ভারতী ।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৭ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

TRACING LAMINATED.

১৩২৭ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
অনন্ত বাসুদেব (সচিত্র)	...	শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	...	১৬৭
অবতার (উপন্যাস)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৫,৩২৭,৩৬৪,৪৭১	
অর্থ-বিজ্ঞান	...	শ্রীঘারকানাথ দত্ত এম-এ, বি-এল	৪৩৩	৪৫১
অনাসৃষ্টি (চিত্র)	...	শ্রীনীহারবালা দেবী	...	৫৯১
আদর্শ সৌন্দর্য্য (সচিত্র)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	২৪৯
আন্ধারের আধঘণ্টা (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল		১৮৯
আলোচনা—				
বাল্য-বিবাহে পূর্ব্বরাগ	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল		১৩৩
ভারতবাসীর উপনিবেশ	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ	...	৩২২
ঐ	...	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	৩৮৭
উড়ো আপদ (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৩১২
এই হল জীবন সম্বল (কবিতা)	...	শ্রীসতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৯৫
এসেছে (কবিতা)	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	...	১৭৮
কথিকা	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬
কাল-বৈশাখী (উপন্যাস)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৪৮, ১২৩
খোকার আশা (গল্প)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল		৩৯৭
গৈরিকের সাহিত্য সাধনা	...	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ	...	৫১১
গৌরীদাস ও পূর্ব্বরাগ	...	রায়সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ		২৯
ঘুমপাড়ানি গান (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল		৫২৫
ঘুমের ব্যাঘাত (গল্প)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৭১
চয়ন—				
অপেরার লক্ষণ	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৩৫৪
আশ্চর্য্য ঘড়ি	...	শ্রীচারুচন্দ্র রায় বি-এস-সি	...	৫৮
এঞ্জিন-মূর্ত্তি ঘড়ি	...	ঐ	...	৫৮
গাছের গুঁড়ির ঘড়ি	...	ঐ	...	৫৮
চিরায়ুষ্মতী ঘড়ি	...	ঐ	...	৫৮
জনময়ারের ঘড়ি	...	ঐ	...	৫৮
জুয়ারীর ঘড়ি	...	শ্রীচারুচন্দ্র রায় বি-এস-সি	...	৫৯
পাঁজী ঘড়ি	...	ঐ	...	৫৯
ভাঙা ষ্টোভের ঘড়ি	...	ঐ	...	৬০
মাধ্যকর্ষক ঘড়ি	...	ঐ	...	৬০
আর্টে ঘোড়া (সচিত্র)	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৫৫
আলোক-চিত্রে নব-ধারা (সচিত্র)		ঐ	...	৩৪২
অ্যাক্রোপলিস্ (সচিত্র)	...	ঐ	...	৫০৯
কাব্য ও বিজ্ঞান	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	২১০
ঘরবাড়ীর সুর-জ্ঞান	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৫১৭
চাঁদের মুল্লুকে 'মনিষ্যির গন্ধ'	...	ঐ	...	৪২৪
জাপানী আর্ট		শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	১৫২
জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ		ঐ	...	২১২
ঢাউস দূরবীণ	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৪২৫
নানাদেশী মতি-গতি (সচিত্র)	...	ঐ	...	৪৩২
নাচে বেয়াড়া ঢং (সচিত্র)	...	ঐ	...	৪২৬
পূর্ব্বগগনের প্রথম প্রভাত (সচিত্র)		শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	১৫৩
পুরুষ বনাম নারী	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৫১৪
পুরানো মিশরে নূতন আবিষ্কার (সচিত্র)		ঐ	...	৩৪৯
প্রকাণ্ড জুয়াখানা		ঐ	...	৩৫৬
বিজ্ঞানের জন্য রূপসীর চক্ষু-দান		শ্রীচারুচন্দ্র রায় বি-এস-সি	...	১৫১
ভবিষ্যতের সপ্তম আশ্চর্য্য	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	২০৫
মৎস্যনারী (সচিত্র)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৫১
মনের ব্যামোর ছবি	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৪২৫
মার্কিণ বৈজ্ঞানিক মাইকেলসন্	...	শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	৬২
মানুষের বহুরূপ	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	৪২২
যমক-রহস্য	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	২০৪
লর্ড নর্থক্লিফ	...	শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ,	...	৬০
লেখাপড়া জানা কুকুর	...	শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	২০৭
সাধারণ ও অসাধারণ	...	শ্রীচারুচন্দ্র রায় বি-এস-সি,	...	৪২০
সাহিত্যের বিজ্ঞান	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৫১৭
সেকালের নকল চোখ	...	শ্রীবামাপদ বসু	...	৫০৯
স্বপ্ন-তথ্য	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	২০২

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
হড়্‌কা কলের গাড়ী	...	শ্রীপ্রসাদদাস রায়	...	৪২৬
"হাতকড়ির রাজা"	...	ঐ	...	২০৬
চাঁদবিবির কথা (গল্প)	...	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু আই-সি-এস		২৭
চিরসঙ্গী (কবিতা)	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ,		৯২
চিঠি (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		১৭৯
তিলক (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৩৭৮
নতুন খাতার-নিমন্ত্রণ (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল		৬৩
নাগ্নিপীরিতির-কথা (কবিতা)	...	শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামী		১৭১
নোয়ার কিস্তি	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১১১, ১৮৫
পথের বঁধু (গল্প)	...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	২৯৮
পর্ত্তুগীজ জলদস্যু	...	শ্রীকালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল		৩৮৯
পান্নার দুল (গল্প)	...	শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ	...	৫১৮
পুতুল নাচের ঘরে (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	...	৩৯৬
বর্ষার মশা (কবিতা)	...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	...	৪১৯
বনের জ্যোৎস্না (কবিতা)	...	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	...	৪০১
বারোয়ারি উপন্যাস	...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৩২
ঐ	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		১৩৯
ঐ	...	শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	২১১
ঐ	...	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-এট-ল		৩৩৬
ঐ	...	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ,		৫০২
ঐ	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪৭৯
বাংলার গীতি কবিতা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ		শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী	...	৪৭৬
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ	...	শ্রীঅশীতিপর শর্ম্মা	...	২৮৯
বিষ্ণুবাহন গরুড় (সচিত্র)	...	শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়	...	২৬৭
বৈদিক দেব-নামানুসারে খৃষ্টধর্ম্মের একটী ঈশ্বর নাম		শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ		৪২
বোঝা (গল্প)	...	শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ	...	২২৬
ব্যথার স্মৃতি (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল		৩৪৭
ভারতবাসীর উপনিবেশ	...	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	২৩৫
ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক হীনাবস্থা		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৪
ভোরাই (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৪৭০
মনের মিল	...	শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত	...	২২১
ময়ূর-মাতন (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৩৬৩

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
মারণ (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	...	২৫
মার্জ্জনা (উপন্যাস)	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ		২৩৯, ২৭৮
	...		...	৩৭৯ ৪৩৫
মুষ্টিযুদ্ধ (সচিত্র)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১৬১
মৃত্যু বিভীষিকা (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ		২৩২
মেঘের সাগর (কবিতা)	...	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	...	৩৬০
রং বেরং (নাটিকা)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৭
রাতের পাখী	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	...	৮৭
রুষিয়ার সাহিত্যিক	...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৩৬৭
শ্রাবণ রজনী (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ		৫৩৪
সঙ্কলন :—				
অরবিন্দের পত্র	...		...	২৫৯
অন্তর-বাহির প্রবন্ধ	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭৫
অতিথি "	...	ঐ	...	৬৮
আমার কথা ৮	...	ঐ	...	১৭২
গান	...	ঐ	...	২৬১
নারী-স্বাতন্ত্র্য	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৪৯৪
বিলাতযাত্রীর পত্র ৩	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৫৭, ৪৭৮
ভারত ইতিহাস-চর্চ্চা ৫	...	ঐ	...	৬৫
মানুষের আয়ু	...	শ্রীজগদানন্দ রায়	...	৪৯২
রথযাত্রা সদ্য কবিতা	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭৭
শিল্পী (গল্প)	...	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ	...	৭০
শিল্পীর উপসংহার	...	জনৈক শিল্পীর ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট হইতে উদ্ধৃত		৯৭১
সাহিত্যে পতিত	...	শ্রীমোহীতোষকুমার রায় চৌধুরী এম-এ		২৬১
সমালোচনা	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	...	৪৪১ ৫২৬
সন্ধ্যাকালী (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	...	৪৬৬
সাল-পহেলী (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৩
সাতের কথা	...	শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল	...	৪৬৬
সিখের ইতিহাসে শিবাজী ও আফজাল খাঁ		শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, পি আর এস		৩০৫
সোনার ফ্রেম (গল্প)	...	শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ	...	৩৭২
য়ুরোপের প্রভাবে ভারতের ভাবীঅবস্থা		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১২১

চিত্র সূচী

অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ... ৯৭
অনন্ত বাসুদেবের বিমান ও পার্শ্বস্থ মন্দির ১০০
অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে ভাস্কর্য্যের চিত্র ১০৪
অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ... ১০৯
অভিনেত্রী মিস গ্লাডিস কুপার ২৪৯
অতি-বড় রূপসীর ঠোঁট ... ৪৩২
আপলোর মুখ ... ২৫৪
আসুরিয়ার ভাস্কর্য্য ... ১৫৯
আলোকচিত্র নং ১ ... ৩৫৩
ঐ নং ২ ... ৩৫৩
ঐ নং ৩ ... ৩৫৪
অ্যাপলো ... ২৫৩
অ্যাক্রোপলিসের রমণী-মূর্ত্তি ... ৫১৩
অ্যাক্রোপলিসের রমণী-মূর্ত্তি ... ৫১৫
করঙ্ক-বাহিনী (রঙিন)
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত ৪৪৩
কণারকের ঘোড়া ... ৫৬
কার্পেন্টিয়ার ... ১৬৫
কার্পেন্টিয়ার ও স্মিথের মুষ্টিযুদ্ধ ১৬৪
খেলা (রঙিণ)
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ১৮৩
গতি লাবণ্যের শরীরিণী মূর্ত্তি ... ২৫১
গেবি ডেলির নাচের জিমনাষ্টিক ৪২৮
গেবি ডেলির আর এক কসরৎ ৪৩০
জনসন, জেফ্রিসের ঘুসি এড়াইতেছেন ১৬৩
জনসনের হাতে বার্ণাস্ মার খাইতেছেন ১৬২
জলবালার প্রেম ... ৫৫
জেলের ছেলে ও জলবালিকা ... ৫২
জ্যাক ডেম্প্সী ... ১৬৬
ঝড়ের আলো (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত ১
ডায়োনিসাসের রঙ্গালয়ের মূর্ত্তি ৫১৩
তরুণী অবাক হয়ে মৎস্যবালাকে দেখছে ৫৪
তৃতীয় টুথ্‌মোসিস ... ৩৪৯
দেবী এথেনী ... ৫১৪
দ্বিতীয় রামেসিসের মমি ... ৩৫১
দ্বিতীয় রামেসিসের মর্ম্মর মুখ ৩৫১
দ্বিতীয় রামেসিসের নির্ম্মিত মন্দির ৩৫২
দুই সুন্দরীর দু-রকম হাসি ... ২৫০
নবোঢ়া (বহুবর্ণ) প্রাচীন চিত্র ২৬৫
পালোয়ানী নাচের নমুনা ... ৪২৯
পর্থেননের চাঁদনী ... ৫১১
পার্থেননের একাংশ ... ৫১২
পার্থেননের একটি ভাঙা মূর্ত্তি ... ৫১৬
প্রভাতের শিশির (বহুবর্ণ) ...
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ৯৩
প্রাচীন গ্রীসের নাচ ... ৪৩১
বঙ্কিম তনুলতা পুরন্ত ভঙ্গিমায় অপূর্ব্বছন্দ ২৫৪
বরেন্দ্রের গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি ... ২৭২
বেকেট ... ১৬৬
ব্যাবিলনের স্থাপত্য ... ১৬০
ব্যারণ ক্লটের গড়াঘোড়া ... ৫৭
বিশ্রম্ভালাপ (বহুবর্ণ) প্রাচীন চিত্র ৩৬১
বিবাহ যোগ্যার উল্কা ... ৪৩৩
ভারতীয় নাচের বিকৃত নকল ৪৩০
মৎস্যনারী .. ৫১
মাছ ধরতে,—জলবালা ... ৫২
মাকড়সার মত নাচ ... ৪২৭
মিস আনেট কেলারম্যান ... ২৫২, ২৫৫
যবদ্বীপের গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি ২৭১
যুবক আপলো ... ৫১০
রাখাল ও জলবালা ... ৫৩
রূপরাণী ভেনাস ... ২৫৬
লণ্ডনের একটি মনুমেণ্টের অশ্বমূর্ত্তি ৫৬
লুক্সারের মন্দির ... ৩৫০
সুগঠন দেহ ও সুন্দর মুখ ... ২৫৬

করঙ্ক-বাহিনী
চিত্রকর—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের সৌজন্যে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৭ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্জ্জনা

৪

সোদপুরের বাগান-বাড়ীটা হাল ফেসানের না হলেও খুব বনেদি ধরণের। ঘরগুলো সংখ্যায় কম হলেও লম্বা-চওড়ায় বড়-বড়। হল-ঘরটার একদিক থেকে আর একদিকের লোকজনকে যেন ছোট্ট দেখায়।—সাম্‌নে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান, দেশী-বিলাতী ফুল ফুটে আলো করে রয়েচে; দুদিকে দুটো বড় বড় পুকুর; মাঝখান দিয়ে চওড়া সুরকির টক্‌টকে লাল রাস্তা; গেটের দু'ধারে দুটো প্রকাণ্ড বড় মেহগিনির গাছ;—রাস্তার দুধারে রাধাচূড়োর গাছ—ফুল ফুটে লালে-লাল! বাড়ীটাকে উপভোগ্য আর মনোরম করবার যথেষ্ট চেষ্টা যে করা হয়েচে, তা তাতে পা দেবামাত্র বেশ বুঝতে পারা যায়।

কল্‌কাতার গাড়ী-ঘোড়া লোকজনের ভিড় থেকে সেখেনে গিয়ে পড়ে আমি যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। নিরিবিলি জায়গার একটা মস্ত গুণ যে সেখানে নিজেকে উপলব্ধি করবার অন্ততঃ যথেষ্ট অবসর পাওয়া যায়। নিজেকে জানা যে একটা মস্ত কাজ, তা বেদ-বেদান্ত অনেকবার করে বলে গেছেন। বয়সের সঙ্গে যখন বাইরের উপর একটা অনাসক্তি আপনিই এসে পড়তে থাকে, ইন্দ্রিয়গুলো দুর্ব্বল আর ক্ষীণ হয়ে পড়ে, বাহ্য জগৎটাকে অনেক খানি অস্পষ্ট এবং দূর ক'রে তোলে, তখন স্বতঃই নিজেকে জান্‌বার প্রবৃত্তি আর আকাঙ্খাটা বেড়ে উঠ্‌তে থাকে, সেই সময় বনে যাবার উপদেশটা মন্দ নয়। আমার মনে হয়, নিজের আর পরের শান্তির জন্য এটা একটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ। প্রবৃত্তিগুলো যখন নিবৃত্তির পথ ধরে, তখন তাদের উপর আগেকার ঝোঁক-ঝাক সয় না; অভ্যাস-দোষে সে ঝোঁক দিতে হলে জীর্ণ ঠিকা গাড়ীর মত তারা এমন একটা কলরব করতে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

থাকে, যাতে ভিতরকার শওয়ারি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে! তখন তাকে কাজের গণ্ডী থেকে তফাৎ যে করতে পারে, সে খুব বুদ্ধির কাজই করে। দায়ে পড়ে যখন আমার এই ব্যবস্থাই ঘটল, তখন আমি শাস্ত্রকারদের বুদ্ধি এবং বহুদর্শিতার বাহাদুরি না দিয়ে থাকতে পারিনে।

মিনিকে এ'সব কথা আমি বলিনি; কিন্তু সে যেন এটা বুঝে নিয়েছিল—তাই তাকে নেহাৎ না ডাকলে সে এসে বড় আমার নিভৃত চিন্তার শান্তি ভঙ্গ করত না। তার দেহখানা নবীন থাকলেও মনে সে অনেক-খানি বুড়ো হয়ে গিয়েছিল—হয়ত সেও বসে চুপ-চাপ নিজেকে উপলব্ধি করত।

মোট কথা, সোদপুরে দিনগুলো খুব ভাল কাটবে বলে আমার বিশ্বাস হওয়াতে মনটা সম্পূর্ণ উদ্বেগ-হীন হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ বোধ করলাম।

বিকেলে হয় লোক, না হয় চিঠি কলকাতা থেকে আসত। সেই সময়ে আমরা বাগানের মধ্যে বসে চা পান করতাম। দিনের মধ্যে যা-কিছু প্রয়োজনীয় কথা বার্ত্তা আমাদের সেই অবসরে হতো। চিঠি-কাগজ-পত্র মিনিই সব খুলত, কি উত্তর দিতে হবে, আমি মুখে মুখে বলে দিতাম—সে রাত্রে বসে সেগুলোর জবাব লিখে দিত। ইতিপূর্ব্বে আমার স্ত্রী মিনিকেই চিঠি দিচ্ছিলেন; সে-ই তার জবাব দিয়ে দিত। সেদিন একখানা খামে মোড়া চিঠি আমার নামে এসেছিল, আর আমার স্ত্রী তাতে লিখে দিয়েছেন যে আমি ভিন্ন অপর কেউ যেন সেটা না খোলে।

মিনি চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বল্লে, "প্রেরকের অনুজ্ঞা যে এটা আপনিই খুলবেন।"

চিঠিখানা না দেখেই আমি বল্লাম, "কে প্রেরক?"

"কাকিমা।"

চিঠিখানা পড়ে, উদ্বেগে চিত্তটা ভরে উঠল। তিনি লিখ্‌চেন, লীলার শরীরটা ক'দিন ধরে মন্দ যাচ্ছিল; ডাক্তারেরা ভয়ের কোন কারণ নেই বল্‌চেন; কিন্তু লীলা নিজে এত অধীর হয়েচে যে তাঁর আর একা থাকতে সাহস হচ্চে না। হয় আমাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে, নয় তাঁরা সোদপুরে আস্‌বেন। যদি সোদপুরে আসেন ত লীলার জন্য উপরের ঘরটার বন্দোবস্ত করতে হবে।

মিনিকে সব কথা বল্‌লাম; মনে হাসি এল। এমন কি গোপনীয় কথা যা মিনিকে লেখা যায় না! বোঝা শক্ত, ভাব-গতিক।

মিনি বল্লে, "আপনার এ অবস্থায় কল্‌কাতা যাওয়া হতেই পারে না। লীলাই এখানে আসুক—আমাদের ডাক্তারের ভাবনা যখন নেই, তখন আর ভয় কি! যাঁরা সেখানে দেখ্‌চেন—এবেলা ওবেলা করে এখানেই দেখে যাবেন। আর অসুখ নিতান্ত মারাত্মক নয়—এটা নিশ্চয়।"

"তবে আমার জবানি—তুমি তাদের কাল আস্‌তে লিখে দাও।"

মিনি তখনি বসে চিঠিটা লিখে দিলে—আমিও শেষে দু-কলম লিখে দিলাম।

তার পরদিন মিনি উপরের ঘরটা ঝাড়-পোঁছ করাতে খুব ব্যস্ত রইল। সন্ধ্যা-নাগাদ লীলারা এল।

লীলা আমাকে দেখে খুব কাঁদতে লাগ্‌ল।

আমি তার মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লাম, "ছি মা, এমন উতলা হলে কি চলে? অসুখ হলে সহ্য করতে হয়—দু-চার দিন পরে সেরে উঠ্‌বে।"

সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে, "বাবা, আমি আর বাঁচব না।"

"পাগল মেয়ে! কি হয়েচে তোমার যে তুমি এমন করচ!" সে মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদতেই লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বোস্ এসে দেখে গেলেন—কোন ভয় নেই।

খাওয়া-দাওয়ার কিছু আগেই স্ত্রী আমার ঘরে এলেন। দেখ্‌লাম, তাঁর উগ্র-চণ্ডী মূর্ত্তিটা কতটা নরমে গেছে। মনে মনে একটু খুসী হলাম। এই ক'দিনের বিচ্ছেদ তাঁকে কি চমৎকার বদলে দিয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের একান্ত সান্নিধ্য যে দাম্পত্য সুখের বিরোধী তা' ইতিপূর্ব্বে লোকের মুখে শুন্‌লেও তেমন বিশ্বাস করতুম না; কিন্তু এখন মনে হলো যে কথাটা খুবই সত্য।

দেখ্‌লাম, লীলার জন্য তিনি অতিরিক্ত চিন্তিত। তিনি বলেন, "লীলার অসুখের কারণ, মোহিতের কঠোর ব্যবহার। সে এ-পর্য্যন্ত একটা চিঠি-পত্র দেয়নি। চিঠি দিলে তার উত্তর দেওয়াটা যে প্রয়োজন তাও সে মনে করে না। সে যেমন ব্যবহার করচে, তাতে তার খোঁজ-খবর না নেওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু মেয়ে যে আমাদের!"

এই কথা শুন্‌লেই ধাঁ করে আমার মাথাটা কেমন গরম হয়ে ওঠে। মেয়ে আমাদের, তাতে অপরাধটা কি? সে কিছু এমন কোন উৎপাত আরম্ভ করেনি, যার জন্য তুমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠ! আর তেমন যদি কিছু ঘটে থাকে, তার জন্যে দায়ী তার চেয়ে তুমি বেশী নও কি?

অনেক দিনের পর দেখা, আমার রাগটাও কম হলো, আর তা প্রকাশও করলাম না। শুধু বল্লাম, "আমাকে কি করতে হবে, তা প্রকাশ করে বল। আমি নিজে ত দুনিয়ার সব কাজের বার হয়েছি। এই দেহ আর মন নিয়ে আমি কি যে করে উঠতে পারব, জানিনে। তবুও বল, কি করতে হবে?"

"কেন, তুমি নিজে না পেরে উঠ্‌লে তোমার এত চেনা-শোনা, এত বন্ধু-বান্ধব—ইচ্ছা করলে তুমি কি না পার?"

এমন কথা শুনে বোধ হয় ভীষ্মদেবও খুসী হতেন। আমার অজ্ঞাতসারে হাসিটা বেরিয়ে পড়ল,—বল্লাম, "বেশ, তুমি তার সব ঠিক-ঠিকানা ঐ প্যাডটার উপর লিখে রাখ। দেখ, কালই আমি পাত্তা বার করবার কি চেষ্টা করি!"

দেওয়ালের উপর টিক্‌টিকিটা ঠিক এই সময়ে তিনবার শব্দ করলে—তার সঙ্গে আমার স্ত্রী বল্লেন, সত্যি! সত্যি! সত্যি! আর্‌, তাই হোক্!

খাবারের ডাক পড়ল।

কত রাত—ঠিক আন্দাজ করতে পারিনে, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, পারুলের চাপা গলার ডাকে। অসম্ভব রকম ভয় পেলে যখন মানুষের বাক্‌রোধ হয়ে আস্‌তে থাকে,—এ যেন ঠিক্ তেমনি গলা!

"একবার শীগ্‌গির উপরে চল।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"আমি কিছু বুঝতে পারচিনে। ওগো কি আমি বলব তোমাকে—তোমার পায়ে পড়ি, লীলাকে তুমি বাঁচাও—" তুব্‌ড়ীর মুখে আগুন দিলে যেমন দেরী সয় না—এও যেন তেমনি তাড়াতাড়ি,—অনর্গল বকে যাওয়া।

উপরে উঠে গিয়ে যা দেখ্‌লাম, তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। ভীষণ রক্ত-গঙ্গার মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় লীলা পড়ে আছে—মনে হয়, যেন সে আর বেঁচে নেই!

"ইস্, সর্ব্বনাশ! কত দিন এমন হয়েচে? কৈ, আমি ত কিছু জান্‌তে পারিনি।"

পারুল ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি অস্থির হয়ে ঘরের এক দিক থেকে অন্যদিক পর্য্যন্ত পায়চারি করতে লাগ্‌লাম।

হঠাৎ পারুল আমার পা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, "তুমি ওষুধ দিয়ে রক্ষা কর, নইলে মেয়েটা আমার আর বাঁচবে না।"

আমার কোন ওষুধের কথাই মনে এল না। বল্‌লাম, "ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাও—কাকে দেখাচ্ছিলে?"

"বোসকে।"

"রাত্তিরে গাড়ী নেই?—তাইত। আমার হাত-ব্যাগটা কোথায়?"

পারুল তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে সেটা নিয়ে এল। ব্যাগটা খুল্‌তে প্রথমেই নজর পড়ল রিভল্‌ভারটার উপর। সেটা ভরাই থাকে। মনে হলো, সেটা নিজের বুকের উপর বসিয়ে দিয়ে সব লজ্জা শেষ করে ফেলি, কিন্তু তখনি সর্ব্বাঙ্গ রাগের আগুনে প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌ল। আগে বদমায়েসের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করি,—তার পর নিজের লজ্জা-নিবারণ!

ইন্‌জেক্‌সনের পিচ্‌কিরিটা দিয়ে বার দুত্তিন আর্গট দিয়ে-দিয়ে—ব্যাগটা হাতে করে নীচে নেমে গেলাম। যাবার সময় বলে গেলাম, "ভয় নেই—এতেই কাজ হবে।"

নীচে টেবিলের পাশে চেয়ারের উপর বসে পড়ে ভাববার চেষ্টা কর্‌লাম।...অসম্ভব! মনটা ঠিক গরম জলের মতই টগ্‌বগ্ করে ফুটচে!

ল্যাম্পটা ঢিমে জল্‌ছিল। মনে হলো, তেমন আলোতে কোন জিনিষের খেই পাওয়া যায় না; সেটাকে বেশ করে তুলে দিলাম। দিতেই প্যাডের উপর পারুলের নীল পেন্‌সিলে বড় বড় করে লেখা দেখতে পেলাম; মোহিতমোহন রায়, জমিদার;—পুর। এক মুহূর্ত্তে ভুলে গেলাম, আমার বয়স আর শরীরের অবস্থা। আমার দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত তীব্র চীৎকার করে যেন বলে উঠ্‌ল—অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে।

ব্যাগ থেকে রিভল্‌ভারটা বার করে নিজের পকেটে রাখলাম; তখন আর নিজেকে ধরে রাখ্‌তে পারচিনে; গায়ে শত হস্তীর বল, পায়ে হরিণের ক্ষিপ্রতা! একখানা কাগজের উপর লিখে দিলাম:—

"মিনি,

পাপের প্রতিবিধান একান্ত দরকার। সেই উদ্দেশ্যে বার হচ্ছি। হয়ত এ জীবনে আর দেখা হবে না। ইতি

তোমার কাকা।"

জানিনে কখন্ বাড়ী থেকে বার হয়ে কি করে পথটা অতিক্রম করে ষ্টেশনে এসে পড়েচি! গাড়ী আস্‌তেই তাতে চড়ে বস্‌লাম। তত সকালে গাড়ীতে বিশেষ

লোক-জন নেই—আমার কামরাটা একেবারে খালি। গাড়ীখানা ছুটচে, আর তার ভিতর ক্ষুধার্ত্ত পশুরাজের মত আমি হান্‌-টান করচি, শোণিত-পিপাসায় আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠ্‌চে! ঠিক যেন খুন চড়ে গেছে!

সমস্ত দিন মানসিক উত্তেজনা আর অনাহারের পর যখন গাড়ী—পুরে থাম্‌ল, তখন দেহটা যেন অবসন্ন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে চায়! তখন সন্ধ্যা হয়ে আস্‌চে।

ষ্টেশন থেকে বার হয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে দেখলাম, সন্ধ্যার ধূসর আকাশকে মলিন করে, রাশি রাশি ধূলো উড়িয়ে দলে-দলে গরু-বাছুর মাঠ থেকে বাড়ী ফিরচে। পথে আর বিশেষ লোক-জন নেই।

রাখাল ছেলেদের মধ্যে একজনকে ডেকে বল্লাম, "ওরে জমিদার বাবুদের বাড়ী কতদূর?"

সে বল্লে, "মালতীপুর যাবেন—সে যে অনেকদূর! গাড়ী না হলে যাবেন কেমন করে?"

"গাড়ী পাবো কোত্থেকে?"

"কেন, জমিদার বাবুদের খবর দিন।"

"তুই যাবি?"

"না।" বলে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

নিজেকে এমন অসহায় জীবনে আর কখনো বোধ করি নি। কি করি, কোথায় যাই! একটা গাছ-তলায় একখানা কাঠ পড়েছিল, তার উপর বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

এ কি পাগ্‌লামি আমার! কার অপরাধ! কে কাকে শাস্তি দেবে! এই পঙ্কিলতার মধ্যে অযথা নিজেকে টেনে এনেছি কেন? ছি ছি মানুষের অহঙ্কার কি পাগলই করে মানুষকে!

ক্রমেই অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। অবসন্নতার অত্যন্ত গুরুভারে শরীরটাও যেন নুয়ে পড়তে চায়। মদের নেশার মত যে উত্তেজনা মনটাকে জুড়ে বসেছিল, সেটা যেন হাল্‌কা হয়ে এসে দেহের সমস্ত বন্ধনকে শিথিল করে দিয়ে গেল। আমি স্পষ্ট অনুভব কর্‌লাম যে একটা বিরাট আকর্ষণে পৃথিবী আমার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে তার নিজের দিকে টান্‌চে। সে টানকে ঠেকিয়ে রাখা আমার সাধ্যের অতীত! সেই ধূলো-মাটির উপর লুটিয়ে পড়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই!

শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লাম, অদূরে ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতে তার ছোট কোলের ছেলেটি মার কোলে দিনের অবসানে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে কান্না নিয়েচে। আমারো বুকের মধ্যে থেকে যেন কান্নার ঢেউগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আমিও জীবনের অবসানে ঠিক তেমনি করেই ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্চি; কেবল যা চাচ্চি, তা পাচ্চিনে বলেই—সমস্ত হৃদয়কে মথিত করে এই নিবিড় কান্নাটা ব্যথার সুরের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হতে চায়!

ফোড়া যখন দেহের একটা জায়গায় নিবদ্ধ থাকে, তখনি তার টাটানিটা অসহ্য বলে মনে হয়; কিন্তু সেটা যখন ফাট্‌তে না পেয়ে বিষটাকে সমস্ত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে থাকে, তখন মৃত্যু আসন্ন হলেও ব্যথার তীব্রতা কমে এসে দেহ-মনকে আচ্ছন্ন

করে দিতে থাকে—ঠিক তেমনিটি হয় দুশ্চিন্তায়—সে যখন মনের সীমাকে অতিক্রম করে, তখন মনটাও অসাড় হয়ে আস্‌তে থাকে, মহা-সুষুপ্তির অতল তলে ডুবে যেতে তার কিছুমাত্র দেরী হয় না!

সেই অচেনা অজানা দেশে পথের ধুলোর উপর শুয়ে পড়ে আমার চোখ দুটো ঘুমের ঘোরে এমন ভেরে এলো যে আমি নিমেষে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

রেলের লাইন-কাটা ঘণ্টার কর্কশ আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুয়ে শুয়ে শুনলাম, দশটা বাজা; কিন্তু গজাল শুনে বুঝলাম, দুপুর রাত, বারোটা বাজল। উঠে বসে দেখ্‌লাম, বাতিগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েচে। হঠাৎ এত রাত্রে এ কিসের সমারোহ সুরু করে দিলে এরা আবার! আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। ঠিক যেন মনে হলো, বর আস্‌বার আগে পথের বাঁধা আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে কার প্রতীক্ষায় জন-কয়েক এদিক-ওদিক ছুটো-ছুটি হাঁকা-হাঁকি করচে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা ট্রেন এসে পড়ল। এমন করে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে থাক্‌তে বিরক্তি হলো। উঠে পড়ে গাড়ীখানা ধরবার জন্যে চল্‌তে গিয়ে দেখি যে পা যেন চল্‌তে চায় না। মাতালের মত উঠি-পড়ি করে গিয়ে ষ্টেশনের গেটের কাছে পৌছুলাম। এসে চোখে আর কিছু দেখ্‌তে পাই না! মনে হলো, হয়ত বা ঘুরে পড়েই যাব!

যে জানে যে সে কতখানি অসহায়, সে কতখানি বেশী সতর্ক! আমার পক্ষে এতখানি বোধ-বিবেচনা স্বাভাবিক নয়; কিন্তু আজ আমি জান্‌তুম যে আমি নিতান্ত একলা; তাই সতর্কতা এমনি করে আপনি এসে জুটলো।

কতকগুলো কুলির সঙ্গে একটা মস্ত ওভার-কোট-পরা মেম সায়েব আস্‌চেন দেখে ত্রস্তে একপাশে সরে গেলাম। মেম সায়েব আমার দিকে ফিরে বিস্ময়ের সঙ্গে চীৎকার করে বল্লে, "কাকা!—আপনি!"

যে জলে ডুবে মরে, তলিয়ে যাবার আগে, তার কাণে যেমন তীরের লোকের বিলাপ-ধ্বনি অস্পষ্ট-অস্ফুট ধ্বনিতে কাণে এসে পৌছোয়—আমার কাণেও এই দুটি শব্দ এসে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞানটা কোথায় যেন তলিয়ে চলে গেল।

চোখ চেয়ে দেখ্‌লাম,—সেই আমার পরিচিত ঘর—সেই পুরোনো কোচের উপর শুয়ে আছি! সাম্‌নে তেপায়ার উপর থরে থরে ওষুধের শিশি সাজান রয়েচে। পারুল পায়ের কাছে বসে। তার মুখ-খানা কৌটোয়-ভরা তুলোয় মোড়া চোপ্‌সা আঙুরের মত।

আমাকে চাইতে দেখে পারুল সরে এসে বল্লে, "আজ ভাল আছ?"

আমি স্থির চক্ষে তার কপালের উপর যে একগোছা চুল ঝুলেছিল, তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লাম!

বল্লাম, "মিনি—?"

"ও-ঘরে ঘুমুচ্চে।"

"কেন?"

"রাত জেগেছিল। ডাক্‌ব?"

তাকে একবার ভারী দেখবার ইচ্ছে

হচ্ছিল; কিন্তু মুখ থেকে কেমন বেরিয়ে পড়ল—"না।"

"লীলা সেরেচে।"

"কি হয়েছিল তার?"

পারুলের মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল!

"তাকে মার্জ্জনা কর।"

এক মুহূর্ত্তে সে দিনের সব কথা বিদ্যুতের আলোর মত মনের একদিক থেকে অন্যদিক পর্য্যন্ত চম্‌কে গেল।

"অসম্ভব—"বলে পাশ ফিরে শুয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে চোখ চেয়ে দাঁড়া-আর্শিতে দেখ্‌লাম, আমার স্ত্রীর চোখ দিয়ে ধারা বয়ে যাচ্চে।

"তুমি কি মিনিকে ক্ষমা করতে পেরেচ?"

পারুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো।

তখন একটা হাত তার গায়ের উপর রেখে বল্‌লাম, "ক্ষমা আমাদের করতেই হবে যে পারুল। যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনকে মন্থন করে উঠ্‌চে, তার শক্তি ত ক্ষুদ্র নয়; তাকে ঠেকানো কি ঐ শিশুদের কাজ? আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে কোন্ ছেলেটি না হাত পুড়িয়ে ফেলে? চোখের কাছে দোষটাকে তুলে ধরে মানুষকে আড়াল করলে লাভ কি? দোষ বড় নয়, মানুষ বড়।"

পারুল আমার পানে চেয়ে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল—পলক-হীন দৃষ্টি! আমি বল্‌লাম, "ডাকো মিনিকে, ডাকো লীলাকে।"

তারা ঘরে আস্‌তে তাদের পাশা-পাশি বসিয়ে বল্‌লাম, "দেখ ত পারুল, দুটিকেই কেমন নতুন ফোটা ফুলের মত পবিত্র-সুন্দর দেখাচ্চে। জগতের কোন পঙ্কিলতা ওদের মলিন করতে পারেনি।...মানুষ মানুষের বিচারই করতে পারে না—ক্ষমা করবে কি?

পারুল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, মিনি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, লীলা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। এই তো সেই কান্না,—যাতে সমস্ত চিত্ত ধুয়ে নির্ম্মল নিষ্কলুষ হয়!

আমার মনের উপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গিয়ে যেন আমাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে দিলে।

তার পর অনেককেই বল্‌তে শুনেচি—বুড়ো দিন্ দিন্ ছোঁড়া হয়ে যাচ্চে!

কি বদলানই বদ্‌লে গেলাম!

সমাপ্ত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অর্থ-বিজ্ঞান

প্রকৃত খাজানা

(১) শস্যক্ষেত্র

বাস্তব জীবনে পূর্ব্বোক্ত উর্দ্ধ সীমায় যাইয়া জমা ধার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। এই সীমা নির্দ্দেশ করিবার সময় মূলধন ও জন-বলের অভাব নাই এমনি কল্পনা করিতে হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদেশেই তাহাদের উপরের কিম্বা এক-তমের অভাব নিয়তই অনুভূত হইয়া থাকে। তাহাদের কোন অঙ্গের অভাব হইলে ভূমির

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

উৎপাদিকা শক্তির সীমা পর্য্যন্ত ধন ও জন নিয়োগ করিয়া ক্ষেত্র হইতে যতটা শস্য উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা করিয়া উঠা যায় না। এ দেশের ন্যায় যে-সব দেশে মূলধনের অত্যন্ত অভাব, সেই সব দেশে ভূমির অণ্ডীনোৎপাদিকা শক্তি-সীমা পর্য্যন্ত চাষ-আবাদ করা চলে না।

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় ২৫ কোটি একর্ (acre) আবাদী ভূমি আছে। তন্মধ্যে চার কোটি একর গোগ্রাস জন্য পতিত অবস্থায় আছে; বাকি ২১ কোটি একর ভূমিতে বিভিন্ন শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যে আদম সুমারী হয়, তাহাতে দেখা যায় যে আট কোটি লোক একমাত্র কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রতিজনে ২০৬ একর্ ভূমির সর্ব্বপ্রকার উৎপাদনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের কৃষকগণ প্রত্যেক ১৭৩ একর ও জর্ম্মাণীর কৃষকগণ প্রত্যেক ৫·৪ একর ভূমিতে চাষ-আবাদ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে কৃষিজাত শস্যের মধ্যে যব ও গম সাধারণ। সেখানে প্রতি একর গম ও যব যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৬৪৫ পর্য্যন্ত এবং ভারতবর্ষে তাহাই যথাক্রমে ৮১৪ ও ৮৭৭ পাউণ্ড করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ উৎপত্তি-বৈষম্যের কারণ এই যে, তথাকার কৃষক স্বাস্থ্যে, বলে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় এ দেশের কৃষকগণ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তথায় চাষের পশুগুলিও বলশালী ও কর্ম্মক্ষম। সর্ব্বোপরি সে দেশের লোক এই কৃষি-কার্য্যে বহু মূলধন নিয়োগ করিয়া বাষ্পীয় ও মোটর যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ, শস্য-কর্ত্তন ও আহরণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুতরাং এ দেশের কৃষকদিগের প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্নের ফলে যতটা উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটে, তথায় তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ পাওয়া যায়। তাই সে দেশের ভূমির জন্য যত খাজানা দেওয়া যায়, এ দেশের পক্ষে ততটা দেওয়া সম্ভব হয় না।

আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের বিধান-অনুযায়ী সেটেল্‌মেণ্ট সময়ে জমিদারদিগের পক্ষে খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় জমা-বৃদ্ধির জন্য হাজার হাজার আবেদন পত্র উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত জমা-বৃদ্ধি নহে, সে বোধ সকলের আছে কি না জানি না। ফলতঃ যোত-সৃষ্টির সময়ে খাদ্য শস্যের যে মূল্য ছিল, তাহার বৃদ্ধি হইলে, যে জমা বৃদ্ধি দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা পূর্ব্ব মূল্যের সহিত বর্ত্তমান মূল্যের সমতা মাত্র সম্পাদিত হইয়া থাকে—প্রজার প্রকৃত দেয় জমার এক পয়সাও বাড়ে না। টাকার মূল্য হ্রাস হওয়ার ফলে মালিকানের যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহাই মাত্র নিবারিত করিয়া পূর্ব্বাবস্থার সহিত এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সমতুল্য বিধান করা হইয়া থাকে। প্রকৃত জমা বাড়াইতে হইলে প্রজার জমা দেওয়ার সামর্থ্য যাহাতে বাড়ে, তাহার আনুকূল্য করিতে হয়। অর্থ ব্যয় করিয়া যোতগুলির উন্নতি-সাধন কিম্বা প্রচুর মূলধনে ব্যয় করিয়া উন্নত যন্ত্রাদির ব্যবহারে ভূমিতে গভীরভাবে চাষ ও সার প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া বর্দ্ধিত হারে শস্যোৎপাদন করার ক্ষমতা কৃষকদিগের নাই। অর্থ দিয়া তাহাদিগকে

সাহায্য করিলে অথবা মালিক স্বয়ং পয়ঃ-প্রণালী ইত্যাদি কাটিয়া যোতের উন্নতি বিধান করিয়া দিতে পারিলেই কেবল তাহাদের বর্দ্ধিত হারে খাজানা দেওয়ার সামর্থ্য জন্মিবে; তখন অনায়াসে তাঁহারাও বেশী জমা পাইতে পারিবেন। বর্ত্তমানে কৃষকগণ তাহাদের সামান্য অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবলে মোটামুটিভাবে ভূমি, ধন ও জনের উৎপাদিকা শক্তির অণ্ডীনোপযোগিতার সমীকরণ করিয়া যতটা সম্ভব শস্য উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ একই ভাবে এবং একই নিয়মে এই কৃষিকার্য্য পরিচালন করার ফলে, খাজানার হার কার্য্যতঃ স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। জমার বেলায় "প্রথা" বলিতে আর কিছুই বুঝায় না, উৎপাদনের তিন সাধনাঙ্গের মধ্যে একটা স্থায়ী সম্বন্ধ-স্থাপনের ফলে, প্রজার জমা দেওয়া সামর্থ্যেরও একটা জড়তা সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা মাত্র জ্ঞাপন করে। সজীব সমাজে এই সকল ব্যাপারে "প্রথা" নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। দুই চারি মুষ্টি ভাল বীজ, দুই-চার-দশ ঝুড়ি ভাল সার, এক আধখানা শ্রমলাঘব যন্ত্র আনিয়া তাহাদের হাতে ফেলিয়া দিতে পারিলেই তাহাদের এই জড়গতি ভঙ্গ হইয়া উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে। তখন এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত নূতন করিয়া বিভিন্ন সাধনাঙ্গের শেষ-যোগ্যতার সমীকরণ করার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে এবং তাহার ফলে তাহাদেরও আত্ম-চৈতন্যের সঞ্চার হইবে। পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলার নামই উন্নতি।

বর্ত্তমানে কোন নূতন জমি পত্তন লইতে হইলে, যদি কোন কৃষক তাহার সমশ্রেণীর অপর কৃষক কিম্বা দেশের প্রচলিত হারের খাজানা অপেক্ষা কিছু বেশী দিতে প্রস্তুত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার ইহা লইবার পক্ষে একটা বিশেষ কোন প্রলোভন আছে। এমনও হইতে পারে যে সে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া কিছু লাভ করিতে পারিবে, এরূপ কোন একটা ধারণা হইতেও সে বেশী জমা দিতে স্বীকৃত হইতে পারে। যে ভাবেই হউক, এইরূপ কেহ বেশী জমা দিতে স্বীকৃত হইলে, তখন উপস্বত্ব ও জমা এক কি না, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তথাপি যদি এই চুক্তীকৃত জমা অপেক্ষা উপস্বত্ব কিছু বেশী হয়, তবে কৃষকের কিছু লাভ থাকিয়া যাইবে; কিন্তু কম হইলে তাহাকে ক্ষতি বহন করিতে হইবে। তখন এই ক্ষতি হয় তাহার বেতন হইতে,—নতুবা মূলধন নষ্ট করিয়া সে-ক্ষতি বহন করিতে হইবে। তাহার ফলে, ভূমি হইতে যতটা শস্য উৎপন্ন হইতে পারিত, ক্রমে তাহার পরিমাণ হ্রাস হইয়া উত্তরোত্তর কৃষকের ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সুতরাং এই উপস্বত্বের বাহিরে খাজানা দেওয়া যাইতে পারে না। অপ্রণিধানতা প্রযুক্ত কোন প্রজা সেরূপ চুক্তি করিলে সে স্বয়ং আর্থিক ক্ষতি বহন করে, এবং সমাজও উপযুক্ত ফসল-লাভে বঞ্চিত হয়।

তবে অবস্থা-বিশেষে ভূমির প্রকৃত খাজানা অপেক্ষা তাহার পরিমাণ যে বেশী না হইতে পারে এমন নহে। কোন কৃষক নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য যোত-পত্তন লইয়া তাহার উন্নতি-কল্পে মূলধন নিক্ষেপ করিলে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

এই সময়ের মধ্যে যোতের এই পরিবর্ত্তিত সুবিধা-সুযোগ হইতে সমগ্র মূলধন উঠিয়া না আসিতেও পারে। ভূমির কোন কোন উন্নতি এমনও আছে যে, তদ্দ্বারা মূলধন উঠাইয়া আনিতে অতি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এইরূপ কোন উন্নতি বিধান জন্য মূলধন নিয়োগ করিয়া, ইহার সম্যক্ উঠিয়া আসার পূর্ব্বে যোত ছাড়িয়া দিতে হইলে, কৃষকের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। সেই ক্ষতি-নিবারণ জন্য কৃষক কিছু বেশী খাজানা স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় যোতের জন্য পত্তন লইতে পারে।

তেমন কোন প্রজাকে তাহার পুরুষানুগত যোত পরিত্যাগ করার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, কিছু বেশী জমা দিতে স্বীকার করিয়া যোতরক্ষা করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ যোতে প্রজার একটা মমত্ববুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। মানব-চিত্তের ভাব-প্রবণতা একান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রজা যেমন কিছু বেশী জমা দিতে স্বীকৃত হইতে পারে, তেমনি পুরুষানুক্রমে যে প্রজার সহিত একটা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক হইয়াছে, তেমন প্রজাকে উচ্ছেদ বা পীড়ন করা অপেক্ষা ভূম্যধিকারীও কিছু জমা ছাড়িয়া দিতে পারেন। কেবল আর্থিক সম্বন্ধের উপর সর্ব্বত্র খাজানা ধার্য্য হয় না; অন্যান্য সম্বন্ধও সময়ে সময়ে গভীরভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। তবে সকল অবস্থাতেই এই সম্ভাবিত উপস্বত্ব তাহার মূল ভিত্তি। ইহাকেই আদর্শ ধরিয়া প্রজার জমা দেওয়ার ক্ষমতা, অক্ষমতা, কিম্বা তাহার হারের কম-বেশীর বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

এ-পর্য্যন্ত আমরা সমশ্রেণীর কৃষকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু বাস্তব জীবনে সম-গুণ-বিশিষ্ট লোক দ্বারা এই কৃষিকার্য্য সম্যক্ নির্ব্বাহ হয় না। কোন কোন কৃষিকার্য্য এমনও আছে যে, সুচারুরূপে তাহা নির্ব্বাহ করিতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞ ও যথারীতি শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের আবশ্যক হয়। যে কার্য্যে সুদক্ষ পটু লোকের নিয়োগের প্রয়োজন হয়, অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে সে কার্য্য করিয়া যথোপযুক্ত শস্যলাভ করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাহারা যে জমা দিতে পারিবে, কর্ম্ম-কুশল লোক তদপেক্ষা যে বেশী জমা দিতে পারিবে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে ভূমিরও একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। সকল ভূমিতে সকল রকম শস্য উৎপন্ন হয় না। ভূমির প্রকৃতি-অনুসারে শস্য নির্ব্বাচন করিয়া বপন করিতে হয়। তাহা না করিতে পারিলে সুফল লাভ হয় না। তেমন কোন শস্য-বিশেষ উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া তাহা বিনষ্ট করা আবশ্যক। কৃষকের এই সকল নির্ব্বাচনের উপরে এক দিকে ফসল ও অন্য দিকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি দেওয়ার সামর্থ্য লাভ হয়।

এই সকল বিভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, যদি ভূম্যধিকারীর কোন ভূমি পত্তন করার অনভিপ্রায় কিম্বা প্রতিবন্ধক না থাকে এবং তিনি তাহা পত্তন করিতে সচেষ্ট হন, এবং গ্রাহকদিগের মধ্যেও সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকে, তবে ভূমি

হইতে তাহার বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক পন্থার অনুসরণ করিলে, যে-পরিমাণ উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে, তাহার সমানে সমানে ভূমির খাজানা ধার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহাই খাজানা-ধার্য্যের স্বাভাবিক গতি। ইহাকেই তাহার স্বাভাবিক বা সাধারণ নিয়ম বলা হয়। সামাজিক বহু জটিল সম্বন্ধের ফলে, তাহার পরিমাণের কিছু ইতর-বিশেষ হইলেও, মূল তত্ত্বের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না ও ঘটিতে পারে না। সর্ব্বাবস্থাতেই ভূমির গুণ-বৈষম্য বা বিশিষ্টতার জন্য যে উপস্বত্বের অভ্যুদয় হয়, তাহার সমানে সমানে খাজানা ধার্য্যের একটা স্থির গতির উদ্ভব হয় এবং এই উপস্বত্ব হইতেই খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং খাজানা ভূমির এই বিশিষ্টতার মূল্য বলিয়া পরিকল্পিত হয়।

কৃষি-ভূমির খাজানাকে তাহার বিশিষ্টতার মূল্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ভূমির জন্য কোন যোগান মূল্য (supply price) নাই। ভূমির খাজানা তাহার প্রয়োজন-মূল্যের (demand price) উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। কোন ভূমির জন্য মালিক কম কিম্বা বেশী জমা চাহিতেছেন, তাহার উপরে তাহার আবাদ-পত্তন নির্ভর করে না। খাজানা পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী ভাবে ভূমি মিনাহ দিলেও সেই ভূমি হইতে ব্যয় পোষাইয়া শস্যোৎপন্ন করা সম্ভব না হইলে, ইহা কখনো আবাদে আসিবে না। আমেরিকা প্রভৃতি নূতন অধ্যুষিত দেশে দেখা যায় যে বর্ত্তমানে যে-সকল ভূমি হইতে লভ্য সহকারে ব্যয় পোষাইয়া ফসল করা সম্ভব নহে, ভবিষ্যতে তাহা হইতে লভ্য পাওয়া যাইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ধনীরা তাহাতে চাষ-আবাদ করিয়া কিম্বা অন্যভাবে অর্থব্যয় করিয়া একটা ব্যক্তিগত অধিকার পরিচালন করিয়া থাকেন। যদি কেহ বর্ত্তমান চাষের অযোগ্য কোন ভূমি পত্তন গ্রহণ করেন, তবে বুঝিতে হয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবিত আয়ের প্রত্যাশায় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা সেই ভূমি আবাদের যোগ্য কিম্বা খাজানা পাওয়ার যোগ্য এরূপ প্রতিপন্ন হয় না। ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। পণ্য সামগ্রীর ন্যায় তাহার যোগান মূল্যের উপরে তাহার টান-যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। জমা কম কি বেশী তদ্দ্বারা তাহার চাহিবার কোন ইতর-বিশেষ হয় না। সমাজ তাহার আত্ম-প্রয়োজনেই কেবল অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ভূমি আবাদ কিম্বা গভীরভাবে চাষ করিতে বাধ্য হয় বলিয়াই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূমির জন্য কৃষকের লভ্য বা উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহা হইতেই খাজানা দেওয়ার ক্ষমতা জন্মে।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় তাঁহার "ধন-বিজ্ঞান" গ্রন্থে কোন-এক স্থানের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "উক্ত স্থানের নিকট প্রায় দশ বার হাজার বিঘা জমি পতিত রহিয়াছে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করাতে তিনি বলিলেন, "দুই তিন টাকা নিরিখের কম কেহ উহা ব্যবহার করিতে দিবে না'।"*

* ধন-বিজ্ঞান ৮৭ পৃঃ

কিন্তু মালিকদিগের জানা কর্ত্তব্য যে খাজানার নিরিখের উপরে ভূমির আবাদ-পত্তন নির্ভর করে না। লভ্যের সহিত অথবা একান্তপক্ষে খরচা মাত্র পোষাইয়া কৃষক তাহা হইতে ফসল উৎপন্ন করিতে পারিবে কি না, তাহার উপরই কেবল তাহার চাষ-আবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পক্ষান্তরে "পতিত জমির উপর সরকার হইতে কর ধার্য্য না হইলে আর জমিদারগণের চৈতন্য হইবে না" বলিয়া গিরীন্দ্র-বাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন নহে। দেশে অন্নের অভাব হইয়াছে ইহা খুব ঠিক কথা, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান শস্যের মূল্যে ব্যয় পোষাইয়া এই সকল জমি আবাদ করা সম্ভব কি না, তাহার কোন পরীক্ষা হইয়াছে কি? ফলতঃ এই সকল ভূমি আবাদে আনিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তাহা সহসা আবাদে আসিয়া পড়িবে, তৎপূর্ব্বে কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না। তখনও জমির হার তাহাদের বিশিষ্টতার উপর নির্ভর করিবে, এক টাকা কিম্বা পাঁচ টাকা বলিয়া মালিক গট হইয়া বসিয়া থাকিলেই সেই জমা পাওয়া যাইবে না। ফলতঃ যে স্থানে "সমস্ত জমিই বহু পূর্ব্ব হইতে প্রজাদিগকে অতি অল্প হারে মৌরষ দেওয়া হইয়াছে" সেই স্থানে বহু ভূমি পতিত থাকা বিস্ময়কর নহে। বর্ত্তমানে এই সকল জমির অবস্থা কি জানি না। অবস্থা যাহাই হউক, শস্যের টান যোগানের উপরে তাহার বাজার-দর ধার্য্য হয় এবং প্রচলিত বাজার-দরে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া তাহার উৎপাদন-ব্যয় সম্যক উঠিয়া আসিবে কিনা, তাহার উপরে মুখ্যভাবে জমির চাষ-আবাদ নির্ভর করে; খাজানা অল্প কি বেশী তাহার উপর নির্ভর করে না। তেমন জমা কমি-বেশীর উপরে ভূমিতে গভীরভাবে চাষ দেওয়া না দেওয়ারও অপেক্ষা রাখে না। যেমন সমাজের অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনে পতিত ও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর জমি আবাদে আসে, তেমনি অন্যদিকে গভীর ভাবে চাষ করিয়া ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হারে ফসলোৎপন্ন করার চেষ্টা হইয়া থাকে। এই ভাবে ভূমির পরিধি-বিস্তার কিম্বা গভীরভাবে চাষ করার ফলে যে উপস্বত্বের অভ্যুদয় হয়, তাহা হইতে খাজানা দেওয়া না দেওয়ার উপরে কৃষিজাত সামগ্রীর টান-যোগান নির্ভর করে না। এই উপস্বত্বের সমস্তটা প্রজার হাত হইতে টানিয়া আনিয়া মালিকের আয় বৃদ্ধি করিলেও দেশের চাষ-আবাদের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হইবে না। তেমন মালিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া প্রজাকে তাহার সম্যক উপভোগ করিতে দিলেও সে তাহার কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিবে না। তবে প্রজার মূলধনের অভাব থাকিলে এই আয় তাহার থাকিয়া গেলে, সে তাহার যোতের উন্নতি সাধন করিয়া আরো লাভবান হইতে পারে কি না, সেই চেষ্টায় ব্রতী হইতে পারে। কিন্তু তাহার মূলধনের অভাব না থাকিলেই কেবল কৃষিজাত সামগ্রীর টান বৃদ্ধি হইলে, তাহার পক্ষে নূতন ভূমি আবাদে আনা কিম্বা গভীরভাবে চাষ দেওয়া সম্ভব হয়। মূলধনের হিসাবেই কেবল ষোল আনা উপস্বত্ব প্রজার হাতে থাকা না থাকার একটা মূল্য আছে; কিন্তু মূলধনের কথা ছাড়িয়া দিয়া মাত্র খাজানা দেওয়া না দেওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমাদের এই খাজানা-তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্যের উপলব্ধি জন্মিবে। আর যোতে প্রজার কোন একটা স্থায়ী অধিকার না থাকিলে, তাহার উন্নতি বিধান জন্য তাহার পক্ষে যদৃচ্ছা ব্যয় করা স্বাভাবিক নহে। আমাদের এ দেশে চাষি জমির উপরে প্রজার দখলের স্বত্ব কল্পিত হওয়ায়, মূলধন পাইলে তাহারা দ্বিধাশূন্য চিত্তে যোতের উন্নতি বিধান করিতে পারে। এ দেশে কৃষি-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না হওয়ার প্রধান কারণ অর্থাভাব। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে যে-কিছু সামান্য মূলধন আছে, তাহাও নিকৃষ্ট পতিত জমির আবাদেই বিশেষভাবে নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বর্দ্ধিত হারে ফসল লওয়ার চেষ্টায় প্রযুক্ত হইতেছে না। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে অনেক নিকৃষ্ট ভূমি চাষে আসিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ টাকার মূল্য-হ্রাস। তাহার সহিত লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; এতদ্ভিন্ন বহির্বাণিজ্যের টান। প্রধান ভাবে এই তিন কারণে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্ব আবাদী ভূমির অণ্ডীনোপযোগিতা বৃদ্ধি হওয়ায় নিম্নশ্রেণীর ভূমি আবাদে আসিয়াছে। ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৮২০ লক্ষ একর ভূমি-আবাদ ছিল। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে তাহা ১৯৫০ লক্ষে এবং ১৯১ খৃষ্টাব্দে ২১০০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। তাহার ফলে উৎকৃষ্ট জমির জন্য কিছু আয় বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই আয়-বৃদ্ধি ভূমির উন্নতি-বিধানের ফলে সম্ভাবিত হয় নাই। বর্দ্ধিত হারে শস্য উৎপন্নের সীমা উত্তরোত্তর দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই মূল্য বৃদ্ধির ফলভোগ করিতে পারিলে, প্রজা উপকৃত হইত; তাহা না হওয়ায় প্রজারা অতি সামান্যই লাভবান হইয়াছে। বর্ত্তমানে টাকার মূল্যাভাবে কৃত্রিম উপসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার স্বাভাবিক ফলোদয় হইলে, অনেক নিকৃষ্ট জমি চাষ হইতে ঝরিয়া পড়িবে। তবে বর্ত্তমানে যে পরিমিত টাকা প্রচলনে আছে, তাহার একাংশ প্রত্যাহৃত না হইলে, স্বাভাবিক ফলোদ্ভবের সম্ভাবনা খুবই অল্প।

এই আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে এই বৃদ্ধির সময়ে প্রকৃত খাজানা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহার ফলে পূর্ব্ব-প্রচলিত নিরিখে কিম্বা তাহার বেশী হারে অনেক পতিত জমির পত্তন হইয়াছে। তবে কত জমি কি নিরিখে পত্তন হইয়াছে, তাহার কোন তালিকা নাই।

(২) বাস্তুভূমির খাজানা

কৃষিভূমির আলোচনায় যে সাধারণ নিয়মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বাস্তু ভূমির খাজানা-ধার্য্যের উপর তাহার কতটা প্রভাব বা উপযোগিতা আছে, এখন তাহাই দেখা যাক। পল্লীবাসের জন্য যে ভূমির আবশ্যক হয়, তাহার সহিত সহর-মোকাম ও ব্যবসায়-কেন্দ্রস্থিত ভূমির বিস্তর পার্থক্য আছে; কিন্তু তথাপি তাহাদের তত্ত্বগত বিশেষ কোন বৈষম্য নাই। সুদূরবর্ত্তী ভূমি হইতেও কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া আনিয়া উপভোগ করা চলে, কিন্তু বাস্তুভিটা নিয়ত বাসের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানুষের পক্ষে তাহার বাসভূমির সহিত স্বীয় ব্যবসায়-কেন্দ্রের সহজ সংযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্থান নির্ব্বাচন করা খুবই

স্বাভাবিক। যে স্থান হইতে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে অযথা শ্রম ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করা সম্ভব নহে। স্থানের জল, বায়ু, আলো-উত্তাপ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লোকে বাস্তুভিটা নির্ম্মাণ করে। সুতরাং বাস্তু ভূমির চাহিদার উপরে স্থানগত অবস্থিতি সুবিধা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

অস্থায়ী জমায় পল্লীগ্রামের ভিটা ভূমির বিষয়ই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা যাক। ভূম্যধিকারীদিগের কৃতকার্য্যে যে সকল ভূমি বাসের যোগ্য হইয়া উঠে, তাহাকে ভূমির গুণ-বোধক বলিয়াই ধরিত হইবে। চাষি ভূমির ন্যায় এই সকল ভূমির ও বিভিন্ন ব্যবহারের উপরে তাহাদের খাজানার হার সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তবে এ দেশে পল্লীগ্রামে যে সকল ভূমিতে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তথায় গৃহকর্ত্তা স্বয়ং বাস করেন। অন্যত্র ভাড়া দিয়া অর্থ-লাভের উদ্দেশ্যে কেহ কখনও এই সকল ভূমির পত্তন গ্রহণ কিম্বা গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন না। সুতরাং এই ব্যবহারের ফলে ভূমি হইতে কতটা লাভ হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল ভূমির টান কিম্বা খাজানা ধার্য্য হয় না। সাধারণতঃ এই সকল ভূমির সহিত সংযুক্ত এবং শস্যোৎপাদনযোগী যে দুই-এক টুক্‌রা ছাট্‌ বা পালান ভূমি থাকে, তাহার সম্ভাবিত উপস্বত্ব, গৃহাদি তুলিয়াও তরি-তরকারী এবং শাকসব্জী করিবার মত যে একটু স্থান থাকে তাহার এবং দুই-দশটা ফলবান বৃক্ষ থাকিলে কিম্বা করিবার মত স্থান থাকিলে, তাহাদেরও একটা মোটামুটি উপস্বত্ব ধরিয়া খাজানা ধার্য্য হয়। তাহার সহিত স্থানগত অবস্থিতি সুবিধার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। স্থানের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর না হইলে অন্যান্য সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভূমির তেমন টান হয় না। পল্লীবাসের ভূমি কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং তাহার জমা তদপেক্ষা উচ্চ-হারে ধার্য্য হইয়া থাকে। এদেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে পল্লীগ্রামের জমা চুক্তি-হারে ধার্য্য আছে। এক সময়ে ভূম্যধিকারীর ডাকে-হাঁকে কাজে-কর্ম্মে সাধারণ গৃহস্থ প্রজাকে পাওয়া যাইত বলিয়া তাহাদের এই সকল কার্য্যের বিনিময়ে মিনাই সূত্রে কিম্বা নামমাত্র জমায় এই সকল ভিটার পত্তন ছিল। বর্ত্তমানে সে পন্থা প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়া ইহা চুক্তি জমায় পরিণত হইয়াছে। তথাপি এই সকল ভূমির মধ্যে যেগুলি কৃষিক্ষেত্র কিম্বা বাস্তুভিটাস্বরূপ যদৃচ্ছা ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই সকল অন্যান্য চাষিজমি হইতে উচ্চ ও উন্নত। ইহাই ভিটা ভূমির মধ্যে মণ্ডীনোৎপাদিকা শক্তি-সম্পন্ন ভূমি। সুতরাং তাহাদের জমা সম্ভাবিত শস্যের উপস্বত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধার্য্য হইতে পারে। ইহাই তাহার নিম্নসীমার জমা। তাহার তুলনায় যেগুলিতে যে পরিমাণ বিশিষ্টতা আছে, সেই হারে তাহাদের জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। এই বর্দ্ধিত জমা তাহাদের বিশিষ্টতার মূল্য। সুতরাং এক্ষেত্রেও সাধারণ নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সহর-মোকামে অথবা ব্যবসায়-কেন্দ্রে দোকান পাট, হাট, বাজার প্রভৃতি

সংস্থাপন জন্য যে সকল ভূমির প্রয়োজন হয়, তাহাদের পক্ষে অবস্থিতি সুবিধাই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হইয়া পড়ে। কোন প্রকার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য কলিকাতার ন্যায় ব্যবসায়-কেন্দ্রে প্রকাশ্য রাস্তার উপরে একখণ্ড ভূমির জন্য যে টান, নিভৃত কোন পল্লীর ভিতরে তেমন স্থান থাকিলে, তাহার জন্য সেরূপ টান হওয়া স্বাভাবিক নহে। তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই তাহাদের উপরে পাকা-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া যে সম্ভাবিত লভ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার উপরে খাজানা দেওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। এই সকল ভূমির উন্নতি-সাধনের জন্য স্থায়ীভাবে যে মূলধন নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা অন্য-ভাবে নিয়োজিত করিলে যে লভ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তদপেক্ষা এই কার্য্যে প্রয়োগ করিলে বেশী লাভ পাওয়া যাইবে, এরূপ বোধ না জন্মিলে, কাহারও পক্ষে এই উন্নতি বিধান জন্য অর্থব্যয় করা সম্ভব নহে। অর্থের বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লোকে এই সকল পাকা বাড়ী নির্ম্মাণে স্থায়ীভাবে অর্থ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। যেমন কৃষি-কার্য্যের বেলায় নূতনাধিকরণ বা পরিবর্ত্তন পদ্ধতির নিয়মানুসারে ভূমির বিভিন্ন ব্যবহার ও শস্যাদির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহাদের বিভিন্নাঙ্গের মণ্ডীনোপযোগিতার সমীকরণ করার ফলে যতটা উপস্বত্বের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার উপর প্রজার জমা দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করিতেছে, এই সকল ভূমির বেলায়ও সেই নিয়মেরই প্রভাব দৃষ্ট হয়। ইহাদেরও বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক অনুষ্ঠানের ফলে, যতটা উপস্বত্বের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার উপর গ্রাহকগণের জমা দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করিবে। এইরূপ কোন ভূমিতে পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, মূলধনের কোন ক্ষুদ্র ব্যষ্টি মাত্রার হিসাবে পর পর ভাবে নিয়োগ করিতে করিতে, শেষ যে মাত্রায় ব্যয় সম্ভাবিত আয়ের দ্বারা উঠিয়া আসিবে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই এই উন্নতিকল্পে শেষ মাত্রা এবং এই মাত্রায় উৎপাদিকা শক্তি লভ্যের সমান হইয়াছে। এই মাত্রার উপর ব্যয় করিলে অনুষ্ঠাতাকে ক্ষতি বহন করিতে হইবে। এই অধীন মাত্রার লভ্যে বাড়ীর স্থিতিকাল মধ্যে সমস্ত ব্যয় উঠিয়া আসিবে। তাহার উপর যে আয় হইবে, তাহাই ভূমির উপস্বত্ব; এই উপস্বত্ব হইতে খাজানা দেওয়া যাইতে পারিবে। এই বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য যিনি সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এই দায়িত্বের জন্য তাঁহার কিছু লভ্য পাওয়া আবশ্যক; কিন্তু ভূমির টান বেশী হইলে, তাঁহাকে মূলধনের সুদ মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সুতরাং কৃষি-ক্ষেত্রের জমা ধার্য্যের বেলায় যে নিয়ম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও তাহা প্রযুজ্য হয়; তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নাই।

পল্লীবাসের ভূমির বেলায় তাহার উন্নতি-কল্পে যে মূলধন নিয়োজিত হয়, তাহাকে পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা হয় নাই; কিন্তু এই সকল পাকাবাড়ী সম্বন্ধে ইহা পৃথক্ করিয়া ধরা হইয়াছে। পাকা বাড়ীর মূলধন ভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করা যায়, কৃষি-ক্ষেত্রের উন্নতিকে তেমন ভাবে বিশ্লেষণ করা চলে না।

এই পাকাবাড়ীর স্থায়িত্ব-কাল বলিয়া যে সময়ের নির্দ্দেশ করা গেল, তাহার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারণ করা যায় না। তবে ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই সকল বাড়ী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করার আবশ্যক হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সামাজিক বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তাহার ব্যবহারোপ-যোগিতা নষ্ট ও মূল্য হ্রাস হইয়া পড়িতে পারে। এই মূল্য-হ্রাস-হেতু তাহার বর্ত্তমান খাজানার একটা বিষম দায় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। তখন এই বাড়ীর সামান্য পরিবর্ত্তন বিধান করিয়া, এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ও দায় লাঘব করা যায় কিনা, তাহার চেষ্টা চলিবে। এমনও হইতে পারে যে এই পরিবর্দ্ধিত অবস্থার সহিত ঐক্য সাধন করিতে হইলে, এই দালানটা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। এই সকল নানা কারণে বাস্তুভূমির উন্নতি-কল্পে যতটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, চাষি-জমির বেলায় সেরূপ কিছু হয় না। চাষি-ভূমিতে নিক্ষিপ্ত মূলধন অতি অল্প সময়ে উঠিয়া আসে, কিন্তু দালান এমারতাদির টাকা অতি দীর্ঘ সময়েও অল্পে অল্পে উঠিয়া আসে। মূলধন যত সত্বর উঠিয়া আসে, ততই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সমন্বয় করিয়া পুনরায় নিয়োগ করা যায়। আর কৃষি-কার্য্যের মূলধন কতক উঠিয়া আসার ফলে, মূলধন জ্ঞানে তাহা রক্ষা করিবার জন্য একটা মমত্ব-বুদ্ধি জন্মে কিন্তু বাড়ী ভাড়া রূপে যে অর্থের সমাগম হয়, তাহার একাংশ যে মূলধন সে বোধ প্রায় থাকে না; সুতরাং খরচার মুখে আয় স্বরূপে বাড়িয়া বাড়িয়া যায়। সুতরাং কৃষি ভূমির জন্য যে একটা সাধারণ টান জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, সহর মোকামের স্থানের জন্য সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। তাহার ফলে, ভিটা ভূমির জমা যথাসাধ্য উচ্চহারে ধার্য্য হয় না। তেমনি যে সকল কৃষি-ভূমিতে বর্ষার জল উঠিয়া প্লাবিত হয়, তথায় স্রোতের মুখ হইতে ফসল কাড়িয়া আনায় উপভোগ করার যে দায়িত্ব, তাহাতে সে সকল ভূমির খাজানাও অতি নিম্নসীমায় ধার্য্য হইয়া থাকে।

ব্যবসায় স্থানে যে সকল ভূমির আয়ে তাহার উন্নতির ব্যয় মাত্র উঠিয়া আসে, তাহারা অণ্ডীনোৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন। এই সকল ভূমির কোন জমা হইতে পারে না। বাস্তুভূমির পক্ষে তাহারাই অণ্ডীন-যোগ্য। তাহাদের তুলনায় যে ভূমিতে যে পরিমাণ উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে, সেই অনুপাতে তাহাদের জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও খাজানা তাহার বিশেষত্বের মূল্য।

এ পর্য্যন্ত আমরা মূলধনের কোন অভাব না থাকার কল্পনা করিয়া আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু মূলধনের অভাব নিয়তই অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং ভূমির যতটা উন্নতিসাধন করা যাইতে পারিত; সাধারণতঃ তাহা করিয়া উঠা যায় না। তবে এই কার্য্যে যতটা মূলধন নিয়োজিত হয়, তদ্দ্বারা ভূমির যে ভাবে যতটা উন্নতি করা যাইতে পারে, মোটামুটি ভাবে তাহাদের বিভিন্ন অঙ্গের শেষোপযোগিতায় সমীকরণ করিয়াই ব্যয়িত হইয়া থাকে। তাহার ফলে, অবস্থানুযায়ী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপস্বত্বের উদ্ভব হয়। কিন্তু তাহার ভূমির শেষোৎপাদিকা শক্তির সীমায় যাইয়া উন্নতি-সাধনের ফলে যাহা পাওয়া

যাইত, তদপেক্ষা ইহা কম। সুতরাং দেশে মূলধনের অভাব থাকিলে উপযুক্ত খাজানার উদ্ভব হয় না।

(৩) ভাড়া

যেমন ভূমির উন্নতি করিলে যে উপস্বত্ব পাওয়া যায়, তাহা হইতে খাজানা দেওয়া হয়; তেমনি এই উন্নতির সুবিধা-সুযোগ ভোগ করার জন্য যে খাজানা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাকে ভাড়া বলে। ভাড়া হইতে মূলধনের সুদ, বাড়ীর ব্যবহার-জনিত ক্ষয়, মেরামত-খরচা ইত্যাদি বাদে যাহা লাভ হয়, তাহা হইতে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তেমন যাহারা এই বাড়ী ব্যবহার করিয়া, তাহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায় ইত্যাদি পরিচালন করিবেন, তাহারা তাহাদের ব্যবসায় হইতে যে উপস্বত্ব লাভ করিতে পারিবেন, তাহা হইতেই ভাড়া দেওয়া হইবে। তাহারা তাহাদের বিভিন্ন ব্যবসায় হইতে যতটা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া অনুমিত হইবে, তাহার উপরে ভাড়া নির্ভর করিবে। বড় বড় ব্যবসায়-কেন্দ্রেও সকল ব্যবসায় সমভাবে চলে না। তন্মধ্যে যে সকল ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাদেরই প্রতিযোগিতায় ভাড়া ধার্য্য হইবে। তবে বড় রাস্তার উপরে যে সকল দোকান-পাট বা ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী লাভ হইয়া থাকে। যে স্থানে যত বেশী জিনিষের কাট্‌তি হয়, সেই স্থানের বাড়ীর জন্য বেশী ভাড়া দেওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের মাল কাট্‌তির উপরে তাহাদের ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে। যাহারা প্রকাশ্য রাস্তার উপর বড় বড় দোকান খুলিয়া কারবার পরিচালন করিয়া আসিতেছে, তাহারা বাড়ী ভাড়া বেশী দিলেও তদ্দ্বারা পণ্যদ্রব্যের মূল্যের ইতর-বিশেষ হয় না। এই ভাড়ার টাকা পণ্য-দ্রব্যের মূল্যে ধরা হইতে পারে না। বরং যাহারা প্রকাশ্য স্থানে বেশী ভাড়ার বাড়ীতে কারবার পরিচালনের ফলে অতিশয় বেশী মাল কাটাইতে পারে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। নিভৃত কোন পল্লীর ভিতরে সেরূপ সস্তায় মাল বিক্রয় করা সম্ভব নহে। তাহার প্রধান কারণ মাল-কাট্‌তির বৈষম্য। যাহারা বাড়ী ভাড়ার কমতি দেখাইয়া সস্তায় মাল বিক্রয়ের ভাণ করে, তাহারা সর্ব্বত্র সাতের মর্য্যাদা রক্ষা করে, এমন মনে হয় না।

যে সকল বাড়ীতে বিক্রীত মালের লভ্য দ্বারা প্রচলিত হারে অনুষ্ঠাতার বেতন, কর্ম্ম-চারীগণের বেতন ও কারবারের আনুসঙ্গিক অন্যান্য খরচা মাত্র উঠিয়া যায়, কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না। সেই সকল বাড়ীর জন্য কোন ভাড়া দিয়া কারবার পরিচালন করা চলে না। কারবারের পক্ষে এইগুলিই অণ্ডীনোৎ-পাদিকা-সম্পন্ন। এই সকল বাড়ীর অনুপাতে অন্যান্য বাড়ীর যতটা সুবিধা আছে, সেই অনুপাতে তাহাদের ভাড়া ধার্য্য হয়। এই ভাড়াও বিশিষ্টতার মূল্য।

(৪) খনির খাজানা

খনি কাটিয়া খনিজ সামগ্রী আহরণের জন্য মালিককে যে কর দেওয়া হয়, তাহার সবই খাজানা সংজ্ঞক বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাহার একাংশ খাজানা ও অপরাংশ খনিজ সামগ্রীর মূল্য।

কোন ভূমি পত্তন দেওয়ার সময়ে তাহার

প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে ভূম্যধিকারীকে নজর দেওয়া হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি পত্তন দিলে মৃত্তিকার স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট করা হইবে,—এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। প্রজার ব্যবহার কিম্বা ফসল করার প্রকৃতি-অনুসারে যে শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এইরূপ মনে হইলে নজর না দিলে পত্তন দেওয়া হয় না। তেমন কোন কৃষিক্ষেত্রের একাংশ কর্ত্তন করিয়া অপরাংশে বাড়ী নির্ম্মাণের অধিকার প্রদত্ত হইলে বুঝিতে হয় যে ভূমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এ সকলই নজর গ্রহণের কারণ। তেমন খনি হইতে যে সকল খনিজ দ্রব্যের আহরণ হয়, তাহার ফলে তাহার যে অপচয় ঘটে, তজ্জন্য উত্তরোত্তর খনির মূল্য হ্রাস হইয়া আসে। এই অপচয়ের মূল্য না পাইলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে ইহা পত্তন করা সম্ভব নহে। কোন খনি হইতে কম ব্যয়ে কোনটা হইতে বা অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যয়ে খনিজ সামগ্রী আহরণ করা সম্ভবপর হয়। পক্ষান্তরে সকল খনির সহিত বাজারের সংযোগ-সুবিধাও সমান নহে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন খনি হইতে যে খনিজ বস্তু আহৃত হয়, তাহাদের শেষ মাত্রায় উৎপাদন ব্যয় সমান নহে। খনিতে উৎপন্ন হ্রাস-নিয়মের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ভাবে কার্য্য করে। তবে বর্ত্তমান উন্নত ও শ্রম-লাঘব যন্ত্রের সাহায্যে খনি কাটার ফলে, অনেক খনি হইতেই লভ্যের সহিত খনিজ বস্তু আহরণ করা সম্ভব হইয়াছে, তথাপি যে সকল খনির উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার মূল্যে উৎপাদন-ব্যয় মাত্র কাণায় কাণায় পোষাইয়া যায়—কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না, সেই সকল খনির জন্য কোন জমা দেওয়া চলে না। এই খনিজ সামগ্রী আহরণের হিসাবে কষ্টসাধ্য। তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর খনি কাটিয়া ব্যবসায় চালাইলে অনুষ্ঠাতাকে লোকশান দিতে হইবে।

এই সকল অণ্ডীনোপযোগী খনির জন্য খাজানা দেওয়া সম্ভব না হইলেও তাহা হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করার অধিকার লাভ করিতে হইলে, তাহার অপচয়ের ক্ষতিস্বরূপ মূল্য দিয়া সে অধিকার লাভ করিতে হইবে, অন্যথায় ভূম্যধিকারীর পক্ষে সম্মতি দেওয়া ও এই অপচয় সহ্য করা সম্ভব নহে। উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার মূল্যে এই অপচয়ের মূল্যসহ অন্যান্য উৎপাদন-ব্যয় পোষাইলেই কেবল তাহা হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। যদি এই মূল্য দেওয়া না হয়, তবে মালিক কখনও সম্মতি দিবে না। তাহার ফলে এই খনি হইতে যতটা খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাইত, তাহার আমদানী বন্ধ হইবে। তখন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে; অন্যান্য খনিওয়ালাদের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি হইবে। তখন অন্য লোক আকৃষ্ট হইয়া এই অন্তীন-খনির অধিকার পাওয়া যায় কিনা, তাহার চেষ্টা করিবে। তখন তাহার মূল্য দিয়া সামগ্রী আহরণ করিলে, আমদানী বৃদ্ধি হইয়া বাজার মূল্যের স্বাভাবিক অবস্থা সম্পাদিত হইবে। আর যদি এই দায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়, মালিক যদৃচ্ছা আহরণের অনুমতি দেন তবে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট খনি হইতেও দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব হইবে; তখন আমদানি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মূল্য হ্রাস হইয়া কাটতি বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং অন্য সামগ্রীর উৎপাদন

ব্যয়ের ন্যায় এই অপচয় মূল্য তাহার টান যোগানের উপর গভীরভাবে ধার্য্য করে, কিন্তু কোন ভূমিরই টান-যোগানের উপর খাজানার কোন প্রভাব নাই। খাজানার উপরে ভূমির যোগান নির্ভর করে না। সমাজের আত্মপ্রয়োজনে নিকৃষ্ট ভূমিও ব্যবহারে আনিতে হয় বলিয়া, উৎকৃষ্ট ভূমির জন্য একটা উপস্বত্ব বা খাজানার অভ্যুদয় হয়। খাজানার হ্রাস-বৃদ্ধিতে ভূমির যোগানের ইতর-বিশেষ হয় না কিন্তু খনিজ বস্তুর অপচয়ের মূল্য দেওয়া না দেওয়ার উপরে তাহার যোগান সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং এই অপচয় মূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের একাংশ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু এই অণ্ডীনোৎপাদিকা শক্তি-সম্পন্ন ভূমির ব্যয়ে যে সকল খনি হইতে তদপেক্ষা বেশী সামগ্রী আহরণ করা যায়, এই উদ্বৃত্ত সামগ্রীর উপস্বত্ব হইতেই খনির খাজানা দেওয়া হয়। খনির জন্য যে রয়েলটি দেওয়া হয়, তাহাকে খনিজ দ্রব্যের মূল্য বলিয়া গণ্য করিলে তাহার উপরে যাহা দেওয়া যায় তাহাকে খাজানা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

এই সকল বিভিন্ন আলোচনায় ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য যে সকল ভূমির উপযোগিতা আছে, তন্মধ্যে যেটীর গুণ অল্পই, যাহার উৎপন্ন সামগ্রীতে উৎপাদন-ব্যয় মাত্র পোষায়, তাহার জন্য কোন খাজানা দেওয়া চলে না এবং এই ভূমির তুলনায় সেই কার্য্যের জন্য অন্যান্য যে-সকল ভূমির যতটা বিশিষ্টতা বা শ্রেষ্ঠত্ব আছে, সেই ভূমির সেই অনুপাতে খাজানার উদ্ভব হয়। যে ভূমিতে নালিতা করা সম্ভব নহে, তেমন ভূমিতেও উৎকৃষ্ট ধান জন্মাইতে পারা যায়। নালিতার পক্ষে ইহা অনুপযুক্ত হইলেও ধানের জন্য তাহার উপযোগিতা আছে। তেমন সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে গভীরভাবে চাষ করিয়া শাক-সব্জী করা সম্ভব হইলেও, পল্লীগ্রামের কোন ভূমিতে সেরূপ গভীর চাষ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। এইরূপে কৃষিকার্য্যের বিভিন্ন প্রণালী ও শস্যের বিষয় চিন্তা করিলে, কোন ভূমিই খাজানার একান্ত অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। তবে প্রস্তরময় ভূমি বা মরুভূমির কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষা-অনুসারে এইরূপ ভূমি চাষের যোগ্য বলিয়া কল্পিত হয় না; তবে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াও ব্যবসা চলে।

তদ্রূপ প্রাকৃতিক শক্তির খাজানা ধার্য্য করিতেও তাহার অণ্ডীনোৎপাদিকা শক্তি সীমার হিসাব করিয়া উপস্বত্ব বাহির করিতে হয়। এদেশে এই সকল শক্তির বহুল ব্যবহার অদ্যাপি হয় নাই। সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা গেল না। তবে ভাগী ও গোচারণ ভূমি সম্বন্ধে পৃথকভাবে কিছু বলা আবশ্যক। আমরা নিম্নে তাহারই আলোচনা করিব।

(৫) গোচারণ ভূমি

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে যে চারি কোটী একর জমি গোচারণের জন্য পতিত আছে, তাহা দেশের প্রয়োজনের হিসাবে একান্ত অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। এইরূপ পতিত থাকার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া Industrial Commissioner মহোদয়গণ বলিয়াছেন, "In India fallows are due, as a rule, to accidental misfor-

tune or to land being on the very margin of cultivation. Indian Industrial Commission Report 1916-18 58 (note) কোন আকস্মিক বিপদ-পাতে অথবা ভূমিগুলি অণ্ডীনোৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন বলিয়া পতিত রহিয়াছে। আকস্মিক কারণে সামান্য ভূমি পতিত থাকিলেও অধিকাংশ ভূমিই যে-কোন প্রকার শস্য উৎপন্নের অযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল ভূমিতে যথারীতি চাষ করিয়া গোগ্রাস উৎপন্ন করিলে, তাহাদের খাজানার উদ্ভব হইতে পারে। এই রূপ কোন পতিত ভূমির জন্য খাজানা অবধারিত থাকিলে বুঝিতে হয় যে তাহা পতিত রাখার পক্ষে কৃষকের কোন প্রলোভন আছে। তদ্বারা ইহা খাজানার যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। প্রকৃত খাজানার উদ্ভব হইতে হইলে রীতিমত গোগ্রাসোৎপন্ন করিতে হয়। অন্যান্য সভ্যদেশে গবাদি পশুর আহার যোগাইবার জন্য যথা-নিয়মে চাষ-আবাদ করিয়া ঘাস উৎপন্ন করা হয়। আমাদের কৃষকদল তাহার কিছুই করে না। অথবা লোক বৃদ্ধি ও বহির্বাণিজ্যের প্রভাবে শস্যের টান বৃদ্ধি হওয়ায় সাবেক গোচারণ ভূমিসমূহ চাষে আসিয়াছে। তবে প্রাকৃতিক সুবিধা-সুযোগ ভেদে তাহাদেরও কোন কোন ভূমির যে সামান্য জমার উদ্ভব না হয়, তাহা নহে।

আমাদের পূর্ব্ব-বঙ্গে বিলাভূমিতে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে স্বভাবজাত ঘাস উৎপন্ন হইত। বর্ষাকালে প্রজারা উহা যদৃচ্ছা কাটিয়া আনিয়া গরুর আহার যোগাইত। দেশের লোকের অত্যাচার নিষ্ক্রিয়তার ফলে প্রকৃতির প্রতিশোধ স্বরূপে বর্ত্তমানে আর তাহাতে ঘাস গজায় না। তন্মধ্যে যে সকল ভূমিতে এখনও কিছু ঘাস জন্মে, তাহাতে প্রায় জমার পত্তন হইয়াছে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে এই স্বভাব-জাত ঘাসই বিঘা প্রতি ২০।২৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। তদ্বারা দেশে গোগ্রাসের উৎকট অভাব মাত্র সূচনা করে। রীতিমত ঘাস উৎপন্ন করিলে যে লভ্য না আছে তাহা নহে। বর্ত্তমানে ধানী জমির খড়ই প্রজার দেয় খাজানার উপরে বিক্রয় হয়।

আর সুদিনে পল্লীগ্রামে গোচারণ ভূমির যে অভাব, তাহা পল্লীবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার ফলে গোজাতি নষ্ট হইতে চলিয়াছে।

(৬) ভাগী জমি

বর্ত্তমানে আমাদের এই বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের যে যৎসামান্য খামার জমি আছে, তাহাই ভাগে পত্তন হয়। সাধারণতঃ কৃষকগণ সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন-ব্যয়-ভার আপনাদের শিরে লইয়া, উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধাংশ মালিককে দেওয়ার সর্ত্তে এই ভাগাউড়ী পত্তন লইয়া থাকে। প্রজাদের নিজ নিজ যোত জমিই যথারীতি চাষ-আবাদ করিবার মত মূলধন তাহাদের নাই, তদবস্থায় পরের জমিতে উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন করা শক্তির অতীত। কারণ আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে দেখিতে পাই, জলপ্লাবনে মধ্যে মধ্যে ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপে ফসল একবার নষ্ট হওয়ার ফলে যে মূলধন নষ্ট হইয়া যায়, তাহা পূর্ণ করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া পড়ে; তখন মালিকের প্রাপ্য দেওয়ার প্রবৃত্তি থাকে না। পরন্তু তাহাদের অন্যান্য কার্য্যের অবসর সময়ে

এই সকল ভাগের জমির কাজ করে এবং যাহা কিছু পায় তাহাই লভ্যের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে। তাহার ফলে ভাগের জমিতে ভাল ফসল জন্মায় না। আর যদি বা কখনো হয়, তাহাও সকলে ঠিক মত মালিককে দেয় না। যে দেশে টাকার সুদ শতকরা মাসিক তিন টাকা হইতে আট-নয় টাকা, সে দেশের প্রজার এইরূপ নৈতিক অধঃপতন বিস্ময়কর নহে। ফলতঃ এই ভাগের জমি হইতে যথারীতি ফসল লইতে হইলে মালিককে সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া মাত্র হেফাজৎ ও কাটনি প্রজার শিরে রাখিলে সুফল লাভ হইতে পারে। যে ভাবেই হউক প্রজাকে টাকা দিয়া সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এই ভাগের প্রথা আমূল পরিবর্ত্তিত না হইলে উপযুক্ত ফল-লাভ করার প্রত্যাশা বৃথা।

ভূমির মূল্য

ভূম্যধিকারী হইতে কোন ভূমি পত্তন লইতে হইলেই কেবল খাজানার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। তথাপি ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করিতে যে শ্রমজীবিদিগের বেতন, টাকার সুদ, কৃষক বা অনুষ্ঠাতাগণের বেতন-স্বরূপে নিম্নসীমায় লভ্য হইয়া থাকে, তাহা হইতে এই উপস্বত্বের কোন পার্থক্য থাকিলে, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাহা পৃথক করিয়া দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভূম্যধিকারী স্বয়ং সমস্ত কার্য্যের ভার লইলেও এই উপস্বত্ব তাঁহার অন্যান্য আয় হইতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। ভূম্যধিকারীর বেলায়ও এই কার্য্যে-লিপ্ত অন্যান্য অনুষ্ঠাতাগণ যে বেতন পাইয়া থাকে, সেই বেতনকেই তাহার বেতন বলিয়া কল্পনা করিয়া অন্যান্য খরচা সহ ইহা বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই তাহার বিশেষ আয়। এই আয়ের উপর ভূমির মূল্য ধার্য্য হয়। কাহাকেও ভূমি ক্রয় করিতে হইলে, যে মূলধন স্থায়ীভাবে নিক্ষেপ করিয়া সুদের দ্বারা এই উপস্বত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই ভূমির মূল্য। এদেশে—ভূমির বার্ষিক উপস্বত্বের উপরে বিশগুণ দরে ভূমি খরিদ-বিক্রয়ের প্রথা বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এই হিসাবে টাকার সুদ বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা হয়। ইহাই প্রচলিত বা স্বাভাবিক সুদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে ভূমি ক্রয় করিলে ভূস্বামী স্বরূপে যে একটা সামাজিক পদ-গৌরব ও আভিজাত্য-মর্য্যাদার অভ্যুদয় হয়, অথবা হয় বলিয়া লোকের ধারণা আছে, তদ্বারা মানব-চিত্ত নিয়ত অভিভূত রহিয়াছে। তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তেমনি সময়ে এই ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভিটা আবাদ-যোগ্য অথবা অন্য কোনভাবে ইহার মূল্যের ইতর-বিশেষ হইতে পারে। এই রূপ কোন সম্ভাবনা থাকিলে, তাহারও মূল্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তবে সর্ব্ব অবস্থাতেই ইহা হইতে কতটা উপস্বত্ব লাভ করিতে পারা যাইবে, তাহাকে মূল ভিত্তি ধরিয়া মূল্যের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। সুতরাং তখন ভূমি পত্তন হউক কি না হউক, এই উপস্বত্ব-ধার্য্যের নিয়মের একটা স্পষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক হয়। এই কারণেও খাজানার বিশেষ সার্থকতা আছে।

স্থায়ী জমায় কোন ভূমি পত্তন করা বিক্রয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। পার্থক্য এই যে বিক্রয়ের সময় সম্পূর্ণ উপস্বত্ব ধরিয়া মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, আর স্থায়ী জমায় পত্তন-সময়ে যে জমা রাখা হয়, তাহার পরিমাণ মূল্য বাদ দিয়া নজর-স্বরূপে মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে।

শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত।

সন্ধ্যাকালী

আজ বরষার দিবস-শেষে
তোমার পূজা সন্ধ্যাকালী।
শ্মশান রচে অর্ঘ্য তোমার
উল্কামুখীর দেউটী জ্বালি;
ধূপ জ্বালে আজ আলেয়াতে
নূ-কঙ্কালে মাল্য গাঁথে
চিতায় চিতায় হোম করে সে
মজ্জা-বসার আজ্য ঢালি॥

বিদ্যুতেরি খড়্গ ঘায়ে
পশ্চিমাকাশ ধূপাঙ্গনে,
কালো মেঘের মেষ-মহিষের
রক্ত ছুটে প্রস্রবণে।

দুল্‌ছে তমাল ঝাউয়ের চামর
তুল্‌ছে সমীর তুমুল ডামর
জুবায় কানন, অঙ্গে তড়াগ,—
সাজায় তোমার পূজার ডালি॥

জোনাক করে ভোগ-আরতি
ঢাক বাজে মেঘ-মন্দ্রে আজি,
দাদুরী দেয় হুলুধ্বনি
ঝাঁঝর বাজায় ঝিল্লীরাজি।
বিল্বদলের মাঝে মাঝে
নীপ্‌যূথী নৈবেদ্য রাজে,
অট্টহাসে পট্টবাসে
নদ-নদী দেয় করতালি॥

শ্রীকালিদাস রায়।

সাতের কথা

"তিন" অপেক্ষা "সাতের" আধিপত্য বেশী কিনা এই বিষয় লইয়া অনেক দিন হইতে একটা গোল রহিয়া গিয়াছে। সাতের তরফ লইয়া বোধ হয় কেহ বেশী কিছু লেখেন নাই, কিন্তু সাতের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। হিন্দুশাস্ত্রে, জ্যোতিবিদ্যায়, ভূগোলে, খেলায় ও অন্যান্য ব্যাপারে সাতেরই প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র :—

সপ্তাহ সাত দিনেই হয়, ছয় দিনে নয়, আট দিনেও নয়। আবার সাতটি গ্রহের নামে সাতটি বারের নামকরণ হইয়াছে—হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র-মতে রাহু-কেতুকে বাদ দিয়া রবি, সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিকে প্রধান ধরায় সপ্তাহের বারগুলির নামও তদনুসারে করা হইয়াছে। রাহু-কেতুকে ধরা হয় নাই, কারণ বাস্তবিক রাহু ও কেতু গ্রহ নয়; চন্দ্রের কক্ষ (orbit) পৃথিবীর কক্ষকে যে যে স্থানে কাটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উত্তরবিন্দু ও দক্ষিণ বিন্দু—এই দুইটিই রাহু ও কেতু। আবার ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্র-মতে আমরা আমাদের এই পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই প্রধান গ্রহ সাতটি, যথা,—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস, ও নেপচুন। নক্ষত্র-পুঞ্জের মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডলই প্রধান। তাহারই দুইটী নক্ষত্রের সাহায্যে ধ্রুবতারা বা উত্তরদিক নির্ণীত হইয়া থাকে।

ভূগোল :—

হিন্দু ভূগোল শাস্ত্র বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে সমুদ্র সাতটি, যথা,—লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, নবনী সমুদ্র, দধি সমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, জল সমুদ্র; এবং এই সপ্তসমুদ্রই সাতটি দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে,—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শকু এবং পুষ্কর। পাহাড়ও সাতটি—সুমেরু, হিমাবত, হেম, কেতু, নিষধ, শ্বেত, শৃঙ্গি। আধুনিক ভূগোল শাস্ত্র-মতে পৃথিবীর মধ্যে মহাদেশ সাতটি,—যথা—এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওসেনিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া।

সামাজিক ব্যাপারে দেখা যায়, হিন্দুদের বিবাহের সময় কন্যাকে বরের চারিদিকে সাতটি পাক দিতে হয়, এবং সেই সাতটি পাকের বন্ধন বা জোর এত বেশী যে উল্টা দিকে সাত-সাতে উনপঞ্চাশ পাক দিলেও তাহা খোলে না, তাহার প্রমাণ—হিন্দুদের Divorce আইন নাই। বিবাহের পর কন্যাকেও সাতদিনের পর স্বামী-গৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিতে হয়;—সপ্তশলাকা।

এখন দেখা যাক্ পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করিয়া যে বিজ্ঞানের সৃষ্টি, তাহার সহিত এই সপ্ত-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কতদূর। প্রথমতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কথা আলোচনা করিলে দেখি যে সঙ্গীত-শাস্ত্রে সাতটি সুরই প্রধান,—যথা—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। এই সাতটি সুর ও তাহাদের শ্রুতি-বিভাগের উপরই কি পাশ্চাত্য, কি প্রতীচ্য, সর্ব্বদেশেরই সঙ্গীত-শাস্ত্রের সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই সাতটি সুর বিশেষরূপে আয়ত্ত করার জন্যই মাদাম মেল্‌বার ফী পাঁচ-শ' গিনি,—কারণ তাঁহার "কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখী!"

তারপর দর্শনেন্দ্রিয়ের কথা—ইহারই উপর আলোক-শাস্ত্রের ভিত্তি। আলোকের আকর সূর্য্য। সেই সূর্য্যের আলো বিশ্লেষণ করিলে আমরা সাতটি রং পাই। তাহাদের নাম ও ক্রম—বেগুণী, নীলের (indigo) রং, নীল, সবুজ, হল্‌দে, কমলালেবুর রং ও লাল। আস্বাদ সম্বন্ধে জানা আছে যে মিষ্ট, তিক্ত, কষায়, কটু, ঝাল, লবণ ও টক্—এই সাতটিই প্রধান আস্বাদ।

গন্ধ-শাস্ত্রের যতদূর আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে প্রধান গন্ধ সাতটি, আর সকলই তাহাদের সংমিশ্রণ বা বিভাগ। এ বিষয়ে যিনি বিস্তারিত অবগত হইতে ইচ্ছা

করেন,তিনি গস্‌নেল্ কোম্পানীর pamphlet পাঠ করুন।

সুগন্ধির মধ্যে—চন্দন, ধুনা, গোলাপ, বকুল, মৃগনাভি, ও দুর্গন্ধের মধ্যে পুরীষ ও গলিত দ্রব্য—সর্ব্বশুদ্ধ এই সাতটি।

স্পর্শ-সম্বন্ধে অনেকেই জানেন না বোধ হয়, যে, স্পর্শানুভূতি সাত প্রকার; যথা,—নরম, শক্ত, আঠার মত চট্‌চটে, জলীয়, শীতল, উষ্ণ ও ধারাল। মানুষের গায়ের বর্ণ যাহার উপর জাতি-ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, —তাহাও সাতভাগে বিভক্ত; যথা—শ্বেত, গোলাপী, শ্যাম, হলুদে, গৌর, লাল ও কৃষ্ণবর্ণ।

রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—সকল ইন্দ্রিয় এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র লইয়া দেখা গেল, যে সকলগুলিই,প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত। যদি কেহ তর্ক করিতে আসেন, আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারি যে সাতের অধিক অন্য যাহা-কিছু আছে, তাহা ঐ প্রধান সাতেরই সংমিশ্রণ বা বিভাগ।

হিন্দু আইন-শাস্ত্র-বেত্তারা অবগত আছেন যে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ডের অধিকারী, এবং উপরিতন ও অধস্তন সাত পুরুষকে সপিণ্ড বলে। কোন কিছু পাপ করিলে আমরা বলি, কখনও সাতপুরুষ কখনও বা সাত দুকুনে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়। মৃতাশৌচ চার সপ্তাহ অর্থাৎ ২৮ দিন—কারণ ২৯ দিনে ক্ষৌরকার্য্য করা হইয়া থাকে।

হিন্দুর গর্ভোপনিষদে লিখিত আছে যে রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এবং ওজঃ—এই সাতটি ধাতু লইয়াই মনুষ্য-দেহ গঠিত হয়।

খ্রিয়সফিষ্টদের মতে জীবাত্মার অভিব্যক্তির সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা কোষ নিরীক্ষিত হইয়াছে। যথা—জলময় কোষ, মৃত্তিকাময় কোষ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আকাশময় কোষ।

যুদ্ধ সম্বন্ধে সাতের আধিপত্যের কথা বলিতে হইলে বলিব, এই যে এত-বড় যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে জর্ম্মানির বিরুদ্ধে সাতটি প্রধান শক্তি একত্র হইয়াছিল—ইংরাজ, ফরাসী, ইতালী, জাপান, আমেরিকা, বেলজিয়াম ও রুষ।

মহাভারতের বীর অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য সপ্তরথীকে এক-জোটে মিলিতে হইয়াছিল। আধুনিক যুদ্ধে সাত রকম সৈন্য নিয়োজিত হয়, যথা,—পদাতিক, অশ্বারোহী, কামান-বাহী, বিমানবাহী, গোলন্দাজ বা জল-সৈনিক, ট্যাঙ্ক ও গ্যাসবাহীদল। মানুষ মারিবার জন্য সাত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এই মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে,—গুলি, গোলা, বেয়নেট, বর্ষা, বোমা, গ্যাস, ও টরপেডো।

যুদ্ধের উপরিতন কর্ম্মচারীর গ্রেড্ সাতটি, —লেপ্টেনেণ্ট, কাপ্তেন, মেজর, লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও ফিল্ড মার্সাল।

এদেশের শাসন-বিভাগেও সাতটি ক্রম বা গ্রেড্ দেখা যায়,—বড়লাট, প্রদেশিক লাট, কমিশনার, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট, থানার দারোগা, ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট।

তারপর আপনারা আলিপুরের কাছারিতে যান, দেখিবেন, সাত রকম কাছারিতে সাত রকম মোকদ্দমার বিচার-নিষ্পত্তি হইতেছে,—

(১) আপীল
(২) দাওয়ানী (নিম্ন)
(৩) ফৌজদারী (নিম্ন)
(৪) দায়রা
(৫) রেভিনিউ
(৬) Land Acquisition
(৭) রেজিষ্ট্রেশন।

তাসের খেলায় গ্রাবু খেলিতে হইলে দুকুড়ি সাত ফোঁটা না রাখিতে পারিলে খেলা কিছুতেই হইবে না। অপর পক্ষ বিস্তি হাঁকিলে তোমার তিন কুড়ি সাত দেখানো চাই; আর ইস্তক বিস্তি থাকিলে তোমাকে চার কুড়ি সাত দেখাইতে হইবে। অর্থাৎ কুড়ি বা দশ যতই হউক, তাহার সহিত সাতটি ফোঁটা থাকা চাইই। গল্পে আছে যে কোথাকার এক রাজা তাস খেলিতে ছিলেন; খেলিতে খেলিতে একবার বাজিতে এক ফোঁটা কম হয়। তাহাতে নাকি খুব বেশী বাজি হারিয়া যাইবার কথা। তিনি নিজের আঙুল কামড়াইয়া রক্ত দিয়া গণিয়া দেখিবার সময় এক ফোঁটা বেশী দেখাইয়া দুকুড়ি সাতের খেলা বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ তাসে ফোঁটা বসাইয়া দিলেন, এ-সব জেরা করিলে মুস্কিলে পড়িব কারণ সে রাজার ইতিহাস এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই।

তাসের ব্রিজ খেলাতেও সাতটি পিট না হইলে পিট্‌ই গণ্য হয় না। আর মোটে বারোটি পিট থাকায় এবং ৬ এর উপর যে কয়টি পিট হইতে পারে এই নিয়ম থাকায় কোন পক্ষেরই সাতের অধিক গণনীয় পিট হইতে পারে না।

রূপকথায় সাত সমুদ্রের কথা কে না পড়িয়াছেন? সাত শ' রাক্ষসীর দেশ, সাত সমুদ্রের পার ও সাত ভাই চম্পার কথা যিনি বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তিনি কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ছেলেদের গল্পের বই একখানি কিনিয়া পড়ুন। সাত রাজার ধন এক মাণিকের কথাও সকলে জানেন। সাত গেঁয়ের কাছে মামদোবাজী বচনটির কথা এই সঙ্গে ভাবিয়া দেখা উচিত।

নেশার মধ্যে প্রধান সাতটি, যথা—মদ, আফিম, গাঁজা, গুলি, চরস, কোকেন ও তামাক।

সাহিত্যে—বাল্মীকি যে তাঁহার রামায়ণ সাতকাণ্ডে শেষ করিয়াছেন, তাহা কি সাতেরই সম্মান-রক্ষার জন্য নয়?

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই সাতের মান রাখিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"সপ্ত-কোটি-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ করালে"; এবং চতুর্দ্দশ না লিখিয়া "দ্বি-সপ্ত কোটি-কণ্ঠৈর্ধৃত খরকরবালে" লিখিয়াছেন। আর সরস্বতীর বরপুত্র ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন এমন যে স্যর আশুতোষ তাঁহাকেও সাতটি পরীক্ষা—এন্‌ট্রেন্স, এফ্-এ, বি-এ, এম্-এ, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ, বি-এল, ও ডি-এল পাশ করিতে হইয়াছে। আর তিনিই অনেক ভাবিয়া এই সাতেরই মর্য্যাদা রাখিবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পূর্ণ সংখ্যা ধার্য্য করিয়াছেন, ৭×১০০=৭০০।

-শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

ভোরাই

ভোর হ'ল রে, ফর্সা হ'ল, দুল্‌ল উষার ফুল-দোলা !
আন্‌কো আলোয় যায় ঢাকা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা !
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে, অ-থই নিথর পাথার-জলে—
আল্‌পনা ছায় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন্ ভোলা !

ধানের ক্ষেতের সব্‌জে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে !
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর পানায় টুপিয়েছে।
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে, অপ্‌রাজিতায় রং ধ'রেছে—
নীল-কাজলের কাজল-লতা আস্‌মানে চোখ্ ডুবিয়ে যে।

কল্পনা আজ চল্‌ছে উড়ে হাল্‌কা হাওয়ায় খেল্ খেলে !
পাপ্‌ড়ি-ওজন পান্‌শি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে !
মোতিয়া মেঘের চামর পিঁজে পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে
পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় ঢেলে !

পূব্-গগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !
পশ্চিমে মেঘ মেল্‌ছে জটা—সিংহ কেশর ফুলিয়েছে !
হাঁস চলেছে আকাশ-পথে, হাস্‌ছে কারা পুষ্প-রথে, —
রামধনু-রং আঁচ্‌লা তাদের আলোর পাথার দুলিয়েছে !

শিশির-কণায় মাণিক ঘনায়, দুর্ব্বাদলে দীপ জ্বলে !
শীতল শিথিল শিউলি-বোঁটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে !
আলোর জোয়ার উঠ্‌ছে বেড়ে গন্ধ-ফুলের স্বপন কেড়ে,
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক্ ঝল্‌মলে !

নীলের বিথার নীলার পাথার দরাজ এ যে দিল-খোলা !
আজ কি উচিত ডঙ্কা দিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ঝড় তোলা ?
ফির্‌ছে ফিঙে দুলিয়ে ফিতে, বোল ধ'রেছে বুল্‌বুলিতে !
গুঞ্জনে আর কূজন-গীতে হর্ষে ভুবন হরবোলা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অবতার

৪

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, অক্টেভ লাবিন্‌স্কাকে ভাল বাসে এই কথা লাবিন্‌স্কাকে সে বলিতে উদ্যত হওয়ায় লাবিন্‌স্কা তাহাকে থামাইয়া দেন, সে কথা তার মুখ হইতে বাহির করিতে দেন নাই ; সে কথা তিনি শুনিতে চান নাই। তখন হইতে দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুখ-স্বপ্নের উচ্চ শিখর হইতে এই রূপ দারুণ পতন হওয়ায়, অক্টেভের চিত্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং অক্টেভ, লাবিন্‌স্কাকে কোন সংবাদ না দিয়া দূর দেশে চলিয়া যায়।

যে একটি মাত্র কথা অক্টেভ লাবিসস্কাকে লিখিতে পারিত সেই কথাটিই মুখ দিয়া বাহির করিতে অক্টেভকে নিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই লাবিনস্কা অক্টেভের কোন সংবাদ পান নাই। অক্টেভের এই নিস্তব্ধতাতে ভীত হইয়া, লাবিনস্কা বিষন্ন চিত্তে স্বকীয় ভক্ত উপাসক বেচারী অক্টেভের কথা মধ্যে মধ্যে চিন্তা করেন। :—সে কি আমাকে ভুলিয়া গেছে ?" লাবিন্‌স্কা চাহিতেন যে সে তাহাকে ভুলিয়া যায়—কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতেন না। কেন না, অক্টেভের চোখে তিনি যে প্রেমের আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছেন, তাহা নির্ব্বাণ হইবার নহে ; কৌণ্টেস্ তাহার হৃদয়ের অবস্থা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রেম ও দেবতাদের মধ্যে বেশ একটা চেনা পরিচয় আছে—ইঁহারা পরস্পরকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারেন। তাই এই প্রেমের কথাটা মনে হওয়ায় তাঁহার সুখের স্বচ্ছ আকাশের উপর দিয়া যেন একটি ক্ষুদ্র মেঘ চলিয়া গেল, পৃথিবীর দুঃখকষ্টে স্বর্গের দেবতাদের যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ লঘু ধরণের একটু দুঃখ তাঁর মনকে অধিকার করিল। তাঁহার জন্য কোন হতভাগ্য কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া সেই মমতাময়ী দেবীর অন্তঃকরণ একটু দ্রবীভূত হইল। কিন্তু আকাশের কোন উজ্জ্বল তারকায় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যদি কোন সামান্য মেষপালক উদ্বাহু হইয়া হাত বাড়ায়, তাহা হইলে সেই তারকা তাহার জন্য কি করিতে পারে ?

প্যারিসে আসিয়া, কৌন্‌টেস্ লাবিন্‌স্কা অক্টেভের নামে লৌকিক ধরণের একটা সাদামাটা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পত্রখানিই ডাক্তার বাল-থাজার-শেরবোনো অন্যমনস্কভাবে এফণে আঙ্গুলের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। কৌনটেশের ইচ্ছা সত্ত্বেও যখন কৌণ্টেশ দেখিলেন অক্টেভ আসিল না, তখন তাঁর মনে হইল, সে এখনো তাঁহাকে ভালবাসে, তবে হয়ত কোন বিশেষ কারণে আসিতে পারে নাই। এই মনে করিয়া কৌন্‌টেশের হৃদয় উৎফুল্ল হইল ; তবু তো এই রমণী স্বর্গের দেবতার মতো বিশুদ্ধ-চরিত্র ও হিমালয়ের উচ্চতম শিখরস্থ তুষারের মতো শুভ্র নিষ্কলঙ্ক। ডাক্তার অক্টেভকে বলিলেন :—"তোমার বর্ণিত

সমস্ত কথা আমি বেশ মন দিয়ে শুনেছি, আমার মনে হয়, এখন কোনপ্রকার আশা করা তোমার পক্ষে নিতান্তই পাগলামী। কোণ্টেস্ কখনই তোমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন না।"

—"দেখুন ডাক্তার, এইজন্যই আমার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবার কোন হেতু দেখ্‌তে পাই নে।"

ডাক্তার বলিলেন :—"আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, সচরাচর উপায়ে প্রাণ বাঁচাবার কোন আশা নাই। কিন্তু এমন-সব গুহ্য তত্ত্ব ও নিগূঢ় শক্তি আছে যার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান একেবারে অনভিজ্ঞ। মূর্খ সভ্যতা যে সব দেশকে অসভ্য বলে, সেই সব বিদেশভূমিতেই এই গুহ্য বিদ্যার চর্চ্চা বংশ-পরম্পরায় চলে আস্‌চে। সেই-খানেই জগতের আদিমকালে, মানবজাত প্রাকৃতিক শক্তির সহিত অব্যবহিত সংস্রবে আসায় তার গুহ্য তত্ত্ব জানতে পেরেছিল। লোকের বিশ্বাস—সে-সব তত্ত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সাধারণ লোকে তার কিছুই জানে না। ঐ সব গুহ্য তত্ত্বের জ্ঞান প্রথমে মন্দির দেবালয়ের রহস্যময় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে শিষ্য-পরম্পরায় প্রচারিত হয়; তার পর, ইতর লোকের অবোধ্য পবিত্র ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ হয়, ইলোরার ভূগর্ভস্থ প্রাচীরের গায়ে খোদিত হয়। তুমি এখনও দেখ্‌তে পাবে, যেখান থেকে গঙ্গা নিঃসৃত হচ্চে সেই উচ্চতম মেরু-শিখরে, পুণ্যনগরী বারাণসীর প্রস্তর-সোপানের তলদেশে, সিংহলের ভগ্নদশাগ্রস্ত ডাগোবার গভীরদেশে কতক গুলি শতায়ুষ্ক ব্রাহ্মণ অপরিজ্ঞাত পুঁথির পাঠোদ্ধার করচেন, কতকগুলি যোগী অনির্ব্বচনীয় ওঁ-শব্দের জপে ব্যাপৃত রয়েছেন—ইতিমধ্যে আকাশের পাখী তাঁদের জটার মধ্যে বাসা বাঁধ্‌চে—সেদিকে তাঁদের লক্ষ্যই নাই; কতকগুলি সন্ন্যাসী যাঁদের স্কন্ধদেশ ত্রিশূলবিদ্ধ ক্ষতের চিহ্নে অঙ্কিত—তাঁরা নষ্ট গুহ্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন এবং তা-থেকে আশ্চর্য্য ফল লাভ ক'রে, তা কাজে প্রয়োগ করচেন। আমাদের য়ুরোপ ভৌতিক স্বার্থে নিমগ্ন হয়ে, কল্পনাও করতে পারে না—ভারতের তপস্বীরা আধ্যাত্মিকতার কত উচ্চ ধাপে আরোহণ করেছেন, তাঁদের নিরম্বু উপবাস, তাঁদের ধ্যানধারণার ভীষণ একাগ্রতা, কত কত বৎসর ধরে', দুঃসাধ্য আসন রচনা করে' একভাবে উপবিষ্ট থাকা, প্রখর সূর্য্যের নীচে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে বসে শরীরকে শোষণ করা,—এ-সব য়ুরোপের সাধ্যাতীত। তাঁদের হাতের নখ্ বর্দ্ধিত হয়ে তাঁদের হাতের তেলোতে বিদ্ধ হয়ে আছে—দেখ্‌লে মনে হয় যেন "ইজিপস্যান মমি" তাদের সিন্দুক থেকে সদ্য বের হয়ে এসেছে! তাঁদের দেহের বহিরাবরণটা যেন প্রজাপতির খোলস; প্রজাপতিরূপ অমর আত্মা ঐ খোলস ইচ্ছা-মতো ত্যাগ করতে পারে কিংবা আবার গ্রহণ করতে পারে। যখন উঁহাদের ভাষণ-দর্শন জীর্ণ-শীর্ণ জড়বৎ দেহ-পিণ্ডটা একস্থানে পড়ে থাকে, তখন ওঁদের আত্মা, সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে খেয়ালের ডানায় ভর করে' গণনাতীত উচ্চ প্রদেশে অলৌকিক জগতে উড়ে যায়। তখন তাঁরা অদ্ভুত দৃশ্য অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌তে থাকেন। অনন্তের সাগর-বক্ষে বিলীন যুগযুগান্তের যে

সব তরঙ্গ ওঠে, তাঁরা যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে সেই সব তরঙ্গ অনুসরণ করেন; তাঁরা বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে সাহায্য করেন, দেবতাদের জন্মগ্রহণ ও যোনিভ্রমণে সাহায্য করেন, সর্ব্বতোভাবে অসীমের মধ্যে তাঁরা বিচরণ করেন। প্রলয়কাণ্ডের দরুণ যে-সব বিজ্ঞানবিলুপ্ত হয়েছে সেই সব বিজ্ঞান, এবং আদিম মানব ও পঞ্চভূতের বিবরণ তাঁদের স্মরণে আসে; এই উদ্ভট অবস্থার মধ্যে, তাঁরা এমন-এক ভাষার শব্দ বিড়বিড় ক'রে উচ্চারণ করেন, যে ভাষায় বহুকাল যাবৎ কোন জাতিই আর কথা কয় না। সেই আদিম শব্দ-ব্রহ্মকে তাঁরা আবার পেয়েছেন,—যে-শব্দব্রহ্ম পুরাতন অন্ধকারের মধ্য হতে, আলোকের উৎস ধারা ছুটিয়ে দিয়েছিল। লোকে তাঁদের পাগল মনে করে, আসলে তাঁরা দেবতা।"

এই অদ্ভুত গৌড়চন্দ্রিকায় অক্টেভের উদ্দীপ্ত কৌতূহল শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিল, ডাক্তারের কথার গতি কোন্‌দিকে বুঝিতে না পারিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসার ভাবে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অক্টেভের ভালবাসায় সহিত ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, অক্টেভ তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না।

ডাক্তার অক্টেভের মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, কোন প্রশ্ন করিতে মানা করিবার ভাবে হাতের একটা ইসারা করিয়া বলিলেন :—বাপু, একটু ধৈর্য্য ধর; এখনি তুমি বুঝিতে পারবে—আমি যা বল্লুম, এসব অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক কথা নয়—মূল বিষয়ের সঙ্গে তার বিলক্ষণ যোগ আছে।

পরীক্ষাগারের মার্বেল-মেঝের উপর বসে,' শব-দেহের উপর ছুরি চালিয়ে পরীক্ষা করে' ক'রে ক্লান্ত হয়েছি, তার থেকে কোন সাড়া পাই নি; জীবনকে খুঁজ্‌তে গিয়ে কেবল মৃত্যু-কেই দেখ্‌তে পেয়েছি! তখন একটা মৎলব আমার মনে হল। মৎলবটা খুব দুঃসাহসীর মতো বল্‌তে হবে। এ দুঃসাহস অগ্নিহরণ-উদ্দেশে প্রমেথিউসের স্বর্গ-আক্রমণের মতো দুঃসাহস। মনে করলাম, আমি আত্মাকে হঠাৎ পাক্‌ড়াও করব, তার পর তাকে বিশ্লেষণ করব, শবচ্ছেদের মতো খণ্ড খণ্ড করে দেখ্‌ব। আমি কারণের উদ্দেশে কার্য্যকে ত্যাগ করলাম। জড় বিজ্ঞানের উপর আমার গভীর অবজ্ঞা হল—কেন না, তার থেকে কেবল মৃত্যুরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার মনে হল, কতকগুলো আকারের উপর পরীক্ষা করা, কতকগুলো বিচ্ছিন্ন উৎপন্ন পরমাণু-রাশির উপর পরীক্ষা করা—এ তো স্থূল-প্রত্যক্ষবাদের কাজ। যে সকল বন্ধনে দেহা-বরণটা আত্মার সঙ্গে আবদ্ধ রয়েছে, চুম্বক-শক্তির যোগে সেই সব বন্ধন শিথিল করবার জন্য আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। এই পরীক্ষা-কার্য্যে 'মেস্‌মের' প্রভৃতি মোহিনীশক্তির আবিষ্কারকদেরও ছাড়িয়ে উঠ্‌লাম। খুব আশ্চর্য্য ফল পেলাম। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলাম না। মৃগীরোগ, সশরীরে স্বপ্নভ্রমণ, দূর-দর্শন, "দশা-পাওয়া" অবস্থায় চিত্তের উজ্জ্বলতা,—এই সব ব্যাপার আমি স্বেচ্ছাক্রমে উৎপাদন করতে পারতাম। এই-সব ব্যাপার ইতর লোকের বুদ্ধির অগম্য—কিন্তু আমার কাছে

খুবই সোজা। আমি আরও উচ্চে উঠলাম। য়ুরোপীয় মঠের যে সব মহাপুরুষ ধ্যান-ধারণা সমাধির দ্বারা আশ্চর্য্য বিভূতি অর্জ্জন ক'রে, তার দ্বারা নানাপ্রকার অলৌকিক কাণ্ড করতেন আমি তাও করতে সমর্থ হলাম। কিন্তু তবু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। আত্মাকে আমি কিছুতেই ধর্‌তে পারলাম না। আমি আত্মাকে অনুভব করতে পারতাম, বুঝতে পারতাম, আত্মার উপর কার্য্যফল উৎপাদন করতে পারতাম। আমি আত্মার বৃত্তিগুলিকে জড়ীভূত কিংবা উত্তেজিত করতে পারতাম। কিন্তু আত্মা ও আমার মধ্যে যে মাংসের আবরণ আছে সেটাকে কিছুতেই অপসারিত করতে পারতাম না—পাছে আত্মাটা উড়ে পালায়। ব্যাধ যেমন জালে পাখী ধরে' জালটা তুলতে সাহস করে না—পাছে পাখীটা আকাশে উড়ে যায়—এ সেই রকম।

শেষে আমি ভারতবর্ষে যাত্রা করলাম—এই আশা করে' যে, সেই পুরাতন জ্ঞানের দেশে আমার দুর্জ্ঞেয় সমস্যার মন্ত্রটি আমি পাব। আমি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শিখ্‌লাম। আমি পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা কইতে সমর্থ হলাম; যেখানে থাবা পেতে বসে' বাঘরা গর্জ্জন করে, সেই-সব জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। যে-সব পবিত্র সরোবরে হংসীরের বাস, সেই সব সরোবরের ধার দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। লতাগুল্মে আচ্ছন্ন দুর্লঙ্ঘ্য অরণ্য পার হয়ে গেলাম। আমার পায়ের শব্দে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ে গেল, বানরের পাল পালিয়ে গেল। যে পথে হিংস্রেরা বিচরণ করে, সেই পথের বাঁক নেবার সময় একেবারে হাতীর মুখামুখী এসে পড়লাম। এইরকম ক'রে অবশেষে একজন প্রসিদ্ধ যোগীর কুটীরে এসে পৌছলাম। আমি তাঁর মৃগচর্ম্মের একপাশে বসে', যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে দশা-পাওয়া অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে যে-সব অস্পষ্ট মন্ত্র নিঃসৃত হচ্ছিল তাই খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলাম; এইরকম করে কতদিন কেটে গেল। তার মধ্য থেকে বেছে যে শব্দগুলা খুব শক্তিমান সেই-সব শব্দ, যে মন্ত্রে প্রেতাত্মাদের আবাহন করা যায় সেই-সব মন্ত্র, তারপর শব্দ-ব্রহ্মের মন্ত্র আমি মনে করে রাখ্‌লাম; দেবমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কক্ষে যে-সব খোদাই কাজের বিগ্রহ আছে সেই সব বিগ্রহের তত্ত্বালোচনা করতে লাগলাম। এই-সব গুপ্ত বিগ্রহ অদীক্ষিত লোকের অদর্শনীয়। কিন্তু আমার ব্রাহ্মণের বেশ ছিল বলে' আমি সেই গুপ্ত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম; সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য, লুপ্ত সভ্যতার অনেক কাহিনী আমি পড়তে পারলাম; দেব-দেবীরা তাঁদের বহু হস্তে যে-সব জিনিস ধারণ করেন, তার রূপক-অর্থ আমি আবিষ্কার করলাম।

ব্রহ্মার চক্রের উপর, বিষ্ণুর পদ্মের উপর, নীলকণ্ঠ শিবের সর্পের উপর আমি ধ্যান করতে লাগলাম। গণেশ তাঁর স্থূলচর্ম্ম শুণ্ড নাড়তে নাড়তে দীর্ঘপক্ষ্মবিশিষ্ট ছোট ছোট পিট-পিটে চোখ মেলে, একটু মৃদু হেসে যেন আমার এই সব গবেষণার চেষ্টায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এই-সব বিকট মূর্ত্তি তাদের প্রস্তর-ভাষায় আমাকে যেন বল্‌তে লাগ্‌ল:—আমরা কতকগুলি আকার বই আর কিছুই নয়, আসলে আত্মাই জড়পিণ্ডের পরিচালক।"

"তিরুণামলয়"-মন্দিরের পুরোহিতের কাছে আমার সঙ্কল্পের কথা খুলে বলায়, তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষের ঠিকানা আমাকে বলে দিলেন। সেই সিদ্ধ পুরুষ যোগী এলিফ্যাণ্টার গুহায় বাস করেন। আমি সেখানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম—গুহার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে, বাকল বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে, হাঁটু চিবুকে ঠেকিয়ে, হাতের আঙ্গুলগুলা পায়ের উপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। চোখের তারা ওল্টানো—কেবল চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে—ঠোঁট অনাবৃত দাঁতকে চেপে আছে। গায়ের চামড়ায় কষ ধরেছে;—চর্ম্ম অস্থিলগ্ন। চুল জটা পাকিয়ে পিছনে ঝুলে আছে। তাঁর দাড়ি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে; গৃধ্রের নখের মতো তাঁর নখ বেঁকে ঘুরে গেছে।

ভারতবাসীর মতো তাঁর গায়ের রং স্বভাবত শ্যামবর্ণ, কিন্তু প্রখর সূর্য্যের তাপে কালো পাথরের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম দৃষ্টিতে আমার মনে হ'ল, লোকটা মৃত; বাহু ধরে নাড়া দিতে লাগলাম—গাঁরোগে যে-রকম হয়—বাহুদুটো শক্ত ও কাষ্ঠবৎ হয়ে গেছে। আমাকে যাতে দীক্ষিত বলে জান্‌তে পারেন, তাই আমার দীক্ষা-মন্ত্র তাঁর কানের কাছে উচ্চৈস্বরে বল্‌তে লাগলাম; কিন্তু তবুও নড়ন-চড়ন নেই, চোখের পাতা একেবারে স্থির নিশ্চল। আমি তাঁকে চাগিয়ে তুলতে না পেরে চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা অদ্ভুত ফট্-ফট্ শব্দ শুন্‌তে পেলুম; বিদ্যুৎ-আলোর মত একটা নীলাভ স্ফুলিঙ্গ চকিতের ন্যায় আমার চোখের সাম্‌নে দিয়ে চলে গেল; সেই স্ফুলিঙ্গ যোগীর আধ-খোলা ঠোঁটের উপর মুহূর্ত্তকাল সঞ্চরণ ক'রে একেবারেই অন্তর্হিত হল।

ব্রহ্মলোগম্ (এই তাপসের নাম) মনে হল যেন নিদ্রাবস্থা থেকে জেগে উঠ্‌লেন: তাঁর চোখের তারা আবার যথাস্থানে এল; তিনি সদয়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগ্‌লেন।

"দেখ্, তোর বাসনাপূর্ণ হয়েছে; তুই একটি আত্মাকে দেখ্‌তে পেয়েছিস্। আমার ইচ্ছামত আমার আত্মাকে শরীর থেকে আমি বিযুক্ত করতে পারি। জ্যোতির্ম্ময় ভ্রমরের মত এই আত্মা শরীর থেকে বাহির হয়, আবার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তা কেবল সিদ্ধ পুরুষেরই দৃষ্টিগোচর হয়। আর কেউ দেখ্‌তে পায় না। আমি কত উপবাস করেছি, কত আরাধনা করেছি, কত ধ্যান ধারণা করেছি, কি কঠোর ভাবেই দেহকে শীর্ণ করেছি—তবে আমি আমার আত্মাকে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পেরেছি এবং অবতার-মূর্ত্তি-গ্রহণের সময় যে রহস্যময় মহামন্ত্র বিষ্ণু-অবতারকে পথপ্রদর্শন করেছিল, সেই মহামন্ত্র বিষ্ণুদেব স্বয়ং আমার নিকট প্রকাশ করেছেন। যদি নির্দ্দিষ্ট মুদ্রাভঙ্গী-সহকারে আমি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহা হইলে, পশু কিংবা মানুষ, যার শরীরে তোমার আত্মাকে আমি প্রবেশ করতে বল্‌ব তার শরীরেই তোমার আত্মা প্রবেশ ক'রে তাকে সজীব ক'রে তুলবে। এই

পৃথিবীতে আমি ছাড়া এই মন্ত্র আর কেহই জানে না—এই গুপ্তমন্ত্রটি তোমাকেই দিয়ে যাচ্চি—কারণ, বুদ্‌বুদ যেমন সাগরে মিশিয়ে যায়, আমি সেইরূপ এখন অকৃত অমৃত ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চাই।" তারপর এই যোগী সিদ্ধপুরুষ, মুমূর্ষুর অন্তিম-শ্বাসের ন্যায় অতি ক্ষীণ স্বরে কতক-গুলি শব্দ আবৃত্তি করলেন—সেই শব্দের উচ্চারণে আমার পিঠের উপর দিয়ে যেন একটা মৃদু কম্পনের তরঙ্গ চলে গেল।

অক্টেভ বলিয়া উঠিলেন :—

—এখন আপনি কি বল্‌তে চান ডাক্তার মশায়? আপনার মৎলবটা কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি নে।

ডাক্তার বলথাজার-শেরবোনো শান্তভাবে উত্তর করিলেন :—আমি তোমাকে এই কথা বল্‌তে চাই —

আমার বন্ধু ব্রহ্মলোগমের মায়া-মন্ত্রটি আমি এখনো ভুলি নাই। কৌণ্ট ওলাফ্ লাবিন্‌স্কার শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট অক্টেভের আত্মাকে যদি কৌণ্টেশ লাবিন্‌স্কা চিন্‌তে পারেন তাহলে বুঝব, কৌণ্টেস্ লাবিন্‌স্কার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি এ জগতে আর কেহই নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলার গীতিকবিতা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ

কবিতা কি? এই প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর আছে। সেটি এই যে, কবিতা তাহাই যাহা মানুষের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় একটি আনন্দ-সঙ্গীত বাজাইয়া তোলে, অথবা মানুষের অন্তরে যাবতীয় অনুভূতির সূক্ষ্মরসকে ঠিক সচেতন করিয়া তোলে।

আমাদের দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম সেদিন মাত্র হইয়াছে। এই ছন্দের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ তেমন গভীর নহে। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্য বিশেষ অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন, যে-জাতির সাহিত্য আছে, সে-জাতির সাহিত্যের প্রথম জাগরণ ছন্দের ভিতর হইতে, সঙ্গীতের ভিতর হইতেই হইয়াছে।

সাহিত্যের প্রথম জাগরণের মধ্যে ছ[ন্দ] ছিল। মিত্রাক্ষরের ছন্দের মধ্যে যে সঙ্গী[ত] বাজিয়া ওঠে, সে সঙ্গীত মানব-জীবনে[র] অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবগুলির উপর এমন এক[টি] মধুর বেদনা-ব্যঞ্জক ঘা মারে যাহাতে মা[নুষ] নিজের অন্তরের কতগুলি অনুভূতির [সূক্ষ্ম] চাক্ষুষ উপলব্ধি করিতে পারে। মানু[ষের] প্রকৃতির দুইটি দিক আছে, একটি স্থূ[ল] অপরটি সূক্ষ্ম। বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত দুইটি স্বতন্ত্র দি[কের] পরিচয় নাই—একটি প্রমত্ত অপরটি অপ্রম[ত্ত]। এই দুইটি দিকের সহিত মানব-প্রকৃ[তির] বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই সাহিত্যের মধ্যেও আমরা মা[নুষের] প্রকৃতির দুইটি স্তরের পরিচয় পা[ই]।

সাগরের বাহিরের তরঙ্গ-নৃত্যই তাহার এক মাত্র দিক নহে, তাহার অন্তরে যে একটি প্রগাঢ় স্তব্ধতা আছে—সেটিও সাগরের একটি দিক। এই দুই দিক লইয়াই সে সম্পূর্ণ। ঠিক তেমনি মানব-প্রকৃতি তাহার দুইটি দিক লইয়াই সার্থক।

কবিতার মধ্যে যে দুইটি ছন্দের সহিত আমরা পরিচিত অর্থাৎ মিত্রাক্ষর আর অমিত্রাক্ষর, সে দুটি ছন্দ মানব-প্রকৃতির ঐ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য। কাব্যের মধ্যে মানব-জীবনের বিচিত্র অনুভূতি এবং ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত বিচিত্র ভঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠে, এইজন্য কাব্যের মধ্যে মিত্রাক্ষর আর অমিত্রাক্ষর পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর মত তাল মিলাইয়া চলিতে পারে। মারামারি কাটাকাটি হানাহানির মধ্যে যে ভৈরব সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে, সে সঙ্গীতের যোগ্য ছন্দ অমিত্রাক্ষর। জীবনের বিচিত্র লীলাকে বৃহৎ ভাবে, ভাব-ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিবার পক্ষে অমিত্রাক্ষর ছন্দই যোগ্য ছন্দ; কেন না সেখানে বক্তব্যের গতি অবাধ রাখা প্রয়োজন। প্রাণবান বেগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত চালানোর প্রয়োজন হইলে সেখানে মিত্রাক্ষর ছন্দ বেখাপ হইয়া পড়ে, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেখানে মিলের নূপুর বাজাইতে গেলে বীর সহস্রবার চেষ্টা করিলেও খাপ হইতে তরবারি বাহির করিতে পারিবে না। মাইকেল যে সুরে তাঁহার কাব্যযন্ত্রটিকে ঠিক করিয়াছিলেন সে সুর প্রমত্ত। মারামারি কাটাকাটির মধ্যেই যে প্রমত্ততা আছে তাহা নহে; পরন্তু, আনন্দ-আবেগেরও একটা দিক বেজায় প্রমত্ত। হো হা করিয়া বিষম হট্টগোলের মধ্যে দেহ-মনকে শ্রান্ত করিয়া ফেলে এমন আনন্দের পরিচয়ও আমরা যে পাইনা তাহা নয়। এই শ্রেণীর আনন্দ-তাণ্ডবের ধ্রুপদে ছন্দের মিত্রাক্ষরের প্রভুত্ব বোধ হয় খুব বেশী চলে।

মিত্রাক্ষরের ছন্দের মধ্যে যে রস উদ্বেলিত হইয়া উঠে—সে রসের ধারা শ্রাবণ-বর্ষার মত অফুরন্ত ভাবে কথার পর কথার কস্‌রৎ করিয়া চলে না—সে রস মানুষের মনে অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াই শান্ত। অর্থাৎ লিরিকের কিম্বা গীতি-কবিতার উদ্দেশ্য, ভাষা ও ছন্দের কস্‌রৎ দেখাইয়া লম্বা পাড়ি মারা নহে। অল্পের মধ্যে দু-একটি কথায় ছন্দের দুইচারিটি ঝঙ্কারে মনের মধ্যে দুএকটি অনির্ব্বচনীয় রসাবেগ সৃষ্টি করাই লিরিকের ধর্ম্ম। গীতি-কবিতার বিশেষত্ব এই যে, তার ছন্দে যে একটি সঙ্গীত আছে তাহা রসে রসে বক্তব্য বিষয়কে অপরিসীম করিয়া তোলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঝঙ্কার মৃতকে হয়ত বা মত্ততায় জাগাইয়া দিতে পারে, কিন্তু সে ঝঙ্কারে শরৎকালের অন্তর-প্রকৃতির করুণ ব্যথাকে মনের মধ্যে সচেতন করিতে পারে না।

"নীল আকাশের নীরব কথা
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা"র

যে রস, সে রস অমিত্রাক্ষর ছন্দে সৃজন করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন। গীতি-কবিতার ভাবই তার ছন্দকে চালায়, ছন্দ ভাবকে চালায় না। সত্যকার কবি ব্যতীত ঠিক গীতি-কবিতার সুর সৃজন আর কাহারো দ্বারা সম্ভব নয়। মিলের ঝুম্‌ঝুমি বাজাইলেই "লিরিক" হয় না। যে গীতি-কবিতার মধ্যে গীতি-প্রাণ নাই, সে গীতি-কবিতা কানের উপর

দিয়া শব্দ-ঝঙ্কারের একটা বন্যা বহাইয়া দিলেও সে ঝঙ্কার নিষ্ফল, কেননা তা কান পর্য্যন্তই থাকে, প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

২

গীতি-কবিতার স্বভাব এই যে তাহা ইঙ্গিতেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার তোলে এবং ইসারা করিয়াই মানব-চিত্তকে সৌন্দর্য্য-রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। তাছাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্পর্শী আনন্দ-টুকুকে, যেন ভাব ও ভাষার তুলিকায় চোখের সামনে একেবারে ছবির মত ফুটাইয়া দেয়। সে ছবিতে নানারঙের ছোপ্ থাকে না—থাকে কয়েকটি রেখার, মাত্র কয়েকটি রঙের আল্‌গোছ স্পর্শ। তাই সে বর্ণ, সে রেখা ভোরের শিশিরে-ভেজা জুঁইফুলের মত স্নিগ্ধ এবং কমনীয়। যুক্তি-তর্কের বাঁধন দিয়া বক্তব্য বিষয় কচ্‌লাইয়া ব্যক্ত করা গীতি-কবিতার স্বভাব নহে। সে স্বভাব গদ্যের, তারপরেই মিত্রাক্ষরের। গীতি-কবিতা কতকটা শ্যামের বাঁশির মত। সে তার সঙ্গীতে চিত্তকে একটা ব্যাকুল বেদনায় ঘর-ছাড়া করিয়া জীবনকে আনন্দ-নদীর কিনারে আনিয়া হাজির করে কিন্তু ঠিক জায়গায় পৌঁছায় না। চিত্ত সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগৎকে রাধিকার মত বিরহ-বেদনায় ভরাইয়া তোলে।

"আমি জানতেম না যে বাঁশি আমার
বাজবে এমন সুরে,
এমন গানের শিখা উঠবে কেঁপে
প্রাণের গোপন পুরে।"
(একতারা)

প্রাণের ভিতরে সূক্ষ্মভাবে ঘা দিতে মিত্রাক্ষর বিশেষ মজবুত। মানুষের হাসি-কান্নার একটা অনুভূতি অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকে—যে অন্তঃপুরে গীতি-কবিতার সুর-নারী ছাড়া অন্যের প্রবেশ নিষেধ। গীতি-কবিতা যে অবগুণ্ঠিতা যুবতী বধূ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবটা তো নজরে পড়ে না, অল্প যেটুকু পড়ে, সেইটুকুই প্রাণের মধ্যে রসাবেগ সৃজন করে। ঘোমটার ফাঁকে ঐ যে একটু নিমেষের সলজ্জ চাহনি সেই চাহনিই যথেষ্ট। ঐ সামান্য চাওয়ার মধ্যেই যে প্রেমিকের অন্তরে পাওয়ার অসীম আনন্দ আন্দোলিত হইয়া ওঠে! মানুষের সঙ্গে গীতি-কবিতার সম্বন্ধ এই রকমের। মনের কথা বিবৃত করিয়া বলিবার পক্ষে হয়ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রশস্ত, কিন্তু গীতি-কবিতা মনের কথা বলে না—মনের ভাবকে ছন্দে বাজায়। এসরাজের তারের ঐ যে সুর, সে ত আর কথা বলে না—জাগায় ভাব। গীতি-কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য ভাব ফুটানো, অর্থ ফুটানো নহে। এইজন্যই প্রেমিকের দরবারে গীতি কবিতার সমাদর এত বেশী। গীতি কবিতার পরতে পরতে ইঙ্গিত, ইসারা, তাই তাহা এত মধুর, এমন মনোরম। বলিয়াছি, গীতি কবিতা অবগুণ্ঠিতা যুবতী। তার অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে আমরা সৌন্দর্য্যের যে কণামাত্র পরিচয় পাই, সেই কণামাত্র পরিচয়েই সে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-রসের ক্ষুধাকে মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয়।

"তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
হৃদয় আমার পাগল হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায়
যাহার কূল সে নাহি জানে।"

এই যে অকূলের দিকে ইসারা,—এই ইসারাই গীতি কবিতার ধর্ম্ম; সামান্য কয়েকটি কথায় অসামান্য ভাব-রস অন্তরে সৃজন করে। এই ইঙ্গিতেই মানুষ পাগল, তাই যুবতীর অবগুণ্ঠন আমাদের কাছে এত মধুর, এত সরস। হাজারো কবিতা ঘোমটার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল তবু ঘোমটার পসার কমিল না, তার মোহ গেল না। খোলাখুলি কথার মধ্যে বোঝাবুঝির সমস্যার সমাধান হয় সত্য, সে ধর্ম্ম গদ্যের। গীতি কবিতায়—বোঝার চেয়ে কাঁদায় বেশী, মাতায় বেশী, রস অনুভূতির মধ্যে ডুবায় বেশী। বিদ্যাপতির—

"এ-ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—"

গানে বর্ণনার ঘটা নাই। কয়েকটি মাত্র শব্দ-যোজনা। কয়েকটি শব্দে মানব অন্তরের চিরকালের বিরহকে যেন নব বেদনায় উদ্বেলিত করিয়া দেয়।

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া"

এক-একটি পদে, অন্তরের শেষ বেদনাটুকু যেন একেবারে অশ্রুজলে ব্যক্ত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে, রসানুভূতির সার্থকতা এই-জন্যই, এবং এইজন্যই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে রসের ঢেউ এত প্রচুর।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

বারোয়ারি উপন্যাস

১৪

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আপিস থেকে বেরিয়ে বরাবর ধর্ম্মতলার পথ ধোরে হরেন ক্ষিতীশের বাসার দিকে চলেছে, হঠাৎ মনে হলো চাকরির জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছে। একবার সে ফিরে দাঁড়ালো, ভাবলে, যাই ওটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। আবার ভাবলে, দূর হোক্-গে ছাই, বিজ্ঞাপনটা না হয় বেরিয়েই গেল, চাকরি নেওয়া না-নেওয়া তো তারই হাতে।

হরেনদের কলেজে একটি সমিতি ছিল; তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ থেকে চাকরি-গ্রহণের প্রবৃত্তি সমূলে নির্ম্মূল করা; হরেন এই সমিতির একজন প্রধান পাণ্ডা। চাকরিতেই যে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করলে, এই মর্ম্মে সে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায়ই বক্তৃতা করত এবং প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করেছিল যে প্রাণ গেলেও সে কখনো চাকরি গ্রহণ করবে না। শুধু নিজে স্বাক্ষর নয়, পথে-ঘাটে যেখানে যাকে পেত, তর্ক কোরে বুঝিয়ে, খোসামোদ কোরে ধোরে, তাতেও না হলে ধমক-ধামকে, শেষে ঘুসি-বাগিয়ে এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিত। এমনি কোরে প্রায় হাজারটা স্বাক্ষর সে সংগ্রহ করেছিল। অল্পদিনেই এতখানি কাজ সমিতির কোনো মেম্বর করতে পারেনি—সেই জন্য সমিতির সবাই তাকে বাহবা দিত। এবং হরেনের নিজের মনেও এই নিয়ে খুব-একটা গর্ব্ব ছিল যে তার দ্বারাই সমিতির এবং দেশের অনেক-খানি কাজ অগ্রসর হয়েছে। মনের উদ্বেগে বাবার উপর অভিমান কোরে, সাত-তাড়াতাড়ি

চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে আসাতে হরেনের বুকের ভিতরে একটা দারুণ অনুশোচনার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে, চাঁদনির সামনে ফুটপাথে কেবলই এদিক-ওদিক কোরে পায়চারি করতে লাগল। প্রতিজ্ঞাপত্রের দু-একখানা কাগজ তখনো তার বুক-পকেটে ছিল; হরেনের মনে হতে লাগল, সেগুলো যেন তাকে ভ্রূকুটি করছে! সে রেগে পকেট থেকে সেগুলো বার কোরে কুচিকুচি কোরে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে। তখন তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল সেই সব লোকের মুখ-ভঙ্গী, যারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র নিয়ে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা বলত, স্বাক্ষর করা সহজ; কিন্তু কার্য্যকালে—। হরেন বাকি কথাটা আর মনে আনবার ধৈর্য্য রাখতে পারলে না। তার মনে হতে লাগল, ঐ কার্য্যকালটাই তার সমস্ত আত্ম-অভিমানকে অপমানে কালো কোরে তুলেছে। প্রথম-প্রয়োজনের কাছেই ত সে হার মেনে গেল! বুদ্ধি, বিচার দিয়ে এখন না-হয় ত্রুটি সংশোধন করা চলে; কিন্তু প্রথম-অভাবেই ভিতরকার প্রেরণা ত তাকে দাস্যবৃত্তির পথেই ঠেলে নিয়ে ফেল্লে! ধিক্ তাকে!

হাজার বিজ্ঞাপন দিক্, চাকরি সে কিছুতেই করবে না, এ যদিও স্থির, তবু যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনের পাপের মতো চাকরির ইচ্ছার পঙ্কটা তো তাকে গায় মাখতে হল! এতে নিজের উপরে তার ভয়ানক রাগ হতে লাগল;—কেন ঐ প্রতিজ্ঞা-পত্রের কথাটা তার যথাসময়ে মনে হল না? কিন্তু মনে হবে কি কোরে? হরেনের মনটি এম্‌নিভাবে গড়া যে যখন যেটা তার মনের ভিতর ঢুকে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, সেইটি ছাড়া আর-কোনো দিকে তার খেয়াল থাকেনা—খেয়াল সে রাখ্‌তেই পারে না—মন এম্‌নি একবগ্‌গা হয়ে ছোটে। হরেন মনে-মনে খুব জোরের সঙ্গে বল্লে, বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বেশ করেছে, লক্ষ টাকা মাইনের চাকরি এলেও সে তা গ্রহণ করবে না! কিন্তু করবে কি? একার টাকা সাড়ে-তেরো-আনা সঙ্গতি নিয়ে ত চিরজীবন চলে না? তা চলে কি, না চলে, কে জানে? হরেনের সেজন্য কোনো দুর্ভাবনা দেখা গেল না। এবং দুর্ভাবনা যে আগেও হয়েছিল, তা ঠিক নয়। বাপকে এবং বাপের টাকাকে অগ্রাহ্য কোরে সে নিজে কি করতে পারে, এরই উত্তেজনায় চাকরি করতে গিয়েছিল। যাক্, চুলোয় যাক্ চাকরি! সে নিজের আত্মমর্য্যাদা সবল কোরে নিয়ে জোরে-জোরে পা ফেলে আবার চল্‌তে লাগল।

১৫

সাম্‌নে শ্যামবাজারের একখানা ট্রাম এসে থামল। হরেনের পা তার অজ্ঞাতে তাকে সেই ট্রামের কাছে ঠেলে নিয়ে গেল। গাড়ির ঠাণ্ডা হাতলটায় আপনা-হতে হাত পড়তেই তার চমক ভাঙলো। ট্রাম লোকে লোকারণ্য। হরেনের মন তখন নির্জ্জনতা খুঁজছিল। সে ট্রাম ছেড়ে আবার ফুটপাথে উঠল। একবার মনে হল, অনেকটা দূর, ট্রামেই যাই। আবার ভাবলে, নাঃ, হেঁটেই চলি। অন্যমনস্কে পা-দুয়েক গেছে, এমন সময় তড়াক্-কোরে ট্রাম থেকে লাফিয়ে কে-একজন একেবারে হরেনের পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—পিছন থেকে

তার জামার ঘাড়টা টেনে চীৎকার কোরে বল্লে—"পালাও কোথায়?"

হঠাৎ বাধা পড়াতে হরেন থম্‌কে গেল। পিছন থেকে জামার ঘাড়ের কাছটা এমন কড়াড়ে কোরে ধরা যে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতেই পেলে না, কে তাকে ধরেছে। তার মনে হল, নিশ্চয় কোনো গুণ্ডা। তখন দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাজপথে দু-একটা রাহাজানির কথা খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে বার হচ্ছে এবং তাই নিয়ে চারিদিকে আন্দোলন চলেছে। হরেনের মনে হল, এ তারই একটা পুনরাবৃত্তি। গুণ্ডার সঙ্গে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি তখন তার ছিল না; পুরুষমানুষ হয়ে সাহায্যের জন্যে চীৎকার কোরে পাড়া মাথায় করাটাও তার লজ্জাজনক মনে হতে লাগল। সে পকেট থেকে একান্ন টাকা সাড়ে-তেরো-আনার ব্যাগটা বার কোরে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—"এই নে! যা!" হরেনের গলার কাপড় যে ব্যক্তি ধরেছিল, সে কাঁপতে-কাঁপতে ব্যাগটা তুলে নিয়ে, সজোরে সেটা ছুঁড়ে হরেনের মুখের উপর মারলে।

আঘাতের ধাঁধাটা চোখ থেকে কেটে গেলে হরেন দেখলে, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অরুণ—রাগে ফুলছে! অরুণকে দেখেই সে আনন্দে এতটা অভিভূত হয়ে পড়ল যে অরুণের সেই ক্রুদ্ধমূর্ত্তির জন্যে কোনো বিস্ময় তার মনে আমোলই পেলে না; ব্যাগটা যে অরুণই ছুঁড়ে মেরেছে, এমন কোনো সংশয়ও তার মনে এল না। সে সাদরে অরুণের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্লে—"আরে অরুণ! তুই কখন্ কলকাতায় এলি? কার সঙ্গে এলি? আমায় খবর দিস্ নি কেন? চল্, চল্।"—এই বোলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্ল। মানিব্যাগটা পথেই পড়ে রইল।

অরুণ যতটা রাগ নিয়ে হরেনকে আক্রমণ করেছিল, হরেনের এই স্নেহের ব্যবহারে তার সবটাই যেন কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে যতগুলো কড়া-কথা শোনাবে বোলে এতদিন ধোরে ঠিক কোরে রেখেছিল, তার একটাও বল্‌তে পারলে না। চিরকালই অরুণ হরেনকে দাদার মতন দেখে এসেছে, ছেলে-বেলা থেকে তার কাছে কত আদর-আব্দার করেছে, তার কাছ থেকে কত স্নেহ, ভালোবাসা পেয়েছে;—এই সমস্ত এতকালের সঞ্চিত স্নেহপ্রীতির আবেগ তার সেই ক্ষণিক উত্তেজনার মূলে প্রবল নাড়া দিতে লাগল। প্রথম যখন ট্রাম থেকে সে দেখে, হরেন গাড়িতে উঠতে-উঠতে-উঠল না, তখন তার মনে সন্দেহ হয়েছিল যে হরেন তাকে দেখেই পালাচ্চে, তাই সে বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে তার গলা ধরেছিল; তার পর যখন হরেন তার দিকে ব্যাগটা ফেলে দিলে, তখন তার মনে হল, হরেন তাদের যা ক্ষতি করেছে, তারই মূল্যস্বরূপ যেন এই টাকা ধোরে দিচ্ছে; তাই অপমানে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই টাকার ব্যাগ সে হরেনের মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল। কিন্তু এখন তার মুখের দিকে চেয়ে অরুণের মনে হতে লাগল, এ সেই হরেন-দাদা,—সেই চিরদিনের হরেন-দা! হরেনের বাহুস্পর্শে সমস্ত উত্তাপের জ্বালা যেন তার জুড়িয়ে গেল! মনে হল, গ্রামের সেই কুৎসা-গ্লানি স্কুলের সম-পাঠীর বিদ্রূপ, মা-বাপের মর্ম্মান্তিক শোক—সে সমস্তই

মিথ্যা, মায়া! হরেনদাদা তাদের চিরদিনের মিত্র;—শত্রু নয়।

অরুণ খুব সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করলে—"দিদি কোথায়, জানো হরেন দাদা?"

হরেন সোৎসাহে বল্লে—"আরে, সেইখানেই ত তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

অরুণের মনটা আবার খট্-কোরে বেঁকে দাঁড়ালো। তবে তো মিথ্যা নয়—গ্রামের সমস্ত কুৎসা তবে ত সত্যি! সে চল্‌তে-চল্‌তে থেমে পড়ল। হরেন বল্লে—"থাম্‌লি কেনরে?"

অরুণ উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ গলার মধ্যে চেপে ঘাড়-বাঁকিয়ে বল্লে—"তা হলে সত্যিই তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ!"

হরেন বিস্মিত হয়ে বল্লে—"সর্ব্বনাশ?"

অরুণের মনে হল, যেন হরেন বল্‌তে চায়—এ আর সর্ব্বনাশ কি! এতবড় গুরুতর ব্যাপারকে হরেন এমন তাচ্ছিল্য করছে ভেবে অরুণের বিষম রাগ হতে লাগল। সে সজোরে হরেনের হাত ছাড়িয়ে বল্লে—"সর্ব্বনাশ নয়ত কি? পরের বিবাহিত মেয়েকে—" অরুণ কথাটা শেষ করতে পারলে না।

হরেন আরো বিস্মিত হয়ে বল্লে—"পরের বিবাহিত মেয়েকে কি করেছি?"

"কি করেছ আবার জিগ্‌গেস্ করছ?"

অরুণের ঐ কথার সুরে কেমন-একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক যেন হরেনের বুকের মধ্যে ধীরে-ধীরে জমা হতে লাগল। সে বল্লে—"অরুণ, তোমার কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি না।"

অরুণ হরেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সে মুখ সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক; তার মধ্যে প্রতারণা, অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র নেই। সেই মুখের পানে চেয়ে অরুণের কেমন ধাঁধা লাগতে লাগল।

হরেন অধীর হয়ে বল্লে—"চুপ কোরে রৈলি কেন? বল্, কি বল্‌ছিলি!"

অরুণ কি-কোরে কথাটা বলবে ঠিক করতে না পেরে খানিকটা আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগল। শেষে একনিশ্বাসে বোলে ফেল্লে—"তুমি আমার দিদিকে লুকিয়ে রেখেছ?"

হরেন খুব-একটা বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লে—"তোমার দিদিকে আমি লুকিয়ে রেখেছি? লুকিয়ে রাখতে যাব কেন?"

অরুণের মনে হল যেন হরেন কথার প্যাঁচ দিয়ে ব্যাপারটা চাপা দিচ্চে। সে বলছে, লুকিয়ে রাখবো কেন? অর্থাৎ···কি বোলে জিজ্ঞাসা করলে হরেন আর ফাঁকির পথ পাবে না, অরুণ অনেকক্ষণ ভেবেও তা ঠিক করতে পারলে না। সে খানিকটা থেমে বল্লে—"তবে দিদি কোথায়?"

হরেন বল্লে—"তোমার দিদি আছেন ক্ষিতীশবাবুর বাসায়।"

অরুণ অবাক হয়ে বল্লে—"ক্ষিতীশবাবু! সে কে?"

"যিনি তোমার দিদির প্রাণ রক্ষা করেছেন।"

"প্রাণ রক্ষা?"

"হ্যাঁ, তোমার দিদি ভিড়ের চাপে ভির্মি গিয়ে রাস্তায় পড়েছিলেন, ক্ষিতীশবাবু তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচান্।"

অরুণ আশঙ্কা-রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লে—"দিদি ভালো আছে ত?"

"হ্যাঁ।"

অরুণের চোখের সাম্‌নে থেকে যেন একটা প্রকাণ্ড কুয়াশা কেটে গেল। তার সেই বালক-হৃদয়ের মধ্যে তখন কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কোনো প্রশ্ন আর রইল না। সে দিদিকে দেখবার জন্যে অধীর হয়ে হরেনের হাত টানতে-টানতে বোলে উঠল—"চল, শীগ্‌গির কোরে চল—দিদিকে দেখব!"

হরেন অন্যমনস্কে বল্লে—"চল।" তার মনের মধ্যে সেই অজ্ঞাত আতঙ্কটা যেন ক্রমেই আরো জমাট বাঁধছিল। সে তারই দিকে চেয়ে-চেয়ে ভিতরে-ভিতরে কেমন অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল।

অরুণ যেতে-যেতে বল্লে—"হরেন-দাদা, তোমাদের ঐ শশী মুখুজ্জেটা কি পাজি!"

হরেন কথাটার উপর কোনো মনোযোগ না দিয়েই বল্লে—"কেন, সে আবার কি করলে?"

"সেই তো তোমার নামে আর দিদির নামে যত কুৎসা রটিয়েছে।"

হঠাৎ কেমনতর-একটা ধাক্কা হরেনের বুকে এসে লাগল। সে কিছুই বুঝতে না পেরে বল্লে—"কি কুৎসা?"

"সেই তো রটিয়েছে যে তুমিই দিদিকে সরিয়ে রেখেছ। আগে থাকতে তোমাদের সব ঠিক্‌ঠাক্ ছিল।"

হরেনের সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে উঠল। সে বলে উঠল—"পাজি নচ্ছার! তাকে আমি দেখে নেব!"

হরেন খুবই রেগে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেই রাগের ঝাঁজ বেশীক্ষণ রইল না। তার সেই ভিতরকার অজ্ঞাত-আতঙ্কের অন্ধকারে সেটা যেন কেমন তলিয়ে যেতে লাগল।

কমলা এতদিন বাড়ী-ছাড়া—নিরুদ্দেশ; এ নিয়ে একটা বিষম গোল হবে, এ দুর্ভাবনা তার ছিল; আবার সময়-সময় আশা হতো হয়ত কোনো গোল নাও হতে পারে; কিন্তু সে যে ষড়্-কোরে কমলাকে কুলের বার করেছে, এত বড় অপবাদ রাষ্ট্র হবে—এ কথা সে ভাবতেও পারে নি। কোথায় ছিল কমলা, আর কোথায় ছিল সে—কতদিন তাদের ছাড়াছাড়ি! এর মধ্যে পরামর্শ হলই বা কখন্ এবং কেমন কোরেই বা হল? এর কোনো সাক্ষীসাবুদ না পেয়েই লোকে যে কেমন-কোরে এই কুৎসা রটালে সে তা বুঝতে পারছিল না। সে ভাবছিল, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে? সে জিজ্ঞাসা করলে—

"অরুণ, এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করেছে?"

"করেছে বৈ কি!"

"কে করেছে?"

"সকলেই!"

"বাবা করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"মা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবা-মা?"

"তাঁরাও।"

"তুমি?"

"করেছিলুম বৈ কি। না, না, প্রথমটা করিনি! সবাই যখন বলতে লাগল, ঠাট্টা করতে লাগল, তখন বিশ্বাস না কোরে করি কি হরেন-দা?"

হরেন আর কিছু বল্লে না, কেবল তার

বুকের গভীরতা থেকে একটা দীর্ঘ হুঁ-শব্দ বার হল মাত্র। তার সমস্ত মন একটা প্রকাণ্ড অভিমানে ভরে উঠল। বাপ-মা থেকে আরম্ভ কোরে পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই তাকে এমন হীন ভাবতে পারলে মনে কোরে সমস্ত পৃথিবীর উপর যেন একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। সে কী করেছে—তার চরিত্রে, ব্যবহারে লোকে এমন কী পেয়েছে, যাতে এতবড়-একটা কলঙ্ক তার বুকের উপর দাগ্‌তে কেউ একটু ইতস্তত করলে না? তাকে একবার কেউ জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলে না! একটা পরীক্ষা করলে না যে এ সত্য, কি মিথ্যা! একেবারে বিচারের রায় বেরিয়ে গেল!—তার মনে হল, জগতে কেউ তার মরমী বন্ধু, মুখ-চাইবার আপনার জন নেই। বাপ-মা পর্য্যন্ত না। এই জন্যই সে মায়ের কাছ থেকে এতদিন ধোরে কোনো চিঠি পাচ্ছে না, এই জন্যেই, বাবা এসে রেগে বাসা উঠিয়ে তাকে তাচ্ছিল্য কোরে চলে গেছেন!

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা কি বলছেন?"

অরুণ বল্লে—"শুনচি তিনি আপনাকে ত্যজ্যপুত্র করেছেন।"

হরেন আপনার মনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"বেশ! বেশ!"

অরুণ পথে যেতে-যেতে বক্‌র্-বক্‌র্ কোরে কত কথাই বলছিল, তার কোনোটাই হরেনের কানে যাচ্ছিল না, কোনো কিছুই তার মনকে আকর্ষণ করছিল না—সে যেন পৃথিবীর মাটিতে পা না দিয়েই চলে যাচ্ছিল।

নিজের কথা ভাবতে-ভাবতে হরেনের মনে এল কমলার কথা। হরেন বল্লে—"অরুণ, কমলাকে সবাই কি বলছে?"

অরুণ বল্লে—"দিদির নিন্দেয় তো দেশে কান পাতবার যো নেই—তাই তো আমি গ্রাম ছেড়ে, বাবা-মাকে না বোলে পালিয়ে এসেছি—তোমাকে ধরবার জন্যে।"

"তোমার বাবা-মা কি বলছেন?"

"তাঁরা বল্‌ছেন—"কম্‌লিটা যদি মর্‌ত, তাহলে আমাদের এত দুঃখু হত না!"

এই বাপ-মা! কমলা এমন কি করেছে যে তার বাপ-মাও মেয়ের মৃত্যুকে বরণীয় মনে করলে? কমলারও তবে ইহ-সংসারে কেউ নেই! তারও অবস্থা, তার নিজেরই মতন। হরেনের মনে হচ্ছিল, এক রশিতে দুজনকে বেঁধে পৃথিবীর লোক যেন অগাধ সমুদ্রে তাদের ফেলে দিয়েছে! আহা, বেচারা কমলা! কমলার কথা ভাবতে ভাবতে হরেনের হৃদয় আকুল হয়ে উঠতে লাগল। সে ব্যস্ত হয়ে বোলে উঠল—"তবে কমলার কি হবে ভাই অরুণ?"

অরুণ নিজের মনের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়ে ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। সে বল্লে—"হবে আবার কি! যখন কাদে ধোরে প্রমাণ কোরে দেব যে সমস্ত কুৎসা মিথ্যা, তখন লোকের মুখে জুতো পড়বে না!"

হরেনের মনে হল, এ কথা এই বালক হৃদয়ের উৎসাহ নিয়ে সেও যদি বলতে পারত, তাহলে বেঁচে যেত! হায় প্রমাণ! এ সংসারে প্রমাণের অপেক্ষা কে রাখে! এত বড় কলঙ্ক যারা তাদের কপালে এঁকে দিতে পেরেছে, তারা সেই কলঙ্ক দেবা

সময় কি প্রমাণের অপেক্ষা করেছিল? কি প্রমাণ? কোথায় প্রমাণ? প্রমাণ যদি বলবান, তবে এতখানি অবিচার তাদের উপর হলো কেমন কোরে? যে-প্রমাণ মানুষের এতদূর অবজ্ঞেয়, সেই প্রমাণের ভরসায় তারা মুক্ত হবে? বাতুলতা! কমলা সহরের রাস্তায় ভির্মি গিয়েছিল, এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তার প্রাণ রক্ষা কোরে, নিজের বাড়িতে রেখেছে, এ কথা কি এখন তারা মানতে চাইবে—মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আনন্দ করা যাদের ব্যবসা?

তবে কমলার কি হবে? হরেনের মনের ভিতর এই কথাটা একটা করুণ আর্ত্তনাদ কোরে ফিরতে লাগল। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে কমলা বিনা-দোষে বাপ-মায়ের কাছ থেকে পরিত্যক্ত হবে। সে অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"অরুণ, তোমার বাবা-মা কি কমলাকে এখন বাড়িতে ফিরিয়ে নেবেন?"

অরুণ চোখ-মুখ পাকিয়ে বল্লে—"কেন নেবেন না?"

কেন নেবেন না?—এ কথার জবাব যে কতখানি জটিল, হরেন তা কেমন-কোরে এই ছেলেমানুষকে বোঝাবে? বাপ-মায়ের হৃদয়ের উষ্ণ রক্তও যে পাষাণের মতো কঠিন শীতল হয়ে আসতে পারে, এ কথা হরেন মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করলেও, অরুণকে তা বোঝাবার চেষ্টা করলে না। সে নিজের মনের কাৎরানি শুনতে-শুনতে পথ চলতে লাগল।

যখন প্রায় ক্ষিতীশের দরজার গোড়ায় এসেছে, তখন যেন হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে উঠে হরেন জিজ্ঞাসা কল্লে—"অরুণ, সতীশবাবুর খবর কিছু জানো?"

সতীশবাবুর কথা উঠতেই অরুণের অতখানি উৎসাহ কেমন যেন দমে গেল; তার উজ্জ্বল মুখের উপর একটা কালো ছায়া এসে পড়ল। সে ধীরে-ধীরে বল্লে—"জানি।"

হরেন বল্লে—"সে সব শুনেছে?"

"শুনেছে।"

"বিশ্বাস করেছে?"

"বোধ হয়।"

"বোধ হয় কেন?"

"না, বোধ হয় নয়; ঠিকই বিশ্বাস করেছে।"

"কি কোরে জানলে, বিশ্বাস করেছে?"

"শুনলুম তার নাকি আবার বিয়ে হচ্ছে।"

"বেশ!"—বোলে হরেন যেন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিলে।

১৬

ক্ষিতীশের বাসায় ঢুকতেই ক্ষিতীশ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"এত দেরী হল যে হরেনবাবু? উনি আপনার জন্যে ভারি ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

হরেন গম্ভীরভাবে বল্লে—"কে, কমলা?"

ক্ষিতীশ অরুণের মুখের দিকে একটা সন্দেহের সঙ্গে চেয়ে বল্লে—"হ্যাঁ।"

এই আগন্তুকটি কে? তাই জানবার জন্যে ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে হরেনের মুখের দিকে চাইলে। পূর্ব্বের মতো গম্ভীরভাবেই হরেন বল্লে—"ও আমাদের অরুণ।" যেন তাইতেই

তার সব পরিচয় দেওয়া হয়ে গেল! ক্ষিতীশ অবাক হয়ে হরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল—আরো-কিছু বিশদভাবে শুনতে; কিন্তু হরেনের মুখ থেকে উত্তরের কোনো আভাষ পাওয়া গেল না। মৈত্রমহাশয়ের খবর কমলাকে দেবার জন্যে ক্ষিতীশ ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই অপরিচিতের সাম্‌নে কমলা-সম্বন্ধে কোনো কথা উত্থাপন করাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছিল না।

ওদিকে কমলা হরেনের জন্যে সেই বিকেল থেকে ঘর-আর-বার করছিল। যতই দেরী হচ্ছিল, ততই তার উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটা ভয় বেড়ে উঠছিল। স্বামীর দেখা না পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে আসাটা যেন শুভ লক্ষণ নয়—এই রকম একটা শঙ্কা কেবলই তাকে উৎপীড়িত করছিল। এই যে একটা অশুভ সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো—তার কঠোর মূর্ত্তি নিয়ে, এ যে কি কোরে তবে ছাড়বে, তা কে বল্‌তে পারে! এতদিন কমলার মনে কোনো দুর্ভাবনা শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি। আজ না হয় কাল, বাপ-মায়ের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে দেখা হবেই—এই আশার উত্তেজনায় তার দিন কাটছিল। স্বামীর দেখা না পেয়ে ফিরে আসার নৈরাশ্য তাকে এই প্রথম ধাক্কা দিলে। সেই থেকে কেবলই তার মনে হচ্ছে যেন কোথায় কি-একটা ভয়ানক-কিছু তালগোল পাকিয়ে উঠছে। বাড়িতে ফিরে যাওয়া প্রথমে যত সহজ মনে হয়েছিল, ততটা সহজ বুঝি নয়;—যেন সে একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছে, তা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা শক্ত! কি হবে? কে জানে?—এই রকম একটা অনিশ্চিতের আশঙ্কা ক্রমাগতই তার বুকের উপর আঘাত দিচ্ছিল। সেই জন্য একটা-কিছু ভালো নিশ্চিত খবর পাবার জন্যে সে ছট্‌ফট্ কোরে বেড়াচ্ছিল। হরেনের যতই দেরি হচ্ছিল, ততই সে আরো উতলা হয়ে উঠছিল। ঘর থেকে কেবলই ছুটে-ছুটে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছিল। এতক্ষণে নীচে হরেনের গলা পেয়ে সে দুর্দুর্ কোরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বৈঠকখানা-ঘরের পাশটিতে চুপ-কোরে দাঁড়ালো। তারপর যেই অরুণের নাম শুনলে অমনি ঝড়ের মতো ছুটে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কমলাকে হঠাৎ দেখে ক্ষিতীশ চম্‌কে উঠল। বালক হলেও অপরিচিতের সাম্‌নে এমন কোরে আসাটা ঠিক হলোনা। সে অরুণের হাত ধোরে তাকে পাশের ঘরের দিকে ঠেলে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় অরুণ চেঁচিয়ে উঠল—"দিদি!" কমলার মনের আবেগ এতটা বেড়ে উঠেছিল যে সে কোনো কথাই কইতে পারলে না—সে এগিয়ে এসে শুধু অরুণের হাতখানি ধরলে। তার পর ভাই-বোনে দুজনে মুখোমুখি খানিক চেয়ে রইল। কমলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ধীরে-ধীরে বল্লে—"ভাই অরুণ, এসেছিস?" অরুণ শুধু বল্লে—"দিদি!"

কমলা চমক-ভেঙে বল্লে—"অরুণ, ক্ষিতীশ-দাদাকে প্রণাম কর।" অরুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের মুখের পানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল; তারপর প্রণাম করলে। অরুণের মনে হল, এই ত তার দিদি, সেই দিদিই আছে—কৈ কিছুই ত বদল হয়নি! তবে! হরেন চুপ-কোরে চেয়ে ভাই-বোনের এই

মিলনের আনন্দ দেখছিল। আর তার মনে হচ্ছিল, এই কঠোর সংসার-মরুভূমে এমনি-তর স্নেহের নির্ঝর যদি তার একটি থাকত!

কমলা বাপ-মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা কোরে অরুণের হাত ধোরে তাকে উপরে নিয়ে গেল। যেতে-যেতে অরুণের মনে হতে লাগল, এই ঘর, এই বাড়ি, এই ক্ষিতীশদাদা, হরেনদাদা, এদের আশপাশ সমস্ত কেমন-একটি শুভ্র শুচিতায় ভরা। এর সমস্তখানি যেন হৃদয়ের প্রীতি দিয়ে মাখানো; কোথাও যেন কোনো মলিনতা, নিষ্ঠুরতা নেই। লোকের টিট্‌কারি আর নিন্দা শুনে-শুনে তার মনে কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে দিদি যেখানে আছে, সে স্থানটা বুঝি নরক। আজ এই পবিত্রতার মধ্যে দিদিকে অধিষ্ঠিত দেখে তার মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে হৃদয় নির্ম্মল আনন্দে ভরে উঠল।

বাড়িতে নতুন অতিথি, রাত্রিও হয়েছে, তার উপর কমলার আজ আনন্দের দিন! ক্ষিতীশ বড়-গোছের একটা ভোজের আয়োজন করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল—হায়, কমলা এইবার চলে যাবে! নিশ্চয়! তিন দিন পূজোর পর বিজয়ার দিন পূজো-বাড়িটা যেমন খাঁ-খাঁ করে, তার মনের ভিতরে তেমনিতর একটা শূন্যতার আভাষ জেগে উঠছিল। এই বাড়ি-ঘর, এই আসবাব-পত্র, নিজের হাতে টাঙানো ছবি, নিজের হাতে সাজানো লাইব্রেরী—এ সবই যেন কেমন মিছে মনে হতে লাগল। কমলা চলে যাচ্ছে যেন জগতের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে! যদি সে পারত তাহলে রূপকথার দৈত্যের মতো এই কমলাকে সকলকার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে চলে যেত—সে কোন্ অজানা নিরালা গুহার মধ্যে!

হরেন একা চুপটি কোরে সেই ঘরে বসেছিল। তার আহত হৃদয় ক্রমেই অভিমানে ভরে উঠছিল। এ অভিমান শুধু বাপ-মায়ের উপর নয়—এ অভিমান জগৎ, সংসার, সমাজ, সবার উপর! যতই এ অভিমান বাড়ছিল, ততই একটা বিতৃষ্ণা তার সমস্ত মনকে তেতো কোরে তুলছিল। সে মনে-মনে বলছিল, কিছু চাইনা, কাউকে চাইনা! কিন্তু কমলা? তার মনে হতে লাগল, এই কমলাকে যেন নিয়তি তার বুকের উপরে আছড়ে এনে ফেলেছে! এই কমলা, ছেলে-বেলাকার সেই কমলা! দিন-রাত যার সঙ্গে খেলাধূলো, মান-অভিমান, হাসি-কান্নায় কেটেছে। কেমন কোরে ক'দিনের জন্যে এ কমলা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, কে জানে? আবার কমলা ফিরে এসেছে। কোথা থেকে, কি কোরে এল, কিছুই জানিনা—শুধু দেখছি, সে এসেছে! সকলকার কাছ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে সে আমার কাছে ফিরে এসেছে। কে যেন সংসার থেকে তাকে ছিঁড়ে এনে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেল। তার আর কে আছে? কেউ নেই। বাপ-মা নয়, স্বামী নয়;—কেউ তাকে গ্রহণ করবে না। সে অনাথ, সে আশ্রয়-ভিখারী।—সে আমার কমলা! হরেন যতই ভাবতে লাগল ততই আশ্চর্য্য হতে লাগল যে কেমন কোরে নিজেদের অজ্ঞাতে তারা দুজনে একই দণ্ডে বাঁধা পড়ে পাশা-

পাশি এসে দাঁড়াল! এ যেন প্রলয়ের পর কেবলমাত্র দুটি প্রণয়ীর চারিদিক-জলে-ঘেরা একটুকরো ডাঙায় মুখোমুখি চেয়ে থাকা! হরেন বসে-বসে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

১৭

অরুণকে পেয়ে কমলার মনে হতে লাগল যেন তার সাম্‌নের দুর্দ্দিন-দুর্ভাবনাগুলোর অস্তিত্ব আর নেই; যেন সেই ঘূর্ণাবর্ত্ত থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। অরুণ নিজের মনের স্ফূর্ত্তি দিয়ে কমলার সমস্ত আশঙ্কা মুছে দিয়েছিল; এবং যেটা আসল ভয়ের কথা, সে-ভয়টার আগাগোড়াই যখন মিথ্যা, তখন সে-সম্বন্ধে অরুণের মনে কোনো খোঁচ্ না থাকাতে, সে-কথা দিদির কাছে সে আর উত্থাপনই করেনি। অরুণের হাবে-ভাবে কথাবার্ত্তায় কমলা এমন একটা আশ্বাসলাভ করলে যে তারও মনে যেন আর কোনো আশঙ্কা রইল না। সে মনের উল্লাসে গঙ্গাস্নান করতে আসার পর থেকে যত ঘটনা ঘটেছিল, একে-একে অরুণকে বল্‌তে লাগল। এর অধিকাংশই ক্ষিতীশের কথা। তার স্নেহ, তার যত্ন, তার আদর যে কমলার মনের এতখানিটা অধিকার কোরে বসে আছে, অরুণকে বল্‌তে গিয়ে কমলা তা এই প্রথম টের পেলে। কমলা এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্ষিতীশের কথা বল্‌ছিল যে শুন্‌তে-শুন্‌তে অরুণের মনও ক্ষিতীশের প্রতি একটা প্রগাঢ় প্রীতিতে ভরে উঠতে লাগল। কমলা বল্লে—"এতদিন পরের বাড়িতে আছি, কিন্তু একদিনের তরেও মনে হয়নি যে এ পরের বাড়ি! সত্যি বলচি ভাই অরুণ, এই ক্ষিতীশদাদা নিশ্চয় কেউ আমাদের আপনার লোক!"

অরুণ কি বল্‌বে খুঁজে না পেয়ে বোলে উঠল—"ক্ষিতীশবাবু সত্যিই বড় ভালো লোক!"

কমলা বল্লে—"শুধু ভালো লোক নয়—ভালো লোক তো ঢের আছে, কিন্তু আপনার লোক পৃথিবীতে কটা পাওয়া যায় ভাই?"

অরুণ বল্লে—"তা তো বটেই! দেখ না, নিজের কাজকর্ম্ম ফেলে তোমার জন্যে কি-না করেছেন! তোমায় ঘাড়ে কোরে বিদেশ পর্য্যন্ত ঘুরে এলেন! কিন্তু ভাই-দিদি, হরেনদাদাও তোমার জন্যে অনেক করেছেন বল্‌তে হবে!"

কমলা বল্লে—"আরে, হরেনদাদা ছিল কোথায়! তাকে ত ক্ষিতীশবাবুই খুঁজে-পেতে আনলেন!"

অরুণের মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল, সে বল্লে—"তা বোলে হরেনদাও তো কম করেনি!"

কমলা বল্লে—"হরেন-দাদা তো কর্ব্বেই! সে হল আমাদের গ্রামের লোক—আপনার লোক বল্লেই চলে;—সে করবে না তো করবে কে? কিন্তু অজানা অচেনা এই ক্ষিতীশবাবু—"

অরুণ বল্লে—"তা বটে! ক্ষিতীশবাবুকে দেখে অবধি আমারও তাই মনে হয়—"

কমলা বল্লে—"সেই জন্যেই ত ওঁকে আমি ক্ষিতীশ-দা বলে ডাকি।"

অরুণ বল্লে—"আমিও এখন থেকে ক্ষিতীশদাদা বলব!"

কমলার খট্-কোরে মনে হল,—এখন থেকে বটে, কিন্তু আর কতদিন? একটা কি দুটো দিন বৈ তো নয়। তারপর এই ক্ষিতীশ-

দাদা থাকবেন কোথায়, আর আমি থাকব কোথায়? ক্ষিতীশদাদা নানা কাজে হয়তো আমায় ভুলে যাবেন, কিন্তু আমি ভুলতে পারব না। সেই বিদেশে—যেখানে আপনার লোক বেশী নেই—সেই খোট্টার দেশে প্রতি-অবসরে আমায় মনে পড়বে এই ক্ষিতীশদাদাকে! একে দেখবার জন্যে কত মন-কেমন করবে কিন্তু দেখতে পাব না;—হয় ত ইহজন্মেই আর পাব না! কেবল থেকে-থেকে মনে পড়বে এই কটা দিনের স্মৃতি; শুধু মনের সম্বল হয়ে থাকবে এই কটা দিনের ক্ষিতীশ-দাদা! ভাবতে-ভাবতে কমলার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। চোখে জল এল।

খাবার জায়গা হয়েছে বোলে অরুণকে ডাকতে এসে ক্ষিতীশ দেখলে, কমলার দু-চোখে দু-ফোঁটা জল—মুক্তোর মতো টল্‌টল্ করছে। কমলা এ-বাড়িতে এসে অবধি কখনো কেঁদেছে কি-না ক্ষিতীশ জানেনা, সে কোনো দিন তার চোখে জল দেখেনি। এই সে প্রথম দেখলে। কান্না দেখলে মানুষের মনে দুঃখ হয়, কিন্তু কি-জানি-কেন ক্ষিতীশের মনে হতে লাগল—কি সুন্দর ঐ দুফোঁটা জল! যদি ঐ দু-চোখের দুটি ফোঁটা সে পায়, সাত-রাজার ধন মাণিকের মতো সোনার কৌটোয় লুকিয়ে রাখে—চিরদিন, চিরজীবন! তার মনে হল, জীবনের সমস্ত ক্ষতি যেন এই দুফোঁটা চোখের জল পূরণ কোরে দিতে পারে!

চোখের জল ঝরে পড়ে গেল, তবু ক্ষিতীশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই চোখের পানে চেয়ে রইল। কমলা চমক-ভেঙে বলে উঠল—"এই যে ক্ষিতীশদাদা!" কিন্তু ক্ষিতীশের চমক ভাঙল না। তার সেই অপলক চোখের দিকে চেয়ে কমলার মনে হতে লাগল, কে যেন তার মনের অন্ধকারটা হাৎড়ে-হাৎড়ে দেখছে—এখানকার জিনিস ওখানে ওলোট-পালোট কোরে! তাইতে সে ভিতরে-ভিতরে ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল—তাড়াতাড়ি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

হরেন ও অরুণ খেতে বসলো। কমলা বল্লে—"ক্ষিতীশদাদা, তুমি বসলে না যে?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আগে ওঁদের হোক। ওঁরা হলেন অতিথি!"

কমলা বল্লে—"অতিথি-টতিথি এখানে কেউ নেই—সবই আপনার লোক! তুমি বোসো।"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই কমলা!"

ক্ষিতীশ বল্লে বটে, ব্যস্ত হবার দরকার নেই, কিন্তু কমলা অনুভব করলে আজ নিজের হাতে পরিবেষণ কোরে ক্ষিতীশদাদাকে খাওয়াবার জন্যে তার সমস্ত হৃদয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বল্লে—"না ক্ষিতীশদাদা, সে হবেনা, তোমাকে বস্‌তেই হবে।"

ক্ষিতীশ বল্লে—"আমার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন কমলা? আমি লক্ষ্মীছাড়াটা তো যেখানে-সেখানে যখন-তখন যা-পাই খাই।"

কমলা বল্লে—"আজ তা হবে না। আজ আমি তোমায় নিজের হাতে পরিবেষণ কোরে খাওয়াবো।"

ক্ষিতীশ বিস্মিত হয়ে একবার কমলার মুখের দিকে চাইলে, তারপর বল্লে—"আজ তোমার এ খেয়াল চাপলো যে?"

কমলা একটা ব্যথাভরা সুরে বল্লে—

"দাদা, আর তো তোমায় কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পাব না!" বলতে-বলতে তার গলার স্বর ধোরে-আসতে লাগল। গলাটা পরিষ্কার কোরে নিয়ে সে বোলে উঠল—"কাল যে আমি চলে যাচ্ছি।"

হরেন এতক্ষণ চুপ কোরে ছিল, সে গম্ভীর ভাবে বল্লে—"কোথায়?"

কমলা বল্লে—"কালীগ্রামে!"

হরেন বল্লে—"কার সঙ্গে?"

—"অরুণের সঙ্গে। তুমিও চলনা, হরেন-দাদা!"

হরেন সংক্ষেপে কিন্তু খুব-একটা দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লে—"না!"

কমলা বল্লে—"তোমার যদি পড়ার ক্ষতি হবে মনে কর, তাহলে না-হয় আমি একা অরুণের সঙ্গে যাই।"

হরেন বল্লে—"না!" এই না-শব্দটা এমন-একটা গভীর গম্ভীর সুরে সজোর ধাক্কার মতো বেজে উঠল যে কমলা অনেকক্ষণ কোনো কথা কইতে পারলে না।

হরেন যে তার বাড়ি ফিরে যাওয়ায় কোনো আপত্তি করবে, কমলা কখনো তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কেন যে করছে তাও সে ঠিক বুঝতে পারলে না; সে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"বারণ করছ কেন হরেনদাদা?"

হরেন কোনো উত্তর দিলে না। কমলার কেমন ভয় হতে লাগল। সে এবার হরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে আবদারের সুরে বল্লে—"কেন হরেনদাদা বারণ করছ ভাই?" তার মনে হচ্ছিল, কোনো-রকমে এখনই হরেনের কাছ থেকে যাবার সম্মতি না নিতে পারলে যেন তার নিস্তার নেই!

হরেন বল্লে—"না। তোমার যাওয়া হতে পারে না।"

অরুণ ও কমলা দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে হরেনের মুখের পানে চেয়ে রইল। তাদের মনে হল, হরেন যেন এমন-একটা জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে সে হুকুম করবে, তাদের মানতে হবে! কমলার একবার প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হল, কিন্তু তার উপযুক্ত বল সে মনের ভিতর থেকে সংগ্রহ কোরে উঠতে পারলে না। তখন সে আর-একবার আব্দারের সুর ধরলে, কিন্তু হরেনের মুখের দিকে চেয়ে বেশী অগ্রসর হতে পারলে না। সে কি করবে ঠিক করতে না পেরে হরেনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখতে লাগল। চেয়ে-চেয়ে বুঝতে পারলে হরেনের ভিতরটা যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের অপেক্ষায় স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কমলা ছেলেবেলা থেকে জানে, হরেনের এই অবস্থায় কিছুতেই তাকে টলানো যায় না, নড়ানো যায় না। সে ভীত হয়ে বলে উঠলো—"তোমার আজ হলো কি হরেনদা? তুমি অমন-কোরে রয়েছ কেন?"

হরেন একটা গম্ভীর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—"না, কিছু হয়নি।"

ক্ষিতীশও চেয়ে দেখলে হরেন যেন আজ মোটেই হরেনের মতো নয়। কেন এমন হল, সে কিছুই ধরতে পারলে না।

কমলা হরেনের দিক থেকে হতাশ হয়ে ক্ষিতীশের দিকে ফিরলো। সে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি বল ক্ষিতীশদাদা, অরুণের সঙ্গে কালীগ্রামে যাবো না?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"হরেন যখন বারণ কচ্চে, তখন না যাওয়াই ভালো।"

কমলার কেমন ভয় হচ্ছিল যে হরেন জোর কোরে তাকে রেখে ভালো করছে না; যতই দিন যাবে, ততই তার পক্ষে অমঙ্গল। সে ক্ষিতীশের দিকে করুণ প্রার্থনার দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—"কিন্তু কেন উনি বারণ করছেন, তাতো কিছু বলছেন না।"

"কারণ আবার কি! আমি বারণ করচি, যেতে পাবে না।"—বোলে হরেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

এই হুঙ্কারে অভিমানের সঙ্গে কমলার একটু রাগও হল। সে বোলে উঠল—"আমি যাব। তুমি বারণ করবার কে?"

হরেন কি-একটা কড়া-কথা বলতে যাচ্ছিল, ক্ষিতীশ তার অবসর না দিয়ে বোলে উঠল—"না কমলা, হরেন ভালো কথাই বলছে। তোমাদের বাড়ি থেকে কেউ না নিতে এলে তোমার যাওয়াটা ঠিক—সঙ্গত হবেনা। তুমি ছেলেমানুষী কোরোনা।"

ক্ষিতীশের এই কথার মধ্যে কেমন-একটি স্নেহের সুর ছিল, যাতে কমলার বিরুদ্ধ মন এক-নিমেষে বশ্যতা স্বীকার কোরে ফেল্লে। তার মনে হল, ক্ষিতীশদা যা বলছেন, তাই তার করা উচিত। কিন্তু নিজের অবস্থার সেই অসহায়তায় তার কেমন কান্না পেতে লাগল। সে চাপা কান্নার সুরে বোলে উঠল—"তবে কি আমি এইখানে পড়ে থাকব না কি?"

হরেনের বুকের মাঝে এই কান্নার সুর গিয়ে বেজে উঠল; সে বল্লে—"এখানে কেন থাকবে কমলা? আমি তোমায় আমার কাছে নিয়ে যাব।"

কমলা বল্লে—"সে তো একই কথা!—তা হলে এখানে থাকতেই বা আমার কি!"

হরেন প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে বোলে উঠল—"না, না, এ হল পরের বাড়ী, এখানে তোমায় থাকতে হবে না।"

কমলা আহত হয়ে বল্লে—"ছি, ছি, অমন কথা বোলোনা হরেনদা! ক্ষিতীশদা কি আমাদের পর!"

হরেন এর কোনো উত্তর খুঁজে পেলে না। কমলার জন্যে ক্ষতীশ যা করেছে, তাতে কমলার কথা ঠিক বটে; কিন্তু কমলা যে-সুরে সেটা বল্লে, হরেনের সে সুরটা তেমন ভালো লাগল না। তারপর ক্ষিতীশের কথাতেই কমলার বাড়ি-যাবার জেদ ছুটে গেল—এটাও তার মনের মধ্যে কেমন খোঁচা দিতে লাগল। সে আবার গুম্ খেয়ে গেল।

অরুণ বল্লে—"তাহ'লে আমি কাল ভোরেই বাড়ি ফিরে যাই—বাবা-মাকে খবর দিই-গে?"

ক্ষিতীশ বল্লে—"সে বেশ কথা!"

হরেন কোনো সাড়া দিলে না।

পরদিন ভোরে অরুণ যখন দিদির কাছে বিদায় নিতে গেল, তখন কমলা বল্লে—"ভাই অরুণ, তোকে আমার একটি কাজ করতে হবে লুকিয়ে—কেউ যেন না জানতে পারে।"

অরুণ বল্লে—"কি কাজ?"

কমলা একখানা খাম-আঁটা চিঠি অরুণের হাতে দিয়ে বল্লে—"এই চিঠিখানি নিজের হাতে তোকে দিয়ে আসতে হবে।"

অরুণ বল্লে—"কাকে ?

কমলা বল্লে—"শিরোনামাটা পড়ে দেখ্‌না।"

অরুণ দেখলে খামের উপর লেখা আছে —"শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচি শ্রীচরণেষু।"

অরুণ প্রথমটা কেমন-একটু থম্‌কে গিয়ে দিদির মুখের দিকে খানিক ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইল; শেষে মুখ নামিয়ে বল্লে—"আচ্ছা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

মানুষের আয়ু

বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে চিকিৎসা-শাস্ত্রকে দাঁড় করাইয়া রোগ-নিবারণের যে কত চেষ্টা দেশবিদেশে চলিতেছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি। জীবাণুর সহিত নানা রোগের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হওয়ায় রোগের মূলে ঘা পড়িতেছে এবং যে সকল রোগ পূর্ব্বে অনারোগ্য বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, তাহা এখন জীবাণুমূলক চিকিৎসায় সহজে আরোগ্য হইয়া যাইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে লোক যে রকম পীড়ায় যন্ত্রণা ভোগ করিত এখন তাহা করিতেছে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার যে কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে তাহার সংখ্যাই হয় না। ইহাতে বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি অনেক মহামারীর প্রকোপ কমিয়াছে। ক্ষত-রোগে পূর্ব্বে সকল দেশেই হাজার হাজার লোক মরিত, আধুনিক শস্ত্র-চিকিৎসার গুণে এবং ক্ষত নির্বিষ করার নূতন উপায়ে এই রোগের মৃত্যু অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমেরিকা বা য়ুরোপের কোন বড় সহরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যত লোক মরিত, তাহার সহিত এখানকার মৃত্যু-সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যাইবে মৃত্যুর হার কমার দিকেই চলিয়াছে। এ সকলি সত্য। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্র মানুষের আয়ুর পরিমাণ বাড়াইতে পারিল কিনা জানিবার জন্য কাগজ-পত্র খুঁজিলে বড়ই নিরাশ হইতে হয়। দেখা যায় এখনকার উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যনীতি মানুষের পরমায়ু বাড়াইতে পারে নাই। অর্থাৎ এক-শত বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশ মানুষই যেমন সত্তর আশী বা নব্বুই বৎসরের মধ্যে মরিত, এখন তাহারা ঠিক সেই রকম বয়সেই মরিতেছে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ কেন দেড়শত বা দুইশত বৎসর বাঁচিতেছে না, সে সম্বন্ধে সম্প্রতি কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাহারি আলোচনা করিব।

মোটামুটি বলিতে গেলে, জন্ম এবং মৃত্যুকে বিশেষ বিশেষ রসায়নিক ক্রিয়ার ফল ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। কোন আকস্মিক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন যখন স্থায়িভাবে প্রাণীর শ্বাস রোধ করিয়া দেয়, তখনি মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কোন্ সূত্রে এই পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা বলা যায় না। কখনো বাহিরের আঘাত, কখনো পীড়া বা বিষ ইহার সূত্রপাত করিয়া দেয়। কাজেই বলিতে হয়, প্রাণীর স্বাভাবিক মৃত্যু নাই,—সকল মৃত্যুই আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে উৎপন্ন হয়। কয়েক জন বৈজ্ঞানিক এই কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং সকল রকম আঘাত ও পীড়ার বিষ হইতে বাঁচাইয়া প্রাণীকে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ বা অপর বড় প্রাণী লইয়া এই পরীক্ষা করা চলে নাই। ইহাদের পাকাশয় ও অন্ত্র সর্ব্বদাই নানা পীড়ার জীবাণুতে পূর্ণ থাকে—কাজেই খুব সাবধানে রাখিলেও এই সকল প্রাণীদের শরীর কখনই রোগবিষ হইতে মুক্ত হয় না। রুসিয়ার বৈজ্ঞানিক বগ্‌ডানাও (Bugdanow) মাছি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। জীবাণুর অগম্য স্থান নাই। মাছিরা যে ডিম প্রসব করে তাহাতে অসংখ্য জীবাণু বাস করে। বাগডানাও সাহেব

এই সব দেখিয়া মাছির সদ্যপ্রসূত ডিমগুলিকে প্রথমে ক্লোরাইড অব মার্কারি নামক বিষে ডুবাইয়া জীবাণু-বর্জ্জিত করিয়াছিলেন। মাছিদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত। বলা বাহুল্য ইহাতে অনেক ডিমই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শেষে যে দুই চারিটি ডিম ভাল ছিল, সেগুলি হইতে মাছি জন্মিলে তিনি মাছিগুলিকে জীবাণুবর্জ্জিত খাদ্য দিয়া পালন করিয়াছিলেন। মাছিদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত চলে। অল্প দিনের মধ্যেই সেই দুই চারিটি মাছি সন্তান-সন্ততি লইয়া প্রকাণ্ড এক ঝাঁক মাছি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাতে বাহিরের আঘাত অপঘাত গায়ে না লাগে বা বাহিরের জীবাণু আসিয়া গায়ে আশ্রয় না লয়, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু মাছিরা অমর হইল না,—যথাসময়ে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে তাহারা গণ্ডায় গণ্ডায় মরিতে লাগিল। বাগডানাও সাহেবের দেখাদেখি ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় অনেক বৈজ্ঞানিক ঠিক ঐ প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল স্থানে ঠিক একই ফল দেখা গিয়াছে।

এই অকৃতকার্য্যতায় পরীক্ষকগণ নিরুদ্যম হন নাই। তাঁহারা বুঝিলেন, যে সকল রাসায়নিক পরিবর্ত্তন প্রাণী-দেহে জীবনীশক্তির সৃষ্টি করে, তাহাই শরীরে নানা বিষ পদার্থ উৎপন্ন করিয়া প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। রাসায়নিক কার্য্যকে সুখত রাখা কঠিন নয়,—তাপপ্রয়োগে এই কার্য্য দ্রুত চলে এবং ঠাণ্ডা দিলে তাহা মন্দীভূত হয়। পরীক্ষকগণ ভাবিলেন, যদি কোন উপায়ে প্রাণীদের দেহ শীতল রাখিয়া শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়াকে সংযত করা যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রাণীরা দীর্ঘজীবী হইবে।

পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ডাক্তার লয়েব এবং নরথ্রপ জীবাণুবর্জ্জিত মাছি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মানুষ এবং অপর উন্নত প্রাণীদের দেহের উষ্ণতার এক-একটা সীমা আছে; খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডায় রাখিয়া এই উষ্ণতার পরিবর্ত্তন করা যায় না; কিন্তু পতঙ্গদের দৈহিক উষ্ণতার সে প্রকার কোনো সীমা নাই। বাহিরের তাপ-অনুসারে ইহারা দেহের উষ্ণতা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত করে এবং তাহাতে কোনো অসুস্থতা বোধ করে না। কাজেই মাছি লইয়া পরীক্ষা করায় পরীক্ষকগণের অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। উষ্ণতা কমাইয়া দেওয়ায় প্রথমে কতক কাছি মরিয়া গেল। শেষে সেণ্টিগ্রেটের কুড়ি ডিগ্রি উত্তাপ কমাইলে যেগুলি বাঁচিয়া রহিল, পরীক্ষকগণ তাহাদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে রাখিয়া সাবধানে পালন করিতে লাগিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গেল তাহাতে তাঁহারা অবাক হইয়া গেলেন। পরীক্ষকগণ দেখিলেন যে-সকল মাছি জন্মের এক মাসের মধ্যে মারা যাইত, তাহারাই ঠাণ্ডায় থাকিয়া নয় মাস পর্য্যন্ত বাঁচিতে লাগিল কিন্তু এই পরীক্ষা মানুষের উপর করা হইল না। মানুষের জটিল দেহযন্ত্র বেশী ঠাণ্ডা পাইলেই বিকল হইয়া যায়। তাই দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য মানুষের শরীরে স্বভাবতই একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা থাকে। ইহা কোনো কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘকাল কমাইয়া রাখিলে মৃত্যু হয়। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষকগণ বলিতেছেন, মানুষের দেহের উষ্ণতা যদি কোনো ক্রমে কুড়ি ডিগ্রি পরিমাণে কমাইয়া রাখার উপায় থাকিত, তবে এখন যে সব মানুষ ষাট বা সত্তর বৎসরে মরিতেছে, তাহাদিগকে দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু তাহা হইবার নহে,—এই উপায়ে কোনো কালে যে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহার সম্ভাবনা আজও দেখা যাইতেছে না।

মানুষ বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া কখন যৌবনে পা দেয় এবং তার পরে কি করিয়া কবে যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পতঙ্গ উভচর প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করিলে, বাল্য এবং যৌবনের সীমারেখা সুস্পষ্ট চেনা যায়। ভেকেরা ডিম হইতে বাহির হইয়াই ভেকের আকার পায় না। বেঙাচির আকারে তাহারা কয়েক সপ্তাহ জলে সাঁতার দেয়। ইহাই ভেকের শৈশব কাল। তার পরে যখন তাহাদের লেজ লোপ পাইয়া যায়, পা গজাইতে থাকে এবং গায়ের চামড়া ও মুখ রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, সেই সময়টা তাহাদের যৌবনারম্ভ কাল। মানুষের যৌবনের কাল বাড়াইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘজীবী করা যায় কিনা জানিবার জন্য Gudernatch নামে

জনৈক বৈজ্ঞানিক কিছুদিন ধরিয়া ভেকের শারীরিক পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। ইহাতে এসম্বন্ধে অনেক নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। বড় প্রাণীদের কণ্ঠনলীর কাছে একটি বিশেষ মাংসপিণ্ড আছে, ইহাকে ইংরাজিতে Thyroid gland বলে। ইহা হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণীদেহে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কাজ করে। শীতকালে তিন চারি সপ্তাহের পূর্ব্বে ব্যাঙাচি কখনই ব্যাঙের মূর্ত্তি পায় না। পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকটি খুব ছোট ব্যাঙাচিকে অপর প্রাণীর Thyroid gland খাওয়াইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বড়ই অদ্ভুত। Thyroid Gland খাইয়া অপুষ্টাঙ্গ ছোট ছোট ব্যাঙাচি এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাঙের মূর্ত্তি পাইয়াছিল। পরীক্ষক বুঝিয়াছিলেন, প্রাণীদের Thyroid Glandই তাহাদের যৌবনের বিকাশ করে এবং শেষে যখন তাহা দুর্ব্বল হইয়া যায় তখন বার্দ্ধক্য দেখা দেয়। কয়েকগুলি ব্যাঙাচির দেহের Thyroid Gland সাবধানে কাটিয়া ফেলিয়া এলেন্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতেও আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছিল; ব্যাঙাচিগুলির মধ্যে একটিও যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা আজীবন লেজযুক্ত ব্যাঙাচিই থাকিয়া গিয়াছিল।

এই পরীক্ষা মানুষের উপর চলিতেছে কিনা জানি না। দেহের Thyroid Gland কাটিয়া মানুষকে আজীবন শিশু করিয়া রাখা ত সম্ভব নহে। সম্ভব হইলে ইহাতে মানুষের দুঃখই বাড়িয়া যাইবে, আয়ু বাড়িবে না। কাজেই বলিতে হইতেছে, মানুষের আয়ু বাড়াইবার জন্য এ পর্য্যন্ত যত চেষ্টা হইয়াছে তাহার কোনোটিই সার্থক হয় নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

শান্তি নিকেতন, শ্রাবণ ১৩২৭।

নারী-স্বাতন্ত্র্য

পাশ্চাত্যে মেয়েরা যতটা পুরুষালী হইয়া উঠিতে পারে তার চেষ্টা করিতেছে, আর প্রাচ্যে মেয়েরা যতটা মেয়েলী হইয়া থাকিতে পারে তাই যেন চাহিয়াছে। এই দুইটাই সীমার বাহিরের জিনিষ। নারীকেও মানুষ হইতে হইবে, কিন্তু তার অর্থ পুরুষ হওয়া নয়। আবার নারীত্ব হারাইবে না বলিয়া সে যে "মেয়ে মানুষ" হইয়া থাকিবে এমনও কোন কথা নাই। পুরুষও মানুষ হইবে, মেয়েও মানুষ হইবে—দুজনে হুবহু এক রকমের না হইলেও, আবার সম্পূর্ণ আলাদা রকমেরও নয়। কিন্তু এখন সমস্যা হইতেছে দু'য়ের মধ্যে কোথায় সেই ছেদরেখা টানিব।

আমাদের দেশে ছেদটা খুব সহজে স্পষ্ট করিয়াই টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেয়ে থাকিবে ঘরে, পুরুষ থাকিবে বাহিরে। মেয়েরা বাহিরে যাইতে পারিবে না—যদিই বা কখন কদাচিৎ যায় তবে পুরুষের ছায়ায় ছায়ায় চলিতে হইবে, থাকিতে হইবে গলগ্রহ হইয়া; আর পুরুষেরাও অন্দরমহলে ঢুকিতে পারিবে না, যদিই বা ঢুকিতে চায় তবে যেন মেয়ের মুখোস পরিয়া মেয়েলী হইয়া তাহাকে ঢুকিতে হইবে;—পুরুষের পুরুষত্ব হারাইয়া দুই জনের দুইটি আলাদা প্রাচীর-ঘেরা রাজ্য—মাঝে আনাগোনার একটা ছোট দরজা আছে কি নাই।

আমাদের দেশে পুরুষের জীবন একান্ত বাহিরে—আড্ডায় সমাজে সভা-সমিতিতে কেবল পুরুষেরই সংসর্গে। জ্ঞানের চর্চ্চায়, কার্য্যানুষ্ঠানে, এমন কি আনন্দ-উৎসবেও আমাদের সাথী হইতেছে পুরুষ। এ সব বিষয়ে নারীর স্থান নাই। নারীর কথা যখন মনে জাগে, তখন ফিরি ঘরে, ওসকল কথা ভুলিয়া গিয়া, ইহাদের মুখে ছিপি আঁটিয়া দিয়া আরম্ভ করি মেয়েলি কথা—ঘরকন্না, ছেলেপিলে, বড়-জোর দুই-একটা রসালাপ। মেয়েরাও বাহিরের কোন খবর রাখে না, স্বামীর জীবনের অর্দ্ধেকটাই তার অজ্ঞাত। বাহিরের জগৎ ডুবিল কি বাঁচিল সে দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন—ঘরের খাওয়া-পরা চলিলেই সব হইল। মেয়েরা মেয়ের সাথে জানে কেবল ঘর-কন্নার কথা বলিতে, গালগল্প করিতে, পরের আলোচনা

করিতে। পুরুষ যদি অন্তঃপুরে আসিয়া দৈবাৎ কোন গল্পের বিষয় সুরু করেন তবে মেয়েরা অগাধ সলিলে যেন ঠাঁই পায় না। *

এই বিচ্ছিন্নতার ফলে দাঁড়াইয়াছে কি? আর কোন ক্ষেত্রে মিলনসূত্র না পাইয়া পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কেবল শারীরিক ক্ষেত্রেই বিপুল বিকটভাবে দেখা দিয়াছে—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক যৌন সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে নাই। পুরুষ ও নারীর মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ যে হইতে পারে, সে কল্পনাও আমরা সহজে করিতে পারি না। পুরুষ নারী একত্র দেখিলেই আমাদের চোরের মন বোঁচকার দিকে ধায়—তাহাকে অশ্লীলতা উচ্ছৃঙ্খলতা কত কি নাম দিই। আমাদের শাস্ত্রকার তাই শাসাইয়া রাখিয়াছেন—পুরুষকে জানিবে আগুন বলিয়া, আর নারীকে জানিবে ঘৃত বলিয়া; দুইকে কদাপি একত্র হইতে দিবে না। তাই ঘরে বাইরে সমস্যা আমাদিগকে এতখানি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে—বাহিরকে যতদূর পারি বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছি, ঘরকে যতদূর পারি ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়াছি। দুই-এর যেন মুখোমুখী করিতে নাই।

অনেকে বলিবেন দেশের সামাজিক অবস্থার সঠিক চিত্র আমি দিতে পারি নাই। আমাদের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের গভীর অর্থ টা আমার মোটা বুদ্ধিতে ধরা দেয় নাই। তাঁহারা বলিবেন আধুনিক ইউরোপের মত আমাদের ধর্ম্ম-প্রণেতৃগণ পুরুষ ও নারীকে একাকার করিতে চাহেন নাই। পুরুষ ও নারীর পৃথক পৃথক স্বভাব ও স্বধর্ম্ম জানিয়া সেই অনুসারে উভয়ের পৃথক পৃথক কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের রাজ্য বাহিরেই, নারীর রাজ্য ঘরেই। এ কথার অর্থ কি? পুরুষের কাজ লোক-সমক্ষে, নারীর কাজ গোপনে নীরবে। পুরুষ দিবে কর্ম্ম, নারী দিবে ভালবাসা। পুরুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবে, নারী কিন্তু সান্ত্বনা-বাণি লইয়া ফিরিবে। কঠোরবৃত্তি, পুরুষত্ব যাহাতে প্রয়োজন তাহা পুরুষের ধর্ম্ম; কোমলতা কমনীয়তা নারীর ভূষণ। পুরুষের মস্তিষ্ক, পুরুষের বাহু জীবনের এক দিক, আর নারীর হৃদয়, নারীর কোমল হস্ত আর এক দিক। নারী ঘরেই থাকুক আড়ালে আবডালে থাকিয়া সেখান হইতেই সে ভাল রসসঞ্চার করিতে পারে, তীব্র রৌদ্রাতপে আসিয়া তাহাকে শুকাইয়া পুড়াইয়া ফেলিও না। নারীর অঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়াতেই পুরুষ সরস সতেজ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িতেছে—Love of Ladies, Death of warriors এ শুধু আমাদের দেশের কথা নয়, ইউরোপ যখন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই, বর্ণসঙ্করে একাকার উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই, তখন সে আমাদের ভাবেরই ভাবুক ছিল।

তাই বলিয়া বলিও না নারীকে অবলা অশক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। পুরুষের বল ও শক্তি এক ধরণের, নারীর শক্তি ও বল আর এক-রকম ধরণের। পুরুষের হইতেছে আক্রমণ করিবার বল (Active), নারীর হইতেছে সহ্য করিবার বল। আমাদের সমাজে সংসারের যে ভার তাহা পড়ে মেয়েদেরই উপর। পুরুষ যে যতটুকু পারে কেবল অর্থ আনিয়া দিয়াই খালাস। কিন্তু সংসারকে দক্ষতার সাথে চালান, সকল দুঃখ-ক্লেশ আধিব্যাধির মধ্যে ধীর স্থির থাকিয়া সংসারের হালটি ঠিক ধরিয়া থাকায় যে কতখানি শক্তির দরকার তাহা পুরুষে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পুরুষের শক্তিতে ডাকহাঁক, বাহির-চটক থাকিতে পারে—কিন্তু পর্দ্দার আড়ালে যিনি একটু উঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন সেখানে মেয়েদের মধ্যে কি নীরব সামর্থ্য, কি অকাতর শ্রম, কি অটুট অধ্যবসায়, কি শালীনতা, কি শোভনতা,—মেয়েদের জন্যই সমাজ দানা বাঁধিয়া শক্ত সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে!

তারপর জ্ঞানের দিক দিয়া আমাদের মেয়েরা বিদুষী পণ্ডিতানী না হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিতে প্রকৃতজ্ঞানে—ধর্ম্ম-বিষয়ে—পুরুষের চেয়ে তাহারা কোন অংশে হীন নয়, অনেক স্থলে ইহারাই পুরুষের আদর্শ হইবার

* আমি দেশের সাধারণ অবস্থার কথা বলিতেছি। বিশেষ কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির পক্ষে আমার কথা প্রযুজ্য না হইলে কেহ যেন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া না উঠেন।

উপযুক্ত। নিরক্ষর হইলেই মূর্খ হয় না, পাশ্চাত্যের মোহে পড়িয়া এই সহজ কথাটি আমরা এখন আর বুঝিতে পারি না; পুরুষের বিদ্যা পুরুষের মস্তিষ্ককে কৃত্রিম অস্বাভাবিক (sophisticated) করিয়া ফেলিয়াছে, আমাদের মেয়েদের বুদ্ধি কিন্তু সহজ স্বাভাবিক সরল সতেজ। বেশী কতকগুলি কথা জানিয়া ফল কি? সে ত চপলতা চটুলতা মাত্র। আমাদের মেয়েদের মুখে খলিফৎ আন্দোলনের কথা অথবা পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনীতির কথা শুনিতে পাই না বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? দরকার হয়, পুরুষ সে কথা লইয়া বাদ-বিচার করুক। কিন্তু নারীকে আবার তাহার মধ্যে টানিয়া আনা কেন? নারীর কাছে চাই ধর্ম্ম-কথা, নীতিকথা, আদর্শের কথা, ভিতরের কথা। পুস্তকের বিদ্যা, খবরের কাগজের কাহিনী সব নারীর জানা নাই থাকিল। কিন্তু স্বভাবকে চরিত্রকে যাহা উন্নত করে মার্জ্জিত করে সেই সকলের সাথে পরিচয় থাকিলেই যথেষ্ট। পুরুষ বিজ্ঞান লইয়া থাকুক; নারী যেন তাহার জ্ঞান লইয়া থাকে। পুরুষ তাহার মস্তিষ্ক লইয়া থাকুক, নারী যেন থাকে তাহার হৃদয়-প্রাণ লইয়া।

আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থাকে ধর্ম্মকর্ম্মকে আরও কতদূর যে আদর্শোচিত বলিয়া ব্যাখ্যান দেওয়া যাইত তাহা জানি না। কিন্তু যেটুকু দিয়াছি তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ইহা বাস্তবে কতদূর সত্য, আর সত্য হইলেও ইহাই চরম আদর্শ কি না? আমাদের জননীরা মমতাময়ী, ধৈর্য্যশীলা শক্তিমতী, বুদ্ধিমতী, জ্ঞানশীলা, এই-সব কয়টি গুণ আমাদের সমাজ পূর্ণমাত্রায় নারীকে দিয়াছে, কল্পনায় এ কথা সহজেই সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের কষ্টিপাথরে এই সত্যকে যিনি ঘসিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি ইহার মধ্যেও অনেকখানিই—বেশীর ভাগই যে খাদ মিশিয়া আছে, তাহা চিনিতে পারিবেন। আর এ কথা যদি সত্য বলিয়াই জানি, তবে সে সত্য কেবল একটু ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার মধ্যে,—আপন সংসার, আপন পরিজন, আপনার স্বামী ও সন্তানের বাহিরে নয়। যে সব গুণের খেলার জন্য যথেষ্ট জায়গা, বহুল আশ্রয় নাই, তাহার যে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু প্রাণহীন হইয়া পড়িবে তাহা ত খুব স্বাভাবিক। ক্ষেত্র যদি বড় না হয় তবে শক্তি আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। শুধু গভীরত্বের দোহাই দিলে চলে না—যে গভীরত্বকে আটকাইয়া রাখা হয় কঠিন বাঁধের মধ্যে, সে গভীরত্ব বেশী দিন থাকে না, ক্রমে তাহা পাতলা হইয়া আসে, ক্রমে তাহাতে পচ্ ধরে। আমাদের নারীসমাজে কি তাই হয় নাই?

নারীর কাজ নীরবে গোপনে, নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এ সব কথা দিয়া আমরা চোখের ঠারে মন ভুলাইতে চেষ্টা করি মাত্র। এখানে আছে একটা আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়াস। নারীকে যথার্থতঃ হীন (untouchable বলিব কি?) বলিয়াই মনে করা হয়, তাহাকে ছোট ক্ষেত্র ছোট বিষয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের নাম ও উপাধি দেওয়া হইয়াছে বড় বড়। হাতা কড়া লইয়া থাকাকে বলা হয় সংসার করা, পরিবারের কাহারও অসুখ-বিসুখের সময় পথ্যাদি দেওয়া বা শুশ্রূষা করাকে বলা হয় সেবাধর্ম্ম মহাপ্রাণতা, আর সীতা সাবিত্রীর উপাখ্যান জানাকে বলা হয় ধর্ম্মজ্ঞান। আমাদের এ কথায় একটু রং চড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ ইহা যে কতখানি সত্য তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পুরুষের ক্ষেত্র বাহিরেই হউক আর নারীর ক্ষেত্র ভিতরেই হউক, আমরা কি স্পষ্ট দেখিতেছি না, পুরুষ নিজের ক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, নারী তাহার ক্ষেত্রে ততখানি অগ্রসর হইতে পারে নাই, হওয়া তাহার দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে! যে সব নূতন ভাব নূতন চিন্তা নূতন প্রেরণা পুরুষ জাতিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, নারী যদি সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিল তবে কি পুরুষ কি নারী কাহারও সার্থকতা হইবে কি? সমাজের গোটা জীবন সতেজ সমুন্নত হইবে কি? নারীকে আমরা সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকি —কিন্তু সে ধর্ম্ম কি ঘরের মধ্যে ব্রতপূজা আচার অনুষ্ঠান না শুধু সংসার-পালন? আমাদের মনে হয় মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে, জ্ঞানে ও প্রাণে—বাহিরে ও ভিতরে

—একটা বিচ্ছেদ রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই আমাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিরাট অসামঞ্জস্য, সমাজে ঢুকিয়াছে অস্বাস্থ্যের বীজ। যে ভয়ে ঘরে ও বাহিরের মধ্যে আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছি, সেই ভয়ই আমাদের কাল হইয়াছে; যে ভুচ্ছ তাচ্ছল্য বা উদাসীনতার জন্য সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গকেই পঙ্গু করিয়া রাখিতেছি, তাহাতে অপর অর্দ্ধাঙ্গও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, সমাজ-শক্তি পূরা সামর্থ্য পাইতেছে না।

নারীর শোভা শ্রী, হ্রী, এই বচনের দোহাই দিয়া নারীকে অবগুণ্ঠনে মুড়িয়া একটা জড় পুঁটুলি বানাইতে চেষ্টার সচেষ্ট, ইহাতে নারীরও সুবিধা স্বস্তি হয় না, পুরুষেরও ভারটাই কেবল বেশী হয়। লজ্জা শালীনতা শোভনতা—হৃদয় ও প্রাণের বৃত্তি যে কেবল ঘোমটার অন্তরালে, ঘরের কোণেই বাড়িয়া উঠে এ সত্য মানিয়া লওয়া একটু কঠিন। তা ছাড়া পুরুষ যে সকল জিনিষকে কেবল আপনারই একচেটিয়া বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা সত্য সত্যই কতখানি তার একচেটিয়া, কতখানিতে বা নারীরও সমান অধিকার, সমান কর্ত্তব্যই আছে তাহাও বিচার করিবার বিষয়। নারী গৃহে গৃহিণী, শয্যাপ্রান্তে সখী; সেই নারীই আবার জীবনক্ষেত্রে সচিব, জ্ঞানের সাধনায় আর কিছু না হউক অন্ততঃ প্রিয়শিষ্যা হইবার যোগ্য নয়?

ইউরোপে আজ যে নারীর বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতরের কথা হইতেছে নারীর অন্তরাত্মার মুক্তির প্রয়াস। পুরুষের দেওয়া, নিজের বানিয়া লওয়া শতাব্দীর সংস্কার বা অভ্যাসকে নারী আর সনাতন স্বভাব বা ভগবানের বিধান বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছে না। অন্তরাত্মার অনুযায়ী নূতন ক্ষেত্রে নূতন জীবন সে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। অন্তরাত্মার প্রথম মুক্তি-আবেগ তাই দেখা দিয়াছে বিদ্রোহের রূপে, শুধু উপরের চাপের বিরুদ্ধে আক্রোশের ভাবে। নারী তাই চাহিতেছে পুরুষের সকল প্রতিষ্ঠানকে অধিকার করিতে, সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া সর্ব্ববিষয়ে পুরুষেরই মত হইয়া উঠিতে।

ভারতে বাংলা দেশেও নারী-সমাজের অন্তরে এই রকম একটা বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, তাহা কি দেখিতেছি না? শুধু তাহাই নয়, পুরুষেরা নিজেরাই ইহাতে ইন্ধন জোগাইতেছে না কি? নারীকে বাহিরে জীবনের সঙ্গিনীরূপে না পাইয়া পুরুষের মধ্যেও যে অভাব গুমরাইয়া উঠিতেছে তাহার পরিচয় আজকালকার সাহিত্যে--গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে—অজানিত অতর্কিতভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছে। পুরুষের সে অভাব—সে অস্বস্তিবোধ জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়াও নারীকে গিয়া আঘাত করিতেছে। পুরুষের সে অভাব আজকাল বিবাহের বাজারে মেয়ের পিতামাতা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন।

মেয়েদের এই নবীন শিক্ষা দীক্ষা অনেকটা যে পুরুষেরই অনুকরণে হইবে, তাহা গোড়ায় খুবই স্বাভাবিক,—কারণ সজীব শিক্ষা দীক্ষার আদর্শ মেয়েরা কি মেয়ের পিতামাতারা আর কোথাও পাইতেছেন না। ইংরাজ এ দেশে আসিলে আমরা ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় যে রকম মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, এও সেই রকম—পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা দেখিয়া মেয়েরাও তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার বিশেষ কিছু নাই, ইহা আশারই কথা। এখন যেমন ইংরাজী বুলি কপ্‌চাইয়া আর আমরা তেমন গৌরব অনুভব করি না, সেটাকে প্রাণের ভাষা বলিয়া আর মনে হয় না, এখন স্বদেশের ভাষায় নিজের প্রাণের কথার খোঁজ করিতে ফিরিয়া চলিয়াছি, সেই রকম নারীও পুরুষের মুখোস্ পরিয়া চলিতে পারিবে না, নিজের অন্তরাত্মার প্রয়োজনেই তাহার শরীর তাহার আয়তন গড়িয়া লইবে।

কিন্তু সকলের আগের কথা হইতেছে নিজেকে মানুষ ভাবা, নিজের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া। আগে নর কি নারী নয়, আগে হইতেছে মানুষ। নারী অন্তরাত্মার পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে যাইয়া যদি আপাততঃ খানিকটা পুরুষের মত হইয়া উঠে, তাহা নিরসন করিবার দরকার নাই। ভুল করিবার যার পথ অধিকার আছে, সেই ত সত্যকে পাইবারও পথ অধিকার পায়। আর সকল ক্ষেত্রে এ সত্যটি খাটিলে, নারীর পক্ষে এ কথা খাটিবে না কেন? নারী তাহার

ভিতরের মানুষকে মুক্তি দিক আগে, পরে বুঝিয়া স্থির করিয়া লইবার সময় আসিবে সে নারী। প্রকৃত মনুষ্যত্বকে পাইলে প্রকৃত নারীত্ব আপনা হইতেই তাহার মধ্যে বিকশিত সজ্জিত হইয়া উঠিবে।

ঘরে ও বাহিরের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে যে প্রাচীন পুরাতন প্রাচীর, তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ফাটল ধরিয়াছে, জোড়া তালি দিয়া মেরামত করিলেও তাহা থাকিবে কি না সন্দেহ। সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে—খোলা ক্ষেত্রে স্বভাব-নিয়ত কর্ম্মই পুরুষের ও নারীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, ঘর বাহির যদি দরকার হয় তবে তাহার পদ্ধতিটা সেই স্বভাব আপনা হইতেই ক্রমে ফুটাইয়া তুলিবে। পুরুষের রাজসিক অহঙ্কার নয়, নারীর তামসিক আনুগত্যও নয়—পুরুষ নারীর সম্বন্ধ উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দিবে উভয়ের ভাগবত প্রেরণা, উভয়ের মধ্যে সাধারণ মানবপ্রকৃতির যে বিভিন্ন অথচ সামঞ্জস্য-বিধৃত গতি।

আগে চাই পূর্ণমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য, আত্মসংস্থা—Self-determination, তবেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে হইবে প্রকৃত ঐক্য, সামঞ্জস্য। তা না হইলে এক জন আর একজনের সত্তায় আত্মবলি দিবে মাত্র, উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইবে ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃসম্বন্ধঃ! নারীকে আগে গালাগালি দিতে হইলে বলা হইত স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসিনী অথবা স্বৈরিণী, ইহাতেই বুঝিতে পারি নারীর উপর পুরুষের কি ভাব, নারীর নিকট পুরুষে কি চায়? কিন্তু আজকালকার যুগে এ ভাব কতদূর চলিবে, তাহা চক্ষু একেবারে বুজিয়া না আছেন যাঁহারা, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

নারায়ণ—ভাদ্র ১৩২৭।

অনাসৃষ্টি

(চিত্র)

শীতকালের ভোর,—তখনো পূর্ব্ব দিক ভাল করে ফরসা হয় নি; চারিদিক ভোরের কুয়াসায় আর দরিদ্র-পল্লীর ঘুঁটের ধোঁয়ায় ভরে রয়েছে। গলি রাস্তায় ময়লা-ফেলা গাড়ীর ক্যাঁচ-ক্যাঁচানি শব্দ, আর দু-একটা ধাঙড় ছেলেমেয়ের তর্ক-বিতর্ক ছাড়া আর কোন কোলাহল তখনো জাগে নি। ময়না ওরফে ঊষারাণী ঘুম ভাঙ্গতেই তাড়াতাড়ি গায়ের লেপটা ছুড়ে ফেলে বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো।

বাইরে এসে সে দেখে, কি সুন্দর দিন! সূর্য্যের প্রথম উদয়ের রাঙা আলোয় তার দুই চোখ যেন জুড়িয়ে গেল! এমন ভোরে কিছু সব দিন তার ঘুম ভাঙ্গে না, ভোরের এমন সৌন্দর্য্য দেখাও তাই তার ভাগ্যে কোন দিন ঘটে না; সেদিন তার অন্তরের নিগূঢ় আনন্দের তুফান তার সারা মনটিতে যে মিঠে দোল দিচ্ছিল, সেই দোলাতেই রঙিন চোখে সে চেয়ে দেখ্‌লে, বিশ্ব-সংসারে আনন্দে আর ফাঁক কোথাও নেই।

তার আনন্দোজ্জ্বল মুখের উপর আলোর ঝলক ঢেলে সূর্য্যোদয় হল। পাশের ঘর থেকে তার বড়-জা বেরিয়ে এসে তাকে দেখে হেসে বললে, "হ্যাঁ ভাই ময়না, আজ কি বার রে!" ময়নার তো কান অবধি লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লো। তার মনের গোপন বার্ত্তা

আর কারো অগোচর নেই! সে আঁচলটা তুলে মুখে চেপে বল্‌লে, "আমি জানিনে তো!"

আদর করে তার মুখখানি নেড়ে দিয়ে জা বললে, "না, তুমি তো জানো না কিছুই, অতদিন ডাকাডাকি করলেও ঘুম ভাঙ্গে না, বড় শীত করে, আর আজ বুঝি বার-মাহাত্ম্যে শীত-টিত সব ঘুচে গেছে!"

ময়না নিতান্ত উদাস অজ্ঞতার ভাণ করে বল্‌লে, "ওঃ, আজ বুঝি শনিবার? তা হবে।"

কিন্তু সে আজ এক সপ্তাহ ধরে এই শনিবারটিরই প্রতীক্ষা করে আছে! বড়-জা হেসে বল্‌লে, "তা হলে তুই ঐ দেওয়ালের গায়ে যে ক্যালেণ্ডারখানা আছে, সেখানা ভাল করে দেখে নে, আমি স্নান করে আসি।"

ময়না ব্যস্ত হয়ে বললে, "না ভাই বড়দি, আমিই আগে নেয়ে আসি—তুমি পরে নেয়ো।"

সকৌতুকে বড়বৌ বললে, "কেন, শীত করবে না আজ? এত সকালে নাইবার চাড় হল যে?"

রুচি মুখখানি যথাসাধ্য গম্ভীর করবার চেষ্টা করে ময়না বললে, "কেন আবার! বেশ তো, তবে যাও, তুমিই নেয়ে নাও গো, আমি নাইবো না। কিন্তু কাজের দেরী হলে তখন আমাকে দোষ দিতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।" বড়-জা চলে যেতে যেতে হাসি-মুখে বললে, "আহা, তাই তো! আজ তো আর ভাবনা নেই যে চিঠি ডাক পাবে না!" এবারে একটু রাগ দেখিয়ে সে বললে, "আচ্ছা, যাও।" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ তার মুখ ভরে হাসি এসে পড়ে সব রাগটুকু মাটী করে দিলে, সে ফিক্ করে হেসে আঁচল তুলে মুখ ঢাকলে।

স্নানের পর সে দিন তার বেশ-ভূষার পারিপাট্য দেখে বাড়ীশুদ্ধ তরুণী জা-ননদের দল তো তাকে ক্ষেপিয়ে পাগল্ করে তোলবার যোগাড় কর্‌লে। মেজ ননদের ছোট মেয়ে বেলা তার সেই আধ-ময়লা সাদা কাপড়-খানা জলের টবে ফেলে দিয়ে তার মুড়োটা ভিজিয়ে ফেলেছে বলেই যে সে এই নীলাম্বরী-খানা পরতে বাধ্য হয়েছে, এই সহজ কথাটা কেউ তারা বিশ্বাস করতে চায় না! আর চুল—? তা না আঁচড়ালে তো তোমরাই বকো বাপু! বক্‌তে বক্‌তে সে যে কোথায় যায় তা ভেবে পাচ্ছে না, এমন সময়ে শাশুড়ী বড়ির ডালা-টালাগুলো রোদ্দুরে ধরে দেবার জন্য এক-জনকে ডাক্‌লেন। এদের চোখ এড়িয়ে সরে পড়বার এই সুযোগ পেয়ে ময়না বলে উঠলো, "আচ্ছা, মরো তোমরা এই শীতে, আমি ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে বড়ির ডালাটা হাতে করে নিয়ে ছাতে যাই।" বড় বৌ হেঁকে বললে, "আচ্ছা, দেখা যাবে, তুই নাবিস্ কি না?"

ময়নার স্বামী কুমুদ এখনো ছাত্র; হোষ্টেলে থেকেই সে পড়াশোনা করে! কলকাতাতেই বাড়া হলে কি হয়, বাড়ী থেকে বড় বেশী দূর পড়ে, তাই হোটেলেই তাকে থাক্‌তে হয়। না হলে সারাদিন ঠিক সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হতে পরে না! সপ্তাহে দুটি দিন সে বাড়ীতে থাকে—সে এই শনিবারে আর রবিবারে। তা-ও অন্য শনিবারে সে সন্ধ্যা বেলাতেই বাড়ী আস্‌তো—সে দিন কি একটা ছুটি-ছাটা ছিল তাই সকালেই তার আসবার কথ।

কাজেই নির্জ্জন ছাদের উপর আটক থাকাটাও ময়নার পোষাচ্ছিল না। সে শীত-কালের রোদ্দ পোহাতে পোহাতে ছাতের আল্‌সের ধারে ফাঁকে মুখ দিয়ে দেখছিল, কেউ আসচে কি না? তাদের বাড়ীর সামনে সরু গলি-রাস্তাটুকুতে তখন বেশ লোক-চলাচল সুরু হয়েছে, ফেরিওয়ালার রকম-বেরকম চীৎকারও শোনা যাচ্ছিল।

২

ঝী কলতলায় বসে বাসন মাজ্‌ছিল, কুমুদ দুখানা বই হাতে করে নিয়ে বাড়ী ঢুকেই তাকে প্রশ্ন করলে, "মা কোথায় রে?" তার হাতের বই-দুখানা হয়তো নিতান্তই ব্যাগারের বোঝা,—কিন্তু হাতে বই না থাক্‌লে তো আর ছাত্র বলে চেনা যায় না, তাই সে অনধ্যায়ের দিনেও অধ্যয়নের প্রমাণ দিতে ভুলতো না!

ঝী তার কাদা-মাটিমাখা হাতের কনুই দিয়ে মাথার কাপড়টা নামিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "মা উপরকে আছে।" তারপর কি ভেবে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে নাকি সুরে হেঁকে বললে, "অ গো ও গিন্নি-মা ছোট বাবু এ্যায়েছে গো!"

কুমুদ ব্যস্ত হয়ে বললে, "থাক্, থাক্, আমি তো উপরেই যাচ্ছি।" তেতলার ছাদের উপরেও ময়নার কানে গিয়ে ঝীয়ের গলার স্বর পৌঁছুলো, এই সময়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়তে পারলেই বেশ হত, কিন্তু সে হয় কি করে?

এই সকালেই কুমুদের মাথায় ফিট্‌ফাট টেরির বাহার! সেই দুঃসহ শীতের দিনেও গায়ে একটি ফিন্‌ফিনে পাৎলা ফ্যান্‌সী পাঞ্জাবি, তবে শালখানায় অবশ্য মেয়েদের গাড়ীর মত করে আগাগোড়া ঢাকা।

কুমুদ বরাবর দোতলায় উঠে ডাকলে, "মা, ও মা—" মা তখন আহ্নিকে বসেছেন, তিনি তো আর কথা বলতে পারেন না, সুমুখে বড় বৌ। তিনি তাকেই ইসারা করে বললেন, "তুমিই যাও।" বড় বৌ তখন তর-কারির ঝুড়ি নিয়ে কুট্‌নো কুট্‌তে বসেছে; মটরশুঁটির খোসা ছাড়াতে ছাড়াতেই বেরিয়ে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে কুমুদের দিকে চেয়ে বললে, "ওমা! এ-ও যে স্নান-টান সারা দেখ্‌চি! খাওয়া দাওয়াও সারা হয়ে গেছে, বোধ হয়?"

কুমুদ বল্‌লে, "বাঃ, সকাল বেলাতেই স্নানাহার সেরে এসেছি, কি রকম?"

"কৈ, যে-রকম ফিট্‌ফাট দেখচি, তাতে অনাহারী বলে ত মনে হচ্ছে না!"

কুমুদ শালের মধ্যে হাত দুখানা ঢেকে নিয়ে বললে, "তা বৈ কি!" তার পর বললে, "উঃ, কি শীত বৌদি!"

বড় বৌ একটু হেসে বললে, "রোদ্দ পোয়াবে? তা যাও না, ছাতে খুব রোদ্দুর আছে, সেবন কর গে!"

আশে-পাশে যারা ছিল, সবাই মুখ টিপে হাস্‌তে আরম্ভ করলে, অর্থাৎ কুমুদের আর বুঝতে বাকী রইল না যে ছাতে রোদ্দুর বলে কি পদার্থ আছে!

এদিকে ময়না বেচারী কি যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না। উঠোনের দিকে এক সার রেলিং ছিল, তার উপরে ভর দিয়ে নীচের দিকে চেয়েছিল। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, শুধু এক-তলায় স্নানের ঘরে ছাদটুকু। হঠাৎ অতর্কিতে দুখানা সবল পরিচিত হাত তাকে ঘিরে ধরতেই অতর্কি

আনন্দে মুখ ফিরিয়ে সে হেসে ফেল্‌লে! অনেকক্ষণ ধরে রোদের তাত লেগে ময়নার পিঠের কাপড় বেশ গরম হয়ে উঠেছিল,—কুমুদ বললে, "গরম হয়ে গেছ যে!"

মাথা নেড়ে ময়না বল্‌লে, "তা হবো না,—কোন্ সকাল থেকে ছাতে বসে আছি!" তার মাথা-ঝাঁকানির ভঙ্গী দেখে কুমুদ হাস্‌লে, বল্‌লে, "কেন?"

"কি করি, ওদের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ছাখো না আমার পিছনে লেগেছে!"

"অপরাধ!"

"এমনিই। ছাখো না,—আচ্ছা, তুমিই বল দেখ, আমি না কি সাজ-গোজ করেচি?"

কুমুদ এক পলক তার দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লে, "কি জানি! আমি অত বুঝিনে, সাজবার দরকারও তো বিশেষ কিছু নেই, ভগবান্ দয়া করে এমনিই যা দিয়েছেন, তাতে আলায়—"

ময়নার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌লো, সে বল্‌লে, "ঐ নাও, আবার তুমিও ঐ সব সুরু করলে বুঝি?"

নীচের তলায় গিন্নির পুজো সারা হয়েছিল। তিনি আসন ছেড়ে উঠে বললেন, "কৈ, ছোট বৌমা গেল কোথায়?"

বড় বৌ বললে, "সে তো সেই বড়ি দিতে ছাদে গেছে।"

শাশুড়ী বল্‌লেন, "ওমা,—আর নাবে নি? কুমুদ তো জলটল খেলে না, সেও ছাতে গিয়ে উঠেছে বুঝি?"

বড় বৌ একটু হাস্‌লে; শাশুড়ী একটু রুক্ষভাবে বল্‌লেন, "এদের সবই অনাছিষ্টি, যা!"

৩

বিকেলে মায়ের কাছে বসে জল-খাবার খেতে খেতে কুমুদ আস্তে আস্তে কি-সব বলছিল, মাও আগ্রহ করে তাই শুন্‌ছিলেন দেখে বাড়ীর সব তরুণ-দলের চাঞ্চল্য ভয়ানক বেড়ে গেল। কি যে এমন কথা হতে পারে অনেক ভেবে-চিন্তেও কেউ ঠাওর করতে পারলে না! বাড়ীর কর্ত্তা অন্যদিন অফিস থেকে বাড়ী এসে বিকেল বেলাটা প্রায়ই বেড়াতে যান—সেদিন রাত ন'টা অবধি শুধু কুমুদের সঙ্গে গল্প করেই কাটালেন—এও একটা কম আশ্চর্য্যির কথা নয় তো! কেন না কুমুদ ইচ্ছে-সাধ্যে তো তার বাবার ত্রিসীমা মাড়াতে চাইত না, বরং প্রাণপণে সেদিকটা এড়িয়েই চল্‌তো। অফিসের ছোট-খাট কেরাণীরা তাদের সাহেবকে যত না ভয় করে, কুমুদ তার বাবাকে তার চেয়ে বেশী ভয় করতো, তার আসা-যাওয়াটা তো বেশীর ভাগ তার বাবা টেরই পেতেন না। এমন যে কুমুদ,—তার হঠাৎ বাবার সঙ্গে অত ভাব হয়ে যাবার কারণ কি, কেউ তা বুঝে উঠতে পারলে না! ময়না কোন রকমে কিছু না বুঝে বড়বৌকে গিয়ে বললে, "ব্যাপার কি ভাই বড়দি? কিছু শুন্‌লে?"

বড় বৌ হাসি চেপে বললে, "শুন্‌লুম বৈ কি, তা কি করবি, বল্? দুটো বিয়ে তো কত লোকই করে, তাতে আর কি হয়েচে এমন?"

একেবারে অবাক্ হয়ে ময়না বললে, "তুমি কি বল্‌চো তার ঠিক নেই—যাও!"

বড় বৌ তার শুক্‌নো মুখের ভাব দেখে বললে, "আমি কি আর সাধ করে

বল্‌চি! কোন্ এক বড় লোকের ডাগর সুন্দরী মেয়ে দেখে পছন্দ করে ঠাকুরপো বাবার কাছে বিয়ের কথা পেড়েছে যে! হয় না হয়, তুই জিজ্ঞেস করে দেখিস্!"

কথাটা একেবারে অবিশ্বাস করেও সেদিন কুমুদের বাড়াবাড়ি রকম আদর পেয়ে ময়নার মনটা খুবই দমে গেল। তার এই সব ছোট-খাট দুষ্টুমি, খুন্‌সুটি ভালো রকম জমে না উঠতেই কুমুদ আদর দিয়ে থামিয়ে দেবে, এটা সে একেবারে পছন্দ করতো না।

দিন সাতেক পরেই জানাজানি হয়ে গেল যে কুমুদ বিলেত যাচ্ছে। আগে জানা-জানি হলে যদি যাত্রাটায় বাধা পড়ে, তাই ব্যাপারটা নিয়ে এত কানাঘুষো চল্‌ছিল। যাবার স্ফূর্ত্তিতে, আর পাঁচ জায়গায় সমাদরে নেমন্তন্নের ধুমে কুমুদের বুকখানা উৎসাহে ফুলে উঠ্‌ছিল। সে তার স্ফূর্ত্তির ভাগ দিয়ে ময়নাকেও খুসী করতে চাইছিল, কিন্তু বেচারী ময়না যে কিছুতেই সে ভাগ নিতে পারছিল না! যদিও সে সাফ বলতে পারছিল না যে ওগো তুমি যেয়ো না,—কেন না তার মত ছেলেমানুষ ছেলের মা হলেও কাজের কথায় কথা কইবার মত দাম তো তার হয় নি! সে কেবল মধ্যে মধ্যে বলতো, "তা বেশ তো, তুমি যাও না, আমি মরে যাবো'খন। তুমি তখন আবার খুব সুন্দর দেখে মেম বউ নিয়ে এস।"

কুমুদ শুনে হাসত।

যাবার দিন কাছে এসে পড়লো, গোছ-গাছের তাড়ায় কুমুদ ময়নার দিকে ভাল করে চাইবারও অবকাশ পেত না,—তা পেলে হয়তো ময়নার মুখের চেহারা দেখে সে শিউরে উঠ্‌ত!

কুমুদের সাধের ফটো-ক্যামেরা প্রায় মাস কতক ধরে একটা শেল্‌ফের উপর তোলাই ছিল, অনেক দিনকার অব্যবহারে তাতে সাত-পুরু ধূলোমাটি জমে রংয়ের পালিশ-টালিশ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অনেক-দিন মানুষের হাত না পড়ায় মাকড়সা তাতে জালে বেশ দখল করে নিয়েছিল, হঠাৎ অসময়ে সেইটে পেড়ে নিয়ে কুমুদ পরিষ্কার করছিল!

চুল বাঁধা শেষ করে তার সাজ-সরঞ্জাম চিরুণী, সিঁদুর-কৌটো এই সব নিয়ে ঘরে রাখতে এসে ময়না থম্‌কে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি হবে গা ওটা?"

এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ক্যামেরা সাফ করতে করতে কুমুদ বললে, "এটার কাজ আছে—একজন সুন্দরীর তস্‌বীর তুলে নিতে হবে।"

ময়না বল্‌লে, "তা ভালো। সেখানে সুন্দরী রূপসীর তো আর অভাব হবে না।"

কুমুদ ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে বল্‌লে, "না, এইবার থেকে তিনি বুকে-বুকে থাক্‌বেন।"

ময়না উদাসভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "তা থাকুন্‌গে যান!" তারপর একটু থেমে অলক্ষ্যে গলাটা সাফ করে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সে বললে, "আচ্ছা বিলেতে ক'বচ্ছর থাকতে হয় গা?"

এর উত্তর হয় তো তার একশো বার শোনা হয়ে গেছে, তবু সে কেবলি যেন শুনে যাচ্ছিল! কুমুদ স্নেহ-কোমল গলায় বল্‌লে,

"ক বছর! বেশী দিনতো নয়, দু'তিন বছর মোটে!"

"তিন বছর! সে বড় কম দিন হল, বুঝি? তাহলে তুমি না হয় ছ'বছরই করো।"

বেশ নরম হয়ে কুমুদ বললে, "তা এ আর একটা দিন গো!"

"এক হাজার আশী দিন! বড্ড অল্প দিনই হল, নয়?"

একটু বিস্মিতভাবে কুমুদ বল্‌লে, "দিন, ছবার সব গোণা-গাঁথা হয়ে গেছে দেখ্‌চি যে!"

চোখের জলে-ভেজা ভারী গলায় "হুঁ" বলে ময়না মুখ ফিরিয়ে পশ্চিম দিক্‌কার ফাগ-মাখা মেঘের ঢেউয়ের মাঝে ঝল্‌মলে সূর্য্যের অস্ত যাওয়া দেখতে লাগলো। তার টুক্‌টুকে মুখখানিতে রাঙা আলো লেগে সেখানিকে আরও রাঙিয়ে তুলেছিল।

৪

দু'মাসের উপর হল কুমুদ চলে গেছে। বিলেতে পৌছেই টেলিগ্রাম করে পৌছন-খবর দিতে সে অবশ্য ত্রুটি করে নি; চিঠি-পত্রও রীতিমত আসছিল! সে দিনটাও ছিল বিলেতের ডাক আসবার দিন! কিন্তু সেদিন চিঠির জবাব না পেয়ে ময়নার শুধু যে ভাবনাই হয়েছিল তা নয়, অভিমানও হয়েছিল অনেক-খানি। সে যে নতুন জিনিষটি পেয়েছে, তার আসার খবর পেয়েও তিনি উত্তর দিতে পারলেন না! মেয়ে বলেই কি তিনি অগ্রাহ্য করলেন? ছোট্ট বিছানায় শুয়ে যেখানে তার সজীব পুতুলটি হাত-পা নেড়ে খেলা করছিল, সেইখানে উঠে গিয়ে ময়না তার কচি গালে একটি চুমু খেয়ে নিলে!

পরের ডাকে কুমুদের চিঠি এল। তখন ময়না তার ছোট বোনের বিয়েয় বাপের বাড়ী এসেছে। বিয়ের গোলমালে, নানা কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে কারো নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই, ময়নার এক ভগ্নীপতি চিঠিখানা হাতে করে এনে বললেন, "কোথায় গো উষা! তোমার সুমুদ্দুর-পারের সন্দেশ এসেচে, ইলার বাবার পাঠানো, নাও।"

ইলার বাবা! কথাটা শুন্‌তে নূতন হলেও ময়নার কাণে বেশ মিষ্টি লাগলো; আগ্রহে আনন্দে সে চিঠি খুলে দেখলে, কুমুদ অনেক কথাই লিখেছে। গেল বারে একটি বাঙালী ছাত্রের অসুখের পরিচর্য্যায় ছিল, তাই সে-ডাকে সে চিঠি দিতে পারেনি,তাও লিখেছে, আর এই সব কথার ফাঁকে-ফাঁকে সে যে তার বুক-পকেটের ছবিখানি এক মিনিটের জন্যও হারায়নি, বরং দিন্‌কের-দিন সেখানির মধুরতা বেশী হয়ে উঠছে, এ খবরটিও দিতে ভোলেনি! কিন্তু নেই একটিও কথা খুকুর সম্বন্ধে! নিজের আদর অত-বেশী তার ভাল লাগলো না! তার ভারী দুঃখ হল, দেখলেন না বলে বুঝি তিনি খুকীর খবরটিও নেবেন না?

বোনের বিয়ের আমোদ-আহ্লাদে দিন-কতক কাটিয়ে সে যখন শ্বশুরবাড়ী এল, তখন তার খুকু বেশ হাস্‌তে শিখেছে, তার জা এবার তার বদলে তার ইলাকেই বুকে করে চুমু খেলেন। ময়না মনে মনে খুসি হলেও মুখে বল্‌লে, "আমি বুঝি আর কেউ নই?"

বড় বৌ ময়নার মুখের দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসলে!

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বাড়ীর

সবাই প্রায় ঘুমিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিল। প্রথম রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে,—রোদের ঝাঁঝ এড়াবার জন্যে জানলা বন্ধ করে ঘরের শানের মেঝেটি গামছায় মুছে ঠাণ্ডা করে নিয়ে তারি উপর শুয়ে ময়নার সঙ্গে গল্প করতে করতে বড়বৌও ঘুমিয়ে পড়ল! কিন্তু ময়নার চোখে ঘুম এল না। চোখ বুজে আর কতখানি সময় ফাঁকি দিয়ে কাটানো যায়? সে মনে মনে হিসেব করতে বসলো। তিন বছর পুরতে আর কত দেরী আছে? আর কতদিনে তিনি আস্‌বেন?

হিসেবটা তার পূর্ণ হতে না হতে দোলনা থেকে ইলা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। মাকে আর ভাববার চিন্তবার সময় মোটেই দেবে না, এই যেন তার কচি মেয়ের মতলবখানা!

ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল! অফিস-ফেরত কর্ত্তার তীব্র গলার স্বরে ময়না একেবারে আকাট হয়ে থেমে পড়লো, একটা অজানা ভয়ে বুকের মধ্যকার ধ্বক্-ধকানিটা বেশী রকম বেড়ে গিয়ে তার দু'চোখের সামনে সব যেন শরষে ফুলে ছেয়ে দিলে। একটু পরেই খবর এল, বিলেতের ডাক এসেছে, কুমুদের ফেলের খবর নিয়ে।

খবর শুনে ময়না তাড়াতাড়ি গিয়ে ইলাকে বুকে চেপে ধরলে। ফেল! তবু ভালো!

কর্ত্তা তো তখনকার মত খুবই রেগে গিয়ে ছিলেন। এক রাশ টাকার শ্রাদ্ধ করে ছোঁড়াটা যে তাঁর বাঁদর হয়েই ফিরবে, তখনকার মত এতে আর তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না। কুমুদ গিয়েছিল সিভিল্ সার্ভিস্ দিতে কিন্তু তা আর হবার উপায় রইল না। সে লিখেছে যে ইঞ্জিনিয়ার হবার চেষ্টায় আছে;—শুনে তার বাবা হতাশ হয়ে বল্‌লেন, "আর তার মাথা হবে!"

কুমুদের এক ভাগ্নে একবার ফিপ্‌থ্ ক্লাসে ফেল করে প্রোমোশন না পাওয়ায় মহা দুঃখে কান্নাকাটি জুড়ে বাড়ী-শুদ্ধ লোকের হাড় জ্বালাতন করে তুলেছিল, সেই সময় কুমুদ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, "Try again." কথাটা সময়গুণে সে ছেলেটির খুবই ভালো লেগেছিল। সে বুঝেছিল যে তার ছোট মামা তবু একটু সহানুভূতি দেখালেন তো! সেই ভাগ্নে যখন ময়নাকে একটু গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বার হতে দেখ্‌লে, তখন খুব উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌লে, "তার আর কি ছোট মামী, তুমি লিখে দাও না, আর একবার চেষ্টা করলেই ও হয়ে যাবে!"

ময়না একটু হেসে বল্‌লে, "না বাবা, তাঁর আর কিছু হবে না!" কিন্তু ছেলেটি তখন বেশ করে মাথা ঘামিয়েও ঠিক করতে পারলে না যে আর-একবার পড়লে না হবে কেন? বিশেষ ফিপ্‌থ্-ক্লাসেও যখন হয়!

৫

ইলা এখন সাত বছরের মেয়ে। লেখা পড়া নিয়ে, গান নিয়ে, অনর্থক আব্‌দার জুড়ে দিয়ে, তার মায়ের অর্দ্ধেক সময় সে দখল করে থাকে।

কুমুদ ফিরে আস্‌ছে ব্যারিষ্টার হয়ে। তার যে করে খাবার পথ একটাও করে নিতে পেরেছে সে, তাতে তার বাবা খুসীই হলেন, অবশ্য! তাঁর আগ্রহ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল।

বাড়ী থেকে কুমুদের দাদা আর বাবা তাকে আন্‌তে হাওড়া ষ্টেশনে যাবার সময়

ইলার ফুর্ত্তি দেখে কে! সে তার পুসিটার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে শুনিয়ে দিলে যে তার বাবা আসছেন! কিন্তু যেই তার দাদামশায় যাবার সময় তাকে ডাকলেন, "চল্‌রে ইষ্টিসন থেকে বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে আনিগে—" অমনি তার সমস্ত আগ্রহ নিভে গেল, অজানা অচেনা বাবার সঙ্গে দেখা করবার উৎসাহ না দেখিয়ে সে গিয়ে তার মায়ের পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালো! ময়না তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা দর্শনীয় বস্তু করে তোলবার প্রকাণ্ড চেষ্টা করতে বসলো। বড় বৌ হেসে বল্‌লে, "ওকে সাহেবি পছন্দয় সাজাস্‌রে ময়না, নাহলে বাপ মেয়েকে চিনতে পারবে না!"

ময়না চুপ করে শুন্‌লে, কিছু বল্‌লে না। মুক্তি তার বুকে মুক্তার সৃজন করে, সেই মুক্তাকে ঔজ্জ্বল্য দিতে গিয়ে যে নিজেকে সফল সারাংশ থেকে বঞ্চিত করে, করেই সে সুখী হয়, হয়তো মাও তেমনি নিজেকে নিঃশেষ করে সন্তানকে দিয়ে দেন। ময়নাও ভাবছিল, কেমন করে সাজালে তার মেয়েকে তার চেয়েও ঢের বেশী সুন্দর দেখাবে, কুমুদ দেখলেই বুঝবে, এমন জিনিষটি আর কারো নেই!

ক্রমে যখন বিরক্ত কুকুরের মত ভ্যাক্ ভ্যাক্ করে হর্ণ বাজাতে বাজাতে গলির লোক সরিয়ে ট্যাক্সি মোটর বাড়ীর দুয়োরে এসে থামলো, আর তা থেকে পুরাদস্তুর সাহেব সেজে কুমুদ তার বাপ-দাদার সঙ্গে নেমে বাড়ী ঢুকলো, তখন ইলা একেবারে ময়নার গোপন উল্লাসে, অদমনীয় চাঞ্চল্যে বুকের মধ্যেকার হৃদয় যন্ত্রটা যেখানে লাফালাফি জুড়ে দিয়েছিল, ঠিক সেইখানে মুখ লুকিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লে, "মা, সাহেব!"

বুকের অশ্রান্ত দাপাদাপিতে ময়না যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। মাথা হেঁট করে ইলাকে একটা চুমু খেতে গিয়ে সে মুখ তুলে নিলে,—চুমু খাওয়া হল না। ইলার মুখে পাউডার দিয়ে ইলাকে সাজিয়েছে সে,—চুমু খেতে গেলে সেটুকু উঠে যায় যে!

মশ্ মশ্ করে জুতোয় কঠোর শব্দ তুলে কুমুদ সহাস্য মুখে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল, সাহেবী হ্যাট্‌টা বাবার পায়ে প্রথম প্রণাম করবার সময়েই খুলে রেখেছিল, সেটা আর তখন মাথায় ছিল না; সাহেবি পোষাকের বোঝা খুলতেই সে ঘরে ঢুকেছিল, এ বাড়ীতে সে-ই প্রথম বিলাত-ফেরত সভ্য, এর আগে কেউ তা ছিলেন না, কাজেই "ড্রেসিং রুম" বলে একটা আলাদা জায়গা এ বাড়ীতে ছিল না, ওটা শয়ন 'রুমে'ই চলতো!

কুমুদ থম্‌কে দাঁড়ালো! খপ্ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও কথাও বল্‌তে পারলে না, সে যেন কত নতুন! কুমুদ অবাক হয়ে দেখ্‌লে, তার চোদ্দ বছরের চঞ্চলা ময়নাটির বদলে একজন পরিপূর্ণা নারী তার সন্তানকে বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে, এ তো সেই মুখ-ভরা চাপা হাসির জলুস্ নিয়ে কৈ কাছে ছুটে এল না? বুক-ভরা কতখানি আবেগ কি নিঃশব্দে যে সে চেপে যাচ্ছে তা তার করুণ চোখের স্নিগ্ধ সজল দৃষ্টিতেই ধরা যায়। এক মিনিটেই কুমুদ বুঝে নিলে তার সে-ময়নাকে সে কাল-সাগরে হারিয়ে ফেলেছে;—এবার এই নূতনকে নিয়ে ঘর করতে হবে।

মেয়ের দিকে নজর না করে কুমুদ ময়নার দিকেই এগিয়ে এল। ময়না ব্যস্ত হয়ে মেয়েকে ঠেলে দিয়ে বললে, "প্রণাম করো ইলা, প্রণাম করতে হয়!"

তাদের দুজনের মাঝখানেই এত বড় যে একটি জীব গড়ে উঠেছে, এতখানি খেয়াল কিন্তু কুমুদের হয়নি। পোষাকের বোঝা ছেড়ে ছুড়ে সাত বছর পরে সাদা ধুতি পরে সে যখন ঘর থেকে বার হল, তখন তার বৌদিদি আসন পেতে খাবার দিয়ে তাকে ডাকলে, সে খেতে বস্‌ল। বৌদি হেঁকে বললে,—

"ইলা মা, একবার এদিকে আয় তো।"

ইলা ঘর থেকেই একটু খানি মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলে, তারপর খুব আস্তে আস্তে অনেকখানি ঘুরে জেঠাই-মার পিঠের দিকে গিয়ে দাঁড়ালো; বড় বৌ হেসে বললে, "এটিকে চিন্‌তে পারো ঠাকুরপো? বল দেখি এ কে?" কুমুদ মাথা নেড়ে একটু হাস্‌লে, আড়াল থেকে তার সে হাসি দেখে ময়নার চোখে যেন অমাবস্যার পর চন্দ্রোদয় হল। বড় বৌ বাঁ হাত দিয়ে ইলাকে জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে, "ইনি আমাদের ব্যারিষ্টার সাহেবের মেয়ে, মিস্ ইলা—"

কুমুদ অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে যেন নূতন চোখে চারদিক চেয়ে-চেয়ে দেখছিল, সে বৌদিদির কথায় অত কাণ করেনি, মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, "কি হল নামটা? ইলা, না?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তা নইলে ব্যারিষ্টার সাহেবের মেয়ের নাম কি আর নারান-দাসী হলে মানায়? না মাতঙ্গিনী হলে মানায়?"

দিন কয়েকের মধ্যেই মেয়ের সঙ্গে কুমুদের বেশ ভাব হয়ে গেল। পথে-ঘাটে অবধি চেনা লোকে দেখ্‌তো যে ঘষা ফুলো চুলে রিবন-বাঁধা, ফ্রক পরা ফুট্‌ফুটে সুন্দর একটি মেয়ে কুমুদের বাঁ হাতের আঙুল ধরে দিব্যি হাস্‌তে হাস্‌তে পথে চলেছে।

তবে ময়নাকে আগের মত সুলভভাবে পাওয়া আর তার হয়ে উঠ্‌লো না। মাঝের সাতটা বছর তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে সে মা হয়েছে, সংসারী হয়েছে। তখন আর এখন—দু'য়ে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। এখন যেন আর কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টা চিম্‌টি কাটা, খোঁপা খুলে দেওয়া কিছুতেই চলে না—সে উৎসাহ তার আর নেই!

৬

ব্যারিষ্টার কুমুদ মজুমদারের গোষ্ঠীর কোনো মেয়ের তেরো পেরিয়ে বিয়ে হয় নি, কথা সে পাড়ার সকলেই জান্‌তো, আর এমন কথা কখনো কারো মনেও হয় নি যে এমন কাজ কেউ করতে পারে যাতে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়, তাও আবার সখ করে।

ব্যারিষ্টার সাহেবের মেয়ের কিন্তু চৌদ্দও উৎরে চল্‌লো। কিন্তু তার আর বিয়ের নাম-গন্ধও শোনা গেল না। ঐ একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে, তারপর সারাদিনকার পরিশ্রান্ত দেহখানি টেনে বাড়ী এসে কার মুখ দেখে জুড়োবে—ভাবতে বস্‌লেই বাড়ীর একটি মাত্র ঐ ফুটন্ত হাসির ফুলটির নির্ব্বাসন চিন্তায় সমস্ত মন বিষয়ে উঠতো।

আশ-পাশের পাড়া-পড়শীর কথার খোঁচা পাঁচবার খেয়ে ময়না এক-আধ বার মেয়ের বিয়ের কথা তুল্‌তো, কিন্তু তার কথার উত্তরে কুমুদ এম্‌নি এক-একটি গুণধর পাত্রের নাম

করতো যে তার আর কথা কইবার যো থাক্‌তো না। মাগো! এমন সব পাত্তরের হাতে কি আর তার ইলাকে দেওয়া চলে? তার চেয়ে বেশ আছে সে।

সেদিন সন্ধ্যে উৎরে যাবার পর কুমুদ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "এইবারে ইলা-মাকে বিদেয় করবার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সেটা আমার নেহাৎ খারাপও মনে হচ্ছে না।" ময়না স্বামীর মুখ-পানে চেয়ে বললে, "কোথা থেকে?"

কুমুদ তখন চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসে সব কথা ভেঙ্গে চুরে বল্‌লে, পাত্রটি নিতান্ত গরীব, তাকে খরচ চুকিয়ে মানুষ করে নিতে হবে, দেখ্‌তে ছেলেটি খুব সুন্দর, বেশ বুদ্ধিমান, নাম অরুণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ময়না এ সব খবরও শুনে নিলে, এর পর আর তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতের কোন অমিল রইল না।

মাস দুই পরে বোশেখ মাসের মাঝামাঝি একদিন কুমুদ তার আদরের ইলাকে পরের হাতে সম্প্রদান করে দিলে। বিয়ে কন্যা দান করবার সময় মেয়ের বাপের বুকে যে বাষ্প ভরে উঠেছিল, তরুণ অরুণের হর্ষোৎফুল্ল মুখে ঠিক সেই পরিমাণেই আলোর দীপ্তি জেগেছিল। আর সেই আলোতেই দরিদ্র অরুণ ইলাকে অভিনন্দন করে নিলে। মনের সম্পত্তি ছাড়া বাইরে কাণা কড়ির সংস্থানও তার ছিল না যে!

বিয়ের পর অরুণের সমস্ত ভার পড়লো কুমুদের মাথায়। সে—নিজের জন্যে এককালে যে ব্যবস্থা ছিল—জামাইয়ের জন্যেও তাই করে দিলে, অর্থাৎ হোষ্টেলে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ছুটি-টুটি পেলে শ্বশুর বাড়ী আসা,—অবশ্য কুমুদের ওখানে ছিল নিজের বাড়ী আসা! ব্যবস্থাটা করবার সময় কুমুদের নিজের কথাটা ঠিক মনে পড়েনি—কিন্তু চৌদ্দ বছর আগেকার কত কথা ময়নার সেদিন কেবলই মনে পড়ছিল।

৭

চৌদ্দ বছর পরে যে শীত-কালটি বছর বছরকার সেই হাড়-গোড় বের করা জরাগ্রস্ত পঙ্গু চেহারা নিয়ে কাশের সাদা চামর দুলিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে এসে দেখা দিলে, তার চেহারা আসলে হয়তো এখনো যেমন, চৌদ্দ বছর আগেও ঠিক তেমনিটিই ছিল, তবে মানুষের যেমন বাঁধা গৎ আছে তেমনি সে বছরও সবাই বলছিল যে, এমন ভয়ানক শীত আর কখনো পড়েনি, এই প্রথম পড়ছে! ইলাও তার চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতায় রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে শোবার সময় ময়নাকে বলছিল, "এমন শীত আর কক্ষণো পড়ে নি, না মা?"

ময়নাও উত্তর দিয়েছিল যে হ্যাঁ, এবার শীতটা বড্ড বেশী পড়েছে! কিন্তু রাত পোহাতে ঘুম ভেঙ্গেই সে দেখ্‌লে, ইলার খাটের বিছানা একেবারে খালি—সে কখন্ উঠে গিয়েছে! ছোট্টটি থেকে এমন দিন খুব কমই হয়েছে যে মা ডাকাডাকি না করতেই তার ঘুম ভেঙ্গেছে, তা ছাড়া তার জলচোরা মেয়েটি শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মাথার খোঁপা কাঁধে এসে ঢলে পড়লেও স্নানের নামেই আলগোচ। হাত পা আর মুখটুকু সাবান ঘসে ধুয়ে ফেলতে পারলেই যে

একটা যুদ্ধ জয় করার গর্ব্বে নিজেকে মস্ত সাহসী মনে করে, সাত সকালেই তার গা-টা ধোওয়া সারা হয়ে গেছে! ছাতের আল্‌সেয় তার ভিজে চৌখুপী ডুরে সাড়ীখানি আর সেমিজটি শুকুতে দেওয়া ঝুলছিল! কেবল ইলাই কোথায় লুকিয়ে পড়েছে, তার খোঁজ নেই! অবশ্য ময়নার বুঝতে দেরী হল না যে মেয়ে তার বাগানে গিয়েই বসে পড়েছে হয়তো!

বাস্তবিকই ইলা তখন তাদের বাড়ীর পশ্চিম দিক্‌কার বাগানে বেঞ্চের উপর বসে কতকগুলো ফুল তুলে তোড়া বাঁধ্‌ছিল, এমন সময় পিছন দিককার ফটক দিয়ে অরুণ এসে ঢুকে পড়লো,—ইলা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মাগো! লিখ্‌লে কিনা পাঁচটায় আস্‌বে,—এই বুঝি তোমার পাঁচটায় আসা!"

অরুণ বললে, "আস্‌তুম, তা তোমার ঘুম তো জানি! অত ভোরে যে ভাঙ্গবে না! তা বুঝতে পেরেই দেরী করলুম।"

"ইস্, তা বই কি! আমি আজ কখন্ থেকে এসে বসে আছি, জানো মশাই?... তা অসময়ে এলে যে! আজ কি কলেজ বন্ধ না কি?"

"না গো, কলেজ অত সদয় নয়, আমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে কলেজ করবো, তুমি বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে খবর দিয়ে রাখনি তো!"

"না, তুমি গিয়ে কলেজ করবে! পারবে তো?"

"খুব পারবো—" বলে অরুণ পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে, "এই হল সাতটা,—সাড়ে আটটায় বেরুলেই চল্‌বে।"

ইলা অরুণের পানে একটু চেয়ে থেকে বল্‌লে, "তুমি এসেছ, তা কি কাউকে বলবো না?"

অরুণ ইলার পিঠে হাত চাপড়ে বল্‌লে, "না, লক্ষ্মীটি!"

"কিন্তু সাড়ে সাতটায় চা খাবার সময়, বাবা আমাকে খুঁজবেন যে!"

অরুণ বল্‌লে, "তা তিনি খুজ্‌তে খুঁজ্‌তেই আমি চম্পট দিতে পারবো—আমার সাইকেল আছে!"

সকাল বেলা চা জল-খাবারের সময় প্রায়ই কুমুদের কাছে ইলা উপস্থিত থাক্‌তো, ময়না এ সময়টা সংসারের অন্য কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকতো, সে এদিকে আস্‌তে পারতো না, এলেও বসতে পারতো না—তাই ইলার সঙ্গেই একটু গল্প করে চা খেয়ে কুমুদ বাইরে চলে যেত। সেদিন ইলাকে সামনে না দেখে কুমুদ বল্‌লে, "হ্যাঁ গা, আজ ইলা গেল কোথায়?"

ময়না সেইখানেই ছিল, সে বললে, "কেন তাকে?"

"না, এমনিই বলচি।"

ময়না স্বামীর খুব কাছে সরে এসে ইলার তিরোধানের কারণটি জানিয়ে দিতে দিতে নিজেদের এই বয়সের সেই মিষ্টি স্মৃতি মনে করে হাস্‌লে, কিন্তু কুমুদ যখন আর এক পাক ঘুরে এসে শুনলে, ইলা বাগানে,—তখন সে ভ্রূটা ঈষৎ কুঁচ্‌কে বহুদিন আগেকার তার মা-বাপের কথারই যেন প্রতিধ্বনি করে আপন-মনে বলে উঠল, "এদের এ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড!"

শ্রীনীহারবালা দেবী।

চয়ন

সেকালের নকল চোখ

মিসরের পুরাতত্ত্ববিদ্ এবার্স সাহেব বলেন যে, নকল চোখ-ওয়ালা "মমী" (mummy) এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু ঈলিয়ট্ স্মিথ্ প্রণীত কায়রো যাদুঘরের মমী-বিভাগের নির্দ্দেশ-পুস্তকে নকল চোখের উল্লেখ আছে—যদিও তিনি বিশেষ কোন বিবরণ দেন নি।

ব্রুসেল্‌সের যাদুঘরে মার্ব্বেল পাথরের, পোড়ামাটির, এনামেলের আর কাঁচের চোখ আছে, এগুলোকে "মমীর চোখ" ব'লে নামকরণ করা হয়েছে। এই সকল চোখ মার্ব্বেল পাথরের উপরে কাঁচ বসিয়ে মমীর মুখোসের জন্যে তৈরী করা হ'ত। কাঁচটা চোখের কালো তারার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হ'ত। সাধারণত এইরকম চোখই তৈরী হ'ত, কিন্তু কখনও কখনও ব্রোঞ্জ ধাতু ও অন্যান্য পদার্থও ব্যবহার হ'ত আর তাতে অনেক কার্য্য সৌষ্ঠবও থাকৃত।

পরবর্ত্তী উন্নত-যুগে পোড়া মাটি আর এনামেল দিয়ে চোখ তৈরী হ'ত। চোখের সাদা অংশটায় অনুজ্জ্বল সাদা এনামেলের আর তারার জায়গায় পাঁশুটে নীল রংয়ের কাঁচ ব্যবহার হ'ত। মিসরবাসীরা এইরকম চোখ তৈরী করতে খুব ওস্তাদ ছিল। শাসনকর্ত্তার আর দেব-মূর্ত্তিগুলির চোখ খুব কারিকুরি ফলিয়ে তৈরী করত আর তাতে দামী দামী সব পাথর বসানো থাকত। কলিকাতার যাদুঘরে যে মমী আছে তার মুখোসে সাদা এনামেলের উপর নীল-পাথর-বসানো চোখ আছে—এটা নাকি চার হাজার বছরের পুরানো। কিন্তু সে সময়ে জীবন্ত মানুষ যে নকল চোখ ব্যবহার করত, এ-রকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

প্রোফেসর ভ্যান্ দ্যুস্ বলেন, প্রথম যে ব্যক্তি নকল চোখ ব্যবহার করেন তাঁর নাম পল্, ইনি এজিনা দেশের লোক, আর সাত শতাব্দীতে ইনি জীবিত ছিলেন। হিব্রু আইন-পুস্তক তাল্‌মুদে (Talmud) এই রকম চোখ সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে সেটা যদি সত্য হয় তাহ'লে আরও পূর্ব্বে—দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে—জীবন্ত মানুষ নকল চোখ ব্যবহার করেছে ব'লে স্বীকার করতে হ'বে। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ইহুদী চক্ষু-চিকিৎসক প্রোফেসর হার্সবার্গ বলেন, তাল্‌মুদে চোখের যে উল্লেখ আছে, সেটা আজকাল নকল চোখ বল্‌তে যা বুঝায় ঠিক সে-রকম কোন জিনিষ নয়।

শ্রীরামাপদ বসু।

অ্যাক্রোপলিস্

প্রাচীন গ্রীস যে সভ্যতায় কতটা উন্নতি-লাভ করিয়াছিল, এথেন্স নগরের অ্যাক্রো-পলিস্ এখনো তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। গ্রীক ভাষায় acros অর্থে উচ্চতম এবং polis অর্থে নগর। আসলে অ্যাক্রোপলিস্ একটি ক্ষুদ্র শৈল। নীলাচলের উপরে যেমন হিন্দুদের জগন্নাথ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, গ্রীসের এই শৈলের উপরেও তেমনি প্রাচীনকালে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

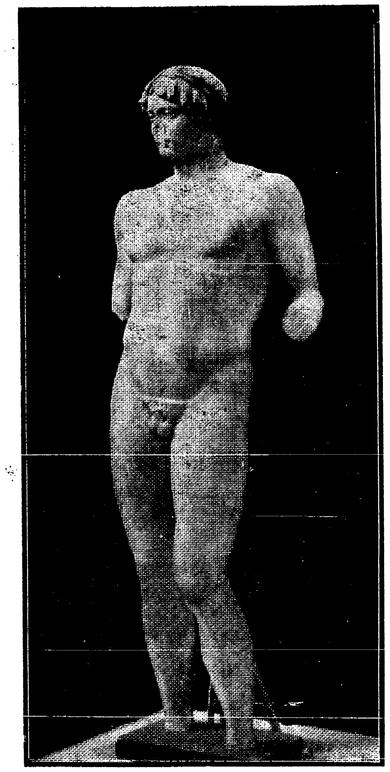

যুবক আপলো (খৃঃ-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী)

জাতি পৃথিবীতে আজ-পর্য্যন্ত দেখা যা
নাই। আমরা তাঁহাদের চিত্র, ভাস্ক
ও স্থাপত্য কলার সম্পূর্ণ নিদর্শন আ
দেখিতে পাই না, কারণ তাহার অধিকাং
কালের ও মানুষের অত্যাচারে বিস্মৃতি
গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। যাহা আছে
সেকালের তুলনায় তাহাও না-থাকার
মধ্যে,—ভাঙাচোরা, অস্পষ্ট। কিন্তু সে
ভগ্নাবশেষের মধ্যে এখনো ছিটেফোঁটা
মত যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা অপূ
এবং আর-কোথাও দুর্লভ।

অ্যাক্রোপলিসে এখন যে-সব ধ্বংসাব
আছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইতে
পার্থেনন। ৪৬০ হইতে ৪৩৫ খৃঃ-পূ
পর্য্যন্ত এথেন্স নগরের কর্ত্তা ছি
পেরিক্লিস। পেরিক্লিসের চরিত্রে প্র
বিশেষত্ব ছিল,সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। পেরিক্লি
চেষ্টায় ও তাঁহার বন্ধু ভাস্কর ফিডিয়া
পরিশ্রমে গ্রীসের এই অপূর্ব্ব পার্থেন
প্রতিষ্ঠা। এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী
এথেনী পার্থেনস্ এই মন্দিরের প্র
বিগ্রহ। আগেও তাঁহার একটি পাথ
মন্দির ছিল বটে, কিন্তু ৪৫০ পূর্ব্বা
পারসীকরা সে মন্দির ভাঙিয়া দেওয়া
পেরিক্লিস এই নূতন মন্দিরের প

অনেক গ্রীক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শৈল "The sacred rock of Athena on the plain" বলিয়া বিখ্যাত।

খৃষ্টজন্মের বহুযুগ পূর্ব্বে এই অ্যাক্রোপলিসকে আশ্রয় করিয়া গ্রীক তথা জাগতিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ ভাবের মাধুর্য্য বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকজাতির মত শিল্পী

করেন। ৪৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রথম শ্রে
মর্ম্মর প্রস্তরের দ্বারা পার্থেননের নির্ম্মাণ-ক
সমাপ্ত হয়। তারপর পার্থেননের উত্তর দি
ইরেচ্থিয়াম নামে দুইটি-মন্দিরবিশিষ্ট
দেবালয় ৪০৮ পূর্ব্বাব্দে গড়িয়া তোলা হয়।

সাধারণত সেকালের গ্রীক মন্দির
আকার হইত সমকোণ চতুর্ভুজ। তাহা

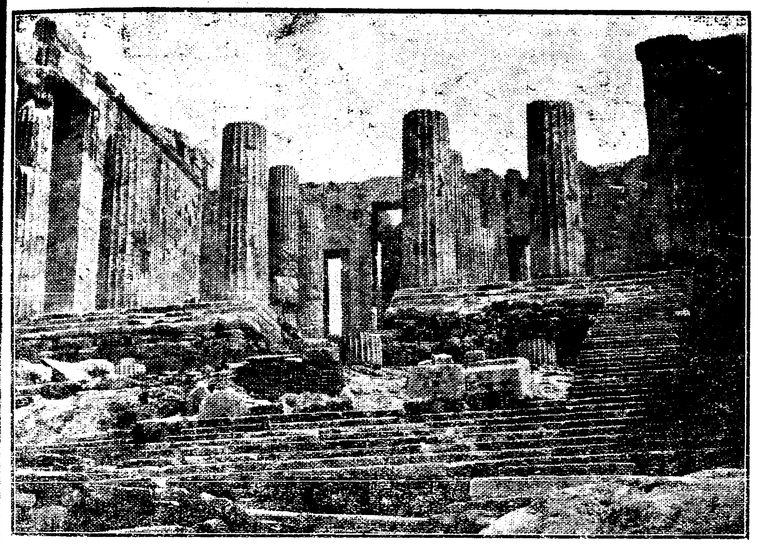

পার্থেননের চাঁদনী

দরজা থাকিত, কিন্তু জানলা থাকিত না। তাহাদের চারিদিকেই এক বা দুই সার-বিশিষ্ট স্তম্ভ, দেবালয়ের মৌন প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া ছাদের ভার বহন করিত। মন্দিরের যে দুটি দিক অপেক্ষাকৃত ছোট হইত, সেই দুইদিকের ছাদের উপরটা হইত তিনকোণা। গ্রীকরা তাহাকে বলিত pediment এবং কোন কোন স্থলে তাহার উপরে পাথরের পুতুল ক্ষোদা হইত। মন্দিরের দেয়ালে উপর-অংশেও ক্ষোদা মূর্ত্তি থাকিত।

পার্থেননের অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার আগা-গোড়ার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। স্তম্ভ ও pedimentএর দীর্ঘতা, স্তম্ভের স্থূলতা এবং মন্দিরের আকৃতির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে এমন-একটা সুসামঞ্জস্য আছে, যে পার্থেননের কোনদিকই হাল্কা বা ভারি বলিয়া মনে হয় না—সমস্ত মন্দিরটি দেখিলেই দর্শকের প্রাণে শক্তি ও সুষমার একটি নিখুঁত আদর্শ জাগিয়া উঠে। সেকালে সিমেণ্ট দিয়া কোন কিছু যোড়া হইত না, কিন্তু পার্থেননের মস্ত মস্ত লম্বা-চওড়া মর্ম্মর পাথরের যোড়ের মুখগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন খাপ খাওয়াইয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, স্যাকরারা সোনার গয়নার যোড়ের মুখও তার চেয়ে বেমালুম ভাবে মিলাইয়া দিতে পারে না। ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলিতেও এই গঠনপটুতা দেখা যায়।

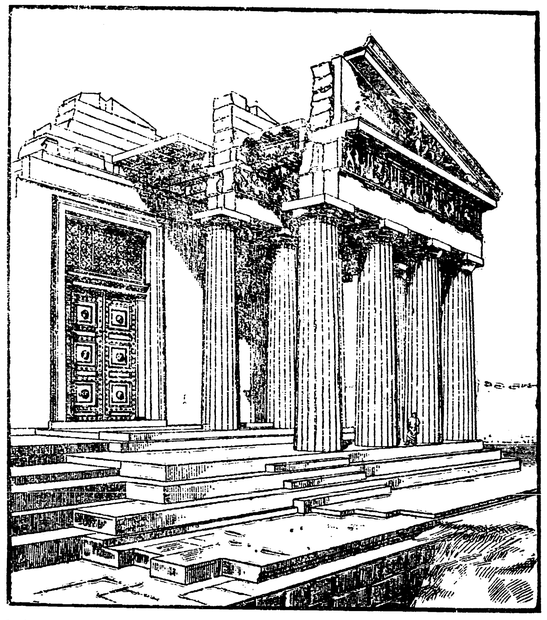

পার্থেননের একাংশ

পার্থেননের যে পার্শ্বটা সমুদ্রের বেশী কাছাকাছি, সেইদিকে একটি চাঁদনী (portico) আছে। এই পরমসুন্দর স্থাপত্য-কার্য্যের নাম প্রপেলিয়া। একসময়ে ইহা চিত্রমালায় অলঙ্কৃত ছিল,—তাহার কোন চিহ্নই আর নাই।

অ্যাক্রোপলিসের নীচেই ডায়োনিসাসের বিখ্যাত রঙ্গালয়। যে-সব গ্রীক নাটক আজ-পর্য্যন্ত জগতে অতুলনীয় হইয়া আছে, এই রঙ্গালয়ে হাজার হাজার দর্শকের সাম্‌নে তাহাদের অভিনয় হইত। এই রঙ্গালয়ের দেয়ালেও অনেক মূর্ত্তি ক্ষোদা আছে।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি, অ্যাক্রোপলিসের শিল্পকীর্ত্তি এখন নষ্ট ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাইজান্‌টাইনরা একসময়ে পার্থেননকে গীর্জ্জারূপে ব্যবহার করিয়াছিল। তারপর ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহার ভিতরে বারুদে আগুন লাগাতে, ইহার অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া যায়। সেই অগ্নিকাণ্ডের এবং নানা সময়ের লুঠ-তরাজের পরেও পার্থেননের ভিতরে ভাঙা-অভাঙা যে-সব কারুকার্য্য রমণীয় মূর্ত্তি প্রভৃতি ছিল, লর্ড এলগিন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সেগুলিকে বিলাতে লইয়া যান। বাদবাকি যাহা-কিছু ছিল, ফরাসী ও অন্যান্য জাতিরা গ্রীকদের অসহায়তার

ডায়োনিসাসের রঙ্গালয়ের দেওয়ালে খোদিত মূর্ত্তি সারি

সুযোগে আসিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত আভরণ-শূন্য হইয়াও পার্থেননের ভগ্ন দেহ এখনো নির্ব্বাপিত-চিতা শ্মশান-ভূমিতে কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে। সৌন্দর্য্যসাধক আজও তাহার রূপ দেখিয়া অভিভূত হইয়া যান, শিল্পীর কাছে আজও তাহা পবিত্র তীর্থের ভাঙা দেবতার মত ভক্তির অঞ্জলি লাভ করে। প্রাচীন পার্থেননে বিকসিত ভাবের ও আদর্শের ছায়া এখনো পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির শিল্পের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে,—কারণ অতীতের সেই প্রতিভাবান শিল্পী ফিডিয়াসের স্বর্গীয় কল্পনার কাছে, আধুনিক যুগের সমস্ত শিল্পীই মাথা হেঁট করিতে বাধ্য!

অ্যাক্রোপলিসের রমণীমূর্ত্তি

পুরুষ বনাম নারী

হ্যাভেলক ইলিসের নাম এখন পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই বিখ্যাত। আমরা এখানে এই চিন্তাশীল লেখকের একটি আধুনিক রচনার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

গত এক শতাব্দী ধরিয়া আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি, সমগ্র জগতে নারীত্বের নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নারীত্বের দিক হইতে অনেকে গর্ব্বপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, এই জাগরণের দ্বারা নারী তাহার পুরুষ-প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে জয়লাভ করিয়াছে।

মিথ্যা কথা। কারণ নারীত্বের ঘুম ভাঙাইবার পক্ষে রমণীর সঙ্গে পুরুষও বড় কম চেষ্টা করে নাই। এতদিন যে রূপার কাটি রমণীকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল এবং যাহার জন্য এই পৃথিবী "পুরুষের পৃথিবী" বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই রূপার-কাটি নারী (যদিও অনিচ্ছায় ও আপনাদের অজ্ঞাতসারে) এবং পুরুষের হাতে প্রায় সমান ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

দেবী এথেনী
(ফিডিয়াসের আসল মূর্ত্তির নকল)

সামাজিক জীবনে নারীত্বের ন্যায্য দাবী এখন মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আজ আবার এক নূতন কথা উঠিয়াছে। পুরুষরা নাকি আপনাদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য নারীর স্বার্থকে দাবিয়া রাখিবার ফিকিরে আছে!

এখানে আমরা নারীর স্বার্থকে নারীত্ব এবং পুরুষের স্বার্থকে পুরুষত্ব বলিয়া ধরিয়া লইব।

অনেক বিখ্যাত লোককেই স্বার্থপর পুরুষপক্ষের দলের-চাঁই বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু আসলে সেটা ঠিকঠাক নির্দ্দেশ করা এতটা সহজ নয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই, সকল সময়েই একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট। সভ্যতার ইতিহাসে নারীজাতির প্রতি বরাবরই পক্ষপাতিতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। প্রাচীন মিশরে বা রোমে বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে, যখনই সভ্যতার উপরে বিপুল কোন ভাবের আঘাত লাগিয়াছে, তখনই তাহার উপরে রমণীর প্রভাব পড়িয়াছে।

অ্যাক্রোপলিসের রমণী-মূর্ত্তি

যুরোপের কুরুক্ষেত্রে যখন কিছুকালের জন্য পাশব-শক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তখন নারীজাতি ও নারীত্বের সমস্ত আন্দোলনকেই পিছনে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছিল। রণক্ষেত্র চিরদিনই পুরুষত্বের বিচরণ-ক্ষেত্র—নারীত্বের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ।

যদিও নারীত্ব ও য়ুজেনিক্সের মত, ইহার বিরোধী, তবু কিন্তু যুরোপে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়া, এদেশে সকলকার চোখ খুলিয়া দিয়াছে।

আমরা বুঝিয়াছি, আধুনিক নারীত্ব প্রকাশ্যে আপনাকে যতই পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া প্রচার করুক, পুরুষত্বের ছদ্মবেশ পরা তাহার পক্ষে একান্ত নিষ্ফল। শান্তির সময়ে জাগ্রৎ নারীত্বের যে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হইয়াছিলাম, আসল যুদ্ধের সময়ে এক মুহূর্ত্তেই তাহা ছেলে-খেলার মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। নারীত্বের অধিকার-লাভের জন্য কোন আন্দোলনের কথাই তখন আর শুনা যায় নাই।

যুদ্ধের আর একদিক আমাদের চোখে পড়িয়াছে, যাহার সঙ্গে "য়ুজেনিক্সে"র একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এ কথা প্রায়ই শুনা যাইত যে, সামরিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ না থাকিলে এবং যুদ্ধ উঠিয়া গেলে, পৃথিবী হইতে বীরত্বের ও পুরুষত্বের সমস্ত গুণই লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং জাতির জীবন ক্রমেই অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইবে। অতএব অবিরাম শান্তি অমঙ্গলের হেতু।

কিন্তু গত যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, নানা দেশের শান্তিপ্রিয় কেরাণী, শিল্পী ও চাষা-ভূষো,—যাহারা কোনদিনই যুদ্ধ দেখে নাই বা যুদ্ধে অভ্যস্ত নয়—তাহারাও দলে দলে রণ-ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে এবং জার্ম্মেনার

পার্থেনিনের একটি ভাঙা মূর্ত্তি

সুশিক্ষিত ও যুদ্ধধর্ম্মী সৈন্যগণের মতই সমান বীরত্ব ও শক্তির পরিচয় দিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হইলেও পুরুষরা কাপুরুষ হইয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কা করিবার আর কোনই কারণ থাকিবে না।

কিন্তু এখন আর এক বিষয় লইয়া আমাদের মাথা-ঘামানোর দরকার। পুরুষত্বকে আর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখা উচিত নয়। এমন বিষম হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সভ্যতার কষ্টলব্ধ সমস্ত সুফল নষ্ট হইয়া যায়। যাহার উপরে "যুজেনিক্সে"র ভিত্তি, যুদ্ধের ফলে সে ভিত্তিও আর শক্ত থাকে না। অতএব পুরুষত্বকে এখন এমন বিষয়ে নিযুক্ত রাখিতে হইবে, যাহাতে সমাজ ও সভ্যতা যথার্থ উপকার লাভ করে।

আজ এই মহাযুদ্ধের পরে, সুধু নারীত্বের নয়,—পুরুষত্বের দিক হইতেও বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, যুদ্ধ-ব্যাপারটা প্রাচীন বর্ব্বরতারই পুনঃপ্রকাশ মাত্র এবং একালকার যুদ্ধের বীভৎসতা কোন অসভ্য জাতিও সহ্য করিতে পারিবে না। যুদ্ধকে নরসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য সমস্ত সভ্যদেশে এখন প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং বলা যায়, ভবিষ্যতে পাশব সামরিকতাকে পুরুষত্বের ভিত্তি বলিয়া আর ধরা হইবে না।

রমণীর শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যতের জীবনে আশা করি, নারীর প্রভাবের সঙ্গে পুরুষের অধিক-মাত্র এবং যথার্থকল্যাণকর চরিত্র-প্রভাব একত্রে মিলিত হইয়া সভ্যতা ও সমাজকে প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। পুরুষের দ্বারা এবং পুরুষের জন্য, আদিম কালে যে-সব বিধি-বিধান গঠিত হইয়াছিল, তাহার বাঁধনে নারীজাতিকে আর বাঁধিয়া রাখা হইবে না। আবার, যে-সব কাজ এখন অনায়াসে নারীর দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে এবং পুরুষরা অকারণে যে-সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে আপনাদের জড়াইয়া রাখিয়াছে, সে-সমস্ত অনর্থক কর্ত্তব্য-বাহুল্য হইতেও ভবিষ্যতের পুরুষত্ব মুক্তিলাভ করিবে। পুরুষ তাহার সমগ্রতা লইয়াই পুরুষ এবং নারীও তাহার সমগ্রতা লইয়াই নারী। আধুনিক বিজ্ঞান যে Hormone রসের কথা আবিষ্কার করিয়াছে, পুরুষ ও নারীর দেহের ভিতরে এবং মনের উপরে তাহা ভিন্নভাবে কাজ করিয়া যায়। কাজেই পুরুষ ও নারীর স্বভাব ও শক্তিসামর্থ্য চিরকালই অসমান থাকিবে বটে, কিন্তু আপন আপন বিভাগে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন করিলেই ভবিষ্যতে পুরুষত্ব ও নারীত্বের দ্বারা, সমগ্র মানব-সভ্যতা সম্পূর্ণ উন্নত হইয়া উঠিবে।

ঘরবাড়ীর সুর-জ্ঞান

সম্প্রতি একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বড় বাড়ী ও সেতু প্রভৃতি সঙ্গীতের এক-একটা বিশেষ সুরে অভিভূত হয় এবং সেই সুরের প্রতিধ্বনি তাহাদের মধ্যে জাগিয়া তাহাদের জড়-দেহকেও এমন ভাবে কাঁপাইতে থাকে যে, তাহারা ভাঙিয়া মাটির উপরে পড়িয়া যাইতে পারে। আপনি যখন কোন জন-বহুল সেতুর উপর দিয়া যাইবেন, তখন লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে, সেতুটির ভিতর হইতে একটা অব্যক্ত ধ্বনির অনুরণন ফুটিয়া উঠিতেছে। এই ধ্বনিই তাহার নিজস্ব সুর এবং সুরটা যদি খুব বেশী করিয়া জাগানো যায়, তবে কম্পনের ফলে সেতুটি হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে! বৈজ্ঞানিকরা আরো বলেন যে, বড় বড় অট্টালিকার কোন কোন বিশেষ স্থলে, অট্টালিকার নিজস্ব সুরের পর্দ্দায় বাজ্‌না বাজাইয়া, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে ভূমিসাৎ করা যায়! পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক স্থপতিরা প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণের সময়ে, বিশেষ সুরের কম্পন হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন।

সাহিত্যের বিজ্ঞাপন

প্রতিভাবান লেখকদের পুস্তক ও বাস-স্থান বিলাতের অনেক নগর ও পুরাতন জায়গাকে সমৃদ্ধিশালী ও অধিকতর বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছে।

সেক্‌স্‌পিয়ারের জন্মস্থান ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন্‌-অ্যাভন্‌ দেখিবার জন্য সারা য়ুরোপ ও বিশেষ করিয়া আমেরিকা হইতে দলে দলে সাহিত্য-রসিক যাত্রী ইংলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হয়। সেক্‌স্‌পিয়ার যদি সেখানে না জন্মিতেন এবং তাঁহার রচনায় ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের উল্লেখ না থাকিত, তবে আজ তাঁহার নাম পৃথিবীর কেহই জানিতে পারিত না। প্রতি বৎসরেই গড়ে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

প্রায় দশ হাজার করিয়া লোক সেক্‌স্‌পিয়ারের স্মৃতিমন্দির দেখিবার জন্য মোট প্রায় নয় হাজার টাকার টিকিট কেনে। মিউজিয়মের টিকিট বিক্রী করিয়াও বৎসরে নয় হাজার টাকা ওঠে। আনা হাথাওয়ের কুটিরে বৎসরে দর্শনীর টাকা পাওয়া যায় সাড়ে-চারহাজার টাকা। আর এই যাত্রীদের দৌলতে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড সহরের বাৎসরিক লাভ হয় তিনলাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা। লাভের পরিমাণ বৎসরে বৎসরে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

স্কটের ভক্ত যাত্রীদের জন্যও এডিন্‌বার্গ সহরের বাৎসরিক কয়েক লাখ টাকা লাভ হয়। তা ছাড়া স্কটের উপন্যাসে-উক্ত প্রাচীন কেনিলওয়ার্থ দুর্গেও প্রতি বৎসরে প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকা, দর্শনীস্বরূপ চল্লিশ হাজার যাত্রীর কাছ হইতে আদায় হয়!

চাষা কবি বার্ণ্‌সের জন্মগৃহ দেখিবার জন্য যাত্রীরা প্রতি বৎসরে সাড়ে সাতহাজার টাকা দর্শনী দেয়। কবির জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আর দুটি সহরের জন্যও দর্শকদের কাছ হইতে বাৎসরিক প্রায় দেড় লাখ টাকা করিয়া পাওয়া যায়।

স্যর হল কেনের উপন্যাসে স্থানলাভ করিয়া আইল-অফ ম্যানও আজকাল অনেক ভ্রমণকারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। সেখানকার একজন রাজকর্ম্মচারী বলেন, বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দিয়া হল কেন এদেশের রাজভাণ্ডারে প্রতি বৎসরেই দেড় লাখ টাকা পাওনার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

একালের শিক্ষিত ও সহুরে বাঙালীর প্রাণে কিন্তু এ-রকম কোন উৎসাহই নাই। কয়জন লোক ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম ও মাইকেল প্রভৃতির জন্মভূমি দেখিতে যায়? কিন্তু যাহাদিগকে আমরা পাড়াগেঁয়ে ও অশিক্ষিত বলিয়া অবহেলা করি, কবিদের মর্য্যাদা ও স্মৃতির পূজা বরাবরই তাহারা করিয়া আসিয়াছে। বাংলার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন কবির জন্মভূমিতে বৎসরে বৎসরে এখনো যে-সব মেলা ও উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহা পল্লীবাসীদের কবি-প্রীতিরই পরিচয় দিয়া থাকে।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

পান্নার দুল

ক্লাশে আমরা যে-কটিতে একজোট ছিলাম তার মধ্যে অবিনাশ ছিল সকলের চেয়ে বয়সে বড়। হাতের আর গলার বোতাম ছেড়ে চটি-পায় ছেলেদের দলে সে সর্দ্দারি করে বেড়াত। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শীতের ঝরা পাতার মত কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক নেই, আমি তখনো কালেজের একটা শুক্‌নো ডালে আমার নিরানন্দ নীরসতা নিয়ে আট্‌কা পড়ে আছি।

পথে-ঘাটে কংগ্রেসে-কন্‌ফারেন্সে অবি-

নাশের সঙ্গে কালে-ভদ্রে দু-একবার দেখা হত; বছর তিনেক ধরে তাও বন্ধ। চিরকালটা ভবঘুরে গোচেরই তার স্বভাব, কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে তার খবর জান্‌ব সেও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না; তবে তার খবর জান্‌বার জন্যে আমার যে ব্যস্ততা কিছু ছিল ভদ্রতার খাতিরেও সে মিথ্যাটা আমি বল্‌তে পার্‌ব না, সুতরাং একটু একটু করে তাকে ভুলেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় একদিন ময়দানে খেলা দেখ্‌তে গিয়ে লোকের ভিড়ের ঠেলা-ঠেলির মধ্যে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হলো।

পরস্পর মামুলি কুশল-জিজ্ঞাসার পর আমি তার এই তিন বৎসরের ইতিহাস জান্‌তে চাইলাম। সে বল্‌লে, এই প্রশ্নের জবাব সে কেবল একটি কথায় দেবে। ইতিমধ্যে সে বিয়ে করেছে। ভারবাহী জানোয়ারের আর যত রকম উপসর্গই থাকুক, ইতিহাস থাকে না।

আমি লৌকিকতার ভাব থেকে তাকে বিস্ময়ভরা প্রচুর আনন্দ জ্ঞাপন করে বল্‌লাম, 'হুজুলাতে খুব দেশ দেখে বেড়াচ্ছ বুঝি?'

সে রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লে, 'আরে রাম! তুমি নিয়ে করনি, এ আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি। কলুর বলদও ঘোরে, তার সেটাকে কি দেশ দেখে বেড়ানো বল্‌তে চাও?'

তার প্রতি-কথায় স্ত্রীর সম্বন্ধে ভারি একটা নাগালছাড়া ঔদাসীন্যের ভাব লক্ষ্য করে ব্যথিত হলাম; ছেলেবেলা থেকেই দেখ্‌তাম, স্নেহ-প্রীতি মান-অভিমান প্রভৃতি জিনিষগুলোর উপর তার কেমন একটা উগ্র, অবজ্ঞা-মাখানো কৃপাদৃষ্টি ছিল। অন্তরাল-বর্ত্তিনী কোন এক উপেক্ষিতার আয়ত কালো চোখের কোণে সে-দিনকার সন্ধ্যাটি অশ্রু-বিন্দুর মতো টলটল কর্‌তে লাগ্‌ল।

একটা গাড়ী ডেকে অবিনাশ আমায় তার শ্যামবাজারের বাড়ীতে নিয়ে গেল।

তার স্ত্রী ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তার টেবিলে-পড়া কাগজগুলোকে গুছিয়ে ঠিক করে রাখ্‌ছিলেন, আমাদের সাড়া পেয়েই ত্রস্ত হরিণীর মতো তাড়াতাড়ি সে-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। চকিতের মতো তাঁকে একটুখানি দেখ্‌লাম। তারপর অবিনাশকে বিস্ময়-ভরা যে আনন্দ আমি জানালাম, তার মধ্যে লৌকিকতার নামগন্ধও ছিল না।

অবিনাশ দুঘণ্টা ধরে আজেবাজে কত কি যে বকে গেল, কাজের কথাও তার মধ্যে ছিল অনেক, কিন্তু আমার মনে হলো, আজকের এমন ধ্যানস্তিমিত সন্ধ্যাখানি পণ্ড নিরর্থক হয়ে গেল। দু-একগাছা চুড়ির আচম্‌কা ঠিনিঠিনি, ক্যাশ-বাক্সের ডালা খোলার শব্দ, এবং চাপাগলার ছোট দু-একটি ফিসফিস ছাড়া আর-সমস্ত ধ্বনিকে সেদিনকার সন্ধ্যায় কেউ যদি টুঁটি টিপে ধরে চুপ করিয়ে দিত, তাতে পৃথিবীর কিছু লোকসান হত কি?

আমি একটু-আধটু গাইতে পারি। সেই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করে অবিনাশের বাড়ীতে উপর্‌-উপরি কয়েকদিন আনাগোনা ঘট্‌ল। কিন্তু তার স্ত্রীকে আর দেখ্‌লাম না। যতক্ষণ থাকি, রাজ্যের আর-সমস্ত কথারই আলোচনা হয়, ঐ কথাটি ছাড়া। সে বাড়ীটাতে সে নিজে ছাড়া আরো যে কেউ আছে, এ কথাটা অবিনাশ এমন চমৎকার ভুলে থাক্‌তে পারে ফেসে আর কি বল্‌ব!

বড় ইচ্ছে হত, এই অনাদৃতার নিঃসঙ্গ

জীবনের বোঝাটাকে আমি আমার ভ্রাতৃত্ব দিয়ে একটু লাঘব করে তুলি, একটা ভাই-ফোঁটা বা এমনি একটা-কিছু উপলক্ষ্য করে তার সঙ্গে পরিচিত হই! আমার এই হত-ভাগ্য জীবনের কোথাও কি ফুল ফোটে না! পাখীরা কলকণ্ঠে গেয়ে ওঠে না! এ জীবনে এমন আলোর বিকাশ কি হয়নি যা পৃথিবীর আর সকল আলো থেকে আলাদা, এমন সৌরভ যা বিশেষ করে আমারই সৌরভ! তাকে দেবার মতো সম্পদ আমার কিছু কি নেই?

কিন্তু কেবল দিতে পারার অধিকার নিয়ে ত কিছু দেওয়া চলে না। তাই রুদ্ধ দরজায় নিরুপায়ের দেবতাকে ডেকে বলি, অত যে সুন্দর, সুখে তার অধিকার আছে, সে সুখী হোক্! তারপর তার কথা ভাবতে বসি।

যখন জানাশোনা ঘটবার কোনো ভরসাই আর নেই, তখন হঠাৎ একদিন বেড়াতে এসে তার সমস্ত কথার পুঁজি নিঃশেষ করে শেষটা অবিনাশ বল্‌লে, 'দীপ্তি ধরেছে, তোমাকে অবসর-মতো মাঝে-মাঝে গিয়ে তাকে গান শখোতে হবে।

আমি বল্‌লাম, 'আমি আবার গাইতে জানি নাকি?'

সে তার একত্র মুঠি-বাঁধা হাত-দুটোকে টেবিলের উপর রেখে বল্‌লে, 'তুমি গাইতে জানো; এমন কথা ত বলা হচ্ছে না। এ ক'-দিন যেমন করে চ্যাঁচালে, মাঝে মাঝে গিয়ে আধঘণ্টাটাক সেই-রকম চেঁচিয়ে আসতে পারবে কি না সেইটে জান্‌তে চাচ্ছি।'

একরকম জোর করেই সে আমায় ধরে নিয়ে গেল। তার বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে যখন সঙ্কট আসন্ন তখন আর ফাঁকি দেওয়াটা সুযুক্তি নয় মনে করে খোলাখুলিই বল্‌লাম, 'আমার কিন্তু ভাই ভারি লজ্জা করবে।'

সে ঘাড়টাকে শিথিল করে অবজ্ঞায় মাথা নেড়ে বল্‌লে, 'হুঁঃ!' সে অবজ্ঞা আমার লজ্জা-করাকে কতখানি, আর যাকে লজ্জা তাকেই বা কতখানি, সেটা ঠিক বুঝ্‌তে পারা গেল না।

অনেকক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা কর্‌লাম। আমি স্বজনহীন মা-হারা, তার উপর বাঙালীর ছেলে। একটু পরে স্থৈর্য্যে-ভরা একখানি প্রেমমণ্ডিত মুখকে একটা তৃপ্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে নিয়ে একটি জীবন্ত দেবীপ্রতিমা আমার চোখের দৃষ্টির আরতি-প্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন। আমার মাকে ভগিনীকে কন্যাকে এক-সঙ্গে তাঁর মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ কর্‌লাম।

উনি কাছাকাছি হতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। অবিনাশ পিছন থেকে দুহাতে আমার মাথাটাকে চেপে নুইয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস কি হাঁ করে? গড় কর্, হতভাগা, গড় কর্।'

অস্বস্তিতে দীপ্তির মুখের দীপ্তি মিলিয়ে গেল। আমিও মহা বিরক্তির সঙ্গে তার হাত-দুটোকে সরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, 'আঃ কি ছেলেমানুষী কর্‌চ!'—কিন্তু আমার মন যে তার সমস্ত প্রণিপাত ঢেলে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়্‌ল সেই দুটি পদ্মকোরকের মতো কোমল পায়ের তলায়!

অবিনাশ বল্‌লে, 'ইনি তোমার বৌদি।'

আমি দুটি হাত জোড় করে তাতে অন্তরের সমস্ত উপলব্ধি নিয়ে বল্‌লাম, 'বৌদি!'

মহা উৎসাহে দীপ্তি সাক্‌রেদি আরম্ভ

বল্‌লে। কিন্তু থেকে-থেকে আচম্‌কা এক-একবার তার সেই উৎসাহ ফটোগ্রাফের কাগজের সাদার মতো কিসের তাপে পলকে কালো হয়ে মিলিয়ে যেত। তখন এস্রাজের তারের উপর তার আঙুল আর নড়্‌তেই চাইত না। গানের মাঝখানে অর্গানের রীডের উপর হাতটাকে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে হঠাৎ এক সময় সে টুল ছেড়ে উঠে পড়্‌ত। পাছে আমি কিছু মনে করি, এই ভয়ে রোজই তার একটা-না-একটা ওজর খাড়া কর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌তাম।

এ সত্ত্বেও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে আর স্বাভাবিক নীতি-কুশলতার গুণে আমার কাছ থেকে যখ্‌বার যা-কিছু সবই সে আয়ত্ত করে নিলে, আমার বিদ্যার পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যেতে দুটি দিনের বেশী লাগ্‌ল না। তবু কর্ত্তৃপক্ষের দিক থেকে তুষ্টির কিছুমাত্র ঘাট্‌তি দেখা গেল না বলে কাজটিতে আমি বাহালই থেকে গেলাম।

ক্রমাগত আসা-যাওয়া করে নানা খুঁটি-নাটির মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম, স্ত্রীর সঙ্গে অবিনাশের ব্যব-হার খুব ভদ্র এবং মোলায়েম নয়। দালালির কাজে তার সমস্ত দিনটা এবং রাতেরও অধি-কাংশ সময় কাটে, তার স্ত্রীর দিন কাটে কি করে তারপর সে খবর নেবার তার সময়ই হয় না। তার প্রসঙ্গ তুলে আমি কোনো কথা কইতে গেলে দীপ্তি ত্রস্ত হয়ে সেটাকে চাপা দিয়ে দেয়। বুঝ্‌তে পারি এদের সম্পর্কের মধ্যেকার কোন্ এক জায়গায় কাঁটার মত একটা-কিছু কেবলই ফুট্‌ছে, তার বেদনাটা কোনো সময়ই বহ্নি ডাকার মতো গুরুতর হয়ে ওঠে না, কিন্তু অলক্ষিতে জীবনের মধ্যে তিক্ততা সঞ্চার করে দিতে থাকে।

এই উদ্ভাবনাটা আমাকে একটুখানি বিব্রত করে দিয়ে গেল। নানা গুরুতর কাজের চাপ অগ্রাহ্য করেও এই অত্যন্ত অকাজের বিশ্রম্ভালাপের মজ্‌লিসে, গীত-অধ্যাপনার অভিনয়ে আমাকে যোগ দিতে হত। একটি দুঃখী নিষ্পাপ চিত্ত আমার সামান্য একটু সঙ্গ আশা করে পথ চেয়ে বসে আছে, এইটুকু আমি তাকে যদি না দিতে পারি, তবে কিসের জন্যে এত আড়ম্বর করে তৈরি হচ্চি! এর চেয়ে বড় কোন্ কাজটায় আমি লাগব? মাঝে মাঝে দীপ্তি যে ছট্‌ফট্ কর্‌তে থাকে সে আমি বুঝ্‌তাম না, তা নয়। আমার মনে হত, এই ছটফটানি ঘোচাবার জন্যেই আমার সঙ্গ বেশী করে দর্‌কার। আমি এস্রাজ ফেলে স্বরদে সুর বাঁধ্‌তাম, সঙ্গীতের প্রবাহ চৌতাল থেকে ঠুংরীতে গড়িয়ে পড়ে ফেনিল হয়ে উঠ্‌ত।

ক্রমে আমরা গান থেকে পরস্পরের সুখ-দুঃখের আলোচনায় সময় দিতে লাগ্‌লাম বেশী। একের কাছে অপরের আর-কিছু বড় লুকানো রইল না। কেবল স্বামীর প্রসঙ্গে দীপ্তির আঘাত লাগে বলে সতর্কতার সঙ্গে সেদিকটাকে আমি এড়িয়ে চলি।

আমাদের এই নূতনতর সম্পর্কের মাঝ-খানে অবিনাশকে কোথাও খাপছাড়া লাগ্‌ল না। একদিন সে একটুক্ষণের জন্যে আমাদের আড্ডায় যোগ দিতে এলে দীপ্তির চেয়ারের পিঠটার উপর কনুয়ের ভর রেখে দাঁড়িয়ে তাকে বল্‌লাম, 'আমরা আর দেবর না, বৌদি না, এখন থেকে আমরা বন্ধু!'

অবিনাশ উৎসাহিত হয়ে বল্‌লে, 'বটে! তাই নাকি? তাহলে ভালো করে কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা করা যাক্। ওরে কেষ্টা—"

দীপ্তি উৎসুক হয়ে ছিল; তাকে দেখে মনে হলো, তার শরীরের সমস্ত রক্ত কোন্ একটা অদৃশ্য জায়গায় কিসের টানে গিয়ে জমা হয়েছে। ঠোঁট-দুটিকে কাঁপিয়ে একটু বিচলিত হয়েই সে বলে উঠ্‌ল, 'বন্ধু হতে পারা কি এমনি মুখের কথা ঠাকুরপো, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি?'

আমি বল্‌লাম, 'বা রে, শাস্ত্রে যে রয়েছে—সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বম্……সাপ্তপদম্ মৈত্রম্……'

কিন্তু আমার পরিহাসে হাসির সুরটি লাগ্‌ল না।

"মুখের কথাই বটে! কিন্তু বল্‌বার ত উপায়ও নেই। তাই মুখের কথার বেশী কী আমার কর্‌বার আছে সেই ভাবনাতে আমার দিনের পর দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। তারপর একদিন—

আচ্ছা ঋণ জিনিসটার সৃষ্টি কত-দিনকার? কে প্রথম এর প্রবর্ত্তন করেছিল? টাকার ঋণ টাকা দিয়েই কি সব সময় শোধ কর্‌তে পারা যায়, তার সঙ্গে এমন কিছু কি থাক্‌তে পারে না যা অপরিশোধনীয়?…

সেদিন আর কালেজ যেতে ইচ্ছে হলো না, শীতের ভোরের কুয়াসা ভালো করে না কাট্‌তেই অবিনাশের চায়ের টেবিলের একধারে একটা কেদারা নিয়ে গিয়ে বসে পড়্‌লাম। অবিনাশ এক হাতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আর-এক হাতে কতগুলি কাগজপত্র উল্টে যাচ্ছিল, ভালো করে না তাকিয়েই বল্‌লে, 'এসো।' আমাকে এক বাটি চা ঢেলে দিয়ে দীপ্তি মুখটিকে ভারি গম্ভীর করে শুধু-শুধু একদিকে চেয়ে বসে রইল।

তখন টাউন্-হলে স্বদেশী-মেলার উৎসব গল্পের আগুনটাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে আমি তারই কথা পাড়্‌লাম। দীপ্তি চোখের কোণে অবিনাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অকস্মাৎ অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে বলে উঠ্‌ল, 'আমায় নিয়ে চল না ঠাকুরপো।'

আমি পুলকিত হয়ে বল্‌লাম, 'বেশ তা কবে যাচ্ছ, বল।'

সে বল্‌লে, 'আস্‌চে রবিবারে। সে দিন ত তোমার ছুটি।'

অবিনাশের সম্মতির জন্যে তাকে এ বিষয়ে একটু সচেতন করে দিতেই সে চোখ না তুলে তার কাগজ-পত্রের এক জায়গায় আঙুল বুলোতে বুলোতে বল্‌লে 'একটু সকাল-সকাল যেয়ো, তা না হলে সব দেখে উঠ্‌তে পার্‌বে না।'

দীপ্তির এর পর এ আলোচনায় আর উৎসাহ দেখা গেল না। উদাস চোখদুটি দৃষ্টিকে বাইরে আকাশের দিকে প্রেরণ করে জান্‌লা ঘেঁসে স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল।

শনিবার বিকালে, কাল আগে থাক্‌তে তৈরি হয়ে থাক্‌বার জন্যে তাকে তাড়া দিতে গিয়ে শুনি, সে উৎসবে যাবে না! আমাকে একলা রেখে বাইরে থেকে দরজার পরদাটাকে টেনে দিয়ে সে চলে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে একই ভাবে বসে রইলাম, তারপর কখন এক সময় উঠে আস্তে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌লাম মনে নেই। পথে পড়ে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লাম

রাতলায় তার জান্‌লার কপাট-দুটি দুহাতে ধরে বড় বড় কান্না-ভরা চোখে সে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরদিন দুপুর না পেরতেই দীপ্তির আহ্বান এল। গিয়ে তাকে কতকটা প্রসন্ন দেখ্‌লাম। সে সাদা সহজ পোষাকে আমার সঙ্গে সে উৎসব দেখ্‌তে চল্‌ল। সমস্ত দিনটা কল-টেপা পুতুলের মতো সে আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালে, তবু সেই একটি মাত্র উৎসব-জনীর একটি ছুটি স্মৃতি আমার দৈন্যে ভরা সমস্ত জীবনটার জন্যে পুঁজি করা আছে। সেগুলি শোন্‌বার আগ্রহ অনেকের হয়ত নেই, কিন্তু বল্‌বার আগ্রহ আমার একেবারেই নেই, কেননা আমি জানি কেউ সেগুলির মূল্য বুঝ্‌বে না।

দীপ্তি এবং তার সঙ্গিনী মেয়েটিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন রাত ন'টা। খাওয়ার চেষ্টায় নীচে দেরি না করে সোজা ছাতে চলে গেলাম। দীপ্তিদের বাড়ীর দিকে চোখের দৃষ্টিকে যতদূর পারা যায় প্রেরণ করে এই কথাটা ভেবেই আমার গর্ব্ব হলো যে, এতদিন ধরে এমন কতটু-কিছু আমি পাইনি বা পেতে আশা করিনি যাতে পৃথিবীর কারুকে প্রবঞ্চিত করা হয়। আমার অন্তরের আনন্দের স্পদ আমার অন্তরেরই সম্পদ, অন্তর্যামী সে কথা জানেন।

ভোর হতেই দেখি দীপ্তির চিঠি নিয়ে বেহারা বসে আছে। সে লিখেচে—

আমার কানের পান্নার দুল-একটা বাজারের ভিড়ে কাল আমি হারিয়ে এসেচি। আপনি যদি জান্‌তে পারেন, তাহলে কি হবে? এর আগে আরো একবার আর-একটা দুল আমি হারিয়েছি, তখন কিছু বলেননি, এবার কি আর আস্ত রাখ্‌বেন? আপনি এ বিপদে কয়েকটি টাকা দিয়ে যদি আমাকে সাহায্য করেন তবে আমি রক্ষা পাই। ধর্ম্মতলায় শ্যামলাল কান্‌হাইয়ালালের যে জহরতের দোকান আছে সেখান থেকে দুলজোড়া কেনা হয়েছিল। আপনি আমাকে কীই হয়ত ভাব্‌চেন, কিন্তু আমি বিপন্ন এবং দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়েছি। ইতি—দীপ্তি।

বৌদি বলে টাকাটা চাইতে তার বেধেছে, লিখেছে দীপ্তি!…আমার পরীক্ষার ফীর টাকা ডাকঘরে জমা করা ছিল, সেটাকে উঠিয়ে নিলাম। দুবার এগ্‌জামিন দেওয়া হয়নি, এবারেও হবে না,—না হোক। যাদের সঙ্গে ভালো করে কথা কইনি তাদের কাছেও হাত পাত্‌তে হলো। তারপর ছুটে গিয়ে হারানো দুলটার একটা জুড়ি সংগ্রহ করে লুকিয়ে তাকে দিয়ে এলাম। সে হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিয়ে বল্‌লে, টাকাটা শীগ্‌গিরই দিয়ে দেবে, এবং, এ যে নিতান্তই তার ঋণ-গ্রহণ, এই কথাটাকেই খোঁচা দিয়ে স্পষ্ট কর্‌বার জন্যে আমায় ধন্যবাদ জানালে না।

সেদিন চায়ের টেবিলে সে যখন এসে বস্‌ল, তার দু কানের দুটি দুলের মধ্যে থেকে আমার এত দুঃখের দানটিকে আমি নিজেই খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌লাম না, অন্যের চোখে আর সে পড়্‌বে কি? স্বামীকে ডেকে সে সংসারের কথা তুল্‌লে। তবু মনটাকে কেন যে সেদিন এমন কানায়-কানায় ভরা মনে হয়েছিল জানিনে। টাকাটা দীপ্তি যেন আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল, তাকে ফিরিয়ে দিয়ে

নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। ঋণমুক্ত লোকের যেমন সাহস বাড়ে, আমি তেমনি সাহসী হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে তাদের ঘরকন্নায় দুটো-একটা পরামর্শ দিতে সুরু কর্‌লাম।

দীপ্তি এতে খুসি হলো না। কেমন একটা ছাড়াছাড়া দূরদূর ভাব তার মধ্যে লক্ষ্য করি। দেখা হলেই খামকা ঘেমে লাল হয়ে সে টাকাটার কথা পাড়ে। বলে, দিয়ে দেব।

আমি একদিন বিরক্ত হয়ে বল্‌লাম, 'তুমি যদি মনে করে থাক, টাকাটার জন্যে আমার ঘুম হচ্চে না, তবে সেটা দিয়ে দিলেই ত পার।'

সে বলে, 'আপনি দুটি মাস আর সময় দিন!...'

আমি যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। রোজ ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মনে হত, বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেই তাদের বাড়ীর বেহারাকে দেখ্‌ব, চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। শুতে যাবার আগে ভাব্‌তাম, আজকেই ছাড়াছাড়ির শেষ দিন। কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেলেও পথ-চাওয়া পরোয়ানা যখন ল না, তখন একদিন অকারণে অনেক পথ ঘুরে শ্যামবাজারের পরিচিত এবং প্রিয় একটি দোতলা বাড়ীর সামনে গিয়ে ডাক্‌লাম, 'অবিনাশ!'

একটি চশমা-পরা ছেলে বর্ম্মা-চটি পায় বাইরে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, 'এ বাড়ীতে অবিনাশ বলে ত এখন কেউ থাকেন না, সম্ভবত আমাদের আগে তাঁরা এখানকার ভাড়াটে ছিলেন। আপনি কোথা থেকে আস্‌চেন? ভিতরে এসে বসুন।'

আমি কোনো কথা না বলেই সেখান থেকে চলে এলাম। অবিনাশের ক্লাবের লোকেরা বল্‌লে, 'আছে কোথাও, ভারতবর্ষ ছেড়ে যায়নি এ-পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি মশায়।'

বাড়ী এসেই তার ঠিকানা-ছাড়া একখানা চিঠি পেলাম। তাড়াতাড়ি কোলের উপর কাগজ রেখে পেন্সিলে সে লিখেচে—

'আপনার টাকাটা ফিরিয়ে না দিতে পারা পর্য্যন্ত আপনাকে মুখ দেখাতে পার্‌ব না, মাপ কর্‌বেন। দুল-হারানোর ব্যাপারটা একবার লুকিয়েই আমি বিষম ঠেকে গিয়েছি। গোড়াতেই ওঁকে বল্‌লেই চুকে যেত; ওঁর ভালোবাসাতে এবং ক্ষমার শক্তিতে প্রথম থেকেই অকারণে সন্দেহ করে আমি যে অন্যায় করেছি, তার শাস্তি আমায় ভোগ কর্‌তে হবে ত।...'

সে সন্দেহকে আশ্রয় দিয়ে এবং সাহায্য করে আমি যে অপরাধ করেছি, আমাকেও তারই শাস্তি ভোগ কর্‌তে হচ্চে। বুঝ্‌তে পার্‌চি, বন্ধুর প্রতি আমি কর্ত্তব্য করিনি।

তাও বলি, পৃথিবীতে উপকার জিনিষটাকে লোকে ভুল্‌তে পারে না কেন? যারা দেয় এবং যারা নেয় তারা সকলেই টাকাটাকে কেন এত বেশী করে দেখে? ভাব্‌চি, দেড়শোটি টাকার সংস্থান আমার যদি না হত তবে পৃথিবীতে আমার কিছুরই অভাব থাক্‌ত না।

বন্ধু, আমার এই কছত্র লেখা তোমার চোখে কি পড়্‌বে? তোমার কৃতজ্ঞতার স্মৃতির আড়াল ঘুচিয়ে তুমি কি আমায় বাঁচাবে? দিতে পারার গর্ব্ব আমার ত টুটেই গেছে, তোমারও কি ঐ কটা টাকা ছাড়া আর-কিছু আমায় দেবার ছিল না?

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

ঝড়ের আলো।

Indian Press, Ltd., Allahabad.

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪৪শ বর্ষ]　　বৈশাখ, ১৩২৭　　[১ম সংখ্যা

সাল্-পহেলী

শূন্যে ঘোরে সূর্য্য শত সোনার চাঁপা ছড়িয়ে রে!
অগাধ আকাশ—নাগর-দোলার দেশ!
চক্রে চলে চন্দ্র-তারা জ্যোতির পরাগ উড়িয়ে রে!
নাইক সুরু, নাই সে গতির শেষ।
সেই অশেষের অনির্দ্দেশে অলখ্-লেখার দাগ দিয়ে,
নূতন হ'য়ে নিচ্ছে চিরন্তন ;—
ডালিম্-ফুলে উথ্‌লে পুলক,—কুসুম-ফুলে ফাগ দিয়ে,—
চন্ননাদের গায় দিয়ে চন্দন ;—
স্বপন-পুরে চল্‌ছে উড়ে দেখিয়ে আঙুল কোন্ দূরে,
না পাই এঁচে কয় কি ইশারায়,
আশার আলোয় গলিয়ে আঁধার জ্বালিয়ে বাতি কর্পূরে,
চাঁদের চোখে চমক দিয়ে চায়!
উড়িয়ে ফুঁয়ে তুলোট-পুঁথি ধূলোট খ্যালে চুল্‌বুলে—
ফুল-বিলাসী দখিন হাওয়া, তাই,
সুর হেনে তিন পিচ্ কিরি পিক ছায় জাগিয়ে বুল্‌বুলে,
পাপিয়া-শামার কণ্ঠে বিরাম নাই!

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

সিঁদূর-মাখা সোনার মোহর কৃষ্ণচূড়া তাই ঢালে
সদর-পথে দরাজ ক'রে মন,
আনন্দেরি মুদ্রা ঝরে বকুল-ফুলের টাঁকশালে,
আলোয় আলো গন্ধরাজের বন !

* * * *

পাওনা-দেনার গদিতে আজ গাওনা চলে দিল্-খোলা,
দম্‌কা খরচ কর্‌ছে বেনের দল,
কেবল-ধূনো-গঙ্গাজলে আজ খুসী নয় হাটখোলা,
আজ্‌কে সেথায় চল্‌ছে গোলাপ-জল !
চল্‌ছে খুসীর সওদা শুধু চল্‌ছে নিছক শিষ্টতা
প্রসন্নতার সদাব্রত আজ,
আনন্দ আজ মূর্ত্তিমন্ত, কুটিল ভুরুর ক্লিষ্টতা
তলিয়ে গেছে কোন্ অতলের মাঝ !
পান্না-পাঁতির ছিল্‌কে দিয়ে সাজিয়ে অশথ দেবদারু
তরুণ হ'তে ডাক্‌ছে তরুর দল,
নূতন পাতার নূতন খাতা !···আজ বাকী না রয় কারু
খুল্‌তে হৃদয় ভুল্‌তে অকৌশল ।
বাতিল হ'ল বকেয়া কেতাব, আর যেন না যায় দেখা
অসংখ্য ভেল অসংখ্য ভুল তার,
নিরঙ্ক এই নূতন খাতায় নিষ্কলঙ্ক লেখ্ লেখা,
পঙ্কে ফুটুক পদ্ম চমৎকার !
জানিয়ে দে রে এই প্রভাতের নবীন প্রভার দেব্‌তাকে
নূতন হবার শক্তি চিরন্তন,
ডুবিয়ে দে রে অনুশোচন, যা কিছু আক্ষেপ থাকে
আজ্‌কে ক্ষ্যাপা ! সব দে বিসর্জ্জন ।

তাজা হবার তাগিদ্ এল সৃজন ক'রে নওরোজে,
জঞ্জালে আজ আগুন জ্বালার দিন,
চাকার ভিতর চল্‌ছে চাকা,... বুঝ্ আছে যার সেই বোঝে,
জমায় পাড়ি অগাধ জলের-মীন ।

* * * *

দিন কিনে নে প্রাণের হাটে ঘূর্ণি-ঘোরার মাঝখানে
বৃহৎ প্রাণের চাই রে রসদ চাই,
নূতন তারে সাজিয়ে সেতার চল্ সে গুণীর সন্ধানে,—
নবীন প্রাণের গান আছে যার ঠাঁই ।
প্রাচীন শাখী তরুণ হ'ল কিশলয়ের হাস্যে রে,
বিশ্বে চলে রসের রসায়ণ,
নূতন তালে রক্ত চলে হিয়ায়, হাওয়ার লাস্যে রে,
নবীন আলোয় বিভোল্ দু'নয়ন !
চিরদিনের ঘুরন্-পাকে এই যে নূতন মন-গড়া
এর সাথে আজ মিলিয়ে নে রে হাত,
অশোক-ফুলের স্তবকে, ছাখ্, রাঙা-চেলীর গাঁট্‌ছড়া
জর্দ্দা-চেলীর উত্তরীয়ের সাথ !
বাঘছালে যার নাগের বাঁধন তার দু'নয়ন ঢুল্‌ছে রে
ভুল্‌ছে সে আজ বিষাণ-বাদন তার,
আরম্ভেরি বোল্ কেবলি ডম্বরু তার তুল্‌ছে রে,
অম্বরে ভায় স্বয়ম্ভূ-ওঙ্কার !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

কথিকা

এবার মনে হল মানুষ অন্যায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েচে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মানুষ অনেকদিন থেকে একখানি আসন তৈরি করচে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে তার দেবতা আস্‌বেন, তিনি পথে বেরিয়েচেন।

যেদিন উন্মত্ত হয়ে সেই তার অনেকদিনের আসন সে ছিঁড়ে ফেলে সেদিন তার যজ্ঞস্থলীর ভগ্নবেদী বলে, "কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আস্‌বে না।"

তখন এতদিনের আয়োজন আবর্জ্জনা হয়ে ওঠে। তখন চারিদিক থেকে শুন্‌তে পাই, "জয়, পশুর জয়।" তখন শুনি, "আজও যেমন, কালও তেম্‌নি। সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মত, চিরদিন একই ঘানিতে একই আবর্ত্তন তুল্‌চে। তাকেই বলে সৃষ্টি। সৃষ্টি হচ্চে অন্ধের কান্না।"

মন বল্‌লে, "তবে আর কেন? এবার গান বন্ধ করা যাক্! যা আছে কেবল-মাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারি আশা নিয়েই গান।"

শিশুকাল থেকে যে-পথের পানে চেয়ে বারে-বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেচে, যে-পথ দিগন্তের দিকে কান পেতেছে দেখে' বুঝেছিলুম ওপার থেকে রথ বেরল, সেই পথের দিকে আজ তাকালেম, মনে হল সেখানে না আছে আগন্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বল্‌লে, "দীর্ঘপথে আমার সুরের সাথী যদি কেউ না থাকে তবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।"

তখন পথের ধারের দিকে চাইলুম। চম্‌কে উঠে দেখি, ধূলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ; তাতে একটিমাত্র ফুল ফুটেচে।

আমি বলে উঠ্‌লুম, "হায়রে হায়, ঐত পায়ের চিহ্ন!"

তখন দেখি দিগন্ত পৃথিবীর কানে-কানে কথা কইচে, তখন দেখি, আকাশে-আকাশে প্রতীক্ষা। তখন দেখি চাঁদের আলোয় তালগাছের পাতায়-পাতায় কাঁপন ধরেচে, বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে-চোখে ইসারা।

পথ বল্‌লে, "ভয় নেই।" আমার বীণা বল্‌লে, "সুর লাগাও।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রং-বেরং

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

[বুড়োশিবতলায় 'জটে'-বাবার আশ্রম। একদিকে একটা বটতলায় ভাঙা শিবমন্দিরের ঘাট। একহাতে আঁকশী, একহাতে সাজি নিয়ে পার্ব্বতী-বুড়ির প্রবেশ।]

পার্ব্বতী। ফুল তুল্লেম, ফল পাড়লেম, ঠাকুর তো এখনো ভিক্ষে করে ফিরে এলেন না;—সন্ধ্যে উৎরে যায়; যাই ঘাটটা গঙ্গাজলে ধুয়ে রাখি।

(নেপথ্যে ঘুঘু ডাকলো!)

আ মর্! ঘুঘুটা আবার মন্দিরের উপরে বাসা বাঁধতে লেগেছে!

ঘুঘু। বৌ—বৌ—

পার্ব্বতী। দূর হ! দূর হ! বাসা বাঁধবার আর জায়গা পাওনি বৌকে নিয়ে! ঠাকুরের ঘরে ঘুঘু-চরাতে চাও!

ঘুঘু। বৌ, ওগো বৌ!

পার্ব্বতী। রোস্ তো, এই আঁকশী দিয়ে তোর ঘুঘুর বাসা চুর করি! বৌ নিয়ে ঘর করাচ্ছি ঠাকুরের আশ্রমে! (আঁকশী নিয়ে তাড়া) যাঃ—যাঃ, দূর হ!

(জটে-বাবার প্রবেশ।)

জটে। ও পার্ব্বতী, বলি হচ্ছে কি ও?

পার্ব্বতী। রোজ তাড়াব, আর রোজই এসে ওই ঘুঘুটা বাসা বেঁধে এখানে ঘরকন্না বসাবার চেষ্টা করবে। এটা আশ্রম—তা বোঝে না!

জটে। তা ওর যদি ইচ্ছে হয় বাঁধুক না বাসা। এখানে তো অনেক জীব-জন্তু বাসা বেঁধেছে—না হয় ওরা দুটিতে থাকলো; এতে তোমার এত আপত্তি কেন?

পার্ব্বতী। দুটি যদি হতো আপত্তি ছিল না। দুটি, তারপর দশটি, এমনি করে শেষে এখানে পালে-পালে ঘুঘু চরলেই মুস্কিল!

(ঘুঘু ডাকলো।)

জটে। ঘুঘুর ডাক আমায় বড় মিষ্টি লাগে, ওদের তাড়িও না;—তুমি এখন আপনার ঘরে যাও।

পার্ব্বতী। তা থাক ঘুঘু-দুটো। (স্বগত) কাল সকালেই দুটোকে বিদায় করছি।

জটে। ভাবছ আমি কাল যখন ভিক্ষেয় বেরোবো আর তুমি ওদের আস্তে-আস্তে এখান থেকে বিদায় করবে,—কেমন বুড়ি?

পার্ব্বতী। ছিঃ, ছিঃ, ঠাকুর জানতে পেরেছেন!—ঠাকুর, অপরাধ নিওনা। একটা কথা বলবো-বলবো করছি কদিন—

জটে। তা বলেই ফেল না—

পার্ব্বতী। আমি কিছু টাকা জমিয়েছি।

জটে। সে তো ভালো কথা পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। একলা আমি অনেক টাকা নিয়ে কি করবো—

জটে। ইহকালের কাজে লাগিয়ে দাও, নয় তো—

পার্ব্বতী। ইহকাল তো কেটে গেল

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

একরকমে, এখন পরকালের জন্তে আমি ওই টাকাটা—

জটে। সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও? তা তো হবার জো নেই পার্ব্বতী;—টাকা তো সঙ্গে যাবে না!

পার্ব্বতী। টাকা যাবে না জানি, কিন্তু টাকা দিয়ে যা কিছু পুন্নি করবো, তার ফলটা তো সঙ্গে যাবে?

জটে। তা তো আমি ঠিক বলতে পারিনে পার্ব্বতী। পণ্ডিত-মশায়কে শুধিয়ো।

পার্ব্বতী। তাঁকে শুধিয়েছিলেম। তিনি বলেন এই বুড়ো শিবের মন্দির আর ঘাট টাকা খরচ করে বেশ করে পলস্তারা ছিমেণ্ট দিয়ে নতুন করে দিতে। আর এই বন-জঙ্গল কেটে সাফ করে এখানে একটা ধর্ম্মশালা বসিয়ে দিতে।

জটে। সর্ব্বনাশ! তাহলে আমি যাবো কোথা? এই যে নানা জীবজন্তু নিয়ে আমি এখানে—(নন্দীর প্রবেশ) ওহে নন্দী, পার্ব্বতীর কথা শোনো, উনি এখানে একটা ধর্ম্মশালা বসিয়ে পুন্যি করতে চাচ্চেন!

নন্দী। ভালোই তো! ধর্ম্মশালা হয় তো, ঠাকুর মোহন্ত হয়ে গদীতে বসে আরাম করবেন।

জটে। নন্দী, তুমি কালই পার্ব্বতীকে ওঁর বাপের বাড়ী পৌছে আসবে।

পার্ব্বতী। কেন ঠাকুর, আমি কি অপরাধ করলেম যে আমাকে চরণ-ছাড়া করবেন?—আমি কিছুতে যাবো না; এইখানে পড়ে থাকবো।

জটে। এ আশ্রমটা তোমার না আমার—শুনি?

পার্ব্বতী। আমি তো বলিনি আশ্রমটা আমার?

জটে। তবে যে এটাকে ভেঙে-চুরে নতুন করতে চাচ্ছ?

পার্ব্বতী। নতুন করে দিতেম তো ভালোই হতো। তা ঠাকুর, তোমার যখন তা ইচ্ছে নয়, তখন এমনিই থাক্; আমি রোজ ঝাঁটিয়ে যাবো।

জটে। কিন্তু খবরদার! সাপ, ব্যাঙ, মশা, মাছি, বোল্‌তা, ঘুঘু, পায়রা, গরু, ছাগল কাউকে কিছু বলেছ কি তোমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়েছি!

(মন্দিরের মধ্যে প্রস্থান।)

নন্দী। ঠাকুর আজ হঠাৎ চটলেন কেন?

পার্ব্বতী। কি জানি বাবা! দুটো বুনো, ঠাকুর যেখানটিতে আসন কোরে বসেন, তারি উপরে বাসা বাঁধচে দেখে আমি তাড়াতে চাইলেম, দেখেই ঠাকুর রেগে গেলেন!

নন্দী। তাহলে তো ঠাকুরমা তোমার কাজ গেল! আঁকশী দিয়ে কিছু পাড়তে পারবে না, ঝাঁটা দিয়ে কিছু ঝাঁটাতে পারবে না।

পার্ব্বতী। গজাক্ গে তোমার ঠাকুরের বাগানে চোর-কাঁটা আর মনসা! ভেঙে পড়ুক এই মন্দিরটা তোমার ঠাকুরের—

নন্দী। চুপ, চুপ, অমন কথা বলতে নেই!

পার্ব্বতী। তাতে আমার কি এল-গেল! মন্দির ভেঙে পড়লে ঠাকুরেরই লোকসান! ঝাঁটা আর আঁকশীর কাজ আমার তাতে কবে তো বন্ধ হবে না একদিনও! চলুন, এখন শিবরাত্তিরের জোগাড় দেখি। (প্রস্থান।)

(একটা ভৃঙ্গার হাতে ভৃঙ্গীর প্রবেশ।)

ভৃঙ্গী। ছুটি চাইলে? ঠাকুর কি বল্লেন?

নন্দী। মেজাজ আজ বড় খারাপ। বুড়িটা চটিয়ে গেছে। ছুটি চাইতে সাহস হল না।

ভৃঙ্গী। তুই বড় বোকা, কোনো ছুতোয় অমনি ছুটিটা চেয়ে বসতে হয়!

নন্দী। সময় পেলুম কোথা যে চাইবো? —এসেই দেখি ধুন্ধুমার বেধেছে!

ভৃঙ্গী। তাহলে এখন উপায়?

নন্দী। এইখানেই দুজনে ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে গান করা যাক্।

ভৃঙ্গী। টিক্‌টিকিটি পর্য্যন্ত কেউ বাকি নেই, সবাই চলেছে—আর আমরা-দুটিতে থিয়েটার দেখবো না?

নন্দী। ঠাকুর এলেন জটে-বাবা সেজে, আমরা এলেম তাঁর চেলা সেজে বুড়ো শিব-তলায়,—এই তো এক থিয়েটার! আজ এই দেখ! ঠাকুর যদি কৃপা করেন তো পৃথিবীতে যখন এসেছি, তখন থিয়েটার দেখে যাবোই-যাবো।

(জটে-বাবার প্রবেশ।)

জটে। দেখ-দেখি তিনখানা কি কাগজ আমার সিদ্ধির ঝুলিতে ছিল। কে দিয়ে গেল কিছুই মনে নেই।

নন্দী। এ যে দেখি থিয়েটারের টিকিট!

ভৃঙ্গী। কই দেখি?

জটে। কিছু পত্তর-টত্তর না তো? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এঁরা কিছু খবর পাঠাননি তো?

ভৃঙ্গী। আজ্ঞে না। আমাদের নামে দুটো পোষ্টকার্ড সৈরবী দিদি পাঠিয়েছেন।

জটে। তোমার দিদি ভালো আছেন তো?

ভৃঙ্গী। আজ্ঞে না। তার ভারি অসুখ! স্বর্গ থেকে দেবতাদের তাড়িয়ে দৈত্যরা তাঁকে পিঁজরাপোলে বন্ধ করে বড় কষ্ট দিচ্ছে, তাই তিনি আমাদের একটিবার দেখতে চেয়েছেন।

জটে। তাইতো—নন্দনপুর তো কম রাস্তা নয়! তাহলে আজ রাতে আর তোমরা ফিরতে পারছ না বোধ হচ্ছে।

নন্দী। কাল ঠাকুরের ধ্যান-ভাঙবার আগেই আমরা এসে হাজির হবো, কেবল রাতটুকু—

জটে। তবে যাও। আমার আসন, ভৃঙ্গার, ত্রিশূল—

ভৃঙ্গী। সব মন্দিরের মধ্যে গোছানো আছে।

(জটের প্রস্থান।)

ভৃঙ্গী। এই তো ছুটি হয়ে গেল, চল এখন সেজে-গুজে বার হওয়া যাক্।

নন্দী। ঠাকুরের সামনে মিছে কথা-গুলো বল্‌লি কেমন করে?

ভৃঙ্গী। না হলে টিকিট ক'খানা মারা যায় যে!

নন্দী। আর যখন ঠাকুর শুন্‌তে পাবেন মিছে কথা বলেছিস্?

ভৃঙ্গী। কি করে শুনবেন আমরা কোথায় গেছি?

নন্দী। ঠাকুরমা যদি বলে দেয়?

ভৃঙ্গী। আরে মুখ্যু, ঠাকুরমা জানবে কেমন করে আমরা কোথায় গেলুম, কোথা থেকেই বা এলুম?

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

নন্দী। ঠাকুরমা যে শুধিয়েছিল আমাকে —দিদি কেমন আছে? আমি বলেছি আজ সৈরন্ধ্রীদির লেখা পেয়েছি, সে ভালো আছে।

ভৃঙ্গী। তবেই আমার মাথা খেয়েছ! আচ্ছা, কথা কইতে জানিস্‌নে তো কথা কোস্ কেন বল্‌তো? তোকে পৃথিবীতে এসে পর্য্যন্ত মানা করছি—ওরে কথা কস্‌নে! কইতে জানিসনে তো মৌনী-বোবা সেজে থাক্।

নন্দী। আমি তো মিছে বলিনি, সত্যিই যা তাই বলেছি।

ভৃঙ্গী। সত্যি বোলে কারো কিছু লাভ হল? লাভের মধ্যে আমাকেই বিপদে ফেল্লি, আর টিকিট ক'খানাও মারা গেল!

নন্দী। কিন্তু কাল যখন ঠাকুর সব-কথা শুনবেন, তখন যে টিকিটের সঙ্গে আমরাও মারা যাবো, তার কি?

ভৃঙ্গী। তুই থাম তো! তোকে মুখ বুজে থাকতে বল্লুম না, আবার কথা কচ্ছিস! চুপ্, কে আসছে দেখ্!

(পার্ব্বতীর প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। বাবা নন্দী, আমাকে বাপের বাড়ীতে রেখে এসো;—ঠাকুরের মুখের কথা আমি ঠেলবো না।

নন্দী। সে কি ঠাকুর-মা! আমরা যে এখন অন্য জায়গায় যাচ্ছি। কাল গেলে হবে না?

ভৃঙ্গী। চুপ্, ফের্ মুখ খুলেছিস্!

পার্ব্বতী। কোথায় যাচ্ছ বাবা তোমরা?

ভৃঙ্গী। ঠাকুরমা, আমরা তো তোমার বাপের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিনে, ঠিক তার উল্টো দিকে চলেছি যে!

পার্ব্বতী। কোথায় বাবা?

ভৃঙ্গী। তা তোমায় বল্‌তে পারবো না ঠাকুর-মা!

নন্দী। তুই কি যে বলিস তার ঠিক নেই! তুমি ওর কথা শুনোনা ঠাকুর-মা। আমি কাল নিশ্চয়—

পার্ব্বতী। এই রাতের বেলায় দুজনে কোথায় যাচ্ছিস, শুনি?

ভৃঙ্গী। ঠাকুরকে যদি না বল তো বলি।

পার্ব্বতী। লুকিয়ে বুঝি শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হচ্ছে?

নন্দী। না ঠাকুর-মা, শ্বশুর-বাড়ী কেন?

ভৃঙ্গী। তুই থাম্ না। ঠাকুর-মা শুনবে কোথায় যাচ্ছি? কিন্তু ঠাকুরকে বোলো না, তাহলে আর সেখানে যাওয়া হবে না। আমরা থিয়াটার দেখতে যাচ্ছি।

পার্ব্বতী। সে আবার কি,—থ্যেটার?

ভৃঙ্গী। সেখানে নাচ, গান, সং, কত কি দেখা যায়! তুমি যাবে ঠাকুর-মা?

পার্ব্বতী। তা চলনা, দেখে আসি। কিন্তু মেয়েমানুষ আমাকে সেখানে যেতে দেবে তো?

ভৃঙ্গী। কেন দেবে না?—টিকিট থাক্‌লেই দেবে।

পার্ব্বতী। আমার ত টিকি নেই, খোঁপা।

ভৃঙ্গী। আমার তিনটে টিকিট আছে, তাতেই হবে। কিন্তু যদি ঠাকুর জানতে পারেন তাহলে—

পার্ব্বতী। কেন জানবেন?—তাঁকে তো আর আমি বলতে যাচ্ছিনে! চল্, চুপি-চুপি বেরিয়ে পড়ি।

(ভেঁপু দিয়া মটর-গাড়িতে সাহেবী-সাজে

শ্রীধর; সঙ্গে বোম্বাই-সাজে শ্রী।)

পার্ব্বতী। একি, শ্রীধরের একি সাজ! ছোট-বৌ দেখছি! ওমা, লক্ষ্মীঠাকরুণের কি সাজ!

শ্রীধর। দাদা কোথায়?

ভৃঙ্গী। আজ্ঞে তিনি হাত-মুখ ধুয়ে এই মাত্র একটু আরাম করতে গেছেন।

শ্রীধর। খবর দাও, দাদাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভৃঙ্গী। আজ্ঞে তাঁর মেজাজটা আজ সকাল থেকে—

(শ্রীধরের ভেঁপু বাদ্য। জটের প্রবেশ।)

জটে। কি একটা বিকট আওয়াজ হল? এ কে?

শ্রীধর। আমি শ্রীধর। চলুন দাদা, আজ আপনাকে থিয়েটার দেখিয়ে আনি। এখনো যে প্রস্তুত হননি? টিকিট তো আমি সক্কালেই পাঠিয়েছি।

জটে। সব ভুলে গেছি ভাই! আমার ক ও-সব মনে থাকে?

শ্রীধর। আর তো সময় নেই, চট্ করে তাহলে—

জটে। তা চলনা! আমার আবার প্রস্তুত কি!

শ্রীধর। এই বেশেই?

পার্ব্বতী। আমাদের আর বেশ কি বল!

জটে। তুমিও যাবে নাকি? সেখানে অনেক বাইরের লোক!

পার্ব্বতী। বৌ যাচ্ছে আর আমি ব না?

নন্দী। ঠাকুরমা তো যাচ্ছিলেনই আমাদের সঙ্গে।

ভৃঙ্গী। তোর কি মুখ কিছুতে বন্ধ হবে না! ঠাকুর, আমরা কোনোদিন মটোরে চড়িনি, থিয়েটারও দেখিনি।

জটে। মটোরে আবার চড়ে নাকি? সে তো খায়!

(মুখে রুমাল দিয়া শ্রীর হাস্য।)

শ্রীধর। একেই বলে মোটর-গাড়ি, আর যেখানে যাচ্ছি, সেটা থিয়েটার।

জটে। ওঃ, তাই বল! তা এতে এত লোক চাপালে ঘোড়া টানবে কেমন কোরে? তাহলে আমি বরং থাকি, ওরাই যাক্।

শ্রীধর। এর নাম হাওয়া-গাড়ী, মানুষের ছিষ্টি। এতে ঘোড়া নেই, আপনি চলে। যত জন খুসি, যতদূর খুসি, চলে যান্।

জটে। তাই নাকি! তবে চল সবাই।

(শ্রী আর পার্ব্বতী ভিতরে উঠলেন, সামনে বসলেন শ্রীধর ও জটে, পিছনে নন্দী-ভৃঙ্গী।)

মটোর। র-র-র-র!

জটে। দেখো, দেখো! সাম্‌লে চল—একটু আস্তে ভাই!

শ্রীধর। কিছু ভয় নেই।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ইন্দ্রের স্মোকিংরুম। ফিট্-বাবু-বেশে ইন্দ্র। সান্ধ্য-বেশে, কেউ ড্রেসগুট, কেউ পাঞ্জাবী ইত্যাদি বিচিত্র বেশে দেবগণ। ঘরের দেয়ালে ইন্দ্রের রাজাবাহাদুর-বেশে মাথায় পালক বুকে তক্‌মা ও চাপরাস দেওয়া অয়েল পেন্টিং।]

ইন্দ্র। চন্দর, কটা বাজালো হে?

চন্দ্র। (হাতঘড়ি দেখে) সাড়ে-আট দেবরাজ!

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ইন্দ্র। তাহলে যাওয়া যাক চল থিয়েটারে। ওহে সূর্য্যি, একটু গরম হয়ে নাও।

সূর্য্যি। আমায় কাল সকালেই আফিস করতে হবে, আমি আর যাব না ভাবছি।

ইন্দ্র। তাহলে দনু বড় রাগ করবেন। চল দেখে আসা যাক্, কি নতুনতর কাণ্ড হবে শুনছি। তোমার তেষ্টা ভাঙল বরু?

নারদ। ভরত-মুনিকে বাদ দিয়ে নাটক যা হবে, তা বুঝতেই পারছি।

ভরত। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা কেউ নেই; নাটক যা হবে তা—

ইন্দ্র। নাটকখানা লিখলেই বা কে, বইটার নামই বা কি?

ভরত। তা জানিনে, শুনেছি মানুষের লেখা। পাত্র-পাত্রী সব দেবতার বাহন জন্তু-জানোয়ার।

(ব্রহ্মার কাঁচা-পাকা দাড়ি, চসমা-চোখে গরদের ধুতি-চাদর-পরা উপাচার্য্য-বেশে প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলিয়া) পিতামহ!

পিতামহ। ওহে ইন্দ্র, কি করি? মহা বিপদ উপস্থিত। দনুর ওখানে নিমন্ত্রণ অথচ আমার—

নারদ। সে ছেলে-ছোকরার দলে আপনি নাই গেলেন! তাছাড়া থিয়েটার হল একটু—

ব্রহ্মা। একটু কি, একেবারে অশ্লীল! কিন্তু তবু একবার যেতে হয়। দেব-দানবে হাঙ্গামা-ঝগড়ার পরে একটা সন্ধি হয়েছে; দনু ঝেঁটিয়ে চাকর-বাকর মায় সহিস-কোচমান পর্য্যন্ত টিকিট দিয়েছে; আমি না গেলে কি ভালো দেখায়। কিন্তু আমার গাড়ী নেই, তোমাদের সঙ্গেই—

ইন্দ্র। তাইতো, আমাদের একটু ঘুরে যেতে হবে—

ব্রহ্মা। তবেই তো মুস্কিল!

ইন্দ্র। আপনি নারদের সঙ্গে আসুন—আমরা এগোই। (প্রস্থান।

নারদ। চলুন, তাহলে আমরাও এগোই।

(সকলের প্রস্থান।)

(ফ্যান্-হাতে বাতাস খেতে-খেতে শচীর প্রবেশ। সঙ্গে নন্দনী দাসী।)

শচী। গাড়িতে আমার পানের ডিবে তুলে দে নন্দনী! ইনি বুঝি বেরিয়েছেন?

নন্দনী। হাঁগো দেবরাণী, এ কি থ্যাটার দেখার ধুম গো! সারা রাতটা আজ ভোগাবে। আহা হতো কেষ্টো-যাত্রা কি রাম-নীলে দেখে পুণ্যি হতো। কি ধেই-ধেই, ভাল লাগে না বাপু! ওই যে কানসাট কিসের বাদ্যি, সেটা যে লাগে কানে, মা মা, যেন কর্ণ বধির করে দেয়! (পানের ডিবেটা গুছাইয়া নেওয়া।)

শচী। আয়না চট্ করে!

নন্দনী। এই যে যাই, চল দেবরাণী।

শচী। জয়ন্ত কোথায়?

নন্দনী। সে ওই যে নালটুপি পরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

শচী। সে ছেলেমানুষ, সেখানে কি করবে?

নন্দনী। কার্ত্তিক গণেশ থ্যেটারে শুনে, সেও নেচেছে—

শচী। আরে, সে সেখানে গিয়েই যাবার জন্যে কান্না ধরবে; বড় মুস্কিল হবে

নন্দনী। ছেলেমানুষ দেখবে না?—সেথোরা সবাই যাবে! একটু বোতলে দুধ ভরে নিয়ে চল, খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব অখন।

শচী। তাই নে সব গুছিয়ে। ভালো ল্যোঠা! নিয়েই গেলেই পার্ত্তেন তাঁর সঙ্গে। আমার স্কন্ধে ঝঞ্ঝাট চাপিয়ে গেলেন!—নে চট্ করে চল্।

(পাখা নাড়িতে-নাড়িতে প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

[হুঁকো-টানিতে-টানিতে একটা নামাবলী গায়ে সাজ-ঘরের কর্ত্তা গরুড় ও মুখে চুণকাম-করা সখীবেশে তার এক্‌ট্রেস্ তারিণী।]

তারিণী। দেখুন না আমার মুখের রংটা কেমন হয়েচে! আর-একটু সাদা মাখি—

(চুণের প্রলেপ।)

গরুড়। নাও, নাও, চট্‌পট্, আর দেরি নেই! একটু যেন বেশী সাদা হল বোধ হচ্ছে—

তারিণী। বেশী হয়েচে? (আয়নায় দেখে) কই না তো!—গালে একটু লাল দিলেই হবে। (লাল লেপিয়া) আমার চোখের কাজলটা আর একটু টেনে দিন্ না—

গরুড়। নাও, নাও, ডানা-দুখানা চট্ করে বেঁধে নাও, পালকের টুপিটা—

তারিণী। (টুপি পোরে) একি বিশ্রি দেখাচ্ছে! এই কাগজের ফুলগুলো—

গরুড়। আবার ওগুলো নিয়ে টানা-টানি কেন? ও যে অন্য লোক পরবে।

তারিণী। তা কি হবে? আমি এ টুপি পোরে সং সাজতে পারবো না।

গরুড়। আরে, তোমার পার্ট যে পাখীর! এ-রকম করলে তোমাকে নিয়ে কাজ চলা দায়!

তারিণী। আমার মাথা বড় ঝিম্-ঝিম্ করছে। বোধ হয় মাথা ধরলো। টুপিটা যে গরম বাপু!

গরুড়। তা থাক্, তোমার যা ইচ্ছে পোরে নাও, আমি আর কিছু বলতে চাইনে।

(এক-গালে-রং হারার প্রবেশ।)

হারা। আমার মটুকটা কে নিয়ে এল?

গরুড়। মটুক কি? তোমার যে ঝুটি পরবার কথা। লক্কা-পায়রা সেজে বেরোতে হবে, জাননা?

হারা। পরী-দিদিকে পায়রা সেজে যা দেখাচ্ছে ভাই, কি বলবো, হেসে বাঁচিনে! ও যেমন পরতে গেল এই সাজ, আমি হলে—

গরুড়। ফের এখানে গোল করতো ঘাড় ধরে বের করে দেবো! যাও নিজের জায়গায়।

(শ্রীধরকে টানিতে-টানিতে দনুর প্রবেশ।)

শ্রীধর। মাই ডিয়ার দনু, কি করছ? ওঁদের সাজতে দাও।

দনু। ধ্রুবতারা! মাইফ্রেণ্ড শ্রীধর, ধ্রুব-তারা!—

গরুড়। বাবু যে! হুজুর, আপনি এখানে—

শ্রীধর। এই যে গরুড়, তোমাকেই একবার দেখতে এলেম। মাইডিয়ার ফেলো! লেট আস্ গো, ঘণ্টা দিচ্ছে ওদিকে!

দনু। দিলেই বা ঘণ্টা, একটু রিফ্রেস্‌ড্ হয়ে নেওয়া যাক্; চল ওধারে। (প্রস্থান।)

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

গরুড়। তাহলে তারিণী, আর তুমি সাজতে দেরী করো না, সব তৈরি—

(প্রস্থান।)

তারিণী। (মুখে চুণ লেপিতে-লেপিতে) আমি কিছুতেই ওই বিশ্রি পালকগুলো পরছি নে।

(পেণ্টারের প্রবেশ।)

পেণ্টার। আমার আঁকার তুলিটা কে নিলে? ব্যস্, এটাকে রং-জুবড়ে দফা খেয়ে বসে আছ?—নিজেও বহুরূপী সেজেছ!

তারিণী। তা যাওনা, তোমার রং-তুলি নিয়ে ওদের সাজাওগে, আমি নিজেই সাজতে জানি।

পেণ্টার। এ রকম সেজে বার হলে লোকে বলবে কি?

তারিণী। তোমার সে ভাবনা কেন?

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

[ড্রপ-সিনের উল্টো পিঠ। পর্দ্দার একটা ফুটো দিয়ে আলো আসছে। শুম্ভ নিশুম্ভ দুই প্রম্টার ও ম্যানেজার। ধুতির উপরে সার্ট ও চটি পায়ে, গায়ে চাদর নেই।]

শুম্ভ। সবাই তো এসেছেন—আর দেরি কেন? দেখছ কি ভাই নিশুম্ভ?

নিশুম্ভ। রয়েল-বক্স এখনো খালি দাদা!

শুম্ভ। দেখি। এই যে ফিচ্ কোম্পানির বড়-সাহেব এসে বসলেন। আর দেরি না। রয়েল-বক্সের ডাইনে কে হে কালা-সাহেবটি?

নিশুম্ভ। শ্রীধর, দেখছ না?

শুম্ভ। আর পাশেই ওঁর শ্রী বুঝি? ওহে, ওদিকে যে আমাদের ঠাকুর-মশাই বসে!

নিশুম্ভ। ছেজ-বক্সে বসলো কে?

শুম্ভ। একদিকে নারদ, একদিকে ভরত; দুই সমজদার দুই পাশে। নিশুম্ভ, বলে দাও, সবাই যেন সাবধানে একটু করে, ভুল-চুক না হয়।

নিশুম্ভ। ইন্দ্র-চন্দ্র এঁরা এসেছেন তো দাদা?

শুম্ভ। কাউকে দেখছিনে। না, না, ওই যে সবাই পিটে বসেছেন।

নিশুম্ভ। দেবতারা চিরকাল পিটে বসেন দেখছি!

(ঘণ্টা ধ্বনি।)

শুম্ভ। চল, চল, আর দেরি নয়। ঐ আসছেন ধ্রুব-তারার ধ্রুব, আর আদুরে ছেলে পেল্লাদ! ভোগালে!

(যাত্রার দলের রাজ-বেশে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের টলিতে-টলিতে প্রবেশ।)

প্রহ্লাদ। সব তো রেডি?

ধ্রুব। খঞ্জন-খঞ্জনী, বুল্‌বুল্, মনুয়া—এরা কোথা?

শুম্ভ। তারা সাজ পরচে। তোমরা বসলে প্লে আরম্ভ হবে।

নিশুম্ভ। ওদিকে নয়, ও গ্রীণ রুম্! এই বাইরে যাবার পথ।

শুম্ভ। সাইড্ দোরটা বন্ধ করে দাওনা। বাজে লোক কেন আসতে দিচ্ছ?

নিশুম্ভ। আর নয়, কন্‌সার্টের ঘণ্টা দাও।

(কন্‌সার্ট আরম্ভ।)

সিন্‌সিফ্‌টার। যত লোক এইখান দিয়ে যাতায়াত করবে! দড়িগুলো জড়িয়ে গেছে, ড্রপ্ তুলি কেমন করে?

নিশুম্ভ। দেখো, কপিকলটা না বিগড়ে যায়! টান এইবার।

(বাঁকিয়া-চুরিয়া ড্রপ্ উঠিল।)

পঞ্চম দৃশ্য

[অন্ধকার একটা আঙিনার ডানদিকে একটি পোড়ো বাড়ীর খোলা জান্‌লা। গরাদের ওপারে মিট্‌মিটে আলো বাতাসে নিভ্‌ছে, জ্বলছে। আঙিনার বাঁদিকে হেলে-পড়া-মাচায় ঠেস দিয়ে ঝুমকো-লতা বাতাসে দুলছে; তারি শিয়রে নীল আকাশে একটি তারা। পাড়ো-বাড়ীর জান্‌লা দিয়ে দু-একটা ফুলঝুরি আলোর স্ফুলিঙ্গগুলো অন্ধকারে ঝরিয়ে-ঝরিয়ে দিয়ে নিভে গেল। একটা শামাপাখী সিটি দিলে। কোলা-ব্যাঙের করতাল বাজলো; কাকগুলো ঘুমের ঘোরে একবার কাকা করে ডেকে থামলো।]

(বসন্ত-বাউরী, কোকিল, পাপিয়া আর কুকুরের একে-একে প্রবেশ।)

পাপিয়া। পিউ!

কোকিল। উহুঃ, মরে যাই, বসন্ত এল, উহুঃ!

পাপিয়া। সে রইল মানে—পিউ কাঁহা পিউঃ!

বসন্ত-বাউরী। পিউ বোলেও ফল নেই, কুহু কোরেও লাভ নেই। বল, বৌ কথা কও বৌ—

কুকুর। রও, গোল কোরোনা, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী আসছেন।

[বেঙ্গমীর হাত ধরে বেঙ্গমা, সঙ্গে একে-একে আশপাশি ময়ূর আর পেরু, বক আর হাঁস, লক্কা-পায়রা আর দাঁড়কাক বাবুই ও তালচড়াই আসরে এলেন। খঞ্জন-খঞ্জনী এসে নাচ-গান আরম্ভ করলে।]

(গান)

আসা-যাওয়ার বাঁকে-বাঁকে
থেকে-থেকে দেখা পাওয়া।
বারে-বারে হারিয়ে গিয়ে
কাছে দূরে খুঁজে পাওয়া।
থেকে-থেকে-হেসে চাওয়া,
ফিরে-ফিরে কেঁদে যাওয়া,
বারে বারে নতুন করে
তোমায়-আমায় দেখা পাওয়া।

বেঙ্গমা। ভোরে আলো ঝলক দিয়ে আসে ঘুরে।

বেঙ্গমী। ভরা সাঁঝে ঝিলিক দিয়ে চলে দূরে।

সকলে। বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর-ঝুমুর আসা-যাওয়া,
গেয়ে যাওয়া, হেসে চাওয়া,
থেকে-থেকে দেখা পাওয়া।

(কাক-সন্ধ্যার একটু আভা নীল-আকাশে পড়লো। টিং টিং কোরে স'পাঁচটার ঘড়ি দিতে-দিতে চারা-মুখ ঘড়ির প্রবেশ।)

ময়ূর। কেও, কে আসে ও?

ঘড়ি। সঃ কালঃ।

বেঙ্গমা। এরি মধ্যেই কাল এলো?

বেঙ্গমী। নাচ-গান সুরু হতে না হতে?

ময়ূর। ভাই দাঁড়কাক, তুমি কি ডেকে-ছিলে যে কাল আসছে?

কাক। ভাই ময়ূর, তুমি ডাকলে নাকি, যে অকালে বাদলা এসে আসরটা ভেঙে দিতে চাচ্ছ?

পেরু। হাঁস, বক, লক্কা-পায়রা এঁদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ ডেকেছেন।

লক্কা। ভাই পেরু, তুমিই ডেকেছ এবং এখনো ডাকছ!

খঞ্জন-খঞ্জনী। ওগো শুনলেনা, কোকিল ডাকলো, পাপিয়া ডাকলো, বসন্ত-বাউরীও ডাকলো, কাল আর না এসে থাকতে পারে!

কোকিল। আমরা ডাকলেম এলো বসন্তকাল; আর তোমরা তাল দিয়ে নেচে

ডাকলে কিনা, তাই আসছে নিদেনকাল —তাল-বেতাল সঙ্গে করে!

ঘড়ি। শুনছো পায়ের শব্দ—এক, দুই, তিন—ফাঁক!

বাবুই। কোথায় হে তাল-চড়াই, জড়-ভরতটি হয়ে রইলে কেন? লাগাও না ঠুমরী! বলি ও বুল্‌বুল্, ও মনুয়া, এগিয়ে এসো, কোণে কেন?

চড়াই। ওই ঢিমে-তেতালা আসছে, দেখনা।

(কাছিমের প্রবেশ।)

বেঙ্গমা। কি হে কাছিম-সাহেব, এত দেরী যে?

কাছিম। এমনিই বা কি দেরী হয়েছে, খরগোস তো এখনো পৌঁছান নি! এই খোলটা বেঁধে নিতেই যা—

কুকুর। দেরী বোলে দেরী! এতক্ষণ ধরে তোমার পায়ের শব্দ পাচ্ছিলুম যে মনে হলো বুঝিবা কাল এলো!—কিন্তু তুমি এলেনা কাছাকাছি!

কাছিম। ভোমরা-ভুমরী এসে গেছে?

ঘড়ি। অনেকক্ষণ! তুমি এখন খোলে চাঁটি দিলেই হয়।

কাছিম। কোথায় গো ভ্রমর-ভ্রমরী, কীর্ত্তন ধরো—

(গান)

তা দিন্, দিন্ তা, দিন্ দিন্ দিন্ তা,
ডিমে তা ঢিমে তা লে—!
তা দিয়ে লেরে, দিয়ে নেরে তা,
দেরে তা, দিগে তা, দিগে দিগে তা,
দিয়ে নেরে তা, দিগে দিয়ে তা,
তা দিগে তা!

(কোরাস্)

কাক। দিও তা, দিও তা।
কোকিল। তা দিয়ে নিও নিও!
কাক। না না তা!
কোকিল। তা দিয়ে দিও দিও!
সকলে। ওদিও না, দিও না,
দিও দিও দিও তা।

(রতা-শেয়ালের নাচিতে-নাচিতে প্রবেশ।)

শেয়াল। বা-হোয়া! বা-হোয়া!
হুতুম-পেঁচা। খুব ধুম লগায়ো, খুব ধুম!
সারস। এন্ কোর্! এন্ কোর্!
টিয়াপাখী। ক্যা—পি—টা—ল্!
রাজহাঁস। (টলিতে-টলিতে) এক্-সেলেন্! এক্ সেলেন্!
বেঙ্গমী। হেসে খেলে নাও—
বেঙ্গমা। মনের সুখে হরদম্—

(নেপথ্যে রামশিঙে বাজালো।)

ময়ূর। কেও, আসে কেও?

(আত্মারামের প্রবেশ।)

আত্মারাম। আমি রামপাখী!

(শিঙে বাজাইয়া নাচগান।)

(গান)

পালাঃ, এবার শিঙে-ফোঁকার পালা
সুরু হলরে, ও আমার আত্মা-রামপাখী, পালা!
শিঙে দে ফুঁকে, রামশিঙে দে ফুঁকে!
নেচে চল শিঙে-ফোঁকার তালে-তালে
পা ফেলে যাবার পালা সুরু করে দিয়ে, পালাঃ।

কাছিম। আরে বাবা, এ কেমন বেয়াড়া তাল?—কোমর যে দুল্‌তেই চায় না!

কুকুর। পালাই-পালাই ডাক ছাড়ছে যে!

কাক। এর চেয়ে যে কোকিলও গা ভালো।

কোকিল। ওটা তুমি বাড়িয়ে বলছ! এই শেয়াল জানেন, তুমি-আমি দুজনের মধ্যে গান ভালো কার।

(আত্মারামের শিঙেতে ফুঁ। তাড়াতাড়ি ছুঁচোর প্রবেশ।)

ছুঁচো। কেত্তন হচ্ছে নাকি?

লক্ষ্মীপেঁচা। হয় নি, হবে; এসনা এই দিকে।

(গোঁফ-ফুলিয়ে বেরালের প্রবেশ।)

বেরাল। সে ছুঁচোটা গেল কোথা?

পেঁচা। সে এইমাত্র এদিক দিয়ে চলে গেছে! (পেটে হাত বুলাইলেন।)

কুকুর। সভার মধ্যিখানে ছুঁচোকে তাড়া করে এসো, তুমি তো ভারি অভদ্র হেঃ।

বেরাল। এটা সভা নাকি? আমি বলি শোভাযাত্রা!

আত্মারাম। আমি ভাবলেম গঙ্গাযাত্রা হচ্ছে; শিঙে-ফুঁকতে-ফুঁকতে চলে এসেছি।

ময়ূর। (প্যাখম ছড়িয়ে) তুমি কোন্ দেশী পাখী হেঃ!

কাকাতুয়া। (ঝুঁটি উঁচাইয়া) দেখছনা শোভাযাত্রা!

পেরু। (গলার থলি নেড়ে গম্ভীর সুরে) দেখছনা শোভাযাত্রা!

(সকলে একে-একে আত্মারামের মুখের কাছে ঝুঁটি ও ল্যাজ নাড়িয়া)

তুমি কোন্ দেশী পাখি হেঃ!

(আত্মারামের গান)

যেখানে গয়া গঙ্গা কিংবা কাশী
সব কিছু না মেলে,
সেই দেশেরই ছেলে আমি
সেই দেশেরই ছেলে!
যেখানে বাঁকা কথার হাউই ওড়ে,
ফাঁকা কথার ফানুস্,
সেই দেশেরই মানুষ আমি,
সেই দেশেরই মানুষ!
যেখানে ঘরে-ঘরে পটোল তোলে,
বাইরে তোলে ঝিঙে,
যে-দেশেতে ফোঁকে সবাই
আমার মতো শিঙে,
যে-দেশটা শূন্য ভরে উড়ছে যেন ফানুস্!
সেই দেশেরই আত্মা আমি, সেই দেশেরই মানুষ!

ঘড়ি। তুমি শিঙে-ফোঁকা মানুষ, পাখী-দের মধ্যে কেন? যাও শিংএর দলে যাও।

আত্মারাম। তোমারও তো কালো কাঁটার মতো ছুঁছোলো শিং দেখছি, তুমি এখানে কেন?

বেরাল। নেও! ওই সরু দুটি কাঁটার মতো, ও দুটো বুঝি? শিং ঝাঁটা গোঁফ!

ঘড়ি। এ ঝাঁটা দিয়ে শিঙে যে ফোঁকে, কিম্বা যে শিঙে-ফোঁকার কাছে যায়, এমন কি নাও যায়, তাদের সবাইকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করি আসর থেকে।

(নেপথ্যে)

এক আঁকড়ি-বুড়িকে ছাড়া!

[একটুখানি বিদ্যুৎ চম্‌কালো, দূর থেকে বিষ্টি আর বাতাসের শব্দ পাওয়া গেল।]

কুকুর। কেমন জোলো আর লোণা হাওয়া দিলে, দেখেচো?

ঘড়ি। দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু বোধ করছি পষ্ট আমরি কল-বলে মর্চ্চে ধরছে!

কাছিম। (পেট চাপড়াইয়া) আমার খোল্‌টা ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ করছে!

আত্মারাম। শিঙে যতই ফুঁ কছি, কেবলি শব্দ হচ্ছে ঘড় ঘড়্!

শেয়াল। এই আত্মারামটা এসে অবধি মনটা কেমন আন্‌চান্ করছে—

বেরাল। সব যেন ভিজে-ভিজে ঠেকছে—!

সকলে। দাও ঘাড়-ধোরে আত্মারামকে দূর করে!

বাবুই। চলুক্, চলুক্, নাচ-গান চলুক্! গোল কর কেন?

তালচড়াই। সেই ভালো।

(গান)

ছিছি মিছিমিছি কর কিচিমিচি!
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে
কেউ বসে আছি কেউ চলে গেছি
সুখে কিম্বা মনদুখে!
ছিছি মিছিমিছি খিটিমিটি বাবুইহাটি খুটিনাটি!

বাবুই। তোমার নাম তাল-চড়াই, কিন্তু তোমার গানের না আছে তাল, না আছে ছন্দ! নাইকো মাথা, নাইকো মুণ্ড!

তালচড়াই। ঠিক বাবুই-পাখীর বাসাটির মতো! (দূরে ঝড়-ঝাপ্‌টার শব্দ উঠলো, পোড়ো-বাড়ীর জান্‌লাটা ঝমাৎ ঝমাৎ কোরে খুল্লো, বন্ধ হলো।)

কোলাব্যাং। কড়মড় কড় কৌটি? —দেবতা দাঁতো-খামাটি দিউকে হাসি কিড়ি!

কাছিম। আরে থাম্‌রে বাপু, তুই আর কিড়ি-মিড়ি করিসনে।

কাক। ঘড়িতে কি বল্‌ছে?

ঘড়ি। এক-আঁকড়ি এক-আঁকশী এল বোলে!

আত্মারাম। আঁকড়ি-বুড়ি আঁকশী নিয়ে? তাহলে এবার আত্মারামের কথা ফুরোলো—

ছাগল। (দাড়ি নেড়ে) তব্যা নে গাছও মুর্য্যালো! (শাক ভক্ষণ।)

আত্মারাম। রাম রাম ভাইসকল (রাম-শিঙেতে ফুঁ।)

শেয়াল। (আত্মারামের ঘাড় ধোরে) খবরদার! এখানে শিঙে ফুঁকোনা! বাইরে চল।

বেরাল। ছুঁচোটা গেল কোথায়? শিঙে ফোঁকার সঙ্গে-সঙ্গে তাকেও কেত্তন করতে পাঠালে হতো যে!

পেঁচা। (পেটে চাপড় দিয়ে) একটা আগেই এখানেই তো ছিল, আর তো দেখতে পাচ্ছিনে!

কাক। ফরসা হয়ে গেছে—আর তুমি দেখতে পাও! আমি কিন্তু দেখছি এইখানে— (পেঁচার পেটে খোঁচা।)

পেঁচা। আঃ কি! ভালো লাগছে না খোঁচা।

কুকুর। আঁকড়ি-বুড়িটা আসছে।

কাছিম। সব মাটি দেখছি! আমোদ টামোদ সব গুড়োতে হল এইবার!

কুকুর। বুড়িটার গায়ের বাতাস, কি পায়ের শব্দ পেলেই মনে পড়ে যায়—বুড়ো হয়েচি, দাঁতও পড়েছে—

সজারু। মনে পড়ে চুল পেকেছে, আর গাটা অমনি কাঁটা দিয়ে ওঠে!

কাছিম। বোধ হয় যেন কোমরে বাত ধরেচে!

পেঁচা। চোখে ছানি পড়ে আসছে!

ময়ূর। আর আমার মনে হয় সর্ব্বাঙ্গে উকুন লেগেছে আর পাখার পালকগুলি একটি কোরে খসে-খসে পড়ছে! কেমন

হে কাক, তোমার কি ঠিক এমনি মনে হয় না?

কাক। ঠিক উল্টো! বুড়িটাকে দূরে থেকে দেখি আর ইচ্ছে হয় প্যাখম-ছড়িয়ে নাচি, আর ওকে ডাকি—আয়, আয়!

ময়ূর। সে-ডাকটা সবাই পছন্দ করে মনে কর নাকি?

বেড়াল। আহা, বুড়ি তো নয় যেন ষষ্ঠী-ঠাকরুণ!

কুকুর। ষষ্ঠীর কাছে যাওনা, যষ্টিমধু খাওয়াবে এখন!

খরগোস। বুড়ির ওই সাদা চুলগুলি গর্ত্তের মধ্যে বিছিয়ে শুতে কি আরাম বলতো! যেন পালকের গদিতে—

রাজহাঁস। তাইতো হে ছোক্‌রা, ভারি জ্যাঠামো শিখেচ যে!

বক। বুড়ির কাছে তুলোর গদির ফরমাস দিতে যাওনা!

সারস। দুটি কান ধোরে বুঝিয়ে দেবে তুলো-ধোনা কাকে বলে!

ব্যাং। শলীলটাতো ভাই দিন-দিন শুকিয়ে গেল। ভাবনায়-ভাবনায় ঘুমিয়ে আরাম নেই। বুড়ি ওই বাড়ি-গাছটা দিয়ে হয়তো দেখ্‌ব কোন্‌দিন কুয়োর তলা থেকেও আমায় বঁড়সি-গাঁথা করে তুলেছে! কোনো-রকমে যদি ডানা গজাতে পারতেম, তবে একদম ওই হিমালয় পর্ব্বতটার ওপারে ওই নীল জায়গাটায় গিয়ে তলিয়ে থাকতেম।

শৃগাল। হিমালয়ে যেতে-যেতেই গায়ে তোমার যেটুকু জল আছে, জমে গিয়ে, তুমি শীলটি হয়ে এসে পড়তে ঠক্ করে বুড়ির ঘরের দাওয়ায়, আর বুড়ি অমনি আঁকশী দিয়ে টেনে নিয়ে টুপ্ করে তোমায় গালে ফেলে দিত!

কাছিম। ঠিক বলেছ, বুড়ির ভয়েই তো আমি কাঠ হয়ে কেঠো ব'নে গেছি। রোজ রাতে স্বপ্নে দেখি বুড়ি যেন আঁকশীতে গেঁথে আমায় আকাশের উপর শূন্যে ঝুলিয়ে দেয় আর ঝুপ্ করে আমি এসে পড়ি মেঘের উপর থেকে আরারুট পর্ব্বতের চূড়োয়।

বেঙ্গমা। আঁকড়ি-বুড়িকে আমার তো এতটুকুও ভয় করে না।

বেঙ্গমী। একটুও নয়; —আমরা দুজনে যে ভাব করে নিয়েছি।

বেঙ্গমা। একেবারে এক হয়ে গেছি। —ভয় দেখাবে কাকে? বুড়ি চিনে উঠতেই পারে না কে বেঙ্গমা, কেই বা বেঙ্গমী!

কাক। কই, আমিও আদর করে তো বুড়িকে কতবার ডেকেছি, এমন কি ওর আঁকশীটাকে দাঁড় কল্পনা করে দাঁড়কাক হয়েও বসে থাকি—বুড়ির ওই পোড়ো-বাগানটাতে; কিন্তু তবু তো ওর তাড়া মাঝে-মাঝে খেতে হচ্ছে এখনো!

বেঙ্গমা। কিন্তু বুড়ি আমাদের তাড়া মোটেই দেয় না, দিতে পারেও না।

বেঙ্গমী। আমরা যখন-তখন তার ভাঙা ঘরখানাতে গিয়ে ঢুকি, বার হই; বুড়ি আমাদের স্থাথে আর ঝিমোয়, হাই তোলে, তুড়ি দেয়।

বেঙ্গমা। তাড়া কখনো দেয় না।

কাছিম। এমন অঘটন ঘটলো কি করে, শুনি?

কুকুর। এও তো বড় আশ্চর্য্যি! সবাই ভয় করে যাকে তোমরা দুটিতে—

বেঙ্গমা। তার ভয়ের বাইরে অনেক কাল হল চলে গেছি।

ব্যাং। যে সবাইকে বঁড়সী-গাঁথা করে একদিন-না-একদিন টেনে তুলবেই, তার ভয়ের বাইরে গেলে কি উপায়ে শুনিনা?

বেঙ্গমা। সে অনেক দিনের কথা। পৃথিবীর প্রথম-ছেলে প্রথম-মেয়ের খেলা-ঘরের একটি কোণে আমরা দুটি বেঙ্গমা-বেঙ্গমী বাসা বাঁধলুম।

বেঙ্গমী। একটি কোণ, তাতে দুটি পাখী—যেন প্রাণ আর ধড় একসঙ্গে রয়েছি।

বেঙ্গমা। যেন এক-ফুলের দুই ভোম্‌রা, তেমনি সেই একটি বাসায় আমরা দুটি।

বেঙ্গমী। একখানি মাটির খেলাঘরে সেই ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এক-হয়ে রয়েছি।

কাছিম। তারপর? তারপর?

বেঙ্গমা। তারপর একদিন আঁকড়ি-বুড়ি এসে বল্লে, বেঙ্গমা তোমায় যেতে হবে! বেঙ্গমী কাঁদতে লাগল। ছেলে-মেয়েটাও কাঁদতে থাকলো—

কুকুর। তারপর?

বেঙ্গমী। বেঙ্গমাকে বুড়ি নিয়ে চল্লো, আমিও সঙ্গে-সঙ্গে চল্লুম, ছেলে-মেয়েটিও চল্লো—না-না বোলে কাঁদতে-কাঁদতে—

কাক। কোথায় গেলে তারপর?

বেঙ্গমা। তারপরে বুড়ি রেগে আমাদের দুজনেরই ঘাড়-মট্‌কে রাস্তায় ফেলে চলে গেল!

কাছিম। আহাহা! তারপর?

বেঙ্গমা। তারপরে কি হলো তাতো জানিনে; বোধ হয় সেই রাস্তার ধারেই পড়ে রইলেম ভাঙা-চোরা—

বেরাল। নেও, তারপর?

কুকুর। তারপরে? তারপরে?—

বেঙ্গমী। তারপরে দুজনেই আমরা স্বপ্নে বেঁচে উঠলুম—

বেঙ্গমা। নিরালা নিবিড় একটি ঝোপে দুটি পাখী।

কাক। বুড়ি এসে আর ঘাড় মট্‌কালে না?

বেঙ্গমা। মট্‌কালে বই কি! কিন্তু যতবারই মট্‌কালে বেঁচে উঠলুম—

বেঙ্গমী। সবুজ ক্ষেতের একেবারে বুকের মাঝে একটি অক্ষয় বট, তারি একটি খোপে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী!

বেঙ্গমা। আহা!

(গান)

ও আমার
ভাঙা-খাঁচার বিহঙ্গী!
নিবিড় খোপের বিহঙ্গ—
ও আমার বিহঙ্গ!
সোনার দাঁড়ে বনের টিয়া,
বনে সোনার কুরঙ্গ,
ও আমার বিহঙ্গ!
নীল-গগনের বিহঙ্গী!
রূপসাগরের বিহঙ্গ!
স্বপনপুরের বিহঙ্গী—
আমার স্বপন-বিহঙ্গ!
ওরে প্রাণ-বিহঙ্গী!
ওহে প্রাণ-বিহঙ্গ!
খেলাঘরের বিহঙ্গী!
ফুলবনের বিহঙ্গ!

কাছিম। আমিও তো স্বপন দেখি—আকাশে উড়লুম আবার আকাশ থেকে

পড়লুম, ভেঙে চুর্‌মার্ হয়ে গেলুম স্বপ্নের সঙ্গে। জেগে উঠে দেখি, যে-কাছিম সেই কাছিমই আছি; বুড়ির ভয়ও রয়েছে তেমনি।

কাক। আমি রোজই দেখি, স্বপনের ছানার ড্যালা মুখে নিয়ে উঁচু ডালে বসে আছি, শেয়ালটা বল্‌ছে, গান গাওনা! গান গাই, ছানা পড়ে, শেয়াল পালায়, আবার স্বপন ঘুরে আসে ছানার ড্যালা হয়ে, কিন্তু ওই বুড়িটাকে তো কোনোদিন স্বপন বলে মনে হয় না!

কুকুর। তবে যে তুমি বল্লে বুড়িকে তোমার ভালো লাগে, দেখলেই আয় আয় বোলে ডাকতে ইচ্ছে হয়!

কাক। হয় তো! কিন্তু একেবারে বুড়ির ভয় তো যায় না! কিন্তু এও আবার—

কুকুর। আরে ভাই, কিন্তুও নেই, আবার এও নেই,—আছে বুড়িটা! স্বপন আমারো একটা কেন, দুটোতিনটে আছে। কোনোটাকে দেখি জলের মধ্যেকার ছায়ার মতো, কোনোটা বা দেখি যেন ধর্ম্ম-অবতার হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়েছি—স্বর্গের সিঁড়ি টোপ্‌কে! কিন্তু বুড়ি এসে এক-একবার যখন গলার ছিকল্‌টায় টান লাগায়, তখন সে স্বপ্ন ছুটে যায়, আর বুকের কাছটা টন্-টন্ করে ওঠে, তার করলে কি?

বেঙ্গমা। তোমরা যে স্বপন দেখো; আমাদের দুটির তো তা নয়!

কাছিম। তবে কি? আমাদের সঙ্গে তফাৎটা কি তোমাদের স্বপনের?

বেঙ্গমা। তোমরা স্বপনকে দেখো, আর স্বপন দেখে আমাদের।

বেঙ্গমা। তাই আমরা স্বপ্নময় হয়ে গেছি স্বপ্নের দিষ্টিতে—

বেঙ্গমা। আমরা যে স্বপ্নলোকে চলে গেছি; সেখান থেকে বুড়িটাকেও দেখি—স্বপ্ন বই আর কিছু নয়!

তেলাপোকা। এ কখনো হতে পারে কি?

কাঁচপোকা। কেন হবে না? তুমি তো তেলাপোকা, কিন্তু আমি দেখি যখন তোমাকে, তুমি দেখতে-দেখতে কাঁচপোকা হয়ে যাও, আর সবুজ ঝক্‌ঝক্ করতে থাকো, যেন সাত-রাজার ধন তক্তে-তাউসের একখানি পান্নার তক্তি!

ব্যাং। তাহলে আমার আদুলিটাকে ভুয়ো-জিনিষ তো বলা যায় না!

বেঙ্গমা। কিছুতেই নয়।

কাছিম। তা হলে আমি এবার রোজই আকাশে উড়বো, দেখি বুড়িটা কি করে!

কাক। আমিও ত গান গাইছি—এবার থেকে বেপরোয়া!

কুকুর। স্বপনের ছিকল্ বুনে এবার গলায় সাতনরী হার ঝোলাচ্ছি, দেখ না!

কাঁচপোকা। স্বপ্নের এবারে তক্তে-তাউস বানিয়ে একেবারে সাজাহান বাদশা হয়ে বসচি।

তেলাপোকা। স্বপ্নের এবারে সরষে-ক্ষেত বুনে ফেলছি।

পেঁচা। আমি স্বপ্নের ছুঁচোবাজি লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখনা।

পেরু। এবার থলি নয়, স্বপ্নের বস্তা বাঁধছি।

ময়ূর। আঁকড়ি-বুড়ি গেল কোথায়? (প্যাথম ছড়াইয়া) দেখে যাক্ স্বপ্নের চাল-চিত্তির!

জোনাক-পোকার দল। স্বপ্নের ফুল-ঝুরি!

ঝুমকোলতা। আর ঝুমকোফুলের ঝাড়!

(গান)

আলোর ফুলঝুরি, কালো ঝুমকো ফুল,
এক-স্বপনে গাঁথা দুটি, বঁধুর কানের দুল!
স্বপ্নে-গাঁথা আলো, স্বপ্নে-গাঁথা ফুল!
স্বপ্ন-চাঁদমালা, বিনি সুতার হার,
নীল সে পরশমণি স্বপ্ন-পারাবার!
স্বপন আলোর টিপ, শুকতারাটি জ্বলে
জ্বলে সাঁঝে দীপ, স্বপ্ন দিয়া জ্বলে!
স্বপ্ন-নদী বহে—চলে সোনার তরী,
বাতাস গেল কহে—মরি, মরি, মরি!
ছায়া-করা কূলে, স্বপন-নদী পার,
বঁধু গাঁথেন ফুলে, বঁধুর স্বপন-হার,
তাঁরি বরণ-ডোলা, স্বপ্নে দেয় দোলা—
আলোর ফুলঝুরি, কালো ঝুমকো-ফুল।

সকলে। আসুগ্‌গে এখন বুড়ি, আর ভয় করি নে!

(নৃত্য গীত)

ঘুমে-জাগায় মিলিয়ে গিয়ে
চলে সেথা লুকোচুরি;
সেখানেতে আলো-ছায়া
ভাঙে-গড়ে মায়াপুরী!
কাজল-রেখা সজল কোরে
বাদল এল যেই পারেতে,
উড়িয়ে দিয়ে আলোর আঁচল
স্বপন চলে সেই ধারেতে!
কুকুর—ঘুমে-জাগায় মিলিয়ে গিয়ে—
হাঁস—মায়াতরী বারে-বারে—
বক—চলে সেথায় ঘুরি ঘুরি—
চড়াই—চলে যেথা লুকো-চুরি—
কাছিম—ঘুমে-জাগায় মিলিয়ে গিয়ে।
কাক—যেখানেতে আলো-ছায়া
ময়ূর—ভাঙে-গড়ে মায়াপুরী!
বেঙ—ঘুমে-জাগায়—(নৃত্য)

[সকাল হলো। ঘড়ি ছটার ঘণ্টা দিলে। আঁকড়ি-বুড়ি আঁকশী ঠুকে প্রবেশ করলেন।]

বুড়ি। চল চল, ফরসা হল আর স্বপন দেখে না!

পেঁচা। কোথায় যেতে হবে?

বুড়ি। বাসায়, আর কোথায়!

বেঙ্গমা। চল তবে সবাই—

বেঙ্গমী। বাসায় গিয়ে স্বপন দেখি।

সকলে। আর ভয় কি! ভয় ক্যা, ভয় ক্যা! মিছি মিছি ই—ই—

(ড্রপ্ পড়ে গেল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ড্রপ্‌সিনের সম্মুখ ভাগ। ড্রপের গায়ে সীতা-হরণের একটা বীভৎস ছবি আঁকা। তারি সামনে দিয়ে দেব-দেবী ও দর্শকরা একে-একে বাড়ী চলেছেন। দনু একধারে দাঁড়িয়ে সবাইকে আপ্যায়িত করছেন।]

নারদ। কেমন দেখলে হে আচার্য্য?

ভরত। যা ভেবেছি তাই, যেমন গান-বাদ্য, তেমনি নাট্য, তেমনি দৃশ্য! বিপরীত ব্যাপার!

নারদ। আত্মারামকে তো মন্দ লাগলো না—

ভরত। ঢেঁকি!

(প্রস্থান।)

জটে। (দনুর প্রতি) অতি পরিপাটি হয়েছে হে, জিনিষটার রস পাওয়া গেল।

দনু। ঐ সাম্‌নের কামরাটায় একটু বসুন, ভিড় কমলে যাবেন।

ব্রহ্মা। অনেকগুলি ছেলে-ছোক্‌রা দেখলেম, ওদের এ-সব জায়গায় আসতে দেওয়া ঠিক নয়।

দনু। আপনার কেমন লাগলো?

ব্রহ্মা। বইটা তেমন রুচি-সঙ্গত হয় নি, তোমরা ডন্ জুয়ানটা প্লে করলে না কেন?

(ব্রহ্মা ও জটের প্রস্থান।)

(শ্রীধরের প্রবেশ।)

দনু। আই সে শ্রীধর! তুমি এখন যাও না।

শ্রীধর। সঙ্গে মিসেস্ আছেন, আর একদিন হবে এখন, দাদাকে আবার পৌঁছনো চাই।

(প্রস্থান।)

(পার্ব্বতী সঙ্গে দেবীগণের প্রবেশ।)

দনু। কেমন দেখলেন ঠাকুর-মা?

পার্ব্বতী। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর কথাটুকু বেশ লাগলো, আর যাত্রার শেষে একটা সং দিলে ভালো হতো, কেবলি কান্না, একটু হাসি না হলে চলে, কি বলিস্ ছোট বৌ?

শ্রী। কান্না কোথায় পেলে দিদি? আমার ভাই বেশ লাগলো। কেবল নাচ-গান হাসি-তামাসা, ভরত-মুনির দেব-যাত্রা দেখে-দেখে চোখ পচে গেছে, কেবলি উর্ব্বশী, মেনকা আর রম্ভা!

শচী। ছোট মা ঠিক বলেছেন, বিভেধরা-গুলোর নাচ দেখলে গা জ্বলে যায়! যেই দেহ—

নন্দনী। (জয়ন্ত কোলে) এর চেয়ে আমাদের বারোয়ারি-তলার যাত্রার দল কত যে ভালো-গায়, শুনতে যদি মা!

জয়ন্ত। মা, দেখ, দেখ, কেমন ছবি লিখেচে!

দনু। ওহে, লেডিজ্‌দের ক্লোক্‌রুমের দরজাটা খুলে দাও; আর বল সেখানে চা, সেণ্ডউইচ, আইস্‌ক্রিম পাঠিয়ে দিতে—

খানসামা। মেমসাব, ইস্ তরফ চলিয়ে।

(দেবীগণের প্রস্থান খানসামার সঙ্গে।)

(ইন্দ্র, চন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ।)

দনু। ব্যস্, তা হচ্ছে না, চল চল একটু রিফ্রেস্‌ড্ হবে।

সূর্য্য। আমার কাল আবার আফিস আছে।

দনু। চল তো, একটু রিফ্রেস্‌ড্ হবে! কাল সিক্ লিভ নিও। খানসামা—বয়!

(বিঁড়ি-মুখে দুই স্কুল-বয়।)

"আমি সেই দেশেরই ছেলে,
আমি সেই দেশেরই ছেলে!"

(গান মুখস্থ করিতে-করিতে প্রস্থান।)

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক হীনাবস্থা

(ফরাসী হইতে)

অধুনা, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে ভারতের ক্ষতি হইতেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি।—দেশটা দরিদ্র। রাজকর সংখ্যায় বেশী না হইলেও উহা গুরুভার। কারণ উহার একাংশ হইতে, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের পেন্‌শন্, অথবা ভারত ইংলণ্ডের নিকট হইতে যে প্রভূত ধন ঋণ লইয়াছে তাহার সুধ দিতে হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষতি।—গ্রেট্-ব্রিটেন ভারতে যে শাসনপদ্ধতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে; ত্রিশকোটি লোক বিদেশী রাজাকর্ত্তৃক যথেচ্ছভাবে শুধু যে শাসিত হইতেছে তাহা নহে, বিদেশী গণতন্ত্রের দায়িত্ব-বিশিষ্ট কর্ম্মচারীগণের দ্বারাও শাসিত হইতেছে; ভবিষ্যতের গুরুতর প্রশ্নাদি সম্বন্ধে, এমন কি, যে সকল প্রশ্ন সাক্ষাৎভাবে ইংরেজের স্বার্থ-বিরুদ্ধ সেই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে ভারতবাসী দিগের সহিত পরামর্শ করা হয় না, পরন্তু ইংরেজদেরই সহিত পরামর্শ করা হয়।

ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক অনিষ্ট নিবারণের সাহায্যকল্পে, ইংরেজের দুইটি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ শাসনব্যয় ও সামরিক ব্যয় কমানো, পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান বেশী বেশী করা, ভূমিকরের বণ্টন আরও ভাল করিয়া করা। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়িক শিক্ষার উৎসাহ দেওয়া, এবং যাহাতে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে এইরূপ সমস্ত সামাজিক সংস্কার-কার্য্যে আনুকূল্য করা।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একাধারে উদার ও একটু বেশী-ভারতীয়-ভাবাপন্ন করিবার জন্য সভ্যজাতি-গৃহীত মূলতত্ত্ব-অনুসারে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি আর-একবার নূতন করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা উচিতঃ—যথা, প্রদেশ বিভাগগুলির স্বায়ত্তশাসন, প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের ক্রমশঃ বিস্তারসাধন, শাসনবিভাগের সমস্ত কাজেই ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার দেওয়া।

কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে আর একটি গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। সেই সময় নিকটে আসিয়াছে যখন ভারতের আইন-কানুন নিরবচ্ছিন্ন আর ভারতীয় আইন-কানুন রূপে থাকিতে পারে না।

অষ্টাদশ-শতকে যুক্তি-বাদীরা (rationalist) এবং ঊনবিংশশতকের প্রারম্ভে উদারনৈতিকেরা এই মূল তত্ত্বটি স্বীকার করিয়াছেন যে, সকল লোকই একই রকমে শাসিত হওয়া উচিত। ইহা হইতেই ফরাসী উপনিবেশে দেশীয় লোকেরা স্থানীয় শুল্ক স্থাপন সম্বন্ধে সার্ব্বজনিক মত প্রকাশের অধিকার লাভ করে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। জাতিতত্ত্ববিদ্যা বলিলেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বভাবতই গভীরতর পার্থক্য আছে; যে দেশের যে সভ্যতা, তাহা সেই দেশের সাক্ষাৎ ও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-ফল। আজিকার দিনে, ক্রমবিকাশের মতটাই প্রবল; বিভিন্ন সভ্যতা একটি সমগ্র মানবীয় সভ্যতার কতকগুলি খণ্ডাংশ মাত্র এইরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে। কিংবা সেইদিকে মতের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে দৃষ্টান্তস্বরূপ জাপান দেখাইয়াছে যে, খুব সম্প্রতি য়ুরোপের যে সকল জাতি সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে তাহারা যেরূপ সত্বর য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও বৈষয়িক উন্নতি সমূহ গ্রহণ করিয়াছে জাপানও সেইরূপ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্যই পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ, তাহাদের উপরে উপনিবেশকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে শাসন করা, তথাকার ভৌতিক ব্যবস্থার নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা, এবং তত্রত্য লোকদিগকে প্রাচীন কালোচিত জীবনমাত্র নির্ব্বাহ করিতে দেওয়া আর আবশ্যক বোধ করেন না। ঐ সব দেশ বিজিত হইবার পর প্রথম কয়েক বৎসর এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উপযোগী হইলেও, উহা ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতি স্বীকার করে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার জনসমাজ একপ্রকার অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু আসলে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়; কতকগুলি সমাজ কালক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় এবং কতকগুলি পশ্চাতে হটিয়া যায়; এবং যে সকল সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, তাহারা ন্যূনাধিক দ্রুতভাবে অগ্রসর হয়। যখন হইতে এসিয়ার ইতিহাস ভাল করিয়া জানা গিয়াছে তখন হইতেই ইহারও পরিচয় আমরা পাইয়াছি যে, এশিয়ার মত ও বিশ্বাস ও রীতিনীতির মধ্যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ লুই ও অ্যালেক-জাণ্ডারের আমলে জনসমাজের মধ্যে যতটা পার্থক্য, আকবর ও অশোকের সময়কার জনসমাজের মধ্যেও ততটা পার্থক্য দেখা যায়। য়ুরোপের অর্থনৈতিক সমুন্নতি, গত শতকের অর্দ্ধাংশের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে এবং য়ুরোপের প্রভাবাধীনে এশিয়ার কতকগুলি রাষ্ট্রের য়ুরোপেরই ন্যায় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে! তথাকথিত বৈজ্ঞানিক শাসনপদ্ধতি, আসলে সব-চেয়ে অ-বৈজ্ঞানিক; কেননা প্রথাকে আইনরূপে দাঁড় করাইয়া, যে সব জনসমাজ বরাবর ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া আসিতেছে, ঐ পদ্ধতি সেই সব সমাজকে অচল করিয়া রাখিবার দিকে যেন উন্মুখ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মারণ

না হ'ক রূপসী, মুখ চোক্ খাসা, রঙটি তাহার কালো
কুৎসিত বলে, বেহারী তাহার, প্রিয়ারে বাসে না ভালো।
লয় না তাহার যতন আদর, দেখে না তাহারে চোখে,
নিকটে আসিলে নিজে চলে যায়, তাড়াইয়া দেয় বোকে।

নহে বেহারীর স্বভাব ত ভালো, বিষম স্বেচ্ছাচারী;
বালিকা ভার্য্যা, তাহার উপরি হ'ল আক্রোশ ভারী!
মূর্খ সে, তার খেয়াল উঠিল, যতই হউক ক্ষতি,
কুরূপা সতীর হাত হতে ঠিক লভিবে অব্যাহতি।

গেল সে গোপনে বৃদ্ধা জনেক হাড়ীর ঝিএর কাছে,
শুনেছে তাহার তন্ত্র-মন্ত্র, টাট্‌কা-টোটকা আছে;
জানে সে মারণ, উচাটন কত, বশীকরণের টিপ্,
শুনেছি কেবল মুখের বাতাসে জ্বালাইতে পারে দীপ।
দ্বাদশ মুদ্রা ফুরান্ হইল গোপনে তাহার সাথে,
মারণ করিয়া মারিবে বধূরে, অমাবস্যার রাতে।
দুটি দিন ধরি চলিবে সাধন, গোপনে অগ্নি জ্বালি,
বেহারী নিতুই সুমুখে তাহার বসিয়া রহিবে খালি।

গভীর নিশিতে জ্বলিল বহ্নি, বিজন নদীর কূলে,
হাড়িণী তাহার রুক্ষ জটাটা তুলিয়া বাঁধিল শিরে;
গভীর সিঁদুর কপালে লেপিয়া, বিকট মন্ত্র হাঁক,
সাক্ষী করিল আকাশ-পাতাল, চন্দ্র-সূর্য্যে ডাকি;—
নিরীহ অবলা বালিকা বধিব, শুন কামাখ্যা-মায়ি,
আমি নির্দ্দোষী, তুমিও সাক্ষী, সোয়ামী উহার দায়ী!
সিঁদুরে রমণী-মূর্ত্তি আঁকিয়া সেদিন ফিরিল ঘরে,
বেহারী নিশীথে শিহরি উঠিল স্বপনে দারুণ ডরে।

পরদিন রাতে বেহারী তেমনি গেল সে নদীর কূলে,
আজিকে তাহার কি এক আঘাত লাগিছে মরম-মূলে।
গঙ্গা-মাটীর মূর্ত্তি গড়ায়ে, বলিল হাড়িণী "আমি
বধিব ইহারে, আমি নির্দ্দোষী জেনো অন্তর্যামী!"
বেহারীর পানে চাহিয়া বলিল, "এই বিল্বের কাঁটা
পুতুলের গায় ছোঁয়াইব যেই ঘুচিবে তোমার লেটা!"
বেহারী বলিল আর কাজ নাই, টাকা লয়ে দাও ছাড়ি,
দুখিনী আমার থাকুক ঘরেতে কাজ কি তাহারে মারি!

হাড়িণী তখন রুষিয়া বলিল ঊর্দ্ধে তুলিয়া আঁখি,
"চামুণ্ডারে কি ফিরাইতে পারি এতদূরে আমি ডাকি?
বিল্বের কাঁটা ফুটাইব আমি এই পুতুলের গলে,
এখনি!"—বেহারী কাঁদিয়া পড়িল তাহার চরণ তলে।
"রক্ষা কর গো, সে অভাগী মোর পরাণের চেয়ে প্রিয়,
আমার সাথেতে সুখে সংসার করিতে তাহারে দিও।"
হাড়িণী বলিল, "হবে না, হবে না, এই সে পুতুল ছুঁয়ে,
শপথ করিবি তবে সে শুনিব লুটাইয়া এই ভুঁয়ে।"

"ভালোবাসি তারে, ভালোবাসি তারে, ভালোবাসি আমি বড়,
এবারের মত ফের চামুণ্ডা, একবার দয়া কর।"
কাঁদিল বেহারী হাড়িণী তখন আপন বক্ষ চিরে,
সদ্য শোণিত তিন ফোঁটা দিল অনল-কুণ্ডে ধীরে।
চামুণ্ডা যান্ হইয়া শান্ত, বেহারী ফিরিল ঘরে,
সুখে সংসার করে দুইজনে গলাগলি বধূ-বরে।
এখনো বধূরে হাসিয়া হাড়িণী বলে, "আমি দোষী মূলে,
'বশীকরণের' মন্ত্র পড়েছি মারণের কথা ভুলে।"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চাঁদবিবির কথা

দুটো লোক আমাকে ভালো বেসেছিল! একজন খুন হয়েছে, আর একজনের সেজন্যে ফাঁসি হয়ে গেল।

আজ তাই বসে-বসে ভাবছি—কেন? আমি কী এমন একটা লোক—যার জন্যে দুটো লোক প্রাণ দিলে!

চাষার ঘরে, মুসলমানের ঘরে এমন রূপ ত একটা মেলেনা—তা ঠিক! তবু—কি-ই বা এমন আমার রূপ! মা-বাপে আদর করে নাম রেখেছিল—চাঁদবিবি। কিন্তু কৈ, তবু পঁচিশ বছর বয়স হলো, ছেলে কোলে করতে পারলাম না ত! এ জন্মে আর পারবও না, বোধ হয়।

সেই কোন্ ছেলেবেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল। গাঁয়ের মধ্যে সব-চেয়ে শান্ত শিষ্ট ছেলেটির সঙ্গে বাপ-মা আমার বিয়ে দিয়েছিল।

ওগো, অত ভালো লোকের সঙ্গে কেন তোমরা এ পোড়ারমুখীর বিয়ে দিলে?

একটু বড় হ'ত না হ'ত তার বাপ-মা দুজনেই কবরের মধ্যে আশ্রয় নিলে। সে এসে তার শ্বশুর-বাড়ীতে থাকতে লাগল। আমাকে আর শ্বশুর-ঘর করতে হোল না। বড় ভাগ্যবতী আমি!

তার পর আট বছর এক সঙ্গে কেটেছে। কি ভালোই সে বেসেছিল আমাকে! একলা আমার ভয় করবে বলে একটা রাত্তির কখনও আমাকে ফেলে যায় নি। পাড়ার মেয়েরা সেজন্যে কত হাসাহাসি করেছে।

আমায় একলা ফেলে গিয়ে আজ তার কত কষ্টই হ'ল, না জানি!

বেশ হয়েছে, কতবার কত লোকে তোমায় বলেছে যে, তোমার স্ত্রী অসতী। তুমি হেসে তা উড়িয়ে দিয়েছ। কতবার আমি নিজে তোমায় বলেছি তুমি একটা আপদ, আমার পথে কাঁটা, তবু তুমি হেসেছ, তবু তোমার বিশ্বাসের অন্ত দেখিনি। বেশ হয়েছে!

করিমদ্দি তোমার বড় বন্ধু ছিল, না? তোমার যখন বন্ধু, তখন আমারও তাকে খাতির-যত্ন করা দরকার। তুমি ঘরে থাক আর নাই থাক, সে এলে আমি দুটো মিষ্টি-কথা এক-ছিলিম তামাক তাকে দেবই তো। সে যে তোমার দোস্ত। ঠিক, তা নৈলে পাড়ার লোক তোমাকে "সিধা লোক" বলবে কেন? সেই করিমদ্দিই তো এক কোপে তোমার গলা কাটলে! আর সেই করিমদ্দিরই তো কাল ফাঁসি হয়ে গেল। বেশ, হরে-দরে সেই একই। সিধা লোকটা যেখানে গেল, চালাক লোকটাও সেই একই যায়গায় পৌঁছে গেল। পুড়ে রৈলাম কেবল আমি। এ-জন্মে আর ছেলের মুখ দেখতে হোল না।

সে দিন সন্ধ্যা থেকে তুমি বাড়ি নেই; করিমদ্দির ওখানে গেছ; রাত হয়ে গেল, এলে না—রাগ করে আমি গিয়ে শুলাম। দোর খোলা রৈল। কখন ঘুমিয়েছি, জানি না, হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, কোথায় যেন তুমি শুয়ে আছ, আর তোমার সারা গা দিয়ে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। প্রাণ আমার গুর্-গুর্ করে উঠল—ভয়ে কেঁদে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল—চোখ মেলেই দেখি, করিমদ্দি আস্তে-আস্তে এসে সিন্দুকের উপর বসল। তাকে দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠল।

—সে কোথায়?

—দরকার কি? সে আর আসবে না—বলে করিমদ্দি হাসবার চেষ্টা করলে। সেই পরশু দিনকার আমার সেই হাসির এই উত্তর। বললুম,—যাও, যাও, তুমি এখনি চলে যাও, নাহলে এখনি আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব।

ভ্যাবা-চ্যাকা হয়ে করিমদ্দি বেরিয়ে গেল। ভারি চালাক, পালোয়ান করিমদ্দি! গাঁয়ের মধ্যে সেরা লাঠিয়াল, সেরা সড়কিবাজ। একটা মেয়েমানুষের হাসির জন্যে নিজের জান তুচ্ছ ক'রে মানুষ খুন করে—আবার একটা মেয়েমানুষের কড়া কথায় সুড়্-সুড়্ করে অন্ধকার ঘর ছেড়ে চলেও যায়। ঘেন্না করি আমি অমন পালোয়ানকে!

সে দিন উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন —তোমার স্বামী তোমায় ভালোবাসতো?

হেসে আমি জবাব দিলাম,—খুব।

তারপর জিজ্ঞাসা হোল করিমদ্দির সঙ্গে তোমার ভালোবাসা ছিল?

এবারো আমার হাসি এল, বললাম,—মোটেই না।

দু-দুটো লোক আমায় ভালোবেসেছিল। একজন খুন হোল, আর একজন ফাঁসি-কাঠে চড়ল। এ-জন্মে আর আমার ছেলের মুখ দেখা হোল না।

শ্রীঃ—

গৌরীদান ও পূর্ব্বরাগ

ছেলেরা চিরকালই বুড়দের ঠাট্টা ক'রে এসেছে;—পাকা-চুল ও টিকি নিয়ে টানাটানি ক'রে তারা চিরকালই একটা মজা পেয়েছে।

আজকালকার দিনে "সনাতন পন্থী" "প্রাচীনের দল" প্রভৃতি নানারূপ সম্ভাষণ বুড়রা পাচ্ছেন; ছেলেরা কতকটা এগিয়ে এসেছে এবং বুড়দের টিকি ধ'রে তাদের সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নিতে চাচ্ছে; তাতে চুলের গোড়ায় অবশ্যই একটা বেদনা হচ্ছে, কিন্তু ছেলের হাতে এই দৌরাত্ম্য তাঁদের সয়ে থাকতে হবে, না হোলে উপায় নেই।

আচ্ছা, এই যে গৌরীদান-প্রথাটা ছিল—তাতে কি দম্পতী পূর্ব্বরাগের সীমানার বাইরে গিয়ে পড়্তেন? আমরা অনেকেই ভুক্ত-ভোগী সুতরাং আমাদের জীবিতাবস্থায় যাঁরা কল্পনার শরাসন হাতে নিয়ে তীর ছুড়্বেন, তাঁরা লক্ষ্য ভেদ কর্তে পার্বেন ব'লে আমরা তো কখনই মেনে নেব না।

আমাদের সময় ১১ বছরের ছেলে ও ৮।৭ বছরের মেয়ের বিয়ে ভদ্রঘরে প্রায়ই হোতে দেখেছি। প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ং সেই দলের। এই বিয়ে নিয়ে যে এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ হচ্ছে, তা' অনেকেরই বাপ-মায়ের উপর গিয়ে পড়ছে। তা' পড়্ক, কিন্তু তাঁরা কি প্রেমশাস্ত্রের একবারেই ধার ধার্তেন না? আমি তো বলি, তাঁদের প্রেম-চর্চ্চাটা এখনকার চেয়ে অনেক সময়ই কোনো অংশে অল্প হোত না।

শিশুকালে বিয়ে ক'রে ত স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎই হোত না, স্ত্রী তো একটা মোড়কের মধ্যে পুলিন্দা হোয়ে বাল্য-জীবন কাটিয়ে দিতেন। তিনি শ্বাশুড়ীর কোলে-কাঁখে, ননদের সঙ্গে হেঁসেলে দিন কাটিয়ে রাত্রে কোনো গুরুজনের বিছানায় শুয়ে পড়তেন। বিয়েটা তো তখন পুরুতের মন্ত্র-পড়ার সঙ্গে সমাপ্ত হোয়ে মুল্তুবী থেকে যেত। যে পর্য্যন্ত তিনি বড় না হোতেন, সে পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে বাড়ীর আর-আর সকলের সম্বন্ধ একটা পাকাপাকি রকমের হতে থাক্তো। এইভাবে পারিবারিক জীবনের দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তিনি কৈশোর অতিক্রম ক'রে হঠাৎ একদিন স্বামীর কাছে, অভিনব-ভাবে ধরা দিতেন। বহুদিনের পাওয়া জিনিষ ব'লে তিনি পুরোনো বা বাসি হোয়ে

যেতেন না। যৌবন তাঁকে নূতন ক'রে সাজিয়ে এনে স্বামীর ঘরে উপঢৌকন দিয়ে যেত। চারিদিকের বাধা বিঘ্নের মধ্যে, চারিদিকের লজ্জা, ভয়, সকৌতুক দৃষ্টি ও পরিহাসের পাহারার মধ্যে সে প্রেম যে কি মধুর ও দুর্ল্লভ বস্তুর মত হৃদয় অধিকার ক'রে নিত, তা আর কি বল্‌ব! কবি লিখেছেন—"ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়ে, ফেরয় কতই পাকে।"—পরস্ত্রীর ছায়ায় ছায়া লাগাবার এ চেষ্টা নয়; তা' কি কখনো অবরোধের মধ্যে কেউ কর্‌তে পারে? নিতান্ত-আত্মীয় ভিন্ন সেই অবরোধের মধ্যে ঢোক্‌বার কারু অধিকারই যে নেই! স্বামীর সঙ্গে কুলবধূর প্রেমের প্রথম-অধ্যায়ে এইরূপ শতশত লুকোচুরী ভাবের মধ্যে—সংকোচে বাধ-বাধ, আনন্দের পূর্ণতায় ভরপুর প্রেম বিকাশ পেতে থাক্‌তো। গুরুজনের শাসন ও চারিদিকে লজ্জার পাহারার মধ্যে এই পূর্ব্বরাগ বড় দুর্ল্লভ হয়ে উঠ্‌তো। অবাধ-মিলনে প্রেমের এই দিক্‌টা তেমন মধুর হোতেই পারে না! সেই অতিগোপনে অস্ফুট প্রেমালাপে অবিদিত-গত-যামা রাত্রি পুইয়ে যেত। দিনের বেলা কথা বল্‌বার কোন সুযোগই থাক্‌তো না, মুখখানি দেখবার জন্যে লোলুপ চোখ দুটি এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াত ও গুরুজনের ভয়ে ঈপ্সিত স্বর্গে পৌঁছতে না পেরে কণ্টক-ক্ষত ভ্রমরের মত বেড়ার বাইরে চ'লে যেত। সেই পূর্ব্বরাগকে ছেলেরা যতই ছোট ক'রে দেখুন না কেন,—বুড়দের কাছে সেটা মস্ত বড় জিনিষ;—সকল ঘটনার উপর সেই ঘটনা, সকল স্মৃতির উপর সেই স্মৃতি।

সুতরাং ছেলেরা যদি বলেন—আগেকার দিনের লোক প্রেমের আস্বাদ বাড়ীতে পায় নি, তাই বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছা ও বৈষ্ণব-তত্ত্ব লিখে মনের ঝাল মিটিয়েছেন, তা আমরা মান্‌ব না। আমরাই তার সাক্ষী; চাক্ষুষ যা হোয়েছে, তাই লিখ্‌ছি, তাঁদের কাল্পনিক অভিযোগে কান পাতবো না।

তারপর বাইরের জিনিষ নিয়ে টানাটানির একটা চেষ্টা বহুযুগ থেকে মনুষ্য-সমাজে চলে এসেছে। রাবণ সীতাকে নিয়ে টানা-টানি ক'রে দশটা মাথা খুইয়েছিলেন; এখনকার দিনেও একটা মাথাওয়ালা প্রেমিক যে এ বিষয়ে একান্ত নিরাপদ, তা বল্‌তে পারি না। আইন তার বিরুদ্ধে, সমাজ তার বিরুদ্ধে, এবং এক্ষেত্রে তাঁকে প্রশংসা কর্‌তে পারে—একান্ত কুসঙ্গী ও সমধর্ম্মী ছাড়া—আর কোন লোক আছে বলে আমরা জানি না।

যদি বিবাহ জিনিষটা উড়িয়ে দিতে চান—তা' দিন, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু যতদিন তা' না দিতে পার্‌বেন, ততদিন স্বামী হয়ে স্ত্রীকে অশেষ কষ্ট দেবেন, কিংবা স্ত্রী হয়ে স্বামী-বেচারীর মাথায় দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেবেন—এটা কি ঠিক্? রসের দোহাই দিয়ে এ সকল চলে না। কেউ-কেউ শকুন্তলার কথা তুলেছেন—কিন্তু শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের বিয়ে হওয়ার পরে অবাধ-মিলন হয়েছিল। এমন কি, বিদ্যাসুন্দরের গল্পেও দেখা যায় দুজনের গন্ধর্ব্ব-মতে বিয়ে হওয়ার আগে কোনো প্রেমাভিনয় হোতে পারে নি।

পূর্ব্বরাগ হ'য়ে বিয়ে হোলেই যে প্রেম খুব শক্ত একটা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পায়

এবং গুরুজনের নির্ব্বাচিত বিবাহে যে তা হয় না, এমন কথা কেউ জোর কোরে বল্‌তে পারেন না। নিজেদের নির্ব্বাচন দ্বারা বিয়ে ঠক্ ক'রে পরস্পরকে অবিরত তালাক্ দিয়ে য়ুরোপ-আমেরিকার দম্পতীরা তাঁদের বাসর-ঘরকে আদালতে পরিণত ক'রে ফেলেছেন। এবং আপনাদের মধ্যে যাঁদের দিদিমা বা ঠাকুরদাদা জীবিত আছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্‌লে জান্‌তে পারবেন, তাঁদের বিবাহিত জীবনের প্রথম-দিক্‌টা—নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে কিরূপ অপূর্ব্ব প্রেমের সিন্দূররাগে মণ্ডিত হোয়ে উঠেছিল। তাঁরা এ সকল কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন—এখনকার মত তাঁদের মুখরতা নাই, কিন্তু এই স্বাভাবিক সঙ্কোচই তাঁদের প্রেমের গাঢ়তাকে আরও বেশী ক'রে প্রতিপন্ন ক'রে জানাচ্ছে।

গৌরীদানের পর বউটি সেই ছোট্ট-খাট্টো হয়েই ব'সে থাকে নি—সে বড় হয়েছে এবং যখন তার দেহ ও মনে যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে তখন তার চিত্তে প্রেমের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। অবরোধের আড়ালে ছিল বলে এ বিষয়টিতে যেন ভুল না হয়। ঝোপের আড়ালে প'ড়ে থেকেও গোলাপটি গন্ধ দিতে ভোলে না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয়ের মনেই কোনো-কোনো স্থানে বহুর জন্য লালসা থাকে,—তাদের কামনা নিত্যই নূতনের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করতে চায়। আধুনিক গল্প-লেখকগণের চেষ্টা হচ্ছে এই ভাবটির প্রশ্রয় দেওয়া—ইহা ভাল কি মন্দ, তা জানি না। আমাদের আইন যদি একটা গণ্ডী দিয়ে থাকে, সমাজ যদি একটা গণ্ডী দিয়ে থাকে—তবে সাহিত্যেই বা সে গণ্ডী থাকবে না কেন? তা না' হলে চারিদিকের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে যে!—এবং ফলে এই দাঁড়াবে যে ঘরে-ঘরে কলহ, খুনোখুনি এবং নীরব-চিত্তদাহে বাঙ্গলা দেশের কুঁড়ে ঘরগুলি একেবারে ধ্বংস পাবে। অপরাপর জাতির কর্ম্মক্ষেত্র বাইরে—সুতরাং ঘরের চিন্তায় তাদের আসে-যায় না, কিন্তু আমরা দাঁড়াব কোথায়? আমরা অতিরিক্ত-মাত্রায় রসিক সেজে যে এমন কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হ'তে পারি যে নিজের খোড়ো ঘরে দেশলাইয়ের কাটি জ্বালিয়ে তামাসা দেখ্‌বো—এটা বড় আশ্চর্য্য!

বৈষ্ণবদের কথা উঠেছে। তাঁদের বর্ণিত প্রেম—একটা খেয়াল নয়; সেটা প্রেমের একটা দুশ্চর তপস্যা। রাধা বনপথে ছুটে চলেছেন দেখে সখীরা বল্লে—"অমন কোরে পিছলপথে ছুটে চল্লে, তুই পড়ে যাবি ও পাথরে মাথা ঠেকে তোর প্রাণ যাবে।" রাধিকা বল্লেন—"আমি আগেই জানতুম—তাঁর বাঁশী শুন্‌লে আমি ঘরে থাক্‌তে পার্‌বো না, কোন্ রাস্তা ভাল কোন্ রাস্তা মন্দ তা দেখ্‌বার অবসর থাক্‌বে না; এজন্য আঙ্গিনায় জল ঢেলে সারা রাত্রি ধরে আমি পিছল-পথে চলা অভ্যাস করেছি।"

এ সকল সাধনার কথা। এই প্রেম একটা দুর্জ্ঞেয় অসীম রাজ্যে যাবার পথ;—এ পথ দিয়ে একটি লোক একবার নিজে চলে জগতকে বুঝিয়েছিলেন, বৈষ্ণব-পদগুলির অর্থ কি। উহা কাল্পনিক টীকার প্রতীক্ষা রাখে না। যে অবস্থায় এই জাতি-কুলশীল ও শাস্ত্র-বিহিত পথ-বিরোধী প্রেমের জন্ম হয়—এবং যে অবস্থায় উহা ভূতলে আবির্ভূত

হোয়ে ঊর্দ্ধলোক স্পর্শ করে—তা' প্রেমের চরম কথা। যিনি এই প্রেমের অবতার, করতাল-মৃদঙ্গ-মন্দিরার শব্দের সঙ্গে যিনি এই প্রেমের টীকা-টিপ্পনি নিজ জীবন দিয়ে ক'রে গেছেন, তাঁর চরিত প'ড়ে এই প্রেমের আলোচনা কর্‌বেন—তা না হ'লে যদি উপন্যাস-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রেমের বৈষ্ণব-প্রেমের তুলনামূলক সমালো করতে যান, তবে বিদ্যাপতির কথায় আ বল্‌বো :—

কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বারোয়ারি উপন্যাস

১

সেবারকার চূড়ামণি-যোগে গঙ্গাস্নানের ফলটা মৈত্রমহাশয় হাতে হাতেই পেয়ে গেলেন। যোগস্নান যে এমন অব্যর্থ ফলপ্রদ, সেটা প্রত্যক্ষ করে হরনাথ মৈত্র দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এলেন।

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। সেবার চূড়ামণি-যোগে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে হরনাথ তাঁর যুবতী বিবাহিতা সুন্দরী কন্যা কমলাকে কলকাতায় রেখে এলেন। হরনাথের স্ত্রীর সঙ্গে এই সুযোগে কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করে নেবার জন্য তাঁদের গ্রামের অনেকগুলি স্ত্রীলোকও সঙ্গে এসেছিলেন। স্নানের পর পরস্পরের আঁচলে গেরো বেঁধে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে তাঁরা থেমে গেলেন। সেটা একটা চৌমাথা। সেখানে অসম্ভব ভিড় জমেছে। একজন ইংরেজ পাদ্রী সেখানে দাঁড়িয়ে বাংলায় বক্তৃতা দিচ্ছিল—হে বাঙ্গালার মনুষ্যসকল, তোম কি! তোমাদের কি সামান্য বুদ্ধি-শক্তি নাই? গঙ্গাস্নান করিলেই যদি মনুষ্য স্ব যাইতে পারিত, তবে ত গঙ্গাবাসী কুম্ভী হাঙ্গর ও ইলিশ মৎস্যের অত্যাচারে দেবতা স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত তোমাদের বিবেচনা-শক্তি কি শয়তানে এক বারে হরিয়া লইয়াছে? যে গঙ্গায় স্নান করি ধৌত বসন মলিন হইয়া যায়, সে গঙ্গায় স্ন করিলে মনের ময়লা কিরূপে ধৌত হই পারে?"—ইত্যাদি। সাহেবকে ঘিরে এ লোক দাঁড়িয়েছে যে তার মধ্যে দিয়ে গ করে বেরিয়ে যাওয়া এক রকম অসম্ভব সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, কেউ বা সাহেবে মুখে বাংলা বুলির তোড় শুনে অবাক হচ্ছে কেউ বা তার যুক্তি শুনে হাততালি দিচ্ছে।

মৈত্র মশায় মেয়েদের আগে আগে রাস্ত পরিষ্কার করতে করতে চলেছিলেন আ মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাদের সাবধা

র দিচ্ছিলেন। এই জায়গাটাতে এসে নি ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে দিলেন—বেশ ধানে হাত-ধরাধরি করে থেকো।

ঠিক সেই সময়ে একটা লোক হঠাৎ এক ড় মেরে পাদ্রীর মাথার টুপিটা উড়িয়ে দিলে। ঙ্গে সঙ্গে আরো কতকগুলো ছোঁড়া সেই াদ্রীর দলের উপর গিয়ে পড়ল। তারপরে দুই লে হাতাহাতি জুতোজুতি সুরু হয়ে গেল। ড়ের মধ্যে কে যে কোথায় গিয়ে পড়ল ার ঠিকানা নেই। হরনাথ তার সামলাতে ামলাতে প্রায় আধপোয়া রাস্তা দূরে গিয়ে ড়লেন। কাছেই একটা ঘোড়-সওয়ার ুলিশ রাস্তার উপর ছবির মতন দাঁড়িয়েছিল। ারামারি চলেছে দেখে সে ঘোড়া-সমেত কেবারে সেই ভিড়ের মধ্যে এসে পড়তেই ব-মার পালাতে আরম্ভ করলে। কাদা ছিটকানোর মতন চতুর্দ্দিকে মানুষ ছিটকে ড়তে লাগল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে খানকার হট্টগোল একেবারে সাফ হয়ে গেল।

মৈত্র মহাশয় আবার মেয়েদের জড় করে লেন—এই দিক দিয়ে এস—

মৈত্র-গিন্নী চাপা গলায় স্বামীকে ডেকে লেন—ওগো কমলি কোথায়? তাকে যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—

—কি আপদ, সে আবার গেল কোথায়? তখন থেকে বলছি, সব সাবধানে চল—

হরনাথ প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলেন, —কমলি—কমলা।

কোথায় কমলা! সেই চেঁচামেচিতে কেউ কি কারো ডাক শুনতে পায়?

মেয়েদের একপাশে দাঁড় করিয়ে হরনাথ তখনি সেই বিশাল জনসমুদ্র হাতড়ে ঠেলে তোলপাড় করে বেড়াতে লাগলেন। মাথায় পাগড়ী বুকে জরির হরফের তক্‌মা লাগান ভলান্টিয়ারের দল মেয়েদের গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিচ্ছিল, তিনি তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে কমলাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক ধরে চেঁচিয়েও যখন কোন কিনারা হল না, তখন মেয়েদের বাসায় রেখে এসে তিনি পুলিশে খবর দিতে গেলেন।

প্রায় মাসখানেক ধরে পুলিশ, হরনাথ আর ভলান্টিয়ারের দল কলকাতার সহর তোলপাড় করে ফেল্লে কিন্তু কমলাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। মোট কথা, যুবতী মেয়ে কলকাতার রাস্তায় এমনিভাবে হারিয়ে গেলে বাপে যা করে থাকে, তা সবই হল, হলনা কেবল কমলার সন্ধান। হরনাথের সঙ্গে যাঁরা পুণ্যসঞ্চয় করতে কলকাতায় এসেছিলেন, তাদের নিয়ে তিনি দেশে ফিরে গেলেন।

চব্বিশ পরগণার কোন এক গ্রামে হরনাথের দেশ। নিজগ্রামে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি আছে। লোকটী সাদাসিদে কিন্তু বড় রাগী। মনে যা আসে তখনি সেটা ভাষায় প্রকাশ করে ফেলা তাঁর একটা বড় বদ অভ্যাস ছিল। রেখে-ঢেকে কথা বল্‌তে তিনি পারতেন না। তাঁর কয়েক ঘর ধনী যজমান আছে। যজমানী না করলেও তাঁর সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হবার অন্য উপায়ও ছিল। হরনাথের ঊর্দ্ধতন চার-পাঁচ পুরুষ ঐ কাজ করে বেশ দু-পয়সা করে গিয়েছিলেন। নগদ টাকা ছাড়া তাঁর লাখেরাজ জমিও ছিল বিস্তর; তাই থেকে সংসার বেশ স্বচ্ছল ভাবেই চলে যেত। শাস্ত্রপাঠ ও নানারূপ ক্রিয়া-

কর্ম্মে হরনাথের বড় বেশী রকমের অনুরাগ ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যজমানী করে বেড়ালে ক্রিয়া-কর্ম্মের বিশেষ অসুবিধা হয় বলে তিনি বেছে বেছে কয়েকটী ঘর নিজের জন্যে রেখে বাকি ঘরগুলি গ্রামের অন্য অন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন। গ্রামে আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। কিন্তু তাদের কারো অবস্থা হরনাথের মত স্বচ্ছল নয়। বিপদে আপদে অনেকেই তাঁর কাছে থেকে সাহায্য পেত, কাজেই দেশের মধ্যে তাঁর অনুগত লোকের অভাব ছিল না। গ্রামের সনাতন সন্ধ্যা-বৈঠকটী মৈত্র মহাশয়ের চাতালেই নিয়ম করে প্রত্যহ বসত। কাঁদতে কাঁদতে সাদাসিদে হরনাথ কমলার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সকলের কাছে খুলে বলে ফেল্লেন। কিন্তু দেখলেন যে, কমলার কথাটা সেখানে বলবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ সকলেই এ ব্যাপার জানে; শুধু জানে যে তাই নয়, তিনি যা জানেন তার চেয়েও তারা ঢের বেশী জানে। বাড়ীর ভিতরে এসে হরনাথ গিন্নীকে ডেকে বল্লেন—এর চেয়ে মেয়েটাকে যমের হাতে তুলে দিয়ে এলেও নিশ্চিন্ত হতুম।

মৈত্রগৃহিণীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। পাশাপাশি শায়িত দুটী মুমূর্ষু রুগীর মধ্যে একজন মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে উঠলে আর একজন তার দিকে যে রকম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সেই রকম দৃষ্টিতে তিনি একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্বামীর যন্ত্রণায় কোনরকম সহানুভূতির কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না।

কি করে কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গে ব্যাপারটা তাঁর ধারণাতেই ঠিক আসছিল না বছর কয়েক আগে বিয়ের পরদিন শ্বশুরবা যাবার সময় কমলা কেঁদে বলেছিল—ও তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না- কলকাতার সেই বিরাট ভিড়ের মধ্যে থে কান্নার সেই পরিচিত সুরটা যেন তাঁর কা ভেসে আসতে লাগল।

বছর দশেক আগে এই গ্রামে এ গৃহস্থ-পরিবারে কি একটা বিশ্রী ব্যাপা ঘটেছিল, তাই নিয়ে সারা গ্রামে দু-তি বছর ধরে খুব ঘোঁট আর দলাদলি চলেছিল এই সম্পর্কে দু' একটা মামলা পর্য্য আদালতে গড়িয়েছিল। তারপর এই দু বছর কোন রকম উত্তেজনার অভাবে গ্রামে ছোট-বড় সব সম্প্রদায়ই কেমন যেন মুষড়ে দিন কাটাচ্ছিল। কমলার অন্তর্দ্ধানের দি কতক পরেই গ্রামবাসীরা হঠাৎ বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাদের নির্জ্জীব রসনা অনেককা পরে একটা নতুন রসের স্বাদ পেয়ে বে সজীব হয়ে উঠল।

মৈত্রজার চাতালের বৈঠক আর তেম জমে না। ক্রমে আড্ডাটী ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সেটী অন্য আর-এক জায়গায় স্থানান্তরিত হল। কমলা সম্বন্ধে প্রত্যহ নতুন নতুন কথা আবিষ্কৃত হতে লাগল। অবশেষে একদিন জানতে পারা গেল যে যোগেন মিত্রের ছেলে হরেন বাবাজী কমলাকে সরিয়ে রেখেছে। হরেন কলকাতার কলেজে পড়ে, আগে থাকতেই নাকি তার সঙ্গে কমলার সব ঠিকঠাক করা ছিল। শুধু এতদিন সুযোগের অভাবে তারা পালাতে পারে নি, এইবার

সুযোগ পেয়ে তারা সরেছে। অনেকদিন আগে থাকতেই কমলার সঙ্গে হরেনের প্রণয় ছিল। লুকিয়ে তাদের পরামর্শ চলত, এটাও অনেকে লক্ষ্য করেছে। তবে যোগেন মিত্রের ছেলের নামে ফস্ করে কিছু বলে ফেলতে এতদিন কেউ সাহস করে নি; আর ব্যাপারটা যে এতদূর পর্য্যন্ত গড়াবে তা কেউ ভাবেও নি। তবে কি না, যখন এতটা হল, তখন আর না বলে চুপ করে থাকাটা ভাল দেখায় না, তাই শশী মুখুয্যে একদিন সন্ধ্যা বেলায় প্রায় জন-পনেরো-ষোলো লোকের কাছে খুব গোপনে এই বার্ত্তাটী প্রকাশ করে ফেল্লে। সঙ্গে সঙ্গে শশী সবাইকে বলে দিলে—দেখো, যেন কথাটী প্রকাশ না হয়। তা হলে যোগেন মিত্তির আর আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে না। জান ত আমি তার কাছে চাকরি করি—

শশী মুখুয্যে গ্রামের জমিদার যোগেন মিত্রের খাতাঞ্জিখানায় কাজ করত। কিছু-দিন আগে গ্রামের এক আধা-বয়সী কৈবর্ত্ত বিধবার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই নিয়ে মৈত্র মশায় শশীর বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ হয়ে কৈবর্ত্ত-রমণীর প্রতি অনুরাগী হওয়ার জন্য তিনি তাকে সামাজিক দণ্ড দিতেও চেষ্টা করেছিলেন। এই জন্য হরনাথের উপর শশীর মনের ভাব বিলক্ষণই তিক্ত ছিল। সে অনেকদিন থেকেই তার উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এতদিন পরে সে সুযোগ মিলল।

হরনাথের সেই ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জন্য সেদিনকার সন্ধ্যা বৈঠকে শশী যে কথাটী বলেছিল, সেটী তার তার নিছক কল্পনা নয়।

হরেন ও কমলা প্রতিবেশী। ছেলেবেলা থেকেই তাদের দুজনের মধ্যে ভাব ছিল। এক গ্রামেরই ছেলে-মেয়ে, শিশু কাল থেকে এক জায়গায় তারা বেড়ে উঠেছে, এক সঙ্গেই খেলা করেছে, এক পুকুরে এক সঙ্গে সাঁতার কেটেছে। গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে যে হরেনের ভাব ছিল না তা নয়, তবে কমলাদের বাড়ী তাদের পাশেই—সেইজন্যে তাদের মধ্যে মেশামেশিটা বেশী ছিল। কাজেই অন্য মেয়েদের চেয়ে কমলার সঙ্গে হরেনের ভাব একটু বেশী হবার সুযোগও ঘটেছিল।

এই ঘটনার বছর কয়েক আগে একদিন কি কারণে হরেন স্কুলে যায় নি। দুপুর বেলাটা বাড়ীতে বসে না থেকে সে মৈত্রদের খিড়কীর বাগানে ঢুকে একটা পেয়ারা গাছে চড়ে মনের সুখে ডাঁসা পেয়ারা চিবোচ্ছিল, এমন সময় সে দেখতে পেলে, যে কমলা বাগানের একধারে দাঁড়িয়ে কি একটা চিঠি পড়ছে। কমলা তখন সদ্য শ্বশুর-বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে, কার চিঠি সে এত মন দিয়ে পড়ছে, সেটা বিচক্ষণ হরেনের মস্তিষ্কে আসতে বেশী দেরী হল না। পেয়ারা চিবোতে চিবোতে তার মাথায় দুষ্ট-সরস্বতী চাপল। সে গাছ থেকে নেমে পা টিপে টিপে কমলার পিছনে গিয়ে খপ্ করে তার হাত থেকে চিঠিটা ছোঁ মেরে নিয়ে একেবারে দৌড় দিলে। কমলা এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে ফিরে দেখলে, হরেন তার চিঠিটা কেড়ে নিয়েছে। লজ্জায় তার মুখ দিয়ে প্রথমটা কোন কথা বেরুল না। তারপর

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কমলা বল্লে—হরেন দা, চিঠি দিয়ে দাও—ভাল হবে না, বলচি—

হরেন নির্ব্বিকার চিত্তে বাঁ হাতের পেয়ারাটাতে একটা কামড় মেরে কমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলে—

—প্রাণের কমল—

কমলা আর সহ্য করতে না পেরে চিঠিখানা কেড়ে নেবার জন্য হরেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হরেনও নাছোড়বন্দা—দুজনে যখন চিঠি-কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত, এমন সময় তারা দেখতে পেলে, কমলাদের খিড়কীর ধারের রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে শশী মুখুয্যে একদৃষ্টে তাদের পানেই তাকিয়ে রয়েছে। শশীকে দেখেই হরেন চিঠিখানা ফেলে দিয়ে সে তল্লাট থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কমলা চিঠিখানা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর চলে এল।

সেদিন সমস্ত-ক্ষণ হরেনের মনটা ভয়ে ভয়ে কাটল। তার মনে হচ্ছিল, খেয়ালের মাথায় কাজটা করে ফেলা ভাল হয় নি। হরেনের বাবা ভয়ানক কড়া লোক ছিলেন, তিনি যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারেন যে, সে মৈত্রদের কমলার সঙ্গে চিঠি-কাড়াকাড়ি করছিল, তাহলে আর তিনি তাকে আস্ত রাখবেন না। কমলার সঙ্গে আপোষ করে ফেলবার জন্য সে সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাকে বল্লে—কমলি, কাউকে বলিস্ নে যেন ভাই—

কমলার রাগ তখনো পড়েনি, সে বল্লে—না, বলবে না বৈ কি! দাঁড়াও, কালই আমি গিয়ে মাসিমাকে বলে দিয়ে আসব।

হরেন অনুনয় করে বল্লে—তোর পায়ে পড়ি ভাই, লক্ষ্মীটি, আর কক্ষনো তোর চিঠি পড়ব না।

অনেক কষ্টে কমলাকে ঠাণ্ডা করে সে বাড়ী ফিরল, কিন্তু শশীকে ঠাণ্ডা না করা অবধি সে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

শশীর চেহারাটা অত্যন্ত কদাকার, তার উপরে তার একটা চোখে ছানি ছিল। গ্রামের ভাল ছেলেরা আড়ালে আর দুষ্টু ছেলেরা সামনেই তাকে কাণা-শশী বলে ডাকত। হরেনও শশীকে দু' একবার কাণা-শশী বলে ডেকেছে। সে জানত যে, এবার শশী আর তাকে ছাড়বে না। ক'দিন দারুণ দুর্ভাবনায় দিন কাটাবার পর হরেন যখন দেখলে যে শশী সে কথাটা নিয়ে কোনরকম উচ্চ-বাচ্য করলে না, তখন সে নিশ্চিন্ত হল।

শশী কিন্তু যে ব্যাপারটা সেদিন নিজের চোখে দেখেছিল, সেটা ভুলতে পারলে না। হরনাথের উপর তার যে-রকম আক্রোশ ছিল, তাতে সেই দিনই সে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিত, কিন্তু এর মধ্যে তার মনিব-পুত্র থাকাতেই সব মাটী হয়ে গেল। সেই থেকে সে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ কমলা হারিয়ে যাওয়ায় সে সেই পুরোণো ঘটনার সঙ্গে যোগ রেখে একটা গল্প বানিয়ে তা' প্রচার করে দিলে।

২

যোগেন মিত্র এই গ্রামের জমিদার। একালের শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তিনি একালের শিক্ষার উপর বিষম চটা ছিলেন।

যোগেন নিজের হাতে সমস্ত জমিদারী দেখতেন। তিনি নিজে যা বুঝতেন তার উপর অন্য কারো কথা বলবার যো ছিল না। এই স্বভাবের জন্য যোগেন জীবনে অনেকবার ঠকেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর স্বভাবের কোন রকম পরিবর্ত্তন হয় নি। গ্রামে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি ছিল। এক কথায়, তাঁর ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। ছেলে বেলায় পিতা-বর্ত্তমানে যোগেন কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতেন। হঠাৎ কি কারণে পড়াশুনা ছেড়ে দেশে ফিরে এসে বাপকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আর পড়বেন না, নিজেদের জমিদারীর কাজ দেখবেন। যোগেনের বাবা ছিলেন, সেকেলে মানুষ। ছেলের এই মতিগতি দেখে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তখনি তাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সেই থেকে যোগেন নিজের জমিদারী চালিয়ে আসছেন। পিতার অবর্ত্তমানে সে সম্পত্তি বেড়েই চলেছে, ক্ষতি কিছুমাত্র হয় নি। কলকাতা নামক স্থানটীর উপর যোগেন হাড়ে-চটা ছিলেন। সেখানকার নাম শুনলেই তিনি এমন সব আপত্তিকর কথা বলতেন যে সে সব কথা শুনলে অতি নিরীহ কলকাতাবাসীর পক্ষেও ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ত। নিজ-গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না, আর নিজের বাড়ীতে আড়ালেও তাঁর নিন্দে করতে কারো সাহস হত না। হরেন স্কুল থেকে পাশ করে বেরোবার পর যোগেন তাকে দপ্তরের খাতা চাপা দেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কি কারণে ঠিক জানা যায় না তিনি তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে সম্মত হয়ে তাকে কলেজে পড়তে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

হরেনের ইচ্ছে ছিল, সে কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়বে। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবার পর তার বাবা বল্লেন, এবার জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম শিখতে আরম্ভ কর! পিতার মুখের উপরে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলবার মতন সাহস হরেনের কেন, সে বাড়ীর কারো ছিল না। তবুও একবার সে মাকে দিয়ে তার মনের ইচ্ছাটা কর্ত্তাকে জানিয়ে দিলে।

যোগেনের মেজাজটা সেদিন কেন যে অত ভাল ছিল, তা তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারলেন না। তিনি এক রকম হাল ছেড়ে দিয়েই কথাটা স্বামীর কাছে পেড়েছিলেন। কিন্তু আরজী পেশ হতে না হতেই সেটা পাশ হয়ে গেল দেখে তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। গিন্নীর মার-প্রাণে কে যেন ভিতর থেকে বলতে লাগল যে তাঁর হরেন ভবিষ্যতে নিশ্চয় একটা বড়লোক হবে তাই ঠাকুর দয়া করে কর্ত্তার এমন সুমতি দিয়েছেন।

কমলার অন্তর্দ্ধান হওয়ার কথাটা গ্রামের ভদ্রলোক এমন কি চাষা-ভূষোদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেলেও গ্রামের জমিদার যোগেন মিত্তিরের কাছে সেটা আশ্চর্য্য রকমে গোপন রইল। যোগেন বাবু অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে তিলটি পর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব গোপন করে পালাতে পারত না। কিন্তু এই সংবাদটা কেমন করে তাঁর কর্ণকুহর ডিঙ্গিয়ে একেবারে অন্দর-মহলে গিয়ে প্রবেশ করলে।

জমিদার বাড়ীর গৃহিণী হলেও যোগেনের স্ত্রী উমাসুন্দরীর নিজের কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। যোগেনের কড়া মেজাজ আর শাসনের আব-হাওয়ায় থেকে সে বাড়ীতে কারো ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠবার অবকাশ পেত না। তিনি ঘর আর বাইরের এমন মালিক ছিলেন যে সেখানে উমাসুন্দরীর মতন ভাল মানুষের নিজে বুঝে কোন কাজ করবার উপায়ও ছিল না। তাঁর কাছে যখন খবর এল যে, তাঁর ছেলে ওবাড়ীর কমলাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, তখন তিনি মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। কথাটা স্বামীকে জানাবার যো নেই, তাহলে হয়ত নিজের সর্ব্বনাশই টেনে আনা হবে, কারণ যোগেন ত প্রথমে হরেনকে কলকাতায় পাঠাতে চায়নি, শুধু তাঁরই অনুরোধে তিনি রাজী হয়েছিলেন। তারপর এই সংবাদ পেলে তিনি হরেনের উপর কি রকম শাস্তির বন্দোবস্ত করবেন, সেটা উমাসুন্দরী কল্পনাতেও আনতে পারলেন না। হয়ত তিনি রাগের মাথায় হরেনকে বিষয়-চ্যুত করবেন। নিজের ব্যক্তিগত কোন মত না থাকলেও মা হয়ে সেটা কেউ সহ্য করতে পারে না। একবার তাঁর মনে হল, লুকিয়ে হরেনকে একখানা চিঠি লিখে সংবাদটা কতদূর সত্য তার সন্ধান করলে বোধ হয় ভাল হয়। হরেন যে এতবড় একটা কাণ্ড করে ফেলেছে, সেটা তাঁর মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না। যে ব্যক্তি এই সংবাদটি উমাসুন্দরীর কাছে প্রকাশ করে ছিল, সে বলেছিল, ইতিপূর্ব্বেই হরেনের সঙ্গে কমলার প্রণয় ছিল। কিন্তু মা হয়েও ঘুণাক্ষরে সে প্রণয়ের কথা জানতে পারেন নি ভেবে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আবার ভাবলেন, হয়ত বা হতেও পারে,—কোন্ মা আর নিজে ছেলেকে এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে। হরেনকে চিঠি লেখবার কথা মনে হতে আর-এক সমস্যা এল, চিঠি কে লিখে দেবে। আর চিঠি লিখলেও কর্ত্তার হুকুম আ পাঠ না হলে কোন চিঠির ত দেউড়ী পা হবার উপায় ছিল না।

এই সত্য-মিথ্যা আশা-নিরাশার দা তোলাপাড়া বুকে নিয়ে উমাসুন্দরী দিন কাটা লাগলেন। জমিদার বাড়ীতে জমিদার সম্পর্কী অনেক মেয়ে বাস করতেন। কিন্তু তাঁ সঙ্গে নিজের ছেলের সম্বন্ধে এই বিষয় নি কোন মন্ত্রণা কি আলোচনা তিনি কর পারতেন না। এই চিন্তা আর তার জন্যে মা প্রাণে যে অসহ্য যন্ত্রণা,—সেটা তাঁকে একা ভোগ করতে হত। ওদিককার মে গৃহিণীর চেয়ে উমাসুন্দরীর মানসিক কষ্ট কম ছিল না। উমাসুন্দরীর ইচ্ছা হচ্ছি একবার কমলার মার কাছে গিয়ে রহস্য বেশ ভাল করে বুঝে আসেন। তাঁ দুজনেই সেই ছেলেবেলায় বৌ-অবস্থায় এ গ্রামে এসেছিলেন। নববধূর সেই অসহা অবস্থা থেকে আজ পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে তাঁদে প্রণয় বেড়েই চলেছিল, হঠাৎ এই কাণ্ড হয়ে যাওয়াতে কমলার মার কাছে তাঁর মু দেখাতে লজ্জা করতে লাগল। মৈত্র-গৃহি আগে প্রায় রোজই দুপুর বেলা একবার ক পাড়া বেড়াতে বেরুতেন, কিন্তু তীর্থ থে অত বড় লজ্জার ডালি মাথায় নিয়ে দে ফিরে আসবার পর তাঁকে আর কোথা দেখতে পাওয়া যেত না।

কমলার কথা নিয়ে গ্রামের মধ্যে যে ঘোঁট আর আন্দোলন চলেছিল, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই সেটা নিভে আসতে লাগল। গ্রামের বৃদ্ধেরা প্রথমে কথাটা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ বাধিয়ে ছিলেন; কিন্তু যোগেন মিত্রের ছেলের নাম শুনে হঠাৎ তাঁরা যে যার বেমালুম চেপে গেলেন। যুবাদের দল থেকে নামতে নামতে কাহিনীটা শেষে দেশের ছেলেদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কমলার একটী ছোট ভাই ছিল, তার নাম অরুণ। অরুণ হরেনের ভাই নরেনের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত। দিদি কলকাতায় হারিয়ে যাওয়ার পরে তাদের বাড়ীতে ও বাইরে যে ব্যাপার চলেছিল, নিতান্ত বালক হলেও অরুণের সেটা বোঝবার বয়স হয়েছিল। এর মধ্যে কতখানি লজ্জা আর কতটা সামাজিক লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হচ্ছে, আর তার মধ্যে কতটুকু বা তার প্রাপ্য, সেটা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করত। স্কুলের মাষ্টাররা পড়াতে পড়াতে এক একবার আড়-চোখে, কখনো বা স্থির দৃষ্টিতে যখন তার মুখের দিকে তাকাত কিংবা সমপাঠীরা যখন তার দিকে চেয়ে বা তাকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলাবলি করত, কাণে তা শুনতে না পেলেও অরুণের বুকের মধ্যে তখন এমন একটা জায়গায় গিয়ে সে কথাগুলো বাজতে থাকত যে তার বেদনায় সে বেচারী অস্থির হয়ে উঠত। বুকের মধ্যে লজ্জা আর অপমানের এই দারুণ বোঝাটা তাকে একলাই বয়ে নিয়ে বেড়াতে হত, কারণ তার যে বয়স এবং যে অবস্থা, তাতে প্রাণের বন্ধু পাওয়া শক্ত। অরুণ তার বাপ-মাকে তার দিদির কোন কথা জিজ্ঞাসা করত না। তাঁরা যে কষ্ট ভোগ কচ্ছেন, তা দুবেলা সে নিজের চোখেই দেখতে পেত, এটুকু সে বুঝত যে সে কিছুই জানতে চাইলে তাঁরা বেশী কষ্ট পাবেন—এই ভেবেই সে চুপ করে থাকত।

অরুণের দিদি আর নরেনের দাদাকে নিয়ে লোকের মুখে-মুখে যে কুৎসাটা রটেছিল, তাতে অরুণ আর নরেন দুজনেরই মনের অবস্থা সমান হওয়া উচিত ছিল। কথাটা যখন প্রথম প্রচার হয়েছিল, তখন অরুণের দেখা-দেখি নরেনও লজ্জায় মুষড়ে পড়েছিল; কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই ক্লাশের ছেলেরা তাকে বুঝিয়ে দিলে, এর মধ্যে তার লজ্জা করবার কোন কারণ নেই; কারণ মেয়ে যে-তরফের, লজ্জাটাও যে সেই তরফের। ক্রমে এমন দিন এল, যখন ক্লাশের ছেলেরা নরেনের দাদার বাহাদুরী দিতে আরম্ভ করলে। স্কুল বসবার আগে ছেলেদের মধ্যে যখন এই নিয়ে গল্প চলত আর তারা যখন হরেনকে বাহাদুর ছেলে বলে তারিফ করত, তখন এমন-দাদার ভাই মনে করে নরেনও মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করতে লাগল। হয়ত ক্লাসের ছেলেরা কমলা-সম্বন্ধে আলোচনা করছে, তার মধ্যে কেউ একটা বিশ্রী রহস্য করে উঠল, তাতে সমস্ত ছেলে অমনি একেবারে ছাত ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছে, এমন সময় ধীর ভাবে ম্লান মুখে এসে অরুণ ক্লাসে ঢুকল। হঠাৎ সে হাসি থেমে গেল, কেউ হয়ত তখনো হাসি থামাতে পারে নি, মুখে কাপড় দিয়ে আড় চোখে অরুণের দিকে তাকিয়ে তখনো হাসছে, —কিসের কথা চলছিল, কিসের জন্য এত হাসি, সেটা জানতে না পেলেও ব্যাপার বুঝতে

তার দেরী হত না। কখন কখন এমনও হত যে ছেলেরা অন্য কথা নিয়ে হাসি-তামাসা করছে—কিন্তু সে মনে করত যে তার দিদির কথা নিয়েই আলোচনা চলেছে। এ রকম দুঃসহ জীবন যাপন করা ক্রমে সে বেচারীর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। অরুণ মনে মনে ভাবলে যে, সে আর স্কুলে যাবে না। কাউকে না জানিয়ে একলা কলকাতায় গিয়ে সে দিদির সন্ধান করবে।

একদিন সকাল বেলা স্কুলে যাবার সময় সে তার মাকে জানিয়ে দিলে যে আজ থেকে সে আর স্কুলে যাবে না। পড়া-শুনার উপর তার খুব মনোযোগ ছিল, অন্য ছেলেদের মত সে কখনো স্কুলে যেতে আপত্তি করে নি। স্কুলে যাবে না শুনে মা জিজ্ঞাসা কল্লেন—স্কুলে যাবিনা কেন রে? কি হয়েছে?

এ কেনর কোন জবাব ছিল না। কি যে হয়েছে তা সকলেই জানে অথচ মুখ ফুটে কারো বলবার কিছু নেই। অরুণ এই কেনর জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে অশ্রুসিক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—স্কুলে যাবিনে কেন, বাবা? কি হয়েছে?

অরুণ একেবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বল্‌লে—তোমার পায়ে পড়ি মা, আর আমায় তুমি স্কুলে যেতে বলোনা।

এতদিন ধরে স্কুলে তার উপর যে পীড়ন চলছিল, আবেগের মুখে তা সে সব খুলে বল্‌লে! ছেলের কথা শুনে মাও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মৈত্র মশায় বাইরের চাতালে বসে কি করছিলেন, হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনে তিনি ভিতরে এসে স্ত্রীর কাছ থেকে ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন; তারপর ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

যোগেন মিত্তির তখন সবেমাত্র দপ্তরে এসে বসেছেন। ফরাসের উপর একটা উঁচু জায়গায় তাকিয়া হেলান দিয়ে তিনি ফর্‌সীতে তামাক টানছিলেন, আর চারদিকে আট দশ জন কর্ম্মচারী এদিক ওদিক ছড়িয়ে বসে আছে, তাদের আশে-পাশে ছোট লম্বা বেঁটে নানান্ আকারের খাতা ছড়ানো রয়েছে—তার মধ্যে কতগুলো খোলা, কতকগুলো বন্ধ। কাজ চলেছে, দপ্তর জম্‌জম্ করছে—এমন সময় ঝড়ের মত ছুটে হরনাথ সেই ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর সে মূর্ত্তি দেখে দপ্তরের সবাই ভয় পেয়ে গেল। ডান হাতে পৈতেগাছা জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে হরনাথ যোগেনকে বল্লেন—মশায়, এর একটা প্রতিকার করুন। আপনি গ্রামের জমিদার, আমাদের রক্ষক, কি দোষে আমার উপর এতটা অবিচার চলেছে, সেটা আমি জান্‌তে চাই।

হরনাথের কথাবার্ত্তা আর ঐ রকম মূর্ত্তি দেখে দপ্তরের সবাই তাঁর আসার কারণ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু যোগেন মনে করলেন, হয়ত জমিজমা নিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কারো গোলমাল বেধেছে। তিনি তাঁকে বসতে জায়গা দিয়ে বল্‌লেন—বসুন, বসুন, অত উত্তেজিত হয়েছেন কেন? ব্যাপার কি, খুলে বলুন দেখি।

হরনাথের চোখ দিয়ে তখন আগুন বেরুচ্ছিল, তিনি চীৎকার করে বল্লেন—ব্যাপার খুলে বল্‌তে হবে? কি হয়েছে, ঐ গ্রামের কে না জানে!

যোগেন কোন বিষয়ে বেশী ভণিতা করা

আদৌ পছন্দ করতেন না। বিরক্ত হয়ে কর্ম্মচারীদের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মৈত্র মশায়ের কি হয়েছে, তোমরা কেউ জানো?

কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই তখন খাতায় মুখ জুবুড়ে একমনে কাজে লেগে গেছে। দু-একজন তাঁর গলা শুনে খাতা থেকে মুখ তুলে মুখের উপর এমন একটা ভাব আনলে, যেন মনে হল, তারা এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

শশী বরাবরই কর্ত্তার চোখের আড়ালে এক কোণে বসে কাজ করত। হরনাথের আগমনে তার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। তার মনে হল, এবার বুঝি সার্ত পুরুষের বাস্তু ভিটের মায়া ত্যাগ করতে হল। মনে মনে দেবতার নাম স্মরণ করে সে খাতায় নাক গুঁজতে লাগল।

বিরক্ত হয়ে যোগেন বল্লেন—কৈ মশায়, কেউ ত কিছু জানে না। আপনিই খুলে বলুন।

হরনাথ বল্লেন—কমলাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা জানেন ত?

যোগেন এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এ্যাঁ, কমল! কেন, সে কোথায় গেছে!

—কোথায় গেছে! আপনার গুণধর পুত্র তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই বলে হরনাথ কমলার অন্তর্দ্ধানের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলে গেল।

যোগেন জীবনে কখনো এত আশ্চর্য্য হন্‌নি। সব চেয়ে তাঁর আশ্চর্য্য লাগল এই যে, কথাটা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই জানে, তিনিই জানেন না, অথচ তাঁর বাড়ীর সঙ্গেই এই বিশ্রী ব্যাপারটার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যোগেনের মনে হতে লাগল, হয়ত আরও কত কথা, কত ব্যাপার তাঁর বাড়ীতে ও গ্রামে তাঁর চোখ-কাণের অন্তরালে হয়ে যাচ্ছে। নলটা মুখ থেকে জোর করে ছুঁড়ে ফেলে তিনি ডাক দিলেন—শশী—

শশী ততক্ষণ নিজের হাতে নাক-কাণ মলে রণচণ্ডীর দোহাই পাড়ছিল, কর্ত্তার আওয়াজ শুনে কুঁজো হয়ে হাত দুটো জোড় করে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে কর্ত্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

যোগেন বল্লেন—এ সম্বন্ধে যা জান, সমস্ত কথা খুলে বল। একটি কথা গোপন করলে তোমাকে এ গ্রাম-ছাড়া করব। আমার নাম যোগেন মিত্তির—

দপ্তরের সবাই মনে করলে, আজ বুঝি তাদের সামনে একটা ব্রহ্মহত্যা হয়! সকলে নির্ব্বাক হয়ে শশীর সেই গরুড়ের মতন মূর্ত্তির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যা বৈঠকে সকলকার সামনে শশী গোপনে যে বার্ত্তাটী প্রকাশ করেছিল, এতদিনে তার সব কথাগুলো ভাল করে মনেও ছিল না। কাজে কাজেই কাঁপুনির সঙ্গে আমতা-আমতা করতে করতে কমলা ও হরেন সম্বন্ধে সে দস্তুর-মতন একটি নূতন ইতিহাস সদ্য সদ্য বানিয়ে বলে দিলে। শশী বল্লে—হরনাথ দেশে ফিরে আসার পর তার মামাতো ভাইয়ের শালা পশ্চিম যাচ্ছিল, সেই ট্রেণে সে হরেন আর কমলাকে যেতে দেখে তাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছিল।

যোগেন তক্তাপোষের উপর প্রচণ্ড একটা

ঘুসি মেরে বল্লেন—উল্লুক, এ কথা আমায় এতদিন বলনি কেন ?

শশী টাল খেতে খেতে চার পাঁচ পা পিছনে সরে গিয়ে বল্লে—আজ্ঞে, ভয়ে কর্ত্তা।

যোগেন আর কাউকে কিছু না বলে দপ্তর ছেড়ে উঠে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।*

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

বৈদিক দেব-নামানুসারে খৃষ্টধর্ম্মের একটী ঈশ্বর-নাম

খৃষ্টধর্ম্ম, ধর্ম্মের নূতন সংস্করণ, অথচ ইহা আর্য্য জাতীয়দিগের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম নহে। ইহা সেমিটিক জাতির উদ্ভাবিত ধর্ম্ম, সুতরাং ইহাতে যে আর্য্য-সাধারণ কিছু থাকিতে পারে, তাহা সহজে প্রত্যয়যোগ্য হইবার কথা নহে। কিন্তু পুরাণ ও ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে আর্য্য ধর্ম্মের নিদর্শন খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান ঈশ্বর-তত্ত্বের সংস্রবেই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা সেই প্রমাণই উপস্থিত প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিব।

'ভগ' বেদের অন্যতম প্রাচীন দেবতা। তিনি আদিত্য-দেবতা বিশেষ। তিনি পাশ্চাত্য বৈদিক পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ভাগ্যদেবতা (God of fortune) বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। অধ্যাপক-প্রবর ব্লুম্‌ফিল্ড্ সাহেব তদীয়—"The Religion of the Veda" ('বেদের ধর্ম্ম') নামক পুস্তকে ভগ যে কেবল ভারতীয় দিগেরই প্রাচীন দেবতা নহেন, পরন্তু পারসীক ও পাশ্চাত্যদিগেরও দেবতা, সে সম্বন্ধে স্পষ্টই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Bhaga, 'Fortune' is not only Indo-Iranian but even Indo-European." The Religion of the Veda by Maurice Bloomfield P. H. D. L. L. D. P. 130.

তিনি বিভিন্ন ভাষার তুলনা দ্বারাই তদীয় উপরি-উদ্ধৃত মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এস্থলে তদীয় উক্ত তুলনাটী উদ্ধৃত হইতেছে :—

---

* এই উপন্যাস আগাগোড়া একজন না লিখিয়া প্রতিমাসে বিভিন্ন লেখক ইহাকে অগ্রসর করিতে থাকিবেন। প্রতিবার নূতন হাতের ইঙ্গিতে চালিত হইয়া ইহা কত বিচিত্র পথে ঘুরিবে এবং কোথায় কি ভাবে সমাপ্ত হইবে, তাহা এখন কাহারো অনুমান করিবার যো নাই ;—না লেখক, না পাঠক ! লেখকদের মধ্যে আমরা কয়েকজন নামজাদা ঔপন্যাসিককে পাইয়াছি। তাঁহাদের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আগামী সংখ্যায় লিখিবেন—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

"On more limited Indo-European territory appears another general term, Slavic bogu, old Persian baga, Avestan bagha "god," Sanskrit bhaga "god of fortune" Ibid P. 109.

পাশ্চাত্য অধ্যাপক মহোদয় 'ভগ' নামে মঙ্গল বা শ্রেয়ঃ দাতার ভাব যেমন দেখিতে পাইয়াছেন, তেমনই ইহাতে নিত্যজাগ্রত মানব-হিতেচ্ছার ভাবও সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছেন। এই প্রকারে 'ভগ' নামে মঙ্গলময় ঈশ্বরের তান্ত্রিক ধারণা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"The word is again of clear origin : It means spender of goods, or blessings. It contains the abstract conception of a good God, embodying an eternal and never-slumbering wish of mankind." Ibid P. 109.

আমাদের সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে 'ভগ' নামের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণের চেষ্টা করিলে, আমরা অধ্যাপক মহোদয়ের উক্ত ব্যাখ্যা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। অধ্যাপকবর যে 'ভগ'কে ভাগ্য-দেবতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ভাগ্য শব্দ যে ভগ শব্দের যৌগিক (derivative) শব্দরূপে গঠিত হইতে পারে, তাহাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ভগ' শব্দের যৌগিকশব্দরূপে 'ভাগ' শব্দও সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। ঐ ভাগ শব্দও ভাগ্য অর্থেরই প্রতিপাদক। 'ভাগ্য' শব্দে ভাগ শব্দের ভাগ্যার্থের প্রয়োগই দেখা যায়। ইহা হইতে 'ভগ' যে ভাগ্য-বিধাতা দেব তাহা বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। 'ভগ' শব্দের যৌগিক শব্দ ছাড়িয়া, মুখ্য ভগ শব্দটীর মূলার্থ বিচারের দ্বারা ইহার একটী নূতনার্থের সন্ধান আমরা পাইতে পারি। 'ভগ' শব্দ ভজ্ ধাতু হইতে নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই ভজ্ ধাতুর অর্থ 'ভজনা,' উপাসনা। সুতরাং 'ভগ' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হয় ভজনীয়, উপাস্য। এই মূল 'উপাস্য' অর্থ হইতে, ঈশ্বরার্থটী সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে।

'ভগ'দেবের এই বিশেষ 'উপাস্য' অর্থ দ্বারা তিনি যে বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাধান্য মূলেই যে তাঁহার নাম বৈদিক আর্য্যদিগের ন্যায় অপর আর্য্যদিগের মধ্যেও প্রচার লাভ করিবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

অধ্যাপক ব্লুম্‌ফিল্ড্ পাশ্চাত্য সেভজাতি ও আদিরিক পারসীক জাতির মধ্যে 'ভগ' নামের প্রচলন প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; পরন্তু আসিয়া-মাইনরের গ্রীকদিগের মধ্যেও যে এই নাম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারও সন্ধান তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"The "Phrygian" Zeus Bagaios reported by the Greek glossographer Hesychios is nothing but the Persian Baga." Ibid P. 109. foot-note.

এখানে গ্রীকদিগের প্রধান দেব জিউসের (Zeus) সহিতই 'ভগ' নামটী সংযোজিত

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে ভগদেবের বিশেষ প্রাধান্যের প্রমাণ যেমন পাওয়া যায়, তেমন পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে তাঁহার ঈশ্বররূপে পরিণতির যথেষ্ট আভাসও পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 'ভগ'দেব স্লেভদিগের মধ্যে এরূপই গৌরব লাভ করেন যে স্লেভ-জাতি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও তাহাদের নবধর্ম্মের ঈশ্বরকে নবনামে অভিহিত না করিয়া তাহাদের ঈশ্বরের পুরাতন অভিধাই তাহারা তাঁহাকে প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বেদবিৎ পণ্ডিত রেগোজিন তদীয় Vedic India—(বৈদিক ভারত) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ বক্তব্য করিয়াছেন:—

A fourth, Bhaga, quite impersonal and only occasionally mentioned along with the others, is of great interest to us because of his name, which, in a very Slightly modified form, Bogh has been adopted by the entire slavic branch of the Indo-European family of nations as that of God—the one God of Christian monotheism." Vedic India by F. A. Ragozin P. 155.

পাঁচ হাজার বৎসরেরও প্রাচীনম বৈদিক দেবতা যে অধুনাতন খৃষ্টধর্ম্মের পর দেবতা বা পরমেশ্বরের সহিত এরূপ সমঞ্জী ভূত হইবে, তাহাতে বৈদিক দেব-কল্পনা কতদূর উন্নত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তাহার যে আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়, বৈদিক যে নিত্য বা সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণাক্রা তাহারও তেমনই আশ্চর্য্য আভাস ইহা হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কাল-বৈশাখী

তেরো

বিনোদের কথা

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এটা ত জানা কথা! মানুষের মন নিয়ে এতকাল আমি মিছেই নাড়াচাড়া করি-নি! ওজন করে' করে' সব কাজ আমি করেছি! তাই আমি একটুও আশ্চর্য্য হই-নি! 'কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হয় সেই মূর্খরা,—সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত ভেবে-চিন্তে, আগে থাক্‌তে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে যারা কাজ করতে জানে না! উকিলের ছেলে নেপোলিয়ন যদি সম্রাট হয়েছেন বলে' নিজেই বিস্মিত হয়ে যেতেন তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথা থেকে রাজমুকুট খসে পড়্‌ত!

আমার একান্ত অবহেলায়, কঠিন ব্যবহারে, কর্কশ কথায় প্রভার মন আমার প্রতি বিরূপ হয়ে, মিষ্টভাষী, মৃদু

—"দেখ প্রভা, তোমাকে আমি ভালো না বাস্‌লেও স্ত্রীর আর-সমস্ত অধিকার থেকে আমি তোমাকে বঞ্চিত করি-নি!"

প্রভা তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, তুমি আমার পেটে ভাত দিয়েচ, পরোণে কাপড় দিয়েচ, আর—যাতে আমার পতন হয় তার পথও বেশ খুলে দিয়েচ! এ-কথা আমি মান্‌ব।"

প্রভা যে দেখ্‌ছি উল্টে আমাকেই আক্রমণ কর্‌তে চায়! এর জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলুম না, অধীরভাবে বল্‌লুম, "তোমার পতনের পথ খুলে দিয়েছি কি-রকম?"

—"ভেবে দেখ।"

—"ভেবে দেখব? কি ভেবে দেখ্‌ব? যা বল্‌চ তা তোমার ভ্রম।"

—"দেখ, আমাকে আর জ্বালিও না। —তোমার পায়ে পড়ি। আমি সব বুঝি। ভ্রম তোমার—তুমি ভাব পৃথিবীতে তোমার মত বুদ্ধিমান্ লোক আর নেই। দেখো, এই ভ্রমই তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে।"

—"প্রভা, তুমি এমন সুরে কথা কইচ, যা আমি পছন্দ করি না।"

—"যা পছন্দ কর না, তা সাধ করে' শুন্‌তে চাইচ কেন? আমি ত বল্‌চি, আমাকে রেহাই দাও। তোমার সংসারে থেকে আমারও প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে, এখান থেকে এখন একেবারে মুক্তি পেলেই আমি বর্ত্তে যাই।"

—"হ্যাঁ, আমিও তোমাকে একেবারে মুক্তি দিতে চাই। তোমাকে আমি আর বইতে পারচি না। বুঝলে?"

—"এ কথা আজ কেন, অনেকদিন আগেই বুঝেচি। কিন্তু এতদিন আমি চলে যেতে চাই-নি বলেই তুমি বুঝি দায়ে পড়ে আমার ভার সহ্য করে' ছিলে?"

—"ঠিক। কিন্তু এখন দেখ্‌চি আর সহ্য করা চলে না। তুমি মাত্রার বাইরে গিয়েচ। কাল রাত্রে স্বচক্ষে যে দৃশ্য দেখেচি—"

—"সে দৃশ্যের কথা তোমাকে আর খুলে বল্‌তে হবে না। এখন আমাকে একটু বিশ্রাম কর্‌তে দাও। আজকেই আমি তোমার বাড়ী থেকে বিদায় হয়ে যাব—"

—"কিন্তু তোমার ওপরে আমি অবিচার কর্‌তে চাই না। আমি যখন তোমার স্বামী, তখন আইনত তোমার ভরণ-পোষণের জন্যে আমি দায়ী। তুমি যেখানে যে-ভাবেই থাক, মাসে মাসে আমি তোমাকে অর্থসাহায্য কর্‌ব।"

—"কিন্তু তোমার দয়ার দানে আমার একটুও লোভ নেই। নিজের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা আমি নিজেই কর্‌ব-এখন। দেশে আমার ভাই আছেন, সেখানে আমি ফ্যাল্‌না ও নই।"

প্রভা এমন সহজ ভাবে এই নির্ব্বাসন-দণ্ড নিলে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মনে হ'ল, সে যেন আগে থাক্‌তেই আমাকে ত্যাগ করে' যাবে বলে' প্রস্তুত হয়েছিল। তার গর্ব্বিত প্রকৃতিকে একটুও খর্ব্ব করতে পারলুম না বলে' আমার মনে দুঃখ হ'ল। কিন্তু একদিক দিয়ে তাকে আঘাত দিতেই হবে। ভেবে-চিন্তে শেষটা বল্‌লুম, "হ্যাঁ, শুধু তোমার ভাই কেন, আরো অনেকের কাছেই তুমি ফ্যাল্‌না নও। সে কথা আমি জানি।"

—"তোমার কথার মানে ?"

—"অতি স্পষ্ট। আমি বা তোমার ভাই তোমাকে ত্যাগ কর্‌লেও, পুরন্দর তোমাকে ত্যাগ কর্‌বে না। যতদিন তোমার রূপ-যৌবন আছে, পুরন্দর তোমারে ফুলদানির তোড়ার মত সাজিয়ে রাখ্‌বে। তোমার আর ভাবনা কি ?"

কিন্তু প্রভা আমার এ খোলাখুলি আক্রমণে একটুও বিচলিত হ'ল না। আমার কথা সে যেন আমোলেই আন্‌লে না। আমার চোখের উপরে তার শান্ত চোখ রেখে, স্থির স্বরে সে বল্‌লে, "পুরন্দরবাবুকে চিন্‌তে হ'লে, তোমাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তপস্যা কর্‌তে হবে। মাটির ভিতরে যে-সব অন্ধকারের পোকা থাকে, নীলাকাশের উদারতা বোঝা তাদের কাজ নয়।"

প্রভাকে আহত কর্‌তে পার্‌লুম না। বরং তার সাহস দেখে আমারি মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কোনরকমে আত্ম-সংবরণ করে' বল্‌লুম, "তোমার উপমার অর্থ বোঝা একটু শক্ত। কবিতা পড়া বা শোনা কোনকালেই আমার অভ্যাস নেই তা জান ত ?"

—"আগেই ত বলেচি, বুঝতে তুমি পার্‌বে না! তোমার অত্যাচারে অন্ধ হয়ে পুরন্দরবাবুর পায়ের তলায় আমি আশ্রয় নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু তিনি আমাকে মা বলে ডেকে আমার মুখ রক্ষা করেছেন, আমার মোহ ভেঙে দিয়েছেন, আমার নারীত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সেই মুহূর্ত্তের ভুলের জন্যে যে পাপ, সে পাপ আমার হয়েচে বটে—কিন্তু আমার দেহ এখনো নিষ্কলঙ্ক।"

—"কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখেচি—"

প্রভার সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দাঁড়িয়ে উঠে, দুই চোখ মুদে সে প্রবল বেদনায় অস্ফুট স্বরে বল্‌লে, "তুমি যা দেখেচ, তার জন্যে আমিই দায়ী —আমিই দায়ী! কি নিষ্ঠুর তুমি গো, —নারীর এই গভীর কলঙ্কের কথা তার নিজের মুখে না-শুনে তুমি ছাড়্‌লে না—" বলতে বলতে দ্রুতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

.... কিন্তু এ কী শুনলুম! এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষাতেও - পুরন্দরের মন তাহলে বিকৃত হয়ে যায়-নি! পশুত্বই তাহলে সব মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয় ?... ...

না, না, না! আমি বিশ্বাস করি না,— প্রভার মিথ্যা কথা!

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চয়ন

মৎস্যনারী

মৎস্যনারী বা জলবালার কথা মানুষ অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছে।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Gentleman's Magazineএর ২১৬ পৃষ্ঠায় 'মারমেড' বা সাগর-বালার এই বিবরণটি বাহির হইয়াছিল।—

"সম্প্রতি লণ্ডন-সহরে সাগর-বালার যে দেহটি প্রদর্শিত হইতেছে, সেণ্ট জেমস্‌ মেলায় বৎসর-কয়েক পূর্ব্বে প্রদর্শিত সাগর-বালার সঙ্গে তাহার যথেষ্ট আকৃতি-গত পার্থক্য আছে। পূর্ব্বে-প্রদর্শিত সাগর-বালাটিকে দেখিতে ছিল কৃষ্ণবর্ণ; কারণ আফ্রিকার সমুদ্র হইতে তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। কিন্তু এবার-কার সাগর-বালাটি আমেরিকার সমুদ্রের বাসিন্দা। তাই তাহার গায়ের রঙও সাদা। লোকে সাগর-বালাটিকে দেখিলেই নিগ্রো রমণী বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এবারকার সাগর-বালাটিকে অবিকল যুবতী য়ুরোপ-সুন্দরীর মত দেখিতে।

তাহার চোখদুটি সুন্দর হাল্‌কা নীলরঙের; নাকটি ছোট্ট, টিকলো; মুখের হাঁ বড় নয়; ঠোঁটদুখানি পাতলা; চিবুকটি সুগঠিত ও

মৎস্যনারী
(সি, এন, কেনেডির আঁকা)

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

জেলের ছেলে ও জলবালিকা। (হার্বার্ট, এফ, ড্রেপারের আঁকা)

মাছ ধরতে,—জলবালা! (হার্বার্ট, এফ, ড্রেপারের আঁকা)

ব্যারণ ক্লটের গড়া ঘোড়া

করিয়া ফেলিয়াছেন। কোন কোন ভাস্কর ঘোড়ার দ্রুতগতি ও সতেজ ভাবের আভাস দিয়াছেন বটে, কিন্তু গঠন নির্ভুল করিতে পারেন নাই।

একালের মধ্যে অশ্বমূর্ত্তি গঠনে সব-চেয়ে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, ব্যারন ক্লট। রুশিয়ার পেট্রোগ্রাডে আনিচ্‌কিন সেতুর উপরে তাঁহার গঠিত যে চারিটি ঘোড়ার মূর্ত্তি আছে, তার চেয়ে নির্দ্দোষ ও সুন্দর ঘোড়ার মূর্ত্তি আর কোথাও নাই।

আমরা ব্যারন ক্লটের গড়া একটি ঘোড়ার ছবি এখানে দিলাম। (এই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিটির সঙ্গে কণারকের প্রাচীন শিল্পীর গঠিত অশ্বমূর্ত্তির কি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে! কণারকের ঘোড়াটি এখন ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার হইইেও এবং তাহার ভিতরে উচিত-মত স্বাভাবিকতা না থাকিলেও, এই দুই দেশের প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পের মধ্যে যে একই গতির বিদ্যুৎ ছুটিতেছে এবং একই ভাবের ধারা বহিতেছে, সেটা যিনিই দেখিবেন, তাঁহাকেই মানিতে হইবে।)

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

আশ্চর্য্য ঘড়ি

জন ময়ারের ঘড়ি

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক স্বর্গীয় জন্ মুয়ারের একটি বিখ্যাত ঘড়ি ছিল। তাঁহার ছাত্রজীবনে তিনি ঐ ঘড়িটী ব্যবহার করিতেন, পরে Wisconsin State Historical Societyর মিউজিয়মকে তাহা দান করিয়া যান। কাজ করিবার ঝোঁকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইত বলিয়া সকালে ওঠা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। প্রথম প্রথম পায়ের আঙুলে দড়ি বাঁধিয়া ভৃত্যকে দিয়া ভোর পাঁচটার সময় তিনি দড়ি টানাইয়া লইতেন। এই উপায়ে কয়েকদিন বেশ কাজ চলিয়াছিল, কিন্তু পরে অন্যান্য ছাত্রেরা আসিয়া তাঁহাকে বিছানা হইতে টানিয়া ফেলিতে সুরু করিল। অবশেষে তিনি একটি ঘড়ি উদ্ভাবন করিয়া সমস্ত কাজ সোজা করিয়া লইলেন।

প্রথমত তিনি দেবদারু তক্তা দিয়া একটি তেপায়া খাট বানাইলেন। খাটের মাথার দিকে দুইটি ও পায়ের দিকে একটী পায়া; এই পায়ের দিকের পায়াতে একটী পেরেক এমন ভাবে লাগানো থাকিত যে উহা তুলিয়া লইলে খাটখানি পড়িয়া যাইত।

একটী লম্বা দড়ির একপ্রান্ত সেই পেরেকে বাঁধা ও অপরপ্রান্তে ঘড়ির কাছাকাছি একখণ্ড পাথর। রোজ শুইবার আগে দড়িটী ঘড়ির সঙ্গে লাগাইয়া লইলে প্রত্যহ প্রাতে পাঁচটার সময় ঘড়ি নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিত। ভদ্রলোকের বিছানা হইতে উল্টাইয়া পড়ার গোলমালে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথর-পড়ার শব্দে বাসাস্থ সকলেরই ঘুম ভাঙিয়া যাইত। ইহা ছাড়া তিনি এই ঘড়ির কলের সাহায্যে ইচ্ছামত সময়ে আগুন ধরাইতে পারিতেন বা পড়িবার সময় বই খুলিতে এবং বন্ধ করিতেও পারিতেন।

গাছের গুঁড়ির ঘড়ি

ঘড়িটী দেখিতে নিতান্তই অদ্ভুত। প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরাতন একটী ফার্ গাছের গুঁড়ি কুঁদিয়া, ভিতরে কলকব্জা সাজাইয়া ঘড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঘড়ির গুঁড়ির মুখ সমচ্ছেদ (section) করিয়া কাটিয়া ঘড়ির চাকামুখ তৈরি করা হইয়াছে। ঘড়িটী শুধু দেখিতেই অদ্ভুত নহে, আকারেও বেশ বড়-সড়। চাকামুখটির পরিধি ৩½ ফুট হইতে বেশী (প্রায় আড়াই হাত) এবং মিনিটের কাঁটাটি দুই ফুটের উপর (প্রায় দেড় হাত)।

এঞ্জিন-মূর্ত্তি ঘড়ি

এ ঘড়িটি দেখিতে রেলগাড়ীর এঞ্জিনের মত; কান্‌সাসের (Kansas) এক কারিগরের তৈরি। এঞ্জিনের নক্সাদার কামরার গায়ে নকল আবলুস কাঠের চাকামুখ এবং তাহা চুনী ও সবুজ বৈদ্যুতিক আলো দিয়া সাজানো। ইহা ছাড়া কামরার ভিতরে এবং এঞ্জিনের বাহিরের নানা অংশে ছোট-বড় আরও অনেক আলো আছে। ঘড়ির কলের সঙ্গে এই সমস্ত আলোর যোগাযোগ থাকায়, প্রত্যহ সন্ধ্যা ছয়টা হইতে আরম্ভ করিয়া ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা আছে। ঘড়ির চাকামুখের আলোক-সমষ্টির সঙ্গে কামরার ভিতরকার ও বাহিরের

অন্যান্য আলোক-সমষ্টির এককালীন যোগ নাই; যে কোন আলোক-সমষ্টি স্বতন্ত্রভাবে জ্বলিতে পারে। প্রত্যেক বিভিন্ন আলোক একটির পর একটি করিয়া প্রতি পনেরো সেকেণ্ড অন্তর জ্বলিয়া ওঠে, এবং তিন সেকেণ্ড থাকিয়া নিবিয়া যায়। কলকব্জা সাধারণ ঘড়ির মত এবং একদমে আট দিন চলে। আধ ঘণ্টার এবং সময়ের ঘণ্টার সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনের চাকাও ঘুরিতে থাকে, কিন্তু রেল-পথের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ না থাকায় চলিতে-ফিরিতে পারে না।

জুয়াড়ীর ঘড়ি

জুয়াড়ীর ঘড়িই ইহার উপযুক্ত নাম; কারণ দেখিলে মনে হয় যে,জুয়াখেলার যাবতীয় সরঞ্জাম দিয়া উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। দাবার ছকের তৈয়ারী চাকামুখের উপরে এক হইতে বারো পর্য্যন্ত বিন্দুযুক্ত চৌকা গুটী দিয়া সময়-সংখ্যা নিরূপণ করা হইয়াছে। ছোট কাঁটার লম্বাদিকের মাথায় হরতনের নক্সা এবং অপরদিকে চিড়িতন। তেমনি বড়কাঁটার লম্বাদিকের মাথায় রুহিতন এবং অপরদিকে ইস্কাবন। একটী চৌকা গুটীতে ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা একসঙ্গে বসাইয়া ঘড়িতে জুড়িয়া দেওয়া আছে। ঘড়ির মাথায় একসারে নয়টী বোড়ে, তিনটি বিলিয়ার্ডবল্ এবং একজোড়া বিলিয়ার্ড খেলিবার ছড়ি আড়াআড়ি করিয়া রাখিয়া ইহার শোভা বর্দ্ধন করা হইয়াছে।

চিরায়ুস্মতী ঘড়ি

পেনসিলভেনিয়ার Mr. Drawbaughএর আপিসের এই অদ্বিতীয় ঘড়িটি, সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর সুপ্ত-বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালিত হইতেছে। ঘড়িটি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোনদিন বন্ধ ছিল না। বহু পূর্ব্বে Mr. Drawbaughএর পিতা এইরূপ একটি ঘড়ির কল্পনা করেন। পরে Mr. Drawbaugh সেই কল্পনানুযায়ী এই ঘড়িটি প্রস্তুত করেন। গতিকে অবিশ্রান্ত ভাবে কাজে লাগাইবার জন্য অন্যান্য যে-সমস্ত আবিষ্কারক মাথা খাটাইয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাগ্রগামী। ঘড়িটি উচ্চে চার হাত এবং উহার আধমণী দোলনটি শক্তি-কেন্দ্রের (motor) কাজ করে। একখানি স্থায়ী চুম্বক (magnet) এবং আর একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক (Electro magnet) দ্বারা আকর্ষিত বৈদ্যুতিক শক্তিতে উহা চলিতেছে। দীর্ঘে-প্রস্থে দুই হাত এবং চার হাত গভীর করিয়া মাটি খুঁড়িয়া ঘড়িটি বসাইতে হয়। মাটির নীচের ধাতুঅংশগুলিকে উপযুক্ত ভাবে বাষ্পিত (moist) রাখিবার জন্য কয়লা দিয়া গর্ত্ত বুজাইতে হয়। ভাল করিয়া উহা বসানো হইলে সম্বৎসরে এক সেকেণ্ডেরও এদিক-ওদিক হয় না।

পাঁজী ঘড়ি

পৃথিবীর নানাদেশ হইতে ছোট বড় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া ওয়াসিংটনের Mr. Frank Friede এই ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার আকার অত্যন্ত বড়—দীর্ঘে-প্রস্থে সমান—দুই হাত; উচ্চে সাড়ে তিন হাত, এবং একশো আটটি চাকামুখ উহাতে সংযুক্ত আছে। শুধু সময় দেখা

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ছাড়া উঁহাতে আরও অনেক জিনিষ দেখা যায়; যথা—নানাদেশের জাতীয় পতাকা, দেশের বিভিন্ন শাসনপ্রণালী, যাবতীয় ডাক-টিকিট, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের রাজধানীর নাম এবং ভাষা। ইহাতে সৌর-জগতের গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদির সমস্ত গতিবিধি পরিলক্ষিত হয়, যথা—তিথি, গ্রহণ ইত্যাদি। ভিতরের কলকব্জার মধ্যে পাঁচশো চাকা আছে। পুরানো ফনোগ্রাফ, সেলায়ের কল, মেয়েদের টুপীর কাঁটা, ছাতা-ভাঙা ইত্যাদি দিয়া উহার বেশীরভাগ অংশ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ভাঙা ষ্টোভের ঘড়ি

ফিলাডেলফিয়ার ষ্টোভ মেরামত করার কারখানায় এই ঘড়ি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। আকারে উহা বেশ বড়, তিন হাত লম্বা এবং দুই হাত চওড়া। বিশেষত্বের মধ্যে উহা অত্যন্ত ভারী (৪।০ মণ) এবং ইহাতে একটি অভ্রের চাকামুখ আছে, তাহাতে Stove Repairs এই বারোটি অক্ষর দিয়া সম্ নিরূপণের অক্ষর লেখা আছে। যেমন ১এ বদলে S, দুই বদলে T, তিনের বদলে ইত্যাদি। পাঁচশো উনিশটি ভাঙা ষ্টোভে টুক্‌রা ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে-লাগিয়াছে।

মাধ্যকর্ষক ঘড়ি

এই ঘড়ির নির্ম্মাতা একজন ফরাসী নাম Mr. Eugene Walser। আশ্চর্য্যের মধ্যে এই যে, উহার কোন অংশে একটি স্প্রিং নাই এবং সেই জন্য উহাতে দম দিবারও প্রয়োজন হয় না। ঘড়িটি দেখিতে চক্রাকার একটি ঈষৎ-ঢালু টেবিলের উপর হইতে আস্তেআস্তে গড়াইবার সময় কলকব্জা আপন আপন কায করিয়া যায়। ভিতরের চাকামুখটি গড়াইবার সময় ঘুরিয়া যায় না, উহা একভাবে সোজা হইয়া থাকে। একমাস অন্তর ঘড়িটিকে টেবিলের উঁচুদিকে তুলিয়া দিলেই উহার দম দেওয়ার কাজ হয়।

চারুচন্দ্র রায়।

লর্ড নর্থক্লিফ

যাঁহারা ইংরেজী খবরের কাগজের একটু-আধটু খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই লর্ড নর্থক্লিফের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। অনেকের মতে ইংলণ্ডে তিনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী লোক। তিনি এখন সকলের নিকট Napolean of the Press নামে সুপরিচিত। পনেরো বৎসর বয়সে বালক নর্থক্লিফ প্রথমে লণ্ডনের একটি ছোট সংবাদ-পত্রে এক সামান্য লেখকরূপে কাজ আরম্ভ করেন এবং আজ এই চল্লিশ বৎসর মাত্র বয়সে তিনি প্রায় চল্লিশখানি খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রের মালিক। কেবল মালিক নন, তাঁহার কলমের খোঁচায় অনেক মন্ত্রী ও বড়-বড় যোদ্ধাকেও পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। অনেকে বলেন যে, একমাত্র তাঁহার কাগজেই ইংলণ্ডের জন-

সাধারণের মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়।

নর্থক্লিফ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং তাঁহারা ভাই-বোনে এগারো জন। মা ছিলেন আইরিস্ এবং তাঁহারই উৎসাহ ও প্ররোচনায় নর্থক্লিফ আজ এত বড় শক্তিবান লোক হইতে পারিয়াছেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ও তাঁহার ভাই পঁচিশ হাজার পাউণ্ডে "ইভিনিং নিউজ্" নামে এক সংবাদপত্র কিনিয়া, স্থায়ীভাবে কারবার আরম্ভ করেন এবং ১৮৯৬ খৃঃঅব্দে তাঁহার বিখ্যাত "ডেলি মেল" প্রকাশিত হয়। "ডেলি মেলে"র নাম অবশ্য সকলেই শুনিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বত্র প্রচারিত খবরের কাগজ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই সংবাদ-পত্রের কারবার এখন এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহার সংবাদপত্রের কাগজ যোগাইবার জন্য তাঁহাকে নিউ ফাউণ্ড-ল্যাণ্ডে কয়েকটি প্রকাণ্ড কাগজের কারখানা স্থাপন করিতে হইয়াছে। এই সকল কারখানা কেবলমাত্র তাঁহার সংবাদপত্রের কাগজই যোগায়।

তাঁহার সংবাদ-পত্রগুলিতে হাজার-হাজার লেখক, কম্পজিটার ও সংবাদদাতা প্রভৃতি কাজ করিতেছে। একমাত্র তাঁহার কাগজের কার্য্যালয় হইতেই পাঁচহাজার কর্ম্মচারী যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। সমস্ত কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করার এবং সমস্ত কাজ একসূত্রে গাঁথিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। ইংলণ্ডের প্রত্যেক বড় সহরেই তাঁহার কাগজ আছে এবং সমস্ত কাগজের মধ্যেই একসময়ে একই-প্রকার মত প্রচারিত হয়। কোথাও কোন গণ্ডগোল নাই। সমস্তই ঘড়ীর কাঁটার মত চলিতেছে।

এই যুদ্ধের সময় তাঁহার অনেক শত্রু হইয়াছে। গেল যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি দেশবাসীকে বলিয়া আসিতে-ছেন যে, জার্ম্মেণীর সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। তখন হইতেই তিনি দেশবাসীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশবাসী তখন সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। অনেকেই বলিয়াছিলেন, তিনি যুদ্ধপ্রয়াসী এবং সেইজন্যই দেশবাসীকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। কিন্তু যেদিন জার্ম্মেণী বেলজিয়মের সীমা অতিক্রম করিল বলিয়া ইংলণ্ড যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল, সেইদিন ইংরেজকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, লর্ড নর্থক্লিফ প্রকৃতই একজন তীক্ষ্ণদর্শী দেশহিতৈষী পুরুষ। তিনি জার্ম্মাণদের একজন প্রধান শত্রু। যুদ্ধের সময় উড়োজাহাজ ও 'ডেষ্ট্রয়ারে'র সাহায্যে জার্ম্মাণেরা দুইবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দুইবারই তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়।

কেণ্টের সমুদ্রের ধারে এলম্ উড নামক জায়গায় তিনি সাধারণত বাস করেন। ভোরে চারিটার সময় উঠিয়া তিনি প্রথমে খবরের কাগজগুলি পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়া হইয়া গেলে কোন্ খবরটি নূতন, কোন্‌টির সমালোচনা করিতে হইবে এবং কোন্ জিনিষটি প্রতিবাদ বা সমর্থন করিতে হইবে, তাহা তিনি এই সময়েই মনে-মনে স্থির করিয়া

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

নেন। তাহার পর ইংলণ্ডের যেখানে-যেখানে তাঁহার কাগজ আছে, সেই সেই নগরেই টেলিফোঁয় তাঁহার মতামত শুনিয়া সম্পাদকেরা সেই অনুসারে লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখা পড়িলে বোধ হয়, তিনি একজন গর্ব্বিত ও অহঙ্কারী লোক। সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে লেখাই যেন তাঁহার একমাত্র কাজ। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে একবার-মাত্র মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার মত বিনয়ী ও বন্ধুবৎসল লোক খুব কমই আছে।

যুদ্ধের সময় তাঁহার কাগজগুলির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি দিনের পর দিন প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ইংলণ্ডের লোকবল, অর্থবল, ও অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর তুলনায় খুবই কম। জয়লাভ করিতে হইলে এই সকল অভাব পূরণ করিতে হইবে। আমরা খুব বড়, আমরা নির্দ্দোষী, এবং আমাদের কোন অভাব নাই—এইরূপ ঘোষণা করিলে জয়লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই এবং এইজন্যই লর্ড কিচেনারের পদত্যাগের জন্য তিনি তাঁহার খবরের কাগজে একটা আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। সাধারণ লোক তাহাতে ক্ষেপিয়া উঠিল। অনেক স্থানে তাঁহার খবরের কাগজগুলিকে পুড়াইয়া ফেলা হইল। কিন্তু তিনি তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ তাঁহাকে উচ্চপদ দিতে চাহিলেন। কিন্তু লর্ড নর্থক্লিফ প্রকাশ্যভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার পক্ষে গবর্মেণ্টের কোন কাজ করা অসম্ভব; কারণ তাহা হইলে সংবাদপত্রে স্বাধীন মত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

বাস্তবিক, তাঁহার মত ক্ষমতাশালী স্বদেশ-হিতৈষী লোক বর্ত্তমানযুগে খুব কমই আছে। এমন কি একদিন জার্ম্মান কাইজারকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, প্রকৃতপক্ষে লর্ড নর্থক্লিফই ইংলণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

মার্কিণ বৈজ্ঞানিক মাইকেলসন্

অধ্যাপক অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন্ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃত বিজ্ঞান বিভাগের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ। Munsey's Magazineএ তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। জড়-জগতের নব নব রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, ইনি আজ বিশ্বের মধ্যে পরিচিত ও একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞানের কয়েকটি অসাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার ও সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক কয়েকটি যন্ত্র উদ্ভাবন করায়, জগতের বুধমণ্ডলী তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ 'নোবেল প্রাইজ' ও 'কপ্‌লী মেডেল' (Copley medal) উপহার দিয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। সমস্ত মার্কিণ মুলুকের মধ্যে একমাত্র ইনিই কেবল লণ্ডনের রয়েল সোসাইটীর প্রদত্ত ঐ দুর্লভ 'কপ্‌লী মেডেল'

ইয়াছিলেন এবং জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, আমেরিকার মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে 'নোবেল' পুরস্কার অর্জ্জন করেন।

ইনি বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তকারী আবিষ্কার ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করা সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণের অনেকেই এখনও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানে না। কারণ মাইকেলসন্ কোনদিনই দেশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নিজের যশোদুন্দুভি বাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। নীরবে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় একাগ্রচিত্তে আজ এই সুদীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর কাল তিনি মুগ্ধ হৃদয়ে প্রকৃতির মর্ম্মকাহিনী তন্ময় হইয়া শুনিতেছেন;—আর জাগতিক বৈজ্ঞানিক সমাজ এই সিদ্ধ আচার্য্যের মুখে রহস্যময়ী প্রকৃতির অশ্রুত গোপন বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া বিজ্ঞানের এই পরম ভক্ত পূজারীকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে।

উৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে ক্ষুদ্রতম পরিসরের পরিমাপ পাওয়া যায়, তাহারও এক-পঞ্চাংশ অর্থাৎ প্রায় দশলক্ষ অংশে বিভক্ত এক ইঞ্চির পঞ্চম মাত্রা $\frac{১}{৫০০০০০}$ পর্য্যন্ত পরিমাপ করিবার অতি সূক্ষ্ম উপায় ইনি আবিষ্কার করিয়াছেন। মাত্র একইঞ্চি পরিমাণ প্রশস্ত কোনও উজ্জ্বল মসৃণ কাচখণ্ডের উপর একত্রে পঞ্চাশৎ সহস্র সরল সমান্তরাল রেখা, সমসূত্রে অঙ্কিত করিবার একটি অদ্ভুত যন্ত্র ইনি উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রচলিত দৈর্ঘ্যমানের যে নির্ভুল নিরিখ ইনি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা এতদূর সঠিক যে, বিশলক্ষের মধ্যে একাংশের অধিক সে অঙ্ক ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। আলোক-বেগের কল্পনাতীত প্রচণ্ড গতির হিসাব নির্দ্ধারিত করিয়া ইনি যে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর! সর্ব্বশেষ পৃথিবীর ভূম্যাবরণের কাঠিন্যের মান নির্দ্দেশ করিয়া বিজ্ঞান-জগতে ইনি আপনার অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

নতুন-খাতার নিমন্ত্রণ

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোমাদের ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা;—
এসো বন্ধু! এসো, এসো—টল্‌তে-টল্‌তে মদের গেলাস হাতে করে নিয়ে;
আর, তুমি কে গো? তুমিই না সেই বাস্তু-ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দিয়ে
সহরেতে বাঁধ্‌লে বাসা? ওড়াও, ওড়াও, ফুর্ত্তি ওড়াও! লজ্জা কি হে?
নিজের কড়ি উড়িয়ে দিলে তুমি,
বাপের বাড়ি কল্লে শ্মশানভূমি;—
মারো-নি ত একটি পয়সা কারো!
লোকের কথার ধার তুমি কি ধারো?

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোমাদেরও নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা,—
এসো, এসো—জেল-খালাসী, পকেট-মারা, চোর-ডাকাত আর খুনী-জনের সেরা,
নির্ব্বিচারে তোমরা সবাই সবান্ধবে! নাইক হেথায় বিচার কিংবা জেরা;
করুন সে সব কুঁচ্‌কে ভুরু চস্‌মা চোখে দিয়ে—যে লোকেরা
নিজেরা সব এক-একটি ধর্ম্মপুত্র যেন!
তোমরা তাতে লজ্জা পাবে কেন?
সুবিধে ও সুযোগ থাকলে পরে,
বিচারক যে, বন্ধ হয়ত থাকতো হাজত-ঘরে!

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
সকলকারি নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা।
তোমরা কারা দাঁড়িয়ে আছ সরে?
জাত গিয়েছে মুর্গী খেয়ে? বিলেত গিয়ে? বিধবা-বিয়ে করে?
ঝাড়ু মার তাদের মাথায়, যারা তোমায় শাস্ত্র দেখায়, বিধান দিয়ে করেছে এক-ঘরে।
মানুষকে যে পর করে দেয়, বলো গিয়ে সে সব চসম্‌-খোরে
—"আমরা তোদের তোয়াক্কাটা কি রাখি!
আমাদের সব ফাঁকে রেখে নিজেই তোরা পড়ে গেলি ফাঁকি!
তোদের অন্ন একশোগুণে ঘৃণ্য মুর্গী চেয়ে,
প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা খেয়ে!"

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোদেরও ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা।
তোরা চামার? তোরা চাঁড়াল? জল খেতে নেই তোদের হাতে, এম্‌নি তোরা অস্পৃশ্য
বলেন যে সব মহাপ্রভু, তাদের টোলের নইক আমি শিষ্য।
সত্যিকারের চামার, চাঁড়াল তারাই, যারা এমন সোনার বিশ্ব
অত্যাচারে কালো করে, ভরিয়ে তোলে ক্রন্দনে!
ছুঁইনা সে সব শুদ্ধাচারী পৈতে-ধারী দুর্জ্জনে—
তাদের বাতাস লাগাইনেকো গায়।
আয়, তোরা আয়, বুকের পরে আয়!

আজকে আমার নতুন-খাতা;—
তোমাদের ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা;—
এসো, এসো, সবাই এসো জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে—আসতে বারণ তাদের শুধু খালি,
যারা ভণ্ড, মিথ্যেচারী, বকধর্ম্মী—পেশা যাদের গায়ে দেওয়া কালী।
আর, দিক্‌বিদিকে লাগিয়ে ধাঁধা হুহু করে হাঁকিয়ে হাওয়ার গাড়ি
দিন-দুপুরে মাঝ-সহরে মানুষ মারে যারা,
খুনীর অধম সে সকল জন ধনমদে মত্ত মাতোয়ারা!
তাদের ত বাদ দিতেই হবে আমার এ মজ্‌লিসে
হউন তিনি প্রিয় শ্যালক, মাতুল কিংবা পিসে!

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
নিয়ে এসো নতুন প্রীতি,
নতুন গীতি-গল্প-গাথা;
পরস্পরে জড়িয়ে বুকে সবাই মিলে করি এস প্রাণের কোলাকুলি,
সুখ-দুঃখের নাগর-দোলায় সকল ভাইয়ে একসঙ্গে দুলি;
মনের মাঝের গোপন-ব্যথা এস সবাই বলি খোলাখুলি;
হৃদ্‌কমলের পদ্মমধু হাতে-হাতে বিলাই সকলে
তুচ্ছ হিংসা, তুচ্ছ ঘৃণা, তুচ্ছ বিরোধ-বিষের বদলে;
এস, সবার বুকে আশার প্রদীপ একশো-মুখে দিই জ্বেলে,
ভয়ের মুখে তুড়ি মেরে এগিয়ে চলি পা-ফেলে!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

ভারত ইতিহাস-চর্চ্চা

আমি অন্যত্র একথার আলোচনা করিয়াছি যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। কেন নহে তাহার কারণ আছে।

প্রত্যেক জাতির এক একটি সাধনার বিষয় আছে। এই মূলগত সাধনাটি লইয়াই সেই জাতির সকল লোক আঁট বাঁধে। নর্ম্মানে স্যাক্সনে মিলিয়া ইংরেজ যখন এক হইয়া গেল, যখন তাহাদের মধ্যে সমাজভেদ রহিল না তখন তাহাদের মধ্যে একটা বড় ভেদ রহিল—রাজার সঙ্গে প্রজার স্বার্থের ভেদ। সেই ভেদ যখন একান্ত থাকে তখন রাজার খেয়ালের জন্য প্রজাদের দুঃখ ও ক্ষতি হইতে থাকে। সেই ভেদ বিলুপ্ত করিয়া রাজশক্তিতে নানা প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া পরস্পরের সামঞ্জস্য সাধনের ইতিহাসই ইংলণ্ডের ইতিহাস। অর্থাৎ ইংলণ্ডের যে-

সমস্যা প্রধান ছিল সেই সমস্যার সমাধান লইয়াই তাহার ইতিহাসের পরিণতি ঘটিয়াছে।

ইংরেজি ইস্কুলের ছাত্র ভারতের ইতিহাসে সেই রাষ্ট্রীয় ধারার পথই খুঁজিতে থাকে। খুঁজিয়া না পাইলে বলে ভারতের ইতিহাস নাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার ভারতের ইতিহাস সেখানেই ভারতের সমস্যা যেখানে।

প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে। এই মিলন-চেষ্টাই মানুষের ধর্ম্ম, এই মিলনেই মানুষের সকল দিকে কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।

আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই সকল নানা উপজাতির বর্ণভাষা আচার ধর্ম্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ ইহারা সকলেই প্রতিবেশী। ইহাতে একদিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চলিতেছিল তেমনি আর একদিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কি করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য-সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।

য়ুনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের ইতিহাসে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহার সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের কিছু মিল আছে কিন্তু অমিলও যথেষ্ট। সেখানে য়ুরোপের নানাস্থান হইতে নানাজাতি মিলিতেছে। কিন্তু তাহারা একই বর্ণের সুতরাং তাহাদের মিলনের বাধা সুগভীর নহে। তাহা ছাড়া, য়ুরোপের সকল উপজাতির মধ্যে সভ্যতার রূপভেদ নাই। নিগ্রোদের সমস্যার কোনো ভাল মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত সেখানে হয় নাই বলিয়া কেবলি দুঃখ অত্যাচার, অবিচারের সৃষ্টি হইতেছে ইহাতেই মনুষ্যত্বের পীড়া ঘটে। এই পীড়া দুর্ব্বল সবল উভয়কেই স্পর্শ করে। তাহা ছাড়া এসিয়াবাসীদের সম্বন্ধে শুধু আমেরিকায় নহে য়ুরোপের সকল উপনিবেশেই বিরোধ চলিতেছে এসিয়াবাসীকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখি এই বিরোধ দেশের বাহিরে গিয়া কালক্রমে আ প্রবল হইয়া জমিতে থাকিবে এবং একদিন ই হিসাব নিকাস করিতেই হইবে। আমেরিক ইতিহাসে আর একটা ব্যাপার দেখিতে পাই তাহা ঐক্যসাধন না বলিয়া একাকারীকরণ বলা যা যে কোনো জাতীয় লোক আমেরিকা স্থায়ীভাবে বাস করিতে আসে ভাষায়, আচা ব্যবহারে তাহাকে সম্পূর্ণই আমেরিকান ক তুলিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে রাষ্ট্রীয় দিক হই সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যমূলক মান সভ্যতার দিক হইতে ইহাতে ক্ষতিই ঘটে। সৃষ্টি যে পরিণতিক্রিয়া দেখি তাহাতে একাকারত্ব আ দেখা যায় কিন্তু বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এ মধ্যে বিভাগ ও সেই বিভাগের মধ্যে ঐক্য প্রক হইতে থাকে। যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে একাকারত্ব একান্ত আবশ্যক বলিয়া ধরা হয়, তবে বলিতে হইবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঐক্যের আদর্শ নহে। ইহা একপ্রকার স্বাধীনতার লোভে মানুষের গভীরত স্বাধীনতাকে বলপূর্ব্বক বলি দেওয়া হয়। সমস্যা ইহা প্রকৃত সমাধান নহে বলিয়াই ইহাতে এত নিগূঢ় দাসত্ব ও ব্যাপক দুঃখের সৃষ্টি হইতেছে।

ভারতবর্ষে নানা জাতির এই সংঘাত ও সামঞ্জস্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বৈদিকযুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযু পৌরাণিক যুগে পরিণত হইয়াছে। এই সৃষ্টির উদ্ভা রাজা ও রাষ্ট্রনীতি প্রধান শক্তি নহে। অবশ্য বিদে রাজা যখন হইতে ভারতে আসিয়াছে তখন হই এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকার্য্য বাধা পাওয়ায় আর এক অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। এই জন্যই ইংরে যাহাকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করে ভারতে সে ইতিহাস মুসলমান অধিকারের পরে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অর্থ এমন নহে যে বিদেশী রাজত্বে পর হইতে ভারত-ইতিহাসের প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে পূর্ব্বে চেয়ে আমাদের ইতিহাস জটিল হইয়াছে, আর্য্য

দুরূহ সমস্যায় আরো একটি নূতন গ্রন্থি পড়িয়াছে। এখনো আমাদের মধ্যে ভেদের সমস্যা। এই ভেদ সমাজের ভিতরে থাকিতেই অন্য দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কিছুতেই ঠিকমত খাটিতেছে না। আমরা অন্য দেশের নকলে যে সব পন্থা অবলম্বন করিতেছি, বারম্বার তাহা ব্যর্থ হইতেছে।

যাহা হউক, আমাদের দেশের এই সামাজিক ইতিহাসের ধারা এখনো আমরা আগাগোড়া অনুসরণ করিয়া দেখি নাই; অনেকটাই অস্পষ্ট আছে এবং অনেক জায়গাতেই ফাঁক পড়িয়াছে। বিশেষত যেহেতু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্ম্মতন্ত্রমূলক সেইজন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাস কুয়াশার মত আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে। ৬ গোচর হইয়া উঠিতেছে তাহা বিদেশী ঐতিহাসিকদেরই চেষ্টায়।

কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাসের জন্য চিরদিনই কি পরের মুখ তাকাইয়া থাকা চলিবে?

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধানযুগ। ইহা যেমন ভারতবর্ষ ও হিন্দু ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্য্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি এক-প্রবেশনায় ভাঙিয়াছিল—শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্ম্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তারপরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ এবং হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধি স্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য্য ও অনার্য্য এক গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান-প্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসঙ্গত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসঙ্গতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্ব্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে পদেপদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়,—যাহা কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম চীন জাপান জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই জন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মত হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানাজাতির নানা ক্রিয়াকর্ম্ম মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চ্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থন-দণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্ম্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণজনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে, ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিককালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানাজাতির

সম্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ইহারাই আর সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য্য তাহাকে আর্য্যবেশ পরাইবার প্রয়াস ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

অতএব, ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া এই মহাযান বৌদ্ধপুরাণ সকলের অনুশীলন করিতে হইবে। বিশ্বভারতীতে কোনো ছাত্র যদি অনুশীলনে নিযুক্ত হইতে পারেন তবে আনন্দের বিষয় হইবে। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য সিংহলের মহাস্থবির মহাশয় আছেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত অধ্যাপনার অধ্যক্ষতা করিতেছেন। অতএব এখানে এই কাজ আরম্ভ করার সুযোগ আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন। চৈত্র ১৩২৬।

অতিথি

একটি সত্য আছে, সেটি মানুষের অন্তরতম। বোধ করি, সেই জন্যেই তাকে আমরা ভুলে থাকি। বাইরের নানা টানে নানা দাবীতে আমাদের বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সকলের চেয়ে অন্তরের এবং কাছের কথাটিতে আমাদের মন যায় না।

সে কথাটি এই,—আমাদের জীবনের দ্বারে একজন অতিথি আছেন।

একদিকে তিনি দেবেন আর আমরা নেব, এর সামঞ্জস্য করতে হলে, আরেকদিকে আমরা দেব আর তিনি নেবেন এইটুকু থাকা চাই, নইলে দানের ভারে আমরা নেমে পড়ব। তাই তিনি আমাদের দ্বারের কাছে এসে অপেক্ষা করেন; নিজের কর্ত্তৃত্বরাজ্যে যেমন প্রভুরূপে থাকেন তেমন ভাবে নয়, আমাদের কর্ত্তৃত্বের সংসারে অতিথিরূপে। আমরা তাঁকে কতটুকু জায়গা ছেড়ে দিই, তাঁর জন্যে আমাদের কতটুকু সেবার আয়োজন, সেইটুকুতেই আমাদের তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সত্য হয়।

সেইজন্যেই যেমন বলচি, পিতা নো বোধি, তুমি যে পিতা এই বোধ আমাকে দাও, তেমনি করেই আমাকে প্রার্থনা করতে হবে, তুমি যে আমার অতিথি এই বোধ আমাকে দাও। পিতার বোধ হচ্চে তাঁর কাছ থেকে পাবার, অতিথির বোধ তাঁকে দেবার।

যখন ভালবাসি তখন দেওয়াতে আর বাধা থাকে না। এই যে অতিথি আমাদের ঘরে আশ্রয় চেয়েচেন, আর বলেচেন, তোমার সম্পদ তুমি একলা ভোগ কোরো না, আমাকেও স্মরণ কোরো। তবু পারিনে দিতে; নানা জায়গাই আমার "আমি" জুড়ে থাকে, আমার সব শক্তিই এই "আমি"র দাবী মেটাতেই ব্যাপৃত। তাঁকে দাঁড় করিয়েই রাখি। এমন কেন হয়? প্রেম নেই বলে। দিতে তাই আনন্দ নেই। তাই কেবলি বলি, তুমি রোসো, আমার সময় নেই, আমার অনেক কাজ।

সংসারে সত্য হব এবং সংসারকে সত্য করব, এইটে হল মানব জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন করবার জন্যেই আপনাকে প্রত্যহ বলতে হবে, "সকলের চেয়ে বড় যিনি তিনি অন্তরের মধ্যে এসেছেন, ছাড় সব ছোট কথা ছোট বাসনা।" বলতে হবে, "সকলের চেয়ে প্রিয় যিনি তিনি হৃদয়ে এসেচেন, আপনার স্বার্থকে আনন্দে তাঁর কাছে বিসর্জ্জন কর।"

সংসারে প্রতিদিন যদি বলি, আমিই আছি, আমার মধ্যে আমার চেয়ে বড় কেউ নেই, তাহলেই বড় সত্যকে বাদ দিয়ে সংসারটাকে দেখি, তাহলেই ওজন ঠিক থাকে না, তাহলেই বিপদ বাধে, তাহলেই সব চেয়ে বড় ঠকা ঠক্‌তে হয়।

যিনি বিশ্বের অধীশ্বর তিনি আমার অতিথি হয়ে এসেচেন, আমার জীবনে এইটেই সব চেয়ে বড় সত্য কেন? কেননা, এইখানে দুটি সত্যের মিলন হয়েচে—একটা হচ্ছে তিনি বড়, আরেকটা হচ্চে আমিও ছোট নই।

একরকম বড় আছে সে অভিভূত করে, আমার সব কেড়ে নিয়ে জবরদস্তি করে; সে যত বড়ই হোক তার কাছে নত হওয়া, তার কাছে আত্মাবমাননা। কিন্তু এ ত তা নয়। তিনি সকলের চেয়ে বড় হয়ে আমাকে চাইলেন। তাতে তিনিও বড় রইলেন আমাকেও বড় করলেন। যিনি কর্ত্তৃত্ব করেন, তিনি এইখানে আমার কর্ত্তৃত্ব মানেন। আমি ভুলে থাকি, তাঁকে ফিরিয়ে দিই, কিন্তু তিনি দরজা ভাঙেন না, অপেক্ষা করেন। তিনি বলেন আমি এসেচি তোমাদের হৃদয় নিতে; খাজনা নিতে নয়।

এই যে সূর্য্য, এ সমস্ত সৌরজগতের অধিপতি। এই পৃথিবীকে সে বেঁধেচে তার নিজের সঙ্গে। সকালে পূর্ব্বদিগন্তে যখন সূর্য্য দেখা দেয়, যখন তার করাঘাতে অন্ধকারের কপাট খুলে যায়, তখন পৃথিবী পুলকিত হয়ে অনুভব করে সমস্ত সৌরমণ্ডলের সূর্য্য বিশেষভাবে তারই আপন হয়ে তার দ্বারে অতিথি, তাই আনন্দে সে তার ফুলের সাজি সাজিয়ে ধরে, তার নহবতে প্রভাতী সুর বাজিয়ে দেয়। এই পূজায় তার নিজের মহিমা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়।

এই সকালে সূর্য্য পৃথিবীর দ্বারে এল, সে ত প্রভু ভাবে এল না; আনন্দের সুর বাজিয়ে এল। পৃথিবী যদি তার সমস্ত হৃদয় উদ্ঘাটন না করত, যদি বন্ধ থাকত তার ঘর, তাহলে কি অমঙ্গলই হত, চারিদিকে কি অন্ধকার, কি নিরানন্দ!

এমনি করেই অসীম পুরুষ প্রত্যেক মানুষের আত্মার দ্বারে তারই বিশেষ অতিথি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বলচেন, আমি যে প্রভু সেই কথাটি ভুলে যাও, মনে রাখ আমি একান্তভাবে তোমার, আমাকে গ্রহণ কর। আমি জোর করব না, আমার সৈন্যসামন্ত আনিনি, আমি তোমার সমান হয়ে এসেচি। তাঁর এই কথাটি যদি মন দিয়ে শোনবার সময় করে নিতুম, তাহলে সব টানাটানি কাড়াকাড়ি শান্ত হয়ে যেত, আনন্দে সমস্ত চিত্ত গান গেয়ে উঠত, বলত, এস, এস, সবই তোমার।

মানুষের আমিত্ব আপনাকেই মেনে সার্থক হয় না, আপনার চেয়ে বড়কে মেনে সার্থক হয়। যতক্ষণ এইটে না মানে ততক্ষণ নিজের সব চেয়ে বড় অধিকার সে পায় না। তার সব চেয়ে বড় অধিকার হচ্চে আত্মদানের অধিকার। যতক্ষণ তার দেবার কৃপণতা, ততক্ষণ আপনার উপর তার পূর্ণ অধিকার নেই। তাঁকে যখন সত্য করে আপন অতিথি বলে মানি সেই অধিকার পাই। তখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে বলি, আমার ধনজন-মান সব তোমার হোক্। তখন আমার ইচ্ছার উপর আমার চরম কর্ত্তৃত্ব হয়, তখন আমি ইচ্ছা করেই বলতে পারি, "আমি সব দিলুম।"

এই যে আমার "আমি" বিশ্বের সকলের উপরে মাথা তোলবার জন্যে ব্যস্ত, চন্দ্র সূর্য্য তারা সকলেই এর স্পর্দ্ধা স্বীকার করচে, "হাঁ, তুমি খুব বড়।" এই যে খুব বড়, একে আনন্দে নত হয়ে বলতে হবে, "আমি কিছুই না।" সেই আতিথ্য-সৎকারের মহা দিনটির জন্যেই দুঃখ পেয়ে আঘাত পেয়েও সকলে এঁকে মেনে নিচ্চে। যদি সে দিন না আসে, যদি আপনাকে দেবার অধিকার না পাই, তবে সে বড় দুঃখ,—শুধু একা আমার নয়, সকলের।

নোটকে ভাঙাতে পারলে তবেই যেমন তার অর্থ, তেমনি আমার "আমি"কে ভাঙাতে পারলে তবেই তার অর্থ পাব। নোটটাকেই যদি শেষ বলে জানি, যদি সেটাকে নিয়ে কাগজের নৌকো বানিয়ে খেলা করি, তা হলে সেটা হল ফাঁকি। "আমি"কে নিয়ে তেমনি যদি খেলা করে যাই, তাহলে তার থেকে তার সত্যকে পাওয়া গেল না, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ফাঁকি রয়ে গেল। আমাদের জীবনের যিনি অতিথি তাঁর সেবার আয়োজনের জন্যে ঐ আমিটিকে ভাঙাতে হবে, ওকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে তবে ওকে সার্থক করতে হবে। এ হলেই যা দিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী পেলুম। সেই অনেক বেশী পাবার ব্যবস্থা আছে। বীজকে যদি সঞ্চয় না করে রোপন করতে পারি, তাহলে যেমন বীজের অহমিকা বীজের কৃপণতা বিদীর্ণ হয়ে তার চেয়ে যে অনেক বেশি সেই উদ্ঘাটিত হয়, তেমনি আমার সেই অতিথি ভূমার কাছে আপনাকে দিয়ে ফেল্‌লে তবেই এর পরিপূর্ণতা কঠিন আবরণকে ছিন্ন করে ফেলে অন্ধকার থেকে আলোকে প্রকাশিত হয়।

সেই প্রকাশের জন্যেই আমাদের প্রার্থনা, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও, আমার আপন হতে তোমাতে নিয়ে যাও। সেই জন্যেই আমাদের প্রার্থনা, হে আবি আমার কাছে আবির্ভূত হও—অর্থাৎ আমার মধ্যে তোমার যে প্রকাশ সেইটে যেন অপ্রকাশিত না থাকে, অতিথিকে যেন না দেখে ফিরিয়ে না দিই। যদি সেই প্রকাশ আমার কাছে মোহের আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহলে, রুদ্র, শোকদুঃখ অভিঘাতে তা ভেদ করে তোমার দক্ষিণ মুখ আমার জীবনে অবারিত কর, এবং তেন মাং পাহি নিত্যম্; তাহার দ্বা আমাকে নিত্য রক্ষা কর। দুঃখ হতে রক্ষা করা ন তোমার প্রকাশের বাধা হতে রক্ষা কর, হে রুদ্র দুঃখের দ্বারাই রক্ষা কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন। চৈত্র ১৩২৬।

শিল্পী

শিল্পী ছবি আঁকত।

রাজার সেগুলো পছন্দ হ'ত না; সভাসদগণের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠত; নাগরিকেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

শিল্পীর তবুও ছবি আঁকার বিরাম ছিল না।

কিন্তু এমন একদিন এল যখন শিল্পীর অনশন-ক্লিষ্ট হাত হ'তে তুলিকা আপনিই খ'সে পড়ল।

গৃহলক্ষ্মী বল্‌লেন—রাজার কাছে যাও; তাঁর কৃপা-কটাক্ষে তোমার সকল অভাব দূর হ'য়ে যাবে।

মানস-প্রিয়ার আধ-আঁকা ছবিখানি তুলে রেখে শিল্পী রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বল্‌লেন—উদ্যানবাটিকার ভিত্তিগাত্রে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী তোমার তুলির মুখে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে।

সভাসদেরা আশ্বাস দিলে—আশাতীত পুরস্কার পাবে।

নাগরিকদের আশা হ'ল—দেয়ালজোড়া ছবি দেখে চক্ষু সার্থক করবে।

রাজপ্রসাদতুষ্ট হাতে শিল্পী আবার তুলিকা তুলে নিলে।

শতেক রাজার মুখচ্ছবি ভিত্তিগাত্রে ফুটে উঠল; অমাত্যদের ভাবহীন মুখের ছায়া অলিন্দের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল, নাগরিকদের প্রাণহীন মুখের রেখা শোভাযাত্রার মধ্যে ছড়িয়ে রইল।

শিল্পীর কাজ সাঙ্গ হবার পর—

রাজা তাকে শিরোপা দিলেন; সভাসদেরা দিলে—বাহবা; নাগরিকেরা দিলে—অভিনন্দন।

শিল্পীর মুখ গর্ব্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল।

শিল্পীর বাড়ীর ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তার মান প্রিয়ার অর্দ্ধসমাপ্ত মুখখানি রেখায় সমাপ্ত হ উঠল।

কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল না—শিল্পীর শত চে সত্ত্বেও।

রংএর সঙ্গে রং মিশল, রংএর 'পরে রং পড় কিন্তু মুখের সে মৃত্যু-বিবর্ণ ভাব কিছুতেই ঘুচল না।

শিল্পী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে, বিত্ত সম্পদ ফেল্‌লে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিলে; কিন্তু সে প্রাণের আভাস ফুটে উঠল না।

শিল্পী তখন কলাদেবীর দ্বারস্থ হ'ল।

দেবী বললেন—শিল্পীর বুকের রক্ত দিয়েই তার মানস-প্রিয়ার-মুখে জীবনের আভা ফুটিয়ে তু শিল্পীর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তার মানস-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করি।

শিল্পী বল্‌লে—আমার সেই শ্রেষ্ঠ বলি আজ করুন।

দেবী উত্তর করলেন—তা' তো পারি না। স্বর্ণমুদ্রার রঙে যে দিন তুলি রাঙিয়েছিলে, সে দি হ'তে তুমি মৃত। তোমার আত্মবলিদানে অধিকার নাই, ফলও নাই।

শিল্পীর সংজ্ঞাহত হাত থেকে তুলিকা খসে পড়ল আর মানসপ্রিয়ার প্রাণহীন মুখ শূন্যে চেয়ে রইল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

সবুজপত্র। পৌষ, মাঘ ১৩২৬।

শিল্পীর উপসংহার

শিল্পী আর তুলি ধরলে না। বিশ্বকর্ম্মার পূজোর র যে হাতুড়ি ছিল, তাই নিয়ে রাজার দেওয়া সোনা টে সোনার পাত গড়তে আরম্ভ করলে। দিনে জার কাজ কোরে যত সোনা পায়, রাতে এসে হাতুড়ি টে সেই সোনার তারে মানস-প্রতিমার নূতন র্ত্তি নূতন ছাঁচে গড়ে। কলাদেবী এসে-এসে খন আর বলেন—"কি করছ? কার মূর্ত্তি গড়ছ? টা নিয়ে করবেই বা কি?" শিল্পী কথাই কয় না। সোনার প্রতিমা গড়া হলো। তখন বাকি সোনা রইল, তাই নিয়ে শিল্পী একটা সোনার মন্দির ড়তে সুরু করলে। কলাদেবী এসে বল্লেন—মন্দির গড়ছ কার?" শিল্পী নিরুত্তর রইল। তারপর ন্দির উঠল। পাথরে-সোনায় চিত্র-বিচিত্র মন্দিরের সানার চূড়ো গিয়ে ঠেকল—রাজবাড়ির চূড়োর নেক উপরে মেঘে-মেঘে সোনালি আভা ধরিয়ে! জা মন্ত্রীকে শুধোলেন—"এটা কি, রাজবাড়ি ছাড়িয়ে ঠলো?" মন্ত্রী বল্‌লেন—"শিল্পীর আস্পর্দ্ধা আর স্বাধী তার ধ্বজা!" রাজা বল্লেন—"ওটা কাল সকালেই ামিয়ে দিও ধূলোতে!" এদিকে কলাদেবী বল্লেন—শিল্পী, মন্দির তো গড়লে, কিন্তু ওখানে প্রতিষ্ঠা করবে ক?" শিল্পী উত্তর দিলে—"দেবী যাকে বলবেন তারি প্রতিষ্ঠা হবে ওখানে।" দেবী বল্লেন—"রোসো, তুলি দিয়ে যে মানস-প্রতিমা লিখেছিলে তার তো ওখানে প্রতিষ্ঠা হতে পারে না—মন্দির গড়েছ কি এক-একখানি পাথর তোমার বুকের রক্ত দিয়ে জমিয়ে?" শিল্পী ঘাড়-নেড়ে বল্লে—"না, সোনা গলিয়ে পাথরে পাথর জুড়েচি—হাতুড়ি পিটিয়ে; রক্তের লেশ নেই, আগাগোড়া গলা-সোনা আর নিরেট-পাথর!" কলাদেবী বল্লেন—"তা হলে ঐ জায়গাটা আমার পক্ষে ঠিক হবে। আমার থাকবার ঘরখানা গেল-ঝড়ে উড়ে গেছে।" শিল্পী বল্লে—"তাই হোক্!" কলাদেবী রত্নবেদীতে উঠে বসলেন। শিল্পী তাঁকে নমস্কার করে ঘরে গেল!

এদিকে রাতারাতি রাজার সাবল সোনার কলাভবনে এসে অকস্মাৎ হানা দিলে! চুড়ো ভেঙে পড়লো রত্নবেদীর উপরে—কলাদেবী যেখানে শিল্পীর নৈবেদ্য সাম্‌নে রেখে বসেছিলেন। সকালে এসে শিল্পী দেখলে মন্দির নেই, কেবল পাথর আর সোনার স্তূপ! সে তারি উপরে আপনার তুলি আর হাতুড়ি নিয়ে কখনো ছবি লেখে, কখনো ভাঙা পাথর কেটে নূতন মূর্ত্তি গড়ে আর কখনো সোনা গালিয়ে সোনার প্রতিমা ঢেলে চলে। রাজা কিম্বা বেরসিক কেউ কিনতে এলে বলে—"এর দাম—এমনি আর একটা মন্দির!" রসিক এলে বলে—"দাম নেই, বখশীস্ নিয়ে যাও।"

জনৈক শিল্পীর ওয়েষ্ট-পেপার-বাস্কেট হইতে উদ্ধৃত।

ঘুমের ব্যাঘাত

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাড়ার মধ্যে ভক্তপ্রবর গঙ্গারাম হাতীর প্রবল হরি-সংকীর্ত্তন দিন-দিন এমন বিকট রূপ ধারণ করতে লাগল যে ভালোমানুষ ভামিনীভূষণও একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সে কী তাদের ভীষণ চীৎকার!—মৃদঙ্গের ঘচঘচ আর খঞ্জনীর খচমচ! কানে ত তালা লাগেই, প্রাণও পালা-পালা করতে থাকে! রাত্রির নিস্তব্ধতার বুকের উপরে মহাসুরের এই তাণ্ডব নৃত্য দেখে বল্‌তে

ইচ্ছে হয়, ওগো প্রলয়, আর কত দেরী? বাঙালী যে কি-রকম নিরীহ, সহিষ্ণু তার প্রমাণ যে-পাড়ায় হরি-সংকীর্ত্তনের দল আছে, সে-পাড়াটি একবার বেড়িয়ে না এলে বোঝা যায় না। জগাই-মাধাই যে কেন কলসীর কাণা ছুড়ে মেরেছিল, তার প্রকৃষ্ট টীকা, পাড়ায় একটা হরিসভা থাকলে বোধ হয় আর অন্যত্র খুঁজতে হয় না।

সমস্ত দিন আপিসে খেটে-খুটে এসে ভামিনীকে রোজ সন্ধ্যাবেলা বড়-ছেলেটিকে পড়াতে বস্‌তে হয়—মাষ্টার রাখবার সামর্থ্য ত নেই! তারপর সংসার-অভিনয়ে প্রেয়সীর সঙ্গে নানা-রকম সুরে অ্যাক্টিংএর রিহার্সাল না দিলে, দাম্পত্যজীবন নিতান্তই বেসুরো, নীরস হয়ে ওঠে। তারপর টুকিটাকি ফাইফরমাশ, নানা আদর-আব্দার-নালিশ খাটাও আছে। এতদিনে এ সমস্ত-রকম পরিশ্রমই ভামিনীভূষণের অনেকটা গা-সহা হয়ে এসেছিল; সারা দিনের ক্লান্তির পর রাত্রির বিরামের ক্রোড়ে শুয়ে সে যখন আরাম করত, তখন দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা যেত যে সমস্ত দিনের খিটিমিটি, দ্বন্দ্ব-ঝগড়ার গ্লানি নাসিকার গভীর ফুৎকারে সে বেপরোয়া ঝেঁটিয়ে দিচ্চে। এই ঘুমের সুখেই বেচারা বেঁচে ছিল! এখন তার উপরে মৃদঙ্গের ঘন-ঘন চাঁটি পড়াতে তার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হল! দিনে-রাতে নিদ্রা না থাকলে মানুষ বাঁচে কেমন কোরে?

হাতীর কীর্ত্তন চল্‌ত রাত বারোটা-একটা পর্য্যন্ত; কোনো-কোনো দিন উৎসাহের ঝোঁকে দুটো-তিনটেও বেজে যেত। প্রথম-প্রথম এই উৎপাত ভামিনীভূষণ বাঙালীর স্বভাব-জাত সহিষ্ণুতায় তেমন-কোরে মাথ্‌তনা;—কোনো-রকমে চোখ-কান থাকত; কিন্তু ক্রমেই বেগতিক হতে লাগল তবু তাকে সহ্য করতে হত। কারণ না করলে উপায় কি? একটা উপায় আছে বটে—বাড়ী-বদ্‌লে অন্যত্র উঠে যাওয়া; সে কি কম হাঙ্গাম? তার চেয়ে যমযন্ত্রণা সহ্য করা যে ঢের বেশী সহজ। আর কাঁহাতকই বা সে বাড়ি বদলায়! এই আট মাসের মধ্যে একটা-না-একটা উৎপাতে তাকে ছ'বার বাড়ি বদ্‌লাতে হয়েছে; এবং যেখানেই গেছে, সেইখানেই একটা-না-একটা আপদ শনির মতো তার পিছন-পিছন ফিরেছে। সে কী লাঞ্ছনা! বাড়ী বদ্‌লাতে গেলেই দেখা যায় যে, বিশ্বসুদ্ধ লোক হৈহৈ-কোরে তার বিরুদ্ধে লেগেছে; আপিসের সাহেব, বাড়ির গৃহিণী, রাস্তার পাহারা, বাজারের কুলি, পথের ভিখিরী, গেঁড়াতলার গাঁট-কাটা, চোর-ছ্যাঁচড়, এমন কি আকাশের কাক-চিল পর্য্যন্ত! এতগুলা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাড়ি-বদলানো মনকে রাজি করানো শক্ত! তারপর যে-পাড়ায় গিয়ে উঠবে, সেখানে যে কোন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরদের বাস, এমন ত বলা যায় না! হয় ত এর চেয়েও মাংঘাতিক উৎপাত সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে; ভামিনীভূষণের পায়ের সাড়া পেয়ে তারা গর্ত্তের ভিতর থেকে কেউটে-সাপের মতো গর্জ্জে উঠবে। তার চেয়ে এই বেশ!

কিন্তু এই বেশটা জোর-কোরে মনকে মানালেও, কান সেটা কিছুতেই মান্‌তে চায় না; সে কেবল ত্রাহি ত্রাহি করে; তাতে মন

পায় হয় না, তখন মাথার সঙ্গে পরামর্শ রে তাকে বিদ্রোহী কোরে তোলবার গাড় করে। পাপিষ্ঠ কর্ণকুহর হরিনাম- য় শীতল না হয়ে জগাই-মাধাইয়ের মতো ন যে দিনে-দিনে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে গল তা কে বল্‌বে? আর তার সঙ্গের খী প্রাণের ইয়ার পাষণ্ড চোখ-দুটোকে স্ক-উস্কে এমন ঘূর্ণিত রক্তবর্ণ করে তুল্লে যে -বেচারা ভয়ে পাখা-মেলে নীল-আকাশে াও হয়ে পালালো! সমস্ত দিন খাটুনি, তার পর এই নিদ্রার অভাব—বেচারা ভামিনী ন পাগলের মতো হয়ে উঠল। কি যে রবে, কিছুই ঠিক করতে পারলে না। র উপরে বিস্ফোটকের মতো আপিসেও ক নতুন লাঞ্ছনা আরম্ভ হল। দুপুরবেলা কটু ঝিমুনি এলেই বড়-বাবু ভীমগর্জ্জনে ালে উঠতেন—"বলি ভামিনী, ওকি হচ্ছে? ম কি আফিং ধরেছ? না গাঁজা খাও? ন-করে ঢুল্‌চ কেন-?" হায়, এও অদৃষ্টে ল? শেষে নেশাখোর অপবাদ! ছেলে- য়ায় যখন লেখাপড়া করত, তখন বেশী ক্লাস অবধি ভামিনী প্রমোশন্ পায়নি ট, কিম্বা প্রথম-দ্বিতীয় এই শ্রেণীর প্রাইজ ওয়াও তার অদৃষ্টে ঘটেনি; কিন্তু যে-কয়েক ন স্কুলে ছিল, তার প্রত্যেক বছরই সে চরিত্রতা এবং ভালোমানুষির জন্যে একখানা রে প্রাইজ্ পেয়েছে। সেই সব প্রাইজের বই প্রাচীন বটতলার পকেট গীতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ণ, এবং আধুনিক বাজারের 'নীতিশিক্ষা' ভৃতি বিবিধ সৎগ্রন্থ এখনো সে যত্ন-কোরে ল রেখেছে। গৃহিণী মধ্যে-মধ্যে সেগুলিকে াল বোলে উল্লেখ করলে, তার বুকের পাঁজর যেন খসে পড়ে! ভামিনীভূষণ চরিত্রটাকে সঠিক রাখবার জন্যে এখনো সেই নীতিশিক্ষা মাঝে-মাঝে খুলে পড়ে;—পাছে কোথাও কিছু বেচাল হয়ে যায়! এই প্রাইজ নিয়ে তার মনে খুব-একটা অভিমানও আছে। কোথাও লেখাপড়ার কথা উঠলেই সে যে ছেলেবেলায় বিস্তর প্রাইজ পেয়েছিল, একথা বোলে গর্ব্বপ্রকাশ করতে ত্রুটি করেনা;—এবং এ-গর্ব্বটা লোকাভাবে যখন-তখন বিশেষ কোরে প্রকাশ পায় গৃহিণী এবং ছেলেদেরই কাছে। সদৃষ্টান্তে ছেলেদের মনকে প্রাইজের দিকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে এই বইগুলি সে তাদের খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখায়; কিন্তু ছেলেরা যে তার মলাট দেখে প্রলুব্ধ হচ্ছে তা মোটেই বোধ হয় না। বেচারাদের ভবিষ্যৎ ভেবে ভামিনী ভারি মুস্‌ড়ে পড়ে; আর মনে-মনে বলে, আজকালকার ছেলেরাই এম্‌নি! এ হেন সচ্চরিত্র ভামিনীভূষণের নেশাখোর-অপবাদ যে কতদূর মর্ম্মান্তিক, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বেচারা কি কর্‌বে? সকলরকম দুঃখের সঙ্গে এ দুঃখও তাকে সইতে হল! নইলে যে চাকরি যাবে।

মনের দুঃখ সহা যায়, কিন্তু রাত্রে ঘুম না হওয়া, সে যে অসহ্য! বিশেষত ভামিনীভূষণের মতো লোকের পক্ষে। সংসারে তার ঐ একটিমাত্র সুখ ছিল, সেটিও যদি যায়, তবে আর বাঁচা কেন? মানুষের জীবনে অনেকরকম সখ থাকে, ভামিনীর সখ ছিল এই ঘুমের। এই ঘুমের চারদিকটি কেমন কোরে মনোরম কোরে তোলা যায়, কি কোরে সেটিকে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়া যায়, মনে-

মনে দিনরাত সে তারই আলোচনা করত এবং যেটুকু অতিরিক্ত ব্যয় মাঝে-মাঝে করত, সে তার এই ঘুমেরই আস্‌বাবের জন্যে; অন্য কোনোদিকে তার বাজে-খরচ ছিলনা। যদি কখনো তার বড়মানুষ হবার স্বপ্ন মনে আসত, সে তার সমস্ত-বড়মানুষীটাকে এই ঘুমের বিছানায় ঢেলে দিত;—বড়মানুষীর সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য্য এই ঘুম দিয়েই সে সম্ভোগ করতে চাইত। যে যাই বলুক, সে বল্‌ত এই ঘুমের সখ সে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না! সকালে, বিকেলে, দুপুরে যখনই ফুরসৎ মেলে একটু গড়িয়ে নিতে পারলে, সে ছাড়ত না। পাছে ঘুম নষ্ট হয় এই ভয়ে রাত্রির নিমন্ত্রণে কালিয়া-পোলাও সে জীবনে অনেকবার অনায়াসে ত্যাগ করেছে; থিয়েটারের দিক ত সে মাড়াতই না; গৃহিণী আব্দার ধরলে, হয় পাড়ার লোক, নয় কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে সে-রাত্রে বেশ-একটু আরাম করে ঘুমিয়ে নেবার আয়োজন করে নিত। যখন দেখত সকাল ছটার আগে থিয়েটার থেকে গৃহিণীর ফেরবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন বলত —আহা, শয্যাটি আজ কি নিষ্কণ্টক!—অবশ্য বল্‌ত মনে মনে; নইলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবার খুবই সম্ভাবনা ছিল।

সাধারণ-মানুষে যেমন ঘুমোয়, ভামিনীও তেমনিই ঘুমোত,—চাই কি, কিছু অতিরিক্ত ঘুমোত বল্লেও চলে; কিন্তু তবু তার খুঁৎ-খুঁতুনির অন্ত ছিল না। বেচারার জীবনে একটা মস্ত আপশোস্ এই ছিল যে সে ভালো-কোরে ঘুমতে পায় না! কচি ছেলে যেদিন রাত্রে কান্না জুড়ত, সেদিন বেচারা

মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"আপ্‌কা মন্‌মে বহুৎ দুখ্ হ্যায়!"

বেচারা ভামিনী খোট্টাই-মুখের এই কোমল সমবেদনায় একবারে গলে গেল। তার দুঃখের কি অন্ত আছে? রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, এতবড় দুঃখটা সে বোলেই এখনো বহে বেড়াচ্চে!—এ যে কী দুঃখ দুনিয়ার কেউ ত বোঝে না, বল্‌তে গেলে কেবল ঠাট্টাই করে; আর এই পথের লোকটা কিনা ডেকে তাকে সমবেদনা জানাচ্ছে!

হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"হিঁয়া বৈঠিয়ে।"

ভামিনী গদগদ হয়ে ফুটপাথের উপরে উবু হয়ে বসে পড়ল। হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"বাবুজি, কাহে এৎনা দুখ্ পাতা হ্যায়?"

কি আশ্চর্য্য! ভামিনী একেবারে অবাক! তার মনের মধ্যে দুঃখ যে লুকোনো আছে, এই বাইরের লোকটা কি করে তা জানলে? সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কি কোরে জান্‌লে আমার দুঃখের কথা?"

সে বল্লে—"হাম্ সব জান্‌তা হ্যায়—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান!"

"ওও তাই বটে!" মনে-মনে এই কথা বোলে ভামিনী যেন বিস্ময়ের একটা অন্ত খুঁজে পেলে।

হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"আপ্‌কা কাহে এৎনা দুখ্ উয়ো জান্‌তা হ্যায়?"

ভামিনী ঘাড়-নেড়ে বল্লে—"না!"

"তব্ শুনিয়ে!" বোলে ফুটপাথের উপরে খড়ির কতকগুলো দাগ কেটে এক-জোড়া পাশা ঝাঁ-কোরে তার উপর ফেলে দিয়ে বল্লে—"ইয়ে দেখিয়ে!"

ভামিনীভূষণ মাটির উপরে খড়ির সেই

হিজিবিজি দাগগুলো অবাক হয়ে দেখ্‌তে লাগল; কিন্তু তার মধ্যে কি যে দেখ্‌তে হবে, তা সে ঠিক বুঝতে পারলে না।

হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"দেখা?"

ভামিনী ঘাড়-নেড়ে বল্লে—"হ্যাঁ!"

হিন্দুস্থানী বল্লে—"অব্ তো বিশ্‌ওয়াস্ হুয়া!"

কি বল্লে ঠিক হবে ভামিনী স্থির করতে না পেরে বল্লে—"হুয়া!"

হিন্দুস্থানী বল্লে—"তব্ এক কাম্ কিযিয়ে! আঁখ মুদ্ কর্ আপ্‌কো ইষ্ট-দেবতাকো নাম্ লেকে উন্‌কা মূর্ত্তি ধ্যান কিযিয়ে!"

ভামিনী এইখানে একটু ফাঁপরে পড়ল। তার ইষ্টদেবতার নাম যা, তার স্ত্রীর নামও তাই;—দুজনেই কালী। ইষ্টদেবতার নাম কোরে তাঁর মূর্ত্তি ধ্যানে আনবার যতবার সে চেষ্টা করে, ততবারই তার স্ত্রীর চেহারা মনে এসে পড়ে। কি আপদ! এর জন্যে যতই সে হাঁকু-পাকু করতে লাগল; ততই তার মাথাও কেমন ঘুলিয়ে যেতে লাগল, শেষে কিছুতেই আর কালী-মায়ের চেহারা মনে আসে না! চোখ খুল্‌তে দেরী দেখে হিন্দুস্থানীটা তার গায়ে হাত বুলিয়ে বোলে উঠল—"আপ্ বড়া ভকত্ হ্যায়! দেবতাকো নাম্‌সে তন্ময় হো গিয়া। হুয়া, হুয়া, আব্ আঁখ্ খুলিয়ে, —দেবী প্রসন্ন হুয়া!"

কি করে? ভামিনী তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেল্লে। হিন্দুস্থানীটা বল্লে—"কুচ্ ডর্ নেই, আপ্‌কো ভালা হোগা। ইয়ে মাদুলি লেও, ধারণ করো, সব্ কুচ্ দুখ্‌কা শান্তি হো যায়ে গা!"

ভামিনী কৃতজ্ঞ-চিত্তে মাদুলিটা জোড়-হাতে গ্রহণ করলে। তারপর দাম কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা কোরে যেমন পকেটে হাত দিতে যাবে অম্‌নি হিন্দুস্থানীটা তার দুটো হাত সজোরে চেপে ধরে বল্লে—"নেই, নেই! হাম্ আপ্‌সে কুছ লেগা নেই!"

ভামিনী তার বদান্য দেখে একেবারে অবাক! সত্যিকার মহাপুরুষ বটে! সেই মাদুলি হাতে নিয়ে সে মহাফুর্ত্তির সঙ্গে বাড়ির দিকে ছুটল। এই ছোট্ট মাদুলিটির গুণ সে যেন সদ্য-সদ্য প্রত্যক্ষ করলে; এই তো এটা হাতে পাবা-মাত্রই তার মনের বিষণ্ণতা ক্রমে-ক্রমে দূর হয়ে যাচ্ছে!—নিদ্রাপুরীর নিঝুম অন্তপুরের পথ তার চোখের সামনে যেন ধীরে-ধীরে খুলে যাচ্ছে! এমন একটা দুর্লভ সামগ্রী বিনামূল্যে পাওয়াতে তার ফুর্ত্তি শতগুণ বেড়ে উঠছিল। গিন্নীকে এ-সব কথা এখন বল্‌বে, কি, পরে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেবে, এই ভাবতে-ভাবতে সে বাড়ী এসে পৌছল। বাড়ী পৌছতেই গিন্নী বল্লে—"ওগো, একটা পয়সা দাও তো, খোকার জন্যে বিস্কুট আন্‌তে দেব, সে বড় কাঁদচে।" ভামিনী পকেট থেকে ব্যাগ্ বার করতে গিয়ে একেবারে থ হয়ে গেল। এ-পকেট ও-পকেট বার-বার হাৎড়েও ব্যাগ্ পাওয়া গেল না। গিন্নী বল্লে—"কি গো, তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন?"

ভামিনী বল্লে—"সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার ব্যাগ্ চুরি গেছে!"

"সে কি গো! কি কোরে চুরি গেল?"

"তা ত জানি না।"

গিন্নী তখন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলে, আপিস থেকে বেরিয়ে ভামি কোথায়-কোথায় গিয়েছিল। মহাপুরুষে কথাটা ভামিনী লুকোবার অনেক চেষ্টা করলে কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত চাপ্‌তে পারলে না। গি আদ্যোপান্ত সব শুনে বল্লে—"হয়েছে!"

"হয়েছে কি?"

"তোমার ঐ মহাপুরুষটিই ব্যাগ্‌টি মহাপ্রস্থানে পাঠিয়েছেন।"

ভামিনী বল্লে—"সে কি রকম?"

"রকম এই যে, যখন তুমি চোখ-বু ইষ্ট-দেবতার নাম স্মরণ করছিলে, সে অবসরে—"

ভামিনী বাধা দিয়ে বোলে উঠল—"চু চুপ্! অমন কথা বল্‌তে নেই—পা হবে!"

গিন্নী ধমক দিয়ে বল্লে—"থামো তুমি!"

ধমক খেতেই ভামিনী ভারি মুস গেল। গিন্নী বল্লে—"তুমি যখন চোখ বু ছিলে, সে সময় তোমার গায়ে সে হা দিয়েছিল?"

ভামিনী আম্‌তা-আম্‌তা কোরে বল্লে "হ্যাঁ দিয়েছিল।"

গিন্নী বল্লে—"তুমি যখন মাদুলির দা দেবার জন্যে পকেটে হাত দিতে গিয়েছিলে তখন সে তোমার হাত চেপে ধরেছিল?"

"ধরেছিল!"

"ব্যস্, তবেই বোঝা গেছে!"

মনে-মনে ভামিনী মহাপুরুষকে বাঁচাবা অনেক চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু গিন্নীর কথাগুলো মনের মধ্যে এমন-একটা সন্দে ধুঁইয়ে তুল্‌তে লাগল যে মহাপুরুষকে কিছুতে রক্ষে করা গেল না। আর তার যুক্তি

ছল এই যে গৃহিণী যখন তাকে কোনো জিনিষ বোঝায়, তখন তা এমন-কোরে বুঝিয়ে য় যে না-বুঝে তার আর উপায় থাকে া।—মনে হয় সত্যিই ত! যাকে সে প্রথমে ঃখের অন্ধকারে ভাস্করের মতো দেখেছিল, গিন্নীর কথায় শেষে সে তস্করে পরিণত য়ে গেল। কি করবে বচারা?

ভামিনী স্ত্রীকে প্রবোধ দেবার আর-কিছু া পেয়ে বোলে উঠল—"যাক্, মাদুলিটা ত াওয়া গেছে—সেইটেই মস্ত লাভ। ওতে যদি ামার ভালো হয়, ব্যাগ্‌টা না হয় গেলই!"

গিন্নী ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে—"ঐ ভুয়ো াদুলিটায় তোমার ভালো হবে?"

ভামিনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"ভুয়ো কি রকম?"

"এই দেখনা!"—বোলে গিন্নী মাথার একটা কাঁটা দিয়ে মাদুলির ভিতর থেকে তকগুলো কাগজের কুঁচি বার করলে।

ভামিনী ব্যস্ত হয়ে বল্লে "কর কি?—কর কি? কোন্ দ্রব্যের কি গুণ, তা কি তুমি-আমি জানি!"

গিন্নী বল্লে—"ওর গুণ যা, তা অনেকক্ষণ টের পাওয়া গেছে। হাতে আস্‌তেই তোমার একটা লোক্‌সান্ হল।"

নাঃ, এমন অকাট্য প্রমাণের পর আর তর্ক করা চলে না। ভামিনী হেঁটমুখে আপিসের কাপড় ছাড়তে উঠে গেল। অন্যদিন ম ঘুমটুকু হয়, সে-রাত্রে ব্যাগের শোকে সটুকুও হলনা। মাদুলির ফল হাতে-হাতে াওয়া গেল!...

কীর্ত্তনের জ্বালায় কি করি, কি করি কোরে ভামিনী যতই অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগল, হাতীর কীর্ত্তন ততই সজোরে চলতে থাক্‌ল। ভামিনীর সমস্তদিন কাজে-কর্ম্মে কাটত; রাত্রি এলেই তার বুকটা ধড়াস্ কোরে উঠত—ঐ রে কীর্ত্তন এলো! বুড়ো-বয়সে কীর্ত্তনের ভয় তার যতটা হল, ছেলেবেলায় জুজুর ভয় ততটা ছিলনা। শেষে ঘুম-ঘুম-কোরে ব্যস্ত হয়ে ঘুম-হওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। অনেকে ঘুমের নানা টোট্‌কা-টুট্‌কি বল্লে; কিন্তু তাতে কি হবে? যম যাকে ভয় করে, সেই হরিনামের কাছে টোট্‌কা! ওদিকে যেমন খোলে চাঁটি পড়া, এদিকে ভামিনীর কাঁচা ঘুম চম্‌কে উঠে কোথায় যে পলায়ন করে, সারারাত আর দেখা দেয়না। বিছানায় পড়ে রাত-ভোর সে যে কী কষ্ট, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে? বিশেষ ভামিনীভূষণের—যার জীবনের সখই হচ্ছে ঘুম! অবশেষে একজন এক পাকা পরামর্শ দিলে; বল্লে—দেখো, শোবার আগে একটু-কোরে সিদ্ধি খেয়ে শুয়ো,—খুব ঘুম হবে। কথাটায় প্রথমে ভামিনী ভারি রুখে উঠল। কী, সে সিদ্ধি খাবে? নেশাখোর হবে? কখনোই না! তারপর সকলে যখন বুঝিয়ে বল্লে ঔষধার্থে সুরাপান নীতি-বিরুদ্ধ নয়, তখন সে ঠাণ্ডা হল।

কি করে? প্রাণের দায়ে শেষে তাকে সিদ্ধি সেবন করতে হল। প্রথম-প্রথম দু-চার দিন বেশ ঘুম হল—এক-ঘুমে রাত কাবার। ভামিনী মনে-মনে তারিফ কোরে বল্লে—"বাঃ, চমৎকার জিনিষ ত!" কিন্তু দুদিন না যেতেই নেটের পাৎলা পর্দ্দা ছিঁড়ে গেল। সে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ ঘুমপুরীর সিংহদ্বার ভেদ

কোরে বোল্-হরিবোলের সিংহনাদ তার কানে গিয়ে পৌঁছতে আরম্ভ করলে! প্রথমে মনে হত অনেক দূর থেকে যেন একদল খ্যাপা-হাতী ছুটে আসছে; তাদের বৃংহিতের রেশ কানে এসে লাগছে; তার পর ক্রমেই তারা কাছাকাছি এসে কানের কাছে কুলোর মতো কান দুলিয়ে, শুঁড় নেড়ে, দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌তে থাকে—"বোল্ হরিবোল! বোল্ হরিবোল্!" আর সঙ্গে-সঙ্গে গোদা-গোদা পা ফেলে নৃত্য!

মাঝ-রাত্রে খাম্‌কা খ্যাপা হাতীর মুখে এই হরিবোল-বলার অনুরোধ শুনে ভামিনীর প্রথমটা ভারি হাসি পেত, তার পর রাগ হত—তার পর ছম্‌ছমে রাতের অন্ধকারে বুকের ভিতরটা কেমন ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করতে থাকত! সে পাশ-ফিরে শুয়ে অন্যমনস্ক হবার যতই চেষ্টা করত, ততই মনে হত যেন আরো কানের কাছে আরো জোরে সেই নাছোড়বান্দা বোল্-হরিবোল স্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে একসঙ্গে হাজার দামামা পিট্‌তে আরম্ভ করেছে। তখন মাথার ভিতরকার রক্তধারা ঘূর্ণীর মতো কেবলই ঘুরপাক খেতে-খেতে টগ্‌বগ্ কোরে ফুটে উঠত। তখন তার যেন খুন চাপত;—ইচ্ছা হত এখনি ছুটে গিয়ে হাতীর কীর্ত্তনীয়া দলের পাষণ্ড ক'টার গলা এমন-জোরে টিপে ধরে, যাতে চিরদিনের মতো তাদের স্বর বন্ধ হয়ে যায়! তাতে গৃহিণীরও কোনো আপত্তি ছিল না; তার আপত্তি ঐ পাষণ্ড কথাটায়। সে জিভ-কেটে বল্‌ত—"ছি ছি, পাষণ্ড বোল না ওদের! অপরাধ হবে।" ভামিনী বল্‌ত—"খুব বলব! পাষণ্ড, ভণ্ড, ষণ্ড—সব বল্‌ব!"

কিন্তু এত বোলেও কোনো ফল হল না। ভামিনীভূষণের ভামিনী দেখ্‌লে এমন কোরে চল্‌তে থাকলে স্বামী উন্মাদ হতে আর বেশী দেরী লাগবে না; সে বল্লে—"ওগো, কাজ নেই এখানে থেকে, চল অন্য পাড়ায় যাই।"

ভামিনী এতদিন যা ভয় করছিল, শেষটা তাই ঘটল। হা অদৃষ্ট!

গৃহিণী আবার বল্লে—"বেশী দেরী কোরোনা, বুঝলে!—চট্‌পট্ একটা বাড়ী ঠিক কোরে ফেল।"

ভামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আচ্ছা!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাসা বদল কোরে ভামিনীভূষণ সপুত্র পরিবার নূতন পাড়ায় উঠে এসেছে। বাড়ীখানা ছোট, কিন্তু দোতলা। নীচে আর কারা ভাড়াটে আছে; উপরের মহল ভামিনীভূষণ অধিকার করলে। পাড়াটা দেখে মনে হয় বেশ ঠাণ্ডা—কোনো উপদ্রব নেই। সরু গলির ভিতরে এই বাড়ী;—বেশ অন্ধকার-অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে—গ্রীষ্মকালে দিবা-নিদ্রার ভারি উপযোগী। তাই দেখে ভামিনীর মন খুব খুসি হয়ে উঠল। তখন গ্রীষ্মকাল, রবিবারের দুপুরগুলো বেশ আরামে কাটবে মনে কোরে ভামিনীর আহ্লাদ আর ধরে না। অবশ্য, ভাড়া নেবার আগে এই বাড়ীর কাছে কোথাও হরিসংকীর্ত্তনের দল আছে কিনা, সেটা সে ভালো করে খোঁজ নিয়েছিল। খবর পাওয়া গেল প্লেগের বছর একটা কীর্ত্তনের দল তৈরি হয়েছিল বটে,

কিন্তু তার পর থেকে তার আর কোনো সাড়া-সুড়ি নেই। ব্যস্, তবে আর ভাবনা কিসের! ভামিনী একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে এক মাসের অগ্রিম ভাড়া বাড়িওয়ালাকে দিয়ে বাড়ীটা তখনই ঠিক কোরে ফেল্লে। এমন চট্‌জল্ হাত-ছাড়া করা কি উচিত? বাড়ীটা সকলদিক থেকেই সুবিধে মনে হল। ভাড়া কম, জায়গা বেশ নির্জ্জন, আর পাড়া-প্রতিবেশীরা নিরীহ লোক বোলে ত মনে হয়;—ভামিনী যেমনটি চায়! মালপত্র বহে আনার যে হেঙ্গাম, এই বাড়ীর গুণ দেখে ভামিনীর কাছে সেটা যেন অনেকটা হাল্‌কা হয়ে এল। মনে হল চোখকান বুজে কোনো-রকমে জিনিষগুলো একবার এনে ফেল্‌তে পার্‌লে, আর তাকে পায় কে! নাকে সর্ষের তেল দিবারও দরকার হবে না—দিব্যি ঘুমুতে পারবে! সে গৃহিণীকে বল্লে—"ওগো চল, আজই চল!"

গৃহিণী বল্লে—"সে কি, আজই?"

সে বল্লে—"আজই নয় ত কি!—সে বাড়ী দেখে অবধি এখানে একদণ্ড আর তিষ্ঠতে ইচ্ছে করছে না!"

গৃহিণী বল্লে—"তোমার তো দেখা? আমি একবার না দেখলে হবে না;—আমায় নিয়ে চল, আমি দেখে আসি, তারপর ঠিক কোরো।"

"তুমি আর দেখ্‌বে কি? সে ঠিক হয়ে গেছে।"

"তবেই আমার মাথা খেয়েছ! ঠিক হয়ে গেছে কি গো!"

"ভাড়া-পত্র আমি চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি কি তেম্‌নি বোকা?—আগে খোঁজ নিয়েছি সেখানে কীর্ত্তনের দল আছে কিনা, তবে ভাড়া করেছি।"

"শুধু কীর্ত্তনের দল দেখলে তো চল্‌বে না; বাড়ী কেমন, তা তো দেখতে হবে?"

"তা কি না দেখেছি? আহা, যেমন নিঝুম, তেমনি ঠাণ্ডা!"

"ঠাণ্ডা কি গো?"

"হ্যাঁ গো ঠাণ্ডা!—রোদ থেকে তেতে-পুড়ে গিয়ে সর্ব্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল—চোখে ঘুম আস্‌তে লাগল।"

"তবেই হয়েছে! অমন স্যাঁতা বাড়ীতে টিঁকব কেমন কোরে? ছাদে জল পড়ে না ত?"

জল পড়ার কথা শুনেই ভামিনীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ল আর-এক বাড়ীর কথা—বর্ষার জলে সারারাত সেই বাবুই-ভেজা! তার পর স্বহস্তে সেই ছাদ মেরামত করতে পরের মৈ-বেয়ে উঠে, নামবার সময় মৈ না পেয়ে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে অবস্থান! সে কী লাঞ্ছনা! আবার যদি সেই রকম হয়? ভাবতে-ভাবতে ভামিনীর চোখ কপালে উঠতে লাগল; মুখ দিয়ে আর কথা বার হল না। গৃহিণী তাকে চুপ থাকতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো, ছাদ-টাদগুলো ভালো করে দেখেছ ত?"

ভামিনী ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে চেয়ে বল্লে—"না, তাড়াতাড়িতে ঐটেই দেখা হয় নি।"

গৃহিণী রেগে উঠে বল্লে—"এত তাড়া-তাড়িটা কিসের হল শুনি?"

তাই ত, এত তাড়াতাড়িটা যে কিসের,

সে-কথা ভামিনী কিছুতেই মনে আন্‌তে পারলে না।"

গৃহিণী বল্লে—"দরজা-জান্‌লা সব দেখেছ ভালো কোরে? গরাদে, ছিট্‌কিনি, এ সব আছে ত?"

ভামিনী সে-সব দেখেনি নিশ্চয়! বাড়ীটি বেশ স্নিগ্ধ, ঘুমের একান্ত উপযোগী, এইতেই সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল; অন্য জিনিষের খবর করার কথা তার মনেই ওঠেনি; কিন্তু সে-কথা স্ত্রীর কাছে কবুল করতে সাহস হচ্ছিল না। একটা কবুল কোরে ইতিমধ্যে অপ্রভিত হওয়া গেছে, আবার কি অপ্রভিত হতে হবে? এই ভেবে সে একটা ফাঁকির পথ খুঁজতে লাগল।

তাকে চুপ থাকতে দেখে স্ত্রী বল্লে—"বুঝেছি! এ সব দেখবার বুদ্ধি তোমার ঘটে থাকলে ত?"

পুরুষের বুদ্ধির উপর মেয়েমানুষের টিট্‌কারি, যার দেহে এতটুকু পুরুষ-রক্ত আছে, তার পক্ষে সহ্য করা শক্ত। ভামিনী আর চুপ থাকতে পারলে না, সে বোলে উঠল—"ছিট্‌কিনি, গরাদে না থাকে, নাই আছে, তোমার তাতে কি?"

গৃহিণী বল্লে—"আমার কিছু নয়! চোরের সুবিধে হবে কতটা তাই ভাবছিলুম।"

ওরে বাপরে! সে যে বড় ভয়ানক কথা! চোর-জিনিষটার উপর পুরুষমানুষ হলেও ভামিনীর ভারি ভয় ছিল। তাই ত, কাজটা বড় বেফাঁশ হয়ে গেছে ত! এখন কি করা যায়? গৃহিণীকে না দেখিয়ে বাড়ী-ঠিক-করাটা যে ভালো হয়নি, ভামিনী এখন তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলে। কিন্তু আর ত উপায় নেই, ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে যে! তখন ভামিনী অভিমান হতে লাগল স্ত্রীর উপরে। সেই তাকে বাড়ী ভাড়া করতে পাঠালে, নইলে কি যেত? এখন তাকে দোষ দিলে চল্‌বে কেন? বাড়ী ভাড়া করতে যখন গেছে, তখন বাড়ীর ভাড়াটা দিয়ে ফেলা এমন কি অন্যায় হয়েছে? সে ত দিতেই হবে। নইলে ভাড়া পাওয়া যাবে কেন? হ্যাঁ, বটে, বাড়ীর ছাদ, দরজা, জান্‌লা, এসবগুলো তার দেখা উচিত ছিল। সে কি বলছে উচিত ছিল না? দেখা হয়নি, অদৃষ্ট! অদৃষ্টে থাকে ভাঙা জান্‌লা গলে চোর আসবে, ভাঙা ছাদ বয়ে জল পড়বে! সে তার কি করবে? সে-বাড়ীতে এখন যেতেই হবে—উপায় ত নেই। গৃহিণীও সেটা বেশ বুঝেছিলেন; তাই আর উচ্চবাচ্যে ফল নেই দেখে চুপ কোরে গেলেন। ভামিনী হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল!

সেদিন রবিবার সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে ভামিনী কতকগুলো মুটে ডেকে আনলে। তাদের মাথায় ঠুন্‌কো জিনিষগুলো দিয়ে, একটা গোরুর গাড়ীতে বাকি জিনিষ চাপিয়ে সে নতুন বাড়ীর দিকে রওনা হল। ফিরে এসে ছেলে এবং গৃহিণীকে নিয়ে যাবে। গৃহিণী বলে দিয়েছিল—দেখো, সাবধানে জিনিষগুলো নিয়ে যেও, যেন কোনো মুটে মোট নিয়ে না পালায়! ভামিনী মুটেদের দিকে তাই খুব খরদৃষ্টি রেখে রাস্তায় চলছিল। হঠাৎ একটা অন্যমনস্ক হয়েছে আর অম্‌নি একটা মুটে সোজা-পথে না গিয়ে সাঁ-কোরে ডাইনের গলিতে বেঁকে পড়েছে। বাস্‌রে! কলকাতার মুটেগুলো কি সয়তান! দিনে ডাকাতি করে! কিন্তু ভামিনীর চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ

নয়। সে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে বল্লে—"ব্যাটা, পাজি চোর। জানিস্ তোকে এখনি পুলিশে দেব।"

মুটে ফিরে-দাঁড়িয়ে বল্লে—"কেয়া, তোম্ মাতোয়ালা হ্যায়?" এত বড় স্পর্দ্ধা, নিজে চুরি কোরে ভামিনীকে মাতাল বলা! ভামিনীর সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠল;—বেশাখোর অপবাদও সে কিছুতেই সইতে পারে না। সে চেঁচিয়ে বল্লে—"রোস্ ব্যাটা, তোকে মজা দেখাচ্ছি।" বোলে, সে কি মজা দেখাবে, সেইটে মনে-মনে রাস্তার চারিদিকে খুঁজছে, এমন সময় পিছন থেকে এক ভদ্রলোক এসে বল্লে—"কি মশায়, এত গোল কিসের?"

ভামিনী বল্লে—"দেখুন ত মশায়, আমার মাল নিয়ে এই মুটে-ব্যাটা পালাচ্চে। বল্‌তে গেলুম, তা চোখরাঙানি কত!"

ভদ্রলোকটি বল্লে—"এ মাল আপনার কি! এ যে আমার জিনিষ!"

ভামিনীর ভারি ভয় হল। সে বেশ বুঝতে পারলে এইবার চোরের উপর জুয়াচোরের পাল্লায় সে পড়েছে। সর্ব্বনাশ! চোরের হাতে নিস্তার ছিল, এর হাতে আর নিস্তার নেই! এরা দিনকে রাত করতে পারে। সে কাতর কণ্ঠে বল্লে—"দোহাই আপনার, এই গরীব-ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করবেন না!"

ভদ্রলোকটি যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"কি বলছেন আপনি?"

ভামিনী হাত জোড় কোরে বল্লে—"এ গরীবকে রেহাই দিন—ধনেপ্রাণে মারবেন না কর্ত্তা!"

ভদ্রলোকটির বিস্ময় যেন উত্তরোত্তর বাড়তেই লাগল। তার এই জাঁকামির ভান দেখে ভামিনীর বোধ হল লোকটা পাকা জুয়াচোর বটে। ভদ্রলোকটি বল্লে—"ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি।" ইতিমধ্যে রাস্তায় বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে; ভামিনীর মুটেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। সবাই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে—"কি হয়েছে? কি হয়েছে?" কি যে হয়েছে, মাথামুণ্ড কেউই জানে না, তবু যার যা খুসি সে সেই-রকম একটা উত্তর দিচ্ছে। কেউ বল্‌ছে চুরি, কেউ বল্‌ছে খুন, কেউ বল্‌ছে মারপিট, কেউ বল্‌ছে বোম, কেউ বল্‌ছে গাড়ি-চাপা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম চারিদিকে একটা গোলমালে ভামিনী ক্রমেই ধাঁধা খেয়ে যেতে লাগল। ভয় হল, একটা মুটের মাল ত গেছে, এইবার বাকিগুলোও না যায়! কি করবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে সে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। বাবুটি বল্লে—"কি মশায়, চুপ করে রইলেন কেন? কি বল্‌বেন বলুন, নয় ত আমার মুটে ছেড়ে দিন।" ভামিনী তখনো মুটের হাত চেপে আছে; সে-হাত ছেড়ে দিতে তার বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল—হায়, এতগুলো মাল জুয়াচোরে ঠকিয়ে নিয়ে যাবে? কিন্তু উপায় কি? বেশী গোলমাল করলে হয়ত ছুরি মেরেই চলে যাবে। চুপ থাকাই ভালো। তবে একবার শেষ-আবেদনটা করে দেখা যাক্, এই ভেবে ভামিনী বল্লে—"তাহলে নিতান্তই আমার জিনিষগুলি আপনি নিলেন?"

ভদ্রলোকটি হেসে বল্লে—"আচ্ছা দেখুন দেখি ভালো কোরে, এ মাল আপনার কি

না?" বোলে তিনি মুটেকে মোট নামাতে হুকুম করলেন।

কি ভয়ানক! জুয়াচোরটা শুধু চুরি নয়, যাদুও জানে!—বেমালুম সমস্ত জিনিষের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে!

ভামিনী কি বল্‌বে থতমত খেয়ে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ একটা কথা মনে এল। তার মুটেরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাদের এক, দুই, তিন কোরে গুণে শেষে এক-গাল হেসে বল্লে—"না মশায়, ও জিনিষ আমার নয়—ভুল হয়েছে।"

ভদ্রলোকটি হাসতে-হাস্‌তে মুটে নিয়ে চলে গেলেন; ভামিনীও নিজের মুটেদের ও গোরুর গাড়ী নিয়ে নতুন বাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে রাস্তার লোকেরা এ-ওর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কেনই বা এই গোলমাল, আর কেনই বা ওরা দুজনে বকাবকি করতে-করতে হঠাৎ ফিক্-কোরে হেসে যে যার পথে চলে গেল, কেউ বুঝতেই পারলে না। অবাক কাণ্ড!

মুটের মাথা ও গোরুর গাড়ির বুক থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে রেখে ভামিনীর মনে পড়ল, এইবার স্ত্রী আর ছেলে-পুলেদের আন্‌তে হবে। পা বাড়াতে গিয়েই দেখে মহা মুস্কিল! এত জিনিষ এখন আগ্‌লায় কে? জিনিষ আগ্‌লাতে গেলে স্ত্রীকে আনা হয় না; স্ত্রীকে আন্‌তে গেলে জিনিষ আগ্‌লানো হয় না। তবে উপায়? ভামিনী একটা মোটের উপর বসে-পড়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল—কি করা যায়? যতই ভাবতে লাগল ততই মনে হতে লাগল—করবার কিছুই নেই! হয় স্ত্রীর মায়া ত্যা করতে হয়, নয় জিনিষের মায়া ত্যাগ করতে হয়;—দুটোকে রাখার উপায় কিছুতেই নেই ভাবতে-ভাবতে ভামিনীর চোখে কান্না এল। রাত জেগে-জেগে তার মাথা এমন গরম হয়ে উঠেছিল যে এখন একটুতেই তার কান্না পায়। তার কেবলই মনে হতে লাগল—হায়, হায়, তালা-চাবিগুলো কো আনলুম না? তাহলে তো এ-বিপদে পড়তে হত না! কিন্তু হায়, হায়, করলে তো তালা-চাবি ছুটে আসে না, তবে উপায় কি? ভামিনী নিরুপায় হয়ে একেবারে জো পড়ল। তার সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে এল;—সে সেই মোটটার গায়ে হেলে-পড়ে চুপটি-কোরে আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় পড়ে রইল। এম্‌নি কোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাট্‌তে লাগল। ইতিমধ্যে ঘুম একটু এসেছিল কি-না, সে খবর আমরা ঠিক জানিনা—অন্তত ভামিনী তা স্বীকার করে না।

হঠাৎ ছেলে-পুলেদের কলরব আর স্ত্রীর গলার আওয়াজ পেয়ে ভামিনী চম্‌কে উঠল। স্ত্রী এসে বল্লে—"আচ্ছা লোক তো তুমি! এই আস, এই-আস কোরে বসে-বসে বেলা শে হয়, তবু তোমার দেখা নেই! এখানে দিব্যি বসে আছ! ভাগ্যিস্ বাড়ির ঠিকানাটি জেনে নিয়েছিলুম, নইলে আসতুম কি কোরে বলো দেখি?"

স্ত্রীকে ফিরে-পেয়ে ভামিনীর যে আহ্লাদ হল তাতে এই তিরস্কার তার গায়েই লাগল না। সে সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে-ফেলে উঠে দাঁড়াল।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে—"বলি, আমাদে আন্‌তে গেলে না কেন?"

ভামিনীর মনে ভারি অভিমান হল। সে কেন যে কি করে, সে-দুঃখের কথা কেউ যদি বুঝত, তাহলে তার দুঃখ কিসের! সে কিছু না বোলে চুপ কোরে রইল। এই বাড়ী-বদ্‌লানোর হেঙ্গামে তাকে কত নির্য্যাতন সইতে হল, তার জন্যে আহা-উহু বল্‌বার কেউ নেই, আছে কেবল তার যেখানে ত্রুটি, সেইখানে খোঁচা দিয়ে তাকে জর্জ্জরিত কোরে তোল্‌বার লোক! হায় রে অদৃষ্ট!

ভামিনীর মুখ দেখে গৃহিণীর বড় মায়া করতে লাগল। সে বুঝলে রাত জেগে-জেগে বেচারার মাথার ঠিক নেই, তাই কি করতে কি করে ফেল্‌ছে! সেই জন্যে এই কথা নিয়ে সে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলে না।

বাড়ীর অনেক দোষ ছিল, বাড়িতে পা দিয়েই তা গৃহিণীর চোখে ঠেকেছে; কিন্তু সে সব কথা তুলে স্বামীকে এখন উৎপীড়িত করতে তার মায়া হল। আহা বেচারা! সচ্ছিভঙ্গ স্বামীকে প্রফুল্ল করবার জন্যে সে বরং উল্টো রকমের কথা বলতে সুরু করলে।

সে বল্লে—"বাঃ, বেশ বাড়ী হয়েছে ত!"

কথাটা যেন ভামিনীর বিশ্বাস হল না; সে বল্লে—"সত্যি তোমার বাড়ী পছন্দ হয়েছে?"

গিন্নী বল্লে—"কেন, বেশ বাড়ী ত! খারাপ ত কিছুই দেখ্‌ছি না! তোমার পছন্দ নাকি?"

ভামিনী হাঁফ্-ছেড়ে বাঁচল। মাঝে-মাঝে গৃহিণীর কাছ থেকে এম্‌নিতর প্রশংসা পায় বোলেই তার জীবনটা এখনো দুঃসহ হয়ে ওঠেনি। সে তখনি উৎসাহের সঙ্গে মোটপত্র সরিয়ে বাড়ী গুছোতে লেগে গেল।

স্ত্রী তার হাত ধরে বল্লে—"থাক, তুমি অনেক খেটেছ, একটু জিরোও।" বোলে সে স্বামীকে একখানা মাদুর পেতে দিলে। সেইখানে বসে জানলার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভামিনীর মনে হল যেন তার জীবনের কালো মেঘ কেটে গিয়ে শান্তির শুভ্রজ্যোৎস্না দেখা দিচ্ছে! সে সেই মাদুরে শুয়ে পড়ল। গৃহিণী সংসার গুছোতে লেগে গেল।

বাজার থেকে খাবার আনিয়ে খেয়ে সেদিন খুব সকাল-সকাল শোয়া হল। ভামিনী আজ অনেকদিন পরে সুনিদ্রায় মুখদর্শন করবার আশায় বালিসগুলি ভালো-কোরে গুছিয়ে নিয়ে, চাদরটি পরিস্কার-কোরে ঝেড়ে, হাতে একখানি ছোট্ট পাখা নিয়ে আরাম কোরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। তার মুখে-চোখে একটি অখণ্ড নিশ্চিন্ততার আবেশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। আজ সমস্ত দিন বেজায় পরিশ্রম গেছে, মানসিক উৎকণ্ঠাও ঢের কাটাতে হয়েছে—এইবার সে-সমস্তের অবসান হবে, এই আশা বুকে নিয়ে সে ধীরে-ধীরে চোখের পাতাটি বুজতে যাচ্ছে, এমন সময় একটা কথা মনে পড়ল। সে গৃহিণীকে ডেকে বল্লে—"দেখ, ভালো কথা মনে পড়েছে। কাল আটটার আগে আমায় যেন ঘুম থেকে ডেকে তুলোনা—বুঝলে?" গৃহিণী খোকার জামার বোতাম টাঁকতে-টাঁকতে ছুঁচের সুতোটা দাঁতে কেটে বল্লে—"আচ্ছা।"

ভামিনী অভিমানের সুরে বল্লে—"অমন কোরে দাঁতে-দাঁত দিয়ে বলছ কেন? ভালো-করে বল। অনেকদিন পরে ঘুমটা আসছে—"

গৃহিণী হেসে বল্লে—"আচ্ছা। কোনো ভয় নেই তোমার, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও।"

ভামিনী বল্লে—"আর দেখ, খোকা যদি কেঁদে ওঠে, তাকে তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে দিয়ো—বুঝলে?"

গৃহিণী বল্লে—"আচ্ছা!"

একটু চুপ কোরে থেকে ভামিনী আবার বল্লে—"দেখ, শুনচ? রাত্রে যদি বৃষ্টির ঝাট্ আসে, আস্তে-আস্তে উঠে জান্‌লাটা বন্ধ করে দিয়ো তাড়াতাড়ি।"

গৃহিণী বল্লে—"সে সব হবে এখন, তুমি ভেবো না।"

বৃষ্টির কথা তুল্‌তে গিয়ে ভামিনীর বুকটা আবার ছাঁৎ করে উঠল! ছাদ দিয়ে যদি সত্যিই জল পড়ে? তবেই ত সব মাটী! তার ঐ অত ফুর্ত্তি জলের এই একটু আমেজ পেয়েই মিইয়ে আস্‌তে লাগল। সে পাশ ফিরে শুয়ে মনের উপর একটা সজোরে ধমক-দিয়ে বল্লে—নাঃ! ছাদ দিয়ে জলটল্ পড়ে না।

সে যেমনটি মনে করছিল, তত শীঘ্র নিদ্রাদেবী তাকে দর্শন দিলেন না। একটার পর একটা ভাবনা এসে জাগরণের নানা আঁকা-বাঁকা পথে তাকে ঘোরাতে লাগল। যাকে বেশী আশা করা যায়, সেই দুনিয়ায় বেশী-কোরে ভোগায়! থেকে-থেকে ভামিনীর মনে একটা আপ্‌শোস্ আস্‌তে লাগল—এই এতখানি সময়টা বৃথা বহে যাচ্ছে। সে একবার চোখ খুলে সাম্‌নের কুলুঙ্গিতে টাইম্‌পিশ্‌টার দিকে চেয়ে মনে-মনে হিসেব করে নিলে, এখনো যদি ঘুম আসে, তাহলে পুরো বারো-ঘণ্টা আর মারে কে! এতক্ষণ ঘুড়ি নিয়ে কোনো আপদ ছিল না; একবার যেই তার দিকে চেয়ে দেখা কি অম্‌নি আস্কারা পেয়ে সেটা কানের কাছে এমন টিক্‌টিক্ আরম্ভ করলে যে ভামিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। সে আবার গৃহিণীকে ডেকে বল্লে—"ওগো, ঘড়িটা ওখান থেকে সরাও তো, বেজায় কানের কাছে টিক্‌টিক্ কর্‌ছে।" গৃহিণী ঘড়িটা দূরে সরিয়ে রাখতে ভামিনী আর একবার পাশ-ফিরে শুলো। তারপর এটা-ওটা ভাবতে-ভাবতে, অন্ধকারে এদিক-ওদিক্ চল্‌তে-চল্‌তে হঠাৎ হোঁচট-খেয়ে একেবারে নিদ্রাদেবীর কোলের উপরে গিয়ে পড়ল।...

ঘুমের ঘোরে ভামিনীর হঠাৎ মনে হল, একটা প্রবল ভূমিকম্পে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ভয়ঙ্কর টল্‌মল্ করছে। তারি ধাক্কায় ঘুম-ভেঙে সে দেখে গৃহিণী তার গা ধরে সজোরে নাড়া দিচ্ছে আর বলছে—"ওগো, শুন্‌ছ—শুন্‌ছ?"

ভামিনী ভয়ে-ভয়ে বল্লে—"কি?"

"ওগো ওঠো, শিগ্‌গির ওঠো!"

ভামিনী গলার স্বর আরো ছোট কোরে বল্লে—"কেন?"

"ঐ শুন্‌তে পাচ্চ?"

সেই অচেনা জায়গায় অন্ধকারে পাছে বিদ্‌ঘুটে কিছু শুনতে হয়, সেই ত্রাসে ভামিনী তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে কান চেপে ধরলে।

গৃহিণী চীৎকার কোরে বল্লে—"শুন্‌তে পাচ্ছ কি?"

ভামিনী কান চেপে ফিস্‌ফিস্-কোরে বল্লে—"না, পচ্ছিনা। তুমি কি শুন্‌চ, বলনা!"

গৃহিণী বল্লে—"ঐ যে থাম্‌লো, আর কোনো আওয়াজ নেই।"

ভামিনী বল্লে—"বাঁচা গেল! তুমি এখন শুয়ে পড়।"

খানিক সব চুপ্‌চাপ্। একটু বাদে গৃহিণী আবার ধড়্‌মড়্ করে উঠে বল্লে—"ঐ-ঐ-ঐ শোনো!"

ভামিনী আচম্‌কা এই নাড়া পেয়ে তড়াক্ কোরে বিছানায় উঠে বসল। এবারে আর কান চাপবার কথা তার মনেই ছিল না। সে খোলা-কানে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে, কোমল-কণ্ঠে করুণ-সুরে নীচের মহল থেকে কে চীৎকার করছে—"কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষে কর—রক্ষে কর!"

সর্ব্বনাশ! ভামিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে আসতে লাগল। সে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গৃহিণী বল্লে—"আহাহা, খুন করে ফেল্লে গো!"

খুন! ভামিনীর চোখের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একবার ঘুরে গেল! সে এক-লাফে বিছানা থেকে মাটিতে এসে দাঁড়াল। আবার করুণ-সুরে শব্দ উঠল—"ওগো রক্ষে কর—রক্ষে কর!" সেই সুর কাঁদতে-কাঁদতে দূর-আকাশে মিলিয়ে গেল। ভামিনীর মনে হল যেন এক অসহায় বিপন্ন নারী তার পায়ের উপরে আছড়ে পড়ে কেঁদে মৃত্যুর কবল থেকে আশ্রয় চাইছে! দারুণ মৃত্যুভয়-মাখা দুটি আঁখি তার মুখের দিকে তুলে বুক-ফাটা সুরে বল্‌ছে—"ওগো আমায় বাঁচাও, তুমি বাঁচাও!" ভামিনী আর স্থির থাকতে পারলে না; ঝড়ের মতো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি-বেয়ে নেমে গেল। পিছন থেকে স্ত্রী চীৎকার কোরে বল্‌তে লাগল—"ওগো, তোমার বুকে ছুরি মারবে, তুমি যেয়ো না—যেয়ো না!"

ভামিনী সেই আর্ত্তনাদ লক্ষ্য কোরে সদর-দরজার পাশে যে-ঘর, তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হল, অনেকগুলো লোক সেখানে জটলা করছে। বিঁড়ি-পোড়ার একটা তীব্র গন্ধে সেখানটা আচ্ছন্ন। ভামিনী অধীর-ভাবে দরজায় ধাক্কা মেরে বল্লে—"দরজা খোলো!"

ভিতর থেকে প্রশ্ন এল—"কেও?"

ভামিনী বল্লে—"দরজা খোলো বল্‌ছি। নইলে এখনি ভেঙে ফেলব।"

দরজা খুলে গেল। ভামিনী সজোরে ভিতরে প্রবেশ করলে। একটু পরেই একটা বিকট হাসির রোল শোনা গেল।.....

ভামিনীর স্ত্রী এদিকে চোখ-বুজে এক-মনে ভগবানকে ডাকছে—"হে হরি, আমার স্বামীকে বাঁচাও—তোমার পূজো দেব, ঠাকুর! তার কোনো অপরাধ তুমি নিয়ো না!" তার কেবলই এই ভয় হচ্ছিল যে স্বামীর হরিসংকীর্ত্তনে অশ্রদ্ধাতেই বুঝি এই বিপদ ঘটল! সে মনে-মনে কেবলই মানৎ করতে লাগল—"তুমি তাকে বাঁচাও ঠাকুর, আমি এইখানে তোমার সংকীর্ত্তন বসাবো!"

এমন সময় ভামিনীভূষণ ঘরে প্রবেশ কোরে বল্লে—"সর্ব্বনাশ!"

স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠে তার হাত ধরে বল্লে—"হোক্‌গে সর্ব্বনাশ! তুমি আমার ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসেছ—এই ঢের!"

ভামিনী বিছানার উপর হতাশ হয়ে বসে পড়ে বল্লে—"আমার প্রাণ এবার গেল!"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি দরজায় খিল্ লাগিয়ে

শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন গো, কি হয়েছে?"

ভামিনী বল্লে—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! এখন পালাই কোথায় ভাবছি!"

গৃহিণীর মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সে বল্লে—"অ্যাঁ, শেষে তুমি কি একটা খুন-জখম করলে না কি? পুলিশে তোমায় তাড়া কোরে আসছে না কি গো?"

"ওগো, না গো না!"

"তবে পালাতে চাচ্চ কেন?"

"পালাতে চাচ্চি কি সাধে? প্রাণের দায়ে!"

"প্রাণের দায় কি গো? বলনা সব খুলে,—আমি যে হাঁপিয়ে মলুম!"

"কি আর বলব? ব্যাটারা এইখানে এক থিয়েটারের আখ্‌ড়া গেড়ে বসে আছে, তা কি জানতুম?"

"তাহলে ঐ খুনটুন্?"

"সে সব কিছু নয়!—ও অ্যাক্টিং হচ্ছিল!"

গৃহিণী সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"বাঁচা গেল! প্রাণে কি ধুক্‌পুকুনিই হয়েছিল!"

ভামিনী বল্লে—"কিন্তু এ যে কীর্ত্তনের বাড়া!"

গৃহিণী আঁৎকে উঠে বল্লে—"না, না, আর কীর্ত্তনের নিন্দে করো না।" একদিন সে যে এখানে কীর্ত্তন দেবে বোলে ঠাকুরের পায়ে মানৎ করেছে, সে-কথাটা তখনকার মতো চেপে গেল, বল্লে—"নাও, এখন শোও। রাত এখনো ঢের আছে, এই সবে দশটা!"

ভামিনী আবার শুয়ে পড়ল। সে শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল এই যে নাগাড়ে তার ঘুমের ব্যাঘাত চলেছে, এর কি আর শেষ হবে না? মনের দুঃখে গৃহিণীকে করুণ সুরে সে বল্লে—"হ্যাঁগা, তোমার কথায় বাড়ি ত বদ্‌লালুম; কিন্তু এখানে আমার ঘুম কি হবে—ব্যাটাদের ঐ অ্যাক্‌টিঙের চীৎকারে?"

কথার সুরটা গৃহিণীর মনে কেমন বাজল। সে ভাবতে লাগল, তাই ত এর কি কোনোই উপায় নেই? ভাবতে-ভাবতে বেচারারও ঘুম চড়ে গেল। তারপর হঠাৎ একটা কথা তার মনে এসে লাগল। সে স্বামীকে ডেকে বল্লে—"ওগো, শুনছ?" ভামিনীর সেই সবে-মাত্র তন্দ্রাটি এসেছে, গৃহিণীর ডাকে সেটিও ভেঙে গেল। সে হতাশ হয়ে মনে-মনে বল্লে—"জীবনের মধ্যে স্ত্রী হচ্চে ঘুমের একটি জীবন্ত ব্যাঘাত!" তারপর মুখ-ফুটে বল্লে—"কি বলছ?"

গৃহিণী বল্লে—"এক কাজ করলে হয় না?"

ভামিনী কাতর স্বরে বল্লে—"কি?"

"হাসবে না বল?"

"না! পোড়া-মুখে হাসি কি আর আছে!"

"তোমার ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে কাদের তুলো গুঁজে গুলে হয় না?"

ভামিনী লাফিয়ে উঠে বল্লে—"ঠিক বলেছ!"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রাতের পাখা

পরিপাটি বেশে অভ্যাগতের দল সুড়সুড় করে' এসে এক-একখানি তুলো-ভরা আসনের উপর হাঁটু-গেড়ে বসলো—মৌনমুখে। মেঝের উপর পুরু কোমল মাদুরের আবরণ। তার উপর দিয়ে এল নগ্নপদ পরিচারিকার দল। তারা সকলের সম্মুখে সাজিয়ে রাখলে গালা-করা নানা ভোজন-পাত্র—নিঃশব্দে। ক্ষণকাল সব নিঝ্‌ঝুম। কেবল একটুখানি হাল্‌কা হাসি ভেসে বেড়াতে লাগলো সবাইয়ের ঠোঁটের উপর দিয়ে—যেন স্বপ্নের সুষমা। বাড়ীর চারিদিকে বিস্তীর্ণ উদ্যানের অবকাশ, তাই ভিতরে কর্ম্মময় বৃহৎ জগতের কোনো সাড়া পৌঁছায় না—সেখানে বিরাজ করে পরিপূর্ণ অখণ্ড স্তব্ধতা।

অবশেষে মানুষের একটু সাড়া পাওয়া গেল। কর্ম্মকর্ত্তা বল্লেন—যেমন সর্ব্বত্র সব কর্ম্মকর্ত্তাই বলে' থাকেন—ও-সোমাংসুদে গোজারিমাস গা! দোজো ও হাশি! অমনি সবাই মাথা নত করে' নমস্কার জানালেন। তারপর খাওয়া সুরু হল। বেশ নিঃশব্দেই সকলে আহার করছেন। কাঠি দিয়ে আহারে সবাই অভ্যস্ত। পরিচারিকার দল ক্ষিপ্র-চরণে সকলের পাত্রে তপ্ত সুরা পরিবেষণ করে ফিরছে। যতক্ষণ না অনেকটা খাদ্য ও সুরা উদরস্থ হয়, ততক্ষণ কারো মুখ খুলবে না।

সহসা স্ত্রীকণ্ঠের মিহি হাসির ধ্বনি সবাইকে সচকিত করে' তুল্লে। ঘরের মধ্যে সার-বেঁধে যেন ভেসে এল একদল তরুণী—স্রোতের জলে ফুলের মালার মত। তারা হাঁটু গেড়ে বসে' মরালগ্রীবা বাঁকিয়ে সমবেত ভদ্রগণকে অভিবাদন করলে; তারপর ভোজনরত নিমন্ত্রিত-শ্রেণীর মাঝে চপল-চরণে ঘুরে-ফিরে সলীল ভঙ্গীতে সুরা পরি-বেষণ সুরু করে' দিলে। এ কাজে তাদের দক্ষতা অসাধারণ। চমৎকার সুন্দরী এই সব তরুণী। অঙ্গে তাদের বহুমূল্য রেশমী পোশাক। নীবিবন্ধ যেন রাজরাণীর মত। মাথায় মনোহরণ খোঁপা। খোঁপায় ঝুটো ফুল, রংবেরঙের;—মনে হয় যেন টাট্‌কা-তোলা। কত বিচিত্র চিরুণী, কত অদ্ভুত কাঁটা, অপরূপ কত সোনার অলঙ্কার! অপরিচিতের সঙ্গে তারা কথা কইছে যেন কতদিনের চেনাশোনা, কতকালের আলাপ-পরিচয়। হাসি-ঠাট্টা চলছে আর মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ মিহিসুরের চীৎকার। এরাই হল 'গেইশা' —নর্ত্তকী; ভোজনের আসরে আনন্দ-বিতরণের জন্যে এদের আগমন।

সামিসেনের তারে ঘা পড়লো—কুড়িং কুড়িং। দালানের সুদূর প্রান্তে নর্ত্তকীর দল দাঁড়ালো—সার দিয়ে। কয়েকজন ঐক্যতান বাজাতে বসলো—কয়েকটি সামি-সেন ও একটি ডম্বরু—সেটি বাজায় একটি সুকুমার শিশু। একজন তাদের নেত্রী, বয়স তার অনুমান করা কঠিন।

নাচ আরম্ভ হল—একে-একে বা যুগলে-যুগলে। নমনীয় অঙ্গের সঞ্চালন-ভঙ্গিমা অপরূপ সুন্দর। পদক্ষেপ ও অঙ্গ-ভঙ্গীর

এমন আশ্চর্য্য সমতা সুদীর্ঘকালের একাগ্র সাধনা ভিন্ন অসম্ভব। নৃত্য বলতে সাধারণত যা বোঝায়, অধিকাংশ স্থলে এ নৃত্য সেরূপ নয়, বরং একে অভিনয় বলাই উচিত ;—পাখা ও আস্তীনের অসাধারণ সঞ্চালন, মুখচোখের কোমল মধুর সংযত খেলা একেবারে প্রাচ্য। দর্শকের কামনা উদ্দীপিত হয় এমন অনেক নৃত্যও তারা জানে। তবে সাধারণত, ভদ্র শিক্ষিত সভায় তারা প্রাচীন জাপানের পুরাণ-কাহিনীই নৃত্যে অভিনয় করে' থাকে,—যেমন 'সমুদ্র-দেবকন্যার দয়িত জেলে উরাশিমার কাহিনী' ইত্যাদি। মাঝে-মাঝে তারা গায় পুরানো চীনা কবিতা ;—কয়েকটি বাছা-বাছা চমৎকার কথায় সরল সহজ ভাবের আবেগ কত সরস ও সুস্পষ্ট !

এধারে সুরা পরিবেষণের বিরাম নেই ;—সেই কুসম-কুসম গরম ফিকে-হলদে তন্দ্রা-আনা সুরা আমাদের শিরা-উপশিরা স্নিগ্ধ সন্তোষে নিষিক্ত করে' মনটাকে যেন আনন্দ-সায়রে নিমজ্জিত করে। সেই সুরার নেশায়, আফিমের নেশার মত, অতি-সাধারণও অনির্ব্বচনীয় হয়ে ওঠে। গেইশারা রূপান্তরিত হয় উর্ব্বশী-মেনকায়, আর প্রতিদিনের তুচ্ছ জগৎ বড় মধুর, বড় রমণীয় হয়ে ওঠে।

যে-ভোজ এত চুপিচুপি নিঃশব্দে আরম্ভ হয়েছিল তা ধীরে-ধীরে আনন্দ-কলরবে মুখর হয়ে উঠল। তখন অভ্যাগতের সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মাঝে ভাঙন ধরে ; জনকয়েকে এক-সঙ্গে মিলে এক-একটা ছোট-ছোট দল রচনা করে। চারিদিকে তরুণীর দল সরস বচন আর মধুর হাসি বিলিয়ে বেড়ায় ;—সুরা-পরিবেষণ চলতেই থাকে, তার আর বিরাম নেই। পুরুষেরা পুরানো যুদ্ধের গান ধরে, কেউ বা চীনে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। আনন্দের আতিশয্যে, এমন কি দু-এক জন নাচতেও সুরু করে' দ্যায়। গেইশা তার ভুলুণ্ঠিত পোশাক জানু পর্য্যন্ত তুলে ফ্যানে সামিসেনে দ্রুততালে বেজে ওঠে—"কোশিয়া ফুনে ফুনে!" বাজনার তালে-তালে গেইশা হাল্‌কা-ঢঙে ত্বরিত-পায়ে বাংলা ৪ সংখ্যার বিসর্পিত গতি বর্ণনা করে, আর সুরা-পাত্র ও বোতল-হাতে এক যুবক তার পিছু-পিছু ধায়। যদি সমরেখায় দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে তো যার ভুলে এরূপ ঘটে তাকে একপাত্র সুরা পান করতে হয়। বাজনা ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে, যুবক ও যুবতীর চরণও ক্ষিপ্রতর হয়ে ওঠে—নইলে যে তাকে কাটে—অবশেষে···সুন্দরীরই জয় হয়।

আর-এক দিকে অভ্যাগত ও গেইশার আর-এক খেলা চলেছে। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে খেলতে-খেলতে তারা গান গাইছে, হাত-তালি দিচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে মিহি সুরে চেঁচিয়ে উঠে চাঁপার কুঁড়ির মত আঙুলগুলি ছুড়ে এগিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সুর রাখছে সামিসেন—

চোইতো,—দোন্-দোন্!
ওতাগাইদানে ;
চোইতো,—দোন্-দোন্!
ওইদেমাশিতানে ;
চোইতো,—দোন্-দোন্!
শিমাইমাশিতানে।

এই খেলার নাম 'কেন্'। এটি সংকেতের খেলা। নানাপ্রকার হয়। গেইশার সঙ্গে এ

খেলা খেলতে হলে মাথা রাখা চাই ঠাণ্ডা, দৃষ্টি হওয়া চাই তীক্ষ্ণ, আর অভ্যাস থাকা চাই রীতিমত। শিশুকাল থেকে গেইশা সবরকম 'কেন্'ই খেলতে শিখেছে ;—তারা যখন হারে তখন বিনয়ের খাতিরেই হারে, অন্যথা বড়-একটা নয়। খুব সাধারণ 'কেন্'-এর সংকেত তিনটি—মানুষ, শেয়াল ও বন্দুক। গেইশা যদি বন্দুকের সংকেত আঙুল দিয়ে নির্দ্দেশ করে তো তখুনি বাজনার তালে তোমাকে সেই শেয়ালের সংকেত জানাতে হবে —যে বন্দুক ব্যবহার করতে পারে না। তার পরিবর্ত্তে যদি তুমি তখন মানুষের সংকেত জানাও তাহলে গেইশা তখুনি উত্তর দেবে শেয়ালের সংকেত দিয়ে—মানুষকে যে ঠকাতে পারে। তাহলে তোমার হবে হার। যদি সে প্রথমে শেয়ালের সংকেত নির্দ্দেশ করে তবে তোমায় তার জবাব দিতে হবে বন্দুকের সংকেত দিয়ে—যা দিয়ে শেয়ালকে বধ করা যায়। কিন্তু নিয়তই তোমাকে তার চপল চোখ আর কোমল করপল্লবের পানে দৃষ্টি রাখতে হবে। দুই-ই বড় সুন্দর! তা দেখে নিমেষের জন্যেও যদি তোমার মনে মোহের সঞ্চার হয় তো ব্যস! তোমার মাথা যাবে ঘুরে আর তুমি খেলায় যাবে হেরে।

এত মেলামেশা সত্ত্বেও জাপানী ভোজে অভ্যাগত আর গেইশার ব্যবহারে একটি শোভন-সংযম সদাই রক্ষিত হয়। সে সংযমের সীমা কেহই লঙ্ঘন করেনা। সুরা-পানের মাত্রা লঙ্ঘন করেও কখনো কোনো অভ্যাগত গেইশাকে আলিঙ্গন বা চুম্বন করে বেয়াদবী করতে উদ্যত হয়েছে, দেখা যায় না। অভ্যাগত স্মরণ রাখে গেইশা সভায় এসেছে সভার শোভা বর্দ্ধনের জন্যে ;—সে একটি ফুলের মত—তাকে দেখেই পরিতৃপ্ত হওয়া চাই, স্পর্শ করে' নয়।

ক্রমে রাত বেড়ে যায়। রাত দুপুরের কাছাকাছি অভ্যাগতেরা একে-একে বিদায় হয়—নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে, যেমন করে' এসেছিল তেমনি করেই। কলরব ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসে, বাজনা নীরব হয়। অবশেষে শেষ-অভ্যাগতকে অলিন্দ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মধুরকণ্ঠে স্মিতহাস্যে তাকে বিদায়-নমস্কার 'সায়োনারা' জ্ঞাপন করে' গেইশা ফিরে আসে সেই পরিত্যক্ত জনশূন্য স্তব্ধ কক্ষে—তার সুদীর্ঘ উপবাসক্লান্তি অপনোদনের আশায়।

এই হল গেইশার জীবন-ধারা। রাতের পর রাত এমনিই চলে। কিন্তু তার রহস্য,—কে তা জানে? কি তার চিন্তা? তার অন্তরের রূপটি কেমনধারা? তার মনের গভীর গোপনে কোন্ ভাবের খেলা চলছে? আলোকে-উজ্জ্বল ভোজের আসরের বাইরে তার সত্যকার জীবন, সে কেমন? কেমন সে, সুরার অস্পষ্ট মোহ-বেষ্টনীর পরপারে? কণ্ঠে মধুর হাসির ফোয়ারা তুলে কতকালের পুরানো গান যখন সে গায়—

কিমিতো নেয়ারু কা, গোসেংগোকু তোরুকা?
নান্নো গোসেংগোকু? কিমি তো নেয়ো।

অর্থাৎ—

যারে ঘিরে ফেরে মন
তারে চাও অনুখণ?
কিবা ধন অগণন চাও হিয়া রে!
সারা প্রাণে যারে চিনি
তারে চাই নিশিদিনই
চাইনে হাজার গিনি, চাই প্রিয়ারে।

তখনকার সেই চটুলতা কি তার মজ্জাগত ? না সেটা কৃত্রিম—শুধু ক্ষণেকের ? আর যে অলৌকিক নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায় সে আমাদের চিত্ত স্নিগ্ধ করে' তোলে সে-প্রতিজ্ঞা কি সে পালন করতে সক্ষম ?

ওমায়ে শিন্দারা তেরা এওয়া য়্যারান্
য়্যায়েতে কোনিশিতে সাকে দে নোমু !

অর্থাৎ—

দারুময় গেহে রাখিবনা দেহ
তুমি হবে যবে অপ্রকাশ,
মদ্যে মিশায়ে শ্মশান-ভস্ম
পান করে' যাবো তব সকাশ !

গেইশার বাড়ীর কুলঙ্গিতে থাকে একটি অদ্ভুত মূর্ত্তি। সে-মূর্ত্তি কখনো মাটির, সাধারণত চীনামাটির, ক্বচিৎ সোনার হয়ে থাকে। মূর্ত্তিটির ভারি সম্মান—সম্মুখে পূজা-উপচার সাজানো। মিষ্টান্ন, চালের পিঠে ও সুরার ভোগ; প্রদীপের আলো ও ধূপের ধোঁয়া—সবই থাকে। মূর্ত্তিটি একটি বিড়াল-শাবকের; —পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে একটি থাবা প্রসারিত করে' রেখেছে, যেন আহ্বান করছে ! সে আনে সৌভাগ্য, ধনীর প্রসাদ, ভোজ-সভার আমন্ত্রণ ! গেইশার অন্তরের সংবাদ যারা রাখে, তারা বলে এ-মূর্ত্তি গেইশারই বিগ্রহ—symbol। চঞ্চল ও সুন্দর, নবীন ও সুকোমল, তন্বী ও সোহাগী; আর নিষ্ঠুর যেন আগুন !

এর চেয়েও কঠিন কথা তারা বলে :—দারিদ্র্যের কঙ্কাল তার ছায়া অনুসরণ করে; যুবাজনের মস্তক সে চর্ব্বন করে; সম্পত্তিতে আগুন ধরায়; পরিবার ছারখার করে ! তার সৌন্দর্য্যও যেমন অসাধারণ, তার মিথ্যাচারও তেমনি গভীর !

কিন্তু পুরুষের উদ্দাম কামনা এবং ভোগ-লালসার ফলে যার উদ্ভব সে আর কেমন হবে ? পুরুষ চেয়েছিল দায়িত্ব ও দুঃখের ভাগ এড়িয়ে কেবল রূপযৌবন ও প্রেমের মায়াজালে আপনাকে জড়াতে। তাইতো গেইশা শিখেছে হৃদয় নিয়ে খেলা করতে। আমাদের এই জগতে নির্ব্বিঘ্নে সব খেলাই খেলা যায়, যায় না কেবল তিনটি খেলা। তা হচ্ছে—জীবন, প্রেম ও মৃত্যু নিয়ে খেলা। ও-খেলা দেবতাদেরই সাজে, মানুষে পারবে কেন ?

জীবনের প্রত্যূষে গেইশা ক্রীতদাসী। অসহনীয় দারিদ্র্যের পীড়নে নিরুপায় পিতা-মাতার ফুটফুটে মেয়েটিকে যে কেনে সে এই সর্ত্তে—মেয়েটি আঠারো কুড়ি কখনো বা পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তার সম্পত্তি, তারই কথায় ওঠা-বসা করবে। মেয়েটির আহার-বিহার শিক্ষা-সহবত সমস্তই হয় গেইশার আস্তানায়। তার শৈশব কাটে কঠোর নিয়মের নাগপাশ-বন্ধনে। শোভন অঙ্গ বাক্য ও ব্যবহার তাকে শিখতে হয়। নৃত্যশিক্ষা প্রত্যহই চলে। উপরন্তু তাকে কণ্ঠস্থ করতে হয় ঝুড়ি-ঝুড়ি গানের কথা ও সুর। খেলা শিখতে হয় নানাপ্রকার; আর শিখতে হয় ধনীর ভোজে বা বিবাহ-সভায় সুরা ও খাদ্য পরিবেষণ। পরিপাটি সাজসজ্জা ও প্রসাধন সাহায্যে সুন্দর হবার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। শারীরিক সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় নিয়তই সে বিব্রত। পরে আসে বাজনা-শিক্ষা। প্রথমে শেখে ৎ-সুজুমি—ছোট তবলা; তারপর শেখে

সেন—তারের যন্ত্র; সেটি বাজাতে হয় কচ্ছপের খোলার মেজরাপ দাঁত বা কচ্ছপের খোলার মেজরাপ। আট-ন' বৎসর বয়সে সে ভোজ-সভায় গান আরম্ভ করে—তবলা বাদিকারূপে। নি সে তবলাটা একবার মাত্র হেলিয়েই পাত্র কানায়-কানায় পূর্ণ করতে শিখেছে এক বিন্দু সুরাও অপচয় না করে'।

ক্রমে তার শিক্ষাপ্রণালী আরো কঠোর ওঠে। তার গলা হয়তো খেলে ভালো, জোর কম, তাই নিশীথ রাতের নিদারুণ ত সারাদেশ যখন স্তম্ভিত মৃতপ্রায়, সে ন যন্ত্র নিয়ে মুক্ত ছাদের উপর গানবাজনা াস করে—যতক্ষণ না তার আঙুলের ভাগ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে আর কণ্ঠের কণ্ঠেই মিলিয়ে যায়। এর ফল হাতে-ত পাওয়া যায়—ভয়ানক সর্দ্দিকাশি। ভঙ্গ হয়ে কণ্ঠ দিয়ে অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ া বড়-কোটা-কিছু আর বার হয় না। কাল এই দুর্ভোগ চলে, তারপর কণ্ঠের ও শক্তি, উভয়েরই উন্নতি ঘটে। সে নাচ-সর আসরে অবতীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জ্জন । সাধারণত তখন তার বয়স বারো-তেরো র। রূপ ও বিদ্যা থাকলে কাজের অভাব না—ঘণ্টায় সে পাঁচ-ছয় আনা উপার্জ্জন । তার শিক্ষার জন্যে যে সময়, অর্থ ও ব্যয় হয়েছে তার ফল ফলতে যখন হয়, তখন তার মালিক তা সুদসুদ্ধ ায় করেন। বহুবৎসর পর্য্যন্ত গেইশার র্জ্জিত সমস্ত অর্থই তার মালিক কড়ায়-য় বুঝে নেন। গেইশার আপনার বলতে ই থাকে না, এমনকি যে পোশাকটি সে , সেটিও না।

বয়স যখন তার সতেরো-আঠারো বৎসর তখন তার খ্যাতি হয়েছে। এই কয় বৎসরে কত আসরে যে সে নেমেছে তার আর সংখ্যা নেই। যে-শহরে তার বাস, সেখানকার সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির আকার-প্রকার ও জীবন-ইতিহাস তার নখদর্পণে। তার জীবন, রাতেরই জীবন। যখন থেকে নর্ত্তকী হয়েছে, তখন থেকে পূর্ব্বগগনে সূর্য্যোদয় সে ছাখেনি। আজকাল প্রচুর সুরাপানেও তার মত্ততা আসে না; সাত-আট ঘণ্টার অনশনক্লেশ সে অকাতরে সহ্য করে। কত লোকই যে তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে তা আর বলবার নয়। যাকে ভালো লাগে তার প্রতি কতকটা মমতা প্রকাশ সে করতে পারে—তবে রূপের মোহজাল বিস্তার করে' স্বার্থসিদ্ধি করাই যে তার প্রধান কর্ত্তব্য সে-সম্বন্ধে তাকে সচেতন রাখবার চেষ্টার ত্রুটি হয় না।

এইখানে গেইশার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যাক। অল্পবয়সে যদি তার মৃত্যু হয় তবেই ভালো, নইলে...থাক সে দুঃখের কাহিনী শুনে কাজ নেই।

* * *

গভীর রাত। তথাগতের মন্দিরের সিংহ-দ্বার অতিক্রম করে' বাতাসে ভেসে আসছে সামিসেনের রিনিঠিনি আর স্ত্রীকণ্ঠে-গীত গানের ঈষৎ একটু আভাস। ভিতরে মন্দির-প্রাঙ্গণে জনতা—স্তব্ধ, উৎসুক। জনতার সম্মুখে মন্দিরের সোপানশ্রেণীর শীর্ষদেশে শুভ্র মাদুরের আস্তরণ। তার উপর দুজন গেইশা। একজন গাইছে, একজন বাজাচ্ছে। অদূরে একখানি নীচু ছোট টেবিল, তার উপর একখানি 'ইহাই'—লোকান্তরিতের স্মৃতি-

ফলক। ফলকের সম্মুখে প্রদীপের স্তিমিত আলো, কাংস্যপাত্রে ধূপের সুগন্ধি ধূম। ছোট্ট একখানি রেকাবীতে নৈবেদ্য—ফলমূল ও মিষ্টান্ন। টেবিলের পাশে একজন গেইশা —নৃত্যরতা।

স্মৃতি-ফলকটি একজন গেইশার—এ সখী ও সঙ্গিনী। তার স্মরণে এই নৃ গীতের আয়োজন—নিঝুম রাতে, দেবায়তন অবারিত যাঁর দ্বার এবং অসীম ও অব্যা যাঁর শান্তি।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা

চিরসঙ্গী

দিবসে যখন শত কাজে থাকি,
শত চিন্তায় ভোর,
সংসার এসে ছেয়ে ফেলে মনে
সব ঠাঁইটুকু তোর!
তখনো সকল কাজের মাঝারে
তোর পরিচয় পাই বারে-বারে,
না পারি ছাড়িতে, ঘুরিয়া বেড়াস্
আমার হৃদয় ঘিরে,
পক্ষিণী যথা নীড়খানি বেড়ি
উড়িয়া-উড়িয়া ফিরে।
তোমারি পক্ষ-ঝাপটে আকুল
মাঝে-মাঝে কাজে হয়ে যায় ভুল,
তোরি সে পাখার ছায়া এসে পড়ে
সব চিন্তায় কাজে!
রে মোর ব্যাকুল নীড়-হারা পাখী,
চকিতে চমকি শুনি থাকি-থাকি
বেদনা-বিভোর আহ্বান তোর
মধুর করুণ বাজে।

নিশীথে যখন রহি আমি একা
নাহি থাকে কাজ কিছু,
সংসার যবে সরি যায় দূরে
ভাবনা লইয়া পিছু;
তুই ছাড়া কিছু নাহি রহে আর,
তোরি সে পরশ লভি চারিধার,
তোরি সীমা-হারা শান্তির মাঝে
মগন হইয়া থাকি;—
পক্ষিণী যথা রাখে শাবকেরে
পক্ষের তলে ঢাকি।
তোমারি কোমল তপ্ত পরশে
মোহরস-ধারা সরসে বরষে,
সুধীর বক্ষ-স্পন্দন-তালে
ঘুম ঘনাইয়া আনে;
ঘুম সে তোমারি পক্ষের ছায়া,
তব স্নেহ রচে স্বপ্নের মায়া,
যেন নিজেরে বিছায়ে রেখেছ আমার
নিশীথের মাঝখানে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

* লাফকেডিয়ো হার্ণ হইতে।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রভাতের শিশির
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ [২য় সংখ্যা

এই হল জীবন সম্বল

এই হল জীবন সম্বল !
গুটিকত ছবি আর খান-কত চিঠি,
যে কথা ভুলিব বলে' মনে বাঁধি বন,
তুলির পরশে আঁকা প্রাণহীন দিঠি,
তাই মোরে ভুলায় কেবল !

ভাবিব না ভাবি যেই কথা,
এ কাজে, সে কাজে ফিরি, পড়ে শুধু চোখে,
অনিমেষ নয়নের বাঁধা আকুলতা,
যাহা নাই, তারি লাগি পলকে পলকে
একা আমি, চলে যাই কোথা !

চোখে মোর ভরে' আসে জল,
আলোক মিলায়ে যায় ছায়া আসে ঘিরে,
একেলা ঘরের কোণে বিছায়ে আঁচল
চিঠিগুলি কোলে তুলে, দেখি ফিরে ফিরে !
মূর্ত্তি ধরে অক্ষরের দল !

হেসে কেউ শুয়ে পড়ে কোলে,
কেউ আসে অভিমানে চক্ষু ছল-ছল,
কাঁপে ঠোঁট, চায় মুখে কথাটি না বলে'
ভুল করা, ভুল বোঝা, তারি প্রতিফল
দিয়ে যায় প্রতি পলে পলে !

কবে কার ভুলে-যাওয়া বাথা,
আবার নতুন হয়ে ভরে ওঠে বুকে,
কবেকার সোহাগের সুধার বারতা,
সহসা সম্বিৎ হারা করি দেয় সুখে !
ভুল হয় আজিকার কথা !

হায় ভুল, কি তার জীবন ?
চমক ভাঙ্গিয়া যেতে লাগেনাত দেরী,
দিনের আলোক-জ্বালা জাগ্রত ভুবন,
কে পারে স্বপন দিয়ে রাখিবারে ঘেরি ?
অতীত যে, আশাতীত ধন !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

অনন্ত বাসুদেব

আমরা ভুবনেশ্বরের মন্দির লিঙ্গরাজ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া বন্ধুবর র— জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরেও গিয়াছিলে ?" কেবল দেশ বেড়াইতে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু তীর্থ-কর্ত্তব্যাদি সম্পাদন করিতে হইলে পুরাণোক্ত নির্দ্দেশ-অনুসারে অগ্রেই এই বিষ্ণু-মন্দির দর্শন করা বিধেয়। (১) কপিল সংহিতার একাদশ অধ্যায়-পাঠে জানা যায় যে শিবের এই তীর্থে আগমনের পূর্ব্বে বাসুদেব ও অনন্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।(২) কিম্বদন্তী-মতে বিষ্ণুই মহাদেবকে এই স্থানে তাঁহার গুপ্ত আবাস সংস্থাপিত করিতে অনুমতি প্রদান করেন। (৩) সেইজন্য লিঙ্গরাজের পূজার পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরের এই একমাত্র বিষ্ণুমন্দিরে অনন্ত ও বাসুদেবের অনুমতি-গ্রহণ-উদ্দেশ্যে পূজার্চ্চনা করিতে হয়। বিন্দুসাগরে স্নান ও পিতৃতর্পণাদি না করিয়া এবং যথারীতি মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক অর্দ্ধ-পাপহরা দেবীর পূজা সমাপন না করিয়া কোনও পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীই লিঙ্গরাজ দেবকে দর্শন করার অধিকার লাভ করেন না। সম্ভবতঃ এই প্রচলিত বিধিও পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতি হইতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভট্ট ভবদেবের এই মন্দির লিঙ্গরাজ দেউল অপেক্ষাও প্রাচীন।

পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ব্রহ্মপুরাণে অনন্ত বাসুদেবের যে 'গুহ্য বৃত্তান্ত' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কলিযুগের কোনও মন্দির-নির্ম্মাতার উল্লেখ দেখা যায় না এবং উহা যে একাম্রক্ষেত্রে অবস্থিত এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও কোথাও নাই। (৪) ভৌগোলিক অবস্থান-প্রসঙ্গে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের (৫) উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটির বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরীতীর্থে জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্তর্গত অনন্ত বাসুদেবের ক্ষুদ্র মন্দিরটি সাধারণের নিকট সেরূপ পরিচিত নহে,পক্ষান্তরে কপিল সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে একাম্রক্ষেত্রের এই জনার্দ্দন মূর্ত্তির বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে, দেখিতে পাই।

(১) "তস্মাদ্বিন্দুহ্রদে স্নাত্বা দ্রষ্টব্য পুরুষোত্তমঃ। দেবী পাপহরা চৈব দ্রষ্টব্য সাবধানতঃ"॥ শিবপুরাণ ২য় অধ্যায় quoted in J. A. S. B. Vol. VIII. 1972. p. 343.

(২) ১১শ অধ্যায় ২২ পৃঃ কপিলসংহিতা, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি।

(৩) Ant. Orissa Vol. II. p. 62.

(৪) ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৬৭ অধ্যায় পৃঃ ৬৯০—৬৯৩।

(৫) ঐ পৃঃ ৬৯১।

একাম্রে পরমং ব্রহ্ম বাসুদেবেতি সংজ্ঞকঃ।
তি পাষাণ-বপুষা মুক্তি দোমুরনাশনঃ॥
ত্বা কার্য্যানকার্য্যং বাদৃষ্টৈ কাম্রে জনার্দ্দনং।
রো বৈকুণ্ঠমাপ্নোতি নান্যথামুনিসত্তমাঃ॥ (৬)

সুতরাং মনে হয়, যে এই অনন্তবাসুদেব ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব হওয়াই সম্ভব।

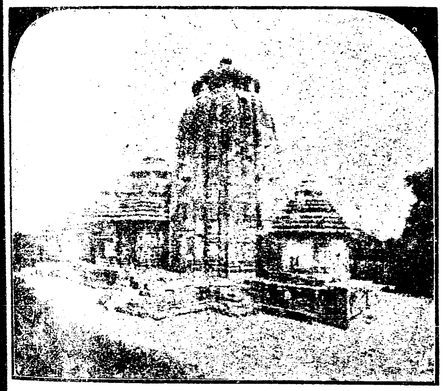

অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত বৃত্তান্তে বিশ্বকর্ম্মা বিগ্রহ মূর্ত্তির নির্ম্মাতা, এবং প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং দেবরাজ। দেবনাদ ইন্দ্রপুরী অধিকার করিলে পর অনন্ত-বাসুদেব মূর্ত্তি লঙ্কায় আনীত হয় এবং বিভীষণ উহা ভ্রাতার নিকট হইতে চাহিয়া লন। রামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয়ের পর অযোধ্যা-পুরীতে এই মূর্ত্তি আনয়ন করেন এবং 'দুর্লভ বৈষ্ণব পদে' প্রবেশ-কালে সমুদ্ররাজকে উহা প্রদান করেন। পরে কংশাদি দুষ্ট রাজগণকে বধার্থ সঙ্কর্ষণসহায় ভগবান কৃষ্ণ বসুদেবকুলে অবতীর্ণ হইলে সরিৎপতি সমুদ্র কোনও কারণান্তর জল হইতে এই প্রতিমা উদ্ধার করেন। দ্বাপরযুগের এই ঘটনার (৭) উল্লেখ করিয়াই পুরাণ-কার অনন্ত বাসুদেব-মাহাত্ম্য সমাপ্ত করিয়াছেন। মন্দিরটি লিঙ্গরাজ মন্দিরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই হয়তো কপিল-সংহিতা রচয়িতা পাছে উহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে লিখিয়াছেন যে যদি কেহ 'আমি একাম্রক্ষেত্রে গিয়া পুরুষোত্তম-দেবকে দর্শন করিব' এই কথাকয়টি মাত্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি বিষ্ণুপুর গমন করে। (৮)

র—বলিলেন, "তীর্থযাত্রী হিসাবে না হইলেও আর এক কারণে এই মন্দিরটী বাঙ্গালীর অবশ্য-দ্রষ্টব্য। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ভট্ট ভবদেব রাঢ়ীয় শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রীয়

(৬) কপিল সংহিতা, এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি, পৃঃ ৩০।

(৭) একাম্রকং গমিষ্যামি দ্রক্ষ্যামি পুরুষোত্তম[ং]। ইত্যুচ্চরতি যস্তাস্তে সোঽপি বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। কপিলসংহিতা (A. S. B. Ms.) পৃঃ ২৯।

(৮) J. A. S. B. Vol. VIII. 1612. p. 340.

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গদেশে সাবর্ণ চৌধুরীদিগের বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান।"(৯)

র—ভায়ার এ কথা শুনিয়া আমাদেরও বিশেষ আগ্রহ জন্মিল; বলিলাম, "আজ বৈকালেই তুমি আমাদিগকে সেখানে সঙ্গে লইয়া চল।"

মন্দিরে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মন্দির-দর্শনের জন্য জনৈক পাণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। সে ব্যক্তি একটি আলো লইয়া আমাদিগকে মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিল। প্রাঙ্গণটি আগাগোড়া বালিয়া ও মুগনি পাথরের টালি দিয়া বাঁধান। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে বহুসংখ্যক খণ্ডালাইট (Khondalite) জাতীয় প্রস্তরের খণ্ডও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের চারিদিকে ৯ ফিট্ উচ্চ ল্যাটেরাইট্ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর। এই চৌহদ্দিভুক্ত সমগ্র ভূ-খণ্ডের পরিমাণ ·৩০৩ একর্—সোজা হিসাবে প্রায় এক বিঘা আন্দাজ হইবে। আসল মন্দিরটি যে-জমির উপর অবস্থিত তাহার পরিমাপও ·০৮২ একরের কম নহে। এ মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালী ঠিক লিঙ্গরাজ মন্দিরেরই অনুরূপ। খোদাই কাজ ও নক্সা প্রভৃতিতে পদে পদে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, যেন বড় দেউলের ইহা একটী ছোট-খাট সংস্করণ মাত্র। তবে একটু তফাৎ এই যে অন্যান্য দেবমন্দিরগুলি পূর্ব্বদ্বারী; কেবল এই দেউলটীরই তোরণ পশ্চিম মুখে অবস্থিত। ভারতবর্ষে মন্দিরাদি হউক বা আবাস-গৃহই হউক বায়ু ও আলোকের অবাধ চলাচলের জন্য এবং সম্ভবতঃ স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-কল্পেও পূর্ব্বদ্বারী করিয়াই নির্ম্মিত হইত; শিল্পশাস্ত্র মতে নরসিংহ অবতার ব্যতীত বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার মন্দিরগুলি পূর্ব্বদ্বারী করিয়া নির্ম্মিত হইত। (১০) ডাক্তার লেবঁ (Le Bon) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মণিকোটায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ উদীয়মান সূর্য্যের সম্মুখীন থাকেন। এই উদ্দেশ্যেই প্রধান দ্বার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত হইত। সাধারণ রীতির এই ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে যে কি কারণে ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

দেখিলাম, প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে পশ্চিম প্রাচীরের ভিতরের দিকে দুইখানি শিলালিপি সংলগ্ন রহিয়াছে। একখানি ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি ও অপরখানি স্বপ্নেশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মেঘেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক অরপ লিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত বর্ণমালা, বিশেষজ্ঞের মতে বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর সমূহের সহিত সাদৃশ্য

(৯) 'মানসার' শিল্পশাস্ত্রে এইরূপই বর্ণিত আছে—"পূর্ব্বকে শ্রীকরং প্রোক্তং নারায়ণমথাপি বা। গ্রামস্যাভিমুখং বিষ্ণুং নারসিংহং পরাঙ্মুখম্॥" (M. A. Ananthalwars Indian Architecture. pp. 147.—148. Book I, Chap IX.) কিন্তু শিবালয়গুলি যে পশ্চিম দ্বারীও হইতে পারিত 'মানসার' গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

(১০) M. Ganguly's Orissa p. 370.

রূপ বলিয়া বিবেচিত। প্রধান মন্দিরের চারিটি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত; তাহার মধ্যে দুইটী ভগ্নদশাপন্ন। আমরা মন্দির দর্শন-কালে কোনও পাণ্ডাকে পশ্চিমদিকস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরটীতে পাক করিতে দেখিয়াছিলাম। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে স্বতন্ত্র পাকশালা নির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহা প্রাচীন মন্দিরের এরূপ অপব্যবহার অন্যায় বলিয়া বিশেষ অনুযোগ করিলেন পাণ্ডা মহাশয়ও লজ্জিতভাবে প্রতিশ্রুত হইলেন যে তিনি আর কখনও সে মন্দির এরূপভাবে ব্যবহৃত হইতে দিবেন না। বস্তুতঃ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে মধ্যযুগের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তিস্তম্ভগুলি এখনও অনেকাংশে অল্পায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে। মন্দিরের চারিটি অংশ ১—শিখর ২—জগমোহন ৩—নাটমন্দির ৪—ভোগ-মন্দির। জগমোহনের দ্বারদেশে নবগ্রহ প্রস্তর সংলগ্ন থাকায় অনুমান হয় যে মন্দিরটী পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল; যে হেতু মন্দিরের পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপাদির দ্বারদেশেই সাধারণতঃ এ প্রস্তর সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। নাটমন্দিরের অবস্থান হেতু মন্দিরের অভ্যন্তরদেশ বড়ই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার গঠনও নিতান্ত সাদা-সিধা ধরনের; সেজন্য উহা পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়াই ধারণা জন্মে। ভোগমণ্ডপে অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতির ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাই মহাপ্রসাদ বলিয়া পরিগণিত। জগন্নাথ ও লিঙ্গরাজের প্রসাদের ন্যায় অনন্ত বাসুদেবের প্রসাদও জাতিভেদজনিত স্পর্শদোষে কলুষিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য মন্দিরের প্রাচীনত্বের একটী সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন। রাজা-রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভোগমণ্ডপটীও পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন রূপ কারুকার্য্য নাই; কেবল দেওয়ালে পঙ্কের প্রলেপেই যাহা-কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। শিখর ও জগমোহনের গাত্রের খাঁজ ও কুলঙ্গিতে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আছে, কিন্তু নাটমণ্ডপে এরূপ একটীও মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। রাজা রাজেন্দ্রলাল কলস পর্য্যন্ত শিখরাংশের মাপ ৬০ ফুট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর মহাশয়ের মতে বিমানের উচ্চতা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হওয়াই সম্ভব। শিখরের সহিত সংলগ্ন ছোট ছোট তিনটী মন্দির আছে। এগুলি জগমোহনের ন্যায় প্রবেশ-প্রকোষ্ঠরূপেই (Vestibule) ব্যবহৃত হইত। শিখরের ও জগমোহনের চারি ধারে দুই সারি করিয়া কুলঙ্গী। শিখরদেশের ঊর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত মধ্য-ভাগের দুই পার্শ্বে পোস্তাবন্দী (buttress) সদৃশ তিনটী করিয়া উদ্গত অংশ রহিয়াছে। খাঁজগুলি আমলক হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তবে ঊর্দ্ধভাগে কুলঙ্গীর পরিবর্ত্তে উহাতে একসারি করিয়া বিমানের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিরূপ গঠিত হইয়াছে।

জগমোহন, নাটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ "পীড়" শ্রেণীর দেউল। সবগুলিরই ছাদ পিরামিডাকৃতি। এই ছাদগুলি অটুটভাবে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এক দেওয়াল হইতে অপর দেওয়াল পর্য্যন্ত লম্বমান লোহার স্থূল কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি

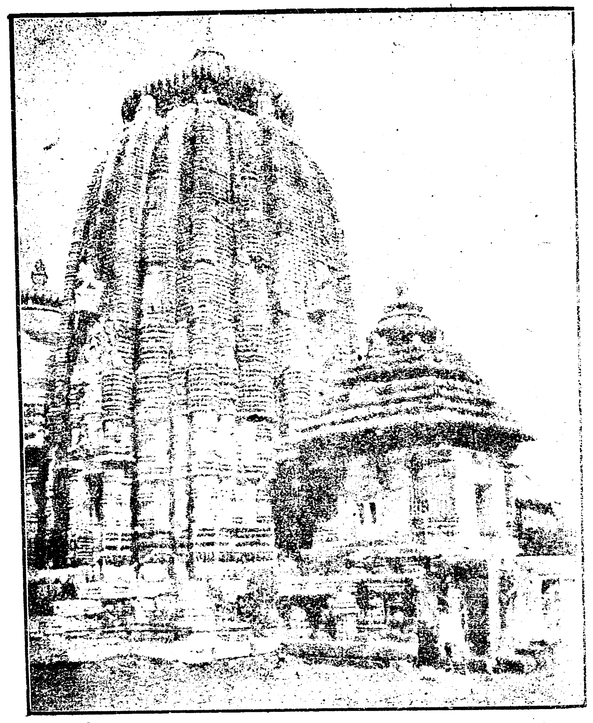

অনন্ত বাসুদেবের বিমান ও পার্শ্বস্থ মন্দির।

অনেক স্থলেই একবারে ভিত্তিভূমি হইতে উঠিয়াছে, দেখা যায়। বাহির হইতে মেজে থামাল করিয়া গাঁথিবার নিয়ম সকল ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে 'রেখা' (বিমান) ও জগমোহন অংশে পোতা পর্য্যন্ত গাঁথনির দুইটী বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। তাহার মধ্যে একটির বহিঃসীমা অপরটি হইতে প্রায় একফুট আন্দাজ ভিতরের দিকে সরিয়া গিয়াছে। এই দুইটী স্তর যথাক্রমে 'তলপৃষ্ঠ' ও 'খুর পৃষ্ঠ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (১১) বৈষ্ণব মন্দির বলিয়া ভূরপৃষ্ঠাংশে পদ্মদল খোদিত হইয়াছে। মন্দিরের জগমোহন সম-চতুষ্কোণ। বাহিরের ধারের মাপ ৩৩ ফিট ও ভিতর দিকের মাপ ১৯ ফিট করিয়া

(১১) M. Ganguly's Orissa p. 371.

মোহনের দুইপার্শ্বে দুইটী দুয়ার। তৃতীয় ারটী দিয়া নাটমণ্ডপে যাওয়া যায়। র্ভগৃহ ও জগমোহনের মধ্য-দেশে কিন্তু কাধিক দ্বার নাই। নাটমণ্ডপের দুইধারে নটী করিয়া দরওয়াজা আছে। সপ্তম ারটি দিয়া ভোগমণ্ডপে যাওয়া যায়। এই ার ব্যতীত ভোগমণ্ডপেরও উভয় পার্শ্বে নটী-তিনটী করিয়া ছয়টী দুয়ার আছে; তরাং বাহিরে না আসিয়া মন্দিরের একাংশ তে অন্যাংশে যাওয়ায় বিশেষ কোনই ুবিধা ঘটে না। নাটমণ্ডপের বাহিরের শের মাপ ২৯×২৪ ফিট্ এবং তরের মাপ দৈর্ঘ্যে ২৭ ফিট্ ৪ ইঞ্চি ও স্থে ১৬ ফিট্ ৯ ইঞ্চি। ভোগমণ্ডপের র্দ্ধেশ ও অন্তর্দ্দেশ যথাক্রমে ২২×১৯ ফিট ১৯×১২'-৬" ফিট। বিমানের উত্তরদিকের জে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি আছে, কিন্তু ক, পদদ্বয় ও চারিটী হস্তের দুইটী হস্ত য়া গিয়াছে। যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ য়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে টী পদ উপর দিকেই উত্তোলিত ছিল। (১২) ণ দিকের দুইটী হস্তের মধ্যে উপরটিতে ও নিম্নেরটিতে শঙ্খ এখনও অক্ষুণ্ণ স্থায় রহিয়াছে। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি চর,—একটীর হস্তে পদ্ম পুষ্প ও অপরটী যন্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ণ দিকের কুলঙ্গিতে বরাহ-মূর্ত্তি অনন্তের সমাসীন। বরাহদেবের মস্তকাবরণে টু বিশেষত্ব আছে। এ খাঁজটিতে উড়িষ্যার সুপরিচিত প্রথানুযায়ী ত্রিপত্র খিলান ও উপরে একটি কীর্ত্তিমুখ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে স্বাভাবিক ভাবে খোদিত দুইটী রাজহংসের চিত্রও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমানাংশে দিক্‌পতি বা দিক্‌পাল-দিগের মূর্ত্তিসমূহ যে সকল খাঁজে অবস্থিত, তাহার ঠিক উপরিভাগের কুলঙ্গীগুলিতে তাহাদিগের স্ব স্ব শক্তিগণের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; আকৃতিগত সাদৃশ্য ও বিশেষ বিশেষ বাহনাদি হইতে ইহাদিগকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। (১৩) জগমোহনের ছাদের সম্মুখ-ভাগে স্তম্ভোপরি সন্নিবিষ্ট ত্রিকোণাচার গাঁথুনি অংশ (pediment) বহু স্থাপত্য অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন। উহার উত্তরাংশে অবস্থিত খোদিত চিত্রসমূহের মধ্যে পঞ্চফণাযুক্ত নাগ ও নাগিনী মূর্ত্তি, স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তিসমূহ, হস্তীশ্রেণী, ঘোড়ার মিছিল, পাল্কী ও বেহারার চিত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভোগ-মণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারের দুই পার্শ্বের কুড্যস্তম্ভের (pilaster) গাত্রে উঁচু করিয়া খোদা দুইটী বিভিন্ন প্রকারের পদ্মাসনোপরি দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে। বামদিকের মূর্ত্তিটী গুম্ফযুক্ত; এ মূর্ত্তির শিরো-ভূষণে যথেষ্ট কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং দেহেও অলঙ্কারের অভাব নাই। গলদেশে মধ্যমণিযুক্ত হার এবং বাহু প্রকোষ্ঠ ও পদদ্বয়ে বিভিন্ন অলঙ্কার নৈপুণ্যের সহিত খোদিত। চারিহস্তের মধ্যে দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে চক্র ও মাল্য এবং বাম দিকের

(১২) Ibid p. 372.
(১৩) Ibid p. 377.

হস্তটাতে শঙ্খ ও গদা রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকের বিষ্ণুমূর্ত্তি শুম্ফযুক্ত নহে। ইহার ডাহিন্ পার্শ্বের নীচের হাতটি বামদিকের গদাধৃত হাতটীর উপর "আশীর্ব্বাদ মুদ্রায়" বিন্যস্ত। এই দুয়ারের ঠিক বাম পার্শ্বে সংলগ্ন একটী দণ্ডায়মান স্থূলোদর মূর্ত্তির শিরোদেশে কতকগুলি সর্পমুখ খোদিত দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তির অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নিম্নাবস্থিত দক্ষিণ হস্তটাতে পদ্মপুষ্প দেখিয়া ইহা শৈব মূর্ত্তি কি বিষ্ণুমূর্ত্তিরই প্রকার-ভেদ, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। ভোগমণ্ডপের উত্তরের দ্বারে কোনও রূপ খোদিত চিত্র দেখা যায় না।

এ মন্দিরে জান্তব মূর্ত্তির অভাব নাই। খোদিত চিত্রের হস্তীগুলি কোনার্ক মন্দিরের আলম্বনস্থ হস্তীসমূহেরই ন্যায় স্বাভাবিক-ভাবে সন্নিবিষ্ট। 'হনুমন্ত লতা' নামে অভিহিত স্থাপত্য অলঙ্কারের (১৪) লতামধ্যস্থ বানর-মূর্ত্তিগুলিও বড়ই সুন্দর। পার্শ্বদেবতার খোদিত মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে অবস্থিত রাজহংসের চিত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্য চিত্রের মধ্যে দক্ষিণদিকে জগমোহন-গাত্রস্থ মধ্যকার কুলঙ্গীর মৎস্য ও মকর অলঙ্কারগুলিতে (arabesques) যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ভাস্কর্য্য-বিষয়ক প্রসঙ্গে যে সকল লতামণ্ডনাদির চিত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই অন্তর্গত 'ফুললতা' নামক একপ্রকার নক্সার ব্যবহার এ মন্দিরের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এ নক্সায় লতার ফাঁকে বিভিন্ন জন্তুর চিত্র সুকৌশলে বসান রহিয়াছে। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরও জগমোহন-গাত্রস্থ লতাপাতা ও অন্যান্য কারুকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে চিত্র-ব্যতিরেকে শুধু ভাষার সাহায্যে এ মন্দিরের প্রকৃত বর্ণনা সম্ভব নহে। এসিয়াটীক সোসাইটির পত্রিকায় স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের প্রকাশিত ও ভবদেব প্রবন্ধে উহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

নাটমন্দিরের ভিতর স্তম্ভের উপর মৃগ পাথরের একটী গরুড় মূর্ত্তি আছে। মন্দি কোঠা গর্ভগৃহটী বড়ই অন্ধকার, ভিতরে দিবারাত্রি টিম্ টিম্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে ইহাতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরস্থ দেবতার মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল অনন্ত (বলরাম) এবং বাসুদেব (কৃষ্ণ) মাত্র এই দুইটী বিগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। (১৫) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তৃতীয় কোন মূর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই; (১৬) কিন্তু ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে অনন্ত বাসুদেব ও নৃসিংহ এই তিনটি মূর্ত্তি সংস্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই তিনটি মূর্ত্তিই লক্ষ্য করিয়া এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য দিয়া

(১৪) Ant. Orissa. Vol. II p. 62.

(১৫) Ganguly's Orissa p. 369.

(১৬) J. A. S. B. 1912 Vol VIII. p. 338

গিয়াছেন। (১৭) মূর্ত্তিগুলির গঠন সেরূপ সুন্দর নহে। উচ্চতায় পাঁচ ফিট পরিমাণ হইবে। অনন্ত নামধেয় বাসুদেবের শিরোপরি বহুসংখ্যক সর্পফণা চন্দ্রাতপের ন্যায় বিন্যস্ত। তিন দেবতার মন্দির হইলেও সাধারণতঃ ইহা বিষ্ণুমন্দির বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ উহা বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কথিত বূহবদ্ধ পূজা-প্রণালীর অন্যতম দৃষ্টান্ত (শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। (১৮) অনন্ত ও বাসুদেবের প্রতিষ্ঠাকালে সম্মুখে একটী বাপী (জলাশয়) খনিত হইয়াছিল এবং দেবত্রয়ের পরিচর্য্যার জন্য মন্দিরের সেবিকা স্বরূপ একশত অঙ্গনা নিয়োজিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে বিন্দুসরোবর ব্যতীত অপর কোনও জলাশয় নাই। তাই লিপি-বর্ণিত 'বাপী' বিন্দু-সরোবরেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান বিন্দুসাগর যে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পরে রচিত, এইরূপই অনুমিত হয়। জলাশয়টী এখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত; দেবদাসীরা আর নাই বটে—কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব-মন্দির এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুইজন বিখ্যাত বিদেশী লেখক উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যে অশ্লীলতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই এ দোষ বিশেষভাবে বিদ্যমান। (১৯) কঠোর শৈব আরাধনার প্রণালীতে বৈষ্ণব-দিগের মধুর রসের স্থান নাই। (২০) রাজা রাজেন্দ্রলাল ইহার প্রতিবাদ-কল্পে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই সুবৃহৎ ও বহু কারুকার্য্য-সমন্বিত মন্দিরে একটীও সেরূপ আপত্তিকর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। সুধী রাজেন্দ্রলাল যথার্থই বলিয়াছেন যে শিল্পীর আপনার রুচি এবং মন্দিরে অল্প বা অধিক পরিমাণ ভাস্কর্য্য অলঙ্কার ও চিত্রাদি ব্যবহারের আবশ্যকতা এই শ্রেণীর মিথুন মূর্ত্তি-সমূহের অল্প বা অধিক প্রাদুর্ভাবের নিয়ামক ছিল (২১)। বৈষ্ণব মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরে এবং কোন কোন বঙ্গদেশীয় প্রাচীন মন্দিরেও প্রণয়লীলা-জ্ঞাপক চিত্ররাজি দেখিতে পাওয়া যায় বটে (২২) কিন্তু এরূপ দুই-একটী উদাহরণে নির্ভর করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে।

(১৭) 'পাঞ্চরাত্র' মতানুবায়ী ব্যূহবদ্ধ উপাসনা প্রণালী ভারতের পূর্ব্বাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশেই অধিক পরিচিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ Dr. Otto F. Schrader প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। (Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhuya Samhita pp. 35-36, 144-145).

(১৮) Hunter's Orissa. Vol. I. p. 111—112.

(১৯) Fergusson's Tree and Serpent Worship p. 71

(২০) Ant. Orissa. Vol. II p. 12.

(২১) "Above them appears square or rectangular panels depicting in Vaisnava temples Radha-Krisna in various attitudes (often amtory) &c" J. A. S. B. 1909 Vol. I. p. 142.

(২২) J. A. S. B. Vol. VIII, 1912 p. 340.

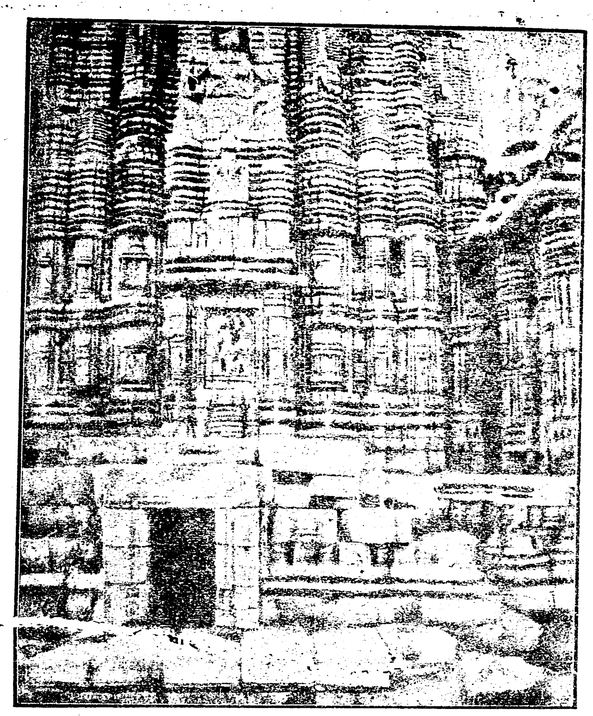

অনন্ত বাসুদেব মন্দির গাত্রস্থ ভাস্কর্য্যের চিত্র।

মন্দিরের বিবরণের পর মন্দির-নির্ম্মাতার কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে বিষয়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাচস্পতি মিশ্র রচিত প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় ভট্ট ভবদেব মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং এক নব 'হোরা' শাস্ত্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্বিতীয় বরাহরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কুম্ভসম্ভব অগস্ত্যমুনি যেরূপ সমগ্র সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ 'বৌদ্ধসাগর' উদরস্থ করিয়া ও ভ্রান্ত-মতবাদীদিগের কুতর্ক-নিরসনে কৃতিত্ব দেখাইয়া সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ভবদেব ভট্ট 'বাল বলভী ভুজঙ্গ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিবাস রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহের প্রপিতামহ ভবদেব হস্তিনীভিট্ট 'শাসন' নামক গ্রাম গৌড়রাজের নিকট দান-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন

চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রশস্তি-অবলম্বনে ভবদেব ভট্টের যে বংশ-লতা প্রস্তুত করিয়াছেন নিম্নে তাহা যথাযথ ভাবে প্রদত্ত হইল। (২৩)

রাঢ়দেশীয় সিদ্ধল গ্রামবাসী সাবর্ণ মুনির বংশ

মহাদেব ১। ভবদেব অট্টহাস

২। রঙ্গনাথ অপর সাতাটি পুত্র

৩। অতাক্ষ

৪। বুধ, 'স্ফুরিত' নামে পরিচিত)

৫। শ্রীহরিদেব-সরস্বতী (বঙ্গরাজের প্রধান মন্ত্রী)

৬। গোবর্দ্ধন-সাঙ্গোকা (বন্দ্যঘটী ব্রাহ্মণ-বংশের কন্যা)

৭। বালবলভী ভুজঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ভবদেব ভট্ট

ভবদেব, নৃপতি হরিবর্ম্মদেব ও তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে সান্ধি-বিগ্রহিক বা বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি "কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি" ও "প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্" নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকখানি পুঁথি সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালা, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত আছে। মীমাংসাসূত্র বিষয়ক "জৈতাতিত মততিলকম্" নামধেয় কুমারিল ভট্টের "তন্ত্রবার্ত্তিকের" টীকা-খণ্ডও ভবদেব ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া বিবেচিত। ইহা ব্যতীত "সম্বন্ধ বিবেক" নামক দ্বাদশপৃষ্ঠাব্যাপী এক ক্ষুদ্র পুঁথির পুষ্পিকায় 'ইতি ভবদেব ভট্ট কৃত সম্বন্ধ-বিবেক সমাপ্তঃ' এইরূপ লিখিত আছে; কিন্তু ইহাতে ভবদেবের 'বাল বলভী ভুজঙ্গ' এ পদবীটির উল্লেখ না থাকায় ইহা অপর কোনও ভবদেবের রচিত কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই পদবীটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইংরেজীতে ইহার অর্থ করিয়াছিলেন (young serpent of the turret) বলভী শব্দে বুরুজ বা বারান্দা ধরিয়া লইয়া বালশব্দ ভুজঙ্গের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিলে তবে এ অর্থ প্রতিপন্ন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বাল-বলভীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহা দেব-গ্রামের সন্নিকটস্থ স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বালবলভী—"বাগড়ী" অর্থদ্যোতক। কেহ কেহ ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই। (২৪) সে যাহা হউক বালবলভী যে কোনও স্থানের নাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিবর্ম্মদেব যে বঙ্গের রাজা ছিলেন, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালের তাম্রশাসন ও হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি তাঁহার অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণ-স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। (২৫) সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(২৩) বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬০।

(২৪) ঐ, পৃষ্ঠা ২৭৩;

(২৫) J. A, S. B. 1912 Vol, VIII. p. 341.

মহাশয় তাঁহার 'বেনের মেয়ে' নামক কথা-গ্রন্থে এ যুগের যে মনোমদ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে ভট্ট ভবদেব ও হরি-বর্ম্মদেব উভয়েই জীবন্তবৎ প্রতিভাত হইতেছেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলস্থ রাঢ়দেশে যে যথেষ্ট বিদ্যাচর্চ্চা হইত এবং তৎকালে দর্শন, জ্যোতিষ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিদ্যার্থীগণের পঠন-পাঠনের যে সুব্যবস্থা ছিল, তাহা ভবদেবের প্রশস্তি হইতেই অবগত হওয়া যায়। শ্রীধরাচার্য্য রচিত ন্যায়কন্দলী গ্রন্থও এ অনুমানের সমর্থন করিতেছে (২৬) ন্যায়কন্দলী বৈশেষিক দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা ৯১৩ শকাব্দে (খৃঃ ৯৯১—২) অব্দে রচিত হয়। গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীধরাচার্য্য আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ভূরিসৃষ্টি, বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর নদ তীরবর্ত্তী ভুরসুট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্ব হইতে সমগ্র রাঢ়ময় বিস্তৃত না থাকিলে ভবদেব ভট্ট বা শ্রীধরাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতর্কিত আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল না। ঘটকদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ-মতে ব্রাহ্মণগণ যে একাদশ শতাব্দীর ন্যায় পরবর্ত্তী যুগে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত হওয়া সম্ভব নহে, অনন্ত বাসুদেবের শিলালিপি আধুনিক ঐতিহাসিকদের এ ধারণাও বিশেষ-ভাবে সমর্থন করিতেছে।

উড়িষ্যার অনেক মন্দিরেই নির্ম্মাণকাল-জ্ঞাপক কোনও শিলালেখ পাওয়া যায় না। অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে শিলালিপি আছে বটে কিন্তু তাহার সাল ও তারিখের অংশ পাঠযোগ্য নহে। পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক কীলহর্ণ (২৭) হরপগুলির আকৃতি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া লিপিতত্ত্বের দিক হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই প্রশস্তিখানি খৃঃ ১২০০ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এ প্রশস্তি খৃঃ দশম শতাব্দীতে রচিত। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই লিপি হইতে তাৎকালিক বিদ্যালোচনা ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ অবগত হওয়া যায়। (২৮) প্রশস্তিলেখক বাচস্পতি মিশ্র তখন তরুণ বয়স্ক পণ্ডিত। পরবর্ত্তীকালে ইনি ষড়দর্শনের টীকাকাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলালও শিলালেখোক্ত বাচস্পতিকে প্রসিদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রবিৎ বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে লিপিখানি একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে বাচস্পতি দশম শতাব্দীর লোক। একাদশ শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমান থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁহার "ন্যায় সূচী নিবন্ধ" নামক মীমাংসা দর্শন বিষয়ক টীকাগ্রন্থ ৮৯৮ শকাব্দে (খৃঃ ৯৭৬ অব্দে) লিখিত

(২৬) Ep. Indic. Vol. VI. p. 205.

(২৭) J. B. O. R. S. Vol. V. pt. II, 1919 p. 176.

(২৮) Literary History of the Pala period, p. 175. J. B. O. R. S. Vol. V. 1919.

হইয়াছিল। (২৯) বঙ্গদেশে বাচস্পতি নাম বহুল প্রচলিত নহে, তাই তিনি এই প্রশস্তিকার বাচস্পতি ও দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র যে অভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও স্বর্গীয় রায় বাহাদুর চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্র লালের অনুমানই মোটের উপর বজায় রাখিয়া ভট্ট ভবদেব খৃঃ ১০২৫ হইতে খৃঃ ১১৫০ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন এইরূপই প্রমাণ করিয়াছেন। উপস্থিত এই মত গ্রহণ করাই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে শিলালিপি দুইখানি এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত পূর্ব্বে তথায় ছিল না। জেনারেল ষ্টুয়ার্ট ভবদেবের প্রশস্তি খানি মন্দির হইতে বিচ্যুত করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগ্রহ-শালায় আনিয়া রাখেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে মেজর কিটো (Kittoe) (ইনি তখন লেফ্‌টেনাণ্ট পদাভিষিক্ত ছিলেন) ভুবনেশ্বর ভ্রমণ করিলে স্থানীয় লোকেরা লিপিখানি কাড়িয়া লওয়ার জন্য মন্দিরের ধর্ম্মহানি ঘটিয়াছে ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন এবং লিপিখানি প্রত্যর্পণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা-মত কিটো মহোদয় ভট্ট ভবদেবের লিপি ও ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের লিপি এই উভয় লেখ আনয়ন করিয়া অনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে পশ্চিমদিকস্থ দেওয়ালের ভিতরকার দিকে লাগাইয়া দেন। এই উভয় লিপির পাঠই স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মেশ্বর মন্দির স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতেও কিটো সাহেব কি জন্য সেই মন্দিরের শিলালিপি এই স্থানে সংলগ্ন করাইয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্পূর্ণ অবিদিত। এখন ব্রহ্মেশ্বর লিপিটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহা যে কাল্পনিক নহে তাহা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অনুসন্ধান করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। মেঘেশ্বর মন্দিরের লিপি কে কবে উঠাইয়া আনিয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছে, তাহাও অদ্যাপি রহস্যে সমাচ্ছন্ন। রাজা রাজেন্দ্রলাল অনন্তবাসুদেব প্রসঙ্গে মেঘেশ্বর লিপির কোনই উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার ভুবনেশ্বর পরিদর্শন কালে উহা যে তথায় ছিল না, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। মেঘেশ্বর মন্দির ভাস্করেশ্বর মন্দিরের কয়েক শত ফিট্ দূরেই অবস্থিত। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মেঘেশ্বর মন্দিরের লিপিখানি এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যথাস্থানে সংলগ্ন করিলেই সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মন্দির দেখিতে আমাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গেল। 'র'—ভায়া প্রদীপ-সহযোগে শিলালিপিদ্বয়ের কিয়দংশ পাঠ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন।

(২৯) M. Ganguly's Orissa pp. 326—329.

খোলা গরুর গাড়ী করিয়া খণ্ডগিরিতে ফিরিয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল; কিন্তু এই স্থানের নূতন দৃশ্যসমূহের বর্ণনা ও জ্ঞানানুশীলনের এই সকল নূতন পন্থা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় আমরা পথের ক্লেশ মোটেই অনুভব করিতে পারি নাই।

র—এর ক্যাম্প—আমরা নাম দিয়াছিলাম "বিজয় স্কন্ধাবার"; দূর হইতে দেখিতেই এতটা পথ। এই পথ এত শীঘ্র যে কি করিয়া অতিক্রম করা গেল, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এ অঞ্চলে চিতাবাঘের ভয় আছে, তাই আর অধিক রাত্রি না করিয়া আহারাদি সমাধা করিয়া সেদিনকার মত স্ব স্ব তল্পে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। আমার ছুটীর আর একটী মাত্র দিন অবশিষ্ট ছিল; তাই আর ধৌলি বা ধবলগিরির অশোক লিপিদর্শন অদৃষ্টে ঘটিল না। পরদিন সন্ধ্যায় আহারাদি করিয়া কলিকাতা-অভিমুখে রওনা হইলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম, কাসাই নদীতে 'বান' ডাকিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রাম জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। নদীমাতৃক দেশের এ বিপদ চিরদিন। কলিকাতায় পঁহুছিতেই আলনস্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। কিন্তু কর্ম্মভূমির দৈনিক কর্ত্তব্যচিন্তা মন্দিরের কথার প্রাচীন কাহিনীকে এখনও বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে সরাইয়া দিতে সক্ষম হয় নাই।

ভট্ট ভবদেব প্রশস্তি

(মর্ম্মানুবাদ)

এই প্রশস্তিটি পঁচিশ লাইনে সমাপ্ত। ইহা "বালবলভীভুজঙ্গ" সুবিখ্যাত ভট্ট ভবদেবে প্রশংসা-বাদে পূর্ণ। ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইহার রচয়িতা। প্রশস্তির প্রারম্ভে—

ওঁ ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় এই স্বস্তি-বচন লিখিত আছে। তিন হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোক পর্য্যন্ত ভবদেবের বংশ-পরিচয়; পনেরো হইতে ছাব্বিশ শ্লোক পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যাবত্তা প্রভৃতির বর্ণনা, এবং ২৭ হইতে ৩২ শ্লোকে ভট্ট ভবদেবের নানারূপ সৎকার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার যে-সকল গুণ-গ্রামের প্রশংসা করা উদ্দেশ্যে এই প্রশস্তি লিখিত হইয়াছে তাহারই যথাবিহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সমগ্র লেখাটির সারমর্ম্ম এইরূপ—সাবর্ণ গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল গ্রাম দান-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সংখ্যায় প্রায় শতাধিক হইবে। তাহার মধ্যে রাঢ় দেশীয় সিদ্ধল-গ্রাম খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই গ্রামে এক সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে ভবদেব নামে এক ব্যক্তি সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহাদেব ও কনিষ্ঠের নাম অট্টহাস। গৌড়রাজ তাঁহাকে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আটটী পুত্র ছিল; সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম রথাঙ্গ, রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র বুধ "স্ফুরিত" নামে অভিহিত হইতেন। বুধের পুত্র আদিদেব বঙ্গরাজের সান্ধি-বিগ্রহিক—পাদীয় অমাত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন সভা ও বীর-স্থালী উভয় স্থানেই কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব

জ্যেষ্ঠী সং কলিকাতা।

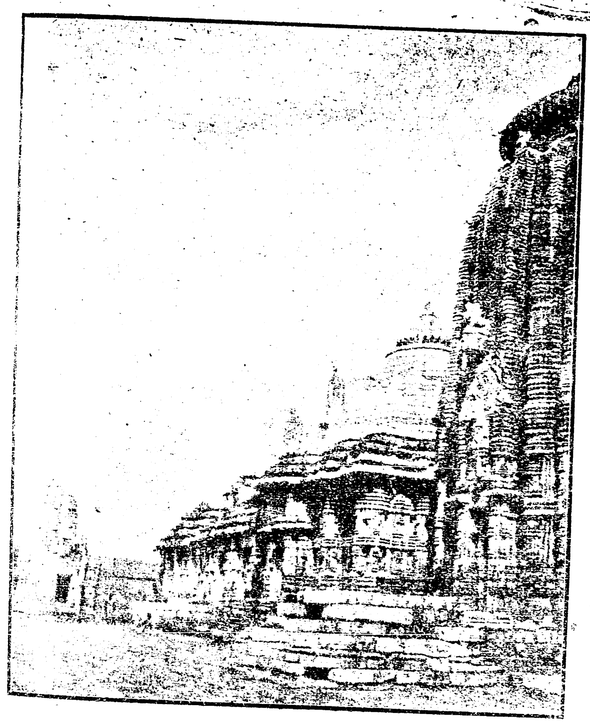

অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ও পার্শ্বস্থ 'নিসা' দেউল।

কা নামক অঙ্গনা-রত্নকে তিনি পত্নীরূপে করিয়াছিলেন। ইঁহারই গর্ভে যাঁহার র্থ এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল, সেই ব জন্মগ্রহণ করেন।

বি "জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীম্" প্রভৃতি গে বিশেষিত করিয়া ভবদেবকে দেব-অধিকারা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার পদগৌরব জানাইবার জন্য করিয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম-বিজয়ী হরিবর্ম্ম দেব সুদীর্ঘকাল তাঁহার মন্ত্রণা-শক্তিতে চালিত হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার "দণ্ডনীতি বর্ত্তমানুগা"—উপদেশাবলী হরিবর্ম্মের পুত্রের রাজত্বকালেও দেশের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল।

ব্রহ্মদ্বৈত বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের বিস্ময়-উৎপাদনকারী মীমাংসা 'তন্ত্রবার্ত্তিক' রচয়িতা ভট্টের (কুমারিল ভট্টের) রচনাবলীর গভীর অর্থ-সমাধানে সমর্থ, বৌদ্ধসমুদ্রের অগস্ত্য-

মুনি পাষণ্ড বৈদান্তিকদিগের প্রজ্ঞা-খণ্ডনে পণ্ডিত, ভট্ট ভবদেব সর্ব্বজ্ঞরূপে বিরাজমান ছিলেন, এবং সংহিতা, তন্ত্র ও গণিতে পরপারদর্শী এবং নবীন 'হোরা' শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া জনসমাজে অপর বরাহরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্পর্কীয় স্ব-রচিত টীকা ও বিবৃতি-বিষয়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে তিনি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতবাদ নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপাদি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ নিরসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রে তিনি (কুমারিল ভট্টের) নীতি-অবলম্বন করিয়া যে সকল বাক্যাবলী (maxims) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সহস্রকর রবির কিরণ-মালার ন্যায় অজ্ঞান-তিমির নাশ করিত। আগম,' অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ এবং সকল কবি-কলায় কৃতবিদ্য ভবদেব বাস্তবিকই জগতীতলে অতুলনীয় ছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রেও যে তাঁহার অপর নাম 'বালবলভী ভুজঙ্গ' সপুলকে উদ্গীত হইয়াছে, সে কথা কোন্ ব্যক্তিই বা অবগত নহে? দুষ্ট ভুজঙ্গ-দষ্ট (দংষ্ট্রান দুষ্ট ভুজঙ্গ ব্রণ মোহরাত্রি) অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তিগণকে প্রত্যূষে তূর্য্যধ্বনির ন্যায় তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণ-গুণে সত্বর নবজীবন দান করিয়া—"গরল-কেলীতে" নীলকণ্ঠের ন্যায় অপূর্ব্ব মৃত্যুঞ্জয়-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।* তিনি রাঢ়দেশে জঙ্গলপথ ও গ্রামের উপকণ্ঠ-সীমায় শ্রমমগ্ন পান্থ পরিষদের প্রীত্যর্থে এক সুপরিসর জলাশয় খনন করেন এবং যে স্থ এ লিপিটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সান্নিধ্যে নারায়ণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থ করেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গর্ভ-গৃ নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ এই ত্রি-মূ স্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনি হরিমেধ (বিষ্ণুর) সেবা উদ্দেশ্যে মন্দির-সেবার জন্য কিয়ৎসংখ্যক বিদ্যাধরী-তুল্যা দেবদা উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

স্বপ্নেশ্বর প্রতিষ্ঠিত মেঘেশ্বর মন্দিরে শিলালিপি (মর্ম্মানুবাদ)।

ওঁ ওঁ নমঃ শিবায়ঃ

অক্ষপাদ গৌতম মুনির বংশে রাজ নামক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মূলদেব। মূলদেবের অহিরাম নামে এক জন্মে। সেই অহিরামের অন্যান্য সন্তানাদির স্বপ্নেশ্বর নামে এক পুত্র ও সুরমাদেবী এক কন্যা ছিলেন। চন্দ্রবংশসম্ভূত চেদি মহীপতির মৃত্যু হইলে রাজরাজ, বিজয়-লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করেন; তিনি দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়সে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিয়ঙ্ক (অ ভীমদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলে

(মনুজরাজঃ নতাঙ্ঘ্রি যুগ্মঃ অভিষিক্তম্ অকরোৎ।)

* এই 'গরল-কেলী' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না বলা যায় না! প্রাচীনকালের শ্রেণীর চিকিৎসকগণের মধ্যে জাঙ্গলিবিদঃ বা বিষ-বৈদ্যের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ূরও এইরূপ জাঙ্গুলিক নামে পরিচিত ছিলেন। জাতকগ্রন্থে ব্রাহ্মণেরাও যে সর্পবশ-বিদ্যায় লাভ করিতেন তাহা অবগত হওয়া যায়। Dr. Radhakamal Mukerjee's Local Govern in Ancient India p. 60.

"সাম্রাজ্য—লক্ষ্মীপতি প্রত্যর্থী ক্ষিতিপাল মৌলি তিলক" অনিয়ঙ্ক ভীম "ত্রিকলিঙ্গনাথ" লিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাজশ্যালক স্বপ্নেশ্বরের তি "গঙ্গাবংশীয়গণের দিব্যাস্ত্র" এবং চতুরঙ্গ নাপেক্ষ অধিক বলবিশিষ্ট ("চতুরঙ্গতা ধিকতরঃ") প্রভৃতি বিশেষণ প্রযুক্ত হওয়ায় নুমিত হয়, তিনি 'মহাবলাধিকৃত' বা প্রধান নাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্ব-থিত এই স্বপ্নেশ্বরই মেঘেশ্বর দেবের মন্দির তিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং মন্দিরে সেবার ন্য কিয়ৎ-সংখ্যক পরিচারিকা প্রদান করিয়া-লেন। মন্দিরের সন্নিকটে উদ্যান প্রতিষ্ঠা 'উপবনম্ অথ চক্রে') এবং দেবালয়সংশ্লিষ্ট কটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তিনি পথিপার্শ্বে 'পুরে পুরে' তড়াগাদি খনন এবং সুরগৃহ দেবালয়ে প্রদীপাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাং শালা মালাঃ পথি পথি, তড়াগাঃ তিপুরম্, প্রদীপাঃ সম্পূর্ণাঃ প্রতি সুরগৃহম্ বিমলাঃ)।

ইহা ব্যতীত বেদাধ্যায়ী ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদিগের জন্য মঠ ও ব্রহ্মপুর (cloesters) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদীয় গুরু শৈব-মতাবলম্বী আচার্য্য-রাজ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং বিষ্ণুর আদেশক্রমে উদয়ন কবি এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। মেঘেশ্বর মন্দিরে দিশিখবলের পুত্র চন্দ্রধবল কর্ত্তৃক উহা শিলাপৃষ্ঠে সরলাক্ষর-মালায় লিখিত হইয়াছিল। আর সূত্রধর শিবকর প্রস্তর ফলকে মুক্তাফলনিভ এই অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ করিয়াছিল।

অনিয়ঙ্ক ভীমদেব দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খৃঃ ১১৯২ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইহা হইতে আচার্য্য কীলহর্ণ অনুমান করেন যে লিপিখানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই রচিত হইয়াছিল।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

নোয়ার কিস্তি

[স্থান—আরারট-পর্ব্বতে বাঁধা হজরত্ নূহ বা ান মনু বা পীর নপিস্তিম্ বা রেভারেণ্ড নোয়ার র একটা জাহাজ, কতকটা বাজারের পশুপাখীর কানের ধরণে তরো-বেতরো, খাঁচা ও নানা শাক-ী ফল-ফুলুরীর ঝুড়িতে বোঝাই করা।

কাল—কলির শেষ। ঘোর দুর্দ্দিন, কালরাত্রি, দ্বাদশ উনপঞ্চাশ বায়ু, মেঘ-বিদ্যুৎ সব একসঙ্গে দেখা ছে।

পাত্র—মনুবাবু ওরফে নকল নোয়া; একজন মোল্লা; এক পাদ্রী; এক পণ্ডিত; এক রাব্বি, এবং শয়তান বা ডেবিল্ বা কলি বা ইব্‌লিস্।]

মনু। (সংহিতার পুঁথি লিখিতে) সে হিসেবে তাহলে হল—ছয় মন্বন্তরে ১,৮৪,০৩, ২০,০০০ বৎসর এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্ত-বিংশতি চতুর্যুগ—৪৬,২০,০০৭ × ২৭ = ১১,৬৬,

৪০,০০০ বৎসর। এতে যোগ দাও অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অতীত কাল—৩৮,৯৩,০১০ বৎসর। তাহলেই দেখা যাচ্ছে সর্ব্বসাকুল্যে ১৯৬ কোটী ৮ লক্ষ, ৫৬ হাজার বৎসর হয়ে গেছে; কিন্তু এখনো একটি ব্রহ্মদিন শেষ হয় নি। ইতি ভেরেণ্ডা-সংহিতায় ছিষ্টি তত্ত্ব প্রথম শ্লোকঃ।

মোল্লা। হজরত নুহ, আলায়হেস্-সালাম!

মনু। নুহ কাকে বলছ? দেখছ না আমি এখন মনু হয়ে ভেরেণ্ডা-সংহিতায় সৃষ্টিতত্ত্ব লিখছি! গোল কোরে আমার হিসেব ভুলিয়ে দিও না—যাও!

পাদ্রী। মাই লর্ড নোয়া! ফাদার অফ্ সাম্, হ্যাম্ এণ্ড—

মনু। রেভারেণ্ড ফাদার! একটু চুপ করনা,—প্লিজ ডু নট্ ইন্‌টারাপ্‌ট্!

রাব্বি। পীর নপিস্‌তিম্ ফেরেস্তা অল্ বেহেস্ত—

মনু। আঃ কি বক্‌বক্ করছ! বুঝছনা, আমি এখন ভগবান মনু হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখছি—ভবিষ্যৎ আর্য্যবংশের জন্যে। আমাকে একটু স্থির হয়ে ধ্যান করতে দাও না।

পণ্ডিত। পেন্নাম হই ঠাকুর!

মনু। বেশ। ধনে-পুত্রে লক্ষীলাভ কর! এখন সকলে বাইরে যাও, আমি একটু মনঃসমাধান কোরে আসনে সমাসীন থেকে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুগণের জন্যে আমার ভেরেণ্ডা-সংহিতা-খানা রচনা করি—যাও।

মোল্লা। হরজত নুহ, আলায়হেস-সালাম! গরীবের একটি আরজি আছে, আপনাকে শুনতেই হবে।

মনু। রেখে দাও তোমার আরজি। ঋষি হয়ে আমি তোমাদের আরজি শুনতে বাধ্য নই। একি মাইনে-করা আদালতের কাজি পেয়েছ যে যখন যা আর্জ্জি পেশ করবে শুনতে হবে? যাও, আমি শুনব না!

পাদ্রী। রেভারেণ্ড ফাদার! আপনি অত্যন্ত রাগান্বিত হতেছ কেন?

রাব্বি। বেল্ মেরোডাচ্ এল্ খাম্ হেম্মুরাব্বি নেবুকাড্‌নেজার!

পণ্ডিত। ঠাকুর, আপনি ওঁয়াদের কথায় কর্ণপাত করবেন না—ব্রাহ্মণাদি বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠকরণ, ক্ষত্রিয়প্রভৃতি অনুলোম-প্রতিলোম জাত সঙ্করজাতির পৃথক-পৃথক রূপে ধর্ম্মসংহিতা আমাদিগকে বলুন।

মনু। এই ঠিক বলেছ। মানুষের মধ্যে কথা! আগে ব্রাহ্মণের জন্যে ধর্ম্মশাস্ত্র লেখা চাই, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; তারপর হিব্রু, তারপর মুসলমান; সব-শেষে খ্রীষ্টান! বিধাতার সঙ্গে এইরকমই আমার কথা আছে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রটা আগেই আমাকে লিখতে হবে আর সেইজন্যেই আমি হয়ে আজ এইখানে স্থির হয়ে বসতে চাচ্ছি তোমরা কেবল মিছে গোলমাল কোরে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করছ। ব্রাহ্মণের আমাকে প্রথমেই বজায় রাখতে হবে; বিধাতার কৃপায়—'ব্রাহ্মণোজায়মানো পৃথিব্যামধিজায়তে!' জন্মাবামাত্রেই ব্রা পৃথিবীর মধ্যে সবার শ্রেষ্ঠ হয়েন।

মোল্লা। হজরত! এ কেমন কথা বলে আল্লাহ্-তালা পৃথিমিতে পয়লা পানি হাবা, দরখ্‌ত আর কীড়া, চিড়িয়া জানোয়ারদিগের পয়দা করেন। তারপ

মনু। বলে যাও।

মোল্লা। বাদ ছিষ্টি করেন মোসলমান-পয়েস্তাগণকে ও জিন-সমুদায়কে—

পণ্ডিত। তার পরে?

মোল্লা। তারপরে আদম আর হাবা, তারপরে হজরত শীশ, হজরত মৌলাইল, হজরত ইদ্রিস্, তারপর আসলেন হুজুর হজরত নুহ আলায়হেস-সালাম!

মনু। ভুল, ভুল, সম্পূর্ণ ভুল! প্রথমেই হাবার সঙ্গে হাবা সৃষ্টি হল, শেষে আবার আদমের সঙ্গে হাবা এল? এ হতেই পারে না। এক জিনিষ কখনো দুবার সৃষ্টি হতে পারে না। তোমার আরজি নামঞ্জুর,—যাও।

মোল্লা। আলায়হেস-সালাম হজরত নুহ! গরীবের কথায়—

মনু। আমি যখন নুহ হয়ে তোমাদের আইন লিখতে বসবো, তখন যা জানাবার জানিও, এখন বেরোও!

পাদ্রী। গড হইতে আসিল আদম আর হাবা; তাঁহারা জন্মাইল সেথ্‌কে; সেথের পুত্র এনাস্, ইনোসের সন্তান কেনান্, কেনান একশত বৎসর জীবিত রহিল ও পুত্র-কন্যা প্রসব করিল।

মনু। ভুল, ভুল, একেবারে অসম্ভব রকম ভুল!

পাদ্রী। রেভারেণ্ড ফাদার নোয়া! আপনি কি বলিতেছে? ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল কখনো ভুল হইতে পারেন না!

মনু। আমি যখন নোয়া-অবতারে তোমাদের ধর্ম্মের জাহাজ নিয়ে পার করতে যাবো, সে সময় তোমার আপিল শুনবো। এখন টু গো আউট্ নাউ।

রাব্বি। আহুরা মাজদা—নেবুকাড্‌নেজর।

মনু। ওহে, আমি তোমার মেজদা নয়, আমি মনু, সবার বড়দাদা;—তপস্তপ্ত্বা-সৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষোবিরাট তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং।

পণ্ডিত। অর্থটা কি হল ঠাকুর? অর্থটা কন্!

মনু। অস্যার্থঃ—হে দ্বিজসত্তম! বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন আমি সেই মনু, আমাকে ছিষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া অবগত হও।

মোল্লা। হজরত! কেতাবে এ-সব কাফেরদের কথা না থাকলেই ভালো, তোবা তোবা!

পাদ্রী। গস্‌পেলে যা নাই, তা কথাই নয়!

রাব্বি। খামুস্!

পণ্ডিত। আহা, তোমরা গোল কর কেন? ঠাকুরকে সংহিতাখানা শেষ করতে দাওনা; ক্রমে তোমাদেরও কেতাব লেখা হবে।

মোল্লা। আর হবে কবে? এই প্রলয়-কাণ্ডর পরেই মোসলমান-জাত আবার পয়দা হবে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তাদের জন্যে ধর্ম্মপুস্তক না হলে চলে কেমন করে?

পাদ্রী। এই ark থেকে ডাঙায় নেমেই আমাকে tract বিলি করতে হবে; এখন থেকে রেডি না হলে চলে?

মনু। কিন্তু মনু-সংহিতা না শেষ কোরে তো আমি অন্য কাজে হাত দিতে পারিনে!

পাদ্রী। তবে রেভারেণ্ড ফাদার, আমায় নোট্ দিন্।

মনু। নোট্? আমি কি নোটের তাড়া বেঁধে এনেছি? না, আমার ব্যাঙ্কে তোমার কিছু জমা ছিল? যাও—এখনি বেরোও বলছি।

পাদ্রী। মহাশয়, আপনি বুঝিতে পারিতেছে না কাহার সহিত কথা কহিতেছে, আমি রেভারেণ্ড ফাদার আর্ক—

মনু। গো টু হেল ইওর রেভারেণ্ড ফাদার!

[শয়তান প্রবেশ করিয়া]

আর তার সঙ্গে তোমার আর্কও যাক্ আমার ওখানে, কি বল হে মনু?

মনু। ঠিক বলেছ দাদা! চুলোয় যাক্ আর্ক, আমি এখন ভবিষ্যৎ-মানুষদের জন্যে আমার সংহিতাখানা ভালোয়-ভালোয় লিখে যেতে পারলে বাঁচি! এস দাদা, বোসো। তোমার নামটি—

শয়তান। আমাকে কেউ বলে ইবলিস, কেউ ডেবিল্, আর কেউ বলে শয়তান।

মনু। এ্যাঃ সহতান? কই শাস্ত্রে তো এ নাম পাইনি। এক সহদেব ছিলেন।

শয়তান। দেবতার সহ আমার ঝগড়া তাই বোধ হয় ওই নামেই আমায় ডাকা হয়। আমাকে কেউ-কেউ কলিও বলে।

পণ্ডিত। এ্যঃ, হা-রাম! কলি স্বশরীরে উপস্থিত! আর পড়বি তো পড় আমারি চোখে সকাল বেলা! কোথায় কলির শেষ হবে, না স্বয়ং কলি স্বশরীরে হাজির! এইবারেই কিস্তিকাৎ ঠাকুর হে!

মোল্লা। ইয়া আল্লা!

রাব্বি। খামুস্!

পাদ্রী। By jove ফাদার সন্ হোলি গোস্ত্!

সকলে। আর এখানে থাকা নয়, চল অস্থান করি। চলেন, চলেন। খামুস্, খামুস্! ফাদার সন্ হোলি গোরোস্ত! আঃ কি গেরো! (প্রস্থান।

শয়তান। ওহে মনু, তুমিও যাও কোথা কি লিখছিলে দেখি না!

মনু। (পুঁথি সাম্‌লে) আরে না, না ও কিছু নয়। ওটা ছুঁওনা, ধর্ম্মশাস্ত্র।

শয়তান। পৃথিবীতো উল্টে গেল, এখ আর শাস্ত্র লিখছ কার জন্যে?

মনু। কেন, যে-সব মানব আসছে তাদের জন্যে আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখে যেতে হবে, এমনি কথাই তো আছে বিধেতার সঙ্গে!

শয়তান। সত্যি নাকি?

মনু। সত্যি নয় তো কি মিছে? আমি তো শয়তানও নই, কলির ব্রাহ্মণও নই যে মিছে বলবো।

শয়তান। মিছে-কথা বলার কি ব তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখলে?

মনু। এখনো লিখিনি; কিন্তু লিখবো মনে করছি। একটি তুল্‌সী-পাতা ছিঁড়লে পাপ, মিথ্যা কইলে সেই পাপ।

শয়তান। বাহবা, এ তো বেশ কথা মিছে-কথা বলার শাস্তি?

মনু। চান্দ্রায়ণ!

শয়তান। চুরি?

মনু। গোরুর গায়ে পা-ধোয়া জল এ বিন্দু দিলে যে পাপ, চুরিতে সেই পাপ।

শয়তান। প্রায়শ্চিত্ত?

মনু। চান্দ্রায়ণ! এই ভাবে গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা সব পাপের কথা আর তার প্রায়শ্চিত্ত লিখতে হবে।

শয়তান। চান্দ্রায়ণ-ব্রতটা কি ব্যাপার?

মনু। ওটা একটা ব্রত; সেটা ব্রতকাণ্ড লেখবার সময় লিখে দেবো।

শয়তান। খুব শক্ত কিম্বা expensive হলে তো চান্দ্রায়ণ সবাই করতে পারবে না।

মনু। যাতে সবাই করতে পারে সহজে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শয়তান। তা হলেই হলো। তোমার সংহিতার কথা শুনে বইখানা আমার আগা-গোড়া দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।

মনু। বোসো, আগে লেখা শেষ হোক, তখন একদিন পড়ে শোনাবো।

শয়তান। ধর্ম্মকথা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগেনা।

মনু। শুধু ধর্ম্মকথা কেন? অনেক কথাই আমি লিখবো, শুনে মজা পাবে।

শয়তান। আরো কি থাকবে তোমার পুঁথিতে?

মনু। জুয়ো-খেলা, বিয়েতে যৌতুক-খেলা, রাজনীতি, অনুলোম-প্রতিলোম, ক্ষেত্র-তত্ত্ব, জল-চলাচলের হিসেব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বর্ণাশ্রম —এম্‌নি সব।

শয়তান। সৃষ্টিতত্ত্ব তুমি কি লিখবে? তোমার তো ঢের আগে সৃষ্টি হয়ে গেছে; তুমি তার কি জানো?

মনু। সেইজন্যেই তো ধ্যান কোরে সবটা পরিস্কার দেখবার চেষ্টায় ছিলেম। কিন্তু এরা পাঁচজনে হতে দিলে কই? চোখ বন্ধ কোরে দেখবার চেষ্টাটি করছি কি কানের কাছে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলে, আর সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল! আবার কত বচ্ছর ধ্যান করলে যে ছিষ্টির রহস্য জানতে পারবো তার ঠিক কি?

শয়তান। মনে করলেই এখনি তুমি ছিষ্টি কবে হলো, কেমন করে হলো, সব জানতে পারো।

মনু। সত্যি নাকি?

শয়তান। আমি কি মিছে বলে তুল্‌সী-পাতা ছেঁড়ার পাপে লিপ্ত হব?

মনু। তা হলে কেমন কোরে কার কাছে ছিষ্টির খবরটা পাওয়া যাবে?

শয়তান। এই আমারি কাছে।

মনু। তোমার কাছে? হঃ হঃ! সেকি হে, তোমার যে এখনো চুল পাকেনি, দাড়ি-গোঁপ গজায়নি!

শয়তান। সত্য গেল, ত্রেতা গেল, দ্বাপর গেল, কলিও এল-গেল, আবার সত্য আসবার জোগাড়, কিন্তু আমার চুল কালোই রইল, দাড়ি-গোঁফও দেখা দিলেনা।

মনু। তাই তো হে, তোমার চুল যে কালো কুচ্-কুচ করছে! কলপ দাও নি তো?

শয়তান। কলপও দিইনি, কলমে কোরে কালিও ছেটাইনি; কলুষ লাগিয়ে বসে আছি।

মনু। তাই বলো। কলপ দিলে তো এমন জলুস হয় না! আমার এই তো সবে ঊনপঞ্চাশ-লক্ষ বছর, এরি মধ্যেই দাড়ি-গোঁপ সব দেখনা একেবারে সাদা ধপ্‌ধপ্ করছে, যেন ধোপ-দেওয়া পৈতের গোছা!

শয়তান। ইচ্ছে কোরে ধর্ম্মের ধোঁয়া লাগালে চুল কটা হবে না তো কালো থাকবে নাকি ?

মনু। সব বিধাতার ইচ্ছে! যাক্ সে কথা! যে-রকম চট্‌পট্ বুড়িয়ে যাচ্ছি তাতে ভয় হয় বুঝিবা আমার ভেরেণ্ডা-সংহিতাখানা শেষ কোরে যেতে পারলেম না। এক ছিষ্টিতত্ত্ব নিয়ে সারা দিনটা গেল, অথচ এখনো একছত্র লেখা হল না; ভেবেই ঠিক হচ্ছে না ছিষ্টি কেমন করে হ'ল!

শয়তান। তুমিই লিখবে আবার তুমিই ভাববে ছিষ্টি কেমন কোরে হল,—এ হলে ছিষ্টিতত্ত্ব তোমার কোনো দিন লেখা হবেনা।

মনু। আমার হয়ে আবার কে ভাবতে আসবে ?

শয়তান। কেন আমি! আমি ভাবি আর তুমি লিখে চল;—হুহু কাজ এগিয়ে যাবে।

মনু। হ'লে তো হয় ভালো; কিন্তু তা হ'তে পারে না।

শয়তান। কেন হবে না? মহাভারতটা হ'ল কেমন করে? ব্যাস ভাবলেন, গণেশ লিখলেন—হুহু কোরে চারহাতে অষ্টাদশ পর্ব্ব।

মনু। সে ব্যাসও নেই, সে গণেশও নেই; সব যে এখন উল্‌টে গেছে!

শয়তান। কিন্তু তুমি-আমি আছি তো! দুজনে মিলে একখানা বই আর লিখে উঠতে পারবো না? বোসো কলম ধোরে।

মনু। আচ্ছা বেশ! পণ্ডিত-মশায়, আমার দোয়াত-কলমটা চট্-কোরে আনেন তো!

(নেপথ্যে পণ্ডিত)

আমি ওখানে যেতে পারবো না, কলি রয়েছেন!

মনু। আরে, কি বাজে বকো?

পণ্ডিত। আজ্ঞে ঠাকুর, আমি হরিনাম করছি—আপনি এসে লয়ে যান।

মনু। আরে রেখে দাও হরিনাম! আমি ব্যাসাসন কোরে বসেছি, উঠি কেমন কোরে!

পণ্ডিত। আজ্ঞে আমি যোগাসনে বসে আছি, যাই কেমন কোরে?

মনু। এ তো বড় বিপদ হ'ল!

শয়তান। কেন, মোল্লা কি পাদ্রী ওদের কাউকে বল না?

মনু। সে তো হ'তে পারেনা! সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ওঁদের ছোঁয়া জিনিষে—তুমি যদি একবার গিয়ে দোয়াত-কলমটা—

শয়তান। একে কালি, তাতে ব্রহ্মার হাঁসের পালক,—ও দুটোর দিকেই আমার যাবার জো নেই, তুমি তো জানো।

মনু। তবে উপায়?

শয়তান। উপায় আমি বাৎলাই,—তুমি মুখস্থ কোরে যাও, সময়-মতো লিখো।

মনু। তা হ'লে তো শ্রুতি এবং স্মৃতি হল, সংহিতা হ'ল না।

শয়তান। সেই তো ঠিক! আগে শ্রুতি, তারপর স্মৃতি, শেষে সংহিতা—এই নিয়মই তো বরাবর চলে আসছে।

মনু। তাও তো বটে!

শয়তান। তবে শোনো। (কানে-কানে) শুনলে? মনে থাকবে তো?

মনু। রোসো! সুবর্ণ-নির্ম্মিত সূর্য্য-প্রভাযুক্ত একটি অণ্ড—

শয়তান। আরে যাও, তোমার কিছুই মনে নেই! ছিষ্টির আগে কিছুই ছিল না, ছিল কেবল একটি অণ্ড, তার একভাগ আলো আর একভাগ কালো। আলোর ভাগে হলেন ব্রহ্মা, আর কালোর ভাগে পড়লেন শয়তান। তারপর দুজনে সতরঞ্চ-খেলা আরম্ভ হল। ব্রহ্মা ছিষ্টি করলেন হাতি, ঘোড়া আর পারাপারের নৌকো; আর শয়তান গড়লেন রাজা, মন্ত্রী, আর বড়ে! এক অণ্ড—এইভাবে কালো-আলো পাপ-পুণ্য দুই ভাগ হয়ে সেই যে খেলা সুরু করলে সেই খেলা এখনো চলছে, চিরকাল চলবে;—একজন চাল্‌বে চাল, অন্যে চাল্‌বে বেচাল!

পণ্ডিত। (পা-টিপিয়া প্রবেশ করিয়া) ঠাকুর চুপিচুপি কি করছেন, জানতে হ'ল! হুঁহুঁ আমাকে ভাঁড়িয়ে ছিষ্টিতত্ত্ব জেনে নেওয়া হচ্ছে! (প্রকাশ্যে) ঠাকুর, পায়ের ধূলো দেন, জপ আমার শেষ হয়েছে।

মনু। তুমি এখানে কেন? যাও, যাও, এ সব অতি গোপনীয় কথা, তোমার শুনতে নেই।

পণ্ডিত। আমি শুনে ফেলেছি, এখন বাকিটুকু শুনতে চাই।

মনু। আমি আদেশ করছি, গুরুর আদেশ অমান্য করতে নেই, তুমি বেরোও—

পণ্ডিত। আর আপনি একা-একা কথা শুনুন? এমন অনাছিষ্টি তো হতে পারে না!

শয়তান। তুমি এ-সব শুনে করবে কি? তুমিতো আর বই লিখবে না!

পণ্ডিত। উনি যদি শুনে লিখতে পারেন তো আমি পারিনে?

মনু। সেইজন্যেই তোমাকে বাইরে যেতে বলা হচ্ছে। তুমি সংহিতাটা লিখে যাবে আর আমি বুঝি কেবল ভেরেণ্ডা ভাজবো এই—কতকালের পুরোনো নৌকোটারখোলের মধ্যে বসে? সে হচ্ছে না বাবাজী! বেরোও এখনি, না হলে—

পণ্ডিত। না হলে কি? বলেন, কি বলতেছিলেন—না হলে কি?

মনু। দেখছ ইনি স্বয়ং কলি!

পণ্ডিত। তাতে হয়েছে কি?

মনু। এঁর দৃষ্টিমাত্রে তুমি ভস্ম হয়ে যাবে!

পণ্ডিত। সে ভয় নেই, তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

শয়তান। কি করেছ শুনি!

পণ্ডিত। একঘটি গঙ্গাজল খেয়ে এসেছি।

মনু। গঙ্গাজল! এখানে তুমি গঙ্গাজল পেলে কোথায় বাপু?

শয়তান। গঙ্গা, টেম্‌স, জর্দ্দন সব জল যে এখন এক হয়ে গেছে; গঙ্গাকে খুঁজে পেলে কোথায়?

পণ্ডিত। এই আমার ট্যাঁকে রয়েছেন গঙ্গা।

শয়তান! ট্যাঁকে গঙ্গা?

মনু। এমন তো শুনিনি!

পণ্ডিত। ব্রহ্মার কমণ্ডুলে, শিবের জটায় গঙ্গা থাকতে পারেন, আর ব্রাহ্মণের ট্যাঁকে রইতে পারেন না?

মনু। ছ্যাখ্, মিথ্যা বোলে তুলসী-ছেদন করিসনে, ভালো হবেনা!

শয়তান। গঙ্গাকে তুমি ট্যাঁকে বাঁধলে কি প্রকারে শুনি!

পণ্ডিত। কেন, পৃথিবীর অবস্থা

খারাপ দেখে ঠাকুর যখন দেবতার কাছে মানত কোরে জোড়া-জোড়া পাঁটা-মোষ-কাক-বলি, কুঁকড়ো-বলি, লাউ-বলি, কুমড়ো-বলি—এমনি নানা সামিগ্রির পোঁটলা বেঁধে বিপদ-সাগর পার হতে এই কতকালের ভাঙা নৌকোখানায় এসে চড়লেন, তখন আমি ভাবলেম—সর্ব্বনাশ! এই প্রলয়-ঝড়ে এত বোঝা নিয়ে নৌকো তো ভরা-ডুবি হবেই! বিদেশে বিভুঁয়ে কোথায় গিয়ে মরি তার ঠিক নেই, মরণকালে গঙ্গা পাই কিনা, কাজেই আসবার সময় তাড়াতাড়ি দুটো গঙ্গা-মৃত্তিকের তিলকমাটি ট্যাঁকে জড়িয়ে আনলেম—

মনু। ওতো মাটি, গঙ্গা কোথায় রে হতভাগা?

পণ্ডিত। এই মাটি জলে গুলে দিলেই গঙ্গা,—একঘটি, দুঘটি, দশ ঘড়া, বিশ ঘড়া—যত চান্।

মনু। রইলো এই ভেরেণ্ডা-সংহিতা!

শয়তান। কেন? কেন? এমন জিনিষটা লেখা হচ্ছিল—অসমাপ্ত থাকবে?

মনু। সমাপ্ত করে লাভ? আমি মাথা-ঘামিয়ে লিখবো, কেউ আর পড়বে কি?

পণ্ডিত। কেন ঠাকুর, আমি পড়বো।

মনু। তুমিই খালি পড়বে, আর-কেউ পড়বে না।

পণ্ডিত। কেন ঠাকুর, আমি পড়ে সকলকে পড়াব,—পাখী-পড়ানো কোরে পড়াব।

মনু। তা হলে সংহিতাটা তুমিই লিখে নাও না কেন। আমার পুঁথি তোমায় দিচ্ছি, ওই তোমার ট্যাঁকের মাটিটুকু আমায় দাও।

পণ্ডিত। বাস্‌রে, তাও কি হয়! গঙ্গাদান করবো? এই গঙ্গাজল এক একবিন্দু খাইয়ে লক্ষকোটি পাপী আমি উদ্ধার করবো ভেবেছি।

মনু। তবে আমার ধর্ম্মশাস্ত্র লেখার প্রয়োজন?

পণ্ডিত। প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রে এই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য লিখতে হবে, তবে তো আমার কথায় লোকে বিশ্বাস করবে।

মনু। তুমি কিনবে নাম, কুড়বে পয়সা, আর আমি-ব্যাটা তার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিলি করবো!—রইলো তোমার ভেরেণ্ডা-সংহিতাতাকে তোলা! দেখি তুমি কেমন পাপী উদ্ধার কর!

(প্রস্থান।)

পণ্ডিত। ঠাকুরকে চটিয়ে তো বিষম বিপদ হ'ল দেখছি! মানুষ জন্মাবে, পাপও করবে; কিন্তু সংহিতাও থাকবে না, গঙ্গাজলের মাহাত্ম্যও কেউ বুঝবে না!

শয়তান। তুমি তো বুঝবে?

পণ্ডিত। শুধু আমার বোঝায় তো ফল হবে না। আমি কি শুধু দুবেলা গঙ্গাজল খেয়ে প্রাণধারণ করবো?

শয়তান। ভগীরথ তো তাই করে-ছিলেন।

পণ্ডিত। তাঁর কথা ছেড়ে দাও। গঙ্গা-জলের জন্যে যদি আমার-ওখানে যাত্রীর ভিড় না লাগলো তো আমার এর-পরে যে সংসার হবে তা চলে কিসে?

শয়তান। ওহো, তাওতো বটে! তা তুমি নিজেই কেন দু-ছত্তর পুঁথি লিখে ফেলনা!

পণ্ডিত। আরে তাই যদি পারবো তবে

ও মনু-বাবাজীর পায়ে তেল দিচ্ছি কেন? চিরকালটা ওঁর জন্যে পুঁথির মোলা গেঁথে আর তল্পি বয়ে বেড়িয়েছি, এ বয়সে কি এখন আর পুঁথি লেখা চলে? পুঁথি-গাঁথবারই দিষ্টি নেই, পুঁথি তৈরি করা ত দূরের কথা!

শয়তান। এতকাল যে ওর তল্পি বইলে, ওর কাছে কিছু আদায় করতে পারলে না? যোগে-যাগে কিছু-একটা বিদ্যে, কি বুজরুগি, কি magic, কি সোনা-দানা কিছু?

পণ্ডিত। থাকলে কিছু তো আদায় হবে! আমাকে সিদ্ধি দেবেন বলেছেন, সেই থেকে ওঁর সঙ্গে ঘুরছি।

শয়তান। এককালে তো কিছু ছিল?

পণ্ডিত। রামঃ কোনো কালে কিছুই ছিল না।

শয়তান। তবে এত-বড় নৌকোখানা, এই এত খাঁচা পশু-পক্ষী, এত ঝুড়ি, এত ধামা, এত হাতি-ঘোড়া এগুলো সব এল কোথা থেকে, যদি কিছু না থাকবে?

পণ্ডিত। আমিওতো তাই ভাবি, ওঁর তো এক-পয়সার পুঁজি ছিল না, কেবল ছিল একটা ছেঁড়া পাঁজী, তার থেকে এত হ'ল কেমন কোরে?

শয়তান। ঠিক জান তো? এ-সব যা দেখছি সবই তোমার গুরুর, আর কারু নয় তো?

পণ্ডিত। গুরু নিজমুখে বলেছেন সব ওঁর কাণ্ডকারখানা; না হলে কি বিশ্বাস করি?

(মোল্লা সঙ্গে নবি-বেশে মনুবাবুর প্রবেশ।)

নূহ। ফিল্ হকিকৎ, বিল্ ইত্তেফাক্, বয়ান্দাজ লওজান!

শয়তান। এর মানে কি হ'ল? হঠাৎ আরবী ধরলেন যে?

নূহ। এর মানে যারা ফকীরদের কথায় অবিশ্বাস করে তারাই কাফের, তাদের ফিল-খানায় মেথর কোরে রাখ।

পণ্ডিত। গুরুজী, আমি কোন্ দিন আপনাকে অবিশ্বাস করেছি যে অভিসম্পাৎ দিচ্ছেন?

নূহ। চোপরও কাফের, বদমাস! আমি আর তোমার গুরু নই, আমি এখন—

মোল্লা। হজরত নূহ আলায়হেস সালাম!

পণ্ডিত। যাক্, সংহিতার দফা রফা হ'ল, আমিও গেলেম এবারে!

শয়তান। তাইতো, আবার যে ধর্ম্মপুস্তক লেখা সুরু হ'ল, একটা মস্ত দল তো হাত-ছাড়া হয়, এখন উপায়?

মোল্লা। হজরত, তাহলে এইখানটায় কুর্সি নিয়ে কেতাব লিখতে বসেন, আমি খানিক জম্‌জমের জল দিয়ে স্থানটা পরিষ্কার করে দিই।

শয়তান। তোমার সঙ্গে জম্‌জম্ আছে নাকি? তবে তো ভালো।

মোল্লা। আজ্ঞে উটের চামড়ার একটা কার্ব্বা জল সঙ্গে এনেছি।

নূহ। জম্‌জম্ কিহে?

শয়তান। (চুপি-চুপি) ওদের গঙ্গাজল। দুয়েরই ঠিক এক কাজ।

নূহ। বল কি? তাহ'লে তো কেতাব লেখা হয় না। পাদ্রী, রেভারেণ্ড ফাদার! চট্ কোরে আমার সোলারটুপি আর অল্‌স্টার আনো, আমি গস্‌পেল লিখতে চাই।

মোল্লা। হজরৎ—

নোয়া। গো টু দি—

পাদ্রী। ফাদার সন্ হোলি গোস্ত! রেভারেণ্ড ফাদার নোয়া ইওর মোষ্ট—

শয়তান। এ এক ফ্যাসাদ্ উপস্থিত! রেভারেণ্ড ফাদার, গস্‌পেল লেখবার আগে—

পাদ্রী। সকলকে জর্ডনের জলে বাপ-টাইজ করে নিই।

(বোতল বাহির করণ।)

নোয়া। ও আবার কি বেরোলো?

শয়তান। জর্ডন! জম্‌জমের ছোট ভাই!

নোয়া। গো আউট, গো আউট! নাঃ, আর কারু জন্যে কিছু লেখা নয়!

(আগুনের আংটা দুলিয়ে রাব্বির প্রবেশ।)

রাব্বি। পীর নপিসতিম্ নেবুকাড্‌নেজর—

মনু। চাইনে তোমার নেবু। সা অব্বাসি দামুস দুমুস্!

রাব্বি। খামুস!

সকলে। ক্ষেপে গেলেন নাকি? ওহে পলায়ন কর! ক্যা আফত্! Very strange! খামুস্!

পণ্ডিত। আমার যে ডাক-ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, আহা এমন গুরু আর পাবনা রে—

সকলে। আহা, হাহা, হুহু! Lord! তোবা তোবা! হতোস্মি! খামুস্!

(দলে-দলে স্ত্রীগণ)

কি হলো, কি হলো, ঠাকুরের কি হলো?

পণ্ডিত। আর হবে কি? নাম শোনাও, নাম শোনাও!

পাদ্রী। হিম্! হিম্! শীঘ্র হিম্!

মোল্লা। যোকুছ করনা হোয় ভাই, এ ক্যা আফত্!

রাব্বি। খামুস্!

(গান)

আরে নামে-নামে গঙ্গাপানি!
জম্‌জম্-পানি, জরদন্-পানি!
হরদম্ পানি, ঝম্ ঝম্ পানি—
নামে নামে নামে পানি!

পণ্ডিত। বোল্ বোল্ বোল্ বোল্ বোল্ বোল্ বোল্ বোল্!

পাদ্রী। বাইজোব্ বাইজোব্ বাইজোব্ বাইজোব্!

মোল্লা। তোবা তালা তোবা তালা তোবা তালা।

রাব্বি। খামুস্ খামুস্ খামুস্ খামে!

মনু। নাঃ, এরা আমায় ক্ষেপিয়ে তুল্‌বে ওরে থাম্ তোরা! ওহে সহতান, ও সহদেব, কোথায় পালালে হে? এই অন্তি কালে দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

শয়তান। (নেপথ্যে) এই যে আমি এইখানে;—এই মস্ত খাঁচাটার এপারে ব পিঞ্জরাবদ্ধ জীবদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করছি।

মনু। কই হে দেখা দাওনা, অন্ধকারে রইলে কেন?

শয়তান। দেখা দিলে সবাই আঁৎকে উঠবে; বরং তুমি এই খাঁচার ম এস, ওরা তোমার কাছে ঘেঁসতে পারবেনা।

মনু। সেই ভালো, পিঁজরাপোলেই কতক আরামে কাটানো যাক গে।

সকলে। অমন কাজ করবেন না ঠাকু খাঁচায় বাঘ আছে—রেভারেণ্ড! হুহু খামুস্! নপিস্‌তিম্!—নাম কর! নাম

(গান)

আরে নামে নামে ঝম্ ঝম্ নামে!

মনু। বাঘের মুখে নামতে হয় তাও ধিক্কার, তোদের উৎপাত আর সহ্য হয় না—

ব্লেম।

শয়তান। এসো।

[ঘোর অন্ধকারে বিকট মূর্ত্তিতে শয়তানের আবির্ভাব। সকলে চীৎকার ক'রে উঠলো। পশুপাখীগুলো পর্য্যন্ত খাঁচার মধ্যে ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি সুরু ক'রে মূর্চ্ছিত হ'ল।]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যুরোপের প্রভাবে ভারতের ভাবী অবস্থা

(ফরাসী হইতে)

এখন আলোচনা করা যাক্ যুরোপের ভাব-বলে ভারতীয় জন-সমাজের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে।

দুইটি প্রবণতা এখন হইতেই প্রকাশ পাইতেছে।

প্রথম, ভারতীয় সমাজ যে সকল বিভিন্ন উপাদানে গঠিত সেই সব উপাদানের মিশ্রণ।

ভারতের ধর্ম্মসমূহ।—এখনও বহুকাল ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম পরস্পরের সহিত যুঝাযুঝি করিবে। কিন্তু বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয়, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং যুরোপের ভৌতিক সভ্যতার প্রগতি—এই দুইটি জিনিস অল্প অল্প করিয়া ধর্ম্মদিগের পৌত্তলিকতাকে ক্ষীণ করিবে। পক্ষান্তরে, সমস্ত মুসলমান রাজ্যের অবনতি হেতুঃ ভারতীয় মুসলমানদিগের মেজাজটা আর ততটা দুর্দ্দমনীয় থাকিবে না।

ভারতের অধিবাসী।—ভারত একটি সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক ভূখণ্ড হওয়ায়, উহার সমস্ত অধিবাসীগণেরই সমান স্বার্থ। বৃহত্ত্ব প্রযুক্তই উহা কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত। টেলিগ্রাফ্, ষ্টীমার, রেল-গাড়ী, ভারতকে ক্রমশঃ এক-রাষ্ট্রে পরিণত করিবে। বিভিন্ন ভাষায় কথা কহা বরাবর চলিলেও একটি সাধারণ ভাষা উহাদের মধ্যে প্রচলিত হইবে—সে ভাষা ইংরেজী। এই ইংরেজী ভাষার সাহায্যে উহারা যুরোপের সমস্ত বিজ্ঞানের অনুশীলনে সমর্থ হইবে।

বর্ণভেদ প্রথা উঠিয়া গেলে তাহারই ফলে আর একটি গুরুতর ঐক্য সংসাধিত হইবে।

ভারতের ইতিহাসে বর্ণভেদপ্রথা, অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থার স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ণভেদ প্রথার প্রতি হিন্দুর অপরিসীম আসক্তি থাকায়, যে-সকল আন্তরিকভাব (sentiment) অন্যান্য দেশে স্বতন্ত্র, এমন কি বিরোধী—তাহাও ভারতে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে;

যথা,—ধর্ম্ম, জন্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস, অদৃষ্টের প্রতি অধিক আস্থা স্থাপন, স্থানীয় দেশানুরাগ, পৌরাণিক ইতিহাস ও প্রাদেশিক কিংবদন্তীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি, স্থানীয় ভাষা ও উপভাষার প্রতি অনুরাগ, দল-গণ্ডির প্রতি, কৌলিক কর্ত্তব্যের প্রতি আসক্তি। বস্তুতঃ, যদি কোন রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়া সহসা জাতিভেদের উচ্ছেদ হয় তাহা হইলে হিন্দুরা সামাজিক গঠনপ্রণালী হইতে, ধর্ম্ম হইতে, ধর্ম্মনীতি হইতে বঞ্চিত হইবে।

কিন্তু যে ঐক্যসাধনের কাজ কোন আইনের দ্বারা সংস্থাপিত হইতে পারে না, সভ্যতার ক্রমবিকাশই,—মূল-বর্ণগুলাকে খণ্ডাংশে বিভক্ত করিয়া, সেই কাজ সমাধা করিবে। এই প্রকারে সেকালের সমাজ আস্তে আস্তে লয় প্রাপ্ত হইবে;—পক্ষান্তরে য়ুরোপের প্রভাবে ক্রমশঃ একটি নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

* *
*

তাহারপর, পাশ্চাত্য মতামতের (ideas) সহিত প্রাচ্য মতামতের, ইংরেজী রাগ-বিরাগের (sentiment) সহিত ভারতীয় রাগ-বিরাগের মিলন সাধন।

একপক্ষে ইংরেজদের কেজো বুদ্ধি, ও কল্পনাবর্জ্জিত তথ্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ; অপর পক্ষে, হিন্দুদিগের উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম কল্পনা এবং শ্রেণীবন্ধনের প্রতি অনুরক্তি।

রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিতে, ঐ উভয় মানসিক বৃত্তিই একত্র সম্মিলিত হইতে পারে। হিন্দুদিগের পদ্ধতিরচনাবিষয়িনী বুদ্ধির প্রভাবে ভারত একটি কেন্দ্রবর্ত্তী শাসন-প্রণালী প্রাপ্ত হইবে। এবং ইংরেজদিগে কেজো বুদ্ধির প্রভাবে, ভারতীয় প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসন সংরক্ষিত হইবে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে, ইংরেজেরা ভারত বাসীদিগকে স্বকীয় উদ্যমশীলতা ও স্বাধীনতাস্পৃহা প্রদান করিবে। বি বর্ণভেদপ্রথা কতকটা হ্রাস ও রূপান্তরিত হইলেও উহা আরো বহুদিন স্থায়ী হইবে দরিদ্র ও অল্পশিক্ষিত ত্রিশ কোটি কৃষী কারুকরকে কার্য্যের একটা গঠন শৃঙ্খল প্রদান করিবে। যেদিন য়ুরোপীয় বণিকেরা ভারতে মজুরীর বাজার সস্তা দেখিয়া অনেকগুলি কারখানা খুলিবার জন্য ভারতী শ্রমজীবিদিগকে নিযুক্ত করিবে সেইদি একমাত্র বর্ণভেদ প্রথাই শ্রমজীবীকে র করিবে।

ইংরেজদের সাহিত্য, দর্শনশা অভিজ্ঞতাবাদ, উহাদের যাথাযথ্য, উহাদে গভীর আন্তরিকতা—হয়তো ভারতবাসী খেয়ালী কল্পনার উপর আধিপত্য লাভ করি সমর্থ হইবে। তখন আর ভারতবাসী গুণবাচক ও দ্রব্যবাচককে, অথবা বু ধারণা ও কল্পনার ছবিকে মিশাই মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিবে না। তাহা বুঝিবে যে, তথ্যের নিকট অতীব সূক্ষ্ম যুক্তি পরাভূত হয় এবং তথ্য-ভিত্তি-বিরহিত মনগড়া সাধারণ সিদ্ধান্তগুলা সময় কাটাইবা উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রও একটু পরিবর্ত্তি হইবে। সম্ভবত য়ুরোপের প্রভাবে ভার বাসীগণের কর্ম্মে অভিরুচি হইবে, ব্যবহারি জীবনের কাজ সম্বন্ধে একটা সহজ বু

ংগঠন হইবে। পঞ্জাবী, মারাঠী, তামুল প্রভৃতি সকল জাতি কর্ম্মিষ্ঠ তাহারা আরও কর্ম্মিষ্ঠ হইবে। গুজরাটীরা এখনই ত বাণিজ্য-কুশলতার পরিচয় দিয়াছে। বাঙ্গালীদের এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যামূলক ব্যবসায় ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ের প্রতি বড় একটা অনুরাগ দেখা যায় নাই। বহুকাল হইতে সুসভ্য হিন্দুস্থানীরা স্বকীয় বলবীর্য্য ও প্রখর বুদ্ধি হারাইয়াছে।

বর্ত্তমানে সমস্ত জনসমাজের যেটি পরিচায়ক লক্ষণ, সেই লক্ষণটি নব্যভারত-সমাজেও বর্ত্তাইবে;—সেই লক্ষণটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এই সম্বন্ধে ভারতবাসীর আর কিছুই করিতে হইবে না, উহাদের বর্ত্তমান প্রভুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেই হইবে। ভারতবাসীরা এই কথাটা মনে মনে একবার ভাবিয়া দেখুক, কি করিয়া এক লক্ষ লোক,—ত্রিশ কোটি লোককে, বাঙ্গালীর ন্যায় বুদ্ধিমান জাতিকে, রাজপুত পঞ্জাবী প্রভৃতির ন্যায় লড়াকা জাতিকে অনায়াসে শাসন করিতেছে! তাহারা তখন বুঝিতে পারিবে,—প্রধানিষ্ঠ পুরাতন সমাজ বা মণ্ডলী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট নবীন সমাজকে কখনই প্রতিরোধ করিতে পারে না। তবে, এই নবীন সমাজের অনুকরণ করিলে আপাতত উহারা মানসিক ও নৈতিক নিজত্ব হারাইবে এবং আর্থনৈতিক হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু ইহাও উহারা বুঝিতে পারিবে যে, জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত শুধু সিদ্ধান্ত-মূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কোন কাজেরই নহে। আসলে জ্ঞানশিক্ষার দ্বারাই চারিত্র গঠিত হয়। প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকৃত আত্ম-সংযমের শিক্ষা দেয়, আইনকে সম্মান করিতে, স্বনির্ব্বাচিত অধিনেতাদিগকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেয়, এবং প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রকৃত ঐক্যবন্ধনের শিক্ষা দেয়; উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতির একান্ত অনুগত হইতে, স্বাধীনভাবে-অঙ্গীকৃত বাক্য পালন করিতে, আপনার প্রতি সম্মান করিতে এবং আত্মসম্মানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেয়।

সমাপ্ত *

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাল-বৈশাখী

চোদ্দ

শ্রীর কথা

জানিনে বাপু, মনটা কেন এমনধারা ধুক্‌ধুক্ করছে! ওঁর সঙ্গে ভালো করে' কথা কইতে কেমন-যেন বাধো-বাধো ঠেকছে, থেকে-থেকে কথা কইতে কইতে পালিয়ে আস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, প্রাণের ভিতরটা মাঝে-মাঝে অকারণে কেঁদে-কেঁদে উঠছে!—কেন এমন হচ্ছে?

* Dela Mazeliere প্রণীত "ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ" নামক এই ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ ১৩১৮ সন বৈশাখ মাসের "প্রবাসী" পত্রে প্রথম আরম্ভ হয়।

সত্যি-সত্যি, এত লুকোচুরি আমার ভালো লাগ্‌ছে না! স্বামীকে চিরদিন আমি দেবতার মত দেখি, আমার মনের একটা কথাও তাঁর অজানা নেই, আর আজ আমি তাঁকেই বশ করবার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরের লোকের কাছে হাত পেতে ওষুধ মেগে নিয়েছি! নিশ্চয় এতে আমার পাপ হয়েছে, আর সেইজন্যেই মনটা খারাপ হয়ে আছে!

বাস্তবিক, ঠাকুরপো আমার কোথাকার কে? দুদিন আগে তাঁকে জানতুম না চিনতুম না, আমার বিয়ের দিন শত্রুর মত তিনি আমাদের গলায় ছুরি বসাতে চেয়েছিলেন,—তাঁর সঙ্গে পরিচয় ত এইটুকু! আর আজ তিনি আমার এমন কী আপনার লোক হয়ে পড়লেন যে, স্বামীকে লুকিয়ে তাঁর কাছে সব প্রাণের কথা খুলে বল্‌ছি?

আমারি-বা হ'ল কি? স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষের সঙ্গে মরে গেলেও কথা কইতে পারতুম না, উনি এজন্যে কত কথা বলেছেন, কত রাগ করেছেন, তবু আমি কোনদিন ওঁর কথা ভুলেও কাণে তুলি নি! অথচ আজ আমিই কিনা লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে এই নতুন লোকটির সঙ্গে মেলামেশা করছি, এর কথায় কলের পুতুলের মত উঠ্‌ছি-বস্‌ছি! এটা কি ঠিক হচ্ছে?

ঠাকুরপো নিশ্চয় গুণ-টুন কিছু জানে! আমি ত কোন্ ছার, বনের পশুকেও বোধহয় ও বশ করতে পারে! নৈলে এমন করে' আমাকে ভুলিয়ে দেয়!

কিন্তু এক-একদিন কেন জানিনা, ঠাকুরপোকে আমার যেন কেমন-কেমন মনে হয়! সময়ে সময়ে—আমি যখন পিছন ফিরে থাকি—ঠাকুরপো কি-একরকম চোখ করে' আমার দিকে তাকিয়ে থাকে; হঠাৎ সাম্‌নে ফিরে আমি সেটা দেখ্‌তে পাই, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরপোর চোখের ভাবও অম্‌নি আবার সহজ হয়ে আসে! সে সময়ে আমার বুকটা যেন শিউরে ওঠে, পুরুষের চোখে ও-রকম ভাব দেখলে আমার বড় ভয় হয়!.....কেন, ঠাকুরপোর চোখ অমন হয় কেন? সাম্‌না-সাম্‌নি এক রকম, পিছনে আর-একরকম, এর কারণ কি?

কারণ যাই হোক্, ঠাকুরপোর সঙ্গে আর এত-বেশী মেলা-মেশায় দরকার নেই বাপু, মেয়ে-মানুষের সুনাম কয়লার লেখার মত,—জলের এক ঝাপ্‌টায় তা মুছে যায়, কিন্তে কি হয় বলা ত যায় না!.....এখনি ত আমি শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছি,—স্বামীকে সন্দেহ করে' লুকিয়ে ঠাকুরপোর কাছ থেকে ওষুধ নিয়েছি,—এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে ওঁর সাম্‌নে আমি মুখ দেখাব কেমন করে'?—বাঁধন যাতে আরো-বেশী শক্ত না হয়ে ওঠে, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করতে হবে।

আচ্ছা, এ-সব ওষুধ-বিষুধ কি সত্যি, না কেবল কথার কথা? ঠাকুরপো যদি এগুলি জানে, পরের স্বামীকে অনায়াসে বশ করিয়ে দিতে পারে, তাহলে সে নিজের বউকে বাগ মানাতে পারছে না কেন? তার বউটির মন ফেরালেই ত আমি-বেচারী রেহাই পাই, আমার স্বামীরও মন ভালো হয়, ওষুধের জন্যে আমাকেও আর ভেবে মরতে হয় না! হ্যাঁ, আজ ঠাকুরপো এলে বল্‌ব, আগে তোমার নিজের ঘর সাম্‌লাও, তাহলেই আমার স্বামীর মন ফিরবে!... ... ...

ওকি, ওকে! ও আমাদের বাড়ীতে কেন? অ্যাঁ, ওর ত বুকের পাটা কম নয়, বাড়ী বয়ে ও এসেছে কিনা—

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম! সে আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার মুখের পানে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে, একটুখানি হেসে বল্‌লে, "আপনি ত পুরন্দর বাবুর স্ত্রী?"

আমি আড়ষ্টভাবে ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

—"আপনার সঙ্গে আমার কখনো আলাপ করবার সুবিধে হয় নি, আপনি আমাকে চেনেন ত?"

আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। মনে মনে বল্‌লুম, 'তোমাকে আবার চিনি না—খুব চিনি! এত-বেশী চিনি যে জীবনে কখনো ভুল্‌ব না!'

সে আবার হেসে বল্‌লে, "আপনার মুখ দেখে মনে হচ্চে, আমাকে দেখে আপনি ভারি ভয় পেয়েছেন! কেন বলুন দেখি? আমি কি মানুষ নই? বিশ্বাস যদি না হয়, আমার গায়ে বরং হাত দিয়ে দেখুন, আমার দেহের কোন-খানটা মোটেই রাক্ষসীর মত নয়—আমি ঠিক আপনার মতই জলজ্যান্ত মানুষ!"—এই বলে সে আমার হাত ধর্‌লে!

আমি কি কর্‌ব—কি বল্‌ব ভেবে না পেয়ে যেমন ছিলুম, তেম্‌নি চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, ধীরে ধীরে বল্‌লে, "বোন, আমাকে দেখে তুমি যে কেন এমন জড়সড় হচ্চ তা আমি বুঝেচি। কিন্তু ভাই, এতবড় দুনিয়ায় এত-রকমের লোক অবস্থার ফেরে পড়ে' সবাই কিছু নির্ভুল কাজ করতে পারে না। ভুল-ভ্রান্তি অনেক হয়! পড়তে পড়তে মানুষ যেমন চল্‌তে শেখে, আমরাও অনেকে তেম্‌নি আগে ভ্রম না করে' ভ্রম সংশোধন করতে পারি না! এটা আমাদের দুর্ব্বলতা, কিন্তু যারা দুর্ব্বল, তারা কি তোমাদের কাছ থেকে একফোঁটাও দয়ার আশা কর্‌বে না?"

এমন দুঃখিত ভাবে সে এই কথাগুলি বল্‌লে, যে আমিও দুঃখিত না হয়ে থাক্‌তে পারলুম না। সে যে কত-বড় অন্যায় কাজ করেছে, এটা সে বুঝতে পেরেছে দেখে তার উপর থেকে আমার রাগ অনেকটা কমে এল।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "পুরন্দর বাবুর অসুখ হয়েচে, না?"

—"হ্যাঁ।"

—"এখন কেমন আছেন?"

—"জ্বরটা নেমে এসেচে।"

—"তিনি কোথায়?"

—"ঐ ঘরে।"

—"আমি তাঁর সঙ্গে একটিবার দেখা কর্‌ব। তোমার কি আপত্তি আছে, ভাই?"

এই দেখা-করার কথাটা আমার কিন্তু ভালো লাগল না। এত কথার পর আবার দেখা-করার কথা কেন? একবার যখন ভুল হয়েছে, আবার ভুল হ'তে কতক্ষণ!

সে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি ভাবছি দেখে সে একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "ভেবনা ভাই, ভেব না! আমি বাড়ী বয়ে তোমার স্বামী চুরি করতে

আসি-নি! নেহাৎ যদি বিশ্বাস না কর, এই-খানেই না-হয় তুমি ঘাটি আগলে পাহারা দাও, সন্দেহ হ'লেই আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পার্‌বে।"

আমি লজ্জা পেয়ে বল্‌লুম, "ঐ পথ দিয়ে গেলেই ওঁর ঘরে যেতে পারবেন।"

কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বের করে' সে বল্‌লে, "দেখ বোন, ততক্ষণে তুমি এই চিঠিখানা বসে বসে পড়ে ফেল। সব কথা মুখে বল্‌বার সুবিধে হবে না ভেবে এই চিঠিখানা আমি লিখে রেখেচি। জেন, এর প্রত্যেক কথাটি সত্য। অবিশ্বাস কর্‌লে তোমারি অমঙ্গল হবে। তোমার মুখ চেয়ে, এই চিঠির কোন কথা আমি তোমার স্বামীকে জানাব না—সেজন্যেও কিছু ভেব না। এই নাও।"

আমি হাত পেতে চিঠিখানা নিলুম, সে আমার স্বামীর ঘরের দিকে চলে গেল।

হঠাৎ এ কিসের চিঠি? আর আমাকেই বা লেখবার উদ্দেশ্য কি? ভারি আশ্চর্য্য হয়ে পত্রখানা খুলে পড়লুম ঃ—

"প্রিয় ভগ্নী!

আমার সঙ্গে তোমার কোন পরিচয় নেই, অথচ গায়ে পড়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখছি দেখে তুমি বোধহয় বিস্মিত হবে। কিন্তু তোমার মাথার উপর যে বিষম বিপদ ঝুলছে, সেটা তোমাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই পত্র লেখার দরকার হয়েছে।

ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারি-নি; তবে কতক কতক আন্দাজ করে' যেটুকু মনে হয়েছে, কোনরকম আড়ম্বর না করে সেটুকু তোমাকে আমি বল্‌ছি, শোন। যা বল্‌ব, সংক্ষেপেই বল্‌ব, কারণ গুছিয়ে-গাছিয়ে সমস্ত খুলে বল্‌বার সময় বা মনের অবস্থা এখন আমার নেই।

আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসেন না, কিন্তু তিনি বোধ হয় তোমাকে..... তবে, তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে তোমার স্বামী বাধার মত দাঁড়িয়ে আছেন বলে', খুব সম্ভব তিনি সেই বাধা দূর কর্‌তে চান। আমার এতটা আন্দাজ কর্‌বার কারণ, আজ সকালে তিনি তোমাদের বাড়ীতে পাঠাবার জন্যে যে অ্যারারুট তৈরি করেছিলেন, তাতে বিষ মেশানো ছিল! সেই অ্যারারুট আমি একটা ইঁদুরকে খাইয়ে দেখেছি,—ইঁদুরটা মরে গেছে!

অ্যারারুট তৈরি করে'ই আমার স্বামী নিশ্চয়ই সেটা তোমাদের বাড়ীতে তখনি পাঠিয়ে দিতেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ কোন রোগীর বাড়ী থেকে কে তাঁকে ডাকতে এল, তিনি তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে নীচে নেমে গেলেন। সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকে বিষাক্ত অ্যারারুটটা আমি সরিয়ে ফেল্‌লুম। ষ্টোভের উপরে তখনো খানিকটা ভালো অ্যারারুট ছিল। খালি বাটিটা ধুয়ে বাকি অ্যারারুটটা আমি তার ভিতরে ঢেলে রেখে চলে আসি। আমার স্বামী কিছুমাত্র সন্দেহ না করে' সেই অ্যারারুটটাই তোমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যাঁর জন্যে বিষ তৈরি করা হয়েছিল, দৈবগতিকে তিনি এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা সাবধান হও! কারণ এবারে দৈব তোমাদের বিরুদ্ধে হ'তে পারে। আমিও আর এখানে থাকব না—আজই আমার বিদায় হওয়ার কথা।

আর এক কথা। কথাটা আমার লজ্জার কথা, ভ্রমের কথা। কিন্তু আমার সামান্য লজ্জা বা ক্ষণিক ভ্রমের জন্যে যে তুমি তোমার স্বামীর প্রতি চিরকাল একটা অন্যায় সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করবে, স্বামীভক্তি হারিয়ে আপনার সারাজীবন ভারবহ করে' তুল্‌বে, এ ত কখনি হ'তে পারে না! নিজের মুখ পুড়িয়েছি, এখন তোমাদের সুখেও বাধা দিলে আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না!

বোন, কাল রাতে আমার স্বামীর সঙ্গে তোমাকেও আমি তোমাদের ছাদের উপরে দেখতে পেয়েছিলুম। ঠিক জানিনা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার স্বামীই তোমাকে ছাদের উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন! আমাদের বাড়ীর ছাদের উপরকার দৃশ্য দেখে, তুমি যাতে তোমার স্বামীর উপরে ভক্তি-ভালোবাসা হারাও, এইটেই বোধহয় আমার স্বামীর মনের ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু তুমি যা দেখেছ, যা ভেবেছ, যা বিশ্বাস করেছ—সব ভুল, সব ভুল! সুধু চোখে দেখে, কাণে কিছু না শুনে সব সময়ে সব কথা বিশ্বাস কোরো না! ভীরু মানুষ স্বচক্ষে ছায়া দেখেও ভূত মনে করে, তোমার সন্দিগ্ধ চোখও তেম্‌নি তোমার স্বামীর বাইরের ভাবভঙ্গি স্বচক্ষে দেখেও যথার্থ সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে আছে।

স্পষ্ট করে' আমি আর কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না—আমার লজ্জা করছে! পাপ কর্‌তে আমার লজ্জা হ'ল না—সে পাপ স্বীকার কর্‌তে আমার এত লজ্জা কেন? এই কি পাপীর লক্ষণ?

তবু বল্‌তে হবে!..... .....তোমার স্বামী নিষ্পাপ দেবতা, তিনি আমাকে কখনো কু-দৃষ্টিতে দেখেন-নি—কালও না। আমিই আগে তাঁকে.....

কিন্তু তিনি আমার ভ্রম ভেঙে দিয়েছেন। তিনি আমাকে পাপী বলে' ত্যাগ করেন-নি, তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন—কিন্তু মা বলে ডেকে!

সেই এক মাতৃসম্বোধনে আমার পাপী প্রাণ আজ অনুতাপে হাহাকার করে' কাঁদছে। উপন্যাসে-নাটকে চরিত্র পরিবর্ত্তন অনেক পড়েছি, কিন্তু বাস্তব জীবনেও এক মুহূর্ত্তে এমন পরিবর্ত্তন যে সত্যই সম্ভব, আগে তা জানতুম না। ভগ্নী, তোমার স্বামী কাল আমার নারীত্বকে কলঙ্ক-সাগর থেকে উদ্ধার করেছেন।

বিশ্বাস কর না-কর—এই আমার শেষ-কথা। আর আমার কিছু বলবার নেই। আজীবন স্বামীর পায়ে তোমার সেবার পূজার অধিকার থাক্—সর্ব্বশেষে এই কামনা করে' তোমাদের কাছ থেকে আমি চিরবিদায় গ্রহণ কর্‌ছি। তোমাদের পথে আর-কখনো আমি পায়ের দাগ ফেল্‌ব না। ইতি

অভাগী প্রভা

পুঃ। হ্যাঁ, এখনো একটু বাকি আছে—মনের ঝোঁকে সে কথাটা বল্‌তে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। আমার স্বামীকে স্পষ্ট জানিও যে, তুমি সব জেনেছ, কিন্তু তোমার স্বামীকে কিছুই জানিও না। এ নিয়ে আর গোলমাল করে' ফল নেই—অতীতের গেল-দিন ক'টা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেও।"

... ...

চিঠিখানা আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

আগাগোড়া পড়লুম! একবার পড়া সাঙ্গ হয়ে গেল, আবার পড়লুম—আবার পড়লুম—আবার পড়্লুম!.....এখনো মনে হচ্ছে, আমি জেগে নেই!

জোর করে' আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম—কিন্তু তখনি আবার ঘুরে মেঝের উপরে পড়ে গেলুম! একি সত্যি—একি সত্যি? হে ঠাকুর, হে মা দুর্গা, এতদিন কি মিছেই আমি তোমাদের পূজা করেছি?

বুকের মাঝে যেন দাউ-দাউ করে' আগুন জ্বলে উঠ্ল—মনে হ'তে লাগল, আমি যেন নরকের ভিতরে পড়ে আছি—চোখের সাম্নে খালি অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে কারা যেন তীরের মত ছুটে আস্ছে—তাদের রং যেন অন্ধকারের চেয়ে আরো কালো, তাদের চোখ যেন উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলন্ত, তাদের লম্বা লম্বা হাত যেন চারিদিক থেকে আমাকেই খুঁজছে! ওগো মা, ওগো মা, আমার একি হ'ল! কে আমাকে বাঁচাবে—কে আমাকে নরক থেকে উদ্ধার কর্বে—মাগো, ওমা!

হঠাৎ কে আমার গায়ে হাত দিলে! ভয়ে আমার আগাপাশতলা ছম্ছমিয়ে উঠল, চম্কে দু-হাতে ভর্ দিয়ে ফিরে দেখি,—আবার তিনি!

তাঁর কোলের ভিতরে মুখ গুঁজে পড়ে ডুকরে কেঁদে বলে' উঠলুম, "হ্যাগা, বল—সত্যি করে' বল, স্বামীকে আমি কি নিজের হাতেই বিষ খাইয়েচি?"

কোমল স্বরে তিনি বল্লেন, "না ভাই, ভগবান তোমাকে সে মহাপাপ থেকে রক্ষা করেচেন—তোমাকে ত আগেই আমি বলেচি, অ্যারারুটে বিষ ছিল না!"

—"কিন্তু তোমার স্বামী ত বি
করেই সে বাটিটা আমাকে দিয়েছি
আর আমিও সেই—"

—"অতটা ভেবে নিয়ে মিয়ে
খারাপ কোরো না! তার চেয়ে এখন নি
সাম্লাবার চেষ্টা কর, তুমি এখন শ
হ'লে সবদিক নষ্ট হয়ে যাবে। ওঠ
ওঠ, এমন করে' পড়ে থাক্তে নেই—
এই বলে' তিনি আমাকে ধরে আস্তে
দাঁড় করিয়ে দিলেন।

কিন্তু আমার শক্তি কে যেন এ
হরে' নিয়েছিল, দাঁড়াতে আমি পারলু
একখানা চৌকির উপরে অবশ হয়ে
বসে পড়লুম।

খানিকক্ষণ নীরবে আমার দিকে
থেকে, ধীরে ধীরে তিনি দরজার দিকে
হলেন—কিন্তু হঠাৎ তাড়াতাড়ি পিছুয়ে
অস্ফুট স্বরে বলে' উঠলেন, "ঐ আমার
আসচেন!... ... সাবধান!"

আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল
রাক্ষস যদি আবার আমাকে একলা
তাহ'লে আমি আর বাঁচব না! ছুটে
প্রভার দু-হাত চেপে ধরে কাতরভাবে
বল্লুম, "ও দিদি, তুমি যেও না—ও
তুমি যেও না!"

তিনি আমার দিকে তাঁর ম্লান মুখ
ফিরিয়ে বল্লেন, "কিন্তু আমি আর
কি কর্ব ভাই?"

—"তোমার স্বামীকে চলে যেতে
আমি আর ওর সঙ্গে দেখা কর্তে চাই না
বল্তে বল্তে বিনোদ এসে ঘরের মধ্যে
পড়ল। ঢুকেই সাম্নে প্রভাকে

মুকে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে,
? তুমি! এখানে তুমি?"
মীকে দেখেই প্রভার ধরণ-ধারণ সব
গেল! আমাকে আড়াল করে' দাঁড়িয়ে
কিয়ে সে বল্লে, "হ্যাঁ আমি। আমায়
ত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন?"
"তুমি যে এখানে আস্বে তা আমি
কার-নি। বৌদিদির সঙ্গে তোমার
কবে আলাপ হ'ল?"
"আজ।"
"আজ! হঠাৎ এতদিন পরে তোমার এ
'ল কেন?"
"কেন তা শুন্লে তুমি চম্কে যাবে!"
"বটে! কিন্তু এত অল্পে ত চম্কানো
র স্বভাব নয়, তা তুমি জানো ত?"
"তাই নাকি? তোমার হাতের ঐ
ঐ অ্যারারুটে কি মেশানো আছে,
থা বল্লেও তুমি চম্কে যাবে না?"
আমার বুক শিউরে উঠল! কি ভয়ানক,
ণ আমি দেখ্তে পাই-নি—বিনোদের
সত্যি-সত্যিই যে একবাটি অ্যারারুট!
কে চেয়েই আমি চেঁচিয়ে কেঁদে ফেল্লুম
য়ে আমার প্রাণ যেন উড়ে গেল!
বিনোদ একবার আমার দিকে, আর-
ার তার স্ত্রীর দিকে অবাক হয়ে
য়ে দেখ্লে। তারপর বল্লে, "কি বলচ
?"
"বল্চি তোমার ঐ অ্যারারুটে বিষ
নো আছে!"
বিনোদের হাত থেকে খসে, ঝন্-ঝন্
অ্যারারুটের বাটিটা মেঝের উপরে পড়ে
! পিছনে হটে গিয়ে, দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে
দাঁড়িয়ে সে স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল!

উঃ! সে ত চোখ নয়—যেন দু-টুক্রো জলন্ত কয়লা! তাড়াতাড়ি আমি প্রভার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে দাঁড়ালুম!

খানিক এম্নি চুপচাপ থাকার পর বিনোদ বল্লে, "প্রভা, তুমি কি পাগল হয়েচ? এ-সব কি কথা?"

—"পাগল আমি হই-নি, পাগল হয়েচ তুমি। নইলে সহজ মানুষ কখনো এমন কাজ কর্তে পারে?"

—"কাজ! কি কাজ? তুমি যা বল্চ সব মিছে কথা!"

—"মিছে কথা! বটে! তাহলে মিছে কথা শুনে তোমার হাত থেকে ভয়ে ও-বাটিটা পড়ে গেল কেন?"

বিনোদ হা হা করে' হেসে উঠল! বল্লে, "ভয় কর্ব কাকে প্রভা? তোমাকে?"

—"আমাকে নয়—ভয় কর তুমি সত্যি কথাকে!"

বিনোদ হঠাৎ গলাটা খুব গম্ভীর করে' বল্লে, "প্রভা, তোমার এ-সব হাসি-ঠাট্টা আমার ভালো লাগ্চে না,—যাও, বাড়ী যাও!"

—"বাড়ী কোথায় আমার? তুমি ত সেখান থেকে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছ!"

—"আঃ! কী যে বাজে বক্চ—তুমি কি ঠাট্টা বোঝ না? বাড়ী থেকে তোমায় আমি তাড়িয়ে দিতে যাব কেন? যা নয় তাই বল্লেই হ'ল! যাও, বাড়ী যাও!"

—"না। এ-জীবনে তোমার বাড়ীতে আর আমি ঢুক্ব না!"

চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে বিনোদ বল্‌লে, "তবে তুমি চুলোয় যাও! তোমার মত স্ত্রীকে বাড়ীতে যেতে বল্‌চি এই ঢের! তুমি যে বাড়ীতে থাকবার যোগ্য নও, বৌদিও তা জানেন। ছাতের ওপরে তোমাদের অভিনয় বৌদি কাল স্বচক্ষে দেখেচেন। নিজের পাপ ঢাক্‌বার জন্যে তুমি এসেচ উল্‌টে আমাদের চোখ রাঙাতে? তোমার মত পাপিষ্ঠার কথায় বিশ্বাস করে কে? আমি ত করিইনা, বৌদিও কর্‌বেন না! না বৌদি?"

আমি শুক্‌নো গলা টেনে টেনে স্পষ্টাস্পষ্টি বল্‌লুম, "আপনার স্ত্রীর কথায় আমি বিশ্বাস করি।"

বিনোদ থতমত খেয়ে অবাক হয়ে রইল।

প্রভা বল্‌লেন, "এখন শুন্‌লে ত? আর মিছে চেষ্টা, ভগবানের রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না। বাড়ীতে পুরন্দর বাবু আছেন, এখনি তিনি সব শুনতে পাবেন, —তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। তার চেয়ে কেউ কিছু জানবার আগে এইবেলা তুমি সাবধান হও, এখান থেকে চলে যাও, আর এখানে এস না।"

প্রভার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বিনোদ বল্‌লে, "আবার তুমি আমাকে মিছে ভয় দেখাচ্চ! আমি কি করেচি যে, এখান থেকে চোরের মত চলে যাব?"

—"না, তুমি চোরের মত যাবে না— এখান থেকে তুমি খুনীর মত যেতে চাও, নয়? এখনো তুমি লুকোচুরি কর্‌চ, এখনো আমার কথা মান্‌তে চাইচ না! অথচ আজ সকালে তোমাকে আমি স্বচক্ষে অ্যারারুটে বিষ মেশাতে দেখেচি!"

—"তাই যদি হবে, তবে সে অ্যারারুট খেয়ে পুরন্দরের কোন অনিষ্ট হয়-নি কেন? এইখানেই ত প্রমাণ হচ্চে, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌চ!"

—"সে বিষাক্ত অ্যারারুট ফেলে দিয়ে বাটিতে আমি ভালো অ্যারারুট ঢেলে দিয়েছিলুম, তাইতেই তোমার—"

প্রভার কথা শেষ না হ'তেই বিনোদ ঠিক বিদ্যুতের মত আচম্‌কা, তাঁর গায়ের উপরে লাফিয়ে পড়্‌ল! ভয়ে আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম—সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ক্রুদ্ধস্বর শুন্‌লুম, "বিনোদ! বিনোদ! এ কি ভয়ানক কাণ্ড!"

এ আমার স্বামীর গলা!

পনেরো

পুরন্দরের কথা

ভগবান, আমার এ ওষ্ঠাধর এখনো যেন কি-এক অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে! মানুষকে তুমি শ্রেষ্ঠজীব করে' সৃষ্টি করেছ—অথচ তার মনের মধ্যে দুরন্ত পশুর মত অশান্ত, এমন-এক জলন্ত লালসাকে পূরে রেখেছ কেন? তোমার এই সুন্দর সৃষ্টিতে, এই উদার আকাশের ছায়ায়, এই স্বাধীন বাতাসের পবিত্র স্পর্শে এই উদয়-অস্তের চিরন্তন খেলায় চন্দ্র-সূর্য্যের লীলায় আলোক-আঁধারের অবিরত আবর্ত্তনে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের বিচিত্র প্রকাশে মানুষ কেন আপনার দীনতা-হীনতা ভুল্‌তে পারে না— কেন সে শ্রেয় হ'তে গিয়ে হেয় হয়ে পড়ে— কেন সে উচ্চ আদর্শকে ব্যর্থ করে' দেয়! এই যে পদে পদে অন্ধকারের ঝড় উঠে পথের উপর থেকে ধ্রুবতারার আলো একটু

ফুৎকারে নিবিয়ে দিচ্ছে, এর-মধ্যে তোমার কোন্ মঙ্গল-ইচ্ছা গোপন হয়ে আছে? আপনাকে সংবরণ কর্‌তে না-পেরে বিশ্বের শত-সহস্র আত্মা এই-যে দিবা-রাত্র হাহাকারে ফেটে মর্‌চ্ছে, এ গভীর হাহাকার কি তোমার শান্তিকে বিক্ষুব্ধ করে' তুল্‌ছে না?... ...হে রহস্যময় মহাদেব, তোমার এই বিরাট গুপ্ত কথা কি কোনদিনই আমরা বুঝতে পার্‌ব না?

বাস্তবিক, প্রভার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করেছি, তার চরিত্রের কত দিকই আমার চোখে পড়েছে, কিন্তু তবু ত তার মনের তলে গিয়ে কোনদিনই পৌঁছতে পারি-নি! বাইরে তার চোখের কোণে সামান্য-একটু ইঙ্গিতও যদি কোনদিন পেতুম, তাহ'লেও আমি যে আগে-থাক্‌তে সাবধান হ'তে পার্‌তুম! কোন-রকম পূর্ব্বাভাস না-দিয়ে মানুষের মন যে এত সহসা আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!

কিন্তু প্রভার এই আচরণের জন্যে বোধ হয় বিনোদই বেশী দায়ী। প্রভার মুখেই যতদূর শুনলুম তাতে বেশ বুঝলুম, বিনোদ তাকে ভালোবাসে না, তার উপরে অত্যাচার করে, তাইতেই তার মন ক্ষুধিত হয়ে উঠেছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে! যৌবন আশ্রয় চায়, কোমলতা চায়, প্রেমের পূর্ণতা চায়—প্রভার যৌবন যে এর কিছুই পায়-নি! যৌবন হচ্ছে অধীর ও অদূরদর্শী;—তার ধৈর্য্য নেই, সহ্য কর্‌তে সে জানে না! প্রভার কাল্‌কের ব্যবহারে যৌবনের এই দুর্নিবার ধর্ম্মই বোধহয় প্রকাশ পেয়েছে, সে যা করেছে, বোধহয় তা আকস্মিক ভাবের আবেগে অভিভূত হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই করে' ফেলেছে। একটা কিছু করে' ফেলে পরে অনুতপ্ত হওয়া— যৌবনের এও একটা মস্ত লক্ষণ! হয়ত প্রভা এতক্ষণে নিজের ভ্রম বুঝে অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে।.....

দরজার কাছে একটা শব্দ হ'ল। মুখ তুলে দেখি, প্রভা!

তার মুখ কি ম্লান, চোখ কি করুণ! মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে, জড়সড় হয়ে সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল—যেন একখানি সলজ্জ বিষাদ-প্রতিমা!... ...কাল রাত্রে সেই অশুভ মুহূর্ত্তে তার চোখে-মুখে যে উদ্দাম ভাব, যে প্রচণ্ড তৃষা ফুটে উঠেছিল, তার সঙ্গে আজ্‌কের এ মূর্ত্তিতে কী তফাৎ, কী তফাৎ!

আশ্চর্য্য! মানুষের এই নিত্য-দৃষ্ট সাধারণ মুখ ক্ষণিক ভাবের পরিবর্ত্তনে কতটা অসাধারণ হয়ে ওঠে!

শুয়ে ছিলুম, তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লুম। প্রভা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখেই ঘাড় হেঁট কর্‌লে। আমি হাত বাড়িয়ে তার হাত ধর্‌লুম—তার হাত কাঁপ্‌তে লাগল! ধীরে ধীরে বল্‌লুম, "এস প্রভা, বোসো। কাল্‌কের জন্যে আজ যে তুমি কষ্ট পাচ্চ, তোমার মুখ দেখেই আমি তা বুঝেচি। আজ তোমার হাসিমুখ দেখ্‌লে আমি দুঃখিত হতুম, কিন্তু তোমার মলিন মুখ আজ আমাকে আনন্দিত করেচে। তোমার ভ্রমের কথা ভুলে যাও, এস, আমরা কের আগেকার মতই প্রাণ খুলে আবার কথাবার্ত্তা কই।"

প্রভা কেঁদে ফেল্‌লে!

আমি হাত ধরে' তাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে বল্‌লুম, "প্রভা, চোখের জল মোছ। এখনি শ্রী এসে পড়্‌তে পারে।"

প্রভা আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে বল্‌লে, "আপনি এখন কেমন আছেন?"

—"বেশ ভালোই আছি প্রভা! কাল রাতে হঠাৎ একটু জ্বর এসেছিল, এখনি কমে গেছে—দুদিনেই সব সেরে যাবে।"

প্রভা অল্পক্ষণ চুপ করে' বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লে, "পুরন্দরবাবু, আমি যা জান্‌তে এসেছিলুম তা জান্‌লুম। আপনি যে আমাকে ক্ষমা করেচেন, আপনি যে চিরকাল আমাকে ঘৃণা কর্‌বেন না—এটুকু জেনেও আমি এখন অনেকটা শান্তি পেলুম। আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।" এই বলে' প্রভা উঠে দাঁড়াল।

—"প্রভা, ঘৃণা আমি কারুকে কর্‌তে পারি না—অতি-বড় শত্রুকেও না। এ পৃথিবী হচ্চে মানুষেরই স্বদেশ, মানুষের প্রতি ঘৃণা থাকলে এখানে বাস কর্‌ব কেমন করে' বল দেখি?"

—"কিন্তু আমার মত পাপীকে ঘৃণা না কর্‌লে পাপকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হবে,—পাপী যে ঘৃণার পাত্র।"

—"না, পাপীও মানুষ, মানুষ কখনো ঘৃণিত নয়—ঘৃণিত তার পাপ। সকল মানুষেরই মনের ভিতরে পাশাপাশি ভগবানের আর সয়তানের বাস আছে। সেই সয়তানকে ত্যাগ কর্‌ব বলে আমরা যদি গোটা মানুষটাকেই ত্যাগ করি, তাহলে সেইসঙ্গে ভগবানকেও যে ত্যাগ করতে হবে! না প্রভা, এ ঠিক নয়,—যে পাপ করে, তাকে একেবারে ছেড়ো না! তাকে গ্রহণ কর্‌বে, পাপের প্রতি তার নিজেরও যাতে ঘৃণা জন্মে, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করবে। দৈবগতিকে একবার পাপ করে' চিরকাল ঘৃণিত হয়ে থাকে বলে'ই পাপী আর ইচ্ছে থাক্‌লেও ভয়ে সমাজে ফির্‌তে পারে না! এতে পাপীরও ক্ষতি, মানুষেরও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি! এটা আমরা বুঝি না বলে'ই সমাজে পাপের সংখ্যা নিত্যই বেড়ে চলেচে!"

—"আপনার এই উদার মন আমাকে পতন থেকে রক্ষা করেচে, এর-জন্যে চিরকালই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব—আপনার শিক্ষা জীবনে কখনো ভুলব না। পুরন্দরবাবু, আপনাকে নমস্কার করে' এখন আমি বিদায় হই—হয়ত এ-জীবনে আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ-সাক্ষাৎ।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম! শেষ-সাক্ষাৎ! এর অর্থ কি? প্রভা যখন দরজার কাছ বরাবর গেছে, আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "শেষ-সাক্ষাৎ কেন প্রভা? তুমি কি অন্য কোথাও যাবে?"

—"হ্যাঁ। স্বামী আমাকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েচেন।"—আর একটি কথাও না বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল!

বিনোদ, বিনোদ!... ...না, এ অসহ্য, স্ত্রীর প্রতি এত অবিচার, এত অত্যাচার! কেন সে একটা জীবনকে এমনভাবে নষ্ট করে দিতে চাইছে? এতবড় নিষ্ঠুরতা ত মানুষের শোভা পায় না! সে ত চোখ বুজে বিবাহ করে নি, নিজে দেখে-শুনে যাকে বিবাহ করেছে, যার ভালো-মন্দের জন্যে সে দায়ী, সে ছাড়া যার ভিন্নগতি নেই, তাকেই কিনা সে এখন তাড়িয়ে দিতে চায়!

দুর্ভাগী প্রভার মুখ চেয়ে মনটা আমার দয়ায় ব্যথায় ভরে' উঠল। বিনোদ তাড়িয়ে

দিলে তার কি অবস্থা হবে?... ...তাইত, কি করে' এ অন্যায়কে দমন করা যায়? বসে বসে অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে শেষটা স্থির করলুম, এখনি আমার বিনোদের কাছে যাওয়া উচিত। কারুর পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমার স্বভাব নয় বটে; কিন্তু চোখের উপরে এমন দৃশ্য অটল হয়ে দেখবই বা কেমন করে'? বেচারী প্রভা! তাকে বাঁচাতেই হবে!

শরীরটা দুর্ব্বল ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি শয্যাত্যাগ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম!.....

সিঁড়ির কাছে গিয়ে নীচে নাম্‌তে যাব, হঠাৎ পাশের ঘরে বিনোদের গলা শুন্‌লুম। তারপরেই পেলুম প্রভার সাড়া! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে এমন উত্তেজিত স্বরে প্রভা কি বল্‌ছে বিনোদকে? অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালুম। ভাবলুম আর যাই হোক্, ওদের দুজনকেই যখন একসঙ্গে এখানে পাওয়া গেল তখন একরকম ভালোই হ'ল। ... কিন্তু না, একি, এ-সব কী কথা হচ্ছে! বিষ!... ...আরারুটে বিষ মেশানো হয়েছে? এ কথার মানে কি? ও আবার কি? কার হাত থেকে বাটি না কি-একটা খসে ঝন্‌ঝন্ করে' মাটির উপরে পড়ে গেল যে!

সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেলুম!... ... ... ক্রমে ক্রমে একে একে যে-সব কথা আমার কাণে আসতে লাগল, তাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধীরে ধীরে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল! এও কি হ'তে পারে? আমি ভুল শুন্‌ছি না ত? জ্বরের ঘোরে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়-নি ত?

আমার অ্যারারুটে বিনোদ বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, আর.....আর সেই বিষের পাত্র শ্রী আমার মুখের সাম্‌নে নিজের হাতে তুলে ধরেছে! বিনোদ আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, আর শ্রী আমার প্রিয়তমা স্ত্রী!... ... ... উঃ!

বুকে যেন কে শেল মার্‌লে! দু-হাতে বুক চেপে ভুঁয়ে বসে পড়লুম।

না, না,—আঃ! বাচলুম! এই যে, শ্রীও এখানে রয়েছে! শ্রীর কথা শুনে মনে হচ্ছে, নিষ্পাপ মনে সে আমাকে অ্যারারুট খেতে দিয়েছিল, বিষের কথা জান্‌ত না!—নিশ্চয়, নিশ্চয়, তা নয় ত কি! শ্রীকে আমি কি চিনি না? নির্ম্মল প্রাণ তার যূথিকার মত শুভ্র, শিশুর মত অকপট, বৃষ্টিধারার মত স্বচ্ছ, এর-মধ্যে কলঙ্কের আশ্রয় হবে কেমন করে?

কিন্তু বিনোদ,—তুমি কি? তুমি কি সত্যিই মানুষ? তাহলে মানুষের গুণ তোমাতে কোথায়? তুমি বন্ধুত্ব মান না, দয়া-ধর্ম্ম জান না, আত্মপর ভেদ রাখ না, আপন স্ত্রীকে তাড়িয়ে দাও, হাসিমুখে পরের প্রাণ নিতে চাও—এ-সব কি মানুষের লক্ষণ? ভগবানের সৃষ্টি কি এমন ভয়ানক? এত জ্ঞান-বিজ্ঞান, এত-বড় সমাজ, এতদিনের সভ্যতা, এত উচ্চ আদর্শ, এ সমস্তই কি তবে ব্যর্থ?

আচম্বিতে আমার আচ্ছন্নতা ছুটে গেল—ঘরের মধ্যে ও কার আর্ত্তনাদ! সঙ্গে সঙ্গে শ্রীর চীৎকার! কী ভয়ানক দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে ওখানে?

প্রাণপণে ছুটে তখনি ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌লুম!... ...দেখলুম বিনোদের কবলে পড়ে প্রভা ছটফট করছে!

তীরের মতন বেগে তাদের উপরে গিয়ে পড়লুম। দুহাতে বিনোদের হাত-দুখানা চেপে ধরলুম—বাল্যকাল থেকে বলবান বলে' আমার খ্যাতি আছে,—আমার হাতের চাপে বিনোদের হাত অবশ হয়ে এল, তার সে সাংঘাতিক বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে, ব্যাঘ্রমুখচ্যুত হরিণীর মত প্রভার দেহ এলিয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল!

বিনোদকে ছেড়ে দিতেই আবার সে প্রভাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল, আমি আবার তাকে বাধা দিয়ে বল্লুম, "বিনোদ, শান্ত হও—নইলে আমি দারোয়ানদের ডাকতে বাধ্য হব!"

সে পাগলের মত চেঁচিয়ে দৃপ্তস্বরে বললে, "দরোয়ান! কে তোমার দরোয়ানদের ভয় করে! ছেড়ে দাও আমাকে, ওকে আমি খুন কর্‌ব—ওকে আমি খুন কর্‌ব!"

—"স্ত্রীলোককে তুমি খুন কর্‌বে? বলতে লজ্জা হচ্চে না তোমার?"

বিনোদ আমার মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বল্‌লে, "লজ্জা! কিসের লজ্জা? স্ত্রী হোক্ পুরুষ হোক্,—যে আমার পথে এসে দাঁড়াবে তাকেই আমি খুন কর্‌ব!"

—"কেন বিনোদ, প্রভা তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করেচে?"

—"কী অপরাধ করেছে! ওর অপরাধের সীমা নেই! ও আমার সর্ব্বনাশ করেচে, আমার এতদিনের সাধনা, যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম ব্যর্থ করে' দিয়েচে, আমার প্রাণের সব আশা ওর জন্যে নির্ম্মূল হয়ে গিয়েচে, আমার প্রতিহিংসার মহাযজ্ঞ ও পণ্ড করে দিয়েচে! ওকে আমি ছেড়ে দেব? কখনো না, কখনো না!"

—"প্রতিহিংসা! বিনোদ, প্রতিহিংসা কিসের?"

ভীষণ এক মুখভঙ্গি করে' তীব্র স্বরে বিনোদ বলে' উঠ্‌ল, "বটে! তুমি কি জান না? আমার বুক থেকে শ্রীকে কে ছিনিয়ে নিয়েছিল? একসভা লোকের মাঝে কে আমার মাথা হেঁট করে' দিয়েছিল? সমাজে কার জন্যে আমাদের একঘরে হয়ে থাকতে হয়েছিল? আমার সে হতাশা, সে পরাজয়, সে অপমান লাঞ্ছনা মনস্তাপ কি ভোলবার? না, আমি তা ভুলি-নি! সেদিনের দৃশ্য এখনো আমার চোখের ওপরে দুঃস্বপ্নের ছবির মত জেগে আছে! আজ কত বৎসর প্রতিদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, সে অপমানের প্রতিশোধ না-নিয়ে আমি মর্‌ব না! প্রতিশোধ আমি নিতুমও ঠিক, কিন্তু ঐ সর্ব্বনাশী প্রভার জন্যে ঠিক শেষ-মুহূর্ত্তে আজ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েচে!"

এতক্ষণে আমি সব বুঝলুম। সেই—সেই দিনের কথা!... ...স্তব্ধ হয়ে আমি তার রুদ্ধ আক্রোশ-ভরা, ক্ষুব্ধ, বিকৃত, পাণ্ডুর মুখের দিকে নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে রইলুম! নিশ্চয় সে পাগল! সহজ মানুষের মুখ এমন হয় না!

—"আমার মুখের দিকে কী দেখ্‌চ তাকিয়ে? এতক্ষণে আজ তুমি কোথায় থাকতে জানো পুরন্দর? আমার এই পায়ের তলায়, অন্তিম নিশ্বাসের অপেক্ষায়! কাল তোমার শ্রীকে আবার আমার নিজের করে' নিতুম!"

পিছন হ'তে শ্রী আর্ত্তনাদ করে' বলে' উঠ্‌ল, "চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে! ওগো, ওকে তাড়িয়ে দাও, দূর করে তাড়িয়ে দাও!"

আমি ফিরে বল্‌লুম, "শ্রী, প্রভাকে নিয়ে তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও। প্রভার বড় লেগেচে, ওর মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিও।"

প্রভাকে নিয়ে শ্রী তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমি বিনোদের হাতে ছেড়ে দিলুম।

বিনোদ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "আমাকে নিয়ে এখন তুমি কি করতে চাও? যা করবার, শীগ্‌গির করে ফেল! তোমার চোখের সাম্‌নে এমন অসহায় খেলার পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকতে আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্চে!"

—"তোমাকে নিয়ে আমি কিছুই করতে চাই না।"

—"কী! আমি তোমার শত্রু তা জানো?"

—"না, তুমি আমার বন্ধু। তুমি রাগের মাথায় এ-কথা এখন ভুলে যাচ্চ, কিন্তু আমি ত তা ভুলি-নি! বাল্যকালে একসঙ্গে তোমাতে-আমাতে কত খেলাই খেলেচি, বড়বেলাও তোমাকে আমি সত্যিই ভালো-বেসেচি, সে-সব স্মৃতি কি হঠাৎ একদিনে ভুলে যাওয়া যায় ভাই? দোষ করেচ বলে তোমাকে আমি ত্যাগ কর্‌ব না—নিজের ভুল তুমি দুদিন পরে নিজেই বুঝতে পারবে!"

বিনোদ আমার সাম্‌নে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ, তীব্র স্বরে বল্‌লে, "আমাকে ক্ষমা করে' তুমি কি আমার পরাজয়ের গ্লানি আরো বাড়িয়ে তুল্‌তে চাও? না, সে হবে না—হ'তে পারে না! তোমার ক্ষমার ওপরে আমি পদাঘাত করি! আমি তোমার শত্রু, আমি তোমাকে হত্যা কর্‌তে চেয়েছিলুম! আমাকে তুমি পুলিসে দাও, আমাকে তুমি মারো ধর যা-খুসি কর—কিন্তু আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো না! সে অপমান আমি সইতে পার্‌ব না!"

—"তুমি আমার বন্ধু, আমার ব্যবহারকে তুমি ক্ষমা বলে' নিচ্চ কেন? বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে আলাদা।"

—"পুরন্দর, আমি তোমার শত্রু! আমাকে মুক্তি দিলেও আমি তোমার শত্রুই থাক্‌ব। ভেবনা তোমার দয়ায় ক্ষমায় ভুলে গিয়ে আমি তোমার গোলাম বনে যাব! না, তোমাদের ও-সব দুর্ব্বলতাকে আমি ঘৃণা করি—আমার ধাতু আলাদা। আমি আবার তোমাকে খুন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।"

আমি হেসে বস্‌লুম, "সে চেষ্টা ত একবার করে' দেখ্‌লে, কিন্তু সফল হ'লে কি? ভাই, মাথার ওপরে ভগবান যে নিত্যই সজাগ হয়ে আছেন—জন্ম-মৃত্যু যে তাঁর হাতেই!"

—"তুমি পুরুষের ছদ্মবেশে স্ত্রীলোক মাত্র,—নইলে ভগবান মান্‌তে লজ্জা হয় না তোমার! ধিক্, তোমাকে ধিক্! ছি ছি, তোমার মত এক অপদার্থের কাছে আমাকে কিনা হার মান্‌তে হোলো, তোমারি কাছে আমাকে কিনা ক্ষমা গ্রহণ কর্‌তে হোলো! এর-চেয়ে মৃত্যুই আমার ভালো ছিল!" এই বলে আমার দিকে আর-একবার ঘৃণাভরা দীপ্ত চোখে তাকিয়ে, বিনোদ চকিতে দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল!

জান্‌লার কাছে আমি দাঁড়িয়েছিলুম; বাইরে চেয়ে দেখি,—আকাশের তিমিরকৃষ্ণ মেঘের অরণ্য দুলিয়ে, কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত ঝড় পৃথিবীতে হুহু করে' নেমে আসছে!

বজ্রের মুহুর্মুহু অট্টহাস্যে, ভীত জীবজন্তুর ব্যাকুল চীৎকারে, ঝড়ের বিচিত্র আর্ত্তনাদে অকস্মাৎ ধরিত্রীর অন্তরাত্মা যেন ধড়্‌ফড়্‌ করে' উঠল! চক্ষু অন্ধ করে,' চক্রে চক্রে ঘূর্ণিপাক্ খেয়ে নিবিড় ধূলার রাশি উঠ্‌ছে-নাম্‌ছে-ছুট্‌ছে—নিরেট বৃষ্টিধারার মত চারিধারে সশব্দে ঝরে যাচ্ছে,—মুহূর্ত্তমধ্যে পথিকশূন্য দীর্ঘ রাজপথ বিক্ষুব্ধ ঝটিকার বিজন নৃত্য-সভায় পরিণত হয়ে গেল।... ... ...

সেই প্রলয়-অভিনয়কে অগ্রাহ্য করে' বিনোদ পথের উপরে গিয়ে দাঁড়াল, একবার ঊর্দ্ধমুখে জ্বলন্ত চক্ষে ঘনঘন বিদ্যুৎবিদীর্ণ উচ্ছৃঙ্খল আকাশের এধার-থেকে-ওধার পর্য্যন্ত চেয়ে দেখ্‌লে,—তারপর মাথা নামিয়ে, আর-কোনদিকে না-তাকিয়ে, সুমুখের রাস্তা ধরে হন্‌হন্ করে' সমান চল্‌তে লাগল অটল পদে, অনায়াসে,—ঝঞ্ঝার শরীরী মূর্ত্তির মত!

... ...অনেকদিনের অদর্শনের পরে, ঐ কাল-বৈশাখীর মত আমাদের জীবনে মাঝখানে বিনোদ হঠাৎ এসে উদয় হয়েছিল আবার ঠিক ঐ কাল-বৈশাখীর মতই হঠাৎ আজ সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল;—জানিনা তার সঙ্গে আমার এই দেখাই শেষ-দেখা কিনা!

... ...

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমনসময়ে পিছন শ্রীর সাড়া পেলুম—

—"হ্যাঁগা, সে চলে গেচে?"

—"হ্যাঁ।"

—"আঃ! বাঁচলুম!"

শ্রী ছুটে এসে প্রাণপণে আমার গ জড়িয়ে ধর্‌লে। তারপর আমার বুক ভিতরে মুখ গুঁজে অস্ফুট কণ্ঠে সে কাঁদ লাগ্‌ল!

—"একি শ্রী! অকারণে কাঁ কেন?"

—"এবার আমায় মাপ কর গো! আ কখনো তোমায় সন্দেহ কর্‌ব না!"

ইতি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রা

আলোচনা

বাল্য-বিবাহে পূর্ব্বরাগ

বৈশাখের "ভারতী"তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আমার "পূর্ব্বরাগ" প্রবন্ধের উপর লক্ষ্য করিয়া শরবর্ষণ করিয়াছেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তাঁহার লক্ষ্যটা তেমন ঠিক হয় নাই। তাঁহার মত প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে এরূপ যুক্তিহীন ভাসা-ভাসা রকমের কতকগুলা ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র আমরা আশা করি নাই।

দীনেশবাবু প্রবন্ধের প্রথমেই ভূমিকা করিয়া যে আমরা "প্রাচীনের দলের টীকি" ধরিয়া ... টানাটানি করিয়া তাঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি যে "প্রা হইলেও "প্রাচীনে"র উপর আমাদের কিছুমাত্র বি বা অবজ্ঞা নাই। 'নবীন' চিরকালই প্রাণের বেগে —আর 'প্রাচীন' কিছু দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত। তাই নবী

াছে প্রাচীনের দ্বিধা জড়তা বলিয়া মনে হয়;—আর াচীনের কাছে 'নবীনের' উৎসাহ হঠকারিতা লিয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্তু কি নবীন কি প্রাচীন ভয়েরই উদ্দেশ্য এক—সামাজিক কল্যাণের জন্য ানুসন্ধান। তাহার আলোচনায় তীব্র ভাষার প্রয়োগ াকিলেও গাত্রদাহের কোন কারণ নাই।

দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে কথার-মত-কথা একটী মাত্র খিলাম। তিনি বলিতে চান যে বাল্য-বিবাহে র্ব্বরাগের অবসর নাই—এ কথা মনে করা ভুল। ং যৌথ পরিবারের মধ্যে পূর্ব্বরাগটা আরো লো করিয়া ফুটিয়া উঠে। যথা"—স্ত্রী তো একটা াড়কের মধ্যে পুলিন্দা হোয়ে বাল্যজীবন কাটিয়ে তেন। তিনি শাশুড়ীর কোলে কাঁখে, ননদের ঙ্গ হেঁসেলে দিন কাটিয়ে রাত্রে কোন গুরুজনের ছানায় শুয়ে পড়্‌তেন।.....এইভাবে পারিবারিক বনের দীক্ষা গ্রহণ ক'রে হঠাৎ একদিন স্বামীর ছে অভিনবভাবে ধরা দিতেন।.....যৌবন তাঁকে ন ক'রে সাজিয়ে এনে স্বামীর ঘরে উপঢৌকন য়ে যেত....." ইত্যাদি। বর্ণনাটা কবিত্বময় ট। দীনেশবাবু চিরকাল প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া টিয়া বুড়াবয়সে হঠাৎ যে এতটা কবিত্ব সঞ্চয় রিয়া ফেলিয়াছেন এটা আমাদের জানা ছিল না। ক যেন উপকথার রাজকন্যার গল্প। ঠাকুরমার ণ শুনিয়াছিলাম যে এক ছোট্ট রাজকন্যা কেমন রিয়া সমুদ্রের এক ঝিনুকের মধ্যে বন্দিনী া ছিলেন। এক জেলে জাল ফেলিয়া ঝিনুকটী ও রাজপুত্রকে উপঢৌকন দেয়। রাজপুত্র ত্রিকালে ঝিনুকটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে হঠাৎ তাঁহার ধাঁধিয়া গেল—পরমাসুন্দরী দেবকন্যার মত হকুমারী বাহির হইয়া ঘর আলো করিয়া ফেলিলেন। রপর? তারপর আর কি—রাজপুত্রের সঙ্গে রাজ-ার ভয়ঙ্কর প্রেম,—বিবাহ—সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস াদি।

দীনেশ বাবুর যুক্তি অনেকটা এই ঠাকুরমার গল্পের । বাল্য বিবাহে নানারূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্যে তীর মনে মধুর পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইত, অতএব বাল্যবিবাহে দোষ নাই। বরঞ্চ চারিদিকে এরূপ বাধাবিঘ্নের বেড়া থাকিত বলিয়াই দীনেশবাবুর মতে পূর্ব্বরাগটা আরও গাঢ় হইত বোধ হয়। আমার এক সরল-প্রকৃতি ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধু বলেন যে ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়া তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছে। ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। দেশ স্বাধীন থাকিলে নানারূপ যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবাদির গোলমালে সকলের ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যাঘাত হইত। তাই ভগবান দয়া করিয়া ভারতবাসীকে অন্যের রক্ষণাধীনে রাখিয়াছেন। ফলে তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া পরকালের চর্চ্চায় মন দিতে পারিতেছে। বোধ হয় আমার এই ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুর যুক্তি ও দীনেশ বাবুর যুক্তি চিন্তার ধারা-হিসাবে একই শ্রেণীর।

কিন্তু দীনেশ বাবু বাল্যবিবাহের যে মনোরম চিত্রটী আঁকিয়াছেন—তাহার অনেকখানিই তাঁহার মন-গড়া। বাস্তব চিত্রটা অন্যরূপেও বর্ণনা করা যায়। অষ্টমবর্ষীয়া নববধূ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ননদেরা তাহার পিছনে লাগিয়া গেলেন। তাহাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ননদেরা বুঝাইতে ছাড়িলেন না যে সে তাহাদের ক্রীতদাসী মাত্র। শাশুড়ী স্নেহের মাত্রাতিশয্যে তাড়না-ভৎর্সনা এমন কি প্রয়োজনমত দেহে গরম হাতা বেড়ির ছেঁকা দিতেও কসুর করিলেন না। এইরূপ ভৎর্সনা ও অশ্রুজলের মধ্য দিয়া তাহার ঘোমটা-ঘেরা দৃষ্টি বাহিরের সুন্দর জগৎকে একটা কারাগার বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। হঠাৎ কবে তাহার যৌবনের মালঞ্চে ফুল ফুটিয়া উঠিল, কোকিলের কুহুধ্বনি শোনা গেল,—তাহা সে জানিতেই পারিল না। স্বামীকে এতদিন সে দিন-রাত্রির মধ্যে একবার চোখের দেখাও দেখিতে পায় নাই,—সে যে কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু, তাহা তাহার ধারণাতেও আসে নাই। ক্রমে গাঢ় অন্ধকার রজনীতে সকলের চোখ এড়াইয়া ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চোরের মত তাহাকে অভিসার-যাত্রা অভ্যাস করিতে হইল। কখন ভোর হয়, এই দুর্ভাবনায় রাত্রিটা কাটাইয়া অন্ধকারের আবরণে পলায়নের চতুরতাও কসরৎ

করিতে হইল। এদিকে স্বামী বেচারাও এইরূপ মূক-অভিনয়ে তৃপ্ত থাকিতে না পারিয়া সন্ধ্যাকালে "সহবত" শিক্ষার জন্য স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। আমার অবশ্য দীনেশ বাবুর মত ভাষার জোর ও কবিত্ব-শক্তি কিছুই নাই। কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে তাঁহার কাল্পনিক মধুর চিত্র হইতে আমার এই করুণ চিত্র কোন অংশেই অবাস্তব নহে।

কিন্তু এ সব বাজে তর্ক করিয়া লাভ নাই। আসল কথা এই যে যে-বাঙলা দেশ শক্তিপূজার পীঠস্থান—সেই দেশে আমরা কৃত্রিম প্রথার বন্ধনে নারীত্বকে ক্রমেই হীন করিয়া ফেলিতেছি। নারীর মধ্যে হৃদয় ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশের অবসর না দিয়াই তাহাকে আমরা জোর করিয়া নিজেদের "ছাঁচে" ফেলিয়া গড়িয়া তুলিতেছি। বড় বড় শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া হিন্দু নারীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি। কিন্তু গোড়ায় গলদ দেখাইয়া দিলেই নানারূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপ মনের ভাব ঘোরতর স্বার্থপরতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। নারীরা আমাদের খেলার পুতুল হইয়া আমাদের কথাতেই বাঁচুক আর মরুক, এইরূপ মনোভাবই ইহার মূল। তাই নানারূপ শাস্ত্র-বচন ও আধ্যাত্মিকতার দুর্গ রচনা করিয়া আমাদের অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় আমরা অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছি। ফলে ভারতের নারী-জীবন সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিতেছে না;—সমস্ত জাতীয় চেষ্টা তাহার অভাবে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

আমি বিবাহের আগে পূর্ব্বরাগের কল্পনা করিয়াছি বলিয়া দীনেশ বাবু ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আমি দুর্নীতির প্রচার করিতেছি! রাবণের দশটা মাথা কাটা যাওয়ার কথাও তিনি ক্রোধের আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু কোন রাবণকেই আমি সীতাহরণের পরামর্শ দিই নাই—অথবা আধুনিক রসিক যুবকদিগকে পরের মেয়ের দিকে লোভ দৃষ্টি ফিরাইবার কথাও বলি নাই। এ-সব দীনেশ বাবু গায়ে-পড়া তর্ক। একটু বেশী বয়সে বিবাহ হইলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইতে পারে আর সে জিনিষটা ভালই, ইহাই বলা আমার উদ্দেশ্য। ব্যাপারটী যে মনে মনে সকলেরই ভাল লাগে, আধুনিক উপন্যাস ও গল্পের দিকে তাকাইলে তাহা বুঝা যায়। বরকন্যার মধ্যে বিয়ের আগে কোনরূপে প্রণয় সঞ্চার করিতে পারিলে গল্প লেখকেরাও ভারী খুসী হন্, আর পাঠকেরাও তাহা পছন্দ করেন। যাঁহাদের গল্পের মধ্যে এই ব্যাপারটির অবতারণায় কৌশল লক্ষিত হয়, তাঁহারাই পাঠকদের প্রিয়তম লেখক। লোকপ্রিয় গল্প-লেখক শ্রদ্ধেয় প্রভাত বাবুর কৃতিত্বের প্রধান কারণই এই। অ দীনেশ বাবুও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহার পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলিতে পূর্ব্বরাগ অবতারণা করিতে তিনি ছাড়েন নাই।

প্রবন্ধের শেষভাগে দীনেশ বাবু আমার মর্ম্মান্তিকরূপে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছেন। তি বলিয়াছেন যে আমি বৈষ্ণব কাব্যের পরকীয়া প্রে কথা পাড়িয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাধনার নিন্দা করিয়াছি তাঁহার মত বুদ্ধিমান প্রবীণ লোকের পক্ষে এরূপ ব বলা ভাল হয় নাই। আমি তুলনা-মূলক আলো করিবার সময় বৈষ্ণব সাহিত্যকে কাব্য-হিসা দেখিয়াছি। তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সা কথা মোটেই জড়াই নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক হইতেও দেখা যাইতে পা এ কথা বোধ হয় দীনেশ বাবু মনে মনে জা জানেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাধনার উপর তাঁর যে আমার শ্রদ্ধা কম নয়। এই কথা বলিলেই য হইবে যে প্রেমের অবতারকে তিনি মাত্র মানুষে বুঝিয়াছেন, আমার কাছে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

বারোয়ারি উপন্যাস

৩

উমাসুন্দরী তখন সবেমাত্র স্নান সেরে পূজায় বসেছেন; একধারে বামা ঝী বাজারের প্রকাণ্ড ফর্দ্দ পেড়ে বসেছিল, কটা পয়সার হিসেব তার আর কিছুতেই মিল্‌ছিল না। উমাসুন্দরী সেদিকে ততটা কাণ দেন্‌নি, তিনি তখন আসনে বসে জপ করছিলেন। খুব নিবিষ্ট চিত্তে হিসেব করতে করতে বামা হঠাৎ চম্‌কে মাথায় আঁচল টেনে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে,—ওমা, কত্তাবাবু যে গো! বলেই বামা বাজারের ফেরত বাকী পয়সা কটা আঁচলের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে সেদিক থেকে সরে পড়ল। যোগেন মিত্তির ঠাকুর-ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

এমন সময়ে কর্ত্তা এখানে! উমাসুন্দরী আশ্চর্য্য হলেন-; ব্যাপার কি? শশব্যস্তে তিনি স্বামীর মুখের পানে চাইলেন। যোগেন মিত্তিরের সর্ব্বাঙ্গ তখন রাগে থর্ থর্ করে কাঁপ্‌ছিল। সে মূর্ত্তি দেখে উমাসুন্দরী জপ ভুলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে গা?

যোগেন মিত্তির বললেন,—শুনেছো, তোমার হতভাগা ছেলের কীর্ত্তির কথা?

উমাসুন্দরী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, দুই চোখ কপালে তুলে বললেন—কার কীর্ত্তি? কে ছেলে?

—তোমার হরেন। যাকে কলকাতায় পাঠিয়েছ,—ভারী বিদ্যে শেখাবে বলে!

উমাসুন্দরী এ ইঙ্গিতের অর্থ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন; কিন্তু এ কথা কর্ত্তার কাণে তুললে কে?

তাঁর আশঙ্কা হল, কথাটা কর্ত্তার কাণে যখন উঠেছে, তখন খুবই একটা অঘটন ঘটে যাবে! কথাটা তিনি নিজে মোটেই বিশ্বাস করেন্ নি! ছেলের সম্বন্ধে কোন্ মা-ই বা এমন কথা বিশ্বাস করেন? শুধু এই কারণেই যে তিনি বিশ্বাস করেন নি, তা নয়—তাঁর ছেলেকে তিনি ত চেনেন্! সেই অত আব্দার, বড় হলেও ছেলেমানুষের মত এখনো তার খামখেয়ালী এলোমেলো ভাব,—এগুলো যে অত-বড় বিশ্রী ব্যাপারের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না!—লোকে বলে, কমলার সঙ্গে আগে থেকেই না কি তার প্রণয় ছিল—! পাগলের কথা! থাকুক প্রণয়! প্রণয়ের অর্থ কি ঐ অত-বড় একটা সর্ব্বনাশের ব্যাপার! তাঁর মন জোর করে কেবলি বল্‌ছিল—না, না, এ মিছে কথা! একেবারে মিছে!

যেন-কিছু-জানেন-না এমনি ভাব দেখিয়ে উমাসুন্দরী বল্‌লেন,—কার কথা বলছ তুমি? হরেন? কি কীর্ত্তি করেছে সে?

যোগেন মিত্তির বললেন,—আমাদের মৈত্র মশায়ের মেয়ে কম্‌লিকে নিয়ে ওরা সব কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে গেছল না কি, তা সেখান থেকে সবাই ফিরেছে, কমলি শুধু দেশে ফেরেনি। সেখানে হরেন নাকি তাকে ফুস্‌লে নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে!

এ কথায় উমাসুন্দরীর সমস্ত মনটায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল; তিনি বললেন—হরেন নিয়ে গেছে তাকে?

—হ্যাঁ গো, তোমার হরেন।

উমাসুন্দরী আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে একেবারে গর্জ্জনের সুর তুলে বললেন,—মিথ্যে কথা! কে এ কথা বলেছে, শুনি?

যোগেন মিত্তির একটু থম্‌কে চুপ করে রইলেন। উমাসুন্দরীর এমন মূর্ত্তি তিনি আগে কখনো দেখেন্‌নি ত! তখনই সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বললেন,—শশীর কে আপনার লোক আছে, ট্রেণে সে কোথায় যাচ্ছিল—সেই ট্রেণেই সে হরেন আর কম্‌লিকে এক সঙ্গে কোথায় যেতে দেখেছে।

—শশী বলেছে! একটা বদমায়েস, মাতাল!

—কিন্তু তার এ মিছে কথা বলায় কোন স্বার্থ নেই ত।

সে কথা ঠিক! উমাসুন্দরী ভাবলেন, সত্যিই ত! শশী তাঁরই ভৃত্য। তাঁর ছেলের নামে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে বেড়ানোয় তার লোকসান বৈ লাভ নেই! তবে—? তাছাড়া এ কথাটা আরো পাঁচমুখে এমন করে রটে বেড়াবে কেন? দেশে আরো ত লোক ছিল, কলকাতাতেও লোকের অভাব নেই—কিন্তু এদের সকলকে ছেড়ে তাঁর ছেলে হরেনকেই বা কেন্দ্র করে এই কুৎসার চক্রটা এমন করে লোকে ঘুরিয়ে দেবে কেন? এ কেন'র অর্থ মেলে না যে!

উমাসুন্দরী বললেন,—তুমি কি করবে এখন?

যোগেন মিত্তির বললেন,—কি করব তাও ঠিক করেছি। হরেনকে এখনি আমি চিঠি লিখব,—সে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াক্, দাঁড়িয়ে জবাব দিক্, এত লোক থাকতে তার নামে এ অপবাদ উঠল কেন! তার পর আমি এর বিহিত করব।

উমাসুন্দরী বললেন,—কিন্তু শোনো, শুধু লোকের মুখে উড়ো কথা শুনে আগে থাকতেই যেন ছেলের সঙ্গে একটা হাঙ্গাম-ফৈজত্ করে বসো না—হাজার হোক্ ছেলে এখন বড় হয়েছে। ছাখো, কখনো তোমাকে কোন কথা বলবার আস্পর্দ্ধা রাখিনি—আজ অনেক দুঃখে এইটুকু মিনতি জানাচ্ছি—আগে সঠিক খপর নাও, তারপর যদি দোষী বলে বোঝো, তোমার যে-সাজা দিতে মন চায় দিয়ো।

যোগেন মিত্তির বললেন,—এর আর কোন খপরাখপর নেবার দরকার দেখি না। কলকাতার মত জায়গায় ছেলেকে যখন একলা ছেড়ে দিয়েছ, তখন এইরকমই যে একদিন ঘটবে, এ আর আশ্চর্য্য কি! যাক্, তোমায় আগে থাকতেই জানিয়ে রাখ্‌ছি—এর পর আমার কাছে কান্নাকাটি করলে চলবে না, আমি তা শুন্‌বো না। হরেনের কাছ থেকে আমি সাফ জবাব চাই! তারপর যা করবার, করবো।

কথাটা বলে যোগেন মিত্তির আর মুহূর্ত্তকালও সেখানে দাঁড়ালেন না—সটান্ দপ্তরখানার দিকে ফিরে চললেন,—হরেনকে এবার চিঠি লিখতে হবে।

কর্ত্তা চলে যাবার পর উমাসুন্দরী কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে সেই পূজার আসনের উপরই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঠাকুরের

সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললেন,—হে ঠাকুর, এ দায়ে রক্ষা কর! মার মুখ, মার মান, মার এত-বড় আশা, তুমি আজ রাখো ঠাকুর। মার মুখ এমন করে সত্যিই পুড়িয়ে দিয়ো না যেন!

তাঁর দুই চোখের কোণে অশ্রুর সাগর একেবারে উথলে উঠল।

৪

ক্ষিতীশ চৌধুরী কপিলডাঙ্গার জমিদারের বংশধর,—কলকাতায় লেখাপড়া করতে এসেছিল। পটলডাঙ্গার একটা গলিতে মাঝারি রকমের একটা ফিট্‌ফাট্ বাড়ী ভাড়া নিয়ে দস্তুরমত ইংরিজী কায়দায় তাকে সাজিয়ে ক্ষিতীশ সেখানে বাস করছিল আর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এর লেকচারে হাজ্‌রে দিচ্ছিল। বাসায় সরকার বামুন চাকর—এরাই শুধু থাক্‌ত—তা ছাড়া উপরি লোকের আনা-গোনা এত বেশী আর তাদের কলরবে বাড়ীটা সর্ব্বক্ষণই এমনি সরগরম থাকত যে বাইরে থেকে কোন অজানা লোক তা শুনে ভাবত, বাড়ীতে বুঝি কি একটা সমারোহ ব্যাপার চলেছে।

ক্ষিতীশের বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর। বেশ সৌখীন ছোকরা। চেহারাখানি চমৎকার, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখের কোণে প্রিঁস্‌নে চশমা। ক্ষিতীশ হার্ম্মোনিয়ম বাজাতে জানে, গান গাইতে পারে, ছবি আঁকাও তার একটু-আধটু আসে। মস্ত-বড় জমিদার-বংশের দুলাল হলেও সে নেহাৎ একটা ঢ্যাস্‌কা-গোবর-গণেশের মত ছিল না। তবে দুর্ব্বলতা যে তার না ছিল, এমন নয়। পাঁচজন সমবয়সীর মুখের তারিফ্ শুন্‌তে ক্ষিতীশ ভালো-বাসত—এবং সাদা কথায় যাকে মোসাহেবি বলে, জেনে হোক আর না-জেনেই হোক্, সেটাকে সে মোটেই ঠেলে চলতে পারত না।

অর্থাৎ বন্ধু আর সমবয়সীদের দলে সে মস্ত একজন আর্টিষ্ট বলে পরিচিত হয়েছিল। বন্ধুরা বলত, তার চুল ছাঁটা কি চাদর নেবার ভঙ্গী থেকে চলা-ফেরার মত তুচ্ছ ব্যাপারে অবধি কেমন একটা কায়দা আছে। ক্যাটালগ দেখে ক্ষিতীশ বোম্বাই থেকে ইবসেন, বার্ণার্ডশ'র বইগুলো যেবার আনিয়ে ফেললে, সেবার ইবসেনের একখানা বইয়ের পাতা খুলে বন্ধু জগদীশ চেঁচিয়ে বলে উঠলো—এই ত আর্টিষ্টের লক্ষণ!

অগাধ প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসে সমস্ত বিশ্ব-জগৎটা প্রথম যৌবনে তার চোখে এমনি সুলভ হয়ে ধরা দিয়েছিল যে সুলভকে আয়ত্ত করবার ইচ্ছা তার মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে ত যাচ্ছিলই, তাছাড়া সুলভ বস্তুমাত্রকেই সে বর্জ্জন করতে চাইত।

দেশের বাড়ীতে বিধবা মা আর বয়সে-অনেক-ছোট এক ভাই ছিল। বিয়ে তার এখনো হয়নি। বিধবা মা যেদিন দেখে-শুনে সুন্দরী এক পাত্রী ঠিক করলেন, ক্ষিতীশ সেদিন প্রকাণ্ড একখানা ভারী নভেল শেষ করে একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবলে, সত্যিই ত, এ কি বিয়ে! জানা নেই, শোনা নেই, বেনারসী কাপড়ের পুঁটুলিতে বেঁধে একটি মেয়েকে কোথা থেকে আনা হল, আর তাকে এমনি ভাবেই পিঠে বেঁধে সারা জীবন-পথটা চলে যেতে হবে! আমার সঙ্গে তার মিল খাবে কি না খাবে, সেটাতে ঘোর সন্দেহ আছে! হয়ত আমি যখন টেনিসন নিয়ে ঐ অসীম

নীল আকাশে উধাও হয়ে যাব, তিনি তখন দুই চোখে জল এনে বাপের বাড়ীর পুসী বেরালটির জন্যে কাঁদতে বস্‌বেন! ধেৎ!

মাকে গিয়ে সে বললে,—বিয়ের এখন কোন দরকার দেখচিনে মা। যেদিন দরকার বোধ করব তোমায় বলব। এখন আমি কলকাতা চললুম। কাল আমার কলেজ খুলবে।

কথা শুনে মা অবাক! যাই হোক্, তিনি আর কোনরকম উচ্চবাচ্য করলেন না। আকাশের পানে একবার চোখ তুলে চেয়ে শুধু একটা নিশ্বাস ফেললেন। ছেলে একেবারেই বিয়ে করবে না, এমন কথা বলেনি ত!

কল্‌কাতায় এসে ক্ষিতীশ বন্ধুমহলে এই মতটা রাষ্ট্র করে দিলে যে—আগে থাকতে লভ্ না হলে বিয়ে করা চলেই না!

বন্ধু গবেশ ছিল ক্ষিতীশের সব-চেয়ে গোঁড়া সমজদার। তার কারণ, তার আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না, সেদিকটায় ক্ষিতীশের কাছ থেকে সে দায়ে-অদায়ে বিস্তর সাহায্যও পেত। বেড়াতে বেরিয়েছে হঠাৎ গবেশের জুতো-জোড়াটা ছিঁড়ে গেল অমনি ক্ষিতীশের এক জোড়া দামী জুতোয় পা ঢুকিয়ে সটান্ সেটাকে কায়েমী-ভাবে সে নিজস্ব করে ফেল্‌লে,—মাঝে মাঝে বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হলে ক্ষিতীশের কাছে ছুটে এসে ডাক্তারের ফী, ওষুধের দাম চেয়ে নিয়ে যাওয়া—এগুলোয় কোনদিন কোন ব্যাঘাত ঘটেনি বা ক্ষিতীশ কোন কৈফিয়ত্ও তলব করেনি। নিঃশব্দে সে এ-সবে প্রশ্রয় দিয়েই এসেছে। কাজেই সে বেচারীর তারিফের মাত্রাটা যে সবার চেয়ে বেশী হবে, এ আর বিচিত্র কি।

ক্ষিতীশের কথা শুনে গবেশ বল্‌লে,—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গবেশের কিন্তু বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর সে বিয়ের আগে লভের কোন চিহ্নও দেখা যায় নি। কারণ গবেশের স্ত্রীটি এসেছিল একেবারে সেই মগের মুল্লুক থেকে,—যেদিকে গবেশ স্বপ্নেও কোনদিন পদার্পণ করেনি।

গজু বলে উঠল,—তুমি ও কথা বলোনা হে গবেশ, তোমার মুখে ও কথা সাজেনা। তোমার আগে স্ত্রী, পরে লভ্—স্ত্রী-লাভের আগে স্ত্রীর সঙ্গে লভ নয়!

হেসে ক্ষিতীশ বললে,—একটু সবুর সইল না হে? গবেশ ভারী করুণ রকমের একটু হাসি ঠোঁটের আগায় এনে বললে,—অন্যায় হয়ে গেছে, ভাই!

এমনি মজলিসের মধ্যে থেকে ক্ষিতীশের চিত্ত দুর্ল্লভের পানেই ছুটে চলেছিল—এমন সময় এক নূতন উপসর্গ জুটল। সে উপসর্গ,—এক মোটর-গাড়ী।

পটলডাঙ্গার যে গলিটায় ক্ষিতীশের বাসা ছিল, সেই গলির মোড়েই একজন বাবু একখানা মোটর-গাড়ী কিনে সেটা নিয়ে অষ্টপ্রহর ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করে বেড়াতে লাগল দেখে ক্ষিতীশের এক বন্ধু একদিন বলে উঠল—অসহ্য করে তুলেছে ভাই ক্ষিতীশ। তুমি একখানা মোটর না কিনলে আর ভালো দেখাচ্ছে না।

ক্ষিতীশ বললে,—আচ্ছা!

তারপর যে কথা সেই কাজ! এক

হপ্তার মধ্যে ষ্টুয়ার্টের দোকান থেকে প্রচণ্ড দামে এক প্রকাণ্ড গাড়ী এল।

তারপর মোটরের নেশা ক্ষিতীশকে এমনি পেয়ে বসল যে গান-বাজনা ইবসেন-শ' সব কোথায় পড়ে রইল! যে-জিনিষটা হাতে পাবে সেটার দিকে অসম্ভব ঝোঁক দেওয়া ক্ষিতীশের স্বভাবে রোগের মতই দাঁড়িয়েছিল। মোটর পেয়ে সে এই মোটরকে চালাতে শিখে লাইসেন্‌স নিয়ে নিজেকে একেবারে মোটরে এক্সপার্ট বানিয়ে ফেললে। যখন-তখন ধাঁ করে মোটর নিয়ে বেরিয়ে কলকাতার এদিকে-ওদিকে চক্র দিয়ে আসা বাতিকের মত দাঁড়িয়ে গেল। কলেজের লেকচারের দিকে আর মন রইল না। শেষে এই মোটর চালানোর ব্যাপারে একদিন এক মস্ত ঘটনা ঘটে গেল।

সে দিন কি একটা যোগ ছিল! দেশ-বিদেশ থেকে যাত্রী এসে কলকাতায় ভারী ভিড় জমিয়ে তুলেছিল। বন্ধুরা সকলেই ভলন্টিয়ারের দলে নাম লিখিয়েছিল,—কাজেই সকলে কাজে বেরিয়েছে। গবেশ চালাক ছোকরা,—সে দলে নাম লেখায় নি। কথায় কথায় নাকি ক্ষিতীশ একদিন বলেছিল,—তোমরা সবাই মিলে দল বেঁধে চল্‌লে হে, আমি একা ঘরে বসে কি করব? আমিও তোমাদের দলে যাই, চল।

বন্ধুরা ভিড় করে সকলে মোটরে চড়ায় আরামের একটু ব্যাঘাত হয়—তাই গবেশ ঠাউরে রেখেছিল, ঐ যোগের দিনটাতে ক্ষিতীশকে নিয়ে সে সাইট-সীইং-এ বেরিয়ে পড়বে। ক্ষিতীশের মুখ থেকে ভলন্টিয়ারের দলে ভেড়বার কথাটা বেরুতেই গবেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—নতুন নাম এখন আর নেবে না ত। আমি গিয়েছিলুম,—তা হল না।

কথাটা নিয়ে কেউ যদি তখনি তর্ক তুলত, তাহলে গবেশকে হেরে মুখ চুণ করতে হত। কিন্তু সবাই তখন নিজেদের ডিউটীর সময়-ক্ষণ নিয়েই ব্যস্ত, তর্ক তোলবার মত মনের অবস্থা কারো ছিল না। কাজেই গবেশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, অর্থাৎ ক্ষিতীশের ভলন্টিয়ারের দলে নাম লেখানো ঘট্‌ল না।

৫

সারা দুপুর এধার-ওধার লোকের ভিড়ে আর পথে গাড়ী চালানোর ব্যাপারে পুলিশের কড়া বন্দোবস্তর ঠেলায় আহিরীটোলার একটা গলির মধ্যে ক্ষিতীশকে হঠাৎ তার মোটর চালিয়ে দিতে হল। সে-পথে খানিকটা আসতেই সে দেখে, এক দোকানের সামনে লোকের ভারী ভিড়। এটা ত গঙ্গার তীরে যাবার পথ নয়, অথচ এ পথে এত ভিড় কেন? ক্ষিতীশ মোটর গাড়ীটা আস্তে চালিয়ে এগুতে লাগল। গাড়ীতে সঙ্গী ছিল শুধু গবেশ! সে ভাবলে, কোন এ্যাকসিডেণ্ট নয় ত?

এগিয়ে গিয়ে ক্ষিতীশ দেখে, দোকানের রোয়াকে গোলাপ-ফুলের মত রূপে-ঢলঢল একটি মেয়ে—কিশোরী, কোঁকড়া কালো চুলের রাশ গোলাপের তোড়ার পিছনে বাহারে ফার্ণ-পাতার মত এলানো! রূপে চারিধার আলো হয়ে রয়েছে। কিশোরীর মুখে-চোখে জল দেওয়া হচ্ছে। তার মূর্চ্ছা হয়েছে।

ক্ষিতীশ মোটর থেকে নামতেই দু-এক জন বলে উঠল, এই যে, এই একটা মোটর গাড়ী

আস্‌ছে,—মোটর। এইতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ত হয়! কেউ বললে, ছাখো, হয়ত এঁদেরই বাড়ীর মেয়ে। কিন্তু ক্ষিতীশের ভাব-ভঙ্গী দেখে যখন ভিড়ের লোকগুলো বুঝলে যে, না, মেয়েটি এদের ঘরের নয়, তখন চারিধার থেকে মিনতির ধারা ঝরে পড়ল, ও মশায়,—ওগো বাবু—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও সুরু হল,—কে? যাত্রী বোধ হয়, না? কোথায় বাড়ী, মশায়?—সে-সব গোলমালে এতটুকু চঞ্চল না হয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ক্ষিতীশ চোখে যা দেখলে, তাতে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এত রূপ মানুষের দেহেও সম্ভব হতে পারে! ক্ষিতীশ তখনি কিশোরীর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—পল্‌স্ আছে। ভিড়ের মধ্য থেকে সকলে বলে উঠল,—ডাক্তার,—ডাক্তার! বেশ হয়েছে। ভিড়ের দিকে চেয়ে ক্ষিতীশ বললে,—এঁর বাড়ী কোথায়?

—তা ত জানিনা, মশায়।

—আপনার লোকজন এঁর কে আছেন, এখানে?

—কৈ, কেউ নেই।

—কতক্ষণ এমনিভাবে আছেন?

—তা ত জানিনা,—পথের উপর পড়ে-ছিলেন—তুলে রোয়াকে আনা হয়েছে। পুলিশে একটা খপর দেব, ভাবছিলুম সকলে, এমন সময়—

একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনও সেই সঙ্গে ক্ষিতীশের কাণে গেল—কি জাত, কি রীতের মানুষ কে জানে! একধার থেকে একটা অভদ্র ইঙ্গিতও ছুটে বেরিয়ে পড়ল। ক্ষিতীশ কিশোরীর মুখের পানে চেয়ে দেখলে! সুন্দর মুখ,—নির্ম্মল—তার মন অমনি বলে উঠল, অসম্ভব। সে ডাকলে,—গবেশ।

গবেশ এগিয়ে এল, এসে বললে,—কি?

—গাড়ী করে হাসপাতালে নিয়ে যাই, চল। না হলে মারা যাবে।

হাঁ কি না কোন কথাই গবেশের মুখ থেকে চট্ করে বেরুল না। সে এতক্ষণ অবাক হয়ে সেই জমাট রূপের প্রতিমার পানেই চেয়ে ছিল। হঠাৎ ক্ষিতীশের কথায় চমক ভাঙ্গতেই বলে উঠল,—হ্যাঁ।

তারপর সেই বিস্মিত স্তম্ভিত লুব্ধ জনতার মাঝখান থেকে পদ্মবনের পদ্ম ফুলটির মতই সেই রূপসী কিশোরীকে বন্ধুতে দুই ধরাধরি করে মোটরে তুলে মোটর হাঁকিয়ে দিলে।

সেখানে তখন একটা হৈ-হৈ রব উঠল। সারা পথটা ক্ষিতীশের মনের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ ছুটেছিল। কি করা যায়? কি—? হ্যারিসন রোডের মোড় পার হয়ে তার গাড়ী ডান দিকে না বেঁকে যখন সোজা শেয়ালদার দিকে চলল, তখন গবেশ বলে উঠল,—এ কি, ক্যাম্বেলে চললে না কি! মেডিকেল কলেজে যাবে না? ক্ষিতীশের একটু লজ্জা বোধ হল। তার মুখে প্রথমটা কোন কথা জোগাল না। কোন মতে সঙ্কোচটা কাটিয়ে সে বললে,—ভদ্দর লোকের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে—হাসপাতালে চট্ করে নিয়ে যাব? তার চেয়ে বাসায় নিয়ে যাই। ডাক্তার এনে নার্শ রেখে সেবার বন্দোবস্ত করে দেব'খন—তারপর একটু সেরে উঠলে ঠিকানা নিয়ে ওঁর বাড়ীতে খপর দেব।

বাসায় এসে ক্ষিতীশ বন্দোবস্তয় কোন ত্রুটি রাখলে না। ডাক্তার ডাকা হল, নার্শ, ঝী সবই এল। বাড়ীর দোতলাটা রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হল। বন্ধুদেরও কাজেই উপরে ওঠা বন্ধ হল।

ডাক্তার এসে বলে গেলেন,—কোন রকম mental shock-এর জন্যে এই রকম হয়েছে। একেবারে অজ্ঞান নয় ত—জ্ঞান একবার-একবার হচ্ছে আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। কাজেই ভয় তেমন আছে বলে মনে হয় না!

নার্শের সঙ্গে ক্ষিতীশ কিশোরীর শিয়রে বসে সারা রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলে। গবেশের থাকা সম্ভব ছিল না; কারণ লভের পুলে বিয়ে হলেও তার স্ত্রীটি জীবন্ত ছিল, তা-ছাড়া নবোঢ়াও বটে! কাজেই,—যাক্ সে কথা।

কিশোরীর শিয়রে বসে বসে ক্ষিতীশ কত কথাই যে ভাবছিল,—মনটাকে কল্পনার ফানুসে চড়িয়ে সে কোন্ অসীম আকাশে ছেড়ে দিয়েছিল! ঐ দুটি মুদিত নয়ন-পল্লবের তলে কি অসীম রহস্য লুকানো আছে। কখন্ ওগো কখন্ সেটুকু তার তৃষিত চোখে ধরা পড়বে!

সারারাত কল্পনা কত ছবিই দেখাতে লাগল! সেকালে রাজা-রাজড়ারা বনে মৃগয়া করতে গিয়ে সুন্দরীর দেখা পেতেন আর তাকে নিজের বাড়ীতে এনে বিয়ে করে একেবারে রাজেশ্বরী করে পাশে বসাতেন! এও যেন সেই রকমেরই ব্যাপার!

ক্ষিতীশ বারবার শয্যায়-শায়িতা মূর্চ্ছিতার পানে চোখের আকুল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল।

বেলা তখন দশটা। মেয়েটি চোখ খুলে চাইলে। নার্শ এসে চাম্‌চেয় করে খানিকটা বেদানার রস তার মুখে ঢেলে দিলে। মেয়েটি তার ডাগর দুই চোখে অত্যন্ত কুণ্ঠিত কাতর দৃষ্টি তুলে নার্শের মুখের পানে চেয়ে রইল। এমন কতক্ষণই সে চেয়ে রইল; তারপর জিজ্ঞাসা করলে—আমি কোথায় আছি?

নার্শ তাকে বেশী কথা বলতে মানা করলে, বললে,—আপনি ভালো জায়গাতেই আছেন, কোন ভাবনা নেই।

মেয়েটি বললে,—আমার বাবা মা কোথায় আছেন? নার্শ এ কথার জবাব দিলে না। মেয়েটির সম্বন্ধে সে বিশেষ-কিছু জান্‌ত না। তাকে যে কুড়িয়ে আনা হয়েছে, সে যে এ বাড়ীর কেউ নয়, এ খপর সে শোনেও নি ত। ক্ষিতীশ অদূরে একটা ইজি চেয়ারে বসে একখানা বই নিয়ে পড়ছিল। নার্শ ক্ষিতীশের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার চাইলে। ক্ষিতীশ কাছে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটি বললে,—এটা আপনাদের বাড়ী?

ক্ষিতীশ বললে,—হ্যাঁ।

মেয়েটি বললে,—আমার বাবা মা কোথায় গেলেন?

ক্ষিতীশ বললে,—জানি না ত। খোঁজ করে বলব'খন। আপনি এখন ব্যস্ত হবেন না। এখানে আপনার কোন ভয় নেই।

মেয়েটি চুপ করে বিছানাতেই পড়ে রইল। সামনে খড়খড়ি খোলা ছিল। তারি মধ্য দিয়ে আপনার অলস দৃষ্টিটাকে বহুদূর বাহিরে সে ছড়িয়ে দিলে। অসীম আকাশ ছেয়ে রৌদ্র ছড়িয়ে পড়েছে। সেই রৌদ্র

গায়ে মেখে মাঝে মাঝে দু-একটা পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে! আকশের পানে চেয়ে সে কি ভাবতে লাগল। ভালো করে কিছুই মনে পড়ছিল না। সবটাই যেন আবছায়া। এক তুমুল কলরব তুলে কি মস্ত ভিড় এল —যেন পাহাড়ের মত এক তুমুল ঢেউ—সেই ঢেউয়ে ছিট্‌কে সে যে কোথায় গিয়ে পড়ল! ভিড়টা সরে গেলে সে চোখ তুলে চেয়ে দেখে,—চেনা মুখ একটিও পাশে নেই! সমস্ত গা অমনি ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল—মাথা ঘুরে গেল—তারপর সামলে নেবার পূর্ব্বেই সব ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে গেল! মন তার কূল না পেয়ে অকূলে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ল—ক্লান্ত চোখ-দুটীও আপনা-আপনি বুজে এল।

... ...

সাত-আটদিন পরে মেয়েটীর শরীরের অবস্থা সহজ হয়ে উঠল। সে একটু চলে ফিরে বেড়াতে লাগল। ক্ষিতীশ এতদিন বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়েই দিয়েছিল। দিবারাত্রি এই দোতলাতেই পাশের একটা ঘরে পড়ে থাকত; মাঝে-মাঝে এঘরে এসেও বসত। ফুলের গন্ধে লুব্ধ ভ্রমর যেমন গাছের আশে-পাশে গুঞ্জন তুলে ফিরতে থাকে, ঠিক তেমনি করেই তার রূপ-লুব্ধ মন এই ঘরটার চারিপাশে ঘুরে বেড়াত; মুহূর্ত্তের জন্য সে দোতলা ছেড়ে নড়তে পারত না!

দুপুর বেলা মেয়েটি বিছানাতে শুয়ে ছিল, ক্ষিতীশ ঘরে ঢুকে বললে,—আপনি ভালো আছেন?

মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে উঠে বসে বললে, —হ্যাঁ!

ক্ষিতীশ বললে,—শরীরে একটু জোর পেয়েছেন?

—পেয়েছি।

ক্ষিতীশ বললে,—আপনার বাড়ী কোথায় আর আত্মীয়-স্বজনই বা কে আছেন, কোথায় আছেন? তা ছাড়া রাস্তায়—

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চারি-দিকে পাঁচিল ওগো, চারিদিকে পাঁচিল তোলা রয়েছে! পথ কৈ? পথ কৈ—তার ঘরে যাবার পথ? এ অজানার রাজ্যে এতটুকু গণ্ডীর মধ্যে তার মন অস্থির হয়ে উঠছিল। তারপর ভবিষ্যৎ—? এখনই বা সেখানে কি হচ্ছে—? কে কোথায় কেমন আছে? কি করছে? তার চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়তে লাগল।

ক্ষিতীশ বললে,—কাঁদবেন না আপনি। আপনার পরিচয় খুলে বল্‌লে আমি খপর দি।

মেয়েটি তখন সব কথা খুলে বললে— কলকাতার বেশী দূরে নয়, এক পাড়াগাঁয়ে তাদের বাড়ী। বাপের সঙ্গে মার সঙ্গে এখানে যোগে গঙ্গাস্নান করতে সে এসেছিল। একটা রাস্তায় খুব ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সে ছিট্‌কে দল থেকে কেমন বেরিয়ে পড়ে। প্রথমটা তার কোন হুঁসও ছিল না। অনেক দূরে এসে ভিড় সরতে সে চেয়ে দেখে, কোথায় বাবা, কোথায়ই বা তার মা! ভিড়ের চাপে চাপে সে একেবারে এ কত দূরে এসে পড়েছে! অজানা মুখ, আশে-পাশে কেবলি অজানা মুখ—তাদের সে কত রকমেরই বা ভঙ্গী! ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। হয়ত সকলে পিছিয়ে পড়েছে, এই পথেই আসবে, —এই ভেবে মা-বাপের দেখা পাবার আশায়

একটা রোয়াকের উপর সে বসে পড়ল। তারপর সমস্ত পৃথিবীটা কেমন অল্পে-অল্পে ঘোর অন্ধকারে ভরে গেল। তারপর যখন সে চোখ চাইলে, তখন দেখে, একেবারে এই বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছে। কি করে এল, সে তার কিছুই জানে না!

ক্ষিতীশ বললে,—আপনার বাবার নাম কি?

—শ্রীযুক্ত হরনাথ মৈত্র।

—বাড়ী কোথায়?

মেয়েটি দেশের নাম বললে।

—আচ্ছা—বলে ক্ষিতীশ সে ঘর থেকে উঠে গেল। টেবিলের উপরে কাগজের প্যাড্ ছিল, তা থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে সে লিখতে বসল। লিখলে,—

মান্যবরেষু

মহাশয়—

এইটুকু লিখেই সে চুপ করে বসল, এ কি করছে সে? এ চিঠি লেখার মানে? তার নিজের চোখের সাম্‌নে থেকে বিশ্বের সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শের সব অনুভূতি দু হাতে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে যে! নিজের চোখের দীপটিকে নিভিয়ে ফেল্‌তে বসেছে। এ কথা মনে হতেই সমস্ত প্রাণটা তার বাণে-বেঁধা হরিণের মত ছটফট করে উঠল! ওগো না, না—এ চিঠি লেখা যায় না! লেখা হতে পারে না। এ যে নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই হাতে করে সে পরের হাতে তুলে দিতে চলেছে!

আকাশ-পাতাল কত-কি সে ভাবতে বসল! মেয়েটি তার কেউ নয়! কোনদিন প্রাণের কাছে তাকে পাওয়া যাবে কি না, তাও তার জানা নেই! তার সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই—প্রাণের একটা কথাও কোনদিন কওয়া হয় নি—তবে—? তবু,— এ বড় সুখ! একই ছাদের নীচে দু'জনে আছি ত! এই যে কাছে-কাছে আছি— হাতে না পাই, হাতের নাগালে আছে, এই চিন্তাটুকুতেও যে মস্ত সুখ! এ সুখ কি ছাড়া যায়! তবুও—চিঠি না লিখেই বা সে করবে কি! কোন্ অজানা ভদ্র ঘরের কিশোরী মেয়েকে জোর করে সে আপনার বাড়ীতে বন্দী করে রাখতে পারে না ত!

মেয়েটিকে বিয়ে করলে কি হয়? ঠিক কথা! কৈ, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে কি না, সে কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নি ত! বোধ হয়, বিয়ে হয় নি। বিয়ে হলে সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন দেখা যেত! মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্নও ত কৈ, নেই! ক্ষিতীশের আশা তবে দুরাশা না হতেও পারে! আহা, এমন কি হবে! কেন হবেনা? কোথায় সে এই বাসার এককোণে পড়েছিল—আর কোথায় সেই আহিরীটোলার কোণে এক অজানা গলি! সে গলির কথা সে জানতও না। তার অদৃষ্ট যখন তাকে সেদিন সেই গলির মধ্যে নিয়ে গেল, তখন সেটার মধ্যে কি কোন উদ্দেশ্য ছিল না! ছিল বৈ কি! একেই বলে, নিয়তি—! নিয়তির গতি রোধ করার সাধ্য কারো নেই! নিয়তি, অদৃষ্ট—এ সব সে আগে মানত না। আজ এক মুহূর্ত্তে দৈবে তার অসীম বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল। নিয়তির যদি শক্তি না থাকবে, তাহলে ঘটনাগুলো এমন দাঁড়াবে কেন?

আশার উল্লাসে মেতে ক্ষিতীশ আবার মেয়েটির কাছে এল। বললে,—দেখুন, একটা

কথা আমি ভাবছিলুম—আপনার বিয়ে হয়েছে ত। তা শ্বশুর-বাড়ী কি কাছে-পিঠে নয়—? আপনার স্বামীকে তা হলে,—

কথাটা সে খুব ভয়ে-ভয়েই বললে। তার মনে এ বিশ্বাস খুবই ছিল যে জবাব পাবে, বিয়ে আমার হয়নি! হঠাৎ এত-বড় একটি মেয়েকে তার বিয়ে হয়েছে কি না, এ প্রশ্ন করাটা ঠিক ভদ্রোচিত হবে না ভেবেই সে একটু ঘুরিয়ে ঐ প্রশ্নটাই নিক্ষেপ করেছিল; কিন্তু তার জবাবে যখন শুনলে যে, হ্যাঁ, মেয়েটির বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত, তখন মনটা নিমেষে আকাশের উপর থেকে তার রঙীন ফানুস ছিঁড়ে একেবারে কোন্ কঠিন পাহাড়ের গায়ে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। হায়রে হায়, আশার ছোট দীপটি ঝড়ের এক দাপটে নিভে গেল!

খানিক পরে একটা ঢোক গিলে ক্ষিতীশ বললে,—দেখুন, এতদিন ধরে আমার বাসায় আপনি আছেন, আর আপনি বাড়ী না ফেরায় চারধারে একটা গোল পড়ে গেছে, নিশ্চয়। কারণ যখন সেটা পাড়া-গাঁ। তা এমন অবস্থায় আপনার বাবাকে চিঠি লিখলে সোর-গোল পড়ে যেতে পারে না কি? তা-ছাড়া অর্থাৎ বুঝলেন কি না, নিজে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চুপিচুপি তাঁদের বুঝিয়ে বললে ভালো হয় না কি? নইলে নানান্ কথা—

এইটুকু বলে সে চুপ করলে; তারপর দু'বার কেশে ক্ষিতীশ আবার বললে,—অর্থাৎ বুঝলেন কিনা—এতে আমারও একটা দায়িত্ব আছে কি না। এতদিন কোন খপর দেওয়া হয় নি, হঠাৎ আজ—! তা কলকাতায় আপনার এমন কোন আত্মীয়-স্বজন কে নেই, যিনি—

মেয়েটি ভাবতে বসল। অনেকক্ষণ মেয়ে সে ভাবলে—আর ক্ষিতীশ তার চোখে দৃষ্টি দিয়ে তাকে ঘিরে রইল। এ দেখা আর কতক্ষণের জন্যই বা! তার জীবনের পথ থেকে মেয়েটি এখনি চিরদিনের মতই সরে যাবে! তার সঙ্গে কোন কালেও আর দেখা হবার সম্ভাবনা থাকবে না—

হঠাৎ মেয়েটি কথা কইলে। আস্তে আস্তে বললে,—দেখুন, কলকাতায় আমার এক দাদা থাকেন, কলেজে পড়েন। খোঁজ করে তাঁকে যদি আনাতে পারেন, তাহলে বোধ হয়—

স্পন্দিত বক্ষে ক্ষিতীশ বললে,—তাঁর নাম কি, বলুন।

—হরেন্দ্রনাথ মিত্তির!

—মিত্তির! আপনার দাদা!

—তিনি আমাদের গাঁয়ের জমিদারের ছেলে কি না! আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকেন। কায়স্থ হলেও তাঁরা একেবারে ঘরের লোকের মত।

—কোন্ কলেজে তিনি পড়েন? কোথায় থাকেন?

—তা ত আমি জানি না।

ক্ষিতীশ বললে,—বেশ, আমি এখনি খোঁজ করতে যাচ্ছি। জমিদারের ছেলে বলবেন না? কলেজে পড়েন? বেশ, কলেজ থেকেই খোঁজ পাব'খন। দেখি। ভালো কথা, তাঁকে পেলে কি বলব? হরনাথ বাবুর মেয়ে—আপনার নামটি—?—

—আমার নাম কমলা!

ক্ষিতীশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কমলা তার উদাস দৃষ্টি আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, এই ক্ষিতীশের কথা! বাড়ীতে মেয়েরা কেউ নেই—অথচ চারিধারে কেমন শৃঙ্খলা! লোকটিকে কেমন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই তার মনে হতে লাগল।

ক্রমশঃ *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আব্দারের আধঘণ্টা

বেল-ফুল চাইনা,
জুঁই-ফুল দাও!
এ গানটা গেওনা,
এই গান গাও!
কেন ভালোবাসলে
বল—বল না;
হাসলে কেন তুমি?
—কথা ক'ব না!
কাল্‌কের গল্প
আজ কর শেষ;
আজকের রাতটা
লাগচে না বেশ?
সারাটা বেলা ধরে
বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা
এম্‌নিই ভুল!
জুঁই-ফুল চাই না
বেল-ফুল দাও;
এ গানটা গেওনা,
ঐ গান গাও!

জুঁই-ফুল নেবোনা,
দাও বেল-ফুল।
পাশীরা গোলাপকে
বলে না কি গুল্?
ও দিকেতে চেওনা,
চাও এই দিক;
আলোটা নিভে আসে
দাও ক'রে ঠিক:
লাগচে চোখে আলো
ক'রে দাও কম;
ঐ যা, বাতি গেল
নিভে একদম!
হবেনাক জ্বাল্‌তে
খুব বাহাদুর,
জানা গেছে বুদ্ধি
যায় কতদূর!
বেল-ফুল চাইনা,
দাও জুঁই-ফুল;
পাশীরা গোলাপকে
বলে নাকি গুল!

* আগামী সংখ্যার লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব।

জুঁই-বেল চাই না,
চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি তুমি
পাও কি না পাও !
কাকাতুয়া কিনে দেবে—
কিনে দিলে খুব !
কথা কেন নেই মুখে
হয়ে গেলে চুপ ?
ভালোবাস কি না বাস—
ঠিক বলো না !
চাঁদ ঐ উঠছে,
ছাদে চলো না।
মুখে চুণ লাগলো,
ফিরে নাও পান ;
মাথা-ঘুরে পড়লো—
গেওনাকো গান ;
চাই না জুঁই-বেল,
চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি, তুমি
পাও কি না পাও !

চাঁপা-ফুল চাইনা,
চাই চামেলি ;
সব-তাতে হবে-হবে
খালি গাফেলি !
আজ রাতে দুজনাতে
জেগে থাকবো,
কে হারে কে জেতে
আমি তাই দেখবো !
ছোট বলে করবে
তুই-তোকারি ?
তাতে ক'রে অপমান
হয় আমারি !
না বলে না কয়ে তুমি
কেন চুমা খাও ?
বলিনা যত-কিছু
আশ্‌কারা পাও !
চামেলি চাই না,
দাও চাঁপা-ফুল ;—
মিঠে তার গন্ধ,
গা তুল্‌তুল্।

চাঁপা-ফুল চাই না,
দাও বেল-ফুল ;
খোঁপা থেকে ঝরে পড়ে'
গেল বেল্‌কুল্ !
কুড়িয়ে সব ক'টা
পরিয়ে দাও ;
আবার না ব'লে তুমি
গালে চুমা খাও !
আমি মরে গেলে তুমি
খুব কাঁদবে ?
তখন এ বাহু-ডোরে
কাকে বাঁধবে ?
ওকি, ওকি, চোখ থেকে
পড়ে কেন জল ?
মরে কেন যাব আমি—
মিছে করি ছল !
জুঁই, বেল, চামেলি—
যা খুসি তা দাও,
ও-গালেতে চুমা খেলে
এ-গালেতে খাও !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

চয়ন

বিজ্ঞানের জন্য রূপসীর চক্ষু-দান

বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস ক্লারা কিম্‌ব্যাল ইয়ংএর কালো-চোখের খেলা নাট্য-জগতে অনেক নতুন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। সেই চোখদুটিকে তিনি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য উৎসর্গ ক'রে রেখেছেন।

তাঁর মতে, চোখ হচ্ছে আসলে অন্তরের বাতায়ন। তিনি তাই বলেছেন যে, মৃত্যুর একটু আগে তাঁর চোখদুটি কোটর থেকে তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার ঘরে গিয়ে ফটোগ্রাফে 'নেগেটিভ'কে যেমন ক'রে 'ডেভেলাপ্' করে, তেমনি ক'রে যেন ডেভেলাপ্ করা হয়। তারপর সেই 'নেগেটিভ' থেকে 'পজেটিভ্' ছবি তুললে তাতে তাঁর জীবনের গোপন সৌন্দর্য্যভরা সমস্ত চিত্র প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। এই ধারণা তাঁকে এমন ক'রে পেয়ে বসেছে যে, তিনি এখন বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্যে একান্তভাবে আপনাকে নিযুক্ত রেখেছেন।

তাঁর বিশ্বাস যে, আয়নার মত চোখের উপরে প্রাণের সমস্ত ছবি প্রতিফলিত হয়। মানুষের চোখ-মুখ এবং হাবভাব দেখে যাঁরা তাদের প্রকৃতি বলতে পারেন, তাঁরা বলেন যে, চোখ দেখলেই টের পাওয়া যায়, কোন লোক মিথ্যাকথা বলছে কি না। এটা যদি ঠিক হয় তবে এটাও সঠিক যে, শুধু সামনের ঘটনাগুলির ছবি চোখের উপরে ছাপ দিয়ে যায় না, অন্তরের সমস্ত ছবিও তাতে ধরা পড়ে।

প্রাণের স্বপ্ন ও অসীমের চিন্তা কোনদিন যদি সংজ্ঞার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে কেন চোখের পরদার গায়ে গায়ে সেই সমস্ত ছবি ফুটে উঠবেনা—এমন-কি মৃত্যুর পরেও ! স্নেহ,প্রেম কিম্বা ঘৃণা ইত্যাদির যে-কোন ভাব যে-চোখে ফুটে উঠতে পারে, সেই চোখে বিচিত্র বিস্ময়ে ভরা জীবনের কাল্পনিক আদর্শের ছবিও কেন ফুটে উঠবে না ? দেহের উপরে মৃত্যুর যে দাবী, সে দাবী ছবির উপরে চলে না।

প্রাণের চিন্তার সমস্ত ছবিই চোখের মধ্যে ধরা পড়ে, নৈলে চোখদুটো প্রাণীমাত্রেরই এমন একান্ত সঙ্গী হতো না।

এড্‌গার অ্যালেন পো এবং রাডিয়ার্ড কিপ্লিং তাঁদের উপন্যাসে এই ধরনের দু-একটা কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, যা চাক্ষুষ দেখা যায় তার ছবি চোখের মধ্যে থাকা সম্ভব, কিন্তু মিস ইয়ংএর চিন্তার ধারা তাঁদের চিন্তাকেও অতিক্রম করেছে।

কবি কোল্‌রীজ এক জায়গায় বলেছেন, চোখ বুজেও অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অভিনেত্রীও বলেন যে, এই সমস্ত ছবি হচ্ছে আত্মা ও মনের প্রতিবিম্বিত ছবি। সেক্সপীয়ারের রিচার্ড দি থার্ডের এক জায়গায়

রিচার্ড বলছেন,"মৃত্যুর আগেই আমার চোখের মধ্যে মৃত্যুর সমস্ত ছবি ভেসে উঠছে।" রূপসী অভিনেত্রীর বিশ্বাস, সেক্সপীয়ার নিজেও এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন।

মিস ইয়ংএর এই তত্ত্বকে এইজন্য একেবারে উপেক্ষা করা চলে না যে, তিনি নিজে ক্ষতি-স্বীকার ক'রে নিজের চোখদুটোকে বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষাগারে দান করতেও প্রস্তুত আছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র রায়

জাপানী আর্ট

সব জাপানী জিনিসই স্নিগ্ধ সুকুমার, চমৎকার, অপরূপ—ছোট একটি কাগজের থলি, তার ওপর ছোট একটি ছবি, তার মধ্যে একজোড়া সাধারণ কাঠের আহারের কাঠি; চেরি কাঠের এক গুচ্ছ খড়কে কাগজের মোড়কের অন্তরালে, মোড়কের ওপর ছাপা তিন-রঙা আশ্চর্য্য অক্ষর; আসমানি রঙের ছোট্ট তোয়ালে তার ওপর উড়ন্ত চড়াইয়ের পরিকল্পনা—রিক্‌স-ওয়ালা তা দিয়ে মুখ মোছে। ব্যাঙ্কের বিল, অতি সাধারণ তাম্রমুদ্রা—এ সমস্তই সুন্দর। এমন কি ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে সওদা করেছেন সেটি দোকানী যে-রঙিন সুতোয় বেঁধে দিয়েছে সেটি কত পরিপাটি—সেটি একটি দেখবার জিনিস। এখানে এসে সুকুমার পরিপাটি দ্রব্যের ভিড়ে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়.....

মনে পড়ে, জাপানের একটা বড় অগ্নিকাণ্ডর কথা শুনে এক মার্কিন ভদ্রলোক—তিনি একজন কাজের লোক—বলেছিলেন: "ওঃ ওদের অমন আগুনলাগা পোষায়; ওদের বাড়ী করতে আর খরচ কি!" সাধারণ লোকের ভঙ্গুর কাঠের বাড়ী অবিলম্বে অল্প খরচে আবার তোলা যায় বটে কিন্তু বাড়ীর অভ্যন্তরে যা থেকে বাড়ীখানিকে সুন্দর ও রমণীয় করেছিল তা গড়া যায় না—প্রত্যেক অগ্নিকাণ্ড এক একটি আর্ট-ট্রাজিডি, কারণ এ দেশ হাত-গড়া জিনিসের অসংখ্য বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ... ...আর শিল্পীর হাতে গড়া জিনিস কোনোটিই এক ছাঁচের হয় না—এমন কি একই লোকের গড়া জিনিসও নয়। বারে বারে নব নব রূপে তা প্রকাশ হয়, আর প্রতিবার যখন অগ্নিকাণ্ডে সুন্দর কিছু ধ্বংস হয়, জানবেন, একটি বিশিষ্ট আইডিয়ার বিগ্রহ নষ্ট হয়ে গেল।

সুখের বিষয়, এই অগ্নিকাণ্ডর দেশে আর্টের প্রেরণা প্রাণবন্ত, অমর। আর্টিষ্ট-সম্প্রদায়ের তিরোধানের সঙ্গে এ আর্টের নির্ব্বাণ লাভ ঘটে না; যে-আগুন আর্টিষ্টের সুকঠোর পরিশ্রম-ফলকে নিমেষে ভস্মসাৎ করে বা গলিয়ে নিরাকার পিণ্ডে পরিণত করে, সে-আগুনকেও এ আর্ট তুচ্ছ করে। যে-আইডিয়ার বিগ্রহ ধ্বংস হল আবার নব নব রচনায় তা পুনঃপ্রকাশিত হবে,—হয়তো শতাব্দীর পরে,—হয়তো হুবহু তেমনটি হবে না, তবে সেগুলি সেই পুরানো চিন্তাধারারই অনুবর্ত্তী হবে নিঃসন্দেহ। আর প্রত্যেক

আর্টিষ্ট যেন লোকলোকান্তরের কর্ম্মী। বহুবর্ষব্যাপী সাধনা ও ত্যাগের দ্বারাও সে আপনার পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না; অতীতের সকল ত্যাগের মহিমা তার অন্তরে পুঞ্জীভূত; তার আর্ট বংশপরম্পরাগত। যখন সে আঁকে বিস্তারিতপক্ষ বিহঙ্গ; মহীধর-শীর্ষে কুহেলির আস্তরণ; সকাল-সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণসুষমা; বনস্পতির জটিল শাখার বঙ্কিম ভঙ্গিমা কিম্বা নব বসন্তের অযুত পুষ্পবিকাশ; তখন তার অঙ্গুলিকে চালনা করে যারা লোকান্তরিত, যারা তার পূর্ব্বগামী। তার শিল্পকলা যুগযুগান্তের কুশলী শিল্পীর সাধনার ফল—যারা তার অঙ্কনের সার্থকতায় অহরহ নবজীবন লাভ করছে। আদিতে যা ছিল গোচর প্রয়াস পরবর্ত্তী শতাব্দীতে তা আর গোচর রইল না—তা জীবন্ত মানুষের প্রকৃতিগত হয়ে উঠ্‌ল—আর্ট-অনুভূতিতে তা পরিণত হল।

সেহেতু হোকুসাই বা হিরোশিগের ছবির রঙিন প্রতিলিপির মধ্যে প্রকৃত আর্ট, পাশ্চাত্য দেশের অনেক চিত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকা বিচিত্র নয়। অথচ প্রথমোক্ত ছবির মূল্য গোড়ায় ছিল পয়সা-পয়সা এবং শেষোক্ত ছবির মূল্য একটা গোটা জাপানী রাস্তার চেয়েও বেশী।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বগগনের প্রথম প্রভাত

পূর্ব্বজগতের একদা-সমৃদ্ধিশালী বহু নগর-নগরীর অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত-প্রায়। কেবল কয়েকটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মেসো-পোটেমিয়ায় তুর্ক ও জার্ম্মেনীর মিলিত শক্তির সহিত মিত্রশক্তির যখন প্রবল সংঘর্ষ চলিতেছিল, সেই সময় সংবাদপত্রে প্রতিদিন 'বোগ্দাদ্', 'আলেপ্পো', 'দামাস্কাস্', 'মক্কা', 'মেদিনা' ও জেরুশালেম' প্রভৃতি পৃথিবীর অতি-প্রাচীন নগরসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। ঐ-সকল পুরাতন নগরের নামের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত অতীত গৌরবের কত রহস্যময় স্মৃতি এখনও এদেশের মানুষের মনটীকে একান্ত আলোড়িত করিয়া তুলে এবং ঐতিহাসিকের অন্তরে একটা অপরিসীম বেদনার কাতরতা আনিয়া দেয়। শিল্পীর হৃদয়ে জগতের সেই বিগত শ্রীসম্পদের জন্য আক্ষেপের একটা করুণ আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠে!

সভ্যতা-দৃপ্ত য়ুরোপ আজ এশিয়ার দিকে মুরুব্বীর মত কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন! তাঁহারা আজ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, সে কোন্ নীলাকাশের সমুদিত প্রভাতারুণ সভ্যতার হিরণ কিরণে অন্ধকার য়ুরোপকে প্রথম আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিল। চার-হাজার বৎসর পূর্ব্বে খরস্রোতা য়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর ব্যবধান-ক্ষেত্রে একদিন যে বিরাট সভ্যতা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত য়ুরোপ আজ তাহারই ছায়া-স্পর্শে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। বাবিলন, আসুরীয়া,

পামীরা প্রভৃতি যখন শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যায়, কলায়, শিল্পে, সঙ্গীতে ও বিলাস-বিভ্রমে অমরাবতীরও ঈর্ষা উৎপাদন করিতেছিল, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকার অবস্থা কি ছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। 'মিশর' ও 'কিরীট' (Crete) ব্যতীত পৃথিবীর অবশিষ্ট ভাগ তখনও অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া ছিল।

প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর অনেক লুপ্তরহস্য কালের অতলগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আসুরীয়া যে একদিন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, লণ্ডন, প্যারি ও নিউইয়র্কের মত অসংখ্য সমৃদ্ধিশালী নগর-নগরীতে যে সেই দেশ পরিশোভিত ছিল, 'নাইনিভের' খননোদ্ধৃত বিবরণ হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাবিলন-সাম্রাজ্যের ভিত্তিই যে পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম, ঐতিহাসিকগণ ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে বাবিলনবাসী আরবজাতীয় সেমাইতগণ লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হইয়া যখন য়ূফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর ব্যবধানভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন সেখানে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুসভ্য সুমেরীয়গণের সাক্ষাৎ পান এবং তাহাদের নিকট হইতেই বাবিলনের সভ্যতা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। সুমেরীয় ও সেমাইতগণের মধ্যে সভ্যতার প্রবল প্রতিযোগীতার ফলে, সেইসময় যে সকল সহর গড়িয়া উঠিয়াছিল 'উর', 'আসাদ' ও 'মুঘেরাব' প্রভৃতি অধুনা-বিলুপ্ত নগরগুলি তাহাদের অন্যতম। আসাদের অধিপতি শার্গনরাজ একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তাঁহার অপরাজেয় তরবারীর সাহায্যে বাবিলনীয় সভ্যতাকে তিনি আসুরীয়া ও সাইপ্রাস পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। অতীতের ইতিহাসের মধ্যে ইঁহারই সাম্রাজ্যের কথা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। (খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ] ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একখানি প্রাচীন মৃত্তিকা-ফলকে ইঁহার কীর্ত্তিকাহিনী জলন্ত ভাষায় উৎকীর্ণ আছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নৃপতিশ্রেষ্ঠ 'হামুরাবীর' রাজত্ব-কালেই বাবিলন পৃথিবীতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল (খৃঃ পূঃ ১৯৫৮-১৯১৬)। নৃপতি হামুরাবীর যশোভাতি ও সুনাম তদানীন্তন জগতের কোন দেশেই অবিদিত ছিল না। রাজার সিংহাসন, রাজমুকুট ও রাজদণ্ড তিনিই প্রথম জগতে প্রচলিত করিয়া যান। তারপর আজ প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, এখনও পৃথিবীর সকল দেশের সকল রাজাই হামুরাবীর প্রতিষ্ঠিত উক্ত রাজ-মর্য্যাদা-জ্ঞাপক ব্যবস্থাগুলিই শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছেন। হামুরাবীর রাজ্যশাসন-প্রণালী ও বিবিধ বিধি-নিয়মের বিষয় অবগত হইয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ বর্ত্তমান জগৎ আজ বলাবলি করিতেছে যে, চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এমন সুব্যবস্থিত রাজ্য পৃথিবীতে কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছিল ?

খৃঃ পূঃ ১২৫০ অব্দ পর্য্যন্ত বাবিলনের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু খৃঃ পূঃ ১৯১৭ অব্দ হইতেই বাবিলন রাজ্যের উত্তর প্রদেশে আসুরীয়গণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া

উঠিতেছিল, এবং খৃঃ পূঃ ১২৫০ অব্দে তাহারা বাবিলনও জয় করিয়া লইল। তারপর প্রায় ছয়শত বৎসর ধরিয়া—রণকুশল পার্ব্বত্য আসুরীয়গণই বাবিলন অধিকার করিয়া ছিল! খৃঃ পূঃ ৮৯০ অব্দে প্রবলপ্রতাপান্বিত আসুরীয় সম্রাট সেন্যাচেরীব 'নাইনিভে' নগরে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু খৃঃ পূঃ ৫০৬ অব্দে—বাবিরুষেরা মেহ্‌দী ও চাল্‌দী-গনের সাহায্যে বাবিলন পুনরধিকার করিয়া আসুরীয়-গণের অশেষ গৌরবমণ্ডিত রাজধানী 'নাইনীভে' ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

এই সময় হইতে বাবিলনে চাল্‌দীগণের প্রভুত্বই প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে এই চাল্‌দীগণের ভিতর হইতেই নৃপতি নির্ব্বাচিত হইয়া বাবিলনের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। চাল্‌দী নৃপতিগণের মধ্যে 'নেবুকাদনেজার'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই 'নেবুকাদ্‌নেজার' সম্বন্ধে যে সকল হাস্যস্কর কাহিনী আজও প্রচলিত রহিয়াছে, উহার অধিকাংশই সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে নেবুকাদ্‌নেজারের মত একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠতম নৃপতি আজ পর্য্যন্ত জগতের আর কোন দেশেরই সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই।

পৃথিবীর অতীত গৌরবস্থল বাবিলন সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। অসংখ্য প্রাচীন লেখক ও বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ ইহার সম্বন্ধে যে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন, আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব মাত্র।

চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাবিলন সহর আকারে চতুষ্কোণ, এবং ইহার পরিধি পরিমাপে প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত ছিল। চারিপার্শ্বের প্রাচীর-গাত্রের প্রত্যেক দিকে পঁচিশটী করিয়া, মোট একশত সুবৃহৎ তোরণ-দ্বার ছিল। এই প্রাচীর ইষ্টক ও শিলাজতু নির্ম্মিত, ও ভিত্তিগাত্রে মধ্যে মধ্যে জল-নিকাশের জন্য ফাঁপা নল সংযুক্ত ছিল। কত দীর্ঘ শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় মাথায় করিয়া ও বারবার শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিয়াও,বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক বীর সেকেন্দার সাহের দিগ্বিজয়ের সময় বাবিলনের চারিপার্শ্বের প্রাচীর প্রায় পঞ্চাশ হাত উচ্চ ছিল এবং এত প্রশস্ত ছিল যে, ইহার শীর্ষদেশে চারিখানি চতুরশ্ব যান পাশাপাশি ছুটিয়া যাইতে পারিত। প্রাচীরের উপরিভাগে সহর-রক্ষীগণের জন্য প্রায় আড়াইশত চূড়াবিশিষ্ট কক্ষ ছিল। প্রাচীরের বাহিরে চারিপার্শ্বেই প্রসর ও গভীর পরিখা বেষ্টিত ছিল।

একশত তোরণ-দ্বার হইতে সহরে প্রবেশ করিবার একশত প্রশস্ত পথ ছিল। সহরের ভিতর পথের দুইপাশে বড় বড় চতুষ্কোণ অট্টালিকা ছিল! প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে চারিদিকের অনেকখানি জমি ছাড়িয়া রাখিয়া সহরের পত্তন করা হইয়াছিল। এই জমি নগরবাসিগণের বিহারের জন্য সাধারণ উদ্যান-রূপে ব্যবহৃত হইত এবং নগর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে এই জমিতে শাক-সব্জী ও শষ্য প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সহরবাসীরা আত্মরক্ষা করিত। য়ূফ্রেটিস্ নদীটিকে এই সহরের ঠিক মাঝামাঝি রাখা হইয়াছিল। নদীর দুইপারে সহরটি ঠিক দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সহরের ভিতর নদীর দুই তীর প্রস্তর-

বৃতি বেষ্টিত ছিল। সহরের দুই দিক হইতে যে পঁচিশটি পথ নদীর ধার পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছিল, সেই পঁচিশটি পথের শেষেই পঁচিশটি খেয়াঘাট বাঁধান ছিল। এই সকল খেয়াঘাটে পথিকদের পারাপারের সুবন্দোবস্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন একটী ভাসমান সেতু ও নদীগর্ভে একটী সুড়ঙ্গপথও নির্ম্মিত ছিল। সহরের অট্টালিকাগুলি অধিকাংশই ত্রিতল ও চারিতল বিশিষ্ট ছিল। খিলানের কাজ অপেক্ষা কড়ি-বরগার ব্যবহারই সে সময়ে সমধিক প্রচলিত ছিল।

সহরের মধ্যে স্থাপত্য-শিল্পের হিসাবে রাজপ্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ছিল, তারপরই তাহাদের জাতীয় দেবতা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু 'বেলশে'র মন্দির। সপ্তচূড়াবিশিষ্ট পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সুবৃহৎ দেবমন্দির সম্বন্ধে গ্রীক পর্য্যটক হেরোডোটাস (Herodotus) ও দায়োদোরাস্ (Diodorus) অতি চমৎকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে সুবর্ণ-নির্ম্মিত তিনটী প্রকাণ্ড বিগ্রহমূর্ত্তি ছিল। একটী 'বেলশের', একটী 'বেল্‌তীশের' ও একটী 'ডীয়া' বা 'ইশতার' মূর্ত্তি। বেল্‌তীশের মূর্ত্তির সম্মুখে দুইটী স্বর্ণসিংহ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দুই অজগর স্থাপিত ছিল। প্রত্যেকটী ওজনে প্রায় ত্রিশ সের। এই মূর্ত্তিত্রয়ের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড সুবর্ণ-বেদী ছিল। বেদিটী আকারে প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা এবং পনেরো ফুট প্রশস্ত ছিল। এই বেদীর উপর দুইটি বৃহদাকারের রজত-পানপাত্র স্থাপিত ছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে দুইটী প্রকাণ্ড ধূপদান ও বিগ্রহত্রয়ের পূজার জন্য তিনটী সুবর্ণের পঞ্চপাত্র ছিল।

য়ুফ্রেটিস নদীর উভয় তীরেই পরস্পরে সম্মুখীন দুইটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয় প্রাসাদই ইষ্টক, প্রস্তর ও সিমেণ্ট দিয়া গঠিত। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তাম্রপাতে আবৃত সুদীর্ঘ দেবদারু কাষ্ঠের স্তম্ভ পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাসাদের শিখরদেশে 'ব্রঞ্জে'র চূড়াবিশিষ্ট ও খিলান-সংযুক্ত ছিল। তোরণ-দ্বার স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত এবং অসংখ্য বহুমূল্য হীরকাদি রত্নখচিত ছিল। নৃপতি নেবুকাদ্‌নেজারের আদেশে ও তত্ত্বাবধানে এই দুই রাজপ্রাসাদ গঠিত হইয়াছিল। পৃথিবীর আর কোন দেশেই এমন বিরাট রাজপ্রাসাদ ছিল না। সহরের প্রায় ষাট মাইল স্থান অধিকার করিয়া এই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। 'কারার' তুপ খনন করিবার সময় নেবুকাদ্‌নেজারের নামাঙ্কিত ইষ্টক ও শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে।

এই রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেই অবনীর সপ্তম আশ্চর্য্যের একতম বস্তু সেই বিশ্ববিশ্রুত "দোদুল বাগান" (Hanging Garden) দোলায়মান ছিল। কথিত আছে যে, নৃপতি নেবুকাদ্‌নেজার তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা আসুরীয় মহিষী 'অমাইতীশের' মনোরঞ্জনের জন্য বহুযত্নে ও অগাধ অর্থ-ব্যয়ে এই উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। আসুরীয় সুন্দরী গিরি-নন্দিনী—রাণী অমাইতীশের বাবিলনের সমতলক্ষেত্র নাকি পছন্দ হয় নাই—তাই নরাজ প্রেয়সীর প্রীতির উদ্দেশ্যে, আসুরীয়ার পার্ব্বত্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যটুকুও বাবিলনের সমভূমির ভিতর সৃষ্টি করিয়া, এক অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

নাইনিভে, বাবিলন অপেক্ষা অনেক

ছোট। ইহার পরিধির পরিমাপ তিন মাইলের অধিক ছিল না এবং প্রস্থে মাত্র দেড়মাইল বিস্তৃত ছিল। বাবিলনের সহিত ইহার তুলনাই হয় না, তথাপি এই নাইনিভেই ছয়-শত বৎসর ধরিয়া বাবিলন শাসন করিয়াছিল। বাবিলন-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এই আসুরায় রাজধানী নাইনিভে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য-জাতি আসুরীয়েরা সুসভ্য বাবিলনের নিকট অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া পরিগণিত ছিল। ছয় শত বৎসর আসুরীয়গণের অধীনে থাকিয়াও বাবিলন তাহাদের নিকট হইতে নূতন কিছুই পায় নাই; অপরপক্ষে এই বিজিত জাতির নিকটই আসুরীয়গণ তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সামাজিক প্রথার জন্য সম্পূর্ণ ঋণী। কোন কিছু গঠন করা বা সৃষ্টি করার ক্ষমতা ইহাদের কোনদিনই ছিল না। ইতিহাস ইহাদিগকে নিষ্ঠুর, রণোপপাসু, ধ্বংসপ্রিয় ও দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্যজাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। বাবিলনের সম্পর্কে আসিয়া ইহারা ক্রমে ভদ্র হইয়া উঠে।

নাইনিভের প্রধান বিস্ময়ের সামগ্রী ছিল, সম্রাট সেন্যাচরীবের রাজপ্রাসাদ। নৃপতি 'ইসারহাদ্দন' ও 'আসুর-বাণীপালে'র প্রাসাদ-দ্বয়ও স্থাপত্য ও শিল্প-সৌন্দর্য্যে উহার সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই রাজপ্রাসাদগুলির সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব ছিল, উহাদের বিরাট আকৃতি এবং ভিত্তিগাত্রের অদ্ভুত ভাস্কর্য্য। আসুরীয়ার এই আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য শিল্প, উহার সেই দৃঢ়, সতেজ ও বাস্তব ভঙ্গী জগতের প্রাচীন কলা-সম্পদের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। নাইনিভের প্রকাণ্ড পক্ষীরাজ বৃষভ ও অর্দ্ধনারী মূর্ত্তি (Sphinxes) মিশরীয় কল্পনার অনুকৃতি হইলেও, ইহার উপর আসুরীয় কলার একটা নিজস্ব বিশেষত্বের যে স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা হইতে ঐ ভীম-ভৈরব ভাস্করগণের স্বজাতিবৃন্দের একটা দুর্দ্দান্ত চরিত্রের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়।

নাইনিভে ব্যতীত আরও তিনটী প্রাচীন আসুরীয় সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাইনিভের ষাট মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান কাল্‌হে-শোরিয়াৎ নামক স্থানে আসুরীয়ার আদি রাজধানী 'আসুর'। দশ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান খোর্শাবাদের নিকট নৃপতি শার্গনের প্রতিষ্ঠিত "দ্বারশার্গীনা", এবং ত্রিশ মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান নীমরূদ্ প্রদেশে 'কালাহ' নগরের অস্তিত্বের প্রচুর নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কালাহ যখন আসুরীয় রাজধানী ছিল, নাইনীভে তখন একটী প্রাদেশিক সহরের মধ্যে পরিগণিত ছিল। খৃঃ পূঃ ৮৮৩ হইতে ৮৫৮ অব্দের মধ্যে, প্রবলপ্রতাপান্বিত আসুরীয়রাজ বীরশ্রেষ্ঠ 'অসুর-আইজীরপালে'র রাজত্ব-কালে 'কালাহ' সর্ব্বগৌরবে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নৃপতি অসুর-আইজীর-পাল শুধুই যে একজন নিষ্ঠুর রণোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহা নহে, সুচারু কারুকলা ও শিল্প-সৌন্দর্য্যেরও তিনি একান্ত মুগ্ধ উপাসক ছিলেন। কালাহ নগরে তিনি যে অপরূপ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অতুল শিল্প-শোভার যশোগান অনেক প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রিটীশ মিউজিয়মে এই অতি-নিষ্ঠুর অথচ শিল্প-সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত পক্ষপাতি নৃপতি অসুর-আইজীরপালের একটী গম্ভীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই প্রতিমূর্ত্তি তদানীন্তন ভাস্কর্য্য-শিল্পের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। মূর্ত্তিটী দেখিবামাত্র দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে দুইসহস্র বৎসর পূর্ব্বের এই অসাধারণ মানুষটীর অদ্ভুত চরিত্র যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে! প্রতিমূর্ত্তির প্রত্যেক অংশে পরিস্ফুট একটা নির্দ্দয় দুর্দ্ধর্ষতার ভৈরব ভাব দর্শকের অন্তরে প্রথমে ভীতির সঞ্চার করে, অথচ সেইসঙ্গে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত এই মূর্ত্তিটি, রাজার অপরিসীম সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিচয়টুকুও সুপ্রকাশ করিয়া দেয়!

অসীম আসুরীয় শক্তি ও সুকুমার শিল্পের সম্মিলিত বিচিত্র লীলাক্ষেত্র কালাহ কালের অতল গর্ভে আজ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

বাবিরুষেরা যে মেদিশজাতির সাহায্যে আসুরীয় অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া স্বদেশের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিল, সেই মেদীশ নৃপতি সায়াক্সারীস্ বাবিলনের সহিত মিত্রতা-সূচক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বহুদিন পশ্চিম এশিয়ার রাজস্বের অর্দ্ধাংশ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু মেদিশগণের প্রতিবেশী সামন্ত নৃপতি পারস্যরাজ সাইরাশ খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে সায়াক্সারীস্‌কে পরাজিত করিয়া, মেদিশ অধিকার করেন এবং ক্রমশঃ উহা পারস্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। খৃঃ পূঃ ৫৩৯ অব্দে পারস্যরাজ সাইরাশ বাবিলনও জয় করিয়াছিলেন। বেলশাজার ভোজের রাত্রে (Belshazzar's Feast) বাবিলনে মহা উৎসব চলিতেছিল; সমস্ত নগর উদ্দাম আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত, সহর-রক্ষী সৈনিকেরা এবং নদীপথে ঘাটের প্রহরীরাও উৎসব উপলক্ষে ছুটী পাইয়া সেদিন আনন্দে মদ ঢালিয়া দিয়াছে, সেই সুযোগে সাইরাশ অসংখ্য সৈন্য লইয়া ঝড়ের মত বেগে বাবিলনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিমেষের মধ্যে বাবিলনের চারিদিকে সাইরাশ-বাহিনীর শত শত শাণিত লেলিহান অগ্নিশিখা প্রলয়ের ধূম উদ্গীরণ করিয়া একত্রে জ্বলিয়া উঠিল; সহসা অসির ভীম ঝনৎকার উৎসবের গীতবাদ্যকে ভেদিয়া দেখিতে রোদনের হাহাকারে পরিণত করিয়া দিল। চাল্‌দী নৃপতি বেলশাজার সহসা অতর্কিত আক্রমণে আহত হইয়া চিরনিদ্রায় শয়ন করিলেন। দানিয়েলের বর্ণিত 'বেলশাজার-ভোজ' ("Belshazzar's Feast.") বাল্যকালে বোধ হয় অনেকেই পড়িয়াছেন।

মেদিশদের একমাত্র গর্ব্বের ধন ছিল তাহাদের রাজধানী 'এচাতনা'। পারস্যের অধীনে আসিবার পর এচাতনার রাজপ্রাসাদ পারস্য নৃপতিগণের নিদাঘ-আবাসে পরিণত হইয়াছিল, কারণ এচাতনা উত্তর প্রদেশের পর্ব্বতের উপর স্থাপিত বলিয়া গ্রীষ্মের সময়ও সেখানে বেশ শীতানুভব হইত। পারস্যের আদি ও প্রাচীনতম রাজধানী ছিল 'পাশার-গার্দ্দে' নগর, যেখানে এক্ষণ বর্ত্তমান 'মুরঘাব' সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুরঘাবের নিকটে পাশারগার্দ্দের বিচূর্ণ ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানেই মহারাজ সাইরাশের মৃতদেহ কবরশায়ী হইয়াছিল। সাইরাশের সমাধি-মন্দির এখনও অটুট আছে বলে

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার সুবর্ণ-নির্ম্মিত অংশে কারুকার্য্যখচিত শবাধারটী অনেক [illegible] অন্তর্হিত হইয়াছে। তারপর [illegible] রাজধানী হইয়াছিল 'শুসা' নগর, [illegible] শুস্তার নামে অভিহিত হইতেছে। [illegible] প্রসিদ্ধ পারস্য নৃপতি দারিয়ুশ তাঁহার [illegible] প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং [illegible] র মধ্যে তাঁহার প্রধান ধনাগার [illegible]। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার সাহ (Alexander the Great) যখন পারস্য [illegible] তখন তিনি এই ধনাগার লুণ্ঠন [illegible] অর্থ সম্পদ হস্তগত করিয়া- [illegible] রাজ্যের রাজধানীগুলির মধ্যে [illegible] ও ঐশ্বর্য্যে 'পার্শিপলিশ'ই সর্ব্ব- [illegible] ছিল। দারিয়ুশ, জারাক্সেস্ [illegible] রাজারাক্সেসের নির্ম্মিত রাজ- [illegible] ভগ্নাবশেষ হইতে, পৃথিবীর [illegible] সুন্দর স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন [illegible]।

[illegible] জারাক্সেসের মনোহর বিচিত্র রাজপ্রাসাদ [illegible] সেকেন্দার [illegible] স্বহস্তে ধ্বংস করিয়াছিলেন। [illegible] পার্শিপলিশ অধিকার করিয়া গ্রীক বাহিনী [illegible] বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, [illegible] সেই আনন্দ-বাসরে, গ্রীকরাজসভার [illegible] প্রসিদ্ধা বেশ্যা, আথেন্সের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী [illegible] সম্রাট্‌কে [illegible] করিলেন যে, জারাক্সেস্ যেমন [illegible] সুন্দরগুলি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত [illegible] তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ [illegible] জারাক্সেসের নির্ম্মিত এই রাজপ্রাসাদ আজ অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করা হউক! সুরাপানোন্মত্ত সেকেন্দার সাহের পার্শ্বচরগণ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইল এবং

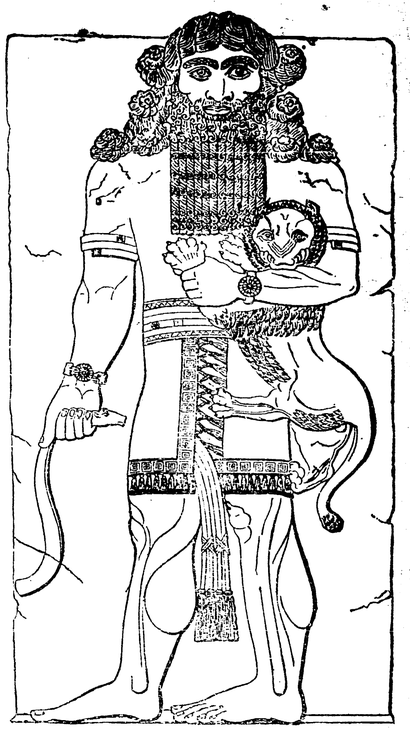

আসুরিয়ার ভাস্কর্য্য

সম্রাটকে স্বহস্তে প্রথম অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সেকেন্দার সাহ বিজয়ীবীরগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, গীতবাদ্য ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে মহা সমারোহে তিনি জারাক্সেসের অতুল রাজপ্রাসাদে প্রথম অগ্নি সংকার করিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তিনি এজন্য অনুতপ্ত হইয়া সত্বর অগ্নি নির্ব্বাপনের আদেশ দিয়াছিলেন এবং প্রজ্বলিত

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

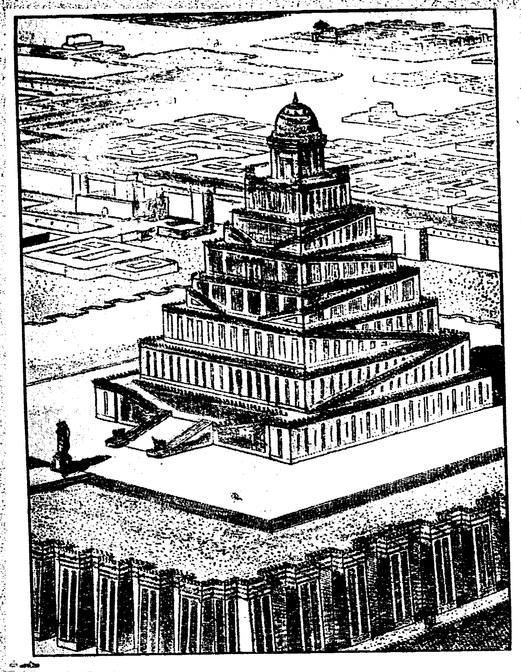

ব্যাবিলনের স্থাপত্য

রাজপ্রাসাদের কতকটা গৌরব-সম্পদ রক্ষা করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেকেন্দার সাহ'র প্রধান সেনাপতি বীর-শ্রেষ্ঠ সেল্যুকাস্ সিরীয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল 'অ্যান্টিয়োক্'। ইনি বাবিলনও জয় করিয়াছিলেন এবং ইঁহার বংশধরেরা খ্রীঃ পূঃ ১১২ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত সিরিয়া শাসন করিয়াছিলেন। পরে সিরিয়া 'পম্পের' অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রাচীন সিরিয়ার আদি রাজধানী ছিল দামাস্কাস্। দামাস্কাস বহুবার আসুরীয়গণের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া শেষে খৃঃ পূঃ ৭৩২ অব্দে আসুরীয়ার অধীন হইয়া পড়ে। এখনও দামাস্কাস সিরিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর বলিয়া পরিগণিত।

দামাস্কাসের পূর্ব্বপ্রান্তে, সিরিয়ার মরুভূমির পরপারে, পামিরীন প্রদেশ খরস্রোতা য়ুফ্রেটিসের সুপ্রচুর স্নেহধারায় সিক্ত হইয়া ফল-জল-শস্য-শ্যামল-সুন্দর শ্রীধারণ করিয়াছিল। এই খানেই ইতিহাস-বিশ্রুত মহিমময়ী মহারাণী 'জেনোবিয়ার' সুরম্য রাজধানী 'পামীরা' অবস্থিত ছিল। পামীরার প্রাচীন গৌরবের প্রচুর ধ্বংসাবশেষ এখনও স্তূপাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। পামীরার প্রতাপশালিনী অধীশ্বরী রাণী জেনোবিয়া ২৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিরিয়া, মিশর ও এশিয়ার পশ্চিমাংশের অনেকখানি পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন, পরে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়,—বিজয়ী 'অরেলিয়ান' তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া লইয়া যান। রাণী জেনোবিয়ার সঙ্গে সঙ্গে পামীরার রাজলক্ষ্মীও চিরদিনের মত নির্ব্বাসিতা হইলেন।

পূর্ব্ব জগতের এই সব প্রাচীনতম রাজধানীই বিশ্বমানবের জ্ঞান ও আধ্যাত্মশক্তির আদিম জন্মভূমি। এইখানেই মানুষ আজ মানুষ বলিয়া যাহা-কিছুর জন্য গর্ব্ব করিতে পারে, তাহার প্রথম বিকাশ দেখা গিয়াছিল।

সংখ্য দেবদেবীর পূজা, আবার একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা এইখানেই প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল। মানুষের বুদ্ধি, মানুষের বিবেক এইখানেই প্রথম আপনার আত্মা ও অস্তিত্ব লইয়া দর্শনের সেই সূক্ষ্মতম তত্ত্বের চিন্তা ও আলোচনা করিতে সুরু করিয়াছিল। এইখানেই মানুষ প্রথম সৃষ্টি ও বিশ্বরহস্যের যবনিকা উদ্ঘাটন মানসে জড়বিজ্ঞানের প্রথম সোপান নির্ম্মাণ করিয়া, তত্ত্বানুসন্ধানের একটা ধারাবাহিক পথ দেখাইয়া দিয়াছে। এইখানেই সুকুমার কারুকলার প্রথম বিকাশে সর্ব্বাগ্রে মানুষের অন্তর্নিহিত একটা সৌন্দর্য্য-পিপাসার গোপন বার্ত্তা বিশ্বের নিকট প্রথম ব্যক্ত হইয়াছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনীয় যে নব নব শিল্প-সম্ভার নিত্যই সৃষ্টি হইতেছে, এইখানেই তাহার সর্ব্বপ্রথম সূচনা হইয়াছিল। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যবহার, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, অক্ষরলিপি ও হস্তলিখন, কবিতা, গল্প ও কল্পনার নানা বিচিত্র বিকাশ এই সকল দেশকেই প্রথম উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাই বোধ হয় আজও এই সকল দেশের নাম শুনিলেই জ্যোৎস্নাস্নাত পূর্ণিমারাত্রে প্রিয়তমের পার্শ্বে বসিয়া প্রেমের কবিতা শোনার মত, একটা অপার্থিব আনন্দ-ধারায় দেহমন অভিষিক্ত হইয়া দেয়।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

মুষ্টিযুদ্ধ

কুস্তি, যুযুৎসু ও মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি ব্যায়াম এক-একটা জাতির জীবনের পরিচয় দেয়। পৃথিবীর যে-সব জাতি এখনো দেহে-মনে জ্যান্ত আছে, তাহাদের সকলের ভিতরেই এই-সব ব্যায়ামের রীতিমত উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়—কারণ এগুলি হইতেছে, জীবনের চাঞ্চল্য। কেবল মনের চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া, জ্ঞান-বুদ্ধির চাষ করিয়া কোন জাতিই এই বীরভোগ্যা ধরণীতে বেশীদিন বাঁচিতে পারে না। দেহকে অবহেলা করিয়া মন বা মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখা অসম্ভব।

অথচ বাঙালী জাতির আজকাল সেই দুর্দ্দশাই হইয়াছে। য়ুরোপ-আমেরিকায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবক বা কলাবিদ যতটা আদর পান, কোন বড় পালোয়ানের সম্মান তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু বাঙলাদেশে পালোয়ানদের সম্মান একরকম নাই বলিলেও চলে,—কেননা, বিদ্বান বাঙালী পালোয়ানীকে মুর্খের কাজ বলিয়া উপেক্ষা প্রকাশ করে!

ভারতের যে-সব জাতি আমাদের মত এতটা নির্জ্জীব নয়, তাহাদের মধ্যে এখনো দৈহিক বল-বীর্য্যের চর্চ্চা ও আদর যথেষ্টই আছে। বাঙলাদেশে এক যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু) ছাড়া উল্লেখযোগ্য পালোয়ান আর আছেন কিনা, জানিনা। কিন্তু অন্যান্য দেশে পালোয়ানের নাম অগুন্তি। রেণীওয়ালা,

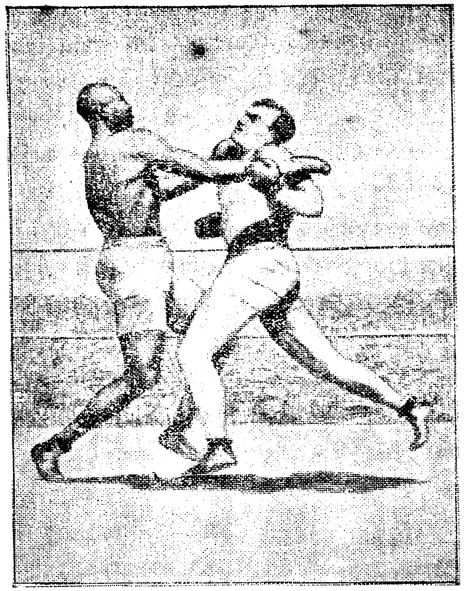

জনসনের হাতে বার্ণ্‌স্ মার খাইতেছে

গোলাম, কিঙ্কর সিং, সুচেৎ সিং, কাল্লু, গামা, ইমামবক্স, হোসেনবক্স ও গুট্টা সিং প্রভৃতি অধিকাংশ দিগ্বিজয়ী পালোয়ানকে আমরা ভারতবাসী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি বটে, কিন্তু বাঙালী বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি না।

দেহে দুর্ব্বল বলিয়া বিদেশীরাও আমাদিগকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করে না। ঘরের বাহিরে রাজপথে বা রেলপথে সাহেবদের ঘুসি ও জুতা ত আমাদের প্রতিদিনের সুলভ 'আহার্য্য',—বিদ্বান, প্রতিভাবান বা ধনবান বলিয়া আমরা কেহই রেহাই পাই না। কিন্তু একজন গরীব, 'মূর্খ' ও 'নির্ব্বোধ' পাঞ্জাবী বা কাবুলী ওয়ালাকে কোন সাহেব কি অপমান করিতে সাহস পায়? বাঙালী যেখানে ঘুসি-জুতা তেঁতো ওষুধের মত হজম করিয়া আসিয়া খবরের কাগজের কলমের উপর কলম বাগাইয়া বসে, অন্যান্য সবল জাতি সে-ক্ষেত্রে হাতে হাতে সুদে-আসলে ঘুসি-জুতা চট্‌পট্ ফিরাইয়া দেয়!

আসল কথা, আত্মরক্ষার জন্যও বাঙালীর পক্ষে এখন উপযোগী ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের মাসিক পত্রাদিতে এ-সব বিষয়ে কোন আলোচনাই প্রায় দেখা যায় না। সকলকারই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা এবারে মুষ্টিযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিব। বারান্তরে ভারতের পালোয়ানদের সম্বন্ধেও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আত্মরক্ষার পক্ষে মুষ্টিযুদ্ধের মত উপকারী ব্যাপার আর খুব কমই আছে। একজন মাঝারি দরের মুষ্টিযোদ্ধা বেশ উঁচুদরের একজন কুস্তিগীর পালোয়ানকেও রীতিমত কাহিল করিয়া দিতে পারে। যিনি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে মুষ্টি ব্যবহার করিতে জানেন, পথে-বিপথে হঠাৎ আক্রান্ত হইলে, চার-পাঁচজন মহা-বলবান লোককেও অনায়াসে ভূতলশায়ী করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত

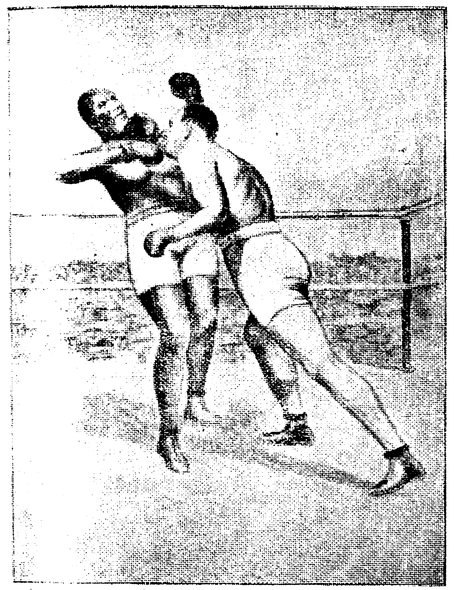

জনসন, জেফ্রিসের ঘুসি এড়াইয়া সরিয়া যাইতেছেন

কঠিন কার্য্য নয়। সাধারণত আনাড়ীরা যে ভাবে ঘুসি লড়ে, তাহাতে শক্তির অপচয় হয় মাত্র,—তাহাতে বাতাসে হাত-নাড়া হয় যথেষ্ট, কিন্তু প্রতিপক্ষকে ঘুসি-মারা আর হইয়া ওঠে না, বা মারিতে পারিলেও ঘুসিটা ঠিক জায়গায় উচিতমত জোরের সঙ্গে গিয়া পড়ে না। মুষ্টিযুদ্ধে যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহারা চোখের নিমেষে একটি-মাত্র ঘুসিতে প্রতিপক্ষকে একেবারে অজ্ঞান করিয়া দিতে পারেন। কুস্তির মত মুষ্টি-যুদ্ধেও দাঁড়াইবার কায়দা, পাঁয়তারা ও অসংখ্য বিখ্যাত প্যাঁচ আছ, সে-সব নিয়মিতভাবে দস্তুরমত অভ্যাস করিয়া শিখিতে হয়। মানুষের দেহে প্রধানত চারটি জায়গার উপরে মুষ্টিযোদ্ধাদের লক্ষ্য থাকে, সে-সব জায়গায় ঘুসি লাগিলে লোকে হয় অজ্ঞান, নয় অত্যন্ত কাবু হইয়া যায়। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের প্যাঁচ বা প্রণালী লইয়া এই সংক্ষিপ্ত স্থানে উপযুক্ত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়—বিশেষ, সে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাও অসম্পূর্ণ, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা খালি মুষ্টিযুদ্ধের একটি মোটামুটি ইতিহাস দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ভারতবর্ষেও পূর্ব্বে যে মুষ্টি-যুদ্ধের প্রচলন ছিল, প্রাচীন পুরাণ ও কাব্যাদিতে তাহার কিছু-কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের আর্ট বিশেষভাবে বিকসিত হইয়াছে পাশ্চাত্যদেশে। এদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকাই প্রধান, আজকাল ফ্রান্স ও বেলজিয়মেও মুষ্টিযুদ্ধের আদর ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

সেকালে বিলাতের লোকেরা ঘুসির লড়াই অত্যন্ত ভালোবাসিত। এমন-কি বাইরণ, কীট্‌স্ ও ল্যাণ্ডর প্রভৃতি বাণীর বরপুত্ররাও তখন মুষ্টিযুদ্ধ লইয়া মাতিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের ঘুসির লড়ায়ের অনেক গল্প এখনো বিখ্যাত হইয়া আছে।

তখনকার পেশাদার ওস্তাদরা খালি হাতে ঘুসি লড়িতেন। এখন হাতে মোটা

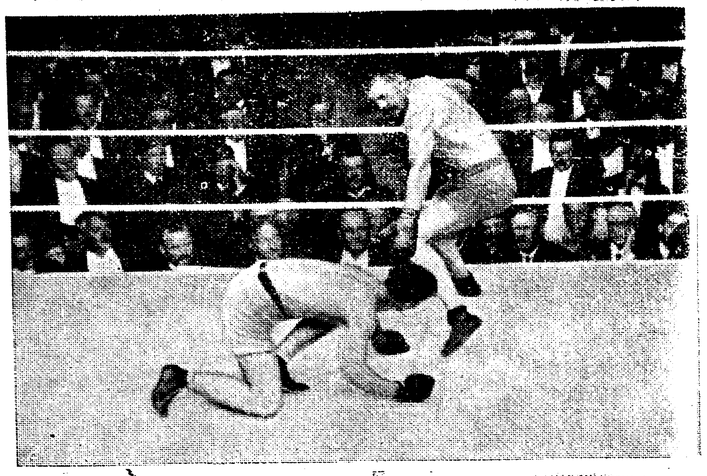

কার্পেনটিয়ার ও স্মিথের মুষ্টিযুদ্ধ

দস্তানা পরিয়া ঘুসি-লড়া হয় বলিয়া, যোদ্ধাদের হাত-গা-মুখ ফাটিয়া তত বেশী রক্তারক্তি হয় না। তারপর সেকালে লড়ায়ের সময়ও নির্দ্দিষ্ট থাকিত না। ক্রমাগত ঘুসাঘুসির পর যতক্ষণ-না একজন যোদ্ধা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও বেদম হইয়া পড়িত, প্রায়ই ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুরা জোরে লড়াই চলিত। কিন্তু আজকাল লড়ায়ের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাহার উপরে এখন ঘুসি খাইয়া ভূতলশায়ী হইয়া কোন যোদ্ধা যদি দশ সেকেণ্ডের মধ্যে গাত্রোত্থান করিতে না পারে, তবে তাহার হার সাব্যস্ত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর ঘুসিকে "knock-out blow" বলা হয়। যে লড়ায়ে knock-out blow মারা হয় না, সেখানে যে যোদ্ধা বেশীবার তাহার প্রতিপক্ষকে ঘুসি মারিতে ও প্রতিপক্ষের ঘুসি এড়াইয়া সরিয়া আসিতে পারে (অবশ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে), তাহাকেই জেতা বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইহা "Points"এর দ্বারা জয়লাভ বলিয়া বিখ্যাত। তাহার উপরে সেকালের লড়ায়ে আরো ঢের শক্ত নিয়ম ছিল—একালে যাহা নাই।

কিন্তু সেকালের লড়াই শক্ত ছিল বলিয়া যোদ্ধাগণকেও যথেষ্ট কৌশলী হইতে হইত। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেকালের যোদ্ধাদের তুলনায় একালের যোদ্ধারা অনেকটা নীচুদরের হইয়া পড়িয়াছে! আমরা অতঃপর কয়েকটি বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বলিব। সকলেই স্মরণ রাখিবেন, "ভারি ওজনের" (Heavy-Weight) পালোয়ানদের কথাই আমাদের আলোচ্য।

জেম বেল্‌চারের সঙ্গে টম ক্রিবের লড়াই হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে। বেল্‌চার "মুষ্টিযুদ্ধের নেপোলিয়ন" নামে বিখ্যাত। তাঁহার ঘুসির

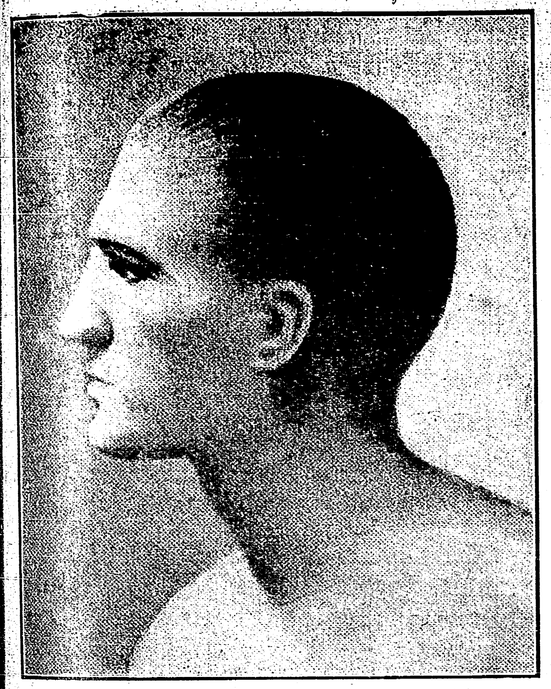

কার্পেন্‌টিয়ার

মুখে কেহই টিঁকিতে পারিত না। কিন্তু উদীয়মান মুষ্টিযোদ্ধা ক্রিবের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সময়ে তাঁহার একটি চোখ কাণা হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার যুঝিবার ক্ষমতাও কমিয়া আসিয়াছিল। এই চিত্তাকর্ষক প্রতিযোগিতায় ডিউক অফ ক্লারেন্স (পরে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ম) প্রমুখ সমাজের উচ্চস্তরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং সেরিডান, বাইরণ ও মুর প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যসেবীরা দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। আঠারো মণ্ডল (round) পর্য্যন্ত বেল্‌চার তাঁহার প্রতিযোগীকে সকলদিকেই বারংবার ভূতলশায়ী ও আহত করিয়া অবশেষে দৈবগতিকে হাতের কব্জি মচকাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় একচল্লিশ মণ্ডল পর্য্যন্ত সমানভাবে যুঝিয়া, ক্রিবের হাতে শেষটা তাঁহাকে হার মানিতে হইল।

তাহার পরের বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধ হয় বিলাতের টম সেয়ার্সের সঙ্গে আমেরিকায় জন হিনানের (১৮২৬ খৃষ্টাব্দে)। সাঁইত্রিশ মণ্ডল পর্য্যন্ত এই লড়াই চলিয়াছিল। প্রায় তিনঘণ্টা-ব্যাপী অশ্রান্ত ঘুসাঘুসি করিতে করিতে সেয়ার্সের ডান হাতখানি ভাঙিয়া গেল এবং হিনান প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িলেন,—তবু কিন্তু সেই বিষম লড়াই থামিল না। বিলাতে তখন মুষ্টিযুদ্ধ বে-আইনী ছিল! শেষটা হার-জিৎ হইবার আগেই তাই পুলিশ আসিয়া এই লড়াই থামাইয়া দেয়। এই প্রতিযোগিতায় অদ্ভুত সাহস ও সহ্যক্ষমতার পরিচয় দিয়া সেয়ার্স পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বখশিস পাইয়াছিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডজয়ী জেম মেসের সঙ্গে টম কিংএর মুষ্টিযুদ্ধ হয়। প্রথমবারে মেস চেতাল্লিশ মণ্ডলে কিংকে সম্পূর্ণরূপে

বেকেট

পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় সর্ব্বত্রই ঘুসি লড়িয়া দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং কিংএর পরে আর কেহই তাঁহাকে হারাইতে পারেন নাই। সাধারণত প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধারা ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই অনেকটা অকেজো হইয়া পড়েন, কিন্তু মেসের বয়স যখন চৌষট্টি বৎসর, তখনো উচ্চশ্রেণীর যুবক মুষ্টিযোদ্ধারা তাঁহার এক-একটি ঘুসি খাইয়া চোখের সাম্‌নে সর্ষেফুল দেখিত।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্বেতাঙ্গে-কৃষ্ণাঙ্গে প্রথম বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধ হয়। পিটার জ্যাকসন জাতিতে কাফ্রি এবং ফ্রাঙ্ক স্ল্যাভিন জাতিতে ইংরেজ—তাঁহার জন্মস্থান অষ্ট্রেলিয়া। পূর্ব্বোক্ত জেম মেসের বিখ্যাত ছাত্র ল্যারি ফলির কাছে হারাইয়া দেন। দ্বিতীয় বারেও প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত মেস আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন,—এমন-কি, কিং-এর জিতিবার আশা আর তিলমাত্র ছিল না। কিন্তু লড়িতে লড়িতে হঠাৎ দুর্ভাগ্য-ক্রমে মেসের পা একবার পিছলাইয়া যায় এবং সেই ফাঁকে কিং তাঁহার মুখের উপরে এমন এক ঘুসি বসাইয়া দেন যে, তাহার অল্পক্ষণ পরেই শক্তিহীন মেস পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। মেসের মত মুষ্টিযোদ্ধা পৃথিবীতে আর জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ! তিনি প্রায়

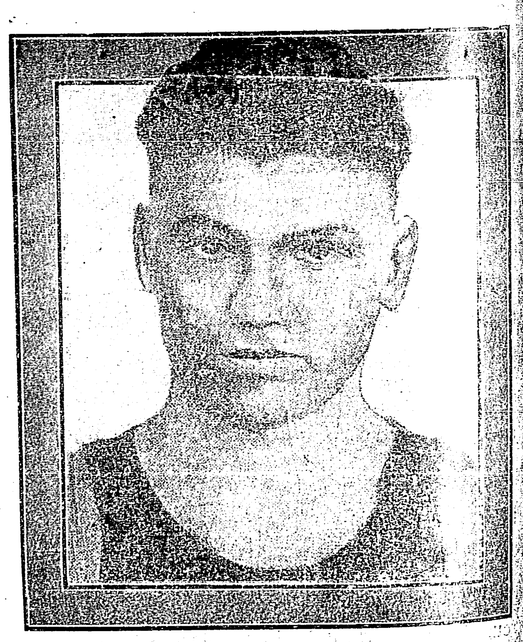

জ্যাক ডেম্প্‌সী

জ্যাকসন মুষ্টিযুদ্ধ শিখিয়াছিলেন। একবার ছাড়া জ্যাকসন জীবনে আর-কখনো পরাজিত হন নাই। স্ল্যাভিনও মুষ্টিযুদ্ধে পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার বিষম ঘুসির মুখে কোন প্রতিপক্ষই বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিত না। ইংরেজরা তাঁহাকে অজেয় জানিয়া জ্যাকসনের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধের বন্দোবস্ত করেন।

যুদ্ধের দিন রঙ্গক্ষেত্র একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস, একজন কৃষ্ণাঙ্গ কখনো উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিযুদ্ধে শ্বেতাঙ্গকে পরাজিত করিতে পারিবে না! কিন্তু সকলকার বিশ্বাসই ভ্রান্ত হইল; কারণ নয় মণ্ডলের মধ্যেই জ্যাকসন অপূর্ব্ব নিপুণতা ও তৎপরতা দেখাইয়া স্ল্যালভিনকে কাবু করিয়া আনিলেন। তারপর দশম মণ্ডলের প্রথমেই জ্যাকসন তাঁহার প্রতিযোগীর চোয়ালে এমন এক ঘুসি মারিলেন যে, স্ল্যাভিন পড়িয়া না গেলেও অত্যন্ত অসহায় ও হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিলেন। জ্যাকসন ইচ্ছা করিলে তখন তাঁহার শ্বেতাঙ্গ প্রতিযোগীকে যত-খুসি মারিয়া হাড় ভাঙিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তা না করিয়া তিনি মধ্যস্থের (referee) দিকে ফিরিয়া সদয় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি এখনো লড়ব?" মধ্যস্থ নিয়মের বাহিরে যাইতে পারেন না, কাজেই তিনি বলিলেন, "লড়ো।"—"তা হলে বেচারীকে শেষ না ক'রে আমার আর রেহাই নেই? বেশ, তবে তাই হোক্!" এই বলিয়া জ্যাকসন ফিরিয়া, তাঁহার সেই স্তম্ভিত প্রতিযোগীকে খুব জোরে ঘুসি না মারিয়া, আস্তে আস্তে দু-চারিটা হাল্‌কা ঘুসিতে ধীরে ধীরে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিলেন। কাফ্রিবীর জ্যাকসনের মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ দর্শকরা তাঁহার নামে জয়-ধ্বনি করিতে লাগিল। বাস্তবিক, জ্যাকসনের মত করুণাভরা বীরত্ব আজ-পর্য্যন্ত আর-কোন মুষ্টিযোদ্ধাই দেখাইতে পারেন নাই।

ইহার পরে আর তিনটি প্রথম শ্রেণীর মুষ্টি-যুদ্ধ হয়। কর্বেটের সঙ্গে সলিভ্যানের (১৮৯১), ফিজসিমন্সের সঙ্গে কর্বেটের (১৮৯৬) এবং জেফ্রি-সের সঙ্গে ফিজসিমন্সের (১৮৯৯)। এই তিনটি যুদ্ধেই প্রথমোক্ত যোদ্ধারা জয়লাভ করেন।

তারপরেই মুষ্টিযুদ্ধে মহাবীর জ্যাক জনসনের আত্মপ্রকাশ। জনসনের সঙ্গে প্রথমে টমি বার্ণ্‌সের মুষ্টিযুদ্ধ হয়। জেফ্রিস তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা। বার্ণ্‌সের সঙ্গে জনসনের ঘুসির লড়াই হইবার কিছুদিন আগে, জেফ্রিস্ পৃথিবীর সমস্ত যোদ্ধাকে হারাইয়া এই বলিয়া রঙ্গক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, "যদি কোন কৃষ্ণাঙ্গ মুষ্টিযুদ্ধে প্রধান হয়ে ওঠে, তবেই আবার আমি ঘুসি লড়ব—নইলে এই পর্য্যন্ত।" তারপর গোলন্দাজ ময়েরকে হারাইয়া টমি বার্ণস্ "পৃথিবীজয়ী বীর" (Champion of the World) নামে সম্মানের উপাধি পান। এই সময়ে কাফ্রি-বীর জনসন মুষ্টিযুদ্ধে বিখ্যাত তিনজন কাফ্রি—স্যাম ম্যাক্‌ভিয়া, স্যাম ল্যাংফোর্ড ও জো জেনেটকে এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব "পৃথিবী-জয়ী বীর" ফিজসিমন্সকে মাত্র দুই মণ্ডলে হারাইয়া দিয়া বার্ণ্‌স্‌কে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বার্ণ্‌স্ প্রথম কিছুদিন তা-না-নানা করিয়া শেষটা নব্বই হাজার টাকা পুরস্কারের লোভে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জনসনের সঙ্গে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু জনসনের লড়িবার কায়দা ছিল এমন আশ্চর্য্য

যে, বিড়াল যেমন ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করে, তেমনি অবলীলায় তিনি বার্ণ্‌সকে লইয়া ঘা-খুসি-তাই করিতে লাগিলেন। লড়িতে লড়িতে সহাস্যে তিনি বার্ণ্‌সকে বলিলেন, "এস হে টমি, আমি তোমাকে নতুন-কিছু শিখিয়ে দেব!'—ক্রুদ্ধ টমি বার্ণ্‌স্ "ওরে পীত কুকুর!" বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া, এক ঘুসি খাইয়া মাটির উপরে ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। মারের চোটে বার্ণ্‌সের সর্ব্বাঙ্গে যখন রক্তের স্রোত,—তাঁহার প্রাণ যখন যায়-যায়, তখন পুলিস আসিয়া লড়াই থামাইয়া দিল। জনসন লড়াই জিতিয়া "পৃথিবী-জয়ী বীর" উপাধি লাভ করিলেন। শ্বেতাঙ্গরা যে কৃষ্ণাঙ্গদের একঘরে করিয়া আপনাদের মধ্যেই সম্মান ভাগ করিয়া নেয় এবং সুযোগ পাইলে কৃষ্ণাঙ্গরা যে শ্বেতাঙ্গদের অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারে, জনসন তাহা প্রমাণিত করিয়া দিলেন।

কিন্তু জনসনের জয়ে শ্বেতাঙ্গদের গাত্র-জ্বালার আর অবধি রহিল না। কালোর হাতে সাদার হার! ছি ছি—কি অপমান! অতএব 'স্বাধীনতা ও উদারতার ভক্ত' আমেরিকান তথা য়ুরোপীয়গণের প্রাণ আর কি ধৈর্য্য ধরিতে পারে? অবিলম্বে চারিদিকে দূত ছুটিল এবং সারা পৃথিবীতে জনসনকে হারাইতে পারে, এমন একজন শ্বেতাঙ্গকে খোঁজা হইতে লাগিল। পর বৎসরেই ষ্ট্যানলি কেচেল নামে একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধাকে আনিয়া জনসনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। জনসন কিন্তু বারো মণ্ডলের মধ্যেই ঘুসি মারিয়া কেচেলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া, শ্বেতাঙ্গদের বড় আশার বাতি নিবাইয়া দিলেন। সকলে তখন জেফ্রিসের কাছে গিয়া এই বলিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িলেন—'এস জেফ্রিস্! এখন তুমি না লড়ায়ে নামলে, এই বেয়াদপ কালা আদমীর হাতে সাদার মান-মর্য্যাদা একেবারে লোপ পেয়ে যাবে!' প্রথমটা নানা ওজরে লড়িতে আপত্তি করিয়া, শেষটা শ্বেতাঙ্গদের মুখরক্ষার জন্য অপরাজিত মহাবীর জেফ্রিস্ আসিয়া রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। জেফ্রিস্ যেমন মত্তহস্তীর মত বিপুলবপু এবং ভয়ানক বলবান ছিলেন, তাঁহার ঘুসির প্রবলতা ও যুদ্ধপ্রণালীও তেমনি বিচিত্র ও নিখুঁত ছিল। শ্বেতাঙ্গরা বুঝিলেন, 'কালা আদমীটার আর বাঁচোয়া নাই, এইবার যাদু মজাটা টের পাবেন, জেফ্রিসের সঙ্গে কোন চালাকিই চল্‌বে না!'

জেফ্রিসের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে জয়ী হওয়াই ছিল জনসনের জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা। লড়ায়ের আগে জনসন বলিয়াছিলেন, "হাজার অর্থলোভ দেখালেও জেফ্রিসের সঙ্গে আমি 'সাজানো লড়াই' (fake fight) লড়ব না। কেন আমি জেফ্রিস্‌কে হারাতে উৎসুক? সাদা আদমীরা যাতে আমাকে মানতে বাধ্য হয়, যাতে তারা আমাদের চেয়ে খাটো হয়, আমি তাই করতে চাই! আমি তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই যে, জ্যাক জনসন হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে সেরা যোদ্ধা—যদিও তার গায়ের চাম্‌ড়া মিশ্‌মিশে কালো!"

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই জেফ্রিসের সঙ্গে জনসনের এই স্মরণীয় যুদ্ধ হয়। প্রথম ছয় মণ্ডল পর্য্যন্ত দুই যোদ্ধাই প্রায় সমান সমান গেলেন। জনসনের সঙ্গে আর কেহই এতক্ষণ ধরিয়া এমন কৌশলে লড়িতে পারে

নাই। দর্শকরা জেফ্রিসের নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু সপ্তম মণ্ডলে জনসন সজোরে ঘুসি মারিয়া জেফ্রিস্‌কে অনেকটা কাহিল করিয়া ফেলিলেন। তারপরের দুই মণ্ডলে জন্‌সনের মুষ্ট্যাঘাত ক্রমে এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল যে, জেফ্রিসের সমস্ত মুখটা রক্তারক্ত, ছিন্নভিন্ন ও থ্যাঁৎলাইয়া গেল—যেন তাঁহার নাক-চোখ-ঠোঁট সব মাংসের মধ্যে চাপিয়া বসিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! সে এক অসহ দৃশ্য! যতই সময় যায়, জনসনের আক্রমণ ততই ভয়ানক হইয়া ওঠে। তাঁহার আত্মরক্ষার কায়দা এমন দুরস্ত ছিল যে, জেফ্রিসের ঘুসি তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না। জনসন কখনো জেফ্রিসের ক্ষতবিক্ষত মুখে দুইহাতে ঘুসির পর ঘুসি বৃষ্টি করেন, কখনো তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে চাপিয়া ধরেন, কখনো তাঁহার প্রায়-নির্জ্জীব দেহটাকে রঙ্গক্ষেত্রের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যান,—জেফ্রিসের মত অমন মহাবলিষ্ঠ লোকের যে এমন শোচনীয় দুর্দ্দশা হইতে পারে, এতটা আগে কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই! জনসন একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ঘুসি তোমার কেমন মিষ্টি লাগচে জেফ্রিস্?" রক্তোচ্ছ্বাসে প্রায়-বদ্ধ স্বরে তেজের সঙ্গে জেফ্রিস্ উত্তর দিলেন, "আরে ছোঃ! এ কি আবার ঘুসির মত ঘুসি!" জনসন অম্‌নি তাঁহার মুখে আর এক ঘুসি বসাইয়া দিলেন। জেফ্রিস্ আর সহিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"উঃ!" পনেরো মণ্ডল পর্য্যন্ত জেফ্রিস্ অটলভাবে—নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও—জনসনের ঘুসি সহিয়াও কোনক্রমে খাড়া হইয়া রহিলেন। কিন্তু তার পরেই আর এক ঘুসি খাইয়া তিনি ছিট্‌কাইয়া মাটির উপরে পড়িয়া গেলেন। বিপক্ষের মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী হওয়ার অপমান,—তাঁহার জীবনে এই প্রথম। তবু তিনি ফের উঠিয়া দাঁড়াইলেন—আবার জনসনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—কিন্তু দর্শকরা আর সেই রক্তারক্তির বিষম দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, শ্বেতাঙ্গের জয়ের আশায় হতাশ হইয়া, জেফ্রিসের প্রাণরক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া রঙ্গক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিল,—পুলিসের লোকেরা লড়াই বন্ধ করিয়া দিল, এবং মধ্যস্থ জনসনের জয় স্বীকার করিলেন।

এই লড়াই জিতিয়া শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে জনসনের অর্থ-সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়—এমন-কি তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি পড়ে। শুনা যায় শেষটা তাঁহাকে বলা হয়, যদি তিনি অনেক টাকা পুরস্কার লইয়া তাহার বিনিময়ে কোন শ্বেতাঙ্গের কাছে হার স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাকে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। কাজেই বাধ্য হইয়া জনসন্ শেষটা কৃত্রিম যুদ্ধে জেস উইলার্ড নামে একজন মাঝারি দরের যোদ্ধার কাছে হার মানিয়া, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। জনসন এখন স্পেনদেশে আসিয়া বায়োস্কোপের অভিনেতা হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গরা স্বীকার না করিলেও, জনসনের মত মুষ্টিযোদ্ধা একালে আর এক-জনও দেখা যায় নাই। পেশাদার যোদ্ধা হইয়াও কাফ্রি-বীর জনসন অশিক্ষিত নন। সাহিত্যে ও দর্শনে তিনি সুপণ্ডিত।

জনসনের পর একালের মধ্যে মাত্র এক-জনের নাম উল্লেখযোগ্য,—তিনি জর্জেস কার্পেনটিয়ার, জাতিতে ফরাসী। তাঁহার মত

অল্প বয়সে আর-কোন মুষ্টিযোদ্ধা এত-বেশী নাম করিতে পারেন নাই। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি ফ্রান্সের "দিগ্বিজয়ী বীর" নামে উপাধি লাভ করেন। (১৯০৮) তারপর তিনি নানা ওজনের অসংখ্য বিখ্যাত যোদ্ধাকে হারাইয়া দিয়া, অবশেষে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ যোদ্ধা বোম্বার্ডিয়ার ওয়েলসকে উপর-উপরি দুইবার পরাজিত করিয়া, সারা পৃথিবীতে নামজাদা হইয়া পড়েন। পর বৎসরেই তিনি উনিশ বৎসর বয়সে "গানবোট" স্মিথের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। স্মিথকে তিনি চতুর্থ মণ্ডলেই মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অচেতন অবস্থায় ধরাশায়ী রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যস্থের একটি সাংঘাতিক ভ্রমের জন্য তাঁহার সে জিৎ বাতিল হইয়া গেল। আবার লড়াই সুরু হইল। কিন্তু ষষ্ঠ মণ্ডলে কার্পেনটিয়ার হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই ভূপতিত অবস্থায় স্মিথ অন্যায় করিয়া তাঁহাকে মুষ্টাঘাত করেন। কাজেই মধ্যস্থের হুকুমে স্মিথকে আর লড়াই করিতে দেওয়া হইল না, এবং কার্পেনটিয়ারকেই জেতা বলিয়া মানা হইল। ফলে উনিশ বৎসরের বালক কার্পেনটিয়ার "পৃথিবী-জেতা বীর" বলিয়া উপাধি লাভ করিলেন! ঠিক তার পরেই কার্পেনটিয়ার য়ুরোপের মহাসমরে সৈনিকরূপে যোগদান করেন এবং শান্তিস্থাপন না-হওয়া পর্য্যন্ত আর মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্পেনটিয়ার ইংরেজ যোদ্ধা ডিক স্মিথকে পরাজিত করেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা জো বেকেটের সঙ্গে কার্পেনটিয়ারের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। বেকেট বারংবার গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "কার্পেনটিয়ারকে আমি গ্রাহ্যই করি না! কারণ, সে ভারি ওজনের যোদ্ধার মধ্যেই গণ্য নয়,—দেহের ভারে, গায়ের জোরে আর পায়তারা-কসরতে আমার কাছে সে কিছুতেই টিঁকতে পারবে না—আমি তাকে অনায়াসেই হারিয়ে দেব,—সে একবার আসুক্ না দেখি!"

বিলাতসুদ্ধ সমস্ত লোকই বেকেটের কথায় সায় দিয়া বলিয়াছিল, 'বেকেটের গায়ে যে-রকম আশ্চর্য্য শক্তি এবং তাহার যুদ্ধকৌশল যে-রকম চমৎকার, তাহাতে কার্পেনটিয়ারের পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব। বিশেষ, রণক্ষেত্রে গিয়া কার্পেনটিয়ারের আগেকার মত লড়িবার ক্ষমতাও আর নাই।' কিন্তু গত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে বেকেটের দর্পচূর্ণ হইয়াছে। কার্পেনটিয়ার রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই, এক মিনিট ছয় সেকেণ্ডের মধ্যে প্রবল এক মুষ্ট্যাঘাতে বেকেটকে একেবারে অজ্ঞান ও ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছেন। এত অল্প সময়ে আর কখনো কোন ভারি-ওজনের যোদ্ধা জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এই লড়াই জিতিয়া কার্পেনটিয়ার "য়ুরোপজয়ী বীর" নামে উপাধি ও পঁচাত্তর হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। বর্ত্তমান কালের "পৃথিবীজয়ী বীর" জ্যাক ডেম্প্‌সী জাতিতে আমেরিকান। কার্পেনটিয়ার এখন তাঁহার সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নাপ্পি-পীরিতি-কথা

বাক্যে অর্থে ফারখৎ হেরি,
ফারখৎ রাধা-শ্যামে ;—
রাসের মঞ্চে নাচিছে আয়ান,
শিশু-রাই নাচে বামে।
যাক্ স্মরিছে মুস্কিলাসান,
বয়রুচি কাঁপে প্রাণে ;
ইস্কুলে ঢোকে অমরসিংহ
শিখিতে কথার মানে!
ডিগ্‌বাজী খায় ছাপার হরফ্,
ডিক্সনারী গেল তল,
রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে
পদ্মাপারের দল!
শব্দ ধুনিয়া ধাঁই ধাঁই, করে—
কারদানী বিস্তর ;
গৌড়-বঙ্গ হাঁ-করিয়া শোনে
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পর'!
অর্থ শব্দ হয়েছে জব্দ
বেফাঁস বাক্য-জালে,
পূর্ব্বরাগের মানে সেই রাগ
ঘটে যাহা পরকালে।
নাপ্পি-খোয়ের পড়শীরা নোনা-
মাছ গেঁথে বড়শীতে,
করে বাহাদুরী গুম্ফ চুমরি'
নাপ্পি-নায়িকা-প্রীতে!
পূর্ব্বরাগের হাড়েতে দুর্ব্বা
গজাইয়া সারি-সারি,
বিশ্বে যা' সাঁচা, বঙ্গে তা' মিছে,
ভণিছে পদ্মাপারী!

* * *

বাজাইয়া ধামী রজকিনী রামী
কহিছে চণ্ডীদাসে,
"চল বড়ু রসতত্ত্ব শিখিব
পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে!
তুমি যে রামীর পূর্ব্বপুরুষ
সন্দেহ তায় নাই,
পরপুরুষে ও পূর্ব্বপুরুষে
হয়ে গেছে একজাই!
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পিছন' হে বঁধু!
সেই কথা পাকা কথা,
ফক্কিকা-কৃত ব্যাখ্যান এযে
নাহি মিলে যথাতথা!
পদ্মা-পারের প্রতিভা-চেরাগে
নব-বাণী লহ প'ড়ে,
পূর্ব্ব-বঙ্গ মানে সে বঙ্গ
পিছিয়ে যে রয় পড়ে।
যাদের কথার টানে সাড়া দেয়,
ডিশিন-নিশিন-পাড়া,
তাদের সদনে তত্ত্ব শিখিব,
চল বড়ু, কর তাড়া!"
পূর্ব্বরাগেরে পান্তা করিয়া,
পান্‌সে করিয়া নাড়ী,
নাপ্পি-পীরিতি সাধনার রীতি
বাখানে পদ্মাপারী॥

শ্রীগোপীবল্লভ গোস্বামী।

সঙ্কলন

আমার কথা

আমার জান্‌লার সাম্‌নে রাঙামাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে, সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে-ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল, সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেচে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা, ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে' ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনি ছুটি পেল তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যতদিন ছিলুম ততদিন পথের ধারের ঐ বটগাছটার দিকে তাকাবার সময় পাইনি; আজ পথ ছেড়ে জান্‌লায় এসেচি আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা সুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারচ না?"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "বুঝেচি, সব বুঝেচি; তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছুক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে; আবার সেই খর্‌খর্, ঝর্‌ঝর্, ঝল্‌মল্।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে; আমি তোমারই খেলার সাথী, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গুড়ুক গুড়ুকে তোমারি মত সূর্য্যালোক পান করেচি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি, ও বল্‌তে থাকে হাঁ, হাঁ, হাঁ।

যে-ভাষা রক্তের মর্ম্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্ত্তন-ধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্ম্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারী ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্চে, "আছি, আছি; আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুসির কথা। সেই খুসিতে ঘিরে অণুপরমাণু থর্‌থর্ করে কাঁপচে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক-ভাষার সেই এক-খুসির কথা চল্‌চে।

ও আমাকে বলচে, "আছ হে বটে?"

আমি সাড়া দিয়ে বল্‌চি, "আছি হে মিতা।"

এমনি করে "আছি"তে "আছি"তে একতালে করতালি বাজ্‌চে।

(২)

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ সুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তারপরে আষাঢ়ের বর্ষা নামল; ওরও পাতার রং মেঘের মত গম্ভীর হয়ে এসেচে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীণের পাকা বুদ্ধির মত নিবিড়, তার কোন ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরীবের মেয়েটির মত; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী; যেন পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝল্‌মলিয়ে আমাকে বল্‌লে, "মাথার উপর অমনতর ইঁটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন? আমার মত একেবারে ভরপুর বাইরে এস না!"

আমি বল্‌লেম, "মানুষকে যে ভিতর-বাহির দুই বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়।"

গাছ খড়্‌খড়্‌ বলে উঠল, "বুঝ্‌তে পারলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! ভিতরেরটা আছে কোথায়?"

—"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

—"সেখানে কর কি?"

—"সৃষ্টি করি।"

—"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বল্‌লেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে' হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা পড়েই ত সৃষ্টি। একই নিমিষ ঘেরের মধ্যে আট্‌কা পড়ে কোথাও হীরের টুক্‌রো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার ঘেরটা কি রকম শুনি!"

আমি বল্‌লেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়্‌চে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠ্‌চে।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার সেই বেড়া-ঘেরা সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্র-সূর্য্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়?"

আমি বল্‌লেম, "চন্দ্রসূর্য্যকে দিয়ে তাকে ত মাপা যায় না, চন্দ্রসূর্য্য যে বাইরের জিনিষ।"

—"তাহলে মাপবে কি দিয়ে?"

—"সুখ দিয়ে—বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বল্‌লে, "এই পুবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে। কিন্তু তুমি যে কিসের কথা বল্‌লে আমি কিছুই বুঝলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "বোঝাই কি করে? তোমার ঐ পুবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে বীণার তারে যেম্‌নি বেঁধে ফেলেচি অমনি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আরেক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়! এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায় তা আমিও ঠিক জানিনে। মনে হয় যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

—"আর ওর কাল?"

—"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।"

—"দুই আকাশ দুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত। তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝলেম না।"

—"নাই বা বুঝলে।"

—"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ?"

—"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল ত সে বোঝা, যদি গান বল ত গান, কল্পনা বল ত কল্পনা।"

(৩)

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বল্‌লে, "একটু থামো। তুমি বড় বেশি ভাবো, আর বড় বেশি বকো।"

শুনে আমার মনে হল, "এ-কথা সত্যি।" আমি বল্‌লেম, "চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাস-দোষে চুপ করে করেও বকি; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মত আলোকবীণায় দ্রুততালে ঘা দিতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠ্‌ল, "এই তুমি যা দেখ্‌চ আর এই আমি যা ভাব্‌চি এর মাঝখানের যোগটা কোথায়?"

আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেম, "আবার তোমার প্রশ্ন? চুপ কর।"

চুপ করে রইলুম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌লেম। বেল কেটে গেল।

গাছ বল্‌লে, "কেমন, সব বুঝেচ ?"

আমি বল্‌লেম, "বুঝেচি।"

(৪)

সেদিন ত চুপ করেই কাট্‌ল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে 'বুঝেচি', কি বুঝেচ বল ত ?'

আমি বল্‌লেম, "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেচে। তাই প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।"

—"কি রকম দেখলে ?"

—"দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কি আনন্দ! নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেচে, কত রঙই লাগিয়েচে, কত গন্ধ, কত রস! তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বল্‌ছিলেম, "ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে-আনন্দধ্বনি করে' উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল, তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেচ, "ওরে আয়না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারি মত নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা!"

মন আমার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বল্‌লে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করে থাক, আমি যে-সব উপকরণ জড় করচি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলনা কেন ?"

—"তার কথা আর কইব কি! সে নিজেই নিজের টঙ্কারে ঝঙ্কারে হুঙ্কারে ক্রেঙ্কারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেচে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। ভেবে পাই নে এর অন্ত কোথায়। থাকের উপর আর কত থাক্ উঠ্‌বে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে? এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

—"বটে? কি জবাব, শুনি।"

—"সে বল্‌চে, প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবামাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দরকেই দেখ এই বনবিহারী। তার বাঁশি ত বাজচে বটের ছায়ায়।"

(৫)

তখন কবেকার কোন্ ভোর রাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনো তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেচে ধূলো, না দেখা দিয়েচে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বটগাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বল্‌লে, "নমস্কার!"

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চল্‌চে কেমন, বল ত ?"

সে বল্‌লে, "বেশ চল্‌চে, একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পূবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের শার; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এম্‌নি জটলা করেচে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি। তুমি কোমল তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর; তুমি ছোট, তোমার তূণ ছোট, তোমার তীর ছোট, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু ত দেখি দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল; দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেছ, পাথর মান্‌চে হার, ধূলো দাসখৎ লিখে দিচ্ছে।"

বট বল্‌লে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখলে ?"

আমি বল্‌লেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্ম্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্ত্তিতে। সেইজন্যেই ত তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেচে ঐ সহজ যুদ্ধজয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্যে। প্রাণ যে কেমন করে' কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারি পাঠশালা খুলেচ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র, ফাল্গুন, ১৩২৬।

অন্তর-বাহির

পৃথিবীর সমস্ত পশুপাখী বাহিরের দিকে যেমন চোখ মেলে দেখ্‌লে মানুষও তেমনি দেখ্‌লে, সমস্ত জগৎ তার ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সমস্ত মনকে দখল করে নিলে।

সুখকর দুঃখকর নানা ঘটনায় আন্দোলিত এই বহির্জগৎটা যখন আমাদের কাছে খুব একান্ত হয়ে ওঠে তখন অন্য অসংখ্য প্রাণী এই জগতের যেমন অন্তর্গত হয়ে অঙ্গ হয়ে থাকে আমরাও তেমনি থাকি। যা কিছু ঘটচে চল্‌চে সেই বাহিরের ধারারই অংশ হয়ে আমরা বয়ে চলি।

কিন্তু একেবারে সুরু থেকেই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। বরাবর মানুষ অনুভব করে আস্‌চে, সে যা দেখ্‌চে তার ভিতরে ভিতরে একটা রহস্য রয়ে গেচে। চোখের সামনে যা আছে কেবল মাত্র তাই আছে একথা মেনে নিলে কোনো আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু মানুষ একথা মান্‌তে পারলেই না।

এই রহস্যের বোধটাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্যে মানুষ কত রকমের শব্দ আওড়ালে যার কোনো মানেই নেই, কত রকমের কাণ্ড করলে যাকে পাগ্‌লামি বল্লেই চলে। এম্‌নি করে নিজেকে সহজের স্বাভাবিকের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে এই কথাটা কোনমতে বলবার চেষ্টা করেচে যে, যেটা প্রত্যক্ষ জানচি তার চেয়েও জানবার একটা কিছু আছে। যা বাইরে আছে সেটাই শেষ কথা নয়। সে যে-অনুষ্ঠানগুলো করলে সেগুলো ভয়ঙ্কর; পশুবলি দিলে, নরবলি দিলে, নিজেকে অসহ্য কষ্ট দিলে, অন্যকেও দিলে, বেশভূষা করলে তা উৎকট। তার মনে হয়েচে একটা দুঃসহ এবং ভয়ঙ্কর আঘাত করা চাই, নইলে স্বভাবের আবরণকে বিদীর্ণ করে তার গুপ্তধন পাওয়া যাবে না।

তার পরে ক্রমে ক্রমে মানুষের সাধনার প্রণালী বদ্‌লাতে লাগ্‌ল। বাইরের স্বভাবের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে এতদিন বাইরের দিকে সে সৈন্য লাগিয়েছিল অস্ত্র মেরেছিল, ক্রমে সেই লড়াইটার গতি ভিতরের দিকে চল্‌ল। সে বল্‌লে হৃদয়ের স্বাভাবিক যে সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে সেইটেকে চরম বলে মান্‌ব না; সেটাকে যদি ভেঙে ফেলতে পারি তা হলেই তার ভিতর থেকে আসল রহস্যময় শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারব। এই বলে মানুষ নিজেকে দুঃখ দিতে লাগ্‌ল। সমস্ত ত্যাগ করে করে দেখ্‌তে চাইলে সব ত্যাগের শেষে কি বাকি থাকে।

একটা জিনিষ মানুষ দেখচে বাহিরের সুরের একেবারে উল্টো সুর সেই ভিতরের দিকে। বাইরের ক্ষেত্রে ক্রোধ, ভিতরের ক্ষেত্রে ক্ষমা; বাইরে ধনের মাহাত্ম্য, ভিতরে ত্যাগের; বাইরে গতি, ভিতরে শান্তি।

ফুলে দেখা যায় তার পাপড়ির বিস্তার, তার বর্ণের ছটা; ফলে দেখতে পাই তার বাইরের সঙ্কোচ, তার পাপ্‌ড়ির খসে পড়া, অন্তরের মধ্যে তার বীজের বিকাশ। এই বীজের মধ্যেই ভাবী জীবন নিস্তব্ধ কেন্দ্রীভূত।

তেমনি মানুষ প্রবৃত্তির রাজ্যে বাইরে আপন রঙ্ ফলিয়েছে, বাইরে যতদূর পারে আপনাকে সমারোহে বিস্তীর্ণ করচে। অন্তরে তার সমস্ত উল্টে গেল। বাহিরের যে আয়োজন সব চেয়ে বেশি করে চোখে পড়েছিল সে সবই পাপ্‌ড়ির মত খসে পড়ল। সেইখানে সমস্ত

বিক্ষিপ্ত শক্তি সংক্ষিপ্ত হল ভাবী জীবনের একটি বীজের উপর। যেমনি তাই হল অমনি অন্তর রসে ভরে উঠল।

একদিক থেকে একদল মানুষ বল্‌লে, এই ফুলের জীবন, এই পাপড়ির বিস্তারই চরম,—তার উর্দ্ধে আর কিছুই নেই। তারা কোমর বেঁধে লাগ্‌ল লড়াই করতে, বোঝাই করতে। দেহ-মনকে ভোগের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়াকেই তারা সকলের চেয়ে বড় করে দেখ্‌লে।

আর একদিক থেকে আর একদল মানুষ বল্‌লে, অন্তরের নিভৃতে বাইরের শাসন থেকে নিষ্কৃতি আছে; সেখানে বসে আমি বাইরের বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি বাইরের আঘাতকে প্রতিহত করতে পারি, সেখানে আপনার মধ্যেই আমার আপনার রাজসিংহাসন আছে। সেই সিংহাসনেই আমি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হব—বাইরের দিকে তাকাবই না।

তারা বলে, বাইরের দিকে যে শক্তির টানে সমস্ত জীব পাক খেয়ে বেড়াচ্চে, যে শক্তি কেবলই এক জিনিষ ভেঙে আরেক জিনিষ গড়চে, যার বিস্তারের আর অন্ত নেই সেই হল প্রকৃতি। সেই ত একদিকে বাসনা আর একদিকে ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে সংসার নাট্যমঞ্চে হাসিকান্নার অবসান হীন পালা জমিয়েচে। আর অন্তরের মধ্যে এই নাট্যের বাতি নিবিয়ে দিয়ে সমস্ত সামগ্রীকে ত্যাগ করে ভোগকে নিবৃত্ত করে যে সত্তা আপনাকে মুক্তভাবে উপলব্ধি করে, আনন্দ পায়, সেই হল আত্মা। এই আত্মাকেই মানব,প্রকৃতিকে মান্‌বই না।

এ কথা যে বলেচে তাকে প্রাণপণ জোর করেই বল্‌তে হয়েচে। কেননা মানব-জীবনের সবচেয়ে আদিমতম অভ্যাস হচ্চে বাহিরেই ছড়িয়ে যাওয়া, বাহিরকেই একান্ত করে জানা। ইন্দ্রিয়-বোধই তার প্রথম আলো জ্বেলেচে, প্রবৃত্তিই তাকে প্রথম চালনা করেচে। এইজন্যে তার মন এই বাহিরের জগতে অনেক দূরে শিকড় চালিয়ে দিয়েচে—তার বিশ্বাস একেই বড় শক্ত করে আঁকড়ে রয়েচে। এই জন্যে তত্ত্বজ্ঞানী আর ধর্ম্ম-উপদেষ্টা যিনি যাই বলুন, আর মানুষও মুখের কথায় যাই প্রচার করুক, বুদ্ধির দ্বারা যা'ই চিন্তা করে জানুক, আচারে ব্যবহারে আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে এমন মানুষ লক্ষের মধ্যে একটি পাওয়াও কঠিন। বাহিরটাই তার ইন্দ্রিয়কে মনকে বিশ্বাসকে বুদ্ধিকে এমন প্রবল শক্তিতে এবং অতিমাত্রায় অধিকার করে বসেচে বলেই তার একান্ত প্রভাবকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই মানুষ এমন বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে এমন একনিষ্ঠ বৈরাগ্যের সঙ্গে বাহিরকে একেবারে অস্বীকার করবার প্রয়াস করেচে।

সত্য এমনি করে দুইভাগ হয়ে গেল। নদীর দুই তীর যে একই নদীর, জলের ধারার মধ্যে উভয়েরই ঐক্য চিরকাল প্রবাহমান একথা মানুষ ভুলে গেল।

উপনিষদ্ বলেচেন, "যশ্চায়মস্মিন্ পুরুষঃ আকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ," তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বাইরে এই আকাশে সমস্তকে অনুভব করে আছেন। পরক্ষণেই বল্‌চেন, "যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ," তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আত্মাতে সমস্ত অনুভব করে আছেন। অর্থাৎ অসীম সত্য অন্তরকে বাহিরকে এক করে বিরাজ করেন।

সত্যের এই যে অন্তর বাহির দুই দিক আছে এদের সামঞ্জস্য তখনি নষ্ট হয় অন্তর যখন বাহিরের উপর আপন কর্ত্তৃত্ব হারায়, বাহির যখন অন্তরকে অভিভূত আচ্ছন্ন করে। আবার বাহিরকে নির্ব্বাসিত করা যায় তবে আপন কর্ত্তৃত্বের অধিকার হারায়।

রাজা আছে তার রাজত্ব নেই একথা বলা চলে না। আত্মাকে যদি বলি রাজা, তবে সংসারের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে তারই প্রভুত্ব প্রচার করতে হবে। তার প্রভুত্বের ক্ষেত্রে করলে তাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়।

আসল কথা আমাদের ইচ্ছা-অনুসারে কোনো একটা অংশকে ছাঁটতে চেষ্টা করলে ছাঁটা পড়ে না, সে উপদ্রব হয়ে ওঠে। যে বাহির আমি, তার মধ্যেই থেকে আঘাত করে, তাকে

দূর করতে চেষ্টা করি তাহলে সে দূর হয় ভেঙে পড়ে আমাকেই চেপে মারে।

ভারতবর্ষ আপন সাধনায় আত্মার দিকে একান্ত ঝোঁক দিয়েছিল। তার ফলে স্থূল ও জড় প্রকৃতির প্রভাব ত সরল না। বরঞ্চ ভারতবর্ষ আপন ধর্ম্মে আচারে এই স্থূলকে যত বেশি মেনেছে এমন অন্য কোনো সভ্য দেশ মানে নি।

যুরোপে মধ্যযুগের সাধক কৌমার্য্য ব্রত নিলে, একান্ত দারিদ্র্যব্রত নিলে, দেহকে চাবুক মারলে, কাঁটার শয্যায় শুয়ে রইল,—এ যেমন সমাজের এক অংশে প্রকৃতির প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচার, তেমনি আরেক অংশে খুনোখুনি কাড়াকাড়ি; উন্মত্ত ভোগলালসা পৃথিবীকে নিংড়ে নিংড়ে খেয়েও আপন তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। সত্যকে একদিক দিয়ে যখন মারি সে আরেক দিক্ দিয়ে আমাদের সাত গুণ মারে। দেহের দিকে যাকে বিনাশ করি ভূত হয়ে সে আমাদের বেশি করে পেয়ে বসে।

তবে একথা মানি, বাহির যখন অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে উদ্দাম হয়েচে, তখন তাকে দমনের জন্যে আঘাত করতে হবে। সেটা কেবল একটা ক্ষণিক চিকিৎসা। বাহির আত্মার রাজ্য, অতএব আত্মা তাকে পালন করবে—কিন্তু রাজ্য যদি বিদ্রোহী হয় তবে শত্রুর মত করেই তাকে মারতে হবে, তাকে পীড়া দিতে হবে। বাইরের প্রবৃত্তি যখন আত্মার শাসনকে লঙ্ঘন করে তখন তাকে মেরে, তার দুর্গ ভেঙে, তার সর্ব্বস্ব লুঠ করে তাকে হয়রান করতেই হবে। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পরে রাজায় প্রজায় সত্যকার মিলনের দিন। তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বারা শুচি হবে, ভোগে সংযমের শান্তি আসবে; তখন আত্মা তার বাইরের অধিকারে আপনার ইচ্ছার বাধাহীন বিস্তার দেখে আনন্দিত হবে। তখন বাইরে চারিদিকে দেখবে সব সুন্দর সব মঙ্গল।

এই যে দ্বন্দ্বকে সামঞ্জস্যে নিয়ে আসা, এ দল বেঁধে কোনো বিশেষ নামধারী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করে হবে না। এর ভার প্রত্যেক মানুষের উপর ব্যক্তিগত ভাবেই আছে। তুমি যদি পার তবে তোমার ভিতর দিয়েই সংসার সফলতা লাভ করবে। একটি সংসারেও যদি আত্মার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আত্মার কর্ত্তৃত্ব সেইখান থেকেই সমস্ত মানবজগৎকে ধন্য করবে।

আমাদের দুর্ব্বলতার মস্ত একটা কারণ এই যে, চারিদিকে আমরা দুর্ব্বলতার নানারূপ সর্ব্বদা দেখি। তাতে করে আত্মার স্বরূপ দেখ্‌তে পাইনে, আত্মার স্বরূপের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না, তখন শক্তিহীনতার জন্যে লজ্জা চলে যায়। সত্যকে যদি বিশ্বাস করতে পারি তবে সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারি। চারদিকের দুর্ব্বলতার সত্যের প্রতি সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়, তখন মনে হয় তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করা নিতান্ত যেন ঠকা, সে যেন মূঢ়তা।

এইজন্যেই তোমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য স্মরণ করে নিজেকে নিয়ত এই কথা বল্‌তে হবে, অন্তরে সত্য হও বাহিরে সুন্দর হও। সকল মানুষ তোমার মধ্যে আপনারই পূর্ণতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখুক, সে জানুক, সে কি। তুমি যে সত্য হবে সে কেবল নিজের জন্য নয়, তোমার মধ্য দিয়ে সত্য সকলেরই অধিগম্য হবে বলে। তোমার আত্মার সঙ্গে সকল আত্মার যোগ আছে বলেই আত্মার পরম দায়িত্ব একান্ত যত্নে বহন করতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩২৭।

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন কাছে।

তাই রাণী রাজাকে বল্‌লে, "চল, রথ দেখ্‌তে যাই।"

রাজা বল্‌লে, "আচ্ছা।"

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরুল, হাতিশাল থেকে হাতি। দাস দাসী দলে দলে পিছে পিছে যায়।

কেবল বাকি রইল এক জনা। রাজ বাড়ীর ঝাঁটার কাটি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।

সর্দ্দার এসে দয়া করে তাকে বল্‌লে, "ওরে তুই যাবি ত আয়।"

সে হাত জোড় করে বল্‌লে, "আমার যাওয়া ঘট্‌বে না।"

রাজার কানে কথা উঠ্‌ল, সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই দুঃখীটা যায় না।

রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বল্‌লে, "ওকেও ডেকে নিয়ো।"

রাস্তার ধারে তার বাড়ী। হাতী যখন সেখানে পৌঁছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বল্‌লে, "ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখ্‌বি চল্!"

সে হাত জোড় করে বল্‌লে, "কত চলব? ঠাকুরের দুয়োর পর্য্যন্ত পৌঁছই এমন সাধ্য কি আমার আছে!"

মন্ত্রী বল্‌লে, "ভয় কি রে তোর, রাজার সঙ্গে চল্‌বি।"

সে বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা হবে না?"

সে বল্‌লে, "হবে বই কি। ঠাকুর রথে করেই ত আমার দুয়ারে আসেন।"

মন্ত্রী হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "কোথাকার পাগল! তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই রে!"

দুঃখী বল্‌লে, "তাঁর রথের ত চিহ্ন পড়ে না।"

মন্ত্রী বল্‌লে "কেন বল্ ত?"

দুঃখী বল্‌লে, "তিনি আসেন পুষ্পক রথে।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "কই রে সেই রথ?"

দুঃখী হাত বাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে "এই যে।" তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্য্যমুখী ফুটে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আঙুর, বৈশাখ ১৩২১।

এসেছে

এসেছে!
বনে বনে কলধ্বনি ভেসেছে।
উদয়-গিরির হৃদয় ব্যেপে, স্পর্শ-শিহর উঠ্‌ছে কেঁপে,
হাওয়ার শিরায় হর্ষ বহে মহোৎসবের ইঙ্গিতে।
এসেছে সে! শব্দ জাগে স্পর্শ-সুখের সঙ্গীতে।

কাঁদিস্ নে!
দৃষ্টি-সুখের শবকে বুকে বাঁধিস্‌নে।
নীল আকাশের তলায় তলায়, পাহাড় ঢেকে গলায় গলায়,
থাকত যেথায় নিবিড় কানন সবুজপাতার পিছনে,
সেখান থেকেই আস্‌ছে বাতাস; দাঁড়ারে তুই বিজনে।

চিনে নে।
প্রেমের ছোঁয়ায় বুঝে, কাছে ছিনে নে!
মায়ার গন্ধ গায়ে লাগে, বিশ্বখানি উল্‌সে জাগে।
জলে স্থলে ফুলের খেলা, পদ্মমুখীর গৌরবে।
এসেছে সে! কাঁদিস্‌নে তুই! চিনে নে তায় সৌরভে

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চিঠি

পাড়াগাঁয়ের অনেকদিনের পুরোনো ভাঙ্গা-চোরা একখানা বাড়ী। তারি শাণ-বাঁধানো ওয়া,—মাঝে-মাঝে চটা উঠে গেছে। সেই ওয়ার একধারে বারো বছরের একটি ছেলে, পাশে কড়ির দোয়াত আর শরের লম; কাছে বসে এক বৃদ্ধা নারী। তাকে কা কার ছেলেটি বললে,—কি লিখতে বে, বল পিশিমা। আমি আবার এখনি পাড়ায় যাত্রা শুনতে যাব।

ছেলেটি যাকে পিশিমা বললে, ছেলের দল াম-সম্পর্কে তাকে পিশি বলে ডাকে। তা-ড়া তার সঙ্গে কারো কোন সম্পর্কই নেই।

বৃদ্ধা বললে,—আমার ফেলিকে চিঠি খতে হবে, বাবা। আজ চার বচ্ছর তার ান খপর পাইনি।

ফেলি তার ভাইঝী; আঁতুড়ে মা মারা গেলে পিশিই তাকে কোলে তুলে নেয়, মানুষ র। এই পিশিমাকেই সে মা বলে জানে।

বৃদ্ধার দুই চোখ ছল ছল করে এল। র মধ্যে চার বৎসর পূর্ব্বেকার এক ণ বিদায়-দৃশ্য জেগে উঠল। বাড়ীর সামনে র-নারকেলের ছায়ায়-ঘেরা খানিকটা খোলা গা—সেইখানে পাল্কী নামানো ছিল। লি শ্বশুর-বাড়ী যাবে। জামাই রোজগেরে ছে, ফেলিকে এবার নিজের কাছে নিয়ে ব। জামাই গরদের কোটের উপর সোনার ড়-চেন ঝুলিয়ে আশে-পাশে গম্ভীর মুখে চারি করে ফিরছিল। আঁচলে চোখের জল মুহ্‌তে মুছতে পিশি এসে ফেলিকে পাল্কীতে তুলে দিলে—মেয়েরও দুই চোখে সাগর বয়ে চলেছিল। পাল্কী উঠিয়ে বেহারারা যখন শ্যাওলা-পড়া পুকুরটাকে বাঁয়ে রেখে মেটে রাস্তা ধরে জাম গাছের ওধারে মোড় বেঁকল, মেয়ে ফেলি তখন পাল্‌কীর দুই দরজা সরিয়ে ঝাপসা-চোখে দূর থেকে পিশির পানেই চেয়ে ছিল। সকালের উঠন্ত সূর্য্যের স্নিগ্ধ রৌদ্রটুকু তালগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার মুখের উপর ঝরে-ঝরে পড়ছিল—পিশিমা নিজের চোখের জলে-অস্পষ্ট দৃষ্টি দিয়েও তা বেশ স্পষ্টই দেখেছিল। সে চোখের সে দৃষ্টি এখনো তার মনে গাঁথা রয়েছে,—সে কি ভোলবার গো!.....তারপর এই চার বছর ফেলির কাছ থেকে একখানি চিঠিও আসেনি। পিশি নিজে লিখতে জানে না; পাড়ার একে-তাকে ধরে মাঝে-মাঝে অমন কত চিঠি লিখিয়েছে—তার একখানার জবাবও কি দিতে নেই?...সে কি সব ভুলে গেল! পিশির আর কে আছে? কেউ না! সেই পিশিকে খপর দিতে সময় পায় না! সে রইল কি গেল, তারও কি কোন উদ্দেশ নিতে নেই!.....পিশির বুকটা ছাঁৎ করে উঠল—কে জানে, তার ফেলিই যদি না থাকে—! থাক্‌লে সত্যিই কি আর সে পিশির খোঁজ নিত না!...পিশির নিজের যাবার উপায় নেই—সে যে জামাই-বাড়ী! নাহলে সে অমন এতদিনে দশবার ছুটে যেত!

পাড়াগাঁয়ে ডাকওলা হপ্তায় দু'দিন এসে চিঠি বিলি করে যায়। যে-যেদিন তার আসবার পালা, পিশি তার আশা-পথ চেয়ে বসে থাকে। দূর থেকে তাকে আস্‌তে দেখে প্রাণটা কি আশায় ভরে ওঠে! উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রশ্ন করে—আমার চিঠি এনেছ, বাবা?

ডাক-ওলা তার থলি না দেখেই বলে, —না গো।

বেচারীর সমস্ত মন অমনি নির্জ্জীব অচেতন হয়ে পড়ে। শরীরের সমস্ত বাঁধন যেন আল্‌গা হয়ে আসে! মাথা ঘুরে যায়! সে ভাবে, আমি গরিব, আমার কেউ নেই,—তাই কোম্পানির লোক ডাকওলা আমাকে গ্রাহ্যিও করে না! চিঠি নিয়ে আসে না!

পাড়ার পাঁচজনকে তখন সে ধরে। তারা বলে,—এখনো চিঠির জবাব আসবার সময় আছে!

এখনো সময় আছে, সময় আছে তাহলে! আঃ!

আশায় আশায় দিনের পর দিন গিয়ে একটা মাসও যখন যায়-যায় হয়, তখন বেচারীর আর সোয়াস্তি থাকে না! আবার-একজনকে ধরে বসে,—ওগো ঠিকানাটা ভালো করে পষ্ট করে এবার একখানা চিঠি বেশ গুছিয়ে লিখে দাও না গা!

এমনি আশা-নিরাশার মধ্যে দিয়েই বুড়ীর দিন কেটে যায়!

আজ যে ছেলেটির কাছে সে চিঠি লেখাতে এসেছিল, সে ছেলেটির লেখা-পড়ায় বেশ নাম-ডাক বেরিয়েছে। তাই শুনে চিঠি লেখাবার পক্ষে সে খুব পাকা লোক হবে ভেবেই বুড়ী, তার বাড়ী এসেছিল, তাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে! ছেলেটির নাম, বিপিন।

বিপিন প্রথমেই 'কল্যাণবরেষু' পর্য্যন্ত লিখে বুড়ীর মুখের পানে চেয়ে বললে,—কি লিখব, পিশিমা, বল?

বুড়ী বললে,—লেখো, তুমি কেমন আছ? জামাই কেমন আছেন! বাড়ীর সবাই কেমন আছে? অনেকদিন কোন খবর পাইনি বলে আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। এবার যেন চিঠির জবাব দেয়। তারপর লেখো,আমি ভাল আছি। দুজনকে আশীর্ব্বাদ জানাও,—এই আর কি সব কথা।

বৃদ্ধা একটি-একটি করে কথা বলে যেতে লাগল—আর বিপিন তার ছাত্র-বৃত্তি-পাশ করা বিদ্যার বহরে সেই কথাগুলোকে বাড়িয়ে তার উপর দু-পোঁছ রঙ্ দিয়ে লিখে চল্‌ল। পিশিমার যা লেখবার ছিল, সে সব কথা শেষ করে বিপিন বললে,—ঠিকানা কি লিখব?

—এই যে বাবা, ঠিকানা—বলে বুড়ী আঁচলের খুঁট খুলে ভাঁজ-করা ময়লা একটা চিরকুট বার করলে। বিপিন সেটা দেখে ঠিকানা লিখলে।

বৃদ্ধা বললে,—মুড়ে ফেলছ যে! আর কিছু লিখবে না?

—আর ত জায়গা নেই।

বৃদ্ধার বুকটা কেঁপে উঠল। জায়গা নেই! আর জায়গা নেই!

কিন্তু লেখবার যে অনেক কথা ছিল—এরি মধ্যে জায়গা ফুরিয়ে গেল! কাল সারারাত যখন চোখে ঘুম আস্‌ছিল না,

তখন ফেলিকে কি লিখবে, সে সব কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল যে। সে যে অনেক কথা! চার বছরে খপর দেবার মত কত ঘটনাই যে গাঁয়ে ঘটে গেছে। নদীটায় চড়া পড়েছে, বোসেদের অত-বড় পুকুর ঝাঁজি হয়ে একেবারে সরবার অযুগ্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেজন্যে ভারী জলের কষ্ট হচ্ছে! তবে' গে গাঁয়ের টেঁপি, পুঁটি, ভুতো, সারদা—এদের বিয়ে হয়ে গেছে। দাশুর ঠাকুমা মারা গেছে—ওদের নন্দর একটি ছেলে হয়েছে—এই সেদিন খুব শিল পড়ে দত্ত-পুকুরের অত মাছ, সব মরে গেছে—এম্‌নি কত কি ব্যাপার যে ঘটে গেছে। প্রত্যেক খপরটিরই যে দাম আছে! চার পাতা চিঠি লেখা হয়ে গেল, অথচ এতগুলো খপর,—সব একেবারেই বাকি রইল!

একটা নিশ্বাস ফেলে বুড়ী খামে-মোড়া চিঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বিপিনকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করে বেচারী সেই চিঠি হাতে করে চল্‌ল, চার ক্রোশ দূরে, সদরের ডাক-ঘরে, সে চিঠি ডাকে দিতে!

২

সহরের মধ্যে ছোট্ট ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার বাড়ী। খাটের উপরে শুয়ে এক সুন্দরী কিশোরী একখানা উপন্যাস পড়ছিল—পাশে অয়েলক্লথ-পাতা ছোট বিছানায় একটি কচি ছেলে ঘুমুচ্ছিল। কিশোরী উপন্যাস পড়ছিল আর মাঝে মাঝে বুকে সে কি-এক অসহ্য আবেগ নিয়ে চোখ তুলে কচি ছেলেটির পানে ফিরে-ফিরে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল।

হঠাৎ এক তরুণ যুবা ঘরে এসে বললে,—তোমার একটা চিঠি গো। বোধ হয় তোমার পিশিমা লিখেছেন।

কিশোরী উঠে চিঠি পড়তে লাগল। অক্ষরগুলো কার হাতের, জানা নেই—কিন্তু কথাগুলো পিশিমারই বটে! স্নেহের সেই শত কাকুতিতে ভরা, আবেগে অধীর—এ পিশিমারই চিঠি বটে!

কিন্তু এ অনুযোগ ত ঠিক নয়। চিঠি কি সে লেখেনি?···না, লেখা হয় নি। আজ লেখা হলনা, কাল লিখব'খন এই বলে ফেলে-ফেলেই রেখেছিল, লেখা আর হয়ে ওঠে নি। তাইত!···একটু দেরী হয়ে গেছে বটে! কিন্তু সে দেরী ত খালি সময়ের অভাবের জন্যেই! সংসারে কাজ-কর্ম্ম আছে, চারধার দেখাশোনা, তার পর ঐ কচি ছেলের ঝক্কি,—ঝঞ্ঝাট কি কম!

স্বামীকে সে বললে,—হ্যাঁগা, একদিন পিশিমার কাছে বেড়িয়ে এলে হয় না!

স্বামী বললে,—কি করে হয়? এই ছোট্ট ছেলে নিয়ে পাড়াগাঁ যাওয়া—!

কিশোরীর মনে একটু ঘা লাগল। এই পাড়াগাঁয়েই ত তার জীবন কেটে গেছে! ভালোই কেটেছে! এই পাড়াগাঁয়েরই মেটে পথ, শ্যাওলা-পড়া পুকুর, শিউলি-তলা, ভাঙা মন্দির তার কত আনন্দের জিনিষ ছিল! আর আজ এই পাড়াগাঁয়ে তার ছেলের যাবার উপায় নেই! পঞ্চাশ রকমের নিষেধ মস্ত বেড়া তুলে দাঁড়িয়ে আছে!

আর পিশিমা! আহা, বেচারী! সংসারে সে-ছাড়া তার যে আর কেউ নেই! তাকে কোলে-পিঠে করে, তারই মুখ চেয়ে পিশিমা এই বাঁধন-হারা সংসারে একটা মস্ত বাঁধন পেয়েছিল যে! সংসার আবার তার সামনে সহস্র প্রলোভন বিস্তার করেছিল!

আজ পিশির আর কি আছে, কে আছে? কেউ না,—কিছু না।

সে ভাবলে, আজ দুপুর বেলায় সে পিশিমাকে চিঠি লিখবে—মস্ত চিঠি। খোকার কথা, নিজেদের কথা সব লিখবে। তা-ছাড়া পিশিমাকে একবার আসবার কথাও লিখবে! কেন পিশিমা আসবে না? জামাই-বাড়ী! ওঃ,—ভারী ত বয়ে গেল তাতে!

দুপুর বেলায় সে চিঠির কাগজ নিয়ে বস্‌ল, পিশিমাকে চিঠি লিখতে। আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে সে অনেক কথা ভাবতে লাগল। কি লিখবে, মোলায়েম করে কি-কি কথা লিখলে পিশিমার এই এত দিনের দীর্ঘ ব্যথা জুড়িয়ে দিতে পারবে,—ভেবে তার একটা নিশানা করে সে লিখলে,—

শ্রীচরণেষু—

স্বামী এসে সামনে দাঁড়াল, বললে,—কি করছ গা?

—চিঠি লিখচি।

—এখন চিঠি-লেখা থাক্। এসো, একটু বেড়িয়ে আসিগে। বরানগরে একটা বাগান ঠিক করা হয়েছে। আরো দু-তিন জন বন্ধু তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যাবে, সেখানে চড়ি-ভাতি করা হবে। নৌকো অবধি ঠিক—নাও, উঠে পড়।

—চিঠিখানা লিখে নি গো,—একটু দাঁড়াও।

—না, না, ও ফিরে এসে পরে লিখো'খন।

চিঠি আর লেখা হল না। ব্রাহ্ম ধরণে ঘুরিয়ে ভালো শাড়ী পরে তাতে ব্রুচ এঁটে কিশোরী স্বামীর হাত ধরে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। গাড়ী করে ঘাটে এসে নৌকোয়—নৌকোয় করে বরানগরে বাগানের ঘাটে আসা হল। আনন্দ সেখানে যেন উছলে পড়ছিল।

সেই আনন্দের মধ্যে কিশোরী এসে আপনার মনটাকে ছেড়ে দিলে! এ আনন্দে কোথায় ভেসে গেল, পাড়াগাঁয়ের সেই অনাড়ম্বর ভাঙ্গা-চোরা বাড়ী-ঘরের ছোট্ট স্মৃতিটুকু! কোথায় ভেসে গেল, স্নেহময়ী পিশিমার ভাবনায়-আকুল চোখের সে ছল-ছল দৃষ্টিই বা!

সন্ধ্যার সময় সকলে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন অত আনন্দ-হাসি-গল্পের মধ্যে থেকে থেকে একটা বেদনা কিশোরীর প্রাণে ভয়ানক বাজছিল!

বাড়ী ফিরে দেখে, ছেলের গা গরম, পুড়ে যাচ্ছে! খুব জ্বর! কাজেই চিঠি আর সে-রাত্রে লেখা হল না!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

খেলা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৭ [৩য় সংখ্যা

নোয়ার কিস্তি

(২)

[একহাতে তেজবলের গদা, একহাতে লণ্ঠন, ভেড়ার লোমের সাজ-পরা, বাঘের নখ, কুমিরের দাঁত ইত্যাদির মালা গলায়, বনমানুষের মতো ভীষণ মূর্ত্তি আদিম মানুষ—আসল নোয়ার প্রবেশ।]

নোয়া। ইস্‌বিস্ ইব্‌লিস্!

মনু। ওহে শয়তান! বলে কি? নি কে?

শয়তান। কিছু তো বুঝতে পারছিনে।

নোয়া। (মনুকে দেখিয়ে) ইস্‌বিস্ ব্‌লিস্!

মনু। আরে নারে বাপু, আমি মনু; ব্‌লিস্ এরি নাম।

(নোয়া গদা উঠাইয়া শয়তানের দিকে অগ্রসর)

শয়তান। কি বিপদ, মারবে না কি!

নোয়া। (গদা আস্ফালন কোরে) ঈস্‌-স্ ঈফ্‌লিস্-স্-স্—

শয়তান। কি বলে, কিছুই বুঝিনে! কেবল সাপের মতো ফোঁস্-ফোঁস্ করছে ও কোন্ জানোয়ার?

মনু। আমার বোধ হচ্ছে আদিম মানুষ। ইস্কুলে পড়বার সময় ডারউইনের বই-খানায় ঠিক অম্‌নি একটা ছবি দেখে-ছিলুম।

শয়তান। তাহলে তো আমাদের কথা বুঝবে না—উপায়!

মনু। সব ভাষার গোড়া দেব-ভাষায় বল্লে হয় তো বুঝবে।

শয়তান। দেব-ভাষা তো আমার মুখে বেরোবেনা।

মনু। আমারো ও-ভাষায় সম্পূর্ণ দখল নেই। দেখি সব ভাষার খিচুড়ি কোরে যদি ওকে গেলাতে পারি;—কি বল?

নোয়া। ইস্‌বিস্—

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

শয়তান। আরে যা করবার চট্‌পট্ কর, ওই এগিয়ে আসছে!

মনু। ক্বঃ ক্বুএ ভোঃ!

নোয়া। (মাটিতে গদা ঠুকিয়া) নূহঃ।

শয়তান। বুঝেছে! বুঝেছে!

মনু। কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝলেম না! নূহ মানে কি? দূর কর, সাধু ভাষা চল্লো না। চল্‌তি ভাষায় চেষ্টা দেখা যাক্। কি কও কর্ত্তা?

নোয়া। কে হও বাছা?

মনু। আজ্ঞে, আমি হনু মনু!

নোয়া। ওহে, তুমি হনুমান!

মনু। আজ্ঞে না, আমি হনু নই;—ম্যান্।

নোয়া। ম্যান্—ম্যান্—মানসপুত্র—মানুষ!

মনু। আজ্ঞে হাঁ, আমি মানুষ, গরীব ব্রাহ্মণ।

নোয়া। ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মণঃ!

মনু। আজ্ঞে না, আমি ব্রাহ্ম নই—হিন্দু।

নোয়া। হিন্দু? তব্ হিন্দি বোলো!

মনু। সর্‌রিলে! হিন্দি বাৎ তো আমার সম্‌জাতে পারবে না সাহেব! বাংলা চল্‌বেনা?

নোয়া। হাম্ সব ভাষা থোড়া থোড়া পড়া; চালাও বাংলা। (গদা আস্ফালন।)

মনু। মশায়, ওই মুগুরটা রাখেন, নাহলে মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ভুলে যাব।

নোয়া। বহুৎ আচ্ছা, গদা রইলো। কিন্তু সাফ জবাব না যদি দাও, গদা উঠবে।

মনু। আপনি কি জানতে চান্ চট্ কোরে বলুন, আমি ফস্ কোরে জবাব দিই।

নোয়া। আমি জান্‌তে চাই এ মানুষগুলো পড়ে-পড়ে কি করছে?

মনু। মরছে; পড়ছে আর মরছে!

নোয়া। এরা পড়তেই বা যায় কেন, মরতেই বা যায় কেন? এই সমিষ্যে পূর্ণ কর; নাহলে গদা উঠলো বলে।

মনু। তা আমি কি জানি! আমি ওদের পড়তেও বলিনি, মরতেও বলিনি।

নোয়া। তবে এরা পড়েই বা কেন, মরেই বা কেন? কে বল্লে এদের পড়তে, আর কেই বা বল্লে মরতে?

মনু। (শয়তানকে দেখিয়ে) ইনি!

শয়তান। আমি কি রকম!

মনু। তোমার ভয়েই তো এরা পড়লো আর মরলো।

শয়তান। মিছে কথা বলো না, তুলসী পাতা ছিঁড়োনা। তুমি এদের পড়াও নি?

মনু। না।

নোয়া। মিছে কথা বলছো? এখনো তোমার হাতে পুঁথি রয়েছে দেখ্‌ছি! গলা পর্য্যন্ত পুঁথির মালা ঝুলিয়ে রেখেছ, আর বল্‌তে চাও পড়াওনি তুমি! এই নোয়ার জাহাজে বসে মিছে কথা বলার শাস্তি কি জানো?

মনু। তা আর জানিনে, চান্দ্রায়ণ!

নোয়া। এই নোয়ার মুগুরে তার মাথার চাঁদি ফাটিয়ে চন্দ্রলোকে—পিতৃগণের কাছে চট্ করে পাঠিয়ে দেওয়া। (গদা উত্তোলন।)

শয়তান। কর কি! থামো, থামো! অবিচার কোরো না।

নোয়া। থাম্‌লেই অবিচার করা হবে।

শয়তান। না। থামলে ঠিক বিচারই হবে;—বিচার হয়ে বসে আছে।

নোয়া। (রাগিয়া) শয়তান! ইব্‌লিস্! আশিবিস্! তুমি আমাকে ঠকিয়ে উল্টো বিচার করাবে ভেবেছ? তা হবেনা। তুমি আদম আর হাবাকে স্বর্গ থেকে পড়িয়েছিলে, আমাকে আবার তেমনি পড়াবে নাকি!

শয়তান। তোমাকে আমার পড়াতে হবে না, তুমি নিজের কর্ম্মদোষে নিজেই পড়বে, যদি না আমার কথাটা শোন।

নোয়া। আচ্ছা বল শুনছি, কিন্তু—

মনু। আগে শোন না ওঁর কথা, তার পর ফিন্তু কোরো,—আমার মাথায় চান্দ্রায়ণ কোরো! ভাই সহদেব, এবারে রক্ষে কর ভাই!

শয়তান। আমাকে আর বনমানুষ লেলিয়ে দেবে?

মনু। বনমানুষ কি, কোনো মানুষ আর তোমার দিকে যদি যায় তো সে দায় আমার!

শয়তান। মনে থাকবে তো?

নোয়া। কই শয়তান, কি বলবে বল।

শয়তান। তুমি বিচার করতে চাচ্ছ কোন্ দলিলের জোরে আগে শুনি, তার-পরে বলছি।

নোয়া। আমার দলিল এই গদা।

শয়তান। ওতো অবিচারের অত্যাচারের দলিল! অমন দলিল তুমি দেখাচ্ছ তো একটা; আমি শয়তান, আমার মাথার উপরে দুটো আছে—ধারালো, ছুঁচালো, মোষের শিং-এর মতো বাঁকা,—"পড়িলে যাহার পরে ভাঙে হীরার ধার!" বিচার তুমি যে করতে পার, তার দলিল আমি দেখতে চাই, তবে তো তোমার আদালতে ওকালতি করবো।

নোয়া। তুমি কি বক্‌ছ! জাহাজে কোনো দিন পারাপার করেছ কি?

শয়তান। না, পারে যেতে তো আমার ইচ্ছেই হয় না। তবে অপারে—অকূলে জাহাজ ভরা-ডুবি করতে আমাকে—যাওয়া আসা করতে হয়—শূন্যভরে বাদুড়ের মতো পাখা মেলে।

নোয়া। তাহলে শোনো। জাহাজের আইন হচ্ছে কাপ্তেনের ইচ্ছে। যে পারাপার করে তার যা হুকুম তাই হ'ল হাকিম, তাই হ'ল বিচার, তাই শাস্তর, তাই শাস্তি।

শয়তান। আচ্ছা, ডাক তাঁকে!

নোয়া। ডাকবো আবার কাকে?

শয়তান। তোমার কাপ্তেনকে!

নোয়া। কাপ্তেন আবার কে! আমি নোয়া, আমি এ জাহাজের কাপ্তেন, খালাসী, সারেং সমস্তই।

মনু। ও বাবা, ইনি একাই একশো দেখছি! আমাকে হারিয়েছে!

শয়তান। তুমি নোয়া নও।

নোয়া। এ সন্দেহ তোমার হবার কারণ?

শয়তান। কারণ আমি পেয়েছি। সে যাই হোক, ধরে নিলেম তুমিই—

নোয়া। নোয়া।

শয়তান। তা যদি হল, তবে বল তো আদম আর হাবাকে পড়িয়েছিল কে?

নোয়া। কেন শয়তান?

শয়তান। হলনা। আদম আর হাবাকে পড়িয়েছিল যে, ওই দুটো মানুষকে পড়া-

বার আগে তার নাম শয়তান ছিল না, পড়াবার পরে হ'ল শয়তান !

নোয়া। বুঝলেম না পরিস্কার কোরে বল —সহজ ভাষায়।

শয়তান। এর চেয়ে সহজ ভাষা আর কি হবে ?

মনু। আমি বলছি শোনো—পুরাকালে পরমপুরুষ--

শয়তান। আরে থামো তুমি ! সে সব কথা তুমি কি জানবে ? মানুষ তখন পৃথিবীতেই আসেনি, নিষিদ্ধ ফল তখন—

নোয়া। আরে রাজে কথা রাখ। পড়ার ফলটা কি দাঁড়ালো ?

শয়তান। ফল দাঁড়ালো—যাঁর দোষে ফল পড়লো আর যিনি আদিমানুষের জুড়ীকে পড়ালেন বিচারে তাঁর হ'ল একটু-খানি বদনাম—শয়তান বোলে। আর নির্দ্দোষ বেচারা—যারা পাকেচক্রে পড়ে পড়লো, তাদের হলো নির্ব্বাসন—নন্দনকানন থেকে !

নোয়া। বিচার তো ঠিকই হয়েছিল।

শয়তান। তাই যদি বল্লে তবে এই বেচারা মনুবাবুর জন্যে উল্টো বিচার তো হ'তে পারে না ! ইনি এই লোকগুলিকে পড়িয়েছেন ; এঁকে তুমি শয়তান বলতে পার ; কিন্তু যারা পড়েছে তাদেরই দাও কঠিন শাস্তি।

মনু। মার মুগুর ওদের মাথায় ! কেরাও চান্দ্রায়ণ !

নোয়া। মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা মেরে কি লাভ ?

মনু। তবে দাও কটাকে জলে ফেলে।

নোয়া। এই জল-ঝড়ে মরা শেয়াল-কুকুরকেও কেউ বাইরে টেনে ফেলে না, আর আমি মানুষ হয়ে—

মনু। তবে দাও ওই সিংহি-বাঘের মুখে ফেলে !—ওরা আধ-পেটা রয়েছে খেয়ে বাঁচুক।

পণ্ডিত। (জানান্তিকে) ওহে, ও মোল্লা, ও পাদ্রী, ও ওর নাম কি—খামুস্, আর দেরী নয়, মুচ্ছা ভঙ্গ কোরে পৃষ্ঠভঙ্গ দাও।

পাদ্রী। রেডি, ষ্টেডি,অফ্—যঃ পলায়তি স জীবতি।

(দুদ্দাড় শব্দে প্রস্থান।)

নোয়া। আরে, আরে, একি !

মনু। ধর, ধর, পালায়, পালায় !

(নোয়ার মুগুরটা নিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্থান।)

নোয়া। (বসিয়া পড়িয়া) এতো ভারি অন্যায় হ'ল,—বিচারের পূর্ব্বেই আসামী পালালো !

শয়তান। ওদের পা আছে পালিয়েছে; তুমিও যাওনা ওদের পিছনে-পিছনে তাড়া কোরে,—দাও গিয়ে মাথায় মুগুর বসিয়ে !

নোয়া। তুমি তো বল্লে তাড়া কোরে যাও !—এ নৌকোখানা কি যেমন-তেমন ঠাওরালে যে ছুটে গিয়ে ওদের ধরবো ? এ যে একটা বিরাট ব্যাপার ; ভবসিন্ধু পারে যাবার তরণী ;—পৃথিবীর জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ এতে এসে বাসা করেছে, তার মধ্যে ওই ক'টা মানুষকে কোথায় খুঁজে পাব ?

শয়তান। মানুষ মানুষের কাছেই তো থাকবে। যে খোপে মানুষগুলো তোমার রাখবার কথা, সেই খোপটায় সন্ধান করগে না !

নোয়া। আরে খোপে খোপে থাকে-

থাকে যেখানকার যা গুছিয়ে নিয়ে আসবার কি সময় পেয়েছি ? হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, যে যেখানে পারলে উঠে পড়ল ! দুদ্দাম্ জিনিষ-পত্তর পোঁটলা-পুটলি খোলের মধ্যে ফেলে ভেসে পড়েছি,—সেই থেকে দুর্য্যোগ চলেছে, সব ওলট-পালট, কিছু গুছিয়ে উঠতে পারছিনে। এমন জানলে কি জাহাজের কাপ্তেনি নিই ?

শয়তান। তাই তো, ধর্ম্মের ঘুণ-ধরা ঐ মানুষগুলো যেখানে যাবে সেইখানেই ঘুণ ধরাবে ! এমন কি তোমার এই প্রকাণ্ড জাহাজ-খানাকেও ঘুণ-ধরিয়ে ফুটো কোরে দিতে পারে !

নোয়া। সেজন্যে ভাবিনে ; গোবরা-কাঠে জাহাজ বানিয়েছি—নোয়ার মত শক্ত সে কাঠ ; তৈ বেঁধেছি পাকা বাঁশের—একটিও কাঁচা বাঁশ নেই ; তার উপরে দিয়েছি এঁটেল মাটির সাতপুরু প্রলেপ।

শয়তান। ধর্ম্মের ঘুণ বড় ভয়ানক ! চেনোনা তাই ও-কথা বলছ। গোবরমাটি কাঁচাপাকা এমন কি জলে পর্য্যন্ত সে গিয়ে ধরে। কোন্ দিন দেখবে ঐ মানুষগুলো তোমার হাতের ন্যায়দণ্ড মুগুরে পর্য্যন্ত ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে !

নোয়া। তাই নাকি ? তবে এখনি তো মানুষের মাথায় আমার অ্যা—আমার মুগুর দেকে নিলে ?

শয়তান। ঘুণ ! এইবার নোয়ায় মর্চ্চে ধরলো ! ধরলো—ধরলো—ধরলো—ও-হো হোঃ-হোঃ ! (বিকট হাস্য।)

নোয়া। হাস্‌ছিস্? আমার দুঃখে হাস্‌ছিস্? পাজি, হতভাগা, শয়তান, বদমাস, লক্ষীছাড়া, ভূত !

শয়তান। হোঃ হোঃ !

নোয়া। গালাগালি দিলে হাসে এমন তো বেহায়া দেখিনি !

শয়তান। ওগুলো কি গালাগালি হ'ল ? ও'তো আমার নাম-কীর্ত্তন করা হ'ল। ও যদি গালাগালি হয় তবে আমিও তোমায় গালা-গালি দিই—ওরে ও নোয়া, বুড়ো, কালো, বানরমুখো বনমানুষ !

নোয়া। গালাগালি তবে কাকে বলে ?

শয়তান। বটে, আমি তোমায় গালা-গালি শেখাই আর তুমি আমায় গাল দাও আর কি !

নোয়া। আঃ ! আমার এমন রাগ হচ্ছে ! এ সময় মুগুরটা হাতের কাছে নেই।

শয়তান। মুগুরটা তোমার হাতের কাছ থেকে চলে আমার কাছে না এসে যে বাইরে চলে গেছে—সেটা ভালোই হয়েছে।

নোয়া। ভালো হ'ল কেমন কোরে ?

শয়তান। তাহলে তুমি যে নোয়া সেটা কেউ আর বলতে পারতো না।

নোয়া। তবে কি বলতো ?—নোয়া ছাড়া কি বলতো শুনি ?

শয়তান। নোয়া-চুরই বলতো ; আর বলবে কি ?

নোয়া। চুরি ? মুগুরটা কি চুরি বলতে চাও ? যে নিষিদ্ধ গাছের ফলের জন্যে আদমের শাস্তি, মুগুরটা সেই গাছের ডালে তৈরি। স্বর্গ থেকে আসবার সময় ওটা আদম প্রথম আনেন পৃথিবীতে; সেই থেকে এপর্য্যন্ত ঐ মুগুর আমার বংশে ব্যাভার হচ্ছে। আমি ঐ মুগুরে পিটিয়ে নতুন পৃথিবীর মাটি সমান

কোরে সত্যযুগের বীজ রুইবো বোলে সঙ্গে এনেছি। তুমি বলতে চাও ওটা চুরি করা সামিগ্রি? পাজি, হতভাগা, বদমাস্, শয়তান, আশিবিষ্, ইব্লিস্!

শয়তান। হোঃ হোঃ হোঃ! (বিকট হাস্য।)

(লম্বা একটা আঁকশি-হাতে নোয়ানীর প্রবেশ।)

নোয়ানী। বলি, পাগলের মতো অত চীৎকার করছ কেন?

নোয়া। হ-ত-ভাগা!

নোয়ানী। হতভাগা বলছ কাকে? আমাকে নাকি?

(আঁকশি উঁচাইয়া অগ্রসর।)

নোয়া। আরে না, না! ঐ শয়তানটাকে বলছি হতভাগা।

শয়তান। দেখুন দেখি, অমন কাজের মুগুরটা চুরি গেল ওঁর, আর আমি হলেম কিনা হতভাগা! মুগুরটা কি আমার?

নোয়ানী। সত্যিই তো তুমিই হতভাগা। না হলে অমন মুগুরটা হারাও? ও বেচারার কি দোষ যে ওকে বলছ হতভাগা!

নোয়া। তুমি চেনোনা ওকে, ওটা শয়তান।

নোয়ানী। শয়তানের কি অমন চেহারা হয়? আহা দেখতে যেন রাজপুত্তুর! কেমন কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলগুলি, রং যেন ফেটে পড়ছে—কেমন সভ্য-ভব্য—বাস্তবিক বাপু—

নোয়া। আমি তো দেখছি ওর মাথায় পাকানো দুটো শিং, পায়ে দুখানা খুর!

নোয়ানী। বুড়ো হয়ে তোমার চোখে ছানি পড়েছে।

নোয়া। আমি কানা? আমি বুড়ো? মুগুরটা গেল কোথা! আমি মরছি মুগুরের শোকে, উনি এলেন আমাকে উপদেশ দিতে এই সময়!

শয়তান। আর একটু আগে এলে যে ভালো হ'ত না।

নোয়ানী। মুগুর গেছে না বেঁচেছে! কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, কেবল মুগুর ভাঁজছেন আর কাপ্তেনি করছেন! মুগুরটা গিয়ে তবু দেখছি চেহারাটা একটু মানুষের মতো দেখাচ্ছে।

নোয়া। মুগুর না হ'লে খাবে কি?

নোয়ানী। কেন, মুগুর না হলে খাওয়া চলবেনা কেন?

নোয়া। নতুন পৃথিবীর নতুন মুখ পিটে নরম কোরে তবে তাতে বীজ বপন করতে হবে, তবে তো কিছু গজাবে।

শয়তান। হাঃ হাঃ!

নোয়া। হাসলে যে?

নোয়ানী। কারণ আছে তাই হাসছেন —তোমার বুদ্ধি দেখে হাসছেন।

নোয়া। আচ্ছা, তোমার মাথায় মুগুর ছাড়া কিছু গজাবার আর কি উপায় আছে শুনি?

নোয়ানী। যখন এই সাতসমুদ্র তেরো নদীর জলে-ভেজা নরম মাটিতে গিয়ে নোয়ার জাহাজ ঠেকবে, তখন বুঝিয়ে দেবো কি গজাতে হ'লে মুগুর কোথায় কাজে লাগে।

নোয়া। তোমার কথা আমি কিছু বুঝলেম না! কেবল তামাসাই করছ ভবিষ্যতের ভাবনা মোটেই ভাবছ না!

নোয়ানী। কেন ভাবব? তুমি বলো কেন? প্রিয়তম নোয়া, ভাবনা কি?

সমুদ্র তেরো নদীর জলে ভেজানো মাটিতে বীজ ছড়িয়ে গাছ হয়ে, গাছে ফল ধরতে যত দিন যাবে, সে ক'দিন এই আঁকশি দিয়ে এই জাহাজের মাস্তুলে ঝোলানো মুরগী, হাঁস, তিতির, বটের; আর জাহাজের নীচের তলা-কার গোঁয়াচ্চায় জিয়োনো কৈ, মাগুর, ইলসে মাছের ডিম পেড়ে-পেড়ে তোমাকে সিদ্ধডিম খাওয়াবো, নিজেও খাবো।

নোয়া। তার পর? এ-সবের পর?

নোয়ানী। নতুন পৃথিবীতে নতুন গাছে প্রথম-ফলটি পাকবে আর অমনি এই আঁকশি—

নোয়া। আঁকশি কি?

নোয়ানী। বুঝলে না প্রিয়তম—এখনো বুঝলে না?

শয়তান। মুগুর না হলে উনি তো বুঝবেন না।

নোয়ানী। এই সহজ কথাটা—

শয়তান। আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওহে ও, তোমার নাম কি?

নোয়া। নোয়া।

শয়তান। চেয়ে দেখ দেখি ওদিকটায়। কি দেখছ?

(প্রকাণ্ড একটা গোল দাঁড়ে শুক-শারীর আবির্ভাব।)

নোয়া। শুক-শারী দাঁড়ে বসে আছে।

শয়তান। বলে যাও—তার পর?

নোয়া। শুক ঘুমোচ্ছে, শারী চুপিচুপি ছিকে থেকে একটা ফল পেড়ে খাচ্ছে।

শয়তান। বল, বল, তার পর।

নোয়া। তারপর আর কি? দিব্যি কোরে ফলটি খেয়ে ঠোঁটদু'খানি পুঁছে শারীটা শুকের মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে।

নোয়ানী। এতক্ষণে বুঝলে? ওই নতুন পৃথিবীতে প্রথম-ফলটি পেড়ে নিজে বেশ কোরে খেয়ে এই আঁকশিটা দিয়ে এম্নি কোরে তোমার মাথা চুল্কে দেবো।

নোয়া। উঃ, মরেছি, মরেছি!

শয়তান। আমিও তবে সরেছি।

নোয়া। আরে যেওনা, যেওনা! আমার মুগুর—

শয়তান। ওই যে আসছে।

(প্রস্থান।)

(নেপথ্যে—সরো সরো গদাধর আসছেন।)

শুক-শারী। গোপীজী ভজো!

[কাঁশর, ঘণ্টা, শিঙে, ব্যাণ্ড, জপঝম্প সব একসঙ্গে বেজে উঠলো। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সব জাত দলে-দলে নিজের নিজের পতাকা নিয়ে প্রকাণ্ড একটা Salvation Armyর মতো বিচিত্র বেশে প্রবেশ করলে। মধ্যে ছাতা মাথায়, একহাতে চামর, একহাতে গদা, চণ্ডীর গানের অধিকারীর সাজে মনুবাবু—অলকা-তিলকায় সাজানো—আবির্ভূত হলেন।]

নোয়া। তুমি কে আবার?

পণ্ডিত। গদা-ধর—দেখতে পাচ্ছনা।

মোল্লা। হজরত মুষল্—

রাব্বি। আল্ পটাস্—

পাদ্রী। গ্রেট্ পিট-রি-আর্ক।

নোয়া। আর আমি?

মনু। তুমি কেউ নয়; কেবলমাত্র নোঃ—আঃ!

(উপবেশন।)

নোয়ানী। আর এই নোয়ানী—আঁকশি-হাতে?

শয়তান। আঁকড়ি-বুড়ি তুমি আমার!

নোয়ানী। বটে! আমাকে এখন গদাধরের পাশে নক্সি হয়ে বসতে হবে।

শয়তান। কেন, গদাধরের চেয়ে রূপে-গুণে আমি কমটা কিসে?

নোয়ানী। রূপে-গুণে তুমি বরং ভালোই। কিন্তু তোমার নামটা যে খারাপ! লোকে আমায় বলবে শয়তাননী! আঃ তোমার নামটা যদি—

শয়তান। নামটা যদি আমার গদাধর হতো তোমায় লোকে বলতো গদাধরী।

নোয়ানী। তাহলে আমি ওকে চাইনে।

শয়তান। বস্, গদাধরের কিস্তি মাৎ! এসো তবে আমারি কাছে এইবার।

মনু। কিহে মাৎ কিহে? হজরত মুষল্ রয়েছেন কি করতে?

নোয়ানী। বটে, আর লোকে বলুক আমায় মোচলনী!

মনু। আল্ পটাস্—

নোয়ানী। মাগো,লোকে ডাকবে পটাসী বোলে! নামের ছিরি দেখে বাঁচিনে!

মনু। (অগ্রসর হয়ে) তবে পিট-রি আরকের—

নোয়ানী। পেত্নি হতে আমি চাইনে!

শয়তান। তার চেয়ে শয়তাননী যে ঢের ভালো।

নোয়ানী। না, আমি তাও হব না।

মনু। কিহে শয়তান, এবারে কার কিস্তি মাৎ হল? কথা নেই যে?

শয়তান। এবারে তাহলে নোয়ার—

নোয়ানী। বেঁচে থাক আমার নোয়া।

মনু। আশীর্ব্বাদ করি তোমার নোয়া ক্ষয় যাক্।

নোয়া। বিচারে তাহলে এই আঁকড়ি-বুড়ি—

মনু। তোমারি ভাগ্যে পড়লো।

নোয়া। তাহলে গদাটা আমায় দাও; নাহলে—

নোয়ানী। আর গদায় কাজ কি,এই আঁকশি থাকলেই হলো। (আঁকশির গোঁতা। নোয়ার পতন ও মূর্চ্ছা।)

মনু। আরে, আরে, কর কি!

শয়তান। নোয়ার কিস্তিও মাৎ!

পণ্ডিত। ওহে নাম শোনাও, নাম শোনাও!

(গান)

"আরে নামে নামে গঙ্গাপানি" ইত্যাদি।

শুক-শারী। গোপী-জী ভজো!

[দাঁড়ে শুক-শারীর অন্তর্দ্ধান। অলোক চক্রের মাঝে প্রকাণ্ড একটা নোয়ার চাবি হাতে জীব্রিলের আবির্ভাব।]

জীব্রিল। নোয়া, ওঠো!

নোয়া। উঠে করবো কি? আবার তো পড়তে হবে, তার চেয়ে পড়েই থাকি না!

জীব্রিল। নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেছে; খাঁচা খুলে সবাইকে একে-একে বার কর।

(নোয়াকে চাবি দিয়ে জীব্রিলের অন্তর্দ্ধান।)

মনু। ইনি কে এলেন এবং গেলেন?

পণ্ডিত। চাবি দিয়ে গেলেন এ কোন্ দেবতা,—তেত্রিশকোটির কোন্‌টি?

মোল্লা। বোধ হচ্ছে হজরত—

পাদ্রী। রেভারেণ্ড—

রাব্বি। আল্—

শয়তান। জীব্রিল!

মনু। নৌকোর ঘরে বসে তো বেশ

কিস্তিমাৎ হচ্ছিল; চতুরং-খেলায় হঠাৎ ওঁর এসে পড়ার কারণ?

শয়তান। কারণটা বোধ হয় চাবি দেওয়া।

মনু। অর্থাৎ—

শয়তান। নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে সবাইকে নিয়ে নতুন যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পশুশালা, পিঁজরাপোল ইত্যাদিতে বন্ধ করা হবে, শুনলে না?

নোয়া। জীব্রিল হলেন বান্ধব;—সৃষ্ট জীব মাত্রেরই বন্ধু।

পণ্ডিত। আর কৃষ্টের জীব খৃষ্টের জীব—এদের কি হন উনি?

শয়তান। হবেন আবার কি! (জিভ বার কোরে) নাম শুনে বুঝলে না,—জীব্রিল।

নোয়া। তোমায় আর সাপের মতো জিভ নাড়তে হবে না! এস তোমাদের সবাইকে খাঁচা খুলে বার কোরে দিই, মনের সুখে নতুন পৃথিবীতে বিচরণ করগে।

মনু। চল, চল। (অগ্রসর।)

শয়তান। এবারেও ছিষ্টিতে মানুষের আগে মনুই চল্লেন।

মনু। মনুই তো প্রজাপতির প্রথম—

শয়তান। কিন্তু দেখো মনুবাবু,প্রজাপতির মতো তোমার ডানা নেই, হঠাৎ খাঁচা থেকে বেরিয়ে যেন জলে পড়ো না, দেখে-শুনে নতুন পৃথিবীতে পা—

মনু। বুঝেছি আর বলতে হবে না।

নোয়া। চলনা; দাঁড়ালে কেন?

মনু। আরে রও, আগে ভক্তরা যাবেন পৃথিবীতে,তবে তো ভগবান মনু অবতীর্ণ হবেন সেখানে! ওহে ও পণ্ডিত, চল তুমিই এগিয়ে চল, পথ দেখাও।

পণ্ডিত। আজ্ঞে আমার পায়ের বাতটা কদিন ধরে বড়ই বেড়েছে, এ সময় সোঁতা মাটির উপরে হঠাৎ গিয়ে পড়লে—

মনু। মোল্লা, তুমি তবে এগিয়ে দেখ। চুপ রইলে যে? রেভারেণ্ড ফাদার, তুমি তবে—

পাদ্রি। ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট আগে যাবেন একি হতে পারে প্রভু! এই খামুস্‌কে পাঠান।

মনু। তাহলে তুমিই—

রাব্বি। খামুস্!

মনু। ওকি? খামুস্ বলেই চুপ করলে যে! ভাই সহদেব, ওহে শয়তান, তাহলে তুমি একবার দেখনা—সত্যিই এখনো চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে, না শুক্‌নো মাটি কিছু বেরিয়েছে।

শয়তান। আলোতে তো আমার যাবার যো নেই, গেলেই চোখ উঠবে।

মনু। পণ্ডিত-মশায়, দেখুন না—খুব দূরে একটা দরজার ফাটল দিয়ে আলো আসছে! নিশ্চয়ই বাইরে সূর্য্য উঠেছে! দিব্বি খট্ খট্ করছে দিন। আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই, দেখছেন ওই আলোটা।

পণ্ডিত। ও আলেয়ার আলো! আমি জানি এখন বাইরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি হচ্ছে, জলে চারিদিক থৈ থৈ করছে, একতিল মাটি নেই।

নোয়া। আচ্ছা, রোসো, আমি দেখছি। ওহে সব পরিষ্কার—একটুও মেঘ নেই, বেরিয়ে পড় এইবেলা।

শয়তান। মেঘ নেই থাকলো, জল আছে কিনা?

নোয়া। সে তো এখান থেকে দেখা যাবে না, আমরা যে আরারুটের চূড়োয় রয়েছি; অনেক নীচে পৃথিবী! কিন্তু পাহাড়ের চূড়োটা বেশ শুক্‌নো দেখা যাচ্ছে। নেমে পড় সবাই।

মনু। পাহাড়ের চূড়ো শুক্‌নো থাকলো তাতে কি?

শয়তান। তার চেয়ে আরো শুক্‌নো তো এই পাহাড়ের উপর নৌকোর কাম্‌রাটা।

নোয়া। তাহলে তোমরা নামতে চাও না? আমি কাপ্তান, আমার কথা অমান্য কর্‌ছ?

নোয়ানী। তোমায় আর কাপ্তানি ফলাতে হবে না! দাও দেখি চাবির গোছাটা আমার হাতে!

নোয়া। কেন চাবি নিয়ে আবার তুমি করবে কি? গদাটা গেছে, আবার চাবি আমি ছাড়ি! রইলো এই গলায় ঝোলানো।

নোয়ানী। চাবি না হয় নাই দিলে, এখন আমি যা বলি কর। ওরা যদি কেউ না যেতে চায়, তবে ঐ খাঁচাগুলোর চাবি খুলে দাও, বাঘ-ভালুকগুলো একটু মাঠে ছুটোছুটি ক'রে বাঁচুক্। এস, এই খাঁচাটা আগে খোলো—ওরে বাস্‌রে মস্ত একটা বাঘ!

(বাঘের গর্জ্জন।)

মনু। আরে বাপরে, খুলোনা, থামো, রোসো!

সকলে। পালা রে পালা! (গর্জ্জন ও সকলের হুদ্দাড় পলায়ন, পতন, উত্থান ইত্যাদি।)

মনু। ধর ধর আমাকে চট্ কোরে! (দর্শকদের প্রতি) ওহে তামাসা দেখছ কি, ধরনা আমি মোটা মানুষ।

(সকলের পলায়ন।)

নোয়া। এই যে আমার গদাটা ওরা ফেলে গেল! (গদা ঘুরাইয়া) বেরও বেরও চট্ কোরে আলোতে; চল অন্ধকার থেকে নতুন পৃথিবীতে নেমে পড়।

নোয়ানী। তুমি ওই গদার ঘায়ে মানুষগুলোর আলোতে বার হবার পথটা পরিষ্কার করে দাওগে, চাবির গোছাটা আমায় দাও, আমি হাঁস-মুরগীর ঝুড়িগুলো খাঁচা-ঘরের মধ্যে থেকে বার কোরে গোরু মোষ ভেড়া আর কাগ-বগগুলোকে ছেড়ে দিই নতুন পৃথিবীতে।

নোয়া। আর বাঘভালুকগুলোকে?

নোয়ানী। এখন ছাড়া নয়; তাহলে সব খেয়ে ফেলবে। আগে ঘর-দুয়োর গোয়াল গোছ গুছিয়ে নিই, তারপর বুনো জন্তুদের ছাড়বো। আমার সেই কুকুরটাকেও নিতে হবে।

নোয়া। আর শয়তানটাকে? সে কোথা গেল? তাকে নেবে না?

নোয়ানী। তার বদলে এই বনমানুষটাকে সঙ্গে নিলেই চলবে।

(নোয়ার গলা ধরিয়া প্রস্থান।)

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবতার

(Theophile Gautier-এর ফরাসী হইতে)

১

অক্টেভের দেহ কোন্ রোগে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হইতেছে তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অক্টেভ শয্যাশায়ী হয় নাই; সে দৈনিক জীবনের কাজ সমান ভাবে করিয়া যাইতেছিল; কখন একটি হা-হুতাশ তার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই; তথাপি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তার শরীর ক্রমশই ধ্বংসের দিকে যাইতেছে। তার আত্মীয়-স্বজন উৎকণ্ঠিত হইয়া ডাক্তার ডাকাইলেন; ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কোন রোগ কিংবা ভয় পাইবার মতো কোন রোগের লক্ষণ তাহার শরীরে কিছুই প্রকাশ পায় না; বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ভাল আওয়াজই হইতেছে; হৃৎপিণ্ডের উপর কাণ রাখিয়া শুনিলেন, হৃৎ-পিণ্ডের স্পন্দন খুব দ্রুতও হইতেছে না, খুব আস্তেও হইতেছে না। কাসি নাই; জ্বর নাই; কিন্তু তবু তার জীবনী-শক্তি যেন কোন অদৃশ্য ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ধন্বন্তরী বলেন, মানুষের জীবন এইরূপ গুপ্ত ছিদ্রে পূর্ণ।

কখন কখন তার মূর্চ্ছা হইত; তাহাতে মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ পাথরের মতো শক্ত হইয়া উঠিত। দুই এক মিনিট কাল মনে হইত যেন প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে; কিন্তু একটু পরেই, যে হৃৎ-স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা যেন কোন রহস্যময় অদৃশ্য হস্তের দ্বারা আবার চালিত হইত। অক্টেভের মনে হইত যেন সে কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাধিনাশক উৎস-জল-সেবনের জন্য উৎস-দেশে তাকে পাঠান হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না। সমুদ্র পথে নেপল্‌স্ নগরে পাঠান হইল, তাহাতেও কোন ফল হইল না। যে সুন্দর সূর্য্যের এত খ্যাতি ও গৌরব, তাহার নিকট সেই সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাধি-স্থান বলিয়া মনে হইল। যে বাদুড়ের কালো পাখার উপর "বিষণ্ণতা" যেন স্পষ্ট লেখা থাকে, সেই বাদুড়ের ধূলিময় পাখা এই উজ্জ্বল-নীল আকাশের উপর যেন চাবুক হানিতেছে এবং বাদুড়েরাও মাথার উপর ঘোরপাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। যেখানে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা নগ্নগাত্রে সূর্য্যকর সেবন করিয়া তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই মের্গেলিনের জাহাজ-ঘাটে আসিয়া তাহার রক্ত যেন জমিয়া গেল।

কাজেই অক্টেভ আবার তাহার বাসা-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল; আবার সাবেক অভ্যাস অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ছেলে-ছোকরার ঘর যতটা সজ্জিত হইতে পারে, সেই হিসাবে ঘরগুলা আসবাব-পত্রে মন্দ সজ্জিত নহে। কিন্তু

ঘরে যে বাস করে, তার চেহারা ও চিন্তা-প্রবাহ ক্রমশ যেন সেই ঘরেতেও সংক্রামিত হয়। অক্টেভের বাসা-বাড়ী অক্টেভেরই মতো একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পর্দ্দার বুটিদার গোলাপী রঙের কাপড়ের রং জলিয়া গিয়া ফ্যাঁকাসে হইয়া পড়িয়াছে; তাহার মধ্য দিয়া এখন একটু সাদাটে রঙের আলো আসে মাত্র। বড় বড় ফুলের তোড়া শুকাইয়া গিয়াছে। ওস্তাদের হাতের ভাল ভাল ছবি ফ্রেমে আবদ্ধ—সেই ফ্রেমের সোনালি ধার ধূলায় ক্রমশ লাল হইয়া গিয়াছে; অগ্নি-কুণ্ডের আগুন অবহেলাবশতঃ নিভিয়া গিয়াছে, ছাইয়ের গাদা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। ঝিনুকখচিত ও তাম্রমণ্ডিত দেয়াল-ঘড়ীর শোভা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে; আছে মাত্র সেই টিক্ টিক্ শব্দ, যে শব্দ রোগীর কামরায় রোগীর দুর্যাপ্য সময় মৃদুস্বরে জানাইয়া দেয়। দরজাগুলার কপাটগুলা নিঃশব্দে বন্ধ হয়; দরজার পা-পোষের উপর কচিৎকখন কোন আগন্তুক অতিধীরে পাদক্ষেপ করে। এই ঠাণ্ডা ও অন্ধকেরে বরগুলায় ঢুকিবামাত্র আনন্দের হাসি যেন আপনা-আপনি আটকিয়া যায়; ঠাণ্ডা ও অন্ধকেরে হইলেও ঘরগুলায় আধুনিক ধরণের আস্‌বাবের অপ্রতুল নাই। অক্টেভের ভৃত্য, একটা পালোকের ঝাড় বগলে করিয়া হাতে একটা বারকোষ লইয়া ঘরের মধ্যে ছায়ার মতো ঘুরিয়া বেড়ায়; স্থানটির স্বাভাবিক বিষণ্ণতা প্রযুক্ত পরিশেষে অজ্ঞাতসারে সেই ভৃত্যও তাহার বাচালতা হারাইয়াছে। দেয়ালে মুষ্টি-যুদ্ধের সরঞ্জাম সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে, কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায়, বহুদিন যাবৎ তাহাতে হস্ত স্পর্শ হয় নাই। বই-গুলা হস্তে লইয়া আবার ইতস্তত ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে—এই সকল নিক্ষিপ্ত কেতাব আস্‌বাবের উপরেই গড়াগড়ি যাইতেছে। একটা পত্র-লেখা আরম্ভ হইয়াছে, কত মাসে যে তার শেষ হইবে, বলা যায় না; চিঠির কাগজ-খানায় হল্‌দে রং ধরিয়াছে—উহা আফিস্-ডেক্‌সের উপর নীরব ভৎর্সনার মতো বিরাজ করিতেছে। ঘরে লোক থাকিলেও ঘরগুলা মরুভূমির মত মনে হইতেছে। উহার মধ্যে যেন জীবন নাই। কবরের মুখ খুলিয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কেহ ঘরে প্রবেশ করিলে তাহার মুখের উপর একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা আসিয়া লাগে।

এই বিষাদময় আবাসগৃহে কোন রমণী এ পর্য্যন্ত পদনিক্ষেপ করে নাই। অক্টেভ এইখানেই বেশ আরামে বাস করিতেছে; এমন আরাম সে আর কোথাও পায় না; এই নিস্তব্ধতা, এই বিষণ্ণতা, এই এলো-মেলো ভাব—ইহাই তাহার ভাল লাগে। জীবনের তুমুল আমোদ-কোলাহলে যোগ দিতে অক্টেভ ভয় করে;—যদিও কখন কখন এইরূপ আমোদ-আহ্লাদের মজ্‌লীসে মিশিতে সে চেষ্টা করিয়াছে! তার বন্ধুরা কখন কখন নিমন্ত্রণ-সভায়, আমোদ-প্রমোদের সভায় তাকে জোর করিয়া লইয়া যাইত—কিন্তু সে সেই-সব স্থান হইতে আরও বিষণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিত। তাই সে এই রহস্যময় বিষাদের সহিত আর এখন যুঝাযুঝি করে না। কালকি হইবে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ঔদাসীন্যের সহিত দিনগুলা কাটাইয়া দেয়।

সে কোনপ্রকার মৎলব আঁটিত না,—ভবিষ্যতের প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল না। সে মৌনভাবে ভগবানের নিকট তার জীবনের ইস্তফা পাঠাইয়াছিল, আশা করিয়াছিল, এই ইস্তফা গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তুমি যদি কল্পনা কর,—তার মুখ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, রং মলিন হইয়া গিয়াছে, হাত-পা সরু হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বড়ই ভুল করিবে। চোখের পাতার নীচে অল্প-বিস্তর যেন খেঁত্‌লিয়া গিয়াছে, চোখের চারিধার একটু হল্‌দে হইয়াছে; কপালের রগে নীল শিরা বাহির হইয়াছে,—লক্ষ্য করিলে এইমাত্র পাইবে। কেবলমাত্র, চোখে আত্মার জ্যোতি নাই, ইচ্ছা, আশা, বাসনা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। এরূপ তরুণ মুখে এরূপ মৃতবৎ দৃষ্টি বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; জ্বর-প্রভৃতি সাধারণ রোগের লক্ষণ দেখিয়া যত-না কষ্ট হয়, উহার মুখ দেখিলে তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়।

এইরূপ বিষাদ-অবসাদে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যাকে বলে "দিব্য সুশ্রী ছেলে," অক্টেভ তাহাই ছিল। বরং আরো কিছু বেশী। কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন কালো চুল,—রেশমের মত নরম ও চিক্‌চিকে—কপালের দুই পাশে আসিয়া জমিয়াছে। টানা-টানা চোখ, মখমল-পেলব নেত্রপল্লব নীলাভ পক্ষ্মরাজি ঈষৎ বক্র; নেত্রদ্বয় কখন কখন একপ্রকার আর্দ্র জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত; বিশ্রামের সময় এবং কোন আবেগে উত্তেজিত না হইলে মনে হইত যেন উহা প্রাচ্যদেশীয় লোকের নেত্র। তার হস্ত অতি সুকুমার ও পদতল পাতলা ধনুবৎ বক্র ছিল। সে বেশ ভালো বেশ-বিন্যাস করিত;—তাহার স্বাভাবিক রূপ-লাবণ্যের যাহাতে খোল্‌তাই হয় সেইরূপ পরিচ্ছদ সে পরিত; কিন্তু "ফিট্‌বাবু" হইবার দিকে তার কোন ঝোঁক্ ছিল না।

এমন তরুণবয়স্ক, এমন সুশ্রী, এমন ধনবান,—তার সুখী হইবার সব কারণই ছিল—তবে কেন সে এমন করিয়া আপনাকে দগ্ধ করিতেছে? তুমি হয়ত বলিতে, আমোদ-প্রমোদের আতিশয্যে তাহার আমোদে অরুচি হইয়াছে কিংবা অস্বাভাবিক উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে কিছুই বিশ্বাস করে না; কিংবা নানাপ্রকার বদ্‌খেয়ালি করিয়া সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছে;—কিন্তু ইহার একটাও সত্য নহে। আমোদ-প্রমোদে সে বড় একটা যোগ দিত না, সুতরাং তাহাতে অরুচি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে নীরস প্রকৃতিও ছিল না, কল্পনাপ্রবণও ছিল না; নাস্তিকও ছিল না, লম্পটও ছিল না, উড়ন-চণ্ডীও ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত অন্য যুবকদিগেরই মতো সে পড়াশুনা ও ক্রীড়া-আমোদ লইয়াই থাকিত। কবে কেন যে তার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল, তার কারণ কেহই বলিতে পারে না—চিকিৎসা-বিজ্ঞানও এই বিষয়ে হার মানিয়াছে। ইহার কারণ কি, স্বয়ং আমাদের নায়কই বলিতে পারে।

সাধারণ ডাক্তাররা এরূপ রোগের কথা কখন শুনে নাই। কেননা, এখনও পর্য্যন্ত চিকিৎসার কালেজে আত্মার 'শবচ্ছেদ' বা

ব্যবচ্ছেদ ত কেহ করে নাই। সুতরাং আর কোন উপায় না দেখিয়া একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হইতে হইল। অনেক দিন ভারতবর্ষে বাস করিয়া, তিনি সম্প্রতি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি নাকি নানা উৎকট রোগ আশ্চর্য্যরকমে আরাম করেন।

অক্টেভ ভাবিল, অসাধারণ সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রভাবে হয়ত এই ডাক্তার তাহার মনের গোপনীয় কথাটা ধরিয়া ফেলিবে, তাই এই ডাক্তারকে ডাকিতে সে ভয় করিতেছিল; অবশেষে তাহার জননীর কাতর অনুনয়ে ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ডাক্তার বালথাজার-শেরবোনোকে সে ডাকিতে সম্মত হইল।

যখন ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন অক্টেভ একটা পালঙ্কের উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় ছিল। মাথার নীচে একটা বালিস, একটা বালিসের উপর কুনুইয়ের ভর, আর একটা বালিসে তার পা ঢাকা; সে একটা বই পড়িতেছিল কিংবা তার হাতে একটা বই ছিল মাত্র; কেননা, তার চোখের দৃষ্টি বইয়ের একটা পাতার উপর বদ্ধ থাকিলেও সে তাহা দেখিতেছিল না। তার মুখ ফ্যাঁকাসে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কোন বিশেষ অসুখের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু উপর-উপর নজর করিলে, যুবকটির কোন গুরুতর পীড়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না—কেননা গোল টেবিলের উপর ঔষধের শিশি, বড়ি, আরক, ঔষধের মাপ-গেলাস ইত্যাদি ঔষধালয়ের সরঞ্জামের বদলে এক বাক্স সিগারেট্ মাত্র রহিয়াছে। মুখে একটু ক্লান্তির ভাব থাকিলেও, নির্দ্দোষ মুখশ্রীর পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—কেবল গভীর দুর্ব্বলতা এবং চোখের হতাশ ভাব ছাড়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের আর সব লক্ষণই রহিয়াছে।

অক্টেভ আর সব বিষয়ে যতই উদাসীন হোক্ না কেন, ডাক্তারের অদ্ভুত চেহারা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ডাক্তারের রং 'রোদে-পোড়া' কপিল-বর্ণ। তাহার মাথার প্রকাণ্ড খুলিটা মুখকে যেন গ্রাস করিয়া রহিয়াছে—মাথায় চুল নাই, তাহাতে মাথাটা আরও প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়। এই নগ্ন করোটী হস্তিদন্তের মতো মসৃণ,—উহার সাদা রংটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কিন্তু উপরকার চর্ম্মাবরণ, সৌরকরস্পর্শে রোদ্রে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। করোটীর অস্থির উঁচু নীচু অংশগুলি খুব স্পষ্ট ও পরিস্ফুট। যে বিরল মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে দুই তিন গুচ্ছ কেশ এখনো রহিয়াছে। কানের উপর এক গুচ্ছ এবং ঘাড়ের উপর এক গুচ্ছ। কিন্তু সব-চেয়ে ডাক্তারের চোখ্ দুটিই বেশি দৃষ্টি আকর্ষক।

মুখমণ্ডল বয়ঃপ্রভাবে একটু তাম্রবর্ণ, সৌরকরস্পর্শে রৌদ্রদগ্ধ, এবং বিজ্ঞানানুশীলনে উহার উপর গভীর রেখাপাত হইয়াছে; কেতাবের পাতার মত তাহা পড়িয়া গিয়াছে; এই মুখের মধ্যে, চোখের দুটি নীলাভ স্বচ্ছ তারা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, তাহাতে কেমন একটা তাজাভাব তারুণ্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মনে হয় বৃদ্ধ ও পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শিক্ষা কোন যাদু-মন্ত্রে, যেন শবের মুখের উপর জীবন্ত বালকের চোখ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই ডাক্তারের পোষাক সেকেলে ডাক্তারি পোষাকের মতো। কাল কাপড়ের কোর্ত্তা ও পাজামা; কালো রংয়ের ফতুই; কামিজের উপর একখণ্ড বড় হিরা;—এই হিরক-খণ্ডটি বোধ হয় পুরস্কারস্বরূপ কোন রাজা বা নবাবের নিকট পাইয়া থাকিবেন। পরিচ্ছদ গায়ে 'ফিট্' হইয়া বসে নাই—কাপড়-ঝুলাইবার কাষ্ঠদণ্ডের উপর যেন ঝুলিতেছে। দেহের এই অসাধারণ শীর্ণতা যে শুধু ভারতের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে ঘটিয়াছে তাহা নহে। গুপ্ত বিদ্যায় দীক্ষিত হইবার উদ্দেশে বালথাজার শেরবোনো, সন্ন্যাসীদের ন্যায় দীর্ঘকালব্যাপী উপবাস করিতেন, যোগীদিগের নিকট, চারিটা প্রজ্জ্বলিত অনলশিখার মধ্যে, মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়া থাকিতেন।

কিন্তু এইরূপ মেদমাংসক্ষয়ে তাঁর শরীর দুর্ব্বল হয় নাই। তাঁর হাতের পেশীবন্ধনগুলি বেহালার তাঁতের মতো বেশ দৃঢ়বদ্ধ ও সটান ভাবে প্রসারিত।

অক্টেভের অঙ্গুলীনির্দ্দেশে ডাক্তার, পালঙ্কের একপাশে একটা নির্দ্দিষ্ট কেদারায় হাঁটু দুমড়াইয়া বসিলেন—মনে হয়, এই ভাবে মাদুরের উপর বসাই তাঁর চির-কেলে অভ্যাস। এইরূপ উপবিষ্ট হইয়া ডাক্তার শেরবোনো আলোর দিকে পিঠ ফিরাইলেন; এই আলো পূরাপূরী রোগীর মুখের উপর পড়িয়াছে: এই সংস্থানটি পরীক্ষার অনুকূল। বিশেষতঃ যে ব্যক্তির অপরকে দেখিবার কৌতূহল আছে অথচ নিজেকে দেখা দিতে চাহে না তার পক্ষে এইভাবে বসাই সুবিধা। যদিও ডাক্তারের মুখ ছায়াচ্ছন্ন ছিল এবং তাঁর সাম্‌রোথের ডিমের মতো গোলাকার চক্‌চকে মাথার খুলির উপর একটিমাত্র সূর্য্যরশ্মি পড়িয়াছিল, তথাপি অক্টেভ দেখিতে পাইল তাঁর নীল চোখের দুটি তারা হইতে যেন ফস্‌ফরস্-ময় পদার্থের মত স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতেছে।

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন; তারপর বলিলেন;—দেখুন মহাশয়, আমি দেখ্‌ছি আপনার এ রোগ আমাদের চলিত নিদান-শাস্ত্রের রোগ নয়; যে সব রোগের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে,—যা দেখে চিকিৎসকেরা রোগ আরাম করে কিংবা আরও খারাপ করে, সেই তালিকা-ভুক্ত রোগ এ নয়। আমি আপনার নিকট একটুকরা কাগজ চেয়ে তাতে সাংকেতিক ইজিবিজি অক্ষর লিখে আপনাকে দেব, আর আপনার চাকর ঝাঁ-করে পাশের দাওয়াইখানা থেকে কতকগুল মার্কামারা শিশি নিয়ে আস্‌বে —এস্থলে সে-সব চল্‌বে না।" অনাবশ্যক ঔষধপত্র হইতে রেহাই পাওয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনচ্ছলে অক্টেভ মৃদু মৃদু হাসিল।

আবার ডাক্তার বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"আপনি অত শীঘ্র খুসি হবেন না; কেন না, আপনার যে রোগ তা হৃৎপিণ্ডের অতিবৃদ্ধিও নয়, ফুস্‌ফুসের দুষ্ট স্ফোটকও নয়, পৃষ্ঠদণ্ডস্থ মজ্জার কোমলতাও নয়। হাতটা দেখি।" ডাক্তার ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিবেন মনে করিয়া অক্টেভ স্বকীয় আলখাল্লার আস্তিনটা সরাইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। হাতের কব্জিতে কিরূপ স্পন্দন হইতেছে তাহা না দেখিয়া ডাক্তার কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো অঙ্গুলীবিশিষ্ট তাঁর

থাবার মধ্যে, অক্টেভের সরু, নীলশিরা-বিশিষ্ট, আর্দ্র হস্তটি জাপটিয়া ধরিয়া উহা টপিতে লাগিলেন, দলিতে লাগিলেন, মলিতে লাগিলেন, পরীক্ষা-পাত্রের সহিত চুম্বক-আকর্ষণের যোগ স্থাপনের জন্য যেন ঐ-সব প্রক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ঔষধপত্রে বিশ্বাস না করিলেও, এই-সব প্রক্রিয়ায় অক্টেভের একপ্রকার উৎকট অনুভূতি হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন ডাক্তার এইরূপে তার আত্মাকে নিংড়াইয়া বাহির করিতেছেন, তার গণ্ডস্থল হইতে রক্ত একেবারে অন্তর্হিত হইল।

যুবকের হাত ছাড়িয়া দিয়া, ডাক্তার বলিলেন :—"আপনি ততটা মনে করচেন না, কিন্তু আসলে আপনার অবস্থা খুবই গুরুতর; বিজ্ঞান,—অন্ততঃ এখনকার প্রচলিত চিকিৎসা-শাস্ত্র এর কোনই প্রতীকার করতে পারবে না; আপনার আর বাঁচ্‌বার ইচ্ছা নাই; আপনার আত্মা অলক্ষিতে আপনার শরীর থেকে বিমুক্ত হচ্ছে। এ আপনার 'হিপকণ্ড্রিয়াণ্ড' নয়, 'লিপমেনিয়া'ও নয়, আত্মহত্যা-প্রবণতাও নয়—না, এ-সব কিছুই না। এ রকম রোগ অতি বিরল ও বড়ই কৌতুকাবহ। আমি যদি এর প্রতিবিধান না করি, তাহলে আপনি বেমালুম মারা যাবেন—অভ্যন্তরে কি বাহিরে, কোন বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাবে না। আমাকে ডাকবার এই ঠিক সময়; কেননা এখন আপনার আত্মা আপনার শরীরের মধ্যে একটি সূত্র অবলম্বন করে রয়েছে; আমরা এখন এই সূত্রে একটি দৃঢ় গ্রন্থি বেঁধে দেব।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার আনন্দে হাতে হাত ঘসিতে লাগিলেন, মৃদু হাসির মুখভঙ্গি করিতে লাগিলেন—এইরূপ চেষ্টায় তাঁর মুখের বলি-রেখাগুলা অসংখ্য ভাঁজের আবর্ত্ত রচনা করিয়া তুলিল।

অক্টেভ বলিল :—"ডাক্তার-মশায়, আমি জানিনে আপনি আমাকে সারাতে পারবেন কি না, সেরে উঠতে আমার ইচ্ছাও নাই—কিন্তু এ কথা আমি কবুল করচি যে, আপনি এক আঁচড়েই রহস্যটা ভেদ করেছেন। আমার শরীরটা যেন ঝাঁঝরি হয়ে পড়েছে; ঝাঁঝরির ছিদ্র দিয়ে যেমন জল বেরিয়ে যায়, সেইরকম আমার আমিটা আমার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—আমি যেন একটা অসীম বিরাটের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছি,—কোন্ রসাতলের গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছি তা বুঝ্‌তে পারচি নে। মূক-অভিনয়ের মত যতটা পারি দৈনিক জীবনের কাজ সবই করে যাচ্ছি, পাছে আমার পিতামাতার মনে কষ্ট হয়। কিন্তু এই জীবনটা যেন আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে—কোন্ কোন মুহূর্ত্তে মনে হয় যেন আমি মনুষ্যলোক থেকে বেরিয়ে গিয়েছি। আগেকার মতই আমি যাওয়া-আসা করচি, যে-মনের আবেগে পূর্ব্বে যাওয়া-আসা করতাম, সেই যন্ত্রবৎ আবেগটা এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু যাই করি না কেন, আমার কোন কাজেই আমি নিজে যেন যোগ দিই না। আমি সময়মতো খেতে বসি, লোকে দেখ্‌লে মনে করবে আমি সচরাচর লোকের মতোই পান-আহার করচি; কিন্তু যতই কেন মুখরোচক খাদ্য আমাকে দেওয়া হোক্ না—আমার তাতে আদপে রুচি হয় না, সূর্য্যের আলো আমার

কাছে চাঁদের আলোর মত ফ্যাঁকাসে বলে মনে হয়; আর বাতির আলোর শিখা আমার চোখে কালো দেখায়। গ্রীষ্মকালের খুব গরম দিনে আমার শীত করে, কখন কখন আমার ভিতরে যেন একটা মহা নিস্তব্ধতা আসে, মনে হয় যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা আর স্পন্দন করচে না; এবং যেন কোন অজ্ঞাত কারণে আমার শরীরের ভিতরকার যন্ত্রগুলা রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থাটা মরণ থেকে যে বিশেষ তফাৎ তা আমার মনে হয় না—যদি কিছু তফাৎ থাকে, তা সে মৃতেরাই হয়তো বল্‌তে পারে।"

ডাক্তার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—"আপনার এই রোগ সম্পূর্ণ নৈতিক, এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। চিন্তা এমন-একটা শক্তি যা প্রুসিক অ্যাসিডের মতো,—লাইড্-বোতল-নিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের মতোই মারাত্মক;—যদিও চিন্তাজনিত ক্ষতিগুলা সচরাচর বিজ্ঞান-ব্যবহৃত বিশ্লেষণের দ্বারা ধরা যায় না। আমাকে বলুন দিকি, কোন্ দুঃখের শেলে আপনার যকৃৎ বিদ্ধ হয়েছে? কোন্ গুপ্ত উচ্চাভিলাষের কোন্ উচ্চশিখর হতে আপনার এই দারুণ পতন হয়েছে? কোন্ নৈরাশ্যের তিক্ত তৃণ আপনি অবিরাম রোমন্থন করচেন? প্রভুত্বের তৃষায় আপনি কি কষ্ট পাচ্চেন? মানুষের যা সাধ্যাতীত এরূপ কোন সংকল্প আপনি কি স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করেছেন?—তবে ত্যাগের বয়স আপনার এখনো তো আসে নি। কোনও রমণী কি আপনাকে প্রবঞ্চনা করেছে?"

অক্টেভ উত্তর করিলেন :—"না, ডাক্তার সে সৌভাগ্যও আমার ঘটে নাই।"

ডাক্তার বলিলেন :—"যাই বলুন না কেন, আপনার ঐ নিষ্প্রভ চোখের মধ্যে, আপনার শরীরের নিরুৎসাহ গতিভঙ্গির মধ্যে, আপনার কণ্ঠস্বরের চাপা আওয়াজের মধ্যে,—সেক্‌স-পিয়ারের একটা নাটকের নাম এমন স্পষ্টরূপে পড়তে পারচি, যেন ঐ নামটি মরক্কো-চর্ম্মে বাঁধানো নাট্য-গ্রন্থের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।"

—"নাটকটির নাম কি? সেক্‌স্‌পিয়ারের কোন্ নাটকটি নাজানি আমি অজ্ঞাতসারে অনুবাদ করেছি?"—এইবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্টেভের কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার উত্তর করিলেন—"সেই নাটকের নাম Love's Labour's Lost"—এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত এই ইংরাজি নামটি বলিলেন যে মনে হয় যেন উনি বহুকাল ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন।

অক্টেভ বলিল :—"উহার ভাবার্থ বুঝি "নিরাশ প্রেমের যন্ত্রণা"?

ডাক্তার :—"ঠিক্ ঐ অর্থ।"

অক্টেভ আর কোন উত্তর করিল না; তার কপাল ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল—মুখের সহজভাব রক্ষা করিবার চেষ্টায় তার আলথাল্লা-লম্বমান বন্ধন-রজ্জু লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ডাক্তার আসন-পিঁড়ী হইয়া, হাতে পা ধরিয়া, প্রাচ্যদেশীয় প্রথা অনুসারে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর নীলবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি অক্টেভের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ হইল। তার পর, সগর্ব্ব অথচ মধুর দৃষ্টিতে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন :—"এসো, এইবার আমার কাছে তোমার মনোদ্বার খুলে দেও—আমি তোমার ডাক্তার, তুমি আমার চিকিৎ-

সাধীন। আর যেমন ক্যাথলিক পাদ্রি, অনুতাপী ব্যক্তিকে বলে, তেমনি আমি তোমাকে বল্‌চি—সব কথা আমার কাছে খুলে বল। কিছুই লুকিও না। তবে, আমার কাছে তোমাকে নতজানু হয়ে বস্‌তে হবে না।"

—"ওতে কি লাভ? ধরে নেওয়া যাক্, আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক্ বুঝেছেন, কিন্তু আমার কষ্টের কথা সমস্ত আপনার কাছে খুলে বল্লে আমার ত কোন সান্ত্বনা হবে না। আমার যে কষ্ট তা বাক্যের অতীত—কোনও মানব-শক্তিই—এমন-কি আপনিও তার প্রতিকার করতে পারবেন না।" আরও খানিকক্ষণ ধরিয়া গোপনীয় কথাগুলা শুনিতে হইবে মনে করিয়া ডাক্তার আপনার আসনে আরো গট্ হইয়া বসিলেন এবং উত্তরে এইমাত্র বলিলেন—"সম্ভব"।

অক্টেভ আবার বলিতে আরম্ভ করিল :—"আমি চাই না, আপনি আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ ও একগুঁয়ে মনে করেন। আমি মৌন থাকলে এই কথা বল্‌বার আপনি অবসর পাবেন যে,"সব কথা খুলে বল্লে আমি লোকটাকে বাঁচাতে পারতাম", সে অবসর আমি আপনাকে দিতে চাই নে। আপনার এই বিশ্বাস যে, আপনি আমাকে সারাতে পারবেন, আচ্ছা তাহলে আমার আত্মকাহিনী আপনাকে বল্‌চি, শুনুন। আপনি যখন মোদ্দা কথাটা ঠিক্ অনুমান করেছেন, তখন খুঁটিনাটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আর ঝগড়া করব না। আমার এই বিবরণে কোন অদ্ভুত ব্যাপার কিংবা রোম্যাণ্টিক ব্যাপার প্রত্যাশা করবেন না। আমার জীবনের যে ঘটনা তা খুব সাদাসিধা, খুব সাধারণ, খুব সচরাচর। কিন্তু, কবি হেন্‌রি-হৈনে-র একটা গানে আছে যে,

যার তা' ঘটে, তার কাছে তা নিতুই নূতন,
সেই আঘাতে চুর হয় তার হৃদি, তনু, মন।

আসল কথা, যে ব্যক্তি গল্পের দেশে, কল্পনার দেশে এতদিন কাটিয়েছেন তাঁর কাছে একটা নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের কাহিনী বল্‌তে আমার লজ্জা বোধ হয়।

ডাক্তার একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—"ওহে, যা খুব সাধারণ তাই আমার কাছে অসাধারণ"—

—"সত্যি ডাক্তার,আমি প্রেমের যন্ত্রণাতেই মারা যাচ্চি।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চয়ন

স্বপ্ন-তথ্য

স্বপ্ন অনেক বিচিত্র ইঙ্গিত দেয়। যাঁহারা বলেন, স্বপ্নের জন্ম বদহজমে, তাঁহারা যে বিল্‌কুল্ ভুল করেন, একালের বৈজ্ঞানিকরা তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

যখন আমরা অসাড় ঘুমে বিভোর থাকি, তখন স্বপন দেখি না। স্বপ্নের জন্ম হয় মানুষের অর্দ্ধজাগরণের সময়ে বা জাগ্রৎ-সুষুপ্তিতে। কারণ দেহে তখন ঘুমের লক্ষণ

থাকিলেও আমাদের মন থাকে গোপনে জাগিয়া।

অবশ্য দেহের কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বা অনুভূতির সময়ে মানুষের স্বপ্নও এক-একটা বিশেষ আকার লাভ করে। যেমন, কোন ঘুমন্ত লোকের মুখের উপরে জল ছিটাইয়া দিলে সে স্বপ্ন দেখিবে, যেন চারিদিকে বৃষ্টি পড়িতেছে!

এ-রকম স্বপ্নের কারণ একরকম বোঝা যায়, কিন্তু অন্যান্য অনেক স্বপ্নের এমন কোন স্পষ্ট হদিস পাওয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, একমাত্র স্মৃতিই স্বপ্নের সমস্ত ছবি আঁকে। জাগ্রৎ অবস্থায় যে-সব দৃশ্য বা কথা বা ভাব আমরা মস্তিষ্কের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখি, ঘুমের সময়ে সেইগুলিই স্বপ্নের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারে। তখন আমরা তাহাদের অনুভব করি, কিন্তু তাহাদের প্রকাশে বাধা দিতে পারি না।

সাধারণত পুরুষের চেয়ে রমণীর নিদ্রা হয় বেশী-লঘু। (যদিও অনেক শিশুসন্তানের পিতা এ সত্য স্বীকার করিবেন না!) সেই-জন্য পুরুষের চেয়ে রমণী স্বপ্নও দেখে বেশী এবং জাগিয়া স্বপ্নকে অখণ্ডভাবে মনে রাখিবার ক্ষমতাও তাহার অধিক।

চারমাসের শিশুও যে স্বপ্ন দেখে সে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহাদের কুকুর আছে তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, কুকুরও স্বপ্ন দেখে। আদিমকালে অসভ্য মানুষের যে-সব ভয়-ভাবনা ছিল, আজ এতকাল পরেও এবং সভ্য হইয়াও আমরা তাহাদের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। অসভ্য অবস্থার ভয়-ভাবনা এখনো মাঝে মাঝে আমাদের স্বপ্ন-চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে!

কুস্বপ্ন উপভোগ্য নয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞানমতে সুস্বপ্ন নাকি মানুষের স্বাস্থ্যে পক্ষে উপকারী।

একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেন, স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের চরিত্রের সূচিপত্র। তাহারা অনেক সময়ে আমাদের মনের দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। রাতের স্বপন লইয়া আপনি যদি দিনের বেলার নাড়াচাড়া করেন, তবে নিজের চরিত্রের অনেক নূতন রহস্য জানিতে পারিবেন।

স্বপ্ন অনেক সময়ে গুপ্ত ব্যাধিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। "Sleeping for Health" নামক পুস্তকের লেখক মিঃ বাওয়ার্স বলেন, "মিঃ ব্রুস নামে এক ব্যক্তি ছয়মাসের মধ্যে প্রায় কুড়িবার স্বপ্নে দেখেন, যেন একটা বিড়াল ক্রমাগত থাবা মারিয়া তাঁহার গলা আঁচড়াইয়া দিতেছে! শেষটা জানা গেল, তাঁহার গলার ভিতরে ঘা হইয়াছে। ডাক্তারের চিকিৎসায় আরোগ্য-লাভের পর মিঃ ব্রুস আর-কখনো সেই উদ্ভট স্বপ্নটা দেখেন নাই। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, মিঃ ব্রুসের অর্দ্ধ-জাগ্রৎ মন এই লুকানো অসুখটা টের পাইয়া, স্বপ্নে তাহার ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সুধু এই ব্যাপারটি বলিয়া নয়,—যক্ষা, ক্যানসার, হৃদ্‌পীড়া ও পেটের ভিতরের ক্ষত প্রভৃতি অনেক অসুখ, যেগুলো প্রথমে আস্তে আস্তে গোপনে বাড়িয়া ওঠে, স্বপ্ন যে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম ইঙ্গিত দিয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

এইজন্য মিঃ বাওয়ার্স মত প্রকাশ করিয়াছেন, স্বপ্নে বারংবার কোন বিশেষ রোগের ইঙ্গিত পাইলেই মানুষের ডাক্তারের বাড়ীতে যাওয়া উচিত।

যমক-রহস্য

আপনারা সকলেই কখনো না কখনো যমজ লোক নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। যমজ সন্তানদের চেহারা প্রায়ই দেখিতে একরকম হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, সেখানে তাহাদের চেহারা এতটা পরস্পর-বিরোধী হইয়া পড়ে যে, এক পিতার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে যে পারিবারিক সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক, তাহারও আভাস পর্য্যন্ত থাকে না। সুধু মুখে নয়, তাহাদের দেহেও এই বৈসাদৃশ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন-কি তাহাদের মতি-গতি রুচি-অরুচি সমস্তই আলাদা-রকম হয়। এ ক্ষেত্রে যমকদের মধ্যে যদি একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে হয়, তবে ছেলেটি হইবে ঢেঙা, সদা-সতর্ক, উৎসাহী এবং অল্পেই ক্রুদ্ধ; আর মেয়েটি হইবে মাথায় খাটো, মোটাসোটা, কুঁড়ে এবং দিল-দরিয়া। তাহারা দুজনে একরকম খাবার পর্য্যন্ত খাইতে রাজি হইবে না।

সম্প্রতি একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, সাধারণত যমজ সন্তান দেখিতে দুইজন হইলেও, আসলে তাহারা অভেদ-আত্মা। তাহাদের দুইটি দেহে একই প্রাণের ধারা বহিয়া যায়। যেখানে তাহাদের আকৃতি অভিন্ন, সেখানে তাহাদের প্রকৃতিও এক-রকম। তখন তাহারা একই প্রকৃতির দুই-দেহ-ধারী মূর্ত্তি। যেখানে তাহাদের আকৃতি ভিন্ন, সেখানেও তাহারা একই প্রকৃতির দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সীমাকে প্রকাশ করে মাত্র।

যমকদের যে পীড়া "sympathetic sickness" নামে বিখ্যাত, তাহার আলোচনা করিলে উক্ত বৈজ্ঞানিকের কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। যমকদের মধ্যে যে আশ্চর্য্য এক সহানুভূতির যোগ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, তাহাদের একটির রোগ হইলে প্রায়ই অন্যটিও সেই রোগে মারা পড়ে,—এমন-কি রোগ যেখানে সংক্রামক নয় সেখানেও!

লণ্ডনে একবার দুইটি যমজ ছেলের মধ্যে একটি দুষ্পাচ্য পিঠা খাইয়া পেটের অসুখে পড়ে। অল্পক্ষণ পরেই অন্য ছেলেটিও পিঠা না-খাইয়াও ঠিক সেই অসুখের দ্বারাই আক্রান্ত হয়।

প্রসিদ্ধ ফরাসী ডাক্তার Trousseau বলেন, "আমার কাছে একবার একটি অদ্ভুত রোগী আসিয়াছিল। সে চোখের বাতে ভুগিতেছিল। সে আমাকে বলিল, "আমার এক যমজ ভাই আছে, সে এখন ভিয়েনায়। আমার যখন অসুখ হয়েচে তখন তাকেও শীঘ্রই এই অসুখে ধরবে!" আমি তাহার এই অদ্ভুত ধারণাকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম বটে, কিন্তু দিন-কতক পরেই ভিয়েনা হইতে রোগীর ভ্রাতার পত্র আসিল, "আমার চোখে বাত হয়েচে। আশা করি তুমিও ঐ রোগে ভুগচ।"

এটাও প্রায় দেখা যায়, যমজদের একজন মারা পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে আর-একজনও মারা পড়ে। অনেকসময়ে একটি যদি রোগে মারা যায় এবং দ্বিতীয়টিকেও যদি সেই রোগে না ধরে, তাহা হইলেও সে বাঁচে না—হঠাৎ বুকের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়া সেও মৃত্যুমুখে পড়ে।

সুতরাং যমজরা যে পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই একটা আশ্চর্য্য মানসিক বার্ত্তার আদান প্রদান করিতে পারে, তাহা একরকম প্রমাণিত সত্য বলিয়া স্বীকার করা চলে।

পৃথিবীতে যমজ সন্তান হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন যদি যমকের ভাই বা বোন বা সন্তান হয়, তবে তাহাদেরও যমজ সন্তান হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

ভবিষ্যতের সপ্তম আশ্চর্য্য

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের নাম আপনাদের নিশ্চয়ই মুখস্থ আছে। কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে যে ব্যাপারগুলি সপ্তম আশ্চর্য্যের কোঠায় পড়িবে, এখনকার বিখ্যাত সপ্তম আশ্চর্য্যের মহিমা তাহাদের কাছে বোধহয় পরিম্লান হইয়া যাইবে।

প্রথমত, পরমাণুকে মানুষের কাজে লাগানো। বৈজ্ঞানিকদের মতে শীঘ্রই ইহা সম্ভব হইবে। পরমাণুর মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি সংগৃহীত আছে, তাহার সাম্‌নে পৃথিবীর অন্যান্য জ্ঞাত শক্তির সমস্তই তুচ্ছ! এই মহা শক্তিকে ব্যবহারে আনা বড় যে-সে কথা নয়।

লণ্ডন কলিসিয়ামে কাপ্তেন রবার্ট্‌স্ সংপ্রতি দেখাইয়াছেন, কিরূপে আলোক ও ধ্বনির কম্পনকে কাজে খাটানো যায়! এই নব উদ্ভাবনার ফলে ইংরেজরা আলোক ও ধ্বনিকে ইচ্ছামত দিকে নিক্ষেপ করিয়া, যুদ্ধের সময়ে বিপক্ষদের অনেক ডুবো-জাহাজ গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি শীঘ্রই আরো উন্নত হইবে, তখন ইহাকে দ্বিতীয় আশ্চর্য্যের কোঠায় ফেলা চলিবে। কারণ তখন ইহার সাহায্যে লণ্ডনে বসিয়া একটি কল টিপিয়া, কন্‌স্তান্তিনোপলের রণ-ক্ষেত্রে অবস্থিত কামান-শ্রেণী ছোঁড়া বা ভূমধ্যস্থ বিস্ফোরক পদার্থে অগ্নিসংযোগ করা কিছুমাত্র কঠিন কার্য্য হইবে না।

তৃতীয় আশ্চর্য্য হইবে, আমেরিকার "উড়ন্ত টর্পেডো"। মনে করুন, একখানি একরত্তি উড়ো-জাহাজ তৈরি করিয়া, কল টিপিয়া সেখানা উড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে চালক বা কোন মানুষ রহিল না। শূন্যপথে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবামাত্র আপনি তাহার পাখ্‌না খসিয়া গেল এবং সে একটি বোমায় পরিণত হইয়া শত্রুর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সম্প্রতি যে "উড়ন্ত টর্পেডো" লইয়া

পরীক্ষা চলিতেছে, তাহা তিনহাজার ফুট উঁচুতে উঠিতে এবং চারশো মাইল দূরে যাইতে পারে। তাহার গতি ঘণ্টায় দুশো মাইল পর্য্যন্ত।

চতুর্থ আশ্চর্য্য কি? আলোক-চিত্র-যুক্ত টেলিফোন। তাহার সাহায্যে আপনি যে লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করিবেন, তাহাকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।

পঞ্চম আশ্চর্য্য হইবে, রেডিয়াম। এখনো ইহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই, এ-অবস্থায় ইহার সম্বন্ধে এখনি জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

ষষ্ঠ আশ্চর্য্য, ঝুলন্ত বাগান নয়,—ঝুলন্ত সহর! এখনি তাহার আকার লইয়া অনেক কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। যে দেশে মাটিতে স্থানাভাব, সেখানে শূন্যে সহর বসিবে।

কিন্তু সপ্তম আশ্চর্য্যের কোঠায় কাহার নাম করিব? ঢেউকে শাসন করা বা ধ্বনির আলোক-চিত্র তোলা বা কল টিপিয়া ঘর-বাড়ীকে স্বেচ্ছামত এখানে-ওখানে লইয়া যাওয়া বা জীবন্ত মানুষের কাজে যন্ত্র-মানবকে লাগাইয়া দেওয়া?—এ সব ব্যাপার য়ুরোপে আমেরিকায় ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব!

আসল কথা, ভবিষ্যতে সপ্তম আশ্চর্য্যও কুলাইবে না।

"হাতকড়ির রাজা"

আমেরিকায় রেলপথে যে ধনী হয়, সে উপাধি পায় "রেলপথের রাজা", যে লোহার ব্যবসায়ে টাকা করে তার নাম হয় "লোহা-রাজা", তুলার ব্যবসায়ে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেয় তার উপাধি হয় "তুলা-রাজা"! আমেরিকা সাধারণ-তন্ত্রের দেশ, সরকারি উপাধির বালাই সে দেশে নাই। তবু কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা এতটা প্রবল যে, মনের ভিতর হইতে সে উপাধি-প্রীতির শিকড় কিছুতেই উপড়াইয়া ফেলিতে পারে না।

হাতকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে মিঃ হ্যারি হুউডিনি আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া, আমেরিকায় তিনি উপাধি পাইয়াছেন "হাতকড়ির রাজা।"

আজ-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত রকমের এবং যত শক্ত হাতকড়ি তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার কোনটাই হুউডিনিকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তিনি অনায়াসেই তাহা খুলিয়া ফেলেন।

সুধু হাতকড়ি নয়, হুউডিনির আরো অনেক ক্ষমতা আছে। সরকারি কারাগারের মধ্যে তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া, হাতে হাত কড়ি ও গায়ে strait-jacket (এর নাগপাশে বাঁধা পড়িলে কয়েদীর আর নড়িবার শক্তি থাকে না) পরাইয়া রাখিয়া, কয়েদখানার দরজায় বাহির হইতে তিন-তিনটা চাবি লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে সামান্য কোন যন্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। হুউডিনি কিন্তু সেই অবস্থাতেও অন্যের সাহায্য না লইয়া নিজেই নিজের হাতকড়ি, strait-jacket

এবং আশ্চর্য্য কৌশলে ভিতর হইতে সেই তিন চাবি লাগানো দরজা খুলিয়া, বাহিরের হতভম্ব পুলিস-কর্ম্মচারীদের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন!

হুউডিনিকে আপনি যদি প্রকাণ্ড একটি জলপূর্ণ জলাধারের মধ্যে মাথা-নীচু ও পা-উঁচু করিয়া পুরিয়া, তাঁহার দুইপায়ে তালা-চাবি-লাগানো শিকল পরাইয়া, সেই শিকলটা আবার ডালার সঙ্গে বাঁধিয়া, জলাধারের ডালা বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলেও তিনি আপনার চোখে ধূলা দিয়া সকলের অগোচরে বাহির হইয়া আসিতে পারেন। জলাধারে সত্যই যদি কোন গুপ্তদ্বার থাকিত, তবে সেটা খুলিয়া বাহির হইবার সময়ে জলাধারের জলও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু হুউডিনি বাহির হইবার পর দেখা যায়, জলাধারের জল একটুও কমে নাই!

হুউডিনি যে কিরূপে এই-সব অসাধ্য সাধন করেন, আজ-পর্য্যন্ত কেউ তার কোন হদিস পান নাই। আসল গুপ্তকাথাটা খুলিয়া না বলিলেও, এ কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, শরীরের নানা স্থানের গাঁইট সন্ধিচ্যুত ও দেহের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করিয়া এবং দৈহিক শক্তি ও কৌশলের দ্বারা তিনি এ-সব কঠিন কাজ সহজ করিয়া ফেলেন। মাংসপেশী ফুলাইয়া ও সঙ্কুচিত করিয়া তিনি নিজের দেহকে এত-বেশী বড় ও এত-বেশী ছোট করিতে পারেন যে, তাহা এক-রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। চাবি-লাগানো দরজা বা হাতকড়ি তিনি হাতের কায়দায় খুলিতে পারেন। তিনি আরো অনেক অপূর্ব্ব সাহস ও শক্তির কার্য্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিপুল শূন্যে উঠিয়া একখানি উড়ো জাহাজ হইতে অন্য একখানি উড়ো জাহাজে লাফাইয়া পড়াটাই প্রধান। বলা বাহুল্য লাফাইবার সময়ে দুইখানি উড়োজাহাজই বেগে উড়িতে থাকে! ভাগ্যে হুউডিনি অসাধু নন! তিনি চোর বা ডাকাত হইলে কোন পুলিস বা কয়েদখানাই তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে পারিত না।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

লেখাপড়া জানা কুকুর

ম্যান্‌হিমের উকিল ডাক্তার মোকেলের স্ত্রী একদিন রাস্তায় একটা কুকুরছানা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেটাকে তিনি বাড়ী নিয়ে এসে খুব যত্ন ক'রে পুষতে লাগলেন। তার নাম রাখলেন "রল্‌ফ্‌"। অল্পদিনের ভিতরই তিনি দেখ্‌লেন যে, রল্‌ফ্‌ মানুষের কথাবার্ত্তা বেশ বুঝ্‌তে পারে। তার যে নাম রাখা হয়েছে—"রল্‌ফ্‌," এটা সে দুদিনেই টের পেয়েছিল। ডাকলেই কাছে ছুটে আসতো। চেঁচামেচি করলে যদি বকা হ'ত, অম্‌নি সে চুপ করতো। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললে সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে যেতো। তাছাড়া শুতে বসতে দাঁড়াতে বললে, টেবিল-চেয়ারের উপর থেকে নেমে যেতে বললে,

কোন-একটা জিনিস নিয়ে আসতে বললে, সার্কাসের অনেক শেখানো কুকুরের মতো সে তখনি তাই করতো। অথচ তাকে একদিনের জন্যেও এ-সব শেখাতে হয় নি! ডাক্তার মোকেলের স্ত্রী কুকুরটার এই আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

একদিন তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন। রল্‌ফ্‌ কাছে বসে আছে। একশ'-বাইশে দুই যোগ করলে কত হয়, এ আর কিছুতেই একটি ছেলে বলতে পারছিল না। তিনি বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "এই সামান্য আঁকটাও কষে দিতে পারছ না? এ তো সব ছেলেই জানে, এমন-কি আমার বোধ হয় রল্‌ফ্‌ও তোমায় বলে দিতে পারে! কি বল রল্‌ফ্‌? এটা তো তুমিও জানো?—" রল্‌ফ্‌ এ কথার উত্তরে এমনভাবে ঘাড় নেড়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো যে, তিনি অনায়াসে বুঝতে পারলেন, রল্‌ফ্‌ বল্‌ছে সে জানে! তিনি আশ্চর্য্য হ'য়ে রল্‌ফ্‌কে বললেন, "আচ্ছা বলতো, দুই আর দু'য়ে কত হয়?" রল্‌ফ্‌ অমনি তার সামনের পায়ের একটি থাবা দিয়ে বার বার তাঁর হাতটা চাপড়ে দেখিয়ে দিলে যে, দুই আর দু'য়ে চার হয়! মোকেলের স্ত্রী তো একেবারে অবাক! এটা সত্যিই সে হিসেব করে বলেছে, না হঠাৎ আন্দাজে লেগে গেছে, সেটা ভাল করে জানবার জন্যে তিনি রল্‌ফ্‌কে আরও অনেক রকম পরীক্ষা করে দেখলেন যে,—না, ব্যাপারটা নেহাৎ মিছে নয়। রল্‌ফ্‌ সত্যিই গুন্‌তে জানে আর আঁকও কষ্‌তে পারে। ১,২,৩,৪ ইত্যাদি সংখ্যা সে বেশ পড়তে পারে! বর্ণ-পরিচয় তার নেই বটে, কিন্তু অঙ্ক-পরিচয় আশ্চর্য্য রকম।

তিনি কুকুরের এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। মা যেমন ক'রে তাঁর হাবা ছেলেটিকে কথা শেখাবার জন্যে দিনরাত প্রাণপণে যত্ন করেন, ডাক্তার মোকেলের স্ত্রীও রল্‌ফ্‌কে নিয়ে তেম্‌নি চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর অসীম অধ্যবসায় ও ক্রমাগত চেষ্টার ফলে রল্‌ফ্‌ একটু একটু ক'রে ক্রমে বেশ লিখ্‌তে-পড়তে শিখলে। শক্ত শক্ত আঁক সে রীতিমত অঙ্ক-শাস্ত্রের পদ্ধতি-অনুসারে নির্ভুল করে ক'ষ্‌তে পারতো। যে-কোন লেখা সে জলের মতো পড়তে পারতো। যে-রকম ছবিই হোক্‌না কেন, রল্‌ফ্‌কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই সে বলে দিতে পারতো,—সেটা কিসের ছবি?—টাকা-পয়সাও সে বেশ চিনেছিল। কোনটা 'সিকি', কোনটা দুয়ানি, আর কোনটাই বা 'আধুলি'—এ-সব অনায়াসে সে বলে দিতে পারতো!

রল্‌ফের কথার ভাষা যে মানুষের বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে মেলেনা এটা বোধ হয় বলে রাখাই বাহুল্য। রল্‌ফ্‌ কথা কইতো তার সেই সাম্‌নের পায়ের একটি থাবা দিয়ে চাপড় মেরে। মোকেল-পত্নী প্রথমে তাকে কতকগুলি খুব দরকারি শব্দ, প্রত্যেক বার তার থাবার চাপড়ের সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তাকে শেখাতে লাগলেন, যেমন:—সাম্‌নের পায়ের থাবা দিয়ে দুবার চাপড়ালে "হাঁ" বোঝাবে, তিনবার চাপড়ালে "না" বোঝাবে, পাঁচবার চাপড়ালে "বাইরে যাবো" বোঝাবে ইত্যাদি। ক্রমে তিনি এই উপায়ে তার অক্ষর-পরিচয়ও করিয়ে দিলেন। প্রত্যেক হরফের এক-একটা নম্বর ঠিক ক'রে তিনি তাকে A. B. C. D প্রভৃতি সমস্ত বর্ণগুলি শিখিয়ে দিলেন;—যেমন "A" হ'ল ৪ B হ'ল ৭ ইত্যাদি। রল্‌ফের স্মরণ-শক্তিও খুব অসাধারণ ছিল, একবার যা শিখ্‌তো তা আর কখনো ভুলতোনা। শিখতেও পারতো সে খুব শীগ্‌গির। তাকে যখন A, B, C, D. শেখানো আরম্ভ হ'ল, তখন সে রোজ পাঁচটা ক'রে হরফ্‌ শিখে ফেল্‌তে লাগল।

বর্ণ-পরিচয়ের পর রল্‌ফ্‌কে বানান শেখানো হ'ল। এই বানান শেখবার সময় দেখা গেল যে, রল্‌ফ মানুষের মতো ব্যাকরণ-শুদ্ধ বানানের মোটেই পক্ষপাতী নয়। সে নিজের ইচ্ছে-মতো অনেক কথার বানান খুব সোজা ক'রে নিলে। মোকেল-পত্নী তার এই চালাকি দেখে বেশ খুসি হ'য়ে রল্‌ফকে বললেন "I see, you are too wise!" রল্‌ফ্‌ অমনি সেই কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, "I C U R Y Y"। সেখানে একটী ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার নাম Karla, রল্‌ফ্‌কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল এই মেয়েটির নাম কি বানান ক'রে বল—রল্‌ফ্‌ তখনি বানান ক'রে বললে, K. R. L. A!

তারপর রল্‌ফ কাপড়-চোপড়ের নাম শিখলে,—কোন্‌টা মোজা, কোন্‌টা গেঞ্জি, কোন্‌টা রুমাল, কোন্‌টা দস্তানা, তা সে দেখেই ব'লে দিতে পারতো। ক্রমে সে রং চিন্‌তে শিখলে,—কোন্‌টা লাল, কোন্‌টা নীল, কোন্‌টা সবুজ, কোন্‌টা হল্‌দে, কোন্‌টা কালো, তাও সে বেশ অনায়াসে বুঝতে পারতো! তারপর তার আকৃতি জ্ঞান হ'ল। চৌকোণা, গোল, বাদামি, তিনকোণা, লম্বা, বেঁটে, মোটা, সরু,—এ-সমস্ত তফাৎও সে চমৎকার আয়ত্ত ক'রে ফেললে। তারপর ক্রমে জীব-জন্তু, গাছপালা, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, আকাশ চাঁদ, সূর্য্যি, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, রেল, ষ্টীমার, বাইসিকেল্‌, ঘুড়ী, লাঠিম, ছাতি, ছড়ি, চা, চুরুট, চিনি, রুটি, বিস্কুট, আর মাংস প্রভৃতি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কোন জিনিষই তার জান্‌তে বাকি রইল না। দেশ-বিদেশ থেকে লোকে কুকুরটার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখ্‌তে আসতো। একটা পশুর ভেতর এতটা শক্তি দেখে তারা অবাক হ'য়ে যেতো!

রল্‌ফ্‌ খুব রসিক ছিল। ভারি চমৎকার চিঠি লিখতে পারতো। তার দু' একখানা চিঠির নমুনা দিয়ে আমরা রল্‌ফের কথা শেষ কর্ব্ব। জেনোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনস্তত্ত্ব-বিশারদ ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী, রল্‌ফ্‌কে দেখতে এসে দিনকতক মোকেলের বাড়ীতে ছিলেন। রল্‌ফের সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ হয়েছিল। ম্যাকেঞ্জী চলে যাবার পর রল্‌ফ তার মনিবের বড় মেয়েকে ধ'রে ম্যাকেঞ্জীকে এই চিঠিখানা লিখিয়াছিল

"প্রিয় ডাক্তার ম্যাকেঞ্জী, শীগ্‌গির এসো, আর চলে যেয়োনা। ছবি এনো। তোমারই স্নেহের রল্‌ফ্‌।"

একবার পাড়ার একটি ছোট মেয়ে, কিছুতেই একটী আঁক কস্‌তে না পেরে, রল্‌ফের সাহায্য চেয়ে তাকে আসবার জন্যে একখানা চিঠি দিয়েছিল, রল্‌ফ্‌ তার উত্তরে

লিখলে—"চিঠি পেলুম, ভালবাসা জানবে। আঁক কসে দিতে। চুমু নাও। ইতি রল্‌ফ্‌ এখনি যাবে তোমার কাছে,—তোমার রল্‌ফ্‌।"

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

কাব্য ও বিজ্ঞান

কবিতা বিজ্ঞানবিশেষ। অর্থাৎ কবিতা একটি উঁচুদরের বিদ্যা, জীবনব্যাপী সাধনার সামগ্রী;—তুচ্ছ ব্যাপার নয়। হেসে খেলে কাব্যরচনা হবার নয়। কবিতার সঙ্গে তরুণ বয়স এবং ঐ বয়সের ভাবাবেগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—এইটে প্রচলিত ধারণা। কাব্যচিন্তাপ্রসঙ্গে, একাগ্র সাধনা এবং অব্যাহত কঠোর পরিশ্রমের কল্পনা, কারো মনে বড় একটা ওঠে না। কবিতাকে ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালমাত্র বলে' উড়িয়ে না দিলে দেখবেন, যে-শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তায় বৈজ্ঞানিক গড়ে' ওঠে, কবিরও সেই শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। তাদের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মানুরাগের মধ্যেও সমতা দেখতে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং ক্রমপরিণতি বৈজ্ঞানিকের জানা যেমন প্রয়োজন তেমনি কবিরও পূর্ব্বগামীদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক। মনের মধ্যে ভাবাবেগ যখন প্রবল ও অশান্ত হয়ে ওঠে, যখন তা প্রকাশের জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করতে থাকে, তখনি কবির লেখনী থেকে কবিতার জন্ম হয়। কবি যখন প্রথম রচনা করেন তখন কাব্যরচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান থাকে না, তাঁর মনও বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সংহত স্বাস্থ্য ও সংস্কারমুক্ত নয়। ঝড়ের মত সহসা যে ভাবাবেগ কবিতার আকারে জন্ম নিয়ে তার প্রভাব তিনি বাস্তব জীবনে কখনো অনুভব করতে পারেন বা তার বিপরীত ঘটতে পারে। কিন্তু তাঁর মনে সবচেয়ে কঠিন আঘাত লাগে তখন, যখন তিনি দেখেন যে-ভাব তাঁর মনে হয়েছিল, তা একেবারে নতুন আন্‌কোরা অভূতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য তার একেবারেই কোনো মূল্য নেই, কারণ তা আর কেউ ইতিপূর্ব্বে আরো নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। গোড়ায় তিনি নিজের রচনাটি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে ছিলেন, আর কারো রচনার মাপকাঠিতে যাচাই করে' ছাখেন নি। ক্রমশ তিনি আবিষ্কার করেন, তাঁর কবিতা যে-কথা তাঁকে বলে, অন্যের নিকট তা নাও বলতে পারে। তিনি বুঝতে পারেন, যে-সম্পদ ও বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হলে রচনা 'কবিতা' আখ্যা লাভ করে, সেইখানেই তাঁর রচনার পূর্ব্বগামীদের রচনার অনুরূপ হওয়া চাই, আর পৃথক হওয়া চাই সেই-সব বিষয়ে যা পরিবর্ত্তনশীল। তাই কবির হাত যত পাকে ততই তাঁর রচনা উত্তরোত্তর কতক বিষয়ে পূর্ব্বগামীদের অনুরূপ এবং কতক বিষয়ে পৃথক হতে থাকে। এক কথায়

তিনি তাঁদের সম্বন্ধে স-চেতন হয়ে ওঠেন। এবং পূর্ব্বগামীদের রচনার সঙ্গে পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হয় ততই তিনি দেখতে পান, আর্টেও, বিজ্ঞানেরই মত, প্রত্যেক যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কর্ম্মধারাকে সম্প্রসারণ ও পরিপূরণ করে' চলেছে। পূর্ব্বগামীরা যদি তাঁদের কর্ম্ম না করতেন তাহলে অনুবর্ত্তীদের কর্ম্মও অসম্ভব হোত।

জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ

জনসাধারণের জন্যে কোনো বিদ্যাপীঠ যে সমস্ত বিশেষ বক্তৃতার (extension lectures) আয়োজন করেন, সেই সব বক্তৃতার সঙ্গে শ্রোতার যে-সম্বন্ধ, জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। জীবন বলতে এই দ্বীপপুঞ্জের (Great Britaioin) জীবন চার-কোটি শ্রমজর্জ্জর মানুষ বোঝায় তাদের বিচার করতে বলা হয় 'কাব্যের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি?' তাহলে না জানি কত অদ্ভুত গোলমেলে উত্তরই শোনা যাবে। একটা যুগে ভালো কবি হয়ায় বড়-জোর আধ ডজন; আর, এরা যে ভালো কবি সে তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম ত্রিশ জনমাত্র রসিক জন্মায়; আর জন্মায় শতেক-খানেক লোক যারা এই কবিমণ্ডলীর খবর পায় আর-কেউ চোখে আঙুল দিয়ে ছাখাবার পর; এ ছাড়া জন্মায় হাজার খানেক লোক, যারা বাহবা ছায় পরের মতের উপর আশ্চর্য্য শ্রদ্ধাবশত; অবশিষ্ট যারা থাকে তারা যা শোনে তা-ই বিশ্বাস করে—অর্থাৎ এরাই তারা, কাকে কাণ নিয়ে গেছে শুনে যারা কাকের পিছু ধায়, কাণে হাত দিয়ে ছাখা প্রয়োজন মনে করে না। তবুও আজকাল কবির কাছে অহরহ নালিশ আসে—কেন তাঁর কবিতা দেশের আপামর সাধারণের মর্ম্ম স্পর্শ করে না? কেন তিনি তাঁর পাঠকের কাছে সূক্ষ্ম ভাবুকতা এবং মার্জ্জিত রসবোধ দাবী করেন? হায় কবি!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারোয়ারি উপন্যাস

৬

কমলার স্বামী সতীশচন্দ্র কলকাতার এক সওদাগরী আপিসের কেরাণী। অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, আয়ও অল্প, এইজন্যে সচারি বিয়ে করতে বরাবরই একটু নারাজ ছিল। কিন্তু সতীশের মা দুর্গামণি জিদ্‌ ধরে বসলেন যে বিয়ে তাকে করতেই হবে। ছেলে বিয়ে করবে না, এ আবার কি কথা! সবার ছেলেই যখন বিয়ে করছে, তখন সতীশই বা না করবে কেন? কৈ, তার

পিতৃকুলে কিম্বা মাতুল-গোষ্ঠীতে আজ পর্য্যন্ত কেউ ত কখনো অবিবাহিত থাকেনি! যার বাপ-দাদারা চিরকাল বিনা-আপত্তিতে বিয়ে করে এসেছে, এমন কি যাদের অনেকে একাধিক পরিণয়েও পশ্চাৎপদ হয় নি, তাদের বংশধর হয়ে সতীশের এমন দুর্ব্বুদ্ধি হল কেন? সতীশ যদি বিয়ে না করে, তাহলে দুর্গামণির দেহান্তের পর শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যে জ্বালবে কে? জগদীশপুরের এত দিনের প্রাচীন রায়-বংশটা কি সে লোপ করে দিয়ে কুলাঙ্গার হতে চায়?

সতীশ হেসে বল্‌তো,—দেখ মা, অত-বড় কুরু-পাণ্ডবের বংশ, তাও আজ লোপ পেয়ে গেছে! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেও যদুবংশ রক্ষে করতে পারেন নি! সুতরাং রায়-বংশ যদিই লোপ পেয়ে যায়, তাহলে এমন বেশী কি হবে?

দুর্গামণি ধমক দিয়ে বলতেন,—থাম্ বাপু, তোর ও-সব জ্যাঠামি আমি শুনতে চাইনি। আমি তোর বিয়ে দেবই। তুই বড় বেহায়া, তাই নিজের বিয়ের কথায় কথা কইতে এসেছিস্! আজ যদি কর্ত্তা বেঁচে থাকতেন, তাহলে কি তুই তাঁর মুখের ওপর এ-সব কথা কিছু বলতে পারতিস্?

সতীশ ঘাড় হেঁট করে বলতো,—না মা, তা বোধ হয় পারতুম না, কিন্তু পারা উচিত। যে বিয়ে করবে, সকল দায়িত্ব তারই যে। সে দায় সে নিজে বুঝে না নিলে চল্‌বে কেন?

দুর্গামণি বলতেন,—তোর যেমন কথা! বিয়ে করতে আবার দায় কিসের! তুই থাম্! বিয়ে করে বুঝি আবার কেউ অসুখী হয়! দেখিস্ দিকি তোর আমি এমন বৌ করবো যে অনেক রাজা-রাজড়ার ঘরেও তেমনটি মেলেনা!

—তোমার এ মূর্খ গরীব ছেলেকে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যে কেউ দেবে না, মা! এই বলে সতীশ হাস্‌তে হাস্‌তে ন'টার ট্রেন ধরবার জন্যে ষ্টেশনের দিকে ছুট্ দিত, নাহলে দশটার সময় আপিসে হাজরে দিতে পারবে না।

এমনি করে ছেলের সঙ্গে অনেকদিন ধরে অনেক তর্কবিতর্ক করে দুর্গামণি যেদিন পাশের গাঁয়ের মৈত্র-মহাশয়ের মেয়ে কমলার সঙ্গে সতীশের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে ফেললেন, সতীশ তখন আর সে বিবাহে অমত করতে পারলে না! যোগেন মিত্রের কাছারী-বাড়ীতে খাজনা জমা দিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে সতীশ একদিন জমীদার-বাবুদের বাঁধানো ঘাটে সদ্যস্নাতা কমলাকে দেখে এসেছিল। যৌবনোন্মুখী সুন্দরী কিশোরীর সেই তরুণ লাবণ্য-শ্রী এই বিবাহ-বিমুখ যুবকের অন্তরে অন্তরে সেদিন কী যে মায়াদণ্ডের যাদুস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছিল তা শুধু সতীশই জানে। বিধবা মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পারার অজুহাতে সতীশ এক কথায় কমলাকে বিবাহ করতে রাজি হয়ে গেল। গাঁ-শুদ্ধ লোক সতীশের এই অদ্ভুত মাতৃভক্তির প্রশংসা করতে লাগল বটে, কিন্তু সতীশ কমলাকে পেয়ে, বাঞ্ছিত মিলনের সার্থকতায় আপনার দুর্ভাগ্য-পীড়িত জীবনটাকেই একান্ত ধন্য বলে মনে করতে লাগল।

বিবাহের পর দুটো বছর সতীশের জীবন কে যেন স্বপ্ন-লোকের বিচিত্র আনন্দে ভরে দিয়েছিল। কমলার কমল-স্পর্শে জগদীশপুরের চির-পরিচিত পুরাতন বাড়ীখানি সতীশের চোখে এক নূতন আনন্দ-রাগে যেন নন্দনের শোভা ধারণ করেছিল! সতীশের মা দুর্গামণি এই লক্ষণা মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছিলেন। তার উপর, কমলা তার সাতরাজার ধন এক মাণিক ছেলেটিকে বশ করতে পেরেছে দেখে বধূর প্রতি তাঁর মহানুরাগ আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল! পাড়ার গুড়ী হয়ে যদি কখনো বৌয়ের আদর, বৌয়ের যত্ন করতে হয়—তবে সে কেমন, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ জগদীশপুরের শ্বশ্রূ-নির্য্যাতিতা তরুণী বধূরা সকলেই সতীশের মা দুর্গামণির রূপ বর্ণনা করতে সুরু করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে দুর্গামণি তাঁর এই সুযশ বেশীদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। দু-বছর পরেও কমলা যখন তাঁর কোলে একটী সোনার-চাঁদ নাতি এনে দিতে পারলে না, তখন দুর্গামণি বধূর সন্তান-সম্ভাবনায় ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। কত রকমের স্বস্ত্যয়ন-বিষুদ, কবচ-মাদুলি ধারণ করিয়ে, কালী ঠাকুরের দোর ধরেও যখন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল না, তখন দুর্গামণি রায়-বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর জন্যে অধীর হয়ে ছেলের আবার বিবাহ দেবার চেষ্টা করচেন, এমন সময় সতীশ পশ্চিম অঞ্চলে একটা মোটা মাইনের চাকরী পেয়ে সে দেশে চলে গেল।

সেখানে পৌঁছোবার দিন দশ-পনেরো পরেই সতীশ হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লো। ছেলের অসুখের খবর পেয়ে দুর্গামণি এমন অস্থির হ'য়ে পড়লেন যে, তাড়াতাড়ি

বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, গ্রামের একজন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়কে সঙ্গে করে তিনি ছেলের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সতীশ তখন কতকটা সাম্‌লেছে; আপিস থেকেই সে সপরিবারে থাকবার উপযুক্ত একটা বাসা পেয়েছিল, দুর্গামণির এই ছোটখাটো ঝর্‌ঝরে, তক্‌তকে নতুন বাংলো বাড়ীখানি আর পশ্চিমের সেই পাহাড়ে-ঢাকা নদীঘেরা জায়গাটি এত পছন্দ হল যে, সতীশ সেরে ওঠ্‌বার পর তিনি আর দেশে ফিরে যেতে চাইলেন না। আত্মীয়টিকে বিদায় করে দিয়ে সেইখানেই তিনি রয়ে গেলেন, আর বৌমাকে নিয়ে আসবার জন্যে সতীশকে মহা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন! সতীশ বড়দিনের ছুটিতে গিয়ে বৌকে নিয়ে আসবে প্রতিশ্রুত হয়ে দুর্গামণিকে নিশ্চিন্ত করলে।

সতীশেরও এই বিদেশে একলা কিছুতেই মন বসছিল না। কমলার কাছ থেকে দূরে এসে থাকায় যে অপরিসীম কষ্ট, সেইটে এখানে তাকে সদাসর্ব্বদা অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে। সুদূর প্রবাসে প্রাণের একান্ত প্রিয়জনটিকে আজ অনেক দিন কাছে না দেখতে পেয়ে সতীশ বড় কাতর হয়ে উঠেছে। কমলার অদর্শন-বেদনা তার অভাবের অসহনীয় দুঃখ একেই সতীশকে ক্রমশঃ এখানে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তার উপর প্রতিদিন দিনান্তে পাওয়া কমলার লেখা একখানি করে চিঠি—যা তার এই সঙ্গীহীন বান্ধবহীন দূর-দেশে জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা আর অবলম্বন ছিল, তাও আজ প্রায় দুসপ্তাহ হল সে একখানিও দেখতে পায়নি। কমলা তার শেষ চিঠি-

খানায় লিখেছিল যে, তারা চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নান করবার জন্যে সকলে মিলে কলকাতায় যাচ্ছে, এখন চার-পাঁচদিন সতীশ যেন তাকে আর কোনও চিঠিপত্র না লেখে। কলকাতা থেকে ফিরে এসে কমলা সতীশকে চিঠি দিলে,—তবে যেন সে জবাব দেয়। সতীশ সেই চিঠিখানির জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। চার পাঁচ দিনের জায়গায় দু হপ্তা কেটে গেল, তবুও কোন খপর না পেয়ে সতীশ বড় উতলা হয়ে উঠলো। প্রথমে কমলার উপর তার দুর্জ্জয় অভিমান হয়েছিল, কেন সে চিঠি দিচ্ছে না! দিনান্তে একখানা চিঠি দিতেও কি সে অপারগ? দেশে নাই যদি ফিরে থাকে এখনও, কলকাতা থেকে কি আর একখানা চিঠি লেখা চলে না?—জানে তো তার চিঠি পেতে দেরী হলে আমি কতটা উদ্বিগ্ন হই। তবুও কি আমায় একখানা চিঠি দেওয়া দরকার, এ কথাটা তার একবারও মনে পড়ছে না? আচ্ছা বেশ, দেখা যাক্, সে কতদিন আর এমন চুপ করে থাকতে পারে, আমিও আর তাকে চিঠি লিখ্‌ছিনে। কিন্তু সতীশ তার পণরক্ষা করতে পারলে না, আরও দু-সপ্তাহ যখন দেখতে দেখতে কেটে গেল, সতীশ তখন কমলার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলো। এমন তো কখনও হতে পারে না! যে লোক প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাকে পত্র লিখ্‌তো, আজ একমাস সে এমন চুপ করে আছে কেন? নিশ্চয় কমলার অসুখ-বিসুখ করেছে। সতীশ আর অভিমান করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলে না, সেইদিনই কমলাকে সে একখানা চিঠি লিখে দিলে।

পত্রের উত্তর আসবার নির্দ্দিষ্ট দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেল; কমলার জবাব নিয়ে কোন চিঠিই যখন সতীশের কাছে এসে পৌঁছল না, সতীশ তখন ভীত হয়ে উঠলো; তাইত, হোল কি ওদের? আজ যে প্রায় একমাস হতে চললো, কোন খবর তাদের পাওয়া যায় নি! সতীশ সেদিন মৈত্র মশায়কে একখানা পত্র দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সেদিনের ডাকে সতীশের নামে একখানা পত্র এল। হাতের লেখাটা অপরিচিত কিন্তু পোষ্ট অফিসের ছাপ রয়েছে তার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের। সতীশ ব্যস্ত হয়ে চিঠিখানার খাম ছিঁড়ে পড়তে বসলো।

প্রিয় মহাশয়,

বড়ই দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে আপনার স্ত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী আমাদের গ্রামের জমীদার-পুত্র শ্রীমান হরেন্দ্র বাবাজীউর সহিত গত চূড়ামণি-যোগে কুলত্যাগিনী হইয়াছেন। আপনার শ্বশুর মহাশয় সম্ভবতঃ এ দুঃসংবাদ আপনাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী কমলা দেবী ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ আপনার বিবাহিতা পত্নী, সুতরাং দুঃসংবাদ হইলেও সর্ব্বাগ্রে এ ব্যাপার আপনার কর্ণগোচর হওয়া বিধেয় বিবেচনায় মহাশয়কে পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলাম। যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। ইতি।

চিঠিখানা পড়ে সতীশের মাথা ঘুরে গেল, বুকের ভিতর হঠাৎ কে যেন সজোরে একটা লোহার শাবল বসিয়ে দিলে। দু' হাতে নিজের মাথাটাকে চেপে ধরে টেবিলের

উপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে, খোলা চিঠিখানার দিকে সতীশ অনেকক্ষণ পাগলের মত উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল!

দুর্গামণি রোজ সতীশের কাছে বৈবাহিকদের খবর পেতেন, সম্প্রতি অনেকদিন হল বৌমাদের কোন খবর না পেয়ে তিনিও একটু উতলা হ'য়ে উঠেছিলেন। ডাকগাড়ীখানি ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালেই তিনি সতীশকে এসে বলতেন,—ওরে তাখ্‌না একবার সতু, উঠে গিয়ে, বৌমাদের খবরটা আজ হয় ত এসেছে। সতীশও উঠে যেত, কিন্তু পোষ্ট আপিস থেকে শুক্‌নো মুখটি নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতো! আজ সে একখানা চিঠি হাতে করে ফিরে এসেছে দেখে দুর্গামণি একেবারে নিশ্চিত অনুমান করে নিলেন যে এবার বৌমাদের খবর না হয়ে আর যায় না। সবিশেষ জানবার জন্যে তিনি যখন সতীশের ঘরে এসে ঢুকলেন সতীশ তখন চেয়ারে বসেও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তার মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে! ছেলের রকম-সকম দেখে দুর্গামণি মনে মনে শিউরে উঠলেন। খবরটা যে খুবই খারাপ এসেছে, এটা তাঁর বুঝতে একটুও বিলম্ব হল না, কিন্তু সেটা কি? বৌমার কি তবে ভাল-মন্দ কিছু হয়েছে? দুর্গামণি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে ও সতু, অমন কচ্ছিস্ কেন বাবা? তোর শরীরটা কি ভাল নেই? ও কার চিঠি এসেছে? বৌমাদের কি কিছু মন্দ খবর পেয়েছিস্?

সতীশের মুখে কোন কথা নেই, কেমন এক রকম শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তার মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল। সমস্ত শরীর তার ঘেমে নেয়ে উঠেছে! দুর্গামণি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে ছেলের মুখখানি মুছিয়ে হাতপাখার বাতাস করতে করতে বললেন,—ওরে, তোর কি হয়েছে, আমায় বল্‌না, অমন করে মুখটী বুজে আমার দিকে চেয়ে রইলি কেন সতু? আমার যে বড় ভাবনা হচ্ছে বাবা!

সতীশ আস্তে আস্তে টেবিলের উপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে তার মায়ের হাতে দিলে। দুর্গামণি বারকতক চিঠিখানা নেড়ে চেড়ে সতীশকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, হায় রে আমার পোড়াকপাল! ওরে, তোর এ অভাগী মা কি লিখ্‌তে পড়তে জানেরে সতু? আমার যে অক্ষর-পরিচয়ও কখনো হয়নি বাবা! তুই একবার পড়ে শোনা, লক্ষ্মী ধন আমার! খবরটা কি, জানবার জন্যে আমার প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠছে বাছা!

সতীশ একটা অব্যক্ত যাতনায় অবরুদ্ধ কণ্ঠ নিয়ে তার মাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। দুর্গামণি খানিকটা ভেবে বললেন; —দেখ সতু! আমার বোধ হয় এ কোন শত্রুর কারসাজি, বাবা! আমার এমন লক্ষ্মী প্রতিমের মত বউ, সে কি কখনো এমন কাজ করতে পারে? তুই মৈত্রী মশাইকে একখানা চিঠি লিখে একবার ভাল করে সন্ধান নে, ও বেনামী চিঠি পড়ে মন খারাপ করে থাকিস্ নে বাবা!

জননীর উপদেশ সতীশের সমীচীন বলে মনে হল। সে তখনি উঠে গিয়ে শ্বশুরকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিলে।

৭

ক্ষিতীশ সেই যে হরেনের সন্ধানে

বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। কমলা উতলা হয়ে তার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে। সহস্র দুশ্চিন্তা আজ তার দুর্ব্বল দেহ-মনকে যেন অস্থির করে তুলেছে। যদি এ বাবুটি হরেনদার সন্ধান না পান, তাহলে উপায়! কেমন করে সে বাড়ী ফিরে যাবে? কে তাকে নিয়ে যাবে? বাবা মা সবাই না জানি তার জন্যে কতই ভাবছেন! চারিদিকে কত বোধ হয় খোঁজ হচ্ছে!

কমলা মনে মনে হিসেব করতে বসল, আজ ক'দিন সে বাড়ী-ছাড়া হয়ে আছে। হিসেব করে বেচারী চম্‌কে উঠ্‌লো! উঃ! আজ যে প্রায় আটদিন হয়ে গেল সে এই অজানা অচেনা একজন পরের আশ্রয়ে পড়ে রয়েছে! ছি ছি! কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্না! গ্রামের লোক শুন্‌লে বলবে কি? ভদ্রঘরের মেয়ে সে, গৃহস্থের বউ, এতদিন ধরে কলকাতার এক অপরিচিত লোকের বাড়ীতে বাস করছে, যে তার আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, কুটুম্ব নয়, কেউ নয়! যার বাড়ীতে একটা মেয়ে-ছেলে পর্য্যন্ত নেই! কমলা তার এই অসহায় অবস্থার কদর্য্যতাটা যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেয়ে নিজেই শিউরে উঠ্‌লো! একটা কলঙ্ক, একটা বদনাম, যে মুহূর্ত্তে রটে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় সে একান্ত ভীত হয়ে পড়ল। কত দ্বিধা দুর্ভাবনা সঙ্কোচ যেন সজারুর কাঁটার মত তার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় ধিক্কারে বিঁধতে লাগল। না, না, আর একদিনও সে এখানে থাকবে না। হরেন-দার সন্ধান পাওয়া গেলে আজই রাত্রে সে তার সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে।··· কিন্তু, যদি হরেন-দাকে না পাওয়া যায়! তাহলে?—তাহলে কি হবে?—সহস্র সাঁতার-না-জানা লোকের অতল জলে তলিয়ে যাওয়ার মতো কমলার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে হাঁকুপাঁকু করে উঠলো। কিছুতেই সে যখন একটা-কিছু কূল-কিনারা ঠাওরাতে পাচ্ছে না, ঠিক সেই সময় ক্ষিতীশ ফিরে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। কমলাকে ডেকে বললে,—দেখুন, হরেনবাবুর কোন সন্ধান আজ পাওয়া গেল না, তবে আশা হয় কাল-পরশুর মধ্যে তাঁকে খুঁজে বার করতে পারবো। গজুকে, গবেশকে, আর আমার অন্য সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে আজ খবর দিয়ে এসেছি, কাল তারা যেমন করে হোক হরেনবাবুর সন্ধান করবেই করবে। আপনি একটুও ভাববেন না। তিনি কোন্ কলেজে পড়েন, সেটা যদি আপনি একটু বলতে পারতেন তাহলে আজই তাঁকে ধরে আনতে পারতুম।

কমলা হতাশ হয়ে বললে,—তা যে আমি ঠিক জানিনি, তবে হরেন-দার কাছে শুনেছিলুম, কলকাতার কোন এক সরকারি কলেজে তিনি পড়েন—সেটা নাকি সহরের ভেতর সব-চেয়ে সেরা ইস্কুল।

ক্ষিতীশ হেসে বললে,—ওঃ! বুঝতে পেরেছি এইবার। এটা যদি আপনি আমায় আগে বলতেন, তাহলে আর আমাকে আজ কলকাতার অর্দ্ধেক দেশ্ খুঁজে বেড়াতে হোত না। তিনি যে কলেজের কথা বলেছেন আমিও যে সেই কলেজে পড়ি! কাল কলেজে গিয়েই তাঁকে বার করবো এখন। হাঁা, তিনি কি পড়েন, জানেন—?

কমলা তার ছোট মাথাটি নেড়ে বললে,—তা

না,—তাতো জানিনি! কেবল দু'টো পাশ করে তিনটে পাশের পড়া পড়ছেন, শুনেছি!

—ওঃ, তাহলে বি-এ পড়ছেন বুঝি!

কমলা সাগ্রহে বলে উঠলো,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, হরেনদা এখন বি-এ পড়ছেন।

ক্ষিতীশ বললে,—ব্যস্, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আমি কালই আপনার হরেন-দাকে নিয়ে এসে হাজির করবো, নিশ্চয়!

কমলা মাথাটা নীচু করে আঁচলের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে,—আমার জন্যে আপনি অনেক কষ্ট পাচ্ছেন, আপনার ঋণ আমি জীবনে কখনো শুধ্‌তে পারবো না!

কমলার এই কটি কথা ক্ষিতীশের অন্তরে যেন একটা পরম সার্থকতার তৃপ্তি ঢেলে দিলে। তার এই তরুণ জীবন আজ যেন ধন্য ও পূর্ণ হয়ে উঠল! সে বেশ প্রীত প্রফুল্ল কণ্ঠে বললে,—না, না, এ আর কষ্ট কি!—এ রকম অবস্থায় সকলেই আপনাকে সাহায্য করতো। বরং এ আমারই খুব সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আমিই প্রথম আপনার উপকারে লাগতে পেরেছি। সে যাহোক্ এখন ভালোয় ভালোয় আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পারলে বাঁচি! আপনার না-জানি এখানে কতই কষ্ট হচ্ছে! আমার এখানে মেয়ে-ছেলেরা কেউ নেই, সমস্তই ঝী-চাকরদের উপর নির্ভর। মোটেই তেমন যত্ন হচ্ছে না!

কমলা ধীরে ধীরে বললে,—এর চেয়ে আদর-যত্ন আমি জীবনে কারুর কাছে পাইনি!

ক্ষিতীশের প্রাণের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুতের মতো আচম্‌কা একটা সুধার ধারা প্রবাহিত হয়ে গেল। কি একটা আবেগের প্রবল বাতাস তরঙ্গ-হিল্লোলের মতো তার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে রোমাঞ্চিত করে তুল্‌লে। মুহূর্ত্তের জন্য ক্ষিতীশ ভুলে গেল যে কমলা বিবাহিত, আর তার স্বামীও জীবিত। এই অসামান্য সুন্দরী মেয়েটিকে পথের পাশ থেকে কুড়িয়ে এনে পর্য্যন্ত, ক্ষিতীশ তার যৌবনের মোহন তুলিকায় প্রতিদিন কল্পনার যে-সব রঙীন ছবি জীবনের অভিনব চিত্রপটে বিচিত্র ভাবের নানা মাধুরী মাখিয়ে আঁকতে সুরু করেছিল, হঠাৎ সেগুলো যেন তখনি সজীব উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার চোখের সামনে বায়োস্কোপের চিত্রের মতো ঘুরে যেতে লাগলো!

কমলা এই সময় আবার অশ্রুজড়িত অস্ফুট কণ্ঠে বললে,—আপনার এ উপকার আমি বেঁচে থাক্‌তে কখনো ভুলতে পারবো না!

ক্ষিতীশের তরুণ তনু ঘিরে উচ্ছ্বসিত যৌবনের তরল রক্তস্রোত সহসা যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো; সে ফস্ করে বলে ফেললে, আপনাকেও বোধ হয় এ জীবনে আমি আর কখনে ভুলতে পারবো না! কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু এক দারুণ লজ্জায় তার কাণদুটো পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠ্‌লো! কমলার কৃতজ্ঞতার উত্তরে তার এ কথাগুলো যে নিতান্ত খাপ্‌ছাড়া আর বেসুরো রকমের হয়ে গেল, এটা তার নিজের কাছেও বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাই সে আর কিছু বলতে পারলে না, দোষীর মতোই অপ্রতিভ হয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা বেজে গেল। কমলা বললে,—কথা কইতে কইতে অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার এখনো খাওয়া হয় নি। যান, কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করে নিন্।

ক্ষিতীশ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে সে নীচেয় নেমে গেল। কমলা উপরের ঘর থেকে শুন্‌তে পেলে, নীচেয় গিয়ে ক্ষিতীশ তার ঝী চাকর বামুন সবাইকে ডেকে কড়া-হুকুম জারি করছে,—খবর্দ্দার, যেন মাই-জীর খাওয়া-দাওয়া-শোওয়ার এতটুকু ত্রুটি না হয়, সবাই হুঁসিয়ার থাকবে, উনি যা হুকুম করবেন তখনি তা তামিল কর্‌বে। ওঁর শরীর খারাপ এটা যেন সকলের মনে থাকে। ইত্যাদি—

৮

ক্ষিতীশ আজ সকাল-সকাল খেয়ে দশটার মধ্যেই কলেজে চলে গেল। যাবার সময় ঝীকে দিয়ে কমলার কাছে বলে পাঠালে যে, কলেজের ফেরৎ একেবারে হরেনকে সঙ্গে করে সে বাড়ী ফিরবে। কমলা তাদের অপেক্ষায় সমস্ত দুপুর-বেলাটা রাস্তার দিকের জানলাটার কাছে বসে কাটিয়ে দিলে। একটা, দুটো করে ক্রমে যখন চারটে বেজে গেল, কমলা তখন বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো! আজ এঁর এত দেরী হচ্ছে কেন?—অন্যদিন ত দুটো-তিনটের ভিতরই ফিরে আসেন! তবে কি হরেন-দার ইনি দেখা পান-নি? হরেনদা কি আজ কলেজে আসেননি?—নাও, আসতে পারেন। হয়ত কোন কাজে হঠাৎ দেশে চলে গেছেন। তা যদি হয়, তাহলে কি হবে? হরেনদা যদি সত্যিই কলকাতায় না থাকে? কমলা খড়খড়ির পাখিটা তুলে একদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল; প্রাণটা তার ঠিক যেন তখন বাসা থেকে পড়ে-যাওয়া পাখীর ছানার মতোই ছট্‌ফট্ করছিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে এলো, রাস্তার দুধারে সারি সারি গ্যাসের আলোগুলো একটা একটা করে সব জ্বলে উঠলো। ঝী এসে জিজ্ঞাসা করলে,—হ্যাঁ মা, আজ কি গা-হাত-পা ধোবেন না, কাপড়-চোপড় কাচবেন না? সন্ধ্যে উত্তরে গেল যে!

কমলা একটু উদাসভাবে বললে,—না ঝী, আজ আর জল ঘাঁটবো না, শরীরটা ভালো নেই।

ঝী বললে,—তবে আসুন, আপনার চুলগুলো বেঁধে দি। অমন কালো মেঘের মতো একরাশ চুল আজ ক'দিন চিরুণী না ছুঁইয়ে যে জট্ পাড়িয়ে ফেললে মা!

কমলা তেমনিই অন্যমনস্কভাবে বললে,—আচ্ছা, দাও।

ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করে ঝী যখন সেই চুলের গোছাকে গুছিয়ে তুলে খোঁপা বেঁধে আয়নাখানা কমলার সাম্‌নে ধরলে, কমলা তখন চম্‌কে উঠে বললে,—ও ঝী, সিঁদুর?

ঝী হাস্‌তে হাস্‌তে বললে,—এই যে মা, সব গুছিয়ে এনেছি তোমার জন্যে।

সে তার আঁচলের গেরো খুলে ছোট একটি সিঁদুর-কৌটো বার করে দিলে, কমলা চিরুণীর ধারে খানিকটা সিঁদুর তুলে নিয়ে যখন তার সেই চারু সিঁথির উপর রেখাটুকু টেনে দিলে, তার সমস্ত অন্তরখানি ঘিরে তখন

আর একজনের ভাবনা তাকে কাতর করে তুলেছিল!

ঝী চলে গেল, কমলা বসে-বসে ভাবতে লাগল। এ ভাবনাটি তার মনের গোপন ভাবনা—অষ্ট প্রহর অন্তরের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরছিল; কিন্তু লজ্জায় কারো কাছে মুখ ফুটে বল্‌তে পারেনি। এই অচেনা পুরীতে এমন একজনও সঙ্গিনী নেই, যাকে সে প্রাণের কথা খুলে বলতে পারে। আজ শুধু মনে-হওয়া নয়, মন তার ব্যগ্র হয়ে উঠল স্বামীকে একখানা চিঠি লেখবার জন্যে। কতদিন তাঁকে লেখা হয় নি! এ-কথা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু কার কাছ থেকে ঠিকানা লিখিয়ে নেবে? বাড়ীতে ঠিকানা লিখে দিত তার ছোট ভাই, এখানে ক্ষিতীশের কাছে তাঁর ঠিকানা লেখাতে তার ভারি লজ্জা বোধ হতে লাগল। যদি সে জিজ্ঞাসা করে বসে কাকে চিঠি লিখেছে? আর স্বামীর নামটাই বা কি করে তার সাম্‌নে বার করা যায়! কিন্তু আর ত লজ্জা করা চলে না।

কমলা ব্যগ্র হয়ে ঘরের চারিদিকে একটা চিঠি লেখবার সরঞ্জাম খুঁজতে লাগলো, কিন্তু ঘরের ভিতর কোথাও সে একটা দোয়াত কি কলম কিম্বা একটুকরো কাগজ পেন্সিল কিছুই দেখতে পেলে না। ক্ষিতীশের টেবিল, চেয়ার, খাতাপত্র, বইয়ের শেল্‌ফ্ সমস্তই 'নার্স্‌রা' এসে সে ঘর থেকে কমলার অসুখের সময় বার করে দিয়েছিল।

কমলার মনে পড়লো, ক্ষিতীশবাবু দিন-রাত পাশের ঘরটায় বসেই তো লেখা-পড়া করেন, নিশ্চয় ওখানে কাগজ-কলম পাওয়া যেতে পারে। পাশের ঘরে ঢুকে কমলা দেখলে, সামনেই ক্ষিতীশের প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার উপর বেলওয়ারী কাঁচের দোয়াত-কলম সাজানো; একধারে মস্ত-একটা 'রাইটিং-কেস্' রয়েছে। কমলা তার ভিতর থেকে একখানা চিঠির কাগজ বার করে স্বামীকে চিঠি লিখ্‌তে বসলো। চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে কমলা দেখ্‌লে, টেবিলে পাতা ব্লটিং, প্যাডের উপর নীল পেন্সিলে কমলার পিতা মৈত্র-মহাশয়ের নাম-ঠিকানাটা লেখা আছে, আর তার চার ধারে তার নিজের নামটাও অসংখ্যবার নানা রকম করে লেখা রয়েছে।

সতীশকে চিঠি লিখ্‌তে বসে কমলা ভাবলে, তাইতো, তাঁকে খবর দিয়ে অতদূর থেকে না টেনে এনে বাবাকে কেন একখানা চিঠি দিই না! সেইতো বেশ ভাল হবে। আমাদের গ্রাম শুনেছি কলকাতার খুব কাছে; বাবা চিঠি পেলেই দু'একদিনের মধ্যে এসে আমাকে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন, কিন্তু পশ্চিমে ওঁর কাছে চিঠি যেতে আর তিনি আসতে আরও একহপ্তা দেরী হয়ে যাবে, অত দিনতো সে কিছুতেই এখানে থাক্‌তে পার্ব্বে না! কমলা তখন মৈত্র-মশায়কেই চিঠি লিখতে বস্‌লো। প্রায় অর্দ্ধেকটা যখন লেখা হয়েছে,—কেমন করে ক্ষিতীশবাবু বলে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তা থেকে নিজের মোটর গাড়ীতে করে তুলে এনে, আপনার বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করিয়েছেন, এই সব বর্ণনা শেষ করেছে,—এমন সময় ক্ষিতীশের সেদিনকার কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল! ক্ষিতীশ বলেছিল,

—কমলা এতদিন বাড়ী ফেরেনি বলে নিশ্চয় তাদের দেশে একটা সোরগোল পড়ে গেছে,—এমন অবস্থায় তার বাবাকে চিঠি লিখ্‌লে একটা উল্টো বিপত্তি হতে পারে, তার চেয়ে কমলার একেবারে নিজে গিয়ে সমস্ত কথা সেখানে তাঁদের বুঝিয়ে বলাই ভাল, নইলে—যে সম্ভাবনার তিনি ইঙ্গিত মাত্র করেছেন তা মনে হতেই কমলার হাতের কলম বন্ধ হয়ে গেল। বেচারী তখন গালে হাত দিয়ে আবার ভাবতে বস্‌লো—তাইতো! সে তবে কি করবে? এমন সময় পিছন থেকে চুপি চুপি কে এসে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে তার আধখানা লেখা চিঠিটা তুলে নিলে! কমলা চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখে—হরেনদা! সেই তার ছেলেবেলরা দুরন্ত সঙ্গীটি! চোখে-মুখে সেই চির-পরিচিত দুষ্ট হাসিটুকু আজও তেম্‌নি ফুটে রয়েছে।

কমলা একমুখ হেসে বললে,—আঃ, বাঁচলুম হরেনদা! তুমি এসেছো দেখে এতক্ষণে আমার মনে একটু ভরসা হচ্ছে! কী বিপদেই যে পড়েছিলুম আমি, সব শুনেছ ত?

হরেন যেন কমলার কোন কথা শুনতেই পেলে না! সে তখন কমলার লেখা সেই অসমাপ্ত চিঠিখানা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে ব্যস্ত! কমলা বললে,—দেখ, তোমাকে ইনি কলেজ থেকেই ধরে আনবেন বলে গেছ্‌লেন, কিন্তু তোমাদের আসতে এত দেরী হল কেন? আমি সমস্ত দিন কি কষ্টই যে পেয়েছি! ইনি কোথায় গেলেন? তোমার সন্ধান পেলেন কি করে?—তুমি বুঝি আর কলেজে পড়তে আসোনি, হরেনদা? দাঁড়াও, দেশে গিয়ে মাসীমাকে বলে দিচ্ছি!

হরেনের তবুও কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না, তেমনি নির্ব্বিকারভাবেই সে কমলার চিঠিখানা পড়তে অথবা মুখস্থ করতে লাগলো। কমলা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে, হরেনের হাত থেকে চিঠিখানা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে,—আচ্ছা হরেনদা, পরের চিঠি পড়া রোগটা কি তোমার এখনও গেল না? চিরকালটাই কি এম্‌নি ছেলেমানুষী করবে?

হরেন একটুও অপ্রতিভ হয়ে বেশ সহজভাবেই বললে,—তোর কি আর বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে নারে কম্‌লি? এ বুঝি পরের চিঠি হল? এতো তুই লিখেছিস্ আমাদের মৈত্র-মশাইকে!

ক্রমশঃ।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

---

* শ্রাবণ সংখ্যার লেখক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মনের মিল

আড্ডাধারী মহাশয় এবং বন্ধুগণকে গুলি-খোর নয়ন-চাঁদ বলিয়াছিল,—"মনের মিল থাকে, তবে বলি, ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও, আমিও তাই। মুসলমান হও, আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সে-গুলিকে মানিব। আমি যে ঠাকুরগুলিকে মানিব, তোমাদেরও সে-গুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে, মনের মিল রহিল কোথায়?"

নয়ন গুলিখোর হইলেও তাহার কথায় অনেকটা সারবত্তা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আকার-অবয়বে, প্রকৃতি-স্বভাবে, বিশ্বাস-বিবেচনায়, হাজার পার্থক্য থাকিলেও এমন একটা কিছুর মিল থাকা চাই, যাহাতে কোন দুইজনের মধ্যে মনের মিল হয় এবং অন্যান্য পার্থক্য যতই বেশী হউক না কেন, সেই মিলটার জোর এত অধিক যে, কিছুতেই উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে না।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। একজনের হয়ত শাসন-প্রবৃত্তি, কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা প্রবল, তাহার সহিত ঐরূপ প্রকৃতির আর একটী লোকের মনের মিল হওয়া দূরের কথা, সর্ব্বদাই বিবাদ ও মনান্তর হওয়াই সম্ভব। আবার কোথাও বা দুইজনেই পরদুঃখকাতর, হয়ত ইহাতেই তাহাদের সহজে মনের মিল হইতে পারে। আবার যেমন, যাহার শাসন-প্রবৃত্তি প্রবল তাহার সহিত নম্র ও বশ্যস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরই সহজে প্রীতি হইতে পারে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। পরস্পর-বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হাজার বিবাদ-বিসম্বাদ-সত্ত্বেও উভয়ের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। সে ভালবাসা —সে মিল কোথা হইতে কিরূপে আসে, তাহা বলা ও বুঝা কঠিন। অনেক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মনের মিল কেবল প্রবৃত্তি-সমূহের সমতার উপর নির্ভর করে না —বরং কতকটা উহাদের আকর্ষণ ও পূরণের উপর প্রীতি ও বৈরতা নির্ভর করিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ এমন কিছু-একটা অজ্ঞাত আকর্ষণী শক্তি দেখা যায়, যাহাতে বিনা কারণে, পরস্পরের প্রকৃতির নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ আনুরক্তির সঞ্চার হয়। আবার এমনও হয়, একজন হয়ত অন্যজনের বিশেষ অনুরক্ত, সে কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চায় না। অনেকের জীবনেই এমন বহু ঘটনা হইয়াছে যে, প্রথম সাক্ষাতেই কেমন একজনের উপর মন বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছে;—মনে হইয়াছে, এ যেন কতদিনের পরিচিত, যেন কত আপনার জন! আবার অকারণে প্রথম সাক্ষাতেই অন্যজনের প্রতি বিদ্বেষ ভাব আসিয়াছে। সুতরাং এ সমস্ত যে এক অপূর্ব্ব অজ্ঞাত আকর্ষণী-শক্তি দ্বারা সাধিত হয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই আকর্ষণ-শক্তির উদ্ভব বিষয়ে বহুকাল হইতেই আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু তাহার

স্থির মীমাংসা কেহই করিতে সমর্থ হন নাই। তন্মধ্যে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ—যাঁহারা মানবদেহে ও ভাগ্যে গ্রহগণের প্রভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এ বিষয়ে নানা মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতের সত্যতা উপলব্ধি করাও বিশেষ কঠিন নহে। তাঁহারা বলেন, গ্রহগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পরের আকর্ষণ-শক্তি আছে, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ-শক্তি আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম-সময়ে আকাশে অবস্থিত গ্রহগণ তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ও গুণবিকাশের নির্দ্দেশক। সুতরাং একজনের জন্মসময়ে সংস্থিত গ্রহগণ অন্যের জন্ম-সময়ে সংস্থিত গ্রহগণের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধে সম্পর্কিত হইলে উভয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ-শক্তির বিকাশ হইবে।

পূর্ব্বে কি বিবাহ-ব্যাপারে, কি ভৃত্য-নির্ব্বাচনে, কি গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ-স্থাপনে, এই নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইত। লোকে তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিত; তাহাতে দম্পতীর প্রণয়, ভৃত্যের বশ্যতা, শিষ্যের আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রত্যয় হইত না। এখনকার মত পতির অত্যাচারে কুলবধূর আত্মহত্যা প্রভুর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ভৃত্যের পলায়ন ইত্যাদি বড় একটা সাধারণ ছিল না। এই নিয়মগুলি কেবল কল্পনা প্রসূত কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা পরীক্ষায় যখন সহজে তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তখন বিনা পরীক্ষায় সেগুলিকে কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, যদি নিয়মগুলি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা সকলের বিশেষ উপকারে আসিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চন্দ্র ও সূর্য্য লইয়াই ফল জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব প্রকার ফলাফল বলা হয়। রাশি, বর্ণ, গণ প্রভৃতি যৌটকগণনা কেবল চন্দ্রের অবস্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই যৌটক গণনায় একজনের জন্মসময়ে চন্দ্রের অবস্থান হইতে অন্যের জন্ম-সময়ের চন্দ্রের অবস্থিতি স্থানের কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধের উপর উভয়ের মিলনের শুভাশুভ বিচারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন য়ুরেনস্ ও নেপচুনের আবিষ্কার হয় নাই, তখন তাহাদের প্রদত্ত ফলাফলের কোন কারণ মীমাংসা করা যাইত না। কিন্তু আবিষ্কৃত না হইলেও তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল; তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ফলও যথাসময়ে প্রকাশ পাইত; কিন্তু লোকে উক্ত ফলসমূহের যথার্থ হেতু নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইয়া নানারূপ কাল্পনিক যুক্তি দ্বারা ঘটনাগুলিকে নিয়ম-সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইত। এই জন্যই যৌটক-বিচারে অনেক সময়ে ফল মিলিত না। কেবল তাহা নহে, নানারূপ দুর্ব্বোধ্য ও বিরুদ্ধ নিয়মসমষ্টি প্রবেশ করাইয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মূল নিয়মগুলির অন্তরায় করিয়া তুলিয়াছিল। যে শাস্ত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তাহার সত্যতা নিরূপণ করা কঠিন নহে; এবং একবার পরীক্ষায় সত্যতা উপলব্ধি হইলে, অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকিবে না।

এক্ষণে আমরা মূল সূত্রগুলির উল্লেখ করিয়া তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা পাইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফল-জ্যোতিষে

চন্দ্র ও সূর্য্যকে লইয়া সমস্ত বিচার হইয়া থাকে। একজনের জন্মসময়ের চন্দ্র বা সূর্য্যের সহিত অন্যের জন্মসময়ের সূর্য্য বা চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণের বিশিষ্ট সম্বন্ধের উপর পরস্পরের আকর্ষণ নির্ভর করে। এই বিশিষ্ট সম্বন্ধটী গ্রহগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যবধান মাত্র। যখন গ্রহগণের মধ্যে ৬০ ও ১২০ অংশ ব্যবধান থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে স্নেহদৃষ্টি আছে জানিতে হইবে এবং যখন তাহাদের মধ্যে ৪৫, ৯০ ও ১৮০ অংশ ব্যবধান থাকিবে তখন তাহাদের মধ্যে বৈরদৃষ্টি আছে জানিতে হইবে। আবার গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র শুভফল-দাতা, তদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রহগণ অশুভ-নির্দ্দেশক। যখন একজনের জন্ম-সময়ের শুভগ্রহের সহিত অন্যের জন্ম-সময়ের শুভগ্রহের বা একের সহিত অন্যের জন্ম-সময়ের রবি বা চন্দ্রের একত্র সংযোগ হয় বা অন্যের গ্রহগণের সহিত স্নেহদৃষ্টি-যুক্ত হয় তখন তাহাদের মিলনে শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে বৈরদৃষ্টি থাকে তখন অশুভ ফল হয়। উক্ত বিশিষ্ট সম্বন্ধ হইলেই পরস্পরের সাক্ষাতে উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিতে হইলে যে পার্থক্যের কথা বলা হইল তাহা দ্বারা সহজে নিরূপিত হইবে। যদি উভয়ের জন্মসময়ের গ্রহগণের মধ্যে উক্তরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধ না দেখা যায়, তবে তাহাদের মিলন বা সংযোগে বিশেষ কোন আকর্ষণ পাওয়া যায় না।

এই নিয়মগুলি বুঝা বিশেষ কঠিন নহে। রাশি-চক্রে গ্রহগণের স্থিত অংশাদি জানিতে হইলে পঞ্জিকা হইতে উভয়ের জন্মদিবসের গ্রহ স্পষ্ট গ্রহণ করিলেই হইবে। তখন তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান স্থির করা সহজ। যেমন, একজনের জন্মসময়ে মেষ রাশিতে ৫ অংশে চন্দ্র রহিয়াছে, অন্যের জন্ম-দিবসে রবি সিংহ রাশির ৬ অংশে এবং শনি মকর রাশির ৭ অংশে অবস্থিত। এরূপ স্থলে পরস্পরের মিলনে উভয়েরই উভয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবে; কারণ, এক-জনের চন্দ্র হইতে রবি প্রায় ১২০ অংশ ব্যবধান এবং শনি প্রায় ৯০ অংশ ব্যবধান। তবে রবির স্নেহদৃষ্টি ও শনির বৈরদৃষ্টি থাকায় ফলও শুভাশুভ উভয়ই হইবে। নিম্নের কয়েকটী উদাহরণ হইতে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রথম সাক্ষাতেই ভূদেব বাবু মধুসূদনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। নিম্নের গ্রহসংস্থানের তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে ভূদেব বাবুর বুধ মকর রাশির ১৫ অংশে এবং মধুসূদনের রবি মকর রাশির ১৫ অংশে অবস্থিত; ভূদেব বাবুর রবি মেষ রাশির ২ অংশে থাকিয়া মধুসূদনের ধনুরাশির ১ অংশে স্থিত শুক্রগ্রহের সহিত স্নেহদৃষ্টিতে সম্বদ্ধ। যাঁহারা ভূদেব বাবুর জীবনী-পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ের আকর্ষণের বিষয় সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

ভূদেব বাবু—	মধুসূদন—
চন্দ্র—মেষ ২ অংশ	শনি—মেষ—২৭ অংশ
শনি—বৃষ ২৫ „	বৃহঃ—মিথুন—১৩° „
বৃহঃ—সিংহ ২২ „	মঙ্গল—কন্যা—২১° „
মঙ্গল—তুলা ২২ „	চন্দ্র—বৃশ্চিক—১৩° „
নেপচুন—ধনু ২৩ „	শুক্র—ধনু— ১ „

য়ুরেনস্—মকর ২০„ নেপচুন „— ১৮ „
বুধ— „ ১৫„ য়ুরেনস্ „— ২৩ „
শুক্র— „ ২৭„ রবি মকর— ২৫ „
রবি— কুম্ভ ৪ „ বুধ „— ২৯ „

বিবেকানন্দ ও পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরস্পরকে এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে আবদ্ধ করিয়াছিল। বিবেকানন্দের রবি পরমহংসদেবের শুক্রের সহিত স্নেহদৃষ্টিযুক্ত ছিল এবং পরমহংসদেবের রবি বিবেকানন্দের বৃহস্পতির সহিত স্নেহদৃষ্টিযুক্ত ছিল।

এইরূপ যত ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও তাহার শুভাশুভ ফলের আলোচনা করা যাইবে তাহাতেই উক্ত নিয়মের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। যখন উক্ত নিয়মগুলি সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে তখন অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

বিবাহ-ব্যাপারেও মনের মিল না হইলে সাংসারিক জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। বিবাহ সাংসারিক জীবনের একটী প্রধান ঘটনা;—ইহারই উপর সংসারের সুখ-দুঃখ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই যখন মিলন,—তখন কুমার-কুমারীর জন্মসময়ে গ্রহাদির অবস্থান প্রভৃতির বিচার করিয়া উভয়ের মিলন হইবার কতদূর সম্ভাবনা তাহা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া দেখা উচিত। কি হইলে পতি-পত্নীর অন্তরে-বাহিরে পূর্ণভাবে মিলন হইবে, সম্বন্ধ-নির্ণয়ফলে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র জীব কেমন করিয়া একই জীবরূপ ধারণ করিবে; বাহিরে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও, কেমন করিয়া উভয়ে মিলিয়া অন্তরে অন্তরে এক হইয়া যাইবে, সম্বন্ধ-নির্ণয়ে এই সকলের সুগম পন্থা বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যঋষিদিগের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই জন্যই সম্বন্ধ-নির্ণয় বিবাহ-ব্যাপারে একটী গুরুতর বিষয়। এই সম্বন্ধ বিচার অনেক সময় স্থির হয় না বলিয়া বিশেষভাবে মিলন ব্যাপারে গ্রহসম্বন্ধ বিচার হয় না বলিয়া অনেক স্থলে বিবাহ ব্যর্থ হইয়া যায়—বিবাহের যে মূল উদ্দেশ্য, বিবাহ হইলেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

বিবাহের মিলন সম্বন্ধে অন্যান্য আরও কয়েকটী নিয়ম আছে, কিন্তু এ প্রবন্ধে সে-সব কথার আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে। সে সহজ নিয়ম কয়টী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসাধারণে প্রযুজ্য এবং সহজেই তাহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। প্রণয়ের ও মিলনের বৈচিত্র্য কিরূপে গ্রহসংস্থান হইতে সহজে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে তাহা ফ্রান্সের প্রসিদ্ধা লেখিকা জর্জ্জ স্যাণ্ডের জীবনীর একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

জর্জ্জ স্যাণ্ডের প্রণয়-কাহিনী অতীব বিচিত্র। বিশেষতঃ তাঁহার শেষ প্রেমিকের পরিচয় অতীব কৌতূহলপ্রদ। কবি বলিয়াছেন যে চোখে না দেখিয়া কেবল বাঁশী শুনিয়াই লোক মজিয়াছে কিন্তু কেবল কাশি শুনিয়া মজিতে কখন শুনিয়াছ কি? ফ্রেডরিক চপিন নামক একজন গায়ক স্যাণ্ডের বাটীর নিকট বাস করিতেন। একদিন স্যাণ্ডের পিয়ানো বেসুরো হওয়ায়, চপিনকে ডাকিয়া তিনি পিয়ানো ঠিক সুরে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। জর্জ্জ স্যাণ্ড লিখিয়াছেন,—"আমি চপিনের কাশি শুনিয়া চপিনের প্রেমে পড়িয়াছিলাম। এমন সুন্দর কাশিতে আর কে পারে না। চপিনের আর কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই। সৌন্দর্য্যের মধ্যে আছে তাহার কেবল ঐ কাশি। ইহার পূর্ব্বে দুই বৎসর হইতে আমি চপিনকে চিনিতাম; কিন্তু তাহার প্রেমে পড়ি নাই। আজ তাহার কাশি শুনিয়া তাহার প্রেমে পড়িলাম।" চপিন পিয়ানো বাজাইতেছেন, আর জর্জ্জ স্যাণ্ড প্রেমভরে তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। চপিন যেন পিয়ানো হইতে মুখ তুলিয়া জর্জ্জ স্যাণ্ডের দিকে চাহিলেন, অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইয়া গেল। স্যাণ্ড আর থাকিতে পারিলেন না, একেবারে ছুটিয়া গিয়া চপিনকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। চপিনও তাহার প্রতিদান দিলেন। উভয়ের মিলন হইয়া গেল। তাহার পর হইতে উভয়ে স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

নিম্নে স্যাণ্ড ও চপিনের জন্ম-দিবসের গ্রহ-সংস্থান প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, কেন ইহাদের মধ্যে এরূপ বিচিত্র আকর্ষণের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলও কিরূপ হইয়াছিল।

জর্জ্জ স্যাণ্ডের জন্মদিনের গ্রহসংস্থান—	চপিনের জন্মদিনের গ্রহসংস্থান—
রবি—কর্কট ১০ অংশ	রবি—মীন ৩ অংশ
চন্দ্র—মেষ ২৭ ”	চন্দ্র—তুলা ১১ ”
বুধ—মিথুন ১৮ ”	বুধ—কুম্ভ ২১ ”
শুক্র—সিংহ ১৭ ”	শুক্র—” ২৮ ”
মঙ্গল—বৃষ ২৩ ”	মঙ্গল—মেষ ২ “
বৃহঃ—তুলা ২৬ ”	বৃহঃ—” ২৩ ”
শনি—কন্যা ২৮ ”	শনি—ধনু ১৪ ”
য়ুরেনস—তুলা ১২ ”	য়ুরেনস—বৃশ্চিক ১৪ ”
নেপচুন—বৃশ্চিক ২৩ ”	নেপচুন—ধনু ৯ ”

[illegible]ইতে দেখা যাইবে [illegible]নের চন্দ্রের সহিত [illegible]নসের সহিত মিত্র-দৃষ্টিযু[illegible]র চপিনের বৃহস্পতির সহিত সং[illegible] শুক্রের সহিত শুভদৃষ্টি-যুক্ত। আবার চাপনের সূর্য্য স্যাণ্ডের শনির ১৮০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত অর্থাৎ বৈর-দৃষ্টিযুক্ত এবং চন্দ্র স্যাণ্ডের য়ুরেনসের সহিত একত্র অবস্থিত। এই সমস্ত দৃষ্টি ও যোগ হইতে দেখা যায় যে, উভয়ের পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। স্যাণ্ডের চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত চপিনের গ্রহগণ অধিক স্নেহ বা মিত্রদৃষ্টিযুক্ত, সুতরাং স্যাণ্ডেরই প্রীতিভাব অধিক প্রবল ছিল। কিন্তু চপিনের চন্দ্র ও সূর্য্য সমস্তই স্যাণ্ডের গ্রহগণ কর্ত্তৃক পীড়িত বা বৈরদৃষ্টিযুক্ত। এরূপ স্থলে চপিন কেবল স্যাণ্ডের আকর্ষণ-বশে বশীভূত হইয়াছিলেন। ফলে বহুদিবস একত্র মনের মিল থাকিতে পারিল না। ফলেও তাই ঘটিয়াছিল। ইহাঁদের মিলনের আট বৎসরের মধ্যে স্যাণ্ডের একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়। ইহার পরই চপিন পীড়িত হইয়া পড়িলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হইল। একদিন চপিন সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং সেই বিচ্ছেদেই তাঁহাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটে।

যতদূর সম্ভব মিলন-বিষয়ে গ্রহদিগের মানবজীবনের উপর প্রভাব সহজ ভাবে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং আশা করা যায় ইহার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আরও অনেক গোপন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।

শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

গল্প)

নেশার ঝোঁক কা[illegible] যখন দেখিল, ব্যাপারটা বহুদূর [illegible] গিয়াছে, খেলা তার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন সে মালতীকে ডাকিয়া কহিল, "মালতী, এই পাঁচশ টাকা নে—আরো চাস্ ত দিচ্চি,আমায় বাঁচা! কাশী-টাশী যেখানে হয়, চলে যা!"

মালতী গরীব নিরাশ্রয়, বিধবা দাসী বৈ ত নয়! অর্থের লোভে জ্ঞানাঙ্কুরকে সে আজ রেহাই দিবে নাই-বা কেন! এই ভাবিয়াই জ্ঞানাঙ্কুর কথাটা বলিল। কিন্তু সে কথা শুনিয়া মালতীর চোখদুটো যেন জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল, "কেন, পৃথিবী থেকেই চলে যাই না?"

জ্ঞানাঙ্কুর শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "না না, তা করিস্‌নে—অন্ততঃ এখানে নয়··· আমার হাতে দড়ি দিস্‌নে·· আরো কিছু চাস্ ত বল্?"

মালতীর দুইখানা শুষ্ক ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "না, না, ভয় নেই···আপনার কলঙ্কও পেতে হবে না, আর আপনার হাতে দড়িও দেওয়াব না! কিছু কর্ত্তে হয়, আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে করব!"

"আত্মহত্যা নাই-ই করলি।"

"কেন, সে তো আপনার পক্ষে ভালই, একেবারে সব মুছে যেত!"

জ্ঞানাঙ্কুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মালতী হাসিল। জ্ঞানাঙ্কুর জিজ্ঞাসা করিল, "হাসলি যে?"

"আপনার দীর্ঘনিশ্বাস পড়া দেখে।"

খানিকক্ষণ নীরব রহিয়া জ্ঞানাঙ্কুর বলিল, "আর কিছু টাকা দেব?"

"না, এতেই হবে। আর দরকার নেই।"

পরদিন মালতী তাহার কাপড়-চোপড় লইয়া কখন্ যে চলিয়া গেল, কেহ তাহার সন্ধানও পাইল না। তিনমাসের মাহিনা ফেলিয়া হঠাৎ না বলিয়া চলিয়া যাইবার কারণ কি ভাবিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। তখন বাড়ীর কোন মূল্যবান জিনিস-পত্র খোয়া গিয়াছে কি না তাহার খোঁজ পড়িল। কর্ত্তা তাঁর ক্যাশ্‌বাক্স খুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওগো, সর্ব্বনাশ করে গেছে! কাল পাঁচশ' টাকার একতাড়া নোট বের করেছিলুম—তা নেই!"

জ্যোৎস্না একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তার অত সাহস হবে! সে তোমার বাক্স খুলবে?"

জ্ঞানাঙ্কুর বিরক্ত হইয়া বলিল—"তবে গেল কোথায়···? তারই কর্ম্ম!"

তখন আরো কি চুরি গিয়াছে তার খোঁজ করিতে করিতে দেখা গেল...ঝির ঘরে একতাড়া নোট এককোণে লুকানো রহিয়াছে।

জ্ঞানাঙ্কুর পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "মাগী হয় শেষে ভয় পেয়ে ফেলে গেছে, নয় তাড়াতাড়িতে ভুলে গেছে!"

জ্যোৎস্না বলিল, "ভোলেনি, ভয় পেয়েই ফেলে রেখে গেছে, আর তাই পালিয়েওছে! হায় দিখিন—কি দুর্ম্মতি...এদিকে কখনো একটা পয়সাও ছোঁয়নি—শেষে কি কুক্ষণে এই মতি হল তার?"

জ্ঞানাঙ্কুর বলিল, "লোক চেনা ভার!"

২

পাচিকা একদিন জ্যোৎস্নাকে বলিল, "বাই বল মা, মালতী টাকা চুরি করার ভয়ে পালায়নি..."

জ্যোৎস্না আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তা নয়ত আর কি-জন্যে পালাবে?"

তখন পাচিকা নানান যুক্তি-তর্কে জ্যোৎস্নাকে বুঝাইল যে, ইদানীং মালতীর লোভন হইয়াছিল, তাই সে নিজের কলঙ্ক ঢাকিতে চাকরি ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছে।

জ্যোৎস্না বলিল, "সে কেমন করে হবে? সে তো একদণ্ড বাড়ীর বার হত না!"

পাচিকা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই মা, বাবুর কাণে যেন এ কথা না ওঠে!"

হঠাৎ জ্যোৎস্নার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পাচিকাকে বলিল, "তোমার সমস্ত মাইনে চুকিয়ে দিচ্চি, তুমি কাল চলে যেয়ো!"

"আমার কি অপরাধ হল মা?···আমি তো বাবুর নামে কিছু বলিনি আর তা বলতেও যা—"

জ্যোৎস্না ধমক দিয়া উঠিল—"চুপ কর বামুন-ঠাকরুণ! আমি কাল তোমার যাবার কথা বলছিলুম, তা নয়—তুমি আজই—এখনি চলে যাও।"

জ্যোৎস্না মাহিনার টাকা আনিতে উঠিয়া গেল।

পাচিকাকে হঠাৎ বরখাস্ত করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোৎস্না স্বামীকে কহিল,

"ও মাগীর বড় আস্পর্দ্ধা, তাই দূর করে দিয়েচি!"

"কি করেছিল—?"

"তা সে তোমার শুনে কাজ নেই, আর আমিও তা বল্‌তে পারব না।"

"এমন কি কথা...যে, আমাকেও বলতে পারবে না?"

"বলবার হলে আর তোমায় বলতুম না? তোমার পায়ে পড়ি, আর বেশী জেদ্ করো না!"

অগত্যা জ্ঞানাঙ্কুর নিরস্ত হইল। এদিকে পাচিকা যাইবার সময় পাড়ায় রাষ্ট্র করিয়া গেল যে, সে সত্য কথা বলায় গিন্নীমা তাহাকে কাজে জবাব দিয়াছেন। ফলে মালতীর কথা লইয়া পাড়ার মেয়ে-মহলে বেশ আন্দোলন হইতে লাগিল। কাহারো কাহারো সত্যানুরক্তি এতটা উগ্র হইয়া উঠিল যে, জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করা হইয়া গেল—"হ্যাঁ ভাই, সত্যি?"

"কি সত্যি?"

"এই মালতী আর—"

"সেই বামনী মাগী বুঝি বলে বেড়িয়েছে?"

"তা নয়ত আর আমরা তোমাদের ঘরের খপর জানতে যাব কেমন করে?"

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

"তা তোমরাও তাই বিশ্বাস করলে না কি ?"

দো-টানা সুরে উত্তর হইল—"এ্যাঁ... বিশ্বাস···? তা নয়, তবে কি জানো ভাই—কথাটা বড্ড খারাপ !"

ম্লান হাসি হাসিয়া জ্যোৎস্না বলিল, "তার আর কি করব···সেই জন্যেই ত দূর করে দিয়েচি !"

সকলে চলিয়া গেলে জ্যোৎস্নার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীকে সব কথা জানায়, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—মাগো, ছি ! কি ভাববেন !

সেই রাত্রে জ্যোৎস্নার মুখের ভাব দেখিয়া জ্ঞানাঙ্কুর জিজ্ঞাসা করিল, "মুখ অত শুক্‌নো কেন জ্যোৎস্না ?"

জ্যোৎস্নার চোখের পাতা সহসা চক্‌-চক্‌ করিয়া উঠিল, সে বলিল—"চল, আমরা এ পাড়া থেকে উঠে যাই—"

"হঠাৎ ! কেন ?"

"এমন পাড়ায় আবার মানুষ বাড়ী করে...রাতদিন পরের নামে মিথ্যে কুৎসা নিয়ে থাকে যে পাড়ার লোকেরা—"

"কে কার কুৎসা করলে—শুনি ?"

"তা আমি বল্‌তে পারব না !"

"কার ?...আমার ?"

জ্যোৎস্না সজল চক্ষে স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

"তা করুক্‌ গে ! তুমি কি বিশ্বাস কর ?"

জ্ঞানাঙ্কুরের কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল।

স্বামীর বুক হইতে অশ্রুলিপ্ত মুখখানি তুলিয়া জ্যোৎস্না বলিল, "বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু শুন্‌লে কষ্ট হয় না ?"

"বিশ্বাস কর না ত কষ্ট হবে কেন ?"

"কিন্তু আমি ত সত্যই বিশ্বাস করি না, তবে কষ্ট হয় কেন ?"

"তবে বিশ্বাস কর, বোধ হয় !"

"না—না, আমি বিশ্বাস করি না—সত্যিই বল্‌ছি !"

জ্ঞানাঙ্কুর আর কিছু বলিল না। জ্যোৎস্না নিজের মনে মনে বলিল—সত্যিই ত, আমি বিশ্বাস করি না, তবে কেন কষ্ট হয় ? তবে কি—

বাকীটা ভাবিতেই জ্যোৎস্নার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল !

৩

মালতী নদীয়ার মাতৃমন্দিরের সংবাদ যে কেমন করিয়া পাইল, তাহা জানিয়া বা জানাইয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। ক্ষণিকের ভুলে নারীর ললাটে যখন চিরদিনের কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখন এই মাতৃমন্দিরের আশ্রয়ে আসিলে সে তাহার সেই কলঙ্ক-রেখা মুছিয়া নারীকে তাহার ভুলভ্রান্তি বুঝাইয়া, আবার নূতন জীবন-পথে চলিবার অবকাশ করিয়া দেয়। অভাগী মায়েদের বুকের ধনগুলিকে মাতৃমন্দির নিজের বুকে তুলিয়া লয়। ক্ষুব্ধ তপ্ত মাতৃহৃদয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর ছয়মাস-কালমাত্র স্নেহের ক্ষুধা মিটাইবার অবসর পায়, তারপর স্নেহের পুত্তলিকে মাতৃ মন্দিরের বক্ষে বিসর্জ্জন দিয়া, হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে তপ্ত বেদনার মৌন জ্বালা

লইয়া অভাগীকে সংসারের হাসি-খেলায় আবার যোগ দিতে হয় !

দেখিতে দেখিতে মালতীর সেই ছয়মাস ফুরাইয়া আসিল। কাল তার বিদায়ের দিন। মালতীর মনে হইতে লাগিল, আজিকার সূর্য্য যেন বড় শীঘ্র অস্তাচলের পারে ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল—সম্মুখে রাত্রিটুকু মাত্র সম্বল। এই রাত্রিটুকুকে যদি আজ মালতী বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া রাখিতে পারিত ! এই রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনে যে আঁধার-ভার চাপিয়া আসিবে, তাহা কি সমাজের লাঞ্ছনার চেয়ে কম ভীষণ ? হৃদয়ের পরতে পরতে রুদ্ধবাক্‌ বেদনা লইয়া সমাজে একটু ঠাঁই পাওয়ার চেয়ে, বুকের ধন বুকে লইয়া সমাজ হইতে বহুদূরে একপাশে পড়িয়া থাকা কি ভালো নয় ? হৃদয়কে বুভুক্ষু রাখিয়া কাজ কি আমার সম্ভ্রমের সজ্জায় ?

মালতী অধ্যক্ষকে জানাইল—সে তাহার সন্তান সঙ্গে লইয়া যাইতে চায়।

আতঙ্কিকা মালতীর মুখে এই আবেদন শুনিয়া অধ্যক্ষ আশ্চর্য্য হইয়া খানিকক্ষণ মালতীর পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমাদের এখানে এলে কেন ?"

মালতী হেঁটমুখে বলিল, "তখন বুঝতে পারিনি যে ছেলে—"

অধ্যক্ষ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমরা আটকে রাখব ? না, না, তা আমরা আটকাব না। তবে কি না, কথা হচ্চে একে সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমাকে সমাজের কাছে অনেক লাঞ্ছনা-অপমান সইতে হবে।"

মালতী নতদৃষ্টিতে নিজের হাতের নখ পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল—"তা বরং সইব !"

"একে লালন-পালন করবে কি করে ?"

মালতী এবার একটু মৃদু হাসিল। অধ্যক্ষ বুঝিলেন, বড় বেকুবের মত প্রশ্নটা করিয়াছেন। তিনি নিজেকে সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বলিলেন—"না, না, আমি বল্‌চি, তোমার চলবে কি করে ?"

"খেটে খুটে চালাব।"

"যদি সমাজে কেউ তোমার জল স্পর্শ না করে ?"

"সমাজ আমার জলস্পর্শ না করতে পারে, কিন্তু সমাজের আবর্জ্জনা স্পর্শ করবার অধিকারও কি আমার থাকবে না ? আমি না হয় মেথরের কাজ করব !"

"পারবে তা ?"

"এই ছেলের জন্যে আমি এখন সব পারি···" সন্তান-স্নেহে মালতীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় হইয়া উঠিল !

৪

বছর পাঁচ-ছয়কার পরের কথা। জ্যোৎস্না বিধবা হইয়া বিয়োগ-বিধুর অবস্থায় ভারতের তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। দেশে বিপুল সম্পত্তি—পরে খাইতেছে। আক্ষেপ নাই। জ্যোৎস্না চায় শান্তি। স্বামীর স্মৃতি জাগাইয়া রাখার মত একটা-কিছু—না হোক্‌ ছেলে··মেয়েও যদি থাকিত ! হৃদয়ের ক্ষুধা ঐশ্বর্য্যের

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ভোগে নিবৃত্ত হয় না! তার পিপাসাও তীর্থের সলিলে মিটে না!

হৃদয়ে এইরূপ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা আর মরুভূমির তৃষ্ণা লইয়া জ্যোৎস্না একদিন পুরীর পথে দেবদর্শনে যাইতেছিল। হঠাৎ রাস্তার চৌমাথায় কাতরকণ্ঠে শিশুর করুণ প্রার্থনা ধ্বনিয়া উঠিল,—একটি পয়সা মা। জ্যোৎস্নার উৎকর্ণ হৃদয় ক্ষণকালের জন্য মুহূর্ত্তে অকারণ পুলকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন কোন হারানো ছেলে তার মায়ের দেখা পাইয়া ব্যাকুল আগ্রহে ডাকিতেছে।

জ্যোৎস্না চকিত হইয়া শিশুর পানে চাহিতেই বিস্ময়ে পুলকে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। জ্যোৎস্নার দাদা বলিল, "কিরে, দাঁড়িয়ে কি দেখচিস্?"

"দাদা, ঐ ছেলেটিকে দেখচ?"

জ্যোৎস্নার দাদা এতক্ষণ সেদিকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করে নাই, ভগ্নীর কথায় শিশুর পানে চাহিয়া ভগ্নীর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "সত্যি—ভারি আশ্চর্য্য তো!—ওরে ছেলে, শোন্ তো এদিকে!"

শিশুর বয়স বছর পাঁচ-ছয় হইবে। পরণের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে একাংশে ভিক্ষার চাল আধসের আন্দাজ। মাথায় কোঁকড়া চুল আঙুরের গুচ্ছের মত মুখের সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—যেন শিশুর বেদনা-ভরা কাণের কাছে সান্ত্বনা দিতে যাইতেছে। চোখ দুটি টানা টানা কিন্তু বড় ম্লান। দারিদ্র্য তাহার কচি মুখ হইতে শিশুর সহজ সরস ভাবটুকুর অনেকখানি কাড়িয়া লইয়াছে। বোধ হয়, এখনও তার আহার হয় নাই—মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে।

শিশু নিকটে আসিলে জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, বাবা?"

এই স্নেহ-সম্ভাষণে শিশুর চোখের পাতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "বোঝা!"

বিস্মিত কৌতুকে ভ্রাতাভগ্নী পরস্পরের দিকে একবার তাকাইল। জ্যোৎস্নার দাদা জিজ্ঞাসা করিল, "এ নাম কে দিলে?"

শিশু একবার দুইজনের মুখের পানে তাকাইয়া মাটির দিকে মাথা নীচু করিয়া বলিল, "মা—মার অসুখ করেছে।" শিশুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল।

জ্যোৎস্না বলিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

শিশু উত্তর করিল, "ঐ—ঐ দিকে।"

জ্যোৎস্না ভাইকে বলিল, "চল না দাদা, যাই।"

"যাবি—বলচিস, কিন্তু—"

"হ্যাঁ দাদা—চল—!"

শিশুর পানে চাহিয়া জ্যোৎস্নার দাদা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর কে আছে?"

শিশু প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "আর? আর? আর পাণ্ডাঠাকুর আছেন, আই আছেন, নীলমণি আছে, শ্রীহরি আছে। পাণ্ডাঠাকুরের মা মহামায়া আছে—"

জ্যোৎস্নার দাদা বাধা দিয়া বলিল, "তারা তোমাদের কে হয়?"

বালক ক্ষণকাল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "না, তাঁরা গোয়ালে থাকতে দেছেন— কেউ হয় না!"

জ্যোৎস্না বলিল, "চল বোঝা, তোমার মাকে আমরা দেখে আসি!"

বোঝা এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাহাদের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার মাকে দেখিতে যাইবে,—কেন? কই, কেউ ত এমন কথা কখনো বলে নাই! পাণ্ডাঠাকুরও তো একদিনও গোয়াল-ঘরে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই—তার মা কেমন আছে? তার মাকে যে অপরে আবার দেখিতে চাহিবার প্রস্তাব করিবে, ইহা তাহার ভারি আশ্চর্য্য অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। শেষে তার কেমন একটা ভয় হইল। ভয়ে মুখ শুকাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গো, তোমরা দেখতে যাবে?"

জ্যোৎস্না বলিল, "তোমার মার অসুখ সেরেচে না—তাই দেখতে যাব।"

জ্যোৎস্নার মুখের ভাবে বোঝার মন হইতে অনেকখানি ভয় দূর হইল। সে বলিল, "তোমরা আমার মাকে সারিয়ে দেবে?"

জ্যোৎস্নার দাদা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মার কি হয়েচে?

"অসুখ—অনেক দিন থেকে—একদিনও সারে না, উঠ্‌তে পারে না—কেবল কাশে, জ্বর—"

জ্যোৎস্নার দাদা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগ্নীর পানে তাকাইল।

জ্যোৎস্না বলিল, "ও রোগ কি একেবারেই—"

"হ্যাঁ, কখনো কখনো সেরেও যায়।"

বোঝা হঠাৎ জ্যোৎস্নার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ডাক্তার বাবু?"

জ্যোৎস্না বলিল, "হ্যাঁ—ইনি ডাক্তার বাবু, তোমার মাকে সারিয়ে দেবেন।"

বোঝা এখন বড় খুসি হইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। খানিকটা পথ গিয়া বোঝা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মা খাবে কি—ভিক্ষে তো বেশী হয়নি!"

জ্যোৎস্না বলিল, "আমাদের কাছে সব আছে, দেব এখন।"

বোঝার আজ কেমন সব ভাবনা কাটিয়া গেল—তার মা সারিয়া উঠিবে।

সে গোয়াল-ঘরের কাছে আসিতে না আসিতে আহ্লাদে আটখানা হইয়া ডাকিল, "মা—মা, ডাক্তার বাবু এসেছেন, আর কে এসেছেন, দেখ। এবার তোমার অসুখ সেরে যাবে। একটু বেরিয়ে আসতে পারবে মা?"

জ্যোৎস্না বোঝার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেরিয়ে এসে কাজ কি? আমরাই যাচ্ছি। উঃ, কি অন্ধকার! দাদা তোমার পকেটে বাতি ছিল না?" জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বরে বোঝার মা চমকিয়া উঠিল...তাহার বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুততালে নাচিতে লাগিল। বাতি লইয়া জ্যোৎস্নার গোয়ালে ঢুকিয়া দেখিল, রোগিণী ছিন্নশয্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে! আর তাহার কপালে বিন্ বিন্ করিয়া ঘাম হইতেছে।

জ্যোৎস্নার দাদা রোগিণীকে দেখিয়া বলিল, "আছে ত?"

দেখিয়া শুনিয়া দাদা বলিলেন, "আছে—তবে বড় খারাপ দেখ্‌চি।"

* * * *

অনেক কষ্টে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। জ্যোৎস্না

রোগিণীর পানে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিল,—জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় চিনতে পার?" রোগিণী জ্যোৎস্নার নিরাভরণ বেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া অতিকষ্টে বলিল, "মা তোমার এই দশা হয়েছে?" তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল। সে আবার চক্ষু মুদিল।

জ্যোৎস্না দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "একে আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া যায় না দাদা?"

দাদা বলিলেন, "এখন ত নয়।"

দাদা বাহিরে সরিয়া গেলেন।

জ্যোৎস্না তখন পাগলের মত হইয়া রোগিণীর শীর্ণ হাতখানা ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "মালতী একটা কথার জবাব দিবি, বোন? বল, তোর বোঝার উপর আমারও একটুও অধিকার আছে কি? তোর পক্ষে বোঝা হতে পারে—ও, কিন্তু আমার কাছে আজ যে ওর দাম নেই—অমূল্য ও।"

মালতী তাহার দুই শীর্ণ হাতে জ্যোৎস্নার হাতখানা ধরিয়া নিজের কপালে ঠেকাইল; তারপর তার দুই চক্ষু দুইটী ক্ষীণ ধারা ঢালিয়া ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল।

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

মৃত্যু-বিভীষিকা

মৃত্যুরে কভু চোখোচোখি দেখিয়াছ
চমকি' সভয়ে সহসা কাঁধের কাছে?
দুইটি আঙুলে পরশি' তোমার দেহ
দুটি কথা বলি'—শোননি সে আর কেহ—
কি যেন সে ভাষা, অর্থ কিছু না আছে,
ধ্বনি নয় যেন প্রতিধ্বনির মত,
নিমেষের মাঝে করিয়া মূর্চ্ছাহত,—
আঁখি না মেলিতে আঁধারে সে মিশিয়াছে?
অথবা যেন সে পথের প্রান্তে আসি',
এতখন চলি' অচেনা সাথীর প্রায়,
সহসা আপন পরিচয় পরকাশি'
চেয়েছে কভু কি উপহাসি' ইসারায়?
চতুর চাহনি কুটিল হাসিতে ভরা,
যেন সে তোমারি কুশল প্রশ্ন-করা,
ভীষণ নীরবে বারেক বাঁকায়ে গ্রীবা
সমুখে ঝুঁকিয়া চোখ দিয়ে চোখ ধরা—
জিজ্ঞাসে যেন—মধুর ভঙ্গী কিনা!—
'চিনিলে না মোরে, কেমনে ভুলিয়া আছ!'
মৃত্যুরে হেন মুখোমুখি দেখিয়াছ?

কবির কাব্যে 'বঁধু' বলে' তারে ডাকা,
ধর্ম্মের নামে পরিচয় করে থাকা—
সে কথা বলি না, দেখেছ কভু কি তারে
বাহির-দুয়ারে সম্মুখে একেবারে?
রক্তনয়ন, বিকটবদন, হাসিতে রক্ত ঝরে,
নিশ্বাসে বাক্ হরে!
কণ্ঠে রজ্জু, জিহ্বা বিগলিত, ভীষণ দশনমালা,
শ্মশানের ধূম, চিতা-বহ্নির জ্বালা—

এ সব দেখেছ, আহ্বান শুনেছ?
ডেকেছে কি নাম ধরে'
সুখ-স্বজনীর ভোরে?
আঁধারে তাহার দীপ্ত নয়ন বাঁকায়ে
দেখেছে তোরে?

জীবনের আশা কিছু পূরে নাই,
মেটে নি প্রাণের কোনো কামনাই,
স্বজন-সখারা দূরে,
নির্ব্বান্ধব পুরে
হঠাৎ ধরিয়া কেশেতে তোমার
টানিয়াছে বার বার?
জীবন-চক্র হয় নাই ঘোরা,
খোলা হয় নাই একটিও ডোরা
মায়ার মদিরা-মোহে,
অতি চঞ্চল ছুটিতেছে স্রোত হৃদয়-ধমনী-লোহে;
আদি ও অন্ত কিছু নাহি বুঝি,
চলিয়াছি পথে অতি সোজাসুজি,
শ্যেনসম হেন কালে,
পাখা-ঝটপট রক্ত-নখরে
তুলে' নিয়ে যাবে আপন বিবরে,
আঁধার গহ্বরে তার;
আমি জেগে রব, সকল চেতনা
রহিবে, সহিব সকল বেদনা,
এত ভালবাসা, এত চেনা-শোনা,
সকলি স্বপনসার!

ঘাতকের অসি ঝল্‌সিছে দিনরাতি,
আঁধার কারায় কঠিন শয়ন পাতি'
মরণের সাথে সন্ধি করিতে চায়,
গণিতেছে দিন ভীষণ প্রতীক্ষায়—
বন্দীজনের জীবন-শেষের মত
মরণ-লগ্ন নিকট হইছে যত,
জীবন-চেতনা ততই বাড়িছে হায়!

অথবা যক্ষ্মা-রোগীর মতন
যেজন পেয়েছে মরণ-নিমন্ত্রণ,
বিষকটু সেই মরণ-পাত্র
লয়ে বসে' আছে দিবস-রাত্র,
সারাপ্রাণ শিহরায়,
চুমকিতে চমকায়!
দর-দর-ধারা নয়নের জল
মিশিছে তাহাতে শুধু অবিরল
নিদারুণ বেদনায়!
জীবনের আলো কত মধুময়
নিবিবে এখনি নাহি সংশয়,—
পাণ্ডুর মুখ, শুষ্ক অধর,
দিন দিন ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর,
মৃদু উত্তাপে তনু জর-জর
নিশ্বাসে ব্যথা লাগে;
আকুল নয়নে সবারে সে চায়,
এতলোক সব হাসিয়া বেড়ায়,
কাতর কণ্ঠে সব দেবতায়
জীবন-ভিক্ষা মাগে।
নাহি কোনো পথ, নাহিক উপায়,
মরণ টানিছে ধরিয়া দু'পায়,
জীবন তাহারে করেছে বিদায়
বহু বহু দিন আগে।
ক্রমে দেহ হয় অস্থি'র মালা,
স্ফীত নাসিকায় অগ্নির জ্বালা,
ওষ্ঠ কালিমাময়!
ললাটে শিশির ঘর্ম্ম-বিন্দু,
চক্ষুর জ্যোতিঃ প্রভাত-ইন্দু,
যেন পৃথিবীর নয়!

যেন সে ঢুকেছে সমাধি-গহ্বরে,
অতিদূর কোন পাতাল-বিবরে
স্তব্ধ বিজনালয়!
সেথা হ'তে দুই গবাক্ষ খুলে',
চাহিয়া দেখিছে গেছে কিনা ভুলে'
মানবের মেলা মানবের খেলা,
—কি যেন সে বিস্ময়!

দেখেছ কি হেন মৃত্যুর বিভীষিকা
ক্ষণেক টুটিয়া জীবনের মরীচিকা—
নিবিয়াছে দীপশিখা
হঠাৎ প্রমোদরাতে?
বল দেখি সে কি ভীষণ আঁধার!
রুদ্ধ নিশাসে সে কি হাহাকার!
আছে কি তাহার কোনো প্রতিকার—
আছে মানবের হাতে?

ধর্ম্মের ধ্বজা রেখে দাও দূরে,
মন্ত্রে তন্ত্রে প্রাণ নাহি পূরে,
আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে'
বুকে করি ল'ব সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব।
জীবনের শোক জীবনের দুখ
জীবনের আশা জীবনের সুখ
পরাণ আমার চির-উৎসুক
লইতে পাত্র ভরি';
উচ্ছল-ফেন-মদিরার মত
কাণায় কাণায় বুদ্বুদ শত
অধরে তুলিব ধরি'—
ধরণীর রস জীবনের রস যত।

শিরা-উপশিরা স্নায়ুতে স্নায়ুতে,
কীচকরন্ধ্র যেমন বায়ুতে—
ভরিয়া লইব জগতের শ্বাস
সুখ-দুঃখের বিলাস-বাঁশরী-তানে,
সুর দিব আমি হাস্য-অশ্রু-গানে,
ফুটাব ঝরাব ফুল-পল্লব বারমাস।
নিশীথ-আকাশে তারকার রাজি
ভরি' দিবে মোর স্বপনের সাজি
নীরব আঁধার রাতে;
ঈশানের কোণে মেঘ হবে জমা,
ধরণী হইবে অতি মনোরমা,
দিগঙ্গনারা পিঙ্গল হাসে,
শাখা তুলি' তরু নাচে উল্লাসে
বজ্র-বঞ্ঝাবাতে,
তাণ্ডবে মাতি' জাগিব বিপদ-রাতে।

তার পর যবে কবে—
দুখে দুখ নাহি রবে,
সুখ সেও আর নাহিক ছলিবে,
জীবন-ক্লান্ত চরণ টলিবে,
বাহুযুগ ক্ষীণ হবে,
ঝিরি-ঝিরি নিশাবায়
ফুল যথা মূরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি
ধরণীতে মাথা রাখি';
আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোনো শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো
সুন্দর পরলোক।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কলিকাতা।
শ্রেণী নং

ভারতবাসীর উপনিবেশ

ভারতের বাহিরে বর্ম্মা, চীন প্রভৃতি প্রদেশান্তর্গত উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের নামের সহিত উত্তর ভারতের প্রাচীন নামের ঐক্য আছে। এইরূপ ইহার দক্ষিণাঞ্চল ও মলয় উপদ্বীপের নামের সহিত দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন নামের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতান্তর্গত ও ভারত-বহির্ভূত স্থানের নামে এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে দুইদল অধিবাসী উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে ভারতের বাহিরে চীন প্রদেশ পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। একদল ভারতের উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া স্থল-পথে মণিপুর ও বর্ম্মার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল; ইহারা উত্তরাঞ্চলে টন্‌কিন্ উপসাগর ও চৈনিক সীমাপর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আর এক দল দক্ষিণদিক্ হইতে আসিয়া জলপথে সমুদ্র দিয়া ভারত বহিঃস্থ বর্ম্মা ও চীন প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল। মলয় উপদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ ও আসামের দক্ষিণাঞ্চল পর্য্যন্ত ইহাদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, উত্তর-ভারতের অনুগ্রহেই ভারতের বহিঃস্থিত প্রদেশের উত্তরাংশে সভ্যতার আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার দক্ষিণাঞ্চলের এবং মলয় উপদ্বীপ-পুঞ্জের প্রথম সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি করোমাণ্ডাল ও মালাবার উপকূল হইতে সমাগত ঔপনিবেশিকগণের সাহায্যেই সংসাধিত হইয়াছিল। এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া ভারত-বহিঃস্থিত এই সমস্ত প্রদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে বহু অপরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য অনায়াসেই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

উল্লিখিত প্রদেশের উত্তরাঞ্চলেরই কথা ধরা যাউক। ভারতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ যে খৃষ্ট-জন্মের তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে উপনিবেশ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। উত্তর বর্ম্মা (Upper Burma), শ্যাম, লাওস (Laos) যূনান, টন্‌কিন্ এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের অধিকাংশ স্থানে ইহাদের রাজ্যস্থাপনের ও রাজ্যকালের শিলালিপি, প্রশস্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই রাজগণ যে—উত্তর ভারতের শক্তিশালী ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা তাঁহাদের ক্ষোদিত লিপি হইতেই প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মপুত্র ও মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া টন্‌কিন্ উপসাগর পর্য্যন্ত এই সমস্ত ক্ষত্রিয় ধুরন্ধর-শাসিত ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। এই ক্ষত্রিয়বীরগণ রাজকীয় প্রশস্তি, লিপি প্রভৃতিতে সংস্কৃত বা পালি ভাষা ব্যবহার করিতেন; ভারতীয় স্থাপত্য রীত্যনুসারে মন্দির ও স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করিতেন; অভিষেক, বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করিতেন।

ভারত হইতে সমাগত রাজন্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এইরূপ রাজ্যের মধ্যে বর্ম্মার অন্তর্বর্ত্তী তগঙ্ রাজ্য, উত্তর পগান্ (Upper Pugan) প্রোম, সেনউই (Senwi Theinni)

রাজ্যের নাম করা যাইতে পারে। লাউ প্রদেশান্তর্গত রাজ্যের মধ্যে Muang Hang, C'hieng Rung, Mnang Khwan ও দশার্ণের (Luang P'hrah Bang) নাম উল্লেখযোগ্য। অগ্রনগর (Hanoi) ও চম্পা টন্ কিন্ ও আসামের অন্তর্গত রাজ্য চৈনিক ঐতিহাসিকগণ য়ুনান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মগধরাজ শ্রীধর্ম্মাশোকের পঞ্চম পুত্র শুক্ল * ধান্যরাজ-বংশীয় Jen-kwo খৃঃ পূঃ ১২২ অব্দে Tali হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী P'eh-ngai নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। ইনি অত্যল্পকাল পরে চীন সম্রাটের নিকট হইতে সমগ্র Tien (Yunan) প্রদেশ শাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (E. H. Parker, in Chinese Rocorder, Vol XXV P 104)

মহারাজবংশ নামক বর্ম্মার রাজবংশ-বিবরণে লিখিত আছে যে, শাক্যবংশীয় রাজা ধজরাজ (ধ্বজরাজ) অন্যূন ৫৫০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মণিপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরে তগঙ্ (Tagaung = প্রাচীন বা Upper Pagn) জয় করেন। †

বর্ম্মা-বাসীদিগের ইতিকথানুসারে শেনবোর দক্ষিণাঞ্চল হইতে কিয়দ্দূরে ইরাবতী নদীর তীরে তগঙ্ বা হস্তিনাপুর নামক প্রাচীন ক্ষত্রিয়-রাজ্য ৯২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ৫২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভূকাম [Old Pagan, Bhukam বা Bukam] ‡ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া তগঙ্ বা হস্তিনাপুর রাজ্যের সমস্ত গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। চীন ভূমির অন্তবর্ত্তী 'গন্ধার-রট্ঠ' অর্থাৎ য়ুনান নামক প্রাচ্য প্রদেশ হইতে সমাগত জাতির আক্রমণে তগঙ্ রাজ্য খৃষ্টপূর্ব্ব শতকের ৫৫০ অব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। § ভূকাম ও অরিমর্দ্দন-পুর এইরূপে পরে চীনরট্ঠবাসিগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তাহা না হইলে ৪৮৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে 'প্রোম' বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বর্ম্মার রাজধানী পরিবর্ত্তনের কোন কারণই দেখা যায় না। বর্ম্মাবাসীদিগের ইতিকথায় তগঙ্ বা হস্তিনাপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা নিতান্তই অতিরঞ্জিত, কেননা 'তগঙ্' ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হস্তিনা-পুর প্রতিষ্ঠার যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৮২ গুপ্তাব্দ (৩০০ খৃষ্টাব্দ) অঙ্কিত

* অধিকন্তু China Review (vol xx. p. 394) একটী প্রাচীনতম প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"the oldest Kaditions connect the Ai-Lao State of Yung Ch'ang with Meng Chia ch'wo, Son of Asoka"

অশোকপুত্রের এই নামটী Cantonese রীত্যনুসারে Mung ka ts'uk রূপে উচ্চারিত হয়। Parker সাহেব এই সমুদায় অক্ষর আলোচনা করিয়া বলেন যে, এই অক্ষরগুলি, মগধ শব্দ এবং Ai Lao বংশীয় রাজগণের ভারতীয় ব্যুৎপত্তি সূচিত করিয়া দিতেছে। (জেরিনির লিখিত টীকা হইতে এই অংশটী এবং অন্যান্য কয়েকটী মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছি।)

† শেনবো সম্বন্ধে চীনমহাকোষ "তু-শু-চি-চেঙ্ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন"। Herveys "Ma Tuan lin," part II, pp 230, 231 নোট দ্রষ্টব্য।

‡ ইহার প্রচীন নাম অরিমর্দ্দনপুর।

§ Burmese inscription of the Po U Daung pagoda, AD 1774.

আছে। তবে তাহাদিগের ইতিকথায় তগঙ্ সম্বন্ধীয় যে ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

যাহা হউক, উল্লিখিত ধ্বসাবশেষের মধ্যে নূতন হস্তিনাপুর-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রবংশাবতংস গোপালের বংশোদ্ভূত রাজা জয়পালের ১৮০ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৪২৬ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলা-লিপিতে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষে গঙ্গাতীরবর্ত্তী হস্তিনাপুরের গোপাল তাঁহার পূর্ব্বতন নিবাস-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে আগমন করেন। তিনি ব্রহ্মদেশের অর্দ্ধসভ্য অধিবাসীদিগের সহিত বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া ইরাবতী নদীর তীরে নূতন 'হস্তিনাপুর' প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিলালিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, হস্তিনাপুর 'ব্রহ্মদেশে' এরাবতী নদীরতীরে অবস্থিত। *

এই শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারতবর্ষের হস্তিনাপুরস্থ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় 'গোপাল' ৩০০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে নূতন 'হস্তিনাপুর' প্রতিষ্ঠিত করেন। এক্ষণে এই ব্রহ্মদেশ কোথায় তাহাই বিচার করিতে হইবে।

বাঙ্গালী লেখকদিগের হাতে বর্ম্মাদেশ ব্রহ্মদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ব্রহ্মদেশ ও বর্ম্মা যে একদেশ নয় তাহা প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত তগঙ্ প্রদেশ ও তৎপশ্চিমভাগ 'ব্রহ্মদেশ' নামে সমাখ্যাত হইত। সমগ্র বর্ম্মা রাজ্য বুঝাইতে কোনও সময়ে ব্রহ্মদেশ শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মদেশ ও চৈনিক বিবরণের পো-লো-মেন (Po-lo-men ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ) অভিন্ন। কারণ ৮০২ খৃষ্টাব্দের চৈনিক বিবরণেই লিখিত আছে যে, পিওউ (P'iau) বা নিম্ন বর্ম্মার সীমান্তে পো-লো-মেন বা ব্রহ্মদেশ অর্থাৎ তগঙ্ অবস্থিত।

পূর্ব্বে বর্ম্মার পশ্চিমে দুইটী পো-লো-মেন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। সেই দুইটীর একটীর নাম (১) ত-সিন পো-লো-মেন। এবং অপরটীর নাম (২) সি-আও পো-লো-মেন।

(১) চীন ভৌগোলিক কিয়তনের (Kia Ton) বিবরণ ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০৫ খৃঃ মধ্যে লিখিত হয়। ইহাতে লিখিত আছে যে, ত-সিন পো-লো মেন, মিনো নদী (মনকথে বা মণিপুর নদী) হইতে ১০০০ লি পশ্চিমে, এবং কামরূপ অর্থাৎ আসাম হইতে ৩০০ লি দূরে অবস্থিত। কামরূপ ও এই পো-লো-মেনের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণীর ব্যবধান। এই বিব-রণ অনুসারে শ্রীহট্ট ও পো-লো-মেন অভিন্ন হইতেছে। † সি আও পোলোমেন—চীনাভাষায় সি আও শব্দের অর্থ—ছোট। 'মন-শু'র (৮৬০ খৃঃ) ‡ মতানুসারে এই রাজ্যের মধ্যে মি-নো (অর্থাৎ মণিপুর নদী) নদী উৎপন্ন হইয়াছে।

* Upper Burma Gazetteer" parti vol II, p 193.

† Bulletin Ecole France, tom IV. p 371.

‡ Ecole France, tom IV, pp 171, 172, 180.

এইস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া এই নদী 'তু-মি-চিঅ-সু'তে আসিয়া পড়িয়া দুইটী শাখাদ্বারা ইহাকে বেষ্টন করিয়াছে। সুতরাং ভৌগোলিক সংস্থান বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, ইহা মণিপুরকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

এখন আমরা দেখিতেছি পো-লো-মেন বা ব্রহ্মদেশ বলিলে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তগঙ্, মণিপুর ও শ্রীহট্ট এই তিন দেশেই বুঝাইত। প্রত্যুতঃ 'ব্রহ্মদেশের' সীমা পূর্ব্বকালে পশ্চিমে তগঙ্ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে মণিপুর ও শ্রীহট্ট ব্রহ্মদেশের বিশেষ অংশরূপে আখ্যাত হইত। গোপাল ব্রহ্মদেশে আসিয়া যখন হস্তিনাপুর সংস্থাপন করেন তখন তিনি ইরাবতী নদীর উপর তাহা স্থাপিত করেন—।

তগঙ্—ইরাবতী নদীর উপর, অধিকন্তু এখানে যখন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যখন হস্তিনাপুর-প্রতিষ্ঠার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তখন তগঙ্ ও হস্তিনাপুর অভিন্ন বলা অসঙ্গত নহে।

Dr Fuhrer ও বহু যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। *

৩০০ খৃষ্টাব্দে এইখানেই গোপালে রাজপাট স্থাপিত হয়। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে রাজপাট যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ অরিমর্দ্দনপুরের ৬১০ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি। অতঃপর এই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতিগণ আসামে কপিলা নদীর তীরে রাজ্য স্থাপন করেন। তখনও রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর ছিল। এখনও ঐ স্থানের নাম হস্তিনাপুর। বর্ত্তমান ত্রিপুরা-রাজগণের প্রাচীন তাম্রশাসন, কাগজপত্র প্রভৃতিতে 'রাজধানী হস্তিনাপুর লিখিত দেখা যায়। ইহা হইতে স্থির করিতে পারা যায় যে, এই রাজবংশ ও চন্দ্রবংশীয় গোপালের বংশ অভিন্ন। গোপালের প্রতিষ্ঠিত হস্তিনাপুর নষ্ট হইয়া গেলেও তাঁহার বংশের রাজধানী বরাবর 'হস্তিনাপুর' আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু রাজমালার প্রাচীনতম প্রাপ্ত পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে জয়পাল নামক একজন ত্রিপুর-নরেশ ছিলেন। রাজমালা অনুসারে ইনি ত্রিপুর হইতে ৭ম নরপতি। এই জয়পাল ও ১০৮ গুপ্তাব্দের জয়পাল অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। †

রাজমালা মতে, এই জয়পালের পুত্রের নাম 'সোমাঙ্গ'। সোমাঙ্গ ও জৈনিক বিবরণের "ইউ আই" যে অভিন্ন তাহা আমরা অন্যত্র সপ্রমাণ করিয়াছি। সোমাঙ্গ রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হইয়া তগঙ্ বা হস্তিনাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসামের অন্তর্গত বর্ত্তমান নওগঙ্ জিলার মধ্যবর্ত্তী কপিলি নদীর তীরে হস্তিনাপুরে

* Dr Fuhrer's Archæological Reports for the year 1894.

† পরবর্ত্তী পুথিতে লিপিকরের হস্তে ইনি কৃষ্ণাঙ্গদ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহার পর হইতে "বিমারে," পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কতকগুলি নাম অধিকাংশ পুঁথিতেই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। Long সাহেব ও কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রমুখ লেখকগণ ঐগুলিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

রাজধানী স্থাপন করেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন ব্রহ্মদেশের সীমা মণিপুর ও শ্রীহট্ট রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিতে হইলে শ্রীহট্টের সীমায় আসিয়া পড়িতে হয়। এই স্থানই রাজমালার উল্লিখিত কপিলি নদীর তীর-সমন্বিত "ত্রিবেগ"। ইহাকেই চৈনিক লেখক "Ka-pi-li" রাজ্য নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ৪২৬ খৃষ্টাব্দে যখন জয়পাল তগঙে অবস্থান করিয়া শিলালিপি প্রচার করেন এবং ইহার দুই বৎসর পরে ৪২৮ খৃষ্টাব্দে যখন রাজা "সোমাঙ্গ" কপিলি রাজ্য হইতে চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন, তখন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের স্থিরীকরণ আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি :—

জয়পাল সম্ভবতঃ ৪২৬ হইতে ৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। কোন পুত্র তগঙেই বাস করিতে থাকেন। ৪২৬ হইতে ৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সোমাঙ্গ তগঙ্ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কপিলি রাজ্য বা ত্রিবেগ নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। ১০ কপিলি নদীর তীরে রাজধানী হস্তিনাপুর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; কেননা, ত্রৈপুর রাজ বিবরণে সকল সময়েই রাজধানী হস্তিনাপুরের উল্লেখ আছে। কালে হস্তিনাপুরের নাম লোকে বিস্মৃত হইলেও, পরবর্ত্তী সকল রাজার অনুশাসনাদিতে রাজধানী হস্তিনাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুর মহারাজ কল্যাণ-মাণিক্য ও গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসনে রাজধানী হস্তিনাপুর ক্ষোদিত আছে। বর্ত্তমান কালে ত্রিপুর-নরেশদিগের সনদ প্রভৃতিতেও রাজধানী হস্তিনাপুরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। পরে আলোচিত হইবে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

মার্জ্জনা

[উপন্যাস]

১

ডাক্তার স্যর্ রেবতীমোহন ধর এম-এ, এম-ডি, পি-এইচ-ডি, এফ আর এস, ইত্যাদিকে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কে না চেনে? মানুষের ভাগ্যে বিদ্যা-বুদ্ধি, যশ-মান, খ্যাতি-গৌরব, যা-কিছু সম্ভব কি তার নেই? গরীবের ঘরে জন্মে মানুষ জীবনে কত উঁচুতে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দিতে হলে বাংলা দেশের লোক আজ-কাল ডাক্তার ধরের কথাই বলে থাকে। পাঠশালার নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্র থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় কর্ত্তা পর্য্যন্ত যার খ্যাতি সুবিস্তৃত, আমিই যে সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ, এ কথা শুনলেই তোমাদের চোখগুলো যে বিস্ফারিত হয়ে

উঠবে, তা' আমি ভালো করেই জানি। তোমরা মনে করবে, এই যে আকাশ-বিহারী মহাপুরুষটি, সে কোন্ প্রয়োজনে আজ সামান্য নরলোকে নেমে এসে আত্ম-পরিচয় দিতে বসে গেছে! সেই কথাই বল্‌ব।

আত্ম-পরিচয় জিনিষটার ভিতর দেখি অনেকখানি অহঙ্কার থাকে; কিন্তু কোন্ দেশের কোন্ বড় লোকটি এ থেকে নিজেকে সংযত রেখে গেছেন? তা' যে রাখা যায় না! আমি যে কি, কোন্ সত্য আমার ভিতর আজীবন লীলা করে' গেল, তা আমি যদি না বলি ত তার মোটে প্রকাশই যে হলো না! এই মস্ত জিনিষটা থেকে জগৎকে কেন বঞ্চিত করব!

খুব কম হলেও দশ-বারোখানা বই আমার জীবন-চরিত-হিসাবে লেখা হয়ে গেছে; তার অনেক কথা আমি নিজে না লিখে দিলেও বলে দিয়েছি। সেটা কিন্তু নিজেকে বড় করে তোল্‌বার জন্যে নয়, ঐ লোকগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি-লাভের জন্যে। আজ এই বুড়ো বয়সে যে কলম ধরেচি কেন, তা ঠিক করে হয় ত বুঝিয়ে উঠতে পারবো না। তবুও একটু চেষ্টা করি।

মানুষ এক জীবনে নিজে বেঁচে থেকেই সুখী; কিন্তু পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে যখন বংশ-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে সে অমর হতে চায়, তখন তার কাছে নিজের বাঁচার চেয়ে পরের বাঁচাটাই বড় হয়; সত্যও ঠিক এক থেকে অন্যে সম্প্রসারিত হয়ে যেতে চায়; তাকে যখন মানুষ নিজের জীবনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না, তখনই প্রচারের পালা সুরু হয়ে যায়। এই চেষ্টা যে কি শক্তি নিয়ে সময়ে সময়ে জাগে! আগ্নেয় গিরির উৎপাতের মত সে দিকে দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। তখন লাভ-ক্ষতি ভালো-মন্দর বিচার থাকে না। সে শক্তিকে কে রোধ করে দেবে?

জীবনে চিরদিন লেখাপড়া করেছি—আর ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিয়েছি;—আজও সে কাজের শেষ হয় নি! ঐ লেখা জিনিষটাই আমার আসে না।

আমার বইগুলো? সে ত সবই আমার বক্তৃতা ধরা, কোনটাই আমার লেখা নয়। তাই ভাব্‌ছি, আজ এই নতুন কাজে কেন মর্‌তে হাত দিলুম। যা ভাবি তা বেশ বলে যেতে পারি কিন্তু লিখতে বসে দেখ্‌চি, আরম্ভের সঙ্গে শেষের মিল রাখা কম শক্ত নয়—তবুও লিখতেই হবে। মানুষকে ভূতেই পায়, জানতুম;—আজকে দেখচি, লেখাতেও পেয়ে বসে!

ডাক্তার ধরকে তোমরা অযথা কৃপণ বল। কৃপণ কে? টাকা যার থেকেও নেই—অর্থাৎ টাকা খরচ করবার কলিজা যার নেই,—সেই কৃপণ। আমার টাকার অভাব কি! বইগুলোর আয়? ঠিক কথা। বছরে বে-ওজর ষাট-বাষট্টি হাজার হবে; কিন্তু ওতে ত আমার কোন দাবী নেই! বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠার মূলে যে ঐ টাকা! দেশের কাজে দেশের টাকা খরচ হচ্চে। আমার সাত'শ টাকা মাইনে—তার সাড়ে তিনশ যায় মাসান্তে বিলেতে। ছেলেটি এত বছর ধরে কি যে মাথা-মুণ্ডু কচ্চে সেখানে, সে-ই জানে। তার পর আজ এ আস্‌চে,—বই কেনবার টাকা চাই! কাল সে এসে বল্‌চে,

কলেজে ভর্ত্তি হবার টাকা নেই। তোমরা জান না, কত অভাব দেশের। আমার তালি-দেওয়া কোট দেখে তোমরা যে হাসো, তা কি আমি জানি না? সেদিন রায় বল্‌ছিলেন, "ধর, এই কোট পরেই কি তোমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল?" আমি হাস্‌লুম, মনে মনে বল্‌লুম—আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল কি না সন্দেহ!

চল্লিশ বছরের কথা! মনে হচ্চে যেন ঠিক সেদিন! দেশের যা-কিছু লেখা-পড়া সেরে ফেলে কি করব, তাই ভাবচি। হঠাৎ দেখা হলো প্রিন্‌সিপ্যাল সাহেবের সঙ্গে ইডন্ গার্ডেনে। তিনি বল্লেন, "অনেক দূর থেকে তোমায় চিনেছি ধর, তোমায় লক্ষ লোকের মাঝে থেকে আমি চিনে নিতে পারি।" আমি অপ্রভিত হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লুম। ক্লাসে প্রায়ই তিনি আমাকে ঐ কথা বল্‌তেন। চেহারাটা মোটেই সুবিধার নয়, বলে, হয় ত!

"কি করছ আজ-কাল?"

"বিশেষ কিছু না।"

"বিলেত চলে যাও।"

"পয়সা নেই, স্যর্!"

"আরে, তোমার মত ছেলের আবার পয়সার অভাব! একটা দাঁও বুঝে বিয়ে কয়ে ফেল না কেন?"

মাথা হেঁট করে রইলুম।

"আচ্ছা, কাল আমার সঙ্গে আপিসে দেখা করো।"

"যে আজ্ঞে।"

"নিশ্চয়, কালই। দেরী করো না।"

তার পর দিন কলেজে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াতেই চেয়ার দেখিয়ে তিনি বল্‌লেন, "বসো, একটু দেরী হবে।"

কয়েকটা ফর্ম্মে দস্তখত করে ঠিকানা রেখে মেসে ফিরে এলুম। দিন কুড়িকের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল, স্কলার্শিপ নিয়ে ধর বিলেত যাচ্ছে।

হলোও তাই।

বেশ দেশ বিলেত। কাজই দেশটার ধর্ম্ম-অর্থ মোক্ষ-কাম। শোভা-সম্পদ, সাজ-গোজ সব আছে; কিন্তু সেগুলো সব উপরের জিনিষ; সকলের নীচে খর-স্রোতে কর্ম্মের প্রবাহ বইচে। সেইটেই দেশের কষ্টিপাথর। বাস্তবিক মানুষকে যাচাই করে নেবার এমন সহজ রাস্তা আর নেই। সেখানকার বেড়া ডিঙ্গিয়ে গেলুম পারিতে। শুন্‌লুম, ফ্রান্স বিজ্ঞানের কর্ম্মভূমি না হলেও নর্ম্মস্থল। এটা একটা প্রকাণ্ড বাবুদেশ। এরা সব জিনিষের সৌখীন-তত্ত্বটুকু ছেঁকে বার করে। সেখান থেকে গেলুম জর্ম্মানিতে। বিজ্ঞানচর্চ্চা এ-দেশে কঠোর ভাবে হয়। জর্ম্মানির কাজ-কর্ম্ম খাওয়া-দাওয়া সব মোটা-মুটি, কিন্তু ভাবনা-চিন্তাগুলি ভারী উঁচু দরের।

বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি-পত্রে জান্‌তে পারলুম যে আমি বিদ্যাতে দিগ্‌গজ হচ্চি। একবার আমেরিকাটা ঘুরে আস্‌বারো ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ডাকের উপর এমন ডাক পড়তে লাগল যে দেশেই ফিরে আসতে হলো।

হাওড়া ষ্টেশনে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত। গলায় মালা দিলেন, কপালে চন্দন দিলেন, মাথায় ধান-দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন,—"যা শিখে এলি, তাই

দেশে প্রচার কর্। ভগবানের ইচ্ছায় তোর পরমায়ু দীর্ঘ হোক।"

পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে চোখের জলে তাঁর তালতলার চটি ভিজে গেল। তিনি বুকে করে আমায় তুলে নিয়ে মোটা খস্‌খসে চাদর দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন। সে স্পর্শ যেন আজও দেহে লেগে আছে!

মহাজনের দালালের মত স্কলার্শিপের ফাঁদ আমাকে আগে থেকেই চাক্‌রির বাঁধনে বেঁধে রেখেছিল। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে দাসত্বের মালা গলায় পরে নিলুম। চোখ-বাঁধা ঘানির বলদের মত সেই একই পথে ঘুরচি আর ঘুরচি!

শিক্ষকতার কাজ যেদিন আরম্ভ করেছিলুম, কি উৎসাহ জীবনে ছিল সেদিন। মনে আছে, জন-দশেকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যখন আরম্ভ করলুম অধ্যাপনা, তখন মনে হলো, পদ্মফুলগুলি জ্ঞানালোকের একাগ্র আবেগে উন্মুখ হয়ে রয়েচে, ফুটে ওঠবার জন্য। আমি অজস্র বলে যেতে লাগ্‌লুম—তাদের শ্রান্তি নেই, বিরাম নেই, বিরক্তি নেই! দিনের পর দিন এম্নি করে লঘু প্রসন্ন গতিতে জীবনটা কেটে যেত যদি, আহা! আর আজ? সেই লেক্‌চার চলেচে! জীর্ণ দেহখানা আর বইতে চায় না, তবু ত তাকে ঠুকে-ঠেকে, জোড়া-তাড়া তালি-পচ্চড় মেরে খাড়া করে রেখেচি—নইলে চলে না। সকালে উঠে,—সকালও নেই, ওঠাও নেই,—ওটা অজ্ঞানে বলচি, সকালে উঠে—সন্ধ্যা হবার আগে একটু গরম দুধ খেয়ে নি—তারপর বই হাতড়াচ্ছি—দশটার সময় আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি—বারোটা বাজতে না বাজতে কি ভীষণ কাশি! জো কি আর শুয়ে থাকি?—আলো জেলে ঘরের চারিদিকে পায়চারি—পায়চারি! এমনি করতে করতে রাত চারটে-আন্দাজ দেহ অবসন্ন হয়ে আসে—মনে হয়, মৃত্যু বুঝি তার করাল হাত-খানা সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতে চাচ্চে। ভয় হয় না, কি এক অসম্ভব ভাবনায় আকণ্ঠ যেন শুকিয়ে উঠতে থাকে—ছুটে গিয়ে জল খেয়ে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ি।—পথের উপর ময়লার গাড়ীর শব্দে যেন সমস্ত দেহখানা ভাঙ্গা কাঁসরের মত ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে! এমন সময় সিঁড়িতে খস্‌খস্ শব্দ! বুঝতে পারি, স্ত্রী আস্‌চেন। গণক্কার নই, তবুও ঠিক জানি, কি কথা তিনি বলবেন। আড় চোখে দেখে নি, সেই বিপুল কলেবর, নড়তে-চড়তে কষ্ট হচ্চে। একখানা চেয়ারের উপর বসে তিনি সুরু করে দেন,—

"এখনো ঘুমিয়ে আছ?"

ভিতর থেকে একটা প্রচণ্ড বাঘের হুঙ্কার যেন বুকটা ফেঁড়ে বার হয়ে আস্‌তে চায়, কষ্টে চেপে, মনটাকে শান্ত করে বলি, "না, সেই বারোটা থেকে জেগেই আছি।"

"বাতিকের ধাত কি না!"

সজারুর গায়ের কাঁটাগুলোর মত মনটা খাড়া হয়ে ওঠে, একটা তীব্র আঘাত দেবার জন্যে! খানিকটা দম বন্ধ করে, দেহের পেশীগুলো শক্ত করে নিয়ে রাগটা সাম্‌লাই ভাবি, এই সেই মেয়েমানুষটি, যার রূপ আমাকে মুগ্ধ করতো, যাকে দেখে আনন্দ হতো—যার গায়ে হাত দিলে সর্ব্বাঙ্গ আমার স্নিগ্ধ হয়ে যেত!

পরিষ্কার মনে পড়ে, সে দিনের কথা

বিদ্যাসাগর এসে বল্লেন, "বিধবা বিয়ে করতে রাজী আছিস্ রে?"

"আপত্তি নেই।"

"মেয়েটিকে দেখবি?"

"বলেন ত যাব।"

"তবে আজ সন্ধ্যার পর আমার ওখানে যাস্—তারপর দু'জনে গিয়ে দেখে আস্‌ব।"

সন্ধ্যার পর পারুলকে দেখতে গেলুম। কি সুন্দরই দেখেছিলুম সেদিন তাকে! ছিপ্‌-ছিপে দেহ, ধপ্‌ধপে রং। কালো চোখদুটো, হাতগুলো গোল-গাল—রূপের সাগরে যৌবন যেন ষোল কলায় পূর্ণ!

বাড়ী ফিরতে ফিরতে তিনি বল্লেন, "কেমন রে, পছন্দ হলো?"

কি আর বলি!

তিনি বল্লেন, "আমি ও-সবের পক্ষপাতী নই। দেখো, শোনো, আলাপ-পরিচয় কর, তার পর যা-হয় একটা স্থির করো। ছোট্টটি নিয়ে গিয়ে তাকে ঘরের মত তৈরী করে নেওয়া যায়; কিন্তু এর স্বভাব-চরিত্র গড়ে পিটে ঠিক হয়ে গেছে—বিশেষ একটা বদল হবে না, তাই দেখে নেওয়া চাই! বনি-বনাও হবে কি না!"

পারুলের সঙ্গে তারপর কত সন্ধ্যে কাটিয়েচি। সে সেতার বাজাত, গান করত; কঠোর বৈজ্ঞানিকের মনটা কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় না ভরে উঠত!

ক্রমে আমরা ঘনিষ্ঠ হলুম। বাইরের কি যেন একটা অমানুষী শক্তি আমাদের দু-জনকে ক্রমেই কাছা-কাছি করে দিতে লাগ্‌লো।

একদিন পরিষ্কার করে পারুলকে জিজ্ঞাসা করলুম, "পারুল, আমার চেহারা ত এই, এর জন্যে তোমার বিরাগ হয় না?"

সে মৃদু হেসে বল্লে, "রূপটা মানুষের ভারী উপরকার জিনিষ, পরিচয়ের আগে কি আরম্ভে তার কিছু প্রভাব থাক্‌তে পারে! কিন্তু সে কেবল যতদিন ভিতরের মানুষটিকে চিন্‌তে পারা যায় না! তোমাকে আমার পৃথিবীর সব পুরুষের চেয়ে সুন্দর বলে মনে হয়।"

মনের বিজয়-ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ল। দুজনে এক হয়ে জীবন-যাত্রা সুরু করে দিলুম। জানিনে, কবে কোন্ দিন সেই পারুলকে হারিয়ে ফেলেচি। তাকে আবার তেমনি করে ফিরে পাবার ইচ্ছা হয়। মাঝে মাঝে তার আব্‌ছায়া ছবিটা লীলার মধ্যে দেখ্‌তে পাই—সেদিন আনন্দরসে মন আপ্লুত হয়ে ওঠে; —আরো কিছুদিন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা হয় যেন!

বাস্তবিক মেয়েমানুষের সৌন্দর্য্য আছে কি না, সে বিষয়ে আমি নিজেই গভীর সন্দিহান। পুরুষের চোখেই সে এত বেশী সুন্দর! ধর্ম্মের ষাঁড়টার রূপের কাছে কোন্ গরু সুন্দর! পুরুষ হাতী দাঁতাল, তার কাছে হস্তিনীর রূপ লাগে না; চড়ুই বাবুই টুন্‌টুনি ময়ূর, কোকিল ফড়িং—এদের পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর;—স্বীকার করতেই হবে; এখানে ত পক্ষপাতিত্বের কথা আসে না। যদি এতটা না স্বীকার কর, এ-টুকু নিশ্চয় করবে ত যে তাদের রূপটা ভারী ক্ষণভঙ্গুর? আমার এক কবি বন্ধু একদিন তাঁর লেখা পড়ে শুনোচ্ছিলেন—কাব্যের কথার বালাইগুলো আমার মনে থাকে না—তবে ভাবটা যদি মনে লাগে তাহলে আর কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তাঁর ভাবটা এই—ফুলদের যখন ফোট্‌বার

কাজ শেষ হয়ে যায়—অর্থাৎ যেউদ্দেশ্যে ফোটা, সেটা সিদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের পাপ্‌ড়ি-মাপ্‌ড়ি খসে ঝরে গিয়ে ফলটা বেরিয়ে পড়ে। আজ কাল পারুলকে দেখলে আমি ঐ কথাই ভাবি। আচ্ছা সে রূপ চিরদিন কিছু থাকে না, কিন্তু সে প্রসাধনের চেষ্টা তোমার কোথায় গেল! আগে যে রূপের অনেকখানি ছাই-পাঁশ দিয়ে ঢেকে মরতে আর আজ এই কুরূপ যেটা এত প্রকট হয়ে পড়েচে, তাকে কি ঢেকে ঢুকে একটু গোপন করতেও ইচ্ছা হয় না!

রূপ-যৌবন না হয় মানুষের চিরদিন থাকে না, তাই বলে যে-নিজেকে অমনটা করে তুল্‌বে—তার কি মানে? আর বেহালার মোটা তাঁতটার মত নিত্য-নিয়ত যে একই একঘেয়ে সুরে বাজ্‌বে—তাই বা কেন? রোজ সেই এক কথা!

"খোকার চিঠি পেলে!"

"না।"

"কাল নিশ্চয়ই আসবে।" এমন কাল কত হাজার বার যে চলে গেল! লজ্জাও করে না? আমি কি ছেলেমানুষটি!

কথার কোন জবাব না পেয়ে—"আর এই ত সেই সে-দিন লিখেচে—রোজ রোজ বাছা লিখবে কত, কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে সমস্ত দিনটা।"

তখন বুঝতে পারি পারু, পাহাড়ের মত বিশাল আর কঠিন হয়ে গেছ কেন তুমি! ফুলের উপর শিশিরের ভরটুকুও সয়না যে! আর এই স্নেহের প্রস্রবণ বইত কোথায়, যদি তুমি অত বিশাল পাহাড়ের মত না হতে!

বলবার আগেই যদি জানা যায় কি বলা হবে, তাহলে শোনবার ধৈর্য্য আর থাকে না! নেহাৎ পরীক্ষা পাশ করবার দায়ে না পড়লে লোকে পড়া-বই আবার ফিরে পড়ে না। বিছানা ছেড়ে বাথরুমে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি, গিন্নী নীচে নেমে গেছেন।

দোতলার হল-ঘর ড্রয়িন্‌ রুম। সেখেনে সকালের কাজের আগে বাঁড়ীর সকলে একত্র হয়ে ভগবচ্চিন্তা করি। ছোট্ট একটি অরগ্যান্‌ আছে। লীলা গান করে। তারপর চা। এ-সব সাহেবিয়ানা আমাদের পরিবারে মজ্জাগত হয়েছে। কার দোষে কি গুণে, তা জানিনে।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচেকার বাইরের ঘরে গিয়ে বসি। লোকজনের সঙ্গে দেখা এই সময়।

প্রকাণ্ড-দাড়ি, লম্বা পইতে, তসরের কাপড় পরা নধর দেহখানি। "কি চাই আপনার?"

"কন্যাদায়,—কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য।"

"কন্যার বিবাহ না দিলেই পারেন।"

"আজ্ঞে, ধর্ম্ম যায়।"

"যাক্‌ না—যাকে রাখ্‌বার ক্ষমতা নেই, সে যায় যদি সে ত মঙ্গল।"

"আজ্ঞে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই যে একমাত্র সম্বল!"

রাগে সর্ব্বাঙ্গ গিস্‌গিস্‌ করে ওঠে—"যান্‌, যান্‌, ও-সব শোনবার অবসর নেই—আমি অক্ষম, পারব না কিছু দিতে।"

"আজ্ঞে বাঁকুড়ো থেকে আপনার নাম শুনেই যে আস্‌চি। আপনি বড় দাতা!"

অপাত্রে দানের এই ফল। দাতার অর্থ-ভাণ্ডার নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায়; কিন্তু গ্রহণ করবার লোক যে ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে থাকে!

ব্রাহ্মণকে বিদায় করতে না করতে একজন যুবক এসে উপস্থিত!

"কি চাও?"

"স্যর আর-সব পেপারে পাশ করেচি—কেবল আপনার পেপারে আর কটা নম্বর পেলেই—"

"অসম্ভব, আমার হাতে যা একবার বার হয়, তার আর বদল হয় না, জানো ত?"

"অবস্থা বড় খারাপ,—আর পড়া চালাতে পারবো না।"

"রোল?"

"৩০৭।"

ড্রয়ার থেকে বার করে উল্টে উল্টে দেখ্‌লুম। "নাঃ—হতে পারে না। তুমি ডাক্তার হয়ে বার হলে কলেজের কলঙ্ক।"

টেবিলের উপর টপ্‌ টপ্‌ চোখের জল। কি শস্তা এই জিনিষটা এদের কাছে! সমস্ত বছরটা বাঁদ্‌রামি করে সিগারেট খেয়ে থিয়েটার শুনে কাটাবে ছোঁড়ারা—তারপর এখন এই কান্নাকাটি!

বিষণ্ণ মুখে ছোক্‌রা ফিরে গেল। বুকের মধ্যে আন্‌চান্‌ করতে লাগ্‌ল। কি করি? নম্বরটা বাড়িয়ে দিলুম।

"কি চান্‌ আপনি?"

লোকটি কালো, বেঁটে, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। জরাজীর্ণ কোট-প্যাণ্ট লাল টক্‌-টকে টাই।

"মিস্‌ ধরকে গত মাসে সাতদিন মিউজিকে লেস্‌ন্‌স্‌ দিয়েছিলুম্‌—তার বিল্‌।"

দেখলুম, ৩৫৲ টাকা।

"খান্‌সামা, মিস্‌বাবাকো—"

"জো হুজুর।"

লীলার প্রবেশ। মিউজিক মাষ্টারকে দেখে তার আর আনন্দের সীমা রইল না।

"হাঁ বাবা, ওটা ওঁকে। মাকে বল্‌তে বলেছিলুম—মা নিশ্চয় বলেচেন, বোধ হয়—আপনার নিশ্চয়ই মনে নেই।"

টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করে বল্‌লুম, "দেখ মা পটু যতদিন না ফিরচে, ততদিন আমাদের বুঝে চলতে হবে। দেনায় যে জড়িয়ে পড়চি।"

"ছেলের এজুকেশনই সব? আমরা কি ভেসে এসেচি, বাবা?"

"কেন, তুমি কলেজ যাওয়া কি বন্ধ করেচ?"

"নাঃ—আমার মিউজিকের লেস্‌ন্‌স্‌ চাইই।"

লীলা ত এমন বেয়াড়া ভাবে আগে কথা কইত না। কেন এমন হলো?

ওদিকে টাওয়ারে ন'টা বাজতেই বাবুর্চ্চি লম্বা সেলাম দিয়ে গেল।

ঠিক দশটার সময় ছোট্ট ব্যাগটি হাতে করে পথের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম, ট্রামের প্রতীক্ষায়। এই এক জায়গায় এক সময়ে লোকে আমাকে চিরদিন দেখে আস্‌চে। বাড়ী থেকে আমার পা বেরুতে দেখ্‌লে লোকে নাকি ঘড়ি মিলিয়ে নেয়!

কলেজে ঢুকতে আমার আলাদা ফটক। দরওয়ান সেলাম করে খুলে দিলে—সটান্‌ চলে গেলাম লাবোরেটরিতে। রামা আমাকে দেখে ভারী খুসী। হাত থেকে হ্যাট নিয়ে নিলে, কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে জুতো ঝেড়ে দিলে।

এই রামা জীবটি অদ্ভুত। এখন বুড়ো হয়েচে। লেখা-পড়া জানে না, কিন্তু আশ্চর্য্য

তার স্মৃতিশক্তি—আমার সব বইগুলি সে চেনে। মানুষের হাড়ের কিম্ভূত-কিমাকার নামগুলো তার মনে আছে। কবে কোন্ ছেলে স্কুলে ভর্ত্তি হয়েচে, কিসে কত নম্বর পেলে—কোন্ ব্যাচে কে-কে আছে, এ-সব রেজিষ্টারি দেখে করলে হয়ত কাজের ভুল হয়, কিন্তু রামাকে জিজ্ঞাসা করে করলে কোন ভুল হবে না। কোথায় কোন্ জিনিষটি যদি রামা না বল্‌তে পারলে, ত আর তা পাওয়া যাবে না।

এমন প্রভুভক্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষ জীবনে আমি অল্পই দেখেচি।

তারপর, আমার ডিমন্‌ষ্ট্রেটার চুনী বাবু। চুনী বাবুর দেহের এবং মনের কোন অংশ সূক্ষ্ম নয়। কাঁকড়ার মত দেহটি, বাঘের মত চোখ—ভ্রূ দুটো যেমন লোমশ, তেমনি মোটা, মাথাটা থ্যাবড়া। দুনিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—নিজের কাজে অসীম ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়। আমার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর অপরিসীম ভক্তি। যে আমার নিন্দা করে, চুনী তার বাঘ।

কোন্ কোন্ জিনিসের দরকার, চুনী কাগজে নোট করে—বাস্, আর ভুল হবার ভয় নেই। এই লোকটির কল্পনার কোন উপদ্রব নেই; যা বলে দেবে, তা ঠিক কলের মত করে যেতে পারে—তাতে ভুল হবে না, ভ্রান্তি হবে না।

নিজের ঘরে গিয়ে বস্‌লুম। চারিদিকে রাশি রাশি বই, সাজানোই রয়েচে—কতদিন খুলিনি। আগে এই ঘরে আস্‌বার জন্যে প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করত—আর আজকাল? কিছু না। মানুষ এমনি করেই আস্তে আস্তে পরলোকের পথে চলে যায়, বোধ হয়।

লেক্‌চারের নোট্‌টা বার করলুম। এত জিনিষ বল্‌তে হবে আজ!—মাথার মধ্যে ত আর ধরে রাখ্‌তে পারিনে। কি বলব? বুকটা দু-চার সেকেণ্ড ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠ্‌লো—যেন মনে হলো, সব ভুলে গিয়েছি—একটি বর্ণও মনে নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—আর চাক্‌রি করা চলে না! এ যেন শুধু অর্থের জন্য মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে বসেচি; কিন্তু চাকরি না করলে চলে কি করে? এই বিরাট খরচ কে সাম্‌লাবে? মাসে মাসে বিলেতে টাকা না পাঠালে চলে কৈ?

দু-চারটে বই ওল্‌টালুম, তেষ্টায় ছাতি শুকিয়ে আস্‌চে। আর আধঘণ্টা পরে তিনশ' ছেলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা-খানেক বক্তৃতা করতে হবে; কি বলব তার এক বর্ণও মনে আস্‌চে না। চোখ দিয়ে জল আস্‌বার মত অবস্থা হয়ে পড়ল।

চুনী এসে বলে গেল, প্রিনসিপাল ডেকেচেন।—বলে দিলুম,—বলে দাও লেকচারের পর যাবো। জ্বালাতন করেচে—কি আবার একটা উল্টোপাল্টা ফরমাস করে বস্‌বে হয়ত। উদ্বেগ বেড়ে গেল। আর পোষায় না, দেখ্‌চি। সবই সহ্য করতে হবে সমস্ত জীবনটা এই করচি, আর ক'টা মাস বই ত নয়!

ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল—নোট বগলে করে গ্যালারিতে গিয়ে উপস্থিত হলুম, চুনী প্রায় রোল-কল শেষ করেচে। তিনশ ছেলে হুড়-মুড় করে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। তাদের পানে চেয়ে হেসে একটু নড্ করলুম। একটা আনন্দের তরঙ্গ বয়ে গেল তাদের মধ্যে। বুড়োকে এখনো তারা ভালোবাসে। সে কেবল নবীন মনগুলি ভালবাসা-প্রবণ বলেই!

তারপর, সুরু হয়ে গেল লেক্‌চার—ভাবনা নেই; চিন্তা নেই—গোমুখী থেকে গঙ্গার ধারা ছুটে চলেচে। ছেলেরা উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাচ্চে। যা জীবনে কোনদিন শোনেনি—আজ যেন এই প্রথম তা শুনচে, এমনি আগ্রহের রেখা তাদের কচি মুখগুলিতে পরিষ্কার ফুটে রয়েচে!

মিনিট পনের পরে থেমে একটু জল খেয়ে চুনীর মুখের দিকে তাকাতেই সে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট সুরু করে দিলে। অদূরে সাজানো মানুষের হাড়গুলোর দিকে চেয়ে রইলুম—আর কত দেরী আমার, তোমাদের মত হতে?

হঠাৎ তালি পড়ল—চুনীর মুখে হাসি ফুটেচে; বুঝলুম, চুনী ভাব্‌চে, আমি খুসী হয়েচি।

আবার লেক্‌চার সুরু করে দিলুম। মৌ-চাকের মত ভন্‌ভনানি নিমেষে চুপ হয়ে গেল! বুড়োর ভাঙ্গা ভরাট গলায় ভরে উঠ্‌ল ঘরটা। আমি যেন সে আমি নই—কোন্ মন্ত্রের বলে বলে যাচ্ছি—তাতে দ্বিধা নেই, ইতস্তত নেই!—এক অপূর্ব্ব গুঞ্জনে এতগুলি চিত্ত-শতদল বিকচ করার পূত মন্ত্র কোন্ ঋষি যেন ঐশ শক্তিতে উচ্চারণ করে চলেছেন! সমস্ত দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌চে—এ আমি নই, আমি নই—আমার ভিতর দিয়ে ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি স্বতঃ প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে! আমি যন্ত্র,—বাঁশীটি মাত্র, অন্য কার ফুঁয়ের জোরে এ যে বাজচে!

লেক্‌চারের পর অবসন্ন হয়ে পড়লুম। ঠিক যেন মৃত্যুর অবসাদ সমস্ত দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে আস্‌চে! রামা এক পেয়ালা চা আর খানকয়েক বিস্কুট ঠিক করে রেখেচে। সে জানে, এ নইলে আমার কথা কইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাক্‌বে না। আস্তে আস্তে চায়ের পেয়ালা শেষ করে বড় সাহেবের ঘরে গেলুম। সেখানে সেই সব মামুলি কথা। আমার যশ-মান, সম্ভ্রম মর্য্যাদা যার কথা তোমরা দেশশুদ্ধ লোক জান—এইখানে এসে সেগুলো নিমেষে ভূমিসাৎ হয়ে যায়! মন্দ নয় এটা! দেহের সমস্ত ক্লেদ যেমন ক্যাষ্টর অয়েলে দূর করে দিয়ে তার পর চিকিৎসক বুঝে নেন, রোগটা কি—এও ঠিক তেমনি। বড় সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে উপলব্ধি করা যায়—আমি কি? সাহেব না কি আমাকে বড় বিশ্বাস করেন—আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করেন না। যখন এই কথা শুনি, তখন মনে-মনে হাসি! কতখানি আস্থা আমাদের উপর তাঁদের আছে। কাজের বোঝা বইতে যে আমরা বেশ পারি, তা তাঁরা জানেন—তার অধিক কিছুর যোগ্য যে আমরা হতে পারি, তা' তাঁরা বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাসের সঙ্গে জোর চলে না!

দিনের কাজ শেষ করে প্রাণের মধ্যে একটা টান বুঝতে পারি—সেটা মিনির জন্যে। এই মিনির পরিচয় পরে দেব।

মিনির বাড়ী থেকে ফির্‌তে দুটো হয়;—সে আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত প্রায়ই পৌঁছে দেয়। এক একদিন উপরের ঘরে গিয়ে তার জন্যে যে ইজি-চেয়ারটা রাখা আছে, তাতে বসে সে গল্প করে। সেদিন বাড়ীর সকলের মুখ ভার হয়ে যায়। কি দরকার এই অল্প-বয়সী মেয়েটির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করবার—যে কোনদিন পৃথিবীর পথে সোজা করে পা ফেল্‌লে না? মানুষ

কি সব কাজ দরকারের তাড়াতেই করবে? যেটা বিনা-প্রয়োজনের দাবী, সেটা যে কত মধুর তা ক'জন বোঝে! মানুষের মনের প্রবৃত্তি গুলোকে অযথা বেঁধে ঠেঙ্গানোকে পাঠশালের গুরুমশায় সংযম বল্‌তে পারেন; কিন্তু আমি তাকে সংযম বলতে কোনদিন প্রস্তুত নই। স্বভাবকে তার মনের মত পথে চল্‌তে দাও—দেখ, সে কি চায়, না চায়। তাকে বেঁধে মেরে ফেলায় একটা নিষ্ঠা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সেটা খুব ছোট্ট জিনিষ। তাতে মুগ্ধ হয় যারা, তাদের আমি করুণার চক্ষেই দেখে থাকি!

বাড়ী ফিরে দেখি, লীলার বন্ধু-বান্ধবরা এসে আমোদ-প্রমোদ করচে। প্রায় সেগুলি পুরুষ-বন্ধু। তাদের মধ্যে একজন কন্‌ষ্টাণ্ট। ইনি নাকি মিস্ ধরের পাণি গ্রহণ করবার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। প্রায়ই রাত্রের আহার শেষ করে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। এঁদের হাসি গান কথাবার্ত্তার উচ্ছ্বাস তেতলা পর্য্যন্ত উৎকীর্ণ হয়ে বৃদ্ধের স্থবির শান্তিকে ক্ষুব্ধ করে তোলে!

টেবিলের একদিকে আমি বসি—কি খাই না খাই জানিনে, ঐ ছোক্‌রাটিকে দেখলে আমার আকণ্ঠ তিক্ত রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার স্ত্রী আমাকে গঞ্জনা দেন,—"তুমি মোহিতের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কও না!"

"কে মোহিত?"

"খুকীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত ঐ যে ছেলেটি গো।"

"এত শীগগির বিয়ে কেন?"

তিনি রাগ করে চলে যান—আবার ফিরে এসে বলেন,—"ওরা জমিদার, একটা আলাপ-সালাপ করে ঠিক-ঠিকানা করে ফেল্‌লেই হয়।"

"আমায় রেহাই দাও, তুমি ত সব পার, তুমি যা করেচ—কি করবে, তাতে কোন দিন ত আমি অমত করি নি পারু।"

তাঁর মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

দশটা বাজতেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে কি না আসে জানিনে—যেমন বারোটা বাজে, মাথা গরম হয়ে ওঠে। দেহ থেকে প্রাণটা বার হয়ে পড়্‌বার যোগাড়—তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বাইরে যেতে না যেতে সেই ভয়ঙ্কর কাশির ফিট্‌টা এসে পড়ে—জীর্ণ দেহটাকে ঝাঁকুনির উপর ঝাঁকুনি দিয়ে যেন পরখ করে নিতে থাকে,—আর ক'দিন?

আমি তখন মনে করতে থাকি, দিন নয়, ঘণ্টা। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত আকাশের দিকে চাই—সেই সব চির-পরিচিত নক্ষত্র-নিচয়; কেউ স্থির, কেউ বা কম্পিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে!

তার পর পায়চারি—পায়চারি—রোজই এক কাজ! কবে তুমি আস্‌বে হে একা-সখা, হে প্রিয়তম—কতদিন বসে থাক্‌ব তোমার প্রতীক্ষায় এমনি করে! এই জীর্ণ তরীতে আর যে পাড়ি দিয়ে উঠ্‌তে পারচিনে নাথ!

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আদর্শ সৌন্দর্য্য

আজ আমরা এমন গুটিকতক কথা বলিতে চাই,—যা অত্যন্ত হাল্‌কা এবং নিতান্ত পল্‌কা! আমরা হইতেছি প্রথম শ্রেণীর গম্ভীর জাতি, কাজেই "তাম্রশাসন" প্রভৃতির সাহায্য না লইলে, আমাদের পাঠকদের বিদ্রোহিতাকে শাসন করা যায় না। সুতরাং এই লেখাটিকে কেউ যে "ভারতীর প্রবন্ধগৌরব" বলিয়া মনে করিবেন, সে দুরাশা আমরা মোটেই রাখি না। তবে এই খোস খুশি হাল্‌কা কথায় যদি কোন ব্যাচালতা প্রকাশ পায়, আশা করি আপনাদের অতুল গাম্ভীর্য্যকে তাহা ভূমিসাৎ করিতে পারিবে না!

বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস গ্লাডিস কুপার। ইনি বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ সুন্দরী।

রূপ, রূপ, রূপ! দুনিয়াটা রূপ রূপ করিয়াই পাগল হইল! সমুদ্র-মন্থনের মোহিনী, বাল্মীকির সীতা, হোমারের হেলেন, মিসরের ক্লিওপেট্রা—এ-সব ত পুরানো যুগের জানাশোনা কথা। কিন্তু এই নূতন যুগেও, শত শত বৎসরের রূপচর্চ্চার পরেও, রূপের সাধনায় কাহারোই অরুচি ধরিয়া যায় নাই। রূপের পদতলে দাসখৎ লিখিয়া দিতে এখনো আমরা কেহই অপ্রস্তুত নই।

নিখুঁত রূপের কদর করে সবাই,—কিন্তু নিখুঁত রূপ কি পৃথিবীতে আছে? কবিদের কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আছে। এবং প্রথম প্রেমিক বা প্রেমিকাও যে কবিদের কথায় সায় দিবেন, সে-বিষয়ে আমরা দৃঢ়নিশ্চিন্ত।

কবিদের অধিকাংশ বর্ণনা কাব্যেই শুনিতে মিষ্ট, কল্পনাতেই দেখিতে চমৎকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে কবির মতানুযায়ী রমণী-রূপের উপাদান-গুলির উল্লেখ করিব।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

দুই সুন্দরীর দু-রকম হাসি।

পূর্ণচন্দ্রের বর্ত্তুলতা, সর্পের বক্রতা, লতার কৃশতা, গোলাপ-কোরকের পেলবতা, পালকের লঘুতা, মৃগ-নেত্রের মৃদুতা, নৃত্যচপল সূর্য্য-করের প্রতিবিম্ব, নবীন মেঘের অশ্রুবিন্দু, বাচাল সমীরের অসঙ্গতি, খরগোশের ভীরুতা, ময়ূরের জাঁকজমক, হীরকের কাঠিন্য, তুষারের শীতলতা এবং ঘুঘুর কোমল কূজন।

এই-সব ব্যাপার একসঙ্গে মিশাইয়া বিধাতা নাকি রমণীকে সৃষ্টি করিয়াছেন! কিন্তু এখানেও ক্ষান্ত না হইয়া, বিধাতার উপকরণের সঙ্গে কবি আরো অনেক জিনিষের ফর্দ্দ দিয়াছেন; যেমন তরুণ তৃণের থর-থর কম্পন, মধু'র মিষ্টতা, বাঘিনীর নির্ম্মমতা, এমন-কি বুভুক্ষু অগ্নির শিখা পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই! এককথায় বিধাতা রমণীকে গড়িয়াছেন "বিষামৃত একত্র করিয়া"! সে আমাদের ভালোও বাসে, ঘৃণাও করে; ভয়ও পায়, চোখও রাঙায়; ছায়ার মত পিছনেও আসে, আলেয়ার মত ছুটিয়াও পালায়; তৃপ্তও করে, দগ্ধও করে; বাঁচায়ও বটে, মারেও বটে! আমরা কখনো তার পূজার দেবতা, কখনো-বা খেলার পুতুল!

—এই হচ্ছে কাব্যে-উক্ত রমণীর দেহ-মনের ছবি। বলা বাহুল্য এ ছবিখানি কল্পনার বৈঠকখানা ছাড়া অন্য-কোথাও টাঙাইয়া রাখা চলে না। কেননা এই বাস্তব সংসারটা একেবারেই কবিতা বা প্রথম প্রেমিকের স্বপ্ন নয়। কাজেই কবির রূপ-বর্ণনার সঙ্গে বর বা বধূর দেহ হুবহু

গতি লাবণ্যের শরীরিণী মূর্ত্তি—
যেন একখানি হাল্‌কা মেঘ!

মিলাইয়া কেউ যদি তিলোত্তমার দ্বিতীয় সংস্করণকে বিবাহ করিতে চায়, তবে তাহাকে মদনের বদনে ভস্মনিক্ষেপ করিয়া চিরকালটাই আইবুড়ো হইয়া থাকিতে হইবে। জীবন্ত কোন অতি-সুন্দর আহা-মরি চেহারাও কবির বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায় না।

তবে একটা ব্যাপারে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমস্ত না অধিকাংশই বিসদৃশ,—অথচ এই দুই-দেশী কবির রূপবর্ণনা কিন্তু অনেকটা এক-রকম। সৌন্দর্য্যের সাধারণ আদর্শ সম্বন্ধে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় কবিরা প্রায় একমত [অবলম্বন করিয়াছেন। কোঁক-ড়ানো চুলের রাশি, ললাটে ও গ্রীবার পিছনে চূর্ণ অলক, ছোট কপাল, টানা ভুরু, পদ্মপলাশ-লোচন, টিকলো নাক, রাঙা গোলাপের মত কপোল, পাত্‌লা টুক্‌টুকে ঠোঁট, ছোট্ট 'হাঁ', টোল্-খাওয়া গাল বা চিবুক, মরাল গ্রীবা, পীবর বক্ষ, সরু মাঝা, গুরু নিতম্ব, স্থূল উরু প্রভৃতি রমণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া ভারতের ও য়ুরোপের কবির মধ্যে কিছু তর্কাতর্কি হয় না। পুরুষ দেহ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এমন কি, এখানে কালো-ধলোর মধ্যে গায়ের রং লইয়াও কোন বিবাদ হয় না—সাদা কবির সঙ্গে কালো কবিও গলা মিলাইয়া গৌরবর্ণের তথা দুধে-আল্‌তা রঙের সুখ্যাতি করেন। অবশ্য snow-white-এর ঠিক প্রতিশব্দ প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্যে আছে কিনা, জানি না।

মুস্কিল বাধে সুধু এক জায়গায়। পাশ্চাত্য কবির রূপবর্ণনা যেমন তাঁহার স্বদেশের নর-নারীদের সঙ্গে অনেকটা খাপ খাইয়া যায়, ভারতীয় কবির বর্ণনা কিন্তু সমস্ত ভারতে ততটা খাটে না। গৌরবর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ বটে, কিন্তু সে শ্রেষ্ঠতা কয়জন ভারতবাসীর আছে? ভারতের দুই-তিনটি প্রদেশ ছাড়া, আর-কোথাও সাধারণত গৌরবর্ণ দুর্লভ বলিলেও চলে। বাঙ্‌লা ত ডাহা কালোর দেশ। সামান্য কটা রঙের কথা ধরি না, আসল ফরসা রঙ এখানে শতকরা একজনের বেশী আছে কিনা সন্দেহ! রঙ হইতেছে সৌন্দর্য্যের প্রধান (এমন-কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)

একটি উপাদান। বাঙ্‌লার মেয়েলী প্রবাদও তাই বলে—"শত দোষ হরে' গোরা।" রঙের জলুষে যে অনেক সাধারণ চেহারাও অসাধারণ হইয়া ওঠে, সে ত আমরা সকলেই আক্‌চার স্বচক্ষে দেখতে পাইতেছি। অতএব বলিতে হইবে যে, বর্ণহিসাবে বাঙালীর জাতীয় সৌন্দর্য্য একরকম নগণ্য।

কিন্তু বাঙালীর রঙ ফরসা না হইলেও, তাহার সৌন্দর্য্যের আদর্শ যে পাশ্চাত্য আদর্শের অনেকটা কাছাকাছি, সেটা বেশ বুঝা গেল। চীনা বা জাপানী বা কাফ্রিরা এ-কথা বলিতে পারে না। তাহাদের সৌন্দর্য্যের মাপকাটি এমন সংকীর্ণ যে, আপন আপন দেশ ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগে না।

আদর্শ-সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? আদর্শ সৌন্দর্য্যের প্রথম দ্রষ্টব্য, বর্ণ-মাধুর্য্য। (The Beauty of Colour) কিন্তু আগেই বলিয়াছি, এদিকে বাঙালীর ততটা সুখ্যাতি নাই।

মিস আনেট কেলারম্যান যাহার দেহের গঠন নিখুঁত বলিয়া বিখ্যাত।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য, গঠন-সৌন্দর্য্য (The Beauty of Form)। যাহার গড়ন ভালো নয়, তাহার রূপও উচ্চশ্রেণীর বলা যায় না! নাক-চোখ অনেকেরই ভালো থাকে, কিন্তু পুরন্ত দেহ অত্যন্ত দুর্লভ। যাহার গড়ন ভালো, তাহার অঙ্গলীলার ভঙ্গীতে নয়ন-মন সহজেই অভিভূত হইয়া যায়। আমরা সুধু মুখের গড়নই (অর্থাৎ নাক-চোখ-ঠোঁট) দেখিয়া তুষ্ট হই, কিন্তু যাঁহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তাঁহারা মুখের সঙ্গে দেহের গড়ন দেখিয়াই তবে রূপের যাচাই করেন। তৃতীয় দ্রষ্টব্য, মানানসৈ অঙ্গসৌষ্ঠব (Balance and Symmetry)। খালি রঙ-গড়ন থাকিলেই চলিবে না, যাহার দেহের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সঙ্গে ঠিকমত খাপ খায় না, সে নিখুঁত সুন্দর নয়। দেহের তুলনায় কাহারও মাথা, কাহারও হাত বড়-ছোট হয়, কাহারও দেহের উপরদিকটা হয় ভারি আর নীচের দিকটা

অ্যাপলো

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

হাল্‌কা, আবার কাহারও দেহ হয় ইহার বিপরীত,—এ-রকম বেখাপ্পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের সৌন্দর্য্যকে অনেকটা খেলো করিয়া দেয়।

কিন্তু রঙ, গড়ন ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব, এই তিনের সুন্দর মিলন বাঙ্‌লা দেশে কোথাও আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। কারণ এদেশে এ-সব বিষয় লইয়া কেহ আলোচনা করে না, তাই এমন নিখুঁত-সুন্দর পুরুষ বা নারীর ছবি বা বর্ণনা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তবে সাদা চোখে পরিচিত ও অপরিচিত অন্তপুরে যে-সব রূপের নমুনা দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, নিখুঁত-সুন্দর কোন পুরুষ বা নারী আজ-পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই।

ভালো মুখ এদেশে প্রায়ই চোখে পড়ে, দু-একজন ফরসা লোকও দেখি। কিন্তু সেইসঙ্গে উপযোগী দেহের গঠন-সৌন্দর্য্য আমরা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। গড়ন-হিসাবে সাহেবরা আমাদের চেয়ে কত উঁচুতে! সাহেবদের মধ্যে শতকরা আশীজনের দেহের গড়ন আমাদের চেয়ে অনেকগুণে ভালো, কিন্তু নির্দ্দোষ গঠন-

বঙ্কিম তনুলত পুরন্ত বাহুর ভঙ্গিমায় অপূর্ব্ব ছন্দ সৌন্দর্য্য আমাদের মধ্যে শতকরা দশজনেরও আছে কিনা সন্দেহ।

ইহার একমাত্র কারণ, ব্যায়ামের অভাব। ফুলগাছের চারা যেমন গজাইয়া উঠিলেও তাহার প্রতি যত্নের আবশ্যক, মানুষের দেহ-সম্বন্ধেও ঠিক তাই। উপযুক্ত যত্ন না হইলে এ দেহ-তরুও ক্রমেই শুকাইয়া যাইবে। প্রতিদিন পনেরো হইতে ত্রিশটি মিনিট ব্যায়ামের জন্য খরচ করিলে সময়ের অপব্যয়ও হইবে না—দেহেরও উৎকর্ষ-সাধন হইবে। আমরা—বাঙালীরা বাল্যে বা প্রথম যৌবনে, যে-সময়ে দেহ গঠিত হয় তখন বাপ-মার কথায় লেখা-পড়ার মত ব্যায়াম করিতেও বাধ্য হই না, ফলে যৌবন যাইতে-না-যাইতেই বুড়া হইয়া পড়ি। কেহ কেহ পরে বেশী বয়সে ব্যায়ামের উপকারিতা বুঝিয়া ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। তখন স্বাস্থ্য বা বল লাভ হইলেও দেহের চাক্ষুষ উন্নতি বড় বেশী হয় না। কেননা, একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পরে মানুষের দেহের বাড় থামিয়া যায়।

সাহেব-মেমরা অনেকেই নিয়মিত ব্যায়াম করেন। তাহার ফলে তাঁহাদের দেহে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের যে অভাব থাকে, ব্যায়ামের দ্বারা তাহার অনেকটা পূরণ হইয়া যায়। কিন্তু বাঙালী যুবকরা সুধু মনের চর্চ্চাতেই প্রাণপণে নিযুক্ত থাকেন—দেহের চর্চ্চা বোধ হয় তাঁহাদের মতে একান্ত অনাবশ্যক। ফলে "য়ুনিভার্সিটি"র জাঁতাকলে তাঁহাদের দেহ দুইদিনেই ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া যায় এবং সে ভাঙা দেহে মনও বেশীদিন টেঁকে না।

ছেলেদের হাল এই—মেয়েদের অবস্থা আরো শোচনীয়। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা এবং

আর-একটি আপলোর মুখ

স্ত্রী-স্বাধীনতা দুয়েরই অভাব। মেয়েরা মনের চর্চ্চাও করেন না—দেহেরও না! ঘরকন্নার কাজ—অর্থাৎ রান্নাবান্না, বাটনাবাটা, বাসন-মাজা ও পান-সাজা প্রভৃতি শিখিলেই

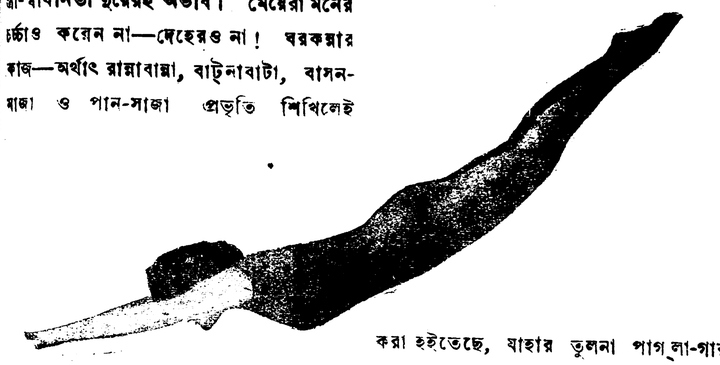

মিস্ কেলারম্যান জলে ঝাঁপ দিতেছেন

তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। রেওয়াজ নাই বলিয়া তাঁহারা অন্দরের বাহিরেও পা ফেলিতে পারেন না। কাজেই খোলা-হাওয়ায় ইচ্ছা-মত নিয়মিত চলা-ফেরাতেও যেটুকু ব্যায়ামের কাজ হয়, সেটুকু হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত। অন্তঃপুরেও তাঁহাদের জন্য যদি ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলেও কথা ছিল। কিন্তু এই হতভাগা দেশে এ কথাটাও এমন নূতন যে, শুনিলেই সমাজপতিরা বলিয়া উঠিবেন, "হিন্দুর ঘরের মেয়েরা ব্যায়াম করবে,—ডম্বল ভাঁজবে! অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মুখ যে তাহলে পুড়িয়ে দেওয়া হবে!—বাঙালীর প্রাণ যে নাভিশ্বাস ছাড়বে!" বাস্তবিক, যাহা-কিছু নূতন তাহারই সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে জড়াইয়া, এদেশে আজকাল এমন-সব যাচ্ছেতাই গোলমাল করা হইতেছে, যাহার তুলনা পাগ্‌লা-গারদ ছাড়া অন্য-কোথাও পাওয়া দুর্লভ!

বাঙ্‌লা দেশে একালে আর-একশ্রেণীর মেয়ে দেখা যায়, তাঁহারা শিক্ষিতও বটে, স্বাধীনও বটে। কিন্তু তাঁহারাও সুন্দরী হইতে চান মুখে রুজ-পাউডার মাখিয়া—অথচ ব্যায়ামের ধার দিয়াও যান না। তাঁহাদের অবস্থাও অনেকটা পূর্ব্বকথিত বাঙালী ছাত্রদের মত।

আমাদের মতে, ছোট ছোট মেয়েদের নাচ-শিখানো একসঙ্গে উপকারী ও দরকারী। অবশ্য, যৌবনে স্বামীর সংসারে গিয়া, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর দৃষ্টিকে স্তম্ভিত ও হতভম্ব করিয়া বঙ্গললনাকে আমরা খেমটা-নাচ নাচিতে পরামর্শ দিই না,—কিন্তু বাল্য ও শিশু বয়সে দেহ যখন গড়িয়া ওঠে, নাচ যখন স্বাভাবিক নির্দ্দোষ আনন্দ, তখন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসারী হইয়া উপযোগী শিক্ষকের সাহায্যে তাহাদিগকে নাচ শিখাইতে আপত্তি কি? এখানে সমাজও বাধা দিবে না।

নাচের মত চমৎকার ব্যায়ামও খুব কম আছে। অন্যান্য ব্যায়ামের মত ইহা কষ্টকর

সুগঠন দেহ ও সুন্দর মুখ-চোখ নাক—
সমস্ত লইয়া যেন একটি স্থির-চপলার স্বপ্ন!

ও একঘেয়েও নয়, তাহার উপরে নৃত্যকলায় মানুষের দেহও নানাভাবে সঞ্চালিত হয়, গঠন নিখুঁত হইয়া ওঠে, ভাবভঙ্গীতে মাধুর্য্য এবং চলা-ফেরায় মধুর ছন্দের আভাস জাগে,—এককথায় যাহার জন্য রমণীর দেহ অপূর্ব্ব এবং বিশ্বকবির মহাকাব্য বলিয়া কীর্ত্তিত, নৃত্যের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। যে রমণী চলিতে জানে না, বাহু-লতাকে ব্যবহার করিতে জানে না, তনুকে লীলায়িত করিতে জানে না,

রূপরাণী ভেনাস

তাহার সৌন্দর্য্যে কোনই মাধুর্য্য নাই
সে যদি স্বামীর দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতে
পারে, তবে আমরা আশ্চর্য্য হইব না
তাঁহাকেই বলি পরমা সুন্দরী রমণী,

যাঁহার দেহের ছন্দ ও তার সমান, যাঁহার উত্তমাঙ্গের ভঙ্গী লঘু, যাঁহার চলাফেরা যেন ডানায় ভর দিয়া, যাঁহার চরণপাত নিঃশব্দ মেঘের মত, যাঁহার প্রত্যেক গতি ও ভাবের লীলা গীতি-কবিতার মত। তাঁহার দেহের কোন-একটি বিশেষ অঙ্গ বা বিশেষত্বের জন্য আমরা মোহিত হইব না,—তাঁহার মাথার তিমির-নির্ঝরের মত এলানো কুন্তল বা ভুরুর ধনুকের তলায় চপল ডাগর চোখে চাহনির বিদ্যুৎ-চমক, (যাহা তীরের চকচকে ফলার মত বুকের ভিতরে আসিয়া বিঁধে), বা মোমের মত নরম-নধর দীর্ঘ গ্রীবার ভঙ্গিমা বা কাঁধের হাতের কি পায়ের নিটোল সুডৌল গড়ন বা গোলাপ-যূথিকার মিলিত রঙের মত বর্ণমাধুরী বা এম্‌নি কোন-কিছুর বিশেষ সৌন্দর্য্য নয়,—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সমস্ত ভাবের ও রূপের রস দিয়া নিখুঁত সুন্দরীরা আমাদের চোখ-মনকে বিভোর করিয়া দেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য খণ্ড ভাবে নয়—সমগ্রভাবে দেখিবার জিনিষ।

প্রসিদ্ধ রুশ-নর্ত্তকী Mlle. Lydia Kyasht-এর দেহ গতি-লাবণ্যের এম্‌নি শরীরিণী মূর্ত্তি।

রমণীর পক্ষে সাঁতার আর একটি ভালো ব্যায়াম। অবশ্য এ সুযোগ সুধু পল্লীবালাদেরই আছে এবং পল্লীগ্রামের অনেক বাঙালী মেয়ে সাঁতার দিতেও পারেন। কিন্তু ঠিক নিয়মিত উপায়ে সাঁতার না দিলে দেহের বিশেষ-কোন উপকার হয় না,—কাজেই এদেশে যে-সব মেয়ে সাঁতার জানেন, তাঁহারাও সাঁতারের যথার্থ উপকারটি পান না। বিখ্যাত মেয়ে-সাঁতারী মিস্ আনেট

কেলারম্যান নিজের দেহের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, রমণীর পক্ষে সাঁতার কেমন উপকারী ব্যায়াম। মিস্ কেলারম্যানের দেহ এখন রমণীর আদর্শ-দেহরূপে প্রসিদ্ধ। গ্রীক ভাস্করের গড়া "ভেনাস ডি মিলো" বা রূপলক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি এতদিন রমণীর নিখুঁত চেহারা বলিয়া নাম কিনিয়া আসিয়াছে। সেটি কিন্তু রমণীর কল্পিত মূর্ত্তি, বাস্তব জীবনে কেহই তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশা করে নাই। মিস্ কেলারম্যান সে ভ্রম আজ ভাঙিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দেহের মাপজোক প্রায় অবিকল ভেনাসের মত।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এদেশে যে-সকল বাঙালী পুরুষ ব্যায়ামের দ্বারা দেহকে গড়িয়া তুলেন, তাঁহারাও দেহের প্রকৃত আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ভারি-ওজনের মস্তবড় লম্বা-চওড়া দেহই আদর্শ দেহ নয়,—মধ্যম-ওজনের দেহই আদর্শ হইবার যোগ্য। সুধু বাঙলা নয়—সমস্ত ভারতবর্ষেই এই ভুল বিশ্বাস বদ্ধমূল। সেইজন্যই ভারতীয় পালোয়ানদের দেহ সাধারণত য়ুরোপীয় পালোয়ানদের মত সুন্দর-সুশ্রী হয় না,—হয় এক-একটি বিপুলবপু ভুঁড়িওয়ালা মত্তহস্তীর মত—তাহাতে না আছে সুগঠন, না আছে সৌন্দর্য্য। ইটালীর যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন ভাস্করের গড়া "আপলো"র মূর্ত্তিটিই আদর্শ পুরুষ-দেহ বলিয়া বিখ্যাত। আমরা এখানে আপলোর অন্য দুটি প্রতিমূর্ত্তি এখানে এখানে দিলাম।

এতক্ষণ আমরা দেহের বাহিরের রূপের কথাই বলিলাম। কিন্তু রূপ সুধু ত দেহের উপরেই থাকে না—তরল মেঘের আড়াল

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

হইতে সূর্য্যের কিরণধারা যেমন বাহিরে বহিয়া আসে, মানুষের অন্তর্গুপ্ত প্রাণের সৌন্দর্য্যের আভাসও তেমনি দেহের বাহিরে ফুটিয়া ওঠে। মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা জানেন, বাহিরের চেহারা-হিসাবে অসুন্দর অনেক রমণী বা পুরুষ, অসংখ্য মানুষকে গোলাম করিয়া ফেলিয়াছে। ইতিহাসে ইহার অজস্র প্রমাণ আছে। কিন্তু ইহার কারণ কি? কেন তাহারা আকর্ষণ করে? —কেবলমাত্র প্রাণের সৌন্দর্য্যে! মানুষের চোখ হইল তাহার প্রাণের জানালা। প্রাণের ভাব সেই চোখ দিয়া বাহিরে আসে, মুখের উপরে জাগিয়া ওঠে। প্রাণের সৌন্দর্য্য না থাকিলে যে-কোন সুশ্রী-সুন্দর পুরুষ বা রমনীকে পাথরের মরা মূর্ত্তির মত দেখায়। তাহাকে ঘর-সাজানো পুতুলের মত ব্যবহার করা চলে, কিন্তু ভালোবাসা যায় না, প্রাণ দেওয়া যায় না, জীবনের সঙ্গী করা যায় না। প্রাণের প্রকাশই দেহের সৌন্দর্য্যকে জীবন্ত করে, এ-কথা ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না। যতই রুজ-পাউডার মাখুন, ব্যায়াম করুন, ভালো সাজ-পোষাক পরুন, প্রাণের শ্রীকে অবহেলা করিলে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বিলাতে আদর্শ-দেহ লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞরা আদর্শ দেহের যে মাপ ও ওজন স্থির করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার কিছু-কিছু উদ্ধার করিয়া বিদায় লইব।

প্রথমে তিনশ্রেণীর পুরুষ-দেহের আদর্শ।

যে পুরুষ মাথায় পাঁচফুট উঁচু, তাহার দেহ এইরূপ হওয়া উচিত :—দেহের ওজন —একমণ সাড়ে-ষোলসের। ঘাড়ের বেড় তের ইঞ্চি। বুকের বেড় (সাধারণ অবস্থায়) সাড়ে-চৌত্রিশ ইঞ্চি। কোমরের বেড় ছাব্বিশ ইঞ্চি। বাহুর বেড় বারো ইঞ্চি। উরুর বেড় সতেরো ও সিকি ইঞ্চি। পায়ের ডিম তের ইঞ্চি।

যে পুরুষ মাথায় পাঁচফুট ছয় ইঞ্চি উঁচু, তাঁহার দেহ এইরূপ হওয়া উচিত :—

ওজন—একমণ সাড়ে-উনত্রিশ সের। ঘাড় সাড়ে-চৌদ্দ ইঞ্চি। বুক সিকি-ইঞ্চি-কম আটত্রিশ ইঞ্চি। কোমর সাড়ে-আটাশ ইঞ্চি। বাহু সাড়ে-তের ইঞ্চি। উরু সিকি-ইঞ্চি-কম উনিশ ইঞ্চি। পায়ের ডিম সাড়ে-চৌদ্দ ইঞ্চি।

যে পুরুষ মাথায় ছয়ফুট উঁচু, তাঁহার দেহ এইরূপ হওয়া উচিত।

ওজন দুইমণ-সাড়ে বারো সের। ঘাড় ষোল ইঞ্চি। বুক পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি। কোমর সাড়ে-চৌত্রিশ ইঞ্চি। বাহু ষোল ইঞ্চি। উরু চব্বিশ ইঞ্চি। পায়ের ডিম সতেরো ইঞ্চি।

নিখুঁত রমণী-দেহ উচ্চতায় পাঁচফুট তিন ইঞ্চি হইতে পাঁচফুট সাত ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইবে। তাঁহার দেহের ওজন হইবে এক মণ সাড়ে-বাইশ সের হইতে একমণ ত্রিশ সের পর্য্যন্ত।

তাঁহার নাকের ডগায় একটি ওলন ধরিলে সেটি তাঁহার পায়ের বুড়ো-আঙুলের সামনে এক ইঞ্চি তফাতে আসিয়া পড়িবে। তাঁহার দুই কাঁধ হইতে নীচের দিকে দুটি সরল রেখা টানিলে, সেই রেখাদুটি তাঁহার পাছার ঠিক দুইপার্শ্ব স্পর্শ করিবে।

তাঁহার বুকের বেড় হইবে আটাশ ইঞ্চি হইতে ছত্রিশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। তাঁহার পাছার মাপ এর-চেয়ে ছয় হইতে দশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বেশী হইবে। তাঁহার কোমরের বেড় হইবে আকার-অনুসারে বাইশ হইতে আটাশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

তাঁহার বাহুর উপরার্দ্ধ ঠিক কটি-রেখার কাছে এবং নিম্নার্দ্ধ ঠিক উরুর মাঝখানে আসিয়া শেষ হইবে।

তাঁহার চিবুক হইতে হাতের আঙুলের ডগা যতখানি, তাঁহার পায়ের মাপ লম্বায় ঠিক ততখানি হইবে। (অর্থাৎ তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্দ্ধভাগের সমান) তাঁহার মাথা হইতে কোমরের মাপ যতখানি, তাঁহার কোমর হইতে পায়ের মাপ তার চেয়ে প্রায় একফুট বেশী হইবে।

দেহের অন্যান্য মাপ এই :—পাঁচফুট তিন ইঞ্চি উঁচু রমণীর ঘাড় বারো ও সিকি ইঞ্চি; পুরোবাহু সাড়ে-আট ইঞ্চি, কব্জি ছয় ইঞ্চি, উরু সাড়ে-একুশ ইঞ্চি এবং পায়ের ডিম তের ও সিকি ইঞ্চি হইবে।

পাঁচফুট সাতইঞ্চি উঁচু রমণীর ঘাড় তের ও সিকি ইঞ্চি; পুরোবাহু সিকি-ইঞ্চি-কম দশ ইঞ্চি, কব্জি সাড়ে-ছয় ইঞ্চি, উরু পঁচিশ ইঞ্চি এবং পায়ের ডিম সাড়ে-পনেরো ইঞ্চি হইবে।

যদি এই মাপকাটি ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহাহইলে আমাদের দেশে সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত অধিকাংশ পুরুষ ও রমণীর রূপের দেমাক নিশ্চয়ই ভাঙিয়া যাইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সঙ্কলন

অরবিন্দের পত্র

* * *

"আমি যা অনেক দিন থেকে দেখছি তার দু একটী কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে জাতির দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দরিদ্রতা নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু শক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের প্রাধান্য। সর্ব্বত্রই দেখি inability বা unwillingness to think, চিন্তা করবার অক্ষমতা বা চিন্তা করিবার অনিচ্ছা"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই অক্ষমতা ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটী জিনিস—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেই খানে; সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা'

মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এ সব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তার পর ভারত দেখ। কয়েকজন Solitary growth ছাড়া সর্ব্বত্রই * * * সোজা মানুষ, অর্থাৎ average man; যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলী মজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনে সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে তবে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার Fatal limtation আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics, yogic hallucination; ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation ও surmount করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই; সহজের উপাসক; সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, ধর্ম্ম বাহ্যের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গালা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের Capacity আছে, intuition আছে,—এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা' হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না; সহজে সারতে চায়; চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। তারপর অবসাদ তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছেনা, পরবার কাপড় পাচ্ছেনা, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ কচ্ছে। শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমে সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া মনোমালিন্য ঈর্ষা ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, তেমনটি আর ভারতে আর কোথাও তত নাই। আর্য্যজাতির উদার বীর্য্য এত হাঁক ডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু যে আরম্ভ করত তা'রা, তা' বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বলচ চাই ভাব উন্মাদনা, দেশকে মাতাতে রাজনীতিক্ষেত্রে ও সব করেছিলাম স্বদেশীর সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোন ফল হয় নি। হয়েছে; যত movement হয়, কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা' অধিকাংশ potability বৃদ্ধি; স্থিরভাবে actualise করবার শক্তি নয়। সেই জন্য আমি আর emotion excitement, ভাব, মন মাতানকে base করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি বিশাল, বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধার সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তির জ্ঞান সূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তার

অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstesy। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ' ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভাগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা' দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটুলি St. Peterএর চাদরের মত; অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজগিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয় নি বলে নয়, আমি তৈয়ারী হই নি বলে। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে?

নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

গান

তীরে কি আর আসবেনা তোর তরী?
ঢেউ দেখে তুই নয়ন ভরে
সেই লাজেতেই মরি।
চেয়ে ঝড়ের মেঘের পানে
শান্তি যে তোর নাইরে প্রাণে,
ভাণ্ডারী তোর হাস্‌চে বসে'
ডান হাতে হাল ধরি।

মিথ্যা স্বপন তোর—
এম্‌নি করে জড়িয়েছে রে, ঘুচ্‌লনা তার ঘোর,
প্রভাত আসে তোমার পানে
আলোর রথে আশার গানে,
সে খবর কি দেয়নি কানে
আঁধার বিভাবরী?

মোস্‌লেম ভারত, বৈশাখ ১৩২৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যে পতিত

আজকাল সাহিত্যে সমাজদ্রোহের চিত্র প্রায়ই অঙ্কিত হইতে দেখা যায়। বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণের চিত্র আমরা অনেকগুলি রচনায় পাইয়াছি। কিন্তু একটী রচনায় উপন্যাসের নায়িকা যেরূপ নির্ভীক ও নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহাকেই স্বামী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, বিধবা-বিবাহ-বর্জ্জিত দেশে তাহা বিরল। এই ধরণের রচনার আর একটী বিশেষত্ব আছে,—সেটী হইতেছে ইহাদের অপরাধ বিস্তৃত করিয়া ইহাদের উপর পাঠকের শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার চেষ্টা। এক জন লেখক তাঁহার নায়িকাকে 'মর্ত্তে কলঙ্কিনী' হইলেও স্বর্গের 'সতী-শিরোমণির' মত করিয়া চিত্রিত করিতে গিয়াছেন। কতদূর সফল হইয়াছেন তাহা বলিবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। কারণ কোন রচনা-বিশেষের সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

আমি ইহাই শুধু বলিতে চাহি যে, এই সকল রচনার দোষগুণ কেবলমাত্র ইহাদের সমাজ-বিগর্হিত চিত্রের দিক দিয়া বিচার্য্য নহে। অর্থাৎ বাল-বিধবার

পরপুরুষের প্রতি অনুরাগের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া কোন রচনা নিন্দনীয় নহে, বা কুলত্যাগিনীর চরিত্র আলোচিত হইয়াছে বলিয়া সেই সমস্ত রচনা সৌন্দর্য্যহীন নহে এবং ব্রাহ্মণগৃহের বিধবার স্পর্দ্ধিত অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সেই পুস্তকও কুৎসিত নহে। প্রত্যেক উপন্যাসের দুইটী দিক—একটী হইতেছে তাহার plot বা গল্পাংশ; আর একটি এই plotএর execution অথবা গল্পাংশের বিবৃতি-কৌশল। সমালোচকের প্রধান দ্রষ্টব্য হইতেছে execution; plot বা গল্পাংশে লেখক সামাজিক নীতি ও বিধানের লঙ্ঘন কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই তাহা দোষের নহে, অথবা যাহারা এই নীতি লঙ্ঘন করিয়া সমাজে পতিত হইয়াছেন তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া তাহা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না।

প্রশ্ন উঠিবে, তাহা হইলে art কি স্বেচ্ছাচারী হইবে? artist কি ইচ্ছামত অধঃপতন ও অধঃপতিতের চিত্র সমাজের সম্মুখে ধরিতে পারিবেন?

যাঁহারা Platoর Republic পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে তিনি কবি ও নাটককারকে উচ্চ স্থান দেন নাই; কারণ তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের দ্বারা প্রবৃত্তির উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইয়া মানুষের সংযম নষ্ট হইতে পারে। Platoর মতানুসারে সেই সাহিত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা মানুষকে বস্তুজগৎ হইতে আদর্শ-জগতে আকৃষ্ট করিতে সহায়তা করিবে। দার্শনিকের স্থান তাই তিনি সকলের ঊর্দ্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মধ্যযুগে আমরা artএর যে আদর্শ দেখিতে পাই তাহাও অনেকটা এইরূপ। মানুষের আদর্শ তখন ছিল পরলোকমুখী; বিচিত্র সৌন্দর্য্যময়ী এই পৃথিবী এবং অসীম বিস্ময়পূর্ণ অনন্ত সুখদুঃখে ভরা মানব জীবন তখন মানুষের চক্ষে সুন্দর ও গৌরবময় বলিয়া বোধ হয় নাই। তাই art তখন কেবলমাত্র দেবদেবী এবং সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী লইয়াই ব্যস্ত ছিল। পার্থিব স্নেহ, প্রেম, জয়-পরাজয় বা দুঃখ সুখকে সাহিত্য আপনার মধ্যে স্থান দেয় নাই। তার পর Reniassanceএর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া লৌকিক আচার-ব্যবহার, লৌকিক সুখ-দুঃখ, লৌকিক জীবন-সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে আসিল; কিন্তু সাহিত্যের theocracyর স্থানে একেবারে democracy না আসিয়া এক প্রকার aristocacryর আবির্ভাব হইল। সাহিত্যে এই aristrociacy স্বদেশে ও বিদেশে এখনও অনেকটা প্রভাবশালী। সমাজে যাহারা তথা-কথিত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত তাহাদের কাহিনীই প্রধানতঃ সাহিত্যে বর্ণিত হইতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে সাহিত্য এই গণ্ডী কাটাইয়া উঠিতেছে। Romanceএর প্রভাব হ্রাস ও Realismএর প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও ক্রমে democratic আদর্শ-পন্থী হইতেছে। য়ুরোপে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচারক ফরাসী জাতিই সাহিত্যে এই মন্ত্রেরও প্রধান প্রচারক। সমাজের সর্ব্বস্তরের চিত্র ও ইতিহাস প্রদান করাই জিল Balzacএর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার Human comedyতে শতাধিক নির্দ্দিশেষে ফরাসী সমাজের তাৎকালিক চিত্রের পর দিয়া তিনি সমস্ত মানব জাতির এক বিরাট চিত্র প্রদান করিয়াছেন। Balzacএর প্রভাব সাক্ষাতে অথবা পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান শতাব্দীতে সমস্তদেশের সাহিত্যে ব্যাপ্ত হইয়া সাহিত্যকে উদার করিয়াছে। অবশ্য অন্যান্য অনেক কারণও সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতেছে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সাহিত্যে যে Realismএর প্রভাবে জনসাধারণ স্থানলাভ করিতেছেন এবং বংশ, পদ ও অর্থের কৃত্রিম বৈষম্যের নিম্নে মনুষ্যত্বের স্বভাব ও জন্মগত সাম্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে তাহারই অন্যতম ধনস্বরূপ যে সাহিত্যে জীবনের নিকৃষ্ট অংশের চিত্রও অঙ্কিত হইতেছে। সমাজে যাঁহারা সৎ ও বরেণ্য তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যাঁহারা পতিত ও ঘৃণিত বলিয়া পরিচিত উপন্যাসকার তাহাদিগকেও রচনায় স্থান দিতেছেন। ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ইহাই আমাদের বিবেচ্য।

একদল লোক আছেন তাঁহারা বলিবেন, যে

কল চিত্র দর্শনে মানুষের নীতিমূল শিথিল হয়, সমাজবন্ধন অতিক্রম করিবার জন্য মানুষের ইচ্ছা হয় তাহা আর্টে অমার্জ্জনীয়। অধঃপতন অথবা অধঃপতিতের কাহিনী সাহিত্যে বর্ণনা করা অন্যায়। ইঁহাদের মতানুযায়ী হইলে সাহিত্য অনতিকাল মধ্যেই পঙ্গু ও অলীক হইয়া পড়ে, কারণ স্বাধীন বিকাশ ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহা ভিন্ন ইঁহাদের মতানুসারে সাহিত্য-সৃষ্টিও এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে; কারণ মানুষের নৈতিক চরিত্র কোন্ দৃশ্য দর্শনে দূষিত হয় সে বিষয়ে মতভেদ থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহার পর সাহিত্যে যাহা হইতে মানুষকে দূরে রাখিতে চান জীবনে কি তাহা করিতে সমর্থ হইবেন? মহারাজা শুদ্ধোধনের মত মানুষকে জীবনের কঠোর সত্য হইতে দূরে রাখিয়া শুধু আবর্জ্জনা আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা একদিন ব্যর্থতা হইতেই বিফল হইয়া যায়। সুখের বিষয় ইঁহাদের উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিবার সম্ভাবনা সাহিত্যের আর নাই।

আর একদল লোক আছেন তাঁহারা বলেন—জীবনের নিকৃষ্ট অংশের, সমাজের পতিত ও অন্যায়ের চিত্র অঙ্কন করিতে পার কিন্তু সাবধান, তাহার প্রতি যেন ঘৃণার বীজ লুক্কায়িত থাকে। Poetic justice যেন লেখকের রচনার মধ্যে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ যে নৈতিক বিধান ভঙ্গ করিয়াছে তাহার আবার দুঃখ সুখের মধ্যেও যেন পরাজয়ের ও দুঃখের ইঙ্গিত থাকে এবং যে পুণ্যাত্মা, তাহার বিফলতার মধ্যেও যেন একটি জয়ের আভাষ লক্ষিত হয়। আমার মনে হয় এই পন্থা অবলম্বন করিলেও সাহিত্য কৃত্রিম হইয়া পড়ে। ইঁহারা জীবনকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেখেন; মানুষের হৃদয় যে অসীম রহস্যপূর্ণ তাহার বৃত্তি যে অতীব জটিল, তাহার কর্ম্ম নিয়ামক মনুষ্য যে অতীব বৈচিত্র্যময় ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া মানুষকে অতি সহজভাবে সৎ ও অসৎ এই দুই পরিষ্কার (clear cut) বিভাগে বিভক্ত করেন, এবং পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সাহিত্যে তাহাই বর্ণনা করেন। কিন্তু মানুষকে আমরা যত শীঘ্র বিচার করিয়া তাহাকে তিরস্কার বা পুরস্কার করি—তাহাকে জয় বা পরাজয়ের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করি জীবনে ত সেরূপ বিচার হইতে দেখা যায় না। Job এর সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল দুষ্টের সম্পদ ও শিষ্টের বিপদ সংসারে তাহাই ত অনেক সময়ে আমাদের চক্ষে পড়ে। সুতরাং poetic justice দিয়া আমরা জীবনের যে সমস্যার সমাধান করিতে যাই তাহা বাস্তবিকই অতি সংকীর্ণ। এরূপ করিতে গেলে সাহিত্য অনেক সময়ই মিথ্যা ও অনুদার হইয়া পড়ে।

আমার মনে হয় সাহিত্যের কাজ বিচার করা নয়। শ্রেষ্ঠ artist যিনি, তিনি এক প্রকার ঋষিকল্প—জীবনে যাহা কিছু সত্য তাহা তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে ব্যক্ত করিবেন। মানব-হৃদয়ে যাহা চিরন্তন—দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যে আদিম প্রবৃত্তি (elemental passions) মানুষকে সংসারে নানা কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে তাহা লইয়াই সাহিত্যের কারবার। সুতরাং মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক—মানুষের জীবনে নিত্য যাহা ঘটে তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারে না। এই জগতের দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক Shakespeare ও Balzac এর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, ইঁহারা পতিতের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—পাপের ও পাপীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন—কিন্তু পাপ পুণ্য অথবা ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিয়া তিরস্কার বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন নাই।

রক্ত মাংস ও আত্মা তিনটী লইয়া মানুষ; একদিকে সে ইতর জন্তুর সহিত জ্ঞাতিত্বে সংশ্লিষ্ট; আর এক দিকে আবার সে অনন্ত আত্মার অংশ—ভগবানের বিশিষ্ট প্রকাশ। তাহার প্রবৃত্তিও তাই অতি জটিল—স্বর্গ ও নরক দুই দিকেই তাহার আকর্ষণ। যিনি শুধু মানুষের নারকীয় প্রবৃত্তির চিত্রই অঙ্কন করেন তিনিও যেমন একদেশদর্শী যিনি আবার তাহাকে দেবতা করিয়াই চিত্রিত করেন তিনিও সেইরূপ সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি মানবহৃদয়ের বিশ্লেষণ হয়, আর্টের লক্ষ্য যদি জীবনের চিত্র প্রদর্শন হয়, তবে তাহাকে জীবনের এই দুই দিককেই ব্যক্ত করিতে হইবে। ইহাতে যদি সমাজের কোন বিধানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা

করিয়া যায়, অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে পতিতের জীবনের প্রতি আকর্ষণ জাগিয়া উঠে তাহাতে উপায় নাই। তাই বলিয়া সংসারে যে ব্যক্তি পাপের পিচ্ছিল পথে নরকের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা হইবে না অথবা করিলেই তাহাকে জীবনে পরাভূত করিয়াই বর্ণনা করিতে হইবে এমন কোন দুর্লঙ্ঘ্য বিধান সাহিত্য মানিতে পারে না। কারণ জীবনে প্রকৃতির রাজ্যে এমন কিছু কঠোর নিয়মের আমরা পরিচয় পাই না।

বোধ হয় পতিতার চিত্র যে সব পুস্তকে অঙ্কিত হইয়াছে সেই সব পুস্তক যাঁহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন তাঁহারা এই সকল কথা ভুলিয়া যান। তাঁহারা বলেন, ভ্রষ্টানারীর প্রতি লেখকের এত সহানুভূতি কেন? শৈবলিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র কত না শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক লেখকগণের রচনায় ভ্রষ্টানারীর সে শাস্তি কোথায়? তাহাদের অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত লেখক করাইলেন? ইঁহাদের মতে যাহারা পতিত—যাহারা সমাজের কোন নৈতিক বিধান ভঙ্গ করিয়াছে তাহারা সহানুভূতির একেবারে অযোগ্য—তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ঘৃণিত করিয়া বর্ণনা না করিলে সমাজের পবিত্রতা রক্ষা হইবে না। বড় হৃদয়হীন কঠোর এই সমস্ত সমালোচক :

কিন্তু আমার মনে হয় সাহিত্যে তাঁহাদের এই মত শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিবে না। যে democratic ideal সাহিত্যে আসিয়াছে তাহারই উত্তরোত্তর স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যাহারা পতিত ও পাপী তাহারাও প্রকৃত বিচারের দাবী করিবে। সমাজের কোন একটি বিধান, নৈতিক কোন একটি নিয়ম অবহেলা করিয়াছে বলিয়াই যে মানুষ একেবারে সর্ব্বপ্রকারে ঘৃণিত বলিয়া গণ্য হইবে, এই বিচারের বিপক্ষে পতিতের অভিযোগ একদিন সমাজকে শুনিতেই হইবে। মানুষের হৃদয়ে সহানুভূতি-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা বলবতী হইলে একজন আর একজনকে সহজে আর তিরস্কার বা পুরস্কার করিবে না।

জীবনে মানুষের অধঃপতন হয় অনেক প্রকারে—সকল প্রকার অধঃপতনই কি একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া বিচারিত হইবে? নৈতিক অথবা সামাজিক আদর্শও মানুষ অনেক কারণে অনেক উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভাঙ্গিতে পারে। তাহাদের জীবনের সেই ইতিহাস সেই কৈফিয়ৎ (defence) সেই কাহিনী না শুনিয়াই কি তাহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে? তারপর নীতি বা সমাজের একটি আদর্শ যে ভাঙ্গিয়াছে —আর একটী আদর্শ হয়তো সে নিজ জীবনে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাকে কি আমরা চিরদিন অবজ্ঞাই করিব? একটী বিষয়ে যে জীবনে অতীব অন্যায় করিয়া সমাজ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, আর একটী বিষয়ে যদি তাহার ত্যাগ অসাধারণ হয় তবে তাহাকে শ্রদ্ধা করা কি অন্যায়? সমাজ যাহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিয়াছে সাহিত্য যদি তাহাদিগকে এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়া পাঠকের সহানুভূতির উদ্রেক করে তবে কি সে সাহিত্যকে সমাজদ্রোহী বলিয়া তিরস্কার করা উদারতার পরিচায়ক? যিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইবেন তিনি সংস্কারবর্জ্জিত হইবেন, কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে কোন সত্য হিতকারী কি না ইহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহার অন্তরতম অনুভূতির দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিবেন তাহাকেই তিনি ব্যক্ত করিবেন। কোন বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শ দিয়া নরনারীর বিচার না করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা সনাতন, যাহা স্বাভাবিক, তাহাকেই গভীর সহানুভূতির সহিত তিনি সাহিত্যে আঁকিয়া দিবেন। অসীম রহস্যপূর্ণ এই স্বর্গমর্ত্ত্যের অসংখ্য শক্তির ক্রীড়নক এই মানুষ—পিচ্ছিল ও দুর্গম এই জীবনের পথ—এই কথা মনে রাখিয়া বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ artist তিনি অগাধ সহানুভূতি ও ক্ষমা লইয়া মানুষের কার্য্যকলাপ দর্শন ও বর্ণনা করিবেন। পতিতের দুঃখ-সুখ, পতিতের জীবনের কাহিনী তাঁহার রচিত সাহিত্যের বহির্ভূত হইতে পারে না।

যমুনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দাশাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার ক্রমিক সং শ্রেণী সং কলিকাতা।

ভারতী

৪৪বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৭ [৪র্থ সংখ্যা

বিষ্ণু-বাহন গরুড়

[রূপম্-পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-রচিত ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে]

পুরাণোক্ত বিহঙ্গরাজ-রূপে,—নাগকুলের নির্দ্দয় সংহর্ত্তা-রূপে,—এবং বিষ্ণুর বাহন-রূপে, গরুড় (১) হিন্দুর প্রতিমা-তত্ত্বে প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ প্রতিমা-তত্ত্বেও গরুড় সুপর্ণ নামে সুপরিচিত। উভয় স্থলেই তাহার সমুচিত স্থান উপ-দেবতার ভিতর। কিন্তু বিষক্রিয়ার প্রতিষেধ-সাধনে তাহার দৈবশক্তি আছে, এই বিশ্বাসে সময়-বিশেষে মূল দেবতার ন্যায় তাহারও অর্চ্চনা হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে গরুড়ের যে পূজাপদ্ধতি আছে, তাহার ধ্যানে (২) গরুড় "পদ্মনেত্রং সুবক্ত্রম্" বলিয়া বর্ণিত।

(১) সংস্কৃত সাহিত্যে গরুড় নানা নামে পরিচিত; এতৎ সম্বন্ধে তন্ত্রসারে গরুড়ের স্তব, এবং অমরসিংহ জটাধর, হলায়ুধ প্রভৃতির কোষগ্রন্থে গরুড়ের প্রতিশব্দ দ্রষ্টব্য। সর্ব্বত্রই গরুড় নাগ-নাশক অথবা নাগ-ভক্ষক রূপে অভিহিত। যথা—নাগান্তক, পন্নগাশন (অমরকোষ); উরগাশন (জটাধর); নাগাশন (হারাবলী) ভুজগান্তক (রাজনির্ঘণ্ট)। মধ্যযুগের শিল্পকলায় গরুড়ের প্রতিমা সাধারণতঃ নাগ-ভূষণে ভূষিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২) বর্ম্মান্তর-বহ্নি-যুগ্মাক্ষর কমলগতং পঞ্চভূতাত্মবর্ণং।
ক্লিপ্তকল্পম্ ফণীন্দ্রৈ রভয়বরকরং পদ্মনেত্রং যুবক্ত্রং॥
দুষ্টাহিচ্ছেদিতুণ্ডং স্মরদবিলবিধপ্রাণনং প্রাণভূতং।
প্রাণ-শেষ্যাং ত্রিবেদিতনুমমৃতময়ং পক্ষিরাজং ভজেঽহং॥

গরুড়ের মূলদেবতা রূপে পূজা এখন বড় প্রচলিত নাই; কিন্তু পুরীতে এখনও সময় সময় সর্পদংশন হইতে জীবনলাভের আশায়, সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আনিয়া মন্দিরের সভামণ্ডপের সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

ক্রমিক সং শ্রেণী সং

গুণওয়েডেল বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষে গরুড়-পক্ষীর প্রতিকৃতি-রচনা অতি প্রাচীন, কিন্তু এই পুরাণবর্ণিত প্রাণীর ধারাবাহিক আলোচনা নিরতিশয় দুরূহ। (৩) গরুড়ের আকারে গঠিত বৈদিক বেদীর উল্লেখ করিতে গিয়া, তিনি সেই প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে যে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য বুঝিবার পক্ষে যাহার মূল্য আছে বা যাহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সুনিশ্চিত তিনি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

গরুৎ শব্দের অর্থ পক্ষ। এই গরুৎ-শব্দ হইতেই গরুড় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গরুড় বলিতে যে কোনও পক্ষবিশিষ্ট প্রাণীকে বুঝাইতে পারে। সুতরাং আমাদিগের বর্ত্তমান যুগেও ভারতবর্ষের কোনও কোনও প্রদেশে সর্পভুক ঈগল যে গরুড় নামে অভিহিত হইবে, তাহা বিস্ময়কর নহে। সর্পভুক ঈগল যে ঐরূপ গরুড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা গুণওয়েডেল লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, প্রতিমাতত্ত্বে, বঙ্গদেশের ও যবদ্বীপের শিল্প-কলার গরুড়ের মূর্ত্তিই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়।—এ বিষয় এখনও পণ্ডিত-সমাজের যথাযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মহাভারতের মতে, সূর্য্য-সারথি অরুণের অনুজরূপে বিহঙ্গের আকারে গরুড়ের জন্ম হয়। অরুণ খঞ্জরূপে জন্মগ্রহণ করায় গরুড়ই বিহঙ্গকুলের রাজপদ লাভ করে। পরে বিষ্ণু তাহাকে অমর করিয়া দেন এবং আপন বাহন-পদে নিযুক্ত করেন। বিষ্ণু তাঁহার ধ্বজপতাকায় গরুড়ের প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট করিয়া গরুড়কে অধিকতর সম্মান দান করেন। উল্লিখিত পৌরাণিক জন্মকাহিনীতে গরুড়—ভীষণ ও বীভৎস-মূর্ত্তি, অসাধারণ শক্তিশালী বিরাট বিহঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এবং ঐশী শক্তিতে গরুড় যে কামরূপী তাহাও উক্ত হইয়াছে। এই পৌরাণিক বর্ণনা শিল্পীর মূর্ত্তিকল্পনার স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়াছে, এবং ভারতীয় শিল্পীগণও তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া প্রয়োজনোচিত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, পরিশেষে তাহাই শিল্পকলার সূত্রাদেশে এক অপরিবর্ত্তনীয় আকারে সন্নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা পুরাণোক্ত বিহঙ্গাকারের বহু অর্থহোতক পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন, এবং এইরূপে আকার ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে গরুড় এক চঞ্চুবৎ-নাসিকা-বিশিষ্ট বৃত্তনেত্র পক্ষযুক্ত মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল হিন্দু শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার ভিতর এমন কোনও গরুড় মূর্ত্তি পাই নাই যাহাকে সত্য সত্যই প্রাচীন বলা যাইতে পারে এবং পুরাণোল্লিখিত আকারের সহিত যাহার আকারের পার্থক্য নাই। সাঁচীর পূর্ব্ব দ্বারের দ্বিতীয় প্রস্তর-ফলকের ভিতর দিকে

(৩) Buddhist Art in India, Revised and enlarged by Burgess, পৃষ্ঠা ৭ শুঙ্গযুগে বেদিনির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সহায়তায় বেদিনির্ম্মাণ ও বেদীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ত্তিগাত্রে বোধিদ্রুমকে পরিবেষ্টন করিয়া ভক্ত জীবজগৎ অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার ভিতর টিয়াপাখীর মত যে প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে গুণওয়েডেল গরুড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৪) হিন্দুর চিত্রশিল্পে কিন্তু টিয়াপাখীর আকারবিশিষ্ট গরুড় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, বা ঐরূপ কোন মূর্ত্তির পরিকল্পনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথায় অবশ্য গরুড়ের পৌরাণিক জন্মকাহিনীর ও গরুৎমান্ দ্বিপদ-রূপের সহিত জন্ম-সম্পর্কের পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত পক্ষ দুইখানি শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আকার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া মানুষের রূপই পরিস্ফুট করিয়াছে, এবং পরিশেষে বাঙ্গালার মধ্যযুগের শেষাংশের শিল্পকলায়, সানুনয়ে অঞ্জলীকৃত।(৫) আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে পুরাণের বিহঙ্গ—গরুড়, শিল্পশাস্ত্রের আর্য্যার বর্ণিত অর্দ্ধমনুষ্যীভূত জীব—গরুড়, মহাপ্রভু বিষ্ণুর পরিচর্য্যানিরত আদর্শ ভক্তরূপে পরিকল্পিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাণের বর্ণিত ও শিল্পশাস্ত্রের নিয়মিত আকার হইতে এই যে পরিণত বিকাশ-ঘটিত পার্থক্য, তাহাই শিল্পাদর্শের স্বতন্ত্রতা সূচিত করিতেছে, এবং এই বিকাশের লীলাক্ষেত্রের নামানুযায়ী ইহাকে গৌড়ীয় শিল্পাদর্শ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের লিপিবদ্ধ বিধানে আমরা গরুড়ের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হই, তাহাতে গরুড় বৃত্তনেত্র ও বৃত্তমুখ, তাহার নাসিকা কৌশীকাকার, গৃধ্রের ন্যায় তাহার পদদ্বয়, চতুর্হস্তের দুইখানি ছত্রধারণরত ও অপর দুইখানি সানুনয়ে অঞ্জলীকৃত।(৫) আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে

(৪) চাক্ষ্যৌ মারকতপ্রখ্যঃ কৌশিকাকার-নাসিকঃ।
চতুর্ভুজস্ত কর্ত্তব্যো বৃত্তনেত্র-মুখস্তথাঃ॥
গৃধ্রোরুজানুচরণঃ পক্ষদ্বয় বিভূষণঃ।
প্রভাসংস্থানকৌবর্ণঃ কলাপেন বিবর্জ্জিতঃ॥
ছত্রঞ্চ পূর্ণকুম্ভঞ্চ করয়োস্তস্ত কারয়েৎ।
করদ্বয়স্তু কর্ত্তব্যঃ তথাস্য রচিতাঞ্জলিঃ॥

এই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে (৩য় ভাগ, ৪৪ অধ্যায়) এই বর্ণনা উদ্ধৃত হইল। গোপীনাথরাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography নামক গ্রন্থে (১মখণ্ড, ২য় ভাগ, মূল, ৭৩ পৃষ্ঠা) এই বর্ণনা কিঞ্চিৎ পাঠান্তরিত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার পাঠে 'কলাপেন বিবর্জ্জিত' স্থলে 'কলাপেন বিরাজিত' দৃষ্ট হয়। কলশব্দ মানে পুচ্ছার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্রের বিধান,—পক্ষদ্বয় রাখিয়া, পুচ্ছকে লুপ্ত করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং গোপীনাথ রাও-র উদ্ধৃত পাঠ ভ্রমাত্মক, উহার সংশোধন কর্ত্তব্য।

(৫) যদাস্য ভগবান পৃষ্ঠে ছত্র-কুম্ভধরৌ করৌ।
ন কর্ত্তব্যৌ তু কর্ত্তব্যৌ দেবপাদধরাবুভৌ॥
কিঞ্চিল্লম্বোদরঃ কার্য্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।

এস্থলে গোপীনাথ রাও 'দেবপাদধরৌ শুভৌ' পাঠ ধরিয়াছেন। 'সর্পাভরণভূষিত' মুদ্রাঙ্কনপ্রমাদে "সর্ব্বাভরণভূষিত" হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ শ্রীতত্ত্বনিধি প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে 'ফণিমণ্ডিত' দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গরুড়মূর্ত্তি বিষ্ণুর অনুচর রূপে বিরাজমান, তাহাদের সম্বন্ধেই সর্পাভরণ উল্লিখিত হইয়াছে,—কিন্তু যে

ইহাও আছে,—বিষ্ণু যখন গরুড়ের পৃষ্ঠারূঢ়, তখন তাহার দুইখানি মাত্র হস্ত থাকিবে ও তারা প্রভুর চরণসংলগ্ন রহিবে। অপর এক শাস্ত্রকারের মতে,—গরুড়কে বিষ্ণুর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, তাহার দক্ষিণ জানু ভূস্পৃষ্ট করিয়া আসীন করিতে হইবে, তাহার আকার মানুষের আকার হইবে,—কেবল থাকিবে পাখীর ন্যায় পক্ষ ও তুঙ্গনাসা। (৬)

এই সকল নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা হইতে,—পৌরাণিক রূপ, ক্ষেত্র-বিশেষের প্রয়োজনানুযায়ী কিরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে শিল্পকলার নানা পরিকল্পনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরুড় যখন মূল দেবতারূপে সম্পূজিত, তখন দেবত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত তাহার চারি হস্ত; তাহার পক্ষদ্বয়ের, গৃধ্রপদের এবং তুঙ্গ নাসিকার কোনও পরিবর্ত্তন নাই। গরুড় যেখানে প্রভুর সম্মুখভাগে অবস্থিত, অথবা সত্যসত্যই প্রভুর পরিচর্য্যায় নিয়োজিত, সেখানে তাহাকে আরও মানুষ গড়িয়া তুলা হইয়াছে, থাকিয়া গিয়াছে মাত্র পক্ষদ্বয় ও নাসিকার তুঙ্গত্ব। এই সকল রূপান্তর প্রয়োজনের দ্বারা অনুশাসিত হইয়াছে, এবং ভাবতান্ত্রিক শিল্পানুশীলন কাজে কাজেই বস্তুতান্ত্রিক শিল্পানুশীলন অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পুরাণে বিহঙ্গাকারের ব্যবস্থা থাকিলেও, পরবর্ত্তী হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের বিধান তাহা বিশেষ গ্রাহ্য করে নাই—শিল্পশাস্ত্রে কোনস্থলেই পৌরাণিক রূপ আমূল অনুকৃত হয় নাই। এই কারণেই, পৌরাণিক হিসাবে বিষ্ণুর স্থান গরুড়ের পৃষ্ঠে না হইয়া গরুড়ের স্কন্ধে হইয়াছে।

ভারতীয় প্রতিমা-শিল্পে গরুড়ের রূপান্তর লইয়া গুণওয়েডল প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রসঙ্গান্তে তিনি সরাসরি ভাবে আপনার মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"এদেশের টিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার গ্রিফিন—এতদুভয় হইতে আধুনিক প্রতিমা-শিল্পের গরুড়-মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে।"

ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের গরুড়ের রূপের সহিত উহাদের কাহারও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রিফিন কাল্পনিক জীব মাত্র,—সিংহ ও ঈগল হইতে তাহার জন্মলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া উক্ত হয়। গ্রিফিনের প্রতিমূর্ত্তিতে পক্ষ, চঞ্চু ও চতুষ্পদ

স্থলে গরুড় মূল দেবতারূপে সম্পূজিত তথায় তাহার সুবিদিত নাগান্তক প্রকৃতিই রক্ষিত হইয়াছে: এই অসামঞ্জস্য প্রণিধানযোগ্য।

(৬) উপেন্দ্রস্তাগতঃ পক্ষী গুড়াকেশঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সব্যজানুগতো ভূমৌ মূর্দ্ধা চ ধরিমণ্ডিতঃ॥
স্থূলজঙ্ঘো নরগ্রীব স্তুঙ্গনাসো নরাঙ্গকঃ।
দ্বিবাহুঃ পক্ষযুক্তশ্চ কর্ত্তব্যো বিনতাসুতঃ॥

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহাগারে যে সকল শিলাময় গরুড় মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহারা আলীঢ় বা প্রত্যালীঢ় লীলায় আসীন,—সাধারণতঃ তাহাদিগের বামজানুই ভূমিস্পর্শ করিয়া আছে। সর্পাভরণের কথা শিল্প-সূত্রেই দৃষ্ট হইবে, উহা পৌরাণিক বর্ণনায় নাই; ইহা হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, শিল্পই আপন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত উহার নব-প্রচলন করিয়াছে।

দৃষ্ট হয়,—গ্রিফিনের উপরার্দ্ধ ঈগলের ন্যায়, নিম্নার্দ্ধ সিংহের ন্যায়। নিসর্গে সিংহের পক্ষ নাই; সিংহে পক্ষসংযোগই—গ্রিফিনের বিশেষত্ব। গরুত্মান্ দ্বিপদ ও সলাঙ্গুল চতুষ্পদ,—এতদুভয়ের সহযোগে গ্রিফিন-রূপে বরং এক জীবসঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গরুড়ের রূপান্তরের বিবরণ মূলতঃই অন্যরূপ—গরুড় তথায় ক্রমশঃ মানবীকৃত হইয়াছে, অযাচিত কল্পনার সাহায্যে কিন্তুত-কিমাকার জীবে পরিণত হয় নাই। মূল কল্পনাতেই এইরূপ সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকায় রূপান্তরের আলোচিত মূল সূত্রটিকে প্রকৃত অপেক্ষা কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই অধিক মনে হইবে। যাহা হউক, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে উদ্ভব কাহিনী অপেক্ষা ক্রমবিকাশ কাহিনীর স্থানই অধিক; এবং এ বিষয়ে গরুড়ের ক্রমিক রূপান্তর বিশেষভাবে অনুশীলন-যোগ্য,—উহার আলোচনায় ইহাই দৃষ্ট হইবে যে, জন্মমুহূর্ত্তের বাহ্য-বিষয়গত বস্তুতন্ত্রতাকে জ্ঞানাঞ্জনদীপ্ত ভাবতন্ত্রতা ধীরে ধীরে হইলেও নিঃসংশয়রূপে পরাজিত করিয়াছে।

প্রাচীনতম বিবরণে, যথা—বৈদিক বেদিনির্ম্মাণ ব্যাপারে, শূল্বসূত্রের লিখিত মত "পক্ষ বাঁকাইয়া, পুচ্ছ বিস্তার করিয়া" গরুড় স্বর্গাভিমুখে উড্ডীয়মান হইয়াছে, এরূপ কল্পনা ও প্রতিকৃতিই সুসঙ্গত হইয়া থাকিবে। সে স্থলে মানবীকরণের কোনও প্রয়োজনই অনুভূত হইতে পারে না, কারণ সে স্থলের একমাত্র ক্ষেত্রানুকূল কল্পনাই স্বর্গারোহনের কল্পনা, এবং সে কল্পনার প্রভাবের পরিমাণও কম নহে; বিহঙ্গাকার বেদীতে যজ্ঞ করিলে যজ্ঞানুষ্ঠাতার স্বর্গারোহন ঘটিবে, এইরূপ বিশ্বাসই ঐরূপ বেদীনির্ম্মাণ ব্যবস্থার মূলীভূত হেতু।

বিষ্ণুর অধীনে গরুড়ের ভৃত্যত্ব—অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী পৌরাণিক কল্পনা; এবং এইরূপ কল্পনা-হেতুই গরুড়কে মানবাকারে গঠিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। গরুড় জন্মাবধিই ভৃত্য নহে। পক্ষিরূপে বহুবার সে আপনার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছে। চিরযৌবনের ও অমরত্বের বরলাভ করিয়া, অধিক বয়সে গরুড় বিষ্ণুর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। পক্ষীর আকারের ভিতর দিয়া এই কর্ম্মের অর্থাৎ পরিচর্য্যার ভাবকে তেমন সুব্যক্ত করা যাইত না, ন্যূনাধিক মনুষ্যাকারই সে ভাব পরিস্ফুট করিবার পক্ষে অধিকতর সুসঙ্গত ও সমীচিন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং এই রূপান্তর-পদ্ধতি উদ্দেশ্যেরই অনুগমন করিয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হয়; পাশ্চাত্য এসিয়ার শিল্পাদর্শের সহিত, অথবা উদ্দাম কল্পনার অবরিত প্রশ্রয়-পুষ্ট যে আদর্শ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল—তাহার সহিত, উপরোক্ত ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির কোনই সাদৃশ্য নাই। প্রাণপণ পরিচর্য্যার ও অবিচলিত অনুরাগের যথোচিত ভাব-ব্যঞ্জনার নিমিত্ত গরুড়ের করদ্বয়কে যখন কৃতাঞ্জলিবদ্ধ করা হইল, তখনও বিহঙ্গের ন্যায় তাহার পক্ষ থাকিল, চরণদ্বয়েরও কোন পরিবর্ত্তন হইল না। ক্রমে যখন পদদ্বয়ের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা করদ্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিল, নয়ন ও নাসিকা তখনও তাহাদিগের আদিম মূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকিল, সমুচিত সামঞ্জস্য

সাধিত হইতে সুতরাং দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইল। এ কারণে মধ্যযুগের শেষাংশের পূর্ব্বে গরুড় মনোমোহন মানব মূর্ত্তিতে আসিয়া উপনীত হয় নাই। গৌড়ীয় প্রদেশে ও সুচিরপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার পাল-সাম্রাজ্যের অধীনে যে সকল প্রদেশ উহার শিল্প-প্রভাবের অধীন ছিল তৎসমুদয় প্রদেশে, আমরা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। বরেন্দ্রে (উত্তরবঙ্গে) প্রাপ্ত এবং রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহালয়ে রক্ষিত একটি নিদর্শনের ছবি উদাহরণ স্বরূপ প্রকাশিত হইল।

সাধারণ শ্রেণীর বিষ্ণুমূর্ত্তিতে, গরুড়কে মূর্ত্তির পাদপীঠে আলীঢ় বা প্রত্যালীঢ় ছন্দে এক জানু উন্নত ও অপর জানু ভূস্পৃষ্ট করিয়া পরম ভক্তের ন্যায় কৃতাঞ্জলি করে আসীন দেখা যায়। বিষ্ণুমন্দিরের অভ্যন্তরে বা সম্মুখে স্তম্ভের উপর যে সকল গরুড়মূর্ত্তি বিষ্ণুমুখী হইয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগেরও আসন এই প্রকারের, ইহা হইতেই মূল কল্পনা উদ্ভূত হইয়া খুটিনাটি বিষয়ের সুবিন্যাস ব্যবস্থাকে নিয়মিত করিয়াছে, কিন্তু এস্থলেও পুরাণ-সৃষ্ট নানা বিপদে শিল্প বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে আদর্শ ভক্ত, সর্ব্বজীবেই তাহার প্রেম সমভাবে উচ্ছ্রিত হইবে, কাহারও প্রতি বৈরিতা থাকিবে না; গরুড় নাগকুলের পরম শত্রু, নাগকুলের নির্দ্দয় অন্তক, সুতরাং তাহার এই বৈরী-ভাবের সম্যক পরিবর্ত্তন প্রকাশোপযোগী সমুচিত শিল্পব্যবস্থার আবিষ্কার না হইলে, গরুড়কে আদর্শ ভক্তের আধ্যাত্মিক মণ্ডলে উন্নীত করা সম্ভব হইত না। গরুড়ের অহি-ভূষণের ব্যবস্থা করিয়া, ও একখানি নাগ-ফণাকে বিশিষ্টভাবে তাহার শিরশ্চূড়ারূপে স্থাপিত করিয়া, শিল্পসূত্র সৌভাগ্যক্রমে এই অসাধ্য-সাধন করিয়াছে। সত্যসত্যই ইহা শিল্পের জয়; কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসের পাঠক, তাঁহারা ইহার ভিতর বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষার একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব আবিষ্কার করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারেন,—মনে করিতে পারেন, সেই শিক্ষাদীক্ষার পরিণাম-ফলেই গরুড় ও তাহার চিরশত্রুর ভিতর মৈত্রী পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, ভক্তের ভাব হইতেই এই আদর্শের উৎপত্তি, এবং এই আদর্শ মধ্যযুগের পরার্দ্ধে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর-দেশে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, কারণ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে পুরুষ-পরম্পরাগত কিম্বদন্তী কল্পনারই প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভক্তজনের অবিচলিত ভক্তিই আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে,—ইহাই চিরাগত বিশ্বাস; পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম্মশাস্ত্রও সমভাবে ভক্ত ও তাহার ইষ্টদেবতার একত্ব প্রতিপাদক ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করিয়া, মানব-সাধারণের মুক্তি-মার্গ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। উল্লিখিত ধর্ম্মমতে ভক্ত কখনও কখনও তাহার ইষ্ট দেবতা-পেক্ষাও শক্তিশালী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কারণ ভক্তের কামনা যতই অসঙ্গত হউক না কেন, ভক্ত তাহা অনায়াসে তাহার ইষ্ট দেবতার দ্বারা পূর্ণ করাইয়া লইতে পারে।

বরেন্দ্রের গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু মূর্ত্তি আধ্যাত্মিক পরীক্ষার শিল্পচাতুর্য্যসমৃদ্ধ প্রতিমা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে,—উহাতে শিল্পচাতুর্য্যের বিজয়বার্ত্তাই কীর্ত্তিত রহিয়াছে। গরুড়ের

এই মূর্ত্তি, পুরাণ-বর্ণিত মূর্ত্তি হইতে অন্যরূপ, এবং উহার বিশিষ্ট বৈসাদৃশ্য শিল্পীর সাহসিকতারই পরিচয় প্রদান করে; কারণ পুরাণের মতে, প্রভু যখন ভৃত্যের সহন-শক্তির পরীক্ষার নিমিত্ত তাহার পৃষ্ঠে আপন বাহু অর্পণ করিলেন, গরুড় তাহা ধারণ করিতে পারিল না। পুরাণের এ কাহিনী আদৌ গরুড়ের বিজয়ের কাহিনী নয়, ইহা সম্পূর্ণ পরাজয়ের কাহিনী। বরেন্দ্রের নিদর্শনে বিষ্ণুর বাম জানু গরুড়ের বামস্কন্ধে এরূপভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে প্রভু যেন ভার-বেগ সেই স্কন্ধেই সংন্যস্ত করিয়াছেন; এবং গরুড় তাহাই আপন বাম করতলের সাহায্যে সুকৌশলে যোগ্যতার সহিত ঊর্দ্ধ-ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কষ্টের বা অসুবিধার অণুমাত্র চিহ্ন ব্যক্ত না করিয়া, আপন সামর্থ্যে আপনার বিশ্বাস হেতু যেন হাসিতে হাসিতে, আপনার অবিচলিত ভক্তির বিজয় সাফল্যের শুভমুহূর্ত্তে, প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া গরুড় যেন উড্ডীয়মান্ হইবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে। এ চিত্র শক্তি ও কর্ম্ম-ব্যঞ্জক, এবং ঐরূপ ব্যঞ্জনাই ইহাকে সৌম্য ও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। গরুড়ের স্ফীত বক্ষ তাহার অদম্য সহিষ্ণুতার শক্তি প্রকাশ করিতেছে; এবং তাহার পদদ্বয়ের ও চরণাঙ্গুলীর বিন্যাস-ব্যবস্থায় তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও এ প্রতিমায় বিষ্ণুকেই মূল দেবতা ও গরুড়কে তাঁহার বাহনমাত্ররূপে প্রদর্শন করিবার কথা, তথাপি শিল্পীর হৃদয়াবেগ মূল মূর্ত্তিকে কথঞ্চিৎ পশ্চাতে ফেলিয়া গরুড়কেই পদ্মাসনে বসাইয়া দিয়াছে এবং তাহাকেই লোক-লোচনের প্রথম বিষয় করিয়া আপনার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছে। শিল্পী যে মুহূর্ত্ত নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহার তক্ষণ-যন্ত্রের পক্ষে তদপেক্ষা শুভমুহূর্ত্ত আর হইতে পারিত না। এ মুহূর্ত্ত—উড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত, এ মুহূর্ত্তে আকস্মিক ভারবেগের প্রথম পরিণাম অতিক্রান্ত ও বিস্মৃত হইয়াছে, এ মুহূর্ত্তে আপন সাফল্যচিন্তায় বাহনের হৃদয় বিশ্বাসে ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধে আত্মনিমগ্নরূপে সমাসীন, দক্ষিণ করতল সম্মুখে প্রসারিত—যেন তিনি ভৃত্যেরই জয় স্বীকার করিয়া আশীর্ব্বাদ-চ্ছলে গরুড়ের প্রশংসা করিয়াছেন ও তাহাকে উৎসাহদান করিতেছেন।

গোপীনাথ রাও তাঁহার গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের যে দুইটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তদপেক্ষা বরেন্দ্রের নিদর্শন-খানিকেই অধিকতর সুব্যবস্থ বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধে চড়িয়া দুই দিকে দুই পা নামাইয়া দিয়া রেকাবদলের মত গরুড়ের হাতে তাহা রাখিয়াছেন। ইহা স্পষ্টতঃই শিল্পপ্রয়োজনা-পেক্ষী নহে, ইহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুগ মাত্র। শাস্ত্রের বিধান প্রতিপালন করিতে গিয়া, এই চিত্র উড্ডয়ন-কল্পনার সহিত অসামঞ্জস হইয়াছে; এবং ইহাতে বিষ্ণুর দেহ-ভঙ্গিমায় তেমন মহিমান্বিত ভাব পরিব্যক্ত হয় নাই। যবদ্বীপের যে গরুড়-বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত হইত, দক্ষিণ ভারতের নিদর্শন অপেক্ষা বরেন্দ্রের নিদর্শনের সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যবদ্বীপে, ঔপনিবেশিক স্বাধীনতায়, শিল্পচাতুর্য্য

আকস্মিক ভাবাবেগের মুহূর্ত্তটি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া গরুড়কেই সমধিক মুখ্যস্থান প্রদান করিয়াছে। কষ্টানুভূতির প্রথম মুহূর্ত্তের ভাব-প্রকাশের পক্ষে, অমানুষিক মুখাবয়ব, ব্যাত্ত বদন, ও কতক মানুষের ও কতক গৃধ্রের মত—অদ্ভুত পদদ্বয়, সুসঙ্গত হইয়াছিল। গরুড়ের হস্তে বিষ্ণুর চরণ রক্ষিত হইবার চিরাগত বিধান লঙ্ঘিত হইয়া বিষ্ণুর যে মর্য্যাদান্বিত ভাব হইয়াছে, এবং আকস্মিক ভাব-বেগে দৃশ্যতঃ পরাজিত হইয়াও গরুড়ের দৃশ্যমান উচ্চয়ন চেষ্টায় বাহনের স্থান যে মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—যবদ্বীপের প্রতিমার উল্লেখযোগ্য লক্ষণ সমূহের মধ্যে এই দুইটি লক্ষণই যবদ্বীপের শিল্পাদর্শের সহিত বাঙ্গালার শিল্পাদর্শের সম্পর্ক বিজ্ঞাপিত করে। পরিচ্ছদের ও অলঙ্কারের গঠন-বিন্যাস-সাদৃশ্য ও উভয়ত্র বিষ্ণুর একই মধুর ভাব—ঐরূপ সম্পর্কের সমর্থন করে। এই উভয় দেশ মধ্যে সুদূর-বিস্তৃত সমুদ্র ব্যবধান থাকিলেও, আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে,—পুরাকালে বাঙ্গালার সহিত যবদ্বীপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তখন বাঙ্গালার সমুদ্রতীরবাসী নির্ভীক নাবিকগণ অর্ণবযান লইয়া সুদূর চীন পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত, এবং বাণিজ্যের ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রচেষ্টার সহিত জন্মভূমির শিল্পাদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষা দূরদূরান্তরেও নীত হইত। পৃথিবীর এইরূপ দুইটি সুদূরব্যবহিত দেশের শিল্পাদর্শ সদৃশ হইবার উহাই হেতু।

উল্লিখিত দুইটি নিদর্শনে গরুড়ের আকার একরূপ নহে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে বৈসাদৃশ্য মাত্র আকারগত, উহা পরিকল্পনার প্রাণেও ছন্দে প্রসারিত হয় নাই। শিল্পের আকাঙ্ক্ষা যে উভয়ত্রই এক মৌলিক সাদৃশ্য ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিবার নহে। উভয়ত্রই একটা দ্বন্দ্বকে আকারিত করিবার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান,—একত্র, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও সম্পাদন-সাফল্য, অন্যত্র, তাহারই কথঞ্চিৎ পূর্ব্বাবস্থা। একই ঘটনার কম্মোদ্যমের ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্ত অবলম্বন করিয়া একই শিল্পাদর্শের দিকে ধাবিত হইতে গিয়া এইরূপ হইয়াছে! এই একই কারণে, প্রয়োজন-বশতঃই বাহ্যিক আকারে বৈসাদৃশ্য ঘটিয়াছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া আকারকেও সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল করিতে হইয়াছে। এ সত্ত্বেও উভয়ত্রই এক—সুরে, রসে, ভাবে এক, যাহা-কিছু পার্থক্য কেবল কথায়। যবদ্বীপে ও বাঙ্গালায়, মূল বিষয় ভাবতন্ত্রানুগত। অতীতের পুরুষ-পরম্পরাগত বিধি নিষে নবীন আলোক-প্রবেশের পথ প্রায় রু করিয়া যে চিরাচরিত সংস্কারমূলক প্রাকা উত্তোলন করিতেছিল, তাহার বন্ধন হই মধ্যযুগের শেষাংশে ঐ মূল বিষয় আপনা কতকাংশে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল। অবশে সেই প্রাকার ভেদ করিয়া নূতন আলো মধ্যযুগের শিল্পাদর্শের উপর আসিয়া প ও নবজীবনের প্রাচুর্য্যে তাহাকে মণ্ডি করিয়া দিল; ভারতের মধ্যযুগের শিল্পস সুধী সমালোচকবৃন্দ ক্রমাবনতি স্বী আর কিছু স্বীকার না করিয়া আপনাদি চূড়ান্ত মত প্রকাশ করিলেও, অন্যা আবিষ্কৃত বহু নিদর্শনে উপরোক্ত বা

নিঃসংশয়রূপ লক্ষিত হইবে। মধ্যযুগের শিল্পে ক্রমাবনতি ব্যতীত যে আর কিছুই নাই,—এ মত প্রথম ফার্গুসন প্রচার করেন, কিন্তু নির্ভয়ে এমন মত প্রচারের উপযোগী প্রচুর উপকরণ তাঁহার ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না; ফার্গুসনের এই মত লইয়া যে মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, সহসা তাহার বিনাশ নাই। ইঁহাদের মতে,—ভারতের শিল্পের ইতিহাস—শিল্পের অবনতির যুগের ইতিহাস; এ অবনতি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর আরব্ধ হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কোনও যুগ পুনর্জ্জীবনের পুনরাভিষেক করা দূরে থাকুক, ঐ অবনতির গতিরোধ করিতেও সমর্থ হয় নাই। তাহার পর বহু উপকরণ সংগৃহীত হইয়া এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সন্দেহের অবতারণা করিয়াছে। বিজ্ঞানে 'চূড়ান্ত বাক্য' বলিয়া কিছু নাই; আমাদিগের পক্ষেও, নূতন নিদর্শন নিচয় যথাযোগ্যরূপে শ্রেণীবদ্ধ ও প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত মত-বিশেষে আত্মসমর্পণ না করিলেই ভাল হইত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় জীবনের কার্য্যতঃ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, ইহা প্রমাণ-নিরপেক্ষ অনুমান মাত্র, এবং এবংবিধ অনুমানের উপর শিল্পের অবনতি সম্বন্ধীয় মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার পালরাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা যে রাজনীতিক উন্নতির আবাহন ঘটিয়াছিল, তাহারই পশ্চাদনুসরণ করিয়া জাতীয় সমুত্থানও পুনর্ব্বার সূচিত হইয়াছিল, ইহার ফলে শিল্পক্ষেত্রেও নবজীবনের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ এই যুগের শিল্পই তাহার আপন স্থায়ী প্রভাব সুদূর তিব্বত, চীন, জাপান ও প্রশান্তসাগরের দ্বীপাবলীতে বিকীর্ণ করিয়াছে। সুতরাং এই যুগের শিল্প-সম্বন্ধীয় আলোচনাই ভবিষ্যতে বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে, এবং কোনওরূপ সংস্কারান্ধ না হইয়া এতদ্বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। লামা তারানাথের গ্রন্থ নিবদ্ধ একটি কিম্বদন্তী হইতে এবং বরেন্দ্রের স্বদেশপ্রেমিক কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর একটি প্রস্তাবনা হইতে আমরা বাঙ্গালার শিল্পের পুনর্জ্জীবন বিষয়ক সাহিত্যিক প্রমাণ প্রাপ্ত হই, কিন্তু ঐ পুনর্জ্জীবনের নিঃসংশয় প্রমাণ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত পাষাণপ্রতিমা সমূহ। তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই নিমেষেই বুঝিতে পারা যাইবে,—প্রাচীন আকারকে নূতন টীকায় ও ভাষ্যে সমৃদ্ধ করিবার যে একটা চেষ্টা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতৎসম্পর্কে যাহা-কিছু সাফল্যলাভ ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতীয় শিল্পের অতীত কীর্ত্তিকে পরাজিত করিতে না পারিলেও, তাহাকে শিল্পের পুনর্জ্জীবন লাভের নবীন চেষ্টা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং ইহার ভিতর দিয়াই বঙ্গদেশের ও যবদ্বীপের শিল্পাদর্শের মধ্যে এক মুখ্য সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

শ্রীবিমলাচরণ মৈত্রেয়।

মার্জ্জনা

২

ডাঃ হারাধন দত্ত এম-এ, এল-এল-ডি কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন; জাতিতে সুবর্ণ-বণিক, ধনে কুবের। হারাধন আমার বড় অন্তরঙ্গ ছিল। অল্প বয়সে তার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে; মিনি তার একমাত্র সন্তান। হারাধন আর বিবাহ করে নি—বেচারা এই মেয়েটিকে তার জীবনের অবলম্বন করেছিল। মিনির সুশিক্ষার জন্যে দত্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করত। সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন—তার উপর চিত্র-বিদ্যা আর সঙ্গীত শেখাবার জন্য একজন ফরাসী বিদুষী। লোকে দত্তকে এই নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাসা করত। দত্ত কিন্তু কিছুতেই দমত না; সে বলত, আমার টাকা—আমার পাঁটা, যদি ল্যাজের দিকেই কাট ত লোকের কি? লোকে ভাত হজম করবার জন্যে পর-চর্চ্চা করে। লোকের কথায় যদি মানুষের গায়ে ফোস্কা পড়ত ত' ভয় করবার কথা ছিল! বলতে দাও না ভাই! তুমি যা কর্ত্তব্য মনে করচ, করে চলে যাও—আত্মা যাতে তৃপ্তি পায়, জগৎ তাতেই তৃপ্ত হতে বাধ্য!

হারাধনের একটা ভীষণ বদ্ অভ্যাস ছিল যে সে অষ্টপ্রহর সিগারেট খেত—ডাক্তারেরা অনেক দিন অনেক মানা করেচেন; কিন্তু সে-সব কথায় সে কর্ণপাতও করত না। তার ফলে গলায় ক্যান্সার হলো। দিন কতক ভুগে সে সমস্ত রোগকে অতিক্রম করে পরম শান্তির দেশে চলে গেল। যাবার সময় মিনিকে আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে গেল। অতুল সম্পত্তি আর এই মেয়েটির ভার নিয়ে আমি তার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করেছিলুম। যখনি তার কথা মনে করি, তখন স্পষ্ট আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বড় বড় সেই চোখদুটি আর রোগক্লিষ্ট শুক্‌নো দুই গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়চে—আহা!

তার পর মিনিকে আমার ঘরে নিয়ে এলুম। বেঁটে-খাটো মেয়েটি—বাপের চোখ দুটি হুবহু কে যেন বসিয়ে দিয়েচে। প্রতিভা তার কথা-বার্ত্তা চলা-ফেরা থেকে মিনিটে মিনিটে স্ফুরিত হচ্চে। শেলি বাইরন টেনিসন্ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কিছুই তার পড়তে বাকি নেই; ছবি দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে তার আঁকা। বেহালায় তার মিষ্টি হাত; অর্গান তার কাছে কথা কয়। দত্ত মিনিকে কোনদিন এমন শিক্ষা দেয় নি যে সে ছেলে নয়, মেয়ে। তার গতি ছেলেদের মতই অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ। এই দেখ মিনি তেতলায় আমার ঘরে চেয়ারে বসে বই পড়চে—ঐ শোন অর্গান বেজে উঠ্‌ল। আবার নীচের তলায় গিয়ে দেখ, মেথি ওয়ালার কাছ থেকে এক রাশ জিনিষ কিনে ছুটে আস্‌চে—"কাকা, এগুলো কিনেচি—চারটে টাকা দিতে হবে।" আমি হাসি,—"কি হবে পাগ্‌লী, এই ছাই-পাঁশ জিনিষগুলো কিনে?"

"বাঃ, এ-সব যে আমার ভারি দরকারী।"

"কই দেখি, কি সব তোমার এত দরকারী জিনিষ?"

"না, আমি দেখাব না, আপনি হাস্‌বেন।"

"তোমাকে ঠকিয়েচে।"

"ইস্ আমাকে ঠকাবে—এত বোকা আমি নই।"

মিনির বিশ্বাস, কেউ তাকে ঠকাতে পারে না! আমি বসে বসে হাসি, আর ভাবি, কোত্থেকে এই ধারণা মানুষের হয়! সবাই নিজেকে ভারি চালাক মনে করে। এইটুকু পুঁজি দিতে কারুকে ভোলেন নি কি ভগবান! কিন্তু মানুষ কম বোকা নয়! যে নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে ভেবে পরকে বোকা মনে করে, সে তত বেশী নির্ব্বোধ!

অল্প বয়সে এই ভাবটা হতে দিতে নেই ছেলে-পুলেদের মধ্যে। তারাই জীবনে বড় বেশী কষ্ট পায়, যারা এই বিজ্ঞতার বোঝা অল্প বয়স থেকে বয়ে মনে করে, অপ্রতিহত তাদের গতি এই সংসারের পথে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় মিনি প্রথম স্থান অধিকার করলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। উত্তর-পত্রে সে যে রচনা লিখেছিল কাগজে তা ছাপিয়ে দেওয়া হলো। তেমন ইংরিজি নাকি একজন এম-এও লিখ্‌তে পারে না!

আমি কিন্তু তাকে নিয়ে মহা বিপদে পড়ে গেলুম। তার আর পছন্দ হয় না এ-দেশের পড়া—সে বিলেত যাবে! কচি বয়সে তাকে কেমন করে পাঠিয়ে দিই সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে! সে তো নাছোড়-বন্দা।

আমার স্ত্রী এসে বল্লেন, "দাও না বাপু ওকে পাঠিয়ে যেখেনে যেতে চাচ্চে—ওর বাপের অগাধ বিষয়-সম্পত্তি—যার অবস্থায় কুলোয়, সে কেন খরচ কর্‌বে না?"

আমাদের লীলা তখন ছোট্টটি—আমি বল্লুম, "পারবে তুমি লীলাকে এই বয়সে একলা বিদেশ বিভূঁইয়ে এমনি করে পাঠিয়ে দিতে?"

স্ত্রী রাগ করে বল্লেন, "সে তেরো মণ তেলও পুড়বে না আর রাধাও নাচবে না—এ আবার ধান ভান্‌তে শিবের গীত কেন?"

চুপ করে রইলুম, মেয়ে মানুষের চিত্তের দীনতা দেখে। হাজার শিক্ষা-দীক্ষা দাও—হাজার ধোও-পোঁছ—মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।

আমি কোন দিন কাউকে নিষেধের গণ্ডীতে বেঁধে রাখবার পক্ষে নেই। মনে হয়, নিষেধের বেড়া আম্যাদের দেশে উপকারের চেয়ে বেশী ক্ষতি করেচে। নিষেধের যা তাৎপর্য্য তা বেশ পরিষ্কার উপলব্ধি কর্‌তে পারি; কিন্তু তার মাত্রা-বোধ বড় কঠিন, একটা থেকে আর একটা, তার পর আর-একটা, এমনি করে সেটা এমন বেড়ে চলে যে শেষ পর্য্যন্ত তাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হয়ে পড়ে।

সেদিন রাত্রে খেতে যাবার আগে আমি কি একটা প্রকাণ্ড বই খুলে মানুষের অভিব্যক্তি-বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম এমন সময় মিনি এসে পাশে বস্‌ল। আমি

বইটা বন্ধ করে—তার দিকে চেয়ে বল্লুম, "কি মিনু ?"

"কিছু না, কাকা।"

কোন কথা খুঁজে পেলুম না, তাই বল্লুম, "তোমাকে দেখ্‌লে আমার ভারি আনন্দ হয়, যেন আমার নিজের অতীত জীবনের আশা-আনন্দের উদ্দামতার স্বাদটা আবার আমি ফিরে পাই।"

সে হাস্‌তে লাগল। কি মিষ্টি সে হাসি! নিষ্কলুষ প্রাণের অকপট হাসি! শরৎচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতই বিশুদ্ধ নির্ম্মল!

"তোমার সঙ্গে আমার আবার বিলেত যাবার ইচ্ছাটা যেন প্রবল হয়ে উঠচে।"

সে হাত-তালি দিয়ে নেচে উঠে বল্লে, "ওঃ তাহলে গ্রাণ্ড হয়, কাকা—আচ্ছা, বছর খানেকের ফার্লো নিয়ে চলুন না কেন, আপনি।"

"বেশ হয়, না ?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়!" সে ছুটে এসে আমার হাতখানা ধরে ঝুলে পড়ে বল্লে—"কাকা তাহলে এই স্থির হয়ে গেল। আর আমি কোন কথা শুন্‌ব না।"

"ছুটি পাওয়া ত আমার হাত নয়, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করচে বড় সাহেবের মর্জ্জির ওপর।"

সে মুখটা কাঁচু-মাচু করে বল্‌লে, "কি হাত-পা বেঁধে রেখেচে আপনাদের এই চাক্‌রিগুলো! আমি বাবা নাকে-কাণে খৎ দিচ্চি, জীবনে চাকরী কখনো করব না।"

"যদি পরিবার ভরণ-পোষণ করতে হতো—আর আমার মত গরীবের সন্তান হতে ?"

"আমি কিছুতে বিয়েই করতুম না, কাকা।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌লুম, "ঠিক বলেচ মিনু, কি ভুলটাই জীবনে করে বসেচি।"

সে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, "ভা হতে যাবে কেন! ঠিকই করেছিলেন কাকা —মানুষের জীবনে কি ওটা একটা মস্ত দাবী নয়? যে বিয়ে করে না, সে কাপুরুষের মত জীবন-সংগ্রাম থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়! জীবনটা যে কি তারা কোন দিন তা উপলব্ধি করে উঠ্‌তে পারে না! জলে ছুঁয়ে মাছ ধরায় বাহাদুরি থাক্‌তে পারে—কিন্তু গায়ে জল-কাদা মাখবার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র আনন্দ আছে—সে কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না।"

"গায়ে জল-কাদা মাখায় যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে, এমন কথাই হয় ত অনেকে স্বীকার করতে চাইবে না।"

"তা হলে অবশ্য নাচার।"

মিনি চুপ করে বসে কি ভাবতে লাগল। তার দীপ্ত চোখদুটো উজ্জ্বল ল্যাম্পের উপর ফেলে নীচের ঠোঁটটা কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে এমনি করেই সে ভাবতে থাকে,—যখন-তখন।

তার চিন্তার স্রোতটা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে বল্‌লুম, "বিলেত গিয়ে সায়েন্স পড়বে, না আর্টস ?"

"আমি ভাষা পড়ব—ফ্রেঞ্চ শেখবার আমার বড় সখ।"

"তাহলে তোমায় পারিতে থাক্‌তে হবে ?"

"না, গোড়াতে ইংরিজিটা শেষ করে তার

পর ফ্রান্সে যাব। আমি মাইকেলের মত যতক্ষণ না সেই ভাষায় অনর্গল কবিতা লিখতে পারচি, ততক্ষণ তাকে ছাড়ব না।"

"তাহলে কবি হবার জন্যে বিদেশ যাচ্ছ ?"

সে একটু হাস্‌লে,—কবি হওয়া যায় না, কবিরা কবি হয়েই জন্ম-গ্রহণ করেন।

"কেন, চেষ্টা করে কবি হওয়া যায় না নাকি ?—আমার মনে হয়, মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই।"

"যাবে না কেন, মানুষ পোপের মত কবি হতে পারে চেষ্টার বলে; কিন্তু শেলি-বাইরন হওয়া চেষ্টায় যায় না—ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা থাকা চাই।"

"আমার মনে হয় তোমার এমন কিছু একটা শেখা উচিত, যা পৃথিবীর কোন কাজে লাগে।"

"কবিরা কি দুনিয়ার কাজে লাগেন না ? তাঁরা জগতের চিন্তার স্রোতে নতুন ভাবের জোগান দিয়ে—জগৎকে চিন্তার পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যান্!—আমার মনে হয়, আর একটা কাজ আমার দ্বারা হতে পার্‌বে—আমি বোধ হয় ষ্টেজের খুব উন্নতি করব। আমার শক্তি ষ্টেজের উপযোগী বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"একট্রেস!—"অতিমাত্র বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করেই আমি কথাটা বলে উঠলুম!

"কেন, আপনি কি তাদের ঘৃণা করেন ?"

"ঘৃণা হয় ত ঠিক করিনে, কিন্তু খুব পছন্দও করিনে ও-জীবনটা।"

"এটা কি আপনার কুসংস্কার নয় ?"

"হতে পারে। কিন্তু সংস্কার বদলানো বড় শক্ত, মিনু।"

"আপনাকে কেউ ঐ জীবন গ্রহণ করতে অনুরোধ করচে না, কিন্তু আমি জানি যে আমার পক্ষে একট্রেস হওয়া প্রায় স্থির।"

হাস্‌তে হাস্‌তে আমি বল্লুম, "কোন জিনিষের নিশ্চয়তা নেই এ জীবনে।"

"তবুও মানুষ ঠিক-ঠিকানা করতে এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্রুটি করে না।—মানুষ যখন তার বিদ্যা-বুদ্ধির কথা ভাবে, তখন সে নিজেকে অমর বলে মনে করে—আমিও তাই মনে করি কাকা, নিজেকে।"

"আমি মৃত্যুর কথা বল্‌চিনে মিনু—আমি বলচি, আর একটা শক্তির কথা—মানুষের সমস্ত শক্তির বাইরে একটা অতি-মানুষিক ক্ষমতা তার ভাগ্যকে নিত্য-নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করচে।"

"তবে মানুষের পুরুষকারের দরকার নেই ? সে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে নড়ার মত জীবনের স্রোতে ভেসে যাবে ?—তা যদি হয় ত' আপনাদের সায়েন্স যে এক পা'ও এগুতে পারে না।—নাঃ, ও আমি মানিনে —নিজেকে গড়ে তোলবার শক্তি বারো-আনা মানুষের হাতেই আছে।"

আমরা দুজনেই হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেলুম। এই পনের-ষোল বছরের মেয়েটির তেজ দেখে আমি অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে রইলুম। মিনি হয়ত আমার বুদ্ধির স্থবিরতা দেখে মনে মনে খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আমাদের আজন্ম অভ্যাস, মেয়েদের লজ্জাবনতা অবগুণ্ঠনবতী দেখা; তাই ধ্বক্

করে বুকের উপর যেন ধাক্কা লাগে এমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে। মনে হয়, এ কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশের হাওয়া দেশ-টাকে! কি জানি, স্বাধীনতা দিতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে না ত! মিনিকে যদি ছেলে বলে মনে করি ত' আর গোল থাকে না! কিন্তু সে যে মেয়ে—তাকে যে একদিন সংসারের মধ্যে দেবী-মূর্ত্তি ধরে একাধারে স্নেহ-মমতা অজস্র কৃপা-করুণা বিতরণ করতে হবে—তাকি এই শিক্ষার পরিণামে সম্ভবপর হবে? তা দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয়ত আমাদের এ জীবনে ঘটবে না,—আমাদের বংশধরেরা ভাল করেই দেখ্‌তে পাবে। তারা শুধু দেখবে না—তারা ভুক্তভোগী হবে।

মিনিকে বিলেত পাঠানোই ঠিক হলো; তার সঙ্গে আমার যাওয়া ঘটে উঠলো না। আমায়ো কেমন যেন ভয় করছিল যেতে। সাহেব যখন ছুটি মঞ্জুর করলেন না, তখন বেঁচে গেলুম নিষ্কৃতির হাঁফ ছেড়ে।

মিনিকে ডেকে বল্‌লুম, "দেখ মা, একলা চলেচ তুমি সেই দূর দেশে—তোমার বয়েস কাঁচা—বুদ্ধিও একেবারে পাকেনি—খুব সাবধানে চলো, মা। চিন্তার স্বাধীনতায় বড় আসে যায় না; কিন্তু ব্যবহারের স্বাধীনতা অল্পেই উচ্ছৃঙ্খলতায় গিয়ে দাঁড়ায়। এক মিনিটের ভুলে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে যার জন্যে সমস্ত জীবন ধরে অনুতাপ করতে হয়।"

সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে; হয়ত বুঝে উঠ্‌তে পারলে না, আমি কি বলচি। আমি এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট করে আর বলতে পারলুম না—হয়ত বলা উচিত ছিল; কিন্তু জিভ্‌টা কে যেন হাত দিয়ে চেপে ধরলে।

একটি পরিচিত পরিবারে তার থাকার বন্দোবস্ত হলো। মিঃ ব্লাটউড্ অক্‌স্‌-ফোর্ডের একজন ছোট-খাট অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা হয় বিলেতে থাক্‌তেই। তিনি মিনির ভার নিতে স্বীকৃত হলেন। বোম্বাই অবধি আমি সঙ্গে গিয়েছিলুম। মিনিকে জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে আমার চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে এল—মনে হলো, হয়ত যেমনটি পাঠাচ্ছি, তেমনটি আর ফিরে পাব না। সে বেশী কথা কইতে পারলে না; কেবল বল্লে, "কাকা, আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন—এমন কোন কাজ আমি করব না, যাতে আপনাদের মাথা হেঁট হয়।"

মনে মনে বল্‌লুম, "তাই হোক মিনি, ভগবান তোমাকে সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন!"

বছর তিনেক অক্‌স্‌ফোর্ডে থাকার পর মিনি আমাকে জানালে যে সে লণ্ডনে আস্‌তে চায়। পড়া-শুনো সে খুব ভালই করছিল, এমন কথা ব্লীটউড আমাকে অনেকবার জানিয়েছেন। এবারে থিয়েটার-গুলোর আরো কাছাকাছি হবে। কোন কথা গোপন করা তার স্বভাবই নয়। ক্রমেই তার বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছিল যে ষ্টেজই তার জীবনের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র। মাঝে মাঝে ছোট-খাট পার্ট নিয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে ঐ কথাই নাকি প্রমাণ

করচে। আমার কিন্তু কেমন-কেমন মনে হতো—যেন কিছুতেই পছন্দ করে উঠতে পারতুম না, তার ঐ ঝোঁকটাকে। কিন্তু স্পষ্ট করে কোন দিন মানাও করিনি। কে কোন্ দিকে জীবনে স্ফূর্ত্তি-লাভ করে, কে বলতে পারে!

লণ্ডনে এসে তার চিঠিপত্র দেওয়া অনেক কম হয়ে গেল। তার কারণ সে বল্‌ত যে এমন একটা আগ্রহ তার ঐ ষ্টেজের দিকে ফুটে উঠচে—যা তাকে বিশ্ব-সংসারকে ভুলিয়ে দেবার মতই করে তুলচে!

শেষ চিঠি সে লিখ্‌লে যে তারই নেতৃত্বে পারিতে একটা ষ্টেজ খোলা হচ্চে; সেখানে তারা দেখিয়ে দেবে মানুষ অভিনয়-মঞ্চ থেকে কতখানি সত্য জগতে দিতে পারে।

তার বছর খানেক পরে, পারি থেকে জানালে যে ষ্টেজের উন্নতির আশা তাকে ত্যাগ করতে হয়েচে। দুনিয়াটা জালিয়াৎ আর জোচ্চরে পরিপূর্ণ। তাকে ফ্রান্সের আরো দক্ষিণে নেমে যেতে হচ্চে—কারণ তার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েচে—কিছু বেশী টাকা চাই।

এ কি কাণ্ড! এমনটি ত কোন দিন আশা করিনি। তাকে সব কথা খুলে লিখ্‌তে বল্‌লুম। তার চিঠির উত্তর পেতে খুবই দেরী হলো। চিঠিখানিতে আর উদ্দামতা নেই—ঠিক বুঝতে পারলুম—তাকে চূর্ণ করে দিয়ে গেছে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বিবাহ সে করে নি—হয়ত বিবাহ করতে বাধ্য করাতে পারত সেই যুবকটিকে; কিন্তু তাও সে করেনি। তার কোলে ভগবান একটি কন্যা দান করেছিলেন—তাকেও হরণ করে নিয়েছেন; তিন মাসের মধ্যে। সে একটু সুস্থ হলেই আমার কাছে ফিরে আস্‌বে; কারণ আমি ভিন্ন জগতে আর তার কেউ বন্ধু নেই!

এ কি করলে, ভগবান!—কুন্দ ফুলটিকে অম্লান জ্যোতিতে ফুটিয়ে তুল্‌তে তুলতে এমন করে পোকায় খাইয়ে দিলে কেন?

পারুলকে ডেকে সব কথা বল্‌লুম। আশ্চর্য্য কথা—সে কিছুমাত্র দুঃখিত না হয়ে বল্লে, "আমি জানতুম ঐ হবে—যে গোল্লায়-যাওয়া ছুঁড়ি! মেয়ে মানুষের এতটা বাড় সইবে কেন? এখন মাথায় করে যেন এ বাড়ীতে এনে আর ঢলা-ঢলি করোনা। পরের বাছাকে দূরে রেখো।"

হায় ক্ষমা কোথায় নারী-চিত্তে! দোষই কি এত বড় মানুষের জীবনে, যে সমস্ত মানুষটাকে আড়াল করে ঢেকে দিতে পারে! তর্ক করতে আমার প্রবৃত্তি হলো না। আমি বল্‌লুম, "তার বাপের তিনখানা বাড়ী আছে চৌরঙ্গীতে—তার ভিতর যেটা তার পছন্দ হবে, সেইটেতে সে থাক্‌বে। তার অভাব কি?"

আমার স্ত্রী রাগ করে তখনি ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। লীলার এ-সব বোঝ-বার ঠিক্ বয়স হয়নি তবুও যেন তাকে উচ্ছল দেখ্‌লুম! মানুষের মনের তলায় অন্ধকারে যে হিংসা গোপনে বাস করে, সেটা তাকে কতখানি অপদার্থ অমানুষ করে দেয়!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কেউ আমাকে দোষ দিলে—কেউ মিনির ভাগ্যকে দোষ দিলে। চুপ করে সব সহ্য করলুম। স্ত্রী-স্বাধীনতার বেদীতে য়ুরোপে এমন কত শত বলি হয়েচে; কিন্তু য়ুরোপ ভুলে যেতে জানে মানুষের অপরাধ। আমাদের দেশের মত এমন সমস্ত জীবনের জন্যে পরিবর্জ্জন, বোধ হয় আর কোন দেশই করে না! আদর্শটা বড় বেশী উঁচু করতে দিয়ে এত বিধি-নিয়মের জঞ্জাল সমাজে এসে পড়েচে। মানুষকে এমন করে কেটে-ছেঁটে পুতুল তৈরী আর কোন দেশে করেছে কি? সমাজকে রক্ষা করতে গিয়ে মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে নির্দ্দয় শাস্ত্রকর্ত্তার কোন দুঃখ হয় নি! আশ্চর্য্য মহা-শক্তি আমাদের দেশের লোকের! অম্লানবদনে সব সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। যুগের পর যুগ এই সুকঠোর নিয়ম প্রতিপালন করে করে আমরা ভুলে গিয়েছি যে ঐ নিয়মগুলো আমাদেরই করা—অনায়াসে আমরা ওটা বদলে দিতে পারি।

মিনির চিঠি পেলুম; সে আস্‌চে। তার জন্যে একটা বাড়ী মেরামত, চুণকাম করিয়ে মোটামুটি আস্‌বাব-পত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখ্‌লুম। এতে কারুর পরামর্শ চাইনি। সে যে আস্‌চে এ কথা কারুকে জানাতেও ইচ্ছা হলো না। একটা ভাল গাড়ী-ঘোড়া কিন্‌লুম। আমার স্ত্রী আপত্তি করলেন। এত নবাবী করলে সংসার চল্‌বে না! খোকা বি-এ পাশ করে এম-এ পড়ছিল, তাকে আবার বিলেতে পাঠাতে হবে! কোন কথার উত্তর দিলুম না—বল্‌লুমও না যে ওটা মিনির গাড়ী।

একদিন শেষরাত্রে গাড়ী নিয়ে হাওড়া চলে গেলুম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলুম, তখনো আধ ঘণ্টা দেরী, গাড়ী আস্‌তে। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করচে—সমুদ্রের তীরের কাছে বালির সঙ্গে জলটা যেমন ঘুলিয়ে ওঠে—তেমনি ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠতে লাগলো মনটা। পাথরের মেজের উপর পা ফেলে যেন নিজে-নিজেই চম্‌কে উঠ্‌চি!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোকজনের সমাগম হতে লাগ্‌ল। টুপিটা টেনে চোখ অবধি নামিয়ে দিলুম। লোকের সঙ্গে চোখো-চোখি করতেও ইচ্ছা হল না।

গাড়ীখানা সশব্দে প্ল্যাটফরমের ভিতর যখন ঢুকলো, তখন হঠাৎ বুঝতে পারলুম যে হাত-পা আমার ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌চে—মাথার মধ্যে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে এল!

দেখ্‌লুম, গাড়ীর মধ্যে মিনি বসে আছে শরৎ-রাতের শিশির-সিক্ত রজনী-গন্ধাটির মত! শুভ্র-নির্ম্মল মুখখানি—সমস্ত আতিশয্য-বর্জ্জিত—নিখুঁত সুন্দর! কালো চোখদুটি বিপদে যেন আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে!

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—সে আস্তে আস্তে নেমে এসে আমাকে প্রণাম করে দাঁড়াল—আর বেঁটেটি নেই—মাথায় প্রায় আমার সমান। তার মুখের দিকে চাইলুম, ঠোঁট দুটি তার বিদ্যুৎ-ভরা মেঘের মত ঈষৎ কাঁপচে!

দু-জনেই নির্ব্বাক; ধীরে ধীরে গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বস্‌লুম—তখনো ঠাণ্ডা হাওয়া

বইচে। সইস্ কাঁচগুলো তুলে দিয়ে বল্লে, "কাঁহা যানে হোগা হুজুর?"

"চৌরঙ্গী চলো।"

পুলের উপর গাড়ীটা যেতেই মিনি কাঁপিয়ে আমার বুকের মধ্যে এসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমার চোখের কোলে দু-ফোঁটা জল যেন জমে আট্‌কে রইল—তারা শুকিয়ে যেতে জানে না—ঝরেও পড়ে না!

পাখী সমস্ত রাত ঝড়ে বাসা হারিয়ে সকালে ফিরে এসে তার বিপদটা যেন সবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তার জীবনের সমস্ত কান্না যেন এক-নিমেষে কণ্ঠ পর্য্যন্ত উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লুম—ছোট্ট মাথাটি থেকে থেকে এক এক ঝোঁকে কেঁপে উঠ্‌ছিল। আমার গলায় কি যেন জড়িয়ে উঠেছিল—ডাক্‌তে গেলুম—একবার হল না!

এমনি করে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

কান্নার বেগটা তার থেমে এলে সে বল্লে, "এ কোথায় নিয়ে যাচ্চেন আমাকে, কাকা?"

"তোমারি বাড়ীতে, মা।"

"আপনার কাছে আমাকে থাক্‌তে দেবেন না কাকা?"

নির্ব্বাক বসে রইলুম। আমার মুখের দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ করে যেন আমার অন্তরের নিগূঢ় তল পর্য্যন্ত পড়ে নিয়ে সে বল্লে, "সেই ভাল, আমি একলাই থাক্‌ব!"

"আমি সব সময়ে যাওয়া-আসা করব, মিনু—আমার বাড়ীর দোর তেমনি অবারিত উন্মুক্ত আছে তোমার জন্যে—এ কেবল তোমার সুবিধার জন্যেই এই ব্যবস্থা। তোমার বাড়ীতে তুমি কর্ত্রী—কারো সাধ্য থাক্‌বে না, সেখানে তোমার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করবার।"

মিনি চুপ করে বসে রইল। গাড়ীর গম্ গম্ শব্দকে যেন ঘোড়ার খুরের তীক্ষ্ণ শব্দটা কেটে খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে চলেচে। দু'চারটে মোড় নিয়ে গাড়ীটা এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নেমে সে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "বাঃ, সুন্দর ঘোড়াটি। এ কার গাড়ী, কাকা?"

"তোমার জন্যে কিনেছি—এ না হলে যখন-তখন তোমার কাছে আসার সুবিধা হবে না বলে—"

"বেশ করেচেন—আমি তাই ভাবছিলুম।"

উপরে উঠেই বসবার ঘর—অল্প দু-চার খানি আস্‌বাব্। সামনেই মিনুর মার-বাবার ছবি দুখানা। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে বল্‌লে, "আর একখানা ছবি দিতে হবে এই দেয়ালটায়।"

"কার?"

"সে আমি পরে বল্‌ব, আপনাকে।"

তার লাইব্রেরী, শোবার ঘর,—সব ফিরে ফিরে দেখে এসে সে বল্‌লে, "শোবার ঘরের পাশের বড় ঘরে আর এক সেট্ খাট-বিছানা দিতে হবে, কাকা।"

আমি অবাক্ হয়ে বল্‌লুম, "সে কার জন্যে?"

"আপনাকে আমি ছেড়ে দেব না। এ

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বাড়ীতে আপনি থাকুন আর নাই থাকুন—আপনার থাকার পুরো-বন্দোবস্ত কিন্তু থাকবে—নইলে আমি থাকতে পারব না, এখেনে।"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লুম—"বেশ, তাই হবে—যেখানে যেমন চাও, করিয়ে নাও!"

"বেশ, আমি সব ঠিক-ঠাক করে নিচ্চি, আপনার দেরী হয়ে যাচ্চে—এখন তবে আসুন, কাকা। কিন্তু আবার কখন আস্‌বেন—কলেজের পর, তিনটের সময়?"

মিনির আসার খবর শুনে আমার স্ত্রী অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে রইলেন। তাকে দেখ্‌বার জন্যে কোন রকম আগ্রহ কি উদ্বেগ প্রকাশ করাটাকে হয়ত তাঁর চরিত্রের লঘুতা বলে মনে হলো।

বিকেলে মিনি যখন আমাদের বাড়ীতে এলো তখন লীলা প্রায় লুকিয়ে রইল—আমার স্ত্রী অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করলেন। সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করে আমার ঘরে এসে চুপ্‌টি করে বসে রইল—তাকে রাত্রে খেতে বলে ছিলুম। আমার অনুতাপ হলো যে না বল্লেই হতো—তাকে এমন ভাবে যে অপমান করা হবে, সেটা আমি বুঝেই উঠ্‌তে পারিনি। আমার নিজেকে অতিরিক্ত প্রফুল্ল করে তুল্‌তে হলো। বল্‌লুম, "মিনি তোমার বাজনা-গান শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে; কি সব নতুন শিখে এসেচ, শোনাবে, চল।" সে গিয়ে গোটা কয়েক জর্ম্মান টিউন বাজালে। গান-বাজনার রস-গ্রহণ আমার বড় ঘটে না—বড় কম বুঝি—তবুও মনে হলো, চিত্তের বেদনাটা মিনি সেই সুরগুলো দিয়ে পরিষ্কার প্রকাশ করলে। মানুষ কেঁদে নিলে যেমন মন একটু হাল্‌কা হয়—এই সুরগুলো বাজানোর পর মিনির স্ফূর্ত্তিও যেন একটু ফিরে এসে —সে বিলাতের দু-চারটে কথা বল্লে; কি নিজের কথাগুলো যেন বেছে বেছে সাবধানে বাদ দিয়ে গেল।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর আশা করছিলুম, স্ত্রী মিনিকে আমাদের বাড়ীতে রাত্রি বাস করতে বল্‌বেন; কিন্তু তিনি তাঁর গাম্ভীর্য্য কিছুতেই ত্যাগ করলেন না। অগত্যা তাকে বিদায় দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলুম। আমার পিছনে পিছনে স্ত্রী এসে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে বল্লেন, "এখনো অহঙ্কার মট্‌-মট্‌ করচে। ছুঁড়িকে দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করছিল।"

আহা! বড় দুঃখ হয় মেয়েটার জন্যে —জীবনের সব স্ফূর্ত্তি যেন সে সাগর-পারে রেখে এসেচে।

"আমি ত দুঃখ-শোক তার কিছু দেখ্‌তে না—যেন একটা ধিঙ্গি হয়ে এসেচে। কাগের চোপড়ের বাহারটা আজ না হয় না দেখাতিস্! তুই যে বড়-মানুষ তা'ত আমরা জানি। হাজার হোক জাতে ছোট কিনা!"

কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে শাণিত ছুরির মত বিঁধ্‌লো। কি নির্দ্দয় এই মেয়ে-মানুষের জাতটা!

কথার উত্তর না দিয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়লুম। আমার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

সাপ যেমন মানুষকে কামড়ে বিষে নিজে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে, আমার স্ত্রীর বোধ হয় তেমনি একটা-কিছু হলো—তিনি বেলীক্ষণ

স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। ছট্‌-ফটিয়ে নীচে চলে গেলেন।

সে রাত্রে একটুও ঘুম হলো না। মাথা অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠে অদ্ভুত আর অসম্ভব সবের কথা মনে হতে লাগ্‌ল। মনে হলো, মানুষের সমস্ত দীনতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতা একটা বিরাট চক্রান্ত করে জগতের সৎ এবং সত্যকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পান্‌সিটা যেমন ডুবে-ডোবে—কে তাকে রক্ষা করবে! ঘর ছেড়ে বাইরে ছাদের উপর এসে দাঁড়ালুম—মিনি হলো, হয়ত মিনিও ঠিক এমনি বিনিদ্র হয়ে রাত কাটাচ্চে!—কত আশা করে সে আজ এসেছিল আমার বুকের মধ্যে, আশ্রয় পাবার জন্যে—সে আশ্রয় আমি পারলুম না দিতে! যাদের জন্যে পারলুম না, তারা আমার কে? মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ ত ভালবাসা দিয়ে—সেই ভালো ত আমি মিনিকেই সব-চেয়ে বেশী বাসি—তবে কেন, এ অসত্য আচরণ কচ্ছি! সমাজ তার নির্ম্মম নিয়মে মানুষকে এমনি করেই অমানুষ করে তুলে! সমাজকে কি ভয় আমার?—আমি একলাই আশ্রয় করব—যা থাকে কপালে! আমার নকল যা-কিছু এই দণ্ডেই শেষ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে গেলুম। কাছেই ভাড়ার ষ্ট্যাণ্ড—একখানা গাড়ী ভাড়া করে মিনির দিকে চল্‌লুম। পথের উন্মুক্ত হাওয়া মাথায় এসে লাগ্‌তে মাথাটা কতক ঠাণ্ডা হলো। কি করচি এই পাগলামি—কোথায় চলেচি এই গভীর নিশীথে! মিনি বোধ হয় ঘুমিয়ে আছে। কেন তার শান্তি ভঙ্গ করব! মনে হলো, ফিরে আসি—কিন্তু সে কথা গাড়োয়ানকে বল্‌তেও লজ্জা বোধ হলো। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলুম। গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দে যেন চম্‌কে চম্‌কে উঠছিলুম; যেন চারিদিক থেকে বিদ্রূপের হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগ্‌ল।

মিনির বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীটাকে থাম্‌তে বলে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে বল্‌লুম, "দাঁড়া, আবার এখুনি আমি ফিরে যাব।—"

সে সেলাম করে বল্‌লে, "যো হুজুর।"

গাড়ী-বারাণ্ডার উপর থেকে মিনি ঝুঁকে বল্লে, "কে? কাকা এসেচেন? সব ভালো ত! এত রাত্রে?"

গলার ভিতর পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তখন, চেঁচিয়ে কথা বার হলো না—বল্‌লুম, "হুঁ।"

বাতি হাতে করে সে আমাকে দোর থেকে নিয়ে গেল। আমি মাতালের মত পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে তার পিছনে পিছনে চল্‌লুম। তার শোবার ঘরে একটা সোফায় গিয়ে বসে বল্‌লুম, "মিনি, একগ্লাস খাবার জল চাই যে।" সে একগ্লাস জল এনে দিলে। জল খেয়ে দুটো হাঁটুর উপর হাত রেখে তার মধ্যে মাথাটা গুঁজে চুপ করে বসে রইলুম! মিনি আমার কাছে চুপ্‌টি করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! তার যেন কোন কথা বল্‌তে সাহস হচ্ছিল না।

এমনি করে কতক্ষণ কেটেচে জানিনে, মাথা তুলে চেয়ে দেখলুম, মিনি তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে।

বল্‌লুম, "দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কতক্ষণ, মা? বসো না।" সে আস্তে আস্তে গিয়ে রেলিংএর ধারটিতে চুপ করে বস্‌ল। তার চোখ-মুখের প্রত্যেক রেখাটি যেন প্রশ্ন করচে—এ কি, কাকা?

আমি গম্ভীরভাবে বল্‌লুম, "মিনু—আমার অক্ষমতা ক্ষমা কর। আজ যে ব্যবহার তোমার উপর আমরা করেছি, তা মানুষের উচিত হয়নি। তোমাকে আমার ঘরেই আশ্রয় দেওয়া উচিত ছিল,—তা আমি করিনি—তাই সমস্ত হৃদয় আমার তীব্র ব্যথায় পীড়িত হয়ে উঠ্‌চে। তোমাকে এমন করে দূর করে দিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি স্বস্তিতে কাটাতে পারব না। হয় তুমি আমার বাড়ী চল, নয় আমাকে স্থান দাও তোমার ঘরের একটি কোণে।"

মিনির মুখের উপর ম্লান হাসি ফুটে উঠ্‌লো। সে বল্‌লে, "আজ সমস্ত দিন এই কথা নিয়েই তোলা-পাড়া করেচি, কাকা। যে ব্যবস্থা আপনি করেচেন, এই সব-চেয়ে ভাল হয়েচে। মানুষ নিজের অপমানের ব্যথাটা মনের কোন্ নিভৃত কোণে লুকিয়ে রাখে, তাকে জন-সমাজের গোচর করা যায় না!—এই যে নিভৃত নীড়ট, এটিকে আমি আপনার স্নেহে রচিত বলে আজ পদে পদে উপলব্ধি করেছি। এই নির্জ্জনতার মধ্যে এক মিনিটের জন্যেও আপনাকে পাইনি, এমন আমার মনে হয়নি। ঐ যে খাট ঐ যে বিছানা পেতে রেখেচি, ওতে আপনি শুয়ে আছেন, এ বিশ্বাস থেকে এক-বারের জন্যেও মন আমার চ্যুত হয়নি। মনের একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে, কাকা, কারণ একনিমেষে কে পূর্ণ আর কে রিক্ত তা সে বুঝে নিতে পারে। আপনার বাড়ীতে গিয়ে আমি এক তিলের জন্য তিষ্ঠুতে পারব না। এও ত আপনার বাড়ী। আমি আপনারই স্নেহের আশ্রয়ে স্থান পেয়েছি—আমার কোন অভাব এখানে নেই, কাকা!"

পূবদিকে কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ উঠচে, সার্শির ভিতর দিয়ে তা দেখতে পেলুম। ধীরে ধীরে চাঁদের আলো মশারি ভেদ করে মিনির বিছানার উপর এসে পড়ল। দেখলুম, একটি ছোট মেয়ে তার ভিতর বালিশের উপর মাথা রেখে অকাতরে ঘুমুচ্চে। আমি জানি, মিনির মেয়েটি বেঁচে নেই, তবে এ কাকে এনে সে নিজের পাশে শুইয়ে রেখেচে!

কোন কথা না বলে উঠে গিয়ে মশারি তুলে দেখলুম—একটা বড় কাঁচের পুতুল—তার নাক-কান-মুখ-চোখ-চুল—সবই মানব-শিশুর মত! হায়, এই ক্ষুদ্র জননীর মাতৃত্বের সমস্ত অভাব কি পূরণ করতে পেরেচে এই প্রাণহীন পুতুলটা? ভগবান, চাইনে জ্ঞানের গরিমা, যশের ব্যর্থ অভিমান, তুমি আমাকে আবার ছোটটি করে দাও,—আমি শিশু হয়ে সন্তান-হারা এই বালিকা-মাতার শূন্য ক্রোড় পূর্ণ করব!

চোখ থেকে আগুনের মত দুর্দ্দৈব তপ্ত জল বার হয়ে বিছানাটা সিক্ত করলে! মানুষ ত এখেনে পুতুল-খেলা করচে!

স্নিগ্ধ শান্তিতে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয়ে উঠল, মনের সমস্ত ক্ষুধা নিমেষে দূর হয়ে গেল। মিনির দিকে ফিরে বল্‌লুম, "মা, আজ থেকে আমি তোমার ঐ পুতুলের জায়গা নিলুম, আমি তোমার ছেলে।"

সে আমার মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার চোখের বিন্দু বিন্দু জল আমার মাথার উপর ঝরে-ঝরে পড়ছিল;—আমার মনে হলো, স্বর্গ থেকে দেবতারা যেন আমার মাথায় অমৃতের শান্তি-জল বর্ষণ করচেন!

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ

(সমালোচন)

ভারতী-সম্পাদকযুগলেষু—

গত চৈত্র মাসের কাগজে শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরত্নের একটী লেখা পড়ে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ লজ্জা ও আশঙ্কার আন্দোলনে মনটা কিছু বিচলিত হয়ে উঠেছিল। বলে রাখা ভাল, হর্ষটা লেখার জন্য নয়, লেখকের জন্য। অনেক দিন কোনও খবর না পেয়ে ভয় হয়েছিল, নবকুমার ভায়া বুঝি লীলা সম্বরণ করেছেন! যোষ মেজাজে বাহাল তবিয়তে আছেন দেখে খুসী হলেম। চাঙ্গার হোক্, পুরাণো আলাপী। কিন্তু লেখাটা পড়ে মনে আশঙ্কাও জেগেছে, যথেষ্ট। কারণটা খুলে বলা দরকার। যাই হোক্, সাবধান করে দেওয়া হিতৈষী-জনের উচিত মনে হলো। কিন্তু নবকুমারের দেখা পাওয়াই যে দুর্ল্লভ। শুনেছিলাম, কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে। কিন্তু তাঁর সে আত্মীয়তাও বড় কাজে লাগল না। সত্যেন্দ্র-নাথ বললেন, "নবকুমারের চাল-চলন বিচিত্র। হাওয়ার মতো আসে, হাওয়ার মতই ভেসে যায়। তবে প্রয়োজন-কালে এসে জোটে বটে।" কাজেই আপনাদের কাগজের শরণাপন্ন হতে হলো। তিনি যেখানেই থাকুন, এ লেখাটা তাঁর নজরে পড়বে এই ভরসা।

এই তো গেল এ-পক্ষের কৈফিয়ৎ। আপনাদেরও একটা কৈফিয়ৎ পাওনা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ যা বললেন, তার কবিত্বটুকু বাদ দিয়ে সোজা বাংলায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায়, কবিরত্নের চাল ও চুলা দুটো জিনিষেরই একান্ত অভাব। অর্থাৎ যাকে বলে Vagabond, Bohemian বা ভবঘুরে। আপনাদের কাগজের মত এমন একটা ভদ্র অর্থাৎ Respectable কাগজে এমন লক্ষ্মী-ছাড়া লোকের লেখাকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া হলো, বুঝতে পারলেম না। Respectability'র প্রধান লক্ষণই হচ্ছে সংযম,—কিনা প্রকৃতিকে চেপে রাখা অর্থাৎ অসুবিধা-জনক সত্যকে কায়মনোবাক্যে পরিহার করা। আরও একটু খুলে বলতে গেলে বলতে হয় শক্তিমানের মন যুগিয়ে চলা, তা

সে শক্তিমান রাজাই হোন্, ব্রাহ্মণই হোন্, সমাজই হোন্ বা জন-সংঘই হোন্। কিন্তু ইতিহাসের পত্তন থেকে দেখা যায়, এই সব ভবঘুরেদের একমাত্র আনন্দই হচ্ছে এই সব শক্তিমানদের অপদস্থ করা। ফুল বিল্লব, বিদ্রোহ সংঘর্ষ অশান্তি হৈ-চৈ। এই সব লোকের উপদ্রব না হলে সংসারটার কেমন নিবাত-নিষ্কম্প দীপের মতো চেহারা হতো সেটা কল্পনা করে দেখুন দেখি। শাক্যসিংহের মতো দু'চারজন বিশিষ্ট চাল-চুলাবন্ত লোকেও অনেক সময় রীতিমত হাঙ্গামা বাধিয়েছেন বটে কিন্তু সেও নাম কাটিয়ে এদের দলে ভর্ত্তি হওয়ার পর। আর একটা কথাও ভেবে দেখার মতো। ঊষার স্বর্ণ-রাগ সত্যই কিছু সোনায় গড়া নয় আর আকাশ-কুসুমে যে ফল ফলে তাতে কোনও-দিন যে কারো খিদে বিন্দুমাত্র মিটিয়েছে ভব-ঘুরে-দলের বড় বড় টাইরাও সেরূপ সাক্ষ্য দেন না। সুতরাং আর কেন? বয়সটা একটু ভদ্র রকমের হলে দু-চারটা হাড়-লক্ষ্মীছাড়া ভিন্ন বুদ্ধিমান মাত্রেই যা করে থাকে তাই করুন—ভবকে ভাবের দিকে টেনে তোলার চেষ্টার পালোয়ানিটা ছেড়ে ভাবকেই ভবের দিকে নামিয়ে আনুন,—কোনও আয়াস পেতে হবেনা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই আপনার হয়ে সব করে দেবে, দিব্য আরামে কাটাতে পারবেন। ভিতরের কথা জানি বলেই আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। বুঝে চলতে শিখুন, কেন বুড়া বয়সে কাগজখানি খোয়াবেন? জানি, এতে আপনাদের আর্থিক সুবিধা বই অসুবিধা হবেনা,—কিন্তু এই রকমে এত দিনের নেশাটা হঠাৎ একদম ছাড়তে হলে ব্যাপারটা কি রকম হবে, ভেবে দেখবেন।

বাজে কথা ছেড়ে আসল বিষয়ের অব-তারণা করা যাক। প্রথমেই তারিফ করতে ইচ্ছা হয়, সেই জহুরীকে, যিনি নব-কুমারকে 'কবিরত্ন' বলে চিনে ফেলে-ছিলেন। এ কথা আমি অকুতোভয়ে বলতে পারি যে এণ্টনী ফিরিঙ্গী ভোলা ময়রাদের সময় জন্মালে নবকুমার অতি অনায়াসেই কবিওয়ালাদের কোহিনুর হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। কাজেই বেচারাকে ফোয়ারার মুখে পাথর চাপা দিয়ে শান্ত সংযত হয়ে বসতে হয়েছে। সে যাই হোক্, নবকুমারের জন্য আমি কেন যে এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, সেই কথাটা খুলে বলা যাক্! নম্বর-ওয়ারি তাঁর বিদ্যার বহরটা দেখিয়ে দিলে আপনাদের বুঝতে কোনরূপ গোল হবে না।

১। নবকুমারের সূচীভেদ্য অজ্ঞতা—খাঁটি বাংলায় যাকে বলে, নিরেট মূর্খতা।

উদাহরণের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। প্রথম লাইনটাই দেখুন না কেন। "কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত?" একেবারে যাকে বলে, বিশমোল্লার গলদ। কারা এই তক্তটা দিয়েছে সেদিকে একটু লক্ষ্য করলেই তো জলের মত বুঝতে পারতেন, এ ঠাট্টা হতে পারে না, হবার যো-ই নাই। আর কারা যে এই তক্তটা দিয়েছে সেটা অব-ধারণ করতে হলে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়ারও আবশ্যক নাই। চোখ মেললেই দেখতে পাবেন।

ঘণ্টাকর্ণ মহাশয়ের (অবশ্য নবকুমারের ভাষায়) ঐ যে 'পণ্ডিত-রাজ' উপাধিটী জল্ জল্ করে জলছে, ঐ ট্রেড মার্কাতেই ধরা পড়েছে এটা কোন্ কারখানার মাল। অপণ্ডিতে কখনো পণ্ডিতের কদর বোঝে না; সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, পণ্ডিতেরা মিলেই তাঁকে নিজেদের রাজার পদে অভিষেক করেছেন। কিন্তু নিজের দেশ পণ্ডিত-রাজ্যের রাজা করেই তৃপ্ত হতে না পেরে অপর দেশ কবি-সাম্রাজ্যের সম্রাট-পদে বরণ করেছেন। যেমন George V King of Great Britain and Ireland and Emperor of India. যে সম্প্রদায়ের দ্বারা এই ডবল অভিষেক ব্যাপার সম্পন্ন হয়েছে, তাঁরা যে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ঠাট্টা করেন নি, তার অকাট্য প্রমাণ এই যে প্রায় দুহাজার বছর ধরে কেউ ঠাট্টা চালিয়ে আসেন না বা আসতে পারেনও না। এঁরা যে কালিদাসের কাব্যে কেবল উপমার বাহারই দেখেছেন, তিন গুণের মধ্যে দুই গুণে মাঘকে কালিদাসের চেয়ে বড় বলে প্রচার করে এসেছেন, রঘুর চেয়ে ভট্টকে শ্রেষ্ঠ ভেবেছেন, পদাঙ্কদূত হংসদূত কোকিল-দূত এবং আরও দূতকে মেঘদূতের মতই আদর করেছেন, নব্য ন্যায়ের শাণে ঘষে ঘষে মানব-বুদ্ধিকে অদৃশ্য-প্রায় করে তুলেছেন, তাহলে এ সবও কি ঠাট্টা? এঁদের যে কাব্যরস-বোধ বিন্দু-মাত্র আছে এ অপবাদ অতি-বড় শত্রুতেও তো দিতে পারে না। এঁরা যে কালিদাস ভবভূতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছেন, এঁদের রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-অনুবন্ধ টীকা-ভাষ্য কোথাও তো তার কোনও পরিচয়ই দেখতে পাওয়া যায় না! অবশ্য পাপিষ্ঠ যবনেরা যদি বেছে বেছে ঐ পরিচয়গুলি লোপ করে না থাকে! ভট্টপল্লী ছেড়ে একবার ঐ য়ুরোপের দিকে চেয়ে দেখুন, যেখানে শুনেছি, জড়বাদের অজস্র আবাদ হয়ে থাকে। তর্জ্জমায় শকুন্তলা পড়ে জর্ম্মণ কবির যে ভাবোচ্ছ্বাস হয়েছিল সমালোচনা-হিসাবে তার মূল্য যাই হোক্ না কেন, তার রসানুভূতি এমন তীব্র ও গভীর যে আজও মনের উপর দিয়ে দখিণ হাওয়া বইয়ে দেয়। ভট্টপল্লী ভুলক্রমে রবীন্দ্রনাথকে যদি ঐ তক্তে বসাতেন (মুনী-নাঞ্চ মতিভ্রম হয়ে থাকে কিনা) তা হলেও একটা কথা ছিল—ঠাট্টার কথাটা মনে উদয় হওয়াই স্বাভাবিক হতো। কিন্তু মুনিদের যখন মতিভ্রম হয় নি, তখন নবকুমারের এমন দারুণ মতিভ্রম হলো কেন? যোগ্য লোকে যোগ্য লোককে যোগ্য আসনে বসিয়েছেন, এর মধ্যে নবকুমার ঠাট্টার অবকাশটা দেখলেন কোথায়?

তাও বলি, বড়ই খুসি হয়েছি আমি নব-কুমারের এই মতিভ্রমে কি না ভীমরতিতে।

ভীমরতি জিনিষটা নিছক ভুলে গড়া, তার সন্দেহ নাই। কিন্তু তার একটা গুণ আছে,—তা মানুষের স্বভাবটাকে জানিয়ে দেয়। ঠাট্টার কথাটা তোলায় নবকুমারের অজ্ঞতা যতই প্রকাশ হোক না কেন, তাঁর অন্তঃসলিলা সহৃদয়তারও পরিচয় বেশ ভাল রকমই পাওয়া গেছে। পুরোনো পণ্ডিতদের কাব্য-রসজ্ঞানের প্রতি তিনি যে এখনো যথেষ্ট শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পেরেছেন, এ

কথাটা একেবারে ফাঁস হয়ে গেছে, এটি কম আনন্দের বিষয়! আমি বরাবরই জানতেম যে যা-কিছু পুরাণো নবকুমারি-তারই কালাপাহাড়। এমন কি পুরাণো চাল পর্য্যন্ত তাঁর দু-চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছিল, এবং বর্জ্জনের ব্যাপারে বিধিমত কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে (পুরাণো চালের তো বটেই—আমাদেরও বটে) ক্রমাগত নূতন চালের সেন্সায় তাঁর কঠিন উদরাময় হওয়াতে কবিরাজের পরামর্শে অবজ্ঞাত পুরাণো চালেরই আশ্রয় নিয়ে মতটাকে ছেড়ে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। এহেন নবকুমার যে পুরাণো পণ্ডিতদের রসজ্ঞানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, এ ব্যাপারটা যে কত বড়, নবকুমারের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নাই তাঁরা সেটা ঠিক বুঝতে পারবেন না।

তারপর নবকুমারের প্রাণীবৃত্তান্তের বিস্কেটার দৌড় দেখুন। উপমার টানে জগতের প্রায় সব শ্রেণীর প্রাণীকে টেনে এনে এই ছোট ক'য় লাইনের কবিতাটীকে একটী রীতিমত চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন। কিন্তু কোন্ অপরাধে এই সব কৃষ্ণের জীবকে এই সংকীর্ণ পাউণ্ডের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে, তার হেতু তো কিছুই দেখা যায় না। আগে প্রাণীর ফিরিস্তিটা দেখুন।

(১) পশু—ঘোড়া মোষ বলদ

(২) পক্ষী—হংস সারস বক গৃধ্র

(৩) কীট—কীট

(৪) পতঙ্গ—এটা যে কি করে বাদ পড়ে গেল বোঝা যায় না। রসজ্ঞ পাঠক একটা ফড়িং ধরে অভাবটা পূরণ করে নেবেন। এ ছাড়া আবার ব্যাধি আছে—যেমন বিস্ফোটক। উদ্ভিদকেও বাদ দেননি—তবে সদ্য আবছায়া না রেখে চচ্চড়ি রেঁধে পাঠকদের পাতে পরিবেষণ করেছেন। অচেতন পদার্থের চৈতন্য নাই বলেই যে তাদের অবিচার করতে হবে, এমন কি কথা? তাই তাদেরও সম্মান রেখেছেন—তাদের প্রতিনিধি ঘণ্টা ও চৌকির জন্য দুটী স্থান রেখেছেন। বেশ দেখা যাচ্ছে—কবিবর তাঁর ঘণ্টাকর্ণের উপযুক্ত উপমা খুঁজে আকাশ পাতাল তোলপাড় করেও মনের আকুতি মেটাতে পারছেন না। আলঙ্কারিকেরা বলে থাকেন, ভাবাতিশয্যে এরূপ ঘটে থাকে। কিন্তু উপমার তো যা হোক কোনও রকম একটা সাদৃশ্য থাকা চাই; সেটা যে কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা আমার বুদ্ধির অগম্য। পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নাই—একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। নবকুমার লিখেছেন, "ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়ছো গ্রীবা গৃধ্রহে"। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে নিই। গৃধ্রের সঙ্গে কোনও কোনও বৃদ্ধের স্বভাবের মিল থাকা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু স্বভাবের মিল থাকলেই যে ছন্দের মিল হবে, এ কথা নবকুমার দূরে থাক স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ বললেও মানবো না। সে যাই হোক্ নবকুমার ছবির বই ছাড়া রক্ত-মাংসের গৃধ্র যে কোথাও দেখেছেন তাঁর লেখা দেখে সেরূপ মনে হয় না। প্রথমতঃ গৃধ্র শ্মশান-ভাগাড়েই থাকতে ভালবাসে—তপোবনের ধার দিয়েও আসে না। তার পর দেখুন, গৃধ্রের দৃষ্টি মৃতদেহের দিকেই; কিন্তু নবকুমার যাঁকে

বৃধ-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেছেন, তাঁর দৃষ্টি বিশেষ করে' পড়েছে তাঁরই উপর, যিনি অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছ্বাসে চারিদিক একেবারে প্রাণ-মুখরিত করে তুলেছেন।

২। নবকুমারের শাস্ত্র-জ্ঞান-হীনতা ও নৃশংসতা :—

নবকুমার লিখেছেন, "অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডলবো?" কিন্তু এই ঘাড় নোয়ানোর ইচ্ছের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করে দেখার যোগ্য। গাড়ীর চাকায় তেল দেওয়ার কথাটা সার্ব্বলৌকিক হলেও গাড়ী টানার মোষের ঘাড়ে ঘৃত-মর্দ্দনের রেওয়াজ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। এক জগদ্ধাত্রী পূজার বলির মোষের ঘাড়ে ঘি ডলে নরম করা হয়ে থাকে বটে কিন্তু সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ লক্ষ খচি মেষ-শাবক বলি দেওয়ার প্রথা সম্প্রতি এ দেশে প্রবর্ত্তিত হয়ে থাকলেও বুড়ো মোষ বলি দেওয়ার কথা শাস্ত্রেও লেখে না দেশাচারেও বলে না। সুতরাং লোক-লজ্জাবশতঃ নবকুমার আসল উদ্দেশ্যটা চেপে গেলেও বুদ্ধিমান পাঠকের চোখে ধুলো দিতে পারেন নি। তাঁর মনোগত ভাবটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কি দারুণ নৃশংসতা! তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে নবকুমার-প্রকৃতির লোকেদের দেশের ছোট বড় মাঝারি কোন রূপ লাট্ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোনও কালেই নাই। কিন্তু এই নৃশংসতাকেও হারিয়েছে তাঁর মূর্খতার ঝোঁকটা। তিনি কি মনে করেন এই চির-বৃদ্ধ বিপুলবপু মহিষের কেবল একটীমাত্র বৃদ্ধ যে সেটী ছেদন করলেই সে মহিষ-লীলা সংবরণ করবে? এ যে কোটী-স্কন্ধ!

৩। নবকুমারের মিথ্যাবাদ :—

বাজারে পশার রাখার জন্য নবকুমার বড়াই করে বলছেন, 'কত বা ঘি ডলবো?' অজ্ঞ পাঠক মনে করবেন তাঁর ভাঁড়ার বুঝি ঘিয়ের মটকিতে ঠাসা। কিন্তু আমরা যে হাঁড়ির খবর জানি! তাঁর ভাঁড়ে বা ভাঁড়ারে ঘি বা তেল বা ঐ জাতীয় স্নেহ-পদার্থ এক ছটাকও কোনও দিন ছিল না। যদি বা ইতিমধ্যে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট চেয়ে-চিন্তে একটু-আধটু সঞ্চয় করে থাকেন তার পরিমাণ কখনই এতো হতে পারে না যে, দরাজ গলায় বলতে পারা যায়, "কত বা ঘি ডলবো?"

৪। নবকুমারের স্বদেশ-দ্রোহিতা :—

রবীন্দ্রনাথের কুশিক্ষায় ও কুদৃষ্টান্তে সাহিত্যে বিশ্বজনীন ভাব বলে একটা ধুয়া উঠেছে। কিন্তু ওভাবটা যে নেহাৎ আজগবি ও বস্তুতন্ত্রহীন একটু প্রণিধান করলে সকলেই তা বুঝতে পারবেন। সংসারে 'বিশ্বজন' বলে রক্তমাংসের প্রাণী যখন কুত্রাপি নাই বা কোনও দিন ছিল না তখন "বিশ্বজনীন ভাব" জিনিসটাও শশশৃঙ্গের ন্যায় অমূলক, আকাশ-বিহারী আলোকচর কবির আলোর স্বপন। কিন্তু এই ধুয়ার ফলে হিন্দু তার হিন্দুত্ব, বাঙালী তার বাঙালীত্ব হারাতে বসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সরবতের সঙ্গে এই সাংঘাতিক বিষ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পান করাচ্ছেন, তার স্বাদ যেমন বিচিত্র, গন্ধ যেমন অপূর্ব্ব, তা দেখতেও তেমনি মনোরম। কাজেই হিন্দুর

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বাঙ্গালীর ভারতবাসীর বিপদ অতি ভয়ানক। এ দিকে মুস্কিল হয়েছে এই যে, ভগবান মানুষের একাদশেন্দ্রিয় ঠিক হিঁদুস্থানীর মাপেই গড়ে তোলেন নি, কাজেই উক্ত সরবতের জঘন্যতা প্রমাণ করবার জন্য চেঁচিয়ে গলা ভাংলেও মানুষের গুহাবাসী মন তা মানতে চায়না। উপায়ান্তর না দেখে দেশের সুধীবর্গ বিস্তর আলোচনা করে স্থির করেছেন যে, যে-পতঙ্গ আগুনের রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়, তাকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় যেমন তাকে অন্ধ করা, উপস্থিত বিপদ হতে দেশকে বাঁচাবার একমাত্র উপায়ও তেমনি দেশের লোকের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনুভূতিকে বিকৃত ও নষ্ট করে দেওয়া অর্থাৎ দেশের লোকের রুচির এমন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তোলা, যাতে তারা সুন্দরকে আর সুন্দর বলে বুঝতে না পারে! উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং চেষ্টাও এমন বিপুলভাবে হচ্ছে, তাতে অচিরাৎ সুফল ফলবে, বুদ্ধিমান মাত্রেই সেরূপ আশা করছেন। আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এই রোগের প্রতিকারের যে ব্যবস্থা ঠিক করেছেন, আমার মতে সেইটীই সব চেয়ে সহজ আর কার্য্যোপযোগী। তিনি বহু গবেষণায় স্থির করেছেন যে গোময়কে হিন্দু যে চোখে দেখেন পৃথিবীর অপর কোনও জাতিই সে চোখে দেখেন না। বলতে গেলে ঐটাই তার সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব। সুতরাং ঐ বিশেষত্বকে বজায় রাখতে ও তার বিকাশ করতে হোলে হিন্দুর বাক্য কার্য্য চিন্তা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস এমন কি গণিতেও গোময়ের পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে যাই হোক, গণিতের মত abstract বিজ্ঞানে গোময়ের পরিচয় থাকা কিরূপে সম্ভব হতে পারে, এই প্রশ্নের মীমাংসাচ্ছলে তিনি যে দুটী অঙ্কের উদাহরণ দিয়েছিলেন—বাস্তবিকই তা' অপূর্ব্ব।

১। একজন বিলাত-ফেরতের প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যে যদি একছটাক গোবর লাগে, তাহলে ১০ কোটী লোকের প্রায়শ্চিত্তে কত গোবর লাগবে?

২। বর্ত্তমানে দেশে যদি ৩ কোটি গোরু থাকে এবং তারা বৎসরে যদি ৯ কোটি মণ গোবর উৎপাদন করে এবং তাহা সমস্ত ভারতবর্ষের উপর ছড়িয়ে দিলে যদি ½ ইঞ্চি উঁচু হয় এবং প্রতি ১০ বৎসরে লোক যদি শতকরা ৩০ হিসাবে বাড়ে ও গৌরীশঙ্করের উচ্চতা যদি ২৯০০২ ফুট হয় তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষকে গৌরীশৃঙ্গের সমান উঁচু করে গোবর দিয়ে ঢাকতে কত বৎসর লাগবে?

অবান্তর কথা ছেড়ে নবকুমারের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। নবকুমার যে দারুণ স্বদেশ ও স্বজাতি-দ্রোহী তাঁর ব্যবহৃত দু'টী শব্দ থেকেই তা জলের মত পরিষ্কার হবে। "চতুর্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকির সঙ্গে তর্কে। এক মুখে কি বলবো আমি বলদ-ধুরন্ধরকে?" এই দুই লাইনে "ঢেঁকি ও বলদ" শব্দ দুটী যে গালাগালি-ছলে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ হবে না। কিন্তু এই অসম্মানের দৃষ্টি ভারতের নয়, হিন্দুর নয়, বিদেশীর ও বিধর্ম্মীর। তাঁরা বিদ্বান হতে পারেন, বুদ্ধিমান হতে পারেন কিন্তু স্বদেশের আত্মার

(Soul of India) যে কোনই সন্ধান পান নি তা নিশ্চয়। দেবর্ষি নারদ যে হাতী ঘোড়া পুষ্পকরথ ছেড়ে ঢেঁকিকেই কেন বাহন করেছেন সে গভীর তত্ত্ব যেন নাই বুঝলেন কিন্তু চোখ মেললেই তো দেখতে পেতেন বিদেশীর অনুকরণে দুরাচারটা চালের কর্ণ হয়ে থাকলেও দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই ঢেঁকি। নবকুমার ও তাঁর দলের দু-চারজন যাই বলুন না কেন দেশের লোক ঢেঁকির মাহাত্ম্য ভালরূপই বোঝে; এককালে পৃথিবীর সব দেশের লোকেই বুঝতো। বড় বড় ঢেঁকির কপালে সিন্দুর চন্দন লেপে তাদের সামনে গড় হয়ে পড়ে থাকাটাকে মানব-জন্মের চরিতার্থতা বোধ করতো। বিশ্বাস না হয় Feudalism ও গোপ-সাম্রাজ্যের ইতিহাস পড়ে দেখুন। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ঢেঁকি-পূজা লুপ্তপ্রায় হয়ে গেলেও নানাবিধ বিপ্লবের মধ্যেও ভারত আপন স্বধর্ম্ম বজায় রাখতে পেরেছে। এই বিশেষত্বের কারণ যখন ভাবি, তখন আমাদের ত্রিকালদর্শী পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পরিপ্লুত হয়ে ওঠে। তাঁরা যদি কঠোর অনুশাসনে আমাদের বেঁধে না রাখতেন তাহলে আমরাও তো পৃথিবীর আর পাঁচজনের মত ঢেঁকি-পূজা ভুলে বসতেম।

সে যা হোক আজ যে পৃথিবীর বড় বড় ঢেঁকিরা পূজার লোভে এই ভারতে এসে সমবেত হয়েছেন এবং আমরাও জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ঢেঁকির কপালেই সিন্দুর চন্দন লেপে সকলের পায়ের তলেই গড় হয়ে পড়ে আছি, এই ব্যাপারের মধ্যে বিধাতার গূঢ় অঙ্গুলির নির্দ্দেশ দেখতে পাচ্ছেন কি? এইখানেই মানব-সভ্যতার নূতন উষার উন্মেষ হবে,—মহা-মানবের আবির্ভাব নয়, মহা-ঢেঁকির প্রতি ভারতের খাঁটী মনোভাব যে কি, আগামী ইলেকসন্ ব্যাপার তা চোখে আঙ্গুল দিয়েই দেখিয়ে দেবে। একটা কথা নবকুমার বলতে পারেন—এদেশের মেয়েরাও তো ঢেঁকি বলে গাল দিয়ে থাকে। সেকথা অস্বীকার করার যো নাই। কিন্তু এই অপরাধে আমরা সনাতন-পন্থীরা মেয়েদের প্রতি কি বিধান করেছি, সেটাও একবার লক্ষ্য করে দেখবেন। তাদের সূর্য্য-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ ও বেদের অধিকার কেড়ে নিয়ে কেবল বাঁচবার অধিকারটুকু মাত্র রেখে দিয়েছি—সেও কেবল আমরণ-কাল ঢেঁকি-সেবায় নিযুক্ত থাকার জন্য। এই বিধানের ফলও এখন চমৎকার হয়েছে! তারা জন্ম-জন্মান্তর ঢেঁকি-সেবার সৌভাগ্যের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছে। আমরাও ঐ সেবাটুকুর লোভে চির-ঢেঁকিত্ব লাভের সাধনায় দেশশুদ্ধ লোক ব্যাপৃত হয়ে আছি।

এখন বলদের কথাটা আলোচনা করে দেখা যাক্। গবর্ণমেণ্ট Statistics থেকে দেখা যায় এই ভারতবর্ষের অধিবাসীর শতকরা ৭৫ জন বলদের দ্বারা চাষ করে থাকে। ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে গেলে আর একটু খুলে বলা দরকার। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ২৬৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৩ বিঘা জমির আবাদ হয়ে থাকে; ১৫৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ৩ হাজার ১৯ বিঘা জমিতে ৭৭৩ কোটি মণ খাদ্যদ্রব্য

উৎপন্ন হয়। এছাড়া গরুর গাড়ী ও ভারবাহী বলদের তালিকা দিলে একেবারে ছবির মত দেখতে পাবেন যে কত কোটি বলদ পরোপকারের জন্য আত্মোৎসর্গ করছে। ভারতের এমন পরম মিত্রকে যে ব্যক্তি অমন অনায়াসে অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারেন, তিনি যত বড়-কবি ও ভাবুকই হোন্‌না কেন, একেবারে হৃদয়হীন অমানুষিক এ আমি জোর গলাতেই বলবো। নবকুমার-সম্প্রদায় আজ যদি চিরদিনের জন্য পৃথিবী-পৃষ্ঠ হতে বিদায় নেন, তাতে যে ফাঁক পড়বে সেটা খালি চোখে বোধ হয় কারো নজরেই পড়বে না। কিন্তু বলদের অভাব! কল্পনাতেও যে আতঙ্কজনক। আর কিছু না হলেও এই বলদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরাই তো চিনির বলদরূপে পৃথিবীর প্রাচীন কাল হতে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন পিঠে করে বহন করে এনেছেন—আর সে এমন নিঃস্বার্থভাবে যে এক বিন্দু রসও নিজে আস্বাদ করেন নি! এজন্যও তো নবকুমার কোম্পানির তাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত! নবকুমার তো অতি অনায়াসেই বলদ তুলে গাল দিলেন—কিন্তু ধীরে রজনী, ধীরে! ইনি কি যে-সে বলদ—ইনি যে স্বয়ং তমোগুণরূপী মহাকালের বাহন। এঁর পিঠের তমোগুণের ঝুলি হতে তিনি মুঠি মুঠি অন্ধকার নিয়ে চারিদিকে ছড়াচ্ছেন—যেদিন থলি উজাড় করে ঢেলে দেবেন, সেদিন দিগ্বিদিকে বিষাণ বেজে উঠবে।

৫। বয়োজ্যেষ্ঠের অসম্মান :—

নবকুমার কোম্পানির এই একটা বিশেষ বাহাদুরির লক্ষণ সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান করেন না, সত্যেরই নাকি সম্মান করে থাকেন। কেবল যে সম্মান করেন না তা নয়, যথাসাধ্য অবজ্ঞাও দেখিয়ে থাকেন। তাঁদের যুক্তিটা এই—যে লোক এত দিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বিন্দুমাত্র পরিচয় পেলেনা তার পিঠের বয়সের বোঝা আবর্জ্জনার রাশি বই নয় এবং আবর্জ্জনার প্রতি মানুষের একমাত্র সম্মান সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগ। যুক্তিটার যে একটু বাহ্য চটক আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—এমন কি আমারই প্রথমটা একটু ধাঁধা লেগেছিল। কিন্তু গুরুকৃপায় হঠাৎ একটা গভীর তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম। সব কথা খুলে বলার হুকুম নাই, বললেও অনধিকারীতে বুঝবে না। আভাসে ইঙ্গিতে একটু জানিয়ে দিচ্ছি। হ্যামলেটের কথাটা মনে পড়ে কি,—There are more things in Heaven and Earth ইত্যাদি? কথাটা খাঁটি সত্য, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান-ভূত জগতের অনেক সূক্ষ্ম শক্তি আবিষ্কার করেছে এবং ক্রমশঃই করছে এ কথা সকলেই জানেন। যেগুলি ধরা দিয়েছে অজ্ঞাতের তুলনায় তা যে নগণ্য মুষ্টিমেয়, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই তা স্বীকার করেন। এই অজ্ঞাত শক্তিরাশির অনেক গুলি ভৌতিক বীক্ষণে কোন দিনই ধরা দেবে না—তাদের ধরার জন্য যে মনো-বীক্ষণ দরকার ভারতীয় আর্য্যেরাই তার রহস্য কতকটা বুঝেছিলেন। তাঁরা বুঝে ছিলেন এই নিগূঢ় শক্তি সমূহের নি

সংস্পর্শে জাগতিক পদার্থ মাত্রেই প্রতি মুহূর্ত্তে একটা অনির্ব্বচনীয় মহিমা লাভ করেছে। সুতরাং যার যত বয়স বেশী হবে সে তত অধিক পরিমাণ এই অতি তাড়িৎ শক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে—তা সে মানুষ জীব-জন্তু গাছপালা আচার ব্যবহার যাই হোক না কেন। ভারতবর্ষ যে নাগা-হদ মাটী পাথর ইস্তক হনুমান বানর পর্য্যন্ত পূজা করেন, সে কেবল এই তত্ত্বটা কতক বোঝেন বলে। আর এরা যে মানুষের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারপর দেখুন অন্ধকার আলোর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে আমরা তার কি সম্মানই না করি। এমন কি আলোকটাকে হঠাৎ নবাব বলে অশ্রদ্ধার চোখেই দেখে থাকি। উপনিষদ অন্ধকারের চেয়ে আলোর বেশী সম্মান করেছেন বলে আমরা সনাতন-পন্থীরা উপনিষদকে পর্য্যন্ত একঘরে করেছি। নব্যপন্থী ব্রাহ্মরা আছেন বলে তিনি কোনও রূপে চলে যাচ্ছেন।

৬। নবকুমার সম্বন্ধে আশঙ্কা :—

এই লেখাটায় নবকুমার কিছু বেশী মাত্রায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন সে কথা গোপন করার যো নাই। এইটী লেখার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁর মানসিক টেম্‌-পারেচার যে স্বাভাবিকের চেয়ে অন্ততঃ ৪ ডিগ্রী উপরে ছিল সে কথা আমি শপথ করে বলতে পারি। তিনি হয়তো বলবেন "আসৈলে" (সাধুভাষায় যাকে অসহনীয় বলে) দেখলে তাঁর গা জ্বালা করে। কিন্তু তিনি কলিযুগে মানুষ হয়ে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন—গা-জ্বালা করাটাই যদি তাঁর প্রকৃতি হয় তাহলে সে গা জ্বালা যে রাবণের চিতার মত জ্বলবে! তার নিবৃত্তি বা কোন্ খানে এবং বিরামই বা কোন্ কালে? আর তার উপশমই বা কোন্ ঔষধ-প্রয়োগে? তাঁর শরীর ও মনের উপর এই নিদারুণ গাত্র-জ্বালার যে কি শোচনীয় ফল ফল্‌বে তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। আবার বিপদ এই যে, এই গা-জ্বালার আগুন আপনাকে ও পরকে যতখানি পোড়ায় সে অনুপাতে আলো দেয় না। বরঞ্চ অনেক সময়ে ধোঁয়াতে সব কলুষিত করে রাখে। যাই হোক তিনি যদি সঙ্কল্প করে থাকেন যে এই দুর্ল্লভ মানব-জন্মটা কেবল জ্বলে জ্বলেই খোয়াবেন তাহলে নাচার।

আমি জানি নবকুমার এর কি জবাব দেবেন! তিনি নাটকের নায়কের মত গম্ভীর কণ্ঠে বলবেন যে চাইনে জান্‌তে এর ফল কি হবে—মিথ্যার বিরুদ্ধে এই যে জেহাদ ঘোষণা,—শেষ রক্তবিন্দুটী পর্য্যন্ত দিয়ে এই ব্রত পালন করতে হবে। আমরা যে Soldiers in the liberation war of Humanity. কে বলে মানুষ মুক্তি চায়? সে মুক্তি-স্বপ্নের আনন্দ-বেগে জেগে উঠে বাঁধনগুলোকে আরও কড়া করে বাঁধে। যে অস্ত্রে তার পায়ের শিকল কাটে সেই অস্ত্রকেই তার গলার শিকল করে তোলে। যদিও মনে ভাবে, এ শিকল নয়, কণ্ঠহার—রুসোই বল প্রেসিডেণ্ট উইলসনই বল আর যিনিই বল মানব-মুক্তির সকল যোদ্ধার সকল চেষ্টাই লামাঙ্কার মহাবীরের চেষ্টারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। নানা চিত্রকরের দ্বারা

নানা চিত্র-ভূমিকায় নানা তুলিতে নানা বর্ণে সেই অতিবৃদ্ধ অদৃষ্টের পুরাতন বৃদ্ধা-জুষ্টটাই বার বার আঁকা হয়ে চলেছে, না জানি, কোন্ প্রতিকূল দৈত্যের প্রকাণ্ড পরিহাস-বশে! কে জানে, এ ট্রাজেডি না কমেডি?

আমি যদি স্থির জানতেম, নবকুমার ভয় পেয়ে আপনার অভীষ্ট পথ হতে ফিরে আসবেন তাহলে হয়তো তাঁর চোখের সামনে এ নিরাশার ছবিটা তুলে ধরতেম না। কিন্তু যে বাঁশী শুনেছে সে যে কর্ত-খানি দিয়ে শুনেছে সে আমি জানি। আমি জানি সত্য কত সত্য—মহৎ কেমন মহৎ, সুন্দর কিরূপ সুন্দর! Knight of the Sorrowful Countenance এর শেষ কথাটা আমার মনের কাণে বেজে উঠছে,—

Dulcinea is the loveliest Lady on the earth and I the most unfortunate of Knights. But it is not meet that my weakness shall deny the Truth. Drive home thy lance Sir, Knight!

শ্রীঅশীতিপর শর্ম্মা।

পথের বঁধু

নিতাইয়ের নেশাটা সেদিন কি রকম চড়ে গিয়েছিল, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে যেমন একটু তন্দ্রা এসেছে ঠিক সেই সময় দেয়ালের ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। নিতাইয়ের মনে হল কে যেন তার মগজে দু-ঘা হাতুড়ী মেরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পড়ে পড়ে সে ভাবতে লাগল ঘুম যদি একেবারে না হয়, তবে কালকে আবার আফিসে গিয়ে ঢুলতে হবে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—আরে কালকে ছুটি যে। পরম আলস্যে সে পাশ বালিসটাকে জড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমের সাধনাতে মন দিলে।

বেলা তখন প্রায় ন-টা। মুখের উপর রোদ এসে পড়াতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত্রিতে নেশার ঝোঁকে বালিশ নিয়ে সে মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল। সেইখানে শুয়ে শুয়ে সে দেখলে খাটের উপর চারু পড়ে রয়েছে। তার একটা পা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে, আর একটা পা মাটির দিকে ঝুলে।—শোয়া ও বসার মাঝামাঝি একটা অবস্থা।

ঘরের এককোনে দুটো দেশী মদের বোতল, একটা খালি, আর একটাতে তখনো একটু মদ রয়েছে। চারুর দিকে চেয়ে চেয়ে নিতাই বল্লে—ছোঁড়ার এখনও নেশা কাটেনি দেখছি, এই চেরো উঠবিনে—

চারুর কোন জবাব নেই।

নিতাই পাশ ফিরে আবার চোখ বুঁজিয়ে

ফেল্লে। আরও আধঘণ্টা এপাশ-ওপাশ করে সে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল। গত রাত্রির কূর্ত্তির নিশানা তখনো ঘরময় এদিক-ওদিক ছড়ান রয়েছে। সে জিনিষপত্রগুলোকে গুছিয়ে রেখে ঘরটাকে বেশ করে ঝাঁট দিলে। তারপর জারুলকাঠের টেবিলটার উপর থেকে একখানা আধপোড়া সিগারেট তুলে নিয়ে সেটাকে ধরিয়ে ডাকলে—এই চেরো উঠবিনে—

চারু চোখ না চেয়ে শুধু তার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে—হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান।

নিতাই একটা সুখ-টান দিয়ে চুরুটটা চারুর হাতে দিলে। চারু চোক বুঁজিয়েই তাতে কষে একটা টান মেরে উঠে বল্লে—আজ ছুটি না—নিতাই টেবিল চাপড়ে গান ধরলে—

ছুটি ছুটি ছুটি
আজকে ছুটি কালকে ছুটি
পরশু ছুটিরে—
আমরা দুটি চাপাই খাঁটি
মকা লুটি রে—

মকদুমপুরে রেলি ব্রাদার্সের যে তিষির আড়ত আছে, নিতাই ও চারু সেখানে কাজ করে। চারুর দুনিয়ায় কেউ নেই, দুর সম্পর্কের এক মামার বাড়ীতে সে মানুষ হচ্ছিল। এই দূর সম্পর্কের মামাকে যেদিন সুদূরের ডাকে তল্পী-তল্পা গুটোতে হল সেই দিন থেকে তাকে নিজে চরে খেতে শিখতে হয়েছে। নিতাইয়েরও তাই, পৃথিবীতে থাকবার মধ্যে তার এক ঠাকুরমা আছে, কাশীতে থাকে। ঠাকুরমা থাকার জন্য সাংসারিক সুবিধা তার কিছুই নেই বরং অসুবিধাই আছে। কারণ প্রতিমাসে তার কুড়িটাকা মাইনে থেকে পাচটী করে টাকা কাশীতে পাঠাতে হত। দুজনে প্রায় সাত বছর এই মকদুমপুরে এক সঙ্গে বাস করছে, দুটীই সমান অভাগা, মিলেছেও ভাল।

চারু বল্লে আজ রাঁধাবাড়ার কি হবে? ট্যাঁকে ত একটী আধলাও নেই।

—কাল কি সব খরচ করে ফেলেছিস্ নাকি!

—ছিলত মোটে তিনটে টাকা—আফিস খোলা থাকলেও না হয় পাওয়া যেত; গুডফ্রাইডের ছুটি পড়ে সব মাটি হয়ে গেল। নিতাই বল্লে—তবুত ছুটির একটা দিনও কাটেনি—দে আজ ভাতে-ভাত চড়িয়ে।

—আরে ভাতে-ভাত চড়াই কি দিয়ে, চালও যে নেই, ওদিকে মাংসওয়ালা ব্যাটা এমন তাগাদা জুড়েছে যে ও-পথ মাড়াবার যো নেই।

রাস্তা দিয়ে একটা ছেলে জংলা সুরে কি একটা গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছিল, নিতাই সেই সুরে শিষ দিতে আরম্ভ করলে আর চারু তালে তালে টেবিল চাপড়ে তবলা বাজাতে লাগল।

মিনিট দুয়েক এই অপূর্ব্ব ঐক্যতানবাদন চলবার পর শিষ থামিয়ে নিতাই বল্লে—আয় তবে এবেলা একাদশী করা যাক, ওবেলা কানাইয়ালালের ওখানে আমার নেমন্তন্ন আছে আসবার সময় গোটা কয়েক লাড্ডু পকেটে ভরে নিয়ে আসব'খন।

খানিকপরে আপনার মনে সে আবার বলতে লাগল—ফরসা জামাও নেই, কি পরে যে যাই। আফিসের কোট এঁটে ত আর ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া যায় না।

দুই বন্ধুতে সেদিনকার মতন একাদশীর বন্দোবস্ত করে বেলা এগারোটার সময় আবার বিছানা নিলে। দিনটা প্রায় কাটিয়ে দিয়েছিল হঠাৎ দরজা ধাক্কার আওয়াজ শুনে চারু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখলে একজন আগন্তুক এসে উপস্থিত। লোকটী বাঙ্গালী, বয়স প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ। চেহারা ও সাজগোজ দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। আগন্তুক চারুকে নমস্কার করে বল্লে—মশায় আমি বাঙ্গালী, নাম নরেশচন্দ্র ঘোষ। আপনারা বাঙ্গালী তাই আপনাদের এখানে এসে হাজির হয়েছি!

নিতায়ের চোখ থেকে দিবা নিদ্রার জড়তাটা তখনো কাটেনি। রাত্রে তার ভাল করে ঘুম হয় নি, দিনের ঘুমটী বেশ জমে এসেছিল কোত্থেকে এই লোকটা এসে লাখ টাকার ঘুমটা মাটি করে দিলে। চোখ বুঁজিয়ে পাশ ফিরতে-ফিরতে সে বল্লে—তা বেশ করেছেন, কিন্তু এই পাণ্ডব বর্জ্জিত স্থানে আসার উদ্দেশ্য? প্রত্নতত্ত্ব বুঝি!

নরেশ বল্লে—আর সে কথা বলবেন না মশায়, যাচ্ছিলুম বাঁকিপুরে, এই ষ্টেশনে নেমে খাবার কিনতে-কিনতে ট্রেনখানা ছেড়ে দিলে। আপনারা একঘর বাঙালী আছেন শুনে এখানে এসেছি।

চারু বল্লে—তা বেশ করেছেন।

নিতাই একটা তান ধরলে—

আসিতে হে যদি নব-যৌবনে
ওগো রাজ-অধিরাজ—

—বাঃ দিব্যি গলাটী ত আপনার—

চারু বল্লে—হ্যাঁ, উনি একজন উঁচুদরের গাইয়ে—নাম নিতাই মুখুয্যে। রেলির আড়তের তিষির প্রেমে মজে এখানে আশ্রম কোরেছেন।

নিতাই তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করলে—আর ইনি—এঁর নাম চারু দত্ত,—জাতিতে কায়স্থ বলেন বটে, কিন্তু সেটা বিশ্বাস হয় না—ইনি একাধারে কবি, গল্প লেখক, সমালোচক—বাংলার সাহিত্য-গগণের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র—মশায়, ইনিও তিষি—

নরেশ বল্লে—আপনি চারু বাবু—আপনার লেখা ত প্রায়ই পড়ি। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ হল। বেশ আছেন আপনারা দুটীতে—

নরেশের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে নিতাই আবার তান ছাড়লে—

আমরা দুটী
স্বর্গ লুটি
মর্ত্ত ভরেছি—

নরেশ নিতাইয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—আহা, বেশ আছে এরা—না আছে বড়বাবুর রক্তচক্ষু, না আছে সাহেবের দাবড়ী। দুনিয়াশুদ্ধ লোক গুডফ্রাইডেতে চারদিন ছুটি পায়, নরেশের বড়বাবু তাকে হুকুম করেছিলেন সোমবারে একবার বেরুতে হবে হে—কত কষ্টে বড় বাবুর হাতে-পায়ে ধরে চারদিনের ছুটি নিয়ে সে একটু বেরিয়ে পড়েছে। কেরাণী জীবনেও এত আনন্দ থাকতে পারে দেখে তার মনটা আপনিই খুসী হয়ে উঠছিল।

তান থামিয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা কল্লে—এতক্ষণ ত আমরা নিজেদের বাহবা গাইলুম,

এখন মশায়ের নামটী জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—খুব পারেন, আমার নাম নরেশচন্দ্র ঘোষ। কলকাতায় চাকরী করি—

—চাকরী করেন! তবে ও নামটাতে আমার আপত্তি আছে, নামটা বদলে ফেলুন মশায়।

চারু নিতাইকে একটা ধমক দিলে—চুপ কর্! তারপর সে নরেশকে বল্লে—কিছু মনে করবেন না মশায়, ও একটু—

নরেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—না, না, মনে করব কেন, উনি ঠিক কথাই বলেছেন।

নিতাই খাটখানার উপর একটা চাপড় মেরে বল্লে—আচ্ছা বাবা, নরেশ নরেশই সই, নামে কি করে—What's in a name

Oh Romeo—

বাঁকীপুরে কি কাজে যাওয়া হচ্ছিল?

—বাঁকীপুরে কাল সাহিত্য-সম্মিলন হচ্ছে দেখতে যাচ্ছি, পথে এই কাণ্ড।

চারু বল্লে—জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, রাত বারোটার গাড়ীতে যাবেন'খন। নরেশ জামা খুলতে লাগল, সেই অবসরে চারু নিতাইকে ইঙ্গিত করলে ভদ্রলোক এসেছে, এখন দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের কি হবে?

নিতাই নির্ব্বিকার ভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—যীশু বলিলেন হে মনুষ্যপুত্র, তোমরা শুক্রবার নিরম্বু উপবাসে কাটাইবে, কারণ ঐ দিন আমি তোমাদের স্বর্গরাজ্যে যাইবার জন্য পাশ বিলি করিব।

চারু নরেশকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

নরেশ বল্লে—এই ষ্টেশনে পুরী কিনেছিলুম কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের পুরোন পুরীতে প্রবেশ করতে সাহস হল না মশায়, ফেলে দিতে হল।

নিতাই বল্লে—চলুন তাহলে আমাদের সঙ্গে বাজারে। আপনার বেড়ানও হবে, আমরাও খাবার-দাবার কিনে এনে রান্না চড়িয়ে দিই। আপনি দয়া করে এসেছেন, অতিথি-সৎকার করতে হবে ত।

এই দুটী লোকের কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার দেখে শুনে নরেশ বেচারী একটু ভড়কে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ হয়ে তার একটা ধারণা ছিল যে তারা অন্য জায়গার লোকদের চেয়ে একটু উচ্চ শ্রেণীর জীব। নিতাই আর চারু তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, না, তাদের ব্যবহারই ঐ রকম তাই নিয়ে সে একটু গোলমালে পড়ে গেল। যাক, যতক্ষণ এখানে থাকা যায় চুপ করে বসে না থেকে দেশটা একটু ঘুরে দেখে নিলে মন্দ কি—ভেবে নরেশ বল্লে—চলুন।

পায়চারি করতে করতে তারা বেনের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক দিন থেকে এই লোকটার তাগাদার চোটে তারা এই রাস্তা দিয়ে চলা ফেরা বন্ধ করে দিয়েছিল। দোকানে এসে চারু মস্ত একখানা ফর্দ্দ দিয়ে বল্লে—এখুনি এই জিনিস গুলো যেন বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, দামটা দিনকয়েক পরে পাবে।

বাবুদের সঙ্গে নতুন লোক দেখে বেনিয়া মহারাজ পুরোন ধারের কথাটা আর পাড়েনি কিন্তু আবার ধারের কথা শুনে

সে খাপ্পা হয়ে বল্লে—আগাড়ী যো উধার গিয়া—

—দাঁড়া না ব্যাটা, ভগা নেহি ভেজনেসে কাঁহাসে রূপেয়া দেগা ?

বেনিয়ার নন্দন অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চারুর দিকে চেয়ে থেকে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করলে—ভগা ! !

নিতাই বল্লে—হাঁ—ভগাকা নাম নেহি শুনা—এত্না বড়া ম্যাজিষ্ট্রেট—উ চারু বাবুকা দাদা হায়।

মাংসওয়ালাকেও ভগার চেক দেখিয়ে তারা সন্ধ্যের সময় বাজার করে নিয়ে বাড়ী ফিরে রান্না চড়িয়ে দিলে।

নরেশ গায়ের কোট আর পাঞ্জাবীটা খুলে এক জায়গায় টাঙ্গিয়ে রেখে তাদের সঙ্গে রাঁধতে লেগে গেল। ঘণ্টা খানেক পরে নিতাই চারুকে ডেকে বল্লে—ওরে আমি কানাইয়ালালের বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি, বেচারা অনেক করে বলে গেছে—গোটা চারেক গান গেয়েই পালিয়ে আসব।

—আচ্ছা, বলে আবার চারু ময়দা মাখার দিকে মন দিলে।

নরেশ চারুকে সাহায্য করছিল আর ভাবছিল, এখানে এসে বেচারীদের বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছি, ভাবটা একটু জমিয়ে নেবার জন্য সে চারুকে জিজ্ঞাসা করলে—চারু বাবুর দেশ কোথায় ?

চারু একচোখ বুঁজিয়ে কাঠের উনুনে ফুঁ দিতে দিতে বল্লে—আকাশের তলায়—আপনার ?

—আমার বর্দ্ধমান জেলায়, তবে দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

ফুঁ দিতে দিতে উনুনটা যখন বেশ ধরে উঠল তখন চারু মাংসর হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে গত রাত্রে যে বোতলটা শেষ করা হয়নি সেটাকে বের করে গেলাসে একটু ঢেলে নরেশকে বল্লে—আসুন।

নরেশ হাত জোড় করে বল্লে—মাপ কর্ব্বেন মশায়, ওসব অভ্যেস নেই।

—বিলক্ষণ, কলকাতায় থাকেন আর অভ্যেস নেই কি রকম, সে কি একটা কথা হল।

শনিবার হলেই নরেশদের মেসের বাবুরা মদ খেয়ে হল্লা লাগাত। সোজা মানুষগুলো জলের মতন এই একটু পদার্থ খেয়ে কি রকম ওলট-পালট হয়ে যায় দেখে দেখে ও জিনিটার উপর তার একটা ভয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবে জীবনে কখনো মদ ছোঁয়নি একথা সে হলফ করে বলতে পারে না। মেসের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তাকে দু' একবার খেতে হয়েছিল কিন্তু নেশা হবার মতন মদ সে কখনো খায় নি। কাজেই মদ খেতে যে কষ্টটুকু পেতে হয় তার অভিজ্ঞতা নরেশের ছিল, নেশার মজাটা সে কখনো পায় নি।

সে হাত জোড় করে বল্লে—আমায় মাপ করুন চারু বাবু—আবার বারোটার গাড়ীতে যেতে হবে।

চারু বল্লে—আপনি না খেলে বুঝব গরীব বলে এই ধান্যেশ্বরীকে অবহেলা কচ্ছেন। আমায় এখন তবে বিলিতী আনতে যেতে হল।

সে আলনা থেকে জামাটা নিয়ে তাতে হাত গলাতে লাগল।

চারুকে জামা পরতে দেখে নরেশ বল্লে—আহা—না—না—আপনি পাগল হলেন নাকি—আচ্ছা দিন মশায়—আপনার কথায় এটুকু খাচ্ছি, আর খেতে বলবেন না কিন্তু—

সে চারুর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে চোঁ করে এক চুমুকে পাত্রটা নিঃশেষ করে ফেল্লে।

সমস্ত দিন রেলের ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে নরেশের শরীরে একটা অবসাদ এসেছিল। সুরার অব্যর্থ শক্তিতে তার সে অবসাদটুকু কেটে গিয়ে মনটা একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল। নরেশের মনে হচ্ছিল, একটা গান গাওয়া যাক্—কিন্তু চারু কি মনে করবে ভেবে এই অহেতুকী ফুর্ত্তিটাকে কোন রকমে চেপে সে জিজ্ঞাসা করলে—নিতাই বাবুর গলাটী বেশ, না ?

মাংস কষতে কষতে চারু জবাব দিলে—বেড়ে—

নরেশের মনে হচ্ছিল আর একটু খেলে হত। কিন্তু প্রথমে সে যে রকম আপত্তি করেছিল তাতে আর চাওয়া যায় না—সে ঠিক করে রাখলে এবারে বল্লে দেওয়া-মাত্র খেয়ে ফেলব। আধঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরও চারুর কোন রকম উচ্চবাচ্য না পেয়ে নরেশ মুখ ফুটে বলে ফেল্লে—দাদা, খুব কম করে আমায় আর একটু দিন ত।

চারু নরেশকে একটুখানি দিয়ে বোতলে যেটুকু ছিল নিজে শেষ করে রান্নায় মন দিয়েছিল, নরেশ আবার চাওয়াতে সে একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। বোতলে ত এক ফোঁটা নেই, তা ছাড়া কাছে পয়সাও নেই যে আনিয়ে নেবে ! তবু সে বল্লে—আর ত নেই দাদা, আচ্ছা দাঁড়াও, আনিয়ে নেওয়া যাচ্ছে—

নরেশ কোটের পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে বল্লে—চল দাদা, তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক্, ওটা এনে তারপর রান্নার দিকে মন দেওয়া যাবে।

চারু একবার মুখ তুলে দেখলে, নরেশ যেখানে কোট আর পাঞ্জাবী খুলে রেখেছিল সেখানে শুধু কোটটা ঝুলছে। পাঞ্জাবীটা অন্তর্হিত হয়েছে দেখে সে আপনার মনে বিজ বিজ করে কি বল্লে।

নরেশ বল্লে—দাদা আমাকে কিছু বলছ ?

—না ভাই, ভাবছি, কাকে দিয়ে বোতলটা আনাই।

নরেশ ব্যাগটা খুলে জিজ্ঞাসা করলে—ক'টাকা লাগবে দাদা ?

—ও কি, তুমি টাকা বার করছ কেন ?

—ওই ত দাদা, আমাকে পর ভাবলে।

চারু পাড়ার একটা ছেলেকে ডেকে টাকাটা দিয়ে তখুনি তাকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে দেখতে পাওয়া গেল চারু মাটিতে পড়ে প্রাণপণে পাশ বালিসটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে আর বলছে—

—ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গৃহিণী।

আর নরেশ তার সামনে উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, তার গাল বয়ে টস টস করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে মোম-বাতিটাকে নিবিয়ে দিয়ে গেল। ঐটুকু আলোর মধ্যে একরাশ জ্যোৎস্না কি রকমে

লুকিয়ে ছিল, বাতিটা নিবে যেতেই ঘরটা চাঁদের আলোয় ভাসতে লাগল।

জ্যোৎস্না দেখে চারু পাশ বালিসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুরু করলে—

হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অন্তরের অন্তরশায়িনী! নাহি সীমা
তব রহস্যের!

ওদিকে কানাইয়ালালের আসরে বসে মাংস পোড়ার গন্ধে নিতাই চমকে চমকে উঠতে লাগল।

নরেশ তন্ময় হয়ে চারুকে দেখছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল—মাংসটা বোধ হয় পুড়ে গেল।

এ্যাঁ—বলে চারু একলাফে উঠে পড়ে দেশলাই খুঁজে বাতিটা জেলে মাংসর হাড়ি নাবিয়ে ফেল্লে। তারপর নিজে একপাত্রথেয়ে নরেশকে একটা পাত্র ভরে দিলে।

নরেশকে পাত্রটা দিয়ে সে হাঁড়ি থেকে একটা মাংসর টুকরো তুলে নিয়ে দেখছিল, সেগুলো খাবার অবস্থা পেরিয়ে গেছে কিনা এমন সময় নরেশ বল্লে—দাদা পাঞ্জাবীটা ওখানে রেখেছিলুম দেখতে পাচ্ছিনা—

—এ্যাঁ, পাঞ্জাবী! তাইত গেল কোথায়। চারু বাইরের বারান্দায় গিয়ে ডাকলে—ভক্ত —নেতা ছোঁড়া সেই যে গেছে—তাইত মহা মুস্কিলে পড়লুম যে!

চারু ঘরে ঢুকতেই নরেশ বল্লে—খোঁজ পেলে দাদা? সেটাতে সোনার বোতাম ছিল। —কিছু ভয় নেই, এই পাত্রটা টেনে নাও, ও পাঞ্জাবী টাঞ্জাবী কিছু মনে থাকবে না।

নরেশ সে পাত্রটা নিঃশেষ করে গেলাসটা রাখতে রাখতে বল্লে—রেখে দাও তোমার পাঞ্জাবী—পড় দাদা, কবিতা পড়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা তুমি ছেড়ে তুই-তুকারি আরম্ভ করে দিলে। খানিকক্ষণ পরে চারু প্রতিজ্ঞা করে বল্লে—তোর আফিসের বড়বাবুকে আমি খুন করে ফেলব। ঘণ্টা খানেক পরে তারা দুজনে দিব্যি করে ফেল্লে—জীবনে আর কখনো ছাড়া-ছাড়ি হব না।

রাত্রি বারোটার সময় নিতাই টলতে টলতে দুম-দাম করে ঘরের মধ্যে এসে দেখলে একদিকে একতাল ময়দা মাথা মাটিতে গড়াচ্ছে আর একদিকে নরেশ আর চারু গলা জড়াজড়ি করে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।

তাদের সেই অবস্থা দেখে নিতাই কীর্ত্তন ধরলে—

আমার নাগর, যায় পর-ঘর
আমারই আঙিনা দিয়া—

বারোটার গাড়ী তখন ষ্টেশনে এসে ভোঁ দিচ্ছিল, বাঁশীর শব্দ পেয়ে নরেশ ধড়মড় করে উঠে বল্লে—বারোটার গাড়ী কি চলে গেল দাদা?

নিতাই বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ধড়াস করে খাটের উপর পড়ে সুর ভাঁজতে লাগল —যাচ্ছে যাক, কিছু বোলো না, কিছু বোলো না।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্মিথের ইতিহাসে

শিবাজী ও আফজল খাঁ

মিঃ ভিন্সেণ্ট, এ, স্মিথ বহুদিন ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসে চাকরী করিয়াছেন। তখন তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস চর্চ্চা করিতেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সময় তিনি তাঁহার Early History of India সঙ্কলন করেন। তার পর ভারতবর্ষের ললিত কলা সম্বন্ধেও তাঁহার একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হিন্দুযুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতেই তিনি আকবর সম্বন্ধে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। শাসন-সংস্কারের আলোচনা-কালেও তিনি নীরব ছিলেন না; ইতিহাসের দিক হইতে তিনি শাসন সংস্কারের প্রশ্নের যে বিচার করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকেই ভারতের রৌদ্র-দগ্ধ বৃদ্ধ আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সুলভ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তারপর তিনি বিলাতের History পত্রে কয়েকজন উদীয়মান বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে ইঁহারা প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান গুলি গোলাপী চশমা পরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। অবশেষে জীবনের সায়াহ্নে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের একখানি আদ্যন্ত ইতিহাস The Oxford History of India রচনা করিয়া অতি অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

পরলোকগত কোন লেখকের রচনার আলোচনা শ্রদ্ধার সহিত না করিতে পারিলে তৎসম্বন্ধে নীরব থাকাই সঙ্গত। সুতরাং এতদিন স্মিথ সাহেবের এই অভিনব গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য থাকিলেও নীরব ছিলাম। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এত প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে যে একই ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে তাহা আয়ত্ত করা অসম্ভব। সুতরাং স্মিথ সাহেবের গ্রন্থকেও কোন স্থিরচিত্ত সুধী ব্যক্তি সাধারণ স্কুল-পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা উচ্চস্থান দিবেন এ সন্দেহ আমার ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। দিন কয়েক হইল দেখিলাম একখানি দৈনিক পত্রে রাজা নন্দকুমারের ফাঁসি সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছে; তাহার মর্ম্মার্থ এই যে স্মিথের মত পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনার পর বলিয়াছেন যে নন্দকুমারের ফাঁসিতে কোন প্রকার বিচার-বিভ্রাট ঘটে নাই; অতএব এ সম্বন্ধে অতঃপর আর কাহারও কিছু বলিবার অধিকার রহিল না। এইবার প্রমাণ হইয়া গেল যে নন্দকুমারের ব্যাপারে হেষ্টিংস ও ইম্পের কোনই অপরাধ নাই। এই নন্দকুমারের বিচারের মূল দলীল-পত্র বোধ হয় বেভারিজ সাহেব অপেক্ষা কেহই অধিক মনোযোগের

সহিত পাঠ করেন নাই। বেভারিজের যুক্তি স্মিথ খণ্ডন করিতে পারেন নাই, সে চেষ্টাও তিনি করেন নাই; তিনি কেবল বলিয়াছেন বেভারিজের লেখা পক্ষপাত-দুষ্ট। ব্যস্। অতঃপর আর কোন যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নাই। স্মিথের অভিযোগ এই যে বাঙ্গালার নবীন ঐতিহাসিকেরা গোলাপী চশমা পরিয়া তাহাদের দেশের অতীতের ইতিহাস নির্ণয় করিতে চাহেন, কিন্তু exford History of India পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মিথ সাহেব নিজে ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা-কালে মসীবর্ণ চশমা পরিধান করিয়া থাকেন। হয়ত প্রকাশকদিগের চেষ্টায় এবং নাম-মাহাত্ম্যে স্মিথের ইতিহাস ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পাঠ্য তালিকা-ভুক্ত হইবে এবং ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণ স্মিথের ফতোয়া বেদ ও কোরাণের বাক্যের মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে তাই স্মিথ সাহেব যে কি প্রণালীতে ঐতিহাসিক সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের জানিয়া রাখা ভাল। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রে স্মিথের গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। স্মিথের গ্রন্থের সকল অংশ সমালোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তিনি মারাঠা ইতিহাস কিরূপে নিজের ইচ্ছামত বিকৃত করিয়াছেন, আমি কেবল তাহাই দেখাইব।

মারাঠী ভাষার সহিত স্মিথ সাহেবের পরিচয় ছিল কি না জানি না। পরিচয় থাকিলেও মারাঠী ভাষায় যে সহস্র সহস্র ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেজ আছে তাহার সন্ধান তিনি লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ তিনি নিঃসঙ্কোচে মারাঠা জাতিকে লুটে ডাকাতের জাতি বলিয়াছেন,—যদিও পঞ্চম বর্ষীয় বালকের বুঝিতে কষ্ট হয় না যে কেবল লুণ্ঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল টিকিতে পারে না। যাক্, এ অভিযোগের উত্তর অন্যত্র দিতেছি। এইখানে স্মিথ সাহেব কিরূপে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য হাজির করিতে জানেন তাহার একটি উদাহরণ দিই।

গ্রাণ্ট ডাফের ইতিহাসে শিবাজী ও আফজল খাঁ ঘটিত ব্যাপারের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত মারাঠীতে লিখিত কোন ইতিহাসের মিল নাই। গ্রাণ্ট ডাফ্ এই বিষয়ে খাফি খাঁকে অনুসরণ করিয়াছেন খাঁফি শিবাজীর মৃত্যুর বহু পরে তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন—শিবাজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার লেশ মাত্রও ছিল না। তিনি শিবাজীকে কুকুর ও কুকুরের বাচ্ছা বলিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন এবং শিবাজীর মৃত্যু-তারিখ-সূচক যে বাক্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহার অর্থ কাফের জাহান্নমে গিয়াছে। সুতরাং শিবাজীর প্রতি তিনি সুবিচার করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। আফজল খাঁর হত্যা-ব্যাপারের সঠিক সংবাদ জানিবার উপায় তাহার ছিল না বলিলেই হয়। তিনি শিবাজীর রাজত্বের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে স্থানে স্থানে বহু ভ্রম-প্রবাদ রহিয়াছে, বোধ হয় অনেক সময় দিল্লীর বাজার-গুজব শুনিয়াই তিনি এই কাফের সয়তানের চিত্র অঙ্কিত

করিয়াছেন! গ্রাণ্ট ডাফ আফজল খাঁর বিবরণে সেই চিত্রের প্রতিলিপি দিয়াছিলেন মাত্র।

মারাঠী ঐতিহাসিকেরা প্রথম হইতেই গ্রাণ্ট ডাফের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। সে প্রতিবাদের ক্ষীণ ধ্বনি বোধ হয় এদেশে অবস্থান কালে বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলার আরাম-কেদারায় স্মিথ সাহেবের কর্ণে পৌঁছায় নাই। কিন্তু তাঁহার আকবর নামক গ্রন্থে তিনি পারসী ঐতিহাসিক কারকারিয়ার একটি রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; সুতরাং কারকারিয়ার রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এমন অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই কারকারিয়াই তাহার একখানি ইংরেজী পুস্তিকায় শিবাজীর কলঙ্ক-ক্ষালনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে সংবাদ স্মিথ সাহেবের জানা ছিল কি না তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

যাহা তাঁহার জানা ছিল তাহা হইতে তিনি শিবাজী কর্ত্তৃক আফজল খাঁর হত্যার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন—An imposing army, numbering about ten thousand men and equipped with mountain guns, was organised and despatched under the command of Afzal Khan, a brave and experienced officer. Sivaji not being capable of meeting his foe in the field, opened negotiations, and a Brahman envoy was sent by the Musalman general to his adversary. The envoy played the traitor, permitting his sympathies as a Hindu to outweigh his duty to his master. The Brahman and Sivaji so arranged a plot to inveigle Afzal khan into an interview at which he could be killed with little risk to the Maratha. Afzal Khan fell into the trap readily and accompanied only by a single Sayyid officer, advanced close to Partabgarh and met Sivaji, who also had but one companion Tanaji Malusre. The Maratha professed the most abject submission and threw himself weeping at the general's feet. When Afzal Khan stooped to raise him in the customary manner, Sivaji wounded him in the belly with a horrid weapon called tiger's claw, which he held hidden in his left hand, and followed up the blow by a stab from a dagger concealed in his sleeve. The treacherous attack succeeded perfectly and the Marathas ambushed in the surrounding jungles destroyed Afzal Khan's army.

স্মিথ সাহেব যদি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের পর ইহাই সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তবে তাহার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ জন্মাইতে পারে, সত্য, কিন্তু তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায়

না। কিন্তু তিনি পাদ টীকায় লিখিতেছেন—"For the details I follow Mankar, The Life and Exploits of Sivaji 2nd Ed. Bombay, 1886 a valuable little book, now almost unprocurable." অপর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন :—The little book by Mankar translated from a lost manuscript, is of considerable value. It is entitled the Life and Exploits of Sivaji and has become very scarce."

মানকরের গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য সন্দেহ নাই। দুই বৎসর যাবত চেষ্টা করিয়াও আমি এখন পর্য্যন্ত উহার এক খণ্ড নিজের জন্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুগ্রহে দুই বৎসর পূর্ব্বে মানকরের গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি স্কটল্যাণ্ড হইতে ঐ গ্রন্থের এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি তখন শিবাজীর প্রাচীনতম মারাঠী জীবন-চরিত সভাসদ বখরের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলাম, মানকর সভাসদের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন, সুতরাং অধ্যাপক সরকার মহাশয় আমাকে ঐ গ্রন্থখানি দেখিতে দিয়াছিলেন। স্মিথ সাহেব বলিতেছেন যে মানকর যে হস্তলিখিত পুঁথি হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা হারাইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। মানকরের ব্যবহৃত পুঁথির বয়স কত তাহা জানা যায় নাই। ঐ পুঁথি যে হারাইয়া গিয়াছে সে সংবাদই বা স্মিথ সাহেব কোথায় পাইলেন? আর যদি হারাইয়াই গিয়া থাকে তাহা হইলেই বা মানকরের অনুবাদের মূল্য কি করিয়া বাড়িল? মানকর যে গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার বহু হস্তলিখিত অনুলিপি মহারাষ্ট্রে পাওয়া যায়। আমি অনায়াসে উহার ১০।১২ খানি নূতন ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। স্মিথ সাহেবের নিজের দেশেই ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে সভাসদ বখরের একখানি হস্তলিখিত প্রতিলিপি রহিয়াছে। এবং মানকরের গ্রন্থ যে ঐ বখরেরই অনুবাদ মাত্র, তাহা ব্লুমহার্ড সঙ্কলিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের মারাঠী হস্তলিখিত পুঁথির তালিকার উপর একবার চোখ বুলাইয়া গেলেই স্মিথ সাহেব জানিতে পারিতেন। সকলেই জানেন যে প্রাচীন গ্রন্থের মাত্র একখানি পুঁথির উপর নির্ভর করা চলে না। মানকর একখানি মাত্র পুঁথি পাইয়া তাহাই অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবার তাহার অনুবাদও সর্ব্বত্র মূলানুগত হয় নাই। অনেক দিন হইল রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ সানে অনেক পুঁথি মিলাইয়া বিভিন্ন পাঠান্তর দিয়া অনেক টীকা-টিপ্পনী সহ সভাসদ বখরের একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন পরে প্রায় ৪০ বৎসরের পুরাতন মানকর ও এক শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত গ্রাণ্ট ডাফের দোহাই দেওয়া পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে?

কিন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞতাই স্মিথ সাহেবের একমাত্র অপরাধ নহে। তিনি বলিয়াছেন যে আফজল খাঁর হত্যার যে বিবরণ তিনি তাঁহার তথাকথিত ইতিহাসে প্রদান

করিয়াছেন তাহা মানকরের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এই কথাটি একেবারে মিথ্যা! মানকরের গ্রন্থ এখন আমার নিকট নাই, তাঁহার নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা আমার বেশ মনে আছে যে আফজল খাঁর বিবরণে সানের সম্পাদিত মূল বখরের সহিত মানকরের অনুবাদের কোন অনৈক্য নাই। সমস্ত মারাঠী ঐতিহাসিকই বলিয়াছেন আফজল খাঁই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিলেন; শিবাজী আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতি-আক্রমণ করিয়াছিলেন মাত্র। একখানি মারাঠী কবিতা গ্রন্থে লিখিত আছে যে আফজল খাঁ যখন শিবাজীর কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া তাঁহার শ্বাস রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন সেই আসন্নকালে বিপন্ন মারাঠা বীর গুরু রামদাসের নাম স্মরণ করিয়াছিলেন। জানি না স্মিথ সাহেব যে বিবরণ গ্রাণ্ট ডাফ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা মানকরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন কেন? এ কি তাঁহার বার্দ্ধক্য-জনিত স্মৃতি-বিভ্রমের ফল? অথবা মারাঠা জাতির প্রতি বিদ্বেষের আতিশয্যে এই বৃদ্ধ আংগ্লো ইণ্ডিয়ান ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার পাঠকবর্গকে একখানি এমন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া প্রতারিত করিতে চাহিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের সহজে পাইবার উপায় নাই! কে বলিবে, তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি!

কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার ভ্রম সংশোধনের সুযোগ জুটিয়াছিল। বিলাতের History পত্রে তিনি কিনকেইড ও পারসনীস রচিত মারাঠা ইতিহাসের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক না কেন আফজল খাঁর সম্বন্ধীয় ঘটনার একটি নির্ভুল বিবরণ উহাতে আছে। স্মিথ গ্রন্থকারদ্বয়কে গালি দিয়াছেন—সে তাঁহার অনধিকার-চর্চ্চা। অজ্ঞতা গোপন করিবার উহাই প্রকৃষ্টতম পন্থা। কিন্তু ইহার পরও তিনি নিজের ভ্রম স্বীকারের দ্বিতীয় সুযোগ পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের শিবাজী তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; এই গ্রন্থখানি তিনি যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি অধ্যাপক যদু নাথের গ্রন্থের প্রভূত প্রশংসাও করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা এদেশে পৌঁছিয়াছে তাঁহার মৃত্যুর পরে। মৃত্যুর ওপার হইতে স্মিথ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে অধ্যাপক সরকার যখন মারাঠী অপেক্ষা ইংরাজী ঐতিহাসিক উপাদানেরই প্রাধান্য দিয়াছেন তখন আফজল-ঘটিত ব্যাপারে তিনি মারাঠা বখরকারের অনুসরণ করিলেন কেন? এইখানে স্মিথ সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছেন। অধ্যাপক সরকার বিশেষ করিয়া সমসাময়িক চিঠিপত্র ও সমসাময়িক ইতিহাসের উপরই নির্ভর করিয়াছেন, একদিকে তিনি যেমন শিবাজী প্রতাপ ও সেডগাঁওকর বখর প্রভৃতি মারাঠা বখরকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন সেইরূপ তিনি ইটালীয় লেখক মেনুসী ও সুবিখ্যাত ইংরেজ লেখক অরমের সাক্ষ্যেও সবিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস রচয়িতা বিলাতের রয়াল হিষ্টরিয়োগ্রাফার

ক্রস সাহেবের নাম করারও তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ফরাসী লেখক মিশো তাহার মহীশূরের ইতিহাসে শিবাজীর দিল্লী হইতে পলায়নের যে অদ্ভুত উপন্যাস প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই বা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ঐতিহাসিক আস্থা স্থাপন করিবেন। আর পোর্ত্তুগীজ লেখক গার্ডার শিবাজীর জীবন চরিতের ত কথাই নাই। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপক সরকার আফজল খাঁর ব্যাপারে কেবল মারাঠা বখরকারগণকে অনুসরণ করেন নাই। তিনি স্মিথ সাহেবের মত মারাঠা জাতিকে ও শিবাজীকে গালাগালি দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি যেখানে ন্যায় বুঝিয়াছেন শিবাজীর কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন, আবার যেখানে অন্যায় বুঝিয়াছেন সেখানে নির্ভীক ভাবে শিবাজীর দোষ ত্রুটি প্রদর্শনে ইতস্ততঃ করেন নাই। এজন্য মহারাষ্ট্রের অধিবাসিরা তাহার গ্রন্থের অন্যায় সমালোচনাও করিয়াছে। স্মিথ সাহেব যদুনাথের শিবাজীর ৫৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইতেন যে রাজাপুরের ইংরেজ বণিকেরাও জানিতেন যে শিবাজীকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রতারণা করিবার দুষ্ট অভিসন্ধি আফজলের প্রথম হইতেই ছিল। রাজাপুরের ইংরেজরা মুসলমান রাজ্যে বাস করিতেন সুতরাং মুসলমান সেনাপতির প্রকৃত অভিসন্ধি জানিবার সুযোগ তাহাদের ছিল; তাহারা সুরাটের কাউন্সিলে লিখিয়াছিলেন, Against Shivaji the Queen this year sent Abdullah khan with an army of 10,000 horse and foot, and because she knew with that strength he was not able to resist Shivaji she counselled him to *Pretend friendship* with his enemy *which he did.* And the other [i, e, Shivaji] whether through intelligence or Suspicion, it is not known, dissembled his love toward him &c (Factor at Rajapur to Council at Surat 10 oct. 1659 T R. Rajapur) এই সমসাময়িক ইংরেজী পত্র সভাসদের মারাঠী বিবরণের সমর্থনই করিতেছে। সভাসদ বলেন, আফজল খাঁই শিবাজীকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীর দূত পন্তাজী গোপীনাথ চতুরতা পূর্ব্বক মুসলমান সেনাপতির প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রভুকে সতর্ক করিয়া দেন। শিবাজী ও আকজলের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন উভয়ের সহিতই মাত্র দুইজন করিয়া অনুচর ছিল। শিবাজীর সহিত ছিলেন সান্তাজী কাবজী মহালদার ও জিউ মহালা, তানাজী মালুশ্রে নহে। এবং আফজলের সহিত কোন সৈয়দ কর্ম্মচারী ছিলেন না। শিবাজীর আপত্তিতে আফজল সৈয়দ বন্দাকে দূরে রাখিয়া আসেন। আফজল শিবাজী অপেক্ষা বলবান ও দীর্ঘায়তন। শিবাজীকে আলিঙ্গনচ্ছলে তিনি বাম কুক্ষিতলে চাপিয়া ধরিয়া যমধার তরবারির আঘাত করেন। শিবাজীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু তরবারির আঘাত তাঁহার লৌহবর্ম্মে প্রতিহত হইয়াছিল। তার পর তিনি হস্তস্থিত বাঘনখের দ্বারা আফজলকে আহত করিয়া তাহার হস্ত হইতে

মুক্তি লাভ করেন। প্রতারণার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন; তাই তাঁহার সুরক্ষিত-মত তাঁহার সৈন্যগণ মুসলমান সেনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। মোটামুটি মানকরও এই বিবরণই দিয়াছেন।

এখন দেখিতে হইবে কোন বিবরণ বেশী সম্ভব। খাফি খাঁর, কি সভাসদের? ইংরেজ কুঠির পত্রে প্রকাশ আফজলের সঙ্গে মাত্র ১০,০০০ সেনা ছিল। শিবাজী সেই সময় প্রায় ২০০০০ অশ্বারোহী সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতাপগড়ের দুর্গ অতি দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত; এইরূপ গিরিসঙ্কুল অরণ্য ভূমিতে সুবিশাল সেনা লইয়া শিবাজীকে পরাজিত করা কত কঠিন তাহা বিজাপুরের সেনাপতি বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন কারণ তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বাইর সুবেদার ছিলেন। আফজল শিবাজী অপেক্ষা দীর্ঘায়তন ও সমধিক বলশালী; সুতরাং একাকী দ্বন্দ্বযুদ্ধে খর্ব্বকায় মারাঠা বিদ্রোহীকে অনায়াসে পরাজিত করিবার আশা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। এক খাফি খাঁ ভিন্ন আর কেহই এই ঘটনার সংস্রবে শিবাজীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করেন নাই। পক্ষান্তরে সভাসদের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কারণ জাবলী বিজয় বিবরণে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে শিবাজী কৌশলে চন্দ্ররাওকে প্রতারিত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রভুর দোষ গোপনের চেষ্টা করেন নাই। হয় ত সেই অরাজকতার দিনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে হত্যা করা কেহ দোষেরও মনে করিতেন না। সেই সভাসদই আফজল খাঁর ব্যাপারে প্রথম আক্রমণের দুরভিসন্ধি ও চেষ্টা মুসলমান সেনানীর উপর আরোপ করিয়াছেন কেন? ইহার অন্য কোন সদুত্তর নাই। আফজল খাঁর হত্যার ব্যাপারে শিবাজী নির্দ্দোষ, তিনি আফজলকে হত্যা করিয়াছিলেন আত্মরক্ষার চেষ্টায়। সুতরাং ইংরেজী murder শব্দ এখানে খাটে না।

ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য সত্য-নির্ণয়। কাহারও প্রতি অযথা পক্ষপাত অথবা অযথা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ ঐতিহাসিকের পক্ষে আর কিছুই নাই। স্মিথ সাহেবের অপরাধ এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি হয় মানকর পাঠ না করিয়াই তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন অথবা জানিয়া শুনিয়া আপনার পাঠকবর্গকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্রদিগকে প্রতারণার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

উড়ো আপদ

অমন যে সোনার টুকরো ভামিনী,—চুরুট-তামাক ত দূরের কথা, পান-সুপুরি পর্য্যন্ত তিনি স্পর্শ করতেন না। তাঁরও কিন্তু মস্ত-একটি নেশা ছিল;—সেটি হচ্ছে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়া।

আপিস থেকে বাড়ী ফেরা এবং ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে যে নিজস্ব সময়টুকু পাওয়া যেত, সেটুকু ভামিনী গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে দিব্যি অনায়াসেই কর্ত্তন করে ফেল্‌তেন। এডগার আলেন পো, গে-বোরিও, কন্যান ডইল, ডিক ডনোভ্যান ও মরিস লেবলাঙ্ক প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি, ভামিনী-ভূষণ দস্তুর-মতন গুলে ভক্ষণ করেছিলেন বললেও চলে। তাছাড়া আজে-বাজে ডিটেকটিভ উপন্যাসও তিনি যে কত পড়েছেন, তা আর গুণ্‌তিতে আসে না। সে-সব গল্পের ঘটনা পড়লে ভামিনীভূষণ ছাড়া অন্য যে-কোন লোকের মাথার চুলগুলো, নিশ্চয়ই সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠত। কিন্তু ভামিনীর মাথার চুল যে খাড়া হয়ে উঠত না, তার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ, যৌবনেই তাঁর উত্তমাঙ্গের শীর্ষদেশে প্রকাণ্ড একটি টাকের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই মরুভূমির মধ্যে প্রাণপণে চুলের আবাদ করতে চেষ্টা করেও, ভামিনী কিছুতেই তাতে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি।... ...

সেদিনও ভামিনী সন্ধ্যের সময়ে ঘরের কোণে বসে, চিম্‌নীর আধখানায় কালি-মাখা একটা হারিকেন লণ্ঠনের আলোতে, খুব মন দিয়ে সালক্ হোম্‌সের একটি বাহাদুরির ইতিহাস পড়ছিলেন। দু-তিনখানা পাতা ওল্টাবার পর, কেতাবের মাঝখান থেকে হঠাৎ কি-একখানা কাগজ বেরিয়ে মাদুরের উপরে পড়ে গেল। ভামিনী আস্তে আস্তে সেখানা তুলে নিয়ে দেখলেন, একখানা চিঠি। তিনি লেখাগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন, লেখা আছে,—

"জীবনেশ্বর,

যাবার দিনে সেই যে তুমি রাগ ক'রে চলে গেলে, তারপর আজ-পর্য্যন্ত আর এক-খানিও চিঠি লিখলে না। প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে এখানে আমি যে কি মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছি, তা তো তুমি জান না! হে নাথ, দয়া করে একখানা চিঠি লিখো, দুটো ভালোবাসার কথা বোলো। তা-নইলে আমি এখানে থাকতে পারব না, পালিয়ে তোমার কাছে চলে যাব। লোকে নিন্দা করে করুক। হেবোকে নিয়ে কোনরকমে—"

এইখানেই চিঠিখানা হঠাৎ শেষ হয়েচে, —যেন লিখতে লিখতে আর লেখা হয় নি।

... ...ভামিনীর হাত থেকে সালক্ হোম্‌সের বাহাদুরির ইতিহাসখানা ধুপ্ করে পড়ে গেল। চিঠিখানা হাতে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে তিনি বসে রইলেন—অনেকক্ষণ।

তারপর তিনি আবার একবার চিঠিখানা

পড়ে দেখলেন। নাঃ,—কোন সন্দেহ নেই, এ দুর্গাকালীর হাতের লেখাই বটে! তার ওপরে চিঠিতে হেবোর নাম রয়েচে—হেবো তাঁর নিজের ছেলের নাম! চিঠি-খানা তিনি উল্টে-পাল্টে দেখলেন, যে-কাগজে লেখা হয়েচে তাও তাঁরই আপিসের কাগজ। আপিস থেকে তিনি প্রায়ই কাগজ হাতিয়ে (বলা বাহুল্য, গোপনে) নিয়ে আসতেন, এ তারই একখানা।

ভামিনীর বুকের শিরগুলো যেন পট্‌পট্ করে ছিঁড়ে গেল! কি ভয়ানক! যে দুর্গা-কালীর মুখ চেয়ে তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরের দাসত্ব করচেন, যাকে তিনি স্বর্গের দেবী ভেবে প্রাণ-মন দিয়ে এতদিন ভালোবেসে আসচেন,—তার কিনা এই কাজ! স্বামীর সংসারে বসে পরপুরুষকে কুৎসিত চিঠি লেখা!

তাঁর ভ্রম হয় নি ত? না,—ভ্রম কি করে হবে? দুর্গাকালীর হাতের লেখা যে তিনি সহস্রবার দেখেচেন,—নিজের স্ত্রীর লেখা—সে কি ভুল হবার যো আছে? তার ওপরে চিঠির কাগজেও তাঁর আপিসের মার্কা মারা, চিঠিতে হেবোর নাম রয়েচে, চিঠিখানা পাওয়াও গেছে তাঁর কেতাবের ভিতরে,—নিশ্চয়ই দুর্গাকালী লিখতে লিখতে শেষ না করতে পেরে, চিঠিখানা তাঁর কেতাবের ভিতরে ভুলে ফেলে রেখে গিয়েচে—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েচে!

আবার লিখেচে কিনা লোক-নিন্দার ভয় না রেখে পালিয়ে যাবে! অ্যাঁ, এত-বড় শক্ত কথাটা লিখতে তাঁর হাত একটুও কাঁপল না? কেন, কিসের অভাব তার? অবশ্য, তাঁর চেহারাটি দেখতে ঠিক কার্ত্তিকের মত ততদূর সুশ্রী নয়,—কিন্তু তিনি ভারত ধর্ম্মত তার স্বামী তো বটে! সীতা-সাবিত্রীর দেশে জন্মে, হিন্দু-স্ত্রী হয়ে স্বামীতে অরুচি! জগতে সুশ্রী চেহারাই কি সব? যত্ন-স্নেহ, মমতা-আদর, প্রেম-ভালোবাসার কি কোনই মূল্য নেই?

ভাবতে ভাবতে ভামিনীর চোখে জল এল,—না কেঁদে তিনি থাকতে পারলেন না।

হেবো সাম্‌নে বসে দুল্‌তে দুল্‌তে পড়া মুখস্থ করছিল—মনের আবেগে ভামিনী তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। অকারণে তাঁকে কাঁদতে দেখে তার পড়া ও দোলা, দুইই একসঙ্গে এক-মুহূর্ত্তে বন্ধ হয়ে গেল। সে বার-পর-নাই আশ্চর্য্য হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে, "বাবা, তুমি কাঁদচ কেন?"

ভামিনী এক ধমক দিয়ে মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, "রাস্কেল, বাপের-সঙ্গে ঠাট্টামো? আমি কাঁদচি? কোথায় কাঁদচি? যাঃ—বেরো এখান থেকে!"

এত সহজে পড়ার দায় থেকে নিস্তার পেয়ে হেবো একটিমাত্র লাফে একেবারে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল।

ভামিনী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন, এর একটা হেস্ত-নেস্ত-করে তবে আমি ছাড়ব! পাপিষ্ঠা দুর্গাকালীকে এখন কোন কথা বলা হবে না—কোন্ শয়তান আমার বংশে কলঙ্ক দিতে চায়—আগে তার সন্ধান নিতে হবে, তারপর দুর্গাকালীর শাস্তি। আমি নরম হতেও পারি, শক্ত হতেও জানি।

একগাছি মাত্র চুলের একটিমাত্র ভাঙা বোতামের, জামা-থেকে-ছেঁড়া একটি সুতোর সাহায্যে, ডিটেকটিভ উপন্যাসের গোয়েন্দারা কত বড়-বড় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেচে, আর এত-বড় প্রমাণ হাতে পেয়েও আমি এই স্পষ্ট ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব!

খ

ভামিনীভূষণ বেশ জানতেন যে, গোয়েন্দাগিরির প্রথম কথা হচ্ছে, কারুকেই বিশ্বাস না করা। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে অবিশ্বাস করতে তাঁর মন কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। আজ পাকা দশটি বৎসর দুর্গাকালীকে বিশ্বাস করে করে, বিশ্বাস করাটাই তাঁর একটা বদ্-অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

আর আসল কথা বল্‌তে কি, স্ত্রীকে অবিশ্বাস করবার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত তিনি পান নি। দুর্গাকালীর জিভ একটু বেশীরকম ধারালো হলেও, স্বামীকে যত্ন-আদর করতে কোনদিনই সে নারাজ ছিল না। আপিস থেকে বাড়ী ফিরেই তিনি জলখাবারের থালাটি ঠিক নিয়মিত সময়েই হাতের কাছে পেয়েছেন। যেচে এসে গায়ে হাত বোলানো, পরিপাটি ক'রে চাদর-কাপড় কুঁচিয়ে রাখা, ঝিনুক দিয়ে ঘামাচি মেরে-দেওয়া, গুমোটের সময়ে নিজে জেগে পাখার হাওয়া করে স্বামীকে ঘুম-পাড়ানো,—এ-সব আদরের খাঁক্‌তি ভামিনীভূষণ কোনদিনই অনুভব করেন-নি।

কিন্তু দুর্গাকালীকে অবিশ্বাস না করলে ত চল্‌বে না,—কাজেই ভামিনীভূষণ আজকাল মনকে চোখ ঠেরে বুঝিয়ে, জোর করে তাকে অবিশ্বাস করতে লাগলেন।

দুর্গাকালী তাঁকে আদর করলে তিনি এখন আর একটুও গলে যান না, খুব শক্ত হয়ে মনে মনে বলেন, সাবধান মন, সাবধান! আজ দশবচ্ছর কামিনীর ছলনায় তুমি বেকুব ব'নে আসচ—আর নয়, এবারে সচেতন হও—উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!

দুর্গাকালীকে হাতে-নাতে ধরে ফেলবার জন্যে আজকাল প্রায়ই তিনি আপিস থেকে অসময়ে ছুটি নিয়ে হঠাৎ বাড়ীতে ফিরে আসেন,—কিন্তু কোনদিন দেখেন, দুর্গাকালী একখানা হালফ্যাসানের তুলোর প্যাড্ দিয়ে রেশমে বাঁধানো নভেলকে বালিশে পরিণত করে, নিদ্রাসুখে নিমগ্ন হয়ে আছে, কোনদিন বা দেখেন, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পরম উৎসাহে সে তাস খেল্‌চে, গল্প করচে।

কিন্তু দুর্গাকালীর বিরুদ্ধে যতই প্রমাণের অভাব হতে লাগল, ভামিনীভূষণের সন্দেহ ততই বাড়তে থাকল। তিনি বুঝলেন, রহস্য ক্রমেই গভীর হয়ে উঠচে।

দুর্গাকালীও স্বামীর এই আকস্মিক ও অভাবিত পরিবর্ত্তনে প্রথমটা ভারি অবাক হয়ে গেল। স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গেলে, ভামিনী এখন বিরক্ত হয়ে জোর করে তার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেন, হেসে দুটো ভালোবাসার কথা বল্‌লে তিনি মুখ গোম্‌ড়া করে বলেন, "যাও, যাও,—আর অত আত্তি দেখাতে হবে না,—ঢের হয়েচে!" তাইত, এ হোলো কি? দুর্গাকালী ভাবলে, তার বয়স বাড়চে বলেই স্বামীর আদর ক্রমেই

এমন কমে আসচে,—পুরুষজাতটাই হচ্ছে প্রজাপতি মত—এক ফুলের মধু খেয়ে বেশীক্ষণ তারা খুসি থাকতে পারে না;—তার স্বামীও তো পুরুষ, তাই তাঁর মধ্যেও এইবার পুরুষত্বের লক্ষণ ফুটতে সুরু হয়েচে!... ... ...

অতএব দুর্গাকালী স্বামীর বাঁকা মনকে আবার সিধে করবার জন্যে, নিজের চেহারাকে নূতন করে চটকদার করে তুলতে চেষ্টা পেলে। আজকাল সে রংবেরঙা কাপড়খানি না পরে, কপালে ছোট্ট একটি খয়েরের টিপ না কেটে, ঘাড়ের উপরে লোটানো এলো-খোঁপাটি না বেঁধে কিছুতেই আর স্বামীর সাম্‌নে বেরুত না।

ভামিনী কিন্তু স্ত্রীর এই ছেড়ে-দিয়ে তেড়ে-ধরা চেহারার কারুকার্য্য দেখে আরো-বেশী সন্দিহান হয়ে উঠলেন। মাঝে মাঝে আড় চোখে যখন তিনি স্ত্রীর দিকে চুরি ক'রে চাইতেন, তখন তাঁর মনে একটু-একটু লোভের উদয় হোতো বটে কিন্তু তখনি তিনি নিজের মনকে এমন-এক কড়া দাব্‌ড়ী দিতেন যে, মন আর আত্মপ্রকাশ করতে পারত না! তাঁর স্ত্রীর সাজসজ্জা যতই বাড়তে লাগল, তিনিও তাঁর পাহারাকে ততই সজাগ ক'রে তুলতে লাগলেন! তিনি বুঝলেন, হাতে-নাতে ধরা পড়তে দুর্গাকালীর আর বেশী দেরি নেই!

শেষটা সত্যি-সত্যিই একদিন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। সে প্রমাণটা পেয়ে ভামিনী বুঝতে পারলেন না বটে, কাকে দেখে দুর্গাকালী তাঁকে ভুলেচে, তবে এটা বেশ জানা গেল, তার স্বভাবের সঙ্গে কেতাবী সতীদের বর্ণনা মিছুই মেলে না। অবশ্য এ অমিলটা ভামিনী যে আজ এই প্রথম আবিষ্কার করলেন, তা নয়—তবে এটার দিকে এতদিন তিনি দেখেও দেখেন নি। আর সত্যি বলতে কি, ভামিনী জটিল ডিটেকটিভ উপন্যাসের রহস্য জলের মত বুঝতে পারলেও, রামায়ণী মহাভারতী সতীদের সতীত্বের মর্ম্ম, তেমন ভালোরকম বুঝতেও ছাই পারতেন না! ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করেও অহল্যা, বিধবা হয়ে বিবাহ ক'রেও মন্দোদরী ও তারা, সূর্য্যকে আত্মদান ক'রেও কুমারী কুন্তী, আর পাঁচের চেয়ে সংখ্যা বাড়াতে চেয়েও দ্রৌপদী প্রভৃতির সতীত্বের সার্টিফিকেট কেন যে এখনো গ্রাহ্য হয়, ভামিনী বিস্তর ভেবেও এ সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেন নি।

সে দিন রবিবার। ভামিনীভূষণ খাওয়া-দাওয়ার পর একটুখানি নিশ্চিন্ত দিবানিদ্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময়ে জান্‌লা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, রাস্তার ওপারে ঘোষেদের বাড়ীর বারান্দায়, একটি লোকের দৃষ্টি তাঁর বাড়ীর ছাদের দিকে নিষ্পলক ও স্থির হয়ে আছে। তার সে দৃষ্টিটা এমন সন্দেহজনক যে, ভামিনীর আসন্ন ঘুম তৎক্ষণাৎ আধ-মিনিটের মধ্যেই চম্‌কে গেল। তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে তীরের মত ছাদের উপরে ছুটলেন। ছাদে উঠে ভামিনী দেখলেন, তাঁর সন্দেহ মিথ্যে নয়। সেখানে দুর্গাকালী পিঠের উপরে ভিজে চুল এলিয়ে চুপটি ক'রে বসে আছে।

ভামিনী চটে লাল্ হয়ে বললেন, "তোমার এ কি হচ্চে শুনি?"

দুর্গাকালী তাঁর ক্রুদ্ধ স্বর শুনে আশ্চর্য্য

হয়ে বললে, "আজ যে একবারে তেরিয়া মেজাজ! দেখতে পাচ্চ না, চুল শুকোচ্চি!"

—"চুল শুকোচ্চ! দেখতে পাচ্চ, ওদিকে কে দাঁড়িয়ে আছে?"

দুর্গাকালী রাস্তার ওপারে একবার চেয়েই "ওমা" বলে হেঁট হয়ে পড়ে মাথায় কাপড় তুলে দিলে। তারপর বললে, "আ মর্ পোড়ারমুখো, অমন চোখে আগুন লাগে না গা!"

ভামিনী কিন্তু ভোলবার ছেলে নন; টিট্‌কিরি দিয়ে বললেন, "আমাকে দেখে ওকে এখন গালাগাল দিচ্চ, কিন্তু এতক্ষণ যে তোমার মাথার কাপড় পিঠের ওপরে এসে পড়েছিল!"

ভামিনী তাকে সন্দেহ করেচেন বুঝেই দুর্গাকালী রেগে তিনটে হয়ে বললে, "তা পড়েছিল ত পড়েছিল, তাতে হয়েচে কি? ও হতভাগা না-হয় আমার পানে তাকিয়ে একটু স্বস্তি পাচ্চে, তাতে তো আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্চে না! ফের যদি অমন ছাই কথা বল, তাহলে এখনি আমি আবার মাথার কাপড় খুলে দেব! যার খুসি হয় আমাকে দেখুক-গে, তাতে আমার কি বয়ে গেল? ও দেখা-টেখায় ডরাব, তেমন মেয়ে আমি নই!"

ভামিনীভূষণ বেশ বুঝলেন যে, খাঁটি সতীদের কথা কখনোই এ-রকম স্পষ্টা-স্পষ্টি হওয়া উচিত নয়, তবু কিন্তু তিনি মনের ঝাল না ঝেড়ে চেপে গেলেন। ভাবলেন, না, এখনি বেশী ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, তাতে হিতে বিপরীত হবে।—তবে ছাদ থেকে নামবার আগে তিনি রাস্তার ওপারে এমন এক জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে এলেন যে, বারান্দার সেই রূপ-গদগদ লোকটি তখনি ঘাড় হেঁট ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

গ

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ভামিনীর সতর্ক চোখ দেখলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাঁরই বাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছে। যুদ্ধের জন্যে কল্‌কাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো কমিয়ে দেওয়া হয়েচে,—তাই তার মুখটা চিন্‌তে পারা গেল না।

কিন্তু তাঁর বাড়ীর দিকে লোকটাকে চেয়ে থাকতে দেখেই ভামিনী রেজায় ক্ষেপে উঠলেন। মনে মনে বললেন, ষ্টুপিডরা ভেবেচে কি, আমি কি মরে গেছি? দাঁড়াও, দেখাচ্চি মজাটা!

গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে পড়ে ভামিনীর মাথা এমন চমৎকার সাফ হয়ে গিয়েছিল যে, খুব চট ক'রে তাতে ফন্দি যোগাত। লোকটার মতলব কি তা বোঝবার জন্যে, ভামিনী তখনি কোঁচার কাপড়টা খুলে গায়ে ও মাথায় দিয়ে, মুখের গোঁফ পর্য্যন্ত ঢেকে জান্‌লার কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর খড়খড়িটা ধরে নাড়তেই লোকটা মুখ তুলে চেয়ে দেখলে। ভামিনী হাত নেড়ে ইসারা ক'রে তাকে ডাকলেন।

লোকটা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কে, দুর্গাকালী?"

গলার আওয়াজ স্ত্রীলোকের মত সরু ক'রে ভামিনী বললেন, "হুঁ।"

লোকটা পায়ে পায়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে এল।

নিষ্ঠুর আনন্দে ভামিনী চোখের পলকে আঁট্‌সাট্ ক'রে কোমর বেঁধে ফেললেন। যখন তাঁর স্ত্রীর নাম পর্য্যন্ত জানে, তখন এ নিশ্চয় সেই লোক—যাকে তাঁর স্ত্রী চিঠি লিখেছিল।

চৌকির তলা থেকে মস্ত-এক লম্বা-চওড়া লাঠি বার করে ভামিনী বাঘের মত লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে গেলেন। সে লোকটা তখন নীচে উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে হাত দিয়ে উপরে ওঠবার সিঁড়ি খুঁজছিল। ভামিনী নীচে গিয়ে মুখে তাকে কিছুই বললেন না, সুধু হাতের লাঠিটা মাথার উপরে তিনবার ঘুরিয়ে সটাং এক ঘা বসিয়ে দিলেন। সেই পাকা বাঁশের লাঠিটা যদি যথাস্থানে পড়ত, তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই লোকটার দেহ থেকে মস্তকের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যেত। কিন্তু তার সৌভাগ্যক্রমে মাথায় না পড়ে লাঠিটা পড়ল গিয়ে তার কাঁধের উপরে। "ওরে বাপরে, গেছিরে" বলে চেঁচিয়ে উঠে, সে দড়াম্ করে উঠোনের উপরে আছড়ে পড়ল।

তার ভীষণ চীৎকার শুনে দুর্গাকালী রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। লোকটাকে দেখবার জন্যে ভামিনীও একটা আলো নিয়ে এলেন,—তাঁর মন তখন ভারি খুসি হয়ে উঠেচে।

কিন্তু আলোটা তিনি উঁচু করে তুলে ধরতেই, দুর্গাকালী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—"ওগো, একি গো, এ যে দাদা গো!"

ভামিনীর হাত থেকে আলোটা খসে মাটির উপরে পড়ে নিবে গেল। তাইত, এ দুর্গাকালীর দাদা যোগেনই বটে!

যোগেন কাৎরাতে কাৎরাতে বললে, "দুগ্‌গা! তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠা রে, আমার 'কলার-বোন' ভেঙে বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে গেছে! ভামিনী, আমার ওপরে তোমার এত যে রাগ ছিল, তা জান্‌লে আমি ত এখানে আসতুম না ভাই!"

ভামিনী জড়োসড়ো হয়ে, চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে বললেন, "আমি—ভেবেছিলুম—চোর!"

দুর্গাকালী ততক্ষণে জল-ন্যাকড়া নিয়ে এসে যোগেনের কাঁধের উপরটা বেঁধে দিতে বসেচে। সে বললে, "কি ক'রে এ কাণ্ড হোলো দাদা?"

যোগেন বললে, "আমি তো তোদের এই নতুন বাসাটা চিনতুম না, খালি নম্বরটাই জানতুম। তোদের বাড়ীর সাম্‌নে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, এইটেই তোদের বাড়ী কিনা—এমনসময়ে বাড়ীর ওপর থেকে একটি মেয়ে আমাকে ডাক্‌লে। এখানে আর কেই-বা আমাকে ডাকবে, কাজেই আমি বুঝলুম, এই বাড়ীটাই তোদের। তবু একবার সন্দেহ মেটাবার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কে দুগ্‌গাকালী? তুই বল্‌লি—হুঁ।"

দুর্গাকালী আশ্চর্য্য হয়ে চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে, "আমি বল্‌লুম হুঁ? দাদা, তুমি কি বল্‌চ?"

—ভামিনী চেপে গেলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ওগো, তোমার দাদাকে এখন মিছে বকিও না—ওঁকে ওপরে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণে ডাক্তার ডেকে আনি।"

ঘ

সেই ভয়াবহ ঘটনার পর দু-মাস কেটে

গেছে। ইতিমধ্যে যোগেনকে লাঠি-মারার দরুণ দুর্গাকালীর মুখ থেকে, ভামিনীকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েচে। দুর্গাকালী যখন-তখন তাঁকে 'খুনে', 'গুণ্ডা', 'ঠ্যাঙাড়ে', 'গোঁয়ার' ব'লে টিট্‌কারী দেয়, ভামিনী কিন্তু সে-সব কথার বিরুদ্ধে একটিও আপত্তি প্রকাশ করেন না। যখন বড়ই অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। স্ত্রীর কবল থেকে মুক্তি লাভের এই একটি চরম নিরাপদ উপায় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন —বিনাবাক্যব্যয়ে ঘুমিয়ে-পড়া! দুর্গাকালী যখন কোন সঙ্গিনীর হাতে নতুন গয়না দেখে এসে রাত্রে স্বামীর কাছে সেই গয়নার সম্বন্ধে সলোভ সুখ্যাতি করতে বস্‌ত, কিংবা অনেকদিন পশ্চিমে বেড়াতে যাওয়া হয়নি ব'লে গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদত, কিংবা সাম্‌নের শনিবারের থিয়েটারের হাণ্ডবিল পড়ে শোনাত, তখনো ভামিনী ভূমিকা সমাপ্ত হবার আগেই উপসংহারের আয়োজন ক'রে আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে অনায়াসে ঘুমের কোলে ঢুলে পড়তেন। ঘুম ছিল তাঁর পোষ-মানা কুকুরের মত;—তু বলে ডাকলেই ছুটে আসত।

কিন্তু ভামিনী এখনো হাল ছাড়েন নি। এখনো তিনি সর্ব্বদাই চোখ-কাণকে সজাগ ক'রে আছেন, এ ব্যাপারটার আদি-অন্ত সমস্ত রহস্য না-জেনে কিছুতেই তিনি ছাড়বেন না! তারপর,—দুর্গাকালীকে একবার দেখে নেবেন—হুঁ!

একদিন শেষরাত্রে হঠাৎ যেন কিসের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ভামিনীর ঘুম তো ঠুন্‌কো কাচের পেয়ালার মত অত-সহজে ভেঙে যায় না! কেন এমন অসময়ে ঘুম ভাঙল, বিছানার উপরে উঠে বসে গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে তিনি তাই ভাবতে লাগলেন।

এমনসময়ে নীচে সদর-দরজা খোলার শব্দ হ'ল। শুনেই তাঁর মনে একটা খট্‌কা লেগে গেল, বালিসের তলা থেকে তাড়াতাড়ি দেশলাই বার ক'রে তিনি তখনি জেলে ফেল্‌লেন।

যা ভেবেচেন তাই! দুর্গাকালী তার বিছানায় নেই, সেখানে সুধু ছেলে মেয়ে দুটো পরস্পরের পা জড়িয়ে ধ'রে ঘুমোচ্চে।

ভামিনী তড়াক্ ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর উঠি-কি-পড়ি এম্‌নি ভাবে নীচে নেমে গেলেন।

নীচে কেউ কোথাও নেই। কিন্তু সদর দরজাটা টেনে যা দেখলেন, তাতে তাঁর বুকের রক্ত শুকিয়ে জল হয়ে গেল। সদর দরজায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ।

তবে কি দুর্গাকালী ... ...না—না—আর কোনই সন্দেহ নেই—দুর্গাকালী নিশ্চয়ই তাঁকে ফেলে চম্পট দিয়েচে! পাছে তিনি তার পিছনে ছোটেন, সেই ভয়ে সে সদর দরজায় বাইরে থেকে তালাবন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে!

হায় হায়, কেন তিনি আর-একটু আগে জেগে ওঠেন নি—তাহলে তো এমন সর্ব্বনাশ হোতো না!

হঠাৎ ভামিনীর মনে পড়ে গেল,—তাঁদের বাড়ীর পিছনে একটা খিড়্‌কীর দরজা আছে। তিনি তখনি সেইদিকে দৌড়ে গেলেন। তারপর দরজা খুলে গলি দিয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

নির্জ্জন পথ দিয়ে খানিক তফাতেই একটা পুরুষের সঙ্গে একজন রমণী হন্ হন্ করে চলে যাচ্চে। ভামিনীর বুঝতে দেরি হোলো না যে, তারা কে? শিকারের ওপরে লাফিয়ে পড়বার সময়ে বাঘের চোখ যেমন-ধারা হয়, তাঁরও চোখদুটো ঠিক তেম্‌নি জ্বলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রমণীর একখানা হাত দুহাতে কষে চেপে ধরে, গলা থেকে এক ভয়ানক গম্ভীর আওয়াজ বার করে বল্‌লেন—"দুগ্‌গাকালী!"

ছিলে ছিঁড়ে গেলে ধনুক যেমন ঠিক্‌রে ওঠে, তেম্‌নি করে ঠিক্‌রে উঠে রমণী ভয়ে শিউরে বল্‌লে, "ওগো মাগো, এ কে গো!"

কি সর্ব্বনাশ—এ তো দুর্গাকালী নয়! ভামিনী দস্তুরমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার হাত ছেড়ে দিয়ে, পিছন-হাঁটা ইঞ্জিনের মত সাঁ করে সরে গেলেন।

রমণীর সঙ্গে যে পুরুষটা ছিল, সে রুখে এসে বল্‌লে, "তবে রে পাজি, গেরস্তর মেয়ের্ গায়ে হাত!" বলেই সে দুহাতে দুই ঘুসি তুললে।

ভামিনী মিনতির স্বরে বল্‌লেন, "মশাই, মশাই, চ্যাঁচাবেন না,—মারবেন না! আগে আমার কথা শুনুন!"

ঠিক সেই সময় পাশের একটা বাড়ীর রোয়াক থেকে বাজখাঁই আওয়াজ এল—"আরে কোন্ শ্বশুরা রে!"

ভামিনী স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, লাল পাগ্‌ড়ী হাতে করে এক পাহারাওয়ালা রোয়াকের উপর থেকে নেমে আস্‌চে।

সেই লোকটা বল্‌লে, "পাহারাওলাজী, হাম লোক গঙ্গাস্নান কর্‌তে আতা হায়, আর এই বদমাসটা হামারা স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়া হায়!"

লালপাগড়ীটা মাথায় পরে নিয়ে পাহারা-ওয়ালা প্রকাণ্ড একটা হাই তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে—"কেয়া!"

এই যেম্‌নি 'কেয়া' বলা, ভামিনী অম্‌নি দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে দে দৌড়! কিন্তু পাহারাওয়ালাও ছোড়্‌নেওয়ালা নয়—সেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে সুরু কর্‌লে!

দ্রুত-ধাবনে ভামিনীর পক্ষে অসুবিধা ছিল একাধিক। কারণ ছুটতে গেলেই তাঁর দোদুল্য-মান ভুঁড়িটি প্রতিপদেই তাঁকে ভূতলের দিকে সবেগে আকর্ষণ করত,—তার উপরে তাঁর বপুখানিও ছিল বিপুলজাতীয়। কিন্তু এ সব অসুবিধা ভামিনীকে আজ একটুও কাবু কর্‌তে পারলে না—বল্‌তে কি, নিজের ছোটবার ক্ষমতা দেখে ভামিনী আজ নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। কিন্তু রাতের পাহারাওয়ালারা হচ্ছে কুম্ভকর্ণের আধুনিক সংস্করণ—অসময়ে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে আর বাঁচোয়া নেই।

ভামিনী প্রথমটা যৎপরোনাস্তি বেগেই ছুটেছিলেন বটে, কিন্তু তিনটে রাস্তা পার হবার পর তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, তাঁর ও পাহারাওয়ালার মাঝখানকার ব্যবধান ক্রমেই অত্যন্ত অন্যায়-রকম কমে আসচে।

চতুর্থ রাস্তার মোড়ে একটা মাতাল গ্যাসপোষ্টে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কলের পুতুলের মত আপন মনেই টল্‌মল্ করে টল্‌ছিল। ভামিনীর দ্রুত পদশব্দে অত্যন্ত চম্‌কে মুখ তুলে সে বলে উঠল—"এই, এই! ছুটিস্-নে, ছুটিস্-নে, অত জোরে ছুটিস্-নে

বাবা, টলে পড়ে মারা যাবি—হাত-পা খোঁড়া করবি!"

ভামিনীর মাথায় অম্‌নি একটা ফন্দি জুটে গেল। তিনি সাম্‌নের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলেন—"ধর্‌, ধর্‌! চোর, চোর!"

চোর-ধরায় বোধহয় মদের চেয়ে বেশী মাদকতা আছে। চোরের নাম শুনেই মাতাল লাফিয়ে উঠল! গ্যাসপোষ্টের আশ্রয় ছেড়ে সে বল্‌লে, "কৈ, কোথায় চোর?"

—"ঐ! ঐ! ঐদিকে পালাচ্চে!"

—"এ্যাঁ, আবার পালাচ্চে! তবে রে বেটা!"—বলেই সেই মাতালটা অনির্দ্দিষ্ট চোরের উদ্দেশে প্রাণপণে লম্বা এক দৌড় মারলে।

সাহসে ভর্‌ করে কপাল ঠুকে ভামিনী দাঁড়িয়ে পড়লেন, সেইসঙ্গে পাহারাওয়ালাও রাস্তার মোড় ফিরে তাঁর কাছে এসে পড়ল। ভামিনী ধাবমান মাতালের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে বল্‌লেন, "পাহারাওলাজী! ঐ দেখ, আসামী পালাচ্চে!"

পাহারাওয়ালা ভামিনীর দিকে চেয়েও দেখলে না—বেচারী মাতালকেই আসামী ঠাউরে সে তার পিছনেই ছুটল।

বুদ্ধির জোরে উপস্থিত বিপদ থেকে নিস্তার পেয়ে, ভামিনী আবার নিজের বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে ফিরে এলেন।

সদর দরজায় তখনো তালা বন্ধ। একটা দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করে খিড়্‌কী দিয়ে তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন।

৬

দুর্গাকালীকে তিনি যে এত-বেশী ভালো বাসতেন, এতদিন ভামিনী তা নিজেই আন্দাজ করতে পারেন নি। দুর্গাকালী তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে, এটা ভেবে এখন তাঁর মনে রাগের চেয়ে দুঃখই হোলো বেশী। তিনি একেবারে বিছানায় গিয়ে মুস্‌ড়ে পড়ে কান্না সুরু করলেন।

হায়রে, ঠিক বেলা ন'টার সময় আর কেউ তাঁকে ভাত-তরকারির থালা সাজিয়ে দেবে না, এটা খাও ওটা খাও বলে আর কেউ তাঁকে যত্ন করে খাওয়াবে না, পিঠের যেখানে নিজের হাত যায় না সেখানটা আর কেউ আদর করে নরম হাতে চুল্‌কে দেবে না, ময়লা জামা-কাপড় পরে বাড়ীর বাইরে যেতে গেলে, আর কেউ তাঁর জুতো-চাদর কেড়ে নেবে না, বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত হ'লে আর কেউ তেমন মিষ্টি বকুনি বক্‌বে না—এবং সব-চেয়ে যা ভাবনার কথা, গরমে রাত্রে যখন ঘুম হবে না তখন হাতের চুড়ি রুণুরুণু বাজিয়ে, পাখার বাতাস করে আর কেউ তাঁকে ঘুম পাড়াবে না! অসহ্য শোকে মুহ্যমান হয়ে, ভামিনী গড়াতে গড়াতে বিছানার একপাশ থেকে আর এক পাশে চলে গেলেন।

... ...

ভোর হ'তে আর দেরি নেই। কাদের আস্তাবল থেকে একটা মুরগী ডেকে উঠল,—সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজা খোলার শব্দ পেয়ে, ভামিনী কাণ খাড়া করে বিছানার উপরে উঠে বস্‌লেন।

একটু পরেই দুর্গাকালী এসে ঘরের

ভিতরে ঢুকল। ভামিনীকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে সে বল্‌লে, "ওমা একি! আজ যে বড় সূয্যি না উঠতেই তুমি উঠেচ!"

ভামিনী যেন তখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না! হাঁদারামের মত ফ্যাল্‌ফেলে চোখে চেয়ে, তোৎলার মত থেমে থেমে তিনি বল্‌লেন, "তুমি! তুমি—তাহলে—ফিরে—এসেচ?"

দুর্গাকালী বল্‌লে, "আজ আবার এ কি ঢং! ফিরে আস্‌বনা ত যাব কোন্‌ চুলোয়?"

ভামিনী বল্‌লেন, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

—"আজ যে বারুনী, গঙ্গাচানে গিয়েছিলুম।"

—"গঙ্গাচানে? একলা?"

—"একলা কেন? পাশের বাড়ীর সরোজিনী ছিল, তার মা, তাদের একজন চাকরও ছিল।"

—"আমাকে বলে গেলেই তো পারতে।"

—"তোমার তখন নাক ডাকছিল। ঘুম ভাঙালে তুমি যে রেগে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় ক'রে তুল্‌তে।"

—ভামিনী চেপে গেলেন। কথায় কথা বাড়িয়ে আসল কথা ফাঁস করে ফেলাটা তিনি নিরাপদ মনে করলেন না।

চ

স্ত্রী-হারানোর ভাবনা যেই গেল, ভামিনীর সন্দেহ অম্‌নি জেগে উঠল। সেই চিঠিখানা তখনো বঁড়শীর মত তাঁর বুকের মাঝখানে গেঁথে ছিল—সেটা তো ফস্‌ ক'রে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়!

কিন্তু সে চিঠি নিয়ে আর গোয়েন্দাগিরি করতেও ভামিনীর সাহসে কুলালো না। দু-দুবার যে ফ্যাঁসাদেই তিনি পড়েছিলেন! একবার বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে ফাঁসী যেতে-যেতে বেঁচে গিয়েছেন, আর-একবার পরস্ত্রীর গায়ে হাত, পাহারাওয়ালায় তাড়া—বাপরে, সে-কথা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না!

ভেবে-চিন্তে ভামিনী শেষটা স্থির করলেন, 'চিঠিখানা একেবারে দুর্গাকালীর সাম্‌নে ধরা যাক্‌! দেখি তার মুখের ভাব কি-রকম হয়, —তাহোলেই সব বোঝা যাবে!'

সেইদিনেই সন্ধ্যের সময়ে দুর্গাকালী যখন খাটের উপরে বসে বালিসে ওয়াড় পরাচ্ছিল, তখন ভামিনী তার কাছে গিয়ে বল্‌লেন, "দেখ দেখি, এই চিঠিখানা কার লেখা?"

দুর্গাকালী চিঠিখানা দেখে খুব সহজ স্বরেই বল্‌লে, "ওখানা তুমি কোথায় পেলে গা?"

—"আমার একখানা বইএর ভেতরে ছিল।"

—"দেখেচ আমার ভোলা মন! কত খুঁজেও আমি পাই-নি! ওখানা ঐ পাশের বাড়ীর সরোজিনীর চিঠি।"

—"কিন্তু এ যে দেখচি তোমারি হাতের লেখা!"

—"হ্যাঁ, সরোজিনী যে লিখতে জানে না! তার বর রাগ করে চলে গিয়েছিল, আমি তাই তার হয়ে চিঠিখানা লিখে দিয়েছিলুম। সেদিন লিখতে লিখতে বেলা হয়ে গেল বলে, চিঠিখানা শেষ না করেই বইয়ের ভেতরে রেখেছিলুম, কিন্তু তার পরদিন খুঁজে

না পেয়ে, আমি তাকে আর-একখানা নতুন চিঠি লিখে দিয়েচি।"

—"কিন্তু তোমার সরোজিনীর চিঠিতে আমার ছেলের নাম কেন?"

"কি আশ্চর্য্য, তা জান না বুঝি? সরোজিনীর ছেলেরও ডাক-নাম যে হেবো!"

ভামিনী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "দেখ, ভবিষ্যতে আর-কোনদিন পরের জন্যে প্রেম-পত্র লিখে, আমার কেতাবের ভেতরে গুঁজে রেখ না।"

ভামিনীর কথা কইবার ধরণ শুনে, দুর্গাকালী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লে, "কেন, তাতে তোমার আপত্তি কিসের শুনি?"

—কিন্তু ভামিনী আবার চেপে গেলেন। তার দাদার উপরে লাঠি-চালানোর আসল কারণটা জানতে পারলে, দুর্গাকালীর জিভ যে কতটা অসংযত হয়ে উঠবে, ভামিনী সেটা আন্দাজ করেই শিউরে উঠলেন। হৃদয়েশ্বরীকেও হৃদয়ের সমস্ত কথা জানানো নিরাপদ নয়!

অতএব তিনি তাড়াতাড়ি কথা ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লেন, "দুগ্‌গাকালী, আজ কি চমৎকার চাঁদ উঠেচে! চল, ছাতের ওপরে বেলফুলের টবের পাশে গিয়ে বসে খানিক গল্প করে আসি!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আলোচনা

ভারতবাসীর উপনিবেশ।

উল্লিখিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রিপুরার আদি ইতিহাস সম্বন্ধে আভাস প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের অনেক কথাই আমরা প্রতিবাদ-যোগ্য বলিয়া মনে করি।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, ত্রিপুরার ইতিহাস প্রধানতঃ ত্রিপুরার রাজবংশেরই ইতিহাস। ত্রিপুরা-রাজাদিগের একটা প্রাচীন বংশ-বৃত্তান্তও আছে। তাহা 'রাজমালা' বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। বিদ্যাভূষণ-মহাশয় এই 'রাজমালার' ততটা অপেক্ষা না রাখিয়া অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে ত্রিপুরার ইতিহাস গঠনেই যেন কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাহা না হইলে ক্রহ্য-ত্রিপুর-ত্রিলোচন প্রভৃতি রাজমালার উল্লিখিত ত্রিপুর-রাজবংশের সুবিদিত-নামা আদি পুরুষদিগের নাম বর্জ্জন করতঃ তিনি সোপান নামক নূতন চন্দ্রবংশীয় এক রাজার সহিত ত্রিপুর-রাজবংশের যোগ-সাধনে প্রয়াসী হইবেন কেন? যাহা হউক যে গোপালের সহিত তিনি ত্রিপুর-রাজবংশের যোগ-সম্পাদন করিয়াছেন, সেই গোপাল তাঁহারই স্বীকৃতমতে হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। গোপালকে যদি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ই ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাঁহাকে চন্দ্রবংশীয় কোন্ ধারার ক্ষত্রিয় ধরা হইবে? হস্তিনাপুরে যখন যুধিষ্ঠিরের বংশধরেরা রাজত্ব করেন, তখন গোপাল যুধিষ্ঠিরেরই বংশধারা, ইহাই বোধ হয় বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের অভিপ্রায়। কিন্তু সেই

পর্কটী বিনাপ্রমাণে গৃহীত হইবে, তাহাই কি বিদ্যাভূষণ-মহাশয় আশা করিতে পারেন? আর যদি তাহা প্রমাণিত ও গৃহীতই হয়, তবে ত্রিপুর-রাজবংশোদ্ভূত 'রাজমালায়' উল্লিখিত ত্রিপুর-রাজদিগের ক্রহ্যবংশীয় বলিয়া খ্যাতি ও ত্রিপুর-রাজবংশে তৎ-সম্বন্ধে চির-প্রচলিত কিম্বদন্তীর সহিত উহার কিরূপে সামঞ্জস্য হয়? যুধিষ্ঠির ক্রহ্যুর বংশধারা নহে, ক্রহ্যুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুরই বংশধারা, তাহাতেই যাঁহাদের 'পৌরব' খ্যাতি সুপ্রচলিত। স্বীয় মত প্রকটিত করার পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের এই সমস্ত বিতর্কের সমাধানই কি উচিত ছিল না?

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় গোপালের নামযুক্ত একখানা শিলালিপির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে বড়ই বলবত্তর প্রমাণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই শিলালিপিতে আমাদের সন্দেহ কিন্তু আরও ঘনীভূত করিয়া দিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, এই শিলালিপিতে ১৮০ গুপ্তাব্দ অঙ্কিত আছে এবং এই গুপ্তাব্দের কাল ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। ইহার পর তিনি গোপালের পুত্র জয়পালের এক শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সময় তিনি ১৮০ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৪২৬ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। এখানে অঙ্কের হিসাবে কিন্তু বেশ গোলযোগই উপস্থিত হইতেছে। পিতার শিলালিপির ৮২ গুপ্তাব্দ, ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইলে, পুত্রের শিলালিপির ১৮০ গুপ্তাব্দ কি করিয়া ৪২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পারে? বরঞ্চ ৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হওয়াই উচিত হয়। গোলযোগ যে এইখানেই শেষ হইয়াছে তাহা নহে, অন্যত্র তিনি লিখিতেছেন:—"এই জয়-পাল ও ১০৮ গুপ্তাব্দের জয়পাল অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।" এখানে জয়পালের প্রাপ্তক্ত ১৮০ গুপ্তাব্দের স্থলে ১০৮ গুপ্তাব্দই হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে খ্রীষ্টাব্দ আরও কম হওয়ারই কথা হয়। অথচ তিনি বরাবরই জয়পালের সময় স্পষ্টরূপে ৪২৬ খ্রীষ্টাব্দই লিখিয়া যাইতেছেন। আমাদের কিন্তু গোল বাড়িয়াই চলিতেছে। বিদ্যাভূষণ-মহাশয় এই ধাঁধাটি ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন কি? পিতা-পুত্রের মধ্যে তদীয় সময়-নির্দ্দেশ মনুষ্য-আয়ুষ্কালকে যে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন কি? বর্ম্মা বা নওগাঁয় প্রতিষ্ঠিত হস্তিনাপুরের রাজগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ই যখন হইতেছেন এবং সম্ভবতঃ পুরু বা যুধিষ্ঠিরেরই বংশধর হইতেছেন, তখন তাঁহারা-সহপূর্ব্ব প্রচলিত সংবৎ, শকাব্দ বা যুধিষ্ঠিরাব্দ গ্রহণ ও ব্যবহার না করিয়া কেন যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গুপ্তাব্দ গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ রহস্যময় ব্যাপারই বলিতে হইবে। ইহাঁরা নিজেই পরে একটী অব্দও ত প্রচলন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরের অব্দ লইতে যাইবেন কিরূপে সম্ভবপর হয়?

তিনি দুইটী শিলালিপির উল্লেখ করিলেও একটীরও কোন প্রতিলিপি প্রদান করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। সুতরাং শিলালিপির প্রকৃত তথ্য আমাদের নিজের নির্দ্ধারণ করার কোন উপায়ই নাই। যাহা হউক শিলালিপির সময় লইয়া কেবল আমাদেরই ধাঁধা লাগিয়াছে তাহা নহে, তিনি নিজেও ধাঁধায় পড়িয়াছেন, দেখা যায়। তিনি শিলালিপি হইতে হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠার সময় ৩০০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত করিলেও, ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সেই প্রতিষ্ঠার সময় ৯২৩ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ উল্লিখিত রহিয়াছে, ইহাতে তাঁহার শিলালিপির সময়ের সহিত কেবল যৎসামান্য সময়ের ব্যবধান হইতেছে না, ১২০০ বারশত বৎসরের ব্যবধান হইতেছে। এক্ষণে এই এক দুই শতাব্দীর নহে, বারো শতাব্দীর ব্যবধানের সামঞ্জস্য করার কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি "তাহা নিতান্তই অতিরঞ্জিত" এই এক কথায়ই সমস্ত ব্যবধান মুছিয়া ফেলিলেন! তাহা না হইলে তাঁহার শিলালিপি খানা যে ভাসিয়া যায়! কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই সময়-নির্দ্দেশটীকে উড়াইয়া দেন নাই। আমাদের প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"বঙ্গদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে কার্ণেল জেরিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এ-কথা উদ্ধার করিয়াছেন যে, উত্তরব্রহ্মের ভামো নগরে হস্তিনাপুর হইতে আগত ক্ষত্রিয় রাজারা খৃঃ পূঃ ৯২৩ অব্দে রাজ্যস্থাপন করেন।" প্রাচীন সভ্যতা, ৮১ পৃঃ।

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় স্বয়ংও এতৎ প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক বৃত্তান্তের সময়ের প্রমাণে খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের উল্লেখ করতঃ Burmese Inscriptionএর (বর্ম্মা-শিলালিপির) উপর বরাত দিয়াছেন। তবে তিনি কোন্ যুক্তিতে একটীকে বিশ্বাস ও অপরটীকে অবিশ্বাস করিতে পারেন? উপরে আমরা বিজয়বাবুর যে মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে হস্তিনাপুরের ক্ষত্রিয় রাজারা ভামোনগরে রাজ্য স্থাপন করেন, এরূপই উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার নাম হস্তিনাপুর প্রদান করেন কিনা, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং হস্তিনাপুর নাম-সম্বন্ধেও আমরা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিতেছি না।

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় ত্রিপুর-রাজবংশের আদি পুরুষ গোপালের সময় যেরূপ পরবর্ত্তী করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিপুর-রাজবংশ অন্ততঃ ১২০০ বারশত বৎসরের অর্ব্বাচীন হইয়া পড়ে। ইহাতে ত্রিপুর-রাজবংশের প্রাচীনতা কিরূপ খর্ব্ব হইয়া যায়, তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই খর্ব্বীকৃত সময়ের মধ্যে ত্রিপুর-রাজবংশের ১৪৪ জন রাজার সমাবেশ কি প্রকারে হইতে পারে, তাহাও তিনি অনুধাবন করিতেছেন কি? ইহাতে ঐতিহাসিক নিয়মানুযায়ী তিন-পুরুষে এক শতাব্দীর স্থলে যে প্রায় দশ পুরুষে এক শতাব্দী ধরার আবশ্যকতা হয়!

তৎপর তিনি গোপালের পুত্র জয়পালের সহিত তাঁহার রাজমালার তথাকথিত জয়পালের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন:—"অধিকন্তু রাজমালার প্রাচীনতম প্রাপ্ত পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জয়পাল নামক একজন ত্রিপুর-নরেশ ছিলেন। রাজমালা অনুসারে ইনি ত্রিপুর হইতে সপ্তম নরপতি। এই জয়পালও ১০৮ গুপ্তাব্দের জয়পাল অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।"

জয়পাল ত্রিপুর-নরেশ ছিলেন, ইহা লিখিয়াই তিনি টীকায় লিখিতেছেন:—"পরবর্ত্তী পুথিতে লিপিকরের হস্তে ইনি রুস্তাঙ্গদ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।" 'জয়পাল' ও 'রুস্তাঙ্গদ' নামের বর্ণমালার মধ্যে এমন কি সাদৃশ্য আছে যে, লিখার সময়, এক অক্ষর সহজেই অনুরূপ অপর অক্ষরে পরিণত হইয়া যাইতে পারে? সুতরাং লিপিকরের দ্বারা জয়পাল, রুস্তাঙ্গদ রূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার এই কথায় আমরা কোনমতেই সায় দিতে পারিতেছিনা।

যে-ভাবে বিদ্যাভূষণ-মহাশয় ত্রিপুর রাজ-বংশের সহিত জয়পালকে সংসৃষ্ট করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেই যে বিশেষ আস্থাবান্ হইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার "অভিন্ন বলিয়া মনে হয়," এই সন্দেহমূলক কথাতেই বেশ ব্যক্ত হইতেছে। প্রাচীনতম রাজমালায় জয়পাল নাম যে আছে তাহা রাজমালা উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন না করায় এবং পরবর্ত্তী রাজমালায় ভিন্ন নামের কথা মন্তব্য করায় অথচ তাহার সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে না পারায়, এই জয়পাল নামের গোড়ায় যে যথেষ্ট গলদই রহিয়াছে, তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। যিনি ত্রিপুর-রাজবংশের প্রকৃত প্রবর্ত্তক, তাঁহার নাম সম্বন্ধেই এত গোল থাকিলে, তাঁহার বিষয় কিরূপে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? বিশেষতঃ যখন রাজমালা-অনুসারে জয়পাল সপ্তম স্থানীয় নরপতি হইতেছেন, তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগকে ফেলিয়া তাঁহাকে কি করিয়াই বা প্রবর্ত্তক বলা যায়? এবং তাঁহাকে প্রবর্ত্তক বলিলে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগেরই বা কি গতি হইবে?

বিদ্যাভূষণ-মহাশয় একদিকে জয়পালকে "ত্রিপুর-নরেশ" বলিয়া আখ্যাত করিয়া, ত্রিপুর রাজবংশের আদি রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন; অপরদিকে তৎপুত্র সোমাঙ্গ নওগঙে রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া, তাঁহাকেও ত্রিপুর-রাজবংশের প্রবর্ত্তক রূপেই বর্ণিত করিলেন! বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের লিখায়ই প্রকাশ যে, জয়পাল নওগঙে রাজত্ব করেন নাই, বর্ম্মায়ই রাজত্ব করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ত্রিপুরার রাজাদিগের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত হয় না। অথচ রাজমালায় ত্রিপুর-রাজদিগের মধ্যে তাঁহার উল্লেখ ও তাঁহার রাজত্বের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা কি বিচিত্র কথা নহে? আমাদের দৃষ্ট রাজমালা-মতে তিনি ত্রিপুর-রাজবংশের ১৪শ স্থানীয় রাজা, সুতরাং তিনি

আদি রাজা বলিয়া কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন? বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ও তাঁহাকে ৭ম স্থানীয় রাজা বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। জয়পাল নিজেই যখন বর্ম্মার রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা হস্তিনাপুর হইতে প্রথম বর্ম্মায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন জয়পালের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ জন বা ১৩ জন রাজার স্থান আর কোথায় থাকে? তবে দেখা যায়, রাজমালাকারের কলমেই মাত্র তাঁহাদিগের অস্তিত্ব থাকে—বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের কলমে নয়! বিদ্যাভূষণ-মহাশয় জয়পালের নাম লিপিকর-প্রমাদে পরবর্ত্তী রাজমালায় রুস্তাঙ্গদ-রূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা বিশ্বকোষকার ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ উভয়ের প্রদত্ত ত্রিপুর-রাজবংশ-তালিকায়ই কিন্তু রুস্তাঙ্গদ নামটীই স্পষ্টরূপে লিখিত দেখিতে পাই। তাঁহারা রুস্তাঙ্গদের পুত্রকে বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের ন্যায় 'সোমাঙ্গ' লিখেন নাই, পরন্তু 'সোমাঙ্গদ' লিখিয়াছেন। এই 'সোমাঙ্গদ' নামটী রুস্তাঙ্গদ নামের যেরূপ স্বাভাবিক অনুকরণ, তাহাতে 'রুস্তাঙ্গদ' ভ্রমাত্মক হওয়া অপেক্ষা জয়পাল নামটী ভ্রমাত্মক হওয়ার সম্ভাবনাই কি অধিক বোধ হয় না? বিদ্যাভূষণ মহাশয় তো সোমাঙ্গকে ত্রিপুর-রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিলেন, অথচ রাজমালায়ও তাঁহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার এই বিশিষ্ট কীর্ত্তির কোনও উল্লেখই নাই কেন? বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার রাজ্যস্থাপনের যে রাজনৈতিক কারণ অনুমান করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও কোনও আভাসই তাহাতে নাই কেন? এই সকল কি নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়াই বোধ হয় না?

সোমাঙ্গের সহিত জয়পালের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে যাইয়া বিদ্যাভূষণ-মহাশয় লিখিয়াছেন:—"রাজমালা মতে, এই জয়পালের পুত্রের নাম 'সোমাঙ্গ'।" জয়পাল হইলেন প্রকৃত বর্ম্মার রাজা, অথচ তাঁহার পুত্রের নামের প্রমাণ হইল রাজমালার বৃত্তান্তের দ্বারা। এই প্রমাণ কি বর্ম্মার ইতিহাস দ্বারা হওয়াই সঙ্গত হয় না? বিদ্যাভূষণ মহাশয় বর্ম্মা ও নওগঙ রাজ্যের মধ্যে সম্বন্ধের সূত্র প্রদর্শন জন্য যে সমস্ত "সিদ্ধান্তের স্থিরীকরণ সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন"—সেই স্থিরীকরণের ভার হইতেই সকলে সেই সূত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে প্রমাণ পাইবেন:—

"জয়পাল সম্ভবতঃ ৪২৩ খৃঃ হইতে ৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করেন; তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। কোন পুত্র তগঙেই বাস করিতে থাকেন। ৪২৬ হইতে ৪১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনসময়ে সোমাঙ্গ তগঙ্ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কপিলি রাজ্য বা ত্রিবেগ নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন।"

শিলালিপির অক্ষয় অকাট্য প্রমাণের যে শেষে সম্ভাবনাতে আসিয়া পরিণত হইবে, তাহা কে ভাবিতে পারিয়াছিল?

শিলালিপি অপেক্ষাও বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের বলবত্তর সহায় 'হস্তিনাপুর' নাম। ইহাকেই তিনি ত্রিপুর-রাজবংশেতিহাসের সহিত সংযোগ-সাধক প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। বর্ম্মাদেশ হইতে জয়পালের পুত্র সোমাঙ্গ আসামে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ ইহাকে হস্তিনাপুর নামে আখ্যাত করেন। "সোমাঙ্গ রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হইয়া তগঙ্ বা হস্তিনাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসামের অন্তর্গত বর্ত্তমান নওগঙ জিলার মধ্যবর্ত্তী কপিলি নদীর তীরে হস্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।" এই কথা লিখিয়াই বোধ হয় রাজমালায় ত্রিপুর-রাজদিগের কপিল-তীরে ত্রিবেগ নামক স্থানে প্রথমাধিষ্ঠানের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। তাই এইখানে ত্রিবেগের কথাও এক টু বলিয়া গেলেন:—"এই স্থানই রাজমালার উল্লিখিত কপিল নদীর তীর-সমন্বিত "ত্রিবেগ।" ইহাকেই চৈনিক লেখক Kapily রাজ্য নামে আখ্যাত করিয়াছেন।" এই উক্তিটি কেবল রাজমালা-পক্ষের মনরক্ষার্থই বলিতে হইবে। নতুবা তন্নির্দ্দেশিত "হস্তিনাপুর" উল্লিখিত না হইয়া রাজমালায় কেন 'ত্রিবেগ' উল্লিখিত হইয়াছে এবং ত্রিবেগের বর্ত্তমান সংস্থান ও নাম পরিচয় কি ইত্যাদি কোন বিষয়ের মীমাংসার কথাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না কেন? পাইবেই বা

কেমন করিয়া? হস্তিনাপুরের 'খেয়ালই যে তাঁহার মাথার অনবরত ঘুরিতেছে! এই 'হস্তিনাপুরের' নাম-পরিচয় সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন:—"তখন রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর ছিল। এখনও ঐ স্থানের নাম হস্তিনাপুর।" আমরা কিন্তু বিশ্বকোষ, Cyclopaedia of India, Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India প্রভৃতি কোন প্রামাণিক আভিধানিক গ্রন্থেই নওগঙ প্রাচীন কি আধুনিক কোনকালেই হস্তিনাপুর নামক কোন স্থানের উল্লেখ খুঁজিয়া পাইলাম না।

হস্তিনাপুরের সহিত ত্রিপুর-রাজবংশের যোগ-প্রদর্শন করিবার জন্য বিদ্যাভূষণ-মহাশয় পরিশেষে লিখিয়াছেন:—"ত্রৈপুর রাজ-বিবরণে সকল সময়েই রাজধানী হস্তিনাপুরের উল্লেখ আছে। কালে হস্তিনাপুরের নাম লোকে বিস্মৃত হইলেও, পরবর্ত্তী সকল রাজার অনুশাসনাদিতে রাজধানী হস্তিনাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুর-মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ও গোবিন্দ-মাণিক্যের তাম্রশাসনে রাজধানী "হস্তিনাপুর" ক্ষোদিত আছে। বর্ত্তমানকালে ত্রিপুর-নরেশদিগের সনদ প্রভৃতিতেও রাজধানী হস্তিনাপুরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে বিদ্যাভূষণ-মহাশয় নিজের মত নিজেই খণ্ডন করিতেছেন। তিনি "ত্রৈপুর রাজ-বিবরণে সকল সময়ই হস্তিনাপুরের উল্লেখ আছে" লিখিয়াই "কালে হস্তিনাপুরের নাম লোকে বিস্মৃত" হওয়ার কথা যখন লিখিলেন, তখন ইহা কি স্ববিরোধী কথাই হইল না? রাজমালাকেই সকলে প্রকৃত ত্রৈপুর-রাজ-বিবরণ বলিয়া জানে। তাহাতে কোথায় তো হস্তিনাপুরের উল্লেখ নাই। তবে ত্রৈপুর রাজ-বিবরণে সকল সময়েই হস্তিনাপুরের উল্লেখ থাকার কথা কি করিয়া সত্য হয়? পরবর্ত্তী রাজাদিগের অনুশাসনাদিতে হস্তিনাপুরের উল্লেখ-সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে যাইয়া তিনি ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণের কথা বলিয়াছেন। যে বংশ তাঁহারই প্রমাণ-মতে ১২০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন, তাহার ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণকে কি প্রাচীন প্রমাণ বলা যায়?

এতদপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণের অভাব সম্বন্ধে তিনি কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন? কেবল বিস্মৃতিই কি ইহার যথেষ্ট কারণ হয়? রাজমালায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ত্রিপুর-রাজের উপস্থিত হওয়ার বিবরণ আছে। এই যোগের দৃঢ়তা-সম্পাদনকল্পে যে, হস্তিনাপুরের সহিত পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরার দলিল-পত্রে, হস্তিনাপুরের যোগ কল্পিত হয় নাই কে বলিতে পারে? এই যোগটী রাজমালার রচনা শেষ হওয়ার পরেই যে পরিকল্পিত, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই রাজমালার কোথায়ও যুধাক্করেও হস্তিনাপুরের কোন উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ পরবর্ত্তীকালেও সনন্দাদিতে হস্তিনাপুরের উল্লেখ বরঞ্চ একটী official formality বা রাজকীয় রীতিরূপেই প্রতীয়মান হয়। তাহাতেই এতৎসম্বন্ধে সাধারণ কোন জনশ্রুতিই প্রচলিত দেখা যায় না। দলিলাদিতে হস্তিনাপুর নাম থাকার কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া বাবু কৈলাসচন্দ্র ত সিংহ মনে করেন না। তিনি লিখিয়াছেন:—হস্তিনাপুর চন্দ্রবংশের পরিচায়ক॥"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঐতিহাসিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

অবতার

২

১৮৪—সালে, গ্রীষ্মের শেষভাগে, ফ্লরেন্স-নগরে আসিয়া পড়িলাম। আমার হাতে কিছু সময় ছিল, কিছু অর্থ ছিল, আর কতকগুলি সুপারিস-পত্র ছিল। আমি তখন খোষ-মেজাজী যুবাপুরুষ; আমোদ ভিন্ন আর কিছুই চাইতাম না! আমি এক পান্থশালায় আড্ডা করিলাম, একটা ফিটেন গাড়ী ভাড়া করিলাম। বিদেশীর কাছে যার একটা মোহ আছে, আকর্ষণ আছে—এখানকার সেই নাগরিক জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। প্রাতঃকালে দেখিতে যাইতাম কোন গির্জ্জা, কোন রাজপ্রাসাদ, কোন চিত্র-শালা বেশ ধীরেসুস্থে,—কিছুমাত্র ত্বরা না করিয়া। আর্টের অতিভোজনে, আমার ভিতরে আর্টের অগ্নিমান্দ্য আনিতে দিই নাই। যে-সব ভ্রমণকারীরা ওস্তাদের হাতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রচনা তাড়াতাড়ি দেখিতে চায়, তাদের প্রায়ই শেষে আর্টে অরুচি ও বিতৃষ্ণা জন্মে। আমি কখন এটা, কখন ওটা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু একদিনে একটার বেশী দেখিতাম না। তারপর কোন হোটেলে আসিয়া, প্রাতর্ভোজনস্বরূপ এক পেয়ালা বরফে-জমানো কাফি খাইতাম, চুরোট ফুঁকিতাম, খবরের কাগজগুলায় চোখ বুলাইয়া যাইতাম, এবং পাশের দোকানে সুন্দরী ফুল-ওয়ালীর হাতের রচিত একটি ছোট পুষ্পগুচ্ছ ক্রয় করিয়া কোর্ত্তার বোদামের ছিদ্রে তাহা গুঁজিয়া, দিবানিদ্রা সেবনের জন্য বাড়ী ফিরিতাম। "ক্যাসিনে"তে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বেলা ৩টার সময় আমার গাড়ী আসিয়া হাজির হইত। আমি "ক্যাসিনেতে" যাইতাম। প্যারিস্-নগরে যেরূপ সৌখীন বেড়াইবার স্থান "বোয়া-দে-বুলং", ফ্লরেন্স নগরে সেইরূপ "ক্যাসিনে"। শুধু তফাৎ এই, এখানে সকলেই পরস্পরকে চেনে। সেইখানে একটা গোলাকার পরিসরের মধ্যে অনাবৃত আকাশ-তলে, একটা যেন বড় রকমের বৈঠকখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং আরাম-কেদারার বদলে কেবল বহুতর গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ীগুলা সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে অর্দ্ধচক্রাকারে। জাঁকালো বেশভূষায় ভূষিতা মহিলাগণ গাড়ীর গদীর উপর অর্দ্ধশায়িত থাকিয়া স্বকীয় প্রণয়ীদিগকে, প্রণয়-পার্থীদিগকে, ফুল-বাবুদিগকে, বিদেশী রাজদূতদিগকে আদর অভ্যর্থনা করেন। এবং ঐ সকল লোক গাড়ীর পায়-দানীতে টুপি রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আপনিও ত একথা জানেন যে,—সায়াহ্নে যেরূপ আমোদ-প্রমোদ হইবে, তাহার মৎলব ঐখানেই আঁটা হয়, ঐখানেই সঙ্কেতস্থানের নির্ণয় হয়। ঐখানেই পরস্পরের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, পরস্পরের মধ্যে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ হয়। এ একরকম প্রমোদ-বাজার বলিলেও

হয়। সুন্দর বৃক্ষচ্ছায়ায়, অতীব রমণীয় আকাশতলে, বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এই বাজার বসে। যার একটু অবস্থা ভাল, তার এখানে প্রতিদিন একবার না আসিলেই নয়—আসিতে যেন সে বাধ্য। আমিও এই নিয়মের অন্যথা করিতাম না। তারপর সায়াহ্নে ভোজনের পর, কোন বিদুষী নারীর বৈঠকখানায়, কিংবা কোন ভাল গায়িকার গান শুনিবার জন্য "পের্গোলা" নাট্যশালায় যাইতাম।

এইরূপে আমার জীবনের কয়েক মাস অতি সুখে কাটিয়াছিল; কিন্তু এই সুখের দিন স্থায়ী হইল না। একদিন একটা খুব জাঁকালো খোলা গাড়ী ক্যাসিনেতে আসিয়া দাঁড়াইল; গাড়ীটা বার্ণিসে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, উহার গায়ে কুলমর্য্যাদাসূচক চিহ্ন অঙ্কিত; গাড়ীতে দুই তেজী ঘোড়া যোতা। অশ্বযুগলের তাঁবার সাজ। সহিস-কোচমানের জাঁকালো উর্দ্দিপোষাক; গাড়ী-দরজার হাতল হইতে যেন বিজলি ছুটিতেছে। সকলেরই দৃষ্টি ঐ জাঁকালো গাড়ীটার উপর নিবদ্ধ। বালু-ভূমির উপর একটা সুবক্র রেখা কাটিয়া গাড়ীটা অন্য গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতেই পারিতেছেন, গাড়ীটা খালি ছিল না; কিন্তু গতির দ্রুততা বশতঃ আর কিছুই ঠিক লক্ষ্য হইতেছিল না—কেবল, সাম্‌নের গদির উপর একযোড়া ক্ষুদ্র বুট্-জুতা প্রসারিত,—শালের একটা বৃহৎ ভাঁজ, এবং মাথার উপর সাদা রেশমের ঝালোর-ওয়ালা একটা ছাতা—ইহাই কেবল দেখা যাইতেছিল। ছাতাটা এইবার বন্ধ হইল, আর অমনি, একটি অনুপমা রূপবতী নারী চারিদিকে সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া লোকের নয়নপথে পতিত হইল। আমি অশ্বারূঢ় ছিলাম। তাই বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ নারী-রচনার কোন খুঁটিনাটিই আমার চোখ্ এড়ায় নাই। রূপালি সবুজশাড়ী, সবুজ হইলেও ধবধবে মুখের রং-এর পাশে কালো বলিয়া মনে হইতেছিল। জরির ফুল-কাটা সাদা রেশমের একটা বড় ওড়নার ছোট ছোট ভাঁজে ভিতরের পরিচ্ছদ আবৃত রহিয়াছে। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে একটি সোনার বালা; এবং সেই হাতে রমণী, ছাতার হস্তি-দন্তের হাতলটি ধরিয়া আছে।

"কাপুড়-দোকানদারের মতো আমি যে বেশভূষায় এই সব খুঁটিনাটি বর্ণনা করিতেছি, ডাক্তার-মশায়, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করবেন; কেননা প্রেমিকের চোখে এই সব ছোটখাটো স্মৃতির গুরুত্ব খুবই বেশী। তার ললাটদেশ তুষার-শুভ্র; তার নেত্রপল্লবের দীর্ঘ পক্ষ্ম-রাজিতে তার নীলাভ চক্ষু অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন। —যে গোলাপ কোকিলের প্রেমালাপে বা প্রজাপতির চুম্বনে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠে সেই সঙ্কোচ-নম্র সুকুমার সাদা গোলাপের ন্যায় তার পেলব গালদুটি। কোন মানব চিত্রকরের পক্ষে তার মুখবর্ণের নকল করা অসম্ভব; তার মাধুর্য্য, তার অপার্থিব স্বচ্ছতা —তার সুকোমল আভা আমাদের স্থূল শরীরের রক্ত হইতে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যা কিছু আভাস পাওয়া যায় সে কেবল তরুণ অরুণ-রাগের মধ্যে, কিংবা কোন স্বচ্ছ গোলাপীবস্ত্রাবৃত অমল-ধবল পাষাণ-প্রতিমা হইতে বিচ্ছুরিত রমণীয় বর্ণের আভায়।

"রোমিও যেমন জুলিয়েটকে দেখিয়া রোজালিণ্ডকে ভুলিয়াছিল সেইরূপ আমি, সৌন্দর্য্যের চরম-উৎকর্ষ এই নারীমূর্ত্তি দেখিয়া আমার পূর্ব্বকার সমস্ত প্রেম-ভালবাসা বিস্মৃত হইলাম। আমার হৃদয়-গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিতে পূর্ব্বমুদ্রিত সমস্ত অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া যেন একেবারে সাদা হইয়া গেল। সচরাচর লঘুহৃদয় যুবাদিগের ন্যায় কেমন করিয়া আমি পূর্ব্বে ইতর নারীদিগের রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, এখন তাহা বুঝিতেই পারিতেছি না। আমার মনে হইতে লাগিল আমার অন্তর্দেবতার যেন আমি অবমাননা করিয়াছি। এই প্রাণঘাতী সাক্ষাৎকার হইতে আমার জীবনে নূতন দিনের আরম্ভ হইল।

"দীপ্তিময়ী নারী-মূর্ত্তিকে লইয়া গাড়ীখানা "ক্যাসিনে" ছাড়িয়া, আবার সহরের রাস্তা ধরিল। আমার ঘোড়া লইয়া আমি এক তরুণবয়স্ক রুস্ ভদ্রলোকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ইনি একজন সৌখীন ভ্রমণকারী, য়ুরোপের সমস্ত নগরের সৌখিন মজলিসে ইঁহার খুব গতিবিধি আছে—বড় ঘরের লোকেদের ইতিহাস ইনি সমস্তই অবগত আছেন। ইঁহার নিকটে আমি এই বিদেশিনীর কথা পাড়িলাম। কথায় কথায় জানিলাম ইনি কৌনটেস্ প্রাস্কোভি লবিন্স্কা; ইনি লুগানিয়া-বাসিনী, মহদ্‌বংশোদ্ভবা ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহার স্বামী কাকেশিয়া প্রদেশে দুই বৎসর হইতে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

আপনাকে বলা বাহুল্য, কৌন্‌টেসের দর্শন লাভের জন্য আমার অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; কেননা স্বামী প্রবাসে থাকায় তিনি কাহারও সহিত বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ করিতেন না। যাহা হউক আমি অবশেষে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইলাম। রাজ-পরিবারের দুই চারজন বৃদ্ধা বিধবা ও চারজন বৃদ্ধা ব্যারন্ পত্নী আমার হইয়া জবাবদিহী গ্রহণ করিলেন।

"কৌণ্টেস্-লাবিন্স্কা একটা জম্‌কালো বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন—প্রাচীন প্রাসাদ,—ফ্লোরেন্স হইতে তিন মাইল দূরে। প্রাচীন প্রাসাদের কঠোর গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কৌণ্টেস আরামপ্রদ সমস্ত আধুনিক সাজসজ্জা ও আসবাবে বাড়ীটিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সেকালের লোহার পতর-মারা বড়বড় দরজা একালের সূচাগ্র খিলানের সহিত বেশ মানানসইভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে; আরাম-কেদারা ও সেকেলে ধরণের আসবাব সকল, কাঠের কারুকার্য্যে কিংবা ম্লানাভ 'ফ্রেস্‌কো'-চিত্রে আচ্ছন্ন দেওয়ালের সহিত বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। কোন নূতন-টাট্‌কা বা উজ্জ্বল রঙে চক্ষু পীড়িত হয় না; এককথায় বর্ত্তমান, অতীতের সহিত মিলিত হইয়া একটুও বেসুরো বাজিতেছে না।

"যেমন আমি কৌণ্টেসের দীপ্তিময়ী সৌন্দর্য্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম তেমনি আবার কয়েকবার দর্শনলাভের পর তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আরও বিস্ময়স্তম্ভিত হইলাম। ওরূপ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতঃ-প্রসারিণী বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। যখন তিনি কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকেন তখন যেন তাঁর সমস্ত আত্মা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখা দেয়। অন্তঃপ্রভ কোন

দীপের আলোকে আলোকিত অমল-ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরের ন্যায় তাঁর বর্ণের শুভ্রতা। কবি দান্তে স্বর্গের শোভাসৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার সময় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁর বর্ণের আভায় 'ফস্‌ফরিক' স্ফুলিঙ্গচ্ছটা ও আলোক-কম্পন যেন পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় যেন কোন দেবী স্বর্গলোক হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছেন। আমার চোখ্ ঝলসাইয়া গেল; আমি আত্মহারা ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তাঁহার সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের মধুর সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া, উত্তর দেওয়া যখন নিতান্ত আবশ্যক হইত তখন আমি থতমত খাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে করিতে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলিতাম, তাহাতে আমার বুদ্ধি-সম্বন্ধে তাঁর খুব হীন ধারণাই হইত সন্দেহ নাই। কখন কখন আমার থতমত ভাব ও নির্ব্বুদ্ধিতার কথা শুনিয়া একটি গোলাপ-রক্তিম আলোকরশ্মির ন্যায় তাঁর সুন্দর ওষ্ঠাধরের উপর সুহৃৎ-সুলভ সদয় উপহাসরঞ্জিত মৃদুমধুর একটু হাসির রেখা অলক্ষিতে দেখা দিত।

"আমার প্রেমের কথা এখনো পর্য্যন্ত আমি বলি নাই; তাঁহার সম্মুখে আমি চিন্তাহীন, বলহীন, সাহসহীন হইয়া পড়িতাম; আমার বুক ধড়াস ধড়াস করিত, যেন হৃৎপিণ্ডটা আমার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয়রাণীর পদতলে গিয়া লুটাইয়া পড়িবে। কতবার উহাঁর নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু একটা অনিবার্য্য ভীরুতা আসিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিল। তাঁহার মুখে আমার প্রতি একটু ঔদাস্য বা অপ্রসন্ন ভাব কিংবা একটু ঢাকাঢাকির ভাব লক্ষ্য করিলে আমার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া যাইত, অথবা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত। কিছুই না বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িতাম; বাহির হইবার সময় দরজা যেন হাতড়াইয়া পাইতাম না, মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতাম।

"বাহির হইয়া আসিবার পর আমার বুদ্ধি-বৃত্তি যেন আবার ফিরিয়া আসিত এবং তখন প্রজ্বলন্ত প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিতাম, খুব আবেগের সহিত আমার অনুপস্থিত হৃদয়-পুত্তলীর নিকট আমার শত শত প্রেমের নিবেদন জানাইতাম। এই সব হৃদয়-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার পর মনে হইত, এইবার বুঝি আমার রাণী স্বর্গ হইতে আমার নিকটে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন; তখন দুই বাহু দিয়া কতবার তাঁকে আমার বক্ষের উপর আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"কোণ্টেস্ আমার মনকে এতটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, যে "প্র্যাস্‌কোভি লাবিন্‌স্কা" এই নামটি আমি মন্ত্রের মত দিবারাত্র জপ করিতাম। এই নামে যে কি অপূর্ব্ব সুধা আছে তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। জপ করিবার সময় "প্রাস্কোভি লাবিনস্কা" এই নামটি কখন বা মুক্তা দিয়া, কখনো বা ধীরে ধীরে পুষ্পমালার আকারে গাঁথিতাম, কখন বা ভক্তসুলভ বাক্য-প্রচুর অসংযত ভাষায় ঐ নাম তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতাম। আবার কখন কখন উৎকৃষ্ট কাগজের উপর, নানাপ্রকার চাঁদ ও বর্ণের

রেখা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাঁহার নাম সুন্দর করিয়া লিখিতাম, তারপর ঐ লিখিত নামের উপর বার বার আমার লেখনী বুলাইতাম। কোণ্টেসের সহিত আবার যতক্ষণ না সাক্ষাৎ হইত ততক্ষণ এই সুদীর্ঘ বিরহ-কাল এইরূপেই কাটাইতাম। আমি পুস্তকপাঠে কিংবা কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। প্রাস্কোভি ছাড়া আর আমার কোন বিষয়েই ঔৎসুক্য ছিল না, এমন কি দেশ হইতে যে চিঠিপত্র আসিত, তাহা না খুলিয়াই ফেলিয়া রাখিতাম। অনেক বার এই অবস্থা হইতে বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করিয়াছিলাম, ভাল বাসিয়াই তুষ্ট ছিলাম, ভালবাসার কোন প্রতিদান চাহি নাই, শুধু তাঁর গোলাপরক্তিম অঙ্গুলীপ্রান্ত, আমার ওষ্ঠযুগল আল্‌গোচে যদি একটিবার চুম্বন করিতে পারে, ইহাই আমার চূড়ান্ত বাসনা ও স্বপ্নের জিনিস ছিল, ইহার অধিক আশা করিতে আমি সাহসী হই নাই। মধ্যযুগে ভক্তেরা "ম্যাডোনার" নিকট নতজানু হইয়া যেরূপ একান্তমনে ভক্তিভরে পূজা করিত, তাহা অপেক্ষা আমার এই পূজা-অর্চ্চনা কোন অংশেই কম ছিল না।"

ডাক্তার শের্‌বোনো, অক্টেভের কথা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতে ছিলেন। কেন না, তাঁর নিকট অক্টেভের এই আত্ম-কাহিনী শুধু একটা রোম্যাণ্টিক গল্প নহে। অক্টেভের কথার বিরাম হইলে, ডাক্তার মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছিলেন, "যা দেখ্‌ছি, এ'তো স্পষ্ট প্রেম-বিকারের লক্ষণ; এ এক অদ্ভুত রোগ, কেবল একবার মাত্র এই রকম রোগ আমার হাতে এসেছিল; চন্দননগরে এক ডোম্-রমণী কোন ব্রাহ্মণের প্রেমে পড়ে, বেচারী সেই প্রেম-রোগেই মারা যায়; কিন্তু সে ছিল অসভ্য বুনো, আর ইনি হচ্চেন সভ্যজাতীয় লোক, আমি নিশ্চয়ই এঁকে ভাল করতে পারব।" এই অবান্তর চিন্তাটা থামিয়া গেলে, ডাক্তার হাতের ইসারায় অক্টেভকে আবার আত্মকাহিনী আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। তারপর পা ও হাঁটু দুম্‌ড়াইয়া, হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া ফড়িং-এর মতো পা মেলিয়া ডাক্তার অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। যদিও এই ভাবে বসা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু মনে হয় বসিবার এই ভঙ্গীই ডাক্তারের বেশ অভ্যস্ত।

অক্টেভ আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—

"আমার এই গুপ্ত মনোবেদনার খুঁটিনাটি বর্ণনা করিয়া আর আপনাকে বিরক্ত করিব না। একদিন, কোণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অদম্য বাসনা দমন করিতে না পারিয়া, আমি যে সময়ে সচরাচর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম, তাহার কিছু আগেই গেলাম, সে সময়ে দিনটা ঝোড়ো ও বাষ্পভারাক্রান্ত ছিল। আমি রাণীকে তাঁর বৈঠকখানায় দেখিতে পাইলাম না। পাতলা পাতলা থামে পরিধৃত দ্বার প্রকোষ্ঠে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, উহার সম্মুখেই একটা অলিন্দ; এই অলিন্দের উপর দিয়া উদ্যানে নামিতে হয়। তিনি তাঁর পিয়ানো, একটা কৌচ ও খানকয়েক বেতের চৌকি ঐখানে আনাইয়াছিলেন। থামের মাঝেমাঝে গঠিত ইষ্টক-বেদিকার উপর সুরভি-কুসুমে পূর্ণ কতকগুলি জম্‌কালো ফুলদানী রহিয়াছে

এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে দমকা বাতাস আসিয়া সৌরভে পরিসিক্ত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে। তাঁহার সম্মুখে স্তম্ভশ্রেণীর ফাঁকের মধ্য দিয়া উদ্যানের ছোটো ছোটো ঝোপের বেড়া দেখা যাইতেছে। শতবর্ষবয়স্ক কতকগুলা ঝাউ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; ইতস্তত সুগঠিত পাষাণ-প্রতিমা উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

"রাণী বেতের কৌচে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একাকী ছিলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! এমন সুন্দরী এর পূর্ব্বে আমি এঁকে কখনই দেখি নি; শরীরে একটা এলানো ভাব, গরমে যেন অবসন্ন। ভারতের শুভ্র স্বচ্ছ মস্‌লিন বস্ত্রে আবৃত—যেন সাগরের অপ্সরা সাগরের ফেনপুঞ্জে পরিস্নাত; পরিচ্ছদের কিনারায় যেন তরঙ্গের রজত-ঝালর দীপ্তি পাইতেছে। একটি ইস্পাতের ব্রোচে এই স্বচ্ছ লঘু পরিচ্ছেদ বক্ষের উপর আটকানো রহিয়াছে, এবং এই পরিচ্ছদ পদতল পর্য্যন্ত লুটিয়া পড়িয়াছে। ফুলের পাপড়ীর ভিতর হইতে ফুলের মত,অমল ধবল বাহুযুগল জামার আস্তিন হইতে বাহির হইয়াছে। কোটিদেশ একটি কালো ফিতায় বদ্ধ—ফিতার প্রান্ত নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—পায়ে বিচিত্র রেখায় অঙ্কিত নীল চর্ম্মের একযোড়া ছোট চটিজুতা; —পদতলের পরিচ্ছদের ভাঁজ হইতে উহার ছুঁচালো বক্র মুখ বাহির হইয়া রহিয়াছে।

"রাণী বই পড়ছিলেন, আমাকে দেখে পাঠ বন্ধ করলেন। এবং একটু মাথা নাড়িয়া ইসারায় আমাকে বস্‌তে বল্‌লেন। রাণী একাকী ছিলেন; এইরূপ অনুকূল অবস্থা বড়ই দুর্লভ। তাঁর সম্মুখেই একটা আসনে আমি বস্‌লাম। কয়েক মিনিটকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে একটা গভীর নিস্তব্ধতা ছিল। এই নিস্তব্ধতার দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি বড়ই কষ্টকর। কথোপকথন-সুলভ সাদামাটা কথাও আমার মুখে যুগাইল না; আমার মাথা যেন ঘুলিয়ে গেল; আমার হৃৎপিণ্ড থেকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে যেন আমার চোখে এসে দেখা দিল। তখন আমার প্রেমিক হৃদয় আমাকে বল্‌লে, "দেখো, এই পরম সুযোগ হারিয়ো না।"

কি করেছিলাম আমি জানি না—হঠাৎ দেখি রাণী আমার কষ্টের কারণ বুঝতে পেরে কৌচের উপর একটু উঠে বসে', তাঁর সুন্দর হাতটি বাড়িয়ে ইঙ্গিতে যেন আমার মুখ বন্ধ করতে বোল্লেন।

"একটি কথাও বোলো না অক্টেভ্; তুমি আমাকে ভালবাস—আমি জানি, আমি বেশ অনুভব করি, আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু আমি তা চাই না, কারণ ভালবাসা ইচ্ছাধীন নয়। অন্য রমণী যারা আমা অপেক্ষা কঠোর, তোমার উপর হয়ত রাগ করবে; কিন্তু আমি তোমাকে ভাল বাস্‌তে পারিনে বোলে, আমার কেবল দুঃখ হয়, এইমাত্র। আমি তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছি—এইটিই আমার দুঃখ। আমার সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে বোলে আমি দুঃখিত—না দেখা হলেই ভাল হত। কি কুক্ষণেই আমি ভেনিস্ ত্যাগ করে ফ্লরেন্‌সে এসেছিলাম। প্রথমে আমি আশা করেছিলাম, তোমাকে ক্রমাগত উপেক্ষার ভাব দেখালে, যদি তুমি দূরে চলে যাও। কিন্তু আমি জানি প্রকৃত ভালবাসা—যার সমস্ত

চিহ্ন আমি তোমার চোখে দেখতে পাই—সেই প্রকৃত ভালবাসা কোন বাধাই মানে না, কিছুতেই দমে না। কিন্তু আমার অন্তঃকরণ এই কোমল ভাব, তোমার মনে যেন কোন বিভ্রম উৎপন্ন না করে, কোনও স্বপ্ন জাগিয়ে না তোলে। তোমার প্রতি অনুকম্পা করচি বলে মনে কোরো না তোমার প্রেমে আমি উৎসাহ দিচ্চি। এক জ্যোতির্ম্ময় দেবদূত, আমাকে সমস্ত প্রলোভন থেকে সর্ব্বদাই রক্ষা করচেন—তিনি ধর্ম্ম হতেও শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্য হতেও শ্রেষ্ঠ, পুণ্য হতেও শ্রেষ্ঠ,—আর সেই দেবদূতই আমার প্রাণেশ্বর:—কোণ্ট লাবিন্‌স্কাকে আমি দেবতার মত পূজা করি। আমার সৌভাগ্য এই যে, যিনি আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা, তাঁর সঙ্গেই আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।"

"এই অকপট আন্তরিক পতি-ভক্তির কথা শুনে আমার চোখে জল এল; আর সেইসঙ্গে আমার জীবনের মর্ম্মগ্রন্থিটিও যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

"রাণী প্রাস্কোভি আমার কষ্টে বিচলিত হয়ে, নারীজনসুলভ স্নেহ-মমতার বশে নিজের সুরভি রুমালখানি আমার চোখের উপর বুলিয়ে দিলেন। আর বল্‌লেন—"ছি, কেঁদো না। আর কোন বিষয় ভাবতে চেষ্টা কর, মনে কর,আমি চিরকালের মত বিদায় নিয়েছি, আমি মরে গেছি। আমাকে ভুলে যাও। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়াও, কাজ কর, লোকের উপকার কর,সচেষ্ট ভাবে বিশ্বমানবের কাজে যোগ দাও—লোকের সঙ্গে মেশামেশি কর—আর্টের চর্চ্চা কর, কিংবা আর কাউকে ভালবেসে মনকে শান্ত কর।"

"আমি অস্বীকারের ভঙ্গী করলাম। রাণী আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন:—

"তুমি কি মনে কর, আমার সঙ্গে বরাবর এইরূপ দেখাসাক্ষাৎ করলেই তোমার কষ্টের লাঘব হবে? আচ্ছা বেশ, তুমি এসো, আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেখা করব। ভগবান বলেছেন, শত্রুকেও ক্ষমা করবে। তবে, যারা আমাদের ভালবাসে তাদের সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করা ঠিক?—কখনই না। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, বিচ্ছেদই এর অমোঘ ঔষধ। দুই বৎসর কাল পরে, আমরা সহজভাবে, বিনা সঙ্কটে পরস্পরের হস্ত-মর্দ্দন করতে পারব—তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্‌লেন—"অবশ্য, বিনা সঙ্কটে তোমার পক্ষে।"

"তার পর দিনই আমি ফ্লরেন্‌স্ ছাড়লাম, কিন্তু কি জ্ঞানচর্চ্চা, কি দেশ-ভ্রমণ, কি কালের দীর্ঘতা কিছুতেই আমার কষ্টের লাঘব হল না। আমি বেশ অনুভব করচি, আমার মরণ নিকটে। না, ডাক্তার মশায়, আমার মৃত্যুতে আপনি বাধা দেবেন না।"

ডাক্তার বলিলেন—"তারপর রাণীর সঙ্গে আর কি দেখা হয়েছে?" এই কথা বলিবার সময় ডাক্তারের নীলচক্ষু হইতে অদ্ভুত রকমের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। অক্টেভ উত্তর করিলেন—"না,তিনি এখন প্যারিসে আছেন।" এই কথা বলিয়া অক্টেভ ডাক্তারের দিকে হাত বাড়াইয়া একটা নিমন্ত্রণ-পত্র দিলেন। সেই পত্রের উপর লেখা ছিল:—

"আগামী বৃহস্পতিবার প্রাস্কোভি কোণ্টেস্ লাবিন্‌স্কা বন্ধুজনের অভ্যর্থনার্থ গৃহে থাকিবেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রাবণ-রজনী

সেদিন বরষা-রাতি,
ঘনঘোর মেঘে জ্যোৎস্না ডুবেছে, বাতাসে নিবেছে বাতি।
সাঁই-সাঁই করে' গাছের পাতায় থেকে থেকে নামে জল,
কখনো মেঘের আড়ালে ফুটিছে চন্দ্রিকা সুবিমল।
বাতায়ন-পথে মাঠ-ঘাট-বাট যতদূর যায় দেখা—
সকলের 'পরে ছায়া-আলোকের সজল চিত্র-লেখা।
আকাশে কোথা'ও মসীর মতন জমাট মেঘের স্তূপ,
কোথা'ও ধূসর মুক্তাবরণ আলিপনা অপরূপ।
আলোক যেখানে অধিক ফুটেছে সেখানে দুধের বান,
কালো মেঘ-আড়ে চন্দ্রবিম্ব তিলকের উপমান!

একবার ফিরে' চাহিয়া দেখিনু প্রিয়া ঘেঁসে আছে শুয়ে,
কঠিন কেয়ূর বাজিছে পারশে, মুখখানি আছে নুয়ে।
তুলিয়া ধরিয়া বারেক চাহিনু, কি করিল বলি শুন,
নয়নে নয়ন বারেক রাখিয়া দু'হাতে ঢাকিল পুন।
নাকের নোলক দোলাইয়া দিয়া চিবুক পরশি' যবে
কহিলাম, কিবা মানায়েছে তোমা—নোলক পরিলে কবে?
উপহাস ভাবি' নোলক তখনি নাকের ভিতরে গুঁজি'
লাজে মরে' গিয়ে মুখ লুকাইয়ে প্রিয়া রহে চোখ বুঁজি'।
যখনি কিন্তু মুখ-পানে চাই তখনি পড়ে গো ধরা—
চুরি-করে'-চাওয়া চপল নয়ন ভয়ে মুদে' যায় ত্বরা।

এমনি করিয়া অর্দ্ধ-রজনী আলসে-বিলাসে কাটে,
জ্যোৎস্না-রূপসী মেঘগুণ্ঠন খুলিল আকাশ-বাটে।
চরাচর-জোড়া ছায়া-আলো-বোনা মিহিন্ জরীর জাল
অসীম শোভার স্বপনে বাঁধিল ধরণীরে সুবিশাল।
মেঘ-আড়ে যবে জ্যোৎস্না ফুটিয়া সিক্ত ধরণী-মুখ
চুম্বন করে, মনে পড়ে মোর কবেকার সুখদুখ!

শ্রাবণ-নিশীথে নবীনা রাধার প্রাণখানি ধুক্‌ধুক্—
জানিয়াছি কেন ভরি' আছে হেন বাঙালী কবির বুক।
আমারি দেশের আষাঢ়-গগনে নবীন নীরদ-ছায়া,
স্থলে-জলে রচে বরষে-বরষে বৃন্দাবনের মায়া।
গোঠে যায় ধেনু, মাঠে বাজে বেণু—আমারি শ্যামল দেশে—
"চাঁদিনী উঠিলে ফুল্‌টি ফুটিলে কদমতলায় কে সে!"
মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, অভিসার অভিরাম—
যাহারে ঘেরিয়া উছলিছে গীতি যুগ-যুগ অবিরাম,
মুকুল-বয়সী, গোকুলে বসতি, হৃদয়ে পীরিতি-মধু—
রাইকিশোরীর রূপগুণ হরে আমারি কিশোরী-বধূ।

মেঘের আঁধারে সাঝের আঁধার কিছু নাহি চেনা যায়,
প্রদীপ সাজায়ে শাঁখটি বাজায়ে প্রণমে দেবতা-পায়,
বিকালে-কুড়ানো বকুলের রাশ ছিল যা' থালায় ঢালা
তাই নিয়ে সারা সন্ধ্যাটি কাটে গাঁথিয়া দীর্ঘ মালা।
রাধিকারি সখী সে কমল-মুখী কিশোরী বঙ্গবালা,
তাহারি স্নেহের সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ঘরে হয় জ্বালা।
নবনীত জিনি রূপের নিছনি, পুষ্পকেশর কেশ,
কবরী ঘেরিয়া যূথিকার মালা, নীলাম্বরীর বেশ,
মিলনের বুকে বিরহের ভয়, হাসিতে অশ্রু মেশে,
এমন হাসিতে এমন কাঁদিতে কেবা পারে কোন্ দেশে!

বাহিরে ঝরিছে জল অবিরল, বায়ু করে মাতামাতি;
এত কাছে শুয়ে বুকে মাথা থুয়ে তবু ভয় সারারাতি!
কণ্ঠ আমার বেড়িয়া ধরেছে কখন ঘুমের ঘোরে,
অতি সুকোমল, 'নোয়া'-পরা ছোট একটি বাহুর ডোরে।
ঘুমন্ত মুখে ঘোম্‌টা খসেছে, উসুখুসু চুলগুলি
সন্তর্পণে নয়ন হইতে ললাটে দিলাম তুলি'।
কপোলে জ্বলিছে মাণিকের মত কাণের রতন-দুল,
শিথানে পড়েছে কখন খসিয়া খোঁপার দু'চারি ফুল।
ঈষৎ-ভিন্ন অধর-পাতায় হাসিটি করিছে খেলা,
মুদিত চোখের পাপ্‌ড়ি-কিনারে স্বপন-শোভার মেলা!

বারেক চাহিনু আকাশের পানে, বারেক ধরণী-পানে,
সঘন-বরষা ঘনায় আবার, ঘন চিকুর হানে।
একটু জ্যোৎস্না খসিয়াছে শুধু কোন্ সে মেঘের ফাঁকে
আমারি ঘরের বালিস-আলিশে, হৃদয়ে ধরিনু তাকে—
শ্রাবণের গান, কবিতার ভাণ সকলি হারা'য়ে গেনু,
বিভোর পরাণে নিমীল-নয়ানে চুমিয়া সকলি পেনু।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বারোয়ারি উপন্যাস

৯

ক্ষিতীশ অনেক কষ্টে সেদিন হরেন্দ্রকে আবিষ্কার করে', নিজে সঙ্গে করেই তাকে বাসায় নিয়ে এসেছিল; হরেনকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে, চায়ের একটু আয়োজন করবার জন্যে সে নীচেই রইল।—ঠাকুর, চায়ের জল তৈরি আছে? নেই? কেৎলিটা চড়িয়ে দাও চট্ করে'। ক' পেয়ালা জল চড়াবে? চড়াও চার পাঁচ পেয়ালার মতন—আজ একটু শীত আছে। রামা, যা ত, তিনকড়ির দোকান থেকে আধ সের রসগোল্লা নিয়ে আয়—বেশ বড় বড় দেখে, বুঝলি? আর ঐ বড় রাস্তার মোড়ে, ক্যালকাটা হোটেল থেকে খানকতক কেক্-টেক্—এই এক টাকার আন্দাজ, বিস্কুট ত ঘরেই আছে। যাবি আর আসবি—দেরী না হয়।—ইত্যাদি হুকুম জারি করে', ঝিকে দিয়ে পেয়ালা পিরিচ প্লেট ছুরি চামচগুলো সে ধুইয়ে মুছিয়ে চক্‌চকে করে' নিতে লেগে গেল।

দশ মিনিটের মধ্যে সমস্তই প্রস্তুত, চায়ের জলও প্রায় ফুটে এসেছে, রামা এখন বাজার থেকে ফিরলেই হয়। ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় ক্ষিতীশ পায়চারি করতে লাগল। দোতালা থেকে মাঝে মাঝে হরেনের উচ্চ-হাসির শব্দ আসে, আর তার মুখখানি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। মনে মনে সে ভাবে, দুজনে খুব জমে গেছে, দেখ্‌চি! কমলা আজ আট দিন এখানে রয়েচে, আমার কাছে কোনো দিন কোনো হাসির কথা ত বলেনি। আমার বেলায় কান্না, আর হরেন্‌দার বেলায় হাসি বুঝি! আচ্ছা!

ক্রমে রামা এসে পৌছল। প্লেটে প্লেটে খাবারগুলি সাজিয়ে, চা ঠিক করে' সেগুলি নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে ক্ষিতীশ উপরে গেল। দেখলে, তার বসবার ঘরটিতে হরেন একখানি চেয়ারে বসে' খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে অনর্গল কথা কয়ে যাচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে হাসচে,—কমলা কিছু দূরে একখানি চৌড়া চক্‌চকে বেঞ্চিতে বসে' হরেনের মুখের দিকে চেয়ে তার গল্প শুনচে।

ক্ষিতীশকে দেখেই হরেন দাঁড়িয়ে উঠে সবিনয়ে বল্লে—এই যে, ক্ষিতীশবাবু যে!

আস্তাজ্ঞে হোক্। বসুন, বসুন। ওরে—

হরেনের ভাব-ভঙ্গী দেখে কমলা হেসে ফেল্লে। হরেন বল্লে—কম্‌লি, তুই হাসচিস কেন? ভাবচিস্ হরেন্‌দা এমন ব্যবহার করচেন, যেন ইনিই বাড়ীর মালিক, ক্ষিতীশ বাবু অভ্যাগত। তা, আমার কি জানিস্, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু। অর্থাৎ সবাই যেন আমারই মতন ভূত।—বলে' সে হা-হা করে হাসতে লাগ্‌ল।

ক্ষিতীশ অন্য একখানি চেয়ারে বসে, হাসতে চেষ্টা করে' জিজ্ঞাসা করলে—আপনাদের পরামর্শ কিছু স্থির হল?

হরেন বল্লে—কিসের পরামর্শ?

—এই, এঁর সম্বন্ধে। সকল কথা শুনেচেন ত? এখন এঁর কি করা উচিত.....

হরেন বল্লে—আমি ত খুব ভাল পরামর্শই দিয়েছিলাম ওকে। তা, ও শোনে কৈ? আজকাল, কি জানেন ক্ষিতীশ বাবু, মেয়েরা সব হয়েচে স্বাধীন, ওরা এখন নিজের মতে চল্‌তে চায়।—বলে' হরেন মুখখানি বিষম গম্ভীর করে' বসে রইল।

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে কমলার পানে চাইতেই সে বল্লে—না ক্ষিতীশ বাবু, শুন্‌বেন না ওঁর কথা। আসল বিষয়ে কোনও পরামর্শই উনি আমাকে দেন নি। আমি যত জিজ্ঞাসা করি, হরেন্‌দা, কি হবে কি করব একটা কিছু ঠিক করুন, উনি ততই যত সব আজগুবি আজগুবি প্রস্তাব করেন। আপনার আসবার একটু আগেই উনি বল্‌ছিলেন, কম্‌লি, তুই আর দেশে গিয়ে কি করবি, বিলেত যা। রবি বাবুর বই পড়ে' পড়ে' সাহেবরা এখন খুব বাঙ্গলা শিখে ফেলেচে—বিলেত গিয়ে, হিন্দুরমণীর উচ্চাদর্শ সম্বন্ধে বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়া।—এই রকম এই রকম সব কথা!—বলে' কমলা ঠোঁট দুখানি একটু ফুলিয়ে রইল।

শুনে ক্ষিতীশের গম্ভীর মুখেও একটু হাসি দেখা দিলে। হরেন বল্লে—মন্দ পরামর্শ দিয়েছি ক্ষিতীশ বাবু? আচ্ছা, এটা যদি কম্‌লির মনঃপূত না হয়, আরও প্ল্যান আমার মাথায় আছে.....

এই সময় চা আর তার উপকরণগুলি সে উপস্থিত হল। ক্ষিতীশ বল্লে—আসুন হরেন বাবু, একটু চা খেয়ে নিন, তার পর পরামর্শ হবে।—বলে' দুটি পেয়ালায় সে চা ঢাল্‌তে লাগ্‌ল।

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—কম্‌লি, তুই চা খাবিনে?

ক্ষিতীশ বল্লে—উনি ত চা খান না; বলেন, চা খেলে আমার মাথা ধরে।

হরেন কমলার দিকে চেয়ে বল্লে—চা খাস্‌নে? খাওয়া কিন্তু ভাল, যে ম্যালেরিয়ার দেশে থাকিস্! আচ্ছা, চা না খাস, দুটো রসগোল্লা খাবি আয়। আয়, হাঁ কর্, টুপ করে' মুখে ফেলে দিই। এস, লক্ষ্মী দিদি এস।

কমলা বল্লে—হরেন্‌দা যে কি বলেন তার ঠিক নেই! এখনও উনি আমাকে সেই ছোট্টটি মনে করেন!

হাসি গল্পের মধ্যে চা খাওয়া শেষ হল। তখন প্রায় ছ'টা—শীতকাল, অন্ধকার হয়ে এসেচে। ক্ষিতীশ এতক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেচে যে হরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে' কমলা যে একটা কিছু ঠিক করে' নেবে,

তার আশা নেই, কারণ হরেন ওর সকল কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়। তাকেই সে কাজ করতে হবে। আর, পরামর্শ টা কমলার অসাক্ষাতে হওয়াই ভাল। তাই সে প্রস্তাব করলে—চলুন হরেন বাবু, গড়ের মাঠে গিয়ে একটু বেড়ানো যাক্। সেই খানেই ভেবে চিন্তে একটা কিছু পরামর্শ স্থির করা যাবে।

হরেন বল্লে—ক'টা বেজেচে? ছ'টা প্রায়। আচ্ছা চলুন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ক্ষিতীশের মোটর গাড়ী আস্তাবল থেকে এসে, বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করে উঠল।

মনুমেণ্টের কাছে পৌঁছে, গাড়ী রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজনে মাঠে প্রবেশ করলে। কিছুদূর যেতেই, একটা গাছের তলায় একখানি খালি বেঞ্চি পাওয়া গেল। দুজনে তাতে বসে' কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলে।

ক্ষিতীশ বল্লে—হরেন বাবু, আপনি কমলার গ্রামের লোক। ওঁর বাপ-মাকেও জানেন, গ্রামের লোকদেরও জানেন। এই আট-দশ দিন নিরুদ্দেশ থাকার পর, আপনি যদি ওঁকে নিয়ে গিয়ে দেশে রেখে আসেন, তা হলে কি রকম হয় বলুন দেখি?

হরেন বল্লে—বড় সুবিধে হয় না। দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করবে, এতদিন ও ছিল কোথায়? ওকেও জিজ্ঞাসা করবে, আমাকেও করবে। ওর বাবাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করবার সময় আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন, ঠিক তাই হবে।

ক্ষিতীশ বল্লে—তা হলে উপায় কি এখন? ওঁর স্বামীকে চিঠি লিখে এখানে আনানো যাবে?

হরেন প্রায় এক মিনিট কাল চুপ করে' থেকে বল্লে—তিনি এসে দেখ্‌বেন, তাঁর ষোল বছর বয়সের সুন্দরী স্ত্রী, রয়েচে একজন যুবাপুরুষের বাসায়, সেখানে আর কোনও মেয়েছেলে ত নেই-ই, তার কোনও পুরুষ আত্মীয়-অভিভাবকও নেই। এক আধ ঘণ্টা নয়—দশ বারো দিন.....

ক্ষিতীশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—ঐটে বড্ড ভুল হয়ে গেচে।

—তা হয়েচে। প্রথমে যা ভেবেছিলেন, মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে যদি নিয়ে যেতেন, তা হলে আর এই সমস্যাটি উপস্থিত হত না।

—তখন ও কথাটা আমার মোটেই মাথায় আসেনি, হরেন বাবু। আমি ভাবলাম, ভদ্রঘরের মেয়েকে নেহাৎ হাসপাতালের ইন্‌ডোর পেশেণ্ট করে' দেওয়াটা, বিশেষ ঐ ছেলেমানুষ...

—সে ত নিশ্চয়। আপনি তখন যে দিক্ থেকে দেখেছিলেন, ঠিকই দেখেছিলেন। কিন্তু.....সে যাক্, এখন আর অনুশোচনায় ফল কি?

কিছুক্ষণ ধরে দুজনে নানা রকম উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলে, কিন্তু কোনটাই মনোমত হল না; একটা একটা করে' সবগুলোকেই বাতিল করে' দিতে হল।

তার পর কিছুক্ষণ দু'জনে নীরবে বসে' রইল।

শেষে হরেন বল্লে—দেখুন, আপনি আর আমি, দু'জনে পরামর্শ করে' এর কোনও কূলকিনারা পাব না। এই পরামর্শের মধ্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আনা আবশ্যক।

—কে সে তৃতীয় ব্যক্তি?

—আমাদের মৈত্র মশায়—কমলার বাপ। বিশেষ জরুরী কাজ আছে বলে'—আর কিছু না বলে'—চিঠি লিখে তাঁকে আনাই। তিনি এলে, সব কথা তাঁকে খুলে' বলি। তিনি বাপ ত, নিজের সন্তানকে তিনি ত ভাল রকমই জানেন, তাঁর মেয়ে যে কোনও অন্যায় করেচে, এ সন্দেহ, আশা করি, তাঁর মনে কখনই হবে না। বাকী থাকে গ্রামের লোক —সমাজ। কি উপায় অবলম্বন করলে, তাদের নখ-দন্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারা যায়, সে পরামর্শ আমরা তাঁরই সঙ্গে করি আসুন।

ক্ষিতীশ কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে বল্লে—এ পরামর্শ মন্দ নয়, বিশেষ যখন এ ছাড়া অন্য কোনও পথ এখন নজরে আসচে না। কিন্তু আপনি তাঁর কাছে যতটা উদারতা আশা করচেন, সেটা কি বেশী হচ্চে না? মনে রাখবেন, তিনি সেকেলে লোক। ইংরেজিওয়ালা নন, চাণক্যশ্লোকওয়ালা। 'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যো স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' স্কুলের লোক। তার চেয়ে বরং কমলার স্বামীকে বিশ্বাস করানো সহজ হতে পারে যে.....

হরেন বল্লে—কিন্তু আরও একটা দিক ভেবে দেখুন ক্ষিতীশ বাবু। সতীশ বাবু—অর্থাৎ কমলার স্বামী—তিনি দেখবেন প্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে, যার কাচ দুখানি খুব অল্পেই জেলসিতে ঘোলা হয়ে যেতে পারে। বাপ দেখবেন অপত্যস্নেহের চক্ষে—সে চোখ দুটি এমনি যে, খারাপ দিকটে ভাল নজরেই আসে না, ভাল দিকটে খুব উজ্জ্বল হয়েই দেখা দেয়।

ক্ষিতীশ বল্লে—এটা ঠিকই বলেছেন।

—আর, আপনি যা আশঙ্কা করচেন ক্ষিতীশবাবু, মৈত্রমশায় যদি তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে কোনও অন্যায় সন্দেহই করেন, সমাজের ভয়ে তাকে ঘরে না নিয়ে যেতে চান, তখন কমলার স্বামী ত আছেই—তাঁকে খবর দিয়ে আনানো যাবে।

—আচ্ছা, তবে সেই পরামর্শই ভাল। মৈত্র মশায়কে আপনি চিঠি লিখুন। তিনি যতদিন না আসছেন, ততদিন কমলা..... কোথায় থাক্‌বেন?

—আপনার বাসাতেই, যেমন আছে, তেমনিই থাকুক।

শুনে, ক্ষিতীশ একটু স্বস্তিবোধ করলে। কথাটা জিজ্ঞাসা করবার সময় তার মনে একটু ভয়ই ছিল, হয়ত হরেন তার কোনও বন্ধুবান্ধবের পরিবারের মধ্যে কমলাকে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বার প্রস্তাব করবে।

হরেন বল্লে—ক'টা বেজেছে দেখুন ত ক্ষিতীশ বাবু।

ক্ষিতীশ মুখের সিগারেটে জোরে দুই তিন টান দিয়ে, সেই আগুনের কাছে নিজের হাত-ঘড়িটি তুলে বল্লে—পৌনে আটটা।

—তবে এখন ওঠা যাক্, চলুন, ঐ পরামর্শই রইল।—বলে' হরেন দাঁড়িয়ে উঠল। ক্ষিতীশও উঠে, দুজনে আস্তে আস্তে রাস্তায় যেখানে মোট গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দিকে যেতে লাগ্‌ল।

কাছে আসতেই, শোফেয়ার নেমে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল। ক্ষিতীশ বল্লে—হরেন বাবু উঠুন।

হরেন বল্লে—না মাফ্ করবেন, আমায় এখন বাসায় যেতে হবে।

তার আশা নেই, কারণ হরেন ওর সকল কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়। তাকেই সে কাজ করতে হবে। আর, পরামর্শটা কমলার অসাক্ষাতে হওয়াই ভাল। তাই সে প্রস্তাব করলে—চলুন হরেন বাবু, গড়ের মাঠে গিয়ে একটু বেড়ানো যাক্। সেই খানেই ভেবে চিন্তে একটা কিছু পরামর্শ স্থির করা যাবে।

হরেন বল্লে—ক'টা বেজেচে? ছ'টা প্রায়। আচ্ছা চলুন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ক্ষিতীশের মোটর গাড়ী আস্তাবল থেকে এসে, বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করে উঠল।

মনুমেণ্টের কাছে পৌঁছে, গাড়ী রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে, দুজনে মাঠে প্রবেশ করলে। কিছুদূর যেতেই, একটা গাছের তলায় একখানি খালি বেঞ্চি পাওয়া গেল। দুজনে তাতে বসে' কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলে।

ক্ষিতীশ বল্লে—হরেন বাবু, আপনি কমলার গ্রামের লোক। ওঁর বাপ-মাকেও জানেন, গ্রামের লোকদেরও জানেন। এই আট-দশ দিন নিরুদ্দেশ থাকার পর, আপনি যদি ওঁকে নিয়ে গিয়ে দেশে রেখে আসেন, তা হলে কি রকম হয় বলুন দেখি?

হরেন বল্লে—বড় সুবিধে হয় না। দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করবে, এতদিন ও ছিল কোথায়? ওকেও জিজ্ঞাসা করবে, আমাকেও করবে। ওর বাবাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করবার সময় আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন, ঠিক তাই হবে।

ক্ষিতীশ বল্লে—তা হলে উপায় কি এখন? ওঁর স্বামীকে চিঠি লিখে এখানে আনানো যাবে?

[illegible]
থেকে [illegible]
ষোল [illegible]
যুবাপুরুষের [illegible]
মেয়েছেলে [illegible]
আত্মীয়-অভিভাব[illegible]
নয়—দশ বারো দিন[illegible]

ক্ষিতীশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস [illegible] ঐটে বড্ড ভুল হয়ে গেচে।

—তা হয়েচে। প্রথমে [illegible] মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে [illegible] যেতেন, তা হলে আর এই সমস্যাটি [illegible] হত না।

—তখন ও কথাটা আমার [illegible] মাথায় আসেনি, হরেন বাবু। আমি [illegible] ভদ্রঘরের মেয়েকে নেহাৎ হাসপাতালের ইন্‌ডোর পেশেণ্ট করে' দেওয়াটা, বিশেষ [illegible] ছেলেমানুষ...

—সে ত নিশ্চয়। আপনি তখন যে দিক্ থেকে দেখেছিলেন, ঠিকই দেখেছিলেন। কিন্তু.....সে যাক্, এখন আর অনুশোচনায় ফল কি?

কিছুক্ষণ ধরে দুজনে নানা রকম উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলে, কিন্তু কোনটাই মনোমত হল না; একটা একটা করে' সবগুলোকেই বাতিল করে' দিতে হল।

তার পর কিছুক্ষণ দু'জনে নীরবে বসে' রইল।

শেষে হরেন বল্লে—দেখুন, আপনি আর আমি, দু'জনে পরামর্শ করে' এর কোনও কূলকিনারা পাব না। এই পরামর্শের মধ্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আনা আবশ্যক।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অন্যায়
[illegible] তাঁর মনে
[illegible] গ্রামের লোক
[illegible] তাদের
[illegible] পারা যায়, সে
[illegible] করি আসুন।

ক্ষিতীশ কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে বল্লে—এ পরামর্শ মন্দ নয়, বিশেষ যখন এ ছাড়া অন্য কোনও পথ এখন নজরে আসচে না। কিন্তু আপনি তাঁর কাছে যতটা উদারতা আশা করচেন, সেটা কি বেশী হচ্চে না? মনে রাখবেন, তিনি সেকেলে লোক। ইংরেজিওয়ালা নন, চাণক্যশ্লোকওয়ালা। 'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যো স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' স্কুলের লোক। তার চেয়ে বরং কমলার স্বামীকে বিশ্বাস করানো সহজ হতে পারে যে.....

হরেন বল্লে—কিন্তু আরও একটা দিক ভেবে দেখুন ক্ষিতীশ বাবু। সতীশ বাবু—অর্থাৎ কমলার স্বামী—তিনি দেখবেন প্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে, যার কাচ দুখানি খুব অল্পেই জেলসিতে ঘোলা হয়ে যেতে পারে। বাপ দেখবেন অপত্যস্নেহের চক্ষে—সে চোখ দুটি এমনি যে, খারাপ দিকটে ভাল নজরেই আসে না, ভাল দিকটে খুব উজ্জ্বল হয়েই দেখা দেয়।

ক্ষিতীশ বল্লে—এটা ঠিকই বলেছেন।

—আর, আপনি যা আশঙ্কা করচেন ক্ষিতীশবাবু, মৈত্রমশায় যদি তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে কোনও অন্যায় সন্দেহই করেন, সমাজের ভয়ে তাকে ঘরে না নিয়ে যেতে চান, তখন কমলার স্বামী ত আছেই—তাকে খবর দিয়ে আনানো যাবে।

—আচ্ছা, তবে সেই পরামর্শই ভাল। মৈত্র মশায়কে আপনি চিঠি লিখুন। তিনি যতদিন না আসছেন, ততদিন কমলা..... কোথায় থাক্‌বেন?

—আপনার বাসাতেই, যেমন আছে, তেমনিই থাকুক।

শুনে, ক্ষিতীশ একটু স্বস্তিবোধ করলে। কথাটা জিজ্ঞাসা করবার সময় তার মনে একটু ভয়ই ছিল, হয়ত হরেন তার কোনও বন্ধুবান্ধবের পরিবারের মধ্যে কমলাকে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বার প্রস্তাব করবে।

হরেন বল্লে—ক'টা বেজেছে দেখুন ত ক্ষিতীশ বাবু।

ক্ষিতীশ মুখের সিগারেটে জোরে দুই তিন টান দিয়ে, সেই আগুনের কাছে নিজের হাত-ঘড়িটি তুলে বল্লে—পৌনে আটটা।

—তবে এখন ওঠা যাক্, চলুন, ঐ পরামর্শই রইল।—বলে' হরেন দাঁড়িয়ে উঠল। ক্ষিতীশও উঠে, দুজনে আস্তে আস্তে রাস্তায় যেখানে মোট গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দিকে যেতে লাগ্‌ল।

কাছে আসতেই, শোফেয়ার নেমে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল। ক্ষিতীশ বল্লে—হরেন বাবু উঠুন।

হরেন বল্লে—না মাফ্ করবেন, আমায় এখন বাসায় যেতে হবে।

—কমলার সঙ্গে দেখা করে' যাবেন না? পরামর্শ যা হল, তাঁকে ত বলা উচিত।

—আপনিই বল্‌বেন, ক্ষিতীশবাবু। আজ একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে। বাসায় গিয়ে, কাপড় বদলে, সেখানে যেতে এমনিই দেরী হয়ে যাবে। আচ্ছা নমস্কার—বলে' হরেন ট্রামের চৌমাথার দিকে অগ্রসর হল।

ক্ষিতীশ বল্লে—আমার গাড়ীতেই আসুন না। আপনাকে আপনার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাই।

—আপনার ঘুর হবে না?

—হলই বা একটু ঘুর। আসুন।—বলে' ক্ষিতীশ হরেনের হাত ধরে' গাড়ীতে তাকে তুলে দিয়ে, আপনি উঠে বস্‌ল।

গাড়ীতে ক্ষিতীশ হরেনকে বল্লে—দেখুন, চিঠিখানা রেজিষ্ট্রি করে' দেবেন। কারণ সেটা পাড়াগাঁ। পিয়ন কার চিঠি কাকে দেয়, তার ঠিক কি? যতটা সম্ভব, ব্যাপারটা এখন গোপন রাখাই দরকার কি না।

—ঠিক বলেছেন। রেজিষ্ট্রি করেই পাঠাব।

—আর, খামের উপর, ফ্রম্-ট্রম্ কিছু লিখে দেবেন না। রাস্তায় পিয়নের হাত থেকে কে সে চিঠি নিয়ে দেখ্‌বে! মেয়ে-হারাণো মৈত্রী মশায়ের নামে, আমাদের জমিদার-পুত্র হরেনবাবু এক রেজিষ্ট্রি চিঠি লিখেছেন—পাড়াগাঁয়ের লোকেদের কল্পনা-শক্তিটে যে-রকম প্রবল, কি সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয়ে তাই প্রচার করে বেড়াবে তার ঠিক কি? পাড়াগাঁয়ের লোককে ত চেনেন!

বলতে বলতে গাড়ী এসে বউবাজারে হরেনের বাসার সামনে দাঁড়াল। হরেন গাড়ী থেকে নেমে বল্লে—আচ্ছা, ও-সব কিছু লিখ্‌ব না। এখন আসি তা হলে—গুড্-নাইট্।

—গুড্ নাইট্। চালাও।

মোটর গাড়ী গর্জ্জন করে' উঠল।

১০

গাড়ী গলির মোড় পার হয়ে বউবাজারের রাস্তায় এসে পড়ল। ক্ষিতীশের মনে হল—কৈ, হরেনকে ত কাল, কি পর্শু, কি মাঝে মাঝে, আমার বাসায় এসে কমলার খবর নিতে বল্লাম না। ভুল হয়ে গেছে—তা যাক্‌গে। ও আপনিই আসবে'খন—অবসর পেলেই আসবে, বোধ হয়।

গাড়ী বড় রাস্তায় যখন এসেছে, ক্ষিতীশ তখন মনে মনে একটা হিসাব করতে আরম্ভ করেছে। আর ক'দিন? কাল হরেন কমলার বাপকে চিঠি লিখবে—একদিন। তিনি সে চিঠি পর্শু পাবেন—পর্শুই পাবেন কি? পাড়াগাঁয়ের পোষ্ট আপিস, দুই একদিন দেরী হলেও হতে পারে;—কিন্তু জায়গাটাও কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। আচ্ছা, পর্শুই না হয় তিনি চিঠি পেলেন—দু'দিন। তার পর দিন, তিনি সেখান থেকে রওনা হলেন—কলকাতায় এসে পৌঁছলেন—তিন-দিন। তার পর দিন, কমলাকে নিয়ে তিনি—দেশেই হোক আর যেখানেই হোক—চলে গেলেন—চার দিন। সুতরাং, এই চার দিন মাত্র কমলাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তার পর? তার পর—আর কোনো দিন না, এ জীবনে না।—ক্ষিতীশের বুকটি কাঁপিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

পটলডাঙ্গায় নিজের বাসায় পৌঁছে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে খানিক উঠেই ক্ষিতীশ দেখলে, তার বসবার ঘরে কমলা টেবিলের কাছে ঝুঁকে বসে একখানি বই হাতে করে পড়চে। সে সিঁড়ি উঠে বারান্দায় দাঁড়াল—কিন্তু কমলা এত নিবিষ্ট চিত্ত যে, ক্ষিতীশের পায়ের শব্দ তার কাণে গেল না। সমুখে বিদ্যুতের টেবিল-বাতিটি জ্বলছে, আর কমলার মুখে পড়ছে, বাতির উপরকার সবুজ শেডের ভিতর দিয়ে ছেঁকে বেরিয়ে আসা সেই মরকত প্রভাটুকু। সেই কোমল প্রভায়, কমলার মুখখানি বড় শীতল, বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। ক্ষিতীশ মুগ্ধ হয়ে সেই মুখশোভা দেখ্‌তে লাগল। প্রায় আধ মিনিটকাল দেখে, একটি মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বল্লে—আর চার দিন।

ক্ষিতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকতেই কমলা চম্‌কে উঠে, চোখ তুলে, বইখানি টেবিলের উপর ফেলে বল্লে—এসেচেন? হরেন দা কৈ?

এই প্রশ্নে—হরেনদার জন্যে এই আগ্রহে—ক্ষিতীশের মনটি একটু ব্যথিত হল, কিন্তু সে নিজেকে তখনই সামলে নিয়ে বল্লে—তিনি এলেন না। বল্লেন, কোথায় তাঁর নেমন্তন্ন আছে।—বলতে বলতে টেবিলের এধারের একখানি চেয়ার টেনে সে বস্‌ল।

কমলা মুখখানি নীচু করে কি ভাবতে লাগল। শেষে বল্লে—আপনাদের পরামর্শ কিছু ঠিক হল?

—হ্যাঁ, হয়েছে একটা।

পরামর্শ যা হয়েছিল, ক্ষিতীশ সংক্ষেপে তা কমলাকে জানালে।

শুনে কমলা বল্লে—হ্যাঁ, সেই বোধ হয় বেশ হবে। বাবা আসুন—তিনি এলে আর কোনও ভাবনা নেই।

—তিনি রাগ টাগ করবেন না ত?

—রাগ করবেন? আপনাকে তিনি কত আশীর্ব্বাদ করবেন। আপনি না থাকলে, তাঁর মেয়ে কি এতদিন বাঁচত? মরে যেত। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনার উপর তিনি রাগ করবেন? কখনই না।

একটু আগে ক্ষিতীশের মনের সে দুঃখটুকু এই কথাগুলি শুনে ধুয়ে মুছে গেল। কমলার বাপ মার কথা, তার ছোট ভাইটির কথায় দুজনের গল্প বেশ জমে উঠল। গ্রামের লোকের কথার প্রসঙ্গে কমলা বল্লে—চিঠিখানি ভালয় ভালয় এখন বাবার হাতে পৌঁছলে বাঁচি!

ক্ষিতীশ বল্লে—সে কথা আমরা আগেই ভেবেছি। হরেনকে বলেছি, চিঠিখানি রেজিষ্ট্রি করে পাঠাতে।

—রেজিষ্ট্রি চিঠি? কিন্তু কাল ত রবিবার। রবিবারে কি এখানে রেজিষ্ট্রি চিঠি পাঠানো যায়? আমাদের গ্রামের পোষ্ট আপিসে ত নেয় না।

ক্ষিতীশ বল্লে—ঠিক ত। কাল যে রবিবার তা আমাদের কারু খেয়ালই হয় নি। না, কাল রেজিষ্ট্রি চিঠি পাঠানো যাবে না। যাক্—আরও একটা দিন তবু পাওয়া গেল।

শেষের কথাটা বলে ফেলেই ক্ষিতীশের মনে হল—যাঃ, এ কি করলাম? তার মনটি ভারি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

কমলা এক দৃষ্টে ক্ষিতীশের মুখের পানে

চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলে—একটা দিন কি পাওয়া গেল ?

ক্ষিতীশের মাথাটার ভিতরে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সে বল্লে—একটা দিন ? ওঃ—এই—ইয়ে—অর্থাৎ পরামর্শ টরামর্শ করবার জন্যে আরও একটা দিন—

ওঃ—বলে' কমলা একটু যেন সন্দেহের চোখে চেয়ে রইল। ক্ষিতীশ হঠাৎ উঠে বল্লে—উঃ, রাত্রি প্রায় ন'টা বাজে, রোগা মানুষ, আপনার এখনও খাওয়া হল না! রান্নার কি দেরী, দেখি।—বলে' চটপট্ সে নীচে নেমে গেল।

কমলা টেবিলের উপর কুনুই রেখে, গালে হাতটি দিয়ে বসে ভাবতে লাগ্‌ল।

একটু পরে ঝি এল, পাশের ঘরে কমলার জন্যে ঠাঁই করে দিলে। বামুন থালায় করে খাবার বেড়ে নিয়ে এসে সেই ঘরে ঢুকলো। ক্ষিতীশ এসে বল্লে—আপনার খাবার দিয়েচে, যান, খেয়ে নিন—খেয়ে শুয়ে পড়ুন গে।

খাবার ঘরের ও-পাশের ঘরখানিতে কমলার বিছানা। ঝিও সেই ঘরে শোয়। এ কদিন রাত্রে খাবার পরে, কমলা একেবারে সেই ঘরে গিয়ে ঢোকে, এ দিকটায় আর আসে না, ক্ষিতীশের সঙ্গে আর দেখা হয় না।

ক্ষিতীশ বল্লে—খাবার দিয়েচে, যান।

—যাচ্চি।—বলে' কমলা মুখখানি নীচু করে রইল। ঝি এসে বল্লে—দিদিমণি আসুন।

—চল ঝি, যাচ্চি এখনি।

ঝি চলে গেল। কমলা বল্লে—আপনি কখন্ খাবেন ? আপনি কেন আগে খেয়ে নিন না।

—আমার খেতে এখনও দেরী আছে। এই ত সবে ৯টা। আপনি রোগা মানুষ, আপনি দেরী করবেন না। যান, লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে।

—যাই।

কমলা মুখে বল্লে যাই, কিন্তু উঠল না। মুখখানি নীচু করে' কি ভাবতে লাগ্‌ল! তার পর হঠাৎ মুখ তুলে বল্লে—আপনি—একটি—অধিকার আমায় দেবেন ?

—কি, বলুন।

—আজ থেকে, আমি আপনাকে দাদা বলব। আপনি মনে করতে পারেন, এত দিনের পর হঠাৎ এর এ খেয়াল কেন ? তা বলি। আপনি যখন আমার হরেন দার বন্ধু হলেন, তখন আমারও দাদা হলেন। হলেন কি না ?

ক্ষিতীশ একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—হলাম বোধ হয়।

কমলা বল্লে—তবু 'বোধ হয়' ? কেন, আপনার ত কোনও বোন নেই ; মানুষের একটা বোন থাকা উচিত ত।

—তা উচিত বোধ হয়।

—সব কথাতেই আপনার 'বোধ হয়'!—আচ্ছা, এখন থেকে আমিই আপনার সে বোন্ হলাম। ঠিক ত ?

—ঠিক।

—আচ্ছা বেশ। আর একটা কথা। আমি যখন আপনার ছোট বোনটি হলাম, আপনি আমায় আর 'আপনি' বলে কথা কবেন না।

—বেশ, তাই হবে। যাও, এখন যাও খেতে বস।

—যাই দাদা।—বলে' কমলা উঠে গেল। মাঝের দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে, ক্ষিতীশ চেয়ারে বসে' গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

১১

তিন দিন পরে, রাত্রি দশটার সময় ক্ষিতীশ বউবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—মৈত্র মহাশয়ের খবর কি ? তিনি এসেছেন ?

—না।

—চিঠিখানা ঠিক পাঠানো হয়েছিল ত ?

—হাঁ, হয়েছিল বৈকি। কিন্তু তার পরদিন ছিল রবিবার—সেদিন হল না। কাল সোমবারে চিঠি রেজিষ্ট্রি করে পাঠিয়েছি।

—এখান থেকে চিঠি লিখলে আপনাদের গ্রামে কবে পৌঁছয় ?

—আজ লিখলে কাল পৌঁছয়।

—তা হলে, আজ তিনি সে চিঠি পেয়েচেন। গাড়ী কখন ? আসবার সময় কি তাঁর হয় নি এখনও ?

—বেলা দশটার সময় আমাদের গ্রামে চিঠি বিলি হয়। চিঠি পেয়েই যদি তিনি রওয়ানা হতেন, এতক্ষণ এসে পৌঁছতেন বৈকি!

—কাল আসতে পারেন।

—হয়ত গ্রামান্তরে কোথাও গেচেন, বাড়ী নেই। বাড়ী এলে চিঠি পাবেন। দুই একদিন দেরীও হতে পারে। কমলা কেমন আছে ?

—ভালই আছেন। আপনি ত কৈ আর তাঁকে দেখতে টেখতে আসেন না!

—সময় পাইনি ক্ষিতীশ বাবু। কাল কি পর্শু বিকেলের দিকে একবার যাব এখন। আপনি বাড়ী থাকবেন ত ?

—হ্যাঁ, থাকব বৈকি। আসবেন তা হলে। এখন তবে উঠি—নমস্কার!

দু'দিন পরে হরেন্দ্র ক্ষিতীশের বাসায় এসেছিল, কিন্তু মৈত্র-মশায়ের কোনও সংবাদই দিতে পারেনি। দিনের পর দিন কাটতে লাগ্‌ল, সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, কিন্তু তবু কোনো সংবাদ নেই। কমলার আড়ালে, ক্ষিতীশ হরেন দুজনে বসে' এ বিষয়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারে না। চিঠি রেজিষ্ট্রি হয়েছে বলেই যে সে অমর, তা ত নয়—সেও ত মারা যেতে পারে। পূর্ব্বের চিঠিখানি ডাকে মারা গেছে অনুমান করে', হরেন ঠিক সেই রকম আর একখানি চিঠি লিখে রেজিষ্ট্রি করে' পাঠালে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথম চিঠি লেখবার পর তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল, তবু কোনও সংবাদ নেই।

কি করা এখন উচিত, রোজই এ বিষয়ে জল্পনা হয়—কিন্তু কিছুই স্থির হয় না। এক মাসের উপর কমলা এখানে রয়েছে। সে এখন কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে। ক্ষিতীশ যথাসাধ্য তাকে সান্ত্বনা দেয়। হরেনও মাঝে মাঝে এসে তাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। কমলা বলে, আমার বাবা বোধ হয় বেঁচে নেই, থাক্‌লে তিনি নিশ্চয়ই আসতেন, অন্ততঃ চিঠির উত্তরও আস্‌ত।

প্রথম চিঠিখানি লেখবার ঠিক একটি মাস পরে, বেলা তিনটের সময় হরেন ছুটতে ছুটতে ক্ষিতীশের বাসায় এসে তার হাতে একখানি সরকারী লম্বা লেফাফা দিয়ে বল্লে—ওহে,এই দেখ।

এই মাসে দুজনে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, 'আপনি' 'মশাই' উঠে গেছে।

ক্ষিতীশ দেখলে, সেখানি ডেড্ লেটার্স আফিস থেকে এসেচে। ভিতরে হরেনের সেই প্রথম লেখা চিঠিখানি। তার পিঠে স্থানীয় পিয়ন মশায় স্বহস্তে লিখেছেন—

মালিক কলিকাতায় গমোন করিয়াছে মতে ডিপোজিট।

নীচে একটা তারিখ লেখা আছে। তার নীচে, আর এক সপ্তাহ পরে তারিখ দিয়ে উক্ত পিয়ন মশায়ের দ্বিতীয় মন্তব্য—

মালিক এখনো কলিকাতা হইতে আসে নাই কবে আসিবে কেহ বলিতে পারে না মতে ফিরৎ।

সেদিন হরেন সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ক্ষিতিশের বাসায় রইল। কমলার সঙ্গে তার এই পরামর্শ স্থির হল যে, এখন তাকে লক্ষ্ণৌয়ে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়াই উচিত।

ক্ষিতীশ বল্লে—তবে তাই নিয়ে যান। সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলে', ওকে রেখে আসুন।

হরেন বল্লে—কিন্তু আমি একলা গেলে ত চল্‌বেনা ভাই, তোমাকে শুদ্ধ যেতে হবে। কি অবস্থায় কমলাকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েছিলে, কি কারণে এই দীর্ঘকাল এখানে থাকতে ওকে বাধ্য হতে হল, এ সমস্ত কথা তোমার মুখেই সতীশ বাবুর শোনা উচিত। ব্যাপারটি যে রকম সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে সাক্ষী প্রমাণ ভাল রকম করে' দেওয়াই দরকার।

ক্ষিতীশ রাজি হল, কিন্তু বল্লে—এখন ত আমার কলেজ কামাই করলে চল্‌বে না ভাই! একেই আমার পার্সেণ্টেজ শর্ট পড়ে গেছে। সাম্‌নের সপ্তাহে শুক্র শনি দু'দিন ঈদের ছুটি রয়েছে, রবিবারটাও পাওয়া যাচ্চে, সেই সময় ঠিক হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মেলে রওনা হয়ে, শুক্রবার সেখানে পৌঁছে, রবিবার সেখান থেকে ছেড়ে, সোমবারে এসে আবার কলেজে হাজ্‌রে দিতে পারব।

সেই পরামর্শই রইল। সতীশ বাবুকে আগে থেকে চিঠি লিখে কিছু না জানানোই স্থির হল।

যাত্রার দিনে বিকেলে ঝি যখন কমলার চুল বেঁধে দিচ্ছিল, তখন তার চোখ দুটি দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগ্‌ল! ঝি বল্লে—কেন দিদিমণি, কাঁদচ কেন?

কমলা বল্লে—যাচ্চি ত ঝি! কিন্তু কপালে কি যে আছে তা ত জানিনে!

ঝি বল্লে—কপালে কি আবার থাকবে? এমন সতী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, তোমার কপালে ভালই আছে।

বম্বে মেলে, যে গাড়ীখানি মোগলসরাইয়ে কেটে নিয়ে আউধ রোহিলখণ্ড রেলের ডাক গাড়ীতে জুড়ে দেয়, অর্থাৎ মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদলাবার জন্যে নামতে হয় না, সেই গাড়ীতে ক্ষিতীশ একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে' রেখেচে। সন্ধ্যার পর, ক্ষিতীশ কমলাকে নিয়ে বউবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে ষ্টেশনে যাবে।

সকালে সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে, দুজনে যখন বেরুবার উদ্যোগ করছিল, তখন হঠাৎ ক্ষিতীশ কলিকাতাবাসী তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলে। বিশেষ প্রয়োজনে, অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যে তিনি ক্ষিতীশকে দেখা করতে বলেছেন।

তাই ত! ঘড়ি খুলে ক্ষিতীশ দেখলে, সেই ঘোড়াসাঁকোয় গিয়ে আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা করে' ফিরে এসে রওয়ানা হ'তে হলে দেরী হয়ে যাবে, ট্রেণ ধরা যাবে না। তখনই তার

মাথায় এক বুদ্ধি এল। চাকরকে বলে দিলে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়া, একটা ট্যাক্সি ধর।

পাঁচ মিনিট পরে চাকর এসে খবর দিলে—ট্যাক্সি এসেচে হুজুর।

ক্ষিতীশ কমলাকে নিয়ে নীচে নামল। তার নিজের মোটর গাড়ী, আর এক ট্যাক্সি, দুখানিই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কমলাকে নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে শোফেয়ারকে বল্লে—এঁকে বউবাজারে হরেন বাবুর বাসায় দিয়ে যাও। হরেন বাবুকে তুলে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে যাবে। আমি একটা কাজ সেরে, এই ট্যাক্সিতে হাওড়ায় গিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছব।

ক্ষিতীশের গাড়ী, কমলাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সি ঘোড়াসাঁকোর দিকে ছুটল।

ঘোড়াসাঁকোর কাজটুকু সেরে, ক্ষিতীশ ট্যাক্সিতে ফিরে এসে বল্লে—জোরসে হাঁকাও।

বম্বে মেল ছাড়বার আর পনেরো মিনিট সময় আছে। ট্যাক্সি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

হাওড়া পুলের কাছাকাছি এসে, এক-খানা সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াটে গাড়ীর সঙ্গে ক্ষিতীশের ট্যাক্সির ধাক্কা লেগে গেল। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়া দুটো হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গাড়ীর ভিতর থেকে দুজন প্রবীণ বয়সী ভদ্রলোক নেমে রাস্তায় দাঁড়ালেন। দুই গাড়োয়ানে মহা গালাগালি। লোক জমে গেল। পুলিস এসে ঝগড়া থামিয়ে দুই গাড়ীরই নম্বর টুকে নিলে। ক্ষিতীশের নাম ঠিকানা লিখে নিলে। ভাড়াটে গাড়ীর আরোহী দুজনের মধ্যে যাঁর গায়ে দামী শাল ছিল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার নাম ঠিকানা?

—আমার নাম শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র। বাড়ী কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা।

'কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা'—শুনেই ক্ষিতীশ বুঝলে যে ইনি কমলার গ্রামের লোক। হরেনের বাপের নাম যে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, তা সে কোনও দিন শোনে নি। আর, এটাও সে জানতে পারলে না যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কমলারই বাপ—হরনাথ মৈত্র, দুজনে এখনি ট্রেণ থেকে নেমে হরেনের বাসার দিকে চলেছেন।

ইতিমধ্যে লোক-জনে ধরাধরি করে' ঘোড়া দুটোকে দাঁড় করিয়ে দিছিল। গাড়ী দুখানি নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হল।

ট্রেণ ছাড়তে তিন মিনিট মাত্র বাকী থাকতে ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছল। হরেন গাড়ী থেকে গলা বের করে' ফটকের পানে চেয়ে ছিল। ক্ষিতীশ এসে পৌঁছতেই বল্লে—তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম এসে বুঝি জুটতে পারলে না!

ক্ষিতীশ বল্লে—ওঃ, হাঙ্গাম কি কম হে! রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে এক ভাড়াটে গাড়ীর সঙ্গে হয়ে গেল কলিসন!

—কি রকম?

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে' ক্ষিতীশ বল্লে—আরও মজা শোন, সে গাড়ীতে যে লোকটি ছিল, সে আবার তোমাদের দেশের লোক! বাড়ী বল্লে—কালীগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা।

কমলা বলে উঠল—কালীগ্রামের লোক? কে ক্ষিতীশদা?

ক্ষিতীশ বল্লে—তার নামটি কি ভাল, ভুলে যাচ্চি! হ্যাঁ—যতীন্দ্রনাথ বোধ হয়। হ্যাঁ ঠিক—যতীন্দ্রনাথ মিত্র।

কমলা ভেবে চিন্তে বল্লে—যতীন্দ্রনাথ মিত্র কে আবার আমার গ্রামে? কে, মনে ত পড়চে না। কত লোক আছে গ্রামে, সবাইকে কি চিনি!

হরেনও যতীন্দ্রনাথ মিত্র বলে' কাউকে মনে করতে পারলে না।

গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিয়ে সবুজ বাতি দুলিয়ে দিলে। বম্বে মেল চলতে আরম্ভ করলে।

ওদিকে যোগেন মিত্র, কমলার বাপকে সঙ্গে করে বউবাজারের হরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে', উভয়ে মেসের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—হরেন বাবুর ঘর কোথা?

একজন দেখিয়ে দিলে—ঐ তেতলায় পুব-দক্ষিণ কোণের ঘর।

দুজনে তেতালায় উঠে, পুব-দক্ষিণ কোণের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন, হরেনের নিজস্ব খানসামা গোপবংশাবতংস ক্ষুদিরাম ঘোষ মেঝের উপর বসে থেলো হুঁকো হাতে করে' তার মাথায় কলকেটিতে একমনে ফুঁ দিচ্চে।

ক্ষুদিরাম নিজের জমিদার বাবুকে এই রকমে হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত দেখে ধড়মড় করে' দাঁড়িয়ে উঠল। হুঁকাটা সরিয়ে ফেলে জমিদার বাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

যোগেন বাবু বল্লেন—কি রে ক্ষুদিরাম, কেমন আছিস তোরা?

—আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে, ভালই আছি হুজুর।

—হরেন বাবু কোথা?

—আজ্ঞে, তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেলেন।

—কবে?

—আজ্ঞে আজই—এই আধ ঘণ্টা হল। বোম্বাই মেলে রওনা হলেন।

—ফিরবেন কবে?

—আজ্ঞে, সোমবারে ফিরবেন বলে গেছেন।

—একলাই গেছেন? না সঙ্গে কেউ গেছে?

—আজ্ঞে, সঙ্গে ত আর কাউকে দেখলাম না, কেবল—

ক্ষুদিরাম কথাটা বলতে ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌ল। সম্প্রতি তার গ্রামের একজন গোয়ালা কলকাতায় এসেছিল, তার কাছে ক্ষুদিরাম একটা গুজবের কথা শুনেছিল।

যোগেন মিত্র চীৎকার করে' উঠলেন—কেবল কি? ঠিক করে' সব কথা বল্ হারাম-জাদা, নইলে জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেবো।

ক্ষুদিরাম যোড়হাতে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—আজ্ঞে তিনি যাবার আগে দরজায় একখানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীর শব্দ শুনেই বাবু বল্লেন চল্। আমি তাঁর ব্যাগ ছাতা ছড়ি নিয়ে পিছু পিছু গেলাম। বাবু গাড়ীর কাছে গিয়ে বল্লেন—কমলা তুমি একলা যে। গাড়ীর মধ্যে চেয়ে দেখি, এই দাদাঠাকুরের মেয়ে, কমলা দিদিমণি গাড়ীতে বসে রয়েছেন। দিদিমণি কি করে' এখানে এলেন তাও কিছু বুঝতে পারলাম না। বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌বারও সময় পেলাম না,—বাবু গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে।

হরনাথ মৈত্র "হা জগদীশ্বর!" বলে, ধপ্ করে' অন্য একখানি চেয়ারের উপর বসে পড়লেন।

যোগেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কমলা দিদিমণিকে আর কোনও দিন কলকাতায় দেখেছিলি?

ক্ষুদিরাম যোড়হাতে বল্লে—আজ্ঞে না হুজুর। আর কোনো দিন দেখি নি। এই প্রথম। এ-কথা হুঁজুরের পা ছুঁয়ে বলতে পারি।—বলেই ক্ষুদিরাম যোগেনবাবুর পায়ে হাত দিলে।

—কোন গাড়ীতে গেছে বল্লি? বোম্বাই মেলে?

—হুঁজুর।

একটা দীর্ঘ "হুঁ" বলে যোগেন মিত্রও একখানা চেয়ারে বসলেন। ব্যাগ থেকে টাইম টেবেল বের করে, চশমাটি চোখে দিয়ে বল্লেন—দেওয়াল থেকে ঐ আলোটা নামা দেখি।

ক্ষুদিরাম আলো নামিয়ে ধরলো। যোগেন বাবু টাইম টেবেল পরীক্ষা করে' বল্লেন—বম্বে মেল, হাওড়া ছাড়ে, ৯টা ৩৫ মিনিট, ক্যালকাটা টাইম। এখন ৯টা ৪৫ —দশ মিনিট হল গাড়ী ছেড়ে গেছে।

ক্রমশঃ *

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্যথার স্মৃতি

প্রতি নিশিদিন ফিরি উদাসীন সঙ্গী-বিহীন প্রবাসে ;
লোকে ভালবাসে, কত খেলে হাসে ; দিন যায়-আসে হতাশে।
মনে পড়ে যায় দুধে-আল্‌তায় রেখে দুটি পায় সেই যে—
অবনীর সার তনু সুকুমার নেই সে আমার নেই যে!
উড়ে আসে খালি শ্মশানের কালি চিতাধূম বালি পবনে,
যত কিছু আলো ক'রে দেয় কালো, লাগেনাকো ভালো জীবনে!
এ কি অবসাদ! যত সুখ-সাধ লাগে বিস্বাদ যেন গো,
আর পাপিয়ায় দখিনে হাওয়ায় তনু না কাঁপায় কেন গো!

জীবনের মত বসন্ত গত ;—কাঙালের মত সরিয়া
প'ড়ে পথ-পাশে মিশে থাকি ঘাসে, চোখ জলে আসে ভরিয়া।
চুড়িওলা হাঁকে ; জানালার ফাঁকে কতজনা ডাকে—'এ বাড়ী!'
আধ-ঘোম্‌টায় মুখ দেখা যায়, মন চম্‌কায় কি-বারই!

* ভাদ্র সংখ্যার লেখক—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাসন্তী-রং কাঁচের বাসন আরো কি-রকম কত কি—
পথে হেঁকে-হেঁকে যায় ডেকে-ডেকে কে তাদের দেখে নিরখি ?
ভেল্‌ভেট-পাড় জরি বুটিদার পড়েনাকো আর নয়নে ;
ফিরি আর কৈ পছন্দসই এটা-ওটা ঐ চয়নে !

চিঠি-বিলি-করা ডাক-হরকরা চলে যায় সরাসর ঐ ;—
উদ্বেগ-মাখা পথ-চেয়ে-থাকা বুকে-ক'রে-রাখা চিঠি কৈ ?
মরণের পর নেই ডাকঘর, নইলে খবর নিত সে ;
এটি-উটি-সেটি লিখে চার-পিঠই একখানা চিঠি দিত সে ;—
সেই এক সুর—আমি নিষ্ঠুর, বিদেশী বঁধুর লাগিয়া,
তার মত কৈ ভেবে সারা হই, নিশিদিন রই জাগিয়া ?
এ কি জাল-বোনা হায় কল্পনা ! মনে আল্‌পনা আঁকা গো ;
মরি কত ছলে স্মৃতি-শতদলে ধুয়ে আঁখিজলে রাখা গো !

সাগরে সলিলে আকাশে অনিলে বিশ্বনিখিলে দেওয়ালী ;—
চম্‌কায় দিল আলো রঙ্গীল—সবুজ সুনীল সোনালী !
ছোটে তর্‌-তর্‌ হাসি-নির্ঝর—মণি-মুক্তার ঝরণা
টুটি আবরণ—রেশমী বাঁধন আস্‌মানি-রং ওড়না।
হেনা-চামেলির মিঠে সুরভির মদিরে সমীর মত্ত
আনন্দ-গান ভ'রে তোলে প্রাণ নাচে আন্‌চান্‌ রক্ত।
এত আলো-গান হাসি অফুরান সবই ম্রিয়মাণ লাগে যে—
কুটির আঁধার, নিবিড় ব্যথার স্মৃতি শুধু তার জাগে যে !

তাই নিশিদিন ফিরি উদাসীন উৎসাহহীন আলসে,
ফেলি আঁখি-লোর, কোথা মনোচোর,—নয়নের মোর আলো সে ?
সেই একদিন প্রথম-নবীন স্বপ্ন-বিলীন শ্রাবণে—
লোপ সৃষ্টির শুভদৃষ্টির সুধাবৃষ্টির প্লাবনে !
আর-একদিন বিদায়-মলিন চেতনা-বিহীন চক্ষে,
হইল ধরণী পাণ্ডুবরণী হানিল অশনি বক্ষে !—
বকুলের বনে পবনে-পবনে এই-সব মনে পড়ে গো,
যে ছিল সে নাই, হ'য়ে গেছে ছাই, জলে আঁখি তাই ভরে গো

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

ফর্ম্মিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চয়ন

পুরাণো মিশরে নূতন আবিষ্কার

বৃষ্টিহীন ঋতু এবং বালুকারাশির শুষ্কতা, এই দুটি কারণের জন্য প্রাচীন মিশরের শিল্পকীর্ত্তিগুলি আজ-পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। আজও খনকের কোদালের মুখে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার নানান নিদর্শন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইতেছে।

অতীতে মানুষ কোথায় কি ভুল করিয়াছে, কোথায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং এক-একটা বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা কি ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া একালের মানুষ তাহার জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া তুলিতে পারে। অতীতের শিক্ষার উপরেই বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তি।

তৃতীয় টুথ্‌মোসিস

প্রাচীন মিশরের সমস্ত ব্যাপারের খুটিনাটি লইয়া আলোচনা করিবার সুযোগ এ যুগে নাই বটে, কিন্তু তাহার সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের বহিঃ-রেখাগুলি আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। এই মিশর পূর্ব্বে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এ কথা আমরা জানিতে পারি যে, কিরূপে "অষ্টাদশ বংশে"র রাজত্বকালে মিশরের সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে একতাবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরে কিরূপে তৃতীয় টুথ্‌মোসিসের অধীনে সেই একতা-বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হইয়া প্রাচীন মিশরকে একটি শক্তিবান সাম্রাজ্যে পরিণত করে (১৫০০ খৃঃ-পূঃ হইতে ১৪৫০ খৃঃ-পূর্ব্বের মধ্যে)।

সম্রাট টুথ্‌মোসিস্‌ অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সিরিয়া প্রদেশ যুদ্ধে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

হারিয়া তাঁহার পদনত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা গঠিত বিপুল সাম্রাজ্য আড়াইশো হইতে তিনশো বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় অটুট ছিল। প্রাচীন সভ্যতার সেই যুগের অনেক ছবি এখন এ যুগের নখদর্পণে। টুথ্‌মোসিসের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত মিশর-সাম্রাজ্যের পতন হয় খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে। তৃতীয় রামেসিস্ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

মিশরের আর-একজন সম্রাট সভ্যতার ইতিহাসে আপনার নামকে বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম তৃতীয় আমেন-হোটেপ। টুথ্‌মোসিসের ঠিক পরেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। লুক্সরের বিখ্যাত মন্দিরের অধিকাংশই তাঁহার নির্ম্মিত। থিব্‌স্ নামক স্থানে যে দুটি অতিকায় প্রতিমূর্ত্তি এখন ভ্রমণকারীর বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে দুটিও তাঁহারই কীর্ত্তি।

লুক্সরের মন্দির

আমেনহোটেপের অধীনে প্রাচীন মিশর শক্তি, সভ্যতা ও বিলাসিতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। মিশর-সাম্রাজ্য তখন সুডান প্রদেশ হইতে য়ুফ্রেটিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুদূর বাবিলনের সঙ্গেও তখন তাহার রাজনৈতিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং য়ুরোপের নানাপ্রদেশেই সে তাহার বাণিজ্য-সম্ভার প্রেরণ করিত।

দেশের ভিতরে শান্তি থাকিলে সে শান্তি ক্রমে দুর্ব্বলতাকে ডাকিয়া আনে। প্রাচীন মিশরে এই দুর্ব্বলতা ধর্ম্ম তন্ত্রের আকারে প্রকাশিত হয়।

মিশরের ফারোয়ারা দেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার উন্নতিবিধানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমেন-হোটেপ ও দ্বিতীয় রামেসিস এজন্য বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। সম্প্রতি একটি অপূর্ব্ব প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রফেসর নেভিলের যত্নে ও চেষ্টায় ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। পাহাড় কাটিয়া মিশরীরা যে-সকল মন্দির ও সমাধিগৃহ নির্ম্মাণ

দ্বিতীয় রামেসিসের মমি

করিয়াছিল, তাহা এখন সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এরূপ ভূমধ্যস্থ ছাদ-সমেত প্রাসাদ এই প্রথম মিশরে আবিষ্কৃত হইল। পণ্ডিতদের মতে এই প্রাসাদটি পিরামিড-যুগের। যদিও প্রাসাদটির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য এখন আর বুঝিবার

দ্বিতীয় রামেসিসের মমির মুখ

উপায় নাই, কিন্তু সুবিস্তৃত স্তম্ভশোভিত গৃহমালা এবং ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত চিত্রগুলি দেখিলে আজ এতদিন পরেও তাহার অতীত শ্রী অনেকটা কল্পনা করা যায়।

পিরামিড-যুগেই (৪৭০০—৪০০০ খৃঃ-পূঃ) মিশরের কলা-সৌন্দর্য্য সবদিকে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। খুফু এবং খাপরার রাজত্বকালে মিশরের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে যে শ্রী ও সত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের শিল্পে তাহা আর দেখা যায় না। ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক বিধান হইলেও মিশরে সে বিধান খাটে নাই।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধান শেষ হইতে এখনো বাকি আছে। এখনো এমন অনেক

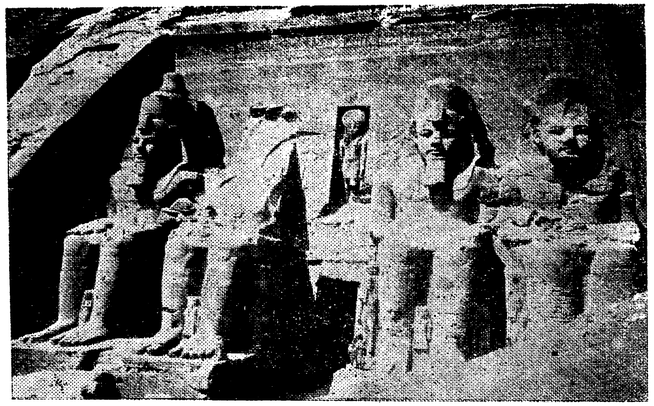

দ্বিতীয় রামেসিসের দ্বারা নির্ম্মিত আবুর মন্দির

ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহা দেখিয়া ছয় সাত হাজার বছরের প্রাচীন—অথচ অপূর্ব্ব-উন্নত মিশরীয় সভ্যতার বহু অজানা কথা জানা যাইতেছে। সুতরাং মিশরীয় সভ্যতা-সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার সময় এখনো আসে নাই।

আলোক-চিত্রে নব-ধারা

এটা খুব ঠিক যে, ফোটোগ্রাফ কখনো অঙ্কিত চিত্রের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কিন্তু আধুনিক আলোক-চিত্রকর যে গত যুগের চেয়ে আসল সৌন্দর্য্যের দিকে অধিক অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ক্যামেরার সর্ব্বপ্রধান গুণ, সত্যকে সে অবিকৃত ভাবে ধরিতে পারে। কিন্তু ছবি তোলাইবার সময়ে আদর্শের যে ভাব থাকে, সেই ক্ষণিক ভাব ছাড়া সে অতিরিক্ত আর-কিছু দেখাইতে পারে না। অঙ্কিত চিত্রে ফোটে স্থায়ী ভাব আর আলোকচিত্রে থাকে অস্থায়ী ভাব।

কিন্তু আধুনিক আলোক-চিত্রকরগণ আপনাদের ইচ্ছামত ভাবে ছায়ালোক-সন্নিবেশ দ্বারা ফোটোগ্রাফের কঠোর বাস্তবতাকে অনেকটা কোমল ও কবিত্বপূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন। ক্যামেরার 'লেন্স' যদি যথাযথ

আলোক-চিত্র নং ১

ভাবে নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হয়, তবে আলোকচিত্রকে অনায়াসেই অনেকটা অঙ্কিত চিত্রের মত করিয়া তোলা যায়।

তবে এ-শ্রেণীর আলোক-চিত্রে যাঁহারা আদর্শ হন, তাঁহাদিগেরও বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক। সাধারণত যাঁহারা আদর্শ-রূপে ক্যামেরার সুমুখে গিয়া বসেন, তাঁহারা ছবি তোলাইবার জন্যই ছবি তোলান এবং ছবি যদি বাস্তব হয়, তাহাহইলেই তুষ্ট হইয়া যান। কিন্তু তাঁহাদের সেই আড়ষ্ট ও সচেতন ভাব যে স্বাভাবিক নয় এবং বাস্তবের মধ্যে তাহা

আলোক-চিত্র নং ২

অবাস্তবকেই যে স্পষ্ট করিয়া দেখায়,এটা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। শিক্ষিত আদর্শের মধ্যে এই আড়ষ্টতা ও সচেতনতা থাকে না।

সত্যবাদী বলিয়া পরিচিত আলোকচিত্রও যে উপভোগ্য মিথ্যা বলিতে পারে, একালে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা এখানে যে ছবিগুলি দিলাম, তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিখানির "ক্ষেত্রপৃষ্ঠ" (Background) একেবারে কৃত্রিম। এই "সমুদ্রস্নান" ও "জলবালা"র ছবিখানি আলোকচিত্রকরের ঘরের মধ্যেই কৃত্রিম দৃশ্যের সাহায্যে তোলা হইয়াছে। অথচ বলিয়া না দিলে এ গুপ্তকথাটা সুধু চোখে দেখিয়া ধরা অসম্ভব।

আলোক-চিত্র নং ৩

অপেরার লক্ষণ

"অপেরা" বা গীতিনাট্য বাঙলা দেশে অনেক লেখা হইয়াছে। কিন্তু সে-সব গীতিনাট্য পড়িলে বা তাহাদের অভিনয় দেখিলে মনে হয়, নাট্যকাররা অপেরার আসল লক্ষণের সঙ্গে পরিচিত নন। সুধু বাঙলায় কেন,—বিলাতেও আধুনিক অপেরার ভাগ্যে যে এই একই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিই তাহার প্রমাণ।

গানই হইতেছে অপেরার সর্ব্বস্ব। কিন্তু আজকালকার শতকরা নিরানব্বইখানি অপেরায় দেখা যায়, গানের দরুণ তাহাদের নাটকীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। অপেরায় এখন নাট্যাংশে এবং সঙ্গীতাংশে এমন একটা ধাক্কাধাক্কি লাগিয়া যায়, যাহার জন্য তাহা উচ্চ শ্রেণীতেও উঠিতে পারে না, দীর্ঘজীবনও লাভ করিতে পারে না।

আধুনিক অপেরায় আসল অভাব হইয়াছে প্রতিভার সঙ্গে সহজ বুদ্ধির। অপেরার নিজের একটা বিশেষ রূপ আছে। তাহা গান-ঘেঁসা নাটকও নয় বা নাটক-ঘেঁসা গীতিমালাও নয়।

মোজার্ট ছাড়া আর-কোন লেখকই অপেরার পূর্ণ-লক্ষণ ফুটাইতে পারগ হন নাই। মোজার্টের অপেরার আগাগোড়া জীবনের রসে পরিপূর,—কারণ, তাহার পাত্র-পাত্রীদের আত্মা খালি কথাবার্ত্তাতেই ফোটে নাই—গানের মধ্য দিয়াও সমানভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন-কি, ওয়াগ্‌নার, বীথোভেন ও গ্লাক্ প্রভৃতি প্রতিভার অধিকারীরাও—ধরিতে গেলে—বিবিধ ঘটনা-সংস্থানে নাট্যরসই প্রগাঢ় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু ঘটনা-পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে তাঁহারা গানের দ্বারা ভাবাভিব্যক্তির চেষ্টা ততটা করেন নাই,—যতটা করিয়াছেন গানের দ্বারা ঘটনা-পরিবর্ত্তনের অবকাশটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে। ওয়াগ্‌নার অপেরার আসল মূর্ত্তি যে-রকম হওয়া উচিত মনে করিতেন, তাঁহার "ট্রিষ্টান" নামে অপেরায় তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে কেবলমাত্র ঘটনা-সংস্থানই দেখা যায়। কিন্তু "রিং" রচনাকালে তিনি যে গল্পটি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত জটিল; সে-রকম গল্প উপন্যাসেরই উপযোগী—নাটকের নয়। তাই ঘটনা-সংস্থানের (Situation) জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াও ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে তাঁহাকে বিশেষরূপে বেগ পাইতে হইয়াছে। গল্পের ধারা যখন গতিশীল তখন গানের ধারাকে স্থির রাখিবার জন্য তিনি অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন,—কারণ গানকেও তিনি গতিশীল করিতে পারেন নাই। ফলে ঘটনা-পরম্পরার মাঝে মাঝে তাঁহার অপেরার সঙ্গীতাংশগুলি গর্ভাঙ্কের মতনই বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অপেরায় আজকাল জানাশুনা চল্‌তি গল্পকে কেহই প্রায় আমোল দেন না। যে-সব গল্পে ঘটনা-সংস্থান অধিক, অপেরায় সে-রকম গল্পভাগও বড়-একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু অপেরা-লেখকদের বুঝা উচিত, যে-সকল গল্প সকলেরই পরিচিত, তাহাদের ঘটনা-সংস্থানের জন্য নাট্যকারকে নূতন-করিয়া কারণোত্তর দিতে হয় না। আধুনিক নাট্যকাররা শ্রোতাদের চিত্তে এমন উত্তেজনা ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতে চান, যাহা নাটকের পক্ষেই যুৎসই। গীতিনাট্যে তাহা অচল;—কেননা, গীতিনাট্যের রসিক শ্রোতারা কখনই 'এর পর কি হইবে'—বলিয়া দম বন্ধ করিয়া উদগ্রীব হইয়া থাকেন না। সত্যই যদি সুর বা গান আমাদের প্রিয় হয়, তবে আমরা ভবিষ্যৎ লইয়া মাথা ঘামাইব না—কারণ বর্ত্তমানের উপভোগই আমাদের মনের যথেষ্ট খোরাক যোগাইয়া দেয়। এমন-কি, অপেরার বাক্যবহুল সঙ্গীত-সম্বন্ধেও ঐ একই কথা; নাটকীয় ক্রিয়ার ভাবকে তাহারা আরো গভীর এবং উচ্চতর করিয়া তুলে। কিন্তু সঙ্গীতের মধ্যে ঘটনার বিস্ময় থাকা একেবারেই অসম্ভব। এইজন্য অপেরার আখ্যান-ভাগে ঘটনার বিস্ময় থাকা উচিত নয়।

সঙ্গীতের যে-রকম ভাবাভিব্যক্তির শক্তিই থাকুক, ইহাতে গীতি-কাব্যের ধর্ম্ম যতটা প্রস্ফুট, ততটা আর-কিছুর নয়। এবং

নাটকোচিত বিস্ময়-প্রকাশের পক্ষে গীতি-কাব্যের উপযোগিতা যে অত্যন্ত অল্প, সে কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অবশ্য, গীতিকাব্যে একটি ঘটনা-সংস্থান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে ক্রমাগত নানা ঘটনার বিচিত্র পরিবর্ত্তন কখনোই থাকে না।

গ্লাকের রচিত অন্যান্য অপেরার চেয়ে তাঁহার Orfeoর জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে কেন? কারণ, তাঁহার এই অপেরাখানিতে একটি পরিচিত প্রচলিত গল্পকেই তিনি আখ্যান-বস্তু রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ঘটনার বিস্ময় নাই, কিন্তু ঘটনা সংস্থান (Situation) আছে যথেষ্ট এবং তাহার জন্য নাট্যকারকে কারণোত্তর দিতেও হয় নাই। আবার ঘটনা-পরম্পরার মাঝে মাঝে বর্ণনামূলক সঙ্গীত ব্যবহার করাতে, গল্পের ধারাও কোথাও ব্যাহত হইয়া গর্ভাঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই। যাঁহারা ভালো অপেরা লিখিতে চান, এ-সব দিকে চোখ না রাখিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিফল হইবেন।

প্রকাশ্য জুয়াখানা

মোন্যাকো ভূমধ্যসাগরের একটি অন্তরীপ। ইহার আয়তন মাত্র আটবর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা উনিশহাজার। প্রিন্স অফ মোন্যাকো এখানকার রাজা। এত ছোট রাজ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। ত্রিশ বৎসর আগে এই জায়গাটি একটি জনশূন্য পাহাড়ে-মরুভূমির মত ছিল—এবং চোর ডাকাত ও চাষাভূষো ছাড়া তখন আর কেউ এখানে আসিত না।

এখন এখানে তিনটি ছোট ছোট সহর হইয়াছে—গোণ্ডামাইন, মোন্যাকো ও মন্টি-কার্লো। আজকাল এদেশে চোর-ডাকাতের অ'ড্ডা না থাকিলেও, অন্যরকম সভ্যতর উপায়ে আমীরকে এখানে ফকিরে পরিণত করা হয়।

মন্টি-কার্লো এবং তাহার বিচিত্র প্রাসাদ ক্যাসিনোর নাম জানে না, য়ুরোপ-আমেরিকায় এমন লোক বোধ হয় একজনও নাই। ক্যাসিনো হইতেছে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জুয়ার আড্ডা।

একটি পাত্রের সঙ্গে একটি চক্র সংযুক্ত থাকে। পাত্রের উপরে ১ হইতে ৩৬ ও ০ পর্য্যন্ত সংখ্যা আঁকা থাকে। তারপর চাকাখানিকে একদিকে ঘুরাইয়া তাহার উল্টোদিকে একটা সাদা মার্ব্বেল গড়াইয়া দেওয়া হয়। মার্ব্বেলটি যে সংখ্যার উপরে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহাই হইল জিতের নম্বর। সেই নম্বরে আপনি যদি আগে থাকিতেই একশো টাকা ধরিয়া থাকেন, তবে ছত্রিশগুণ বেশী অর্থাৎ তিন হাজার ছয়শো টাকা পাইবেন। এই জুয়াখেলার নাম roulette। ক্যাসিনোতে জুয়াখেলার এম্‌নি বারোটি টেবিল আছে। দিনের যে কোন সময়েই ক্যাসিনোতে গেলে আপনি দেখিবেন, প্রত্যেক টেবিলের চারিপাশেই অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশজন জুয়াড়ী ভাগ্যপরীক্ষায় তন্ময় হইয়া আছে!

এই জুয়ার আড্ডায় বহু দূর-দুরান্তর হইতে প্রতিদিনই শত শত লোক ছুটিয়া আসে —আগুনের দিকে পতঙ্গের মত! প্রত্যেক

জুয়াড়ীই মনে মনে নানারকম হিসাব করিয়া এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আসে যে, বাজি জিতিবার সে একটা চমৎকার লাগ-সৈ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে! ক্যাসিনোতে ঢুকিবার আগে ফিরিওয়ালারা নির্ব্বোধ জুয়াড়ীদিগকে "বাজি জিতিবার নির্ভুল উপায়" সম্বন্ধে অনেক বই বিক্রী করে। কিন্তু সত্য সত্যই এই-সব বই পড়িয়া যদি বাজি জেতা যাইত, তবে বইগুলির বিক্রী তখনি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

তবে এ-কথা ঠিক যে, অনেকে এখানে আসিয়া অতুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। ওয়েল্‌স্ নামে এক পাকা জুয়াড়ী ক্যাসিনোর জুয়ার আসরে মোট নয়লাখ টাকার বাজি জিতিয়াছিল। মিঃ হাণ্টলি ওয়াকার পনেরো বৎসর মাথা ঘামাইয়া খেলার এক নিজস্ব পদ্ধতি বাহির করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার লাভ হইয়াছিল দুইলাখ সত্তর হাজার। কর্ণেল পাওয়েল নামে একজন ধনী আমেরিকান পাইয়াছিলেন দশলাখ পঞ্চাশ হাজার। রুশ-দেশীয় এক কাউণ্ট মাত্র একরাত্রের খেলায় দুইলাখ দশ হাজার টাকার বাজি জিতিয়াছিলেন। বিলাতের এক জাহাজের মালিক দুই ঘণ্টা খেলিয়া নব্বই হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু জুয়াড়ীরা যতই চালাক হউক আর যতই জিতুক, সেজন্য ক্যাসিনোর অধিকারীর ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। কারণ আজকাল তাহার বাৎসরিক আয় চার পাঁচ-কোটি টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে!

যুদ্ধের পরে মন্টি-কার্লোতে জুয়াড়ীর সংখ্যাও যেমন বাড়িয়াছে, লোকে ফতুরও হইতেছে তেম্‌নি বেশী। ক্যাসিনোর কাছেই একটি গুপ্তস্থান আছে,—সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। জুয়াখেলায় ফতুর হইয়া যে সকল হতভাগ্য আত্মহত্যা করে, এইখানে গভীর রাত্রে গোপনে তাহাদিগের দেহ গোর দেওয়া হয়।

প্রিন্স অফ মোন্যাকো নিজে কখনো জুয়া খেলেন না। কিন্তু জুয়াখানার মালিক কর বলিয়া তাঁহার হাতে বৎসরে প্রায় ত্রিশলাখ টাকা দেয়। এই আয়ের অনেক অংশ তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয় করেন। মন্দের ভালো!

মোন্যাকোর প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। এখানে ভ্রমণকারীদের পক্ষে দ্রষ্টব্য স্থানেরও অভাব নাই। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের শান্তিপ্রিয় বাসিন্দারা কিন্তু জুয়াখেলার অত্যন্ত বিরোধী এবং জুয়ার আসর তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা যথেষ্ট আন্দোলনও করিয়া থাকে।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়

সঙ্কলন

বিলাতযাত্রীর পত্র

১

পাড়ি দেওয়া গেছে। প্রথম কিছুদিন লাগে নিজের সঙ্গে নিজের যানবাহনের খাপ খাইয়ে নিতে। বিষ্ণু যখন গরুড়ের পিঠে চেপেছিলেন নিশ্চয়ই তখন আরাম পান নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না, কারণ একে আমরা মর্ত্ত্য মানুষ তাতে আমরা কলিদেবতার কলবাহনকে ধার করে' নিয়েচি। গরুড়ের পাখার সঙ্গে অনন্ত আকাশের ঝগড়া নেই—

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কিন্তু আমাদের এই কলের জাহাজের সঙ্গে জলের দেবতার পদে পদে বিরোধ। ঠেলাঠেলি মারামারি করে' তাকে চল্‌তে হয়, চব্বিশ ঘণ্টা হাঁসফাঁস করে' মরে, তার সেই উদ্বেগ আমাদের সর্ব্বশরীরকে উতলা করে' তোলে। যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এর গতি সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে এই বাহনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকাতে আমাদের এত দুঃখ। জাপানিদের জুজুৎসু ব্যায়ামের কায়দা হচ্চে এই যে বাধাকে আপনার অনুকূল করে' তোলা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকেই কৌশলে আপনার স্বপক্ষীয় করে' নেওয়া, শত্রুর অস্ত্রকেই নিজের অস্ত্র করা। পাখীর পাখা বাতাসেরই গতিকে নিজের শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার আকাশ-বিহারকে সুখময় সৌন্দর্য্যময় করতে পারে। মানুষের যন্ত্র প্রকৃতির সঙ্গে এখনো সম্পূর্ণ সন্ধি করতে পারে নি, এইজন্যে সে যতটা শক্তি ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তির অপচয় করে। যন্ত্র কেবলি বল্‌চে আমি জোর করে বাধা কাটিয়ে যাব। যন্ত্রের এই ঔদ্ধত্যে সমস্ত পৃথিবী তাপিত। প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রের অসামঞ্জস্যে যন্ত্রকে এত কুৎসিত করে' তুলেচে। বাণিজ্যলক্ষ্মী যখন থেকে কলবাহনকে অবলম্বন করেচেন তখন থেকে তাঁর শ্রী নেই। তখন থেকে বিশ্বলক্ষ্মীর সঙ্গে বাণিজ্যলক্ষ্মীর মুখ দেখা বন্ধ। যন্ত্রের জবরদস্তি যে সব জঞ্জালকে ক্রমাগত জন্ম দিতে থাকে সেই তার আপন সন্তান, সেই জটিল জঞ্জালই তার সর্ব্বনাশ করে। আধুনিক কালের পলিটিক্স সেই যন্ত্র—বিশেষত বিদেশী রাজ্যশাসনে। মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' চলবার শক্তি এর নেই, উগ্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা কেবলি বাধা ভেদ করে' চলবার জন্যে এর এত উদ্যম। এই জন্যে এই পলিটিক্স দুষ্ট কিন্তু শ্রীহীন। শ্রী হচ্চে সকল শক্তির চেয়ে বড় শক্তি; চারিদিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যের গুণে যখন লীলাময় সহজতা জন্মে তখন দেখা দেয় শ্রী;—শক্তি তখনি সুন্দরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়—বিরোধের ভয়ঙ্কর অপচয় থেকে তখন শক্তি বেঁচে যায়। এই নিষ্ঠুর অপচয়ের হিসাব একদিন নিকাশ হবে। বোধ হচ্চে যেন সেই হিসাব তলব হয়েচে। পলিটিক্সের জঞ্জাল জমে উঠেচে; মিথ্যায় কপটতায় নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীতে দেবতার পথ-চলা বন্ধ। তাইত পশ্চিম গগনে ধূম-কেতুর মত দেবলোকের ঝাঁটা দেখা দিয়েচে, সমস্ত ধরণী কেঁপে উঠ্‌ল।

জাহাজ ত চল্‌চে সমুদ্রের উপর দিয়ে—এদিকে আমাদের মনও চলেচে কালসমুদ্রে। বাইরে যেখানে সমস্ত পরিচিত এবং অভ্যস্ত, মন সেখানে আপন চিহ্নার পথে বাধা পায় না। কিন্তু অপরিচিত মানুষের মত আমাদের মনের পক্ষে এমন বাধা আর কিছুই নেই। অপরিচয় যেখানে কেবলমাত্র পরিচয়ের অভাব সেখানে বাধা অতি সামান্য—কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় মানুষ অপরিচয়ের বর্ম্ম পরে' থাকে পরস্পরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। এই জিনিষটা কেবল অভাব নয়, ফাঁক নয়, এ একটা কঠোর জিনিষ, এ অদৃশ্য-ভাবে ঠেলা দেয়;—বিশেষত যেখানে ইংরেজ সহযাত্রী, এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজ। মনে হয় যেন জাহাজে আকাশটাও শূন্য নয়—সে যেন কুয়ুইয়ের গুঁতো দিয়ে ভরা। আমি স্বভাবত অবকাশবিহারী জীব, আমি চিরদিন ফাঁকায় মানুষ হয়েচি—আমার চারি-দিকের আকাশ যখন ঠেলাঠেলিতে ভরে যায়, তার মধ্যে যখন প্রকৃতির শান্তি বা মানুষের নিমন্ত্রণ থাকে না তখন আমার সমস্ত প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদি আমার সেই শান্তিনিকেতনে, সেই উদার প্রান্তরের প্রান্তে ফিরে যাবার কোনো পথ থাকত তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি চলে যেতুম। কিন্তু পূর্ব্বে বলেচি আমি কলিযুগের ধার-করা বাহনে চলেচি, এ আমার ইচ্ছাকে মানবে না। সেইজন্যেই দেবতার প্রতি ঈর্ষ্যা হয়—আলাদিনের প্রদীপের স্বপ্ন দেখি।

কিসের জন্যে যাচ্চি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্যে নয় সে আমি জানি, আর কিসের জন্যে সে আমি স্পষ্ট জানি নে। কেবল একটা কথা মনে আসে সেটি হচ্চে এই;—মন্থনে দুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে; য়ুরোপে লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়েচে তাতে সেখানকার যাঁরা মনীষী যাঁরা ভাবুক তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধ হয় আজকের দিনে তাঁদের

দেখ্‌তে পাওয়া সহজ। শুধু চোখে দেখতে পাওয়া নয়—আজ তাঁরা সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চিন্তা করচেন সেই চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে। একথা মনে করা ভুল তাঁদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সর্ব্বমানবের সমস্যার যাঁরা সমাধান না করবেন তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না। কোনো জাতি যখন বড় রকমের দুঃখ পায় তখন একথা বুঝতে হবে সেই দুঃখের মূলে সর্ব্বমানবের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ আছে। স্থানীয় পলিটিক্সের ছিন্নতায় তালি লাগিয়ে এ দুঃখের প্রতিকার হতে পারবে না। আমরাও সুদীর্ঘকাল ধরে যে দুঃখ বহন করচি তার কারণটাকে সঙ্কীর্ণ ও আকস্মিক করে দেখ্‌চি বলেই মনে ভাবচি মণ্টেগু ডাক্তারের হাতে এর ওষুধ আছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সভামঞ্চে রেজোল্যুশনের পটি লাগিয়ে ভারতের মর্ম্মান্তিক ক্ষত-গুলির আরোগ্য ঘট্‌বে।

২

আলোয়ারের মহারাজা আমাদের সঙ্গে যাচ্চেন। এঁকে দেখ বড় খুসি হয়েচি। এঁর বেশভূষা আদব-কায়দা সমস্তই দেশী ধরণের। পশ্চিমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করবার সময় ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে আত্ম-পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে—আপনার ভাষা, আপনার বেশ, এমন কি, আপনার স্বভাবকে গোপন করে' তবেই যেন গৌরব বোধ করে। ইংরেজ আপনার কায়দাকেই সম্মান করে, তার সঙ্গে অল্পমাত্র পার্থক্যকেও অবজ্ঞা এবং উপহাস করে' থাকে। সেই কারণে, যেখানে অধিকাংশ লোক ইংরেজ এবং যেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই ইংরেজি সেখানে নিজেকে যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে ইংরেজি ধরন-ধারনের সুবিধে আছে, তাতে অন্তত বাইরের দিকে একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু অন্তরের দিকে? এই ইচ্ছাকৃত দাসত্বের লজ্জা বহন করি কি করে?

এ সম্বন্ধে একটা তর্ক কিছুকাল পূর্ব্বে মাঝে মাঝে শোনা যেত। সে হচ্চে এই যে, বাঙালীর বেশভূষা ধুতিচাদর, কিন্তু ধুতিচাদরে পৃথিবী-পরিভ্রমণ চলে না। একথা সত্য যে, বাঙালী সুদীর্ঘকাল লোকসভার আড়ালে ছিল,—আপনার গ্রামে আপনার চণ্ডী-মণ্ডপেই তার দিন কেটেচে। এই জন্যে বাঙালী স্ত্রীলোক এবং পুরুষের চিরপ্রচলিত বেশভূষা পৃথিবীর জনসভার পক্ষে অত্যন্ত বেশি আটপহুরে। শুধু তাই নয়, বাহিরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার যোগ্য আমাদের কোন আদবকায়দা নেই। এইজন্যে বাঙালী স্বভাবত উদ্ধত না হলেও বিনয়প্রকাশে সে অনভ্যস্ত, এমন কি, তাতে সে লজ্জা বোধ করে। এসমস্তই মানি তবু কিছুতেই মানিনে যে আগাগোড়া ইংরেজ সাজ্‌লেই সমস্যা মেটে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থাকে নিজের নিয়মে মিলিয়ে নেওয়াই হচ্চে প্রাণের লক্ষণ। বাহিরের পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে অস্বীকার করাও জড়ত্ব আর সেই পরিবর্ত্তনকে অন্ধভাবে স্বীকার করাও জড়ত্ব। অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি এবং সৃজনীশক্তির সাহায্যে সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' নেওয়াই হচ্চে যথার্থ আত্মরক্ষা। পূর্ব্বাপর আমাদের কোনো একটা জিনিষের অভাব যদি থাকে তবে সেটাতে আমাদের দারিদ্র্য প্রকাশ পেতে পারে তবু তাতে তেমন বেশি লজ্জা নেই, কিন্তু কোনো-কালেই সে অভাব আমাদের নিজের স্বাভাবিক শক্তিতে মেটাবার ভরসা যদি না থাকে তবে সেই চির-অক্ষমতার অগৌরবই দুঃসহ। একদিন আমাদের বাংলা ভাষার শক্তি সঙ্কীর্ণ ছিল, কারণ সে ভাষা কেবল ঘরের ভাষা গ্রামের ভাষা ছিল, এইজন্যে সে ভাষা বিদ্যার ভাষা ছিল না। এই কারণে, যারা জড়চিত্ত তারা অবজ্ঞা করে' বলেছিল বাংলা চিরকাল প্রাকৃতসাধারণের ভাষা হয়ে থাক্ আর নির্বিচারে ইংরেজি ভাষাকেই বিশিষ্ট-সাধারণে গ্রহণ করুক। কিন্তু আজ আমাদের গৌরবের কথা এই যে, সেই অবজ্ঞা বাংলা ভাষা স্বীকার করে নি। বাংলা ভাষা বিদ্যার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌ল। কেমন করে হল? আপনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে' নয়; নিজের মহলকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলে, আধুনিক কালের বিদ্যা ও ভাবকে দ্বারের বাহির থেকে বিদায় না করে দিয়ে, তাদের সকলকে আতিথ্য দান করবার উপযুক্ত আয়োজন করে' —অর্থাৎ নিজের প্রাণশক্তির বেগেই বিশ্ববিদ্যা বিশ্ব-

সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজের সামঞ্জস্য সাধন করে'। বীণায় সুর বাঁধবার সময় বেসুর অত্যন্ত শ্রুতিকটু হয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু তাতেও বোঝা যায় সুর বাঁধবার ওস্তাদটি বেঁচে আছে, সেইটেই মস্ত আশার কথা। তেমনি আকস্মিক অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধনের সময় আমাদের ব্যবহারে আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে নানা অদ্ভুত বিকৃতি দেখা দেবেই কিন্তু তাতেও বোঝা যায় সজীব ওস্তাদের কাজ চল্‌চে, সেই ওস্তাদ্ সমস্ত বিকৃতিকে ক্রমশই প্রকৃতির অনুগত করে' নেবেন। অতএব এই সকল উপদ্রবকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই, কেননা এ হল প্রাণের উপদ্রব। ভয়ের কারণ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জড়তা। সেই জড়তা পরের ধনে যতই গর্ব্ব করুক তবুও তা জড়তা। যতক্ষণ নিজের শক্তি সচেষ্ট হয়ে সৃজন করচে ততক্ষণ অন্যের তৈরি জিনিষ সেই সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলে,—সেই রকম গ্রহণ করাকে ভিক্ষা করা ধার করা বলে না। তাকেই বলে অর্জ্জন করা। সমস্ত মহৎ এবং প্রাণবান সভ্যতা বাহির থেকে সেই রকম অর্জ্জন করে এবং করেচে। প্রাচীনকালে ভারতও তাই করেচে, যদি না করত তবে লজ্জা বোধ করতেম। শক্তিস্বাতন্ত্র্য অভাবাত্মক জিনিষ নয়—অর্থাৎ প্রাণপণে পরের পন্থা বাঁচিয়ে চলাই ওরিজিন্যালিটি নয়—উপকরণ ঘরের হোক্ আর বাইরের হোক্ সমস্তই নিজের প্রকৃতিসঙ্গত করে নেবার শক্তিকেই বলে শক্তিস্বাতন্ত্র্য। বাহিরের জিনিষ নির্ব্বিচারে নকল করাও যেমন দীনতা, বাহিরের জিনিষ নির্ব্বিচারে বর্জ্জন করাও তেমনি দীনতা। দুইয়েতেই আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়।

তাই আমার বক্তব্য এই যে, আজকের দিনে বিশ্বের সঙ্গে বাংলা দেশের যে সম্বন্ধস্থাপনের কাজ চল্‌চে তার প্রত্যেক অঙ্গেই আমাদের নিজের পূর্ণ জাগ্রত সৃজনী-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। এই সৃজনের মানেই হচ্চে বাহ্য উপকরণকে নিজের আন্তরিক নিয়মের অনুগত করা, অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাই এই জাহাজে যখন কোনো বাঙালী সাহেবকে সগর্ব্বে পদচারণ করতে দেখি তখন সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করি—আবার যদি দেখতুম কোনো বাঙালী খালি গায়ে কাঁধের উপর একখানি চাদর ঝুলিয়ে এবং ফিন্‌ফিনে ধুতি পরে' অবিমিশ্র স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যে ডেকের উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে সমুচ্চস্বরে হাই তুলচেন, তাহলেও সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করতুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শান্তিনিকেতন। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

মেঘের সাগর

নীল আকাশের বুক্‌টা জুড়ে'
আজ্‌কে মেঘের হেলাফেলা,—
সাদায়-কালোয় ধূসর মিশে'
দেদার ভাসে, দেদার খেলা।
ধোঁয়ার 'পরে ছুট্‌ছে ধোঁয়া
মেঘের 'পরে মেঘের ছোটা,
ফাঁকে ফাঁকে নীলের বুকে
রবির হাসির উজল ফোটা।
ঢেউর 'পরে দুল্‌ছে রে ঢেউ
মেঘের সাগর উথ্‌লে ওঠে,
বিরাট কিসের নিবিড় স্বপন
সুপ্ত নীলের চিত্তে ফোটে!
নাইক রে ঠাঁই মেঘে মেঘে
কী এল রে আজ্‌কে ভেসে!—
জমাট-বাঁধা অশ্রু এ কার
থম্‌কে দাঁড়ায় অসীম দেশে!
নিবিড় শুধু বিপুল এ এক
ভুবন-ঘেরা স্নেহের মায়া;
কোন্ জননীর আঁচল এটি?—
বিশ্ব-মাতার বুকের ছায়া?
আজকে নিবিড় মেঘ-সায়রে
ঝাঁপিয়ে যাব, সাঁতার দিয়ে
এপার ওপার কর্‌বো ভেসে'
ডুবে' হেসে' জুড়িয়ে হিয়ে।
মেঘ-সাগরের বিপুল মাতন,
তুফান অসীম, গুম্‌রে ফোলা,
দোল দিয়ে যায় দেদার বুকে—
ঘর ছেড়ে যায় পরাণ ভোলা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কাস্থিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

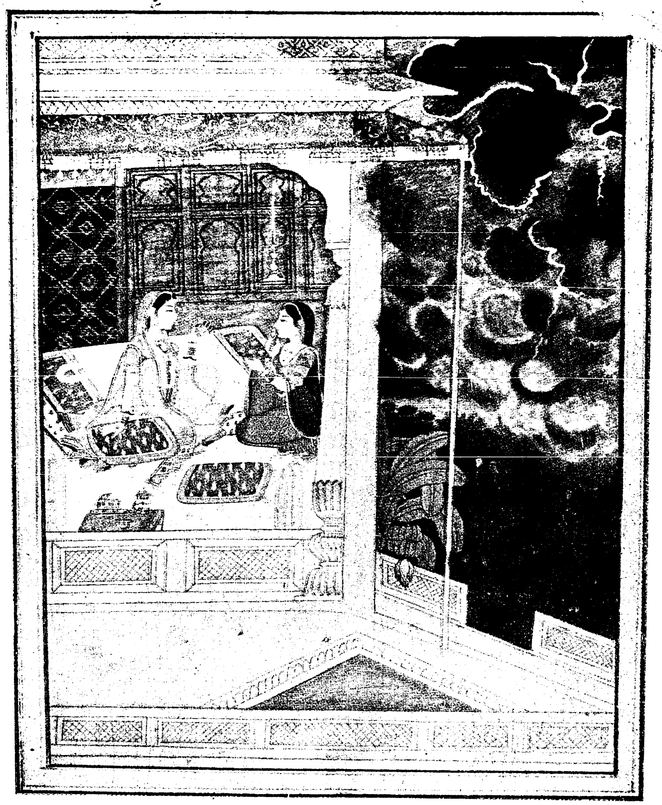

বিশ্রম্ভালাপ
প্রাচীন চিত্র হইতে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ লাইব্রেরী
ক্রমিক সং
৫৬
কলিকাতা।

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২৭ [৫ম সংখ্যা

ময়ূর-মাতন

ওকে আস্‌ছে গো মুখ ঢেকে লোর পর্দ্দায়!
ছেয়ে কদমের পেথমের ডোর জর্দ্দায়!
ওরে দূর থেকে দেখে মেতে উঠ্‌ল ভুবন,
তাই হাওয়া ফেরে ফর্‌ফর্ সর্‌ফর্দ্দায়!

কোন্ দেয়াসিনী রূপসীর বাজ্‌ল নূপুর!
তাই কেয়া-বনে দেয়া সনে মাত্‌ল ময়ূর!
মরি পাখ্‌নার ঢাক্‌নায় স্পন্দে তনু,
ভরি পালকের এস্‌রাজ পুলকের সুর!

—"ওরে! নড়্‌ল কি ঘোম্‌টার মেঘ্‌লা আষাঢ়?
ওরে! উড়্‌ল কি পর্দ্দার এতটুকু পাড়?
হেথা অন্তরে সন্তরে সাত পো স্বপন,
হোথা লাগ্‌ল কি ঢেউ তার জাগ্‌ল কি সাড়?"

কেকা- রব তুলে বলে শিখি টলে পায় পায়!
হানে লাবণির পশ্‌লা সে অবনীর গায়!
তার স্পন্দনে ছড়াছড়ি ইন্দ্রধনু!
তার গোপনের শিহরণে বীণ বেজে যায়!

আজি মন ফেরে মেঘে-মেঘে, অভ্র শিখায়—
খুঁজে দূর রাকা দূর রাস দূর রাধিকায়!
আজ আকাশের রুধি' দ্বার রসের রণন!
সারা দু'পুরের নূপুরের শিঞ্জিনিকায়!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

অবতার

৩

রাস্তার একধারে সারি-যাত্রি বড়-বড় গাছ—আর একধারে সুরম্য উদ্যান। সৌখিন লোকের ধূলিময় ও কোলাহলময় রাস্তা ছাড়িয়া, এই নিস্তব্ধ শান্ত সুন্দর রাস্তায় অতি অল্প লোকেই আসে; কিন্তু যারা একবার আসে, তারা এখানকার একটি কবিত্ব-ময় রহস্য-ময় আশ্রমের সম্মুখে না থামিয়া থাকিতে পারে না। ঈর্ষা-মিশ্র বিস্ময়ে তাহারা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন—যাহা অতি বিরল—ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে সুখ-শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই উদ্যানের গরাদের নিকট আসিয়া কে না একবার থমকিয়া দাঁড়াইবে, কে না উদ্যানের হরিৎ তরুপল্লব-রাশির মধ্য দিয়া একটি সাদা বাগান-বাড়ী নির্নিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিবে, এবং ফিরিয়া যাইবার সময় বিষণ্ণচিত্তে মনে করিবে, যেন তাহার সমস্ত সুখ-স্বপ্ন ঐ উদ্যান-প্রাচীরের পশ্চাতেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এই উদ্যানের সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের দুইধারে বড় বড় শিলাস্তূপের প্রাচীর। অসমান অদ্ভুত আকার দেখিয়াই যেন ঐ সকল শিলাখণ্ড বাছিয়া বাছিয়া ঐখানে স্থাপিত হইয়াছে। এই আবড়ো-খাবড়ো বেষ্টনের মধ্যে সুরম্য একটি হরিৎ দৃশ্য-পট যেন আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শৈল-প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ পার্ব্বত্য-বৃক্ষ অবস্থিত। নানাজাতীয় লতা প্রাচীরের গা বাহিয়া উঠিয়া প্রাচীরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহাতে করিয়া সভ্যতার কৃত্রিম উদ্যান অপেক্ষা অযত্নসম্ভূত স্বাভাবিক অরণ্যের ভাব ধারণ করিয়াছে। শৈল-স্তূপের একটু পশ্চাতে নিবিড় পত্র-পল্লবে আছন্ন কতক-গুলি সুভঙ্গিম-তরু-নিকুঞ্জ। তরুকুঞ্জের পর হরিৎ-শ্যামল শাদ্বলভূমি প্রসারিত, মখমল অপেক্ষাও পেলব—যেন গালিচা বিছানো রহিয়াছে—যেন উহা চোখে দেখিবারই জিনিস—যেন উহাতে পায়ের ভর সহেনা! সুঁড়িপথটি চালনী-ছাঁকা সূক্ষ্ম বালিতে আচ্ছাদিত, পাছে,: ভ্রমণকালে উচ্চকুলোদ্ভবা সুন্দরীদিগের সুকুমার পদ-পল্লব কাঁকর-বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হয়। ঐ বালির উপর বর-ললনাদের সুকুমার পদক্ষেপের ছাপ মুদ্রিত রহিয়াছে। বালু-পথটি হল্‌দে ফিতার মতো এই হরিৎ পরিসরের চারিদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে।

শাদ্বল-খণ্ডের প্রান্তদেশে, গুল্মাচ্ছন্ন জমির উপর গুচ্ছ গুচ্ছ টক্‌টকে জিরা-নিয়ম ফুলের যেন আতস-বাজি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত হরিৎ দৃশ্যের শেষে একটি অট্টালিকা। সম্মুখে সুগঠন সুঠাম পাত্‌লা পাত্‌লা থাম ছাদকে ধরিয়া আছে। ছাদের প্রত্যেক কোণে মর্ম্মর-প্রস্তর-মূর্ত্তি পুঞ্জীকৃত। মনে হয় যেন কোন ক্রোড়পতি খেয়াল-বশে গ্রীশদেশ হইতে একটি দেব-মন্দির উঠাইয়া আনিয়াছে। অট্টালিকার

দুইপাশ দিয়া দুই পক্ষের মত দুইটি উদ্ভিদ্‌গৃহ প্রসারিত; কাঁচের দেয়াল, সূর্য্যের কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—এবং দেশবিদেশের দুর্লভ বৃক্ষের চারা উহার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। উষার প্রথম রশ্মিপাতে যদি কোন কবি প্রাতে ঐ রাস্তা দিয়া গমন করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কোকিলের নৈশ-কুহুধ্বনির শেষ তানটুকু তখনও মিলায় নাই। কিন্তু রাত্রিকালে যখন অপেরা হইতে প্রত্যাগত গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, নিদ্রিত জগতের নিস্তব্ধতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই একই কবি অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন, একটি সুন্দর যুবা-পুরুষের হাত ধরিয়া শুভ্র ছায়ার মত কোন বিষাদ-মূর্ত্তি ললনা নিজ প্রাসাদ-ভবনে আরোহণ করিতেছেন।

এই বাড়ীতেই—পাঠক বোধ হয় অনুমান করিতে পারিয়াছেন—কৌণ্টেশ প্রাস্কোভি-লাভিন্‌স্কা ও তাঁর স্বামী কৌণ্ট-ওলাফ—লাভিন্‌স্কা কিছুকাল হইতে বাস করিতেছেন। এই সাহসী বীর সম্প্রতি ককেশশের যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই পুনর্ম্মিলনে প্রেমিক-দম্পতি আনন্দে উন্মত্ত। যে প্রেম পরিশেষে বিবাহে পরিণত হয় ইহাদের সেই বিশুদ্ধ প্রেমে দেব-মানব উভয়েরই অনুমোদন ছিল। কবি টমাস-মুর "দেবতার প্রেম" যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সেই ধরণের প্রেম। ইহার বর্ণনা করিতে গেলে, আমাদের কলমের মুখে, প্রত্যেক কালির মসি-আলোকবিন্দুতে পরিণত হইবে; কাগজের উপর একটা শিখা ফেলিয়া, সুরভি ধূপের একটা সুবাস রাখিয়া, প্রত্যেক শব্দ বাষ্পাকারে উবিয়া যাইবে। যে দুই আত্মা পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া আমরা তাহার বর্ণনা করিব? যেন দুই শিশিরাশ্রুবিন্দু, পদ্ম-পত্রের উপর গড়াইয়া একত্র মিলিত হইয়া, মিশ্রিত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া —শেষে একটি মুক্তাবিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। এই সংসারে সুখ জিনিসটা এতই বিরল যে, মানুষ তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ উদ্‌ভাবন করিতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু পক্ষান্তরে নৈতিক ও ভৌতিক কষ্ট-যন্ত্রণার অনুরূপ শব্দে, প্রত্যেক ভাষার শব্দকোষ পরিপূর্ণ।

ওলাফ ও প্রাস্কোভি শৈশব হইতেই পরস্পরকে ভাল বাসিত। একটী নামেই উহাদের উভয়ের হৃদয় স্পন্দিত হইত; শৈশব হইতে ঐ নামই উহাদের পরিচিত ছিল, উহাদের নিকট আর কোন লোকের যেন অস্তিত্বই ছিল না; প্লেটোর বর্ণিত একাধারে স্ত্রী-পুং দেহের দুই টুকরা সেই আদিমকালের বিচ্ছেদের পর যেন আবার উহাদের মধ্যে আসিয়া পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিল। যেন উহারা একত্বের মধ্যে দ্বিত্বরূপে গঠিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একই বাসনার আহ্বানে উহারা পাশাপাশি চলিত, অথবা একটি কপোতযুগল একই চেষ্টায় জীবন-পথে বিচরণ করিত, উড়িয়া বেড়াইত।

এই সুখের অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এইজন্য স্বর্ণ-বায়ু-মণ্ডলের মত অসীম ঐশ্বর্য্য উহাদিগকে ঘিরিয়া ছিল। এই

সুখী-যুগল কোথাও আবির্ভূত হইবামাত্র তত্রত্য দীনদুঃখীদের দুঃখের লাঘব হইত —চীর-বস্ত্র তখনই ঘুচিয়া যাইত, নয়নাশ্রু শুকাইয়া যাইত; কারণ, ওলাফ ও প্রাস্কোভির একটা উচ্চতর সুখের-স্বার্থপরতা ছিল, উহারা আপন সান্নিধ্যে কোন দুঃখ-কষ্ট সহিতে পারিত না।

কৌন্টের মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, ঈষৎ দীর্ঘ, সুগঠিত পাতলা নাক, ওষ্ঠ-যুগল দৃঢ়রূপে অঙ্কিত, সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা, গোঁফের দুই প্রান্ত ছুঁচাল, থুত্‌নী একটু ওঠানো ও খাদ-কাটা; কালো-কালো চোখ খুব তীক্ষ্ণ, অথচ দয়ার্দ্র। দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি, পাত্‌লা গঠন, স্নায়ু-প্রধান প্রকৃতি; দেহ অতি সুকুমার প্রতীয়মান হইলেও ইস্পাতের মত দৃঢ় পেশীজাল তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কোন রাজ-রাজড়ার বড় মজ্‌লিসে কৌন্ট যখন হিরক-খচিত জমকালো জরির পোষাক পরিয়া আসিতেন তখন তত্রত্য পুরুষদিগের ঈর্ষা হইত ও রমণীগণের হৃদয়ে প্রেমের আগুণ জলিয়া উঠিত। কিন্তু প্রাস্কোভি তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁর যেরূপ রূপ ছিল, তেমনি আবার মানসিক গুণও যথেষ্ট ছিল।

বুঝিতেই পারিতেছ, এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অক্টেভের সাফল্যের প্রায় কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এবং পাগলা ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো যতই আশ্বাস দিন না কেন,স্বকীয় পালঙ্কে পড়িয়া থাকিয়া শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভিন্ন অক্টেভের আর কোন উপায় ছিল না। প্রাস্কোভিকে বিস্মৃত হওয়াই একমাত্র উপায়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাঁর সহিত আবার সাক্ষাৎ করায় কি লাভ? অক্টেভ মনে মনে অনুভব করিত, এই রমণীর হৃদয় কোমল হইলেও যেরূপ অটল, তাহাতে তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কখনই শিথিল হইবে না; নিতান্ত আবেগহীন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আমাকে কেবল একটু কৃপাদৃষ্টিতে দেখিবেন এইমাত্র। অক্টেভের ভয় হইতেছিল পাছে যে ক্ষতের চিহ্ন এখনো বিলুপ্ত হয় নাই, সেই ক্ষতের মুখ আবার ফাটিয়া নূতন করিয়া বাহির হয় এবং পাছে সেই নির্দ্দোষ হত্যাকারিণীর চরণ-তলে তাহার রক্তাক্ত হৃদয় আবার লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু অক্টেভ তাহার ভালবাসার ধন ঐ মধুর হত্যাকারিণীর উপর হত্যার অভিযোগ আনিতে ইচ্ছুক ছিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রুষিয়ার সাহিত্যিক

পুশকিন রুষিয়ার সব চেয়ে বড় কবি। কিন্তু রুষিয়ায় বহুদিন তাঁর কবিতা অনাদৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। দেশের কবি যে সময় নিজের দেশেই আদর পান নি তখন বিদেশের লোক যে তাঁকে আদর করে কোলে তুলে নেবে সে রকম আশা করা বৃথা, কাজেই ঘরে বাইরে দু-জায়গাতেই বহুদিন অবধি পুশকিনের প্রতিভার তেমন কদরদান জোটে নি।

ক্রমে যেমন রুষিয়ার মধ্যে পুশকিনের কাব্যের সমাদর হতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে জর্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদ হতে লাগল। জর্ম্মানী ও ফরাসী এই দুই ভাষায় তাঁর সমস্ত কবিতার অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। শুধু যে তর্জ্জমা হয়েছে তা নয় বেশ ভাল তর্জ্জমা হয়েছে বলা যেতে পারে। ইংরেজীতে পুশকিনের কয়েকটী কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে বটে কিন্তু ইংরেজী ভাষার গুণে সেগুলো মূল কবিতা থেকে বড্ড দূরে সরে পড়েছে।

পুশকিনের কবিতার প্রধান গুণ ও বিশেষত্ব তার ভাষার মধ্যে। কবিতা গুলির ভাষা এত হাল্কা যে, তার ঠিক রুষীয় ভাব বজায় রেখে তর্জ্জমা করা ত একরকম অসম্ভব, আর সম্ভব হলেও সে যার-তার কর্ম্ম নয়।

তাঁর কবিতার মধ্যে গেটে, শিলার শেলি, ব্রাউনিং কি ভিক্তর হ্যুগোর কবিতার মতন উচ্চ ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু তাঁর ছন্দ, তাঁর ভাব প্রকাশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা এবং ভাষার উপর অধিকার দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। উচ্চ ভাবের কথা ছেড়ে দিয়ে এই দিক দিয়ে বিচার করলে বোধ হয় পুশকিনের মতন বড় কবি পৃথিবীতে আর দুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। ছোট-খাটো খুঁটি-নাটি ব্যাপার, সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, মানুষের মনের এক একটা ভাবকে এমন সহজে কথার ছবি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মতন আর দুটি নেই। তাঁর কবিতার এক এক জায়গায় সেগুলোকে এমন কায়দায় প্রকাশ করা হয়েছে যে পড়লে মনে হয় আর কোন রকমে, কোন কথা দিয়ে এটাকে এত ভাল করে প্রকাশ করা যেত না। এই খানেই পুশকিনের বিশেষত্ব। এই অনাদৃত কবিকে রুষিয়ার লোকে এখন দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে।

মস্কো সহরে এক বড় লোকের ঘরে পুশকিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের ঠাকুরদাদা একজন নিগ্রো ছিলেন। মায়ের দিক দিয়ে তাঁর শরীরে নিগ্রোর রক্ত ছিল। পুশকিনের বাবা, রুষিয়ার বড় ঘরের ছেলেরা সে সময় যেমন করে দিন কাটাত, ঠিক সেই রকমেই দিন কাটাতেন। ছেলেবেলা তাঁর ঠাকুরমা ও এক বৃদ্ধা দাসী তাঁর সঙ্গিনী ছিল। এদের নিকটেই তিনি রুষিয়ার

কথিত ও চল্‌তি ভাষা শেখবার সুবিধা পেয়েছিলেন।

একটু বড় হতেই আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তাঁকে সেণ্টপিটার্সবার্গে লেখা পড়া শিখতে যেতে হয়েছিল।

স্কুল থেকে বেরোবার আগেই কবি বলে দেশময় তাঁর সুখ্যাতি রটে গেল। এই সময় সেণ্টপিটার্সবার্গে তাঁর গুটি কয়েক বন্ধু জুটেছিল, তারা সব রাজনৈতিক আন্দোলন করে বেড়াত। এদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে অভিজাত সম্প্রদায় ও Serfdom রীতির উপর তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা জন্মায়। এই ঘৃণার উত্তেজনায় তিনি সেই সময় "স্বাধীনতা" নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে বিদ্রোহসূচক ভাব ত ছিলই তা ছাড়া তার মধ্যে তখনকার শাসন-নীতির উপর এমন শ্লেষ করা হয়েছিল যে রাজ-পুরুষদের পক্ষে সেটা সহ্য করা একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল। "স্বাধীনতা" কবিতার পরে উপরি-উপরি তিনি এই ভাবের আরও কতকগুলি কবিতা লিখেছিলেন। ১৮২০ অব্দে বাইশ বছর বয়সের সময় তিনি "স্বাধীনতা" নামক কবিতাটী লেখেন। এই কবিতা বের হবার কিছুদিন পরেই সরকার থেকে তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে কিশিনিয়ফ নামে একটা সহরে নির্ব্বাসিত করে দেওয়া হল। এইখানে এসে তিনি সাহিত্য চর্চ্চা একেবারে ছেড়ে দিয়ে দিনকয়েক যথেচ্ছাচারে দিন কাটিয়েছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি বেদেদের দলে ভিড়ে গিয়ে একেবারে তাদের মতন হয়ে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু পুশকিনের সেই প্রদেশের বাইরে যাবার হুকুম ছিল না, কাজেই যে দলে তিনি ঢুকতেন তারা যতদিন ঐ প্রদেশে ঘুরে বেড়াত তিনি তাদের সঙ্গে থাকতেন, তারা বাইরে চলে গেলেই আবার অন্য দল সন্ধান করে সেই দলে গিয়ে মিশতেন।

সেই সময় ইংলণ্ডের কবি বায়রণ এসে গ্রীসকে মাতিয়ে তুলেছেন। কবি বায়রণের প্রভাব তখন ইউরোপের প্রায় সমস্ত লোকের চেতনাকে একটু না একটু নাড়া দিয়েছিল। লুশকিন সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে জুটে পড়বার মতলব করছিলেন এমন সময় রাজপুরুষেরা সেই সংবাদ পেয়ে তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের জমিদারীর মধ্যে বাস করতে আদেশ দিলেন। এইখানে নির্ব্বাসনের সময়ে তিনি তাঁর সব চেয়ে ভাল কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন।

নির্ব্বাসিত অবস্থায় তিনি তাঁর পুরোন বন্ধুদের কথা ভুলে যান নি। ভিতরে ভিতরে তাদের সঙ্গে তাঁর ষড়যন্ত্র ও চিঠি পত্র চল্‌ত। ১৮২৬ অব্দে এই বিদ্রোহীরা যখন সদলবলে ধরা পড়ে তখন তাদের মধ্যে পুশকিনের নামও পাওয়া গিয়েছিল তবে পুলিশের লোকজন এসে পড়বার আগেই তিনি কাগজ-পত্র যা ছিল সব তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। নচেৎ তাঁকেও তাদের সঙ্গে সাইবীরিয়ায় চালান করে দেওয়া হত।

এই ঘটনার কিছু পরেই রাজা প্রথম নিকোলাস তাঁকে সেণ্টপিটার্সবার্গে ডাকিয়ে আনিয়ে রাজ দরবারে একটা সম্মানের

চাকরী দেন। কিন্তু এই চাকরী করা তাঁর আদপেই ভাল লাগত না। তিনি বরাবরই অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর চটা ছিলেন, এই চাকরীতে প্রতিপদে তাঁর সঙ্গে রাজ অনুগৃহীত ধনীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধত। তিনি এই সব খোসামুদের দলকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন, তারাও যে তাঁকে খুব সুনজরে দেখত তা নয়।

পুশকিনের স্ত্রী রুষিয়ার মধ্যে খুব একজন নামজাদা সুন্দরী ছিলেন। এই সুন্দরীকে বিবাহ করে তাঁকে চিরকাল পস্তাতে হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে মনের মিল তাঁর কোন কালেই হল না আর এই সুন্দরীর জন্যই কি একটা ব্যাপারে তিনি একজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীকে দ্বিরথ-যুদ্ধে আহ্বান করেন। এই যুদ্ধে ১৮৩৭ অব্দে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

রুষিয়ার সাহিত্যরসিকদের মধ্যে বরাবর একটা কথা নিয়ে ঝগড়া চলে আসছে। কথাটা এই যে, পুশকিন বড় কবি কি লারমনটফ বড় কবি। আর এক দল এই সমস্যার মধ্যে একটা মস্ত বড় "যদি" ঢুকিয়ে ব্যাপারটার একটা আপোষ—নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন। এই সম্প্রদায় বলেন যে যদি লারমনটফ বেশী দিন বাঁচতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই পুশকিনের চেয়ে ঢের বড় কবি হতেন। কিন্তু রুষিয়ার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই নবীন কবি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। সেখানকার সাহিত্যিকদের ভাগ্য অনুযায়ী লারমনটফেরও অপঘাত মৃত্যু ঘটেছিল। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে এক দ্বিরথ-যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

লারমনটফের দেহে স্কচ রক্ত ছিল। জর্জ্জ লিয়ারমন্‌থ নামে একজন স্কচ পোলাণ্ডে চাকরী করতেন, শেষে তিনি পোলাণ্ড থেকে রুষিয়ায় আসেন। এই জর্জ্জ লিয়ারমন্‌থই কবি লারমনটফের পূর্ব্ব-পুরুষ। লারমনটফের জননী খুব সাহিত্য রসিকা ছিলেন। শুনতে পাওয়া যায় যে, তিনি নাকি কবি ছিলেন কিন্তু তাঁর কবিতা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। কবির দুর্ভাগ্য বশতঃ তিন বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁর জননীকে হারিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় লারমনটফের জননীর মাত্র বাইশ বৎসর বয়স ছিল। কবির পিতা সৈন্য-বিভাগে কি একটা সামান্য চাকরী করতেন কিন্তু তাঁর মামারা খুব বড়লোক ছিলেন। লারমনটফ তাঁর মামার বাড়ীতেই মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর দিদিমা নাতিটিকে গরীব বাপের কাছ থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে মানুষ করতে লাগলেন।

লারমনটফ ছেলেবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি শিলার ও সেকস্পীয়ারের খুব ভক্ত ছিলেন কিন্তু একটু বয়স হতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে দিয়ে শেলী ও বায়রণের গোঁড়া হয়ে পড়লেন। ষোল বৎসর বয়সের সময় লারমনটফকে লেখা পড়ার জন্য মস্কো বিশ্ব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ঢুকতে হয়েছিল কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই সেখানকার একজন অধ্যাপকের সঙ্গে তিনি এমন ঝগড়া বাধালেন যে সেই অপরাধে

তাঁকে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হতে হল। মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে লারমনটফ সেণ্টপিটার্সবার্গের মিলিটরী কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হলেন এবং আঠার বৎসর বয়সে তিনি সেখানকার ঘোড়-সওয়ার দলের এক উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

"একদিন সকাল বেলা উঠে দেখলুম আমি একজন বিশ্ব-বিখ্যাত লোক হয়ে পড়েছি" এই বাক্যটী লারমনটফের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

বাইশ বৎসর বয়সে তিনি পুশকিনের মৃত্যু উপলক্ষে একটী কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাই তাঁকে যশের রাজ্যে টেনে নিয়ে গেল। এই কবিতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর স্বাধীনতার স্পৃহা কত প্রবল ছিল, নির্ভীক চিত্তে তখনকার রাজকর্ম্মচারী দের কি রকম ভাবে তিনি আক্রমণ করেছিলেন তা কবিতাটী না পড়লে বুঝতে পারা যাবে না। কবিতার একজায়গায় তিনি বলেছেন "রাজার সিংহাসনের চারদিকে একদল অবিবেচক অহঙ্কারী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছ, তোমাদের পেশা হচ্চে প্রতিভাবান লোকেদের ধরে ধরে ফাঁসি দেওয়া। তোমরা স্বাধীনতাকে ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছ, যশকে তোমরা নির্ব্বাসনে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছ। তোমাদেরই তৈরি আইন দিয়ে তোমরা নিজেদের ঢেকে রেখেছ, তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিচার করে পরিত্রাণের পথটাও বেশ সুলভ করে রেখেছ। কিন্তু ঘৃণ্য কাপুরুষের দল তোমরা কি জান না ঈশ্বরের বিচার বলে একটা জিনিষ আছে। তোমাদের বিচারের জন্য আর একজন ন্যায় বিচারক বসে আছেন তাঁকে তোমরা অর্থ দিয়ে কিংবা ছুটো খোসামোদের কথা বলে ভোলাতে পারবে না।.....আজ তোমরা যে মহাত্মার রক্তপাত করেছ তোমাদের শয়ীরের কালো রক্ত দিয়ে সে রক্ত ধুয়ে ফেলতে পারবে না বরং সেটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।" এই কবিতা ছাপা হবার আগেই হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সমস্ত রুষিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল।

দিন কয়েকের মধ্যেই সেখানকার ছেলে-বুড়ো সকলেরই এই কবিতাটা মুখস্থ হয়ে গেল।

কবিতাটী প্রকাশিত হওয়া মাত্র লারমনটফকে পাকড়াও করা হল। সঙ্গে-সঙ্গে বিচার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়ে তাঁকে সাইবীরিয়ায় চালান করে দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাজ-সরকারে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের অনেক চেষ্টায় তিনি নির্ব্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। তবে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল। তিনি সৈন্য-বিভাগে চাকরী নিয়ে সে সময় ককেশাস প্রদেশে বাস করছিলেন তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হল।

এই পার্ব্বত্য-প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য লারমনটফের প্রাণে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কবিতার মধ্যে এই ককেসাস প্রদেশের দৃশ্যের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে যে সেগুলো পড়লে প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করবার তাঁর কি রকম অসীম ক্ষমতা ছিল, তা বুঝতে পারা যায়; শুধু তাই নয়, ককেসাস প্রদেশের একটা মোটামুটি ভৌগোলিক ধারণাও হয়ে যায়।

মহাকবি সেকস্‌পীয়র কিং লিয়ার নাটকে একজায়গায় সমুদ্রের বর্ণনা করেছেন; টুর্গেনিফ সেক্সপীয়ারের এই বর্ণনাকে বলেছেন যে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা একমাত্র সেক্সপীয়ারেরই পক্ষে সম্ভব। কিন্তু রুষিয়ার এই যুগের একজন সমালোচক বলছেন যে লারমনটফের এই বর্ণনার সঙ্গে সেক্সপীয়ারের সমুদ্র বর্ণনার তুলনাই হয় না। লারমনটফের বন্ধু ও তাঁর কবিতার সমালোচক বেডেনষ্টেড (জর্ম্মাণ) বলেন যে তাঁর দৃশ্য-বর্ণনায় তিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও naturalist দুই শ্রেণীর লোককেই মোহিত করেছেন।

লারমনটফের মধ্যে শেলির প্রভাব খুব বেশী রকম দেখতে পাওয়া যায়। তিনি শেলীর প্রমিথিয়স বাউণ্ড পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শেলীর অনুকরণ করেন নি। মানুষের মনের ভিতরকার সৎ ও অসতের যে দ্বন্দ্ব কবি শেলীর মনকে নাড়া দিয়েছিল, যে প্রবৃত্তিটা সামাজিক, রাজনৈতিক ও চলতি নীতির বাধন ছিঁড়ে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস সেবন করবার জন্য মানুষের বুকের মধ্যে দিন-রাত মাথা খুঁড়ে মরছে, কবি লারমনটফ মানুষের সেই চিরন্তন স্বাধীনতার ইচ্ছাটাকে ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। লারমনটফ কি কারণে তখনকার ফরাসী রাজ-প্রতিনিধির এক ছেলেকে দ্বিরথ-যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে আবার ককেসাস প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হয়। এখানে আর একটী দ্বিরথ-যুদ্ধে সাতাশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধের অবতারণা করা হয়েছিল এবং যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে তাঁকে হত্যা করা হয়। কবি লারমনটফের মৃত্যুর ইতিহাসটা কবি পুশকিনের মৃত্যুর ইতিহাসের মতই রহস্যজালে আবৃত। কবিতা ছাড়া পুশাকিন ও লারমনটফ দুইজনেই উপন্যাস লিখেছিলেন। এ উপন্যাসগুলির এখন খুব আদর বেড়েছে।

পুশকিন ও লারমনটফের যুগে সমস্ত রুষিয়ার সাহিত্যে একটা নব জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এই যুগে সেখানে ডেলউইগ, ব্যারাটিনস্কি, ইয়জিকফ ভেলোভটিনফ, প্রিন্স আলেকজন্দর ওডোনভস্কি প্রভৃতি আরও ক'জন বড় কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু পুশকিন ও লারমনটফের কবিতার মধ্যে যে বিশ্বজনীন ভাব ফুটে উঠেছিল, এঁদের মধ্যে তা কিছু ছিল না, তবে এঁরা রুষ সাহিত্যকে অনেকগুণে ধনী করে দিয়ে গিয়েছেন। এই কবিদের মধ্যে অনেককেই জীবনে বহুবার রাজদণ্ড সহ্য করতে হয়েছিল। কেউ কেউ আবার রাজা ও রাজপুরুষদের অত্যাচারে প্রাণে পর্য্যন্ত মারা গিয়েছিলেন।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

সোনার ফ্রেম্

(গল্প)

রায়বাবুদের বাড়ী আমি যখন প্রথম চাকরি নিয়ে ঢুকি, তখন তাঁদের বাগানের মালী বেচন সর্দারের মেয়ে বিলাসী এগারো বছরের, ছোট্ট, এতটুকু। বুদ্ধির প্রভায় উদ্ভাসিত ছোট একটি হাসিমুখকে ঘিরে মস্ত এক বোঝা ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল দেখে মনে হত, যেন কালো অন্ধকারের বুকের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের টলটলানি!

দিনের মধ্যে একটিবার পূর্ণিমার হাসি রাহুগ্রাসে পড়ে মলিন হয়ে আস্‌ত। সেই যখন তার বড় যত্ন দিয়ে স্নেহ দিয়ে, তার শিশু-জীবনের সমস্ত আগ্রহ নিছিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা পিঙ্ক্ প্যান্‌সি যুঁই চাঁপা হলিহক ক্রিসেন্থিমামের গাছগুলোকে নিঃস্ব করে মুড়িয়ে ছোটবাবুর জন্যে তোড়া তৈরি হত, আর ছোটবাবু উপহারের টিকিট লাগানো সেই তোড়া হাতে করে কুলু-খানসামার সঙ্গে বাড়ীর সুমুখকার পথটি দিয়ে নেমে বেড়াতে চলে যেতেন। বাগানের রাস্তা পার হয়ে যাবার পথে সুবিধা পেলেই বিলাসীকে ছোটখাটো একটি ঠোনা, তার চুলের গুছি ধরে একটু টান দিয়ে যাওয়া ছিল তাঁর নিত্য কাজ। বিলাসী তবু কোমরে আঁচলটি জড়িয়ে খুর্‌পি হাতে করে নিঃশব্দে গেটের দরজা অবধি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ত, তারপর লোহার কপাটে ভর দিয়ে ফুলগুলির চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত,—যেন শিল্পীর আঁকা ছবি!

ছোটবাবুর বয়স তখন উনিশ;—যে বয়সে মানুষ নিজেকে ভালো করে জানে না, কিন্তু দুনিয়ার সঙ্গে তার জানাশোনা সুরু হয়ে যায়। কাকে ফুল দিতে হয়, তার কার জন্যে কেশাকর্ষণ-ব্যবস্থা, তা-সবই তার জানা আছে, কিন্তু এর কোনোটাই হাত বাড়িয়ে তার মনের নাগাল পায় না। তাই এক-একদিন হঠাৎ ব্যথা পেয়ে বিলাসী যখন উঃ করে ওঠে, বা আঁচলে মুখ ঝেঁপে বড় অপমানের কান্নাকে লুকোবার চেষ্টা করে, তখন ছোটবাবু ছোট্‌বার পথে থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়। হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে 'ছিঁচকাঁদুনে নাকে...,' বল্‌তে বল্‌তে তার মুখখানি আপনা থেকে কালো হয়ে আসে। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে বিলাসীর ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটিকে দুই করতলের মধ্যে নিয়ে উঁচু করে ধরে বলে, "তোর লাগ্‌ল, বিলাসী?"

বিলাসীর কান্না লুকানো আর হয় না!...

ক্রমে এমন হলো, ছোটবাবুর হাতে ছোটখাট একটু প্রহার যেদিন তার না জোটে বিলাসীর সেদিন কেমন খালিখালি লাগে। ঘরের কাজে বাগানের কাজে মনটা বস্‌তেই চায় না, কেবল উড়ু উড়ু করে। বাগানের যে পথটা থেকে ছোটবাবুর জান্‌লা চোখে পড়ে, কেন যে সেখান দিয়ে মৃদু লঘু পদে পহর ধরে সে পায়চারি করে বেড়ায়, তা সে নিজেই ভালো করে জানে না। তার মা জলের কলসীটাকে কাঁখ থেকে নামিয়ে মুখ উঁচু করে ডাকে, 'বিলাসী!' জান্‌লাটার দিকে চকিত চোখে একবার ফিরে তাকিয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতো সে ছুট দেয়, একেবার তার মায়ের বাহুমূলে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'যাই মা!'

এই রকম করে কয়েকটা বছর কাট্‌ল। বিলাসীর বয়স এখন ষোল, ছোটবাবুর চব্বিশ। কতদিন যে ছোটবাবু বিলাসীর চুলের গোছা ধরে টেনে দেয়নি, তার চুড়ি ভেঙে দিয়ে তাকে কাঁদায়নি! তার মনের তাচ্ছল্য আজ আত্মোপলব্ধিতে সচেতন, তার আর বিলাসীর মধ্যে একটা জন্মান্তরের তফাৎ; যদিও পৃথিবীর বুকের একটি স্নিগ্ধশ্যামল ছায়াশীতল স্নেহ-নীড়ে, একই বাতাসের স্নেহস্পর্শে, আলোকের সোহাগ-দৃষ্টির নীচে তারা দুটিতে পাশাপাশি বড় হয়ে উঠেছে।... বিলাসীর মন এ তফাৎকে এ ব্যবধানকে মান্‌তে চায় না। তার কেবলি মনে পড়ে সেই পুরানো দিনের কথা, ছোটবাবুর সেই-সমস্ত মমতায় ভরা নির্ম্মমতা, সেই মান অভিমানের হাজারো খুঁটিনাটি! সেগুলোকে এতদিন ধরে এতবার সে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছে যে তার কোনো তুচ্ছ একটু জায়গার রঙ এতটুকু মলিন হতে পায়নি। তার কেবলি মনে হচ্ছে, এ যেন সেদিন! মাতাল স্মৃতির কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে খেয়ে তার মন প্রতীক্ষার ক্লান্তিকে আমলই দিতে চায় না।

দিনের মধ্যে দুটিবার সে তার দয়িতের দেখা পায়। ঝাঁকড়া চুলের বোঝাটাকে সাধ্য মতো গুছিয়ে, দু-একটা টক্‌টকে লাল ফুল কাঁপা হাতে মাথায় গুঁজে, মাটি-মাখা হাতটাকে চট করে শাড়ীর প্রান্তে মুছে নিয়ে সে পথের একপাশে সরে দাঁড়ায়। বই হাতে করে তার অত্যন্ত কাছের জায়গা দিয়ে ছোটবাবু চলে যান। তাঁর দুটি চোখের অর্থহীন অলস দৃষ্টি বিলাসীর দুটি ধ্যান-নয়নের উপর এসে পড়েই ঠিক্‌রে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়, কিন্তু ঐটুকুতেই তার কানায় কানায় ভরা সুপ্ত নারীত্ব বন্যাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এ দৃষ্টি যে কত জায়গাতেই কত ভাবে ফেলা-ছড়া করে পড়ে, সে খোঁজ নেবার তার প্রয়োজনই হয় না।

সে কি কিছু আশা করে? রোজ এই দুটিবার চোখের চাওয়ার মধ্যে তাকে পাওয়া ছাড়া আর কোনো নিবিড়তর সুখের ইঙ্গিত তার মনে কি কখনো উঁকি-ঝুঁকি দেয়?

—বলা শক্ত। মন যেমন করে মনকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চল্‌তে পারে এমন আর কিছু নয়। কোনোরকম বোঝাপড়ার মধ্যে না গিয়েই বিলাসীর ক্ষুদ্র অনাড়ম্বর জীবনটি তার নিজেরই অজ্ঞাতে প্রতীক্ষার মতো হয়ে গড়ে উঠ্‌তে থাকে।...

হঠাৎ একদিন খবর এল, ফুল চাই। ছোটবাবুর ফুলের দর্‌কার হয়েছে। বিলাসীর সেদিন আর ছোটবাবুর কলেজ যাবার পথটিতে এসে দাঁড়াবার সময় হলো না। সারা দিন ধরে কত রকম ফুলে কত তোড়াই যে বাঁধা হলো, একটা যদি তার মনে ধর্‌ত! তার অন্তরের পূজা-

নিবেদনের কাছে পৃথিবীর সমস্ত পুষ্পসম্পদ লজ্জা পায় যে! ছোটবাবুর চর বার বার এসে হাঁক ডাক করে অস্থির হয়ে ওঠে, হাতের তোড়াটির উপর নিবিড় চোখে ঝুঁকে পড়ে কাতর মিনতির স্বরে সে বলে, 'আর একটু সময় আমায় তোমরা দাও গো, অত মেহনতের কাজটাকে তাড়াতাড়িতে নষ্ট কর্‌তে বোলো না।'

সমস্ত বাগান উজাড় করে সমস্ত দিনে তার মনের প্রেম-প্রস্থনের অনুরূপ করে তার শেষ তোড়াটি বাঁধা হয়। বেচনের হাতে করে সেটিকে উপরে পাঠিয়ে, অন্ধকার ঘরে অবাধ্য বুকটার সঙ্গে সে বোঝাপড়া কর্‌তে বসে। কিন্তু একদিন দেখা গেল, সেই পুরানো দিনের মতোই টিকিটের নির্দ্দেশ কণ্ঠে নিয়ে তার এত যত্নে গড়া ফুলের অর্ঘ্য বাইরে রাজপথে জন-প্রবাহের সঙ্গে ভেসে চলেছে। এর পর এত বড় পৃথিবীতে তার ঠিক দামটি বোঝে, এমন কেউ একজন রইল না।...

রোজ ছোটবাবুর ফুলের দর্‌কার হয়, বিলাসীর চোখের সুমুখ দিয়ে তার বুকের শিরা ছিঁড়ে চয়ন করা ফুলের রাশি তার দিকে চেয়ে পরিহাসের হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে রোজকার মতো একই পথে চলে যায়। বিলাসী টেনে টেনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর বুকে শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এসে ক্ষিপ্র হাতে গাছের গোড়ায় নিড়েনি চালাতে থাকে।

তারপর একদিন, যে পথে ফুলগুলি অদৃশ্য হত, সেই পথ দিয়ে একটি সুন্দরী তরুণী দেখা দিতে এলেন। সেই ফুলগুলিই যেন তাদের হাসিকে পেলবতাকে জমাট করে নিয়ে ফিরে এল।—তারই ফুলগুলি!... বাগানের কাজ ফেলে সেদিন সে বড় দুঃখে তার ঘরের কোণে গিয়ে পড়ে রইল।—আর না, ভুল যদি ভাঙ্‌ল, তাকে গড়্‌বার পণ্ডশ্রম করে নিজের পরাজয়ের আয়ুকে আর বাড়িয়ে দেওয়া নয়! বিলাসী জোর করে চোখের জলকে চেপে রইল।

কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে!—

ঘরের কোণে বসেও গির্জ্জার ঘড়িতে দশটা কখন বাজ্‌বে সেইদিকে তার কান পড়ে থাকে যে! ময়লা দেয়ালগুলো স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে তার চোখের সামনে জেগে ওঠে রাজপুত্রের মতো একটি তরুণ নয়ন-মনোহর মূর্ত্তি।—ঐ সে বইয়ের বোঝা বগলে করে সিঁড়ির দু-তিনটা করে ধাপ একসঙ্গে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নীচে নেমে আস্‌চে।—বাগানের লাল সুর্‌কি বিছানো পথ তার জুতোর পেষণের তলায় মরমর করে বেজে উঠ্‌চে। শিস্ দিতে দিতে সে চলেছে। যেখানে কৃষ্ণচূড়ার গাছটাকে ঘিরে একটা রাধাঝুম্‌কার পল্লব-বহুল আলিঙ্গন পথের মোড়টাকে আড়াল করে রেখেছে সেইখানে এসে সে থাম্‌ল।—তার মুখের শিস্ মুখেই থেকে গেল।—ঝুঁকে পড়ে গলা বাড়িয়ে গাছের চারদিকটাকে সে একবার দেখে নিলে, তারপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে কান খাড়া করে থেকে আবার জুতোর শব্দ কর্‌তে কর্‌তে শিস্ দিতে দিতে মোড় ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে গেল।... বিলাসীর চিন্তাস্রোতকে প্রহত করে তার মা ডাকে, 'বিলাসী, তোর ভাত জুড়িয়ে যায়!'

বিলাসী বলে, 'আমি আজ খাব না মা, শরীরটা ভালো নেই,' বলে পাশ ফিরে শোয়। সেদিনকার জন্যে জীবনটাতে কিছু আর তার প্রার্থনীয় থাকে না।

কয়েকদিন মনটাকে উপবাসী রেখে দ্বিগুণিত ক্ষুধা নিয়ে বিলাসী শেষে একদিন আপনা থেকেই তার বরণ-করা কারাবাস থেকে বের হয়ে এল।—দশটা বাজ্‌তে তখনো বাকী আছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছটার তলায় ঝরা পাতার ভিড় দেখে তার চোখ ফেটে কান্না আস্‌ছিল। বাগানের আনাচে-কানাচে ঝোপে-ঝাড়ে জঙ্গলে বিলাসীর এই কদিনকার অনুপস্থিতি উদ্বেগের মতো হয়ে আঁকা পড়েছে। এ উদ্বেগ যেন আরো একজন কার—

কিন্তু গির্জ্জার ঘড়িতে দশটা—এগারোটা—বারোটা বেজে গেল, সেই 'একজনের' তবু দেখা নেই! বিলাসী ভয়ে ভয়ে বাড়ীটার চারপাশ ঘুরে এল, বাড়ীতে জনমানুষের সাড়া নেই, সব জান্‌লা গুলো বন্ধ। তার মনে হতে লাগ্‌ল, যেন তার অনুপস্থিতির ফাঁকে তার সমস্ত অতীত জীবনটা তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে চুপচাপ সরে পড়েছে। তার বাবা দুহাতে একটা বড় কাস্তে চালিয়ে চালিয়ে ম্যাগ্নোলিয়ার গাছের চারিদিককার ঘাসের জমিটুকুকে সমান করে ছেঁটে দিচ্ছিল, তার কাছ থেকে খবর নিয়ে সে জান্‌লে ছোটবাবুর বিয়ে,—তাই রায়বাবুরা ছেলেপিলে নিয়ে তাঁদের দেশের বাড়ীতে চলে গেছেন, হপ্তাখানেক পর বিয়ের গোলযোগ মিট্‌লে আবার সহরে ফির্‌বেন।

বিলাসীর জান্‌তে ইচ্ছে হলো, কবে গেছেন। তখন কি তার অভিমানের অনাদর কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়, রঙনের ঝোপে ঝোপে, গন্ধরাজের ঝাড়ে ঝাড়ে রুক্ষ হয়ে ফুটে ওঠ্‌বার অবসর পেয়েছিল? কিন্তু জিজ্ঞাসা কর্‌তে তার সাহস হলো না। শাড়ীর আঁচলটাকে ভালো করে কোমরে জড়িয়ে একটা কাঁচি নিয়ে রঙনের সারির বাড়্‌তি পাতাগুলোকে সে ক্ষিপ্র হাতে ছেঁটে দিতে লাগ্‌ল।

সেদিন সূর্য্যাস্তের আগেই সারা বাগানটার হারানো শ্রী আবার পুরোপুরি ফিরে এল। সমস্ত বাগানটাতে কোথাও একটি শুক্‌নো ঝরা পাতা অথবা পাপ্‌ড়ি-ঝরা ম্লান ফুলের চিহ্ন রইল না। মেহেদির সার দিয়ে ঘেরা তকতকে ঘাসের জমিগুলির উপরে দিন-শেষের সোনালি আলোর রেশগুলি যেন ছুটোছুটি করে গড়াগড়ি দিতে এল।

ছোটবাবু সপরিবারে দেশ থেকে যখন ফিরে এলেন তখন বাগানের পথে পা দিয়ে তাঁর মনে হলো, তাঁর হৃদয়াধিকারিণীর বাসের যোগ্য বটে! তরুণী বধূর বুকটি আনন্দে গর্ব্বে দুরু দুরু কেঁপে উঠ্‌ল। কেউ জান্‌লে না কত বড় আত্মঘাতী একটা ফাঁকির মুখোস এর পাতায় পাতায়, এর ফুলে ফুলে। কত বড় বেদনার অশ্রুনিষেকে এর এই সতেজ শ্যামল স্বাস্থ্য।

মানুষের নিজের উপর নিষ্ঠুর হবার যত-খানি সুবিধা আছে, অপরের বেলায় তত নাই, তার কারণ নিজের বুকের মধ্যেকার বেদনা-বোধের অন্ধিসন্ধি তার একেবারে তন্ন তন্ন করে জানা থাকে। বিলাসী আজ ছোটবাবুর খাসমহলের ঝাড়্‌দারণী। রাত্রিশেষে বাসক-

উৎসবের অবশেষ ছিন্ন মালার ফুল তাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হয়, ঘরের মেঝেতে ছোট একটি ছুটি অলক্তক-চিহ্ন তাকেই আঁচল বুলিয়ে মুছতে হয়, সে দাগ শোণিত-চিহ্ন হয়ে তার নিজের বুকে আঁকা পড়ে।

যার জন্যে তার এই দুঃখের সাধন, দিনান্তে একটিবার সে তার দেখা পায় না। কলেজের পালা চুকেছে।

তারপর একদিন, ভোর থেকেই দিনটা কেমন মেঘাচ্ছন্ন, ঘোর-ঘোর। সমস্ত আকাশ ভরা একটা বুকফাটা থুম্‌থমে কান্না। এমন দিনে চারিদিকটা এ-রকম নিবিড় হয়ে চেপে আসে, যে দুর্লভ প্রিয়তমকেও অত্যন্ত কাছে, একই মেঘাবেষ্টনের মধ্যে অনুভব করে মন উদাস হয়ে ওঠে! পাশের ঘরে তরুণী বধূ অর্গান বাজিয়ে গান ধরেছে—

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা……

ওগো, নিজে মিলনকে পরিপূর্ণ করে পেয়ে কোন্ হতভাগিনীর লুকানো মনের অব্যক্ত মিলনাশাকে বাইরে টেনে এনে তোমার এই পরিহাস? মরে গিয়ে অশ্রুর অতলতায় সে আশার ত সমাধি হয়ে গেছে গো, আকাশ-ভরা আলোর এক কণাও সেখানে গিয়ে পৌঁছোয় না! বিলাসীর শিথিল হাতের মুঠো থেকে ঝাড়ুগাছটা খসে পড়ে গেল, দুহাতে বেদনাতুর বুকটাকে চেপে ধরে একটা শিফোনারের উপর মাথা গুঁজে কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। ছোট বাবুর সোনাবাঁধানো ছোট একটি ফটোগ্রাফের সুমুখে তার এলানো কালো চুলের বোঝাটাকে মনে হচ্ছিল, তার অন্তরের সঞ্চিত নৈরাশ্যের নিবেদন।

মাথা তুলে বিলাসী ছবিটিকে প্রথম দেখলে। ফ্রেমের সোনাটাকে অন্যরকমে ব্যবহার করা হবে বলে সেটাকে সেই দিনই বাইরে বের করে রাখা হয়েছিল। দুহাতে সেটাকে খাবলে নিয়ে বিলাসী ভয়ে ভয়ে একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে, তারপর মাটির উপর জানু পেতে বসে নির্নিমেষ চোখে দেখতে লাগল। চোখ দুটি ছাড়া তার আর সমস্ত অঙ্গ তখন কাঁপছিল। আলো লেগে ছবিটা ফিকে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে, তবু সেটাকে দৃষ্টি দিয়ে গ্রাস করতে তার ইচ্ছে যাচ্ছিল। হায়রে ভোগ, চোখের একেবারে কাছে আনলে সব ঝাপ্‌সা হয়ে যায় আবার একটুখানি দূরে রেখেও তৃপ্তি হয় না।

হঠাৎ খট করে কিসের একটা শব্দ হতেই ছবিটাকে তাড়াতাড়ি জায়গামতো রেখে দিয়ে ঝাড়ুগাছটাকে উঠিয়ে নিয়ে সে আবার ঘর ঝাঁট দিতে লাগল।

সমস্ত দিন সেই ছবি তার মনটাকে পেয়ে বসে রইল। আরো দিন-দুই ছবিটাকে নেড়েচেড়ে দেখে একদিন সূর্য্যাস্তের আধ-আলো-অন্ধকারে সে সেটাকে চুরি করলে।

চুরি, হাঁ চুরিই ত! ছবির মুখে ঐ যে অস্ফুট হাসিখানি, এ ত তার জন্যে হাসা নয়। এর দিকে চাইতে গেলে চোখের জল যে দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে দেয়।...তবু সে যে তার প্রিয়তমের জন্যে এই চুরি করেছে তাই ভেবেই চুরি তার গর্ব্বে ভরে উঠল। যাকে জীবন ভরে কিছু দেওয়া চলবে

না, তার জন্যে অপরাধ করেও কতক সুখ!

কিন্তু বিনা-অপরাধেই চোখের জলের জোয়ার যার ঘোচে না, সে যে অপরাধ করে সুখ ভোগ করবে, ন্যায়ের দেবতা এ কিছুতেই সইতে পারেন না। রায়বাবুদের বাড়ীর পাইক এসে তার জীবনের সবার বাড়া সুখের সঙ্গে সবার বাড়া লজ্জাকে টেনে বার করলে সমস্ত জগতের চোখের সাম্‌নে। সে যে চোর, আজন্ম রায়বাবুদের খেয়ে পরে তাঁদের সোনায় লোভ করে, এ কথাটা জানাজানি হয়ে গেল; কিন্তু যে সত্যটি লুকানো রইল একখানি ক্ষুদ্র বুকের পঞ্জরাস্থির অন্তরালে, রক্তগতির ভাষার মধ্যে,—আকাশের আলোয় ছলছল চোখ নির্নিমেষ হয়ে তার উপর ফুটে রইল, সে খবর আর কেউ জান্‌লে না!

ছোটবাবু বেচনকে ডেকে বল্‌লেন, 'বিলাসীকে ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌চি, সে শেষটায়...'

বেচন মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে বল্‌লে, 'দোষ তার নয় হুজুর, বুড়োবয়সে এ দুর্ম্মতি আমিই তাকে দিয়েছি।'

ছোটবাবু ভেবে বল্‌লেন, 'কিন্তু তুমি যে আমার অনেকদিনের পুরানো চাকর, তোমাকে ছাড়িয়ে দিই কি বলে?'

সে বল্‌লে, 'আমায় ত ছাড়্‌তেই হবে। লোকে চোর বলে আঙুলে ইসারা করবে, এ সয়ে ত আমি থাক্‌তে পারব না, হুজুর!'

তারা যেদিন, যাবে, ছোটবাবুর পত্নী সুলোচনার সেদিন চুল বাঁধ্‌তে মন উঠ্‌ল না। ভাবনায় অবসন্ন শরীরটি নিয়ে স্বামীর পাশে ঘেঁসে এসে বসে তিনি বল্‌লেন, 'বিলাসী চুরি করবে, এ আমি বিশ্বাস করিনে...এ আরেকটা কিছু···তোমরা জানো না...'

ছোটবাবু তাঁর কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন।—কিন্তু হাস্‌তে তাঁর কেমন ইচ্ছে হচ্ছিল না।

সমস্তটা দিন ভেবে ভেবে বিকেলের দিকে বিলাসীকে চুপি চুপি তিনি ডেকে পাঠালেন। সে এলে ফ্রেম থেকে নিজের ছবিটাকে খুলে টেবিলের উপরকার বাজে কাগজের ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে, সোনার শূন্য বেষ্টন-টাকে তার দিকে এগিয়ে ধরে বল্‌লেন, 'এ জিনিষটি তোমাকে আমি দিচ্চি; এরপর আর কারুর কিছুতে লোভ করো না।...'

এক মুহূর্ত্ত বিলাসীর চোখদুটো জ্বলে উঠ্‌ল। তখনি সেটাকে দমন করে স্থির অকম্পিত গতিতে এক পা এক পা করে সে এগিয়ে এল। তারপর হাত বাড়িয়ে জীবনে এই প্রথম প্রিয়তমের হাত থেকে পাওয়া তার পরম পুরস্কারকে সে গ্রহণ করলে, তার চরম শাস্তিকে!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

তিলক

অটল যে-জন দাঁড়িয়ে ছিল অনেক নির্য্যাতনে
মর্য্যাদারি মৌন ধ্বজা তুলে,
প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ লোকের নিষ্ঠাপূত মনে,
চিতায় শুয়ে আজ সে সিন্ধুকূলে!

মারাঠা যার চরণ-পীঁড়ি,—কীর্ত্তি দিগ্বিদিকে,
দৃষ্টিতে যার উঠ্‌ত কমল ফুটে,
বাংলা-মুলুক সত্যি ভালো বাস্‌ত যে বর্গীকে
নেই রে সে আর হৃদয় নিতে লুটে!

তীর্থ হ'ল কয়েদখানা যাহার ইন্দ্রজালে,
নির্ব্বাসনে কাঁপ্‌ত না যার হিয়া,
দিল যে-জন দীপ্তি-তিলক দৃপ্ত দেশের ভালে
বজ্র-মেঘের বিদ্যুতে নিছিয়া ;—

'কেশরী' যার বাহন ছিল—দোসর দেশের শুভ,
স্বাতন্ত্র্যে যে ছিল রাজার মত,
'স্বরাজ' ছিল স্বপ্ন যাহার, স্বদেশ-প্রীতি ধ্রুব,
সেই মহাপ্রাণ আজ্‌কে মরণ-হত!

সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা সে যে মর্দ্দ তেজের ছবি—
নয় কোনোদিন ত্রস্ত জুজুর ভয়ে ;
ভিক্ষা-পন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী,
স্পষ্ট কথা বল্‌ত ঋজু হ'য়ে।

খোসামোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই,
আড়াই-কড়ার অনারেবল্ নয় ;
সে ছিল লোক-মান্য তিলক, তুলনা তার নাই,
জাতীয়তার তিলক সে অক্ষয়!

হৃদয়ে তার নিত্য-উদয় শক্তিরূপা মাতা,
ললাটে তার বেদের সরস্বতী ;
ভারত-রথের রথী ক'রে গড়েছিলেন ধাতা—
ছত্র-চামর-বিহীন ছত্রপতি!

ভুল-সময়ে এসেছিল হঠাৎ কেমন ক'রে,
বিদায় নিল তেম্‌নি আচম্বিতে,—
খুঁজ্‌ছে যখন দেশের হৃদয় খুঁজ্‌ছে সকাতরে
যুগের যজ্ঞে পৌরোহিত্য নিতে।

কারার শেষে ঘরে এসে পায়নি সে যার ছাথা,
সেই সতী আজ ডাক দিয়েছে বুঝি,
বৈতরণীর তরণীতে তাই পাড়ি দ্যায় একা
তারার আলোয় পায়ের অঙ্ক খুঁজি'।

চ'লে গেল ডুবিয়ে মশাল ভরা ঘিয়ের ঘটে
স্বদেশ-প্রেমের সজীব মন্ত্র দিয়ে।
চলে গেল কর্ম্মী ত্যাগী, অস্ত-সাগর-তটে
শরীর রেখে হঠাৎ ছুটি নিয়ে।

চ'লে গেল মৃত্যু-পারে, রেখে অমর-স্মৃতি,
যম-জয়ী যে তার জীবনের ভাতি,
ভবিষ্যতের অন্ধকারে তার সে ভারত-প্রীতি
জাগ্‌বে যেমন বাতি-ঘরের বাতি।

তার সে চিতার ভস্ম-কণা উড়ে হাওয়ার ভরে
পড়্‌বে যেথা নূতন তিলক হবে,
শ্মশান-শিবা যতই বলুক, সত্য-শিবের বরে
কীর্ত্তি তাহার অমর হ'য়ে রবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মার্জ্জনা

৩

খোকাকে বিলেত পাঠাতে হলো। সে সুখ্যাতির সঙ্গে গণিত-শাস্ত্রে এম, এ পাশ করেছিল। তার মনের বড় বাসনা যে কেম্ব্রিজ থেকে সিনিয়র র‍্যাংলার হয়ে আসে। লোকে লাউ গাছটিরও ফুঁপি উঁচু হলে মাচা বেঁধে দেয়—আর আমি এমন ছেলের সদিচ্ছাটা কি করে অপূর্ণ রাখি! কিন্তু খরচ-পত্রের বিস্তর কাট-ছাঁট করে দিতে হলো। স্ত্রী আমার গোড়ার কয়েক মাস সেটা গায়ে সইলেন; কিন্তু পরে তাঁর জিহ্বার ধার ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। লীলার সাধগুলোও ত পূর্ণ করতে হয়—সে কত আদরের মেয়ে! মিনির সাজ-গোজের যতই কেন নিন্দা হোক্ না—তার অন্ধ-অনুকরণ খুব প্রবলভাবেই চল্‌লো। লাভে হতে কাঁটাল ভাঙ্গার যা-কিছু রোক-ঝোঁক, সে সবই আমার মাথায় এসে পড়তে লাগ্‌ল।

মানুষকে অর্থের চিন্তা সব-চেয়ে শীঘ্র বিকল করে দেয়; বছর দুয়েকের মধ্যে আমি যেন রীতিমত জরাগ্রস্ত স্থবির হয়ে পড়লাম। যে দেখে সেই বলে—দিন কতক ছুটি নিয়ে দার্জ্জিলিং কি সিমলা গেলে হয় না? হায় রে! ছুটি নিলে পেট চলে কোত্থেকে? সবাই মনে করে, আমার ঢের টাকা—কেবল কৃপণতা করে আমি শরীরটা মাটি করতে বসেচি! ছুটি যতদিনে ভগবান না দিচ্ছেন—ততদিন এই জীর্ণ দেহটিকে এমনি করেই চালাতে হবে, দেখ্‌চি।

৩

পাঁকল আমার উপর মোটেই প্রসন্ন নন্। তার প্রধান ক'টা কারণ আমি অনুমান করতে পারি। প্রথম, বিজ্ঞান কলেজে আমার বই-গুলোর উপস্বত্ব দিয়ে দেওয়া। মানুষের জীবনে এক একটা শুভযোগ আসে—সে সময়ে আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা থাকে না! পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা থেকে বহু-উর্দ্ধে উঠে পড়ে এমন সব কাজ সে করে বসে, যার একদিকে হাঁক-ডাকের যেমন শেষ থাকে না, তেমনি আবার অপর দিকে গঞ্জনাও অসহ্য হয়ে ওঠে। সরকার বাহাদুর আমার এই ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ আমাকে স্যর উপাধিতে ভূষিত করলেন—আর ভিতরের দিক থেকে অন্দরের মনিব বাক্যশরে জর্জ্জরিত করতে এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্রুটি করলেন না। দুঃখ, দেবতা আমাকে কেন ইচ্ছা-মৃত্যুর বরটা জন্মের সঙ্গে দিয়ে দেন নি!

তাঁর দু'নম্বরের অভিযোগ এই যে আমি প্রাইভেট প্রাক্‌টিশ একেবারে পরিত্যাগ করেচি! দেশ-বিদেশে যার এত নাম, সে কি ইচ্ছা করলে অন্ততঃ দুটো একটা ডাকও পায় না? হয়ত পাওয়া যেত! কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে কোন দিন আমার প্রবৃত্তি হয় না! শরীরের তত্ত্বটা এত জটিল, আর তার ধর্ম্ম আর কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধেও এত মত-ভেদ আছে যে বিবেক-বুদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রেখে কোন কাজই করা চলে না। অন্ধকারে ঢিল ফেলা বিজ্ঞানের পথ নয়; তাই ঐ কাজটি আমার কোনদিন করতে সাহস হলো না। নিছক

পরের কল্পনার উপর কাজ করা যে কত কঠিন, তা ডাক্তার মাত্রেই জানেন; এ কাজ করলে পরিবারবর্গ বিশেষত স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা যায়, সত্য বটে; কিন্তু বিবেককে গলা টিপে হত্যা করা পাপের শাস্তি, অনুতাপের, আত্মগ্লানির তুষানলের কথাই বা না ভেবে থাকি কেমন করে! কেউ ইহ-জগতের লাভটাকেই পরম লাভ বলে মনে করে; কেউ তা পারে না। মানুষের রুচি বিভিন্ন। তা নিয়ে মারামারি করা চলে কি!

তিন নম্বরের অভিযোগটি খুব হালের, সেটি লীলার বিবাহ-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য! যে কাজে আর পাঁচজনের আগ্রহাতিশয্য ঘটেচে, তাতে মাথা গলানো আমার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। জীব-তত্ত্ব আলোচনা করে দেখি যে বাল্য বিবাহ স্ত্রী-জাতির প্রকৃতি-বিগর্হিত। অপরিণত বয়সের মস্ত বাধা যে স্ত্রী-পুরুষের মানসিক অবস্থার বৈষম্য। বাইশ বছর বয়সের আগে নারীর সন্তান-লাভের কামনা প্রায় ঘটে না; এই আকাঙ্ক্ষাটা উদ্রিক্ত হবার আগে নারী গর্ভবতী হলে বুঝতে হবে যে পুরুষের লালসা কাঁটালকে কিলিয়ে পাকিয়েছে! এমন অকাল-পক্ক ফলের কি দুর্গতি হয়, তা' সবাই জানেন। এ সব কথা জীব-বিজ্ঞানের প্রথম পৈঁঠের কথা—এ সব সিদ্ধান্ত বলে বহুদিন আগেই চলে গেছে—এ নিয়ে আর অযথা তর্ক করা চলে না।

তাই আমি লীলার আশে-পাশে যুবক-দলের ঘুরে বেড়ানোটা চু-চক্ষে দেখতে পারিনে; কিন্তু আমার কথা কে শুনবে! স্ত্রী আমার যা-কিছু বোঝেন এবং জানেন—তা মোক্ষম ভাবেই। স্ত্রী-জাতি যে কত বড় একগুঁয়ে রক্ষণশীল জাত, তা না ঠেক্‌লে বোঝা যায় না!

এ সবের উপর বেশী বিকল করেচে আমাকে মিনির ব্যাপারটা। তাকে কেউ অপমানে পীড়িত করবে, এমন কথা মনে করলেও আমার অন্তরে কেমন একটা অশান্তি জেগে ওঠে। সে অশান্তির মাত্রা বেড়ে গেলে উন্মাদ পর্য্যন্ত হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নয়!

কাঁচের উপর ফাট ধরলে যেমন সেটা বেড়েই চলে, সেটা মিলিয়ে আগের মত হওয়ার অযথা আশা যেমন কেউ করে না, আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং কন্যার পার্থক্যটা যখন বেড়েই যেতে লাগ্‌ল, তখন তাদের সঙ্গে মিল হবার কথাটা আমি পাগলের দুঃস্বপ্ন বলেই মনে করি! কারণ, অকারণে যারা প্রমত্ত হয়ে অহঙ্কারের চাবুক দিয়ে আশ-পাশের চারিদিককে আঘাতের উপর আঘাত করে' ক্ষুব্ধ করে তোলে—তাদের সঙ্গে জগত আর মিট্‌মাট্, কি কোন রকম একটা রফা করতে কিছুতেই রাজী হয় না। বিরোধের গহ্বরটা শেষ বৃহৎ হয়ে তাদের জঠরের মধ্যে কবলিত করবার এমন প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে টান্‌তে থাকে যে কিছুতেই তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না।

যাদের সঙ্গে বিরোধ, তাদের ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির কথা চিন্তা করে সাধারণ মানুষ ঠিক খুসী হতে পারে কি না জানিনে, কিন্তু আমার পক্ষে সেটা যে হয় নি তা' আমি স্পষ্ট অনুভব করেচি। এই

দুশ্চিন্তার উত্তাপ, চৈত্র-বৈশাখের অসহ্য তাতে আমের কষ্‌টি যেমন হল্‌দে হয়ে ওঠে, আমাকেও তেমনি অকস্মাৎ এমন করে বুড়ো করে দিয়ে গেল যে আমার পৃথিবীর সঙ্গে বিয়োগটা যে অতি-নিকটে, তা আমি পরিষ্কার উপলব্ধি করলাম। আমার দেহের সমস্ত সরসতা নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল,—আমি যেন হঠাৎ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কুঁকড়ে ছোট্টটি হয়ে গেলাম। যাদের চোখে অহঙ্কারের ঠুলি পরা থাকে, তারা এ সব দেখ্‌তে পায় না। মিনি কিন্তু এটা পরিষ্কার দেখ্‌তে পেয়েছিল—তাই আমাকে নিয়ে তার ভাবনা-চিন্তার আর অবধি ছিল না!

একদিন সন্ধ্যার সময় মিনি এসে চুপ্‌টি করে ইজি চেয়ারটায় বসে রইল। তাকে দেখে আমার ভারী আনন্দ হলো—ঠিক যেমন একজন বিদেশে পথ হারিয়ে ফেলে সমস্ত দিনের পরিশ্রান্তির পর প্রিয়জনকে দেখ্‌তে পেয়ে চোখের জল না ফেলে থাক্‌তে পারে না—আমার অবস্থা তেমনি হলো—তাকে দেখে আমার চোখের জলের শুক্‌নো গাঙে বান ডাকবার উপক্রম হলো! কষ্টে সেটা চেপে আমি হাস্‌তে লাগলাম।

"আজ হঠাৎ অসময়ে যে?"

মিনি হাস্‌তে লাগ্‌লো—"আপনার সঙ্গে কথা কবার জন্যে আজ কেমন ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল—তাই চলে এলুম-সটান্।"

"আচ্ছা,একটু রসো—একটু সবুর করতে হবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশী সময় আজ তোমাকে দিতে পারব না।"

"কেন?"

"আমাদের পুঁজিতে সময়টা ত আর খুব বেশী নেই—তাই তার খরচ-পত্রে এত নজর রেখে চল্‌তে হয়।"

দুজনেই হাসি-ঠাট্টার ভাবে কথা কচ্ছিলাম। হঠাৎ মিনির মুখটা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। সে ধীরে ধীরে কাছে এসে বল্লে, "কাকা, সত্যি আপনি দিন্‌কের দিন এত কাহিল হয়ে পড়চেন যে আপনাকে জোর করে ছুটি নেয়ানো বিশেষ দরকার হয়ে পড়েচে।"

"ছুটি!" বলে আমি একটু হাস্‌লাম,—"ছুটির দিন ত সন্নিকট হয়ে আস্‌চে, মা!"

"কি সব কথা যে আপনি বলেন, ছাই-পাঁশ!" তার চোখদুটো ভারী হয়ে উঠ্‌ল।

"তবে কি চাও করতে তোমার এই বুড়ো ছেলেটিকে নিয়ে?"

"আর আমি কিছুতেই আপনার কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। এই গরমের ছুটির সঙ্গে আরো অন্ততঃ তিন মাসের ছুটি নিয়ে আপনাকে আমাদের সোদপুরের বাগানে গিয়ে থাকতে হবে—আমি সঙ্গে থাক্‌ব—আর কারো যদি ইচ্ছা হয় যাবেন। আমি এই চার-পাঁচ মাসে দেখিয়ে দেব যে, যত্ন করলে ঐ শরীর আবার কত ভাল হয়ে উঠতে পারে।"

আমাদের যখন এই সব কথাবার্ত্তা চল্‌চে—তখন নীচে থেকে হাসি-ঠাট্টার গর্‌রার আওয়াজ উঠে আমাদের প্রায় বধির করে দেবার উপক্রম! লীলার বন্ধু-বান্ধবরা আজ-কাল সন্ধ্যার সময় অমনি করে থাকেন। কিছু বলবার জো নেই! ওর ভিতর কয়েকজন যুবক লীলার পাণিগ্রহণের মতলবেও আসেন না কি! তাঁদের সর্দ্দার মোহিতমোহন আমার

স্ত্রীর সমধিক পরিচর্য্যাভোগ্য,—সন্ধ্যার পর তিনি কন্যাকে সঙ্গদান করেন এবং এখানেই আহারাদি শেষ করে তবে বাড়ী ফেরেন! এই ব্যপদেশে রাত্রের আহারের ব্যবস্থাটা খুব প্রয়োজনীয় খরচ বলেই মনে করা হয়।

এতটা সময়ের মধ্যে আমার খোঁজ-খবর নিতে কেউ একবার এদিকে এলেন না। তার দরকার নেই! আমার সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক শুধু টাকার; আমার বাঁচা-মরা সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করবার ফুরসৎ ওঁদের হয় না।

মিনি কতকটা রাগ করেই বল্লে, "এই ত যত্ন-আত্তি! এর জন্যে কাকা আপনাকে আর এখেনে পড়ে থাকতে হবে না। আমি কালই সোদপুরের বাড়ীর ব্যবস্থা করচি—যত শীঘ্র পারি আপনাকে নিয়ে সেখেনে যাব।"

তার কথার ভিতর এত জোর, এত আন্তরিকতা ছিল যে বশ্যতা স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

আমি বল্লাম, "বেশ, তবে তোমার কাকিমার সঙ্গে কথা কয়ে নেওয়া দরকার—হাজার হোক্ তিনি বাড়ীর গিন্নী ত।"

মিনি কতকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল, বল্লে, "চলুন, তবে একবার নীচে যাওয়া যাক্।"

দুজনে নীচে নেমে গেলাম।

আমার স্ত্রী আর মোহিতমোহন তখন খুব কাছাকাছি বসে কিসের খুব গভীরভাবে যেন গোপন পরামর্শ করচেন! খানিকটা দূরে লীলা আলোর সামনে একটা বই খুলে বসে আছে,—তার কাণ আর মন কিন্তু এঁদের গোপন পরামর্শটা শুনে নেবার আগ্রহাতিশয্যে ভীষণ উৎকণ্ঠিত!

আমাদের দেখে দুজনে যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। মোহিত উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রণাম আর সেলামের মাঝামাঝি কি-একটা করলে। আমি মাথাটা সামান্য নীচু করে কাছের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। মিনি তার কাকিমার সঙ্গে কথা সুরু করে দিলে।

"ওটা কি বই লীলা?"

"একখানা ফ্রেঞ্চ নভেলের ইংরিজি, বাবা, মোহিত বাবু এনে দিয়েছেন—আমি পড়িনি, শুধু পাতা উল্টে দেখচি, কেমন বই।" লীলার কথায় অপরাধীর স্বরের মত একটা জড়তা ছিল।

"কই, দেখি কি বই?"

মোহিতমোহন কথা আরম্ভ করলেন, তাঁর কোন বিষয়ে বিজ্ঞতার অভাব ছিল না।

"ফ্রেঞ্চ নভেলগুলোর এইটে মস্ত গুণ, যে সেগুলো জীবনের সত্যকে বিনা-দ্বিধায় প্রকাশ করে। লুকোচুরি জিনিষটাকে এই জাতটা একদম্ ঘৃণা করে।"

আমি দিনকতক ফ্রান্সে ছিলাম, তাই এই জাতের সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিত নই—মোহিতমোহনের কথা শুনে আমার যেন রাগ হয়ে পড়ল। মানুষের আর সব সহ্য করা যায় কিন্তু মূর্খতার ধৃষ্টতা অসহ্য!

কথার উত্তর দিলাম না। ইতিমধ্যে লীলা কখন্ বইখানা নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে চলে গেছে—স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, সে এই যুবকটির ইঙ্গিতেই।

লীলা ফিরে এসে অর্গানে বসলো।

"বাবা, একটা নতুন বেহাগ শিখেচি।"

"বেশ, শুনি, গাও।"

মোহিত রিষ্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "এখনো বেহাগ গাইবার সময় হয়নি। আধ ঘণ্টা দেরী আছে।"

লীলা দ্বিধাক্রান্ত হয়ে বসে রইল।

পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন গুরুমহাশয়ের কথার একটু নড়-চড় করতে রাজী নয়, লীলাকেও দেখ্লাম ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত। সে মোহিতকে ঠিক তেমনি মানে—আর ভয়ও করে যেন!

এমন সময় আমাদের ডাক হলো।

হঠাৎ মিনির উপর আমার স্ত্রীর সৌজন্য দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। তিনি তাকে খাবার জন্যে বিশেষ জেদা-জেদি করে রাজী করালেন!

মানুষকে চিন্তে হলে, সে কতদূর স্বার্থপর হতে পারে তার একটা আন্দাজ, কি ধারণা করে নেওয়া দরকার। আজ মিনির এই খাতিরটুকুর অর্থ, সে আমাকে তার সোদপুরের বাগান বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায় বলে!

দিন কতক থেকে আমার স্ত্রীর একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখ্চি; তিনি আমাকে নিজেই ক'দিন বায়ু-পরিবর্ত্তন করতে যাবার কথা বলেচেন। আমার শরীরের উপর এতটা যত্ন তাঁর কোন কালে ছিল না! মিনির এই প্রস্তাবটা তিনি সহজেই অনুমোদন করেচেন; তবে আমার সঙ্গে আপাততঃ মিনিকেই যেতে হবে; কারণ লীলার কলেজ বন্ধ হয় নি। গ্রীষ্মের ছুটি হলে তিনি আর লীলা সোদপুরে গিয়ে থাক্বেন।

আমি এক পাশে বসে মানুষের চিরদিনের অরুচিকর খাবারগুলি খেতে লাগ্লাম। রাত্রে আমার ভাগ্যে সাগুর হালুয়া আর দুধ জুটত। কিন্তু আমাদের কোন খেদ মোহিত মোহন রাখ্লেন না। মনে হলো, তিনি বুঝি জীবনের শেষ খাওয়া সেই রাত্রেই খেয়ে নিচ্চেন! তবুও আমার স্ত্রী অশেষ-বিধ অনুযোগ করলেন। হয় তিনি লজ্জা করে যাচ্চেন নয় তাঁর শরীর ভাল নেই; কারণ অন্য দিনের অনুপাতে সেদিনের খাওয়া নাকি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়!

মোহিতমোহন খুব দ্রুত খেতে পারেন এবং তাঁর জঠরে খাদ্য-সামগ্রীর স্থানের কোন অকুলান হয় না। যারা বেশী খায়, তাদের আমি দু চক্ষে দেখ্তে পারিনে। তার কারণ আমার মনে হয় যে তাদের কোন জিনিষে সংযম আস্তে পারে না। মানুষের আহারের সংযমটা জীবনের শিক্ষার প্রথম পাঠ হওয়া উচিত। আহারের সঙ্গে শরীরের সমস্ত জিনিষের এমন একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যা' কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। যারা আহারে সংযত হতে পারে না, তারা অনেক সময়েই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়। এই ছেলেটির কথায় ছিল না সংযম, আহারেও তাই; কিন্তু কি গুণে যে আমার বাড়ীতে এত-বড় প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করেছেন—তা ভেবেই পাইনে! চেহারাটা সুন্দর বটে আর তার চেয়ে বড় গুণপনা,—তাঁর বাপের সম্পত্তি নাকি অগাধ!

খাওয়া-দাওয়ার পর মিনি বল্লে, "চলুন মোহিত বাবু, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।"

মোহিতের হাসিটা এক কাণ থেকে আর এক কাণ পর্য্যন্ত মেঘের উপর বিদ্যুৎ-প্রভার মত বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

"বেশ ত চলুন না।"

এই প্রস্তাবটা আমার স্ত্রীর কিন্তু মোটেই ভাল লাগেনি; তাঁর মনের অস্বস্তিটা দেহের উষ্ণ খুষুনিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তিনি বল্লেন, "মোহিত, আরো একটু অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে।"

মোহিত তাতেও খুব রাজী।

আমি বল্লাম, "তোমাকে পৌঁছে দিতে আমি খুব প্রস্তুত কিন্তু ঘোড়াগুলোর অতিরিক্ত হাঙ্গরাণি হবে।"

মোহিত বল্লে, "কেন, ফেরবার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবেন।"

মিনি বল্লে, "তার চেয়ে আর একটা সহজ উপায় আছে—যদি কাকিমার মত হয়।'

"কি?" একটু আগ্রহের সঙ্গে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

"কাকা আজ আমার ওখানেই রাত্রে থাকবেন; ভোরে চলে আস্‌বেন; তাতে কারুর কোন অসুবিধা হবে না।"

"বেশ ত,আমি কি ওঁকে বেঁধে রেখেচি! ইচ্ছা হয়, যান্ না কেন! সাত'শ খুঁটি-নাটি, ওঁর নিজেরই কষ্ট হবার ভয়ে টিক্ টিক্ করে মরি।"

"তবে চলুন, কাকা, কাকিমার মত হয়েচে।"

আমরা দুজনে গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

গাড়ীর ভিতর বসে মনটা কি জানি কেন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। যে জিনিষে আমার আনন্দ, কিন্তু পরের নিরানন্দ, তা' নিরবচ্ছিন্ন সুখের সঙ্গে উপভোগ করা শক্ত। কাঁটার মত কি একটা জিনিষ তাকে অস্বস্তিতে পূর্ণ করে দেয়।

কিছুক্ষণ আমাদের কোন কথাই হলো না; তারপর মিনি বল্লে, "মোহিত বাবু লোকটির প্রকৃতি খুব সোজা।"

"যাকে সোজা কথায় বোকা বলা যায়!"

একটু হেসে সে বল্লে, "ঠিক বোকা নয়, বোধ-বিবেচনা যে একেবারে নেই তা নয়; কিন্তু সেগুলোকে সব সময়ে খাটিয়ে চলার অভ্যাস তাঁর খুব কম।"

আমি বল্লাম, "যাদের বাপের টাকা থাকে, এবং সংগ্রামের জন্য কোনদিন প্রস্তুত হতে হয় না, তাদের প্রায় অমনিই দেখা যায়। এই টাকা জিনিষটা মানুষের সারটাকে যেমন বিকাশ করে দিতে পারে, তেমনিই আবার মানুষকে অপদার্থ করে দেয়। ছেলেদের জন্য সম্পত্তি রেখে যাওয়াটা বোধ হয় ভাল নয়। তাতে এক হিসাবে তাদের সর্ব্বনাশ করে যাওয়া হয়।"

মিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। হয়ত কথাটা তাকে একটা ক্ষুদ্র আঘাত দিয়েছিল।

আমি বল্লাম, "অনেক সময়েই দেখ্‌তে পাই, লোকে মেয়ের জন্য অবস্থাপন্ন জামাই খোঁজে, সেটা কিন্তু ভারি ভুল; এমন লোকের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করা উচিত যাকে নানা রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষ হতে হয়েচে। টাকার স্তূপের উপর মানুষ হলে আসল জিনিষটাই মানুষের পরিস্ফুট হতে পায় না। এই হিসাবে, লীলার জন্য মোহিতকে আমি উপযুক্ত পাত্র মনে করিনে।"

...রটা ক্রমেই এমন: দাঁড়াচ্ছে যাতে যে ...তের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া ছাড়া আপনাদের ...রাস্তর ...বে না।"

"তা আমি জানি, কিন্তু ...লারের উপর আমার কোন জোর নেই।—তার জন্য আমার কোন জেদও নেই। আমি যেটা বুঝেছি—সেইটেই যে ধ্রুব সত্য তা কে বল্‌তে পারে? তাই এখানে কোন জোর খাটে না। যা ঘটে যাচ্ছে, সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।"

"তা হলে মানুষ যা ভাব্‌বে, তা করবে না?"

"যদি পেরে ওঠে ত' করবে; কিন্তু সব সময়ে পেরে ওঠা যে যায় না।"

দুজনেই ভাবতে লাগ্‌লাম।

বাস্তবিক যত বয়স হচ্চে ততই যেন গভীরভাবে উপলব্ধি কর্‌চি মানুষের ক্ষমতা কতটুকু! একদিন রক্তের তেজ ছিল, সেদিন মনে হত, সবই মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জল চাই, কে চেয়ে বসে থাক্‌বে মেঘের আকাশে, দিনের পর দিন? খোঁড় মাটি, তোল জল পৃথিবীর গর্ভ থেকে। কিন্তু এখন বুঝেচি, হায়রে! সে কতটুকু জল ওঠে!—তাতে ক'জনের তৃষ্ণাই বা দূর হয়? সমস্ত দেশের তৃষ্ণা নিবারণ করতে হলে যে সেই মেঘের দিকে চেয়েই বল্‌তে হয়—"হে দেবতা, প্রসন্ন হও তুমি!"

কত ছোট্ট মানুষের ক্ষমতা, আর কি বৃহৎ তার অহঙ্কারের আস্ফালন!

মনের উপর যে বিষণ্ণতা এসেছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটা যেন সমস্ত শরীরের উপর শীতের কুয়াশার মত ছড়িয়ে গেল। যেন আর বসে থাক্‌তে পারিনে। দেহের ভিতর থেকে একবার আগুনের মত তাত্ উঠচে—আবার পরের মুহূর্ত্তে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা! চোখ চেয়ে থাক্‌তে ভরসা হলো না! চোখ বুজে ফেল্‌তেই মনের উপর যেন কে একটা আবরণ টেনে দিলে। তার পর কি হলো, জানিনে!

যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখ্‌লাম, মিনির কোলে শুয়ে আছি; মাথার উপর পাখাটা বন্ বন্ করে ঘুরচে, পায়ের কাছে লীলা বসে আছে; তার মুখের উপর আতঙ্ক যেন বিভীষিকার একটা নির্দ্দয় ছাপ দিয়ে গেছে!

ডাক্তাররা হামে-হাল হাজির; সবাই আমার বন্ধু-বান্ধব। আমার মনে হলো, বড় বেলা হয়ে গেছে—তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কটা বেজেছে?"

"সকাল সাতটা, কাকা।"

"তোমার গাড়ীখানা আন্‌তে বল, আমাকে আবার তৈরী হয়ে কলেজ যেতে হবে।"

ডাক্তার সরকার ঝুঁকে এসে কাণের কাছে মুখ নিয়ে বল্লেন, "এখনো খুব দুর্ব্বল আছেন, বেশী কথা কবেন না। বড় সাহেব এসে দেখে গেছেন, কলেজ আজ যেতে হবে না।"

তখন বুঝতে পার্‌লাম যে আমার অসুখ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে মানুষ যেমন পরিচিত জিনিষকে পাবার জন্য হাতড়ায়—আমিও ঠিক বিস্মৃতপ্রায় অতীতের মধ্যে থেকে ঘটনাগুলোকে স্মৃতির পথে টেনে বার করে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

চোখ বুজে, ভ্রূ-দুটো কুঁচ্‌কে, যত জোর করে ভাব্‌তে যাই, ততই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি! কিন্তু এই হারিয়ে ফেলার ভিতর একটা অপূর্ব্ব আনন্দ! এর আস্বাদ জীবনে আর কোনদিন পাইনি! এ যেন সীমা থেকে অসীমের মধ্যে একটা দোল খেয়ে ফিরে আসার মত!

দিনটা জেগে-ঘুমিয়ে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে কেটে গেল; সন্ধ্যা হতে না হতেই আমার চোখের উপর যেন কত বছরের সঞ্চিত মুখ এসে ঝুঁকে পড়ল। তার গুরু ভারের নীচে চোখের পাতাগুলো আপনি বন্ধ হয়ে এলো।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল,—কাদের ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ। চোখ না চেয়ে চুপ করে শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে লাগলাম। আমার স্ত্রী আর লীলাতে কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল। মনে হলো, ঘরে আর কেউ নেই; এবং আমি যে দেখেছি, তাও তাঁরা বুঝতে পারেন নি।

কথাটা মোহিতমোহন সম্বন্ধেই হচ্ছিল। মোহিত লীলাকে বলে গেছেন যে আপাততঃ বিবাহ হতেই পারে না, কারণ তাঁর মার এ বিবাহে মত নেই। কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। লীলা এ কথার আর কি উত্তর দেবে? কিন্তু তার মা বলেন, মার অমত অমতই সই; বিবাহ যথাসম্ভব শীঘ্র হওয়া চাই—আর কিছুতেই দেরী করা চল্‌বে না।

এ সব কথার কোন অর্থ-ই আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। এত তাড়াহুড়ো লোকে কেন করে, এ সব ব্যাপারে! তবে আমার স্ত্রীর সব-তাতেই যেন কেমন একটা ব্যস্ততার ভাব! কোন জিনিষ ধীরে-সুস্থে রয়ে-বসে তিনি করতে পারেন না। এমন এক-এক-জন লোক থাকে, বটে—এ [illegible] কাজ তাদের বড় উৎরে যায়; কি[illegible] [illegible]ীর ভাগ এমন ভেস্তে যায় যে তাকে সুধ্‌রে নেবার কোন পথই থাকে না।

"মোহিত কবে ফিরবে বলে গেছে?"

"তাঁদের জমিদারিতে কি একটা গোলমাল হয়েচে; সে সবের মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত সেখেনেই থাক্‌তে হবে।"

"তবুও দুদিন পাঁচদিন কি ন-মাস ছ-মাস—? তুই নেকী এ কথাটাও জিজ্ঞাসা করে নিলিনে কেন?"

"তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন, তখনি গাড়ী ধরতে হবে বলে।"

সাপকে হাঁড়ির মধ্যে পুরলে সে যেমন রাগে ফোঁপাতে থাকে—পারুল ঠিক তেমনি করে ফুঁস্‌তে লাগ্‌লেন।

"উঁ, তুমি আমাকে একবার ডাক্‌তে পারলে না?"

লীলা কোন কথা কইলে না—মনে হলো, সে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করচে।

যেন কেমন একটা উৎকট ভয়ে আমার জিভের ডগা থেকে পেটের নাড়ি পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠ্‌ল! বল্লাম, "কে আছ, আমায় একটু জল দাও।"

স্ত্রী উঠে এসে জল দিয়ে বল্লেন, "কেমন বোধ হচ্চে, এখন?"

"কিছু বুঝতে পারচিনে—বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্চে—আর ঘাম হচ্চে।"

স্ত্রী একটু ব্যস্তভাবে বল্লেন, "লীলা, একবার শীগ্‌গির মিনিকে ডাক।"

তিনি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

আহা! সেই হাতখানি, যার কোমল স্পর্শ আমার সংসারের সমস্ত দুঃখকে নিমেষে নিঃশেষ করে দিত! আজো তেমনি মধুর মনে হলো।

মিনির সঙ্গে ডাক্তার বোস্ এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। বোসের বয়স অল্প কিন্তু বেশ বিচক্ষণ বলে সুনাম আছে। নাড়ী পরীক্ষা করে তিনি বল্লেন, "আপনারা কি কেউ এঁর সঙ্গে কথা কইছিলেন? অত্যন্ত বেশী উত্তেজনা হয়েচে, দেখ্‌চি।"

স্ত্রী বল্লেন, "না, উনি ত' এই ঘুম থেকে উঠে জল চাইলেন, হয়ত স্বপন-টপন দেখেচেন!"

তীব্র-গন্ধ কি একটা ওষুধ খেয়ে আমার সর্ব্ব-শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে এল। মনটা জেগে থাক্‌লেও যেন দেহের প্রতি শিরা-অনুশিরা পর্য্যন্ত অসাড় হয়ে গেলো; বোধ হয়, আবার ঘুমিয়েই পড়লাম।

সেরে উঠ্‌তে আমার অনেক দিন লাগ্‌লো; কিন্তু সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হয়ে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। ডাক্তারেরা বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন; কিন্তু কোথায় যাই এই ভাঙা শরীর নিয়ে! শেষ পর্য্যন্ত মিনির সোদপুরের বাড়ীতে যাওয়াই স্থির হলো।

মিনি আর আমি এগিয়ে গেলাম; লীলারা পরে আস্‌বে, স্থির হলো। তার কলেজ বন্ধ না হলে বড় ক্ষতি হয়। স্ত্রী সেই কথা বার-বার করে বল্‌তে লাগ্‌লেন; কিন্তু আমাকে নিয়ে তাঁর চিন্তার অবধি রইল না! তিনি সঙ্গে না থাকাতে যে আমার ভারী অসুবিধা হবে, তা আর কেউ মনে করুক না করুক, তিনি কেমন করে সে কথা না জাহির করে থাকেন!

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচনা

ভারতবাসীর উপনিবেশ

বিগত আষাঢ় সংখ্যার "ভারতী" পত্রিকায় "ভারতবাসীর উপনিবেশ' নামক আমার প্রবন্ধ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন। ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে এই শ্রাবণ মাসে প্রতিবাদকারী 'নব্যভারতে'র পৃষ্ঠায় 'কণিকা' (?) নগরের স্থান-নির্ণয়ে যে গভীর ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন, আজ বৎসরান্তে এই আলোচনা পাঠ করিয়া আমার তাহারই কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি লিখিয়াছিলেন—" 'কণিকা' আমাদের নিকট 'কনক' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়, এবং 'কণিকা' স্বর্ণগ্রামেরই বোধক বলিয়া আমরা মনে করি।"—কণিকার কোন্ কণিকা দেখিয়া তিনি কনকের সন্ধান পাইলেন তাহা স্থির করা আমাদের বুদ্ধিতে কুলাইবে না। আর কনক মানে যখন স্বর্ণ, তখন

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

স্বর্ণগ্রাম আর যায় কোথায়? তিনি অমনই গবেষণা-বলে স্বর্ণগ্রাম যে কণিকা তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন। বর্ত্তমান আলোচনারও গবেষণা এইরূপ। এইরূপ গবেষণামূলক আলোচনার উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। তথাপি বন্ধুদিগের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার প্রতিবাদের কয়েকটী বিষয়ের উত্তর নিয়ে দেওয়া যাইতেছে। আমি দুইটী শিলা-লিপির উল্লেখ করিয়াছি, অথচ তাহাদের প্রতি-লিপি দিই নাই; সুতরাং আমার উক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধাঁধা লাগিয়াছে। গোপালের শিলালিপির সকল বিষয় যখন Upper-Burma Gazetteerএ (part I, Vol. II p. 193) আছে এবং তাহার নজীরও আমি আমার প্রবন্ধে যখন উল্লেখ করিয়াছি, তখন আমার কত গুরুতর অপরাধ হইয়াছে সুবুদ্ধি পাঠকগণই তাহা বিবেচনা করিবেন। আমার আর একটী অপরাধ হইয়াছে যে, আমি লিখিয়াছি, "তখন রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর ছিল। এখনও ঐস্থানের নাম হস্তিনাপুর।" প্রতিবাদকারী দয়া করিয়া লিখিয়াছেন, "আমরা কিন্তু বিশ্বকোষ, Cyclopædia of India, Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India প্রভৃতি কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হস্তিনাপুর নামক স্থানের উল্লেখ খুঁজিয়া পাইলাম না।" উত্তরে এইটুকুই বলা যাইতে পারে যে, ব্যালফোর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি আভিধানিক গ্রন্থ দেখিয়া ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা করা যায় না এবং তাহা সঙ্গতও নয়। ঐতিহাসিক সমালোচনা করিতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকারের দরকার। Assam District Gazetteer-এর Nowgong Volume-এ নওগঙের একখানা map আছে, তাহাতে উজ্জ্বল অক্ষরে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে 'হস্তিনাপুর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমি নিজে গিয়াও এই স্থানটী দেখিয়া আসিয়াছি। ভৌগোলিক অনুসন্ধানে একটু সুড়ুক সন্ধানও জানা দরকার।

তারপর, আমি শিলালিপি-নির্দ্দিষ্ট ৩০০খৃষ্টাব্দকে হস্তিনাপুর-প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং বর্মার 'মহারাজবংশ' নামক কিংবদন্তী-মূলক ইতিকথা-লিখিত ৯২৩পূঃ খৃঃ অতিরঞ্জিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছি। শিলালিপি ছাড়িয়া গল্পিকার পক্ষপাতী হই নাই কেন, আমার এ অপরাধের দণ্ড হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। প্রতিবাদকারী ৯২৩পূঃখৃঃ বজায় রাখিবার জন্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'প্রাচীন সভ্যতা' নামক গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত "বঙ্গদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ" হইতে কার্ণেল জেরিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা এ কথা উদ্ধার করিয়াছেন যে, উত্তর ব্রহ্মের ভামো নগরে হস্তিনাপুর হইতে আগত ক্ষত্রিয় রাজারা খৃঃ পূঃ ৯২৩ অব্দে রাজ্যস্থাপন করেন।" এই অংশ উদ্ধার করিয়া বাহাদুরীর সহিত সাফাই দিয়া বলিয়াছেন—"কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই সনন্দ-নির্দ্দেশটীকে উড়াইয়া দেন নাই।" প্রতিবাদকারী ভাবিলেন আমাকে খুব জব্দই করিলেন। পাঠকগণ দেখুন, এখানে কিন্তু সুবোধ প্রতিবাদকারী যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া জেরিনির পুস্তকখানি স্বয়ং উলটাইয়া বিজয়বাবুর উদ্ধৃত মতের সহিত মিলাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলেই জানিতে পারিতেন যে, জেরিনি নিজেই তাঁহার বিপরীত কথা বলিয়া আমারই পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন—"Sir A. Phayre believes the above events are historical but they have been antedated by several centuries"—(Gerini, Further India &c, p. 62); অধিকন্তু জেরিনি মহারাজ-বংশের অভিমত আমারই ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছেন —'In Circa A. D. 300 a Gopal of Hastinapur, on the Ganges in India..... founded New Hastinapur on the Irawaddy" (ibid, pp 745, 746)। বিজয়বাবু আমাদের বন্ধু, শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র, তিনি ইদানীং অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ভুলিয়া জেরিনির নামে ফেয়ারের ইতিকথার ৯২৩পূঃখৃঃ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। মূল গ্রন্থ দেখিয়া আলোচনা করাই যে যুক্তিসঙ্গত ও প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই কর্ত্তব্য তাহা কি প্রতিবাদকারীকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে?

একটা কথা, ভারতী-কার্য্যালয়ের প্রুফ দেখার দোষে আমার প্রবন্ধে দুই জায়গায় গুপ্তা ভুল ছাপা হইয়াছে। তজ্জন্য যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তবে তাহা ভারতী-সম্পাদক মহাশয়দের দেওয়া উচিত। সমালোচক মহাশয় যদি একটু কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক ৩০০ খৃষ্টাব্দ ও ৪২৬ খৃষ্টাব্দ এই দুইটী সালের সঙ্গে গুপ্তাব্দ মিলাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, গুপ্তাব্দটী ছাপার ভুলেই হইয়াছে। তিনি যে এইরূপ ছাপার ভুল দেখিয়া তাহা লেখকের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন, তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাঁহার নিজের প্রতিবাদেও আমার লিখিত "গোপাল" ছাপায় ভুলে "সোপানে" পরিণত হইয়াছে। এজন্য আমরা কিন্তু তাঁহাকে দোষ দিব না।

আমার বোধহয় প্রতিবাদকারী আমার প্রবন্ধটী আগাগোড়া মনোযোগের সহিত পড়েন নাই। তাঁহার মতের সহিত হয়ত আমার মতের পার্থক্য হইতে পারে। কিন্তু আমার প্রবন্ধে আমি যে সব কথা লিপিবদ্ধ করি নাই, ইনি সেইরূপ অনেক কথা আমি লিখিয়াছি বলিয়া আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। তাহার একটী প্রমাণ দেখুন। আমি আমার প্রবন্ধে রাজা জয়পালকে চন্দ্রবংশাবতংস গোপালের "বংশোদ্ভূত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। প্রতিবাদকারী বলেন, "ইহার পর তিনি গোপালের "পুত্র" রাজা জয়পালের এক শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন।" আমার প্রবন্ধে কোথায় যে আমি জয়পালকে গোপালের পুত্র বলিয়াছি তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার বোধহয় প্রতিবাদকারী যদি ধীরচিত্তে আমার প্রবন্ধটী সমস্ত পাঠ করিতেন তাহা হইলে এই কাগজ-খানির দুর্মূল্যতার দিনে অনেকটা অপব্যয় হইত না।

আর প্রকাশ্যমান ইতিহাসে ত্রিপুর, ত্রিলোচনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। ত্রিপুর-রাজবংশের মর্য্যাদার কোথাও হানি করি নাই। এ প্রবন্ধেও কোথাও সেরূপ ইঙ্গিত নাই। প্রতিবাদকারী একত্র লিখিয়াছেন, আমি জয়পালকে ত্রিপুররাজ-বংশের আদি নরপতি বলিয়া প্রচার করিয়াছি। আমার প্রবন্ধে এরূপ কোন কথাই নাই। জয়পাল ত্রিপুরার রাজা ছিলেন একথা আমি বলিয়াছি, প্রাচীনতম প্রাপ্ত রাজমালাও বলিয়াছে। তবে 'আদি নরপতি' বলি নাই। গোপালের নাম কোন রাজমালায় নাই, একথা আমি জানি। আমি গোপাল কোন্ নরপতির নামান্তর তাহাও জানি। আমার প্রকাশ্যমান ইতিহাসে তৎসমুদয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটী কথা বলিয়াছি মাত্র। তারপর আমার প্রবন্ধশেষে "এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। পরে আলোচিত হইবে।" এই কথা লেখা সত্ত্বেও প্রতিবাদকারী সমগ্র মহাভারতের ফর্দ্দ চাহিয়াছেন। এইটুকুই রহস্য। প্রতিবাদ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

পর্ত্তুগীজ জলদস্যু

খৃষ্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতসমুদ্রে নানাদেশীয় জলদস্যুর ভীষণ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে পর্ত্তুগীজ দস্যুরা নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচারে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও মারহাট্টা প্রভৃতি জলদস্যুদিগকে অতিক্রম করিয়াছিল। যে হতভাগ্য ব্যক্তিরা তাহাদের হাতে বন্দী হইত, তাহাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না।

ইয়ুরোপীয় দস্যুরা এসিয়ার লোকদিগকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করিত না, কি ভীষণ

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

নিষ্ঠুরভাবে যে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিত, তাহার বর্ণনা করিতে লেখনী অক্ষম।* লাজেন বি লিখিয়াছেন—"...তাহার পর মস্কাট হইতে মুরেদের (Moors) দুটি ছোট জা[illegible] আসিলে, দস্যুরা দুই একটা কামান [illegible]ওয়াজ করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করি[illegible] তাহাদের কাপ্তেন ও মহাজনকে [illegible]জদের জাহাজে বন্দী করিয়া আনি[illegible] ও মস্কট হইতে নিশ্চয় অনেক ধন [illegible] যাইতেছে, এই বিশ্বাসে তাহার [illegible]রমাণ কত স্বীকার করাইবার [illegible] সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অত্যাচার [illegible]রিয়াছিল ও নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াছিল। তাহার পর আর কতকগুলি জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইলে এই ছোট দুটি জাহাজ লইয়া কি করা হইবে সে সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিল যে জাহাজে যাহা আছে,—ধন, পণ্য, অশ্ব সব জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক। পরে তাহারা জাহাজের পাইল সমুদ্রে ফেলিয়া দিল ও একটা জাহাজের মাস্তুলকে দ্বিখণ্ডিত করিল। ...আর একবার কাটীওয়ার (Kathiawar) উপদ্বীপান্তর্গত গোঘা নামক স্থান হইতে একটা ছোট জাহাজ তুলা বোঝাই করিয়া কালিকট যাইতেছিল। এই ছোট জাহাজের আরোহীদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে তাহারা অমুক নৌবাহিনীতে ছিল কি না, তখন তাহারা [illegible]র দিল, 'না'। তাহাদের পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তি ও অনুনয় সত্ত্বেও [illegible]হাদের কথা অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের উপর উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। সমস্ত পণ্যদ্রব্য তাহারা সমুদ্রে ফেলিয়া তো দিলই, অধিকন্তু যে নৌবাহিনী তাহারা চক্ষেও দেখে নাই, তাহাতে তাহারা ছিল ও সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সমস্ত সংবাদ জানে ইহা স্বীকার করাইবার জন্য তাহাদের অঙ্গের গ্রন্থিগুলিকে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা নিষ্পেষিত করিতে লাগিল...।" এই জলদস্যুরা জাতে ছিল ইংরাজ!

এ অত্যাচার পর্ত্তুগীজ দস্যুদের নিষ্ঠুরতার শতাংশের একাংশ। পর্ত্তুগীজ জলদস্যু সেবাষ্টিও গঞ্জালিস টিবাওর (Sebastio Gonzales Tibao) কাহিনী শুনিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তাহা কিরূপ ভীষণ ও লোমহর্ষণ ছিল। এই ব্যক্তি লিসবন নগরের নিকট একটা গ্রামে কোন্ এক অজ্ঞাত কুলে জন্মগ্রহণ করে। ভারতে আসিবার পর বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে যুদ্ধব্যবসায়ী হয়, পরে লবণের বাণিজ্য করিয়া কিছু ধনসঞ্চয় হইলে জালিয়া নামক এক প্রকার ছোট নৌকা ক্রয় করে। সেই নৌকায় সে লবণ বোঝাই করিয়া আরাকান রাজ্যান্তর্গত দিয়াঙ্গা (Dianga) নামক বন্দরে উপস্থিত হয়।

* S. C. Hili—The story of the *Cassandra.* in Indian Antiquary, 1920, March. P. 37.

"An account of the *Cassandra*, affords a good description of the way in which the European pirates used to treat their prisoners and also of the infamous crucity towards Asiatics."

এই সময়ে এক বিশেষ ঘটনা ঘটে। নিকোটী (Nicote) নামক একজন বিশিষ্ট পর্ত্তুগীজ সিরিয়াম (এখন Thanliyeng) নামক স্থানে স্বীয় প্রতাপ সুপ্রতিষ্ঠিত জানিয়া প্রভাব আরও বিস্তার করিবার নিমিত্ত দিয়াঙ্গা বন্দর অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তদুদ্দেশ্যেই কতকগুলি জাহাজ সজ্জিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে আরাকান-রাজের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। পুত্র ওই বন্দরে ১৬০৭খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হইয়া আরাকান রাজের নিকট বন্দরটা প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়ে সেই স্থলে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ বাস করিতেন, তাঁহারা নিকোটীর উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা আরাকান-রাজকে জানাইলেন নিকোটীর উদ্দেশ্য সাধু নহে; উত্তরকালে আরাকান-রাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যেই দিয়াঙ্গা বন্দরে নিকোটীর এই পদার্পণ। রাজা ইহা শুনিয়া স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া নিকোটীর পুত্রকে রাজসভায় আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন ও তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সদলে হত্যা করাইলেন। শুধু ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। জাহাজে যাহারা ছিল, তাহাদের তো হত্যা করিলেনই; অধিকন্তু প্রায় ছয় শত পর্ত্তুগীজ নিঃসংশয়ে নিরুপদ্রবে পরম শান্তিতে বাস করিতেছিল, তাহারাও বিনষ্ট হইল। অতি অল্প লোকই বনে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, আর তাহা অপেক্ষা আরো অল্প সংখ্যক ব্যক্তি কোন ক্রমে জাহাজে উঠিয়া পলাইয়া আসিল। তাহাদের ভিতর ছিল সেবাষ্টিও গঞ্জালিস্।

মানোয়েল দে মাটেস (Manoal de Mattos) নামক একজন পর্ত্তুগীজ সন্দীপ দ্বীপ অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি কিছুদিনের নিমিত্ত অন্যত্র গমন করেন ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে ফতে খাঁ নামক একজন মুসলমানকে দ্বীপের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু হইলে ফতে খাঁ দ্বীপস্থিত সমুদয় পর্ত্তুগীজদিগকে স্ত্রী-পুত্রের সহিত হত্যা করেন, বস্তুতঃ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তিকে জীবিত রাখেন নাই। দ্বীপটি এইরূপে আয়ত্ত হইলে চল্লিশখানি নৌকা লইয়া তিনি একটী নৌবহর গঠিত করেন।

এধারে গঞ্জালিস পলায়ন করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। যাহারা দিয়াঙ্গাতে কোনও ক্রমে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়াছিল, তাহারা সকলে গঞ্জালিসের দলভুক্ত হইল। দশখানা নৌকা লইয়া তাহারা আরাকান রাজ্যের বন্দরে বন্দরে লুটপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল। এই দস্যুদলকে সমূলে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে ফতে খাঁ তাঁহার নৌবাহিনী প্রেরণ করিলেন। জয়ের আশায় তিনি এতদূর উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে তাঁহার পতাকায় এই কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন—"ঈশ্বর-অনুগ্রহে সন্দীপাধিপতি ফতে খাঁ খৃষ্টানের রক্তপাত করিয়াছিলেন ও পর্ত্তুগীজ জাতির উচ্ছেদ করিয়াছেন।" ফতে খাঁ জাবালপুর নামক একটী দ্বীপের কাছে নদীতে অতর্কিতে দস্যুদলকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু দস্যুদল ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সন্ধান পাইয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দুইদলে ভীষণ যুদ্ধ হইল; অরুণোদয়ে দেখা গেল, ফতে খাঁর নৌ-বাহিনীর একটী লোকও অবশিষ্ট নাই, তাঁহার দলের

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

লোক হয় নিহত না হয় বন্দী হইয়াছে। তিনি স্বয়ং এ যুদ্ধে বিনষ্ট হন।

এই ঘটনায় পূর্ব্বে দস্যুদিগের বিশেষ কোন দলপতি অথবা নেতা ছিল না। অতঃপর স্থির হইল যে সেবাষ্টিও গঞ্জালিসকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া তাহারা একবার সন্দীপ অধিকার করিবার প্রয়াস পাইবে। বাঙ্গালার বন্দর ও তৎসান্নিধ্যে যে সমস্ত বন্দর ছিল—তাহা হইতে পর্ত্তুগীজরা আসিয়া দলপুষ্ট করিতে লাগিল। সেবাষ্টিও বাটিকালোয়ার (Batticaloa) রাজার সহিত সর্ত্ত করিল যে যদি তিনি সাহায্য করেন তবে দ্বীপ অধিকৃত হইলে তাঁহাকে দ্বীপের রাজস্বের অর্দ্ধেক দেওয়া হইবে। তিনি স্বীকৃত হইয়া জাহাজ ও দুই শত অশ্বারোহী যোদ্ধা দিয়া সাহায্য করেন। ১৬০৯ মার্চ্চ মাসে সেবাষ্টিও চারিশত পর্ত্তুগীজ সৈন্য ও চল্লিশখানি জাহাজ লইয়া সন্দীপ অধিকার করিতে চলিল। দ্বীপবাসিগণ পূর্ব্বাহ্নেই আক্রমণের সংবাদ পাইয়া দ্বীপ-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। ফতে খাঁর ভ্রাতা বহুসংখ্যক মুসলমান লইয়া দস্যুদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দস্যুদের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই দুর্গ-প্রবেশ করিতে হইল। এইখানে দস্যুগণ আসিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। কিছুদিন পরে তাহাদের রসদ ফুরাইয়া আসিল। এ অবস্থায় কি করা যাইবে যখন এই সমস্যা-সমাধানে সকলে ব্যস্ত, তখন দৈবযোগে গাসপার ডি পিনা (Gaspar de Pina) নামক একজন স্প্যানিশ কাপ্তেন আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুরুদ্ধ হইয়া সে গঞ্জালিসকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। তখন পঞ্চাশ জন লোক জাহাজ হইতে নামিয়া বহু সংখ্যক মশাল জ্বালিয়া প্রচণ্ড চীৎকার করিতে করিতে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ তখন অনেক লোক আসিয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। দুর্গ ত্বরিতে অধিকৃত হইল, এবং একজন ব্যক্তিকেও গঞ্জালিস জীবিত রাখিল না। দ্বীপের আদিম অধিবাসিগণ গঞ্জালিসের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিলে সে বলিল, দ্বীপে যে-সমস্ত বাহিরের লোক আছে তাহাদিগকে তাহার কাছে উপস্থিত করিতে হইবে। এতদনুসারে হাজার জন মুসলমান তাহার সমক্ষে নীত হইলে। সে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিবার আজ্ঞা দিল। তাহার পর গঞ্জালিস সন্দীপের স্বাধীন রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিল।

যে সমস্ত পর্ত্তুগীজের বিশিষ্ট সাহায্যে সে দ্বীপ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সে ভূমিদান করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে সে সমস্ত ভূমি প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিল। বাটিকালোয়ার রাজাকে রাজস্বের অর্দ্ধাংশ দিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সহিত সে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। গঞ্জালিসের ধন-জন-প্রভাব স্ফীত হইয়া উঠিল। হাজার দল পর্ত্তুগীজ, দুই হাজার সশস্ত্র সন্দীপবাসী, দুই শত অশ্বারোহী সৈনিক, অশীতি সংখ্যক জাহাজ ও ভাল ভাল কামান এখন তাহার অধীনে। সন্দীপ বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ায় তথায় বণিক্‌গণ প্রায়ই গমনাগমন করিত। গঞ্জালিস তাহাদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিয়া

প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতে লাগিল। নিকটস্থ রাজগণ তাহার লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া তাহার সহিত সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিল। গঞ্জালিস বাটিকালোয়ার রাজার নিকট হইতে জাবালপুর ও পাতেলবঙ্গ নামক দ্বীপদ্বয় অধিকার করিয়া লইয়া তৎকৃত সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রতিদান দিল। অন্যান্য রাজাদিগের নিকট হইতেও ভূমি অধিকার করিয়া স্বীয় আধিপত্য গঞ্জালিস সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

এই সময়ে আরাকান-রাজ স্বীয় ভ্রাতা অনপোরমের সহিত বিবাদ করিলেন। অনপোরমের একটী সুন্দর হস্তী ছিল—তিনি ভাইকে সে হস্তী ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাই বিবাদের সূত্র। যখন অনুনয়-বিনয় অথবা ভয়-প্রদর্শনে কোন ফল হইল না, তখন বলপূর্ব্বক হস্তীটা কাড়িয়া লইয়া রাজা অনপোরমকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অনপোরম তখন গঞ্জালিসের আশ্রয় লইলেন। গঞ্জালিস তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু এত বড় প্রভাবশালী রাজার প্রতিবাদী হইবার শক্তি নাই বুঝিয়া সন্দীপে ফিরিয়া আসিল। অনপোরম তাঁহার স্ত্রী-পুত্রপরিবারবর্গ, ধন-রত্ন ও হস্তী লইয়া তাহার সঙ্গে সন্দীপে আসিলেন। পরে গঞ্জালিস অনপোরমের ভগ্নীকে বিবাহ করিল। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে অনপোরমের মৃত্যু হইল। অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিল যে গঞ্জালিসই বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। আর সন্দেহও বোধ হয় নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে—কেন না মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনপোরমের ধনরত্ন ও অন্যান্য সামগ্রী সবই গঞ্জালিসের বিধবা পত্নী অথবা পুত্রের ভাগে পড়িল না। ইহা লইয়া পাছে একটা কেলেঙ্কারি হয় সেই জন্য গঞ্জালিস স্বীয় ভ্রাতা আনটোনিও টিবাওর (Antonro Tibao) সহিত ওই বিধবার বিবাহ দিবার ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু তাহাকে রোম্যান কাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে না পারায় সে ষড়যন্ত্র সফল হইল না। ইহার পর দুই ভাই মিলিয়া আরাকান-রাজকে আক্রমণ করে। মাত্র পাঁচখানি জাহাজ লইয়া অ্যান্টোনিও রাজার এক শত জাহাজ ধৃত করিল। আরাকান-রাজ ইহার পর গঞ্জালিসের সহিত সন্ধি করেন। অনপোরমের বিধবা পত্নী আরাকান রাজ্যে ফিরিয়া যান। পরে তিনি চট্টগ্রামের রাজার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।

এই সময় মোগলেরা বালুয়ারাজ্য (পথবা ভালুয়া) জয় করিতে মনস্থ করেন। তাহা হইলে সন্দীপের এত কাছে মোগলেরা আসিলে গঞ্জালিসের ভারি অসুবিধা হইবে জানিয়া সে আরাকান-রাজের সহিত বালুয়া-রক্ষণেরবন্দোবস্ত করিল। তদনুযায়ী আরাকান-রাজ আশি হাজার সৈন্য ও সাত শত হস্তী লইয়া বালুয়া রক্ষণের নিমিত্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। জলপথেও দুই শত জাহাজ ও চারি সহস্র লোক গঞ্জালিসের নৌবাহিনীর সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত পাঠানো হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে আরাকান-রাজ সৈন্য লইয়া উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত গঞ্জালিস মোগলদিগকে বালুয়া রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না; তৎপরে মোগলগণ বিতাড়িত হইলে বালুয়া রাজ্যের অর্দ্ধেক

তাহার, ও অর্দ্ধেক রাজার হইবে। গঞ্জালিস তাঁহার নৌবাহিনীর প্রতিভূ-স্বরূপ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ও সন্দীপাধিবাসী কয়েক জন পর্ত্তুগীজের পুত্রগণকে আরাকান-রাজের হাতে সমর্পণ করিল।

স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন বিষয়ে গঞ্জালিস সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল; মোগলগণের গতিরোধ করিতে কোন উদ্যমই সে করিল না। কেহ কেহ মনে করেন যে এই অদ্ভুত আচরণের মূল কারণ হইতেছে যে হয় সে মোগলগণের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল অথবা দিয়াঙ্গায় পর্ত্তুগীজ-নিগ্রহের প্রতিহিংসা লইবার নিমিত্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যাহা হউক, আরাকান-রাজকে একাকীই মোগলদের সম্মুখীন হইতে হইল। প্রথমে তিনি তাহাদিগকে একবার বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু মোগলগণ দলপুষ্ট করিয়া উপচিত শক্তিতে পুনরায় আক্রমণ করিয়া আরাকান-রাজকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিল। কতিপয় অনুচরমাত্র সঙ্গে লইয়া তিনি হস্তীপৃষ্ঠে পলায়ন করিয়া চট্টগ্রাম দুর্গে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। গঞ্জালিস সম্মিলিত নৌবাহিনীকে দেশীর্ত্তা নামক দ্বীপের খালের মধ্যে লইয়া গিয়া তথায় আরাকানী জাহাজের অধ্যক্ষগণকে স্বীয় জাহাজে নিমন্ত্রণ করিল; তাহারা নিমন্ত্রণে আসিলে তাহাদের বিনাশ সাধন করে; পরে জাহাজস্থিত সমুদয় লোককে নিহত অথবা বন্দী করিয়া সমস্ত জাহাজগুলিকে আয়ত্ত করিয়া সে সন্দীপে ফিরিয়া আসে। আরাকানী সৈন্যের পরাজয়-বার্ত্তা কর্ণ-গোচর হইবামাত্র নৌবাহিনী লইয়া সে উপকূলস্থিত সমুদয় বন্দরে রক্তের স্রোত বহাইয়া অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া আগুন জ্বালাইয়া কৃতান্তের মত ফিরিতে লাগিল। বন্দরবাসিগণ জানিত যে আরাকান-রাজের সহিত গঞ্জালিসের এখন কোন বিবাদ নাই, এই শান্তির সময়ে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। গঞ্জালিস আরাকান পর্য্যন্ত গিয়া বিভিন্ন জাতির জাহাজ জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তন্মধ্যে সুচারু শিল্প-খচিত সুবর্ণ ও হস্তিদন্তে মণ্ডিত বৃহদায়তন রাজার প্রমোদ-বহিত্র ছিল।

এই ধৃষ্টতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ আরাকান-রাজ এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে যে-ভ্রাতুষ্পুত্রকে গঞ্জালিস প্রতিভূ-স্বরূপ রাখিয়াছিল,তাহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া আরাকান বন্দরের নিম্নে সুউচ্চ দণ্ডের উপর রাখিয়া দিতে বলিলেন যাহাতে পিতৃব্য সমুদ্র-পথে যাইবার সময় দেখিতে পায় হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের কি অবস্থা হইয়াছে। যখন গঞ্জালিস সন্দীপে ফিরিয়া গেল, তখন আরাকান-বাসিগণ অথবা মোগলগণ সকলেই তাহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহারও কেমন মনে হইতে লাগিল যে বিপদ যেন ঘনাইয়া আসিতেছে।

এইরূপ অবস্থায় গঞ্জালিস গোয়ার রাজ-প্রতিনিধির নিকট সাহায্য ভিক্ষা চাহিল। সে জানাইল যে সে সন্দীপের স্বাধীন রাজা, তিনি যদি উপযুক্ত সাহায্য দেন, তাহা হইলে সে পর্ত্তুগালের অধীন করদ রাজা হইব ও এই অধীনতার চিহ্নস্বরূপ বৎসর বৎসর এক জাহাজ করিয়া চাউল গোয়া কিংবা মলক্কাতে পৌঁছাইয়া দিবে। আর পূর্ব্বে

যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা কেবল আরাকান-রাজ কর্ত্তৃক নিহত দিয়াঙ্গাস্থিত পর্ত্তুগীজগণের প্রেতাত্মাগণের তর্পণের নিমিত্ত; প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করা ভিন্ন তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আরাকান-রাজের সমৃদ্ধ ধনভাণ্ডারও হয় তো পাওয়া যাইতে পারে। ধনভাণ্ডার-প্রাপ্তির লোভে রাজপ্রতিনিধি গঞ্জালিসকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ডম ফ্রান্সিস্কোর (Dom Francisco de Menezor Roxo) নেতৃত্বে গোয়া হইতে একটী নৌ-বাহিনী ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে বহির্গত হইয়া ৩রা অক্টোবর আরাকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গঞ্জালিসকে এই সংবাদ দিবার জন্য একখানি নৌকা অগ্রেই প্রেরিত হইয়াছিল।

ডম ফ্রান্সিস্কো উপদিষ্ট হইয়াছিলেন যে গঞ্জালিসের অপেক্ষা না করিয়াই যেন তিনি আরাকান-রাজকে আক্রমণ করেন। যখন ফ্রান্সিস্কো এই আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন (১৫ই অক্টোবর) হঠাৎ শুনা গেল কতকগুলি ওলন্দাজ জাহাজকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া একটি প্রকাণ্ড নৌবাহিনী নদী বাহিয়া আসিতেছে। একটি ওলন্দাজ জাহাজ হইতে প্রথম গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। দুই দলই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইল। রাত্রে শত্রু সরিয়া গেল ও গঞ্জালিস না আসা পর্য্যন্ত ফ্রান্সিস্কো পুনরাক্রমণ হইতে বিরত থাকিবার সঙ্কল্প করিলেন ও তাহার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া নদীর মোহানায় রহিলেন।

অবশেষে গঞ্জালিস সুসজ্জিত পঞ্চাশখানি জাহাজ লইয়া উপস্থিত হইল। তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ফ্রান্সিস্কো যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন জানিয়া সে বিষম চটিয়া গেল। পরে নভেম্বর মাসের আধাআধি ভাগ করিয়া দুইজনে উজান বাহিয়া গিয়া দেখিল যে একটা নিরাপদ স্থানে শত্রুর বাহিনী নোঙ্গর করিয়া আছে তখনই; তাহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই আরাকানী নৌবাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের উপর চড়াও হইল। গঞ্জালিস প্রথম আক্রমণে বিচলিত না হইয়া স্থির রহিল। সন্ধ্যার সময়ে কপালে গুলির আঘাত পাইয়া ফ্রান্সিস্কো নিহত হইলেন। গঞ্জালিস যুদ্ধে বিরত হইল। পর্ত্তুগীজরা পরাজিত হইয়া সন্দীপে আসিল ও যাহারা গোয়া হইতে আসিয়াছিল তাহারা তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে আরাকান-রাজ প্রভূত সৈন্য লইয়া আসিয়া সন্দীপ জয় করিলেন। সেই অবধি পর্ত্তুগীজদের সহিত ঐ প্রদেশের আর কোন সম্পর্ক রহিল না। এইখানেই গঞ্জালিসের বিচিত্র জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন হইল।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার Studies in Moghul India ও Aurangzebe * নামক পুস্তকে যে মঘ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, সম্রাট আকবরের সময় হইতে সায়েস্তা খাঁর শাসন-কাল পর্য্যন্ত মঘ ও ফিরিঙ্গি—আরাকানের দস্যুগণ জলপথে আসিয়া বঙ্গালায় লুট-তরাজ

* The Fernighi Pirates of Chatgaon—Studies in Mughal India P. P. 118 et Seq.

করিত। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড়, কম বেশী সকলকেই তাহারা ধরিয়া লইয়া যাইত ও তাহাদের করতল বিদ্ধ করিয়া সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু বেত চালাইয়া দিত ও জাহাজের পাটাতনের উপর গাদাবন্দি করিয়া ফেলিয়া রাখিত। যেমন পাখীকে দানা দেওয়া হয়, সেইরূপ সকালে বৈকালে এই বন্দীগণের আহারের নিমিত্ত উপর হইতে চাউল ছড়াইয়া দিত। এই অত্যাচার সহ্য করিয়াও যে হতভাগ্যেরা জীবিত থাকিত তাহাদিগকে লইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দস্যুগণ নানাপ্রকারে অপমানিত করিয়া ভূমি-কর্ষণে অথবা অন্য কোন কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিত। অন্যান্য বন্দীকে দাক্ষিণাত্যের বন্দরে ওলন্দাজ, ইংরেজ অথবা ফরাসী মহাজনদিগের নিকট ক্রীতদাস স্বরূপ বিক্রয় করা হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি; পরে সায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ জয় করিবার পর দস্যুদিগের অত্যাচার নিবারিত হয়।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আমরা এই ফিরিঙ্গী দস্যুদের উল্লেখ পাই; তাহাদের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শ্রীমন্তের নাবিকগণ দিবারাত্রি নৌকা চালাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
রাত্রিদিন বেয়ে যায় নাহি করে ডর॥
চিনি কুচনের ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
রাড়িঘাট বাণপুর ডানদিকে থুইয়া॥
ফিরিঙ্গির দেশযান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারামদের ডরে॥

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার Studies in Moughal Indiaতে (p.128) বলিয়াছেন—"Many Feringis lived happily at Chatgaon and used to come to the imperial dominion for plunder and abduction. Half their booty they gave to the Raja of Arracan and the other half they kept. This tribe was caled *harmas*" তাহারা জলদস্যু ছিল বলিয়া তাহাদের ঐ নাম হইয়াছিল। তিনি ফুটনোটে বলিতেছেন "This word (Harmad) evidently 'armad', a corruption of 'armada'.

শ্রীকালীপদ মিত্র।

পুতুল নাচের ঘরে

আজকে ঢুকে পুতুল-নাচের ঘরে
ভ্রম যে আমার ভাঙলো পরে পরে।
বাইরে শুধু আধেকখানা দেখি
বুঝবো কিসে ভিতর শুধু মেকী।
এরাই আবার দেবতা সাজে দূরে,
যশ যে এদের গাইছে ভুবন জুড়ে।
আমরা অবোধ, বাহির দেখেই ভুলি
'বামন'কে হায় 'বিরাট' করে তুলি।

অংশ দেখে পূর্ণকে নিই ধরে,
সোপান দেখেই দেউল যে নিই গড়ে।
জ্যা দেখিয়াই ধনুকখানা আঁকি
এম্‌নি করে আপ্‌নাকে দিই ফাঁকি।
আজকে এদের ঘরের মাঝে এসে
অবজ্ঞাতে আপ্‌নি মরি হেসে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

খোকার আশা

(গল্প)

কি দুষ্টু মা-টা! না বলে লুকিয়ে মামার বাড়ী চলে গেল! অসুখ সারতে গেছে? তা বেশ ত, যাবার সময় একটু আদর ক'রে একটা চুমু দিয়ে গেল না কেন? আমি সেখানে যাবার জন্যে বায়না ধরব, তাই? সেখানে গিয়ে দুষ্টুমি করব, তাই? ওগো মাগো, তুমি এসো গো, আমি যাবার জন্যে একটুও বায়না করব না, সেখানে গিয়ে কিচ্ছু দুষ্টুমি করব না, একটিবার এসে শুধু দেখা দিয়ে যাও!

বাবাকে কতদিন বলেচি—বাবা চলো, মামার বাড়ী থেকে মাকে ধরে আনি, কিন্তু বাবার আর আপিসের ছুটিই হয় না! দোল-গেল, চড়ক গেল, তবু ছুটি হ'ল না—কি বিচ্ছিরি আপিস! ইংরিজিতে কথা কইতে যে পারি না, নইলে গটমট করে গিয়ে সাহেবকে সেলাম করে বলতুম—"সাহেব-বাবু, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, মা যে আসতে পাচ্ছে না—বাবাকে ছুটি না দিলে;—ছুটি দাও!" মামাকে সেদিন অত করে বলে দিলুম মাকে আনবার জন্যে—মামাও কই আসচে না ত! চিঠি লিখতে যে জানি না, নইলে ঠাকুরমার কাছে যে পার্ব্বণীর পয়সা জমা আছে তাই থেকে একটা পয়সা নিয়ে ডাকওয়ালার কাছ থেকে একখানা খাম কিনে নিজের হাতে লিখে দিতুম—"ওগো মাগো, তুমি একটিবার এস গো! আমি আর কলতলায় গিয়ে জল ঘাঁটব না—দুধ খেতে বায়না করব না!" তা'তে যদি না আসে, তাহলে লিখব—"মা তুমি বড় দুষ্টু। এখনো আসছ না কেন? যদি শীগ্‌গির না আস, তা হ'লে দেখবে তোমার খোকা আর নেই;—বামার মার সঙ্গে বাজারে গিয়ে হারিয়ে গেছে। এমন হারিয়ে যাব যে কোথাও খুঁজে পাবে না। তখন কি করবে?"

এ চিঠি পেলে তখুনি মা ছুট্টে চলে আসবে। এসে কি দেখবে? দেখবে হরিণ-ছানাটা কত-বড় হয়েছে; খোকা তার লাল ফুল কালো জল ছোট পাতা অবধি পড়ে ফেলেছে, আবার একশো অবধি গুণতেও পারে! "ও খোকা তুই কি হলি রে!"—বলে মা তখন কত চুমোই না খাবে! তারপর যখন দেখবে মাছের কাঁটা বেছে নিজের হাতে ভাত খেতে শিখেছি, নিজের হাতে কাপড় পরতে পারি—তখন? একটা কিন্তু অকর্ম্ম করে ফেলেছি—মায়ের সেই আরসি-খানা সেদিন হাত থেকে ফেলে ফাটিয়ে ফেলেছি! মা যখন সিঁদুর-কৌটো, ফিতে-চিরুনি নিয়ে ঐ জানলার ধারে বসে চুল বাঁধতে বসবে আর আরসিখানা খুঁজেই বলে উঠবে—'খোকা তোমার এ কি কাণ্ড!' তখন কি বলব? বলব আবার কি? বলব—জানই ত খোকা তোমার দুরন্ত—তুমি তাকে একলা রেখে গিয়েছিলে কেন? সঙ্গে নিয়ে যেতে পারনি!

কিন্তু কৈ—মা আসছে? ঠাকুরমাকে

জিজ্ঞাসা করি—মা কবে আসবে? ঠাকুমা বলে,—"আসবে! আসবে!" আসবে, সে ত আমিও জানি, কিন্তু কবে আসবে? এ যে অনেকদিন হয়ে গেল! মা তো এমন দুষ্টু ছিল না, কে তাকে এই দুষ্টুবুদ্ধি দিলে! আমি এত লক্ষ্মী হয়ে রইলুম তবু মা এলো না কেন? তবে আবার আমি দুষ্টুমি করব। কাঁদব —খুব চেঁচিয়ে কাঁদবো—ঠাকুমা খেল্না দিয়ে ভোলাতে এলে একটুও ভুলব না। কিন্তু ওগো, মা যে আছে অনেক দূরে, সেখানে তার এই ছোট্ট খোকার কান্নার শব্দ কি গিয়ে পৌঁছবে?

ঐ যে দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবি! আয় মা নেমে আয়, অমন চুপ করে অসাড় হয়ে বসে আছিস্ কেন মা? দেখতে কি পাচ্ছিস না, খোকা তোর কাঁদচে—তোর কোলে যাবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করছে? অমন পাষাণের মত স্থির হয়ে আছিস্ কেন মা?

"খোকার মা আসবে! খোকার মা আসবে!"—বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ! খোকার দেহ-মন আজ নৃত্য করে বেড়াচ্চে। সে বার-বার মায়ের ছবিখানার সাম্নে গিয়ে দাঁড়াচ্চে আর মনে-মনে কি বলচে! তার মনের সমস্ত আনন্দ যেন এই নির্ব্বাক ছবি-খানির কাছে নীরবে সে নিবেদন করছে। সে সবাইকে এক-কথা এক্শ-বার জিজ্ঞেস করছে—"হ্যাঁগা, আমার মা আসবে?" সবাই বলছে—"হ্যাঁরে, হ্যাঁ, তোর একটা ভালো নতুন মা আসছে!" খট্ করে এই ভালো নতুন কথাটা খোকার কানে একবার বাজলো, কিন্তু মা আসছে এই আনন্দ সমস্ত মনের মধ্যে এমন ঝঙ্কার দিয়ে তখন বাজছে, যে সে কথাটা আমোলই পেলে না! মা! মা! চারিদিকে শুধু সে ঐ মা-নামই শুনছে। সে মা নতুনও নয়, পুরানোও নয়—সে মা! সে মা সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়—ভালোও নয়, মন্দও নয়—তার আর কোন বিশেষণ নেই, সে শুধু খোকার মা!

মা আসবে এই আনন্দে খোকা যে কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই খুঁজে পাচ্চে না! একবার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বলছে —"ঠাকুমা, আমায় সাবান মাখিয়ে ফরসা করে দাও, কালো ছেলে বলে মা ঘেন্না করবে যে!" একবার বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলছে—"বাবা, একটা শেলেট-পেনসিল কিনে এনো, হ্রস্ব ই লিখতে শিখেছি—মা এলেই মাকে দেখাতে হবে।" একবার গিয়ে একটা ছেঁড়া নেকড়া নিয়ে মায়ের তোরঙ্গটা সে পরিস্কার করতে লাগল—তা'তে যে ধুলো জমে আছে! মা এসে যে বলবে—খোকা তুমি বড় হয়েছ, জিনিষ-পত্তর নোংরা হয়ে রয়েছে, তুমি দেখতে পারনি? যাঃ, ঐ কুলুঙ্গির উপরে মায়ের ফিতে-কাঁটা ছিল—সেগুলো আবার কে নিলে?—কোথায় হারিয়ে গেল? আরসি রয়েছে, মোটা-দাড়া চিরুনিটাও রয়েছে, কিন্তু সেগুলো গেল কোথায়? নিশ্চয়ই ঐ নতুন ঝীটা চুরি করেছে। আচ্ছা, মা আসুক না, মজাটা টের পাইয়ে দেবে তখন!

আর একটি দিন। আজ রাত পোহালেই কাল সকালে খোকার মা আসবে। অন্যদিন রাত্তির বেলায় খোকা বাবার কাছে শুয়ে

ঘুমোয়—ঠিক সেই জায়গাটিতে, যেখানটিতে সে আর তার মা শুতো। কিন্তু আজ সন্ধ্যা বেলা ভাত-খাওয়া হলেই সে লক্ষ্মীটি হয়ে সুড়-সুড় করে ঠাকুরমার কাছে গিয়ে শুলো—তার বাবা যে আজ মাকে আনতে গিয়েছে! আজ যাই হোক, কাল কেমন মজা! কাল ঠাকুর-মার কাছেও শুতে হবে না—বাবার কাছেও শুতে হবে না! কাল মায়ের গলাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে—আয় রে ছেলের পালেরা মাছ ধরতে যাই—গান শুনতে-শুনতে—না, না, ওটা না—সেই-যে বাঁশবনের কাছে ভুঁড়ো শেয়াল নাচে —সেই শেয়ালটার গল্প শুনতে-শুনতে ঘুমুবে। না, না, ঘুমুবে কেন? চোখ বুজে চুপটি করে শুয়ে থাকবে—ঘুমুলেই যে মা গল্প বন্ধ করে চুপি-চুপি উঠে পালিয়ে যায়! আর খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো মনে করে মা যে পা-টিপে-টিপে পালাতে যাবে অমনি সে চোখ চেয়ে মাকে খপ্ করে ধরে ফেলবে! কি মজা!

সকালে উঠেই ভালো জামা-জুতো-কাপড় পরে খোকা বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল,—মাকে যে-সব জিনিষ দেখাতে হবে, সেগুলো সব ঠিক আছে কি না তারই তল্লাস করে। যখন সব ঠিক হলো, তখন সে সদর-দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপটি করে—মা এলেই তার কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে! ঠাকুমা ডাকলেন—"ওরে খোকা, দুধ খাবি আয়, বেলা হোলো!" খোকা রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লে—"দাঁড়াও ঠাকুমা, এখন নয়!" পিসিমা ডাকলেন—"ওরে খোকা, আয় দুধ খাবি!" খোকা তখনো পথের পানে চেয়ে অধীর হয়ে বল্লে—"দাঁড়াও না, যাচ্চি!" এক-একখানি গাড়ী রাস্তার মোড়ে দেখা যায় আর তার বুকটা লাফিয়ে ওঠে—ঐ মা আসছে! এম্নি করে অনেকখানি বেলা হলো, খোকা তবু সেখান থেকে নড়ল না। পিসিমা বলেচে, বাবা তার দশটার সময় আসবে; কিন্তু খোকার মনে হতে লাগল বুঝি পনেরোটা কি কুড়িটাই বা বেজে গেল!

হুস্ করে একখানা মোটর গাড়ী খোকার বুকে চমক লাগিয়ে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। খোকা চেঁচিয়ে উঠল—"বাবা! বাবা! মা?" ঝড়ের মধ্যে ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনি খোকার ঐ দুটি কথা শাঁখ আর হুলুধ্বনির মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল তা কারো ঠাহরই হল না। সবাই ব্যস্ত, চারিদিকে হট্টগোল—গোলমাল। তারি মধ্যে পড়ে ছোট্ট খোকাটি এমন অসহায় ভাবে চারিদিকে চাইতে লাগল যে মনে হ'ল যেন কে এক পথহারা শিশু আপনার ছোট্ট নীড়টিকে হারিয়ে আশঙ্কার বেদনায় থর্থর্ ক'রে কাঁপচে! খোকা সেই জন-কোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের মতো দেখতে লাগল—বাবা এত ধুমধাম করে ও কাকে নিয়ে এল? পিসিমা ওকে কেন কোলে করে বাড়ির ভিতর নিয়ে চলেছে? এ কে? এর গায়ে এত ঝক্মকে গয়না কেন? মুখে অতখানি ঘোমটা কেন? একে ত কখনো দেখিনি! এ আমাদের কে হয়? ওকি, ওর সব জিনিষ-পত্তর নিয়ে বাবার ঘরে তুলছে কেন? মায়ের তোরঙ্গটা খাটের নীচে সরিয়ে রেখে, ওর তোরঙ্গটা সেইখানে রাখচে কেন? মায়ের

বাসনটা চৌকির উপর থেকে নড়িয়ে রেখে ওর বাসনটা তার উপর রাখচে কেন? এসব কি অনাসৃষ্টি কাজ! তার মনে হতে লাগল কে যেন ঝড়ের মতো এসে, সব ওলোট-পালোট করে, তার সমস্ত কেড়ে নিয়ে, ঘর দখল করে নিচ্চে। ইচ্ছে হচ্ছিল, তার সেই ছোট্ট বাহু দুটি দিয়ে সজোরে তাকে হটিয়ে দেয়, কিন্তু কার সাহসে সে এগিয়ে যাবে? মা যে কাছে নেই!

বামা-ঝী খোকার কাছে এসে বল্লে—"খোকা তোর মা এসেছে!" চারিদিকে চেয়ে চীৎকার করে খোকা বলে উঠল—"কৈ, কৈ, আমার মা কৈ?" খোকার এই আকুল চীৎকার তার বুকের ভিতর থেকে একরাশ কান্না চোখের পাতার উপর এনে ঝরিয়ে দিলে। খোকার ইচ্ছা হচ্ছিল, বাবার কাছে একবার ছুটে যায়। কিন্তু বাবাকে সবাই এমন ঘিরে ধরেছে যে সেখানে যাবার ফাঁক নেই। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল! কেউ তার কাছে এলো না, কেউ তাকে কোলে নিলে না। সবাই ঐ ওর কাছেই যাচ্ছে, ওকেই দেখছে, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। সে আস্তে-আস্তে ঠাকুমার ঘরে গিয়ে খাটের নীচে অন্ধকারে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। একলাটি খোকা সেই অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে শুনতে লাগল, শাঁখ বাজছে, হুলুধনি হচ্ছে—একটা হাসি, একটা আনন্দের স্রোত চলেছে। যদিও সে ঠিক বুঝতে পারছিল না, তবু তার মনে হচ্ছিল, যেন সে একা—তার কেউ নেই! অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে যেমন বুক-দুর্-দুর্ করে, আজ তার ঠিক তেম্‌নিতর বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল!

ঠাকুমা সমস্ত বাড়ী খুঁজে শেষে খাটের তলা থেকে খোকাকে বার করলেন। ঠাকুমা ডাকলেন—"আয়"। সেই স্নেহের সুরে খোকা আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এসে ঠাকুমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখে লুকোলে। আজ তার প্রথম মনে হ'ল, কি স্নিগ্ধ এই ঠাকুমার বুকটি! সমস্ত দুঃখ তার যেন জুড়িয়ে দিতে চাচ্চে। ঠাকুমা বল্লেন—"চ' তোর মায়ের কাছে, মা তোকে ডাকচে।" সত্যি! মা তাকে ডাকচে? খোকা লাফিয়ে উঠল। ঠাকুমা তাকে বুকে করে নিয়ে চল্লেন। খোকা যেতে-যেতে ঠাকুমার কানে-কানে জিজ্ঞাসা করলে—"কৈ মা?" ঠাকুমা দূর থেকে আঙুল তুলে বল্লেন—"ঐ যে!" খোকা আবার ঠাকুমার বুকে মুখ লুকোলে। সেই বুকের অন্ধকারের মধ্যে খোকার মনে হ'ল, যেন তার মা চুপিচুপি এসে একটি চুমু দিলে;—সে যেমন মাকে আঁকড়ে ধরতে যাবে আর অম্‌নি তার মা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলেন। খোকা বাবার কানে-কানে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা, মা কখন আসবে?" বাবা খোকার মুখের দিকে চোখ তুলে শুধু চেয়ে রইলেন, কোনো জবাব দিতে পারলেন না। খোকা যখনই বাবাকে জিজ্ঞাসা করত—মা কখন আসবে? বাবা বলতেন—আসবে, আসবে—শীগ্‌গির আসবে। বাবার কাছে থেকে এই আশ্বাস পেয়ে এতদিন পর্য্যন্ত খোকা আশায় আশায় ছিল, কিন্তু আজ যখন কোনো জবাবই পেলে না, তখন সে যেন বুঝতে পারলে, আর আশা নেই! তার সমস্ত মনটা কেমন নেতিয়ে পড়ল। বাবার চোখের দিকে

চেয়ে সে আর মায়ের কথা ভুলতেই পারলে না। কে যেন তার ভিতরে-ভিতরে বলতে লাগল—মা আর আসবেনা—আসবেনা! কিন্তু কেন আসবে না?—কি হয়েছে? হায়, এর জবাব কে দেবে? খোকার তখন কেবলই মনে হ'তে লাগল—বাবার কোল ছেড়ে ঠাকুমার হাত ছাড়িয়ে সে এখুনি ছুটে পালিয়ে যায় তার মায়ের কাছে—সেই দূরে—দূরে—অনেক দূরে—যেখান থেকে তার মা আর আসতে পারছে না।

খোকার বুঝি আজ ক্ষিদে নেই! ভাত দু'গরাস বই খেতেই পারলে না। অমন যে ডিম-ভরা বড় কইমাছটা—তাও পাতে পড়ে রইল। তার যে অমন দুষ্টুমি—যার জন্যে বাড়ীসুদ্ধ লোক হিম্‌সিম্ খেয়ে যেত, সে দুষ্টুমি আজ কোথায় গেল?

দুপুরবেলা নতুন-বউ খোকাকে চুপিচুপি কাছে ডাকলে। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল—তার সেই বড়-বড় চোখ-দু'টি তার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তুলে। বউ তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করলে, কিন্তু সে ঠিক পুতুলের মতো অসাড় হয়ে রইল। কে জানে এম্‌নিতর স্পর্শের আনন্দ-স্মৃতি তার বুকের মধ্যে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কি না! আর হয়ত মনে বাজছিল যে, তার লাল-ফুল কালো-জল অবধি পড়া, একশো অবধি গোণা, নিজের হাতে ভাত-খাওয়া প্রভৃতি তারিফ করবার মানুষ তার এ সংসারে কেউ নেই। হায়, সবই ব্যর্থ হয়ে গেল!

সমস্ত দিন বাড়ীতে নানা গোলমাল চল্‌ল—খোকার মন তার কোনোদিকেই গেল না। খিড়কির বাগানে বাতাবি-লেবুর গাছে পাড়ার ছেলেরা নতুন দোলা টাঙিয়ে হুস্ হুস্ করে দুল্‌চে—সে জান্‌লায় দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগ্‌ল।

রাত্তির বেলায় বাবা ডাকলেন—"ওরে খোকা, আমার কাছে শুবি আয়। খোকা কিছু না বলে ঠাকুমার বিছানায় গিয়ে মুখ-গুঁজে শুয়ে পড়ল।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

বনের জ্যোৎস্না

গাছে গাছে মাথায় মাথায়
জড়িয়ে নিবিড়
আলিঙ্গনে,
তাদের পরে আধখানা চাঁদ
হাস্‌ছে বসে'
শুভ্রাসনে।

পাতার পরে হাজার পাতা—
নিশান পাশে
নিশান দোলে,
ছোট্ট হাজার মুক্ত অসি
জ্বল্-জ্বলিয়ে
কে ঐ খোলে!

পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি,
উঁচু নীচু
গাছের মাথা,—
নীল-সাগরে শাদা ফেনায়
হেথা হোথা
ঢেউর মাতা'!
সুদূর হ'তে দেখ্‌ছি চেয়ে
গাছের তলায়
স্তব্ধ কালো
লুকিয়ে আছে চোরের মত,
পাহারা দেয়
তীব্র আলো!
জড়িয়ে দেহ আঁধার বাসে
মাথায় জ্বেলে'
লক্ষ হীরে
দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো আজ
ধরার বুকে
সুপ্তি তীরে।
দীর্ঘ গাছের সুপ্ত বনে
তৃপ্ত যেন
কিশোর আশা,
লক্ষ পাতার কানে কানে
চাঁদের আলো
কইছে ভাষা!
ভুবন-মাঝে নেইক সাড়া,
নাইক ধ্বনি
শব্দ মোটে,
এই নিভৃতে সজীব গাছে
চাঁদের চুমোয়
শিউরে ওঠে!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বারোয়ারি উপন্যাস

১২

বন্ধে-মেল স্থান ও কালের অসীমতাকে যেন উপহাস করে ফুৎকার দিতে দিতে ছুটে চলেছিল, যেন ময়দানবের খোকা একটা হাউইএ আগুন লাগিয়ে ময়দানের বুকের উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বাহিরে মাঠের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ঝোপঝাড় গাছপালা অন্ধকারের জমাট ডেলার মতন দেখাচ্ছে; সেই অন্ধকারের মধ্যে গাড়ীর ভিতরকার আলো জান্‌লার ফুকোরে ফুকোরে উঁকি মেরে তাদের দেখ্‌ছে। এই দুর্দ্দান্ত বেগের বুকে বসে কমলা হয়েন আর ক্ষিতীশ, তিন জনেই অনুভব কর্‌ছিল, এ যেন নিয়তির গতি, তাদের টেনে নিয়ে যে কোথায় ছুটেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই!

কমলা তার স্বামীর কাছে চলেছে, যে-স্বামী তাকে একদিন না দেখে থাক্‌তে পারে না,—তার কাছে এতদিনের অদর্শনের পর ফিরে চলেছে! এতে কমলার মনে আনন্দ না ভয় বেশী হচ্ছিল, তা সে স্পষ্ট ঠাহর করতে পার্‌ছিল না। কমলা ভাব্‌ছিল, এতদিন সে বাড়ী ছাড়া, তিনি যদি এ কথা টের পেয়ে

থাকেন তা হলে কি তিনি তার কথা বিশ্বাস কোরে তাকে গ্রহণ করতে পার্‌বেন? তার ছেলে হয়নি বোলে শাশুড়ী ত তাঁর ছেলের আবার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েই ছিলেন, কেবল ছেলের মন হয়নি বোলেই তিনি সঙ্কল্প পূর্ণ করতে পেরে ওঠেন নি; এখন যদি এই ছল ধোরে তিনি ছেলের বিরক্ত মনের সুযোগ পেয়ে তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত কোরে থাকেন, তা হলে সে গিয়ে দেখ্‌বে তার জায়গা আর-একটি মেয়ে এসে দখল কোরে বোসে আছে, শুধু বাড়ীতে নয়, স্বামীর হৃদয়েও,—সেখানে তার আর কোথাও ঠাঁই নেই। এতদিন হয়ত তার স্বামী তাকে কত খুঁজেছেন, কিন্তু সে ত তাঁকে এতদিন কিছুই খবর জানায়নি; বাপের বাড়ীতেও ত জানায়নি। সুতরাং সে যদি শ্বশুরবাড়ীতে ও স্বামীর হৃদয়ে বেদখল হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্যে দায়ী তার শাশুড়ী আর স্বামী, না সে নিজে, কমলা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। যদিই তার স্বামী এর মধ্যে বাস্তবিকই বিয়ে কোরে থাকেন, তবে তার গতি কি হবে? যদিই এখন স্বামী তার সমস্ত কথা শুনে বিশ্বাস কোরে তাকে গ্রহণ করতে চান, তাহলেই কি সে সতীনের সঙ্গে ঘর কর্‌তে পার্‌বে? যে বাড়ীতে ও হৃদয়ে সে একেশ্বরী ছিল, সেখানে আর-একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোকের সঙ্গে নিজের অধিকার নিয়ে নিত্য টানাটানি করতে হবে? আর যদি স্বামী আর শাশুড়ী গ্রহণ নাই করেন, তবে ত সব ফুরিয়ে গেল, তখন সে দাঁড়াবে কোথায়? বাপের বাড়ীতে বাপ মা তাকে ফেল্‌তে পার্‌বেন না হয়ত; কিন্তু একমাস পরে স্বামীর বাড়ী ও মন

বাপের
তাকে আর বি...
আগের মমতা তাঁদের কা...
স্বামী যাকে অবিশ্বাস কোরে তা...
একমাস যে কোথায় ছিল কি করেছে ...
জানে না, তাকে বাড়ীতে নিলে তার বাবার সমাজে মাথা তুল্‌বার জো থাক্‌বে না; তার বাবার উঁচু মাথা হেঁট কোরে সে পাবে শুধু ত একটু আশ্রয়—যা হবে ঘৃণায় বিষদিগ্ধ, উঠ্‌তে বস্‌তে গঞ্জনায় কণ্টকময়! কিন্তু সে আশ্রয়ও যদি সে না পায় তবে? ক্ষিতীশ তাকে আশ্রয় দিয়েছে অসহায় বিপন্ন দেখে; তার বাড়ীতে চিরজীবন থাক্‌বে সে কিসের অধিকারে? ক্ষিতীশই বা তাকে চিরকাল পুষ্‌বে কেন? কিন্তু তখনই কমলার মনে পড়্‌ল ক্ষিতীশের কথা—'যাক্, আরও একটা দিন তবু পাওয়া গেল!' কমলাকে নিজের কাছে রাখ্‌বার যে আগ্রহ ক্ষিতীশের এই অসাবধানে-বলা সাবধানে-ঢাকা কথার মধ্যে ধরা পড়েছে তাতে তার এই আশ্রয়ও আর নিরাপদ নয়; ক্ষিতীশের মনের ভাব ত শুধু এই একটি কথাতেই ধরা পড়েনি, তা যে ধরা পড়ে তার চোখের প্রত্যেক দৃষ্টিতে। কমলাকে দেখ্‌তে পেলেই তার মনের খুসী চোখের কোণে উঁকি মেরে তার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল কোরে তোলে, সে ঢাক্‌তে চাইলেও ধরা পড়ে; সে কতবার কত ছল কোরে কমলার কাছে এসে একটা কথা বোলে যাবার চেষ্টা করে, দূর থেকে কেমন একটা মুগ্ধ কাতর দৃষ্টি ফেলে সে তার দিকে চেয়ে থাকে। এই কথা মনে হতেই কমলা চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে

।
ন্ত তার
ার স্বর্ণরশ্মির মতন
মুখে। কমলা মনে মনে
চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌তে তার
দেখে এল হরেনকে। হরেন কাম্‌রার মাঝখানের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছে, তার দৃষ্টি গাড়ীর আলো-ঢাকা সবুজ ঘেরাটোপের আশে-পাশে ফানুষ-ঢাকা আলোর ধারে পতঙ্গের মতন চঞ্চল হয়ে ছট্‌ফট করছে। কমলা ভাব্‌লে—'হরেন-দাদা ত বড়লোক, সে আমাকে আশ্রয় দিতে পার্‌বে না?' এই কথা মনে হতেই চরম দুঃখের হতাশায় কমলার হাসি পেল—'বাপের বাড়ীতে শ্বশুর-বাড়ীতে যার ঠাঁই হল না, তাকে ঠাঁই দেবে হরেন-দা! হরেন-দার বাবা ত তার বাপের গাঁয়েরই লোক; তিনি কি ছেলেকে কেন আমার মতন স্বামীর তাড়ানো বাপ-মার খেদানো মেয়েকে আশ্রয় দিতে দেবেন?' কমলা আর ভাব্‌তে পার্‌ল না, সে গাড়ীর জান্‌লার ধারে বোসে বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল—সেখানে কী বিরাট জমাট অগাধ অন্ধকার! তার নিজের ভবিষ্যৎটাকেও মনে হল অমনি অগাধ অন্ধকারের জঠরে হারিয়ে যাওয়া। যা হবে তাই দেখ্‌বার প্রতীক্ষাতেই কমলা স্তব্ধ হয়ে বোসে রইল—সে ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে আর ভাব্‌তে পার্‌ছিল না।

ক্ষিতীশ গাড়ীর এপাশের জান্‌লার ধারে বেঞ্চিতে কোণে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বোসে একদৃষ্টে কমলাকেই দেখ্‌ছিল। গাড়ী দেশ ও কালকে ফুৎকারে টিট্‌কারী দিতে দিতে ছুটে যত এগিয়ে চল্‌ছিল ক্ষিতীশের ততই মনে হচ্ছিল কমলা প্রতি মুহূর্ত্তে তার স্বামীর নিকটতর হয়ে চলেছে আর তার কাছ থেকে ক্রমশই দূরে ছিট্‌কে পড়্‌ছে! তাই এই গোণা মুহূর্ত্ত কটির যতক্ষণ কমলা তার চোখের সাম্‌নে আছে সেইটুকুতেই সে নিজের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ কোরে নিতে চাচ্ছিল, মন আগ্রহ দিয়ে ঠেলে তার চোখের কপাট খুলে রেখেছিল, চোখের পল্লব পড়্‌তে দিচ্ছিল না। কমলা বিবাহিতা, সে তাকে বোন বোলে স্বীকার করেছে, তবু তার মনে হচ্ছিল একে সর্ব্বদা কাছে রাখ্‌তে পেলে তার জীবন ধন্য হত। সে বাপ-মার একমাত্র সন্তান; কমলা যদি তার বোন হয়েই তাদের বাড়ীতে থাক্‌ত তা হলেও ত সে সুখী হত, এমন কথাও সে মনকে দিয়ে বলাচ্ছিল; মোটের ওপর তার মনের ইচ্ছাটা কেমন ঘোলা হয়ে উঠেছিল, কিছুই স্পষ্ট ছিল না। কমলাকে সে হয়ত এজন্মে আর কখনো দেখ্‌তে পাবে না; স্বামীর আদরে কমলার মনে এই কটা দিনের স্মৃতি একটা দুঃস্বপ্নের মতন আব্‌ছায়া আতঙ্কে জড়িত হয়ে থাক্‌বে; ক্বচিৎ কখনো যখন এই দুর্দ্দিনের কথা কমলার মনে পড়্‌বে তখনই তারই মাঝে মাঝে তার কথা কমলার মনে হবে, আর হয়ত একটু কৃতজ্ঞতা তার মনের কোণে মাথা তুল্‌তে-না-তুল্‌তে স্বামীর সোহাগে সব ডুবে যাবে। কমলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে তার লাভ হল এই জীবন-জোড়া মর্ম্মজ্বালা! হঠাৎ কমলা তার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে একটু হাস্‌লে দেখে ক্ষিতীশের চৈতন্য হল, সেও একবার হরেনের দিকে

চট কোরে দেখে নিয়ে জান্‌লার বাইরে অন্ধকারের কালীর মধ্যে আপনার ব্যথিত দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলে; আর তার যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌ল, তা গাড়ীচলার হুহুশ্বাসের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

গাড়ীর মাঝের বেঞ্চিতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা দুটো বেঞ্চির পিঠের ঠেসানের ওপর তুলে দিয়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আলোর সবুজ বনাতের ঘেরাটোপটার দিকে তাকিয়ে হরেন ভাব্‌ছিল অন্য-রকম ভাবনা।—'কালী-গঞ্জের যতীন মিত্তির কে? বোধ হয় ক্ষিতীশের ভুল হয়েছে—কালীগঞ্জে মিত্তির-বংশ ত তারা ছাড়া আর কেউ নেই—ক্ষিতীশ যাঁকে যতীন মিত্তির বল্‌ছে তিনি হয়ত তার বাবা, মৈত্রমশায়কে সঙ্গে কোরে কল্‌কাতায় কমলার খোঁজ কর্‌তে এসেছেন। যদি তার বাবাই এসে থাকেন, তা হলে মেসে তার খোঁজ কর্‌তে যাবেনই; এই অকস্মাৎ কলেজ কামাই কোরে কল্‌কাতা ছেড়ে আসাতে তিনি রাগ কর্‌বেন নিশ্চয়। ফিরে গিয়ে কমলার বিপদের কথা বল্‌লেই তাঁর রাগ পোড়ে যাবে। আমি কমলার সঙ্গে এক মোটারে এসেছি ক্ষুদিরাম তা দেখেছে। বাবা যদি শোনেন যে একলা কমলার সঙ্গে আমি কল্‌কাতা ছেড়ে চলেছি তা হলে তিনি কি ভাব্‌বেন? কাউকে কিছু না বোলে চোলে আসা ভালো হয়নি দেখ্‌ছি। শেষকালে কমলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে আমাকে না বিপদে পড়্‌তে হয়।' ভাব্‌তে ভাব্‌তে হরেনের মনে ভয় ঘনিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে এখনই গাড়ী থেকে নেমে ফিরে যেতে পার্‌লে বাঁচ্‌ত; কিন্তু গাড়ী ত একছুটে একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়ে তবে দম নেবে। হরেনের রাগ হতে লাগ্‌ল কমলার ওপর—কম্‌লি অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গায় ডুব দিতে এসেছিল! এখন গোলযোগে সে ডুবেছে। তাকে তুল্‌তে গিয়ে যে হরেনও ডুব্‌তে চলেছে! দুজন যুবাপুরুষে সুন্দরী যুবতীকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে চলেছে—এমন নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রতের ওপর আজকালকার লোকের কি তেমন বিশ্বাস হবে? কম্‌লির স্বামী যদি তাকে না নেয়? তা হলে তাকে নিয়ে আবার ফিরে আস্‌তে হবে? তারপর? হরেন তার বাবাকে আর কমলার বাবাকে কেমন কোরে বিশ্বাস করাবে যে কমলা যে হারিয়ে গেছে তা সে আগে জান্‌ত না আর জেনেছেও অনেক পরে? ভবিষ্যৎ সমস্যা অত্যন্ত জটিল বোধ হতে লাগ্‌ল বোলেই হরেন মনে কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ল ক্ষিতীশ যাকে দেখেছে সে যতীন মিত্তিরই, তার বাবা নন।

গাড়ীর কাম্‌রার তিনটি প্রাণী নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল, গাড়ী একদম চুপচাপ। হঠাৎ হরেন শরীর ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বোসে বোলে উঠ্‌ল—আচ্ছা ক্ষিতীশ, তোমার ট্যাক্সি যাদের গাড়ী ভেঙে দিয়েছিল, তাদের একজনের নাম বল্‌লে যতীন মিত্তির।—যোগেন মিত্তির নয়?

ক্ষিতীশ আর কমলা দুজনেই জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে ছিল; হরেনের হঠাৎ-কথায় দুজনেই চম্‌কে উঠে ঘুরে বস্‌ল। ক্ষিতীশ বল্‌লে—তাও হতে পারে, আমার

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ত ঠিক মনে নেই—ঐ তাড়াতাড়ির সময় একবার মাত্র শোনা।

হরেন জিজ্ঞাসা করলে—তাঁর চেহারা কেমন বলতে পারো?

ক্ষিতীশ বললে—বেশ ঢ্যাঙা শক্ত চেহারা, রং ফর্শা, খুব বড় একজোড়া আধপাকা গোঁপ আর খাঁড়ার মতন নাক, চোখ দুটো ভারী চটা রকমের—দেখলেই তাকে একরোখা লোক বলেই মনে হয়।

হরেনের মুখ শুকিয়ে গেল। কমলা বোলে উঠ্‌ল—উনি ত তাহলে মিত্তির-জেঠা, হরেন-দাদার বাবা! তাঁর সঙ্গে কে ছিল ক্ষিতীশ-দা?

আজ কমলার মুখে অসঙ্কোচ ক্ষিতীশ-দা সম্বোধন শুনে ক্ষিতীশ একটু হেসে বললে—তাঁকে ত আমি চিনিনে ভাই, তাঁর নামও শুনিনি। তবে তাঁর চেহারা বর্ণনা করতে পারি, তা থেকে তোমরা চিন্‌তে পারো যদি।—লোকটি বেঁটে, মোটাসোটা গোলগাল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দাড়ি গোঁপ কামানো, মাথায় টিকি আছে, আর নাকের ওপর একটা আঁচিল...

কমলা বোলে উঠ্‌ল—ইনি আমার বাবা। হয়ত পোষ্টমাষ্টারের কাছে শুনেছেন যে হরেন-দার রেজেষ্টারী চিঠি গিয়ে ফিরে এসেছে তাই মিত্তির-জেঠাকে সঙ্গে কোরে হরেন-দার কাছে আমার খোঁজ করতে এসেছেন।

কমলার এই অনুমান হরেনের কাছেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য বোলে বোধ হল বোলেই তার মুখ আরো শুকিয়ে গেল। হরেন আর কোনো কথাই বল্‌বার খুঁজে পেলে না। ক্ষিতীশও যে কি বল্‌বে তা খুঁজে পাচ্ছিল না। হরেন আর ক্ষিতীশ দুজনকেই চুপ কোরে থাকতে দেখে কমলাই আবার কথা বললে—তা হলে এই পরের ষ্টেশনে নেমে আমাদের ফিরে গেলে হয় না?

কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে মেসে নিজের ঘরটিতে উপস্থিত থাকবার জন্যে হরেনের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; তার বাবা আর মৈত্রমশায় গিয়ে যেন দেখতে পান সে কল্‌কাতাতেই আছে, কমলাকে নিয়ে সে পশ্চিমে যায়নি। তাই কমলার কথা শুনে উৎসুক হয়ে হরেন ক্ষিতীশের মুখের দিকে তাকালো। ক্ষিতীশ বললে—পরের ষ্টেশন ত সেই বর্দ্ধমান? আজ রাত্রে ফের্‌বার আর ত গাড়ী নেই। কাল সকালের গাড়ীতে কল্‌কাতায় যতক্ষণে পৌছব প্রায় ততক্ষণে আমরা প্রতাপগড়ে পৌছে যাব। যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফির্‌ব, ততদিন ওঁরা কল্‌কাতাতেই থাক্‌বেন নিশ্চয়!

ক্ষিতীশ যখন বলছিল—যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফির্‌ব—তখন তার কথার সুরে আর চোখের দৃষ্টিতে এমন একটি বিষাদ ফুটে উঠেছিল যে তা কমলার কাছে ধরা পোড়ে গেল; কমলা নিজের স্বামীর উল্লেখে আর ক্ষিতীশের কথার ভঙ্গীতে লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে বস্‌ল; ক্ষিতীশ দেখ্‌লে কমলার মুখ কমলবর্ণ হয়ে উঠেছে, তার ওপর সবুজ রঙের ঘেরাটোপে ছাঁকা সবুজ আলো পোড়ে তাকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে—যেন অরুণ-বেলার স্ফুটনোন্মুখ কমলের গায়ে সবুজ পাতা

থেকে অরুণ-আভা প্রতিফলিত হয়েছে। কমলা মুখ ফিরিয়ে বসে ভাব্‌ছিল ক্ষিতীশের প্রত্যেকটি কথার নিগূঢ় অর্থ—যার জিনিস তার হাতে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা ত সোমবারই ফির্‌ব। ক্ষিতীশের কথা যা বললে তার মন যে তা বলতে চায়নি তা তার কথার বিষণ্ণ সুরই কমলাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে—ফিরিয়ে দিতে সে যাচ্ছে বটে, কিন্তু অনিচ্ছায়, এবং ফির্‌বে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যে নয় তা নিশ্চিত, এবং ফিরিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা যে ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হতে নাও পারে এ সন্দেহও তার মনে বিলক্ষণ আছে! কমলা লজ্জায় ভয়ে যেন মোরে যাচ্ছিল। সে অন্ধকারের মধ্যে তার লজ্জিত দৃষ্টি ডুবিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বোসে রইল।

হরেন বেচারা একরকম মরীয়া হয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌ল। ক্ষিতীশ তাই দেখে বললে—রাত হয়েছে, শুয়ে পড়া যাক। কমলা তুমিও শুয়ে পড়ো।

কমলা মুখ না ফিরিয়েই বললে—আপনারা শোন্‌। আমার এখনো ঘুম পায়নি।

১৩

কমলার স্বামী চাকরী করত আউধ-রোহিলখণ্ড রেলে প্রতাপগড় ষ্টেশনে। ক্ষিতীশ হরেন আর কমলা প্রতাপগড়ে নেমে একখানা গাড়ী কোরে গণেশী মহল্লায় সতীশের বাসার সন্ধানে গেল। গাড়োয়ান যখন গণেশী মহল্লায় পৌছে বললে—বাবু, এহি তো গণেশী মহল্লা আ চুকা।—তখন ক্ষিতীশ বললে—কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, সতীশবাবুর বাসাটা কোথায়।

হরেন সমস্ত পথটা আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে গম্ভীর হয়েই এসেছে; এখনো তার কোনো চেষ্টা বা উদ্যম দেখা গেল না; তার কেবলই মনে হচ্ছিল সতীশ যদি কমলাকে না নেয়, তা হলে সে কমলাকে নিয়ে ফিরে কালীগঞ্জে কেমন কোরে যাবে? এর চেয়ে ঢের ভালো হত যদি সে কমলাকে নিয়ে আগেই বাড়ী যেত। তারা সতীশের বাসার যত কাছাকাছি হচ্ছিল—ততই তার মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ছিল। কমলারও মুখ একেবারে বোঁটাছেঁড়া পদ্মফুলের মতন দারুণ উদ্বেগে আমূলে উঠে ম্লান হয়ে পড়েছিল। কতকাল পরে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে এই সম্ভাবনা যত ঘনিষ্ঠ হয়ে আস্‌ছিল, ততই লজ্জা আনন্দ আতঙ্ক অনিশ্চয়তা তার বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠ্‌ছিল, তার বুক ঢিপঢিপ করছিল।

পথ দিয়ে একজন বাঙালীকে যেতে দেখে ক্ষিতীশ গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—মশায়, সতীশ-বাগ্‌চীর বাসা কোন্‌টা বলতে পারেন?

সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—কোন্‌ সতীশ-বাগ্‌চী? যিনি পোষ্টাপিসে কাজ করেন, না যিনি ষ্টেশনে কাজ করেন? এখানে দুই সতীশ-বাগ্‌চী আছেন।

কমলার বুকের মধ্যে একটা তুমুল তোলপাড় বেধে গেল। ক্ষিতীশ বললে—যিনি ষ্টেশনে কাজ করেন তিনি।

লোকটি বললে—ঐ যে ল্যাম্পপোষ্টটা দেখা যাচ্ছে, তার সাম্‌নে ঐ যে রক-বার-করা বাড়ী—ঐটে সতীশবাবুর বাড়ী। তা তাঁরা ত এখানে কেউ নেই? তাঁর স্ত্রীর

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

খুব ব্যামো বোলে ছুটি নিয়ে সাত-আটদিন হল তিনি দেশে গেছেন।

ক্ষিতীশ খানিকটা হতাশ খানিকটা আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাড়ীতে কেউ নেই?

উত্তর হল—না, বাড়ীতে তালা বন্ধ। সতীশবাবুর মা-ঠাকুরুণ কেবল এখানে ছিলেন, তিনিও সতীশবাবুর সঙ্গে গেছেন।

ক্ষিতীশ গাড়ীর মধ্যে মুখ টেনে নিয়ে বোসে পোড়ে বোলে উঠ্‌ল—তাইত! এখন কি করা যায়?

ক্ষিতীশ হতাশভাবে কথাটা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও তার অন্তরের আনন্দ তার চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌ল। যাক, কমলা এখনো দু-চার দিন তার কাছেই থাক্‌বে তাহলে।

আসন্ন প্রত্যাখ্যানের ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কমলারও অনেকটা স্বস্তি বোধ হল; কিন্তু স্বামীর কাছে ফির্‌তে যত দেরী হবে তত তার কৈফিয়তের বোঝা ভারী হয়ে উঠ্‌বে আর তার স্বামীর বিশ্বাস করা তত কঠিন হয়ে পড়্‌বে ভেবে কমলা উতলা হয়ে উঠ্‌ল। ভদ্রলোকটি যে বল্‌লেন—সতীশবাবু তাঁর স্ত্রীর ব্যামো বোলে বাড়ী গেছেন—এ কথার মানে কি? সে যে অসুখ হয়ে ক্ষিতীশের বাড়ীতে পোড়ে ছিল, এ খবর কি তিনি পেয়েছেন? কেমন কোরে পাবেনই বা? সে যে হারিয়ে গেছে এক মাসেরও ওপর হল, এ খবর তিনি নিশ্চয় পেয়েছেন। এতদিন সে তাঁকে চিঠি দেয়নি, এতদিন পরের বাড়ীতে সে আছে, সে বাড়ীতে আশ্রয়দাতার কোনো স্ত্রীলোক আত্মীয় নেই, এ সমস্তই তাকে এখন ভয় পাইয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। স্ত্রীর অসুখ বোলে এই যে দেশে যাওয়া, এর মানে কি নতুন স্ত্রীকে বরণ কোরে ঘরে আনা; সে বাড়ীতে তার প্রবেশের দ্বার একেবারে রুদ্ধ কোরে দেওয়া? কী সর্ব্বনাশ! সে তাহলে দাঁড়াবে কোথায়? ক্ষিতীশ যখন হতাশভাবে বোসে পোড়ে বোলে উঠ্‌ল—তাইত এখন কি করা যায়? তখন কমলা ভয়ার্ত্ত কাতর দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের দিকে ফিরে তাকালো, তার চোখে জল ছলছল কর্‌ছিল।

হরেনও দুর্ভাবনায় একেবারে ডুবে গিয়েছিল। সতীশের হাতে কমলাকে সঁপে দিয়ে বোঝা নামিয়ে সে হাল্কা হয়ে ফির্‌তে পার্‌লে তার ভাবনা অনেকখানি কোমে যেত; এখন আবার কমলাকে নিয়ে কল্‌কাতায় ফির্‌তে তার ভয় কর্‌ছিল—সেখানে তার ও কমলার বাবা বিচার কর্‌বার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন। হরেনকে তার বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন—হরেন তাঁকে কিংবা মৈত্র মশায়কে খবর জানায়নি কেন, অথবা কমলার বাপের বাড়ী নিকটে থাক্‌তেও তাকে সেখানে নিয়ে না গিয়ে পশ্চিমে অতদূরে নিয়ে গিয়েছিল কোন্ আক্কেলে,—তখন সে কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না বোলেই হরেনের ভয় আরো ঘনিয়ে উঠ্‌ছিল এবং তাতে কোরে চঞ্চল হরেন একেবারে গম্ভীর থম্‌থমে হয়ে উঠেছিল। আর হরেনের এই অটল গাম্ভীর্য্য কমলাকেও ভয় পাইয়ে তুল্‌ছিল।

হরেন ও কমলাকে নির্ব্বাক নিরুত্তর দেখে ক্ষিতীশ বল্‌লে—তা হলে ত কল্‌কাতাতেই ফিরে যেতে হয় এখন।

হরেন দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বল্‌লে—তা ছাড়া আর উপায় কি?

ক্ষিতীশের হুকুমে আবার ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে ফিরে গেল এবং পরের ট্রেনে তারা তিনজনে আবার কল্‌কাতা ফিরে চল্‌ল। ট্রেন যখন চল্‌ছিল তখন কমলা আর হরেন দুজনেই ভাব্‌ছিল ট্রেনে কলিশন হয়ে তারা গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যদি যায় ত বেশ হয়—কমলাকে তা হলে অপরাধীর মতন স্বামীর কাছে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, স্বামীর প্রত্যাখ্যানের অথবা সতীনের সঙ্গে ঘর করার দুঃখও সহ্য কর্‌তে হয় না; আর হরেনও তার দারুণ কড়া বাবার বিচারের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

কেবল ক্ষিতীশের মনের মধ্যে যে আনন্দ স্ফূর্ত্তিলাভ কর্‌ছিল তার আভা তার মুখে পোড়ে মুখ উজ্জ্বল কোরে তুলেছিল।

ক্ষিতীশেরা বিকেলবেলা কল্‌কাতায় এসে পৌঁছলো। ক্ষিতীশ একটা ট্যাক্‌সি ভাড়া কোরে কমলাকে তাতে তুলে হরেনকে ডাক্‌লে—চড়ো।

হরেন শুষ্কমুখে বল্‌লে—তোমাদের সঙ্গে আমি আর এখন যাব না; এখন আমি বাসায় যাই। বাবা আর মৈত্র মশায় কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে সন্ধ্যের পর তোমাদের সঙ্গে দ্যাখা কর্‌ব।

কমলা উৎসুক হয়ে ব্যগ্রস্বরে বল্‌লে—যত শিগ্‌গির পারো তুমি এসো হরেন-দা।

হরেন বল্‌লে—আচ্ছা।

ক্ষিতীশ ট্যাক্‌সিতে উঠে বস্‌ল এবং ট্যাক্‌সি ছুটে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। হরেন অপর একখানা ট্যাক্‌সি ডেকে তাতে আপনার বিছানা ব্যাগ তুলে নিজের মেসের উদ্দেশে রওনা হল।

হরেন মেসে পৌঁছে চীৎকার কোরে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম, ওরে ক্ষুদে!

মেসের ঝি এসে বল্‌লে—ক্ষুদিরাম ত এখানে নেই বাবু।

হরেন রেগে বোলে উঠ্‌ল—সে নবাব-পুত্তুর কোথায় হাওয়া খেতে গেলেন?

ঝি বল্‌লে—আপনার দেশ থেকে কত্তা-বাবু এসে ক্ষুদিরামকে নিয়ে গেছেন।

হরেনের মাথার মধ্যে রক্তস্রোত সন্ কোরে উঠে বন্ কোরে ঘুরপাক খেয়ে হৃদয়ে হুড়মুড় কোরে নেমে এল। সে জোর কোরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে নিজেই ট্যাক্‌সি থেকে ব্যাগ বিছানা নামিয়ে ফেল্‌লে এবং ট্যাক্‌সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দুহাতে ব্যাগ আর বিছানার মোট ঝুলিয়ে টক্‌টক্ কোরে ওপরে উঠে গেল। ওপরে নিজের ঘরের দরজার সাম্‌নে গিয়ে হরেন আরো আশ্চর্য্য হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল—তার ঘরে তার জিনিসপত্রের চিহ্নও নেই, আছে সেখানে আস্তানা গেড়ে বোসে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত কে—সে লুঙ্গি পোরে আরামে বোসে শট্‌কার নলে তামাক ফুঁক্‌ছে। হরেন দরজার সাম্‌নে হাতের বোঝা নামিয়ে ফেলে ফিরে দাঁড়াতেই তাদের মেসের পুরোনো মেম্বর গৌরাঙ্গ তার কাছেই আস্‌ছে দেখ্‌তে পেলে। হরেনকে ফির্‌তে দেখেই গৌরাঙ্গ বোলে উঠ্‌ল—আরে হরেন যে? কখন এলে?

হরেন গৌরাঙ্গের হাসির বদলে হাস্‌তে না পেরে শুক্‌নো মুখেই বল্‌লে—ব্যাপার কি

গৌরাঙ্গ? আমার ঘর বেদখল—অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক?

গৌরাঙ্গ বল্‌লে—তুমি কিচ্ছু জানো না নাকি? যেদিন তুমি পশ্চিম গেলে, সেইদিনই তোমার বাবা আর এক কে মৈত্র-মশায় এসেছিলেন। তোমার বাবা আমাদের ডেকে বল্‌লেন—'হরেন আর এখানে থাক্‌বে না; আমি হরেনের জিনিসপত্তর সব নিয়ে যাচ্ছি—এই সেসনের সীট-রেণ্ট আর অন্য কিছু যদি মেসের পাওনা থাকে আমি চুকিয়ে দিয়ে যাব।' তিনি তোমার সীট-রেণ্ট দিয়ে গেছেন; কিন্তু আমরা পরদিনই বিলাস-বাবুর শালাকে মেম্বর পেয়ে গেলাম; তাই তোমার সীট-রেণ্টের টাকা কাল মনি-অর্ডার কোরে তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

হরেন প্রাণপণ বলে খুব সপ্রতিভ থাক্‌বার চেষ্টা কোরে সহজভাবে বল্‌লে—ও! আচ্ছা, এখন ভাই আমার মোট দুটো তোমার ঘরে রেখে দাও, আমি এক সময় এসে নিয়ে যাব!

গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এখনই এসেই কোথায় চল্‌লে!

হরেন সিঁড়ি নাম্‌তে নাম্‌তে বল্‌লে—একবার বাবার খোঁজ নিয়ে আসি, তিনি আছেন, না দেশে ফিরে গেছেন।

গৌরাঙ্গ উপর থেকেই হেঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—রাত্রে এখানে খাবে ত? ঝিকে চার্ল নিতে বল্‌ব?

হরেন চেঁচিয়ে বোলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল—না, চাল নেবার দর্‌কার নেই।

হরেন একলা নিরিবিলিতে নিজের অবস্থাটা ভেবে তলিয়ে বুঝে নেবার জন্যে চেনা লোকের সংশ্রব ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল। হরেন ভাব্‌তে ভাব্‌তে চল্‌তে চল্‌তে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হল। সে বাগানে ঢুকে এক টেরে একটা বেঞ্চিতে বোসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—তার বাবার হঠাৎ তাকে কোনো খবর না দিয়ে তার বাসা তুলে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য সে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না; কেবল আব্‌ছায়া এই বুঝ্‌ছিল যে কমলা হারানোর সঙ্গে এর একটা কিছু যোগ আছে। কিন্তু কমলা হারানোর সঙ্গে যে তার কি অপরাধ ঘটেছে তা সে মাথা আলোড়ন কোরেও আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ছিল না। হয়ত তাঁদের খবর না দিয়ে কমলাকে নিয়ে পশ্চিমে যাওয়াতে তিনি রেগেছেন। যাক, সে ভাবনা ভেবে কোনো ফল নেই যখন, তখন ভাবা মিছে; এখন ভেবে দেখা উচিত তার কি করা উচিত। বাবার সঙ্গে দেখা কোরে অভিযোগ শুনে কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন কর্‌তে যাওয়ার মধ্যে একটা যে হীনতা আছে তার অপমান, বিনা দোষে অবিচারে বাবার দণ্ডদানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অভিমান এবং বাবার সাম্‌নে আসামী হয়ে বিচার-প্রার্থী হবার ভয়—তিনে মিশে আবেগময় হরেনের মন আচ্ছন্ন কোরে ফেল্‌তে লাগল। সে পকেট থেকে মনিব্যাগ টেনে বার কোরে দেখ্‌লে তার সঙ্গে এখনো একান্ন টাকা সাড়ে তেরো আনা সঙ্গতি আছে; হাতে একটা হীরের আংটি আর সোনার ঘড়ীচেনও পুঁজি আছে! এতে তার কিছুদিন নির্ভাবনায় চল্‌বে। তবে সে কেন হীনতা স্বীকার কর্‌তে যাবে? অবিচারক অত্যাচারী লোক বাবা হলেও তার কাছে হরেন কিছুতেই মাথা হেঁট কর্‌বে না। এই সঙ্কল্প স্থির করেই হরেন বাগান থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল এবং ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আর বেঙ্গলী কাগজের আপিসে গিয়ে দুটো বিজ্ঞাপন দিয়ে এল—Situations Wanted কলমে যা হোক একটা কিছু চাকরী নিয়ে সে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবে। বাবার ও খাম-খেয়ালী অনুগ্রহ-নিগ্রহের ধার সে ধার্‌বে না।

হরেন যখন বিজ্ঞাপন দিয়ে মনকে হাল্কা করে নিজের অঙ্গীকার-মতো ক্ষিতীশের

বাড়ীতে কমলাকে তার বাবার খবর দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় কালীগঞ্জে কাণা শশী খুব-খুসী মুখ থেকে পাকা লাউ-বিচির মতন বড় বড় দাঁত বার করে মৈত্রমশায়ের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌ছিল—মৈত্রমশায়, আজ রাত্তিরে আমার বাড়ীতে আপনি দয়া করে আহার কর্‌বেন; মানসিক ছিল—মা-কালীর কাছে একটা পাঁটা বলি দিয়েছি—এই উপলক্ষ্যে মার মহাপ্রসাদ বন্ধুবান্ধব মিলে একটু একটু মুখে দেওয়া।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৈরিকের সাহিত্য-সাধনা

সংসার, সাধনার তপোবন ও উপবন—উভয়ই। যদি সোনার চাবি দিয়া সোনার শিকল খুলিয়া ফেলা যায়, তবে উপবনের কুসুমতোরণ খুলিয়া যাইবে; ললিত উন্মাদনায় রঙীন অযুত আবেশ-সিক্ত ধরণীর মুখখানি অমনি পটান্তরাল হইতে আসিয়া দর্শকের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিবে। সে মুখে উচ্ছ্বসিত ভালবাসার আরক্তিম কুঙ্কুম লহরের পর লহর তুলিয়া প্রতিক্ষণে অপরূপ নৃত্যভঙ্গী লইয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। এই রূপীয়সীর ফাগুয়ার ফাগ,—

"রূপের কিরণে ফাগুয়ার ফাগ
মুঠোমুঠি করি লুটিয়া ছড়ায়
দিশি দিশি তার অভিনব যাগ!"

রূপ-যজ্ঞ হইতে বিকশিত হইয়া উপবনের শ্যামলতায় গলিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। ইহাই সাধনার একদিক্—ইহা সাধনার উপবন, তপোবন নহে। এ জগৎকে উপবনের রূপ দিতে কত কবির চক্ষু ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত আছে, ব্যস্ত রহিবে—সংসারের মরণের ফাঁস রোগ-দুঃখের দারুণ ভীতি ও অদৃষ্টের অট্টহাস ভীমা লহরীর মত যখন প্রবল রুদ্রের মূর্ত্তি লইয়া প্রতি নিমেষে মানুষের সাধের সাজ-ঘর গ্রাস করিতে আসে, তখন জগতে হাসির কল্লোল আর উঠিত কি? এ দুঃসহ দারুণ দুঃখসমুদ্র-মন্থনে যখন বিশ্ব-ভুবন আত্ম-চৈতন্য-হীন, তখন মন্থনের ফলে জন্মাইল এক কবি। বিপুল সাধনা লইয়া তাহার জন্ম, বিকশিত শতদলসম তাহার চিন্তা মানস-সরোবরের ন্যায় তাহার মনের সরোবরে প্রতি মুহূর্ত্তে

দীপ্ত পুলকে ফুটিয়া উঠে—শতবরণময়ী শত-গন্ধযুতা সে চিন্তা তাহার অতুল বিত্ত। ইহাই তাহার ফুলশর। এ ফুলশর হস্তে লেখনীরূপ কার্ম্মুক-টঙ্কারে মনসিজ কবি বিদগ্ধ বিরূপ হরের অনাসক্ত কান্তিবৎ রৌদ্রময়ী ধরণীর অঙ্গে ফুলশর ফুটাইয়া দিল। এ ফুল-বাণের আঘাতে বিশ্ব-ভুবনে মূর্চ্ছনা জাগিয়া উঠিল—পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গ প্রকাশ পাইল, বিশ্বময় ফুলশয্যা পাতা হইয়া গেল,—যেন পৃথিবী ব্যাপিয়া বাসরঘর আর ফুলশয্যার রাত্রি অনন্ত উৎসবের মত ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল! ধন্য কবির সাধনা, এ সাধনায় পৃথিবীর করাল কাম্য চোখের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল, মানুষের চোখে বিশ্ব-ভুবন এক উপবন-শ্রীতে ভরিয়া উঠিল। এ উপবনের কুসুম-তোরণ সোনার শিকলে আবদ্ধ,—কবি তাহার সোনার চাবি দিয়া এ দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া সকল সংসারকে ডাকিল, বলিল—'এ সাধনার উপবন,—এ পথে যাও মর্ত্ত্যলোকের দুর্লভ সুষমা এইখানে মিলিবে।' ধরার বুকের দুঃখ গলিয়া উহাতে রূপ ও রসের অমৃত-সংযোগ হইল, আর মাথায় পরানো হইল এক নব-বিবাহিতার সোনার মুকুট। সলজ্জ সরক্তিম নব-বধূকে রাজ-পাটে বসাইয়া কবি তাহার সাধনার উপবনের চক্ষুঃদান করিল।

তারপর তপোবন। ইহা সাধনার অন্য-দিক্—উপবনের সাধনা বুঝিলে ইহাকে বুঝিতে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবটা বড় সুন্দর সহায়ক। উপবনের কবি দেখিয়াছি, তপো-বনের কবিকেও দেখিব। উপবনের কবি কাঞ্চন-সাহায্যে (চাবি) কাঞ্চন (শৃঙ্খল) খুলিয়া পাইল কি? পাইল যৌবন-চঞ্চলা বাসনা-রাগাধরা লাস্যচরণা এক কামিনী! কামিনী ও কাঞ্চন লইয়া উপবনের কবি পঞ্চশর তূণে ভরিল—আর তপোবনের কবি? সাধনার অপর দিক্, এ তপোবন-সাধনা আসিল কোথা হইতে? এ সাধনার রহস্যগুহাহিত, প্রচ্ছন্ন আবরণের অন্তরালে ইহা কেমন যেন আত্ম-গোপন করিয়াছে। যুগের পর যুগ যায়—মানুষের স্তর বাড়িয়া চলে। অঙ্গ-সম্মিলন হইতে মানুষ জন্মায়, বাল্যে কৈশোরে যৌবনে অঙ্গ-লিপ্সা সমস্ত হৃদয় নাচাইয়া অবশেষে বার্দ্ধক্যে উহার অফুরন্ত গীতি লইয়া হাল্‌কা হাওয়ার মত শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া যায়, কিন্তু কোথায় যাইবে? ঊর্দ্ধলোকে স্বরলোকে এ কামনা-দীপ ত জ্বলিতে পারে না, তাই আবার উহার নিজ আকর্ষণেই এ কামলোক-কল্পিত-ভূর্লোকে সেই দীপশিখা নূতন জীবনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া থাকে। এই নব কলেবরে আবার সেই লালসা-সঙ্গীত লহরের পর লহর তুলিয়া বাজিয়া থাকে—কিন্তু কখন হয়ত মৃত্যুর আড়ালে বোধ করিয়া থাকিবে যে ঊর্দ্ধে ঐ যে অনীকিনি নক্ষত্রলোক ঝক্‌মক্ করিতেছে, সেখানে স্তর-পরম্পরা সোপান ছায়াপথ বুকে নিঃশব্দে ভুবর্লোক স্বর্লোক ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধতম কেন্দ্রে পৌঁছিয়া থাকিবে। সেই music of the spheresএ তাহার গীতি লইয়া সুর-ঝঙ্কারে আর একটু সুর যোগ করিয়া দেয়, এ ইচ্ছা কি তাহার হয় নাই! বোধ হয়, হইয়াছিল,—কিন্তু যাইবে কেমন করিয়া? Gold and Tinsel, আত্মার সঙ্গে যে কামের কাদা মাখিয়াছিল

উহা যাইতে দিবে কেন? কিরণময় আত্মার আঁখি কামের কালি লাগিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটু যাহা দৃষ্টি ছিল তাহাতেই দেখিয়াছিল সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। মনের ক্ষোভ লইয়া আবার ঘর করিতে আসিতে হইল! এই অন্তর-ইন্ধন হইতে মানুষের চোখ হঠাৎ খুলিয়া যায়—একদিন খুলিয়াছিল—সেই হইতেই ইহার সৃষ্টি। যখন একদিন মাহেন্দ্রক্ষণে এ মানুষ জাগিল, পৃথিবীর বুকের গান হঠাৎ তাহার কাণের পর্দ্দা স্পর্শ করিল। সেই music of the spheresএর ইহা শেষ ধ্বনি অধস্তন হইতে ঊর্দ্ধতনের গীত-ঝঙ্কারের সহযোগিতা। তখনি পুরুষ বুঝিল, গীতি-ফুলমালিকার শেষ ফুল এই ধরণীর মর্ম্মে ফুটিয়াছে, এ ফুলের বোঁটার সন্ধান পাইলে, সে সূত্র ধরিয়া ওই অনন্তের সোপান মিলিবে, তাহা হইলে আর ব্যর্থ যাত্রার মর্ম্মপীড়া পাইতে হইবে না। এমনি করিয়া একদিন শুনিল, নিবাত-নিষ্পন্প হিমালয় যেন দুই হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছে, 'আয়, আয়, এইখানে গুহা-গহ্বরে লুকাইলে সেই বোঁটার সন্ধান পাইবি,—সেখান হইতে 'সুরের সুরধুনী' বাহিয়া ঊর্দ্ধলোকে যাত্রা করিতে পারিবি!' পুরুষ যখন শুনিল, অমনি চলিতে চাহিল। পায়ে শিকল বাঁধা, আত্মার মহা-শঙ্খ ফুকারিয়া সে লালসার শিকল ভাঙ্গিয়া দিল, ধরণীর পানপাত্রখানি হেলায় ধূল্যবলুণ্ঠিত করিল, তারপর সে গুহালোকে প্রবেশ করিল।

এ গুহালোকে পুরুষ আত্মার অমর মুকুট-সন্ধানে আসিয়াছে—আসিয়া ধরণীর আর এক রূপ উন্মোচিত করিয়া দিল। উপবন-সাধনা দেখিয়াছি, এবার তপোবন-সাধনা দেখিব। ফুলশর লইয়া যে ভুবনকে কবি উপবনের বাসর-ঘর সাজাইয়া তুলিল, যে বাসর-ঘরের রাজ-পাটে নব-বধূকে বরণ করিয়া লইল, সেই ভুবনকে এ ত্যাগী ফুলশরের বদলে কার্ম্মুকের পরিবর্ত্তে পিনাক লইয়া ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিল, এইরূপে তপোবনের সৃষ্টি-কার্য্য আরম্ভ হইল। যে সোনার চাবি ও সোনার শিকল কবি উপবনের দুয়ারে রাখিল, এ ত্যাগী উহাদের পরিবর্ত্তে তপোবন-পথে ত্রিশূল ও ডমরু স্থাপনা করিল। বেদ-ত্রয়ের ত্রিশীর্ষ লইয়া ত্রিশূল, ডমরু হাঁকাইয়া জানাইয়া দিল যে,এই পৃথিবীর শীর্ষস্থল শিরোভাগ হিমালয়ের অন্তরদেশে এক মহা-তপোবন ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ তপোবন মানবের মুক্তি-তীর্থ। এ রাজ্যে হোমানল ধিকি ধিকি জ্বলিয়া আত্মার গ্লানি মুছিয়া দেয়—এ অগ্নি-পরীক্ষায় আত্মার ভোগ দগ্ধ করিয়া তবে উহাকে অ-মৃতলোকে লইয়া যাইতে হয়। তপোবনের কবি বড় গলা করিয়া কহিল, এইখানে যে বাড়বানল জ্বলিতেছে উহাতে কামিনী-কাঞ্চন ভস্মীভূত হয়। উপবনের কবি কহিল, এইখানে মানুষের দুর্নিবার দুঃখ-সমুদ্রে এই ললিত-লাবণ্যের খচিত প্রেমফুলহার ভেলার মত দুইটী হৃদয়কে শত-বিপদ-ঝঞ্ঝায় শত চমকপ্রদ কলহ-নিপুণা বাক্‌চাতুর্য্যময়ী বিদ্যুৎবিলসী রজনীর মাঝেও ধ্রুব-জ্যোতিঃর দিকে নিঃশঙ্কভাবে লইয়া যায়। হরের তপস্যা ও মদনের ফুলশরের মত-এ তপোবন-সাধনা ও উপবন-সাধনা সংসারের দুই দিক লইয়া পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। উভয়ই সাধনা বটে—মহাসাধনার ফলে কবি হওয়া যায়, মহা সাধনায় সাধক হওয়া যায়।

তপোবনের কবি কহিল, 'আমার রাজ্য মুমুক্ষুর জন্য,যাহারা মুক্তি চায়।' উপবনের কবি কহিল, 'আমার রাজ্য বুভুক্ষুর জন্য, যাহারা ভোগ করিতে চায়।' এইরূপে দেখিলাম, সংসার-সাধনার তপোবন ও উপবন। উপবনে সংসার বধূ-বেশী, তপোবনে পৃথিবী মাতৃ-রূপী। উপবনের চক্ষুতে ভুবন-বলয় এক অসামান্য লাবণ্যবতীর অঙ্গ-বিকাশ, আর তপোবনের চক্ষুতে সে চঞ্চল উর্ম্মিফেনার তরলিত লাবণ্য স্থির ধীর গম্ভীর হইয়া শুক্লসন্ধ্যার মত, যে মায়ের প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু এ উভয় সাধনার কি মণি-কাঞ্চন সংযোগ হয় না? এই জগতের দুই সাধনা কি এক কবির বীণায় বাজিতে পারে না—উপবনের পথ বাহিয়া কবি কি ভিতরের তপোবন-প্রান্তরে দগ্ধ ভুবনকে স্বর্গবিভূতি-স্নাত করিতে পারেন না! অবশ্যই পারেন। এ ধরণের প্রয়াস গৈরিক আভায় সুসম্বৃত—এ চেষ্টার সাফল্যে সাহিত্যের অঙ্গনে অবিনশ্বর মণি-দীপ জলিয়াছে,—এ চেষ্টার অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ বাণ-মুখে তপোবনের ধুতুরা মানবের ভাব ও ভাষার সাম্রাজ্যে আসিয়া জুটিয়াছে—ধূর্জ্জটীর জটাজালের কর্পূরকুন্দ শুক্ল জ্যোৎস্না সেই ধুতুরার অঙ্গে লিপ্ত হইয়া সাহিত্যের দেউলে দীপ্ত হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। ইহাকেই বলে, চন্দ্রালোক, শশাঙ্ক-মৌলির চন্দ্র-জ্যোতিঃ।

এ চন্দ্রালোকে মহাকবি কালিদাসের কাব্য-বাতায়ন-পথ উদ্ভাসিত, ভবভূতির সাত্ত্বিক ভাবের উপর,বারিধির উপর জ্যোৎস্না-নৃত্যের মত চন্দ্র দীপ্তি প্রদীপ্ত। বঙ্গ কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দে চন্দ্রালোক ঝল্‌মল্ করিতেছে—শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রে সে তপোবন-হোমানল যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাইকেল-হেম-নবীন-অক্ষয়ে সে অক্ষয় জ্যোতির রেখার ছায়া পথ সমুদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র-চিত্রে সে আলোক-প্রপ্রাত জ্যোতিষ্কের অক্ষরে ফুটিয়াছে, আর অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-সুরধুনীতে সেই চন্দ্রালোক ভাব-তন্ময় হইয়া রাম-ধনুর সপ্ত-বরণে গলিয়া পড়িল—সপ্তস্বর্গের সাতটি রং এই চিত্রকরের চিত্র-নদীতে ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মিরাঙাইয়া তুলিয়াছে,—সপ্তাহের সপ্তদিনে এই রঙ্-সপ্তমীর উৎসব চলিতেছে। ধন্য চিত্র, ধন্য তুলি! সত্যেন্দ্রনাথের সত্য-লোকে সে চন্দ্র-দীপ্তির বিচ্ছুরিত কিরণ জল্ জল্ করিতেছে! এইরূপ কোথায় নয়? চন্দ্রালোকের শুভ্র-আলিপনা কম বেশী কাহার অঙ্ক না উজ্জ্বল করিয়াছে? য়ুরোপের সাহিত্য-মন্দিরে বাণীর অলক্তক-রাগ রহিয়াছে, কিন্তু সেই চন্দ্রালোক দান্তে গেটে শেক্স-পীয়রের লেখার উপর দাগ রাখিয়া দ্রুত অপরাপরের ভিতর দিয়া চকিতে দামিনী-রেখার মত ঝলসিয়া গিয়াছে, এই মাত্র, বসিতে পায় নাই। সে দীপ্তির ছটা বাঁধিয়া লইতে টলষ্টয় হাত বাড়াইয়াছিলেন, তাহার ফলে তথায় ইন্দ্রিয়ের অতীত সেই মহা-গান লেখার ফাঁকে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। শতশাখ মহীরুহের পত্রান্তরালে যেমন চাঁদের আলো নাচিয়া ফিরে, সেইরূপ টলষ্টয়ের সাহিত্য-সৌধ-বাতায়নে ফুল্ল জ্যোৎস্না আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে, sublime in literature একদিন গ্রীসের শেষ-জীবনে গ্রীসিয় বলশেভিজম্ সেক্রেটিসের দ্যুলোক-দীপ্ত জীবনের যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল, আজ এই মর সংসারের

নারকী লিপ্সা যে রুসিয়ার সর্ব্বাঙ্গ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহার 'হিম্‌লকে' (hemlock) এই রুস-সক্রেটিসের কি দশা ঘটিত? এই বলশেভিজমের বিষ-পাত্র লইয়া কোন্ পৈশাচিক অভিনয়-লীলায় রুষিয়া টলষ্টয়ের সম্মুখীন হইত! উপবন সাধনের ইহাই পরিণতি—উপবনের বাসর-ঘরের বাতি নিভিয়া এইরূপে শেষে আসিল কাল রাত্রি। য়ুরোপ উপবন-সাধনায় এতদিন ফুলবনে কমল-বিলাসী হইয়াছিল, এইবার ফুলশয্যা কাটিয়া গিয়া কালরাত্রি আসিয়াছে। ভারতের ভারতী-মন্দিরে আজও ধূপের ধোঁয়ায় যে চন্দ্রালোকের আরতি হয়, যে গন্ধ-দীপের সলিতা পুড়ে, উহাতে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের বন্ধন দৃঢ় হয়, আকাশ-লোকের সহিত এ ধরালোকের বিবাহ হইয়া থাকে। এই transcendental touches and hues লইয়া ভারতের বাণী-ভবন ও কলা-ভবন পূর্ণ দীপ্ত।

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়!' সংসারে সংসারী হইয়া in the world but out of it কবি, ঋষিত্বের প্রতিষ্ঠা আপনার মধ্যে আনিয়া সংসারের সুখ-দুঃখে আপনার গা ভাসাইয়া দেন। গৈরিক অনুভূতি জটা-বল্কল লইয়া শরীরের প্রচ্ছদ-পট না মার্জ্জিত করিলেও, ভিতরের অন্তর-লোকে সেই তপোবন প্রতিষ্ঠাপিত করে। সেখানে তপোবনের কমণ্ডলু ও তপোবনের হোমধূম এক অভিনব মানস-তীর্থ রচনা করিয়া থাকে। সেই অন্তর-লোক হইতে কবি সাহিত্য-জগৎ রচনার স্বপ্ন লাভ করেন। উপবন-সুষমার কমল-জলে শুইয়া বধূ-বেশী ধরণীর রাণী বিলাস-লাস্যে প্রতি চাহনিতে ক্ষণে ক্ষণে যে ফুলশর হেলায় ছুটাইয়া দেয়, তাহার প্রতি শর কবি অশ্রান্তভাবে কুড়াইয়া তূণে ভরিয়া তোলেন, যে নূপুর-শিঞ্জন মাঝে মাঝে ক্ষীণ মূর্চ্ছনার মত বাজিয়া উঠে, তাহার তাল গাঁথিতে কবি এক মহা-ধ্যানে বসিয়া যান্, এই অঙ্গোত্থিত রস-সৃজনে কবির জীবন সাধারণের মত গঠিত হইলেও কবি উপবনের রূপ ও রসের জোয়ারে গা ঢালিয়া দেন্ না। তিনি অন্তরের অন্তরতম দেশে যে তপোবন পোষণ করেন, তাহাই তাঁহার শক্তি, তাঁহার genius,—সেই শক্তি, তাঁহার হৃদয়কে অলক্ষ্যে বন-গহনের তপোবনের সহিত এক বিজলী-দীপ্তির রেখায় বাঁধিয়া দেয়। যখন তাঁহার শ্লোক-রচনা আরম্ভ হয়—যখন দুই মিলন-দুরু-দুরু শুক-সারিকার গান ফুটাইতে থাকেন, তখন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' সেই অঙ্গ-মিলন-উৎসব চারু-চপল-চুম্বনচিহ্নিত হইলেও তাঁহার মন উঠে না, সেই মনের গোপন তপোবন তাঁহাকে বলিয়া দেয়, এ কিসের প্রেম—এ যে অঙ্গ-সম্মিলন! এ লাবণ্যাধার তনু ধূলার মত একদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে—তখন? তখন ত প্রেম মরিবে, কারণ এ তো প্রেম নয়, এ যে কাম! তপোবনের বৈরাগ্যের মন্ত্র, তপোবনের গৈরিক জ্যোতি আসিয়া তখন তাঁহার কাব্যে সঞ্জীবনী-শক্তি প্রদান করে! এইরূপে উপবনের রূপনদীর তরল জোয়ারে চাঁদের আলো আসিয়া পড়ে—সে আলোর কম্পনে কত ঊর্ম্মি নৃত্যপরা হইয়া উঠে,—দুইদিন পরে দেখা যায়, এক বুদ্ধদেব ঊর্ম্মির

ফেন-মুকুটের মাথায় বসিয়া চন্দ্রালোক-দর্শনে আকুল হইয়া তপোবনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—কয়দিন পরে এমনি করিয়া এক শঙ্করাচার্য্য মানব-সাহিত্যের বক্ষে শঙ্কর-জ্যোতিঃ লগ্ন করিলেন, সিন্ধুতরঙ্গে জ্যোৎস্নার ও আকাশের অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া একদিন একজন রামকৃষ্ণ এ চন্দ্রালোক মাথায় করিয়া সুদূর আমেরিকার বিলাস-লাস্যের ভবন-শিখরে ছড়াইয়া আসিয়াছে, এ চন্দ্রালোক হিম-শিখর হইতে বাহির হইয়াছে। ইহাই গৈরিক সাহিত্য—এই অতীন্দ্রিয় চিত্রাঙ্কনে গৈরিকের সাহিত্য-সাধনা মানুষকে কাম ও লালসা হইতে নিষ্কণ্টক করিয়া স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়াছে—বধূর কর-গ্রাস হইতে তপোবনের মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দিয়াছে। গীত গোবিন্দের কবি রাধাকৃষ্ণের মিলনাভিনয়ের অন্তরালে লালসার চিত্ত-বিমোহন চিত্র-অবসরে যে প্রাণের গুঞ্জন লুকাইয়াছেন, তাহা সাধারণ চক্ষুর কোণে, কার্ণের পর্দ্দার দ্বারে ফোটে না ও বাজে না, রসস্বাদী পাঠকের মুখে যে কল্পিত রস পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহার মূলে এক চিরন্তন উৎস রহিয়াছে উহার স্বাদ সহজে মেলে না, মিলিলে মানুষ সব ছাড়িবে। ভোগায়তন দেহের যে আত্মা শ্রীভগবানের সহিত মিলনেচ্ছায় প্রতি মুহূর্ত্তে স্পন্দিত হইতেছে, উহার মাধুর্য্য বিরলে তথায় ফুটিয়াছে। এই গৈরিক আভা একদিন মানুষের মনে বিদ্যুৎ-স্ফুরণে ফুটিয়া উঠে, অমনি মানুষ সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ বলিয়া সব সুন্দরের উপাসনা সকল রূপের পূজার ডালি ফেলিয়া সেই রূপরাজের দিকে ধাবিত হয়। এইখানেই গৈরিক দ্যুতির সংযোগে তপোবন ও উপবনের মিলন-রাত্রি আসিয়া থাকে। ভারতের ভারতী-মন্দিরে এ মিলন-রাত্রি চিরন্তন রহিয়াছে য়ুরোপে পূর্ণ বিচ্ছেদের ভিতর মিলন-রাত্রির আশা কোথায়? তপোবন থাকিলে ত উপবন আসিবে, মূলেরই যে অভাব!

জন্মান্তরের অর্জ্জিত প্রতিভায়, বাসনার জগতে গোলক ধাঁধার প্রতি যখন দৃষ্টিদান হইতে থাকে, যখন বাসনার কাচের ঘর খানি নেহাৎ কাঁচা বলিয়া মনে হয়, তখন প্রতিভার পুত্র কেমন করিয়া হেথায় বসিয়া হাতে পায় ভালবাসার নিগড় বাঁধিবে, কেমন করিয়া খচিত নক্ষত্রাকাশের তলে বরণ-ডালার নীচে বর-বধূর মাথা এক করিয়া দাঁড়াইবে! সে জানে যে সংসার সে বড় ভালবাসে, সে জানে যে সংসার তাহার দুগ্ধ ধবল দৃষ্টিতে অবগাহিত করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু সে ত আসক্তির পূজা করিতে শিখে নাই। এক গৈরিক আভায় তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া সেখানে অলকানন্দার সৃষ্টি করিয়াছে সেই মন্দাকিনীর ঊর্ম্মি যখন জাগিয়া উঠে, সে ঊর্দ্ধে অসীমের মহারাজের দিকে তাকাইয়া কহে,—

আমার হৃদয় ভরিয়া, উছলি উঠে গীতিভরা ঢেউ
চরণে ছুটে কতবার!

এই গৈরিক দ্যুতিতে তাহার হৃদয়ের দীপ যে ভাবে জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতেই তাহার প্রাণের মূলে অঙ্কুরিত হইল এক ভাবের ফুল, কবিতার কৌস্তুভ-হার, সে ফুল কবির পুষ্পিত অযুত ছন্দে বিকশিত হৃদয় লইয়া জন্মাইল। অন্তরে বাহিরে বৈরাগ্যের বিভূতি বিভূষিত

হইলেও, সে ত যতু-গৃহের মত এ সংসার ত্যাগ করিয়া, সংসারের সকল শিকলী কাটিয়া তপোবনের হোমানলে আহুতি ঢালিতে যায় নাই। সে রহিয়া গেল সংসারের অঙ্গনে, কারণ এ খেলা-ঘরে বিধাতার আসন পাতা দেখিয়াছি, মানুষের স্বরে ভগবানের স্বর ফুটিতে শুনিয়াছি। সে এখানে ঘরে ঘরে বিশ্বেশ্বরের ক্ষুদ্র রূপ দর্শন করিয়াছে, ইহাই যে তাহার সাধন-ক্ষেত্র। এই উপবন-অন্তরে যে তাহার অন্তরের যোগ রহিয়াছে,—কারণ সে মানুষ এবং মানুষকে বড় ভালবাসে। কিন্তু সেই ভালবাসায় কোথাও আসক্তির দীপ জ্বালিতে দিতে সে একান্ত নারাজ, নারীকে মা বলিয়া জানিয়াছে, নারী যে তার মায়ের জাতি! সে যে ছেলে হইয়া জন্মিয়াছে, সে যে সন্তান! তাই বাঁধিবার মত তাহার কিছু ছিল না, সে একখণ্ড উপবীতের মত নিজের জীবন-যজ্ঞে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রাণের বোঁটায় পৃথিবীর ভালবাসা রঙীন সুতায় জড়াইয়া আছে, সে জিনিস আর কিছুই নয়, মানুষের প্রতি প্রেম! এই গৈরিকের সাহিত্য-সাধনায় উপবন আছে, তপোবনও আছে। এ গৈরিক কবি চাহে, উপবনের ফুলবন ফুটাইতে, চাহে বধূরূপী নারীর চিত্র আঁকিতে চাহে, মন্মথ-সাহিত্যের মূলে ললিত ভঙ্গীর দৃষ্টি দান করিয়া রসের উৎস খুলিতে! এই রস-পরিবেষণের অন্তরালে এক মহা চন্দ্রালোক লুকাইয়া রহিবে—মেঘাড়ম্বরে যেমন চাঁদের আলো ঢাকিয়া যায়, সেইরূপ এ কবি রভস-আবেশের পরিরম্ভনের পটান্তরালে জীবনের মহা-গান সুপ্তব্য রাখিয়া দেয়, যেন সময় পাইলে জাগ্রত হইয়া সে গান আত্মাকে উত্তিষ্ঠত নিবোধত রূপে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে! সে গান কি? উপনিষদের 'তত্ত্বমহসি' 'সোঽহম' মন্ত্রে সাধনা এ জীবনের জন্য নহে, এ পৃথিবীর ব্যূহ-মধ্যে সমাপ্তি পাইবার নহে, এক জীবনের জন্য বাণীর দেউলে সে এ মণি-দীপ জ্বালে নাই, ইহা তাহার পূজার শঙ্খ। কবিতার প্রাণ ইহার মন্ত্র-স্বরূপ। এই মন্ত্র-সহকারে শঙ্খ-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক ভরিয়া তাহার আত্মা অনন্ত সুন্দরের বক্ষে অনন্ত কবিতা-কালিন্দী বহাইয়া সেই 'তাঁহার' দিকে ছুটিবে। সে প্রতীক্ষায় আছে,

যবনিকা সম যাবে কি খুলিয়া
ধরার অবগুণ্ঠন,—
তোমার আমার মাঝে
রহিবে না কোনও বাধা-বন্ধন।
তোমায় হেরিয়া নয়ন-সমুখে
চরণে নুয়ে পড়িব!

কেমন করিয়া এ যবনিকা ঠেলিয়া ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে হয়, কেমন করিয়া জরার সংসার ফেলিয়া অজর অমর লোকে পথ খুঁজিতে হয়, এ গৈরিক কবি তাহারই চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চাহে। এ রঙ্গালয়ের মঞ্চে রূপের অবতার লইয়া বিলাস-কুসুমের পঞ্চহার পরাইয়া চুম্বনের তিলক ভালে রাখিয়া, কবি সংসার-সুষমায় আদর্শ ভালবাসায় সংসার সজ্জা দেখাইতে ত্রুটি করিতে চাহে না, দেখাইতে চায় রূপের জগতে রস-সঞ্চার কেমন করিয়া বিধাতার নির্দ্দেশ মত অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিণতি লাভ করে,

দেখাইতে চায় রূপ-রস-সম্মিলনে ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী আকর্ষণ রহিয়াছে। সেই সঙ্গত সুশীল প্রেমে ধরণীর উৎপাদনী শক্তি নিহিত। কামের বিলোল কটাক্ষ, রূপের এনায়িত ফোয়ারা, সিরাজীর তপ্ত আভার ন্যায় রূপ-মদ-বহ্নি আলোয় পশ্চাতে যেরূপ আধার বিস্তার লাভ করে, সেরূপ গঙ্গাজলের মত মানুষের প্রেমের পার্শ্বে এইসব নারকীয় প্রেতের কীর্ত্তন অনবরত অষ্টপ্রহর গৃধ্নিনীর রবে সংসার ভরিয়া মানুষেকে পশুত্বের পথে টানিয়া লয়—ম্যাক্‌বেথের মত lead from darkness to darkness,—বাইরনের কথায় বলিতে হয় never anchored they shall be এই ভেলা ভিড়াইতে না পারিয়া মানুষ অকূল সমুদ্রে দিক্ বিদিক্ হারাইয়া সেই জীবনের গান হারাইয়া ফেলে! গৈরিক কবি তাহার কাব্য বিপণিতে এই সব মণি জহরতের আমদানী করিয়া কষ্টি-পাথরে ঘসিয়া দেখাইতে চায় ইহাদের মধ্যে নকল কতখানি, কোন্‌টী মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, কোন্‌টী মানুষকে মারিয়া ফেলে। তারপর মানুষের কানে এই কথাটী বাজাইতে চাহে

একে একে নিভিয়া বিলাস-দীপালী
গীত মুখরিত ধরণী হইবে কালো!

একদিন এ আলের বন্যা চক্ষু হইতে ঝরিয়া যাইবে। একদিন গীতি-গুঞ্জন শ্রুতিমূল হইতে বিদায় লইবে,—কিন্তু তখন? গৈরিক কবি এইরূপে মানুষকে টানিয়া লইয়া তাহার চন্দনাবতীতে দাঁড় করাইয়া বলিবে, মাটীর কাঠামোর সহিত মাটীর চোখ ও কাণ মরিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? এইবার আত্মার অমর লোক জুটিবে,—তাহার মধ্যে অবিশ্রাম যে মহা-গীতি এতদিন চাপা ভাবে বাজিয়াছিল, উহা এখণে পূর্ণ কণ্ঠে গাহিয়া সেই music of the spheres এর ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে থাকিবে। আত্মার নয়নে সমুদ্ভাসিত হইবে সেই মহা-চন্দ্রালোক! কবি নিজে জানে যে তাহার কাব্যের বিরতি নাই, ইহার উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ছন্দে সে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবে, সে যুগযুগান্তের কবি, অক্ষয় অনন্ত তাহার কাব্যের ভাণ্ডার। তাহার কল্পান্ত-স্থায়ী সাধনার মধ্যে সে এক মহা-সত্য প্রচার করিয়া যাইবে; মানুষের দেউলে, ধূপের সৌরভে শঙ্খঘণ্টার মঙ্গল অভিভাষণে ও ঋত্বিকের মন্ত্রোচ্চারণে সর্ব্ব-প্রকার সংযমের মধ্যে দেবতার অভ্যুদয় হয়—দেবারাধনা হয়, আর মানুষের সূতিকা-ঘরে অসংযমের মূল মন্ত্র কামের ফলে মানব-শিশুর অভিনন্দন হইয়া থাকে—শিশু আইসে মানুষের কামের আহ্বানকে স্বর্গ-দীপ্তিতে মণ্ডিত করিতে। এ কেন? একটা ইন্দ্রিয়-সেবা-সর্ব্বস্ব জঘন্য নর-পশুর যে ভাবে সৃষ্টি, সেই ভাবেই জগতের বুদ্ধ জগতের বিবেকানন্দ জগতের সক্রেটিশের জন্ম! এ কেন? তাঁহাদের জন্য এ কালের আরতি কেন? তাহারা কি ব্রহ্মার মানস পুত্রের ন্যায় এ ধরণীর গন্ধ নির্ম্মাল্যের কোলে জন্মাইতে পারিলেন না! এইখানেই ত জীবনের গভীর তত্ত্ব! গৈরিক কবি বুঝাইতে চাহেন ইহারা এমন লোকে চলিয়া গিয়াছেন, যেখানে দেবারতির সঙ্গে জন্ম লাভ করিয়াছেন, যেখানে শঙ্খ ফুকারিয়া হোমনিল জ্বালিয়া দেবতার মত তাঁহাদের অভিনন্দন হইয়াছে। কবি এই সত্য মানুষের কাছে রাখিয়া বলিতে ইচ্ছা করেন, 'আইস ভাই আমরা দেবতা হইব!'

ইহাকেই বলে, গৈরিকের সাহিত্য সাধনা, গৈরিকের জ্যোতি কেমন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবির চিন্তা-স্তরে বিদ্যুদ্বরণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেখিয়াছি, এই শেষ অধ্যায়ে যে বাস্তব গৈরিক কবির সাহিত্য-সাধনার আভাস মিলিল, তাহা স্বাভাবিক মাত্রার বাহিরে গিয়াছে, কতকটা যেন more's utopia.—কিন্তু হইলে কি হয়, ভাবনার রাজ্যে ইহা একটা নূতন সম্পদ, সন্দেহ নাই, আর ভবভূতির

কালোহ্যয়ংনিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী—

এ বিপুল ধরণীর কোলে একদিন এ চিত্র কি উদ্‌ভাসিত হইবে না!

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বর্ষার মশা

বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে,
খালি শোনো শন্ শন্—
ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো ছায় বা থামিয়ে
ভ্রমরের গুঞ্জন!
বাণীর অরুণ চরণ ঘিরে যে
রক্ত-কমল শোভে,
রঙে ভুলে তার দলে দলে মশা
ছুটেছে রক্ত-লোভে!
আদাড়ের মশা পাঁদাড়ের মশা
জুটেছে মানস-সরে,
রক্ত-পদ্মে রক্ত না পেয়ে
ছেঁকে ধরে মধুকরে!
চপল পাখায় বাণীর চরণ
করিয়া প্রদক্ষিণ
ভারতীরে ভণে ভ্রমর "হায় মা!
একি হেরি দুর্দ্দিন!
কোথা হ'তে এল ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো
উড়ে উড়ে সারে সারে,
জুড়ে বসে হের রক্ত-পায়ীরা
মধুপের অধিকারে!
বিশ্রাম নাই 'পঙ্' 'পিঙ্' 'পাঁই'
রব করে ফিরে ঘুরে,
"মোরাও ভোম্‌রা" ভণিতা করিয়া
ভণে যেন নাকীসুরে!
বিকট জরার শাকটিক ওরা
রোগের বাহন জানি,
সহসা ওদের হেরে বাণী-গেহে
মনে আতঙ্ক মানি।
মানসের জল হ'ল কি গরল?
হৃদয় কাঁপিছে ত্রাসে!
বাণীর চরণ ঘিরিল কি এরা
পেট পোরাবার আশে!"
হেসে বাণী কন্ "কেন্ উন্মন
কমল-লোভন, ওরে!
ঘোলাটে রাতের অপচার ওরা,
প্রভাতেই যাবে স'রে।
রবির আলোয় ঘোর আপত্তি
সত্যি ওদের আছে,
কোনো ভয় নাই, পেচকের হাই
ভোরাই আলোর আঁচে—
হবে অদৃশ্য; তাড়াতে হবে না
কিটিঙের গুঁড়া দিয়া,
হবে না তা ছাড়া, মশার কামড়ে
ভোম্‌রার ম্যালেরিয়া।"

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

চয়ন

সাধারণ ও অসাধারণ

পৃথিবীর বা পৃথিবীর যে-কোন দেশের কথা মনে হলে প্রথমেই মনে পড়ে তার সাধারণ মানুষের (Average Man) কথা। তারাই প্রকৃতপক্ষে মহামানব। এই মহামানবের মধ্যে যে প্রাণ আছে সে প্রাণ মহান। ধর্ম্মের মধ্যে, কর্ম্মের মধ্যে, সুখে-দুঃখে—দৈন্যের মধ্যে, পৃথিবীর সমস্ত-কিছুরই মধ্যে এই মহা প্রাণের যে পরিচয় তা গৌরবের পরিচয় এবং তা বিশ্বব্যাপ্ত। এত-বড় গৌরবের অধিকারী এই সাধারণ মানুষরাই। কিন্তু তাদের এই গৌরবের সৌভাগ্য একেবারেই মিথ্যা হয়ে যায়, যখন তারা এই বলে দুঃখ করে বেড়ায় যে, কৈ আমাদের মধ্যে যে geniusই নাই তা আমাদের ভাগ্য ফিরবে কি, আমরা সবাই যে একেবারে নিতান্তই সাধারণ। অথচ পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত বড় বড় অসাধারণ কাজ হয়েছে সে সমস্তই এই সাধারণ মানুষদের দিয়েই হয়েছে এবং চিরকাল ধরেই তাই হবে। প্রতিক্ষণের ইতিহাস প্রতিপদে এই কথাটিকে সপ্রমাণ করছে। তবু মানুষের এই সাধারণত্বের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার অন্ত নাই, তাই দুঃখ-দৈন্যেরও অন্ত নাই।

যারা অসাধারণ এবং যাদের ঘরে অর্থের প্রাচুর্য্যের অভাব, তারাই প্রকৃতপক্ষে বেশী ধন্য, কারণ তারাই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও প্রাণের স্বাদ পায়। সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্তই সৎ এবং সত্য; তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ যত বেশী কোন বিশেষ দলের (অসাধারণ) শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ তত বেশী নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে হয়তো আদর্শ "ভালমানুষ" নাই, কিন্তু তবু তারাই সব-চাইতে ভাল মানুষ;—কারণ তারা ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীও নয় বা কঠোর বিষমুখো Puritanও নয়। এই-সব কথার উপর যাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা নাই, তাদের সাধারণ তন্ত্রের উপরেও আস্থা খুবই কম। সাধারণের প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের এই আস্থা এবং বিশ্বাসের অভাবে পৃথিবীতে কত বড় বড় অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে—যুগে যুগে প্রজা বিদ্রোহ করেছে, রাজা অত্যাচার করেছে এবং এখনও করছে। এরই জন্য মানুষ স্বার্থপর হয়েছে, নীচ হয়েছে এবং এম্‌নি করে অপরাধটা নিজেকে ছাড়িয়ে নিজের ঘরকে ছাড়িয়ে, বাইরে ছড়িয়ে প'ড়ে কত বড় বড় জাতীয়তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। তাই এখনও কোন দেশের সাধারণ-তন্ত্রের জড়তা ও শিথিলতা ভাল করে দূর হয় নি।

কাগজপত্রে এবং লোকের মুখে নিজের নামের বিজ্ঞাপন দিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সমাধান করা যায় না। জীবনের উদ্দেশ্য সুখ-শান্তি দিয়ে জীবনকে ধন্য এবং স্নিগ্ধ করা। এই সুখ-শান্তি তারাই বেশী করে

পায় যারা দোষে-গুণে গড়া। তাদের সমস্ত রিপু ও প্রবৃত্তির উশৃঙ্খলতার ঘাতপ্রতিঘাতে যে সুখ-শান্তি সৃষ্ট হয়েছে তাই সংসারের আদর্শ সুখ ও শান্তি। বড় বড় লোকের (Famous men and Supermen) কাল্পনিক কথা ও অসম্ভব আদর্শকে এরা কোনদিনই প্রাণ ভরে গ্রহণ করেনি। এরা সংসারের বিষকে পান ক'রে নীলকণ্ঠের মত দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে—এরাই সব চাইতে বড় দেবতা, চিরদিনের এবং চির কালের।

পৃথিবীর এত-বড় এই ঘর-সংসার থেকে যারা কোন বিশেষ প্রতিভার জন্য নিজে পৃথক হয়ে গেছে, তাদের নিয়ে জনসাধারণ কোন দিনই সংসার পেতে সুখী হয়নি। স্বর্ণমৃগ স্বর্ণও নয়, মৃগও নয়, তাই তাকে যে চেয়েছিল তার দুর্ভাগ্যের আর সীমা ছিল না। কিন্তু প্রকৃত সুখকে যারা সর্ব্বাঙ্গীন ক'রে পেতে চায় তারা হয় মাটী খুঁড়ে শুধু সোনা আনে নয়তো বনে গিয়ে শুধু হরিণ নিয়ে আসে। দুটোকে একটার মধ্যে কোন দিনই তারা পেতে চায়নি, কারণ তারা জানে, যে দুটোকে একটার মধ্যেই পাওয়ার নামই হচ্ছে স্বর্ণমৃগ—একটা বিরাট অসম্ভবতা। এই জন্যই এরা অসাধারণ মানুষদের স্বর্ণমৃগ বলেই জেনে আসছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা সব্বাই রাম সীতা নয়, নৈলে ভারতবর্ষের চিরদিনকার গৌরবের খ্যাতিটা লঙ্কাদ্বীপের অখ্যাতিতে ভরে থাকতো। অসাধারণ মানুষদের খ্যাতির অভাব নাই, কিন্তু তাদের একটা কোন বিশেষ গুণের গুরুত্ব অন্য সমস্ত গুণের সামঞ্জস্যকে ক্ষুণ্ণ করে—তারা সাধারণের সংসারে পতি ও পিতার কিম্বা সতী ও মাতার আদর্শকে কুৎসিত করে। রামায়ণের রামের ও মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যত বড় দুর্ব্বলতা ছিল তত বড় দুর্ব্বলতা কোন সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই বিরল। নৈলে তাদের সংসার করা অসম্ভব হ'ত। সাধারণ-তন্ত্রের লোকরা সাম্‌না-সাম্‌নী দাঁড়িয়ে divorce চায় এবং স্পষ্ট সত্য কিম্বা স্পষ্ট মিথ্যা বলতে ডরায় না। পুরাকালে জনসমাজের শক্তি ও প্রাণ এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না—চোখের সামনে যাদের দেখতে পেত তাদের ছাড়া তারা অ-দৃষ্ট বাইরের লোকদের সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ রাখতো না, তাই তখন যারা বড় ছিল এখন তারা আর তত বড় হতে পারে না, কারণ, এখনকার সাধারণের শক্তি, চিন্তা ও দৃষ্টি ক্রমে বেড়ে চলেছে। জাতি-ভেদের সময় তখন যে ভাগটী অন্য তিন ভাগের উপরে আধিপত্য করেছে সেই জাতিভেদ যদি এখন আবার পাল্টে করা হয়, তবে অতীতের তিন ভাগ থেকে শুধু নয়, এখনকার ৩৬ ভাগের প্রত্যেক ভাগে এমন লোকের অভাব হবে না যাদের আসন সেই এক ভাগের মাথার উপরে।

এখনকার জনসমাজের শক্তি বিস্তৃত হয়ে গেছে, তাই একের মহাপ্রভুত্ব ক্রমেই অসম্ভব হয়ে আসছে।

শিল্পকলার ও সাহিত্যের জন্য প্রতিভার দরকার হয়। কিন্তু একযুগে দুই-একটির বেশী বড় শিল্পী ও সাহিত্যিক জন্মায় না। তবু সাধারণের মধ্যে সাধারণ শিল্পী ও

সাহিত্যিক এত বেশী দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের কাজের পরিমাণ, শিল্প ও সাহিত্যের জ্ঞান তাদের দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত আশা ও ভরসা এই সাধারণের হাতে, তারা যা গড়েছে—তাই সত্য এবং তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

চারুচন্দ্র রায়

মানুষের বহু রূপ

কোনো একটা দুর্ঘটনা বা নিদারুণ মানসিক কষ্ট যখন অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তখন আমরা তা ভুলতে চেষ্টা করি। এই ভোলবার চেষ্টাই মনকে দুঃখজনক চিন্তাভার হতে মুক্ত করবার স্বাভাবিক উপায়। কখনো কখনো অত্যন্ত ক্লেশকর কোনো কোনো চিন্তা আমাদের চেতনা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দু চারটি ক্ষেত্রে এমনি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয় যে, আমরা যে কেবল সেই বিশেষ স্মৃতিটিই হারিয়ে ফেলি তা নয়, তার পূর্ব্বের যাবতীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতিও আমাদের মানসপট থেকে একেবারে মুছে যায়।

বিগত যুদ্ধে, মনের ওপর শক্ত ঘা খেয়ে অনেক লোকের মধ্যে দুইটি ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছিল। দারুণ ভয়ে সবল মানুষও শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়তে পারে। সে আর বয়স্ক লোকের মত কথা কইতে পারে না, পানাহারের ন্যায় সহজ কাজ করতেও তার কষ্ট হয়। সুস্থ হয়ে ঐ রোগীই আনকোরা নতুন অভ্যাস এবং নানা বিশিষ্ট গুণের পরিচয় দিতে পারে; তারপর মনে আর একটি ঘা খেয়ে হয়তো পুনরায় সহসা পূর্ব্বের ন্যায় শিশুভাবাপন্ন হয়ে পড়বে। তখন বিগত ব্যক্তিত্বের সকল অভিজ্ঞতার স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে যাবে।

মনের ওপর ছোটবড় আঘাত আমাদের সবাইকেই মাঝে মাঝে সইতে হয়। দুঃখক্লেশ সম্বন্ধে যে-পর্য্যন্ত আমাদের বিচার-বুদ্ধি অটুট থাকে সে-পর্য্যন্ত আমরা সহ্য করেও থাকি। কিন্তু এমন সময়ও আসে যখন খুব বলিষ্ঠ প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষেও দুঃখ বা অনুশোচনা-বোধ অসহনীয় হয়ে ওঠে। পরিণামে ঘটে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে যাকে বলে neurasthenia, nervous breakdown বা স্নায়বিক বিকার এবং হিষ্টিরিয়া। Pearson's Weeklyতে একজন লেখক এমনিধারা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি লাজুক ধরণের স্বাস্থ্যবতী বুদ্ধিমতী যুবতীর আঠারো বৎসর বয়সে একবার মূর্চ্ছা হয়। এই মূর্চ্ছা দীর্ঘকাল ছিল। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর কয়েক সপ্তাহ তাঁর শ্রবণ ও দর্শনশক্তি লোপ পায়। তারপর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়বার তাঁর মূর্চ্ছা কয়েক ঘণ্টা থাকে। এবার তাঁর চোখকাণ ঠিক ছিল। কোনো গোল হয়নি। তবে তিনি তাঁর গত জীবনের সকল কথা ভুলে গিয়েছিলেন; বাক্‌শক্তিও প্রায় লোপ পেয়েছিল—শিশুর ন্যায় কয়েকটা আধ-আধ কথা বলতে পারতেন মাত্র—যদিও তার অর্থ বুঝতেন না। তাঁর শিক্ষা আবার নতুন করে' আরম্ভ করতে হয়েছিল।

তিনি যখন লিখতে শিখলেন তখন তাঁর হাতের লেখা অদ্ভুত রকমের হল—শৈশবে যখন প্রথম লিখতে শিখেছিলেন তখন যেমন মোটেই তেমন নয়। তিনি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলেন—যেন আলাদা মানুষ। দ্বিতীয় বার শিক্ষার পর তিনি আর লাজুক ছিলেন না, বেজায় আমুদে আর বাচাল হয়ে উঠেছিলেন।

এই অবস্থা ছিল মাস দুই। তারপর আর এক দীর্ঘ নিদ্রার পর তিনি জেগে উঠলেন—প্রথমে তিনি যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি, অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো। এই অবস্থায় ফিরে তাঁর দ্বিতীয় অবস্থার কথা তিনি একেবারে ভুলে গেলেন।

বহুদিন পরে পুনরায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব লাভ করেন। সেই অবস্থায় তিনি ছিলেন পঁচিশ বৎসর।

এমনো শোনা গেছে বেশ চালাক চতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ। অনেক দিন কোনো খোঁজখবর নেই। এধারে সে অন্যত্র গিয়ে ভিন্ন নামে যা-তা একটি কাজে লেগে গেছে। পূর্ব্ব জীবনের কথা আর তার কিছুই মনে নেই। তারপর বহুদিন পরে সহসা হয়তো পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে এসেছে, তখন সে নিজেই অবাক হয় ভাবে কোথা দিয়ে কেমন করে' কি হল!

বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও নারীর কখনো কখনো শিশু ভাবাপন্ন হওয়ার কথা অনেক শোনা যায়। খুব বুড়ো মানুষ শিশুর মত কথাবার্ত্তা কইছে বা ব্যবহার করছে এমন ব্যাপার অনেকেই দেখে থাকবেন—বাংলায় যাকে বলে 'ভীমরতি ধরা'।

এমনি সব লুপ্তস্মৃতি লোকেদের মনে হিপনটিসম্ সাহায্যে তাদের পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি জাগানো সম্ভব। মনের অ-চেতন কুঠরিতে আমাদের সকল স্মৃতি সমাহিত। হিপ্‌টিসমের সাহায্যে ইঙ্গিতের দ্বারা সেই সব স্মৃতি জাগিয়ে তোলা যায়। কারণ, সম্পূর্ণ চেতন অবস্থায়, প্রাণপণ চেষ্টাতেও মানুষ পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণে প্রায়ই অসমর্থ হয়।

আমরা সকলেই জানি সাধারণ নরনারীর মধ্যেও দুইটি 'মানুষ' থাকে। একটি সামাজিক 'মানুষ', যেটি সবাই দেখতে পায়। অপরটির বাস আমাদের অন্তরে, সেটিকে অনেক সময় আমরা নিজেরাই চিনতে পারি না। সেটির প্রকাশ প্রচণ্ড ক্রোধের সময় এবং স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মনকে তা আচ্ছন্ন করে' রাখে।

মদের নেশায় এবং ক্লোরোফর্ম্, ইথার বা আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় অতি বিজ্ঞ নারী ও পুরুষেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। তার কারণ, সে সময় অ-চেতন মন চেতন মনের সাহায্য ব্যতিরেকেও কাজ করতে পারে।

মানুষের মনের আশ্চর্য্য রহস্য। বলা শক্ত ঠিক কোথায় স্বাভাবিকের সমাপ্তি এবং অ-স্বাভাবিকের প্রারম্ভ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের মুল্লুকে 'মনিষ্যির গন্ধ'!

বিশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধির জোরে হাউই যে এবার সুধু তারার মুখে নয়,—চাঁদের চাঁদমুখেও ছাই ঢালিয়া দিয়া আসিবে, সে খবর আপনারা বোধ হয় এর-মধ্যেই শুনিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি তার চেয়েও আরো-টাট্‌কা একটি খবরে জানা গিয়াছে। প্রথম পরীক্ষা শেষ হইলেই,—অর্থাৎ প্রথম হাউইটি চাঁদের মুখে গিয়া ঠোক্কর মারিতে পারিলেই, দ্বিতীয় একটি হাউইয়ের ভিতরে পুরিয়া, চন্দ্রলোকে মানুষ-যাত্রী পাঠানো হইবে!

অবশ্য এই হাউইটি এমন মস্তবড় হইবে যে, তাহাকে অনায়াসেই ছোটখাট একখানি বাড়ী বলা যাইবে! আর এই অগ্নিরথে চাপিয়া যে যাত্রীটি চির-রহস্যের ঐ অজানা মুল্লুকে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, চন্দ্রলোকে যাওয়ার চেয়েও তাঁহার বুদ্ধি-ভরসা যে ঢের বেশী আশ্চর্য্য, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই!

এই সাহসী বীর আমেরিকার বাসিন্দা, নিউ ইয়র্কের উড়ো ফৌযে তিনি কাপ্তেনী করেন! তাঁহার নাম কাপ্তেন ক্লড আর, কলিন্স। সুধু তিনি নন, তাঁহার সঙ্গে আরো দুজন লোক সঙ্গী হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন পুরুষ, নাম কাপ্তেন চার্লস এন, ফিজজেরাল্ড; আর-একজন কুমারী মহিলা, নাম মিস্ রুথ ফিলিপ্‌স্। বলিহারি এঁদের বুকের পাটা! যে-জাতির মধ্যে এমন স্ত্রী-পুরুষ জন্মান, সে জাতির সঙ্গে আমাদের এই কুণো বাঙালী জাতটার তুলনা করিলে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায়!

কাপ্তেন কলিন্স বলিতেছেন, "আমার এই সংকল্পের কথা শুনে সকলে আমাকে নানারকম ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করছেন। রোজ আমার কাছে রাশি রাশি চিঠি আস্‌ছে! অনেকে ভাব্‌ছেন, আমি বোধ হয় সংসারে বিরাগী হয়ে পড়েছি, আর বেঁচে থাক্‌তে চাই না! তাই যুবতীরা, সন্তানের জননীরা আর প্রাচীনেরা বল্‌ছেন, এমন ক'রে আমি যেন আত্মহত্যা না করি! কিন্তু এঁদের ভাবনা মিছে! কেননা, অকারণে আমি আত্মহত্যা করতেও রাজি নই এবং এই দুনিয়ায় এখনো আমি বেঁচে থেকে সুখের ষোলআনাই ভোগ ক'রে নিতে চাই!

চাঁদ বা মার্স্, (মঙ্গল-গ্রহ)—যেখানেই আমি গিয়ে পড়ি না কেন, যাবার পথে আমার সময় লাগ্‌বে অনেকক্ষণ। এর-মধ্যে আমার আহার ও নিদ্রার আবশ্যক এবং নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্যে অম্লজানেরও দরকার। তা ছাড়া আরো-এক ভাবনা আছে। হাউইটা যখন লক্ষ্যস্থলে গিয়ে মহাবেগে আছড়ে পড়্‌বে, তখন সেই বিষম ধাক্কাটা সাম্‌লাতে না পার্‌লে আমার হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা আমাকে একবাক্যে আশ্বাস দিয়েছেন, হাউইএর ভিতরে এমন কল-কাটি থাক্‌বে যাতে ক'রে অনায়াসেই হাউইএর গতির বেগ কমিয়ে ফেলা যাবে। পৃথিবী থেকে ২৩৩৮১২ মাইল দূরে চন্দ্রলোকে যেতে গেলে হাউএর জন্য অন্তত দশমণ সাঁইত্রিশ সের বিস্ফোরক প্রয়োজন। আমার মতে, কিছুই অসম্ভব নয়।"

ঢাউস দূরবীণ

ইংরেজদের কলম্বিয়ায় একটি নূতন মান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেখানকার সদ্য-তৈরি দূরবীনটির মত বড় দূরবীণ দুনিয়ার আর-কোন মুল্লুকেই নাই। আমেরিকার সিকাগো সহরের দূরবীণটি (আড়াআড়ি কাঁচের মাপ চল্লিশ ইঞ্চি) এতদিন সব-চেয়ে বড় বলিয়া নামজাদা ছিল। কিন্তু এই নূতন দূরবীনের অয়ানাথানির আড়াআড়ি মাপ বাহাত্তর ইঞ্চি। এর চোঙা লম্বায় চল্লিশ ফুট। চওড়াতেও এটি এত-বড় যে, একখানা মোটর গাড়ী তাহার ফাঁদলের ভিতর দিয়া অনায়াসেই চলিয়া যাইবে! খালি এর কাঁচখানার ওজনই ছাপ্পান্ন সের। গোড়ার দিকে কাঁচখানা বারো ইঞ্চি পুরু। সুধু-চোখে আমরা তারা দেখি মোটে পাঁচ হাজার। কিন্তু এই দূরবীণের সাহায্যে প্রায় ত্রিশকোটি তারা দেখা যাইবে এবং চাঁদকেও মনে হইবে পৃথিবী হইতে মাত্র কুড়ি মাইল তফাতে। যদিও সমস্ত দূরবীণটার ওজন এক হাজার পাঁচশো চল্লিশ মণ, তবু একজন বালকের হাতেও এই অতিকায় যন্ত্রটি খেলার পুতুলের মত যেদিকে-খুসি ঘুরাইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না!

মনের ব্যামোর ছবি

ডাক্তার ওয়ালার বিলাতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত লোক। সম্প্রতি তিনি একটি অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা অনায়াসেই মানসিক উত্তেজনার আলোক-চিত্র তোলা যায়! সেই আলোক-চিত্র আবার বায়স্কোপের পর্দ্দার উপরে ফেলিলে, মানুষের মনের গোপন কথা সকলের চোখের সাম্‌নেই স্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিবে! আপনার মন যদি সুখে খুসি ও দুঃখে ম্লান হয়, তবে ডাক্তার ওয়ালারের যন্ত্রে তাহারও অবিকল ছবি উঠিবে। একালের সমুন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান এখনো প্রধানত মানুষের দেহ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া আছে—মনের ধার সে ধারে না বলিলেই চলে। তাই মনের অসুখে ডাক্তার-বৈদ্য ডাকা আর না-ডাকা দুইই সমান। কিন্তু এবার এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে মনের অসুখকেও কায়দায় আনা যাইবে।

হড়্‌কা কলের গাড়ী

দুখানা জলে-ভেজা কাঁচকে যদি গায়ে-গায়ে ঠেকাইয়া উপর-উপরি রাখা হয়, তবে সামান্য একটু ঠেলা মারিলেই উপরের কাঁচখানা হড়্‌কাইয়া চলিয়া যাইবে। আসলে মাঝখানে জলের ব্যবধান থাকার জন্য, কাঁচ-দুখানা কেউ কারুকে স্পর্শমাত্র করে না। একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ঠিক এই পদ্ধতিতেই ভবিষ্যতের রেলগাড়ী চালাইবার চেষ্টা করিবেন। সে রেলগাড়ীর চাকাও থাকিবে না, তাহার লাইনও হইবে সমতল। গাড়ীর গায়ে লাগানো একটি দমকল হইতে লাইনের উপরে জলের ধারা পড়িবে, আর সেই জলধারায় ট্রেণখানি হড়্‌কাইয়া চলিয়া যাইবে এবং তারপরেই ঐ দমকলটিই লাইনের জল আবার শুষিয়া ভিতরে টানিয়া লইবে। জলপড়া বন্ধ করিলেই গাড়ী সেই মুহূর্ত্তেই দাঁড়াইয়া পড়িবে—সুতরাং 'ব্রেকে'রও দরকার হইবে না। বিনা-চাকায় ভবিষ্যতের এই বিচিত্র কলের গাড়ী, ঘণ্টায় খুব কম করিয়াও একশো মাইল বেগে হড়্‌কাইয়া ছুটিয়া যাইবে।

নাচে বেয়াড়া ঢং

বিলাতী রঙ্গালয়ের দেখাদেখি আজকাল এদেশেও রঙ্গালয়ে "পালোয়ানী নাচে"র সূত্রপাত হইয়াছে। সে-সব নাচে নীচুদরের কায়দা থাকিতে পারে, কিন্তু কমনীয় কলা-সুষমা যে একেবারেই নাই, বোধহয় তাহা বলা বাহুল্য।

এমনধারা "পালোয়ানী নাচ"কে বিলাতের রসিক-সমাজও দস্তুরমত ঘৃণা করেন। এ-শ্রেণীর নাচ সেই সমাজেই আদর পাইয়াছে, যে-সমাজে চার্লি চ্যাপ্‌লিনের চিত্রাভিনয় দেখিয়া লোকে খুসি হইয়া হাততালি দেয়। একজন সমালোচকের কথাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে :—

"এদেশে 'র‍্যাগ্‌টাইম' নাচ ও গানের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রতি ক্রমেই লোকের বিরাগ বাড়িয়া উঠিতেছে।

'র‍্যাগটাইম' নাচের বিরুদ্ধে আমরা সর্ব্বদাই আপত্তিপ্রকাশ করিয়াছি। বিশেষত এ-রকম নাচে, স্ত্রীলোকের দেখা পাওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। সুসভ্য ইংরেজদের মুল্লুকে মানুষ যে কেন অসভ্য বুনোদের মত, কিংবা বাঁদর, ভাল্লুক ও মোরগের মত নাচের ঢঙে লাফালাফি করিয়া আমোদ পায়, আমি তো কিছুতেই তা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বিশেষ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাও যে এমন হিল্‌বিলে সাপের বা মাকড়সার মত ভঙ্গিপ্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন না, এটা বড়ই আশ্চর্য্য!

অতএব 'র‍্যাগটাইম'কে এখন কবর দেওয়া হোক্।

আর-একটা কথা ভাবিয়াও আমরা অবাক হই। যাঁহারা নিজেদের দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাই বা কোন্ আক্কেলে এই-সব বিদেশী কুরীতিগুলোকে স্বদেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছেন? ইহাতে কি আমাদের নাচের জাতীয়তা নষ্ট হইয়া যাইতেছে না?"

বাঙ্‌লা রঙ্গালয়ের কর্ত্তাগণকেও আমরা ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই। একে তো তাঁহাদের কবলে পড়িয়া আমাদের শান্ত-সুন্দর দেশীয় নৃত্যের দুর্দ্দশা যতদূর শোচনীয় হইবার তা হইয়াছে, তার সঙ্গে আবার এই বেয়াড়া বিলাতী ঢং জুড়িয়া লোকের রুচির বিগ্‌ড়াইয়া দেওয়ার কি সার্থকতা আছে?

খালি "র‍্যাগ্‌টাইম" বলিয়া নয়, বিলাতে আজকাল আরো কতরকমে নাচকে যে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা হইতেছে, তা আর বলা যায় না। "ভারতীয় নৃত্যে"র নামেও তাঁহারা কাল্পনিককে তাহা বাস্তবিক বলিয়া চালাইয়া দিতেছেন।

ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে এখনো খাঁটি হিন্দু নৃত্য-কলা বাঁচিয়া আছে। আজও সেখানে উৎসবের সময়ে দলে দলে রমণী নৃত্য-লীলার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদেরই পোষাক ও নাচ বিকৃত হইয়া বিলাতে গিয়া এমন বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিলেই লজ্জায় চক্ষু মুদিয়া ফেলিতে হয়!

রুসদেশের যে নৃত্যের আদর্শ পৃথিবীকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহারও একদিকে সৌন্দর্য্য

মাকড়সার মত নাচ

থাকিলেও, অন্যদিকে তথাকথিত জিম্‌নাষ্টিকের কস্‌রতের বাহুল্য দেখা যায়। ভূতপূর্ব্ব রুশসম্রাটের সভা-নর্ত্তকী শেসিন্‌স্কা নাচের মধ্যেও জ্যামিতিকে প্রকাশ করিয়াছেন! দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের উপরে ভর দিয়া

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

গেবি ডেলির নাচের জিমনাষ্টিক !

পালোয়ানী নাচের নমুনা

ভারতীয় নাচের বিকৃত নকল

গেবি ডেলির আর-এক কসরৎ!

প্রাচীন গ্রীসের নাচ

নাচিতে নাচিতে তিনি তাঁহার দেহকে পিছনদিকে এতটা হেলাইয়া ফেলিতেন যে, তাঁহার দেহকে প্রায় অবিকল একটি 'সমকোণ' বা right angleএর মতন দেখাইত! কিন্তু এ দৃশ্যটা আশ্চর্য্য হইলেও ইহাকে নাচ বলা যায় না.

কাব্যে ও শিল্পে সেকালের স্বপ্ন-সুষমা, একালের নানান রকমের উদ্ভট মৌলিকতার দৌরাত্ম্যে ক্রমেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। আজকাল নৃত্যকলার মধ্যেও সেই মারাত্মক ব্যাধি ঢুকিয়াছে,—নূতনত্বের খাতিরে এখানেও নিছক গদ্যকে পদ্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই-সব নাচের পাশে প্রাচীন গ্রীসের নাচকে আনিয়া রাখিলে সকলেই কি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন না?

নানাদেশী মতি-গতি

অতি-বড় রূপসীর ঠোঁট

দুনিয়ার সব মানুষই মূলে এক, কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহার কী বিভিন্ন! এদেশে যাহা বড়ই ঠিক, ওদেশে তা বেজায় বেঠিক! ঝাঙলায় একগোত্রে বিবাহ পাপ, কিন্তু এমন দেশও আছে যেখানে সহোদরা হয় সহোদরের সহধর্ম্মিনী! আমরা বলি, নারী হচ্ছে পতির পদসেবার দাসী,—কিন্তু এমন দেশেরও অভাব নাই, যেখানে রমণীরা মাহিনা দিয়া স্বামীর পদে লোক নিযুক্ত করে। আবার কোথাও বা অল্পদিনের জন্য বাজারে বিবাহ-যোগ্যা স্ত্রী কিনিতে পাওয়া যায়; কোথাও সদরে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করে রমণী আর অন্তঃপুরে বাস করে পুরুষ; কোথাও রমণী সন্তান প্রসব করিলে স্বামীকেও স্ত্রীর সঙ্গে রুগ্নের মত শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়; কোথাও শূকর-শিশুকে স্তন্যপান করাইবার জন্য মানুষ-মা গর্ভজাত শিশুকে বধ করে; আবার কোথাও-বা বিবাহের অনেক বৎসর আগে থাকিতেই কন্যাকে একটি অন্ধকার, ছোট খাঁচার ভিতরে পুরিয়া রাখা হয়!

সাজসজ্জারও নিয়ম এক-এক দেশে এক-একরকম। তবে সব দেশেই একটি ব্যাপারে ভারি সাদৃশ্য দেখা যায়। রমণীরা প্রায় সর্ব্বত্রই অলঙ্কার ও রূপের খাতিরে কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়াই মনে করে না। সভ্য-দেশে—যেমন বিলাতী মেয়েরা ব্যথা সহিয়াও কোমর সরু করে, বাঙালী মেয়েরা নাকে কাণে ফুটো করিয়া মাকড়ী ও নোলক পরে, আর চীনা মেয়েরা পাকে ছোট করিয়া তোলে,—অসভ্য দেশেও মেয়েরা তেমনি-সব যাতনাদায়ক উপায়ে আপনাদের রূপ বাড়াইবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। আজ আমরা তার দুটি সচিত্র প্রমাণ দিলাম। অসভ্য "সারা" জাতীয় রমণীরা বিকৃত ওষ্ঠাধরের পক্ষপাতী। তাহারা প্রথমে

বিবাহ যোগ্যার উল্কী

ঠোঁটে একটি ছেঁদা করে। তারপর ক্রমেই সেই ছেঁদাকে কাঠের ফলকের সাহায্যে অসম্ভব-রকম বাড়াইয়া তুলিতে থাকে।

"কোইটা" নামে আর-এক অসভ্য জাত আছে, তাহাদের কুমারী কন্যার গায়ে প্রকাণ্ড উল্কীর ছবি আঁকা যখন শেষ হয়,তখনি বুঝিতে হইবে, সেই চিত্রময়ী যুবতী বিবাহযোগ্যা! মেয়ের পাঁচবৎসর বয়স হইলেই, তাহার দেহে উল্কীর সূচ ফোটানো সুরু হয়, তারপর বৎসরে বৎসরে চিত্রকরের হাতে উল্কীর সেই ছবির আকার বাড়িতে থাকে!

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

অর্থ-বিজ্ঞান

খাজানা (Rent)

ভূমি-ব্যবহারের জন্য ভূম্যধিকারীকে যে কর বা উপস্বত্ব প্রদান করা হয়, তাহাকে খাজানা বলে। এই সংজ্ঞানুসারে বন-কর, ফল-কর, জল-কর, খনি-কর, বাস্তু-কর প্রভৃতি যে কোন স্থায়ী কিম্বা অস্থায়ী কর প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাদের সমস্তই খাজানা-সংজ্ঞক বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভূমিতে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি নিহিত আছে, যথা, বাষ্প, বিদ্যুৎ, প্রবাহ, বেগ প্রভৃতি এবং যে-সব বস্তু ব্যবহার করার জন্য কাহাকেও কোন প্রকার কর দিতে হয়, তাহাও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হইবে। আর ভূম্যধিকারীর নিজের ব্যবহারের ফলে ভূমির যে উপস্বত্বের অভ্যুদয় হয়, তাহা তাহার নিজের আয়-মধ্যে পরিগণিত হইলেও ইহা তাহার অন্যান্য আয় হইতে স্বতন্ত্র। এ সমস্তই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির মূল্য বলিয়া গণ্য হয়। এই খাজানা বা মূল্য ধার্য্য করিবার সাধারণ নিয়ম অবধারণ করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই আলোচনায় স্বভাবতঃ দুইটী অতি জটিল প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথমতঃ ভূমির ব্যবহারের মূল্য স্বরূপে খাজনা দেওয়ার কারণ কি? এবং কি করিয়াই বা তাহার

পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়? দ্বিতীয়তঃ সমাজে ব্যবহার ও রাষ্ট্র বিধানানুসারে এই খাজানা ব্যক্তি-বিশেষের প্রাপ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই কল্পনা যুক্তিযুক্ত কি না, তাহারো কোন একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না, তাহার চেষ্টা হইতে পারে।

ভূমি প্রকৃতির অযাচিত দান। ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার-স্বীকারে তাহার সঙ্কোচ বিধান করা সঙ্গত কি না, সে আলোচনাও একান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। এ দুইটিই বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন, কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজেও বিস্তর মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ-নীতি-অনুসারে সর্ব্বদেশে এই স্বত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং আমরা এই তর্কিত প্রশ্নে প্রবেশ করিব না; কেবল প্রথম প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাই কি না, তাহারই আলোচনা করিব।

ভূমির গুণ বা উৎপাদিকা শক্তি

কোন বস্তুকে একটা সামাজিক মূল্য দিতে হইলে, তাহার ব্যবহারোপযোগিতা (utility) আছে কি না, দেখিতে হইবে। যে বস্তুতে কাহারও কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন নাই, তাহার কোন মূল্য হয় না বা মূল্য করা যায় না। ভূমির খাজানাও একটা সামাজিক ব্যাপার। তাহার মূল্য ধার্য্য হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবহারিক উপযোগিতা কি, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ভূমির উপযোগিতা বলিলে সর্ব্বাগ্রেই তাহার মধ্যগত মৃত্তিকার নিজস্ব কোন গুণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরতা প্রভৃতি গুণের কথা ছাড়িয়া দিই। এই খাজানা ধার্য্যের বেলায় তাহার একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা হওয়া আবশ্যক। উদ্ভিজ্জ সমূহের পোষণ ও বর্দ্ধন জন্য মৃত্তিকায় যে সকল খনিজ পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রন থাকে, তাহারা নাশ প্রবণ ও পরিবর্ত্তনশীল। ভূমির অস্থায়ী কোন গুণকে তাহার নিজস্ব শক্তি বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত কি না, তাহা বিশেষ-ভাবেই চিন্তনীয়। মৃত্তিকার স্থায়ী গুণকেই যদি কেবল তাহার প্রকৃত গুণ বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, তবে উর্ব্বরতা প্রভৃতি অনেক গুণকেই বাদ দিতে হয়। কিন্তু খাজানা ধার্য্যের সময়ে মৃত্তিকায় এই স্বাভাবিক সংমিশ্রন ত একান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে! ফলতঃ ভূমির এই গুণের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই খাজানার বিস্তর ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। বিশেষ ভূমির স্থানগত মৃত্তিকার প্রকৃতি যে সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তনশীল, তাহাও নহে। কোন উচ্চ পর্ব্বতের উত্তরপাদস্থিত ভূমির মৃত্তিকাকে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার দক্ষিণ পাদস্থিত ভূমির অনুরূপ করিয়া তোলা ত সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে ভূমির আব-হাওয়া তাহার অপরিহার্য্য গুণ কিন্তু ইহা মৃত্তিকার কোন গুণ নহে; অথচ তাহার উপর তাহার উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই সকলগুণ ভূমির অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করে। সুতরাং মৃত্তিকার (soil) গুণ বলিয়া যে সকল স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উন্নতি বিধান জন্য তাহার খাজানার ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে, তাহাদের সকলকেই ইহার গুণ বোধক বলিয়া ধরিতে হইবে। কোন কৃত্রিম উপায়ে ভূমির উন্নতি সাধন করিলে,—তাহার

সেই উন্নতি যে নাশ-প্রবণ সন্দেহ নাই,—কিন্তু আর্থিক হিসাবে তাহা কখনো নাশযোগ্য নহে।

এইরূপে ভূমির কৃত্রিম উন্নতিকেও তাহার গুণবোধক বলিয়া কল্পনা করিলে, সেই উন্নতি-কল্পে যে মূলধন স্থায়ীভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার সুদের সহিত খাজানার একটা গোল বাধিতে পারে। বহুকালের সঞ্চিত কত মূলধন যে ভূমিতে নিয়োজিত হইয়া অদ্যাপি সম্যক উঠিয়া আসে নাই, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন; তাহাকে ভূমির অন্যান্য শক্তি হইতে পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ করা আরো কঠিন ব্যাপার। ভূম্যধিকারী-কর্ত্তৃক সেই উন্নতি বিহিত হইলে তিনি তজ্জন্য বর্দ্ধিত হারে যে খাজানা প্রাপ্ত হন, তাহা সেই মূলধনের সুদ, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি এই সুবিধা-সুযোগ ভোগ করিবার জন্য প্রজাকে যে কর দিতে হয়, তাহার সম্যক খাজানা সংজ্ঞক বলিয়া কল্পনা করিলে এই পার্থক্য সম্পাদনের আবশ্যক হয় না। ফলতঃ বাস্তব জীবনে এতটা পার্থক্য সম্পাদন করিয়া খাজানা ধার্য্য করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ভূম্যধিকারীদিগের কৃত কার্য্যে কৃত্রিম ভাবে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়া ভূমির পত্তন হয়, তাহাদের সকলকেই ভূমির গুণবোধক বলিয়া ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ভূমির অবস্থিতি সুবিধা,—

ভূমির অবস্থিতি সুবিধার মধ্যে তাহার স্থানগত বিশিষ্টতা জল বায়ু আলো উত্তাপ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রাকৃতিক সুবিধার উপরে খাজানার হার বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। তথাপি মানুষের কৃত-কার্য্যের ফলস্বরূপ তাহার উৎপন্ন সামগ্রী সমূহ বাজারে পাঠাইবার যে সকল সুবিধা ও সুযোগের অভ্যুদয় হয়, তাহার প্রভাবও অত্যন্ত বেশী। এমন অনেক উর্ব্বর ভূমি ও স্বাস্থ্যকর স্থান বর্ত্তমান আছে যে ইহা বাজার হইতে অপেক্ষা-কৃত নিকটে হইলেও তাহার সহিত রেল, ষ্টীমার অথবা অন্য কোন দ্রুতগামী বা সুবিধা-জনক যান-বাহনের সংযোগ না থাকায়, তথা হইতে দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ করিতে এত ব্যয়-বাহুল্য ঘটে যে, কোন সামগ্রীই তথায় উৎপন্ন করিয়া তাহার ব্যবসায়ে লাভ করা চলে না। সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের সহিত বহুদূর-দেশান্তরস্থিত স্থানের এমন নৈকট্য সাধিত হইয়াছে যে তথাকার ভূমির খাজানা-বৃদ্ধির ইহাও একটি বিশেষ কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত এদেশে যে সকল রেল-পথ হইয়াছে, তাহার দ্বারা বহির্বাণিজ্যের যতটা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, দেশের আভ্যন্তরীণ ভূমির সহিত বাজারের সে পরিমাণ নৈকট্য সাধিত হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহজনক। সুতরাং দেখা যায় যে ভূমির উৎপন্ন সামগ্রী বাজারে প্রেরণের সংযোগ-সুবিধার সহিত এই খাজানা ধার্য্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কলিকাতার বাজারে যখন গোধূমের দর ৬ টাকা, তখন দিল্লী হইতে কোন এক বিঘা ভূমিতে দশ মণ হারে গোধূম উৎপন্ন করিয়া আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিলে যে লভ্য পাওয়া যায়, সেই ব্যয়ে সুন্দরবনের কোন এক নিভৃতস্থানে এক বিঘা ভূমিতে ১৫ মণ হারে গোধূম উৎপন্ন করিয়াই যদি অতিরিক্ত বহুনী খরচা দিয়া কলিকাতায় আনিয়া সেই পরিমাণ লভ্য পাওয়া যায়, তবে খাজানা ধার্য্যের বেলায় উভয়

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমান বলিয়া গণ্য করা, অসঙ্গত হইবে না। অতএব ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বলিলে তাহার এই সকল স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয় গুণই ধরিতে হইবে।

কোথা হইতে খাজানার উদ্ভব হয়?

যাহারা নূতন কোন অনাবাদী-স্থানে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে, তাহাদিগকে ভূমির জন্য কোন করে দিতে হয় না। ঐ সকল ভূমিতে কোন ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা জাতি-বিশেষের স্বত্বাধিকার কল্পিত না থাকায় যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই যদৃচ্ছা আবাদে আনিয়া আপন অভাব মোচন করিতে পারেন। এই ভাবেই আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নূতন দেশ সমূহ য়ুরোপীয় জাতিগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছে। এইরূপ কোন সমাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে উৎকৃষ্ট ভূমিসমূহ আবাদে আনা স্বাভাবিক; আর সর্ব্ব প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এই সকল ভূমি হইতে যতটা শস্য উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে, সেই ব্যয়ের হারে মূল্য দিয়া তাহার খাজানা ধার্য্য হওয়াও স্বাভাবিক। তদপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়া একে অন্যের উৎপন্ন সামগ্রী ক্রয় করিবে না। কিন্তু তখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ভূমি চাষে আনিবার ফলে, এই ভূমির উৎপন্ন ফসলের হারে মূল্য ধার্য্য হইয়া শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে। তখন সমাজকে বর্দ্ধিত হারে মূল্য না দিলে কেহই ইহা আবাদে আনিবে না। পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট ভূমি হইতে দশ মণ হারে শস্য লাভ হইত, আর যে ব্যয়ে সেই দশ মণ ফসল উৎপন্ন হইত, সেই হারে তাহার মূল্য ধার্য্য হইত; কিন্তু এক্ষণে সেই ব্যয়েই নিম্ন শ্রেণীর ভূমি হইতে আট মণ হিসাবে ফসল উৎপন্ন হইলে এই আট মণের হারেই মূল ধার্য্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ভাবে মূল্য বৃদ্ধি হইলে শ্রেষ্ঠ জমির জন্য দুই মণ করিয়া লভ্য দাঁড়াইবে; কিন্তু যদি এই লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির সময়ে দ্বিগুণ ব্যয় করিয়া গভীরভাবে চাষ হইলে দ্বিতীয় মাত্রার জন্য নয় মণ হারে শস্যোৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইবে বলিয়া বোধ জন্মে এবং সেই ভাবে কার্য্য হয়, তার এই নয় মণের হারেই মূল্য ধার্য্য হইবে; নিম্ন শ্রেণীর ভূমি আবাদে আনার আবশ্যক হইবে না। তখন এক মণ মাত্র লভ্য স্বরূপে উদ্ভব হইবে। আর যদি দুই রসি জমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া অনিবার্য্য হয়, তবে দুই মণই উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে। কিন্তু যদি তখন আরো লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এবং সাত মণ করিয়া উৎপন্নের যোগ্য ভূমি আবাদে আনার প্রয়োজন পড়িয়া যায়, তবে প্রথম শ্রেণীর ভূমিতে তিন মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিতে এক মণ উদ্বৃত্ত হইবে। এই উদ্বৃত্তি হইতেই খাজানা দেওয়া যাইতে পারিবে; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ভূমির জন্য কোন খাজানা দেওয়া যাইতে পারিবে না, কারণ তাহার উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যে ব্যয় মাত্র উঠিয়া আসিতেছে; কিছুই উদ্বৃত্ত হইতেছে না। প্রারম্ভে প্রথম শ্রেণীর জন্য কোন খাজানা দেওয়া সম্ভব ছিল না; দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি আবাদে আনার ফলে, প্রথম শ্রেণীর জন্য দুই মণ খাজানার উদ্ভব হইল; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন খাজানার উদ্ভব হইল না; শেষে তৃতীয় শ্রেণী আবাদে আসিলে, উপরের দুই

শ্রেণীর খাজানার উদ্ভব হইল, প্রথম শ্রেণীর জন্য তিন মণ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য এক মণ, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কোন খাজানা দেওয়া সম্ভবপর হইল না। এইরূপে পর-পরভাবে যত নিম্ন শ্রেণীর ভূমি আবাদে আনা হয়, ততই তদূর্দ্ধ শ্রেণীর জন্য উত্তরোত্তর বেশী উপস্বত্বের অভ্যুদয় হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা ভূমি যদৃচ্ছা-লব্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু তাহা না করিয়া ইহা দুষ্প্রাপ্য এবং ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারগত বলিয়া গ্রহণ করিলেও আমাদের এই অবধারিত তত্ত্বের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে না। কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির উৎপত্তি-হ্রাস নিরাময় প্রভাবে সর্ব্বক্ষেত্রেই ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি সীমায় উৎপন্ন শস্যের মূল্যে তাহার উৎপাদন-ব্যয় মাত্র উঠিয়া আসিবে, কিছুই উদ্বৃত্ত হইবে না। বর্ত্তমান কল্পিত ক্ষেত্রে সমাজের আত্ম-প্রয়োজনে তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিতে হয় বলিয়া তাহার উৎপন্ন ফসলের মূল্যে যাহাতে উৎপাদন-ব্যয় উঠিয়া আসে সেই ভাবে মূল্য ধার্য্য হয়, এবং উপর্য্যুক্ত দুই শ্রেণীর ভূমির জন্য উপস্বত্বের অভ্যুদয় ঘটে। এই মূল্যই ফসলের স্বাভাবিক মূল্য (normal price)। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার উপর মূল্য ধার্য্য হয় না। সমাজ আত্ম-প্রয়োজনে নিম্ন শ্রেণীর ভূমি চাষে আনে অথবা গভীরভাবে তাহার চাষ দেওয়ায় আবশ্যক হয় বলিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূমির জন্য একটা বিশেষ সুবিধা বা বিশিষ্টতার (Differential advantageএর) অভ্যুদয় হয়। ইহাই খাজানা উদ্ভবের কারণ। ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার থাকা না থাকার উপরে খাজানা নির্ভর করে না। এই উদ্বৃত্ত উপস্বত্ব হইতে ভূম্যধিকারী খাজানা পাইয়া থাকেন, এই পর্য্যন্ত। তবে দেশের ভূমি জাতির সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইলে এই উদ্বৃত্ত বা উপস্বত্ব সমগ্র সমাজে বিস্তৃত হইয়া সমাজের উপকারে লাগিতে পারিত সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা করিতে গেলে বর্ত্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া একটা বিরাট বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইবে। সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই উপস্বত্বকেই nationalized বা জাতির সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে চান। আর শ্রমজীবি সম্প্রদায়ও ইহা হইতে একটা অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। এই সকল ব্যাপারের ন্যায়-অন্যায় বিচার করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ভূম্যধিকারী এই উপস্বত্ব হইতে কতটা পাইতে পারেন, তাহাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য।

ঊর্দ্ধকল্পে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য পরিমাণ

নানা কারণে ভূমির জন্য কৃষকের টান জন্মে। ভূমির উর্ব্বরতা, বাজারের সহিত তাহার সংযোগ-সুবিধা প্রভৃতি ভূমির উৎপাদিকা শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য কৃষকের আগ্রহ জন্মে। চাষ-আবাদের ও শস্যাদির প্রকার-ভেদেও এই টানের ইতর-বিশেষ হয়। সর্ব্বোপরি কৃষকের বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষানুসারে প্রচলিত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, তাহার বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে যে পন্থায় যে শস্য উৎপন্ন করিল, সে

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লভ্য করিতে পারিবে বলিয়া তাহার বোধ জন্মে; তাহার উপর তাহার খাজানা দেওয়ার ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। উৎপন্ন সামগ্রী হইতে প্রচলিত হারে তাহার নিজের ও শ্রমজীবিদিগের বেতন, টাকার সুদ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যয়-বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইতেই তাহাকে খাজানা দিতে হইবে। আর বৎসরে বৎসরে এই উপস্বত্বই বা গড়্‌পড়্‌তা কত হইতে পারে, তাহারও একটা মোটামুটি আঁচ করিয়া তাহাকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে প্রচলিত হারে মাহিনা ছাড়াও তাহার যেন কিছু লভ্য থাকিয়া যায়, এ বিষয়েও তাহার লক্ষ্য থাকা অতীব স্বাভাবিক। কেন না বেতনের উপরে কিছু লভ্য না থাকিলে, তাহার পক্ষে এই কৃষিকার্য্যের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তথাপি যদি তাহার সমশ্রেণীর কৃষকের মধ্যে এই ভূমি পাইবার জন্য প্রবল টান জন্মে, তবে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে তাহাকে ভূমির বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক সেই পথ অনুসরণ করিয়া ভূমির শস্যোৎপাদিকা সীমা পর্য্যন্ত ধন ও জন-নিয়োগের ফলে যতটা উপস্বত্ব লাভের সম্ভাবনা আছে, সেই পরিমাণ জমা দিয়া তাহাকে এই কার্য্যে লিপ্ত করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় তাহাকে প্রচলিত হারে বেতন মাত্র পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তখন উপস্বত্ব ও খাজানা এক হইয়া যাইবে। ইহাই খাজানা উর্দ্ধ সীমা। এই সীমার উপর খাজানা দিতে হইলে কৃষকের ক্ষতি হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত।

সঙ্কলন

বিলাত যাত্রীর পত্র

৩

জাহাজে বড় বেশি ভিড়। ডাঙার হাটে বাজারে যে ভিড় হয় সে চলতি ভিড়—নদীতে জোয়ারে জলের মত—কিন্তু এই ভিড় বদ্ধ ভিড়। আমরা যেন কোন্ এক দৈত্যের মুঠোর মধ্যে চাপা রয়েচি কোনো ফাঁকি দিয়ে বেরবার জো নেই। আমরা আছি তার ডান হাতের মুঠোয়, আমরা হলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। কিন্তু যারা পড়েচে বাম হাতের ভাগে তাদের সংখ্যা বেশি, চাপ বেশি, স্থান কম। ঐদিককার ডেকের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় যেন ঐ অংশে জাহাজের হাঁপানির ব্যামো, যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠতে পারচে না। আমরা আছি সভ্যতার সেই যুগে যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারী যুগ। রেলগাড়ি বল, ষ্টীমার বল, হোটেল বল, ইস্কুল বল, আর পাগলা গারদ বল সমস্তই পিণ্ডপাকানো প্রকাণ্ড ব্যাপার। কিন্তু সমষ্টি এবং ব্যষ্টির যোগেই বিশ্বজগৎ। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়, তাতে সমষ্টির যথার্থ উৎকর্ষ হয় না। এতে শক্তির অভাব প্রকাশ পায়। এখনকার সভ্যতা বলচে বহুকে দলন করে যে পিণ্ড হয় সেই পিণ্ডই আমার বরাদ্দ অন্ন। প্রত্যেকের পুরা ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং

সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু এই রকম সরকারী ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কি সাম্রাজ্যে কি সমাজে প্রতিদিন স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এই অন্যায় এবং দুঃখকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই মানুষ নানা উক্তিতে অনুষ্ঠানে ও শাসনে রাষ্ট্রপূজা ও সমাজপূজাকে একটা ধর্ম্ম করে তুলেচে। সেই ধর্ম্ম যারা মানচে এবং দুঃখ সহ্য করচে মানুষ তাদেরই সাধু সম্বোধন করে পুরস্কৃত করচে, যারা মানচে না তাদের বলচে খ্রিষ্টান, তাদের দিচ্চে নির্ব্বাসন কিম্বা প্রাণদণ্ড। এমনি করে প্রভূত নরবলির উপরে মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন একদিন আসচে যখন বলির মানুষ মেলা সহজ হবে না; যখন ব্যষ্টি আপন পুরা মূল্য দাবী করবে। আজ কর্ম্মিকের দল ধনিকের শাসন অমান্য করচে; তাতে ক্রুদ্ধ সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিদেবতা তাদের প্রতি চোখ রাঙাতে ত্রুটি করচে না, এবং রাষ্ট্রধর্ম্মেরও দোহাই দিচ্চে; বলচে, তোমারা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে নেশনের ক্ষতি হবে, অন্য নেশন বাণিজ্যবিস্তারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কর্ম্মিক সে দোহাই আজ মান্‌তে চাচ্চে না; বলচে, আমার প্রতি অন্যায় করতে দেবনা, আমার যা পুরা মূল্য তা আমাকে দিতেই হবে। য়ুরোপে রাষ্ট্রধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলির মানুষকে যুপকাষ্ঠে টেনে নিয়ে আসে, এই ধর্ম্মের দোহাই শুনে কর্ম্মিকেরা ধনদেবতার রথযাত্রায় রথ টান্‌তে টান্‌তে তার চাকার তলায় পড়ে পড়ে মরে, সৈনিকেরা শক্তিদেবতার কণ্ঠহার রচনার জন্যে আপন ছিন্নমুণ্ড উৎসর্গ করে পুণ্যলাভ হল কল্পনা করে। আর আমাদের দেশে সমাজধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমরা এতকাল নরবলি দাবী করে এসেচি;—শূদ্রকে বলে এসেচি অগৌরবে তুমি সম্মত হও কেন না সমষ্টিদেবতার সেই আদেশ অতএব এই তোমার ধর্ম্ম; নারীকে বলে এসেচি কারাবেষ্টনে তুমি সম্মত হও তাহলেই সমষ্টিদেবতার কাছে তুমি বরলাভ করবে, তোমার ধর্ম্ম রক্ষা হবে। কিন্তু সমষ্টিদেবতা সর্ব্বকালে দেবতার প্রতিযোগী হয়ে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। মানুষকে খর্ব্ব করবার অন্যায় এবং দুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠচে, এমনি করে প্রলয়ের ভূমিকম্পকে গর্ভে ধারণ করচে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের ভিত্তি টলে উঠ্‌বে—হিসাব তলব হবে, তখন বহুকালের ঋণ পরিশোধের পালায় ব্যষ্টির কাছে সমষ্টিকে একদিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ব্যষ্টির পূর্ণতা অপহরণ করে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই করে সে পূর্ণতা মায়ামাত্র, সে কখনই টিক্‌তে পারে না। আজ আমরা তাকে ধর্ম্মের আবরণ দিয়েচি কিন্তু এমন কত বলিরক্তলোলুপ ধর্ম্ম কিছুকালের জন্য জননী বসুন্ধরাকে পীড়িত এবং অশুচিকরে আজ অন্তর্দ্ধান করেচে।

এই কথা কয়দিন আমাকে বিশেষ করে বেদনা দিচ্চে, তার কারণ বলি। আমাদের যাত্রার আরম্ভে জাহাজ অল্প কিছু মন্থরগমনে চল্‌চে বলে যাত্রীরা দুঃখবোধ কর্‌ছিল। মন্থরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এঞ্জিনের জঠরানলে কয়লা যোগান দেবার ভার যাদের সেই হতভাগ্য "ষ্টোকার" দল (Stoker) নূতন ব্রতী, তারা পুরা দমে কাজ করতে পেরে উঠ্‌চে না। শোনা গেছে বোম্বাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্ম্মঘট করবার কথা ছিল। সেই তারিখের আগে কোনোক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে অতিরিক্ত মজুরীর প্রলোভন দিয়ে ষ্টোকারদের অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। একজন ষ্টোকার হাতায় কয়লা নিয়ে দারুণ শ্রান্তি ও অসহ্য উত্তাপে এঞ্জিনের সামনে পড়ে মরে গেল। কিন্তু জাহাজ ধর্ম্মঘটের আগেই ঘাটে পৌঁচেছিল, খনি-কারদের বলি না দিলে খনি থেকে কয়লা ওঠে না, ষ্টোকারদের বলি না দিলে জাহাজ সমুদ্র পার হয়ে খেয়াঘাটে পৌঁছয় না—এই জন্যে এদের সম্বন্ধে দুঃখবোধ করা অনাবশ্যক;—সভ্যতার মধ্যে যে একটা সমষ্টিগত ধন ও প্রয়োজন আছে তারই কথাটা এদের সকল দুঃখের উপর মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। সবই মানি কিন্তু এও মান্‌তে হবে যে যত সুবিধা যত সুখই হোক্ না, তাকে সভ্যতা বল আর যাই বল না কেন, দুঃখ এবং অন্যায়ের হিসাব কিছুতেই চাপা পড়বে না। বলির মানুষরা আপাতত মরে কিন্তু পরে তারাই বলিদাতাকে মারে। এই কথা নিশ্চয় জেনো,-গ্রীস রোম ইজিপ্ট তার বলিদের হাতেই মরেচে

ভারতবর্ষও তার বলিদের হাতেই বহুকাল থেকে মরচে। ইতিহাসে এনিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম হতে পারে না—আমাদের শাস্ত্র বলে ধর্ম্ম হত হয়েই নিহত করে—কিন্তু সেই ধর্ম্ম নিষ্ঠুর সমষ্টিদেবতার ধর্ম্ম নয়, সেই ধর্ম্ম শাশ্বত দেবতার ধর্ম্ম। ১০ মে, ১৯২০।

৪

এডেন পার হয়ে রোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলেচি। এদিকে গরম হাওয়ার আকাশ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার আকাশে প্রবেশ করচি। নানা নামের নানা দেশে মানুষ পৃথিবীকে ভাগ করেচে, কিন্তু আসল ভাগ হচ্চে ঠাণ্ডা দেশ আর গরম দেশ। এই ভাগ অনুসারে পৃথিবীর জলস্রোত পৃথিবীর বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে আকাশে মেঘবৃষ্টি ও ধরণীতে ফলশস্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করচে। এই ঠাণ্ডাগরমেই মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্য এমন বহুধা হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের নানা ধারা পৃথিবীর এক দিক থেকে আরেক দিকে প্রবাহিত হচ্চে এবং পরস্পর আহত প্রতিহত হয়ে ঐতিহাসিক উনপঞ্চাশ পবনের রুদ্র নৃত্য রচনা করে চলেচে, সেও এই ঠাণ্ডা-গরমের বিপরীত শক্তির ক্রিয়া। ঠাণ্ডাগরমের এই স্বাভাবিক বিরোধ এবং বৈচিত্র্য মিটবে না। আমরা গরম দেশের লোক একভাবে চিন্তা করব কাজ করব, ওরা ঠাণ্ডা দেশের লোক আরেক ভাবে। আমাদের জিনিষ ওদের হাটে এবং ওদের জিনিষ আমাদের হাটে চালাচালি করতে পারব, কিন্তু ওদের ফল আমাদের ডালে আর আমাদের ফল ওদের ডালে ফলবে এ কোনোদিনই ঘটবে না। ওরা যে শক্তি জগতে চালাচ্চে সে ঠাণ্ডা হাওয়ার শক্তি—সে শক্তি জাপানের পক্ষে সহজ, কেননা জাপান আছে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে, আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কোনো বিশেষ শক্তি ক্ষণকালের জন্যে চালনা করতে সকল মানুষই পারে কিন্তু উপযুক্ত হাওয়ায় আনুকূল্য না পেলে সে শক্তিকে নিরন্তর রক্ষা করা এবং তাকে নিয়ত বিকশিত করে তোলা অসম্ভব। দেবতার অনবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতার ক্রমে শৈথিল্য এবং ক্লান্তি এসে পড়বে এবং ক্রমে বিকৃতি ঘটতে থাকবে। জাহাজে করে পৃথিবীর একভাগ থেকে আরেক ভাগে চলবার সময় এই কথাটা বোঝা খুব সহজ হয়। সৃষ্টিক্রিয়ায় উত্তাপের বৈচিত্র্যই শক্তি-বৈচিত্র্য, সে কথাটা ভারত-সমুদ্র থেকে মধ্য-ধরণী-সাগরের দিকে আসবার সময় নিজের সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। আমার একথা শুনে তোমরা হয়ত বলবে, "তবে কি তুমি বলতে চাও বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার কাছে নিশ্চেষ্টভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে? আমরা কি ইচ্ছাশক্তির জোরে তার উপরে উঠতে পারিনে?" এ কথার উত্তর হচ্চে নিশ্চেষ্ট হতে হবে এমন কথা বলা চলবে না, কিন্তু চেষ্টাকে বিশেষরূপ দেওয়া চাই। বাহ্যপ্রকৃতি ও মানসপ্রকৃতির যোগেই মানুষের সমস্ত সভ্যতা তৈরি হয়েচে, এই বাহ্যপ্রকৃতিকে মানুষ কিছু পরিমাণে বদলও করতে পারে কিন্তু সে বদল খুচরো বদল, মোটা বদল হবার জো নেই। তাহলে আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাজটা কি? তার কাজ হচ্চে এই, যেটা পাওয়া গেছে সেটাকেই পূর্ণ উদ্যমে সফল করে তোলা, জড়তার দ্বারা সেটাকে নিরর্থক না করা। অবস্থার যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি সফলতারও বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছাশক্তি সেই বৈচিত্র্যকে দোহন করে নিতে পারে কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ন অবস্থাগত সফলতাকে একমাত্র পরমার্থ বলে লুব্ধভাবে কামনা করা শক্তি-হীনের কাজ। উপনিষদে বলেচেন, যিনি এক তিনি "বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি তাঁর বহুধা শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিহিত অর্থ দান করেচেন। সেই নিহিত অর্থ নিজের ক্ষেত্রেই আছে; নিজের শক্তির দ্বারা সেই নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্ঘাটিত করতে পেরেচে সেই জাতিই সার্থক হয়েচে। কারণ, যে জাতি নিজের অর্থ পেয়েচে বিনিময়ের দ্বারা পরের অর্থকেও সেই জাতি নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে। নিজের নিহিত অর্থ যে জাতি উদ্ঘাটিত করে না, সেই জাতি ধার করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে, পরের অর্থ কামনা করে, কিন্তু এই পন্থায় কোনো জাতি ধনী হতে পারে না, কেন না, এই পথে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে জাতও যায় পেটও ভরে না। ইতি ২৪ শে মে, ১৯২০।

৫

দুই মহাদেশের মাঝখান দিয়ে চলেচি। বামে ইজিপ্ট, দক্ষিণে আরব। দুই তীরেই জনহীন তৃণহীন ধূসরবর্ণ পাহাড় যেন দুই ঈর্ষাপরায়ণ দৈত্যভ্রাতার মত পরস্পরের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করচে, আর যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে তারা উভয়েই জন্ম নিয়েচে সেই সমুদ্র যেন দিতিমাতার দুই হননোন্মুখ ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে অশ্রুপরিপূর্ণ অনুনয়ের দ্বারা দুই পক্ষকে তফাৎ করে রেখেচে।

বামের তীর শব্দহীন, নিস্তব্ধ, দক্ষিণের তীরও তাই। কিন্তু এই দুই তীরের ভূরঙ্গমঞ্চে মানব-ইতিহাসের যে নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে, আমি মনে মনে তারই কথা চিন্তা করে দেখ্‌চি। ইজিপ্টে যে মানব-সভ্যতা বিকাশ পেয়েছিল সে বহুদিনের এবং সে বহু সম্পদশালী। তার কত চিত্র, কত অনুষ্ঠান, কত মন্দির। আর আরবে যে জাগরণ হঠাৎ দেখা দিয়েছিল তার কত উদ্যম, কত উদ্যোগ, কত শক্তি। কিন্তু দুই বিপরীত তীরে মানবচিত্রে এই দুই উদ্বোধন সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। ইজিপ্ট আপনার বিপুল আয়োজনের মধ্যেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-আর আরব আপনার দুর্দ্দমনীয় বেগে দেশে-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুই সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ ছিল দুই দেশের ভৌগোলিক পার্থক্যের মধ্যে। নীল নদীর জলধারায় পরিপুষ্ট ইজিপ্ট ফলে শস্যে পরিপূর্ণ; অভাবের কঠিন তাড়নায় সেখানকার মানুষকে নিরন্তর আঘাত করে নি। স্তন্যরসহীন আরব-মরুভূমির সন্তানেরা নিজে অস্থির হয়ে ছিল এবং পৃথিবীর সকলকে অস্থির করেছিল।

বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র, যেমন দুই স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঋষি ছিলেন তেমনি ইজিপ্ট এবং আরব দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর দেশ। পৃথিবীর সকল দেশের লোককেই দুই মোটা ভাগে বিভক্ত করে' বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠায় ফেলা যায়। বসিষ্ঠ বাস করেন, আর বিশ্বামিত্র ব্যাপ্ত হন। বসিষ্ঠ ধেনুপালন করেন আর বিশ্বামিত্র ধেনুহরণ করেন। বসিষ্ঠ রামচন্দ্রের কানে মন্ত্র দেন, আর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের হাতে অস্ত্র দেন। বসিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী গৃহের পুরোহিত, আর বিশ্বামিত্র দুর্গম বনপথের নেতা।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষ এবং চীন বসিষ্ঠের মন্ত্রে দীক্ষিত; আর য়ুরোপ বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল। এই দুই ঋষি কি কোনো দিন প্রেমে মিল্‌বেন? আর যদি না মিল্‌তে পারেন তা হলে পৃথিবীতে কি কোনো কালে বিরোধের অবসান হবে? যদি এমন আশা কর যে, দুইয়ের মধ্যে এক ঋষি যেদিন মারা যাবেন সেইদিনই পৃথিবীতে শান্তি দেখা দেবে, তবে সে আশা সফল হবে না, কেননা জগতে বসিষ্ঠও অমর। বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস একদিন এই দুই ঋষিই এক যজ্ঞের ভার নেবেন, মন্ত্র এবং অস্ত্র, অমৃত এবং উপকরণ একত্রে মিলিত হবে, সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা আর নিব্‌বে না। এশিয়া এবং য়ুরোপ যদি কোনো দিন সত্যে মিল্‌তে পারে তা হলেই মানুষের সাধনা সিদ্ধ হবে—নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপস্যা বারংবার কলুষিত হতে থাক্‌বে। ২৪শে মে ১৯২০।

শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৭।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা

রাহুর প্রেম ও অন্যান্য গল্প। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীরমানাথ দাস, ১।১ হরিমোহন রায়ের লেন, কলিকাতা, মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। 'রাহুর প্রেম', 'দানের বেদন', 'সুকৃতির ভোগ', 'প্রহসন', 'বাদুড়', 'ডায়েরি' ও 'শান্তি'—এই কয়টি গল্প এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলির প্লট মামুলির ধরণের নয়,—ব্যঞ্জনায় কৃতিত্ব আছে। রচনায় তেজ আছে, আর্ট আছে—মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণে গল্পগুলিও বেশ উপভোগ্য

হইয়াছে। 'রাহুর প্রেম' ও 'দানের বেদন'—এই দুইটি গল্প আর-একটু ছোট হইলে উহাদের ভিতরকার রস পরিপূর্ণ জমাট বাঁধিত। আমাদের সব-চেয়ে ভালো লাগিয়াছে, এ গ্রন্থের "বাদুড়" গল্পটি। গল্প লিখিবার কায়দা লেখক বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন এবং ভাষাও প্রায় সর্ব্বত্র সংযমের গণ্ডী ধরিয়া ভাবকে মানিয়া চলিয়াছে। আজকালকার ছোট গল্পে 'জান্' জিনিষটার বড়ই অভাব। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এ বইয়ের গল্পগুলিতে সেই 'জান্' বস্তুটি কোথাও মারা পড়ে নাই। বহিখানির ছাপা বাঁধাই কাগজ বেশ নয়নাভিরাম হইয়াছে।

আত্মচরিত। ৺শিবনাথ শাস্ত্রী। কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা। বাঙলার বর্ত্তমান সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রভাব বড় অল্প নহে। বাঙলার এক যুগ-সন্ধিক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ভাবে ও কার্য্যে আপনার ব্যক্তিত্বকে যথেষ্টই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই 'আত্মচরিতে' তিনি নিরপেক্ষতার সহিত তাঁহার মনের অবস্থা, চিন্তার গতি ও পরিণতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই চরিত-গ্রন্থখানি সেকালের নানা কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সেকালের সমাজ কি ছিল,—সেই সমাজ নানা জনের হাতে কেমন করিয়া এখনকার এই বর্ত্তমান রূপে গড়িয়া উঠিল, বাঙলার সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার কতখানি প্রভাব পড়িল, তাহারই কৌতূহলোদ্দীপক সরস বর্ণনা শাস্ত্রী-মহাশয়ের অনিন্দ্যসুন্দর সরল সহজ তুলির ইঙ্গিতে একখানি মনোজ্ঞ ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহা হইতে একদিকে যেমন শাস্ত্রী মহাশয়ের সরল জীবন-যাত্রার প্রণালী এবং বলিষ্ঠ ও দৃঢ় চিত্তের পরিচয় পাই, তেমনি বাঙলার সামাজিক ইতিহাসেরও অনেক তথ্যের সন্ধান মিলে। এ গ্রন্থ হইতে বাঙলার সামাজিক ইতিহাস-রচনার প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইবে,—বাঙলা সাহিত্যে এ গ্রন্থখানির মূল্য বড় সামান্য নয়।

বিভ্রাট। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম, এ প্রণীত। কলিকাতা শ্রীরাম প্রেসে মুদ্রিত। ১৫ নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, লণ্ডন লাইব্রেরী হইতে জে, মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটিকা—বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার লা বিশ রচিত 'ল্য গ্রামেয়ার' নামক হাস্যরসাত্মক ফরাসী নাটিকা অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থখানি 'ব্যাকরণ-বিভ্রাট' নামে 'ভারতীতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদেশী চরিত্রগুলি লেখক নিপুণভাবেই দেশী ছাঁচে গড়িয়া আমদের সম্মুখে ধরিয়াছেন এবং ইহার অন্তর্নিহিত Humourটুকুও বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থে একখানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ছবি দেওয়া হইয়াছে। জোর করিয়া ছবির নীচে একছত্র লেখা থাকিলেও সে ছবির সহিত অবশ্য গ্রন্থোক্ত চরিত্রের কোন মিল দেখিলাম না।

দাস আমি। প্রকাশক, শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়, ৪ নং রামমোহন মুখোপাধ্যায় লেন, শিবপুর, হাওড়া। মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

স্বস্তিকা। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ,—নানা বিষয়ের কতকগুলি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে।

আকাশের খোকা। শ্রীকানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, রায় এম, সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৯০-২-এ হারিসন রোড কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। অস্কার ওয়াইল্ড্ রচিত একটি গল্পের অনুসরণে এই গল্পটি লিখিত—ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা। গল্পটিতে নীতি-কথা আছে। গল্পটি বেশ ঝরঝরে, সহজ ভাষায় লেখা—ছেলেমেয়েরা পড়িয়া আনন্দ পাইবে। বইখানিতে পাঁচটি ছবি আছে। ছবিগুলি আঁকিয়াছেন,—প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। ছবিগুলি ভালো হইয়াছে। বহিখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই বেশ মনের মত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেস শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৪৪ বর্ষ, ২য় খণ্ড

(১৩২৭ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

TRACING LAMINATED.

১৩২৭ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
অনন্ত জীবন (নাটিকা)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		৮৪৬
অপরাধী (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		৬১৬
অবতার (উপন্যাস)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর		৫৫৮, ৬৩৩, ৭১৫,
...	...	...		৭৬৫, ৮৬৩, ৯১৭
অতীত (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	...	৭৭২
আদর্শের বিড়ম্বনা	...	শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বি-এ	...	৮৫৯
আখেরী (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৯৪৫
আলোচনা	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	৮৩২
আলোর পাথার (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৫৪৯
এ ধরণী (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৬২১
একটা পুরাণ গীত	...	...	...	৬৫৫
কন্দর্পের প্রসার (কবিতা)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		৮৫৭
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত		শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ		৬২৭
কবিতার কথা	...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার বিদ্যারত্ন		৭০৭
কবিবর দেবেন্দ্রনাথ (সচিত্র)		শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ		৭৫৪
কোনো নেতার প্রতি (কবিতা)		শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৮২১
গান ও প্রাণ (কবিতা)	...	শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ	...	৮৬৩
ঘুমতী নদী (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৮১৫
চক্র (উপন্যাস)	...	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	৫৪২, ৬৪৪,	৯০৯
চয়ন—				
অভিনেতার সংগ্রহ	...	শ্রীসোমনাথ সাহা	...	৭৫৩
অপ্টোকেঁা (সচিত্র)	...	শ্রীবামাপদ বসু	...	৬০০
'ইকেবানা' (সচিত্র)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬০১
একশো-বচ্ছরের বর (সচিত্র)	...	শ্রীপ্রসাদ রায়	...	৮৭৫
চিরযৌবনের প্রথম ধাপ (সচিত্র)		ঐ	...	৯৮৪
ছায়ার কায়ালাভ (সচিত্র)	...	ঐ	...	৭৪৬

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
চয়ন—				
দাঁতের ব্যামো	...	শ্রীপ্রসাদ রায়	...	৭৫০
দান্নুনসিও (সচিত্র)	...	ঐ	...	৯৭১
নরওয়ের ভাস্কর (সচিত্র)	...	ঐ	...	৮৭০
নূতন 'গম্ভীর বেদন'	...	ঐ	...	৭৪৯
পরলোকে টেলিফোন	...	ঐ	...	৮২৮
পরীর ফোটো (সচিত্র)	...	ঐ	...	৮২২
বেতার টেলিগ্রাফে ফটোতোলা		ঐ	...	৭৫১
ভাবুকতার ক্ষমতা (সচিত্র)	...	ঐ	...	৮১৪
মড়া কি জ্যান্ত হয় ?	...	ঐ	...	৬৮৮
মনের বয়স	...	শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	৫৯১
মনের বসতি কোথায় ?	...	শ্রীপ্রসাদ রায়	...	৭৫০
মানুষ-খেকো গাছ (সচিত্র)	...	ঐ	...	৭৫১
ম্যাপ আঁকা	...	ঐ	...	৫৯৯
মুখ-দর্পণ	...	শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	৫৯২
রুষ-লেখক সোলোগাব	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৬৮৬
লেখার সময়	...	শ্রীপ্রসাদ রায়	...	৫৯৯
ষ্টিভেনসনের প্রিয়তমা (সচিত্র)		ঐ	...	৮৬৯
সব-চেয়ে পুরোণো পট (সচিত্র)		ঐ	...	৮২৪
সভ্য অসভ্যতা (সচিত্র)	...	ঐ	...	৯৮১
সেকালের দুটি দৃশ্য (সচিত্র)	...	ঐ	...	৫৯৪
সেকালের দানব (সচিত্র)	...	ঐ	...	৯৮৪
স্মিটস্‌লার	...	ঐ	...	৮২৫
হামজুন (সচিত্র)	...	ঐ	...	৮২৬
হাড়ের 'কলম' (সচিত্র)	...	ঐ	...	৮৭৭
চাঁদের আলোয় (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল		৬৬৯
চুড়ির আওয়াজ (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ		৯৫৬
চোর (গল্প)	...	শ্রীনরেশ দত্ত	...	৬৫৭
ছোট মা (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ		৭৭৭
জহর খাওয়া (গল্প)	...	শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	৯৩৪
জানিবিধা শিগ্রালিপি	...	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ		৭৭৩

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
জেন্ত-সভা	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৬৫
তফাৎ (গল্প)	...	শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৭০২
তানপুরা	...	শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল ...	৬৪৯
তারকা ও ফুল (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	৮৩২
ত্রয়ী (কবিতা)	...	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ...	৯৮৫
দম্ভি (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ,বি-এল	৭৩৫
নাস্তিকের গল্প	...	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ	৭৬১
পতিতা (কবিতা)	...	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় ...	৬৯৬
পথের গান (কবিতা)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬১৪
পাঁচটা টাকা (গল্প)	...	শ্রীমতী নীহারবালা দেবী ...	৯৪৯
পুরূরবা (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	৭১১
পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...	৬৪০
পৌষের অবেলায় (কবিতা)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬০
প্রব্রজন ও উপনিবেশ স্থাপন	...	শ্রীকালীপদ মিত্র এম-এ, বি-এল	৮১৭
প্রশ্নোত্তর (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৬০৪
প্রিয়ার উদ্দেশে (গল্প)	...	শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৫৫০
বাহবা বেড়ে! (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ,বি-এল	৯৭৪
বারোয়ারি উপন্যাস	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫২৯
ঐ	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৭০
ঐ	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৭৩৬
ঐ	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	৮০৬
ঐ	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৮৯০
ঐ	...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বার-য়্যাট-ল	৯৬৯
বৈদ্যুতিক বিশ্লেষ (সচিত্র)	...	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য	৯৫৯
ভাষার উৎপত্তিতত্ত্ব	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ	৯২৩
ভোমরার গান (কবিতা)	...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ...	৫৯০
মরণ-বাচনের কথা	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	৬৯৩
মঙ্গল মঠ (গল্প)	...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ...	৮৭৮
মাতৃহীনা (গল্প)	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ...	৭৯৬
যদি সে (কবিতা)	...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ,বি-এল	৮০৫
যৌবনের ছিট (গল্প)	...	শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ	৫৭৭

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
রস ও নিরস (সচিত্র)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭২৩
রাজ (কবিতা)	...	শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ,	৯৬৮
লেখার ইতিহাস	...	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ	৭৮২
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মাহাদানী	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ,পি,আর,এস,	৫৩৭
সরযূ জোর (কবিতা)	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮৫
সরযূ (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৭৯৩
সঙ্কলন —			
বর্ত্তমানের সমস্যা	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...	৯৮৭
বাঙ্গালী কি আর্য্য ?	...	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ...	৬৮১
বিলাতের পত্র	...	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ	৮১৭
বিলাতযাত্রীর পত্র	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭৮, ৭৫৩
শিল্পীর সাধনা	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৬০৪
সমালোচনা	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	৬২৩, ৭৬২, ৯০৮, ৯৯০
ঐ	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৮৩৩
সম্ভোগ-তত্ত্ব	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ...	৮৯৯
সাদেকা (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	৯৩২
সিমলার কথা (সচিত্র)	...	শ্রীসত্যশরণ সিংহ বি-এস্, সি	৬৬২
সোনার গৌরাঙ্গ (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	৭৪৫
স্বরলিপি	..	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৫৫
স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৮২৯
হিন্দুস্থান (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৮৮৯

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

চিত্র সূচী

অস্ত্র দিয়ে কোঁচকানো ত্বকটেনে ধরা হচ্ছে ৯৮৪
অন্ধের ছাপানো বইয়ের গান-শোনা ৬০১
আইরিস ও বেঁটে যক ... ৮২১
আঁকা গয়না ... ৯৮২
অ্যালিস ও পরীর দল ... ৮২৩
ইণ্ডয়ানোডন ও আদি মানব ... ৯৮৫
ক্রুক্‌স্ ও কেটকিংয়ের প্রেতাত্মা ... ৭৪৭
গরিলা ও মানুষ ... ৮৭৪
ছায়ার কায়ালাভ ... ৭৪৬
জ্যোৎস্না রাতে (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত ৮৩৫
দান্নুনসিও ... ৯৭৯
দুহাজার বৎসরের পুরানো মানুষের মূর্ত্তি ৫৯৫
দেবেন্দ্রনাথ সেন ... ৫৫৫
নিভৃত আলাপ (বহুবর্ণ)
প্রাচীন চিত্র হইতে ... ৬২৫
নুট হাম্‌জুন্ ... ৮২৬
পম্পির একটি পুরানো বাড়ীর ভিতরের দৃশ্য ৫৯৪
পম্পির একটি রাজপথের ধ্বংসাবশেষ ৫৯৬
পম্পির একটি পুরাতন থামওয়ালা
প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ৫৯৭
পম্পির একটি প্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষ ৫৯৮
পৃষ্ঠে-পটে চিত্র-পতঙ্গ ... ৯৮৩
প্রেতাত্মার মুখে সংলগ্ন ectoplasm ৭৪৮
ফুলগাছের কেয়ারি ৬০৩
ভাসান্ (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ৫২৭
বর আর বউ ... ৮৭৬
বন্দিনী মা ... ৮৭১
"বল দেখি আমার গায়ে কি ? ... ৯৮
বাসন্তী (বহুবর্ণ) ... ৬৯১
মানুষ-খেকো গাছ ... ৭৫২
মানুষের পিঠে গরুর হাড় ... ৯৭৮
যক্ষ মন্দির ও বানর ... ৬৬৬
যক্ষমন্দির যে পাহাড়ে সেইদিককার দৃশ্য ৬৬৭
রণ-রঙ্গিণী ... ৮৭২
সন্ধ্যার পাখী (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত ৯১৫
রাত্রি ... ৮৭৩
ষ্টিভেনসন ... ৮৬৯
সরায় ধরা ... ৬০২
সব-চেয়ে পুরোণো পট ... ৮২৫
সিম্‌লা বাজার ও গির্জ্জা ... ৬৬৫
সিঙিং ... ৮৭১
সুন্দর মূর্ত্তি ... ৭২৮
সেক্রেটারিয়াট বিল্ডিং ... ৬৬৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
কলিকাতা

ভাসান্
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২৭ [৭ম সংখ্যা

বারোয়ারি উপন্যাস

১৮

দুর্গামণির পরামর্শ-মতো সতীশ মৈত্র-মশায়কে একটা তার কোরে উত্তরের অপেক্ষায় রইলো ; কিন্তু মৈত্র-মশায় তখন যোগেন মিত্তিরকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়েছেন, কাজেই সতীশের তার বিনা-উত্তরে কালিগাঁয়ে যেমন গিয়েছিল, তেমনি ফিরে এল। কালিগাঁয়ের পাঁচ ক্রোশ দূরে বেলতলী ষ্টেশনের পোষ্ট-মাষ্টার সতীশের তারের জবাব লিখলেন—"এড্রেসী নট্ ফাউণ্ড।"

টেলিগ্রাফের তারের মতো রুলটানা নিস্ফল গোলাপি কাগজটা হাতে কোরে সতীশকে শুকনো-মুখে আসতে দেখেই দুর্গামণি বুঝলেন, খবর খারাপ। তিনি আর কোনো কথা না শুধিয়ে সতীশকে বল্লেন—"বাবা, আমি একবার দেশে যাবো, কোনোগতিকে আমাকে সেখানে পাঠাতে পারিস্?"

সতীশ খানিক ভেবে বল্লে—"পারি। দারাগঞ্জের সতীশবাবুর স্ত্রীর অসুখ ; দেখতে তাঁর মা কলকাতায় যাচ্ছেন ; তুমি তাঁদের সঙ্গে গেলে বেলতলিতে তাঁরা তোমায় নামিয়ে পাল্কি চড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তুমি দেশে যাবে কি করতে? এখানে তো বেশ একরকম—"

দুর্গামণি সতীশের কথায় বাধা দিয়ে বোলে উঠলেন—"না না, আমার না গেলে চলবে না! আর-একটি ভালো মেয়ে দেখে তোর আবার বিয়ে দিতে হবে।"

কমলার দুর্নাম রটিয়ে বেনামি চিঠিটা পাওয়া অবধি সতীশের মাথায় সন্ন্যাস-করবার একটা প্ল্যান ক্রমাগত ঘুরছিল ; এবং এই প্ল্যানটা নিয়ে সে তার গুরুদেব আত্মানন্দ স্বামীজীর সঙ্গেও ইতিমধ্যে দু-একবার খুব গম্ভীরভাবে আলোচনা কোরে একরকম সংসার ত্যাগ করাই স্থির করেছে ; কিন্তু আজ হঠাৎ তার মা তাকে আর-একবার সংসারের ফাঁস-কলে ফেলার

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

চেষ্টায় আছেন জানতে পেরে সতীশ বিষম ভাবিত হয়েই দুর্গামণিকে কিছু আর না বোলে-কয়েই সোজা গুরুজীর আখড়ার মুখে দুপুর-রোদে একটা ভাঙা ছাতা-মাথায় বেরিয়ে পড়লো।

গোমতী নদীর ধারেই দিব্বি একটা ছোটো-খাটো ইমারতে সতীশের গুরুজী গুরু-মাতার সঙ্গে আখড়া বেঁধে অনেকগুলি বাঙালী উকিল আর কেরানি চেলার সেবা নিয়ে সুখে বাস করছেন। দুপুরের রোদে তেতে-পুড়ে সতীশ সেখানে হাজির। গুরুজী তখন আহা-রের পর মৃগচর্ম্মের আসনে আধ-বসা আধ-শোয়া অবস্থায় ভাগবতের পুঁথিকে বালিশ কোরে নিত্য-নৈমিত্তিক ধ্যানে ছিলেন; কাজেই সতীশকে বাইরে অপেক্ষা করতে হলো।

আখড়ার বারাণ্ডার সামনেই গোমতী নদী মস্ত একটা বাঁক টেনে চলে গেছে; তার ওপারে ধুধু মাঠ; সেই মাঠে গোটা-কতক রোগা গোরু শুকনো ঘাস খুঁজে-খুঁজে চোরে বেড়াচ্ছে; —এই ছবিটা দেখতে-দেখতে বাংলার একটা গণ্ডগ্রামের ঘর-কন্নার গোটা-কতক দিন সতী-শের মনের মধ্যে আজ এমন স্পষ্ট হয়ে আনা-গোনা করতে লাগলো যে এক-সময়ে তার সন্ন্যাসের প্ল্যান গোমতীর স্রোত ধোরে কতদূরে ভেসে গেল তার ঠিকানাই নেই। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মোটা গলায় একটা হুঙ্কার শুনে চম্‌কে-উঠে সতীশ বুঝলে, গুরুজী জেগেছেন। সে আস্তে-আস্তে ছাতা আর জুতো বাইরে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। তখন বেলা প্রায় তিনটে।

দূর থেকে গুরুজীকে টিপ্ কোরে একটা প্রণাম দিয়ে মাটির উপরে সতীশ সোজা হয়ে বসলে, গুরুজী ঘুমে-ভারি দুই চোখ সতীশের দিকে ফিরিয়ে বল্লেন—"বসো, খবর কি?"

সতীশ হাতদুটো খানিকটা জোড় কোরে, খানিকটা মুঠো কোরে উদাস সুরে বল্লে—"বড় বিপদ স্বামীজী! মা আবার আমার বিবাহ দেবার জন্যে দেশে চলেছেন—মেয়ে দেখতে।"

গুরু "হুঁ!" বোলে কেবল একটা নিশ্বাস ফেলেই আসন ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করছেন দেখে সতীশ একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বল্লে—"আমার এখন কি উপায় হবে ঠাকুর?"

গুরু আকাশের দিকে দুটো ঝাঁকড়া ভুরু খুব-খানিকটা তুলে বল্লেন—"বাপু, সংসার মায়াময়! সেখানে আশঙ্কার অন্ত নেই, জ্বালাও অত্যন্ত। আমি ত বলি তুমি সোজা বেরিয়ে পড়; আর দেরি কোরো না।"

সতীশ মুখটা অত্যন্ত কাচুমাচু কোরে বল্লে—"কিন্তু আমি যে দুই সমস্যার মধ্যে পড়লুম! এদিকে মাতৃ-আজ্ঞা—বিয়ে করতে; ওদিকে প্রভু বলছেন, সংসার ছাড়তে!"

গুরু একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"তাহলে মাতৃ-আজ্ঞাই পালন কর। মুক্তির আশা ছেড়ে দ্যেও।"

এই 'ছেড়ে দ্যেও' কথাতেই গুরুর বাঙালে রাগ একটুখানি ঝিলিক্ দিয়ে গেল। সতীশ আরো কাচুমাচু হয়ে বল্লে—"তা কি হয়? আমি সংসার না করাই তো স্থির করেছি কিন্তু—"

গুরুজী মস্ত একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বল্লেন—"ওই কিন্তুই হলো সর্ব্বনাশের মূল! এইটুকু থাকে বোলে সাধন কোরেও তিন

জন্মের পূর্ব্বে মুক্তিলাভ করতে কাউকে বড় একটা দেখলুম না।"

সতীশ অবাক হয়ে বল্লে—"বলেন কি! তিন জন্ম কঠোর সাধন কোরে তবে?"

"তিনটে জন্ম আন্দাজ লাগে দেখছি।"

সতীশ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"তাহলে আমার তো কোনো আশাই নেই দেখছি! তিনের উপরে তিন জন্মেও আমার 'কিন্তু' ঘোচে কি না সন্দেহ!"

আত্মানন্দ খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"গুরুতে ভক্তি-নিষ্ঠা রেখে, তাঁর আদেশ পালন কোরে চল্লে, এক-জন্মেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।"

সতীশ অত্যন্ত কাতর স্বরে বল্লে—"মনে যে 'কিন্তু' আপনা-আপনি ওঠে! না হলে আপনার আদেশ তো আমি যথাযথ পালন করছি।"

আত্মানন্দ শুধোলেন—"কি বিষয়ে তোমার কিন্তু হচ্ছে শুনি?"

সতীশ বোলে চল্লো—"অনেকগুলো বিষয়ে 'কিন্তু' রয়েছে। সর্ব্বপ্রধান—হচ্ছে আমার স্ত্রীর চরিত্রসম্বন্ধে, ওই বেনামি চিঠিটার উপরে। তার পর দ্বিতীয়—সংসার করা, কি নয়? নির্জ্জন বাসে যাওয়া, কি বাসায় বসে সাধন করা? সবার চেয়ে শক্ত কিন্তুটা হচ্ছে চাকরি ছেড়ে মাকে অনাহারে মারা, এবং কমলাকে ছেড়ে নিজেও মরা কি না?"

সতীশ রোদে তেতে-পুড়ে এসেছিল, আর গুরু ছিলেন ঠাণ্ডা ঘরখানিতে ঘুমিয়ে; কাজেই গুরু অতি কোমল সুরে ডাকলেন—"সুধীর, বাবা, এদিকে এস তো।" গেরুয়া-আলখাল্লা-পরা নেড়া-মাথা ধীরানন্দ বাবাজী একটা লোটা-হাতে উপস্থিত হলেন। আত্মানন্দ সতীশকে দেখিয়ে বল্লেন—"বাবা সুধীর, একে একটু জল-টল খাইয়ে ঠাণ্ডা কোরে আন; আমি ততক্ষণ হাত-মুখগুলো ধুয়ে আসি।"

সতীশ গুরুজীর খড়ম-জোড়াটা এগিয়ে দিলে তিনি খটাস্-খটাস্ কোরে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। একটা বাঁদর খড়মের শব্দে ঘুম ভেঙে গুরুজীর বৈকালি-ভোগের প্রসাদ-কণার লোভে ঝুপ্-কোরে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়লো।

সতীশ নিশ্বাস ফেলে ধীরানন্দের দিকে চেয়ে বল্লে—"আমার ভাই, মুক্তি নেই! গুরু বল্লেন, অন্তত তিন জন্ম ফেরাফিরি করতে হবে!"

ধীরানন্দ হেসে বল্লেন—"আর আমি যদি এমন ওষুধ বাৎলে দিই যাতে এক-জন্মেই মুক্তি, তো কি দিবি?"

সতীশ কাতর হয়ে বল্লে—"আমার আর কি আছে? জন্ম-জন্ম তোর কেনা-গোলাম হয়ে রইবো।"

ধীরানন্দ সতীশের পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লে—"আরে এক জন্মেই মুক্তি পেলি তো জন্ম, আবার জন্ম আসে কেমন কোরে? বৃন্দাবনে চলে যা; সেখানে ময়ূর বানর সব এক-জন্মে মুক্তিলাভ করছে দেখতে পাবি।"

সতীশ গম্ভীরভাবে বল্লে—"কিন্তু গুরু যে বলেন আমাকে হিমালয় গিয়ে নির্জ্জন বাস করতে। আচ্ছা ভাই, তোর কি মনে হয়? কমলাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, এখনি যদি চলে যাই, তবে তাদের উপর অবিচার করা হবে না?"

ধীরানন্দ একটু হেসে বল্লে—"যদি চাকরিতে

একেবারে ইস্তফা দিয়ে পালাও, তবেই অবিচার হবে; না হলে 'সিক্ লিভ্' নিয়ে দিনকতক গা-ঢাকা হোলে এই নানা দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি তো পাবিই, আর-একটু মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েও আসতে পারবি।"

সতীশ উৎসাহের সঙ্গে বোলে উঠলো—"তোর কথাতেই রাজি! আজ ছুটির দরখাস্ত দিয়ে মাকে বাড়ি পাঠিয়ে আসবো।"

ধীরানন্দ হেসে বল্লে—"যা করতে হয় এইখানে বসে কর্! বাসায় গেলে আবার মনটা 'কিন্তু' করতে পারে। চল্ এখন কিছু খাবি।"

সতীশ মাথা নীচু কোরে ভাবতে-ভাবতে সুধীরের পিছনে-পিছনে আথড়ার উঠোন পেরিয়ে একটা পোড়ো বাগানের খিড়কির গায়ে সুধীরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

১৯

একবার বিয়ে করতেই সতীশের আপত্তি ছিল; কেবল কমলার দেখা পাওয়া গিয়েছিল বোলেই সেবারে দুর্গামণি সতীশকে বাঁধতে পেরেছিলেন। বাঁধন একটুখানি আল্‌গা হতেই সতীশের বৈরাগ্য-রোগটা আবার দেখা দিয়েছে; এবং আত্মারাম স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সতীশের ধর্ম্মপ্রদীপ ক্রমেই উস্কে তুলে যাচ্ছেন; কাজেই দ্বিতীয় বার বিয়েতে সতীশ ঘাড় পাতবে না, দুর্গামণি বেশ জানতেন; কিন্তু তবু লক্ষ্ণৌয়ের বাসাটায় বসে না থেকে, জগদীশপুরে ফিরে গেলে তিনি যে একটা-কিছু উপায় করতে পারবেন, সেটা তাঁর ধ্রুববিশ্বাস। আর সেই জন্যেই দুর্গামণি সতীশের গুরু-বাড়ি থেকে ফেরার অপেক্ষায় না থেকে নিজের কাপড়-চোপড় বাক্স-পেঁটরা গোছাতে বসে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। কাছারির ফেরতা বড়-বড় দাড়িওয়ালা নাজির আর কাজিরা আল্‌পাকার জোব্বা আর মোড়াসা মাথায় সরু গলিটার মধ্যে নিজের-নিজের গরীবখানায় ফিরে আসছে। একাগাড়িগুলো ঝাঁকানি দিতে-দিতে পাথরের রাস্তায় খট্-খট্-খটাস্ শব্দ কোরে আর ঝিন্-ঝিন্ ঘুঙুর বাজিয়ে কোতোয়ালী থেকে বেরিয়ে সোজা সহরের বাইরে চলেছে—টিক্‌টিকির মতো ঝোলা-অবস্থায় তরো-বেতরো সোয়ারী নিয়ে। সতীশদের বাড়ীর সাম্‌নের বাড়ীর লাল কাঠের একটা ছোট বারাণ্ডায় একটা নাচনী নানা-রঙের ওড়না-ঘাঘরায় যেন সবুজ টিয়া পাখীটি সেজে একটা গড়গড়ায় কেবলি টান দিচ্ছে; আর নীচে একটা পানওয়ালার দোকানে চাপকান-চুড়িদার-লপেটা-পরা অনেক গুলো মান্দ্রাসা-থেকে ছুটি-পাওয়া খান ও খানানের ভিড় জমেছে। রাস্তার ওধারে নবাবী-আমলের একটা ইমামবারা ধূলো আর সন্ধ্যার আলোর মাঝে একটা ঝাপ্‌সা রঙের গম্বুজ দিয়ে অনেকটা আকাশ ঢেকে রয়েছে। দূর থেকে একটা বিউগিল্ ভোঁ ভোঁ কোরে একটা একঘেয়ে বিজাতীয় সুর সহরের সব গোলমালের উপরে ছড়িয়ে বাজতে লেগেছে। দুর্গামণি আপনার বাসার দোতলার গরাদে-দেওয়া জান্‌লার ধারে বসে সতীশের আসার অপেক্ষা করছেন, এমন সময় সুধীর ওরফে ধীরানন্দ বা ধীরেন-বাবাজী এসে বল্লে—"মা, আপনার কি সমস্ত গোছানো হয়েছে? ও-পাড়ার সতীশবাবুরা ষ্টেশনে যাচ্ছেন। চলুন, আপনাকেও তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

দুর্গামণি একটু অবাক হয়ে বল্লেন—"আর আমার সতীশ এল না? তার সঙ্গে দেখা না কোরে—"

সুধীর আল্‌খাল্লার পকেট থেকে একটা চিরকুট কাগজ বার কোরে দুর্গামণির হাতে দিয়ে বল্লে—"পড়ে দেখুন, সতীশ কি লিখেছে।"

দুর্গামণি বল্লেন—"তুমি পড়ে শোনাও বাবা, আমি পড়তে পারিনে। সে ভালো আছে তো?"

সুধীর চিঠি পড়তে লাগলো। চিঠির মর্ম্মটা এই—

"মা, আমি বুঝেছি, তুমি কেন দেশে যাচ্ছ। স্থির জেনো আমি আর সংসার করবো না। তোমার আদেশে আমি প্রথম-সংসার পেতেছিলেম—শুধু তোমার আদেশ বল্লে মিথ্যে বলা হয়, সেবারে আমারো একটু তাড়া ছিল সত্যি—কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্য-রকম। তিনি আমাকে পাকে-চক্রে মুক্ত কোরে দিয়েছেন। এ ক'টা দিন যেন নভেলের কটা পরিচ্ছেদ উল্টে-পাল্টে পড়ে গিয়েছি! এখন স্বাধীনভাবে জীবনের আসল লক্ষ্য-সাধন করবার আমার সময় এসেছে, বুঝছি। আর গুরুদেবও এই কথা বলেন। সুতরাং তাঁরি আদেশ শিরোধার্য্য কোরে আমি কিছুদিনের জন্যে হিমালয়ের কোনো নির্জ্জন বাসে সাধন-ভজন করতে চল্লেম। আমাকে ক্ষমা কোরো। এই আমার গুরু-ভাই ধীরানন্দ, ইনি তোমায় সতীশবাবুদের কাছে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবেন। সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক কোরে দিয়েছি। ইতি সেবকাধম সতীশ।"

অত বড় চিঠিখানার মধ্যে কেবল হিমালয় আর সাধন—এই দুটি কথা দুর্গামণি বুঝলেন। আর বুঝলেন, তাঁকে দেশে যেতে হবে, সতীশ আসবে না। এমন কোরে সতীশ পালাবে, দুর্গামণি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি আঁচলে চোখ মুছে চল্লেন। ধীরেন-বাবাজী পোঁটলা-পুটলি মুটের মাথায় চাপিয়ে একাগাড়ির পর্দ্দাটা নামিয়ে দিয়ে সতীশের মাকে ষ্টেশনে ওঠাতে সঙ্গে চল্লো।

সতীশের স্বভাবটা বরাবরই কেমন-একটু বৈরিগী-গোছের। হঠাৎ কমলাকে দেখবামাত্র রূপের নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল; এবং কমলা আসা অবধি সতীশের বৈরাগ্য-বারিধি প্রেমবারিধি হয়ে একেবারে উছলে উঠেছিল এবং ক্রমেই সংসারের কূলের দিকে তার মনের ঢেউগুলোও এগিয়ে আসছিল, এটা দুর্গামণি যেমন লক্ষ্য করেছিলেন, এমন আর কেউ নয়। কিন্তু আজ তাঁর লক্ষ্মী-বৌ কমলার চাঁদমুখটি সরে গেছে; সতীশকে নিয়ে তার বৈরাগ্য আর-একবার অকূলের দিকে ফেরবার উপক্রম করছে! ছেলের গলায় আর-একটি সংসার না ঝুলিয়ে দিলে সে পালাবে, এটা দুর্গামণি বুঝেই কমলার শূন্য আসনটি আর একটি লক্ষ্মী বৌ দিয়ে ভর্ত্তি করবার চেষ্টায় দেশের মুখে ছুটলেন—সতীশকে বোঝাবার বা দেখবার অপেক্ষা না রেখেই।

ওদিকে সতীশ কমলা-সম্বন্ধে নিদারুণ চিঠিটা পেয়েও বিশ্বাস করেনি, কমলা এতটা করবে! সে মনে-মনে ব্যথা পাচ্ছিল, কিন্তু তবু এক-এক-সময় তার ভিতর থেকে কে যেন বলছিল—যা হবার তা তো হয়ে গেল; এখন আর কেন? বেরিয়ে পড়াই

ভালো! সাধের বাঁধন যখন ছিল, তখন ছিল; কিন্তু এখন যখন সেটা আপনা-হতেই খস্‌লো, তখন বুঝতে হবে সেটা গুরুকৃপা-বলেই ঘটেছে; অতএব এই মহা সুযোগ; আর সংসারে ফেরা নয়! আবার মনে হয়, কমলা কি সত্যি দোষী? একটা বেনামি চিঠির উপরে নির্ভর কোরে তাকে চিরকালের মতো ভাসিয়ে দেওয়া কি উচিত হয়? এক-একবার সতীশ মনে করে, সবিশেষ তদন্ত করার জন্যে একবার তার কালিগাঁয়ে যাওয়াটা হিমালয় যাওয়ার চেয়ে বেশি দরকারি, কিন্তু তখনি মনে একটা ত্রাস জাগে—গুজবটা যদি সত্যি হয়!

সতীশ এমনি হিমালয় ও কালিগাঁ দুটোর মধ্যে দুলছে; আর একবার আফিস, একবার খালি বাসা, একবার গুরুর আখড়ায় যাতায়াত করছে।

ও, আর, আর, গাড়ি পাঞ্জাব-মেলে রূপান্তরিত হয়ে দুর্গামণিকে বেলতলিতে নামিয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাবার হপ্তা-খানেক হয়ে গেলেও সতীশ-ছোকরা যেখানকার সেইখানেই রইলো,—এক-পাও হিমাচলের দিকে গেল না। কিন্তু মনটি তার মুক্তির জন্যে ধড়ফড় করছে, সেটা তার মুখ দেখেই আখড়া ও আফিসের সবাই বুঝলে। ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে এলে সতীশ কোন্‌দিকে নড়বে,—উত্তর-পূর্ব্বে, না দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সেটা নিয়ে তার পরিচিতদের মহলে বাজি খেলাও চলতে সুরু হয়ে গেল—সতীশের সামনে এবং আড়ালে।

২০

সতীশ যখন এইরকম দোদুল্যমান অবস্থায়, সেই সময় ওধারে অরুণ সকালে উঠে কমলার চিঠি বুকের পকেট নিয়ে ক্ষিতীশের চায়ের টেবিলে এসে বসলো। এ-আলাপ, সে-আলাপ, খবরের কাগজ, চায়ের পেয়ালা, সিগারেটের ধোঁয়া আর বাইরের গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ও সার্সি-বন্ধ ঘরের ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যে এক-সময় ক্ষিতীশ অরুণকে শুধোলে, "এই বৃষ্টিতেই কি অরুণ দেশে যাবে?" অরুণ ঘাড় নেড়ে বল্লে—"না, একবার সতীশের সঙ্গে দেখা কোরে তবে দেশে যাব।"

ক্ষিতীশ বোলে উঠলো—"লক্ষ্ণৌ যাবে নাকি? সেখানে তো সতীশবাবু নেই। আমরা সেদিন খোঁজ নিয়ে এলেম, তিনি স্ত্রীর অসুখের ছুতো করে তাঁর মাকে নিয়ে জগদীশপুরে চলে গেছেন।"

অরুণ চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলে উঠলো—"না, আমি জগদীশপুরে যাচ্ছি সাতটা উনপঞ্চাশের গাড়িতে। দিদিকে একবার বোলে আসি।"

কমলার সঙ্গে দেখা কোরে অরুণ ফিরে এল—একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিয়ে, আর গোটা-আষ্টেক মায় দেশালায়ের বাক্সটা ডোরাটানা টুইলের কোট্‌টার পকেটে ফেলে। হরেনকে বল্লে—"হরেনদা চল্লুম।" তারপর চটি-জুতোটা চটাস্‌-চটাস্‌ করতে-করতে বেরিয়ে গেল। ক্ষিতীশ খানিক চুপ কোরে থেকে বল্লে—"অরুণ কি সতীশবাবুর দেখা পাবেন?"

হরেন বল্লে—"পেতেও পারে।"

ক্ষিতীশ খানিক অন্যমনস্ক থেকে বোলে উঠলো—"আমার কেমন মনে হচ্ছে, এ যাত্রায় অরুণও নিরাশ হবে।"

হরেন কোনো জবাব না দিয়ে আপনার মনে কি ভাবতে লাগলো।

সকাল সাতটা উনপঞ্চাশের প্যাসেঞ্জার বেলা একটায় বেলতলিতে অরুণকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। অরুণ তার ব্যাগ আর ছাতাটা প্ল্যাটফরমের সাদা কাঠের রেলিঙের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে একখানা গাড়ির সন্ধান করতে ফুটকের দিকে চলেছে, দেখলে, একদল যাত্রাওয়ালা ষ্টেশনের দুটো কেরাঞ্চি আর চারখানা গোরুর গাড়ি দখল কোরে কাগজের ফুল, সাজ-ঘরের তোরঙ্গ, হারমোনিয়ামের বাক্স ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে ফুলুট বাজাতে-বাজাতে পান চিবোতে-চিবোতে রৈরৈ কোরে চল্লো। সব-শেষে অরুণের চেনা একটা মুটে দুটো এ্যাসেটিলেন গ্যাসের বাতি মাথায় কোরে যাচ্ছিল; সে অরুণকে ডেকে বল্লে—"কালিগাঁয়ে যাবে নাকি বাবু? দেন আমার হাতে ব্যাগটা। গাড়ি পাওয়া যাবে না।"

"জগদীশপুরে যেতে হবে।" বোলে অরুণ মুটেকে ব্যাগটা দিয়ে বল্লে—"সতীশের বাসায় চল্।"

"সতীশবাবুতো নেই। বাসায় মাঠাকরুণ একলা আছেন।" বোলে মুটে হন্‌হন্‌ কোরে এগিয়ে চল্লো।

অরুণ একবার ভাবলে—তবে আর গিয়ে কি লাভ? আবার বল্লে—"তাই চল্; মা-দুর্গাকে দেখে না হয় কালিগাঁয়েই যাবো একবার।"

ভাদরের আকাশ মেঘলা হলেও বাতাসের নাশমাত্র ছিল না। তার উপর সামনে যাত্রাওয়ালাদের চল্‌তি গাড়িগুলো মেটে রাস্তায় বিষম ধূলো উড়িয়েছে। অরুণ একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে আর যাত্রার অধিকারীকে অভিশাপ দিতে-দিতে চলেছে। তার মুটে সদর-রাস্তা ছেড়ে হাঁটা-পথে কোন্‌ দিক দিয়ে কোথায় যে গেছে, তার আর দেখা নেই। এমন সময় সাম্‌নের একখানা কেরাঞ্চি গাড়ি চাকা-ভেঙে হঠাৎ রাস্তার মাঝে কাৎ হয়ে পড়লো। গাড়ির ছাদ থেকে গোটা-কতক ফুলুট ক্লারিওনেট আপনার-আপনার বাক্স ছেড়ে এবং গাড়ির মধ্যে থেকে নিজেদের আসন ছেড়ে গোটা-ছয়েক ছোকরা এবং আধা-বয়সী যাত্রার দলের বাবু পানের পিক্-মাখা সার্ট আর পম্‌সু নিয়ে ছিট্‌কে ধুলোয় পড়লো। অরুণ এই দুর্ঘটনার দিকে দৃকপাত না কোরে হন্‌হন্‌ কোরে সোজা বেরিয়ে গেল। তারপর আর-এক-সময়ে অরুণ দেখলে, রাস্তার ধারে আর-একটা ঠিকে-ঘোড়া যোত ছিঁড়ে কেবলি লাথ্‌ ছুঁড়ছে আর গাড়ির মধ্যেকার লোকগুলো কেবলি ঘোড়া আর গাড়োয়ানকে গাল পাড়ছে; কেউ বা গানও ধরেছে। এমনি নানা ঘটনার মাঝ দিয়ে, ধুলোয় আর ঘামে মিলিয়ে একটা আধ্-শুক্‌নো আধ্-ভিজে চেহারা নিয়ে অরুণ গ্রামে পৌঁছলো—বেলা সাড়ে চারটেয়।

গ্রামের একটিমাত্র রাস্তা; তারি দুধারে ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, পঞ্চাননতলা, ঠিকে-গাড়ির আস্তাবোল, ইস্কুল-বাড়ি, ডাক্তার-খানা সমস্তই—মায় একটা চেরিটেবেল্ ডিস্পেন্‌সারি—যেখানে কুইনাইনের বদলে ময়লা ময়দার গুঁড়ো দেওয়া হয়; আর একটা "জগদীশ হল ও পবলিক্ লাইব্রেরি এণ্ড ক্লব!" সেখানে প্রবন্ধ-পাঠ, বারোয়ারী

পুজো, করপোরেসন মিটিং, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গলায় মাল্যদান ও ওইদিন থিয়েটার যাত্রা বা বায়স্কোপে স্ত্রীস্বাধীনতাও কখনো-কখনো হয়ে থাকে।

অরুণ তেতে-পুড়ে এই লাইব্রেরীর গায়ে সতীশের বাড়ীর সদর দরজায় এসে দেখলে তার মুটে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণ একবার দরজাটায় নাড়া দিয়ে একটা হাঁক দিলে—"মা-দুর্গা ঘরে আছেন?"

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'তিন বার হেঁকেও যখন কারু সাড়া পেলে না, তখন মুটের দিকে চেয়ে অরুণ বল্লে—"তুই যে বল্লি, মা ঘরে আছেন?"

মুটের উত্তর হলো—"আছেন কিন্তু সকাল থেকে জ্বরে বেহোঁস!"

"এতক্ষণ বলতে হয়রে গাধা!" বোলে অরুণ দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে, বাড়ীর মধ্যে দাওয়ার উপরে ব্যাগটা রেখে, ভাড়ার পয়সা মুটের হাতে দিয়ে, অরুণ লোকটাকে একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্‌তে পাঠিয়ে ঘরে ঢুকলো।

অন্ধকার ছোট ঘরটির মধ্যে দুর্গামণি শুয়েছিলেন। অরুণ গিয়ে আস্তে-আস্তে তাঁর পায়ে হাত দিতে চম্‌কে উঠে দুর্গমণি বলে উঠলেন—"কে সতীশ?"

অরুণ তাঁর কাছে সরে বসে বল্লে—"সতীশ তো নয়, আমি এসেছি, মা-দুর্গা!"

"অরুণ!"—বোলে দুর্গামণি তাঁর রোগা হাতখানি অরুণের কোলে ফেলে শুধোলেন—"বাড়ীর সব ভালো? আমার—"বোলেই সতীশের মা চুপ করলেন। একফোঁটা জল চোখের কোণে গড়িয়ে এল।

অরুণ তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো—"তোমার বৌমা ভালো আছেন,-ভেবোনা। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল; হরেনদাদা দ্যাখে—রাস্তায় বসে কাঁদছে। সে আর তার বন্ধু ক্ষিতীশ তাকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে তাকে ভয়ানক অসুখ থেকে বাঁচিয়েছে!"

দুর্গামণি অরুণের দিকে চেয়ে শুধোলেন—"এখন বৌমা?"

"এখন দিদি আমারি কাছে আছে।" বোলেই অরুণ চাদরে একবার নিজের মুখটা বেশ কোরে মুছে নিলে।

দুর্গামণি একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"তবে সে গুজোবটা?"

"সবই মিথ্যা!" বোলেই চট-কোরে অরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আমি একবার বাইরে দেখি, ডাক্তার এল বুঝি।"

দুর্গামণির সাম্‌নে বসে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে অরুণ ডাক্তারকে সঙ্গে কোরে তবে ঘরে ঢুকলো এবার। ডাক্তারের মুখে অরুণ শুনলে, দুর্গামণির টাইফয়েড; কেউ নর্স না করলে চলবে না। এটুকুও ডাক্তার বল্লেন যে একটু দুর্নামের দরুণ পাড়ার মেয়েরা কেউ এঁর সেবা করতে রাজি নয়। ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে অরুণ বলে উঠলো—"সে কথা থাক! আজ রাতটার মতো আপনি আপনার হিন্দুস্থানী দাসীটাকে এঁর কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি আজই কলকাতা থেকে নর্স আনতে চল্লুম। আমার আসা পর্য্যন্ত আপনি এঁকে দেখবেন কিনা বলুন?"

"নিশ্চয় দেখবো!" বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

ডাক্তারকে বিদায় কোরে অরুণ দুর্গামণির কাছে এসে বল্লে—"মা, সতীশের ঠিকানাটা কি? তাকে তার কম্মতে হবে!"

দুর্গামণি বল্লেন—"সে তো তার পাবেনা; বিবাগী হয়ে কোথায় হিমালয় গেছে।"

অরুণ বল্লে—"তবে উপায়? আমি তোমার জন্যে কলকাতা থেকে নর্স আনিগে।"

নর্সের কথা শুনেই দুর্গামণি ভুরু কুঁচকে বল্লেন—"না, না, নর্স কাজ নেই! তোরা কেউ—"

অরুণ দুর্গামণির মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুধোলে—"দিদিকে আনবো মা-দুর্গা?"

"সেই ভালো!" বোলে দুর্গামণি চোখ বন্ধ করে আস্তে বল্লেন—"বৌমাকে বলিস, আমি গুজোব-কথা, বেনামি-চিঠিতে একটুও বিশ্বাস করিনি, করবোও না। সতীলক্ষ্মী আমার বৌ!"

অরুণের চোখ ছল্-ছল্ কোরে এল। সেই সময় ডাক্তারের দাসী রামদাসিয়া এসে উপস্থিত দেখে অরুণ বল্লে—"আজ রাতের মতো এই দাসীটাকে তোমার কাছে রেখে যাই; কাল দিদিকে এনে দিচ্ছি। আমার ব্যাগটা এইখানেই রইলো।"

দুর্গামণির পায়ের ধুলো নিয়ে অরুণ বেরোবে, দুর্গামণি রামদাসিয়াকে বল্লেন—"ও-ঘরে বাতাসা আর ডাব আছে, অরুণকে খেয়ে যেতে বল্।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অরুণ দু-খানা বাতাসা চিবিয়ে ডাবের সমস্তটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে সোজা আবার ষ্টেশনের দিকে চল্লো।

পব্‌লিক লাইব্রেরীর কাছটায় অরুণের বন্ধু যতীন একটা এসেটিলিনের হাঁড়া খাটাতে ব্যস্ত ছিল; অরুণকে দেখে বলে উঠলো—"কিরে কোথায় চলেছিস্? শুকনো দেখি যে! খবর কি? পড়াশুনা চলছে কেমন? আজ রাতে বারোয়ারী পুজো; যাত্রা হবে; আসিস্—বুঝলি!" এমনি নানা প্রশ্নের অরুণ একটি-মাত্র উত্তর দিয়ে গেল—"মা-দুর্গার বড় অসুখ।"

ক্রমশঃ*

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মাহাদানী

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের দপ্তরখানায় অনেক প্রাচীন কাগজ-পত্র আছে, ঐ সকল কাগজ হইতে সেখানকার রাজ্যশাসন-পদ্ধতি-বিষয়ক সকল তথ্য জানিতে পারা যায়। গ্রামের পাটীলের পাওনা হইতে পেশবার পাওনা পর্য্যন্ত গ্রামবাসীগণের সমস্ত দেনার তালিকা ঐ সকল কাগজ হইতে তৈয়ার করা যায়। বাঙ্গালা নদী-মাতৃক দেশ। প্রতি দশবৎসরেই এখানকার নদীর গতির পরিবর্ত্তন হয়, প্রকৃতির এই খাম-খেয়ালের ফলে আমাদের অনেক পুরাতন গ্রামনগরের চিহ্নমাত্রও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাছাড়া

* আগামী সংখ্যার লেখক—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এখানকার আবহাওয়াও অত্যন্ত খারাপ। এই সকল কারণেই এখানে প্রাচীন কাগজ-পত্র বেশী পাওয়া যায় নাই। মারাঠী কাগজ-পত্র হইতে জানিতে পারি, সেখানকার সমস্ত ব্যবসায়ীকেই পণ্যের জন্য কি পরিমাণ কর দিতে হইত। পেশবা-যুগে গোয়ালা-দিগকে ঘী এবং তেলীদিগকে তেলের অংশ রাজসরকারে দিতে হইত। ফিরুজ সাহ তুঘলক যে সকল কর রহিত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'রওঘন-ই-জরদ্,' হল্‌দে তেল বা ঘৃতের উল্লেখ আছে, সাধারণ তেলের উল্লেখ ত আছেই। অন্যান্য মুসলমান নৃপতি-গণের আবওয়াবের তালিকা হইতেও 'রওঘন' বাদ যায় নাই। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে এই সকল কর কি প্রণালীতে আদায় করা হইত, তাহা কোন প্রাচীন সরকারী দলীল হইতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু অনেক সময় প্রাচীন সাহিত্যে দেশের ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়। মহাকবি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নাই। পাঠান রাজত্বকালে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীর পণ্যের মূল্যের অনুপাতে কিরূপে কর আদায় করা হইত তাহার বিবরণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দান-খণ্ড হইতে সঙ্কলন করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণের প্রণয়-প্রস্তাব লইয়া বড়াই রাধার নিকট গিয়া প্রত্যাখ্যাত, ও লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছেন। কৃষ্ণ ইহার প্রতিশোধ লইতে চাহেন আবার রাধাকেও পাইতে চাহেন। তিনি বড়াইকে বলিলেন, রাধাকে লইয়া মথুরার হাটে দধি ঘৃত বেচিতে যাইও, আমি পথে মাহাদানী বা ট্যাক্স-দারোগা সাজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব; দান-কর আদায়ের ছলে তাহার পথরোধ করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিব। সেকালে পথে দাঁড়াইয়া হাট ও বাজার-গামী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এই 'মাহাদানীরা' কিরূপে কর আদায় করিতেন, তাহার একটি সুন্দর চিত্র মহাকবি কৃষ্ণ-রাধিকার বাদ-প্রতিবাদ ছলে অঙ্কিত করিয়াছেন।—

সুন্দরি রাধা শুন সমুখে
পুছো মোএঁ হৃষীকেশ।
কঁথা না রসসি কথাঁ তোর ঘর
জাইবেঁ কোমন দেশে। ল রাধা ॥ ১ ॥
গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মে না পুছহ কিকে।
ষোল শতগোপী পসার সাজিআঁ
মথুরা জাওঁ থো বিকে ॥ ২ ॥
ওলাহো রাধা মাথার চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসারা।
কোন বথু লআঁ জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারী ॥ ৩ ॥
ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসারী।
তোহ্মে না কমন কারণে কাহ্নাঞি
চাহ ইহার বিচারী ॥ ৪ ॥
তোএঁ ন জানসি মোএঁ মাহাদানী
এদান সব আহ্মারে।
ভাণ্ডে ষোল পণ দিআঁ মাহাদান
চল মথুরা নগরে ॥ ৫ ॥
বিথর কালে বিথর শুনী
হেন বিপরীত বাণী।
আনেক সমএ মথুরার পথে
ঘৃত দুধে মাহাদানী ॥ ৬ ॥

আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী
হের পাঞ্জী পরমানে।
আপন চিহ্নিআঁ দিআঁ যাহা দান
রাখহ আপন মানে ॥ ৭ ॥
পুরুবেঁ শুনী এঁ বা রাম রাজ্য
সে ভৈল কংসোর দেশে।
বসিল জনে কড়ী—
(ইহার পর ১৯।১ পাতা নাই)
—মাহাদানী এতকালে শুনী
হেন আচারিজ বাণী।
তোর জপমাত্র লাজনাহিঁ তাত্র
শুন দেব চক্রপাণী ॥ ১৬ ॥
ক্রোধে কাহ্নাঞি' রাধার অঞ্চলে
ধরি মনে মনে হাসে।
াসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৭

(শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন পৃঃ ৩৬।৩৬)।

দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি খণ্ডিত, সকল া নাই, তাই রাম-রাজ্য তুল্য কংসের জ্যেও মাহাদানী কেন হইল, দধি দুধের র আবার ভাণ্ডে ষোলপণ করিয়া শুল কেন হইল তাহার কারণ এখানে ওয়া নাই। শ্রীরাধার প্রত্যুত্তর হইতে ষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে মথুরার হাটের থ মাহাদানীর উপস্থিতি নিত্য-নৈমিত্তিক ধারণ ব্যাপার নহে এবং ঘৃত-দুধের উপর শুল লওয়াটা অসাধারণ অত্যাচার বলিয়াই রগণিত হইত। 'আবালী' গোয়ালিনীর ঞ্চল ধরাটা অবশ্য 'মাহাদানীর' আইন-ত অধিকারের মধ্যে ছিল না, তবে বৈষ্ণব বি তাহার প্রিয় প্রেমের দেবতাটিকে নেক অধিকারই দিয়াছেন, তাঁহারই বলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার এই লাঞ্ছনা। রাজ-কোষে অর্থের বিশেষ অনটন হইলেই রাজার অভাব এইরূপ মাশুল আদায় করিয়া পূরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল, এবং কোন লোকের নিকট হইতে কিছু অগ্রিম টাকা লইয়া এই মাশুল বা মাহাদান তাহাকে ইজারা দেওয়া হইত, তাহারও প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আছে।—

কিনা মোক ভৈল এতকালে।
মাহাদানী ভৈগেল গোকুলে ॥ ধ্রু ॥
অনেক কড়ীর পসারী।
হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥
রাজা কংসে করিব গোআরী।
তবেঁ কাহ্ন লেআঁ যাবোঁ ধরী ॥ ২ ॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ।
দানের সুধা নাহিঁ পাওঁ।
এবে রাজা ধনের কাতর।
চাহে যবেঁ দুধে দিবোঁ কর ॥ ৩ ॥
পুনশ্চ—
শুনত সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বাখান।
ষোল শত কুতঘাটে মোর মাহাদান ॥ ১ ॥
এবেঁ রাজা হয়িল ধনের কাতর।
পথে মাহাদানী থুয়িল হেন আছিদর ॥ ২ ॥

এবং—মোরে দান দিআঁ যাহা সুন্দরি রাধা ॥

* * * * *

অসত্য না বোলোঁ বোলোঁ সত্যপরমান
শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান

মহাদান গ্রহণের ব্যবস্থা যে সর্ব্বদা হইত না, তাহার উল্লেখ আরও দুই এক স্থলে আছে। যথা—

নিতি নিতি রাধা যাসি বিকে।
মোর মাহাদান ভাঙ্গাসি কিকে ॥ ১ ॥

নিলজ বড় গোকুলের কাহ্ন।
কোণ চিতে তোর মাহাদান ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ তোর পসার।
মাহাদান কিকে ভাগঁ আহ্মার ॥ ৩ ॥
বিথর কালে বিথর শুনী!
ঘৃত দধি দুধে বসে মাহাদানী ॥ ৪ ॥
পুছিআঁ চাহা বলভদ্র ভাই।
মোর মাহাদান তোহ্মার ঠাই ॥ ৫ ॥
কিবা পুছিবোঁ মোএঁ বলভদর।
তোহ্মাথো আধিক সে আছিদর ॥ ৬ ॥
বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী।
* * * * ॥ ৭ ॥
এ লোক ও লোক সে জন মাত্র।
সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলোএ ॥ ৮॥
বার বরিষের আহ্মার দান।
বান্ধিআঁ তোমার লইবোঁ পরাণ ॥ ৯ ॥

দেখা যাইতেছে যে বার বৎসরেও মাহাদানের তামাদি হইত না। কারণ কৃষ্ণ বারম্বারই বার বৎসরের দান দাবী করিতেছেন—

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুন তোহ্মে আলে রাধা পাঁজী পরমাণ ॥১॥
* * *
বারহ বরিষের দান শুনহ মুগধী
মোহোর করমে তোহ্মা আনি দিল বিধী ॥৩॥

মাহাদান কেবল পথে আদায় হইত না, হাটেও যথারীতি মাশুল আদায় করা হইত। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'বাটদান' 'হাটদান' উভয়েরই উল্লেখ আছে।

বাটদান হটদান লইলোঁ রাজঘরে।
তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে ॥
নিতি নিতি যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহত আহ্মারে ॥ ১ ॥
দিবেহেঁ দধির দান শুনহ গোআলিনী।
কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদানী ॥৪॥

মাহারাষ্ট্রের ট্যাক্স-দারোগারা কিন্তু কেবল দধি দুধ তেল ঘির উপর কর লইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহারা সকল প্রকার বণিকের নিকট হইতেই সকল প্রকার পণ্যের জন্যই কর আদায় করিতেন—যদি না তাহাদের সহিত ছাড়-পত্র থাকিত। বাঙ্গালা দেশেও যে বহুমূল্য পণ্যগুলি কর হইতে অব্যাহতি পাইত না, তাহাও বঙ্গীয় মহকবির অজ্ঞাত ছিল না, তাই তিনি রাধার রূপবর্ণনাচ্ছলে কৃষ্ণকে দিয়া বলাইতেছেন—

হাতে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন
আইস লে রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ॥
আহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোট দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥
মাথাত কুসুম মাল-রচনে।
এ হতে আহ্মার লক্ষক দানে ॥ ৩ ॥
চামর জিনিআঁ চিকুর তোরে।
এহার দাম দুঈ লাখ মোরে ॥ ৪ ॥
সিসের সিন্দুর ভুবন মোহে।
এহার দান তিন লক্ষ হএ ॥ ৫ ॥
নির্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ।
এহার দান চারি লাখ লেখোঁ ॥
নীল উৎপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পঞ্চ লাখ দানে ॥ ৭ ॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ ৮ ॥
শ্রবণ কুণ্ডল শোভএ তোরে।
এহার দান সাত লক্ষ মোরে ॥ ৯ ॥
মাণিক জিনিয়া দশন শোহে।
এহার দান আঠ লাখ নহে ॥ ১০ ॥

বিম্বফল তুল তোর আধরে।
নব লক্ষ দান তাত আহ্মারে ॥ ১১ ॥
কণ্ঠদেশে তোর কম্বু সমানে।
দশলক্ষ হএ এহাত দানে ॥ ১২ ॥
বাহু মৃণাল কমল করে।
এগার লক্ষ দান তাহারে ॥ ১৩ ॥
মুখ পাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিনে।
বার লক্ষ হএ এহার দানে ॥ ১৪ ॥
শ্রীফল যুগুল তোহোর তনে।
এহার দান তের লক্ষ ধনে ॥ ১৫ ॥
ত্রিবলি মাঝা বাএ হেলে তোরে।
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে ॥ ১৫ ॥
উরু তোর রাম কদলী সমানে।
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে ॥ ১৭ ॥
পদযুগ থল কমল আকারে।
ষোল লক্ষ দান তাহাত আহ্মারে ॥ ১৮ ॥
হেম পাট জিনি ..... ।
চৌষাঠ লাখ তাত মোর দানে ॥ ১৯ ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে চামর, মানিক, কম্বু, মৃণাল, শ্রীফল, হেমপাট, প্রভৃতি সকল বহুমূল্য দ্রব্যের জন্যই কর দিতে হইত। আবার মাহাদানীকে কেহ ফাঁকি দিয়া এই সকল বহুমূল্য দ্রব্য লুকাইয়া না লইয়া যায় তাহার প্রতিও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি সকলের পসরা নামাইয়া পোটলা-পুটলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতেন।

সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরীআঁ।
নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ ॥
আহ্মা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমুল ভাণ্ডার
কাঞ্চুলী খুচাআঁ লৈবোঁ তাহার বিচার ॥ ২ ॥

সুতরাং মাহাদানীরা বণিকদিগের উপর মাঝে মাঝে একটু অত্যাচার যে করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিসাব করিবার জন্য পাঁজিপুথি খড়ি প্রভৃতি সরঞ্জাম মহাদানী মহোশয়ের নিকট প্রস্তুত থাকিত।

হাতে খড়ি করী বোলোঁ মোকাহ্ন।
আইসল রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ॥

আবার রাধা বলিতেছেন—

মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞি কপট নাটে।
কংশ শুনিলে পড়ি যাইবে টাটে ॥ ১ ॥
কিমোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।
পাঁজী পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বামহাতে ॥

চণ্ডীদাস সংস্কৃত জানিতেন, সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিবার মত জ্ঞান তাঁহার ছিল। দান শব্দটি সংস্কৃত সুতরাং আপত্তি হইতে পারে যে মাহাদানী মহাশয় হয়ত হিন্দু-যুগের কোন সংস্কৃত গ্রন্থ বর্ণিত রাজকর্ম্মচারীর প্রতিকৃতি মাত্র। কিন্তু এ সংশয়ের নিরশন দুরূহ নহে। মাহাদানী শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে "ষোলগত কুত থাটে মোর মাহাদান।" এই কুতখাটগুলি পাঠান যুগের পরিচায়ক না হইয়া যায় না। কবিরা আপনাদের কাব্যে অনেক সময় সমসাময়িক সমাজের চিত্রই অঙ্কিত করিয়া থাকিবেন। চণ্ডীদাসের মাহাদানী কৃষ্ণ পাঠান-যুগের ট্যাক্স-দারোগার হুবহু চিত্র না হইতে পারেন, কিন্তু ঐরূপে হাটে ঘাটে ও বাটে পসারিণীর পসরা নামাইয়া, ভাণ্ড, প্রতি মাশুল আদায় করার প্রথা হয় বোধ চণ্ডীদাসের জীবিত কালেই প্রচলিত ছিল এবং জীবিত মাহাদানীদের আদর্শ সম্মুখে ছিল বলিয়াই তিনি মাহাদানীর কুতঘর, ভাণ্ডে ষোলপণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া একটি সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থখানি কাব্যরসিক ও ভাষ্যতত্ত্ববিদের পরম আদরের বস্তু। ইহার রুচি যতই নীতিবিগর্হিত হউক না কেন, ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত প্রত্ন-জিজ্ঞাসুরও এই গ্রন্থখানি আদর করিয়া পাঠ করিতে হইবে। আমাদের এই প্রাচীন দলীল বর্জ্জিত বঙ্গদেশের রাজ্য-শাসন পদ্ধতির মাল-মসলা প্রাচীন সাহিত্য হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। সে সঙ্কলন একেবারে নিখুঁত না হইতে পারে কিন্তু একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্যও হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চক্রে

১

ত্রয়োদশ বর্ষীয় এক বালকের সঙ্গে দালানে বাহির হইয়া আসিয়া জগদ্ধাত্রী ডাকিলেন, "বৌমা! অ বৌমা!" তাঁহার সে উচ্চ কণ্ঠস্বরে অপ্রসন্নতা বেশ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল।

শীলেদের প্রকাণ্ড চক-মিলানো বাড়ী—অন্দর-মহলের দ্বিতলে বারান্দার মোটা মোটা জোড়া থামের পাশে কাঠের রেলিং ধরিয়া একটি দশম বর্ষীয়া বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল। বাটীর গৃহিণীর ডাক শুনিয়া সে মেয়েটি ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার পরিহিত পাঁচপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীর প্রান্তটুকু তাহার মাথার খাটো চুলের উপর ঢাকা ছিল, তাহা সেই রূপই রহিল, আর বেশী বাড়িল না। বালিকার ক্ষুদ্র ললাট ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত হইল, সে তীব্র চঞ্চল নেত্রে শাশুড়ীর সমভিব্যাহারী বালকের পানে বারেক কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"

"আজ আবার তুমি বিনুর গায়ে হাত তুলেছ? দেখ দেখি, বাছার মুখখানা আঁচড়ে পিঁচড়ে কি করে দিয়েছ! ছি ছি ছি! তোমায় যত বলি, যত শেখাই, কিছুতেই কি তুমি কিছু শিখবে না বাছা? এমন করলে আমি তোমায় কি করে পেরে উঠ্‌বো!"

তিরস্কৃতা বধূমাতা বারেক তাচ্ছল্য-ভরে স্বামীর মুখের উপর নিজের কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিয়া লইল। সদ্য নখক্ষত তখনও রক্ত-সরস রহিয়াছে। দেখিয়া সে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না, বরং তীব্র রোষে জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "আহা গো! আমিই যেন শুধু ঐ রকম করে দিয়েছি, ওঁর কচি খোকা ছেলেটি যেন কিছুই করেন নি! এই দেখ না, আমার পিঠে বুকে খামচে ছাল তুলে নিয়েছে, কে,—কে?" এই বলিয়া সে সত্য সত্যই এমন এক প্রমাণ বাহির করিয়া দেখাইল, যাহার পর বিচারককে বিচারের ধারা উল্টাইয়া দিতেই হয়!

"হ্যাঁরে হতভাগা, তুইও তো ওকে মেরেছিস্ খুব, দেখ্, দেখি, খুনে কোথাকার!" মাতার সহানুভূতি পাইয়া পুত্র এতক্ষণ রোরুদ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতেছিল, এখন

মায়ের সহানুভূতির গতি সহসা পরিবর্ত্তিত দেখিয়া নিজের দিক্‌টাকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দন-বিজড়িত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিয়া সে বলিল, "ও যে আমায় আগে মেরেচে, তার বেলায়—?"

"মিথ্যুক! মিথ্যুক! আমি আগে মেরেচি! না মা, ওর সব মিথ্যে কথা! তুমি শুনো না। ও আগে আমার চুল ধরে টেনেছিল,—এমন জোরে টেনেছিল,—যে আর-একটু হলেই আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যেতুম।"

"ইস্! চুল ধরে টান্‌লে নাকি আবার কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে যায়! মুখ থুবড়ে যে পড়ে,সে তো ধাক্কা খেলে! শুন্‌চো মা, কার কথা মিথ্যে—নিজের কানেই তুমি শুন্‌তে পাচ্চো! তা আমি তো আর খুব জোরে চুল ধরে টানি নি—ও কেন আমার মুখে অত জোরে আঁচড়ে দিলে? উঃ! যা জ্বালা করচে—"বলিয়া বালক আহত স্থানে হাত বুলাইল।

ইহা দেখিয়া মা বলিলেন, "সত্যি বাছা, তুমি একেবারে মুখখানায় কিছু রাখোনি! মেয়েমানুষের অত দম্ভিপনা কেন?"

বধূ এইবার কান্নায় ক্রোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সগর্জ্জনে উত্তর দিল, "ও তোমার আপনার ছেলেটি কি না, তুমি তো ওর দিক টানবেই! ও যখন আমার চুল ধরে টান্‌লে, তখন বুঝি কিচ্ছু দোষ হলো না?—হ্যাঁ, ত দোষ সব আমার বেলায়!"

"তুই কেন আমার কলম ভেঙ্গে দিলি, াক্ষুসী?"

"খুব করেছি। তুই আমার কাপড় ছিঁড়ে দিস্‌নি?—হ্যাঁ, এতক্ষণ মাকে সে কথা বলিনি বলে,—না? এই দেখ না মা, আমার কাপড় শুকোচ্ছিল, এই থেকে কতখানি ছিঁড়ে নিয়ে কালি মোছা হয়েছে,—তাই তো আমি কলম ভেঙ্গে দিয়েছি। বেশ করেছি—আবার দেখতে পেলেই দেব।"

"আমিও তো তাই চুল ধরে টেনেছি—এবার এমন চুপিচুপি পেছন থেকে এক টান দেব সুবিধে পেলেই যে, ধপাস্ করে পড়ে সখের সব চুড়িগুলি মুড়্‌মুড়্ করে ভেঙ্গে যাবে। দেখবে তখন মজা!"

"তবে আমিই বা মারবো না কেন?"

"মা, আমিও বলে রাখ্‌চি, এবার ওর যত কাপড় আছে সব আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে রেখে দেবো, ওর চুল কেটে নেব, ওর পিঠের চামড়া বেতের বাড়ী তুলে নেব, তবে আমার নাম!"—এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ঠাকুরাণীর সেই বিনয় নামধারী পুত্রটি মহাবেগে বোধ করি বেত্রান্বেষণেই প্রস্থান করিল। তখন অপর-পক্ষও মহা আস্ফালনে আততায়ীর বিরুদ্ধে কিরূপে শোধ তোলা যাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থায় জিহ্বায় একেবারে মা সরস্বতীর বৈঠক বসাইয়া দিল। সে তাহার বইয়ে আগুন ধরাইয়া দিবে, ঘুড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে, দোয়াত ভাঙ্গিয়া, আরও কত কি করিয়া তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মাষ্টারের নিকট মার খাওয়াইয়া যে নিজের নাম রক্ষা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহিণী আর কি করিবেন? তিনি অগত্যা একটু হাসিয়া "দুটোই সমান জুটেচে" বলিয়া বধূর দিকে একটা হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন, "আয় পাগলি, আয়। আমার পাকা চুল তুলে দিবি, আয়—"

"হ্যাঃ আমি দিলুম তো! কেন আমি তোমার পাক্কাচুল তুলে দেব? তুমি কি আমার মা? তুমি যার মা, তাকে তোমার চুল তুলে দিতে বলোগে না, সে দেবে এখন! আমি আমার বাবার চুল তুলে দেব, তোমার তো দেব না,—তুমি ভারী একচোখি!"

"হারামজাদির মুখ দেখ! কি এক-চোখোমি করেছি রে ক্ষ্যাপার বেটি? নে, আয়, এখুনি আবার দুটোতে লেগে যাবে। একদণ্ড যে চোখ বুজে শোব, সে তো হবার যোটি নেই! কাল থেকে দুটোকে দু'ঘরে দোর বন্ধ করে রেখে দিয়ে তবে নিজে শোব। দাঁড়া না।"

"আমি কাল ভাত খেয়েই সইমাদের বাড়ী পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে-টিপে না এসে—"

"আচ্ছা, এখন তো আর নয়,—সে তখন যা হয় করিস্। কি মেয়েই যে তুই হয়েছিস্, উর্ম্মিলা! লোকে কি বল্‌বে, বল্ দেখি? লোকেদের বউরা কেমন শান্ত লক্ষ্মী, আর তুই দিন দিন যেন ধিঙ্গি হচ্ছিস্!"

"বেশ করচি, ধিঙ্গি হচ্ছি। তুমি ওদের লক্ষ্মী বউ একটা চেয়ে নাও না বাবু, এতই যদি ভাল লেগে থাকে। আমায় না হয় দূর করে দাও বাড়ী থেকে।

"বালাই! ষাট্" বলিয়া স্নেহময়ী শাশুড়ী হাসিতে লাগিলেন। বধূর ধিঙ্গিপদ-প্রাপ্তির আসল হেতুই যে ঐ সর্ব্ব-অপরাধ-সমর্থনকারী সর্ব্বনেশে হাসি, এটুকু জানা থাকিলেও ইহাকে পরিহার করিতে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। বালিকা বধূর তাই এত প্রশ্রয়!

২

রাত্রে শয়ন-মন্দিরে মায়ের দুই পাশ দু জনে অধিকার করিয়া শুইত। সে রাত্রেও তাই হইল। বিনয় মায়ের গলা জড়াইয়া মাকে নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, উর্ম্মিলাও তদনুকরণ করিতে যাওয়ায় সে তাহার হাতটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "খবরদার, আমার মার গায়ে হাত দিস্‌নে, দিলে তোর হাত ভেঙ্গে দেব।"

উর্ম্মিলা এ শাসনে অভ্যস্ত; সে নির্ভয়ে উত্তর দিল, "ইস, ওঁর একলার মা কি না!"

"একলার না তো কি? তুইই তো তখন বলেছিস্, আমি মার আপনার ছেলে—তাহলেই হলো না, মা তোর পর?"

"হ্যাঁ, হলো বই কি! কক্ষনো হলো না,—হ্যাঁ মা, হলো মা? তুমি ওর একলার মা, মা? আমার মা নও?"

জগদ্ধাত্রী বধূকে নিজের বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "নাঃ, কে বলে,—আমি তোদের দুজনকারই মা।"

"শুন্‌তে পেলে! মা তুমি কাকে বেশী ভালবাস মা?"

মা পুনরায় সেই রকম পরম পরিতুষ্ট স্নেহের হাসি হাসিলেন, উত্তর দিলেন—

"দুজনকেই সমান ভালবাসি রে।"

বিনয় সদম্ভে কহিল, "উঁহুঃ, তোমার মনে নেই মা, তুমি আমাকেই ওর চাইতে একটুখানি বেশী ভালবাস। সেই যে আমার অসুখের সময় তুমি দিন-রাত আমার কাছে থাকতে, কেবলি হরিকে ডাকতে—

ওর কাছে শুতে না, আমি ভাল হলে কত সন্দেশ বাতাসা হরির লুট দিয়ে ছিলে!"

মা শুধু একটু হাসিলেন। কিন্তু অংশীদারটি এ অপমান সহ্য করিল না, সেও তেমনি আগ্রহে আর একটি উদাহরণ বাহির করিল।

"আমার পান-বসন্তর সময় ডাক্তারবাবু মাকে আমার কাছে আসতে বারণ করেছিলেন, মা কি তা শুনেছিল? তোমার তো শুধু জ্বর, সে তো দোষের নয়, আমার কাছে তবু মা দিন-রাত থাকতেন, থাকতে না তুমি মা?"

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "তা থাকবো না বাছা, তোমার মা বাপ কেউ কাছে নেই,—আমিই তো এখন তোমার মা। সে মা যা করতো, আমি কি তা না করে থাকতে পারি! উঃ, যা অসুখ করেছিল—পোয়াতির বাছাকে যে শীতলা শেতল করে দিয়েছেন, এই আমার মহাভাগ্যি!" জননী কৃতজ্ঞতা-গদ্‌গদ স্বরে এই বলিয়া সেই রক্ষাকারিণী দেবীর উদ্দেশে দুই হাত যোড় করিয়া নিজের ললাট স্পর্শ করিলেন। তা দেখিয়া তাঁহার এই দুটি সন্তানও তাঁহার অনুকরণ করিল এবং এই আকস্মিক দেব-ভক্তির অতর্কিত আবির্ভাবে উভয়ের চিত্তেই কেমন করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে একটা যেন শান্তি রসের প্রবাহ বহিয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পরকে হঠাইতে পারা সম্ভব নয় দেখিয়াই হোক, অথবা যে জন্যই হোক, একটা মধ্য পথ অবলম্বন করিল। বিনয় কহিল, "আয় তবে, আজকের মত দুজনে ভাব করি—বল্ ডাব—"

"ডাব।"

"তোর সঙ্গে আমার ভাব। মা, এবার একটা গল্প—"

'ভাবে'র প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধ করি ইহাই। ঝগড়া চলিলে গল্প শোনায় বাধা পড়ে। তা এমন ঝগড়া ও ভাব তাহাদের এই বিবাহিত দুইটি বৎসর ব্যাপিয়া নিত্যই চলিতেছে। কতবারই গাড়ী ডাকিয়া আড়ি হয়;—কতবারই ডাব আনিয়া ভাব হইয়া যায়। তা তাহারা তো দুটি কচি ছেলে,—সমস্ত সংসারই তো এইরূপ সন্ধি-বিচ্ছেদ মিলন-বিরহান্তক!

৩

বিপিনবিহারী শীল দেশের মধ্যে একজন বিশেষ গণ্য-মান্য বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার চালানী ও তেজারতির মস্ত কারবার। তাছাড়া সামান্য কয়েকখানি তালুক ইত্যাদিও আছে। ঘরে ছেলেদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিক কালের অধিকাংশ পিতার ন্যায় তিনিও ছেলেদের স্কুল-কলেজে লেখা-পড়া শেখানোর পক্ষপাতী হইয়া পড়ায়, বড় ছেলেটি প্রথমে কলিকাতা-বাসী হয় এবং পরে পিতার বিনানুমতিতে বিলাত পর্য্যন্ত পলাইয়া গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া কলিকাতাতেই প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়াছে। রাগ-ঝঙ্কার করিয়াও পিতা তাহার খরচ চালাইতেছেন। বিদেশে গিয়া যে সদভ্যাসটি তিনি করিয়া আসিয়াছেন, নিজের উপার্জ্জনে তাহারই খরচ আঁটে না! ছোট ছেলে বিনয়কুমারের উপর আশা-ভরসা ইহাদের কোনদিনই বেশী ছিল না, এখন আরও একটু কমিয়াছে। বড় ছেলে বিলাতে বসিয়াই

জনৈক মালবার-শোণিত-মিশ্রিত ইউরেশিয় কন্যা বিবাহ করিয়া বসিলে, দশ বৎসরের ছোট ছেলে বিনয়কুমারের এখানে এক সাত বৎসরের স্ব-ঘরের মেয়ের সহিত শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করানো হয়। আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত নায়ক-নায়িকাই এই শুভবিবাহে সম্বদ্ধ দম্পতী, বিনয়কুমার ও উর্ম্মিলা।

দশটা বাজিলে স্নান সারিতে বাটীর মধ্যে আসা বিপিনবিহারীর চিরন্তন নিয়ম। তা ঘড়িতে সেই দশটা বাজিতে না বাজিতেই পুত্রবধূ উর্ম্মিলাসুন্দরী সেই বাহিরের বৈঠক-খানা ঘরে দর্শন দিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "ওগো বাবা, আজ কি তোমার চান করবার সময় হবে না নাকি গো?"

এই রকম সে প্রায়ই ডাকিতে আসে। বারণ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

বিপিনবাবু তখন চোখের উপর চশমা লাগাইয়া কি সব কতকগুলা পুরাতন হিসাবের কাগজ-পত্র-পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; সাম্‌নে এক তাড়া খেরো-বাঁধা খাতাপত্র বিছাইয়া তেজারতির গোমস্তা বসিয়া; বধূ-ঠাকুরাণীর সশব্দ আগমন ও সদর্প আহ্বান-শব্দে কুণ্ঠিত হইয়া সে বেচারী মাথাটা একটু হেঁট করিল। চব্বিশ ঘণ্টাই শুনিয়া শুনিয়া কর্ত্তার অভ্যাস, তাই এ ডাক তাঁহার কানে পশিলেও মনে পৌঁছিল না। তিনি দুইটা সই ঠিক এক রকম দেখাইতেছে কি না, একমনে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইতে লাগিলেন।

"বাবা! বলি, ও বাবা, ডাকচি, তা কথা কইছো না যে বড়? শুন্‌তে পাচ্ছনা, না কি?

"বিপিনবাবু অর্দ্ধ-অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "অ্যাঁ? কিরে পাগ্‌লি?"

"মা—গো! এতক্ষণ পরে বলা হলো কিনা,—কিরে পাগ্‌লি! চান-টান করতে হবে না বুঝি আজ?"

"হ্যাঁরে, হবে বই কি। এই যে যাই।"

জবাব দিয়া বৃদ্ধ যথাকার্য্যেই ডুবিয়া রহিলেন। তখন উর্ম্মিলা বিশেষ রাগিয়াছে, সে দরজায় ধাক্কা দিয়া একটা চমকপ্রদ শব্দ করিয়া সরোষ গর্জ্জনে চেঁচাইয়া উঠিল, "বাবারে বাবা! ছেলে যেন একজামিনের পড়া পড়চেন! এই চল্লুম আমি, থাকো তুমি তোমার বই নিয়ে বসে।" বিপিনবাবু তটস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ খাতাপত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভৎর্সিত বালকের মত করুণ কণ্ঠে প্রস্থানোদ্যতা বালিকা বধূর পানে চাহিয়া ডাকিলেন, "ওরে, না রে না, যাস্‌নি, যাস্‌নি—এই যে আমি উঠেছিরে! ওহে গোষ্ঠ, তুমি ওসব এখন তুলে টুলে রেখে দাও। এরপর এক সময় ওসব নিয়ে আবার বসা যাবে এখন, এখন আর হচ্চে না, আমার ছোট্ট-মা-টি এখন বেজায় ক্ষেপেছে।"

উর্ম্মিলা চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে শ্বশুরের মন্তব্যটুকু কানে ঢুকিতেই সদ্যস্নাত স্কন্ধবিলম্বী ভিজা চুলের রাশি নাড়া দিয়া ঝাঁকিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আবার বলা হচ্চে,—ক্ষেপেছে! ক্ষেপবে না তো কি? সেই কখন্ থেকে ডাকাডাকি করে গলা ফাটাচ্চি—বলতো, রাগ হয় না, বুঝি?"

বিপিনবিহারী চটি জুতা দুইটার মধ্যে পা গলাইতে গলাইতে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,

"আয়তো দেখি, গলাটা কতখানি ফাট্‌লো? কৈ, কোথাও দেখতে পাচ্চি না তো!" এই বলিয়া হাসি-হাসি-মুখে সমীপবর্ত্তিনী বধূর কণ্ঠ-মালা-পরা কণ্ঠের দিকে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং অল্প-একটু মাথা নাড়িয়া যেন আত্মগতভাবেই কহিলেন, "হায়রে, ও শানায়ে গলা না কি আবার ফাটবে!" মন্তব্য শুনিয়া উর্ম্মিলা খিল্ খিল্ করিয়া এবং বৃদ্ধ গোমস্তা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিল। উর্ম্মিলা শ্বশুরের হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া বলিল, "যাও, তুমি বড্ড দুষ্ট হয়েছ। অমন করে কথা বলো ত তোমার সঙ্গে আড়ি দেব, তা কিন্তু বলে রাখচি।"

"তা হলে আমি যদি বসে কাঁদি?" বিপিনবিহারী ততক্ষণে বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ বারান্দা দিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। উর্ম্মিলা শ্বশুরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বৃদ্ধ-বালকটির মুখে সেই সঙ্গিন্ উত্তর শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং দুষ্টামি-মাখানো সমস্ত মুখখানিকে তাহার এক মুহূর্ত্তেই গভীর করুণামণ্ডিত স্নেহে উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণনেত্র শ্বশুরের মুখে স্থাপন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, বাবা, তুমি কেঁদো না। একটুও কেঁদো না। আমি কি কখনও তোমার সঙ্গে আড়ি করে থাকতে পারি? তুমিই বল তো, পারি কি? সে বরং মার সঙ্গে হলেও হতে পারে, তোমার সঙ্গে হবে না।"

বিপিনবিহারীর চোখের কোণগুলা হঠাৎ যেন সত্যকার বালকের মতই তাঁহার এই ক্ষুদ্র মায়ের এই সান্ত্বনা-স্নেহ-প্রকাশে আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনিও নিবিড় স্নেহভরে ভিন্ন নীড়ের ক্ষুদ্র পাখীটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার চুলের উপর নত হইয়া চুম্বন করিলেন; তারপর মমতা-মথিত মৃদুকণ্ঠে কেবল মাত্র কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন, "তুমি যে আমার মা!"

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে বাটীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বাবুকে আসিতে দেখিয়া বাবুর চাকর মধু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তেলের বাটি ও তেল-ধুতি-হাতে ছুটিয়া আসিল। তখন শীতকাল, রৌদ্রে সেবিত বারান্দায় ছোট একটি পাটি পাতিয়া তেল-মাখা বিপিনবাবুর নিয়ম। গড়গড়ায় তামাক সাজা ছিল, আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আগুন ঈষৎ নিষ্প্রভ। উর্ম্মিলা সেদিকে বারেক চাহিয়াই মধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ও তামাক সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা, তুই শীগগির এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ বাবুকে তেল মাখাই।"

বলিয়া তেলের বাটি টানিয়া লইয়া শ্বশুরের পায়ের খানিকটায় সে তেল মাখাইয়া দিল। মধু কি বলিতে যাইতেছিল, উর্ম্মিলা বাম হাত নাড়া দিয়া অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, "না, ও পুড়ে গেছে। তুই ভাল করে সেজে নিয়ে আয় গে যা।"

এই ক্ষুদ্র মনিবটীর হুকুম যে কত-বড় অলঙ্ঘ্য মধুর, মধুর তাহা ভালোরূপই জানা ছিল, সে অসন্তুষ্ট হইলেও আর দ্বিরুক্তি করিল না। কলিকাটা উঠাইয়া লইয়া অপ্রসন্নতা-ব্যঞ্জক সশব্দ চরণে চলিয়া গেল এবং ফিরিতেও যথা-সাধ্য বিলম্ব করিয়া প্রতিশোধ তুলিবার চেষ্টা করিল।

মধু দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে খশুরের নগ্ন পিঠের উপর তেলমাখা হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বধূ ডাকিল, "বাবা!"

বিপিনবাবু তখন তামাকের তৃষ্ণায় ঈষৎ বিষণ্ণ। মুখের নিকট প্রসারিত চুম্বন-প্রয়াসী আলবোলার নল মুহুর্মুহু সাদরে আহ্বান করিতেছে—অথচ প্রেয়সী প্রাণময়ী নহেন! অন্যমনস্কভাবে তিনি উত্তর দিলেন, "মা!"

"সত্যি, বাবা?"

"কি মা?"

উর্ম্মিলা একটু ইতস্তত করিল, পরে বলিল, "এই যে তুমি বল্লে?" বিপিনবিহারী ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লুম, রে?"

"মাগো! তুমি বড্ড ভুলে যাও! এই এখুনি বল্লে না?"

"হ্যাঁ বলেছি তো রে! তবে বুড়ো হয়েছি কি না, তাই কি যে বলি, মনে থাকে না। তবে আর মা হয়ে কি হলো, যদি বুড়ো ছেলের ভুল-টুলই না শুধরে দিবি!"

উর্ম্মিলা মুখের আপ্রান্ত কল্যাণময় স্নেহ-হাস্যে মণ্ডিত করিয়া জোরে জোরে পিঠের উপর তৈলাক্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ঐ কথা! ঐ কথাটা কি সত্যি বাবা?"

"কই, কোন্ কথা রে?"

"আঃ, বড্ড বোকা তুমি!" এই বলিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াই হঠাৎ বিনীত ও কোমল কণ্ঠে সে ঈষৎ যেন লজ্জার সহিত পুনরায় প্রশ্ন করিল, "সত্যি কি আমি তোমার মা হই?"

বিপিন বাবু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোন একবার কথা! মা হয়ে আবার বেটি বলে কি না, সত্যিকারের মা হই? মা বুঝি কারু আবার মিথ্যেকারের হয়?"

উর্ম্মিলা এই উত্তরে অত্যন্ত খুসী হইল। আনন্দাতিশয্যে যে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খুব খানিকটা তৈল লইয়া সেই সদ্য-সাব্যস্ত হওয়া বৃদ্ধ ছেলের সঙ্কীর্ণ পৃষ্ঠে সে চাপড়াইয়া দিল। বিপিন বাবু হাসিয়া কহিলেন, "মাগো, আবার কি আমায় তুই তেলে-রোদে শক্ত করছিস মা? কত তেল ঢালছিস্, বল্ দেখি?"

তখন নিজের কীর্ত্তি চোখে পড়িতে লজ্জা পাইয়া মা-ঠাকুরাণী ছেলের সেই তৈল-সিক্ত পিঠের উপরই নিজের লজ্জিত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল, এবং এই উপায়েই তাঁহার পিঠের তিনভাগ তেল বধূর মুখে মাথায় ও কাপড়ে উঠিয়া আসিয়া উহাকে রক্ষা করিল। এদিকে ততক্ষণে তামাক সাজিয়া মধুও আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

আলোর পাথার

কে রাজালে মাঝ-দিনে আজ প্রহর-রাতের সুর সাহানা!
শঙ্খ-গৌর মেঘের মেলায় শঙ্খ-চিলের মিলায় ডানা।
জর্দ্দা-কাঠির গম্বুজেতে ময়না জেগে স্বপ্ন দেখে,
শিউলি-ফুলি হাওয়ায় ভেসে ঘাসের ফুলে ফড়িং ঠেকে!

গাছের গোড়া গোল্‌টি ক'রে নিকিয়ে ছায়া ছায় নিভৃতে,
সেই চাতালে রাখাল আসে একটুকু গা গড়িয়ে নিতে।
জলের তালে দুল্‌ছে মাঝি বাঁধা নায়ের ছই-তলাতে,
টুন্‌টুনি ধায় একলা কেবল করমচা-ডাল টল্‌মলাতে।

পালান্-ছোঁয়া শাঁওলা ঘাসে বাছুর গোরু চর্‌ছে পালে,
নাড়িয়ে দু'কাণ তাড়িয়ে মাছি লোটন্ ল্যাজের ছেপ্‌কাতালে,
দীঘির জলে রূপোর ঝিলিক দেখ্‌ছে ব'সে মাছরাঙা সে,
ঢল্-নামা জল থিতায় গাঙের যায় ভাখা তার পাড়ভাঙা যে।

পতর্-আঁটা গতর নিয়ে চল্‌ছে গেতো বোঝাই ভরা,—
মাঝাই বেলার গোড়েন্ সুরে গোড় দিয়েছে নেইক ত্বরা।
দূর কিনারায় পাঁজর-খোলা মেরামতের নৌকোখানা
প'ড়ে প'ড়ে খেয়াল ভাখে বন্যাদিনের প্রলয় হানা!

চরের পরে ঝিমায় কাছিম, চোখের পাতে মোতির দানা,
পিঠেতে তার ঝিমায় ব'সে শামুক-খুলি পাখীর ছানা।
মরালী ধায় লহর তুলে মরাল তাহার ফেরে পাছে,
দোলন্-চাঁপার নিথর মোহে মগজটা তার ভ'রে আছে।

মাজা আলোয় সাজন সাজে, বিজন গেহে মুগ্ধ চোখে,—
বাজন বাজে বুকের তালে,—আয়নাতে মুখ দেখ্‌ছে ও কে!
আতর-ভরা চাওনি দিয়ে আপ্‌নাকে ও বরণ করে,
চাঁপাই আলো সাতঝরোকায় ঝাঁপায় রে ওর চরণ পরে।

আলোর আতর খিতিয়ে বুঝি এই অপরূপ রূপ পেয়েছে,
রূপের ধূপের সৌরভে আস্‌মান ছেয়েছে প্রাণ ছেয়েছে,
আস্‌মানে আর পরাণে আজ সোনার পোড়েন্ সোনার টানা,
শুক্তি-ধবল মেঘের মেলায় হংস-মিথুন মিলায় ডানা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রিয়ার উদ্দেশে*

যাক্ সব চুকে গেছে। আমার কল্পনা-প্রবণ মস্তিষ্কে সেটা শুধু একটা স্বপ্নের মত জেগেছিল। পরস্পরের কাছে আমাদের বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে—আর কিছু তোমায় জানাই নি। কতবার বলি-বলি করে বলা হয় নি—প্রতি সন্ধ্যায় তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে নিজেকে শত রকমে দোষী করেছি, সারা রাত ধরে ভেবেছি, আবার যখন দেখা হবে, তখন কেমন করে তোমার কাছে সব কথা গুছিয়ে বল্‌ব। কিন্তু রাতের আসা-যাওয়ার ত একটা শেষ আছে। তোমার সঙ্গে মিলনের শেষ সন্ধ্যা কেটে গেছে। কিন্তু তোমায় কিছুই বলিনি। কাল যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবো, তোমার সঙ্গে প্রথম মিলনের দিন যেমন অচেনা ছিলুম, অপরিচয়ের সেই সমস্ত ব্যবধান আবার আমাদের মাঝখানে জেগে উঠবে।

আমার মনে হয় হয়ত তুমি আমার মনের কথা সব বুঝেছ। তুমি না জানলে কি আর তোমায় এত ভালবাসতে পারি! কিন্তু না—তোমায় যে কিছু বলিনি তাই ভেবে আমি খুব খুসী হয়ে উঠছি। কোন্ অধিকারে তোমায় ভালবাসা জানাব—নিজের জীবনের 'পরে যার কোনো হাত নেই—মাসের শেষে বাঁচ্‌ব কিনা তাই জানি না! এ সব জেনে-শুনেও কোনো মেয়েকে ভালবাসা জানাতে যাওয়া আমার কাছে নিতান্ত অপৌরুষেয় বলে মনে হয়।

কথাটাকে নিজের কাছে বেশ স্পষ্ট করে নিতে চাই, যাতে সেটা কাঁটার মত সময়-অসময়ে মনের মাঝে না বাজে, কাজের বিঘ্ন না ঘটায়! ধর, তোমায় আমার প্রেমের কথা জানাতুম আর তুমি যদি আমার ভালবাসাকে বরণ করে নিতে—তার ফল হতো কি? সে ত কেবল দুঃখ! যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুজনে একত্র হতে পারতুম না, আর এই সুদীর্ঘ সময় তোমার কাছে কত নিঃসঙ্গ কত নির্জ্জন মনে হোত। তুমি কেবলই ভাবতে, কেমন করে আমি ভাল থাক্‌ব, নিরাপদে থাক্‌ব! অথচ ভাবনাই সার হোত। আমি যদি আহত হতুম, তুমি আমায় মৃত মনে করে

* Love of an Unknown Soldier—Published by John Lane, London.

নিজের জীবনকে সর্ব্ব-গৌরব-বঞ্চিত মনে করতে। আমি আহত হলে তুমি ত আর আমার কাছে থাকতে পেতে না—তোমার তো নিজের একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে, প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য আছে—সুদূর মার্কিন থেকে এসে তোমরা যে অসহায় ফরাসী শিশুদের সেবার ভার নিয়েছ! তার পর ধর আমি হয়ত বিকলাঙ্গ হতে পারি—ফরাসীর পক্ষে যুদ্ধের আঘাত-চিহ্ন তার প্রসাধন—আত্মোৎসর্গরূপ নব ধর্ম্মের সে যে বিগ্রহ। আমাদের কাছে কিন্তু তা একেবারে বীভৎস। বিকলাঙ্গ লোককে সারা জীবনের সঙ্গী করে নেবার দুঃখ দেবার মত হীনতা আমার নেই—আর সত্যি বলতে কি, রোজ তুমি আমায় দেখে অন্তরে অন্তরে কষ্ট পাবে, তা আমি কোন্ চোখে দেখ্‌ব? শেষ কথা এই, যুদ্ধে আমি মরতেও পারি—তারই বা ঠিক কি? যদি তোমায় বিয়ে করতুম, তাহলে সর্ব্বসুখ থেকে বঞ্চিত করে তোমার জীবন কেবল ব্যর্থতায় ভরিয়ে তুলতুম! না, তোমায় ভালবাসার কথা যে কিছু জানাই নি, তাই ভেবে আজ আমি বড় খুসী।

আবার দেখ—যদি বা মুখ ফুটে বলতুম, তুমি হয়ত আমার উপর বিরক্ত হতে, রাগ করতে, আমায় প্রত্যাখ্যান করতে; কারণ আমি তার চেয়ে বেশী পাবার মোটেই উপযুক্ত নই। তোমার পক্ষে আমায় প্রত্যাখ্যান করাটাই উপযুক্ত হোত, কারণ যুদ্ধের সময় এই রকমের বাগ্‌দান, এই সব তাড়াতাড়ি বিয়ে, আমার কাছে ভারি বিসদৃশ ঠেকে—এগুলোকে আমি একটুও বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু যতই বলি—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে কে যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে! যৌবনের প্রথম জাগরণের সমস্ত চাঞ্চল্যকে একটা 'না' দিয়ে নিরস্ত করি কেমন করে? না, এ সব নিয়ে আর ভাব্‌ব না—ভাবতে গেলে মন একেবারে বিরস হয়ে ওঠে!

এখনও কিন্তু তোমায় বলবার সময় আছে! শুধু টেলিফোনের রিসিভারটা উঠিয়ে নিয়ে তোমায় বলা—আচ্ছা, যদি বলি—তুমি তা হলে কি জবাব দাও? বিবাহ-প্রস্তাবের একটা অদ্ভুত উপায় বটে! রাত দুটোয় জেগে উঠে প্রেতের মত একটা ক্ষীণ গলার আওয়াজ শুনছি—আপনি অমুক—? আজ সারা সন্ধ্যেটা যে আপনার সঙ্গে ছিল, আমি সেই লোক—শুধু আজ সন্ধ্যে কেন, প্যারিসে ছুটীতে এসে যত সন্ধ্যে কাটিয়েছি—আমি যে আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছি, সে শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে—আপনি কি আমায় বিয়ে করতে পারেন?

এ জীবনে যা কিছু হতে পারত তা আর ভাব্‌ব না—স্মৃতিই শুধু আমার কাছে প্রিয় হয়ে থাক্। মাটীর নীচে স্যাঁতা ট্রেঞ্চে ব'সে শীতে যখন মনটা নিরানন্দ হয়ে উঠবে, তখন গত দিনের সুখ-স্মৃতিটুকু কত প্রিয় হয়ে উঠবে! তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের পরীর গল্প রচনা করে নিজেকে শোনাব—তোমার সঙ্গে দেখা করবার কথা দিয়ে কেমন করে ঘটনাচক্রে সে কথা গেঁথে রেখেছি, সেই গল্প।

মাস কয়েক আগেকার—সে রাত্রের কথা কি তোমার মনে পড়ে? যুদ্ধে আহত

হয়ে ব্রিটিশ মিশনে আমি আমেরিকা গিয়েছিলুম। তার কিছুদিন আগে আমেরিকা আমাদের দলভুক্ত হয়েছে। ট্রেঞ্চের মধ্যে মানব-আত্মার গৌরব ব্যাখ্যা করাই ছিল আমার কাজ। বক্তৃতার শেষে হলটা যখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে, কে একজন, তোমায় নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। শুনলুম যুদ্ধের অত্যাচারে যে সব শিশু নিঃসহায় হয়েছে তাদের সেবার ভার নেবার জন্যে তুমি একদল মেয়ের সঙ্গে ফ্রান্সে যাত্রা করছ। তোমার চোখের পানে চাইলুম। কি দেখলুম? সে রহস্যময় দৃষ্টি আমি কোনোকালে ভুলতে পারব না—আমার সামনে তুমি দাঁড়িয়েছিলে—দীর্ঘ, ঋজু একটি তন্বী, গোলাপের সরু ডালের উপর ছোট একটি কুঁড়ির মত—পাপড়িগুলো তখনও যেন ভাল করে খোলে নি। যুদ্ধে যে সব গ্রাম ও নগর নষ্ট হয়ে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে তাদের কথা আমি বেশ জানি—এই ধ্বংসের কাজে আমিও অনেক সাহায্য করেছি। কামানের গোলার ঘায়ে মাটি ফেটে যে-সব গর্ত্ত হয়েছে, তার মধ্যে এখনও কত শত শব পচছে। কিন্তু সে ছবির মধ্যে সেই বিকট বীভৎসতার মধ্যে তোমাকে দাঁড় করাতে পারলুম না—তোমার সুকোমল সুললিত লাবণ্য যেন সেখানে কোনোমতেই খাপ খায় না!

তখন কি বলেছিলুম জানি না—তা আমার মনে নেই—ফরাসীদের ধুলো-ঘাঁটা ছেলেদের অপরিচ্ছন্নতার কথা বোধ করি—নিতান্ত বাজে, একেবারে অবান্তর নিশ্চয়ই। দস্তুরমত কর-মর্দ্দনের পর আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলুম। সে রাতটা কিন্তু জেগে জেগে নানা ভাবনায় কাটাতে হয়েছিল—পরদিন তোমায় শুভযাত্রা জ্ঞাপন করে টেলিফোন করলুম, সে শুধু তোমার মধুর কণ্ঠস্বর শোনবার লোভে। তুমি তখন জাহাজে চড়েছ—তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে যেমন করেই হোক তোমার সঙ্গে দেখা করব। কেমন করে যে তা সম্ভব হতে পারে তা আমি নিজেই ঠিক করে উঠতে পারিনি। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—এবং সে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করেছি।

এই কি অদৃষ্ট! কোথায় সেই জল-কাদার রাজ্য থেকে প্যারীতে ছুটী পেলুম, অথচ তখন আমার ছুটী পাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অবশ্য ছুটী পাবার একমাত্র কারণ, যে আমার উপরওয়ালা অনেকেই এ জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, বাকি যাঁরা আছেন তাঁরা বড় একটা ছুটীর আশায় ছিলেন। প্যারীতে আসবার পথে মনে হয়েছিল এবার হয়ত তাকে দেখতে পাব। মাত্র একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলুম, তুমি তার সঙ্গেই আছ—বোধ হয় এরই নাম ভাগ্য! আমার কিন্তু মনে হয় এর মধ্যে আরও কিছু আছে।

প্রথম দিন তোমার সঙ্গে দেখা হল না; পরের দিনই কিন্তু তুমি নিজে এসে আমায় ডাকলে। আমার জন্যে পথ বয়ে আসার কষ্ট তুমি নিয়েছ, এই ব্যাপারটি আমার কাছে শুভ লক্ষণ বলে মনে হল। খুব স্পষ্ট না

হলেও এটা বুঝলুম, তোমার আমার সেই হঠাৎ পরিচয় একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, আমাদের চারিদিকে যেন একটা রহস্যের জাল বোনা চল্‌ছে, আমার সম্বন্ধে তাই যেন তোমার এত কৌতূহল। সেটা আমার আত্মগর্ব্বও হতে পারে, কিন্তু আত্মগর্ব্বকে ছাপিয়ে আরও একটা কিছু যেন এর মধ্যে ছিল। আত্ম-গর্ব্বেরই বা দোষ কি, বলো? সৈনিকের জীবন ত জান—কোথায় কোন্ যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বপ্নের মত দিন কাটে—অতীত জীবনের সকল গৌরব ও আপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের প্রারম্ভটুকু ত সেইখানেই কাটে! জীবনের এই স্বল্পতাকে এমনি করে মূল্যবান করে তোলাই ত তার স্বভাব।

তোমার সঙ্গে যেদিন দেখা হল, সে দিন রবিবার। আমি খুব সাহস করে তোমায় দ্বিপ্রহরে আহারে নিমন্ত্রণ করলুম এবং তুমি সে নিমন্ত্রণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে আমাকে একেবারে অবাক করে দিলে।

মনে হচ্ছে, তোমায় ডাকতে Champ Elysees যাবার পথে আমার প্রতি পদক্ষেপ আর প্রতি মনোভাব আমার মনে গাঁথা আছে। কোমর-বন্ধ আর জামার বোতাম ঘসে মেজে পরিষ্কার করতে আমার যে কত সময় গেছে, তুমি তা ভাবতেই পারবে না! সত্যি পুরুষরা এই রকম! তুমি বোধ হয় খুব হাস্‌ছ—কিন্তু তুমিও বোধ হয় নিজেকে রমণীয় করে তোলবার চেষ্টায় এই রকমেই সময় কাটিয়েছে। যদি না-ও কাটিয়ে থাক তবুও এই কথাটা ভাবতে ভালো লাগছে।

মনের মাঝে কি তোলাপাড়াই চলছিল! সরলভাবে সব কথা বল্‌বে কি? আমার অন্তরটা একেবারে ঘুলিয়ে গিয়েছিল। আমার মনোভাবটা গড়ে উঠেছিল, আশা, বাসনা, সন্দেহ আর তোমার কাছে পাছে অদ্ভুত কিছু ঠেকি এই ভয়ে। তোমার জন্যে আমার বড় মন কেমন করছিল—তোমায় পাবার বাসনায় আমার সমস্ত দেহ-মন ভরে উঠেছিল। আশা হচ্ছিল যে তোমারও মনে হয়তো এমনিধারা এই বাসনাই জাগছে। সন্দেহটা কেন, জান? মনের মাঝে তোমার যে মূর্ত্তি গড়ে তুলেছি, তোমায় দেখে পাছে সেটার দুর্লভত্ব নষ্ট হয়ে যায়, পাছে তা সাধারণ হয়ে পড়ে! আমার স্পর্দ্ধা দেখেছ? অবিশ্বাসের আর জায়গা পাই-নি! আমি নাকি আশঙ্কা করছিলুম তুমি হয়ত সাধারণ মেয়ের মত—দশজনের মত, জগতে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ দেখা হয়! আর তোমার কাছে পাছে অদ্ভুত কিছু ঠেকি বলে এই চিন্তা বীভিষিকার মত আমায় পেয়ে বসেছিল। কি জানি মেয়েদের এই ভাব হয় কিনা! দেখেছ, ভাল-বাসায় পড়লে পুরুষকে কি ভয়ানক অসুবিধা পোয়াতে হয়? তার ভালবাসার প্রতিদান পাবে কি না সে বিষয়ে সে মোটেই নিশ্চিত নয়। আর আমার ত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার কোনো অধিকারই নেই—মুখের আলাপ ছাড়া আর সব বিষয়েই তোমার কাছে আমি একজন অপরিচিত বই আর কি।

তোমার হোটেলে গেলুম। দরোয়ানকে যখন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সে আমার দিকে একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে কড়া সুরে জানালে যে আমার আসার খবর তোমায় দেবে। তোমার কাছ থেকে ফিরে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন বল্লে যে শ্রীমতী

এখনই নামবেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম। কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম, তার ঠিক নেই—খুব সম্ভব পাঁচ মিনিট; কিন্তু সে সময়টা দীর্ঘ এক শতাব্দীর মত মনে হল। একটা করে সেকেণ্ড টিক্ করে চলে যায়, আর নিজের ব্যবহারে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠি—কত সামান্য পরিচয়ে তোমার উপর জুলুম করছি, এতে আমায় তুমি কত আহাম্মক মনে করবে, তাই ভাবছি!

সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। মৃদু একটুখানি খসখস শব্দ—তার পর দেখি তোমার সুকোমল কর আমার পানে প্রসারিত ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছ—বালিকার মত সহজ, বন্ধুর মত হৃদ্য। সে হাতখানি স্পর্শ করলুম—এক অপূর্ব্ব পুলক আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। মনে হল যেন বেঁচে উঠলুম—দীর্ঘ দারুণ পরিশ্রমের সমস্ত ক্লান্তির পরে বিশ্রামের আবেশ সুখের মত আমার উপর নেমে এল। যুদ্ধের বর্ব্বরতা, শীত আর যুদ্ধক্ষেত্রের নানা-বিধ দুর্গতি থেকে মুক্তির দিনগুলো হাস-পাতালে শুয়ে শুয়ে গোণবার যে সুখ, এ যেন তাই। এ সব যা লিখেছি এতে কিছু বলা হচ্ছে না। এ একেবারে অসম্পূর্ণ—যা আমি অনুভব করেছি তার কণামাত্রও এ চিঠিতে প্রকাশ করতে পারছি না। তোমার হাতের স্পর্শের কথা বলছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তোমার চোখের মমতা-মাখা দৃষ্টিই আমায় সব চেয়ে অভিভূত করেছিল।

প্রথম মিলনের লজ্জা ও সঙ্কোচ তখন ঘুচেছে—বায়ু-বিক্ষিপ্ত তুষার-কণা আমাদের মুখে এসে লাগছে—সহরের বিস্তৃত রাজপথের উপর আমরা বেড়াচ্ছি। একটা ট্রামে উঠে আমরা সব গোল করে ফেলুম—আবার আর একটা ট্রাম চড়ে কোথায় যাবো, ঠিক করলুম। সব সময়টা আমরা গল্প করছিলুম, প্রশ্ন তুল-ছিলুম। আর পরস্পরের উত্তরের অবকাশে আবার নতুন প্রশ্ন জেগে উঠছিল। তারপর ট্রাম থেকে নেমে চলার আনন্দে আমরা খুব বেড়াতে লাগলুম। তোমাকে আমার পাশে পাওয়ায় আমার মনে কতখানি গর্ব্ব জমা হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্যই করনি! কত লোক থেকে-থেকে তোমার দিকে চাইছিল—না, তুমি ত কখনও লক্ষ্য কর না—তোমার এইটিই সব-চেয়ে আমার ভাল লাগে—তোমার নিজের সম্বন্ধে এই আনন্দময় ঔদাসীন্য। আচ্ছা, আমার ছবিখানা একবার কল্পনা কর। আমি তখন সমস্ত গ্লানি, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সমস্ত মালিন্য থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি যেখানে মানুষের একমাত্র ভাবনা, কেমন করে বীরের মত মরব—যেখানে মেয়ে বা শিশুর দেখা কোন কালেই মেলে না—মানুষ যেখানে মনের কোমলতাকে প্রশ্রয় দিতে সাহস পায় না, পাছে কাপুরুষ বনে যায়—যেখানে আত্মার সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কোনো সৌন্দর্য্য নেই,—যেখানে ভবিষ্যতের সকল উচ্চ আশা অবলুপ্ত! বাইবেলের সেই কুষ্ঠে লাজারসের (Lazarus) মত আমি যেন নবজীবন লাভ করে পারি সহরের সেরা সুন্দরীর পাশে পাশে বেড়াচ্ছি। এতদিন জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে ধূলোকাদা আর মলিনতার মধ্যে যে পড়েছিল, তার কাছে এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর

কি হতে পারে? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়?

Cafeতে lunch খেতে গিয়ে কত যে মজা হল তোমার মনে আছে? কি খাব তাই ঠিক করতে গিয়ে কি ব্যাপারটাই হল! আমার ফরাসী বলতে বাধছিল বলে তুমি মুখ টিপে টিপে হাসছিলে, শেষে নিজে কথা কয়ে আমায় সে যাত্রা বাঁচালে—অদ্ভুত লোক-গুলোকে দেখে আমরা কি রকম হাসছিলুম—সবাই যে ভদ্র, তা নয়, কিন্তু বেশ হৃদ্য বলে মনে হল। আর আমরাই বা কোন্ অধি-কারে অপরের দিকে চেয়ে হাসি—পৃথিবীর কোন্ পারাপার থেকে অকস্মাৎ কিসের ফেরে আমরা ত দুজনে কাছাকাছি হয়েছি! সেটা কি সব চেয়ে অদ্ভুত নয়?

Cafe থেকে যখন বেরুলুম তখন বরফ পড়ছে—নরম ফুলকো বরফের কণা হীরের টুকরোর মত তোমার চুলে আর জামার পশমের উপর চক্ চক্ করছিল। তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তাই Luxemburg বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করলুম। ভাগ্যক্রমে একটা ভাড়াটে মোটর গাড়ীও পাওয়া গেল—দরজা বন্ধ—সেই আমরা একলা হলুম। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। আমাদের কথা জড়িয়ে গেল; আমরা দুজনে একেবারে চুপ হয়ে গেলুম—বুকের মাঝে যেন ঝড় বইছিল! এই বাইরের জগৎ থেকে তফাৎ হওয়া, এই একলা হওয়া,—যা আমি ভয় করছিলুম, অথচ মাসের পর মাস মনে মনে এইটেকেই বেশী করে চাইছিলুম। তোমার সম্বন্ধে আমি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলুম, তোমার সৌন্দর্য্য, আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠ্‌ল—আমায় যেন ভিতরে ভিতরে আঘাত করলে! আমি তখন ভাবছিলুম—সে ভাবনা আজও আমায় ছাড়েনি—হয়ত তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ। তোমায় যেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখছি, বরফ-ঢাকা জানলার গায়ে তোমার একপাশ বেশ উজ্জ্বল, আর দেখছি তোমার মুক্তকরের অচঞ্চল বিরতি। সে সময়ে তোমায় একে-বারে অপ্রাপ্য বলে মনে হয়েছিল—স্বপ্নের মত তুমি হয়ত নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পার! মাথার মধ্যে নানা কথা চলা-ফেরা করছিল, কত যে কাণাকাণি! কিন্তু কথা-গুলো এমনি সত্য যে মুখ ফুটে বল্লে ভারি হাস্যকর শোনাত, নিশ্চয়ই। আর সময়ও ত খুব বেশী ছিল না। আমি ভাবছিলুম, যদি কপালে থাকে তবে আমার ছুটী ফুরোবার আগেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে।

আবার যখন ভিড়ের মাঝখানে এসে পড়লুম, আমাদের চিন্তার ধারা বদলে গেল—চিন্তার গতিও যেন বাড়্‌ল। পরস্পরকে আর ভয়ের চোখে দেখলুম না—আমাদের মাঝ থেকে ভয়ের ব্যবধান ঘুচ্‌লো। গ্যালা-রিতে একখানা ছবির সাম্‌নে আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম—ছেলেদের ঘরের টেবিলের মাঝখানে বাতি জ্বল্‌ছে, ছেলেরা চার পাশে খেলছে, আর পাণ্ডুর চাঁদ জানালায় উঁকি দিচ্ছে। ছবি দেখে ঘরের কথা, স্মৃতির-ভাণ্ডারে-জমা অনেক ব্যথা মনে জাগ্‌ল। ছবিখানা একজন স্কচ শিল্পীর আঁকা—অক্সফোর্ডে পড়বার সময় তাঁকে দেখে-ছিলুম। তোমাকে ত সেই Chestnut এর ভাল চুরির কথা বলেছি—তাঁর একখানি ছবির

পিছনের দৃশ্য তৈরী করবার জন্যে ভোরে উঠে warden এর বাগান থেকে ডালটি চুরি করতে হয়েছিল।

Luxemburg বাগানের মধ্যে আমরা বেড়াতে লাগলুম—কি সুন্দর যে! যুদ্ধ যেন কোথায় দূরে সরে গেছে। পথ পিছল ছিল বলে তোমার হাত ধরে সাহায্য করেছিলুম, অথচ তোমার অনিচ্ছুক হাত দুখানি আমার হাতে রাখায় মনে মনে ভারি হাসি আসছিল। পুকুরের উপর বরফ জমে গেছে—লোকেরা সেখানে ভিড় করে স্কেট করছে; বুড়ো-ছেলে-মেয়ে-সৈনিক সবাই চীৎকার করছে, আছাড় খাচ্ছে, তাদের আনন্দ আর ধরে না!

Boule Miche দিয়ে Notre Dame এর দিকে অগ্রসর হলুম; মেয়েরা সেখানে প্রার্থনা করছে—লোকান্তরিত যাঁরা, তাঁদের জন্যে। ক্রমে আমরা সীন নদীর তীরের দিকে চল্লুম—অস্তগামী সূর্য্যের অন্তিম কিরণ মেখে রক্তধারার মত সীন বয়ে চলেছে। মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার ত সময় আসেনি—আমাদের বয়স খুব ত বেশী নয়। সেই সময়ে তুমি বল্লে, আর কোথায় তোমার নিমন্ত্রণ আছে। অমনি মনের মধ্যে একটা যে তৃপ্তি এতক্ষণ জমা হয়েছিল তা এক নিমিষে নষ্ট হয়ে গেল।

"আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি?"

"বেশ ত!"

তাড়াতাড়ি একটা taxiতে লাফিয়ে উঠলুম—আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলুম যাতে তোমায় না ছাড়তে হয়—"রাত্রে কি করবেন ঠিক করেছেন?" তুমি থিয়েটারে যাবে ঠিক করেছিলে—একখানা টিকিট বাড়তি ছিল—আমায় তুমি সঙ্গে যাবার নিমন্ত্রণ করলে। মনে মনে ভাবলুম, আমার জন্যে তোমার কিছু দরদ আছে—বিদায় নেবার পর এই চিন্তাটাই মনের মাঝে গানের মত বাজছিল।

তুমি কত আস্তে আস্তে এস! বোধ হয় সে রাত্রে আমি ও জিনিষটি প্রথম লক্ষ্য করি—তোমার আসার শব্দ ত কেউ শুনতে পায় না। এই তুমি নেই, আবার দেখি, তুমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছ—তোমার চোখ দুটি যেন সদাই একটি শান্ত মৌন হাসিতে সমুজ্জল! তারা যেন যা-কিছু জানবার সব জেনেছে, আর এই হতবুদ্ধি গোলমেলে জগতের নানা ব্যাপারে ভারী আমোদ পাচ্ছে। জীবন যে তোমায় কোনদিন ব্যস্ত করেছে, তা আমি ভাবতেই পারি না। আমার মনে যে সব কথা জাগছিল, তা যদি তোমায় বলতুম, তা হলে তোমার মুখের আর চোখের ভাবের কিছু কি পরিবর্ত্তন হোত? কি জানি!

প্রথম থেকেই তুমি আমায় এত বিশ্বাস করেছিলে, প্রেমিকের পক্ষে বোধ করি সেটি শুভলক্ষণ! সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঠেকচে এই যে, যুদ্ধে কামানের মুখে এগিয়ে ভয় জয় করে' আচম্বিত-মৃত্যু-সম্ভাবনায় সারাক্ষণ নির্ব্বিকার থেকে শেষে এক তরুণীর কাছে কেঁপে কেঁপে সারা হচ্চি!

তোমায় এতক্ষণ ধরে যা লিখেছি, তা পড়ে দেখব বলে লেখা থামালুম—আচ্ছা, আমি লিখছি কেন? তুমি ত এ-সব কোনো দিনই পড়বে না। ঘণ্টা দুই আগে ত তোমায় এ সব কথা বল্লেই পারতুম! এখন ত

অনেক দেরী হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আমরা দু-এক ছত্র লিখ্‌ব এমনি কথা হয়েছে—আমরা ত এমনি করেই বলি। তার চেয়ে বেশী কিছু লেখা যাবে না। তোমায় আমি যে চিঠি পাঠাবো, তা একেবারে কেতা-দুরস্ত আর যতদূর সম্ভব ছোট—পরিমিত—পুরুষ বা মহিলাকে যেমন করে লিখি ঠিক তেমনি করেই লিখ্‌ব। কিন্তু তবু হ্যাঁ, এইটে যে মনে আমার সব চেয়ে বেশী করে বাজে—এই বোধ হয় তোমার সঙ্গে শেষ দেখা—তোমার কাছে শেষ বিদায় নেওয়া! যুদ্ধের মুখ থেকে ফিরে আসবার কপাল ক'জনের? যে বোমার ঘায়ে আমার জীবন যাবে, তা বোধ হয় এতক্ষণে জার্ম্মান বারুদখানায় জমা হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চের ধার দিয়ে চলেছি—কি একটা ছুটে এল, জোরে একটা ধাক্কা লাগ্‌ল—অন্ধকার—ব্যস্ সব শেষ! অমন করে সংক্ষেপে বিদায় নেওয়াটা আমার কাছে ভারী বিশ্রী ঠেকছে—পরস্পরের সুখের আশা জ্ঞাপন করে ধন্যবাদ—হাতের একটু স্পর্শ—তার পর সব কথা অ-বলা রেখে অসীম শূন্যতার পানে বেরিয়ে পড়া!

তুমি ত আর এ-সব কোন কালেই পড়বে না—তাই একটা মজা করব মনে করেছি। যা সব লিখছি, তোমায় তা পাঠাব না। এই রকম করে চিঠি লিখে মনের সব কথা বলে যাব। যদি বাঁচি, যুদ্ধের শেষে একদিন হঠাৎ তুমি সব চিঠিগুলোই পেয়ে যাবে—আর যদি তার আগেই মরি তাহলে তুমি কিছুই জানবে না—আমার এই গোপন প্রেম তোমায় কোন ব্যথাই দেবে না। তোমার সম্বন্ধে এখন নানা স্বপ্ন দেখি,—সেই শেলের গর্ত্তের মধ্যে! সেই অবাস্তব জগতে! মনে হয় তুমি প্রকৃতই আমারি!

চুপ করে থেকে বোধ হয় ভাল করিনি। বোধ হয় একটা মিথ্যা গর্ব্বের বশে আমি নীরব ছিলুম। সৈনিকদের বিয়ের সম্বন্ধে সে-দিন তোমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল—আমি বলছিলুম, সে কাজটা নিতান্ত স্বার্থ-পরতা। তিনি প্রথমটা নীরব ছিলেন, যেন মোটেই মনোযোগ দিচ্ছেন না; তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অপ্রত্যাশিত জোরে আমায় বল্লেন—"তাকে আমি বিয়ে কল্লেই ঠিক করতুম।" তাঁর গল্পটা আমি পরে শুনলুম—এক ফরাসী সেনানায়কের সঙ্গে বাগ্দান হয়েছিল, তারপর তিনি মারা গেছেন। ইনি এখন রেড-ক্রশে যোগ দিয়েছেন, এবং এ যাবৎ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে একান্তমনে এগিয়ে আসছেন। কি অশান্তিই তিনি বহন করেছেন! আচ্ছা, বিদায়ের সময় আমরা যেমন করে হেসেছিলুম এঁরাও কি সেই রকম করে হেসেছিলেন?

শেষ ক'দিন আমরা কি সুখেই ছিলুম—পরস্পরের মধ্যে কত সে হৃদ্যতা! সেই সব অতীত সুখের কাহিনীতে স্মৃতি আমার ভরপুর—বিচারবুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার পাকা রঙে নষ্ট হয়ে যায় নি। আজ রাত্রে—আজ শেষ রাত্রে সুখের চরম হয়েছে। আমাদের প্রিয় cafe-এ গিয়েছিলুম—বরফে ঢাকা, প্রথম রবিবারে সেই যেখানে যাই। যাবার সময় গল্পে মেতে এত দেরী হয়ে গেল যে গিয়ে দেখি অপেরার প্রথম দৃশ্য অভিনয় হয়ে গেছে। তাতে আমরা মোটেই ক্ষুণ্ণ হই নি, অন্তত আমি ত নই। তোমার কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পাব

বলেই ত অপেরায় যাবার প্রস্তাব করেছিলুম। সন্ধ্যা রাত্রিটা কি শীগগির কাটল! আবার boulevard-এ বেরিয়ে পড়লুম। তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেবার সময় হয়েছে—অদৃষ্ট ট্যাক্সি পাবার চেষ্টায় আমরা কি মজাটাই করলুম! শেষ একটা বাড়ীর গাড়ীর শোফে-আরকে ঘুষ দিয়ে গাড়ী পেলুম। সেই শেষ মুহূর্ত্তে তুমি কি আমার কাছ থেকে কিছু আশা করেছিলে? আমি শুনলুম, আমি নিজে সব নিতান্ত সাধারণ কথা বলে যাচ্ছি, কিন্তু সে গলার স্বর যেন আমার নয়! কথা বলেই চলেছি—কত দেরী হয়ে গেল—হঠাৎ এত দিনের অন্তরঙ্গ—তার পর আমরা থতমত খেয়ে গেলুম, ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠলুম। তুমি বল্লে, "বিদায়"—আমিও তার প্রতিধ্বনি তুললুম। "চিঠি লিখতে ভুলবেন না ত?" হাত দুখানি আমার মুঠোর মাঝ থেকে টেনে নিয়ে তুমি মাথা নাড়লে, তারপর পিছন ফিরে দৌড়ে উপরে উঠে গেলে।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে মন আমার ভারী খুসী হয়ে উঠেছে। যে বেদনা বহন করে আমি যুদ্ধে ফিরে যাবো তার জন্যেও আমি খুসী। আমার মন-প্রাণ যে একান্ত নিঃসঙ্গ আর ফাঁকা ছিল, তার উপর এর আগে আমি কোন মেয়েকে কোনদিন ভালবাসিনি। এখন ত ভাবতে পারো—সে বোধ হয় জানতে পেরেছে, কেন, আমি তার কাছে সব কথা মুখ ফুটে বলি নি! হয়ত সেও এমনি করে আমার কথা মনে করছে! তোমার সম্বন্ধে কত গল্পই নিজের কাছে বল্‌ব, যেন তুমি সত্যই আমার! তোমার মুখখানি আমার সঙ্গেই থাকবে—তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার স্নিগ্ধ-মধুর ব্যবহার সব, সবই—। এবার আমি আমাকে ছাপিয়ে উঠ্‌ব, তোমাকে যে আমি দেখেছি! যদি মরি, খুসী হয়ে খুসী হয়ে মর্‌তে পার্‌ব।

রাত অনেক হয়ে গেছে—এখনি আবার সব জেগে উঠবে। ঘণ্টা পাঁচের মধ্যেই আমায় সহর ছেড়ে যেতে হবে। তোমায় খুব কাছে ভাবতে ইচ্ছে করছে—এত কাছে যেন কথা কইতে পারি—দেখেছ টেলিফোনের লোভ এখনো সামলাতে পারি নি। কিন্তু হায়রে, পারি আর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম সার কামানের মাঝে কোন টেলিফোনের লাইন নেই!

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

অবতার

৫

চিকিৎসা ও বুজরুগি শক্তির জন্য, পারী নগরে ডাক্তার বাল্‌থাজার শোরবেনোর খুব খসার হইয়াছে; সত্যই হোক্, মিথ্যাই হোক্ তাঁর এই-সব আজগুবি কাণ্ডের দরুণ, সর্ব্বত্রই তাঁর এখন আদর সম্মান। কিন্তু রোগী পাইবার চেষ্টা দূরে থাক্, তাঁর নিকট রোগী আসিলে, দরজা বন্ধ করিয়া উহাদিগকে ভাগাইয়া দেন, অথবা এরূপ ঔষধ-পত্র লিখিয়া দেন যাহা অতি অদ্ভুত এবং এরূপ নিয়ম

ব্যবস্থার কথা বলেন যাহা পালন করা অসম্ভব। 'নিউমোনিয়া', 'এণ্টেরাইটিস', 'টাইফয়েড'—এই-সব চলিত সাদামাটা, সাধারণ ইতর জনোচিত রোগে আক্রান্ত রোগীদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত তাহাদের আগেকার ডাক্তারদের নিকট ফিরিয়া পাঠাইয়া দেন। দুরারোগ্য উৎকট সৌখীন রোগে আক্রান্ত রোগীরই তিনি চিকিৎসা করেন; এবং তাঁর চিকিৎসায় রোগী অভাবনীয়রূপে আরোগ্য লাভ করে। রোগ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনি এক-পেয়ালা জলে ফুঁ দিয়া মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নানা প্রকার মুদ্রাভঙ্গী করেন। মুমূর্ষুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত, আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, উহাকে সমাধি-ভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ চলিতেছে;—সেই সময় উহার যন্ত্রণায় আড়ষ্ট দৃঢ়বদ্ধ চিবুক শিথিল করিয়া দিয়া ঐ মন্ত্রপূত জলের কয়েক ফোঁটা উহাকে গিলাইয়া দেওয়া হয়; তাহার পরেই রোগীর দেহের স্বাভাবিক নমনীয়তা, স্বাস্থ্যের রং আবার ফিরিয়া আসে। রোগী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাই শেরবোনোকে সবাই মৃত্যুর ডাক্তার বলে, মৃতসঞ্জীবনের ডাক্তার বলে। এখনো ডাক্তার শেরবোনো সব সময়ে এই সব রোগের চিকিৎসা করিতে সম্মত হন না; অনেক সময় ধনী মুমূর্ষু রোগীদের নিকট হইতে প্রভূত অর্থের অঙ্গীকার পাইলেও উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। যদি কোন জননী তার একমাত্র সন্তানের জীবনের জন্য তাঁহাকে কাতর অনুনয় করে, কোন প্রেমিক তার প্রাণ-প্রিয়ার প্রেমলাভে হতাশ হইয়া তাঁহার সাহায্য চাহে, অথবা যদি তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তির জীবন সঙ্কটাপন্ন তাহার জীবন কাব্যের পক্ষে, বিজ্ঞানের পক্ষে, বিশ্বমানবের উন্নতির পক্ষে, বিশেষ প্রয়োজনীয়, তবেই তিনি তার মৃত্যুর সহিত যুঝাযুঝি করিতে সম্মত হন।

এইরূপে তিনি 'ক্রুপ'-রোগে রুদ্ধ-শ্বাস একটি কোলের শিশুকে, যক্ষার শেষ-অবস্থায় উপনীত একটি রূপসী ললনাকে, সুরা-বিকার-গ্রস্ত একজন কবিকে, মস্তিষ্কের রক্ত-জমাট-রোগে আক্রান্ত একজন যন্ত্র-উদ্ভাবককে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। তাঁর আবিষ্কারের হদিশটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার গর্ভে নিহিত হইবে, তাঁহার আচরণে এইরূপ মনে হয়। আবার তিনি এরূপ কথাও বলেন যে, প্রকৃতিকে উল্টাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে, কতকগুলি লোকের মরাই উচিত—তাহাদের মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে; তাহাদের মৃত্যুতে যদি বাধা দেওয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব-যন্ত্রে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। এখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ, ডাক্তার শেরবোনো একজন সৃষ্টিছাড়া লোক, বাতিকগ্রস্ত লোক; তাঁর এই বাতিকটা তিনি পুরাপুরি ভারতবর্ষ হইতে অর্জ্জন করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্মোহনকারীর খ্যাতিটা চিকিৎসকের খ্যাতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। অল্পসংখ্যক বাছাবাছা লোকের সম্মুখে তিনি কয়েকবার বৈঠক দিয়াছিলেন, সেই বৈঠকে এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহাতে কুরিয়া লোকের সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত সংস্কার ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রসিদ্ধ যাদুকর ক্যাগলিয়ষ্ট্রোর অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

ডাক্তার একটা পুরাতন হোটেলের এক-তলায় বাস করিতেন। আগেকার দস্তরমত তাঁর ঘরগুলা সারি-সারি এক লাইনে অবস্থিত। সেই-সব ঘরের উঁচু জান্‌লা হইতে নীচের বাগান দেখা যায়। বাগানে বড় বড় গাছ; গাছের গুঁড়িগুলা কালো,—লম্বা লম্বা সবুজ পাতায় ঢাকা। শক্তিমান কতকগুলা তাপ-প্রবাহ যন্ত্রের মুখ হইতে তাপের জ্বলন্ত প্রবাহ বাহির হইয়া বড় বড় ঘরগুলাকে গরম রাখিয়াছে। এখন ঘরের তাপ মান ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রী। ভারতবর্ষের প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে অভ্যস্ত ডাক্তার শেরবোনো, আমাদের দেশে ফ্যাকাসে সূর্য্যকিরণে, থরথর করিয়া কাঁপিতেন—ঠিক সেই ভ্রমণকারীদের মত যাহারা নীল-নদীর সূত্রস্থান মধ্য আফ্রিকা হইতে 'কেরো'তে ফিরিয়া আসিয়া শীতে কাঁপিতে থাকে। তিনি গাড়ী বন্ধ-সন্ধ না করিয়া গৃহের বাহির হইতেন না; এবং শীত-কাতুরের ন্যায় সর্ব্বশরীর পশু-লোমের আলখাল্লায় আচ্ছাদন করিয়া গরম-জলে-ভরা একটা টিনের চোঙ্গার উপর পা রাখিতেন।

তাঁর এই ঘরগুলিতে কতকগুলা অনুচ্চ পালঙ্ক ছাড়া আর কোন আস্‌বাব ছিল না। পালঙ্কগুলা মালাবার দেশের ছিট-কাপড়ে আচ্ছাদিত,—তার উপর অদ্ভুত-আকৃতি হস্তী ও কাল্পনিক বিহঙ্গাদির চিত্র অঙ্কিত, ও সিংহলের আদিমবাসীদিগের দ্বারা রূঢ় ধরণে রং-করা ও সোনার গিল্টি করা; বিদেশী ফুলে-ভরা কতকগুলা জাপানী ফুলদানী এবং মেজের তক্তার উপর, ঘরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, শতরঞ্জি বিছানো রহিয়াছে। কালো-সাদা ফুল-কাটা এই বিষাদময় শতরঞ্জি কারাগারের মধ্যে ঠগেরা বুনিয়াছে। তাহারা যে সোনের রসিতে গলায় ফাঁস লাগাইত, সেই সোনের সুতা দিয়া ইহার বুনানি হইয়াছে। পাথরের ও কাঁসার কতকগুলা হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে; বাদামি আকারের দীর্ঘ চোখ—নাকে মাকড়ি—হাস্য-ময় স্থূল ওষ্ঠাধর, মুক্তার মালা নাভি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া রহিয়াছে; উহাদের স্বরূপলক্ষণ অদ্ভুত ও রহস্যময়; মূর্ত্তিগুলা তলদেশস্থ বেদি-কার উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে। দেবালয়ের গায়ে গায়ে জল-রঙের চিত্র-পট ঝুলিতেছে; এই সকল চিত্র কলিকাতা কিংবা লক্ষ্ণৌর পটুয়াদের হাতের আঁকা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ (যাকে কোন কোন স্বপ্ন-দর্শক হিন্দুখৃষ্ট মনে করেন) বুদ্ধ, কলি এই নয় অবতারের চিত্র। সর্ব্বশেষে নারায়ণের মূর্ত্তি—ক্ষীর-সমুদ্রের মধ্যে সুবক্র পঞ্চশীর্ষ-সর্প-বেদিকার উপর নিদ্রিত—কোন এক সময়ে শ্বেত-অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া শেষ-অবতার কলির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের প্রলয়সাধন করিবেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন!

সব-ঘরের পিছনে যে ঘর—সেই ঘরটি আরও বেশী করিয়া গরম করা; সেই ঘরে পাশাপাশি সংস্কৃত পুঁথিতে বেষ্টিত হইয়া রালথাজার শেরবোনো বাস করেন। পুঁথির অক্ষরগুলা পাত্‌লা পাত্‌লা কাষ্ঠফল-কের উপর, লোহার লেখনীর দ্বারা উৎকীর্ণ; কাষ্ঠ-ফলকে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের মধ্যে দড়ি চালাইয়া, ফলকগুলা একত্র গ্রথিত হইয়াছে।

আমরা য়ুরোপে যাহাকে পুস্তক বলি, এ

সেরূপ ধরণের নহে। একটা বৈদ্যুতিক-যন্ত্র—তাহা সোনালি ফুল-কাটা কতকগুলা বোতলে ভরা; বোতলের কাচের মুখে হাতল লাগান আছে—ঐ হাতলের দ্বারা উহা ঘুরান যায়। এই চঞ্চল ও জটিল যন্ত্রটার ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মাঝখানে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। পাশে সম্মোহন কার্য্য-সংক্রান্ত একটা ছোট কাঠের টেব্‌; তাহার মধ্যে একটা ধাতুময় বল্লম ডোবান আছে এবং উহা হইতে অনেকগুলা লৌহ-শলাকা বাহির হইয়াছে। শেরবোনো একজন হাতুড়ে ছাড়া আর কিছুই নহে; সেইজন্য শেরবোনোর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কোন উদ্যোগ ছিল না। কিন্তু তবু পূর্ব্বেকার 'আল্‌কিমি'-রাসায়নিকের পরীক্ষা-গারে প্রবেশ করিলে মনের যে রকম ভাব হইত, তাঁর এই আজগুবী ধরণের পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলে মনে সেইরূপ একটা ভাব না হইয়া যায় না।

কৌণ্ট ওলাফ্-লাবিন্‌স্কি লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন, এই ডাক্তারের অনেক অলৌকিক চেষ্টা সফল হইয়াছে; তাই তাঁর অতি-বিশ্বাস-প্রবণ কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

যখন কৌণ্ট ডাক্তারের গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁর অনুভব হইল যেন একটা অস্পষ্ট অগ্নিশিখা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে; তাঁহার সমস্ত শরীরের রক্ত মাথার দিকে প্রবাহিত হইল, তাঁহার রগের শিরাগুলা দব্‌দব্ করিতে লাগিল; ঘরের দুঃসহ উত্তাপে তাঁর যেন শ্বাসরোধ হইল। প্রদীপে যে তেল পুড়িতেছিল, ফুলদানীতে যাভাদ্বীপের যে সব মসলাদার বৃহৎ পুষ্প দুলিতেছিল—সেই তেল ও পুষ্পের তীব্র গন্ধে তাঁর মাথা ঘুরিয়া গেল। মাতালের মত টলিতে টলিতে, ডাক্তারের অভিমুখে কৌণ্ট কিয়ৎপদ অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার শেরবোনো সন্ন্যাসীদিগের মত আসন-পিঁড়ি হইয়া পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। পরি-চ্ছদে আচ্ছাদিত ডাক্তারের শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে ভাবে দেখা যাইতেছিল, দেখিলে মনে হয় যেন একটা মাকড়শা জালের মধ্যে থাকিয়া তাহার শিকারের উদ্দেশ্যে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে। কৌণ্টকে দেখিবামাত্র তাঁহার ফস্‌-ফরস-দীপ্ত চোখ-দুইটা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছা করিয়া উহা নিভাইয়া দিলেন। তাহার পর ডাক্তার, ওলাফের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। ওলাফ অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছেন, ডাক্তার বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন—তাই, দুই-তিনবার হাতের 'ঝাড়া' দিয়া তাঁহার চারিদিকে বসন্তের আব-হাওয়া উৎপাদন করিলেন,—এই উত্তপ্ত জ্বালাময় নরকের মধ্যে সুশীতল স্বর্গের আবির্ভাব ঘটাইলেন।

"এখন ত আপনি ভাল বোধ কর্‌চেন? আপনি বর্ণ্টিকের তুষার-শীতল হাওয়ায় অভ্যস্ত, তাই ঘরের এই উত্তপ্ত হাওয়া, কামারের কারখানায় হাপরের জ্বলন্ত হাওয়ার মত আপনার মনে হচ্চিল—কিন্তু ভারতের প্রখর সূর্য্যকিরণে দগ্ধ-বিদগ্ধ যে আমি, এই উত্তাপেও আমি শীতে কাঁপছিলাম।"

কৌণ্ট ওলাফ একটা ইঙ্গিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যে এখন আর তাঁহার গরমে কষ্ট হইতেছে না।

ডাক্তার অতি সরলভাবে বলিলেন,—

"আপনি অবশ্য আমার "ঝাড়া-দেওয়া"র কথা, আমার সম্মোহন বিদ্যার কথা শুনেছেন?—তবে কি একটা নমুনা এখন দেখতে ইচ্ছা করেন?"

কৌণ্ট উত্তর করিলেন:—

"আমার কৌতূহল ওরূপ ছেলে-মানুষি ধরণের নয়। যিনি একজন বিজ্ঞানের সম্রাট্, তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি উহা অপেক্ষা অনেকটা বেশী।"

—"বৈজ্ঞানিক বল্লে যে অর্থ বোঝায় আমি সে অর্থে একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নই; বরং বিজ্ঞান যে সকল জিনিসকে অবজ্ঞা করে সেই সকল জিনিসের অনুশীলন করে' আমি অপ্রযুক্ত কতকগুলি গূঢ় শক্তিকে আয়ত্ত করেছি, এবং তার থেকে এমন-সব ব্যাপার দেখাতে পারি যা প্রাকৃতিক হ'লেও অত্যন্ত বিস্ময়জনক বলে মনে হয়। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরবার জন্য ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে, আমিও তেমনি অপেক্ষা করে থেকে সময় বুঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে, কোন আত্মার রহস্য ঝট্ করে ধরে ফেল্‌তে পারি; সেই আত্মাটি তখন সব কথা খুলে আমাকে বলে;—তাতেই আমার কাজ হাসিল হয়, আমি তার কতকগুলি কথা মনে করে' রাখি। আত্মাই সব, জড়-জগৎ শুধু একটা বাহ্য আবির্ভাব। বিশ্বজগৎ সম্ভবত ঈশ্বরের একটা স্বপ্নমাত্র অথবা অসীমের মধ্যে, শব্দ-ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত একটা বহির্বিকাশ মাত্র। আমি ইচ্ছামত শরীরকে চীরবস্ত্রের মত সঙ্কুচিত করতে পারি, জীবনীশক্তিকে আট্‌কাতে পারি বা দ্রুত চালিয়ে দিতে পারি, আমি আকাশকে বিলোপ করতে পারি, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতির সাহায্য না নিয়েও কষ্টকে নষ্ট করতে পারি। মানসিক তড়িৎ এই যে ইচ্ছা-শক্তি, এই ইচ্ছা-শক্তিতে সজ্জিত হয়ে আমি জীবন দান করি, কাউকে বা বজ্রাঘাতে ধরাশায়ী করি। আমার চক্ষের সমক্ষে কোনও জিনিসই অস্বচ্ছ নয়; আমি চিন্তার রশ্মিগুলি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। যেমন বেলোয়ারি কাচের কলমের মধ্য দিয়ে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছটা পর্দ্দার উপর প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আমার অদৃশ্য বেলোয়ারি কলমেরদিয়ে আমি ঐ চিন্তা-রশ্মিগুলি আমার সাদা মস্তিষ্ক-পটের উপর ইচ্ছাশক্তির বলে প্রতিফলিত করতে পারি। কিন্তু ভারতের সিদ্ধপুরুষ যোগীরা যাহা করেন তাহার কাছে এ সব কিছুই নয়। আমরা য়ুরোপের লোক,—আমরা অত্যন্ত লঘু-প্রকৃতি, অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত, অত্যন্ত অসার; আমাদের কাদা-মাটির কারাগারটি আমাদের নিকট এতই প্রিয় যে, আমরা অনন্ত ও অসীমের বৃহৎ জান্‌লা-গুলো খুল্‌তে পারি নে। তথাপি আমার পরীক্ষা হতে আমি কতকগুলি আশ্চর্য্য ফল পেয়েছি, তা দেখ্‌লে আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন।"

এই কথা বলিয়া ডাক্তার শেরবোনো একটা বড় দরজায় টাঙ্গানো একটা পর্দ্দার শিকের উপর দিয়া কতকগুলা আঙ্‌টা সরাইয়া দিবামাত্র ঘরের পশ্চাদ্ভাগের একট প্রচ্ছন্ন কুঠরী বাহির হইয়া পড়িল। তাঁবার টেপাইয়ের উপর সুরাসারের অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে কৌণ্ট ওলাফ্ যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা অতি ভীষণ, তাহা দেখিয়া এমন যে সাহসী পুরুষ কৌণ্ট তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ

শিহরিয়া উঠিল। একটা কালো টেবিলের উপর কটিদেশ পর্য্যন্ত নগ্ন একটি যুবাপুরুষ শয়ান—শবের মতো নিশ্চল। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মতো তাহার দেহে কতকগুলো শলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে এক-বিন্দুও রক্ত ঝরিতেছে না। দেখিলে মনে হয় যেন কোন ধর্ম্মবীর 'মার্টারের' মূর্ত্তি, কেবল ক্ষতস্থানে চিত্রকর যেন লাল রং দিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ওলাফ্ মনে মনে ভাবিলেন, এই ডাক্তার বোধ হয় শিবের একজন ভক্ত উপাসক—এই লোকটিকে বোধ হয় শিবের নিকট বলি দিবার মৎলব করিয়াছে।

"ওর কিছুই কষ্ট হচ্চে না; ওর গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখুন, ওর মুখের একটি পেশীও নড়বে না।" এই কথা বলিয়া আল্‌পিনের গদি হইতে আল্‌পিন বাহির করিবার মত ডাক্তার উহার গাত্র হইতে শলাকাগুলো বাহির করিয়া লইলেন। উহার উপর তাড়াতাড়ি কয়বার হস্ত-সঞ্চালনের পর বা 'ঝাড়া' দিবার পর, উহার ওষ্ঠাধরে যোগানন্দের একটি মৃদু-মধুর হাসির রেখা দেখা দিল—যেন সে একটা সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। একটা ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার শেরবোনো তাকে ছুটি দিলেন। কাঠের কারু-কার্য্য-ভূষিত ঐ প্রচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠের কাষ্ঠ-কাঠামের মধ্যস্থিত একটা কাটা দরজা দিয়া সে প্রস্থান করিল। মৃদু হাসির ছলে ডাক্তার, মুখের বলি-রেখা-গুলা বেণী পাকাইয়া বলিলেন,—

"আমি ওর একটা পা কিংবা হাত কেটে ফেল্‌তে পারতাম,—ও টেরও পেত না। আমি তা করলাম না, কেন না, আমি এখনো সৃষ্টি করতে পারি নে। এ বিষয়ে মানুষ টিক্‌টিকি হতেও অধম, মানুষের এতটা শক্তি-বিশিষ্ট জীবন-রস নেই যে কাটা অঙ্গ আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। আমি সৃষ্টি করতে পারিনে বটে কিন্তু আমি নবযৌবন এনে দিতে পারি।" এই কথা বলিয়া তিনি এক বৃদ্ধা রমণীর অবগুণ্ঠন উঠাইয়া লইলেন; কালো মার্ব্বেল টেবিলের অনতিদূরে, সেই বৃদ্ধা এক আরাম-কেদারায় চৌম্বক নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল; তাহার মুখশ্রী, মনে হয় একসময়ে সুন্দর ছিল, এখন শুষ্ক ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার বাহুর, তাহার স্কন্ধের, তাহার বক্ষের শীর্ণ গঠনের উপর কালের উপদ্রব স্পষ্ট লক্ষিত হয়! ডাক্তার স্বীয় নীল তারার প্রখর স্থির দৃষ্টি খুব আগ্রহের সহিত, কয়েক মিনিট ধরিয়া তাহার উপর নিবদ্ধ করিলেন; ক্ষীণ-রেখাগুলি আবার পূর্ব্ববৎ সরল হইয়া উঠিল; কুমারী-সুলভ বক্ষের সুগোল-গঠন আবার ফিরিয়া আসিল। কণ্ঠের শীর্ণতা আবার শুভ্রবর্ণ সাটিন্-আভ মাংসে ভরিয়া গেল। গাল বেশ সুগোল হইল; এবং পিচ্ ফলের ন্যায় ঈষৎ গোল ও পেলব হইয়া যৌবনের তাজাভাব ধারণ করিল; উন্মীলিত নেত্রযুগল, একপ্রকার সজীব তরল রসে ভরিয়া গিয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। যেন যাদুমন্ত্রে বার্দ্ধক্যের মুখসটা খসিয়া গেল, এবং বহুকাল-অন্তর্হিতা সেই সুন্দরী যুবতীকে আবার দেখিতে পাওয়া গেল। এই রূপান্তর-দর্শনে কৌণ্ট হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন; ডাক্তার তাঁহাকে বলিলেন:—

"আপনি কি বিশ্বাস করেন, এই স্থলে যৌবনের উৎস হইতে নিঃসৃত অলৌকিক জল-ধারার কতকটা জলে এই রূপান্তর ঘটিয়াছে? আমি বিশ্বাস করি, কেননা, মানুষ নূতন কিছুই উদ্‌ভাবন করতে পারে না; মানুষের প্রত্যেক স্বপ্নই একটা ভবিষ্যৎ দর্শন কিংবা একটা অতীতের স্মৃতি।—কিন্তু আমার ইচ্ছাবলে এই মূর্ত্তিটিকে প্রস্তরে পরিণত করেছিলাম, এখন মুহূর্ত্তের জন্য ওকে ছেড়ে দেওয়া যাক্। আর ঐ কোণে যে মেয়েটি বেশ শান্তভাবে নিদ্রা যাচ্ছে, এখন ওর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক্। ঐ মেয়েটির ডল্‌ফির পুরোহিতের চেয়েও দূর-দৃষ্টি। বোহিমিয়া প্রদেশে আপনার যে ৭টি দুর্গ-প্রাসাদ আছে, তারই কোন-একটি প্রাসাদে ওকে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন; আপনার দেরাজে সব-চেয়ে গোপনীয় জিনিস কি আছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন—এ বলে দেবে। সেখানে পৌঁছতে ওর আত্মার এক-সেকেণ্ডেরও বেশি লাগ্‌বে না। যাই হোক্, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্য বটে; কেন না ঐ একই সময়ের মধ্যে তাড়িৎ ৭০ মাইল লীগ্ অতিক্রম করে; আর, রেলের-গাড়ীর কাছে ঘোড়ার গাড়ী যে রকম, চিন্তার কাছে তাড়িৎশক্তিও সেই রকম। আপনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করবার জন্য আপনি ওর হাতে হাত দিন; আপনার প্রশ্নটি সম্বন্ধে ওকে জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক হবে না। ও আপনার মনোগত প্রশ্ন এম্‌নিই জান্‌তে পারবে।"

কৌণ্ট মনে মনে যে-প্রশ্ন করিলেন, ঐ মেয়েটি অতি ক্ষীণ স্বরে তাহার উত্তর দিল:—

"সিডার কাঠের সিন্দুকের ভিতর, অতিসূক্ষ্ম বালির গুঁড়ার মত এক টুক্‌রা মাটি আছে তার উপর একটা ছোট পায়ের ছাপ্ দেখা যায়।"

ডাক্তার তাঁর স্বপ্নদর্শী মেয়েটির অভ্রান্ততায় যেন দৃঢ়নিশ্চয় এই ভাবে কোন দ্বিধা না করিয়াই বলিলেন:—

—"মেয়েটি ঠিক্ বলেছে কি না?"

কৌণ্টের গাল লাল হইয়া উঠিল। বস্তুত তাঁহাদের ভালবাসার প্রথম অবস্থায় একটা উপবনের বালুময় গলিপথে তরুণী প্রাস্কোভির পায়ের যে ছাপ্ পড়িয়াছিল, বালুময় মাটিসমেত সেই ছাপ্‌টি কৌণ্ট উঠাইয়া লইয়া ঝিনুক ও রূপা-খচিত একটা বাক্‌সোর ভিতর, সেই ছাপ্-সমেত মৃত্তিকাখণ্ড স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং উহার অতিক্ষুদ্র চাবিটি একটি খুব সরু চেনে বদ্ধ হইয়া তাঁহার গলায় ঝুলিত।

শিষ্টাচারে অভ্যস্ত ডাক্তার, কৌণ্টের লজ্জা-সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, এবং তাঁহাকে একটা টেবিলের অভিমুখে লইয়া গেলেন। ঐ টেবিলের উপর হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ খানিকটা জল রাখা হইয়াছিল।

"যে ঐন্দ্রজালিক আর্শিতে, মেফিষ্টোফেলিস্ ফৌষ্টকে হেলেনের মূর্ত্তি দেখিয়েছিল, সেই আর্শির কথা বোধ হয় আপনি শুনেছেন; আমার রেশমী মোজার মধ্যে ঘোড়ার খুর ও আমার টুপিতে দুইটা কুঁকড়োর পালক না থাক্‌লেও, একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়ে আপনাকে নির্দ্দোষ আমোদ দিতে পারি। এই জল-পাত্রের

উপর আপনি ঝুঁকে থাকুন, আর যে রমণীকে আপনি এখানে আন্‌তে চান, একাগ্রচিত্তে তাকে চিন্তা করুন। জীবিত হোক্, বা মৃত হোক্, দূরে থাকুক বা নিকটে থাকুক—প্রপাতের শেষ-প্রান্ত থেকে, ইতিহাসের গহন রসাতল থেকে সে আপনার ডাকে এখানে এসে উপস্থিত হবে।"

ডাক্তারের কথা-মতো কৌণ্ট জল-পাত্রের উপর ঝুঁকিয়া রহিলেন। একটু পরেই তাঁহার দৃষ্টির প্রভাবে, পাত্রের জল বিক্ষুব্ধ হইয়া 'ওপ্যাল'-মণির বর্ণ ধারণ করিল; জল-পাত্রের কিনারাটা বেলোয়ারি কলমে বিশ্লিষ্ট বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত হইল। ইহা যেন একটা ছবির ফ্রেমের মত হইল। ছবি আগেই আঁকা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু উহা সাদাটে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে কুয়াসাটা মিলাইয়া গেল। অম্‌নি স্বচ্ছ জলের উপর এক তরুণীর ছবি ফুটিয়া উঠিল। পরিধানে আলখাল্লার ন্যায় একটা শিথিল পরিচ্ছদ; নেত্রযুগলের বর্ণ সমুদ্র-হরিৎ, কুঞ্চিত স্বর্ণ-কুণ্ডল, পিয়ানোর পর্দ্দা-গুলোর উপর চঞ্চল সুন্দর হাতদুটি ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ছবিখানি এমন চমৎকার আঁকা যে, তাহা দেখিলে গুণী চিত্রকরেরাও ঈর্ষায় মরিয়া যাইত।—

ইনিই রাণী প্রাস্কোভি লাবিন্‌স্কা: কৌণ্টের আবেগময় আহ্বান শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ডাক্তার, কৌণ্ট-ওলাফের হস্ত গ্রহণ করিয়া সম্মোহন-জল-পাত্রের একটা পায়ার উপরে উহা স্থাপিত করিলেন। বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তিতে ভরা ঐ ধাতুখণ্ড একটু স্পর্শ করিবামাত্র কৌণ্ট যেন বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

ডাক্তার উঁহাকে বাহুর দ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং হাল্‌কা পালকের মতো উঠাইয়া লইয়া একটা পালঙ্কের উপর শুয়াইয়া দিলেন। তারপর ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বলিলেন—

"অক্টেভকে এখানে নিয়ে আয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জেন্ত-সভা

বা

জন্তুজাতীয় মহাসমিতি

জেন্ত-সভার প্রথম অধিবেশনের অস্থায়ী সম্পাদক সজারুর চতুষ্পদীকা টিপ্পনী যথা:—

(প্রস্তাবনা)

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা—এ কেবল কথার কথা। জীব-সৃষ্টি হয়ে অবধি, মনু আর সেই আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে এ-পর্য্যন্ত মানুষরা মুখেই ব'লে আস্‌ছে 'জীবে দয়া,' কিন্তু কাজের বেলায় আমাদের কাউকে দেখে জীভে তাদের জল আসে—চোখে নয়, এটা জানা কথা, কাজেই মানুষ যতই জীভ

নেড়ে বলুক 'জীবে দয়া', করছে ঠিক এর উল্টোটা! এই কারণে যত জীব-জন্তু, এমন-কি পোকামাকড় তারা পর্য্যন্ত জ্বালাতন হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে আর ভাব রাখা চলে না, বাস্তবিক মানুষের চেয়ে আমরা কমটা কিসে যে চিরদিন তাদের শাসনে চল্‌তে হবে, হুকুমের চাকর?

মানুষদের সঙ্গে কোনো আর বাধ্য-বাধকতা না রাখাই স্থির ক'রে, ছোট-বড় সব জানোয়ার মিলে এক সভা গঠন করা গেছে, যার নাম হচ্ছে—মনু-তাড়নী জান্তব হিতকরী জাতীয় মহাসমিতি বা জেন্ত-সভা।

ইতিমধ্যেই সভাটির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। গত পূর্ণিমায় আলিপুরের সরকারি চিড়িয়াখানার গোল-চান্‌কাতে এই সভার প্রথম অধিবেশনের বন্দোবস্ত করা গিয়েছিল, কেননা পৃথিবীর জীব-জন্তুকে একত্র করার পক্ষে এমন স্থান আর দ্বিতীয় নাস্তি। একথা বলাই বাহুল্য যে, সেদিনের সভার কাজ পাশব প্রথা-মতো যতদূর সম্ভব বাঘাড়ম্বর ইত্যাদি দ্বারায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোল্‌বার জন্যে প্রাণপণের ত্রুটি হয়নি।

(অভিভাষণ)

স্বাধীনতার মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপুরুষ বীর বনমানুষ—তিনি উৎপীড়িত জীব-জগৎকে মুক্তি দিতেই যেন বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে গভীর রজনীতে বিশ্ব যখন ঘুমে ঘুমায়িত, সেই শুভমুহূর্ত্তে পশুশালার তালাবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরাবলীর অর্গলাদি ও লৌহ-শলাকা-সঙ্কুল শৃঙ্খলাবদ্ধ দ্বারাদি উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে গেলেন। আজীবন বন্দী, চিরদিন বদ্ধ জীব মুক্তির মধুরাস্বাদ পেয়ে বীর-রসের রুধিরাস্বাদে বলীয়ান হ'ল ও উন্মুক্ত আকাশ-তলে পুনরায় দাঁড়িয়ে সিংহনাদ হ্রেসা বৃংহিত চীৎকার চিচিকার করে একে একে এসে জান্তবীয় ভৈরব-চক্রে স্ব স্ব স্থান অধিকার ক'রে বস্‌ল। জাতি-নির্ব্বিশেষে গৃহপালিত গবাদি চক্রের সম্মুখ ভাগে, শার্দ্দূলাদি বন্যগণ চক্রের পশ্চাতে এবং সরীসৃপাদি ভূচরগণ চক্রের তলদেশ ও জলচর খেচরগণ চক্রের উর্দ্ধদেশ আশ্রয় কর্‌লেন, আর বিরাট এই জেন্ত-সভার কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করবার মানসেই যেন চন্দ্রমা সেদিন পূর্ণকলায় উদ্ভাসিত হয়ে, অন্ধকার তরুশিখর ছাড়িয়ে ক্রমে আকাশে আরোহণ কর্‌তে থাক্‌লেন। (সাধু সাধু) মানুষদের মধ্যে রাষ্ট্র-নীতি সমাজ-সংস্কার এম্‌নি-সব ব্যাপার নিয়ে বিরাট সভা অনেক হয়েছে এবং সে-সব সভায় খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি হাতাহাতি গালাগালি এমন-কি জুতো-মারামারিও হ'তে বাকি নেই, কিন্তু জন্তু আমাদের এই জেন্ত-সভায় বড় বড় হাড়-ভাঙা ঘাড়-ভাঙাদের কথা দূরে থাক্, মশা মাছি টিকটিকি পর্য্যন্ত যে শান্ত-শিষ্ট ভাব দেখিয়েছেন তা কোনোকালে কোনো সভায় গিয়ে মানুষ পারেনি, পারবেও না। হেড়েলের ডাকের মধ্যে কে-জানে সেদিন কেমন-একটি অপূর্ব্ব-কোমল সুর লেগেছিল—অর্গানের তিন সপ্তকে যতগুলি কোমল-কালো সুর সবগুলি একই সঙ্গে! আর রাজহংসের গলা থেকে কড়ি সুরের ঝরণা কারুণ্যরসে সবাইকে বিগলিত-প্রায় ক'রে দিয়েছিল। (বেশ, বেশ, আহা!)

প্রার্থনা

কী অপূর্ব্ব সঙ্গীত, কী স্বর্গীয় সুধাময় সুস্বর! আহা কী দেখ্‌লেম, কী শুন্‌লেম, জীবন ধন্য হ'ল, আত্মা পবিত্র হ'ল, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল! শান্তিঃ, শান্তিঃ, চারিদিকে শান্তিঃ! উত্তরে শান্তি, দক্ষিণে শান্তি, পূর্ব্বে শান্তি, পশ্চিমে শান্তি, উর্দ্ধে শান্তি, অধে শান্তি, ভিতরে শান্তি, বাহিরে শান্তি, অন্তরের অন্তরে গভীর প্রেম বিপুল শান্তি! হে পশুপতি, তুমি কত করুণাময়, তুমিই ধন্য, ধন্য তোমার সৃষ্টি, অবোধ অবোলা জীব-জন্তুদেরও প্রাণে এত মায়া, এত ভালোবাসা, এত প্রেম, এমন গভীর পরহিতৈষণা—আহা! মানুষ দেখ, শেখ, ধন্য হও, শান্তিরস্তু জীবংচান্তু, সঙ্গীত!

জাতীয় সঙ্গীত

আর না—আর না—
তোলোরে তোলো ফণা—মেলোরে মেলো ডানা
আর না—আর না—
হাম্বুর হাম্বুর গরজনে,
কাঁপুক অম্বর ক্ষণে ক্ষণে,
ত্রাসিত মানব রণে-বনে
উঠুক ভীষণ কান্না,
আর না—আর না—
(কোরাস)
ঘাসদায়িনী, মাসহারিনী,
শিংঅশালিনী গো!
নথমালিনি হো
ম্যা ম্যা গাঁ গোঁ
পিচ্‌কচ্‌ক্ কাঁ্যা কোঁ! (করতালি)

ঘুণাক্ষর রিপোর্ট

সভার আরম্ভেই ছোট-বড় খাদ্যখাদক-অভেদে সমস্ত জীব-জন্তুতে মিলে কোলাকুলি, সে এক অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় দৃশ্য, সকলেই এমন আবিষ্ট হয়েছিলেন যে আলিঙ্গন-চুম্বনের হুল্লোড় হয়ে গেল! আর কোলাকুলি গলা-গলি পাকড়া-পাকড়ি থেকে দু-একটা রক্তপাত যে ঘটেনি, তা নয়। আমাদের শৃগাল-ভায়া এম্‌নি প্রেমভরে পাতি-পুকুরের হাঁস-গিন্নির গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন যে, তাতে ক'রে গিন্নির সরুগলা তখনি বাতাহত মৃণাল-দণ্ডের মতো ভেঙে পড়্‌লো, নেকড়ে-বাঘের সঙ্গে কোলাকুলিতে ভেড়ার, আর গো-বাঘার সঙ্গে জাপ্‌টা-জাপটিতে ঘোড়ার ওই একই দশা হয়েছিল! প্রতিপক্ষেরা হয়তো বল্‌বেন, যে খায় আর যাকে খায় এ-দুজনে কোলাকুলি কর্‌তে গেলেই এই ফল, কিন্তু আমরা জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি প্রেমের আতিশয্যই হচ্ছে এই সামান্য দুর্ঘটনার মূল, তাছাড়া বৃহৎ কাজে এমন হয়েই থাকে! সুতরাং এ-সব ছোটখাট দুর্ঘটনাতে মন না দিয়ে সভ্যগণকে সভার কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ ক'রে গগনভেদ-পক্ষী—তিনি তারস্বরে যে তিন মহাপ্রাণ জীব জেন্ত-সভার সূত্রপাতেই স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিলেন, তাঁদের অমর আত্মার কল্যাণের জন্য পশুপতি-স্তোত্র পাঠ ক'রে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা কর্‌লেন।

শ্যামদেশের মহাস্থবির শ্বেতহস্তীর 'সর্ব্ব-জীবে দয়া' নামে প্রবন্ধ পাঠ এবং জীব-হিংসা-নিবারণ-কল্পে এক পিঞ্জরাপোলের প্রস্তাব করার কথা ছিল, কিন্তু বক্তৃতা-মঞ্চে

ওঠ্‌বার মুখেই তাঁর গোদা-পায়ের চাপনে একটা উইঢিপি মায়্‌পিপীলিকা-বংশ ধ্বংস হয়ে গেল, শ্বেতহস্তীর সেটা খবরই হ'ল না। কোলা ব্যাং কট্‌কট্‌ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে হস্তীর দৃষ্টি এই দুর্ঘটনার দিকে আকর্ষণ করায়, সেই মহাকায় নিকায় পাঠ ক'রে অনুতাপ করতে থাক্‌লেন, কাজেই তাঁর ঐ প্রস্তাব-দুটোই আর সভাতে উপস্থিত করা হ'ল না।

শেষ

পরিশেষে বক্তব্য যে, তোতারাম বাবাজী যেমন কইলেন, সম্পাদক সজারু চতুষ্পদীতে তাই লিখে নিলেন। এই রিপোর্ট অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, কেননা এ জানা কথা যে, তোতা—তিনি যা শোনেন তাই আউড়ে যেতে একেবারে পাকা। আর মাছি, তিনি মাছি-মারা কাপি যখন নিয়েছেন, তখন এতে ভুল-ভ্রান্তি নাই বল্লেও চলে। সেই আমাদের ধন্য-বাদের পাত্র মাছি ও তোতারাম, তাঁদের আসল নাম-ধাম প্রকাশ করা গেল না, কেননা ইদানীং তাঁরা রাজনীতি সমাজনীতি এ-সব থেকে আড়ালে আবডালে থাকাই মানস করেছেন, কেবল আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই এবারের মতো এঁরা আমাদের সভায় রিপোর্টার ও কাপ্রিইষ্ট পদ গ্রহণ ক'রে-ছিলেন। অপর পৃষ্ঠায় তোতারামের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল। ইতি।

অস্থায়ী সম্পাদক
সজারু

জেন্ত-সভার বিস্তারিত বিবরণী

চট্টগ্রামের কুঁকড়ো, কালেজ-স্কোয়ারের তোতা-পণ্ডিত এবং মিষ্টর হনুম্যান অফ্‌ কলা-গাছি দ্বারায় লিখিত ও প্রকাশিত।

সভার স্থান—আলিপুর চিড়িয়াখানার গোলবাগিচা।

কাল—ইলেবন্‌ থার্ট্টি পি-এম, মুন্‌ডে, ফার্ষ্ট মে পাংচুয়ালি।

কার্য্য-তালিকা—(ক) সভাপতি-নির্ব্বাচন। (খ) মানব-জাতিকে জাতচ্যুত করার প্রস্তাব এবং তদ্বিষয়ে কি উপায় অবলম্বনীয়। সে বিষয়ে গবেষণা। যাঁহারা মানব-জাতির দফা-রফায় মত দিবেন, তাঁহারা বামহস্ত উঠাইবেন, যাঁহারা মানব-জাতির সহিত রফা করিয়া চলিতে চাহেন, তাঁহারা দক্ষিণ হস্ত উঠাইবেন। (গ) প্রধান প্রধান বক্তাগণের নাম—সিংহ, ব্যাঘ্র, হয়, হস্তী, হরবোলা, শৃগাল, কুক্কুর ইত্যাদি। (ঘ) চিড়িয়াখানার ডাক্তারের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য চাঁদা-সংগ্রহ এবং মৃত ডাক্তারের স্থানে মানুষ না হইয়া ঐ পদে কোনো পশু কেন না বসিবেন, এই মর্ম্মে পার্‌লামেণ্ট মহা-সভায় শোকপ্রকাশকারী এক ল্যামেণ্টেব্‌ল্‌ দরখাস্ত প্রেরণ ও এদেশে রীতিমত আজিটেসন্‌ বা আন্দোলন করার প্রস্তাব।

মুচিখোলার থেকে আরম্ভ ক'রে যেখান-কার যত ময়ূর আর বকের পালক-ধারীদের চিড়িয়াখানা আছে, সবগুলো থেকেই মোড়ল মাতব্বর নামজাদা খগেন্দ্রগণ তো এসেছেনই, তা ছাড়া ঝাঁটা-গোঁফ লম্বাদাড়ি ধাড়িবাচ্চা চুনোপুঁটি মাকড়-ধোকড় ফিড়িং-ফড়িং কাগা-বগা কেউ আর আস্‌তে কসুর করেন নি।

আলিপুরের অতবড় যে বাগান, তার

অলি-গলি মাঠ-ময়দান একেবারে জীবে জীবারণ্য হয়ে গেছে—শিং ঝুটি আর ল্যাজে গিস্‌ গিস্‌ করছে, কিন্তু সভার পূর্ব্বদিনে চিড়িয়াখানার সিবিল-সার্জ্জনের হঠাৎ মশার কামড়ে অকালে মৃত্যু হওয়ায় সকলের মুখেই —এমন-কি উদ্যানের তরু-লতাগুলির উপরেও —যেন কি-যেন কি-একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে। ওর মধ্যে যারা ডাক্তারকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এমন-সব সুসভ্য জানোয়ার, তাঁরা অশৌচ চিহ্ন কাছা প'রেই এসেছেন আর হাম্‌বড়া নব্য জানোয়ারের দল, তারা কাছা-কোঁচা দুই বর্জ্জন ক'রে জলোর উপরে কালো এক-একটুকরো ফিতে লাগিয়ে গোম্‌সা-মুখে এদিক-ওদিক করছে! এখানে-ওখানে হোম্‌রা-চোম্‌রা সভ্য জন্তুরা দল বেঁধে খুব উৎসাহের সঙ্গে সভার কাজ কি ভাবে চল্‌বে, কি কি নিয়ম-কানুন হবে, কাকেই বা সভাপতি করা যাবে, এই-সব নানা দরকারী তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত রয়েছেন। হেট্ট-কোট্‌-চশমাতে ফিট্‌ফাট্‌ মিষ্টর হনুম্যেন্‌কে আস্‌তে দেখে গাছতলায় বনমানুষ ব'লে উঠ্‌লেন,—"ইনি যে মানুষের নিকট-সম্পর্কে কেউ, সেটা বোঝাতে এঁর যে বিশেষ চেষ্টা রয়েছে তা বেশই বোঝাচ্ছে ওঁর বেশ।"

বহুরূপী বল্লেন—'মানুষের অনুকরণটা কিন্তু করেছে দিব্বি।'

বনমানুষ চোখ মট্‌কে বল্লেন—'অনুকরণ এক, আর হনুকরণ অন্য জিনিষ।'

ঘাসের মধ্যে থেকে সাপ ফোঁস ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—'ইস্‌, ভঙ্গিমা দেখ! লজ্জা নেই, ছুস্‌!'

বুড়ো দাঁড়কাক গাছের উপর থেকে জবাব দিলে—'ছ্যাঃ, মানুষের চাল-চোল বানরে কখনো সাজে? ভারতচন্দ্র তো স্পষ্টই ব'লে গেছেন 'যার যাহা তারে সাজে'।'

হুতুম-পেঁচা দাঁড়কাককে সাধুবাদ দিয়ে হনুর দিকে চেয়ে কেবলি বল্‌তে থাক্‌লো—'ছুয়ো ছুয়ো, সাত-নকলে আসল ভেস্তা।'

গোদাচিল সে ছড়াও জানেনা পড়াও পড়েনা, কিন্তু তবু কাক আর পেঁচার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়্‌ছে দেখে, হর-বোলা পাখী চিলকে ঠেস্‌ দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—'পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ-সমস্যা পূরায়, মূর্খে নাহি বুঝে তাহা জুল্‌-জুল্‌ চায়!' বহুরূপীর বিশ্বাস ছিল রংতামাসায় তার মতো কেউ নেই, কিন্তু হরবোলা গোদাচিলের সঙ্গে ভালো রং ক'রে নিলে দেখে হিংসেতে বেচারা প্রথমে আগা-গোড়া রাঙা—তারপর একেবারে নীলবর্ণ হয়ে গেল!

এই সময় ধ্যান ভেঙে কচ্ছপ খোলা থেকে মুখটি বার ক'রে বলে উঠ্‌লেন—'বুঝেচো কিনা, জীবনটা অতি-প্রকাণ্ড একটা স্বপ্ন-বিশেষ, এরি-জন্যে আবার ঝগড়া-ঝাটি মারা-মারি! আপনার মধ্যে আপনি একবার তলিয়ে দেখ দেখি, জগৎই বা কি তুমিই বা কে আর—জগৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি'—ব'লেই কচ্ছপ ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। আকাশ থেকে একদল তাল-চড়াই কিচ্‌মিচ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—'হেসে খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে।' নতুন-পালক-ওঠা পিঁপড়ে, শোনা-যায়-না এমনি মিহি সুরে একবার বল্লে—'কবে যাবে তুমি শিঙে ফুকে,' তারপরেই সে আকাশে উড়ে পড়্‌লো আর সঙ্গে সঙ্গেই তার পীপড়ে-লীলাও সাঙ্গ হ'ল। শুঁয়ো-পোকা

এই দেখে ঝাঁটা-গোঁফ ফুলিয়ে আওড়ালে—
'পাঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে।'

এইবার সভার কার্য্যারম্ভের ঘণ্টা পড়্লো। জীব-জন্তু যে যেখানে ছিলেন একে একে গোল চান্‌কাতে এসে তালি দেবার জন্যে ল্যেজ আর বক্তৃতা শোন্‌বার জন্যে কান খাড়া ক'রে বস্‌লেন। সবাই চুপচাপ রয়েছেন, এমন সময় গাধা, তিনি হঠাৎ 'গোল হচ্ছে' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন! একটা কানা-মাছি ছাড়া গাধার কাছে আর কেউ গোল বাধায় নি, গোল চান্‌কাতে সবাই গোল হয়েই চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু তবু গাধা 'চোপ্ চোপ' শব্দে আসর সরগরম ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা করতে থাক্‌লেন। গাধার বন্ধুবান্ধবরা মিলে তাঁর জন্যে একটা বক্তৃতা লিখে দিয়েছিল, কেবল গলার জোরেই তিনি সবাইকে মাতিয়ে তুল্‌তে পার্‌বেন এই বিশ্বাসে প্রথম বক্তৃতার ভার গাধার উপরেই পড়েছিল। দু-চারজন দুষ্টু জন্তু কাণাকাণি করতে লাগ্‌লো —কেমন ক'রে পিছন হটে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে হবে, গাধা এই বিষয়েই বল্‌বেন। যাহোক গর্দ্দভ, কে কোথায় বাহবা দিচ্ছে তারি একটুও হাততালি যেন না এড়িয়ে যায় এই মৎলবে দুই কান খাড়া ক'রে, লেজ নেড়ে বক্তৃতা সুরু কর্‌লেন।

"লম্বাকান জাত্‌ভাইগণ, চার-ঠেং দুই-ঠেং স্বদেশী-বিদেশী পাড়াপড়্‌সী ও বনবাসিগণ, আজিকার এই জন্তু-সভায় সভাপতি নির্ব্বাচন হ'ল একটি প্রধান কাজ। এটা কারো জান্‌তে বাকি নেই যে যিনি আজ এ সভায় সভাপতি হবেন, তাঁকে গুরুতর কাজের ভার নিতে হবেই হবে। মানুষের কাছে দাসত্ব করতে করতে দুঃখের বোঝা বইতে বইতে আমাদের চারখানা পা ভেঙে পড়বার যোগাড় হয়েছে, পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে, এ অবস্থায় সব জীবের ভার লাঘব ক'রে নিজের স্কন্ধে নিতে পারে এমন-একজন আমি ছাড়া আর কে আছে? আমরা চতুর্দ্দশ পুরুষেরও চতুর্দ্দশ-পুরুষ ধ'রে ভারই বহন ক'রে আস্‌ছি, দেবতা থেকে ধোপার মোট পর্য্যন্ত কি না আমাদের বইতে হচ্ছে, ভার বইতে বইতে পিঠে কড়া পড়ে গেল এম্‌নি যে, সেটা বংশ-গত একটা গুণের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের! অতএব এস আর্ত্ত আত্মীয়-কুটুম্ব, এস দেশী-বিদেশী পাড়াপড়্‌শী, যে যেখানে আছ সবাই মিলে সভাপতির গুরু-ভার আমার উপরে চাপিয়ে দাও, আমি অনায়াসে তোমাদের সব কার্য্যভার, বিপদভার, আপদভার, আনন্দ-ভার গ্রহণ কর্‌ছি, দাও! এটা তোমাদের দু'বার ক'রে বল্‌তে হবে না যে, যেমন সইতে তেমনি বইতে, তেম্‌নি আবার গোঁসা ক'রে নিজে গোঁ বজায় রাখ্‌তে আর-কিছুর উপরে পদাঘাত কর্‌তে, গাধার মতো আজন্ম-সিদ্ধ কেউ নেই—"

গাধা ব'লে চলেছেন এমন সময় জীরাফ্, তাঁর রেকের মতো গলাটা উঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন —"চিরটাকাল মানুষের গোলামি আর যমের বাড়ীর যাত্রীদের গাড়ী টেনে এসে এখন জেন্তু-সভার সভাপতি হ'তে চায় গাধা, এ কি আস্পর্দ্ধা!"

জীরাফের কথায় গাধা ভীষণ চটে অভ্যাস-মতো জোড়াপায়ে লাথি চালাতে যাবেন, এমন সময় ভল্লুক 'থামো থামো' ব'লে এক ধমকে গাধাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে বল্‌তে সুরু কর্‌লেন—

"ভাই সকল, একে এই কল্‌কাতার দুরন্ত গরমে তিষ্ঠানো ভার, তার উপর তোমরা সবাই যদি গরম হয়ে উঠে হাতাহাতি লাথা-লাথি করতে থাক, তবে আমাকেও পৃথিবীর শেষ বরফের দেশে ফিরে যেতে হবে, যাবার পূর্ব্বে দু-চার চড়া কথা শুনিয়ে। বরফের দেশে হিম্‌সিম্ আমি যথেষ্ট খেতে পাই, কেবল তোমাদের মুখ চেয়েই আমি কষ্ট ক'রে—এক রকম উপোস ক'রেই—এখানে কাটাচ্ছি, এখন সবাই যদি মানুষের মতো অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে এই সভার মধ্যেকার এবং প্রত্যেকের প্রাণের মধ্যেকার জমাট প্রেমের ক্ষীণধারাটি পর্য্যন্ত শুকিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা কর, তবে ভালো হবে না বল্‌ছি।"

বরফের দেশের ভালুকের গলা পেয়ে উত্তর আর দক্ষিণ সাগরের 'শীল'-মাছগুলো কাঁপ্‌ছে দেখে, সিংহ 'চোপরও' ব'লে ভল্লুককে থামিয়ে দিলেন। এই ফাঁকে রতা-শেয়ালটা কখন্ গিয়ে বক্তার মাচায় উঠে জাঁকিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ ক'রে দিলে! দু-এক কথায় শেয়াল সব জানোয়ারদের বুঝিয়ে দিলে যে, পশুপতির যেমন ত্রিশূল, ইন্দ্রের যেমন বজ্র, প্রজাপতির যেমন কমণ্ডলু, তেম্‌নি সভাপতির একটা অস্ত্র হচ্ছে ঘণ্টা, আর সেই ঘণ্টা একমাত্র ধর্ম্মের ষাঁড়ের গলাতেই ঝোলানো দেখা যাচ্ছে, অতএব ষাঁড়ই সভাপতি হবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র!"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ষাঁড়ই গলঘণ্টা আর গল-কম্বল দুলিয়ে সভাপতির আসনে গিয়ে বস্‌লেন। ডালকুত্তো এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, ঘণ্টার শব্দে হঠাৎ চম্‌কে উঠে ভাব্‌লে তার মনিব আফিসের বাবুকে ডাকতে বুঝি ঘণ্টা দিলেন, অম্‌নি কুত্তোটা 'কোই হ্যায়' ব'লে হাঁক দিয়ে চারিদিক চাইতে লাগ্‌লো। কুত্তোর রকম দেখে নেকড়ে-বাঘ একবার নাক সিট্‌কে মুখ ফেরালে। বেরাল হাঁসের একটা কলম কেড়ে রাতের শিশিরে ভিজে গা একবার ঝাড়া দিয়ে, সট্‌পট্ নোট নিতে লেগে গেল। তোতাপাখী গিয়ে বক্তা আর শ্রোতা দুইজনের মধ্যে বসে রিপোর্ট নিতে লাগ্‌লেন—

এইবার রক্তমাখা কটা-চুল সিংহ ঝাঁকড়া মাথা ঝাড়া দিয়ে গম্ভীর মুখে সভার মধ্যিখানে উঠে বল্‌তে সুরু কর্‌লেন। যেন মেঘ ডাকছে এম্‌নি গুরু-গম্ভীর আওয়াজে সিংহনাদ ক'রে তিনি মানুষের অত্যাচার আর অবিচারের কথা বর্ণনা ক'রে বল্লেন—"এই মানুষের হাত থেকে বাঁচ্‌বার এক রাস্তা, আর সে রাস্তা তোমাদের সবার জন্যে খোলা রয়েছে! এস আমার সঙ্গে জন-মানব-শূন্য সুদূর খাণ্ডব বনে। অতি-নির্জ্জন সে স্থান তেপান্তর মাঠে ঘেরা, মরুভূমির মধ্যেকার ওয়েসিস্ সেটি, বর্ব্বর মানুষগুলো তার ত্রিসীমানায় যেতে পারে না এমন দুর্গম ভীষণ সে স্থান! মানুষের যত বড়াই লোকালয়ের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে, ফাঁকায় আর নিরালায় পেলেই আমরা তাদের ঘাড় মট্‌কে রক্ত পান করি।"—এই সময় বাঘের দিকে চেয়ে একটা গরু দুবার গলা-খাঁকানি দিতে, সিংহ একটুখানি মুচ্‌কে হেসে বল্লেন—"এ-কথা আমি কাউকে ইঙ্গিত কিম্বা ঠেস্ দিয়ে বল্‌ছিনে, সত্যিই বলি মানুষের মধ্যে সিংহ-বিক্রম এমন কে আছে যে রণে বনে আমাদের সামনে এগোতে পারে!"

সুন্দর-বনের বাঘ এই শুনে কাষ্ঠহাসি

হেসে ঝাঁটা-গোঁফ দু'বার মুচড়ে একবার ভাঙা গলায় বাহবা ব'লে হাততালি দিলে। তারপর সিংহ মরুভূমির চমৎকার শোভা শান্তি মুক্তি আর নির্ভয় আনন্দময় জীবনের একটি বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা বন্ধ করলেন।

হাতি উঠে প্রস্তাব করলেন যে, সকলকে নিয়ে ছোট-নাগপুরে নাগাপর্ব্বতে যাওয়াই ঠিক, কেননা সেখানে হাতি-চোখের গাছ যথেষ্ট পাওয়া যায়, দাঁতে চিবিয়ে খাবার সামগ্রীর কোনদিন কারুর অভাব হবে না, তবে খাবার-জলের একটু কষ্ট হবে, কিন্তু যদি উট মোষ হাতি আর মশা এঁরা মোষক কুঁজো পিচ্‌কিরি আর নল ভ'রে ভ'রে পাহাড়ে তুলে দেন, তবে জলার জল সমস্তই পাহাড়ে গিয়ে উঠ্‌বে জালা জালা, জীবের জল-কষ্টও সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে।"

হাতির প্রতিবাদ ক'রে জল-হস্তী ব'লে উঠ্‌লেন—"জলার জল জলাতে রাখ্‌লেই মঙ্গল, মিষ্টিও থাক্‌বে ঠাণ্ডাও থাক্‌বে, নয়তো হাতিরা সবাই গিয়ে জলায় জল তুল্‌তে নাম্‌লে জল কাদায় এমন ঘোলা হবে যে, সে জল কারুর আর মুখে দিতে হবে না।"

কুকুর এই সময় হঠাৎ মাথা গরম ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"তোমরা যাই বল আমি তো বলি, সহরে থাকায় যেমন সুখ এমন আর কোথাও নয়!"

গো-বাঘা, নেকড়ে আর হেড়েল তিনজনে পড়ে কুকুরের কোটের লেজ ধ'রে টেনে বসালে। তখন সুন্দর-বনের বাঘ হুঙ্কার দিয়ে মাচায় লাফিয়ে উঠে লেজ আফ্‌সে বক্তৃতা আরম্ভ করলে—"আমরা লড়াই দেবো, খুন জখম রক্তপাত করবো, মানুষের জাত-কে-জাত পৃথিবী থেকে লোপ ক'রে দেবো! এসো সব বড় বড় জানোয়ার সেনাপতি হয়ে এগিয়ে এসো, আর ছোটখাটো জীবজন্তু, তোমরাও ভয়ে পিছিও না। ছোট হ'লে কি হয়, গ্রীসের ইতিহাস যদি পড়ে দেখ তবে দেখ্‌বে, অত-বড় 'টেরাগোনা' তাকেও জনকতক খরগোস মিলে রসাতলে পাঠিয়েছিল, বীর আলেকজান্দার তুচ্ছ একটুখানি মদের পেয়ালার কাছে পরাভূত হ'লেন, আর আমাদের হনুমান রাবণের লঙ্কা দগ্ধ করলেন, কাঠবেরালী সমুদ্র বাঁধ্‌লেন, এতটুকু লাঙলের ফলায় অতবড় যদু-বংশটা ধ্বংস হয়ে গেল! ঝোপ বুঝে কোপ্ মার্‌তে পার্‌লে টুনটুনিও হাতিকে সাব্‌ড়ে দিতে পারে, আর আমরা মানুষগুলোকে নির্ব্বংশ করতে পারবো না? আর নিস্তার নেই, জগৎ-জোড়া মানব-রাজত্ব এইবার শেষ হ'ল দেখ্‌ছি। দুরন্ত মানুষ বন সব কেটে কি অত্যাচারই না করছে জন্তুদের উপরে! আমাদের ঘর-ছাড়া করছে, জঙ্গল জালিয়ে দিচ্ছে, মাঠ সব চষে ফেল্‌ছে। নিজেদের ঘর ওঠাতে, ক্ষেত বসাতে, গলিজ সহর ওঠাতে, রেলগাড়ী চালাতে, চুলো ধরাতে, গোরূপা পৃথিবী—যিনি জীবজন্তু সবার মায়ের তুল্য, তাঁরও বুকে সাবল আর কোদাল বসাতে মানুষ একটুও ইতস্ততঃ করছে না, আর নিজের গায়ে শক্তি বাড়াবে ব'লে মানুষ ঘাড় মট্‌কে পুড়িয়ে ঝল্‌সে পাখী থেকে আরম্ভ ক'রে জলের তলাকার গুগ্‌লীটা পর্য্যন্ত—কার মাংস যে না খাচ্ছে তাতো জানিনে। দুহাতে ডাইনে-বাঁয়ে মানুষ সব জন্তুকে খুন ক'রে চলেছে। হরিণ আর বাঘ মেরে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তার উপরে বসে

যোগ যাগ না করলে তাদের ধর্ম্মকর্ম্মই হয় না, জলের কুমীর ডাঙার বাঘ মেরে এদের নখের ইষ্টিকবচ ধারণ ক'রে আর আমাদের চর্ব্বি মালিশ ক'রে, তারা নিজেদের গায়ের বাত সারাতে চলে। চিড়িয়াখানায় আমাদের বন্ধ রেখে তারা মজা দেখে, আর জেন্ত অবস্থায় খাঁচায় বন্ধ থেকে যখন আমরা আধ-পেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরি, তখন আমাদের ছালখানার মধ্যে খড় পুরে যাদুঘরে কাচের ভিতরে, তারা নানা ভঙ্গীতে সংএর মতো আমাদের সাজিয়ে রাখে, এম্‌নি বজ্জাত মানুষগুলো! দাও তাদের ঘাড় মট্‌কে, খাও তাদের মাথাগুলো কড়মড়িয়ে চিবিয়ে!"

বাঘের বক্তৃতা শুনে কচি পাঁঠাগুলোর চোখ দিয়ে দর দর ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো দেখে বাঘের নিজের জিভেও জল এল, বাঘের নখগুলো এতক্ষণ খাবার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল, পাঁঠার ভক্তি দেখে ধারালো সব নখ যেন সেই ছাগলছানাদের আশীর্ব্বাদ করার জন্যে বেরিয়ে এল! বাঘ ভাবে গদ গদ হয়ে ছাগলটির দিকে হাত বাড়িয়ে ব'লে চল্লেন—"আহা বাছা কাঁদ্‌বে বইকি, মানুষ নিজের ছেলে মেয়ের বিয়েতে তোমার মা-বাপ দুজনকেই কালিঘাটে হাড়কাটে বলি দিয়ে নিজের জ্ঞাতি-ভোজন করিয়ে যথেষ্ট আমোদ পেয়েছে, লেজা মুড়ো ছাল চামড়া এমন-কি ক্ষুর-কথানাও তারা ফেল্‌তে দেয়নি, এমন চেটেপুটে তারা পাঁটার ঝোল খেয়ে গেছে যে আমি যে বাঘ—আমিও তেমনটি করতে লজ্জা পাই, কি লজ্জা কি লজ্জা! এই সসাগরা পৃথিবী তো এককালে আমাদেরই ছিল—তখন তো কোনো বালাই ছিল না—খাও দাও সুখে ঘর-করা কর, মানুষ যেম্‌নি এল অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে এল তার বন্দুক, আর এল হঠাৎ মৃত্যু, হঠাৎ অপঘাত মৃত্যু, অপমৃত্যু, দুঃখ-শোক, ভয়-ভাবনা আর যন্ত্রণা বনবাসীদের জন্যে! বন্ধুগণ, একতার ধ্বজা তোলো, ছোট-বড় সব লেজ উঠুক আকাশের দিকে, বল একসুরে 'জয় জীব-জন্তু জঙ্গলম্।' চুলোয় যাক্ মানুষের প্রতাপ!" হাম্বুর হাম্বুর ক'রে তিনবার হাঁক দিয়ে বাঘ আসন গ্রহণ করলেন।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে পেন্সন-পাওয়া পিঁজরাপোলের একটা বেতো ঘোড়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বল্লে—"ভদ্র বনচরগণ, রাজনীতি-ক্ষেত্র আমার নয়, কেননা সবুজ ক্ষেতে আর মাঠে বাজির খেলা নিয়েই আমি সারা-জীবনটাই প্রায় কাটিয়েছি, অতএব আমি —আমার এ জীবনে মানুষের সম্পর্কে এসে কি দুঃখ পেয়েছি, সেইটুকুই কেবল বলি। একদিন ছিল যখন তাজী ঘোড়া ব'লে মানুষ আমাকে সোনার গাম্‌লাতে রাজার হালে দানাপানি দিয়েছে, তারপর একদিন এল যখনি কেবলি অনাদর আর চাবুক আর হাড়ভাঙা খাটুনি। ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবার বংশধর আমি, আমার শিরায় শিরায় রক্তের বদলে সোমরস চলেছে—সবুজ ঘাসের, সবুজ পত্রের কাঁচা আর টাট্‌কা রস! কিন্তু হায়, তবুও আমি আমার মানুষ-মনিবকে ঘোড়দৌড়ের 'বাজি-খেলার জুয়োচুরীতে জিতিয়ে দিতে অপারগ হ'লেম! মনিব হতাশ হয়ে আমাকে গোলামের মতো বাজারে নিয়ে বিক্রি ক'রে গেল! কিন্তু তখনো দুর্দ্দশার চরম হয়নি, আমি রাজার ডাক-গাড়ী টান্‌বার ভার পেলুম।

আর যাই হোক সুখ আর মান-সম্ভ্রমের হানি তখনো বড়-একটা হয়নি, কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ কলের গাড়ির ডাক এনে হাজির করলে, সেইদিন থেকে আমার অন্ন গেল, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্দ্দশার পর দুর্দ্দশায় আমি মরণাপন্ন হয়ে ঠিকে-গাড়ির আস্তাবল থেকে মুনিষ্যি-পালের ময়লা-গাড়ি টান্‌তে টান্‌তে খোঁড়া হয়ে শেষে পিঁজ্‌রাপোলে গিয়ে পড়লেম! এখন মলেই বাঁচি, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, তোমরা যেমন ক'রে পারো কলের গাড়ির রাস্তা বন্ধ কর, আর সভা থেকে একটা একটা খোলা গোচারণের মাঠের ব্যবস্থা কর—যাতে-ক'রে দুর্ব্বল আমরা আর একবার সবুজপত্র সবুজ ঘাসের আস্বাদ পেয়ে, নবজীবন লাভ ক'রে জেন্ত-সভাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে পক্ষিরাজ ঘোড়া-রূপে স্বর্গ-পথে যাত্রা করি। উচ্চৈশ্রবার শেষ-সন্তান আমরা, বাস্তবিকই আপনাদের কৃপাপাত্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।"

সভাপতি ষাঁড় ঘোড়ার দুঃখ-কাহিনী আর গোচারণের মাঠগুলির কথা শুনে এতই কাতর হ'লেন যে, দশমিনিটের জন্যে সভার কাজ বন্ধ রাখ্‌বার জন্যে তিনি ঘণ্টা দিয়ে একবার বাইরে বিশ্রাম করতে চল্লেন। জল-চরগণ এই সময় একবার খালে-বিলে নেমে জলযোগ ক'রে নিতে লাগ্‌লো; খেচরদের মধ্যে কেউ কেউ উড়ে উড়ে একটু হাওয়া খেয়ে নিলে, আর উভচর আর স্থলচর, তারা—কেউ স্থল-পদ্মের দাঁটা, কেউ-বা মাছের কাঁটা, কেউ মুরগীর ঠেং, কেউ-বা তার চেয়ে মোটা হাড় দাঁতে ভেঙে চট্‌পট্ ব্রেক-ফাষ্ট ক'রে নিতে লাগ্‌লো।

দশ-মিনিটের পরে আবার টুং টাং ক'রে গলঘণ্টা বাজিয়ে ষাঁড় মাঠ থেকে এসে মাচায় ঢুকলেন, সবাই যে যার জায়গায় বস্‌লে, বাঘেশ্বরী রাগিণীতে রায়-বাঘিনীদের জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল:—

(রাগিণী বাঘেশ্বরী)

নীলাং অম্বরাং মেঘৈর্মে দূরাং নমামি
[তোমারে!
ঘটা-জালিকা মেঘমালিকা বায়ুরূপিকা
হেমা ধরণী জনম-দায়িনী!
জগজন-মন-মোহিনী, পশুপতি-শিশুপালিনী
[ত্বম্!

(কোরাস্)

ফলং জলং ফিড়িং ফড়িং
পী চক্ চক্ ফটীক্ জল্!

মাথার উপরে আকাশ আরো নীল হয়ে উঠুক, নিশাচরদের সুখের রাত্রি নিরাপদ হয়ে থাকুক, মশার গুঞ্জন মাছির ভোঁন্ ভোঁন্ দিনে-রাতে শোনা যাক্, পৃথিবীর বুকে কেঁচোমাটি কুণ্ডলী পাকিয়ে রমণীর খোঁপার মতো শোভা পাক্, উইঢিবির কীর্ত্তিস্তম্ভ মেঘও ছাড়িয়ে উঠুক্, সুরে এম্‌নি-সব নানা প্রার্থনা জানিয়ে চাতক-পাখী গান শেষ করবার পূর্ব্বেই সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—"বাজে, বোকোনা, কাজের কথা কও, কাজ কাজ!" গাধা ব'লে উঠ্‌লেন—"ওহে পক্ষি, ওই রাগিণীতে 'গা' আর 'ধা' দুটো সুরই তুমি একেবারে বাদ দিয়ে গেয়েছো! ওটা ভুল হ'ল, বঘেশ্বরী ওতে ফুটলোই না!"

কান্দাহারের উট্ প্রস্তাব করলে—"যাতে ক'রে মানুষ নিজের পায়ে হাঁটিতে শেখে ও হাঁটিতে-শেখায় অভ্যস্ত হয় এবং ভবিষ্যতে

বড় বড় জানোয়ারদিগের পৃষ্ঠে না চড়িবার ঐরূপ একটা বন্দোবস্ত সভা হতে তুরন্ত যাতে করা হয়, আমি তাহার জন্য প্রস্তাব করিতেছি এবং সইভাগণের ও সভাপতির দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।"

সভাপতি ষাঁড় দেখলেন সত্যিই প্রস্তাবটা উট করেছেন মন্দ নয়, তিনি উৎসাহিত হয়ে উটকে ডেকে শুধোলেন—"এই ভালো কাজে সভা হতে দিলে তুরস্কের পেরু এবং কাফ্রিস্তানের উট পাখী এঁরা কিছু অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতি জানাতে রাজি কিনা! অষ্ট্রীচ্ ও পেরু দুজনেই গম্ভীর মুখে চুপ রইলেন আর কান্তাহারের উট 'তোবা' ব'লে দু'বার ঘাড় নাড়্‌লে, হাঁ-না কিছুই বোঝা গেল না! শূয়োর উঠে বল্লেন—"মানুষগুলো যতদিন-না বৈষ্ণবধর্ম্ম নেয়, আর কসাইখানাগুলো বন্ধ হয়ে তাদের মধ্যে কেবল কুমড়ো-বলি চলিত হয়, ততদিন জীবের দুঃখু ঘোচা শক্ত। ধর্ম্মের নামে কেউ মাল্‌বে গরু, কেউ শূয়োর, কেউ পাঁঠা—এ হ'লে জীবের রক্ষে কোনোকালে অসম্ভব।"

বন্-বরাহ ঠেস্ দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"শূয়োর যা বল্লেন ঠিক বটে, কিন্তু কসাইখানার সঙ্গে আরো-সব নানা জায়গায় নানা আবর্জ্জনা মানুষেরা জীবকে দুঃখু দেবার জন্যে জড়ো করেছে, সেগুলো সম্বন্ধে শূয়োর কি বলেন?"

শূয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে দু'বার গলা খাঁকানি দিয়ে বরাহের কথায় একটা কড়া জবাব দেবেন, এমন সময় সভাপতি ষাঁড় দুজনকে থামিয়ে বল্লেন—"যাক্, ঘরে কে কি খায় না খায় সে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আপনাদের উচিত হয় না ঝগড়া করা।"

এইবার শৃগাল উঠলেন—এতক্ষণ তিনি কে কি বলে মন দিয়ে শুন্‌ছিলেন আর নোট-বইয়ে টুক্‌ছিলেন—আঙুরের লতার মাচায় ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে শেয়াল আরম্ভ করলেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তারা যা ব'লে প্রস্তাব ক'রে গেলেন, তারি সম্বন্ধে দু'চারটে কথা ব'লে আমি ক্ষান্ত হবো, কিন্তু সেই-সব প্রস্তাব নিয়ে নাড়া-চাড়া করার পূর্ব্বে আমি উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্যবাদ দিচ্চি। এ জীবনে আমি অনেক সভায় গিয়েছি, কিন্তু এমন একপ্রাণে একমনে 'লেজ-নাড়া' আমি কোথাও দেখিনি, দেখ্‌বো না! মানুষের নিজের লেজ নেই। তাই অন্যের লেজ দেখ্‌লে তারা হিংসেতে জল্‌তে থাকে, মানুষ চায় সবাই তাদের মতো নির্লজ্জ লেজ কাটা হয়ে থাকুক। কাজেই ঘোড়ার লেজ তারা কাটে, কুকুরের লেজও, গরুর লেজ, ময়ূরের লেজ কিছুই বাদ দেয় না।"

শেয়ালের কথা শুনে মুড়ো-লেজ ডালকুত্তো চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"ঠিক বলেছ দাদা—তোমাকেও তারা ছাড়ে না!" শেয়াল সে কথায় কান না দিয়ে ব'লে চল্লেন..."এখন কাজের কথা হোক...সিংহের প্রস্তাব-মতো খাণ্ডব-বনে একটা স্বতন্ত্র পশু-রাজত্ব স্থাপন করলে মন্দ হয় না, কিন্তু এটা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, খাণ্ডব-বন যুধিষ্ঠিরের আমলে যেমন ছিল এখন আর তেমন নিরাপদ নেই; প্রথমতঃ জায়গাটা দুরন্ত গরম, সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মধ্যিখানে, যেখানে গরমের দিনে 'লু' চলে! ছাগল ভেড়া

খরগোস এম্‌নি-সব ছোট অথচ বড়দের বিশেষ কাজে লাগে, এমন-সব জন্তুরা সেখানে টিক্‌তেই পার্‌বে না, এর উপর সেখানে দাবানলের ভয় আছে, প্রায়ই খাণ্ডবদহন হয়ে থাকে। কুকুর যে সহরে থাকারই প্রস্তাব করেছেন, সেটা আরামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মন্দ নয়, কিন্তু কুকুর চিরদিনই মানুষ-ঘেঁসা এখনো খুঁজ্‌লে হয় তো তাঁর গলার কলারে একটা বেয়াড়া রকমের নাম দেখা যাবে!" কুকুর কথাটা শুনে ঘাড় চুল্‌কাতে লাগ্‌লো, হরবোলা পাখী সুর ক'রে বল্‌লে—"কানকাটা না হ'লে কি মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতে হয় না?" শেয়াল ব'লে চল্‌লো—"বাঘের তেজস্বী ভাষা শুনে আমারো একবার মনে হয়েছিল—লেগে যাই কোমর বেঁধে লড়ায়ে! এক হিসেবে লড়াই মন্দ নয়.—লড়ে বেঁচে আস্‌তে পার্‌লে। নয়তো কতকগুলো অনাথ অনাথা নিয়ে না-লড়ার দলকে বড় বিপদেই ফেলে যাওয়া হয়। ঘরে ঘরে অনাথ-ভাণ্ডারের চাঁদার খাতা গিয়ে ভদ্র জীবদের বড়ই বিপদ ঘটায়, কাজেই বল্‌তে হচ্ছে লড়াই পুরোপুরি ভালো নয়, ওতে মন্দ ও মিশেল আছে, বিশেষ সত্যের জয় যে সব সময় তা নয়। শূয়োর যা বলেছেন তার মধ্যে ভালো-মন্দ দুই আছে, আর বরাহের প্রস্তাব হগসাহেবের বাজারের উন্নতির জন্যে তুলে রাখ্‌লে মন্দ হয় না, শূয়োর আর বরাহের কথায় যতই সার থাক্‌ না, রাজনীতি-ক্ষেত্রে সেটা কোনো উপকারে আস্‌বে না! কাজেই সকলে দেখ্‌ছেন শান্তি কিম্বা যুদ্ধ, অথবা সিংহের প্রস্তাব-মতো স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন—এ তিনই জীব-সমাজের সবার পক্ষে সমান ফল দেবে না। একথা একবাক্যে স্বীকার কর্‌তে হবে যে, কোথাও একটা গোল আছে এবং সে গোলটা সিধে করা দরকার (সাধু সাধু)। আমি যে উপায় বাৎলাবো সেটা সম্পূর্ণ নতুন, আর এ-পর্য্যন্ত পশু-সমাজে তার কোনো পরীক্ষা হয়নি (শোনো শোনো, চুপচুপ)—এস, আমরা সকলে জ্ঞানলাভের জন্যে উঠে-প'ড়ে লাগি—কেননা জ্ঞানের আর বিজ্ঞানের পথই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পথ, 'জ্ঞানাৎপরতরংনহি'—মানুষেই এই কথা বলেছে। কেননা আমরা মানব-জাতির ইতিহাস থেকে এটা শিখে নেবো, আমাদেরই-বা কেননা বিশ্ববিদ্যালয় থাক্‌বে, জাতীয় মহাসমিতি থাক্‌বে, আর থাক্‌বে একটা মুখপত্র যেখানে পরে পরে আমরা নিজেদের অভাব-অভিযোগ-গুলো জাগতে বিশ্ব-সমাজের সাম্‌নে ধ'রে দিতে পারি, আমাদের আশা, উদ্যম, রীতি-নীতি, ঘরের কথা, বাইরের কথা সবই কেননা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে সবার হাতে পড়বে?

মানুষদের মধ্যে যারা প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে নাড়া-চাড়া করে, তারা মনে করে দু-একটা মরা জানোয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে আমাদের হাড়হদ্দ সবই জেনে নেবে, সেটা বড় ভুল। জানোয়ারের কথা এক জানোয়ারেই লিখ্‌তে পারে, কিসে তাদের সুখ কোথায় তাদের ব্যথা সে কেবল তারাই খুলে বল্‌তে পারে, যাদের যাদের সুখ-দুঃখ আনন্দময় জীবন গুলো মানুষের চাপনে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে!" এইখানে আবেগে শৃগালের কণ্ঠরোধ হ'ল, তিনি একটু আঙুরের রসে গলা ভিজিয়ে আবার সুরু কর্‌লেন—"আমাদের দুঃখ-কাহিনী আমাদেরই লিখ্‌তে

হবে, সেজন্যে এখন থেকে প্রস্তুত হওয়া চাইই চাই!" শৃগাল উৎসাহের সঙ্গে আরো বল্‌তে চলেছেন এমন সময় সভাপতি সভা-ভঙ্গের ঘণ্টা দিয়ে হঠাৎ মাঠের দিকে প্রস্থান কর্‌লেন—সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার প্রস্তাব হওয়ার আগেই। কাজেই অসময়ে সভা থেকে সবাইকে চ'লে যেতে হ'ল, কোনো প্রস্তাবই সমর্থন, গ্রহণ কিম্বা কিছুই হ'ল না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(ফরাসী হইতে চুরি)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
কলিকাতা।

যৌবনের ছিট

পুঁজিপাটা নিয়ে সহরের বাইরে মাঠের মাঝখানে যে ডাকবাংলাটাতে আমি গিয়ে আশ্রয় নিলাম তা' থেকে কুড়ি গজ আন্দাজ দূরে নদী। বাড়ীর সুমুখের কঙ্কালসার রাস্তাটা যেখানে সহরের দিকে মোড় ফিরেছে, সেইখানে, ঝাউবনের মধ্যে, নদীর পাড় ঘেঁসে একটা বোতামের কল দিন-রাত খটখট করে মানুষের কানে তালা লাগিয়ে দেয়।—অবশ্য সহরের বাইরে এদিকটাতে মানুষ বল্‌তে কেবল আমি, আর সেই বোতামের কলটার মালিক। একলা বসে বসে যখন আর ভালো লাগ্‌ত না, এক-একদিন খুব ইচ্ছে হত, লোকটির সঙ্গে পরিচয় করি, কিন্তু আমার রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত সমস্ত রাত ধরে আমার দিনের বেলাকার সেই ইচ্ছার কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে তাকে বিমুখ করে দিত।

লোকটির নাম শচীপতি। তাঁকে প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিনই, কেন জানিনে, আমার মনে হয়েছিল, পাকা চুলের সাদা একখানি চাদর নাকে মুখে টেনে দিয়ে তাঁর কাঁচা বয়েস যেন ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখ্‌চে। তাঁর যাবার বেলা যে বয়ে গেছে, সেদিকে তার একতিল হুঁস নেই।

এ বয়সেও প্রতি অঙ্গ তাঁর স্বাস্থ্যে নিটোল, শরীরের বাঁধ শক্ত মজবুত কর্‌মিষ্ঠ। আর রমণীর মতো সুন্দর কমনীয় মুখটিতে একটা তৃপ্তির হাসি যেন দুঃখের তাপে চট্‌চটে হয়ে লেগে গিয়েছে, কিছুতে ছাড়ানো যাচ্চে না।

আর দেখ্‌তাম, বিকাল হতেই একটি পাতা-ছেঁড়া পুরানো বই হাতে করে ঝাউ-বনে ঘেরা বাড়ীটার ছায়ান্তরাল থেকে গেটের কপাট সরিয়ে তিনি বাইরের সোনালী আলোয় বেরিয়ে আসেন, আমার বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যে রাস্তাটা ছোট-একটি-মাঠ পার হয়ে একটা পুরানো পোড়ো বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই রাস্তা ধরে গিয়ে সেই পোড়ো বাড়ীটার সামনে তিনি থম্‌কে দাঁড়ান, তারপর একবার চকিত চোখে চারপাশটা দেখে নিয়ে চোরের মতো লঘু অথচ ক্ষিপ্র পদে ভিতরে গিয়ে ঢোকেন।..... আমার কাজে মন বসে না। খোলা জান্‌লায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আমার মিনিটের পর মিনিট কাট্‌তে থাকে।

এমনি করে যখন দিনে হয় না কাজ আর রাতে হয় না ঘুম, তখন একদিন আর না পেরে ভাব্‌লাম, যাই, লোকটার সঙ্গে কোনো অজুহাতে একটুখানি ঝগড়া করে আসি।... শচীপতি বাড়ীতেই ছিলেন, খবর পেয়ে ছুটে এসে অনাবশ্যক উত্তেজনার সঙ্গে আমায় অভ্যর্থনা কর্‌লেন। এতকাল তাঁর এত কাছে রয়েছি, তবু দেখ্‌লাম, আমার সম্বন্ধে একেবারে কোনো কথাই তাঁর জানা নেই। আমি দু-এক কথায় আমার পরিচয় দিয়ে বল্‌লাম, বসে বসে ভালো লাগে না তাই তাঁর কলটাকে দেখ্‌ব বলে এসেছি। জামার গুটানো আস্তিনটাকে নামিয়ে কালিমাখা হাতেই আমার হাত চেপে ধরে তিনি আমায় টেনে নিয়ে চল্‌লেন, যেখানকার যা সব আমায় বুঝিয়ে দিয়ে-দিয়ে সমস্ত বাড়ীটা আমায় দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন। আমি সত্যি সত্যি কৌতূহলী হয়েই দেখ্‌ছিলাম; হঠাৎ এক জায়গায় কল-কব্জার ভিড়ের মধ্যে কি-একটা ক্রটি ধর্‌তে পেরে ঝুঁকে পড়ে টুক্‌টাক্ করে তিনি সেটাকে সার্‌তে লেগে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ধরে গেল। আমার সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন কর্‌বার জন্যে হাতের লাঠিটাকে বার-কতক মেঝের উপর জোরে জোরে ঠুক্‌লাম, তারপর অনেকক্ষণ ধরে অনাবশ্যক জুতোর শব্দ করে পায়চারি করে বেড়িয়ে, মনের বিরক্তিকে ঠোঁটে চেপে বেরিয়ে চলে এলাম।

রাত্তিরে বোতামের কলের খটখট কানে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, এতদিন যে শব্দকে নীরস অর্থহীন বলে মনে করেছি, আজ তার ভিতরকার মানে কেবলি আমার কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য, এতকাল এই জলের মতো ভাষা আমি বুঝ্‌তে পারিনি!...

ঘুম ভাঙ্‌তেই জান্‌লা খুলে বোতামের কলটার দিকে চেয়ে চোখ খুল্‌লাম। কে যেন অদৃশ্য হাতে ক্রমাগত সেইদিকে আমায় টান্‌তে লাগ্‌ল। কাল যে খুব প্রীত হয়ে ফিরিনি সে কথা একটুও মনে হলো না।

এর পর রোজই একবার করে যাই; কিন্তু কলের কাজে শচীপতি এত ব্যস্ত থাকেন যে ভালো আছি কি না সে খবরটুকু নেবার পর্য্যন্ত এক-একদিন তাঁর অবসর হয়ে ওঠে না। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলে একটু কেবল হেসে এমনভাবে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যান যেন চিরজীবন ধরে তাঁর এই কলটার মধ্যেই আমি আছি!

বিরক্ত হয়ে আমি একবার যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখ্‌লাম, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে যাঁর চোখে পড়িনি, আড়াল থেকেই ফস্ করে আমার সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। আমি কেন যাইনি, বাড়ী বয়ে তিনি তা জান্‌তে এলেন। ভোরবেলা কাজে বেরিয়ে-ছিলাম, ফিরে এসে শুন্‌লাম, এইটুকু সময়ের মধ্যে তিন-তিনবার তিনি আমার খোঁজ করে গেছেন।—নিজে এ সম্বন্ধে তাঁকে অবশ্য কিছু বল্‌তে শুনিনি।

অদ্ভুত লোক! কোনো-কিছুতে মন নেই, অথচ ইনি মনস্বী। যেন সর্ব্বস্ব পুঁজি নিয়ে জীবনের সুরুতে মস্ত একটা বাজি রেখেছিলেন, জিত্‌লে সে পুঁজি সহস্রগুণ হয়ে ফির্‌বে, হার-জিত এখনো সাব্যস্ত হয়নি! একটা অতলস্পর্শ রস-সঞ্চয় কি-এক-রকমে জমাট বরফ হয়ে গেছে; আদত জিনিষটা ঠিকই আছে, পানার্থীর আশা নেই!

কিছু আশা না করেই এই সৃষ্টিছাড়া লোকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমি মিশ্‌তে লাগ্‌লাম। আমি যুবা, শচীপতি বৃদ্ধ, এ সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্ব হলো। তার একটা কারণ, এক জায়গায় আমাদের মস্ত একটা মিল ছিল;—আমরা দুজনই অবিবাহিত। কিন্তু বিবাহ কর্‌বেন না এরকম কোনো সঙ্কল্প তাঁর আছে, এমন কথা কোনোদিন তিনি বল্‌তেন না। তর্কের বেলায় প্রচুর লোক-সান দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়ে, কাজের বেলায় সেই গচ্ছার প্রত্যেক কড়িটি সুদ-সুদ্ধ আদায় করে নেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব। এই ভাবে নিজের ভাবী পত্নী সম্বন্ধে দিনের পর দিন বালক যুবক বৃদ্ধ তিন সমাজেই প্রচুর পরি-হাস-রসের সৃষ্টি করেও শেষ অবধি তিনি অবিবাহিতই থেকে গেলেন।

আমার সঙ্গে কথা কইবার তাঁর অবসর হলেই আমরা প্রণয়ের কথা পাড়্‌তাম। মেয়েদের দিক্ থেকে প্রথমেই যথেষ্ট সম্মতির সাড়ার প্রয়োজন আছে কি না, এ কথার জবাবে তিনি বল্‌তেন—কোথাও কোথাও আছে; যেখানে তারা তাদের প্রণয়ীদের চেয়ে সামাজিক বা অন্য কোনো হিসাবে খানিকটা উঁচুতে, সেখানে স্বাভাবিক নিয়-মের ব্যতিক্রম করেও তাদেরই প্রথমটা অগ্রসর হতে হবে, এই ছিল তাঁর মত। প্রেমের অকুতোভয় হওয়াই উচিত, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান সইতে পারে, অবজ্ঞা সইতে পারে না; সেজন্যে তাকে সাহস দেবার দর্‌কার আছে।.....তিনি এও বিশ্বাস কর্‌তেন, আমাদের দেশের দেহ-মন, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে অস্বাস্থ্য, তার প্রতিকার মেয়েদের অবরোধ-মুক্তির মধ্যে রয়েছে। এদেশের মেয়ে-পুরুষ মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্বন্ধের জায়গাটিতে যতদিন মিল্‌তে না পার্‌বে, ততদিন স্বাভা-বিক মানুষের যে স্বাস্থ্য—স্বাভাবিক মানুষের যে সভ্যতা—কোনো-রকমের সাধনার দ্বারাই তাকে পাবার চেষ্টা আমাদের সার্থক হবে না। আমরা যে পুরুষ, এটা মনে করিয়ে দিতে মেয়েরা আমাদের পাশে নেই বলেই বৃহত্তর জীবনেও সমস্ত চিন্তার এবং কর্ম্মের ক্ষেত্রে আমরা কাপুরুষ বনে গিয়েছি, আরো যাব। ঝাউবনে ঘেরা বোতাম-কল আর সেই পুরানো পোড়ো বাড়ীটার মাঝখান-কার পথে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে এমনি আরও সহস্র বিষয়ে আমাদের আলোচনা চল্‌ত। কলের কার্জের তাগিদ না এলে কোনোদিন তাঁকে ক্লান্তি বোধ কর্‌তে দেখ্‌তাম না।

একটু একটু করে তাঁর জীবনের একটি নিগূঢ় অশ্রু-ভরা অধ্যায়কে তাঁর অজস্র হাসি-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে তিনি আমার কাছে অনাবৃত করে ধর্‌তে লাগ্‌লেন। যখন আর-একটু হলেই সে ইতিহাসের একেবারে গোড়াটাকে আমার পাওয়া হয়, এমনি সময় আমার এক বন্ধুর অসুখের খবর পেয়ে কিছু-দিনের জন্যে আমায় ভাগলপুর চলে যেতে হলো। সে সেরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে পুজোর ছুটি আসন্ন হয়ে এল, মাঝখানকার কটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে এই ফাঁকে একবার পশ্চিম-টাকে দেখে নিতে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

ফিরে এসে দেখি, পথের পাশের পাতাঝরা শাখাবিরল গাছের আশ্রয়ে বসন্তের একঝাঁক যাত্রী-পাখীর মতো, সেই পুরানো জীর্ণ বাড়ী-

টায় এতদিনকার স্তব্ধ নিদ্রাকে সচকিত করে পাড়ায় একঘর নতুন লোকের সমাগম হয়েছে। তাঁদের সবাইকেই ঠিক নতুন লোক বলা চলে না;—পরিবারের যিনি গৃহিণী, তিনি এখানকারই মেয়ে, পীড়িত অক্ষম স্বামী আর একপাল ছেলেপিলে নিয়ে তাঁর পিতার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটের আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে এসেছেন।

কেন জানিনে, আমার মনে হলো, এদের সঙ্গে শচীপতির জীবনের কোন্-এক জায়গায় একটুখানি যেন যোগ আছে। শচীপতিকে বলতে তিনি হেসে আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'দূর পাগল!'—তারপর শিঙের তৈরি নতুন প্যাটার্নের কতকগুলি বোতামকে আলোর কাছে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতিরিক্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলেন।

আমি একটু অপ্রতিভ হলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এ সম্বন্ধে তাঁকে কোনোদিনই আর কিছু বলা হবে না। কিন্তু তা কি পারা যায়? স্পষ্ট দেখতে পাই, আমরা আর ঠিক সেই আগেকার মতন করে মিলতে পারিনে।—পোড়ো বাড়ীটার কাছাকাছি নদীর উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আগেকার মতো সূর্য্যাস্তের শোভা দেখতে তাঁকে আর নিতে পারিনে। আমি যতবার যাই, তিনি আমার আসার কারণ জানতে চান, যেন আমি নিজের কতকগুলি গুরুতর প্রয়োজনেই তাঁর কাছে চিরকাল আসা-যাওয়া করচি। কলের কাজেও যে তাঁর মন আছে, এমনও মনে হয় না।

তাই বাধ্য হয়ে আরেকদিন হাসতে হাসতে সেদিনকার প্রশ্নের পুনরুক্তি করতে হলো। এবার তিনি ভয়ানক চটে গিয়ে চোখ মুখ লাল করে বললেন, 'আমার ঢের কাজ আছে, মস্করা করে আমার দিন কাটে না, জানো? তোমার যদি অন্য কোনো কাজ না থাকে, তুমি যেতে পারো।'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে হলো, বোতামের কলটার সেই জলের মতো ভাষা আজ আবার কেবলি যেন কেমন ঘুলিয়ে যাচ্চে; প্রাণান্ত চেষ্টা করেও তার বক্তব্যটাকে সে স্পষ্ট করতে পারছে না।

আমি যে অপমান বোধ করিনি, তা নয়; তবু ভোর হতেই বোতামের কলটা নিত্যকার মতো আমায় টানতে লাগল। ব্যবসা করা যাদের মতলব তারা চিনির ব্যবসা করে কি হরিতকীর করে তাতে কিছু এসে যায় না, অবশ্য যদি লাভের অঙ্কটা সমান থাকে। এ ক্ষেত্রে আমার লাভ ছিল কৌতুক; সব অবস্থাতে সেটা সমানই জোটবার কথা। তবু সমস্ত দিনটা ইতস্তত করেই কাটালাম। তার পর বিকেলের দিকে কাপড়-চোপড় নিয়ে তৈরি হচ্ছি এমন সময় শচীপতির চিঠি নিয়ে তাঁর কলের পিয়ন দরজায় এসে হাঁক দিলে। যদি সে-সময় কেউ এসে বলত শচীপতির বোতামের কলটা ক্রমাগত কাজ করে করে হাঁপিয়ে গিয়ে খাতা নিয়ে নিরিবিলিতে কবিতা লিখতে বসে গেছে, তবে যে-রকম আশ্চর্য্য বোধ করতাম, তাঁর কাছ থেকে বারো পৃষ্ঠার মস্ত বড় ভারী এই চিঠিখানি পেয়ে তার চেয়ে বড় কম আশ্চর্য্য হলাম না!

প্রীতিভাজনেষু—

আমার কালকের অভদ্র ব্যবহারের পর তুমি আর আমার বাড়ীর ছায়াও মাড়াবে না তা আমি জানি। আমিই বা কোন্ মুখে তোমায় আর আসতে বলব? আমার তখন কি হয়েছিল জানিনে, কিন্তু ভগবান জানেন, তোমাকে আঘাত করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। সম্ভবত আমার জীবনে এখন এত বেদনা যে বেদনাবোধের শক্তিটুকু পর্য্যন্ত আমি খুইয়েছি, নিজের বেলাতেও যেমন, পরের বেলাতেও তেমনি।

তবে আমি কত-বড় হতভাগা তা জানলে হয়ত তুমি আমায় ক্ষমা করবে। সেই আশাতে লিখচি।

তোমার অনুমান যথার্থ। আমি এখনো আশ্চর্য্য হচ্চি এই ভেবে, এ অনুমান তুমি কেমন করে করতে পারলে। চৌত্রিশ বৎসর যে কথাকে অন্ধকার মনের গোপনতায় কেবল অশ্রুসিঞ্চন করে করে বাঁচিয়ে রেখেছি, বাইরের আলোকে একটি দিনের জন্যে যার কাছে ঘেঁসতে দিইনি, এত অনায়াসে তুমি তাকে জেনে ফেলবে, তোমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে বলতে পারার সুখটুকুও তুমি আমায় পেতে দেবে না, এ কেউ সইতে পারে? তুমি হলে কি করতে? কিন্তু তার আগে সমস্ত অবস্থাটা তোমার ভালো করে জেনে নেওয়া চাই।

বয়সে আমরা দু-এক মাসের ছোট-বড়। খুব ছেলেবেলায়, আমার এক মাসতুত বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি যে সেই থেকেই তাকে মনে করে রেখেছিলাম, সেটা কিছু আর তার জানা ছিল না,—কেমন করে থাকবে?

আমি কিন্তু সেই প্রথম দেখার দিনটি থেকেই আমার চিরজীবনের পরমাত্মীয়ের মতো প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে মনে করেছি। সেই শিশু বয়সে সময় না হতেই প্রেমের কাছ থেকে যে ঋণ আগাম নিয়েছিলাম, এত বয়স ধরে বসে বসে সেইটেকেই আমাকে শোধ করতে হচ্চে বুঝি বা!

পৃথিবীটা যে এত নির্দ্দয়-রকমের বড়, সে বয়সে ত সে কথাটা আর জানা ছিল না; তাই কোথাও মেয়েদের জটলা দেখলেই আমার মুখ লাল হয়ে উঠত, মনে হত, সে নিশ্চয় এর মধ্যে আছে; আমি সে জায়গার ত্রিসীমায় ঘেঁসতে পারতাম না। কোনো জন-সমাবেশের জায়গায় গেলে মনে হত চারদিক থেকে নয়নময় হয়ে সে যেন আমায় দেখচে; আমার ঠোঁট কাঁপতে থাকত, আমি ঘেমে উঠতাম। রেলে ষ্টীমারে যেতে আসতে, হঠাৎ কোথাও একটা পুকুরের পাড়ে ঘনবনের ছায়ায় স্নিগ্ধ-শান্তিভরা একটি গৃহ দেখে মনে হত, এই বাড়ীখানিতেই সে থাকে, নিশ্চয়। স্পষ্ট দেখতাম, জলপাই গাছের ছায়ায় অন্দরের দেউড়ির কাছে তার ছোট ভাই ঝুন্নুকে কোলে করে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটের পথে বাসনের বোঝা নিয়ে তার আনাগোনার পায়ের চিহ্নগুলিকে আমি গুনে বলে দিতে পারতাম। বাড়ীটিকে যতক্ষণ দেখা যেত, আমার চোখে পলক পড়ত না, তারপর গ্রাম-প্রান্তের বনাঞ্চলের অন্তরালে সেটা লুকিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেলে বেদনাতুর মাথাটাকে যে-কোনো এক জায়গায় গুঁজে দিয়ে ভাবতাম, তার এত কাছে এসেও তাকে জানিয়ে যাওয়া হলো না। মনে হত, কোন্-একটা বিপুল-

কায় দৈত্য আমার জীবনের প্রিয়তম স্থানটি থেকে আমায় যেন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্চে,—আমার বুকের শিরায় শিরায় তার টান কঠোর হয়ে বাজ্‌ত!

কল্পনায় তাকে এত বেশী করে পেলাম যে বাস্তব জগৎটার জন্যে একটি কানাকড়িও উদ্বৃত্ত রইল না। দীর্ঘ ছয় বৎসরে একটি দিনের জন্যে তার দেখা পেলাম না। তার পর দেখা যখন হলো তখন ঠোঁটের কপাটের উপর আসন্ন-যৌবনের কালো-হরফের পরোয়ানা এসে পৌঁছেচে। আমাদের বাড়ী পেয়ারা গাছ ছিল, কোঁচড়-ভরা পেয়ারা নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে ভাব কর্‌লাম। সে খুসি হয়ে আমায় তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল; তার ছোট ভাই ঝুনু তখন বেশ বড়-সড় হয়েছিল, তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলে; তারপর আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করা হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে পাড়ার দু-তিনটি মেয়েকে জুটিয়ে খিড়কির পুকুরের পারে পেয়ারাগুলোর সদ্গতি কর্‌তে চলে গেল।

পরদিন ইস্কুল যাবার পথে তাদের বাড়ীর দেউড়ির গোড়ায় তাকে দেখ্‌লাম; সম্ভবত পালিয়ে এসে খানিকটা আচার তার মাকে লুকিয়ে সে খাচ্ছিল, আমার দিকে চেয়ে প্রথমটা চম্‌কে উঠে তারপর নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে একটু হাস্‌লে। সেই হাসিটুকুকেই আমি সারা গায়ে বুলিয়ে নিয়ে চলে গেলাম। আমার সমস্ত কাজ এবং অকাজ আমায় সেদিন আর স্পর্শ কর্‌তে পার্‌লে না।

বাড়ীতে বকুনি সয়ে, রাশি রাশি রকমারি আচার লুট করে নিয়ে গিয়ে তাকে দিতে লাগ্‌লাম। চুপি চুপি তাকে তাদের খিড়্‌কির বাগানে ডেকে নিয়ে যেতাম, খুসীতে তার মুখে হাসি যেন ফেনিল সরবতের মতো উপ্‌চে উঠ্‌তে থাক্‌ত। একটা চাল্‌তা গাছের ঠেলে-ওঠা শিকড়ের উপর দুজনে পাশাপাশি পা ছড়িয়ে বসে আচার খেতে খেতে কত রাজ্যের গল্প যে আমরা জুড়ে দিতাম, তার ঠিক নেই। আমি যে দিকটায় বস্‌তাম, সেদিকটায় ছিল কতগুলো বিঘ-পিঁপড়ের চলা-ফেরার রাস্তা। আমার অসহায় অবস্থাটা সে হতভাগাগুলো টের পেয়েছিল কি না জানিনে, দিব্যি নবাবের মতো আমার পা বেয়ে উঠে মনের সাধ মিটিয়ে তারা আমায় কামড়াত, তবু তার পাশটি থেকে আমি একচুল নড়্‌তাম না। সে ক্রমে আমায় একটু একটু খাতির কর্‌তে লাগ্‌ল। আমার তরুণ মনের সমস্ত আগ্রহ এবং নির্ভরতা দিয়ে তারই উপর ব্রিরাট একটা স্বপ্নের ইমারত আমি রচনা কর্‌লাম। জেগে-ঘুমিয়ে আমার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল।

একদিন শুন্‌লাম, তার বিয়ের সম্বন্ধ এসেচে। তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে তাকে পেলাম না। তারপর আরও কয়েকটা দিন তার শোবার ঘরটা থেকে সে বেরুল না। আমি ভাব্‌লাম, বুঝি আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার দুঃখকে আমার সুমুখে লুকোতে পার্‌বে না বলে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌চে! তাকে উত্যক্ত না করে যে লোকটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ হচ্ছিল, চট্‌ করে কাপড়-চোপড় পরে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। লোকটির নাম কালীপদ

বসু, এম-এতে দু-দুটো পাশ দিয়ে উকিল হয়ে সবে সে সহরে এসে বসেছিল। মস্ত পণ্ডিত লোক বলে চারদিকে তখন তার খুব নামডাক। আমায় যত্ন করে নিয়ে বসিয়ে, আমি কেন এসেচি, তা সে জান্‌তে চাইলে। গৌরচন্দ্রিকা আমি ভালোও বাসি না,আর তা কর্‌বার মতো মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না, তাই একেবারেই বল্‌লাম, 'আমি সুরবালাকে ভালোবাসি।'

সে হো-হো করে হেসে উঠে বল্‌লে, 'বটে! তুমি তার কে হও? ভাই বুঝি?'

আমি মুখটাকে গম্ভীর করে বল্‌লাম, 'আজ্ঞে না, আমাদের এক পাড়াতে বাড়ী।'

সে বল্‌লে, 'তা বেশ বেশ। পাড়ার সব ছেলে-মেয়েরাই তাকে খুব ভালোবাসে, বুঝি?'

এ প্রশ্নে আমার এত অপমান বোধ হলো যে আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দেরী না করে আমি উঠে বেরিয়ে চলে এলাম। এরপর কি করা উচিত সেটা ঠিক কর্‌তে না পেরে সুরবালাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। সে তখন চুল বাঁধা শেষ করে উঠে আয়না চিরুণী তুলে ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বার উপক্রম কর্‌চে। আমায় দেখে থম্‌কে দাঁড়াল। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে তার সেই রুদ্ধ গতিবেগের ধাক্কাটা বিদ্যুতের মতো ঝাড়া দিয়ে দিয়ে বয়ে গেল! বল্‌লাম, 'শোনো!'

সে হয়ত ভাব্‌লে, পেয়ারা কি আচার! চট্‌ করে একবার আমার হাতটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে পা টিপে ছুটে এগিয়ে এসে বল্‌লে, 'কি?'

আমি তাকে খিড়্‌কির পুকুরের পারে খুব একটা নিভৃত জায়গায় নিয়ে গেলাম, তারপর দুহাতে শক্ত করে তার হাত-দুটোকে চেপে ধরে তাকে—তাকে বল্‌লাম। কি বলেছিলাম মনে নেই। কিছু কি বল্‌তে পেরেছিলাম? তবু সে গ্রীবা বাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে বল্‌লে, 'কী?'

আমি হাত-দুটি জোড় করে বল্‌লাম, 'দোহাই তোমার। তুমি ইচ্ছে হলে আমায় বিমুখ করে ফিরিয়ে দিতে পার, কিন্তু আমায় অবজ্ঞা কর্‌বার তোমার কোনো অধিকার নেই।'

সে ঠোঁট চেপে একটুখানি হেসে বল্‌লে, 'তুমি তাহলে কি চাও?'

বল্‌লাম, 'তোমায়।'

সে হাস্‌তে হাস্‌তেই বল্‌লে, 'তোমার কি আছে, কি দিয়ে তুমি আমায় বাঁধ্‌তে আশা কর?'

সেই বয়সেই আমি বুঝেছিলাম, সমস্ত তুচ্ছ নগণ্য জিনিষের মধ্যকার অসীম সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুল্‌তে এক প্রেমই পারে, এবং এই সম্ভাবনার দিক্‌ দিয়ে বিচার কর্‌লে পৃথিবীতে বড়-ছোটর কোনো তফাৎই নেই; সেই জন্যেই বোধ-হয় যে-প্রেম খাঁটি তার চোখে কিছুই অসুন্দর নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়।—এই কথাগুলোকে প্যাঁচালো অস্ফুট করে তাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লাম। কিন্তু সে কি ভালো বেসেছিল যে বুঝ্‌বে? বুঝ্‌ল না বলেই সে প্রতিবাদও কর্‌লে না, মুখটাকে বাঁকিয়ে বল্‌লে, 'তুমি ত সেদিনকার ছেলে, আমার চেয়েও বয়সে ছোট—'

আমি গলার সুরে আগ্রহ ভরে তাড়াতাড়ি বল্‌লাম, 'আমি চিরকালই ত আর ছোট থাক্‌ব না।'

সে আমার এ কথায় অত্যন্ত আমোদ পেয়ে হাসির তুফানে বেণুশাখার মতো নুয়ে নুয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, 'বেশ গো বেশ, তুমি বড় হতে হতে আমার চেয়েও যেদিন অনেকখানি বড় হবে, সেইদিন এসো। আজ তাহলে যাওয়া যাক্, কি বল? মা-গো, একরত্তি একটা ছেলে তার কত ঢঙের কথা!'

দুনিয়াটাতে প্রাচীরের যেন অভাব ছিল, তার উপর আবার এই একটা বয়সের প্রাচীর!—আর এ একেবারে অসহ্য। এমন বাধা কেন থাক্‌বে যাকে ভাঙ্‌বার উপায় নেই? কিছু না পাই, খালি হাতে ফিরতে হয় তাতে যায় আসে না, কিন্তু সম্ভাবনার কেন শেষ থাক্‌বে? তপশ্চর্য্যার অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত হব?

হার মান্‌তে হলো; হাসি আস্‌ছিল, হার মান্‌তে।

তারপর তাদের বিয়ে হয়ে গেল। স্বামীর ঘর কর্‌তে যেদিন চলে যাবে সেদিন আমার মায়ের সঙ্গে সে দেখা কর্‌তে এল। পাশের ঘরে তার পরিচিত গলার স্বর অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেল। তার সুন্দর ছোট মুখখানি, ঋজু নিটোল গ্রীবা, পাতলা টুক্‌টুকে দুটি ঠোঁট ধ্বনির রূপ নিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গকে এসে যেন স্পর্শ কর্‌ছিল; আমি অনড় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে ছিলাম। হঠাৎ ঝুপ্ করে একটা ছেঁড়া মলাটের বই আমার বুকের কাছটায় এসে পড়্‌ল। চম্‌কে উঠে বল পড়্‌লাম। চকিতে দরজার উপর তার দেহজ্যোতির একটি রেখা টেনে দিয়ে আমার জীবন থেকে উল্কার মতো চিরদিনের জন্যে সে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।—চির-দিন!

বইটিকে কিছুদিন আগে আমার কাছ থেকে সে পড়্‌তে চেয়ে নিয়েছিল; দেওয়া-নেওয়ার পালা চুকিয়ে দিয়ে গেল।..... আবার শুয়ে পড়ে বুকের কাছ থেকে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বইটাকে আমি ঠেলে দিলাম, ঝুপ করে মেঝের উপর পড়ে গিয়ে তার বুক-খোলা পাতার ভাঁজের মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল, সুরবালা!—সুরবালার ছবি!

না গো না, এ তার অপরাধ নয়। সে কিছুই দিয়ে গেল না।—যাবার বেলা আমার না-পাওয়ার দুঃখকে এই ছবিটির মধ্য দিয়ে লুকিয়ে অক্ষয় করে সে রেখে গেল। আজও বইটির পাতার সেই ভাঁজের মধ্যে সেই ছবিটি আমার কাছে আছে। দুঃখীর ভগবান যদি কেউ থাকেন, তবে এইটিকে ছাড়পত্র করে নিয়ে তাঁর দরজায় আমি ঢুক্‌ব।

কিন্তু শোনো,—যারা ভালোবাসে, তাদের অন্তরটা যেন বস্তুহীন, শূন্যের মতো; একটা-কিছু দিয়ে সেটাকে ভরাতে হয়, নয়ত তারা বাঁচ্‌তে পারে না। আমার জীবনের ফাঁকটাকে আমি টাকা দিয়ে ভরাতে প্রবৃত্ত হলাম। কিন্তু দেখ্‌লাম, টাকা জমে স্তূপাকার হয়ে ওঠে, তাতে জীবনের ফাঁক ভরে না, জীবন কেবল ভারাক্রান্ত হয়। সুতরাং আবার সুরবালার সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। ভাব্‌লাম, দিয়ে যে ভর্‌তে পার্‌লে না, নিয়ে অন্তত সে রেহাই দিতে পার্‌বে।

তখন তারা ভারি দুরবস্থায় পড়েছে। তার স্বামী কালীপদ এম্‌-এতে দু-দুটো পাশ দিয়েছিল, আইনের কূটতর্কেও তার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারে সে অঞ্চলে এমন কেউ তখনকার দিনে ছিল না। কিন্তু কপালের লিখন, হঠাৎ সে ব্যামোয় পড়্‌ল। ডাক্তারেরা বল্‌লে, খুব বেশী বয়স পর্য্যন্তও সে বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু কাজ করা লেখাপড়া আর চল্‌বে না। কব্জা-ভাঙা দরজার মতো চিরকালটা প্রতি মুহূর্ত্তে একটা অনিশ্চয়তা নিয়ে তাকে বেঁচে থাক্‌তে হবে।

আমি সেই ছেলে-বয়স থেকেই জীবনের সকল দিকে আর-সকলের থেকে কেমন-একটু আলাদা।—আমি নিজে সেটা জানি। সব জিনিষকেই সহজ স্বাভাবিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখা আমারা স্বভাব, অন্যদের মতো ক'রে কোনো-কিছুকেই খুব চেষ্টা ক'রেও আমি দেখ্‌তে পারিনে। তা ছাড়া আমি নিজে যা ভালো বুঝি, আগুপাছু না ভেবেই তা করে যাই। সুরবালার সঙ্গে দেখা করতে আমার একটুও বেগ পেতে হলো না; কালীপদর আমাকে মনে ছিল, নিজে সঙ্গে করে তার কাছে সে আমায় পৌঁছে দিয়ে এল। আমি একেবারেই কাজের কথা পাড়্‌লাম। বল্‌লাম, 'তোমার মেয়েটিকে তার এবারকার জন্মদিনে আমার নদীপাড়ের বাগানখানা আমি উপহার দিতে চাই। তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছিলে, এই নিরপরাধ শিশুটিকে বঞ্চিত করো না।'

সে বল্‌লে, 'আমার মেয়েকে এত কাঙাল তুমি কি-জন্যে ভাব্‌চ যে তোমার এই অনুগ্রহের দান না পেলে সে নিজেকে বঞ্চিত মনে কর্‌বে? এ-সমস্ত কথা বল্‌বার অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? তুমি যাও।'

এক মুহূর্ত্তে আমার এতদিনকার প্রাণ-পাতের পুরস্কার, আমার বাড়ী-ঘর-বাগান বোতামের কল সমস্ত কী নগণ্য নিরর্থকই না হয়ে গেল! তার উপর আমি রাগ কর্‌তেও পার্‌লাম না; আমি আমার তুচ্ছ সম্পদ নিয়ে তাকে অপমান কর্‌তে গিয়েছিলাম, আমায় ফিরিয়ে দিয়ে তার যে কি মূল্য, আমায় সে তা জানিয়ে দিলে। কোনো-রকমেই সে যে সুলভ হয়নি, তার সম্বন্ধে সেই গর্ব্বের সুখটুকু আছে বলেই ত আমার উদ্দেশ্যহীন তপশ্চর্য্যা তার ব্যর্থতার বোঝা বহন করে দিন থেকে দিনে এগিয়ে চল্‌তে পার্‌ছে, নইলে সে কি বাঁচ্‌ত?

নদীর পাড় ধরে লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়িয়ে অনেক রাত করে বাড়ী ফিরে এসে আলোটাকে ধরাতে যাচ্চি, এমন সময় কালীপদ এসে ঘরে ঢুক্‌ল। একথা ওকথার পর বার-কয় কেশে, এদিক্ ওদিক্ চেয়ে, হাত কচ্‌লে সে বল্‌লে, 'তোমাদের মধ্যে আজ যা কথা হয়েছে সব আমি শুনেছি। সুরবালা ছেলেমানুষ, তার বুদ্ধি-সুদ্ধি যে কি রকম কাঁচা, তা ত তুমিও জানো। তার কথা ধর্‌তে নেই। তুমি তার আজকের ব্যবহারে কিছু মনে করো না।'

আমি চুপ করে শুনে বাতিটাকে উস্কে দিতে দিতে বল্‌লাম, 'আমি কিছু মনে করিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এক টিপ্ নস্য নিয়ে মুখে একটুখানি হাসি এনে সে বল্‌লে, 'আমাদের মেয়েটিকে তুমি তার মায়ের

অপরাধের ভাগী করো না যেন। বল্‌তে গেলে তুমি ত তার মামা।'

কালীপদ কি মতলবে এসেচে সেটা আঁচ কর্‌তে পেরে আমার মনটা তিক্ততায় ভরে উঠ্‌ল। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লাম, 'আমি তার যে-ই হই,তাকে আমার কিছু দেবার নেই। আমাকে কোনদিন সে জান্‌বে না।'

সে বল্‌লে, 'জান্‌বে। তোমাকে জান্‌তে দিতে হবে। তুমি যদি তাকে ভালোবেসে থাকো তবে তোমার ভালোবাসাতে প্রীতির দেবতার নিয়মে তার দাবী দাঁড়িয়ে গেছে। ইচ্ছে কর্‌লেই তুমি তাকে বঞ্চিত কর্‌তে পার না।'

খুব উঁচু রকমের একটা-কিছু বেশ লাগ-সই করে বলা গেছে, এই রকম একটা ভাবের গর্ব্বে সে মিটমিটে চোখে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আমি এবার আর আমার বিরক্তি লুকোবার চেষ্টা না করেই বল্‌লাম, 'দেখুন, আমার মনে আজ বড় বেদনা।—অনেকদিনকার একটা ভুলের মোহ আমার ছুটেছে। প্রলোভনের মধ্যে আমায় আর টান্‌বেন না। আমায় মুক্তি দিন।'

সে দাঁত খিঁচিয়ে নিজ মূর্ত্তি ধরে বল্‌লে, 'তুমি তা বল্‌তে পারো। কিন্তু তুমি জানো এটা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, জানো অগ্নিশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে এসেও স্বয়ং সীতাদেবীকে এই দেশে বিনা-অপরাধে কি গুরুদণ্ড বহন কর্‌তে হয়েছিল? সুরবালা মেমসাহেব নয়, সে এই দেশেরই মেয়ে। তুমি যদি তার সমস্ত ভার না গ্রহণ কর, তবে আমি তাকে লোক-জানাজানি করে ত্যাগ কর্‌ব, সে কথা আগে থাক্‌তে বলে রাখ্‌চি।'

আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আবেগ-ভরা গলায় বল্‌লাম, 'তুমি কিছুতে তা পার্‌বে না।'

সে ঠোঁট বাঁকিয়ে একটুখানি হেসে বল্‌লে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

আরও একবার হার মান্‌তে হলো। এমনই অদৃষ্ট করে এসেছিলাম সর্ব্বস্ব দিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে গেলাম, সে-দানেও পরাজয়ের কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে লেগে রইল। তখন থেকে এই কুড়ি বৎসর নিয়মিত-ভাবে প্রতি মাসের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে রেলষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্‌মে কালীপদর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমার মাসান্তের সমস্ত পুঁজিপাটা নীরবেই তার হাতে আমি তুলে দিয়েছি, সে ফিরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌তে না বস্‌তে গার্ডের শিটি পড়েছে। সুরবালা কেমন আছে, সে বেঁচে আছে কি না, সে কথাটি পর্য্যন্ত জান্‌তে চাওয়ার অবসর কোনো-দিন আমার হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু কালীপদর সম্বন্ধে আমার মনে যে অনুপায় বিরোধ জমা হয়েছিল, সেটা ক্রমে কেটে গেল। সে দুটো এম-এ পাশ দিয়ে-ছিল। যোগ্যতার দিক্ দিয়ে বিচার কর্‌লে সুরবালা তার উপযুক্ত বরই পেয়েছিল। দেখ্‌তেও সে ছিল রাজপুত্রের মতো,—তার কাছে আমি? অমন শরীরের মধ্যে কি করে যে অমন মারাত্মক রোগ লুকিয়ে আত্ম-গোপন করে ছিল ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। আহা বেচারা! তা ছাড়া আজ ভাব্‌চি, আমার কাছ থেকে টাকাটা আদায় কর্‌বার এই ফিকির করে সে আমার বন্ধুর কাজই ত করেছিল, আমার জীবনটা কাজে লেগে

গেল। আমি ত দিতেই চেয়েছিলাম, তারা হাত পেতে না নিয়ে না-হয় ফাঁকি দিয়েই নিয়েছে! নেওয়া নিয়ে কথা। পাবার গরজ ত কোনকালেই আমার ছিল না।

আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌ব না, কিন্তু ঢের পেয়েছি। তার উপর আজ জান্‌তে পার্‌চি, —আছে, সে বেঁচে আছে। আমার খুব কাছেই সে আছে। তাকে দেখ্‌তে পাইনি, তবু তার সেই পুরানো দিনের নিঃশ্বাসের অস্ফুট সৌরভ আমি যেন অনুভব কর্‌তে পার্‌চি। ঐদিকে তাকালেই আমার মনে হয়, বাতায়নে তার শুভ্র সুডৌল বাহুটির একটি-দুটি আন্দোলন থেকে থেকে যেন আমার চোখে পড়ে; সে যেন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায়, তার কালো চুলের বোঝা দুলিয়ে যায়, বাতায়নের শূন্যতা পশ্চাতে পড়ে হাহাকার কর্‌তে থাকে।

সে আছে, আমার এত কাছে সে আছে! ...জানো, ডাক্তার কি বলেছে? বলেছে, আমার রক্তের চাপ এখনো পঁচিশ বৎসরের যুবকের মতো। কম করে আরো কুড়ি বৎসর আমার পরমায়ু। আরো কুড়ি বৎসর আমার এই জীবনটাকে তার কাজে আমি লাগিয়ে যেতে পার্‌ব; এ যে কী সুখ!...

শচীপতি।

আহা, বৃদ্ধ! নিজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বল্‌তে বসে নিজের সুখকেই প্রতিপন্ন করে তিনি থেমেছেন। তখনি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলাম, কিন্তু তাঁকে বাড়ীতে পেলাম না। সে রাত্রে বোতামের কলের খটখটানিকে জীবিত মানুষের হৃৎস্পন্দনের মতো মনে হতে লাগ্‌ল।

তারই কয়েকটা দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কালীপদর মৃত্যু হলো। শচীপতি সেদিন কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিলেন না। আমার মনে হলো, রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি কাঁদ্‌লেন। আর ঘুরে ঘুরে কেবলই কালীপদর কথা। সে এম-এতে দু-দুটো পাশ দিয়েছিল, ব্যামোয় না পড়্‌লে দেশশুদ্ধ লোক আজ তাকে এক-ডাকে চিন্‌ত, তার উপর অমন রাজ-পুত্রের মতো চেহারা—আরো কত কি!

ভোরবেলা তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটু ঠাণ্ডা করে রেখে বাড়ী চলে এলাম। ডাকের চিঠিগুলোকে দেখে, গোটাদুই চুরুট ভস্ম করে স্নানের জোগাড় কর্‌চি, এরই মধ্যে তিনি আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। আমি স্নানাহার ভুলে গিয়ে তাঁকে ঘরে এনে বসালাম। ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন কর্‌লেন, 'তাদের এর-পর চল্‌বে কেমন করে? আমি জানি, কালীপদ সুর-বালাকে কিছু জান্‌তে দেয়নি, লুকিয়ে মাসের পর মাস আমার দানকে সে গ্রহণ করেছে। সুরো জান্‌তে পেলে রসাতল কর্‌ত।—এখন উপায়?'

আমি ভেবে বল্‌লাম, 'এরপর লুকিয়ে দান করার পালাটা উঠে গেল। এখন দানের গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে একেবারে তাঁর মুখোমুখি আপনাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মেয়েদের আমি যতটুকু জানি তাতে আমার মনে হয়, আপনার এই কুড়ি বৎসরের আশ্চর্য্য মহত্ত্ব ও

নিষ্ঠার ইতিহাস শুন্‌লে তাঁর মন হয়ত নরম হবে। তা যদি না হয়, তবে আপনাকে তিনি অন্তত ক্ষমা কর্‌বেন। এ ছাড়া আর কোনো পথ আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।'

মাথা নীচু করে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তিনি বাড়ী চলে গেলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যার মুখে আমাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে —দেবীদর্শনে যাত্রা কর্‌লেন! ভাঙা বাড়ীটার দেয়ালগুলো সেদিন আমাদের দেখে অন্তর-খসা ইটের দাঁত বার করে যেন বড় দুঃখের হাসি হেসে উঠ্‌ল। আমি দেউড়ির বাইরে ছড়ি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, শচীপতি কিছুক্ষণ আমার হাতটিকে ধরে থেকে সহাস্য বিব্রত দৃষ্টিতে বারবার আমার দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

একটা হাঁড়ির তলায় কতকগুলো ডালের সঙ্গে কেমন করে লবঙ্গ মরিচ প্রভৃতি কি কতগুলো মিশে ছিল, একটি মেয়ে বারান্দার এক কোণে একটা কুলোতে তাই ঢেলে নিয়ে মাথা নীচু করে বাছ্‌তে বসেছিল, তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে শচীপতি ডাক্‌লেন, 'সুরো!'

মেয়েটি মাথা তুলে চেয়েই চম্‌কে কুলোর সমস্ত ডাল মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে উঠে পড়্‌ল, তারপর ছুটে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভয়-জড়ানো কান্নার সুরে ডাক্‌লে, 'ও মা!'

সেলাই হাতে নিয়ে একটি বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কোটরগত চোখদুটির মধ্যে শচীপতি নিজের দৃষ্টিকে যেন প্রোথিত কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু সে কেবল দুটি নিমেষ! তারপর ভূত দেখ্‌লে লোকের যেমন হয়, সেই-রকম করে টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে এসে তিনি দুহাত দিয়ে জড়িয়ে আমাকে আশ্রয় কর্‌লেন।...যে তরুণী ফুল্লাধরা এই দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তাঁর কর্ম্মে উদ্দীপনা দিয়েছে, শ্রান্তিতে চিন্তাসুখের অমিয়ধারা জুগিয়েছে, যার স্মৃতি অশ্রু হয়ে ঝরে জরাগ্রস্ত দেহের নীচে অজর প্রাণের তারুণ্যকে সতেজ করে বাঁচিয়ে রেখেছে এতদিন, তার জায়গায় এই লোলচর্ম্ম পলিত-কেশ দন্তপংক্তি-হীনা নারী!

বাড়ী এসে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পাকাচুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে মুখে ভারী করুণ একটু হাসি এনে তিনি বল্‌লেন, 'মেয়েটা বোধ হয় আমার সাদা চুল-গুলো দেখেই ভয় পেয়ে গেল, কি বল ...?'

একটু পরেই একটা চেয়ার নিয়ে আমার দিকে ঘুরে বসে বল্‌লেন, 'সত্যি, মেয়েটাকে অমন করে ভয় পাইয়ে দিলাম! আমার সুরবালাকে মনে পড়্‌ল! আমি একটা আস্ত গাধা, কি বল...?'

তখনি উঠে গিয়ে একটা ছেঁড়া ময়লা পুরানো বইয়ের পাতার ভাঁজের মধ্যে থেকে একটি ছবি বার করে এনে আমার কাছে ধরে তিনি বল্‌লেন, 'তুমি মেয়েটিকে দেখেছ ত? সত্যি করে বল দেখি, আমার ভুল হতে পারে কি না?' তারপর আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ছবিটিকে হাতে নিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়্‌লেন। আমি তাঁকে সেই অবস্থায় রেখে পা টিপে বেরিয়ে চলে এলাম।

পরের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসে দেখি, শরৎ-শেষের ঝরা পাতার মতো সেই

ছবিটিকে সহস্র-টুকরা করে ঘরময় ছড়িয়ে, আয়নার দিকে ঘুরে, শিথিল মাথাটাকে দুই করতলের মধ্যে নিয়ে তিনি বসে আছেন। তাঁর দেহের সর্ব্বত্র বার্দ্ধক্য এসে পৌঁছেচে। আজ আর অন্যদিনের মতো আমাকে দেখে তাঁর চোখদুটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল না। আমারও মনে হতে লাগ্‌ল, এক রাত্রিতেই তিনি যেন আমার কাছ থেকে অনেকখানি দূরে সরে চলে গিয়েছেন, কোনদিনই আমি আর তাঁর নাগাল পাব না। তাঁর সঙ্গে ঠিক আগেকার জায়গাটিতে মিল্‌তে পার্‌ব না।

বিকেলের দিকে লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে আবার তিনি সেই পুরোনো ভাঙা বাড়ীটাতে এসে হাজির হলেন। পাছে পড়ে যান এই ভয়ে আমাকেও সঙ্গে আস্‌তে হলো। সুরবালা সেলাই নিয়ে বারান্দায় বসেছিলেন, তারই নীচেকার উঠানে লাঠি-গাছটার উপর বসে পড়ে শচীপতি একেবারেই বল্‌লেন, 'তোমাকে ভাবা আমার বোধ হয় এই শেষ, কিন্তু তোমাদের জন্যে শেষ পর্য্যন্তই আমি ভাব্‌তে পার্‌ব। যে-কটাদিন আছি এই অধিকারটুকু তুমি আমায় দিয়ো।'

সুরবালা সেলাই তুলে উঠে পড়ে বল্‌লেন, 'আমার স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলেন, তুমি বেশ ভালো মানুষটি হয়ে ছিলে, আজ আবার অসহায় পেয়ে আমাকে অপমান কর্‌তে এসেছ! আমার ছেলেমেয়েরা এখনই হয়ত ইস্কুল থেকে বাড়ী এসে পড়্‌বে, তুমি যাও। আমার ভাবনা যাঁর ভাব্‌বার ছিল তিনি যথেষ্ট করে তা ভেবে রেখে গেছেন। এ সান্ত্বনাটুকুমাত্র তোমায় আমি দিতে পারি।'

একটু হেসে, চুপ করে মাথা নীচু করে থেকে, মনের সমস্ত মিনতি ভরে শচীপতি বল্‌লেন, 'আচ্ছা, বেশ, যাচ্চি। কিন্তু কেবল একটিবার তুমি আমার বাড়ীতে চল, একটি দণ্ডের জন্য। দেখ্‌বে, জীবনের আরম্ভে চৌত্রিশ বৎসর আগে তোমার জন্যে যা-কিছু আমি জুটিয়েছিলাম, সব যেমনকার তেমনি রয়েছে, বইয়ের মলাটটি অবধি বদলানো হয়নি। তারপর এই এতকাল যে ঐশ্বর্য্য আমার জমে উঠেচে, শুক্‌নো ডাল যে মুঞ্জরিত হয়েছে, ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে, সে কার যাদু-কাঠির স্পর্শে? তোমাকে তা বলে লাভ নেই জানি, তবু একটিবার তোমায় কেবল দেখিয়ে দিয়ে এ-সমস্তই আমি ত্যাগ কর্‌ব। তুমি নিয়ো না, কিন্তু তোমার জিনিষ তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে ঋণমুক্ত হয়ে আমায় মর্‌তে দাও, নইলে মরেও আমার আত্মার মুক্তি হবে না। তুমি চলো।'

সুরবালা নাকি সুরে টেনে টেনে বল্‌লেন, 'সে কি করে হবে? সমাজ ত আছে! তুমি কি আমায় লোকলজ্জা ছাড়্‌তে বল?'

লোকলজ্জা? এই জরাগ্রস্ত মৃত্যুন্মুখ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ-বৃদ্ধার!...শচীপতি উচ্চকণ্ঠে বিকট অট্টহাস্য করে উঠ্‌লেন, দিবসের প'ড়ে-আসা রোদ সে হাসির শব্দে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। কদর্য্য সমাজ, জঘন্য সমাজ, ঘৃণিত সমাজ, যে নিজের কুৎসিত কল্পনাকে ভয় ক'রে অবোধ শিশুকেও পরিণয়-শৃঙ্খলে বাঁধে, নিরুপায় বার্দ্ধক্যকেও নিশ্চিন্ত হয়ে রেহাই দেয় না! হাতের লাঠিটাকে ঠক ঠক করে ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে যেন হাওয়ার আগে তিনি বাড়ী ফিরে চল্‌লেন, আমি ব্যস্ত হয়ে ধর্‌তে গেলাম,

আমায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। খানিক-দূর গিয়ে মাঝপথে থেমে আবার একবার ভাঙা-বাড়ীটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিকট স্বরে তিনি হেসে উঠ্‌লেন, নদীর ওপারে প্রতিধ্বনির পরম্পরা সেই হাসির শব্দকে দূর থেকে দূরে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে বহন কর্‌তে লাগ্‌ল। ঘরের সিঁড়ি উঠ্‌তে হাসির ক্লান্তিতে তাঁর পা টল্‌তে লাগ্‌ল, কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লে, পড়্‌তে পড়্‌তে এগিয়ে গিয়ে বোতামের কলটার গোড়ায় মুখ থুব্‌ড়ে তিনি পড়ে গেলেন। রাত্রি ভোর হবার আগেই ডাক্তারের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয়ে গেল।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

ভোম্‌রার গান

কে আসে গুন্‌গুনিয়ে, চেনে তায় কমল চেনে।
অরসিক হুল্ চেনে তার রসিক চেনে রস-ভিয়েনে।
কালো তার অঙ্গেরি রঙ
মাথা তায় পরাগ হিরণ,
চলে যায় বাজে সারং হিয়ার সোহাগ-হাওয়ায় টেনে।

আসে যায় আন্‌মনে ও দুলিয়ে কলি
চেনে ও ফুল-মুলুকের অলি-গলি।
ওরি মন্তরের কমল
মেলে তার তায় শত দল,
হৃদয়ের সাত-মহলা খুলে তায় বন্ধু মেনে।

তুলে ঢেউ গুঞ্জ-গাথায় কুঞ্জে ঘোরে
মধু-বিষ মিশিয়ে বিধি গড়্‌লে ওরে,
জানে ও হুল্ ফোটাতে
জানে ও ভুল ছোটাতে
পারে ও ফুল ফোটাতে প্রাণের তারে গমক হেনে।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

চয়ন

মনের বয়স

সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে কেউ প্রতিভাশালী, কেউ নির্ব্বোধ হয় কেন, এই নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা অনেক মাথা ঘামিয়ে স্থির করেছেন যে, মনের বয়সের কম-বেশীর জন্যই এই তারতম্য হয়। যেমন কোন ছেলের বয়স, হয়তো জন্ম-তারিখ থেকে হিসেব ক'রে ঠিক দশবছর হয়েছে, কিন্তু তার মনটা ঠিক বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে দশ বছরের মত বেড়ে উঠতে না পেরে হয় তো প্রায় তিন বছর পেছিয়ে এখনও সাত বছরের কোটাতেই পড়ে আছে! আবার কোনও কোনও ছেলের বয়স হয় তো সবে দশবছর, কিন্তু তার মনটা বয়সের চেয়েও আগে বেড়ে উঠে তেরো-চোদ্দোর নাগালে গিয়ে পৌঁছেচে। এই সব ছেলেই জগতে একদিন প্রতিভাশালী লোক ব'লে পরিগণিত হয় আর পূর্ব্বোক্ত ছেলেরা নির্ব্বোধ ব'লে অভিহিত হয়ে থাকে।

ছেলেদের সঙ্গে সামান্য দু'চার কথা ক'য়েই বুঝতে পারা যায় যে, সে কি দরের ছেলে, অর্থাৎ তার বয়সের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য আছে কিনা? যদি থাকে, তবে বুঝতে হবে যে ভবিষ্যতে সে একজন সাধারণ লোক ব'লেই পরিগণিত হবে; কিন্তু মন যদি তার বয়সের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে থাকে তবে সে নির্ব্বোধ হবে নিশ্চয়; আর তার মনের বয়স যদি তার নিজের বয়সকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে দেখা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে যে, সে একদিন প্রতিভাশালী ব'লে গণ্য হবে। এই ধরুন যেমন "তোমার নাম কি?" এই প্রশ্নের জবাব যে-কোন একটি তিনবছরের ছেলে দিতে পারে। "তুমি খোকা না খুকী?" একটী চার বছরের ছেলে অনায়াসে এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে। "তোমার বয়স কত?" জিজ্ঞাসা করলে একটী পাঁচবছরের ছেলের পক্ষে সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের গোটাকতক সামান্য রকম ঠকানো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেই তাদের মনের বয়সটা সহজেই ধরা পড়বে। যেমন জনকতক সাত আট বছরের ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—"আচ্ছা বল দেখি, রাম শ্যামের চেয়ে যদি বেশী খেতে পারে, আর শ্যাম, যদুর চেয়ে বেশী খেতে পারে, তাহলে সব-চেয়ে বেশী খেতে পারে কে?" "একমণ তুলো বেশী হাল্‌কা, না একমণ শোলা বেশী হাল্‌কা?" "বরফ কিসের মতন ঠাণ্ডা?"—"তিনের ডবল যদি ছয় হয়, তাহলে সাড়ে-তিনের ডবল কত হবে?" 'বল' কত রকম আছে?—ইত্যাদি।

তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেদের পরীক্ষা করতে হ'লে কতকগুলো সহজ সমস্যাপূরণ করতে দিতে হয়, যেমন—"যদু মধুকে ডেকে বললে, তুমি যদি আজ ইস্কুলে যাও তাহ'লে আমিই বাড়ীতে থাকি; আর আমি যদি বাড়ীতে থাকি, তাহ'লে তুমিই ইস্কুলে যাও, এখন বল দেখি, কে ইস্কুলে গেল আর কে বাড়ীতে রইল?"—কিম্বা "মণি ফণী ষ্টেশনের দিকে যেতে যেতে মণি বললে, দেখ ফণী, আজ যদি ভাই ট্রেণখানা 'লেট' হয় তাহ'লে আমরা দেশে গিয়ে দাদার দেখা পাব না, কিন্তু ট্রেণ-

খানা যদি 'লেট' না হয় তাহ'লে আমরা বোধ হয় ট্রেণ ফেল্ হবো।' তারপর ষ্টেশনে গিয়ে তারা বুঝ্তে পারলে না যে ট্রেণখানা 'লেট' হয়েছে, কি, হয় নি। এখন তোমরা কেউ বল্তে পার যে তারা দেশে গিয়ে দাদার দেখা পেয়েছিল কি না?"—এ ছাড়া অঙ্ক, কথার মানে, ছবির মর্ম্ম,-এ-সব জিজ্ঞাসা ক'রেও মনের বয়স ধরা যায়—; আর একটা সহজ উপায় হচ্ছে তাদের গল্প বল্তে বল্তে তার ভিতর ইচ্ছে ক'রে মাঝেমাঝে কিছুকিছু ভুল জবানবন্দী ক'রে যাওয়া।-যেমন, "একজন নিঃসন্তান সওদাগর তিনটি ছেলে রেখে মারা গেল, তাদের একজন চোখে কিছু দেখ্তে পায়না, আর দু'জন অন্ধ! একদিন তারা তিন ভাই পরামর্শ ক'রে দেশ-ভ্রমণ করতে বেরুলো। অনেক দূর যেতে যেতে তারা দেখ্লে, সাম্নে একটা মস্ত নদী শুকিয়ে রয়েছে, ধূ ধূ করছে বালির রাশ। তিন ভাই তখন কি করে, মালকোচা বেঁধে অনেক কষ্টে সাঁতার কেটে নদীটা পার হ'ল"—ইত্যাদি।

বিলাতে ছেলেদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করবার সময় এখন এই ভাবে তাদের পরীক্ষা ক'রে নেওয়া হয়। যে ছেলেদের যেমন মনের বয়স, সেই হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ ক'রে, যে, যে বিষয়ে শিক্ষালাভের উপযুক্ত তাকে তদনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের এখানকার মত মুড়ি-মিছরির একদর সাব্যস্ত ক'রে ঘোড়া আর ভেড়াকে এক ক্লাসে ভর্ত্তি ক'রে নেয় না।

মনের বয়স হিসাবে—শ্রেণী-বিভাগ ক'রে যোগ্যতা-অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দেওয়ার একটা মস্ত সুফল দেখা যায় এই,—যে, পরবর্ত্তী জীবনে সংসারে প্রবেশ ক'রে সে-সব ছেলেকে প্রায়ই ব্যর্থ বা অকৃতকার্য্য হতে হয় না; কেন না তারা তখন ঠিক তাদের উপযুক্ত কাজটিই বেছে নিতে পারে।

মুখ-দর্পণ

পাত্লা লম্বাটে মুখ মানসিক ও দৈহিক শক্তির চিহ্ন, কিন্তু মুখখানা যদি চৌকো আর বেঁটে হয়—তাহলে সেটি তার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

পাত্লা-মুখো লোকের চিবুকটা যদি বেশ চৌকোনা দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ইচ্ছা-শক্তি খুব প্রবল আর তাঁর ভিতর একটা কোন নূতন কাজের সূত্রপাত করবার ক্ষমতা আছে। এমন-কি সে কাজে সে-রকম লোক অনেকদূর পর্য্যন্ত এগিয়েও যেতে পারে, কিন্তু চৌকো আর বেঁটে লোকেরা বাঁধা রাস্তা ছাড়া এক পা চল্তে পারে না, আর সেই গতানুগতিক পথেই তারা চিরকাল আট্কে পড়ে থাকে।

যাদের মুখ ঠিক গোল নয় অথচ বাদামীও নয়, দু'য়ের মাঝামাঝি—চোখ-দুটীর চাউনি বেশ খোলা আর ভুরুর রেখা খুব স্পষ্ট ও সমান, তারা প্রায়ই ব্যবসাদার, কাজের লোক হয়।

যাদের চওড়া কপাল ঠিক চোখের উপর থেকেই আরম্ভ হয়েছে তারা সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী। যাদের কপাল সঙ্কীর্ণ তাদের মন বড় দুর্ব্বল ও অস্থির। যাদের কপালের উপর দিক ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে, অর্থাৎ চোখের উপর দিকটা উঁচু, কিন্তু মাথার দিকে ক্রমশঃ নীচু হয়ে পড়েছে—তারা কাণ্ডজ্ঞান-হীন নির্ব্বোধ, লোকের কুৎসা ক'রে বেড়াতেই ভালবাসে, কিন্তু উপকার করতেও চায়—যদি বোঝে যে, তাতে নিজের কোনও ক্ষতি হবে না।

চোখই হচ্ছে মানুষ চেনবার প্রধান উপায়। যাদের দুটি আয়ত ইন্দীবর নয়নে বেশ সরল সুন্দর দৃষ্টি—তাদের খুব কমনীয় নির্ম্মল স্বভাব। যাদের ক্ষুদ্র চোখ সঙ্কীর্ণ, তারা ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, কুঁড়ে আর স্বার্থপর হয়, যাদের চোখ এই দু-রকমের মাঝামাঝি অর্থাৎ খুব ডাগরও নয় বা বেশী সঙ্কীর্ণও নয়, তারা বিশ্বাসী সাদাসিধে খাড়া লোক।

যাদের নাকটি বেশ বাঁশীর মতো, তাদের মনের জোর আছে—দৃঢ়-সঙ্কল্প আছে—আর কার্য্য-কুশলতাও যথেষ্ট।

যাদের নাকটী সরু ছুঁচালো, তাদের সকল বিষয়ে কৌতূহলের মাত্রাটা একটু অধিক। খাটো নাকওয়ালা লোকেরা ধৃষ্ট, প্রগল্‌ভ ও নির্ল্লজ্জ হয়। নাক যাদের চ্যাপ্টা তাদের প্রকৃতিতে গুণ্ডামির ভাবটা প্রবল থাকে।

ঠোঁট-পুরু লোকেরা নিতান্ত তামসিক ভাবাপন্ন, বিষয়ভোগ-লালসা-লিপ্ত—বিলাসী ও পেটুক হয়। পাত্লা ঠোঁট যাদের, তাদের ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল হয় বটে, কিন্তু মেজাজ বড় খারাপ হয়।

মদনের ফুলধনুর মতো সুন্দর অধরপুট যার, তার মুখখানি যদি বেশ দৃঢ় [illegible] হয়, তবে সে আদর্শ-চরিত্র লোক হয়। তার অন্তরের মধ্যে বিশ্বের কল্যাণ-কামনা নিহিত থাকে। সে আশুতোষ, সদানন্দ, সৎমেজাজি, সকলের দুঃখে সহানুভূতি-সম্পন্ন, অকপট আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, ন্যায় ও সত্যের অবতার।

চৌকো চিবুক যার, সে এই সংসারে সহস্র দুঃখ-ঝঞ্ঝার সঙ্গে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে, বিজয়গৌরবে উন্নতির মুখে এগিয়ে যেতে পারে। যাদের চিবুক গোল, তারা অলস ও বিলাসী হয়। যাদের চিবুক অভ্যন্তরগত অর্থাৎ ভিতরদিকে সঙ্কুচিত, তারা দুর্ব্বল হয় ও সকল কাজেই ইতস্ততঃ করে।

মাথার দিকে ঘেঁসা ছোট ছোট কান যাদের, তাদের মানসিক সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ দেখা যায়। সুকুমার কলা-বিদ্যার উপর তাদের ঝোঁক থাকে আর চরিত্র বিশুদ্ধ হয়। বড় বড় ঝোলা-কান একগুঁয়েমি, বোকামি ও পাশবিক প্রবৃত্তির পরিচায়ক। কোন কোন লোক কান নাড়্তে পারে। যারা এই শক্তির পরিচয় দেয়, তারা অল্পদিনমাত্র মানুষ হয়েছে। তাদের প্রকৃতিতে অন্যান্য পশুভাবও অত্যন্ত প্রবল থাকে। কান যে মানুষের বংশ-পরিচয়ের ধারা নির্ণয় ক'রে দিতে পারে, নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা সম্প্রতি তা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন, আঙুলের ছাপ-চেনার মত, কেবল কান দেখেই—অদূর-ভবিষ্যতে অপরাধীদের সনাক্ত করা চল্বে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সেকালের ছুটি দৃশ্য

সংহারকর্ত্তা ভিসুভিয়াস, খৃষ্টিয় ৭৯ শতাব্দীতে সুন্দরী পম্পিনগরীকে বিরাট এক চিতার তলায় চাপা দিয়াছিল; এবং মানুষ ছাই সরাইয়া রত্নের মত আবার তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, এ-কথা এখন সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সেই আবিষ্কারের পর, অল্পকাল পূর্ব্বেই পম্পির আর এক নূতন অংশ আবার খনকদের কোদালের মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে Street of Abundance নামে একটি রাস্তা।

পম্পি ইতিহাসের সেইদিনের একটি মূর্ত্তিমান সাক্ষীর মত—যে দিন আর নাই, আর আসিবে না। তাহার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য সত্য দর্শকের মনকে বারংবার আঘাত দেয়। আজ দুই হাজার বৎসরের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরেও, একালের উন্নতি-গর্ব্বিত মানব-সভ্যতা সেই সুদূর-অতীতের স্মৃতি-মাত্রসার মানুষগুলিকে বড় বেশী পিছনে ফেলিতে পারে নাই। বরং সৌন্দর্য্যবোধে এবং কলাজ্ঞানে একালের চেয়ে সেকাল যে অধিক উন্নত ছিল, পম্পির এই নবাবিষ্কৃত রাজপথে পদে পদে তাহাই প্রমাণিত হয়!

ভিসুভিয়াসের অগ্নি-উদ্গারে পম্পি-নগর যখন ধ্বংস হয়, নগরের বাসিন্দাদের চিত্ত তখন এক রাজনৈতিক আন্দোলনে বিক্ষিপ্ত ছিল। একালে রাজনৈতিক নেতারা নির্ব্বাচনের সময়ে খবরের কাগজ ও পুস্তকের দ্বারা আপনার বক্তব্য জনসাধারণের সাম্‌নে খুলিয়া বলেন। কিন্তু পম্পি যে-যুগের সহর, সে যুগে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। তাই তখনকার নেতারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দেওয়ালের উপর আপনাদের আবেদন লিখিয়া, সাধারণকে নিজের নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেন। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে

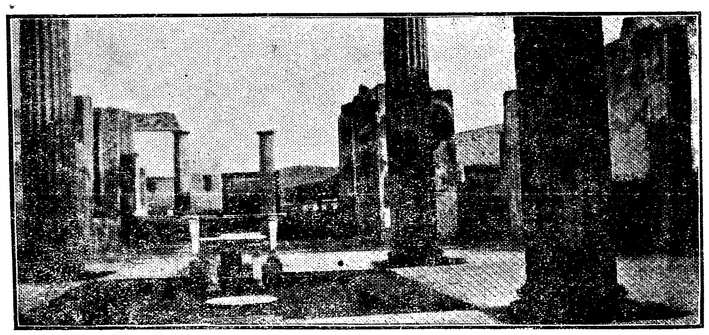

পম্পির একটি পুরানো বাড়ীর ভিতরের দৃশ্য

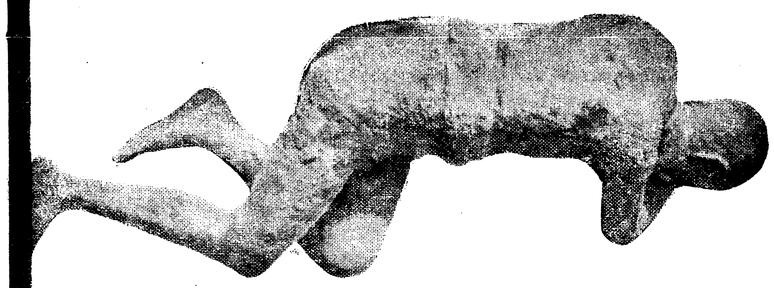

দুহাজার বৎসরের পুরানো মানুষের মূর্ত্তি। মাটি থেকে খুঁড়ে বার করা।

এমন-সব ব্যাপারও ঘটিত, যাহাতে একালের আমরা কিছু হাসিয়াও লইতে পারি। কারণ, সে-যুগের নেতারা প্রতিপক্ষের আবেদন সকলের চোখের আড়ালে রাখিবার জন্য, তাহার উপরে লুকাইয়া চুণকাম করাইয়া আপনাদের আবেদন দাগিয়া দিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না—একালে যেমন দেওয়ালে-মারা এক ব্যবসায়ীয় বিজ্ঞাপনের 'প্লাকার্ডের' উপরও অন্য ব্যবসায়ীর লোকেরা আসিয়া আপনাদের বিজ্ঞাপন মারিয়া দিয়া যায়!

কেবল পম্পি নয়, তাহার সঙ্গে হার্কুলিনিয়াম নামে আর-একটি সহরও ভিসুভিয়াসের জলন্ত ক্রোধে ভস্মস্তূপে আত্মগোপন করিয়াছিল। কিন্তু সে সহরটি এখনো একশো-ফুট গভীর কঠিন গন্ধক, মাটি ও ভস্মরাশির ভিতরে সমাধিস্থ হইয়া আছে। তবে পম্পির উপরকার আবরণটা তেমন শক্ত ছিল না বলিয়াই মানুষ সহজে তাহার কঙ্কালকে খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারিয়াছে।

পম্পির খনন-কার্য্য এখনো শেষ হয় নাই। প্রথম খনন আরম্ভ হইয়াছিল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে। প্রথম সাত-বৎসরেই পম্পির ভিতর হইতে সাতশো আটত্রিশখানা ছবি, সাড়ে-তিনশো পাথরের মূর্ত্তি এবং একহাজার ছয়শো সাতচল্লিশটি অন্যান্য খুচরা দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। তারপরে আজ-পর্য্যন্ত যে আরো কত শিল্প-বিচিত্র দ্রব্যাদি এখান হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। শুনা যাইতেছে, হার্কুলানিয়ামকেও শীঘ্রই পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা হইবে।

পম্পির সাধারণ আকার অনেকটা ডিমের মত। ইহার চারিধারে পাঁচিলের বেড় ছিল প্রায় তিন মাইল। সহরের রাস্তাগুলি তেমন চওড়া ছিল না (সব-চেয়ে চওড়া রাস্তাটি বত্রিশ ফুট মাত্র চওড়া ছিল) বটে, কিন্তু প্রত্যেক রাস্তাই পাথর-বাঁধানো হইত। কিন্তু পম্পির রাস্তাগুলি সরু হইলেও সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পম্পি ধ্বংস হইবার দেড়-হাজার বৎসর পরেও, লণ্ডন ও প্যারি সহরের পথ-ঘাটগুলি বেশী-চওড়া হইলেও—

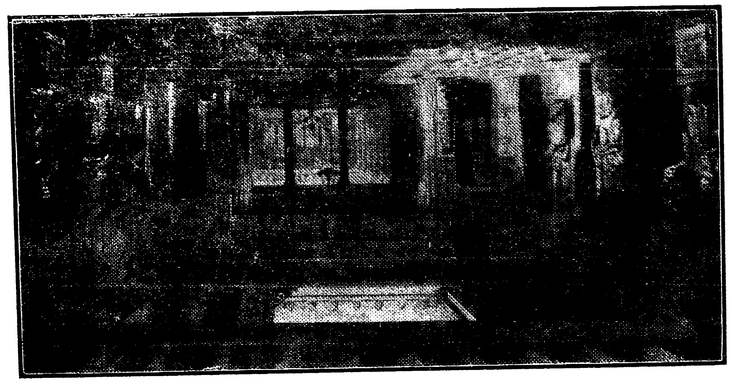

পম্পির একটি রাজপথের ধ্বংসাবশেষ

তাহাদের অবস্থা পম্পির রাজপথের চেয়ে ঢের-বেশী খারাপ ছিল।

সেই পুরাতন দিনেও সহর-হিসাবে পম্পির স্থান প্রথম শ্রেণীতে ছিল না। কিন্তু পম্পির ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে যে-সব সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আধুনিক প্রথম শ্রেণীর নগর-গুলিতে সভ্যতা ও বিলাসিতার যে-সকল উপকরণ দেখা যায়, প্রাচীন পম্পিনগরে তাহার অধিকাংশই বিদ্যমান ছিল।

পম্পির অনেকগুলি প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের আকার, গঠন-কৌশল ও কারুকার্য্য এখনো সকলকে মোহিত করে। এখানকার সব-চেয়ে বড় প্রাসাদটির আকার লম্বায় একশো আশি ফুট ও চওড়ায় আশি ফুট। অধিকাংশ অট্টালিকাতেই যথেচ্ছভাবে যেখানে-সেখানে উঁচুদরের মার্ব্বেল পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। পম্পি-সহরে দুইটি রঙ্গালয়ও পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের একটিতে এক সঙ্গেই পাঁচহাজার ও আর একটিতে দেড় হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। এখানে দর্শকরা ধাতুনির্ম্মিত টিকিট ব্যবহার করিত। অন্যান্য বিখ্যাত অভিনেতার সঙ্গে রোটিকা নামে একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর নামও জানিতে পারা গিয়াছে। গ্লাডিয়েটররা যেখানে দ্বন্দযুদ্ধ করিত, সেই "অ্যাম্পি-থিয়েটার"টিও কম-বড় নয়। তাহার ভিতরে একসঙ্গে বিশহাজার লোকের জায়গা হইত।

পম্পির ছোট বড় অসংখ্য বাড়ীর দেওয়ালেই শত শত ভিত্তি-চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ-সব ছবির বিষয়-বৈচিত্র্যও অপূর্ব্ব,—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী, প্রাকৃতিক ও কাল্পনিক দৃশ্য—সমস্ত বিষয়ই চিত্রকরের বিচিত্র তুলিকা-স্পর্শ লাভ করিয়াছে।

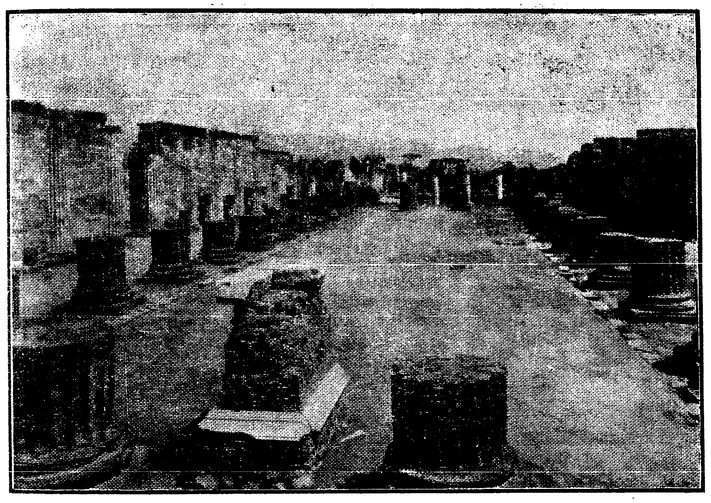

পম্পির একটি পুরাতন থামওয়ালা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

পম্পির পুনরাবিষ্কারের পরে, নানা লোকের দ্বারা তাহার কলা-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইত। কিন্তু সেই অবাধ-লুণ্ঠন এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখন ইতস্তত-বিকীর্ণ ভগ্নাংশগুলি যথাস্থানে জোড়াতাড়া দিয়া সাজাইয়া, মেরামত করিয়া, অনেক পুরাতন ঘর-বাড়ীর মূর্ত্তি আবার সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভয়ত্রস্ত বাসিন্দারা পলাইতে পলাইতে যেখানে-যেখানে পড়িয়া মরিয়াছিল, তাহাদের ছাই-ঢাকা কঠিন দেহগুলিকে এখনো ঠিক সেই সেই জায়গায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। একজায়গায় একটি চাকর গাছে চড়িতেছিল, সেই সময় তপ্ত ভস্মরাশি আসিয়া গাছসুদ্ধ তাহাকে পুঁতিয়া ফেলে,—সেই-অবস্থায় সে বেচারীর দেহটি এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দেওয়ালে কোন শিশু বাড়ীর কর্ত্তার নামটি খুদিয়া রাখিয়াছিল—সেটিও আজ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া আছে।

* * * *

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের দ্বারা রোমের আর একটি গুপ্ত ঐশ্বর্য্য, এই সবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এটি প্রাচীন রোমের একটি রাজকীয় স্নানাগার! ভ্রাতৃহত্যাকারী সম্রাট কারাকাল্লার দ্বারা ২১৬ খৃষ্টাব্দে এটি নির্ম্মিত হইয়াছিল—অর্থাৎ পম্পির সমাধি-লাভের একশো-সত্তেরো বৎসর পরে! সুতরাং এই অপূর্ব্ব স্নানাগারটিকেও প্রায় সেই সময়েরই সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া ধরিতে হইবে। আর বাস্তবিক-কথাও তাই। কারণ পম্পির

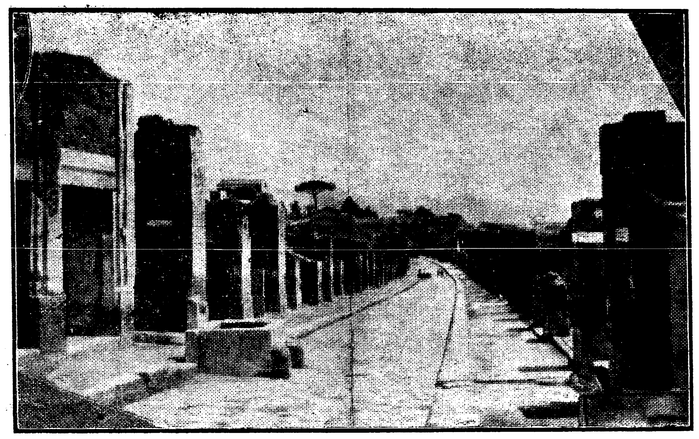

পম্পির একটি প্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষ

ভাঙা কঙ্কালের উপরে যে সৌন্দর্য্যের অবশেষ দেখা যায়, ঠিক সেই একই আদর্শের সৌন্দর্য্য কারাকালার স্নানাগারের সর্ব্বত্রই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই স্নানাগারটি ছিল প্রকাণ্ড—লম্বায় ও চওড়ায় ১০৫০ ও ১৩৯০ ফুট। প্রাচীন রোমবাসীরা স্নানগৃহে অতুল বিলাসিতার পরিচয় দিতেন এবং সেই বিলাসিতার সৌন্দর্য্য এখানে আবার চরমে উঠিয়াছিল। এই বিরাট স্নানাগারের তলায় ১০৫৩৫ ফুটব্যাপী অসংখ্য সুড়ঙ্গ-পথ ছিল। সেই সব পথ দিয়া ক্রীতদাসরা সকলের অগোচরে আনাগোনা করিত। তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল, স্নানাগারের বিভিন্ন গৃহে দরকার-মত জল ও আলোর ব্যবস্থা করা। সেই-সব সুড়ঙ্গ-পথ দেখিলে সেকালের স্থাপত্যবিদ্‌গণের আশ্চর্য্য শক্তি ও কৌশলের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই স্নানাগারেরও এখন ভগ্নদশা। নিষ্ঠুর কাল ও অসভ্য মানুষ একসঙ্গে ইহার উপরে অত্যাচার করিয়াছে। সেই বহুকালব্যাপী অত্যাচার ও যথেচ্ছ লুণ্ঠনের ফলে, স্নানাগারের অমূল্য কারুকার্য্য-খচিত মর্ম্মর শিলাপট ও প্রতিমূর্ত্তিগুলি এখন কোথায় অদৃশ্য বা দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইয়াছে, নয় তো ভাঙিয়া-চুরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। এখানকার একটি হাত-পা-মাথা ভাঙা মূর্ত্তি দেখিয়া, একসময়ে শিল্পী-শ্রেষ্ঠ মাইকেল এঞ্জিলোর মনেও অপূর্ব্ব বিস্ময় ও ভাষাতীত প্রশংসা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

ম্যাপ আঁকা

মানচিত্র আকার কথা বড়-বেশী শোনা যায় না বটে, কিন্তু একালে মানচিত্র একটা দরকারি জিনিষ।

পৃথিবীর সব-চেয়ে পুরানো মানচিত্র আছে, টিউরিন সহরের যাদুঘরে। এই মানচিত্রখানি প্রাচীন মিশরের গাছের পাতায় আঁকা। তাহাতে নানারকমের লেখা-রেখা চিহ্নের সঙ্গে নদ-নদী আঁকা আছে,—এমন কি জলের কুমীর ও মাছ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই! সেই মানচিত্রখানির অঙ্কন-কাল ১৩৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ!

মানচিত্র আঁকায় মানুষের দক্ষতা এখন এত-বেশী হইয়া উঠিয়াছে যে, সমগ্র ইংলণ্ডের খুব অজ্‌-পাড়াগাঁয়েরও কোন্ কোণে ক'টা গাছ আছে, ম্যাপ দেখিয়া অনায়াসে তাহা জানা যায়! বিলাতে যে-সব ম্যাপে পঁচিশ ইঞ্চির স্কেলে এক এক মাইল ধরা হইয়াছে, তাহাতে সারা দেশের প্রত্যেক কুঁড়েঘর, গাছ বা ঝোপঝাড় পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে!

তামার পাতে ম্যাপ খোদাই করা হয়। আগে লিথোগ্রাফের পাথরে ফেলিয়া ম্যাপ ছাপা হইত—এখন হয় অ্যালুমিনিয়ামের পাতের উপরে। ভিন্ন ভিন্ন পাতে ছাপাইয়া ম্যাপকে রঙিন করা হয়। প্রথমে খুব বড় স্কেলে ম্যাপ আঁকিয়া, তারপর আলোক-চিত্রের সাহায্যে তাহাকে ছোট করিয়া আনার দরুন ম্যাপের প্রত্যেকটি রেখা হয় খুব স্পষ্ট ও ঝর্‌ঝরে। অনেক সময়ে এক-একখানি মানচিত্র আঁকিতে ত্রিশ-চল্লিশজন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিত্রকরের দরকার হয়।

ফ্রান্সের লুভ্‌র্ নামক বিখ্যাত চিত্রশালায় পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে দামী ও আশ্চর্য্য মানচিত্র আছে। এই মানচিত্রখানি রুসিয়ার শেষ-সম্রাট ফরাসী জাতিকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহার আকার সবদিকেই চল্লিশ ইঞ্চি করিয়া। শ্লেট-পাথরী রঙের "জ্যাস্‌পার" মণির ফ্রেমে তাহা বাঁধানো। সমস্ত ম্যাপখানিই পাকা সোনায় গড়া এবং দামী রত্নের বোতামে আঁটা! ম্যাপের সমুদ্রের ছবি মার্ব্বেলের দ্বারা আঁকা এবং মূল্যবান চুনী-পান্না বসাইয়া নগর বুঝানো হইয়াছে। এই মানচিত্রখানির আনুমানিক মূল্য বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়!

লেখার সময়

"রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন" নামে বিখ্যাত ইতিহাসখানি রচনা করিতে গিবনের সময় লাগিয়াছিল ত্রিশ বৎসর। কেবলমাত্র প্রত্যেক খণ্ড লিখিতেই তাঁহাকে দুই বৎসর করিয়া সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের দার্শনিক পুস্তক-গুলির নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার Social Statics হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Man versus the State পর্য্যন্ত আটখানি

পুস্তকের মূল বিষয় এক (Society is an organism subject to evolution)। সুতরাং এই একটি বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে তাঁহারও সময় লাগিয়াছিল প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোসেফ হেন্‌রি সর্টহাউসের John Inglesant নামে উপন্যাসখানি পাকা সাতটি বৎসর ধরিয়া লিখিতে হইয়াছিল।

বিশ্ব-সাহিত্যের অনেক ভালো ভালো কবিতা অল্প সময়ের মধ্যে লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু "In Memoriam" লিখিতে টেনিসনের অন্তত দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। ধরিতে গেলে, প্রায় ত্রিশবার এই কাব্যখানিকে টেনিসন নূতন করিয়া লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু আকার-হিসাবে Gray's Elegy অধিকতর দীর্ঘকালব্যাপী রচনার ফল। এই কবিতাটিতে লাইন আছে মোটে একশো আটাশটি। কিন্তু এইটুকু কবিতাই গ্রে সাতবৎসর ধরিয়া একমনে লিখিয়াছিলেন।

বিরোধী দৃষ্টান্তও অনেক আছে। একালের এইচ জি ওয়েল্‌স্ বলেন, একদিনে তিনি দশ হাজার পর্য্যন্ত শব্দ লিখিয়াছেন। কনান ডয়েল একটানা বারোহাজার পর্য্যন্ত শব্দ লিখিয়া, তবে ডেস্ক্ ছাড়িয়া উঠিয়াছেন!

ষ্টিভেন্‌সন অনেক সময়ে একটি কথা বদলাইবার জন্য পাতা-কে-পাতা নূতন করিয়া লিখিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস Jekyll and Hyde মাত্র সাতদিনে সমাপ্ত হইয়াছিল।

স্কটের তাড়াতাড়ি লিখিবার শক্তির কথা সকলেই জানেন। ডুমাস্ ফিল্‌ও এদিকে কম বাহাদুর নন। অনেক কাল ধরিয়া প্রতি সপ্তাহেই তিনি এক-একখানি করিয়া নূতন উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

আমাদের বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি লিখিতে পারেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ রায় কিন্তু এ-বিষয়ে আর সব বাঙালী লেখকের উপরে টেক্কা দিয়াছেন।

"অপ্‌টোফোঁ"

বা অন্ধদের সাধারণ ছাপার বই পড়্‌বার যন্ত্র।

সম্প্রতি অপ্‌টোফোন্ নামে অন্ধদের পড়বার এক যন্ত্র তৈরি হয়েছে! এই যন্ত্র দিয়ে অন্ধরা দৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন লোকেদের মত ছাপার সমস্ত বই, এমন-কি টাইপ্‌রাইটারে ছাপা চিঠি-পত্রের হরফ পর্য্যন্ত পড়তে পারবে।

এতদিন অন্ধরা—"ব্রেইল্" সাহেবের প্রবর্ত্তিত উঁচু উঁচু ছাপার হরফে আঙুল বুলিয়ে পড়ত—এ-রকম বই ছাপায়ও অসুবিধা এবং আকারেও সেগুলি অত্যন্ত বড় আর ভারী হ'ত, সেজন্যে অন্ধদের সাহিত্য পৃথিবীতে বড়ই অল্প হ'য়েছিল; কিন্তু এখন এই যন্ত্রের সাহায্যে, পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার আজ দৃষ্টিহীনেদের কাছে অবাধে উন্মুক্ত হ'ল।

যন্ত্রটীর উপর বই রাখবার একটী কাঁচের

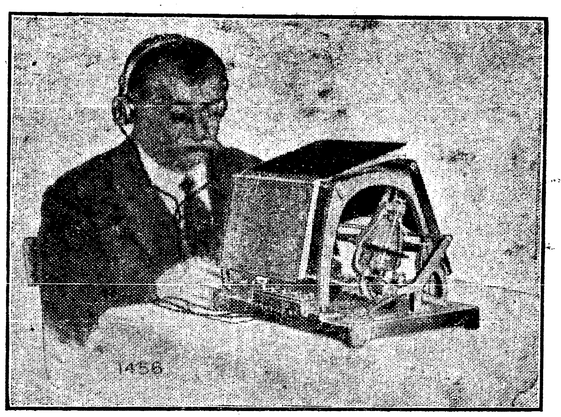

অন্ধের ছাপানো বইয়ের গান-শোনা

প্লেট বসান থাকে, সেই কাঁচের প্লেটে বইয়ের পাতাখানা উপুড় ক'রে আট্‌কে দিতে হয়। প্রত্যেক অক্ষরের উপর পর-পর আলো ফেল্‌বার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই আলো প'ড়ে ছাপার বর্ণমালাকে সুরের বর্ণমালায় পরিবর্ত্তিত ক'রে দেয়। এই সুর টেলি-ফোনের রিসিভারের মত একটা যন্ত্র দিয়ে অন্ধ পাঠকের কানে পৌছায়। অন্ধদের শ্রবণ-শক্তির স্বাভাবিক প্রাখর্য্য বশতঃ এই সুরের বর্ণমালা কিছুদিনের অভ্যাসেই তাদের আয়ত্ত হ'য়ে আসে। টেলিগ্রাফের বাবুরা "টরে-টক্কা," "টরে-টক্কার" ভাষা যেমন সহজেই বুঝতে পারেন, তেম্‌নি "অপ্‌টোফোনের" সুর লিপিতে অভ্যস্ত অন্ধও অক্ষরের সুরের সাড়া সহজেই বুঝতে পারবে। এর সাহায্যে মিনিটে পঁচিশটা কথা পর্য্যন্ত সহজে "পড়তে" পারা যায় দেখা গিয়েছে।

শ্রীবামাপদ বসু।

'ইকেবানা'

জাপান ললিত কলার লীলা-নিকেতন। দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারও যেখানে শ্রীসম্পদে সমুজ্জ্বল, সেখানে ফুলের আদর যে খুবই, ইহা আর বিচিত্র কি! ফুল ও ডাল-পাতায় স্তবক-রচনা সেখানকার একটি বিশেষ আর্ট্। এই আর্টের জাপানী নাম 'ইকেবানা'।

ইকেবানার প্রবর্ত্তক জাপানের রাজকুমার শোতোকু তাইশি (৫৭১—৬২১খৃঃ)। জনৈক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আচার্য্যের অবতার-রূপে ইনি

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

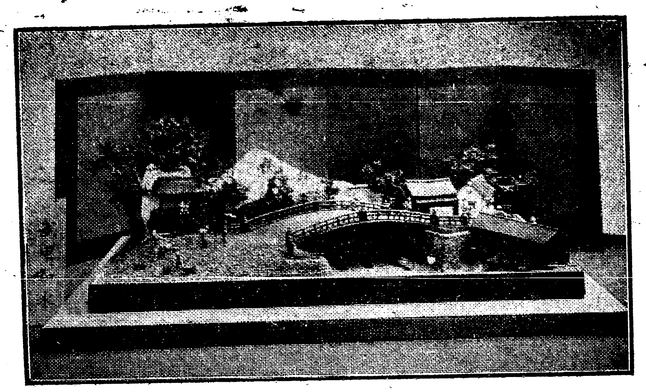

সরায় ধরা

বিবেচিত। জাপানে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের প্রভাব-বিস্তারে ইনি যথেষ্ট সহায়তা করেন।

অধুনা মেয়েদের মধ্যেই ইকেবানার চর্চ্চা নিবদ্ধ। সকল উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ে এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজ-পরিবারের এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের ইহা একটি বিশেষ শিক্ষনীয় বিদ্যা। নগরে বা গ্রামে, কোথাও এই বিদ্যার শিক্ষক বা ছাত্রীর অভাব নাই।

প্রাচীন কালে কিন্তু কেবল মহিলাদের মধ্যেই এই সুকুমার বিদ্যার অভ্যাস ও আদর নিবদ্ধ ছিল না। দার্শনিক, সাহিত্যিক, ধর্ম্মযাজক, রাষ্ট্রনৈতিক, ওমরাহ প্রভৃতির মধ্যেও অনেকে এই বিদ্যার বিশিষ্ট অনুরাগী ছিলেন।

জাপানে ফুল বেশী জন্মায় না, সুগন্ধি ফুল তো একান্ত বিরল। অথচ সেখানে ফুলের আদর অসীম। সে দেশের অসংখ্য গৃহ পুষ্পপত্রের বহু বিচিত্র পরিকল্পনায় রমণীয়। অন্তরে ইহারা নিয়তই মহম্মদের উক্তি স্মরণ করিতেছে—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি,
দুটি যদি জোটে, তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী!

বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই ত সুধা!*

ইকেবানা বা পুষ্প-পরিকল্পনা প্রধানত একটি ত্রিভুজের আকার ধারণ করে। এই তিনটি ভুজকে যথাক্রমে 'তেন্' বা স্বর্গ, 'চি' বা ধরিত্রী এবং 'জিন্' বা মানব আখ্যা দেওয়া হয়। এই মূল তিনটি ভুজের সহিত

* শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ফুলের ফসল"

ফুলগাছের কেয়ারি

যথাক্রমে দুই, চার বা ছয়টি সহ-ভুজ যোগ করা যাইতে পারে। মোট সংখ্যা সর্ব্বদাই অবিভাজ্য থাকে, যথা—পাঁচ, সাত, নয়। প্রাচীন কালে এই ভুজগুলির নানাপ্রকার নামকরণ হইত, যথা—বদান্যতা, বিশ্বস্ততা, জ্ঞান, সত্যবাদিতা, সৌজন্য। অথবা সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি; বা ধরিত্রী, অগ্নি, জল, ধাতু ইত্যাদি; কখনো বা রংয়ের নাম, যেমন হরিদ্রা, নীল, লাল ইত্যাদি। আর এক মতে এই পুষ্প-পরিকল্পনার পাঁচটি ভুজকে যথাক্রমে হৃদয়, সাহায্য, অতিথি, কৌশল ও সমাপ্তি আখ্যা দেওয়া হয়। কথিত আছে, এই বিদ্যা যাঁহারা চর্চ্চা করেন তাঁহারা ধর্ম্মভাব, সংযম, নম্রতা এবং মানসিক শান্তির অধিকারী হন।

পুষ্পের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান পদ্মের। তবে উহা সাধারণত ব্যবহার হয় না। এই পরিকল্পনায় ফুলের সঙ্গে থাকে তিনটি পাতা। একটি অর্দ্ধশুষ্ক, একটি সতেজ, তৃতীয়টি কুঞ্চিত বিকশোন্মুখ। এই প্রকারে অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগতকে সুকৌশলে রূপ-দান করা হয়।

জাপানের ও পাশ্চাত্য দেশের পুষ্প-রচনায় প্রভেদ এই যে, অন্যান্য দেশের মত, কেবল পুষ্পপত্র দ্বারা উহা রচিত হয় না। ডালপালা ফুল সমস্ত দিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ফুলগাছের কাঠামোটি ফুটাইয়া তোলা হয়।

ছোট ছোট ডালপালার খণ্ড ব্যবহৃত হয়। সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করেন শিল্পী—ঐ বিশেষ বৃক্ষের স্বাভাবিক গঠন-ভঙ্গিমার অনুযায়ী। ইহা কি-পরিমাণ সূক্ষ্ম-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি-সাপেক্ষ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ছোট-বড় আকৃতি ফুটাইয়া তোলা যেমন সুন্দর পরিপাটি, যে-আধারে 'ইকেবানা' রাখা হয়; সেগুলিও তেমনি চমৎকার—সাধারণত বাঁশ বা কাঠের তৈয়ারি, এবং তাহার উপর নানা মনোরম চিত্র উৎকীর্ণ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

প্রশ্নোত্তর

(সংস্কৃত হইতে)

স্তাখায় জিনিস কি আছে জগতে ?
কি দেখি' অধিক সুখ ?
—হরিণ-নয়নী তরুণী প্রিয়ার
প্রেম-প্রসন্ন মুখ।
কোন্ আঘ্রাণ তোষে প্রাণ ?—তার
ঘনিষ্ঠ নিশ্বাস !
শ্রবণে অমৃত কিসে বা বরিষে ?
—তার সে মুখের ভাষ।

মধুর চেয়েও মধুর কি ?—তার
অধর-পুষ্পরস !
পরশে অমৃত ?—চন্দন-ঘন
তন্বীর সুপরশ।
ধেয়ানে ধরিয়া কোন্ ধনে হিয়া
সব চেয়ে হয় সুখী ?
মরমীরা কয়,—তার নাম হয়
প্রেয়সী ইন্দুমুখী !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সঙ্কলন

শিল্পীর সাধনা

একান্ন বৎসর বয়সে ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ যখন সাতান্ন-সংখ্যক বেগমের পাণি-পীড়ন করলেন, তখন—তখন কে জান্‌ত যে তাঁরই রাজপ্রাসাদে আরব্য উপন্যাসের নিছক রূপকথাগুলোর একটা এসে নিজের বাস্তবতা প্রমাণ করে' যাবে !

সে যাই হোক্। বাদশা নতুন বেগমের পাণি-পীড়ন করে' তাঁর হারেমে পুরলেন, এদিকে সেই সঙ্গে তাঁর দরবারের আমীর-ওমরাহ্‌দের মধ্যে কেমন করে' জানাজানি হয়ে গেল যে, নতুন বেগমের মত সুন্দরী ত্রিভুবনে নেই। অপ্সরী ?—অপ্সরীরা ত সব চির-যৌবনা। যা চিরদিনের, যার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, যা স্থির, তা হাজার সুন্দর হোক, কিন্তু তাতে মোহের অবসর নেই। ফুলগুলো ফুটে উঠে ঝরে' যায় বলেই ত ওর সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তের তরে নিবিড়তম হ'য়ে দেখা দেয়, সেই জন্যেই ওর মোহ অনন্ত কালের। নতুন বেগমের ভোম্‌রা রঙের রেশমী চুলের রাশ যে একদিন শণের নুড়ি হ'য়ে উঠবে—তার আঙুরের রসে ভিজানো হিঙ্গুল রঙের ঠোঁট-দুখানি যে একদিন শুকিয়ে চামড়ার মত হ'য়ে উঠবে—তাজা ফুলের মত গালদুটো যে শুক্‌নো পাতার মত চুমড়ে যাবে—চোখের কোণ থেকে তড়িৎ ঢালাঢালি যে আর চলবে না—তার বুক যে আর দুলবে না, গ্রীবা যে আর হেলবে না, হাত যে আর টলবে না—এই চিন্তাই যে হুশেন শাহ্‌কে চতুর্গুণ মাতিয়ে তুলেছে। সুতরাং অপ্সরী ?—না, নতুন বেগমের সঙ্গে অপ্সরীর তুলনাই হয় না। অপ্সরী ত নয়ই—মানব-মানবীর মধ্যেও এমন রূপ আর কখনো সৃষ্ট হয় নি—আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা সে বিষয়ে বাদশা হুশেন সাহের ঘোর সন্দেহ।

কিন্তু আমীর-ওমরাহদের মধ্যে নতুন বেগমের রূপের কথা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আপশোষের কথাও জেগে উঠল। এমন সুন্দরী যে নতুন বেগম, যাঁর দেহে বিশ্বকর্ম্মা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ছাপ অঙ্কি

করে' দিয়েছেন—যাঁর তুল্য সুন্দরী সসাগরা পৃথিবীতে নেই, অমরাবতীতে নেই, গন্ধর্ব্বলোকে নেই—তেমন রূপ একদিনের জন্যেও কারো নয়নগোচর হবে না, এই হচ্ছে তাঁদের আপশোসের কথা। তাঁদের মধ্যে দু' একজনা দার্শনিক ওমরাহ তাঁদের লম্বা শুভ্র দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গালিচার বুনোনো রঙিন ময়ূর-গুলোকে নিরীক্ষণ করে' করে' বলতে লাগলেন—তা সংসারে সৌন্দর্য্য জিনিষটা সকলের জন্যেই হওয়া উচিত বিশেষত রূপ দেখলে রূপের কোনো ক্ষতি নেই তবে দর্শকের মহা লাভ।

আমীর ওমরাহদের কানাকানি বাদশা হুশেন শাহের কানে পৌঁছিতে বড় বিশেষ বিলম্ব হ'ল না, হুশেন শাহ ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা। কাজেই আমীর ওমরাহদের এই আপশোষের কারণ দূর করবার জন্যে ইচ্ছা করলেন। তাই মনস্থ করলেন যে, নতুন বেগমের একখানি পূর্ণায়তন তস্‌বীর অঙ্কিত করিয়ে তাঁর আম-দরবারের বিশাল কক্ষে মস্‌নদের পিছনে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দেবেন। বাদশা মনে মনে এই ব্যবস্থা ঠিক করেই তাঁর প্রধান উজিরকে ডাকলেন—"ফজলু খাঁ।"

ফজলু খাঁ পামিরের মাথার উপরকার বরফের মত সাদা লম্বা দাড়ি হেলিয়ে এসে কুর্ণিস করে দাঁড়াল—"জাঁহাপনা"—

বাদশা বললেন—"উজির, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে ?"

উজির হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর লম্বা দাড়ির মধ্যে চালাতে চালাতে স্মৃতিশক্তিটাকে উগ্র করে' নিয়ে উত্তর করলেন—"জাঁহাপনা, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হচ্ছে হিন্দুস্থানের কোশল রাজসভার চিত্রকর—নাম মৌকুল দেব।"

হিন্দুস্থানের নাম শুনে বাদশা মুহূর্ত্তের জন্যে চিন্তান্বিত হলেন—যেন তাঁর মনে কোন সংশয় উদিত হয়েছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন সে সংশয়ের একটা সমাধান করে' বললেন—"ফজুল খাঁ, কোশল-রাজসভার চিত্রশিল্পী ইরাণ-তুরাণের বাদশার দরবারের তরফ থেকে ইস্পাহানে আমন্ত্রিত হোক।"

ফজলু খাঁ তাঁর উষ্ণীষ হেলিয়ে কুর্ণিশ করে বললেন —"প্রবল প্রতাপান্বিত সুজনের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহের যে আজ্ঞা।"

তার পরদিন পুব-গগনে উষাসুন্দরী যখন আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবেন কি করবেন না ভাবছিলেন, তখন ইস্পাহানের প্রশস্ত পাথর-বাঁধা রাজপথ কাঁপিয়ে বাদশার পাঞ্জাঙ্কিত পত্র নিয়ে তুরুক সোয়ার কাবুলের পথে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করল। দ্রুতগামী অশ্বখুরের খটাখট্ শব্দে নিদ্রিত নাগরিকেরা চকিত হয়ে উঠে বসল। বেলা হ'লে ইস্পাহানের বাজারে বাজারে রটে গেল যে, হিন্দুস্থান থেকে চিত্রকর আসছে—নতুন বেগমের তস্‌বীর আঁকবার জন্যে।

(২)

বাদশা আমীর ওমরাহদের নিয়ে তাঁর খাস-দরবারে বসে' ছিলেন। ইরাণ-তুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তায়েজউদ্দিন সেদিন হেমন্ত সন্ধ্যার মত করুণ কণ্ঠস্বরে বাদশা-সমীপে সুন্দরী তরুণীর অশ্রুভেজা ব্যথিত কালো আঁখি-তারার মত একটা নব-রচিত গজল্ সারেঙ্গী সহযোগে গান করছিলেন। গজল্ বলছিল—"রূপোয় দেয়ালী লেগেছে—এমনি নিবিড় জোছনা, যেন মনে হয় তা মুঠো বেঁধে দলা পাকিয়ে ঢিল ছোঁড়াছোঁড়ি খেলা যায়, শিশির-ভেজা পাতায় পাতায় জোছনা ছল্‌কে উঠে পিছ্‌লে পড়ছে—দূর এলবুরুজ পাহাড়তলীর বুল্‌বুল্‌রা সব আর সেদিন ঘুমুতে যায় নি—তাদের গানের সুর ঘন জোছনার বুক চিরে চিরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এম্‌নি রাতে নিঠুরা পিয়ারী বাহুর বাঁধন আল্‌গা করে' কাউকে কিছু না বলে' ক'য়ে কোন্ অজানার পথ ধরে' কোথায় চলে' গেল—কোথায় গেল……"

চারিদিক্ মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে—কালো কালো মেঘ, বিদ্যুৎ-বুকে-করা মেঘ। এলবুরুজ পাহাড়তলীর ময়ূরের দল পেখম তুলে নৃত্য করে' করে' তাদের কেকা-রবে চারিদিক মুখর করে' তুলেছে। বারি ঝর্‌তে আরম্ভ করল,—ঝর্ ঝর্ ঝর্—বিরাম নেই বিরতি নেই—কত-দিনকার কার অশ্রু—কোন্ অলকার কোন্ অপ্সরীর—এম্‌নি বাদল—বুকের মধ্যে বসে বসে

কে যে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—এমন দিন, তবুও পিয়ারী ফিরে এল না—কেন এল না……"

"পিয়ারী কেমন করে' ফিরবে—পিয়ারী যে পথ ধরে' গিয়েছে সে ত ফেরবার পথ নয়—সে যে কেবল যাবারই পথ, সে-পথ—সে যে মরণের পথ……"

সারেঙ্গীর মিষ্টি সুরের সঙ্গে কবির মিষ্টি সুর মিলে গজলের ব্যথাভরা কাহিনী, বাদশার খাস-দরবারের প্রশস্ত কক্ষের কোণে কোণে কোন্-হারিয়ে-যাওয়া কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। যে আমীর-ওমরাহরা যুবক, তাদের কি-একটা ব্যথার আনন্দে বুক ফুলে উঠল, টলে উঠল—বাদশার খুড়ো আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ বৈরাম খাঁর পর্য্যন্ত কুয়াসা-ঢাকা চোখদুটো ছল্ ছল্ করে' উঠল। গান শেষ করে' কবি সারেঙ্গী ও ছড়টা গালিচার উপরে নামিয়ে রাখলেন—চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কেবল সদ্য-সমাপ্ত গজলের সুর বাতাসের বুক চিরে আকাশের গায়ে গায়ে একটা রেশের চিহ্ন এঁকে দিয়ে দিয়ে দূর হতে দূরান্তরে চলে যেতে লাগল—মুহূর্ত্ত ধরে' যেন কারো নিশ্বাস-প্রশ্বাসও পড়ছে না—এম্নি নিবিড় নিস্তব্ধতা। তারপর দরবারের সবাই যেন হঠাৎ চমক ভেঙ্গে জেগে সমস্বরে বলে উঠলেন—"ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ!"

বাদশা সস্মিত হাস্যে কবির দিকে ফিরে বললেন—"তায়েজ, তোমার কাব্য-সাধনা, সঙ্গীত-সাধনা, যন্ত্র-সাধনা, সবই সার্থক!"

কবি তায়েজ তাঁর বিনম্র শির আরও নত করে' কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় উজির ফজলু খাঁ প্রবেশ করে' বাদশা সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, হিন্দুস্থান হ'তে কোশল-রাজসভার চিত্রশিল্পী মৌকুল দেব ইরাণ-তুরাণের বাদশা, দুর্ব্বলের রক্ষক, দুর্জ্জনের শাসক প্রবল-প্রতাপান্বিত হুশেন শাহের দরবারে হাজির।"

বাদশা বললেন—"তাকে এইখানে নিয়ে আসা হোক।"

উজির তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন, আবার পরক্ষণেই ফিরে এলেন—সবাই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল এক অতি সুন্দর তরুণ যুবক।

অতি সুন্দর তরুণ যুবক। তার চোখদুটোতে যেন বিদ্যুতের রেখা টানা—কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে এসে তার বলিষ্ঠ, স্কন্ধ ছেয়ে ফেলেছে—অতি চিক্কণ গোঁফের রেখার চিহ্ন তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের ঘোষণা করছে—আঙুলগুলো যেন ছবির মত সুশ্রী—বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করে' বললেন—"এই যুবক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর?"

যুবক তার মাথা অবনত করল, উজির ফজলু খাঁ উত্তর দিলেন—"হাঁ জাঁহাপনা।"

"এমনি তরুণ বয়সে!"

উজির উত্তর দিলেন—"জাঁহাপনা, প্রতিভাসুন্দরী তরুণের গলেই তাঁর বরমাল্য প্রদান করতে ভালবাসেন।"

বাদশা প্রসন্ন দৃষ্টিতে শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন—"সুন্দর বিদেশী যুবক, চিত্রবিদ্যায় তোমার কতদূর পারদর্শিতা?"

যুবক উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, কবি, চিত্রকর, গায়ক এদের পারদর্শিতার মাপযন্ত্র অন্যের কাছে। আমার যে কি রকম পারদর্শিতা তা আমি নিজে কেমন করে' বলব? তবে আমার অঙ্কিত চিত্রে হিন্দুস্থানের অনেক নৃপতি অনুগ্রহ করে' সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"

বাদশা বললেন—"শোন যুবক, ইসলাম-ধর্ম্ম কোনদিন বিধর্ম্মী পুরুষের কাছে তার মুখাবরণ উন্মোচন করবে না, শাস্ত্রের নিষেধ—না দেখে তুমি তার আলেখ্য অঙ্কিত করতে পারবে?"

শিল্পী বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"না দেখে কি করে' ছবি-আঁকা চলতে পারে জাঁহাপনা?"

বাধা দিয়ে বাদশা জিজ্ঞাসার সুরে বললেন—"কেবল তার বর্ণনা শুনে।"

যুবক বললে—"এমন কবি কে আছে জাঁহাপনা যে শব্দ অর্থ ও সুর দিয়ে রক্তমাংস ও বর্ণকে এমন করে' মূর্ত্তিমান করে' তুলতে পারে যা আবার রঙে তুলিতে পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে?"

গৌরবান্বিত দৃষ্টিতে বাদশা উত্তর দিলেন—"বিদেশী যুবক! আছে, ইরাণ-তুরাণের শ্রেষ্ঠ কবি—তা

কণ্ঠস্বরে শরৎ-উষার উজ্জ্বল আকাশ সান্ধ্য গগনের মত ব্যথিত হ'য়ে ওঠে—হেমন্ত-সন্ধ্যার করুণ রাগিণী বসন্ত উষার মত হাস্যময় হ'য়ে ওঠে—যার সারেঙ্গীর আলাপে প্রচণ্ড নিদাঘে বর্ষার শৈত্য আমন্ত্রন করে' আনে—শীতের শুভ্র মাটীতে সবুজ রঙ জাগিয়ে তোলে—যুবক তুমি নিজেই বিচার করবে"—বাদশা কবি তায়েজকে গান করতে আদেশ করলেন।

সারেঙ্গীর সুর জেগে উঠল—কিশোরী প্রিয়ার সদ্যস্নাত চাউনির মত মিষ্টি, তার রেশমী চুলের স্পর্শের মত মোলায়েম—সে সুরের রেশ প্রিয়ার অঙ্গের স্পর্শের মত শ্রবণেন্দ্রিয়কে বুলিয়ে যায়।

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরি?—রজনীর কালো আঁধারের মাঝে পুঞ্জ মেঘের বুক থেকে বিদ্যুৎ কেমন জিলিক্ হানে?—তাই পিয়ারীর কালো চোখের চার পাশে সুরমা-আঁকা পিয়ারীর কালো চোখের তারা সে মেঘ—চোখের পাতায়-আঁকা সুরমা সে রজনীর আঁধার—পিয়ারীর দৃষ্টি সে বিদ্যুৎ—সে-বিদ্যুৎ কেমন উজ্জ্বল, কেমন নিবিড়, কেমন তীব্র—সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরি?"

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী। পিয়ারী যে চোখ-দুটোতে সুরমা এঁকে তার সারা দেহের আকাঙ্ক্ষারাশিকে গোপন করতে চায়—তার মনের শঙ্কা সঙ্কোচ সরম স্পষ্ট করে' তুলতে চায়—তার চঞ্চল দৃষ্টিকে নিবিড় করতে চায়—তার হাস্যময় দৃষ্টিকে ব্যথা-ভরা দেখতে চায়—সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী।"

গান থামল—রইল শুধু একটা সূচী-সূক্ষ্ম রেশের আধ-লুপ্ত আধ-সুপ্ত রণন্।

তরুণ চিত্রকর প্রশংসমান নেত্রে বললে—"ইরাণ-তুরাণের কবি, হিন্দুস্থানের চিত্রকরের অভিবাদন গ্রহণ করুন।" তারপর বাদশার দিকে ফিরে বললে—"জাঁহাপনা, কবি তায়েজের ক্ষমতা অসাধারণ। কবির সুরে সুরে আমার তুলি চলবে—তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের ছবি ফুটে উঠবে—তাঁর চোখ জেগে উঠবে—তাঁর বুক দুলে উঠবে—গণ্ডে তাঁর গোলাপ ফুটবে—হাতে তাঁর চাঁপার কলি জাগবে—পায়ে তাঁর রক্তকমল বিকশিত হবে—তাঁর ওড়না উড়বে, বেণী দুলবে, ঘাগ্‌রা ঝুলবে; কিন্তু তাঁর আত্মার কথা আমি বলতে পারব না জাঁহাপনা। কবি তায়েজের সুরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের বাহিরকেই আমি দিতে পারব—জাঁহাপনা, তাঁর আত্মার সন্ধান আমি দিতে পারব না।"

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন শিল্পী?"

শিল্পী উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, আত্মা যে সামনা সাম্‌নি দেখবার জিনিষ—হাজার বর্ণনাতেও তার আসল পরিচয় নেই। শিল্পীর আত্মা দিয়ে নতুন বেগমের আত্মা স্পর্শ করতে না পারলে তার তুলির সঙ্গে তা কখনও ধরা পড়বে না। এ আত্মায় আত্মায় স্পর্শ অনুবাদের ভিতর দিয়ে হ'তে পারে না। জাঁহাপনা, আমি ছবি আঁকব; কিন্তু তাতে আত্মার সন্ধান করবেন না।"

বাদশা বলে' উঠলেন—"কিন্তু নতুন বেগমের যে দেহের চাইতে আত্মা সুন্দর—আত্মা সুন্দর বলেই ত তার দেহ সুন্দর—সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহের ছবি আঁকা—যেন গন্ধ বাদ দিয়ে গোলাপ ফোটান—নেশা বাদ দিয়ে মদ চোঁয়ান; কিন্তু বিধর্ম্মীর কাছে ইস্‌লাম-রমণী কেমন করে' মুখ খুলবে?—উপায় কি?" বাদশা তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্‌দের দিকে তাকিয়ে উজিরকে সম্বোধন করে বললেন—"ফজলু খাঁ, উপায় কি?"

ইরাণ সাম্রাজ্যের প্রধান উজির বিমনা হলেন। আমীর ওমরাহ্‌রা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। সভা নিস্তব্ধ—চারিদিকে একটুকু শব্দ নেই। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বৈরাম খাঁ তাঁর সুদীর্ঘ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর তাঁর দীর্ঘোন্নত শরীর বেঁকিয়ে কুর্ণিস করে' বললেন—জাঁহাপনা, উপায় আছে। নতুন বেগমকে বিধর্ম্মীর সাম্‌নে মুখ খুলতে হবে না—তা একখানি দর্পণের সামনে করলেই চলবে। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত নতুন বেগমকে দেখলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হবে। শাস্ত্রও রক্ষা হবে—কর্ম্মও ঠেকা থাকবে না।"

বৈরাম খাঁর কথা শুনে সবার বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বাদশা প্রশংসমান নেত্রে খুল্লতাত বৈরাম খাঁর দিকে তাকিয়ে উজিরকে লক্ষ্য করে বললেন—"ফজলু খাঁ, খুল্লতাত বৈরাম খাঁর যুক্তি গৃহীত হোক।"

দরবার ভাঙল। আমীর ওমরাহ্‌রা বৈরাম খাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ আবাসে ফিরলেন।

(৩)

দ্বারে দ্বারে পুরু রেশমি পরদা—তারি পাশে পাশে উলঙ্গ কৃপাণ হাতে যমদূতের মত কালো হাবসী খোজা। এখানে বুঝি ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকাটিরও প্রবেশ করবার পথ নেই। এখানে বুঝি আর কোন শব্দ নেই, কেবল দুধের মত সাদা কঠিন পাথরের উপরে রক্ত কমলের মত রাঙা কোমল পা ফেলে চলে'-যাওয়া রূপসীদের নূপুর-নিক্কন, কেবল লিলায়িত তনুর ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে তাদের জঙ্ঘা-স্পর্শ-সুখে বিহ্বল ঘাগরার খস্ খস্ শব্দ, কেবল তাদের কৌতুক-উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত হাসির ছন্দময় গিটকিরি, কেবল কত কত উৎস হতে উচ্ছ্বসিত গোলাপজলের বিরতিহীন ঝর্ ঝর্ শব্দ। এখানে বুঝি আর কোন গন্ধ নেই—কেবল কত কত তরুণীদের নিশ্বাস-বিচ্ছুরিত সুরভি, কেবল তাদের সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বেণী-কুণ্ডল হতে উৎসারিত স্বপ্নময় গন্ধাবলেপ, কেবল তাদের নারী অঙ্গ হতে উৎসৃষ্ট এক আবেশময় আভাস! এখানে বুঝি আর কোন রূপ নেই, কেবল সদ্য ফোটা গোলাপরাশির স্তবক, কেবল ফুল প্রস্ফুটিত চম্পকদলের উগ্রতা। এখানে বুঝি আর কোন রস নেই, কেবল সাকির আপন-ভোলা বিফলতা, কেবল সিরাজির সকল-ভোলা মাদকতা। মানুষ জীবনকে ধরে' রাখতে পারে না, কিন্তু যৌবনকে ধরে' রাখতে চায়। এমনি বাদশার হারেম।

এখানে কত কত রূপসী তরুণীর কমল-চোখের কোমল দৃষ্টি কুয়াশায় ঢেকে গেল—কোমল মুখের কমল-হাসি শুকিয়ে উঠল—গ্রীবা আর হেলল না, বুক আর দুলল না, চরণ আর চলল না; কিন্তু শেষ নেই, আবার কত কত নব নব তরুণী এসে তাদের রূপ-যৌবন দিয়ে এখানটাকে ভরে' তুলল। বাদশা হুসেন শাহের কালো চুল শাদা হ'য়ে গেল, দন্তাভাবে গণ্ড শীর্ণ হয়ে পড়ল, ভড়িতাভাবে দৃষ্টি মলিন হয়ে উঠল; কিন্তু এখানটায় তাঁর রূপ-যৌবনের সম্পদ অব্যাহত। এমনি ইরাণ-তুরাণের বাদশার হারেম।

সেই হারেমে কত কত দ্বারে কত কত পরদা সরিয়ে কত কত কক্ষ অতিক্রম করে' কত কত হাবসী খোজার ক্রূর শার্দ্দূল-দৃষ্টির সামনে দিয়ে তরুণ শিল্পী বাদশা হুসেন শাহ্ ও উজির ফজলু খাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল। হারেমে বিদেশী বিধর্ম্মীর আভাস পেয়ে বেগমদের পোষা ময়ূরের দল একবার ভীষণ কেকারবে যেন তাদের আপত্তি জানিয়ে দিল। তার পর হারেমের এক প্রান্ত হতে এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যাদুমন্ত্র বলে নিমেষে যেন একটা পুরু নিস্তব্ধতার গালিচা বিছিয়ে গেল। কত কত মরাল গতির ছন্দে ছন্দে শিঞ্জিনী-নিক্কনীর অর্দ্ধেক ফুটে আর অর্দ্ধ ফোটার অবসর পেলে না—কত কত হাসির গিটকিরি মাঝপথে এসে হঠাৎ চকিতে থেমে গেল—যেন সজীব যা যেখানে ছিল সব সেই সেইখানেই সেই অবস্থাতেই সহসা প্রস্তরের মত কঠিন হ'য়ে গেল—চারিদিকে কেবল নিস্তব্ধতা—সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে কেবল গোলাপ-বারির ঝর্ ঝর্ শব্দ। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বাদশা শিল্পী ও উজিরকে নিয়ে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে দেয়ালে-গাঁথা এক সুবৃহৎ দর্পণ—একটা ক্রূদ্ধচক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ সাটিনের মাঝখানে জড়োয়া কাজের একটা প্রকাণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা পরদায় আগাগোড়া ঢাকা। বাদশা উজির ও শিল্পী তিন জনে এসে সেই দর্পণের সামনা সামনি কক্ষের অপর প্রান্তে দাঁড়ালেন। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদা সরে গেল। রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট নতুন বেগমের প্রতিবিম্ব দর্পণের গায়ে ফুটে উঠল—

যেন মসী-লিপ্ত অমাবস্যার অন্ধকারের বিরাট গহ্বর হতে শরৎ পূর্ণিমার লক্ষ চাঁদ সহসা এককালে জেগে উঠল—যেন কঠিন রসহীন প্রাণহীন পাষাণের বুক চিরে এককালে ফোটা বসোরার গোলাপ ফুটে উঠল—যেন ঘোর অমানিশায় পুঞ্জ মেঘের বুক চিরে

বিদ্যুতের রেখা ফুটে অচঞ্চল হয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত করে' রাখল—যেন—। বাদশা বললেন—"শিল্পী, এই তোমার আলেখ্য।"

বাদশা শিল্পীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, বুঝলেন, তাঁর কথা শিল্পীর কানে যায় নি—তার দৃষ্টি দর্পণে নিবদ্ধ—শিল্পী মন্ত্রমুগ্ধ—বাহ্যজগত তার কাছে লোপ পেয়েছে। বাদশার ঠোঁট দুখানিতে একটা তৃপ্তির, একটা গৌরবের, যেন একটা বিজয়ের নিঃশব্দ হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

শিল্পীর দৃষ্টিতে কি ছিল—দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির অবনত চোখ দুটি ধীরে ধীরে যেন মন্ত্রচালিত হ'য়ে উত্তোলিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধ শিল্পীর প্রতি নিবদ্ধ হল—সেই চোখ দুটিতে বিস্ময়ের একটা ক্ষণিক প্রভা যেন মুহূর্ত্তের জন্য খেলে গেল—তার পর আজীবন সংগোপিত অনন্ত গোপন আকাঙ্ক্ষা আকুলতার আড়াল থেকে দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখের সঙ্গে মিলিত হ'ল—দর্পণের মূর্ত্তি যেন তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা পুলক নিয়ে কেঁপে উঠল—শিল্পীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ চারিয়ে গেল—তার পর নারীর দৃষ্টি অবনত হ'য়ে গেল—পুরুষের চোখে পলক পড়ল না। দর্পণের মসৃণ গায়ের উপরে মনে হ'ল কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিল। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদার দর্পণ ঢাকা পড়ল। শিল্পী চমক ভেঙে জেগে উঠল—দেখলে চারিদিক যেন সন্ধ্যার মত মলিন হ'য়ে উঠেছে।

বাদশা বললেন—"শিল্পী—"

তরুণ যুবক সংযত স্বরে বললে—"জাঁহাপনা, আমি হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের অনেক অনেক অন্তঃপুর-মহিলাদের দেখেছি কিন্তু এমন রূপ কখনও আমার নয়নগোচর হয়নি।"

স্মিত হাস্যে বাদশা বললেন—"শিল্পী, যা চোখে দেখলে, তাই যদি চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে পার, তবে লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা তোমার পুরস্কার।"

শিল্পী উত্তর করলে—"জাঁহাপনা আমাকে ছয় মাস সময় দিন। আর আমি চাই একটি নির্জ্জন নিভৃত স্থান, অতি নিভৃত, যেখানে বাইরের জগতের রাগ-রঙ্গ হাসি-অশ্রু আমার প্রাণে কোন ঢেউ-ই তুলবার সুযোগ পাবে না যেখানে একান্ত ভাবে থাকব আমি আর আমার আলেখ্য।"

বাদশা উজিরের দিকে ফিরে বললেন—"ফজলু, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হোক্।"

তিনজনে হারেম ত্যাগ করলেন।

আবার তরুণীদের কলকণ্ঠ ফুটে উঠল। তাদের পায়ে পায়ে কত কত লাস্য নিয়ে নূপুর-নিক্কন জেগে উঠল, তাদের হাস্যোচ্ছ্বাস কক্ষে কক্ষে রণিত হ'য়ে উঠল; কিন্তু সেদিন সেই হারেমে এমটি নিভৃত কক্ষে একটি তরুণীর অন্তরে অন্তরে একটা নবীন স্বপ্নের আভাসে যে একটা নব তন্ত্রী বাজতে লাগল, তার সঙ্গে সেই তুচ্ছ প্রতিদিনকার উদ্দেশ্যহীন হাসি-গানের কোনই মিল রইল না।

(৪)

সসাগরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সে, দেশ-বিদেশে কোটী কোটী নর নারীর মুখে মুখে তার নাম ফিরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু সে নিজে এতদিন কোথায় ছিল? কোথায় আপন-ভোলা হ'য়ে ঘুরছিল? কি জীবন সে এতদিন যাপন করেছে? কি জীবন? কোন্ একান্ত বাইরে বাইরে সে তুলি আর রঙ নিয়ে কেবল কি-এক তুচ্ছ খেলা করে' বেড়িয়েছে? শিল্পী সে, কিন্তু এই এতদিন তার কাছ থেকে জীবনের অমৃতের উৎস এমনি করে' গুপ্ত হয়েছিল যে, তার অস্তিত্বের সন্দেহমাত্র তার মনে জাগে নি। তার তুলির মুখে কত কত সুন্দরীর ভোমরা-কালো আঁখি-তারা বিশ্ব-বিমোহিনী দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠেছে, তার তুলির সোহাগে সোহাগে কত কত তরুণীর হৃদয়ের উপরে অঞ্চল-ঢাকা ভরা-বুক আধ-আভাস নিয়ে মাথা তুলেছে; তার তুলির আদরে আদরে কত কত কমলের মত হাত চাঁপার কলির মত আঙুল নিয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার পিছনে কি ছিল? আজ যে সে জানে যে, তার পিছনে ছিল তার কেবল অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা। তার পিছনে ছিল না শিল্পী তার সবখানি নিয়ে, ছিল না শিল্পীর নিগূঢ় জীবনের নিবিড় চরম আনন্দের অনুভূতি, ছিল না শিল্পীর

নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। সে কেমন করে' কাটিয়েছে, কেমন করে'!—এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে, এই বিরাট শূন্যতা নিয়ে—কেমন করে সে এতদিন ছিল, কেবল এই রঙ তুলি ও চিত্রপটের বিরাট ব্যর্থতাভরা ব্যঙ্গ নিয়ে? হায়! তার নিগূঢ় আনন্দের উৎসটি এতদিন কে এমন করে' নিষ্ঠুরভাবে তার অলক্ষ্য করে' রেখেছিল!

কিন্তু আজ তার কোন্ নিগূঢ় অন্তরের গোপন কক্ষে কোন্ একটা মণি-মুক্তা-খচিত বীণার স্বর্ণ-তারে কার অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শ পড়ল—সেই স্পর্শে যে সুর বেজে উঠল—সেই সুরে তার আজ এ কি হ'য়ে গেল! এ কি বেদনা, এ কি আনন্দ! তা ত আজ তার বুঝবারও ক্ষমতা নেই—আজ যে কেমন তার বেদনা আর আনন্দ একেবারে ছড়িয়ে গেছে, দুটোকে আর ত তার আলাদা করবার উপায় নেই—আজ যে কেমন তার মনে হচ্ছে, বেদনাও আনন্দ—আনন্দও বেদনা। মৌকুল, মৌকুল, এতদিন কোন্ মরুভূমির মধ্যে পিপাসা-নিবারণের জন্যে ঘুরে ঘুরে মরছিলে!

ঐ যে নিগূঢ় গোপন বীণার তারে ঝঙ্কার—কি ঐশ্বর্য্যময় সে ঝঙ্কার—সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে আজ এক নিমেষে সব নিবিড় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল—চোখে যে কিসের অঞ্জন লেগে গেল—এই ধরিত্রীর মাটিতে মাটিতে এত গান, এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য—এই যে মতি-মঞ্জিল, ঐ যে তরুশ্রেণী, ঐ যে কুসুমকুঞ্জ, ঐ যে লতাবিতান—সব যেন কেমন উজ্জ্বল, কেমন সজীব হ'য়ে উঠল। শিল্পী, শিল্পী, তুমি এতদিন কোন্ অন্ধ-করা অরণ্যে কেবল মুক্তির পথ খুঁজে মরছিলে!

দুটি তরুণ চোখ।আর দুটি তরুণ চোখ—তাদের মিলনে এম্‌নি রহস্যের সৃষ্টি, এম্‌নি অমৃতের উৎস, এমনি দিকে দিকে পুলক জেগে উঠল, আকাশে বাতাসে হিল্লোল খেলে গেল, জল স্থল রঙিন হয়ে উঠল।

সে আজ ছবি আঁকবে—নতুন বেগমের। নতুন বেগম! না—না—না—নতুন বেগম কে? তাকে ত সে তেমন করে' জানে না—তার সঙ্গে ত শিল্পীর কোনই পরিচয় হয়নি। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয় বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়,—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন মনের মন্দিরের দেবী—যে কোমল স্পর্শে তার হৃদয়-বীণার মোহন রাগিণী বাজিয়ে তুলেছে—তার দৃষ্টিসম্পাতে তার হৃদয় পদ্ম প্রত্যেক দলটি নিয়ে ফুটে উঠেছে। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন হৃদয়-মন্দিরের প্রণয়িনী—যার গণ্ড কপোল কণ্ঠ শিল্পীর দৃষ্টিতে লাজ-লালিমার রক্তিমাভায় ছেয়ে গিয়েছে—যে শিল্পীর ছিষ্টি বিনিময়ে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক নিয়ে কেঁপে উঠেছে—না সে বৃদ্ধ হুসেন শাহের নতুন বেগম নয়—সে যে চির-তারুণ্যের জীবন-মন্দিরে যুগযুগান্তরের সঙ্গিনী!

তারি, কেবল তারি ছবি সে আঁকবে? নতুন বেগম? নতুন বেগম বলে কেউ এই পৃথিবীতে নেই—নেই—নেই। নেই—এই ব্রহ্মাণ্ডে ইরাণ-তুরাণ বলে' কোন স্থান নেই—বাদশা হুসেন শাহ বলে' কোন ব্যক্তি নেই···তার হারেম বলে কোন কারাগার নেই—সেখানে নতুন বেগম বলে' কোন বন্দিনী নেই। আছে শুধু অনন্ত শূন্য অনন্ত অবসরের মাঝে দুটি তরুণী, দুটি প্রেমিক প্রেমিকা···আছে শুধু দুটি হৃদয়, আঁখি, একটি অনন্তকালের নিবিড় চুম্বন। এই, আর কিছুই নয়।

কেবল তারই ছবি সে আঁকবে। যে-ছবি সে আঁকবে ···কেবলই কি তুচ্ছ রঙ দিয়ে? তুচ্ছ রঙ দিয়ে! তার হৃদয়-শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে যে আলেখ্যের প্রত্যেক অণু পরমাণু প্রাণ পাবে···তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জেগে উঠবে, তার আত্মার স্পর্শে স্পর্শে তা চিত্রপটে ফুটে উঠবে···তুচ্ছ তুলি আর রঙ?···না।

শিল্পী এক মনে মতিমঞ্জিলে ছবি আঁকতে লাগল।

ধীরে ধীরে তার কাছে বাহ্যজগত লোপ পেয়ে গেল। মতিমঞ্জিল তার বিস্তীর্ণ উদ্যান—বিশাল তরুশ্রেণী—নিবিড় লতাবিতান, সব অদৃশ্য হ'য়ে গেল—রইল শুধু তার চোখের সাম্‌নে একটি তরুণীর মূর্ত্তি—কুন্তল যার নিবিড়, দৃষ্টি যার গভীর, বক্ষে যার ইঙ্গিত, কণ্ঠে যার সঙ্গীত, জঙ্ঘা যার বিরহ-কাতর, চরণ যার নিগড়-বাঁধা।

শিল্পী এক মনে ছবি আঁকতে লাগল।

(৫)

দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল।

গোধূলির স্বর্ণে স্বর্ণে পশ্চিমাকাশে গৈরিক ওড়না উড়িয়ে পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে...বাদশা হুশেন শাহ্ ফজল্ খাঁকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিলে এসে উপস্থিত হলেন। শিল্পীকে বললেন..."শিল্পী, তোমার ছ'মাস শেষ।"

শিল্পী আভূমি প্রণত হ'য়ে উত্তর দিলে···"জাঁহাপনা, আলেখ্যও শেষ।"

বাদশা বললেন, "আজ হিন্দুস্থানের চিত্রকরের ক্ষমতা কতদূর, তার বিচার হবে শিল্পী।"

শিল্পী বিনম্র শিরে বহু কক্ষ অতিক্রম করে' বাদশা ও উজীরকে মতিমঞ্জিলের নিভৃততম অংশে একটি কক্ষে নিয়ে এল। গোধূলি-লগ্নে কক্ষের মধ্যে আঁধার হ'য়ে এসেছে। শিল্পী রৌপ্য-দীপদানে দুটি দীপ জ্বালিয়ে তার চিত্রপটের দু'পাশে রক্ষা করল। চিত্রপটের উপরে পরদা ঢাকা।

পরদা-ঢাকা চিত্রপটের সামনে এসে বাদশা ও উজির দাঁড়ালেন। শিল্পী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর থেকে পরদা সরিয়ে নিয়ে একপাশে এসে দাঁড়াল।

বাদশার কোষে অসি ঝন্‌ঝন্ করে' বেজে উঠল, তাঁর হাতের আকর্ষণে খাপ থেকে তা অর্দ্ধেক বেরিয়ে এল।

শিল্পী তৃপ্তির হাস্যে শান্তস্বরে বললে—"জাঁহাপনা এ আলেখ্য মাত্র।

ইরাণ-তুরাণের বাদশা লজ্জিত হ'য়ে তরবারি আবার খাপে পুরলেন। কণ্ঠ হ'তে বহুমূল্য মণিহার খুলে শিল্পীর গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর বাদশা আর উজির দু'জনে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে আলেখ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ত রঙ দিয়ে আঁকা ছবি নয়—এ যে মূর্ত্তিমান রক্তমাংসের শরীর! কে বলবে নতুন বেগম আজ বাদশা হুশেন শাহের হারেমে—সে আজ মতিমঞ্জিলের একটি নিভৃত কক্ষে রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা!

প্রথম বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ উপশমে বাদশা বললেন... "শিল্পী, তোমার শক্তি অলৌকিক, ঐশ্বরিক···লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে পাঁচ লক্ষ তোমার পুরস্কার—হিন্দুস্থানের নৃপতিরা না বলে ইরাণ-তুরাণের বাদশা গুণের আদর করতে জানে না! আর শিল্পী, কাল প্রাতে অনুচরবর্গ নিয়ে কোতোয়াল আসবে, আলেখ্য রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত করবার জন্যে...সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। শিল্পী, তুমি নতুন বেগমের ছবি আঁক-নি, দ্বিতীয় নতুন বেগমের সৃষ্টি করেছ।"

বাদশা ও উজির মতিমঞ্জিল ত্যাগ করলেন।

ওঃ প্রলয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে শিল্পীর পায়ের নীচে কার কক্ষতল প্রলয়-ঘূর্ণনে ঘুরতে লাগল! কক্ষের আসবাব সব তার চোখের সুমুখে যেন মত্ত হ'য়ে নাচতে লাগল, চারিদিকের দেয়াল যেন দুল্‌তে লাগল, দীপ-দানে দীপ যেন মরণাহত মানুষের হাসির মত বীভৎস হ'য়ে উঠল, শিল্পী টল্‌তে টল্‌তে চিত্রপটের সাম্‌নে মেঝের উপরে বসে পড়ল!

স্বপ্ন! স্বপ্ন! সব স্বপ্ন···আপনায় চারিদিকে স্বপ্নের জাল বুনে এতদিন কি প্রবঞ্চনার মাঝেই না সে এই ছ'মাস কাটিয়েছে!···কোথায় সে? কে সে —মিথ্যা...মিথ্যা...সব মিথ্যা! তার চাইতে অনেক বেশি সত্যি, লক্ষ কোটী গুণ সত্যি, ভয়ঙ্করূপে সত্যি, এই ইরাণ-তুরাণ, ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্, হুশেন শাহের হারেম, আর সেই হারেমে বন্দিনী নতুন বেগম—সত্যি সত্যি, ওগো অতি সত্যি, নিষ্ঠুর ভাবে সত্যি, নির্ম্মম ভাবে সত্যি, মৃত্যুর মত সত্যি!

সেই হুশেন শাহের রাজপ্রাসাদে এই আলেখ্য স্থানান্তরিত হবে কাল—একটি মাত্র রজনীর অবসানে। এই আলেখ্য, যে আলেখ্যের প্রতি অণুতে অণুতে তার অস্তিত্ব বিছিয়ে আছে, যে আলেখ্য মাসে মাসে দিনে দিনে নিমেষে নিমেষে আপনার প্রত্যেক চিন্তাটি দিয়ে, প্রত্যেক বিশ্বাসটি দিয়ে, প্রত্যেক ইচ্ছাটি দিয়ে, প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাটি দিয়ে, সে জাগিয়ে তুলেছে—তাই একজনের একটি মাত্র কথায় চিরদিনের জন্যে তার কাছ থেকে অপসারিত হবে। বাদশার আমদরবারে এই আলেখ্য ঝুলবে, লক্ষ লোকের চোখের তৃপ্তির জন্যে—তার জন্যে রইবে শুধু লক্ষ কণ্ঠে অজস্র বাহবা। শিরা হ'তে বিন্দু বিন্দু করে' রক্ত চুঁইয়ে বাহবা লাভ! না—না—চাই

নে বাহবা, চাইনে লক্ষ দশ লক্ষ, কোটী লক্ষ, সুবর্ণ মুদ্রা, আমার ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও কেবল এই আলেখ্যখানা!

বাতুল—বাতুল, এই আলেখ্য? ওরে শিল্পী, ওরে মূর্খ মৌকুল, কোথায় তোর মানসী কোথায়? এই আলেখ্য? তোর মানসী যে প্রত্যেক নিমেষটিতে বাদশা হুশেন শাহের অন্তঃপুরবাসিনী, সূর্য্যের আলোর পর্য্যন্ত যার মুখ দেখবার অধিকার নেই, এই আলেখ্য? জড়—জড়—কেবল রঙ আর রঙ আর রঙ—জড়—জড়—অতি জড়। জড়? না—না—কে বললে জড়। ওরে নাস্তিক—ঐ যে, ঐ যে বুক দুলছে না কি? ঐ যে চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু কাঁপছে, ঐ যে ঠোঁট দুখানি পাংশু হ'য়ে উঠল—জড়? নয়—নয় কিছুতেই নয়—ঐ যে দীর্ঘ নিশ্বাসে বুক দমে গেল—ঐ যে ঘাঘরার প্রান্তটা কেঁপে উঠল না কি? পাগল—পাগল—এ যে একেবারেই জড়—শক্তিহীন, গতিহীন, ইচ্ছাহীন!

শিল্পী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেই কক্ষতলে বসে আলেখ্যের দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে রইল। ঐ ঠোঁট দুখানি যদি একবার কেবল একবার মাত্র নড়ে ওঠে, একবার মাত্র ডাকে—"শিল্পী"। ঐ চোখের তারা দুটি যদি কেবল একটিমাত্র নিমেষের জন্যে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, যদি—যদি—যদি—আঃ কি নিষ্ঠুর শাণিত তরবারির একটুকু স্পর্শে তার সূক্ষ্ম কোমল স্বপ্নের জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। শিল্পী নিস্তব্ধ হ'য়ে বসেই রইল—দণ্ডের পর দণ্ড কেটে যেতে লাগল, সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে নিবিড় কালো হ'য়ে উঠল, মতিমঞ্জিলের বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীর ডাক সব নীরব হ'য়ে গেল, দণ্ডে দণ্ডে প্রহর কাটতে লাগল, শিল্পী ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ধীরে ধীরে কখন্ নিদ্রাভিভূত হ'য়ে গালিচার উপরে ঢলে পড়ল তা জানলও না।

* * * * *

এদিকে মধ্যরজনীর নীরবতাকে মুখরতায় ভরিয়ে দিয়ে বাদশা হুশেন শাহের হারেমে মহা উৎসব চলছে। সহস্র দীপালোকে রাত্রির অন্ধকার দূর করছে, অথচ তা দিনের একান্ত স্পষ্টতায় কোন দিকেই সমাপ্তি টানে নি —সবই যেন রহস্যময়, আভাসময়, ইঙ্গিতময়। বেলো-য়ারী ঝাড়ের ঠুন্‌ঠাল্, বলয় কঙ্কনের ঠিনি ঠিনি, নূপুর নিক্কনের রিনি-ঝিনি। কত কত রূপসী তরুণী হীরে মণি মুক্তা জহরতে ভূষিত। প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে দীপ-রশ্মিস্পর্শে তাদের আর সারা দেহ হ'তে যেন তারার টুক্‌রো ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। তাদের নিবিড় কালো আঁখিতারা হ'তে অবিরাম ক্ষরিত হচ্ছে অমৃত ও হলাহল, জীবন ও মৃত্যু—ঐ যে দেখা যায় তাদের আবেশবিহ্বল আঁখি পাতে পাতে অঙ্কিত অমরাবতী সিংহাসন আর গভীর গহন রসাতলের বিরাট গহ্বর।

অসংখ্য তরুণী রূপসী তাদের রূপের ডালি নিয়ে চটুল চাহনি নিয়ে, হাসির তরঙ্গ তুলে, উঠছে, বসছে ঘুরছে, ফিরছে, চলছে। এই তরুণীদের মেলায় মধ্যে বৃদ্ধ হুশেন শাহ্।

কি নিষ্ঠুর উৎসব! কি নির্ম্মম এই অসংখ্য তরুণী দের একটি বৃদ্ধকে ঘিরে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদের সমাপ্তি! না জানি ঐ চটুল চাহনীর পিছনে কত শত দীর্ঘ নিশ্বাস সংগোপিত, ঐ হাল্‌কা হাসির পশ্চাতে কত কত হতাশার গুরুভার অটুট, কত কত জীবনের ব্যর্থতা, ঐ উৎসব রজনীর পশ্চাতে আপনার কড়া ক্রান্তির হিসেব টেনে চলেছে! প্রবল প্রতাপশালী হুশেন শাহ্, ঐ বিরাট ব্যর্থতার বিনিময়ে কি দান করবার ক্ষমতা তোমার হাতে নেই।

নতুন বেগম গান গাচ্ছিল—কি করুণ কি কোমল সে সুর! যেন তার আঁখির পাতে বিন্দু অশ্রুরাশি থম্‌কে যাচ্ছে, যেন তার ঠোঁটের কোণে সারা জগতের বিষাদ গুম্‌রে মর্‌ছে, আর তার কণ্ঠস্বরে মিষ্টি বীণার তানেই অশ্রুসাগর উথলে উঠছে।

"ওগো অচেনা, তুমি এমনি পরিচিত—এতদিন কোথায় ছিলে? যখন প্রথম বুল্‌বুল্ ডেকেছিল, প্রথম সিরাজির স্পর্শ স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে গিয়েছে যেদিন প্রথম দিগন্তের কোণে কোণে চোখ দুটি তোমার সন্ধানে ফিরছিল, সেদিন তুমি কোথায় ছিলে—কোথায় ছিলে?—"

"বুল্‌বুল্‌কে খাঁচায় পুরে দিলে, সিরাজি জল

মণ্ডিত পিয়ালায় রঙ্কিত হ'ল, চোখের সাম্‌নে আঁধার নেমে এল, অচেনা তুমি আজ কেমন করে' কোথায় থেকে এল?—"

"ওগো পরিচিত—কেবলই জল ঝরবে, মেঘ থেকে কেবলই জল ঝরবে, জোছনা আর খেলবে না, ফুল আর ফুটবে না, বুল্‌বুল্ আর ডাকবে না, ওগো তুমি চির-পরিচিত—

"ও"—গান আর শেষ হ'ল না। সহসা নতুন বেগম দু-হাতে বুক চেপে গালিচার উপরে লুটিয়ে পড়ল, তার মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেছে, চোখের তড়িৎ মলিন হয়ে গেছে।

বাদশা হুশেন শাহ্ চক্ষের পলকে এসে লুণ্ঠিতা নতুন বেগমের পার্শ্বে নতজানু হ'য়ে বসলেন—দেখলেন নতুন বেগম অতি কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। বাদশা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন—"পিয়ারী, পিয়ারী—"

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অতি কষ্টে নতুন বেগম উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, বাঁদীর গোস্তাকি মাপ করবেন। বুকের ভিতরটা হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন কে চেপে চেপে ধরছে—" বেগমের শ্বাস ফুরিয়ে এল, আর কিছু ফুটল না।

তৎক্ষণাৎ বাঁদীরা ধরাধরি করে' নতুন বেগমকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেল, শয্যায় শায়িত করে' দিলে, প্রতি মুহূর্ত্তে তার শ্বাসকষ্ট উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে লাগল। হাকিমের জন্যে লোক প্রেরিত হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন বেগমের যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের কতকটা উপশম হ'ল, তার মুখ থেকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার চিহ্ন দূরীভূত হ'য়ে গেল, শান্তির নিশ্বাস ফেলে নতুন বেগম ধীরে ধীরে চোখ দুটি নিমীলিত করল, ধীরে ধীরে তার রঙিন ঠোঁটে রঙিনতর একটা হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

হাকিম এলেন, নিদ্রিতা নতুন বেগমের নাড়ী স্পর্শ করলেন, একটা বিস্ময়ের ক্ষণিক আভা তাঁর চোখ দুটোতে খেলে গেল, আত্মসম্বরণ করে' তিনি আবার দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে নাড়ী অনুভব করলেন, তার-পর ধীরে ধীরে হাতখানিকে শয্যায় নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর কণ্ঠে হুশেন শাহের দিকে ফিরে বললেন—"ইরাণ-তুরাণের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশা জাঁহাপনা, নতুন বেগম এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে' বেহেস্তের পথে যাত্রা করেছেন।"

বাদশার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

* * * *

শিল্পী স্বপ্ন দেখছিল। হিমাদ্রির কোন্ গহন গভীর নির্জ্জন গুহায় একমনে সে আপনার মানসীর ছবি আঁকছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে অনাহারে অনিদ্রায় ছবি আঁকছিল। সহস্র বৎসর পরে তার ছবি আঁকা শেষ হ'ল। তখন শিল্পী সভয়ে দেখলে, এ ত আর কেউ নয়—এ যে নতুন বেগম। দেখতে দেখতে গিরিগুহা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে মতিমঞ্জিল হ'য়ে গেল। হতাশায় শিল্পী তার অঙ্কিত আলেখ্যের সাম্‌নে লুটিয়ে পড়ল।

সহসা শিল্পী দেখলে ছবিতে আঁকা ওড়না যেন একটু কেঁপে উঠল, আলেখ্যের চোখের পাতা মিট্‌মিট্ করে' উঠল, চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, ধীরে ধীরে আঁকা মানসী-মূর্ত্তি চিত্রপট থেকে কক্ষতলে নেমে পড়ল, তার কানে এসে বাজল —"শিল্পী—"

শিল্পী ঘুম থেকে চম্‌কে উঠল, জেগে দেখলে, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক তরুণী স্তিমিত থেকে তার মুখ দেখলে, ভয়ে বিস্ময়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"নতুন বেগম!"

স্বপ্নময়ী বললে—"শিল্পী, নতুন বেগম মরেছে, আমি তোমার প্রণয়িনী, এস—রাত আর বেশি নেই—"

নিমেষে শিল্পীর ঘুমের ঘোর কেটে গেল—তার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু জাগ্রত হ'য়ে উঠল, তার শিরায় শিরায় তড়িৎ চারিয়ে গেল। এত স্বপ্ন নয়—এ যে সত্যি—অতি সত্যি। তৎক্ষণাৎ তরুণ যুবক উঠে দাঁড়াল, তরুণীর হাত ধরে' বাইরে বেরিয়ে এলো। রজনীর শেষ শুকতারা পুব গগনে জ্বল্-জ্বল্ করছিল। সেই শুকতারার আলোকে আলোকে প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে' দূর দিগন্তে কোথায় মিশিয়ে গেল।

(৬)

মানুষের হাজার শোক হোক্ রাজার রাজকার্য্য

বন্ধ থাকে না। পরদিন বাদশা হুশেন—শাহ্ কোতোয়ালকে মতিমঞ্জিল থেকে নতুন বেগমের তস্‌বীর আনবার জন্য পাঠালেন। কোতোয়াল অনুচরবর্গ নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশ্যে চললেন। যথাসময়ে ফিরে এসে বাদশাসমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।"

বাদশা বিস্মিত হলেন. উজিরকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিল্ উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এসে দেখলেন শিল্পী অদৃশ্য। শিল্পী যে কক্ষে ছবি আঁকছিল সেই কক্ষে দুজনে প্রবেশ করলেন। দেখলেন কেউ কোথাও নেই। আপনার স্থানে পরদা-ঢাকা চিত্রপট—তার দুপাশে রজতাধারে তৈলহীন প্রদীপ দুটিতে সল্‌তের ভস্মাবশেষ।

বাদশা চিত্রপট দেখে হৃষ্ট হলেন। বল্‌লেন—"উজির, চিত্রকর না থাক, চিত্রপট রয়েছে—তাই আমাদের যথেষ্ট। চিত্রকর যদি পুরস্কার প্রত্যাশা না করে সে দোষ ইরাণ-তুরাণের বাদশার নয়—" বলতে বলতে তিনি চিত্রপটের পরদা অপসারিত করলেন।

বাদশার মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল। দু'জনে মন্ত্র-মুগ্ধের মত ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রপটে রত্নখচিত সিংহাসন যেমন আঁকা ছিল তেমনি আছে; কিন্তু তার উপকার নতুন বেগমের চিহ্নমাত্র নেই।

রত্নসিংহাসনের রত্নগুলো যেন প্রাণ পেয়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সবুজপত্র। ভাদ্র, ১৩২১

পথের গান

কাজল আঁখির রূপালি সুতায়
বুনে' বুনে' পথখানি,
নীলাম্বরীর আঁচল ভিজায়ে
ফিরে গেছে অভিমানী!
বিজুরির জরী-ফিতেটি সে ওই
ফেলে গেছে চুল খুলে',—
শরৎ-মেঘের শাদা কল্কায়
কে তায় বুনিয়া থুলে!
আল্‌তার টোপ্—ঘাস ফুলে ছোপ্
পড়েছে চরণ থেকে,
এইখান দিয়ে চলে' সে গিয়েছে
এই খান দিয়ে বেঁকে!

দুলায়ে দিলে কে হাসির দোলায়
কাশের ও' দুধে হাসি,
কনক ধান্যে সোনার শোলোক
রচনা করিছে চাষী!
ঝুম্‌কা জবার বেলোয়ারী ঝাড়—
স্নিগ্ধ আলোর ঝারা?
গন্ধ তৈলে বনের মিছিলে
ঝুলায়ে রেখেছে কা'রা?
আলোক-লতার দেখন-হাসি সে
বুক জুড়ে' আছে বসি';—
দুই চোখ ঢেকে আঁচলে—এদিকে
গিয়েছে কি ক্রন্দসী!

সাথী-হারা কোন্ পাখীর করুণ
ক্রন্দনে বন-থল
সমবেদনায় সাড়া দিয়ে দিয়ে
কেঁদে' মরে অবিরল।
নিপুণ পাতার শিয়রে ঘুমায়
নিশ্চল ছায়াখানি,—
ঘুমের স্বপনে বন-কৌতুক
সকলি ফেলিছে জানি!
ললাট ঘামিয়া চন্দন-চুয়া
পড়েছে কচুর পাতে,
এই পথ ঘুরে চলে সে গিয়েছে
দারুণ রোদের তাতে!

শ্যাম-সরোবরে সন্ধ্যা-মেঘের
রাঙা ছায়াটুকু পড়ে,
নিবিড় সোহাগ—ক্ষণ যৌবন
আঁকড়ি-আঁকড়ি' ধরে!
তরু-বীথিকার ফাঁকে দেখা যায়
টুক্‌রো আকাশখানি—
জীবনের ছোট প্রহরের শুধু
এইটুকু জানাজানি!
অংশুমালীর মুকুটের সোনা
ঠিকরি' পড়িছে হোথা,
না জানি সে কোন্ রহস্য-দ্বার
খুলিতে গিয়েছে কোথা!

ঝিল্লির গানে—ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে
ঘুমিয়ে পড়েছে পাখী,
নীলিমার মায়া-মন্তর তা'র
জড়িয়ে ধরেছে আঁখি!
বনের মাথায় পাতায় পাতায়
ঝলসি' উঠিছে কি রে?—
ছড়িয়ে গেছে কি তা'রি কণ্ঠের
সোনার কণ্ঠী ছিঁড়ে'!
ফালি চন্দ্রের খালি বুকখানি,
তিমিরে হারায় দিক্!
এরি মাঝ দিয়ে চুপে চুপে সে গো
চলে গেছে ঠিক্—ঠিক্!

সোসর হারায়ে দোসর করেছি
আজিকে পথেরে তাই,
এত কি পথের রহস্য ওগো,
অন্ত কি এর নাই!
নিঝুম রাতির উদাসী আঁখির,
সীমাহীন দিঠি' পরে
অধরের হাসি অশ্রু মিশিয়া
একি কৌতুক করে!
কই আমি! কই ঘন-কুন্তলা!
পথ কই,—পথ কই!
চিত্ত-মরমে নিত্য ছড়ায়
গানের সুরটি ওই!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপরাধী

বিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। মুঙ্গেরের কলেজে পড়িতাম। বয়স আমার তখন আঠারো কি উনিশ।

গোরাবাজারের ওদিকে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ সারা আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ঝড় তুলিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। মাথা বাঁচাইবার উদ্দেশে দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া একদিকে ছুট্ দিলাম। পিছনে ডাক শুনিলাম,—আমাদের বাড়ী আসুন, অজিত বাবু। চাহিয়া দেখি, অশ্বিনী। আমাদেরই সহপাঠী সে,পাশের একটা বাংলার বারান্দা হইতে আমায় ডাকিতেছে। সানন্দে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সাগ্রহে তাহার বাড়ী গিয়া উঠিলাম। অশ্বিনীরা নেটিভ ক্রীশ্চান্। বাঙ্গালীপাড়ার বাহিরে থাকে। ছোট ফটকের মধ্যে একটু কম্পাউণ্ড আছে, ফ্লোরের উপর ঝরঝরে পরিষ্কার বাংলাখানি —ভারী পরিচ্ছন্ন। কম্পাউণ্ডে লাল নীল নানারঙের ফুলে-ভরা ছোট বাগান—ঠিক যেন একখানি ছবি!

ভিজা কাপড় বদলাইয়া মাথায় ব্রশ্ চালাইয়া ভদ্রলোক সাজিয়া ভিতরে আসিয়া বসিলাম।

অশ্বিনীর বিধবা মা আসিয়া সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন—কি মধুর স্নেহ-করুণায় তাঁহার মুখখানি ঝল্‌মল্ করিতেছে—শান্ত সুন্দর শ্রীতে সমুজ্জ্বল, যেন ম্যাডোনার মূর্ত্তি। একবার দেখিলে জীবনে সে মূর্ত্তি ভোলা যায় না! পরক্ষণেই অশ্বিনী ডাকিল,—রেবা।

টক্‌টকে লাল রঙের শাড়ীতে আপনার দেহখানিকে আবৃত করিয়া রাজ্যের লজ্জা গায়ে মাখিয়া এক বালিকা কক্ষে প্রবেশ করিল। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় সমস্ত আকাশ যেমন এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ বর্ণে আপনাকে রঞ্জিত করিয়া তোলে, বালিকার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি এক অপরূপ রূপের হিল্লোল! তাহার সে অপরূপ রূপের জ্যোৎস্নায় প্রলয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন সেই ঘরখানি মুহূর্ত্তে অমনি চকিত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশে দোদুল বেণী,মাথার উপর টক্‌টকে লাল ফিতায় বো বাঁধা—সে এক অপূর্ব্ব শোভা! আমি তাহার পানে চাহিয়া চকিতে চোখ নামাইলাম।

অশ্বিনী বলিল,—ইনিই অজিত বাবু, কলেজ-টীমে খেলেন। সেদিন গোরাদের সঙ্গে কলেজের যে ম্যাচ দেখেচ, তাতে গোরারা যে গোল খেয়ে হেরে গেল—সেই গোলটি ইনিই দিয়েছিলেন। এঁকে চা খাওয়াও দেখি। এঁর অভ্যর্থনার ভার তোমার উপর।

সলজ্জ মধুর ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া রেবা বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় তাহার চোখ আর ঠোঁটের কোণে যে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায় নাই—আমার মনে হইল, যেন হাসির একটা জীবন্ত বিদ্যুৎ-শিখা আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল! এই জ্যোৎস্নাময়ী বালিকার হাতের তৈয়ারী চায়ে সেদিন অমৃতের স্বাদ পাইলাম!

অনেক রাত্রে বৃষ্টি থামিলে বাড়ী ফিরিলাম। সে রাত্রে ঘুমটার বড় ব্যাঘাত হইল। কেবলি রেবার সেই সুন্দর মুখ আমার প্রথম যৌবনের সমস্ত বাসনা-কামনার প্রদীপটিতে শিখার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। রেবা ক্রীশ্চান, ক্রীশ্চান, ক্রীশ্চান,—এই কথাটা বার বার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ ছুরির মতই আমার সমস্ত আশা সমস্ত কল্পনাকে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া তুলিল।

ইহার পর হইতে অশ্বিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা আমার খুবই বাড়িয়া উঠিল। নানা অছিলায় তাহার বাড়ী গিয়া হাজির হইতাম—সন্ধ্যার চায়ের টেবিলে স্পোর্টিংয়ের নানা অবান্তর আলোচনায় ঘড়িতে কখন্ যে দশটা এগারোটা বাজিয়া যাইত, সেদিকে কাহারো হুঁস থাকিত না। আমি শুধু রেবার রূপসুধা আর তাহার হাতের তৈয়ারী চা পান করিয়া আমার সেই প্রথম যৌবনের সুদুর্লভ মুহূর্ত্তগুলিকে এক বিচিত্র রমণীয়তায় পরিপূর্ণ করিয়া বাড়ী ফিরিতাম!

প্রাণে তৃপ্তিই কি তেমন পাইতাম! অসহ্য বেদনা বোধ হইত, যখন বুঝিতাম, এই রেবাকে কোনদিন আমার পাইবার আশা নাই! সে ক্রীশ্চান্! এই রেবা,—কোথায় কাহার হাতে আপনার ঐ অনিন্দ্য-সুন্দর জীবন-পুষ্পটি উৎসর্গ করিয়া দিবে—তখন কোথায় থাকিবে সে, আর কোথাই বা আমি! হায়রে, এখনকার এই মুহূর্ত্তগুলার সকল স্মৃতিই তখন অতীতের কোন্ অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইবে! বেশী ভাবিতেও পারিতামনা। স্বার্থের বিষে সমস্ত মনটা বিষাইয়া উঠিত। রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময় কতবার মনে করিতাম, আর না, রেবাকে আর দেখিব না! নৈরাশ্যের আগুনে এ বাসনার ইন্ধন মিথ্যা আর কেন জোগাই! রেবা পরের, রেবা সুদূরের! কিন্তু পরদিন আবার কলেজের ছুটি হইলেই রেবার সেই তরুণ রূপের মোহ কি প্রবল আকর্ষণে আমায় আবার তাহারই গৃহের দ্বারে টানিয়া আনিত! ওঃ, সে কি ভীষণ মুহূর্ত্তগুলা! নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কেবলি আঘাত পাইতাম। তবুও সে আঘাত পাইবার আগ্রহে আবার সে-যুদ্ধে মাতিয়া উঠিতাম। আমি যেন পাগল হইয়াছিলাম।

আর পারিলাম না—একদিন ভাবিলাম, রেবাকে সব কথা খুলিয়া বলি,—যদি বুঝাইতে পারি,—কি তীব্র পিপাসা, কি প্রবল অনুরাগ আমার প্রাণে! হোক্ সে ক্রীশ্চান! অন্তরের এই যে প্রবল আকর্ষণ, সে কি মানুষের হাতে-গড়া এই ধর্ম্মের কৃত্রিম বেড়াটাকে ভাঙ্গিতে পারিবে না—ভাঙ্গিয়া দুইজনকে এক করিয়া দিবে না? রেবা মানুষ, আমিও মানুষ। তবে?

একদিন একটা সুযোগ মিলিল। সেদিন অশ্বিনী কোথায় কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, কলেজেও আসে নাই। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কলেজের ছুটির পর তাহার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলাম। অশ্বিনীর মা বলিলেন,—রেবার বিয়ের কথা হচ্ছে—অশ্বিনী তাই ছেলেটিকে দেখতে গেছে সাহেবগঞ্জে—।

আমার বুকে যেন কে মুগুরের ঘা মারিল! রেবার বিয়ে!

অশ্বিনীর মা বলিলেন,—রেবা, চা এনে

দাও। তিনি চলিয়া গেলেন; রেবা চা লইয়া আসিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়া তখন ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। কাছেই এক সাহেবের বাঙলা হইতে পিয়ানোর ঝঙ্কারে একটা মাতাল সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সমস্ত বাতাসটাকেও মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আমার প্রাণও সে সুরে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রেবা—তাহার তারুণ্যের অপূর্ব্ব দীপ্তি লইয়া! গোধূলির সেই মৃদু আভায় তাহাকে কি অপূর্ব্বই যে দেখাইতেছিল!

পাগলের মত রেবার হাত ধরিয়া ডাকিলাম—রেবা—

স্বরটা সব বাহির হইয়াছিল কি না, জানি না—সে স্বরে আমার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অসহ্য আশঙ্কায়-উদ্বেগে একেবারে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িল।

রেবা ভয়-চকিতভাবে আমার পানে চাহিল। তাহার দুই চোখ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। আমি বলিলাম,—রেবা, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি। হও তুমি ক্রীশ্চান—তাতে কি বাধা? আমিও ক্রীশ্চান হতে রাজী আছি। রেবা—রেবা—

গুছাইয়া ঠিক এই কয়টা কথাই বলিয়াছিলাম কি না, জানি না! তবে এই ভাবের কথাগুলাই আমার মনের মধ্যে ভাষায় ফুটিবার জন্য আতালি-পাতালি করিতেছিল; তারপর এক-নিশ্বাসে আরো কত কথা যে বলিয়া গেলাম!

রেবা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—কোন কথা বলিল না। আমি তাহার মুখের পানে সাগ্রহ পিপাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তাহার রক্তিম কপোলে ক্ষণে ক্ষণে লজ্জার সুরক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার চোখের পাতা ক্ষণে ক্ষণে মুদিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রেবা বিদ্যুৎ-শিখার মতই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারপর আমি কতক্ষণ যে মূক মৌন পুতুলের মত সেখানে বসিয়া ছিলাম, জানি না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজিতেছে শুনিয়া আমার চেতনা হইল। আমি চোরের মত নিঃশব্দে বাহির হইলাম। ফ্লোরের নীচে এক-ঝাড় হাস্নুহানার পাশে শান-বাঁধানো ছোট চাতালটার উপর রেবা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ওখানে রেবা কি করিতেছে! মন কৌতূহলী হইলেও পা সেদিকে গেল না। সটান্ পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথে আসিয়া ভাবিলাম, এ কি করিলাম! মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ক্ষণিক উত্তেজনায় একটা বালিকার কাছে এমনভাবে—ছি!

দারুণ ধিক্কারে সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। রেবা কি ভাবিল? পাছে পরদিন অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হইলে এ কথা ওঠে, সেই ভয়ে কলেজে গেলাম না। বৈকালে কষ্টহারিণী ঘাটের দিকে চলিয়া গেলাম। বাসায় ফিরিয়া শুনিলাম, অশ্বিনী কি জরুরি কাজে আমায় খুঁজিতে আসিয়াছিল। বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! তারপর দুই-তিনদিন কলেজের ছুটি ছিল—বাসা ছাড়িয়া ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম,—কয়দিনই অশ্বিনী আসিয়া দুই তিনবার আমার খোঁজ করিয়া গিয়াছে!—কেন? কেন? কেন? আশার দোলায় মন দুলিয়া উঠিত—আবার এই দারুণ লজ্জা মনটাকে চাপিয়া ধরিয়া এমনি জ্বালাতন হইয়া একটা কাজ

অছিলা তুলিয়া একদিন হঠাৎ কলিকাতায় পলাইলাম।

চট্ করিয়া ফেরা গেল না। বাড়ীতে অকস্মাৎ নানা অসুখ-বিসুখের হাঙ্গামা আসিয়া আমায় প্রায় দুই মাস বাড়ীতে আটক করিয়া রাখিল। খাঁচার পাখীর মতই পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিলাম—অশ্বিনী কেন আমার খোঁজে আসিয়াছিল? তবে কি রেবাকে পাওয়া সম্ভব? তবে কি মুঙ্গেরে ছুটিয়া যাইব? একটা চিঠি লিখিব? কি জানি, হয়ত হাতের নাগালে পাইয়াও কামনার ধনটিকে চিরদিনের জন্যই খোয়াইয়া বসিলাম!

তার পর মুঙ্গেরে ফিরিলাম, একেবারে পূজার পর, কলেজ খুলিলে। ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত সন্তর্পণে অশ্বিনীদের পাড়ার দিকে চলিলাম। ঐ যে বাড়ী দেখা যায়! সেই বাড়ী! আমার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া নাচিয়া উঠিল। কম্পিত চরণে অগ্রসর হইলাম। এ কি, ফটকের সম্মুখে ছোট ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া এক সাহেব-বালক বেড়াইতেছে যে,—সঙ্গে এক তরুণী মেম। ফটকের সম্মুখে দেখি, কাঠের ছোট সাইনবোর্ড, তাহাতে একটা বিলাতী নাম লেখা। কে যেন আমায় নিমেষে কোন্ উচ্চ পর্ব্বত-শিখা হইতে একেবারে অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বরে ঠেলিয়া দিল।

নিকটেই এক ভুট্টাওয়ালার দোকান। সেখানে সন্ধান লইতে গিয়া দেখি, অশ্বিনীদের বাড়ীর সেই লখিয়া দাইটা এককোণে বসিয়া ভুট্টা সেঁকিতেছে। তাহার মুখে শুনিলাম—অশ্বিনী আজ মাসখানেক হইল,—বোনের বিবাহ দিবার পরই—কি-একটা চাকরি লইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছে—বিধবা মাও সঙ্গে গিয়াছেন। যাইবার সময় বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। বিবাহটা একরকম গোলমালের মধ্যেই সারা হইয়াছে—অশ্বিনী, রেবা কি মা—কাহারও মত ছিল না। জামাইয়ের বাপের কাছে বাড়ীটা বাঁধা ছিল—তাহারা মামলা-মকর্দ্দমা করিয়া ক্রোক দিবার চেষ্টায় ছিল, তাই এই বিবাহ দিয়া সেসব দায় এড়াইয়া বাঁচিয়াছে। কলেজে বন্ধুদের মুখে শুনিলাম,—আমি চলিয়া গেলে অশ্বিনী পাগলের মত আমার সন্ধান করিয়াছিল। আমার কলিকাতার ঠিকানা কেহ জানিত না—কাজেই বলিতে পারে নাই—আমার সঙ্গে অশ্বিনীর নাকি এই বিবাহের ব্যাপারেই ভারী জরুরি পরামর্শ ছিল! রেবাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তবে কি তাহারই জবাব অশ্বিনী দিতে আসিয়াছিল! তবে কি রেবার কাছে আপনাকে ধরা দিয়াছিলাম,—সেই ভরসায় দেনার দায় কাটাইবার জন্য বেচারী অশ্বিনী আমারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল! কে জানে!

তারপর আজ বিশবৎসর পরের কথা বলিতে বসিয়াছি। সংসারের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় গিয়াছে রেবা, আর আমার তরুণ যৌবনের সেই অরুণ-স্বপ্ন! দুই মেয়ের বিবাহ দিয়া নাতি-পুতি লইয়া আমি এখন দস্তুর-মত সংসার ফাঁদিয়া বসিয়াছি। বাংলা নভেলে প্রেমের কথা পড়িলে গাঁজাখুরি বলিয়া সে বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দি! এফ-এ পাশ করিয়া হঠাৎ ধনী শ্বশুরের নজরে পড়িয়া তাঁহার এক কন্যার সহিত অনেকগুলি

টাকা ঘরে তুলিয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কাল কাটাইতেছি। মফঃস্বলে ডাক্তারি চাকরি করি—পরিশ্রম কম, খাতির খুব,—বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিতেছে!

এই চাকরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আজ চারমাস হইল, জামালপুরে আসিয়া উঠিয়াছি।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গৃহিণীর হাতে তৈয়ারী দুই-চারিটা সুখাদ্য মুখে তুলিতেছি, এমন সময় খপর আসিল, এক জরুরি এ্যাক্‌সিডেণ্ট কেশে এখনই বাহিরে যাইতে হইবে।

ভাড়া-গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। গৃহিণী মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু উপায় ছিল না! বাঙালী স্ত্রীরা কর্ত্তব্যের ডাক—এই জিনিষটার অর্থ বোঝে না। তাহারা চায়, স্বামীগুলি তাহাদের হাতে মাথা গুঁজিয়া আদর-সোহাগ লইয়াই—কিন্তু সে কথা থাক্!

রেলোয়ে-ব্যারাকের ধারে গিয়া একটা জীর্ণ বাংলার সম্মুখে গাড়ী থামিল। গাড়ী হইতে নামিয়া জীর্ণ বাংলার মধ্যে ঢুকিয়া দেখি, সম্মুখেই পাঁচ-সাতটি ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছে—ছিন্ন মলিন বেশ,—সুকুমার মূর্ত্তিগুলি জরাজীর্ণ। তাহাদের ঘেরিয়া, সমস্ত স্থানটাকে ঘেরিয়া দারিদ্র্যের বিকট শীর্ণ কঙ্কালখানা যেন খট্ খট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভিতরে গেলাম। রোগশয্যায় শায়িতা এক তরুণী—রোগী, ইহাকেই দেখিতে হইবে। বয়স বেশী নয়, তবে দারিদ্র্যে আর অভাবে গায়ের চর্ম্ম বিশ্রী কর্কশ হইয়া গিয়াছে—রূপ ম্লান, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে—তরুণী এককালে সুন্দরী ছিল বটে—এখন সৌন্দর্য্যের একটা খোলস্ মাত্র তাহার অঙ্গে লাগিয়া আছে। তরুণী অচেতন পড়িয়া আছে। ব্যাপার শুনিলাম—মাতাল লম্পট স্বামী পয়সার জন্য তর্জ্জন করিয়া স্ত্রীর কাছে যখন পয়সা পায় নাই, তখন জুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়া নিতান্ত পাষণ্ডের মতই পদাঘাতে বেচারীকে জর্জ্জরিত করিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ শুশ্রূষার পর রোগীর চেতনা হইল। রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। এ কি—এ যে আমার পরিচিত দৃষ্টি! কোথায় দেখিয়াছি? চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক!—এ যে রেবা! সবিস্ময়ে ডাকিলাম—রেবা—

না, ভুল নয়। তরুণী আমার পানে ফিরিয়া চাহিল—চাহিয়া চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল—অজিতবাবু—

তারপর দুইজনেই নির্ব্বাক। কাহারো মুখে কথা নাই! রেবার দুই ডাগর চোখের কোলে মুক্তার মত দুই বিন্দু জল ফুটিয়া উঠিল। ফোঁটা বড় হইল—তারপর দুই গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। আমার বুক ফাটিয়া কতদিনকার একটা বিস্মৃতপ্রায় রুদ্ধ বেদনা তীব্র নিশ্বাসে ফুটিয়া বাহির হইল। আমি দুই হাতে রেবার চোখের জল মুছিয়া বলিলাম,—রেবা, তোমার এই দশা!

আমার বুকের উপর এক অসহ্য বেদনা পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিয়াছিল—চোখে জল আসিল।

রেবা আকাশের পানে একটা হাত উঠাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—প্রভুর ইচ্ছা!

কোন কথা বলিলাম না—বলিবার শক্তিও ছিল না। এই রেবা—সেই রেবা! এ

অতর্কিত মুহূর্ত্তে ক্ষণিকের উত্তেজনায় যাহাকে বলিয়াছিলাম—

জিজ্ঞাসা করিলাম—অশ্বিনী কোথায়?

—জানি না। এই বিয়ের ব্যাপার নিয়েই দাদার রাগ হয়। এ বিয়েতে কারো মত ছিল না। দাদাও এ বিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হল না—সবই প্রভুর ইচ্ছা!

হারে স্বার্থপর! বর্ব্বর কাপুরুষ! এই বিবাহ বন্ধ করার চেষ্টাটা হয়ত তোর সেই কথাটাকেই কেন্দ্র করিয়া! কে আমার সর্ব্বাঙ্গে তীব্র-কশাঘাত করিল।

আমি আজ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—আর আমার সেই প্রথম-যৌবনের কামনার ধন রেবা—! কেন তাহাকে সেই সন্ধ্যায় আশার উচ্ছ্বাসে মাতাইয়া তুলিয়াছিলাম! তার পর কাপুরুষের মত পলাইয়া—ছি!

রেবাকে বলিলাম,—আমার ওখানে তুমি চল—যাবে রেবা?

রেবা বলিল,—না।

—আমার বাড়ীতে না হয় না গেলে, আমার বাড়ীর কাছে অন্য বাড়ীতে থাকবে,—আমার দেখবার সুবিধা হবে। ছেলেমেয়েদের জন্যেও—?

তবু সেই এক উত্তর—না।

ঠিক! ঠিক জবাব দিয়াছ রেবা। নারী, এই তেজেই দুর্ব্বল অসহায় হইয়াও লক্ষ্মীছাড়া বিশ্বে নিজেকে তুমি খাড়া রাখিয়াছ!

ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উঠিলাম। উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। গাড়ীতে উঠিব, এমন সময় দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতে চারিটা টাকা গুঁজিয়া দিল, দিয়া বলিল,—আপনার ভিজিট!

কোন কথা বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না—হাতটাও সরাইতে পারিলাম না। গরম আগুনের মত বোধ হইলেও টাকা চারিটা হাতেই রহিল।

গাড়ী চলিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখিলাম, রেবার কি দীপ্ত মহিমাময় মূর্ত্তি,—রাজেন্দ্রাণীর মত সিংহাসনে সে বসিয়া আছে—আর আমি তাহার সম্মুখ হইতে আমার বিকৃত কুণ্ঠিত মনটাকে লইয়া নতশিরে সরিয়া পড়িবার জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতেছি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

এ ধরণী

এ ধরণী ধূলায় মলিন,
এরি পরে তোমার অঙ্গুলি নিশিদিন,
সবুজ সোণালি নীলে, রাঙায় কালোয়
সোণার জলের মত উজল আলোয়
বরণের আঁকে আল্‌পনা,
কত ছবি, কত ছায়া, কতই কল্পনা।

এই ধূলি রাখে বুকে করে,
যা কিছু হারায়ে যায়, যাহা থাকে পড়ে,
তাই নিয়ে বারে বারে দেয় ফিরে ফিরে,
তরুলতাফুল, চারিদিক ঘিরে
তরুণ তৃণের আস্তরণ,
জন্ম মৃত্যু প্রণয়ের শয্যা আবরণ!

মাটীর এ আঙিনার পরে
চিরনব নভস্তল আছে ছায়া করে',
আলো দেয় রবিশশী, বসন্ত শরৎ
পুষ্প বৃষ্টি করি ঢাকে, এ ধূলির পথ,
দ্যুলোকের যতেক আলোক
আসে যায়, চেয়ে দেখে কৌতূহলী চোখ।

মর্ত্ত্যবাসী আমরা সকলে
ক্ষণিকের প্রেমিক আমরা, পলে পলে
যা কিছু হারায়ে যায় তাই ভালবাসি,
ভঙ্গুর যৌবন, আর প্রণয় প্রয়াসী,
দুদিনের মধুমাস লয়ে,
ফুলদোল খেলা করি আলয়ে আলয়ে!

ধরণীর এই পুষ্পরাশি
নন্দন মন্দার সম নিয়ত বিকাশি
অক্ষত শোভায় আর অম্লান সৌরভে
দেখা যদি দিত কভু, তবে হায় কবে
ঘুচে যেত সব মোহ তার,
চাহিতে দেখিতে ভুল হ'ত কতবার!

এই যে খসিয়া পড়ে যায়,
চোখ ভরে না দেখিতে শুকায় মিলায়,
যে সৌরভ পলাতক পরশের আগে
ক্ষণ-প্রভা সম যেই পুষ্পশোভা জাগে,
ছিঁড়ে যায় যে ফুলের ডোর
তারি লাগি' সারা প্রাণ বাসনা-বিভোর!

এ ধরণী শিশুর মতন,
নিমেষে নিমেষে হয় কেবলি নূতন,
এতখানি ভালবাসা তাই তার 'পরে,
এ তরুণ শ্যামলতা নহে চিরতরে,
উষা, সন্ধ্যা, শুক্লা বিভাবরী
দুই দণ্ডে চলে যায় প্রাণ-মন হরি!

হেথা মৃত্যু কেড়ে লয়ে যায়,
মিলন মলিন হয় বিরহ-ছায়ায়
বড় বাসনার ধন, বন্ধন কঠিন,
তাও ঘুচে, আসে মুক্তি সবল স্বাধীন
আনন্দে আসেনা অবসাদ,
চিরদিন অভিনব রহে তার স্বাদ!

হায় স্বর্গে অনন্ত-জীবন,
অম্লান আলোক ভয়ে আসেনা স্বপন,
নয়ন নিমেষ-হীন ঝরেনাক ফুল,
বসন্তের আয়োজনে নাই কোন ভুল,
প্রেম থাকে চির-বন্দী হয়ে,
জরাহীন যৌবনের অসীম আলয়ে!

হায় স্বর্গ, গতি-মুক্তি হীন,
অমর জীবন-ভারে আবদ্ধ অধীন,
পূর্ণতার পরিণামে নাই বৃদ্ধি-ক্ষয়,
নাই আশা, নাই শঙ্কা, স্তব্ধ শান্তিময়
অচেতন সে অমরাবতী—
জাগ্রত এচিত নাহি চাহে এক রতি!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সমালোচনা

সোনার ঝরণা। শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা। সব দিক দিয়াই এ বইখানির বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ এখানি গল্পের বই, ছেলেদের গল্প, আবার সে গল্প লিখিয়াছেন দুটি ছোট ছেলে। মোহনলাল ও শোভনলাল দুই ভাই, দুইজনের বয়স দশ আর এগারো বৎসর! এই অল্প বয়সেই তাহাদের গল্প বলিবার ক্ষমতা আর ভঙ্গী তাহারা এমনি আয়ত্ত করিয়াছে যে সেগুলি পড়িয়া আমরা তাহাদের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গল্পগুলি যেমনি সহজ ভঙ্গীতে হাল্‌কা ঝরঝরে ভাষায় লেখা তেমনি তাহাদের মধ্যে হাস্য করুণ বিচিত্র রসও ঠিকসই পরিমাণে আছে,—কোথাও রস কম পড়ে নাই, বা কোথাও রসাধিক্যও ঘটে নাই। সর্ব্বপ্রথমে এই দুই বালকলেখকের গল্প যখন "সন্দেশ" পত্রিকায় ছাপা হয়, তখন সে গল্প পড়িয়া সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় যে বলিয়াছিলেন,—যে-বয়সে তাহাদের গল্প শুনিবার কথা, সেই বয়সে তাহারা এমনভাবে গল্প শুনাইতেছে যে অনেক পাকা প্রবীণেও তেমনটি পারে না। কথাটা খুব ঠিক। ছোট গল্পের যে আর্ট, সে আর্ট 'সোনার ঝরণায়' বেশ বজায় আছে। গল্পগুলির মধ্যে কোথাও একটি অনাবশ্যক লাইন বা একটা অনাবশ্যক শব্দ নাই। প্লটের মধ্যে কোথাও গা-জুরি একটা আয়োজনের ঘটা নাই, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর, কাজেই সহজেই গল্পগুলি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। দুই ভাইয়ের লেখা সাতটি গল্প বই খানিতে সংগৃহীত হইয়াছে; সেগুলি সচিত্র,—ছবি আঁকিয়াছেন, প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়। লেখার একটু নমুনা দিতে চাই—তাহা হইতে এই দুটি ভাইয়ের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। শোভনলাল "ইঁদুরের তিন ছেলে" গল্পে লিখিতেছেন, "এক ছিল ইঁদুর, এতটুকু ছোট্ট। বড় বড় জানোয়ার দেখে সে ভয়ে কাঁপত, গর্ত্ত থেকে বার হতে পারত না। তার যখন বাচ্ছা হবার সময় হল, তখন তার ভারি ইচ্ছা হল যে আমার যদি খুব জোরালো এক বীর বাচ্ছা হয়, তাহলে আর আমি কাউকে ভয় করি না! কি আশ্চর্য্য, যা মনে করা, ঠিক তাই! বাচ্ছা হলো কালো ডোরা-কাটা বাঘের ছানা। ইঁদুর ত অবাক! ছানা দেখে তার ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপুনি থামে না। তারপর যখন তাকে মা বলে ডাকলে, তখন ল্যাজ তুলে ছুটে গিয়ে তাকে আদর করতে লাগল।" খাসা লেখা! এই লেখাটুকুর মধ্যে animal psychologyর যে সহজ স্পষ্ট কথা ফুটিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব! কোন প্রবীণ পাকা লেখকের হাতের লেখায় ইঁদুরের মনস্তত্ত্ব এমন ফুটিত কি না সন্দেহ! আর-এক জায়গায় আছে, "ছেলেটি বল্লে,—"সে কি মহারাজ! পুঁচকে ইঁদুর কেঁদো হাতীর সঙ্গে লড়তে পারে কখনো।" (সোনার ঝরণা, ১৭ পৃষ্ঠা) এই যে বিশেষণ দুটি 'পুঁচকে' আর 'কেঁদো'—এমন লাগসই বিশেষণ প্রবীণের পাকা হাত দিয়া কখনই বাহির হইত না। অথচ এ দুইটি বিশেষণ কি সহজ, আর কি লাগসই! এমনি প্রচুর নমুনা তুলিয়া দেখানো যায়। বহিখানির কভারে ছবি আছে—পাহাড়ের গা বহিয়া ঝরণার সোনালি জল অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িতেছে—আর পাহাড়ের নীচে দাঁড়াইয়া একটি বালক মনের আনন্দে সেই জলে স্নান করিতেছে। ছেলেটির আনন্দ চিত্র-শিল্পী এ চিত্রে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'সোনার ঝরণা' বহিখানিতেও আগাগোড়া এই সোনালি জলেরই মৃদু হিল্লোল ছুটিয়াছে—ছেলে-মেয়েরা তাহাতে গা ভাসাইয়া মাথা ডুবাইয়া প্রচুর আনন্দ পাইবে। লেখা, ছবি, সাজসজ্জা, ছাপা, সব দিক দিয়া "সোনার ঝরণা" সোনার বই হইয়াছে।

শেষে একটা কথা না বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সেটি এই বালক লেখক দুটির পরিচয় সম্বন্ধে—মোহনলাল ও শোভনলাল আমাদের বন্ধু, ভারতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই পুত্র। দেবী ভারতীর আশীর্ব্বাদে মোহনলাল ও শোভনলালের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হোক্, ভারতীর সেবায় তাহাদের চেষ্টা সফল নিরাপদ হোক্, শরীর নীরোগ থাকুক,—ভূমিকা লেখকের সঙ্গে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

রংমশাল। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্‌স্, হারিসন রোড কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। দাম ন' সিকে। এখানি ছেলেমেয়েদের জন্য পূজার 'বার্ষিকী' উপহার-গ্রন্থ। সর্ব্বসমেত একুশটি গল্প আর কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে; ছবির সংখ্যা প্রচুর একচল্লিশখানি, তন্মধ্যে আটখানি 'পাতা-জোড়া'। গল্প আর কবিতাগুলি যাঁহারা লিখিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতি অপরিসীম। সব লেখাগুলিতেই আর্টের খেলা আছে—সেগুলি বাজে নয় 'রংমশালের' প্রথম আলো জ্বালাইয়াছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ। কবিতাটিতে সত্যই তিনি হরেক রঙের আলো ফুটাইয়াছেন। তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন,—"আলোয় আলো! আহ্লাদে ভাই এলিয়ে গেল অন্ধকার!" বহিখানির সম্বন্ধে এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়—"আলোয় আলো!" সত্যেন্দ্রনাথের 'রংমশাল,' 'পেটুকের বর্ণপরিচয়'—অবনীন্দ্রনাথের 'রাণা কুম্ভ,' মণিলালের কবিতা 'রাতের কুটুম' আর 'চড়ের চর্কি,' সৌরীন্দ্রমোহনের 'বোকা তাঁতি,' সুরেশচন্দ্রের 'ভূতের আঁচড়,' 'বেজির বাহাদুরী,' হেমেন্দ্রকুমারের 'ছিদামের প্রেতুকা-পুরাণ,' 'ডাকপেয়াদা,' 'শান্ত ছেলে' ও বাঘের মাসীর গঙ্গাযাত্রা,' কিরণধনের 'নামকাটা সেপাই,' ও 'কমলা-লেবুর দেশে,' শিশু-লেখক মোহনলাল-শোভনলালের 'বাদশাহী আংটি,' ও 'বাঁদরের বন্ধু,' সুকুমার রায়ের 'ফাজিলের ডিক্‌সেনারী,' জলধর সেনের 'কড়াইভাজা,' নরেন্দ্র দেবের 'ফুলের আয়না,' 'কালি আর ঝুল'—সমস্ত রচনাগুলিই উপভোগ্য, চমৎকার। তার উপর ছবি, গগনেন্দ্রনাথের 'পূজোর ফুল,' অবনীন্দ্রনাথের 'ছেলেখেলা,' যতীন্দ্রকুমারের 'জ্যোৎস্না-রাতে,' নন্দলালের 'হাঁস,' 'পুলিনবিহারীর পাড়ি,' 'ছি চকাঁদুনী' সুরেন্দ্রনাথের 'মাঠের পথে,' বিপিনচন্দ্রের 'কদমতলায় কে'—রঙে-রঙে রংমশালের প্রতি পৃষ্ঠা রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। এ বহিখানি বাঙলা দেশে সবার-সেরা হইয়াছে—বাঙলা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে। গল্প কবিতা ছবির এই অনিন্দ্যসুন্দর সংগ্রহটি আর্ট গ্যালারির মতই একটা দর্শনীয় বস্তু হইয়াছে—ইহার মনোরম বৈচিত্র্যে, ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যে এবং ইহার অভিনবত্বে এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। সম্পাদক-যুগলের সাধু চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। তাঁহারা ছেলেমেয়েদের পূজার আনন্দ এই বার্ষিকী উপহারে যে লাখ গুণ বাড়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। বহিখানি যেরূপ তাহার তুলনায় এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে ইহার মূল্য বেশ সুলভই হইয়াছে।

উপনিষদাবলী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংশোধিত। ১২ নং হরীতকী বাগান শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, হাওড়া, কল্যাণপুর পশুপতি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড এক টাকা। প্রথম খণ্ডে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, কৈবল্য, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিন্দু, আরুণি, জাবাল ও ব্রহ্মবিদ্যা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে গোপালপূর্ব্বতাপনীয়, গোপালোত্তর-তাপনীয়, কৌষীতকী অমৃতবিন্দু, আত্মা, কালিকা, সর্ব্বসার ও অমৃতনাদ—মূল শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকা প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদসহ সংগৃহীত হইয়াছে। দুইখানি গ্রন্থেরই আকার ছোট, পকেটে রাখা যায়। বারো খণ্ডে সমগ্র ১১৪খানি উপনিষৎ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

নিভৃত আলাপ

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

ভারতী

৪৪শ বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩২৭　　[৮ম সংখ্যা

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের কোনো ভক্ত বস্‌ওয়েল তাঁদের জীবনচরিত লিখিয়া রাখিতেন না; কবিরাও নিজেদের আত্ম-চরিত লিখিয়া রাখিতেন না। কেবল স্বরচিত কাব্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ভণিতায় ও কাহিনীর প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে নিজের নিজের পরিচয় কবিরা ছড়াইয়া রাখিয়া যাইতেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্যমালার মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশেষ একটি মূল্যমান রত্ন; কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় অন্য কবিদের চেয়ে বেশ একটু ভালো রকমই রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ তাঁর মর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট পরিচয় দ্যান নাই; আভ্যন্তর প্রমাণ হইতে অনুসন্ধান করিয়া অনুমান করা ছাড়া আর উপায় নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিকে শাক্ত বলিয়া ধরিয়া লইবারই প্রবৃত্তি হয়। কবিকঙ্কণও গ্রন্থ-উৎপত্তির বিবরণে লিখিয়াছেন—

উরিয়া মায়ের বেশে　　কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।

*　　*　　*

আশ্রয় পুথড়ি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে　　নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
হাতে লয়্যা পত্র মসী,　　অপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেইমন্ত্র দিল দীক্ষা　　সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া　　দিলেন চরণছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই　　শিলাই বাহিয়া যাই,
আড়রায় হৈনু উপনীত॥

(বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬ পৃষ্ঠা)

স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা প্রচার করা

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

প্রাচীন কবিদের একটা প্রথামাত্র ছিল। আদিকবি বাল্মীকি দেবাদেশে রামায়ণ রচনা করেন; আদি ইংরেজ কবি কেড্‌মন দেবাদেশে গান বাঁধেন; বাংলারও অনেক কবি দেবাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াছেন, যথা—কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মঙ্গল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, রামপ্রসাদের কালিকা-মঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রাজা জয়-নারায়ণ ঘোষালের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর ভাগবত, সঞ্জয় রচিত মহাভারত প্রভৃতি কাব্য স্বপ্নাদেশে রচিত। এইসব দেখিয়া দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"যে-সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না।.....এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভান করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

এ রোগ শুধু আমাদের দেশের কবিদেরই ছিল তা নয়, এ রোগ বিশ্বব্যাপী—

That a god inspired his soul expresses the ordinary belief of early historical times.—Encyclopaedia Britannica.

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর চরণে ভক্তি ও নতি মাঝে মাঝে করিয়াছেন দেখা যায়—

উমাপদে হিত-চিত রচিল নোতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

* * *

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
অভয়া-চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
অনুক্ষণ রহু মম কায়-মনো-বাক্য॥

কিন্তু চণ্ডীচরণে ভক্তি হইতে বা চণ্ডীর আদেশ পাইয়াই যে কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তার প্রমাণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন—

রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশে। (৪২ পৃষ্ঠা)

*

দিলেন অনুমতি ব্রাহ্মণ ভূপতি,
শ্রীকবিকঙ্কণে গান। (১৪০ পৃষ্ঠা)

*

চণ্ডীপদ ভাবি চিত রচিল মুকুন্দ গীত,
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে। (৪৮পৃষ্ঠা)

*

ব্রাহ্মণ রাজার কুতুহলী। (২০ পৃষ্ঠা)

ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের আদেশে কবিকঙ্কণ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—এইটিই আসল কথা; চণ্ডীর আদেশ বা ভক্তি রঘুনাথের আদেশের অনুসঙ্গী গৌণ কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কবি নিজের গ্রামবাসী ও পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাসের একটু পরিচয় দিয়াছেন—

দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত,
সেই পুরী হরের ধরণী।

*

ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নাম্বু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥

*

গঙ্গা সম সুনির্ম্মল তোমার চরণ জল
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥

*

সদাশিব-অনুজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
এক ভাবে পূজিল শঙ্কর।

*

শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান।

ইসব পদ হইতে কবিকে বংশানুক্রমে শৈব বলিয়াই অনুমান করার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু আবার পাই—

কৈয়ড়ি বংশজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
এক ভাবে সেবিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল॥

কবির পিতামহ একবার "একভাবে পূজিল শঙ্কর" আবার "একভাবে সেবিল গোপাল।" তিনি আগে বোধহয় মীনমাংসভোজী শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল' গোপালের দশাক্ষর মন্ত্র ও গোপীজনবল্লভায় স্বাহা জপ করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতামহের এই গোপাল-সেবার কথা কবি নিজের কাব্যে তিন-তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা হইতে অনুমান হয় কবির পিতামহ শেষ-বয়সে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। এবং বৈষ্ণব বংশের ছেলে বলিয়া কবিও বৈষ্ণবই ছিলেন। এ সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল হইতে বহু পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(১) চণ্ডীমঙ্গলের একেবারে প্রথম সূত্রপাতেই মঙ্গলাচরণে গণেশ-বন্দনা শেষ করিয়া কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

গাইয়ে তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।
(১ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাসী সং)

এই গোবিন্দ-ভকতি তিনি আরো দুই বারের ভণিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন—

গোবিন্দ-পদারবিন্দ- বিগলিত-মকরন্দ-
অলি কবিকঙ্কণ গাহে। (৫ পৃষ্ঠা)

কি কব তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে। (৪১ পৃষ্ঠা)

(২) মহাদেব-বন্দনায় কবি মহাদেবকে বলিয়াছেন—"নিগূঢ়-বিষয়-নারায়ণ!" এবং—

তুমি হরি যোগরাজে এ তিন ভুবনে পূজে,
তুমি হরি গুণের আশ্রয়।

মহাদেবকে তিনি নারায়ণ ও হরি রূপে দেখিতেছেন, এবং সেইজন্য শিবনিবাস বারাণসীকেও বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ বলিয়া অনুমান করিতেছেন—

তুমি হরি পুণ্যরাশি, শূল-অগ্রে বারাণসী
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার! (২ পৃষ্ঠা)

(৩) ডিহিদার মামুদ শরিপ "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হল্য অরি" বলিয়া অত্যাচারপীড়িত কবি, অনুযোগ ও দুঃখ করিয়াছেন। (৬ পৃষ্ঠা)

(৪) দক্ষের মুণ্ড ছেদনের পর মহাদেবের প্রসাদে শিবানুচর নন্দী "ছাগলের মুণ্ড দক্ষে করিল জোড়ন।" কিন্তু কবি দেখিলেন—"কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন।" (১৬ পৃষ্ঠা)

(৫) নীলাম্বর যখন অভিশপ্ত হইয়া দেবলোক হইতে মর্ত্তে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

দেবদেহ ত্যাগ করিতেছেন, তখন তাঁর—"চৌদিকে বান্ধব-মেলা, গলাতে তুলসীমালা।" এবং নীলাম্বরের পত্নী ছায়া স্বামীর সহ-মরণের সময় "হরি হরি সোঙরে বিধাতা।"

(৪২ পৃষ্ঠা)

(৬) চণ্ডীকে বারম্বার নারায়ণী ও বৈষ্ণবী বলা হইয়াছে। যেখানে যেখানে যতবার যে-কেউ চণ্ডীর স্তব করিয়াছে, তার মধ্যে চণ্ডীমাহাত্ম্যের চেয়ে কৃষ্ণকথাই প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; চণ্ডীর গৌরব যে "নানা অবতারে মাতা বিষ্ণুসহায়িনী।" বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে সাহায্য করিতে পারাতেই যেন চণ্ডীর চরম মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডী "বলাই-পূজিতা বলদেবের ভগিনী" (২৫৫ ও ১৬৯ পৃষ্ঠা)। "নন্দগোপসুতা হয়ে রাখিলে গোকুল।"

"যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী।
যদুযোষা যুগন্ধরা যজ্ঞবিনাশিনী॥ (১০৪)

(৭) চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মাকে কাঁচুলি নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলে বিশ্বকর্ম্মা কাঁচুলিতে ছবি লিখিলেন চণ্ডীর দশমহাবিদ্যা রূপের কীর্ত্তি-কাহিনী অবলম্বন করিয়া নহে; সেসব ছবি হইল বিষ্ণুর দশাবতারের কার্য্যকলাপ এবং বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ-অবতারের কাহিনী!

(৬১ পৃষ্ঠা)

(৮) নগর পত্তনের জন্য ব্যাধ কালকেতু চণ্ডীর স্তব করিতে গিয়া বলিতেছে—
"আরাধনে হরি হর তুমি তিনজন।" (৮০ পৃষ্ঠা)

আরাধনার যোগ্য তিনটি মাত্র দেবতার মধ্যে হরি অগ্রগণ্য!

(৯) চণ্ডীর সতীন গঙ্গাকে দিয়া কবি চণ্ডীকে শুনাইয়াছেন—

হই গো বিষ্ণুর দাসী, বিষ্ণুপদ হৈতে আসি,
সেই প্রভু গতি সবাকার।

(৮০ পৃষ্ঠা)

(১০) চণ্ডীর কৃপাতেই নূতন গুজরাট নগর পত্তন হইয়াছে। কিন্তু সেখানে দেখা যায়—"সারি সারি বিষ্ণুর দেউল।" এবং—

দিয়া হীরা নীলাখণ্ড বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ড,
অনল-বিজুলী-সমাকুল।

এবং—

দিয়া হীরা নীলাখণ্ড নিরমিল দোলপিণ্ড
কদম্ব-কানন-সন্নিধান। (৭৯ পৃষ্ঠা)

এই গুজরাটপুরী—"রূপে জিনে দ্বারাবতী" শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, এবং "অযোধ্যা সমান পুরী" বিষ্ণুর অপর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী (৮০ পৃষ্ঠা)। গুজরাটের ক্ষত্রিয় বৈশ্য "কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ।" তা ছাড়াও অনেক "বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে" যারা "সদা লয় কৃষ্ণনাম" (৮৭)। কলিঙ্গরাজের কোটাল গুজরাট দেখিয়া আসিয়া রাজার কাছে বর্ণনা করিতেছে—

দেখিলাম গুজরাট, প্রতি বাড়ী গীতনাট,
যেন অভিনব দ্বারাবতী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া নাহি ধরে তার ছায়া,
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি॥
প্রতি বাড়ী দেবস্থল, বৈষ্ণবের অন্নজল,
দুই সন্ধ্যা হরিসঙ্কীর্ত্তন। (৯৪)

(১১) কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় চণ্ডীর কৃপাভাজন কালকেতু চণ্ডীকে ভুলিয়া "হরি স্মরণে বীর এড়ে যতনে" (৯৭) এবং চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া ও স্বাধীন রাজা হইয়া নিশ্চিন্ত মনে—

বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়্যা সাবধান॥(১১০)

(১২) ধনপতি সদাগরের সঙ্গে পায়রা উড়াইতে যে কজন বন্ধু গিয়াছিল তাদের প্রায় সকলকারই বৈষ্ণব নাম।—

মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ॥
গুংশারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
কংহর জনার্দ্দন কুল-পুরোহিত॥
দামোদর গদাধর সুবল সুদাম।
হরিহর পীতাম্বর আর শিবরাম॥
নন্দরাম পরমানন্দ বিনোদ বিক্রম।
বাসুদেব কামদেব আর সনাতন॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস।
পুরুষোত্তম আল্যা আর শ্যাম হরিদাস॥
অনন্ত অচ্যুত আইল আর অভিরাম।
চক্রপাণি চতুর্ভুজ আল্যা ভৃগুরাম॥
মুরারি দৈত্যারি শ্রীগোবিন্দ ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সভার আনন্দ॥(১১৫)

(১৩) শুককে বন্দী করিয়া ব্যাধ শুকের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছে—"বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ" (১২৭)। রাজা বিক্রমকেশরী জাতিস্মর শুকের পরিচয় জানিতে চাহিলে শুক বলিতেছে—

বৃন্দাবন পৈতৃক স্থান, কালিন্দীতে স্নান দান,
জন্ম মোর কল্পতরুমূলে।
বৃন্দাবনে চান্দমুখ দেখিয়া পরম সুখ,
আছিলাম আনন্দ মঙ্গলে॥
গোপের বালক সঙ্গে ছিলাম পরম রঙ্গে
নিরবধি দেখি চান্দমুখ।
বৃন্দাবনে বাস করি নিরবধি দেখি হরি,
তথা বিধি গিয়া দিল দুখ। (১২৮)

(১৪) রাজা রঘুনাথের পরিচয়-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

আরড়া উচিত ভূমি, পুরুষে পুরুষে স্বামী,
সেবনে গোপাল কামেশ্বর। (১৪১)

(১৫) কবি আকাশ শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বিষ্ণুপদ; এবং আকাশে চণ্ডীর আবির্ভাব তিনি দেখিতেছেন—"আজি বিষ্ণুপদতলে উরিলা ভবানী।" চণ্ডীকে বিষ্ণুতলে স্থাপন করিয়া চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা কবি আপনার ইষ্টদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মনে হয়। এইটিই কবির বৈষ্ণবত্বের চরম প্রমাণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। (১৪৯)

(১৬) ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধের সভায় হরিবংশ ও রামায়ণ পাঠ হইয়াছিল।

(১৭৬-১৭৭)

(১৭ চণ্ডীর বরপুত্র শ্রীমন্তের জন্ম হইলে "দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত" (২১২)। লীলাবতী সখী লহনার সপত্নীর পুত্রজন্মহেতু—

"তাপ খণ্ডিবার তরে মধুর মধুর স্বরে
ভাগবতের গান গুণগাথা।" (২১৩)

এবং—

"স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা।
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন লহনা॥ (২১৩)

বালক শ্রীমন্ত—

শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা।(২১২)
কৃষ্ণলীলা অনুরূপ শিশু করে খেলা।(২১৩)

(১৮) শ্রীমন্ত সদাগরকে জগন্নাথক্ষেত্র দর্শন করিতে পাঠাইয়া কবি শ্রীক্ষেত্রের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কবির হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। (২৩৪)

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

(১৯) শ্রীমন্ত সিংহলরাজের কাছে উজানীরাজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছে—

পবিত্র নির্ম্মল যেন গঙ্গাজল,
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান। (২৪৫)

বিক্রমকেশরী রাজা কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তিনি শৈব ছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

(২০) জরতী ব্রাহ্মণীর বেশধারিণী চণ্ডী সিংহলের কোটালকে বলিতেছেন—

কোটাল, দুঃখ পাই নিজ কর্ম্মদোষে।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ না সেবিলুঁ নারায়ণ,
কাহারে না রাখিলুঁ সন্তাষে॥ (২৫৯)

(৪১) মশানে শ্রীমন্ত কোটালকে অনুরোধ করিতেছে—"দেহ তুলসীর মালা।" (২৬১)

(২২) সিংহলেশ্বর চণ্ডীর স্তুতির সময় বলিতেছেন—"খগেন্দ্রবাহন-সহচরী।" (২৭৪)

(২৩) শ্রীমন্ত পিতাকে সিংহলরাজের কারাগারে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিয়া বলিতেছে—

কাণ্ডার ভাই, ঝাট চল তেজিয়া সিংহল।
ধর হে বৈষ্ণব-বেশ, চলহ আপন দেশ,
ভিক্ষা কর পথের সম্বল॥ (২৭৬)

(২৪) শ্রীমন্ত শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলে তার স্ত্রী সুশীলা তার স্বামীকে নিজের পিত্রালয়ে রাখিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতেছিল; তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রলোভন এই—

সখী মেলি গাব গীত, সখা মেলি গাব গীত,
সানন্দ হইয়া গাব কৃষ্ণের পিরীত। (২৮৬)

(২৫) শৈব ধনপতি সদাগর চণ্ডীকে পূজনীয় দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া স্তব করিতে করিতে বলিতেছে—

যে জন তোমার নাহি করিল সেবন।
শ্রীহরি সেবার সেই হবে কি ভাজন!! (৩০১)

কলিঙ্গরাজও চণ্ডীর স্তব করিবার সময় এই একই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

যেই জন নাহি করে তোমার পূজন।
সেই নর কিবা জানে কৃষ্ণের ভজন॥

(২৬) চণ্ডী খুল্লনাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার চেষ্টায় নানা শাস্ত্র উপদেশ দিয়া খুল্লনার পৃথিবীর প্রতি মমতা শিথিল করিতেছেন; তখন তিনি খুল্লনাকে "গজেন্দ্রমোক্ষণ উপাখ্যান" এবং অজামিলের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে বলিতেছেন—

হরিনাম হরিকথা কলুষনাশিনী।

*

অভয়া কহেন, ঝিয়ে শুন ইতিহাস।
হরিনামের মহিমা কহিল কৃত্তিবাস॥

*

সর্ব্বতীর্থস্নান সম কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। (৩০৭)

(২৭) গ্রন্থ সমাপ্তির আগে কবিকঙ্কণ প্রার্থনা করিতেছেন—

হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন।
বদনে লইয়া কর বৈকুণ্ঠে গমন॥ (৩১০)

গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

সর্ব্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত॥ (৩১৩)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কালের উপর বৈষ্ণব প্রভাব অথবা বৈষ্ণব শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের ধর্ম্মমতের জন্যই হওয়া বেশী সম্ভব বলিয়া আমার অনুমান।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবতার

৬

যে বাড়ীতে অক্টেভ বাস করিত সেই বাড়ীর নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে ডাক্তারের মন্ত্রপূত জল-প্রোক্ষিত গুরুগুরু গর্জ্জন-নাদ শোনা গিয়াছিল; শুনিবামাত্র প্রায় তখনই অক্টেভ ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অক্টেভ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—এমন সময় ডাক্তার, অক্টেভকে দেখিতে পাইল—কৌণ্ট ওলাফ একটা পালঙ্কের উপর হাত-পা ছড়াইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। প্রথমে অক্টেভের মনে হইল বুঝি কেহ কৌণ্টকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়াছে,—অক্টেভ কিয়ৎক্ষণের জন্য ভয়-স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু আর একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবার পর, লক্ষ্য করিল, ঐ নিদ্রিত যুবকের বক্ষদেশ প্রায়-অননুভব্য ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাসে একবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে। ডাক্তার বলিলেন:—

"এই দেখ, তোমার ছদ্মবেশ প্রায় প্রস্তুত হয়েছে। এ ছদ্মবেশের যোগাড় করা বড় শক্ত। এ ছদ্মবেশ দোকানে ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু রোমিও যখন ভেরোনার রাজাগুার উপরে উঠেছিল, তখন তার ঘাড় ভাংবার সম্ভাবনাটা থাকা সত্ত্বেও রোমিওর চিত্তকে উদ্বিগ্ন করতে পারে নি। সে জানত, জুলিয়েট, নৈশ অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে উপরের কামরায় তার জন্য অপেক্ষা করচে। কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভির মূল্য কাপুলেট-দুহিতার চেয়ে বড় কম নয়।"

এই আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিয়া অক্টেভের চিত্ত এতটা বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে সে কোন উত্তর করিল না। সে ক্রমাগত কৌণ্টকে দেখিতে লাগিল; দেখিল, কৌণ্টের মস্তক পশ্চাতে অল্প হেলিয়া একটা বালিসের উপর ন্যস্ত। গথিক্ মঠের ভিতর সমাধিস্থানের উপরে, যে সকল বীরপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় তাহাতে ঘাড়ের নীচে খোদাই-কাজ-করা একটা মার্ব্বেলের বালিস থাকে—এ যেন ঠিক সেই রকম। এই সুন্দর ও মহান মূর্ত্তির অভ্যন্তরস্থ আত্মাকে অক্টেভ বেদখল করিতে যাইতেছে,—এই চিন্তায় তার মনে একটু অনুতাপ উপস্থিত হইল।

অক্টেভ এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার মনে করিলেন, বুঝি অক্টেভ এখনো ইতস্তত করিতেছে। ডাক্তারের ঠোঁটের ভাঁজের উপর দিয়া একটা অস্পষ্ট অবজ্ঞার হাসি চলিয়া গেল—ডাক্তার অক্টেভকে বলিলেন:—

"তুমি যদি মন স্থির না করে থাক, তাহলে আমি কৌণ্টকে জাগিয়ে দিতে পারি। আমার চৌম্বক শক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে, যেমন তিনি এসেছিলেন তেমনি আবার ফিরে চলে যাবেন; কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ, এ রকম সুযোগ আর কখনো পাওয়া যাবে না।

সে যাই হোক্, তোমার প্রেমের সম্বন্ধে আমার বেশ একটু দরদ হয়েছে, একটা পরীক্ষা করতে আমার ইচ্ছে হয়েছে—

সে রকম পরীক্ষা য়ুরোপে আমি কখনো চেষ্টা করিনি। আমি তোমার কাছে এ কথা লুকোতে চাইনে যে এই আত্মার বিনিময় ব্যাপারে একটু বিপদ আছে। তোমার বুকে হাত দিয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার জীবন-পাশার যা সব-চেয়ে বড় দান তা পাবার জন্য কি তুমি মুক্ত হৃদয়ে তোমার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করতে রাজি আছ? শাস্ত্রে আছে প্রেম মৃত্যুরই মত বলবান।"

অক্টেভ শুধু এই উত্তর দিলেন :—

—"আমি প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার তাঁর শ্যামলবর্ণ শুষ্ক দুই হাত খুব তাড়াতাড়ি ঘসাঘসি করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"বেশ বাবা বেশ। কোন বাধাতেই পিছপাও হয় না—তোমার এই প্রেমের আবেগ দেখে আমি তুষ্ট হলাম! এ জগতে দুইটি মাত্র জিনিস আছে; আবেগ আর ইচ্ছাশক্তি। তুমি যদি সুখী না হও সে নিশ্চয়ই আমার দোষ নয়। গুরুদেব ব্রহ্মলোগম্! অপ্সরা-সঙ্গীত-মুখরিত ইন্দ্রলোক হতে তুমি ত সব দেখছ—তোমার মৃত কঙ্কাল পরিত্যাগ করবার সময় আমার কানে যে মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলে, তা কি আমি বিস্মৃত হয়েছি? না, সেই মন্ত্র, সেই-সব মুদ্রাভঙ্গী আমার বেশ মনে আছে। তবে এখন কার্য্য আরম্ভ হোক! এইবার আমাদের কটাহে এক অপূর্ব্ব রান্না চড়বে—ম্যাকবেথের সেই ডাকিনীদের মতো কেবল তাদের সেই নীচ ধরণের ডাকিনী-মন্ত্র থাকবে না। আমার সম্মুখে এই আরাম-কেদারায় তুমি বোসো। আমার শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মসমর্পন কর। বেশ, আমার চোখের উপর চোখ রাখো, আমার হাতে হাত রাখ। এখনি মন্ত্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আকাশ ও কালের ধারণা লুপ্ত হচ্চে, অহং জ্ঞান ও আত্মচৈতন্য অপনীত হচ্চে, চোখের পাতা নেমে এসেছে; মাংস-পেশী মস্তিষ্কের কথা আর শুনচে না,—শিথিল হয়ে গেছে। চিন্তা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। যে-সকল সূক্ষ্ম বন্ধনে আত্মা শরীরের সহিত আবদ্ধ সেই-সব বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মা স্বর্ণ-অণ্ডের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন, সেই ব্রহ্মা এখন আর বহির্জগৎ হতে পৃথক নন। বাষ্পের দ্বারা তাঁকে পরিসিক্ত করা যাক্, রশ্মির দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে দেওয়া যাক্।"

ডাক্তার মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে যখন এই সকল কথা বিড় বিড় করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন, তখনও তাঁর হাতের "ঝাড়ন দেওয়া" এক মুহূর্ত্তের জন্যও রহিত হয় নাই। তিনি দুই হাত বাড়াইয়া সেই হাত হইতে প্রদীপ্ত রশ্মিচ্ছটা নিক্ষেপ করিতেছিলেন—সেই রশ্মিচ্ছটা সম্মোহিত ব্যক্তির কপালে ও বক্ষে গিয়া লাগিতেছিল। ক্রমে তাহার চারিধার রশ্মি-মণ্ডলের ন্যায় একটা দৃশ্যমান ফস্ফরস-গর্ভিত বায়ু-মণ্ডল গড়িয়া উঠিল।

আপনার কাজের জন্য আপনাকে আপনি বাহবা দিয়া ডাক্তার শেরবোনো বলিয়া উঠিলেন—বেশ বেশ! খুব ভাল! তারপর একটু থামিয়া যখন দেখিলেন, ব্যক্তিগত জ্ঞান একেবারে লোপ পাইবার পূর্ব্বে ব্যক্তি

জ্ঞান বজায় রাখিবার জন্য অক্টেভের মাথার ভিতর তখনও খুব একটা চেষ্টা চল্‌চে, তখন তিনি আবার বলিলেন, "দেখা যাক্, দেখা যাক্—কে আমার মন্ত্রের প্রতিরোধ করতে পারে! মস্তিষ্ক-পাকের মধ্যে তাড়িত হয়ে, না জানি কোন্ বিদ্রোহী মনোভাব আদিম পরমাণুর উপর, জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুর উপর জমা হয়ে আমার প্রভাবকে এড়াবার চেষ্টা করচে। আমি নিশ্চয়ই তাকে পাকড়াও করতে পারব, তাকে কাবু করতে পারব।"

এই অনিচ্ছাকৃত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ডাক্তার তাঁর দৃষ্টির 'ম্যাগনেটিক্ ব্যাটারি'তে আরও বেশি শক্তি সঞ্চালিত করিলেন এবং সেই বিদ্রোহী চিন্তাটাকে উপমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে লইয়া আসিলেন—যে স্থানটি আত্মার গুপ্ততম পবিত্র স্থান, রহস্যময় দেব-নিকেতন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন।

তখন তিনি মহা গাম্ভীর্য্য সহকারে এক অশ্রুতপূর্ব্ব পরীক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এক শন-নির্ম্মিত পোষাক পরিধান করিলেন, একটা সুরভিত জলে হস্ত প্রক্ষালন করিলেন; বিভিন্ন বাক্স হইতে কতকগুলা গুঁড়া লইয়া গাল ও কপাল চিত্রিত করিলেন, ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র বাহুতে জড়াইলেন, গীতার দুই-তিনটা শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, 'এলিফ্যান্টা' গুহার সন্ন্যাসী যে-সব খুঁটিনাটি আচার-অনুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার একটাও ছাড়িলেন না।

এই-সব অনুষ্ঠান শেষ হইলে, তিনি উত্তাপের বড় বড় মুখ খুলিয়া দিলেন, আর তখনি তাঁহার বৈঠকখানা-ঘর আবার প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত হইল। থরমমেটারে ১২০ দ্বাগ তাপ উঠিয়াছে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—"এই স্বর্গীয় অগ্নির দুই স্ফুলিঙ্গ, যাহা এখন দেহ-পিঞ্জর থেকে নগ্নাবস্থায় বের হয়ে আসবে, আমাদের তুষার-শীতল হাওয়ায় ঐ স্ফুলিঙ্গ-দুটিকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হবে না—বা নির্ব্বাপিত হতে দেওয়া হবে না।"

ডাক্তার সাদা বস্ত্র পরিধান করিয়া জড়-পিণ্ডবৎ এই দুই দেহের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেবীর নিকট যাহারা নর-বলি দেয় সেই ভীষণ রক্তপিপাসু পুরোহিতের ন্যায় এই সময় তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যজ্ঞের প্রক্রিয়া শান্তিরসাশ্রিত।

নিশ্চেষ্ট নিশ্চল কৌণ্ট ওলাফের নিকট ডাক্তার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, তাঁর সেই মহামন্ত্র উদ্ধারণ করিলেন, তাহার পর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন অক্টেভের নিকটে গিয়া সেই মন্ত্রই আবার তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিলেন।

ডাক্তারের যে ক্ষমতা সচরাচর অতি অদ্ভুত দেখিতে, তাহা এই সময় এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল। এই রহস্যময় অনুষ্ঠানের সময় তাঁহার মুখের বিশৃঙ্খল রেখাগুলি চলিয়া গিয়া মুখশ্রীতে একটা শান্ত ভাব আসিয়াছিল, পুরোহিতোচিত একটা গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছিল।

এই সময় কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতে লাগিল। একটা যন্ত্রণার তড়কার ন্যায় কৌণ্ট ও অক্টেভ উভয়ের দেহ একই সময়ে নড়িয়া উঠিল। উহাদের মুখ বিকৃত হইল, উহাদের মুখে 'গ্যাজ' উঠিতে লাগিল। গাত্র-চর্ম্ম শবের মত বিবর্ণ হইল। তথাপি দুটি ক্ষুদ্র নীলাভ আলোক-স্ফুলিঙ্গ উহাদের মাথার উপর ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল—কম্পিত হইতে লাগিল।

যেন আকাশে একটা রেখা-পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন এইভাবে ডাক্তার স্বকীয় বিদ্যুৎ-প্রবাহী হস্তাঙ্গুলির একটা ইঙ্গিত করিবামাত্র ফস্‌ফরস্-গর্ভ বিন্দুদ্বয় চলিতে আরম্ভ করিল, এবং উহাদের পশ্চাতে একটা আলোকের রেখাচিহ্ন রাখিয়া দিয়া, স্বকীয় নূতন আবাসে প্রবেশ করিল:—অক্টেভের আত্ম কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির শরীরকে অধিকার করিল এবং কৌণ্টের আত্মা অক্টেভের শরীরকে অধিকার করিল:—অবতারের কার্য্য সম্পন্ন হইল।

গালের একটু রক্তিম আভায় বুঝা গেল, যে-দুই মৃণ্ময় মানব-আবাস কয়েক সেকেণ্ড আত্মাহীন হইয়া ছিল এবং ডাক্তারের বিদ্যুৎ-শক্তির অবিদ্যমানে যমরাজ যাহাকে আপনার কবলে আনিয়াছিলেন, এইমাত্র সেই দুই মৃত্তিকাখণ্ডের ভিতরে জীবনীশক্তি প্রবেশ করিয়াছে।

আনন্দ-উল্লাসে ডাক্তার শেরবোনোর চোখের তারায় বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। তিনি ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন; "ধন্বন্তরী প্রভৃতি যে-সব চিকিৎসকের খুব নাম-ডাক, মানব-দেহের ঘড়ি বিগড়াইয়া গেলে মেরামৎ করিতে পারেন বলিয়া যাঁদের খুব অহঙ্কার,—আমি যা করিলাম এই কাজ তাঁরা করুন দিকি।

যখন আত্মা আমার একতিয়ারে আছে, তখন শব-দেহের কি-তোয়াক্কা রাখি?"

এই বাক্য-বিন্যাস শেষ করিয়া, ডাক্তার শেরবোনো, যে-রঙিন গুঁড়ার রেখায় নিজের মুখ চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া, এবং ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া ফেলিয়া, অক্টেভের আত্মার দ্বারা অধিকৃত কৌণ্টের শরীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর, সম্মোহন-নিদ্রার অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মোহন-বিদ্যার উপদেশ অনুসারে হাতের ঝাড়া দিতে লাগিলেন;—সেই এক এক ঝাড়ায় অঙ্গুলীপ্রান্ত হইতে বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল।

আর কয়েক মিনিটের পর, অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি (আমাদের বর্ণনা বিশদ করিবার জন্য এখন হইতে অক্টেভকে অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি বলিব) স্বীয় আসনে উঠিয়া বসিলেন, চোখে হাত রগড়াইতে লাগিলেন এবং চারিদিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—এখনও তাঁহার অহং-চৈতন্য ফিরিয়া আসে নাই। যখন তাঁর বাহ্য-জ্ঞান স্পষ্ট ফিরিয়া আসিল, তখন প্রথমেই দেখিতে পাইলেন, তাঁর আপনার বাহিরে তাঁর আকৃতিটা একটা পালঙ্কের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এ যে স্পষ্ট দেখা যাচ্চে! আশির প্রতিবিম্বরূপে না—প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে। অক্টেভ লাবিন্‌স্কি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

এই চীৎকার-শব্দে তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনি ছিল না—এই শব্দে তাঁর মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল। 'ম্যাগ্‌নেটিক'-নিদ্রার সময় এই আত্মার বিনিময় হওয়ায়, অক্টেভ উহার স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই,—তাই তিনি একটা অভূতপূর্ব্ব অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিলেন। এখন অন্য নূতন ইন্দ্রিয় আসিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। একজন শ্রমজীবীর নিকট হইতে তাহার অভ্যস্ত হাতিয়ার সকল উঠাইয়া লইয়া তাহাকে অন্য হাতিয়ার দিলে যেরূপ হয় ইহা কতকটা সেইরূপ। আত্মা-বিহঙ্গ ঠাঁই-ছাড়া হইয়া একটা অপরিচিত মস্তিষ্ক-খোলের মধ্যে, পাখার ঝাপ্‌টা মারিতে মারিতে মস্তিষ্কের জটিল পাকের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে—সেই মস্তিষ্কের মধ্যে অপরিচিত ধারণাদির কতকটা রেখাচিহ্ন এখনো রহিয়া গিয়াছে।

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কির বিস্ময়টা বেশ-একটু উপভোগ করিয়া ডাক্তার বলিলেন;—"আচ্ছা, এখন তোমার এই নতুন আবাসটা কেমন লাগ্‌চে? যার মত সুন্দরী এই ভূমণ্ডলে বিরল সেই সুন্দরীর পতি বীরপুরুষ কৌণ্টের দেহ-মন্দিরে তুমি বেশ গট্ হয়ে বসে নিয়েছ ত? তোমার বসৎ-বাড়ীর সেই বিষাদময় ঘরে আমি যখন তোমাকে প্রথম দেখি তখন ত তুমি মৃত্যু কামনা করছিলে! এখন কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই তোমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত; রাণী প্রাস্কোভির কাছে তোমার প্রেম জানাতে গিয়ে তখন তুমি তাঁর কাছ থেকে মুখ-খাবড়া পেয়েছিলে, এখন আর তোমার সে ভয় নেই। এখন আর বোধ হয় তুমি মৃত্যু-ইচ্ছা করবে না। এই যে বানর-মুখো বৃদ্ধ বালখাজার শেরবোনোকে দেখ্‌ছ—এখন তুমি বেশ বুঝ্‌তেই পার্‌চ তার অসাধ্য কিছুই নেই—আবার তোমার আত্মাকে অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে—তার ঝুলিতে এখনো নানা তুক্-তাকের জিনিস আছে।"

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি উত্তর করিলেন—

"ডাক্তার, আপনার শক্তিসামর্থ্য দেবতার মত—অন্ততঃ দানবের মত। আপনার এই শক্তি, দৈবী কিংবা দানবী শক্তি না হয়ে যায় না।"

—"না বাবা, সে ভয় কোরো না, ওর ভিতরে ভূতুড়ে বা দানবি কাণ্ড কিছুই নেই। তোমার মুক্তির পথে কোন বিঘ্ন হবে না:—তোমার সঙ্গে চুক্তি করে সেই চুক্তি-পত্রে লাল কালিতে তোমাকে সই করতে আমি বল্‌চিনে। এই-সব যা ঘটলো, তার চেয়ে সহজ জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। যে শব্দ-ব্রহ্ম আলোকের সৃষ্টি করেছেন, তিনি কোন আত্মাকেও স্থানান্তরিত করতে পারেন। তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

—"আপনার এই অমূল্য উপকারের জন্য কি বলে' আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? এর প্রতিদান কি করব? কি দিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করব?"

—"তুমি, আমার নিকট একটুও ঋণী নও; তোমার উপর আমার একটা টান্ হয়েছিল। সংসারানলে দগ্ধ, রৌদ্র-দগ্ধ বুড়ার কাছে আবেগ জিনিসটা বড়ই বিরল। তুমি তোমার প্রেমের কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছ। আমাদের মধ্যে কেউ বা

একটু রাসায়নিক, কেউ বা একটু ঐন্দ্রজালিক, কেউ বা একটু দার্শনিক—কোন-না-কোন আকারে সবাই আমরা স্বপ্নদর্শী; আমরা অল্পবিস্তর সবাই পরিপূর্ণ অসীমের সন্ধান করে থাকি। সে যা হোক, তুমি এখন ওঠো, চলা-ফেরা কর, বেড়িয়ে বেড়াও; দেখ, তোমার নূতন গাত্র-চর্ম্মের দরুণ, এই বাহু পরিবেষ্টনের মধ্যে একটু বাধো-বাধো ঠেক্‌চে কি না?"

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি, ডাক্তারের উপদেশ-মত ঘরের মধ্যে দুই-চারিবার একটু পায়চালি করিলেন। এখন আর তেমন বাধো-বাধো মনে হইতেছে না; কৌণ্টের শরীরের মধ্যে, অন্য আত্মা বাস করিলেও, পূর্ব্ব-অভ্যাসগুলার একটা ঝোঁক, একটা বেগ কৌণ্টের দেহে তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল; নব আগন্তুক অক্টেভ-লাবিন্‌স্কিও এই সকল দৈহিক স্মৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল; কারণ অধিকারচ্যুত পূর্ব্বদেহ-স্বামীর চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি সমস্তই এক্ষণে নব-আগন্তুককে গ্রহণ করিতে হইবে।

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন:—

"আমি যদি তোমাদের আত্মার এই বিনিময়-প্রক্রিয়ায় স্বয়ং লিপ্ত না হতাম, তা হলে আমার বিশ্বাস হত,—আজ রাত্রে যাহা কিছু ঘটেছে সবই সচরাচর ঘটনা; আর তুমিই প্রকৃত বৈধ ও প্রামাণিক লিথুনিয়ার কৌণ্ট ওলাফ্-লাবিন্‌স্কি। এখন ত আসল কৌণ্টের আত্মা তোমার পরিত্যক্ত দেহের খোলসের মধ্যে ঐখানে নিদ্রায় মগ্ন।

কিন্তু এখনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজবে। এই বেলা রাণীর কাছে যাও—তাস-পাশা খেলে দেরী করে বাড়ী এলে বলে তাঁর কাছ থেকে ধমক খেতে না হয়। একটা ঝগড়া করে বিবাহ-জীবনের আরম্ভ করাটা ভাল নয়—সে একটা কুলক্ষণ। ততক্ষণ আমি খুব সাবধানে তোমার পুরোনো খোলোসটাকে আবার জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।"

ডাক্তারের কথাগুলা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইল। সিঁড়ির ধাপের নীচে কৌণ্টের জাঁকালো লাল-ঘোড়ার যুড়ী অধীরভাবে খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। মুখের লাগামের লোহাটী কামড়াইতেছিল এবং তাহাদের মুখ-নিঃসৃত ফেন-পুঞ্জে সম্মুখের পাথরে-বাঁধানো স্থানটা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই যুবকের পদশব্দ শুনিবামাত্র একজন জাঁকালো উর্দ্দি-পরা সইশ গাড়ীর পা-দানীর কাছে দৌড়িয়া আসিয়া সশব্দে পা-দানীটা নামাইয়া দিল।

অক্টেভ প্রথমে অভ্যাস-বসে যন্ত্রবৎ তার নিজের সামান্য-ধরণের ব্রহাম গাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল,—তারপর এই উচ্চ জাঁকালো 'চেরিয়াট'-গাড়ীতে উঠিয়াই সইসকে গন্তব্যস্থান বলিয়া দিল—সইস কোচম্যানকে বলিল—"হোটেলে চল।" গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে না করিতেই, অশ্বযুগল ঘাড় বাঁকাইয়া সতেজে ছুটিল। পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। দ্রুতগতি অশ্বের দ্রুত গতি পথের দূরত্বকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রাসাদে পৌঁছিয়া কোচ্‌ম্যান খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিল:—ফাটক্!

দরোয়ান আসিয়া ফাটকের দুই প্রকাণ্ড কপাট ঠেলিয়া দিয়া গাড়ী-প্রবেশের রাস্তা করিয়া দিল। গাড়ী একটা বালুময় বৃহৎ প্রাঙ্গণে এবং সাদা ও গোলাপী রঙের ডোরা-কাটা একটা চাঁদোয়ার নীচে ঠিক্ আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি এক-নজরে স্থানটা দেখিয়া লইল। প্রাঙ্গণটা বিশাল, সু-সমান কতকগুলি ইমারতে বেষ্টিত, তাঁবার দীপ-দণ্ডের উপর কাচের ফানসের মধ্যস্থিত দীপ হইতে শুভ্র আলোকচ্ছটা প্রক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। যে-ধরণের সেকেলে ফানস, তাহাতে এই বাড়ীটা হোটেল অপেক্ষা প্রাসাদের মতই মনে হয়। 'ভেরসাই'-অলিন্দের যোগ্য কতকগুলি কমলা-লেবুর টব্, অ্যাসফ্যাল্টের কিনারার উপর, একটু দূরে দূরে স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে বালুময় ভূমি—এই অ্যাসফ্যাল্ট কিনারাটা পালিচার কিনারার মত মধ্যস্থিত বালুভূমিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

এই রূপান্তরিত প্রেমিক বেচারা, দরজার চৌকাঠে পদার্পণ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল; তার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। তাহার দেহ কৌণ্ট-ওলাফ লাবিন্‌স্কির দেহ হইলেও, সে বাহ্য-দেহ মাত্র; মস্তিষ্কের মধ্যে যে-সব সংস্কার ও ধারণা ছিল, তাহা মালিকের আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছিল,—এখন হইতে যে বাড়ীটা অক্টেভ-লাবিনস্কির এই বার কথা, উহা তাহার নিকট অপরিচিত; উহার ভিতরকার বন্দোবস্ত সে কিছুই অবগত নহে। তাহার সম্মুখে একটা সিঁড়ি দেখিতে পাইল, সে কপাল ঠুকিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল। ঘসা-মাজা পাথরের ধাপগুলা হইতে শুভ্রচ্ছটা বাহির হইতেছে; এবং সেই ধাপগুলার উপর ঘোর রক্তবর্ণ গালিচার এক বিস্তৃত ফালি তাঁবার আঙটায় আটকানো রহিয়াছে; ধাপে-ধাপে স্থাপিত ফুলদানিতে সুন্দর সুন্দর বিদেশী পুষ্প শোভা পাইতেছে।

ঘর-কাটা-কাটা একটা প্রকাণ্ড ল্যাণ্ঠান একটা মোটা বেগনি রেশমী দড়িতে ঝুলিতেছে—ঐ দড়ি ঝাপ্পা ঝালোরে বিভূষিত। ঘরের দেওয়াল মার্বেলের মত পালিশ-করা সাদা চুণ-বালির কাজে মণ্ডিত; দেয়ালের গায়ে কানোভা-রচিত "আত্মায় প্রেমের চুম্বন" এই ছবির একটি নকল-চিত্র ঝুলিতেছে—তাহার উপর লাণ্ঠান-নিঃসৃত সমস্ত আলোকচ্ছটা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সিঁড়ির মাথাটা মোজেয়িক কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত; সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে চারিজন বিখ্যাত চিত্রগুণীর চারিখানা চিত্র রেশমী দড়িতে ঝুলিতেছে—চিত্রগুলি এই জমকালো সিঁড়ির সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে। সিঁড়ির মাথার উপরে, সোনার পেরেক-মারা একটা পশমী কাপড়ের উঁচু দরজা। অক্টেভ-ল্যাবিন্‌স্কি সেই দরজা ঠেলিবামাত্র একটা বিশাল পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়িল। সেই পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে জম্‌কালো সাজে সজ্জিত কতকগুলি ভৃত্য নিদ্রা যাইতেছিল। অক্টেভ সেখানে আসিবামাত্র, কল-কাটি টিপিলে যেরূপ হয়—তখনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, প্রাচ্যদেশের গোলামের মতো দেয়ালের ধারে উহারা সারি-দিয়া দাঁড়াইল।

অক্টেভ বরাবর চলিতে লাগিল। পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠের পরেই সাদা ও সোনালি রঙের এক

বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানায় কেহই ছিল না। অক্টেভ একটা ঘণ্টায় টান দিবামাত্র এক রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

"গৃহিণী-ঠাকুরাণীর দর্শন কি পাওয়া যেতে পারে?"

—"রাণী এখন কাপড় ছাড়বার উদ্যোগ করচেন; একটু পরেই দেখা দেবেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ

পূর্ব্বরাগের আনন্দ জমিয়া উঠিয়াছে না-পাওয়ার মধ্যে, অনুরাগের আনন্দ জমিয়া উঠিয়াছে পাওয়ার মধ্যে। কোন্ আনন্দটি বেশী? কোন আনন্দ বেশী বলা দুষ্কর, কারণ, এই অনুভব নির্ভর করে আপন আপন স্বভাব ও সংস্কারের উপর। আর ব্যক্তিগত স্বভাব ও সংস্কারকে যদি এড়াইয়া উঠিতে পারি তবে নিরুপাধিকের (absolute) দিক হইতে দুইই বোধ হয় ত সমান; পার্থক্য শুধু ধরণে, মাত্রায় নহে।

ইউরোপ পূর্ব্বরাগের পূজারী, প্রাচ্য অনুরাগের সেবক। কিন্তু আশ্চর্য্য, এ যেন ভাবের অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। যে ইউরোপের সমস্ত ঝোঁক পাওয়ার মধ্যে, জিনিষকে স্পষ্টভাবে পূর্ণভাবে হাতের মুঠার মধ্যে না ধরিতে পারিলে * যাহার সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, সেই ইউরোপই নাকি আবার ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে না-পাওয়ার মধ্যে, না-ধরার দিকে! আর যে প্রাচ্য ছুটিয়াছে উধাও হইয়া চলিয়াছে কেবলই অনন্তের অসীমের পানে, † সেই প্রাচ্যই দেখি মধুর আনন্দকে চাহিয়াছে সসীম সুষীম পাওয়ার ধরা-বাঁধার মধ্যে! পাশ্চাত্যের কবি দয়িতাকে বলিতেছেন—

She was a Phantom of delight—

তাহার রূপকে মুছিয়া যতদূর পারেন বাতাসে আকাশে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছেন তাহাকে করিয়া তুলিয়াছেন

A voice, a mystery—

আর প্রাচ্যের কবি প্রণয়িনীর মূর্ত্তিকে যতখানি পারেন সুস্পষ্ট সুস্থির করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, চক্ষু দিয়া দেখিতে পারি, হাত দিয়া ধরিতে পারি এমন স্থাবর নিরেট করিয়া স্থাপিত করিতেছেন—

চিত্রাপিতারম্ভ ইবাবতস্থে—

ইহা প্রকৃতির ক্ষতিপূরণের দাবী কি না অথবা মানুষের অন্তরাত্মার পূর্ণতা প্রয়াসের দোল, তাহা জানিনা; কিন্তু দৃশ্যটি আশ্চর্য্যকর ও শিক্ষাপ্রদ।

ইউরোপের প্রাণ দুলিয়া উঠিয়াছে

* স্মরণ করুন—A bird in hand is worth two in the bush.

† ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

কুমারীকে ঘিরিয়া, ভারতের চিত্ত রসাপ্লুত নারীকে আশ্রয় করিয়া। কুমারীর চারিদিকে যে প্রহেলিকা, যে অপরিচয়ের অভিনবের অতর্কিতের খেলা, সব ইউরোপ তাহাতে মুগ্ধ। ভারত বোধ হয় একটু ধীর গম্ভীর স্বভাব, বালসুলভ চপলতা বলিয়াই হয়ত ইউরোপের এই মোহ-রচনাকে, এই আলো-আধার সন্দেহ-নিশ্চিতের লুকোচুরিকে, উপভোগ করিবার উদ্যোগে সে কিছু করে নাই। তাহার পরিণীতার মধ্যে যে আনন্দ সুস্থির নিবিড় গম্ভীর স্ফুট ও স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে, অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সহধর্ম্মিণীকে বেড়িয়া যে তৃপ্তি নিত্য প্রমাণিত, স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ, সেইখানে ভারত তাহাই চাহিয়াছে! তরুণ ইউরোপ অভিজ্ঞার অনুভবের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া—তাই কৌতূহলে বিস্ময়ে সে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, হাত বাড়াইয়া দিয়াছে আরও আরও'র দিকে, পাওয়া জিনিষের মধ্যে প্রাণ বাঁধিয়া দিতে গেলেই সে মনে করিয়াছে, সব শেষ হইল। ভারত বোধ হয় না-পাওয়ারও শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাই না-পাওয়ার ভয় তাহার নাই, ফিরিয়া বুঝি তাই পাওয়ার মধ্যেই সব পাইয়াছে। কুমারী-পূজাকে ইউরোপ তাহার ধর্ম্মের মধ্যেও লইয়া গিয়া বসাইয়াছে—খৃষ্ট ধর্ম্মের শীর্ষে ভর্জ্জিন মেরী (Virgin Mary); ভারতে দেখি একসাথে অভিন্ন দেব ও দেবী, যুগল মূর্ত্তির পূজা।

প্রেম-জীবনে ইউরোপের 'রোমান্স' (রস বা রাসলীলা) মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; ভারতের প্রেমের লীলা আরম্ভ হয় কিন্তু মিলনের পর হইতে। এ কথা বহু পূর্ব্বে অনেকেরই চোখে পড়িয়াছে যে ভারতীয় সাহিত্য ও উপন্যাসের গোড়া পত্তন বিবাহ দিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যে বিবাহ হইতেছে, পঞ্চমাঙ্ক—যবনিকা। দুইটি অজানা অচেনা হৃদয় কোথা হইতে ক্রমে আসিতেছে, পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, উভয়ের মধ্যে কি রকম একটি সূক্ষ্ম উর্ণনাভের সূত্র প্রথমে দেখা দিল, পরে তাহা সুবর্ণ শৃঙ্খলে পরিণত হইল—এই ইতিহাস দিয়াছে ইউরোপের সাহিত্য। প্রেমজীবনের এই অংশ ভারতবর্ষ হয় ত একেবারে স্রেফ বাদ দিয়া গিয়াছে অথবা খুব সামান্যভাবে উল্লেখ করিয়াছে, পরের অংশটিতে ফুটাইয়া ধরিবার জন্য। দুইটি হৃদয় একত্র হইলে পর, একটি অন্যটির সাথে মিশিবার পর কি রকমে লেনা-দেনা করিতেছে, কি ভাবে সেই মিলনের প্রকাশ করিতেছে, তাহারই চিত্র দিতেছে ভারতবর্ষ। দুইটি অন্তরাত্মার স্পর্শ কি করিয়া হইল, তাহার রহস্য পাই পাশ্চাত্যে; এই স্পর্শের পর দুইটিতে মিলিয়া কি ভাব কি লীলা ফলাইয়া তুলিতেছে, তাহার বার্ত্তা পাই প্রাচ্যে। অথবা, সাধনার কথা যেন বলিতেছে তরুণ সাধক ইউরোপ আর সিদ্ধির কথা বলিতেছে সিদ্ধপুরুষ ভারতবর্ষ।

পূর্ব্বরাগে অনুভব করি না-পাওয়া জিনিষের পাওয়ার চেষ্টায় যে আনন্দ; অনুরাগে বা উত্তর রাগে অনুভব করি পাওয়া জিনিষের সম্ভোগে যে আনন্দ। পূর্ব্বরাগ যেন 'রোমান্টিক' আনন্দ-আর উত্তর-রাগ যেন রিয়ালিষ্টিক বা বস্তুতান্ত্রিক আনন্দ। মানুষ একদিকে অসীম—সে চাহিতেছে কেবলি ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া চলিতে, পিছনের সকল বন্ধনকে ছিঁড়িয়া নিত্য-নূতনের দিকে

আগুয়ান হইতে; এই অসীমের বাঁধনহারার একান্ত মুক্তির রস ভিয়াইয়া উঠিয়াছে পূর্ব্ব-রাগের মধ্যে। কিন্তু আর একদিকে মানুষ সসীম—নিকটের পরিচিতের বন্ধনের মধ্যে সে চাহিতেছে শান্তির তৃপ্তির ভুক্তির আনন্দ —ইহাই উত্তর-রাগের দান। কোন্‌টিকে ছোট, কোন্‌টিকে বড় বলিব? অনিশ্চিতের আনন্দ অফুরন্ত চির-নূতন; নিশ্চিতের আনন্দ কি ফুরাইয়া যায়,পুরাতন জীর্ণ হইয়া পড়ে'ই? অসীম আনন্দ কি কেবল অসীমের মধ্যেও, সসীমের মধ্যেও কি অসীম আনন্দ থাকিতে পারে না?

পূর্ব্ব-রাগ পূজা করিতেছে মানস-সুন্দরীকে। যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব-রাগ ফলিয়া উঠিতেছে, তাহা আশ্রয় মাত্র; আমার ভিতরের আনন্দ আকাঙ্খা রসলিপ্সা চাহিতেছে একটা তৃপ্তি—এ তৃপ্তির খোরাকি বলিয়া বাহিরের একটা আধারকে জড়াইয়া ধরিয়াছি, কারণ সেই বাহিরের আধারের মধ্যে ভিতরেরই ঈপ্সিত জিনিষের একটা কিছু ছায়া হয় ত দেখিয়াছি; কিন্তু প্রকৃত তৃপ্তি আসিতেছে সেই ভিতরের আনন্দেরই একটা রোমন্থনে; কারণ বাহিরটার সাথে নিবিড় পরিচয় এখনও হয় নাই, এখনও তাহা দূরে দূরে, তাহাকে ভিতরের ইচ্ছামতেই প্রতিনিয়ত গড়িয়া তুলিতেছি, তাহার উপর রং ফলাইতেছি। পূর্ব্বরাগের প্রেমাস্পদ সীমার ভিতরের প্রেমেরই সৃষ্টি—দেবী, কল্পনাময়ী। অনু-রাগের আনন্দ কিন্তু এ রকম একদিকের আনন্দ, আত্মগত তৃপ্তি—আত্মরতি নহে; অনু-রাগের আনন্দ যে বাহিরের বস্তুটির স্পর্শে স্পর্শে গড়িয়া ঢালাই হইয়া উঠিতেছে—সেখা আমি প্রেমাস্পদকে গড়িতেছি না, আম প্রেমাস্পদও আমাকে গড়িতেছে, উভ উভয়কে আপনার মত করিয়া লইতে পূর্ব্ব-রাগে আমার অন্তরের তৃষ্ণা যখন যে চাহিতেছে, একটা নিমিত্তকে ধরিয়া তখ সেই রকম রস তৈয়ার করিয়া লইতেছে— তাই পূর্ব্বরাগ চিরনূতনকে জন্ম দিতেছে, তা তাহা কেমন নিত্য সজীব সবুজ! কি অনুরাগেও আছে একটা 'তিলে তিলে নূত হোয়।' প্রেমাস্পদকে যখন ধরিতে পারি পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় আশ্লেষে মিশাইয়া লইতে পারি, লক্ষ লক্ষ যুগ নয়নে নয়ন হিয়া হিয়া রাখিতে পারি, তবুও যে সে আনন্দ ফুরাইয়া যায় না, পুরাতন হইয়া পড়ে না তাহার কারণ প্রেমের রসায়নে প্রেমে আধার উভয় বস্তুর মধ্যেই নব নবোন্মেষ ঘটিতেছে—এ শুধু ভিতরের রঙিল দৃষ্টি দিয়া বাহিরকে দেখা নয়, এখানে আছে বাহিরে পদার্থের মধ্যেই একটা নূতন নূতন রংএ বিকাশ ও লীলা। অনু-রাগে এই উভয়ে মধ্যে চলিতেছে যে নব নব বস্তু-সৃষ্টি, তা যখন বন্ধ হইয়া যায়,তখনই অনু-রাগের আনন্দ শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে; ঠিক সেই রকমেই পূর্ব্ব-রাগের মানস-সৃষ্টি যতক্ষণ বাহিরে বস্তুটির সাথে বুঝা-পড়া করে, যতক্ষণ অতি নিকটে বাস্তব-সংস্পর্শে আসিয়া সংঘর্ষের ফলে অলীক বলিয়া না ধরা পড়ে, ততক্ষণই তাহা অলৌকিকত্ব বজায় থাকে।

পূর্ব্বরাগে প্রেমাস্পদকে ধরিতে ছুঁইতে আপনার বলিতে পারি নাই, কাজেই সেখানে আছে হারাইবার আশঙ্কা; এই আশঙ্কাই

পূর্ব্বরাগের আনন্দে দিয়াছে একটা তীব্রতা। অনুরাগে হারাই-হারাই ভাব যে আছে, তাহারও পিছনে গোপনে আছে, কিন্তু একটা অকাট্য অচ্ছেদ্য বন্ধনের অনুভব, একটা শাশ্বত পাওয়ার নিশ্চয়তা; অনুরাগে পূর্ব্বরাগের সে তীব্রতা, সে ঝাল নাই, সেখানে আছে প্রসাদ-গুণাত্মক গভীরতা—বোধ হয় ত তাহার নাম মিষ্টতা। মরীচের আচার ভাল না রসগোল্লা ভাল, এ কথার উত্তর কোন রুচি-বিশারদ এক কথায় দিতে পারেন? সে যাহা হউক, যে জিনিষের উপর অধিকার আমার যত কম, সে জিনিষের মূল্য আমার কাছে তত অধিক; আবার যে জিনিষ আমার পূর্ণ-অধিকারে, তাহারও মূল্যের সীমা নাই। জিনিষ দুই রকমে মূল্যবান—এক দুর্ম্মূল্য,আর এক অমূল্য—হীরা জহরৎ দুর্ম্মূল্য, জল-বাতাস অমূল্য। হীরা জহরৎ সহজে পাই না বলিয়া মূল্যবান, জল-বাতাস সব সময়েই আমার বলিয়া মূল্যবান। বলিতে পারি না কি পূর্ব্বরাগের আনন্দ দুর্ম্মূল্য, অনুরাগের আনন্দ অমূল্য?

আর এক হিসাবে কিন্তু অনুরাগেই হারাইবার আশঙ্কা বেশী, পূর্ব্বরাগে হারাইবার আশঙ্কা কম; তখন অনুরাগেরই মধ্যে পাই একটা তীব্রতা, আর পূর্ব্বরাগের মধ্যেও পাই একটা স্নিগ্ধতা। পূর্ব্বরাগে দানের মাত্রাটা বেশী, প্রতিদানের প্রশ্নটা গোড়ায় ওঠে না, ক্রমে ক্রমে যখন অনুরাগের দিকে গড়াইয়া পড়ে, তখনই সেটা মাথা তুলিয়া খাড়া হইতে থাকে। পূর্ব্বরাগে আমি কেবল আমাকে দিয়া দিতেছি, ভালবাসিয়াই আমার তৃপ্তি—তখন মনে হয়,

Sweeter to love than to be loved.

যেখানে প্রতিদানের অপেক্ষা নাই, সেখানে ত হারাইবারও কিছু নাই, আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া উৎসর্গ করিয়াই চিত্ত এক স্নিগ্ধ ভাবের নেশায় মশ্‌গুল। অনুরাগে কিন্তু দানের মাত্রা যতখানি, প্রতিদানের মাত্রাও সে ততখানি চায়—দিই যতখানি, আমি চাইও আবার ততখানি। দেওয়াটা আমার উপর নির্ভর করিলেও করিতে পারে কিন্তু পাওয়াটা ত আমার উপর নির্ভর করে না, অথচ পাওয়া চাই—নতুবা অনুরাগের বন্ধন শিথিল হইয়া বা টুটিয়া যায়। কাজেই আশঙ্কা উপস্থিত হয়, পাইতেছি কি না, পাইব কি না, তাই 'নিমিখে নিমিখ হারাই।'

যে স্পর্শ দিয়া অনুরাগের পত্তন, তাহা হাজার হইলেও বাহিরের জিনিষ—সেখানে দুইটি সত্তা পূর্ব্বরাগে যেমন, তেমন দূরে দূরে না থাকিলেও তখনও সম্পূর্ণ মিলিত হয় নাই, উভয়ে উভয়কে ছুঁইয়া আছে বটে, কিন্তু বাহিরে বাহিরে তাহারা ওতঃ-প্রোত মিশিয়া যায় নাই। কাজেই বলিতে হইবে অনুরাগের মধ্যেও পূর্ব্বরাগেরই একটা জের বা রেশ তখনও চলিতেছে—অনুরাগের মধ্যেও পূর্ব্বরাগেরই প্রতিচ্ছবি দেখা যাইতেছে। এই দিক দিয়া দেখিলে পূর্ব্ব-রাগ ও অনু-রাগের মধ্যে একটা কাটাছাঁটা পার্থক্য কিছু পাই না। সব রাগ বা ভালবাসার ধরণ-ধারণ একই রকম দেখিতে পাই—এখানেও যাহা সেখানেও তাহা, সেখানে যাহা এখানেও তাহা—আলো-ছায়ার তার-তম্য হয় ত একটু-আধটু কেবল নির্দ্দেশ করিতে পারি।

তবুও পূর্ব্বরাগে আছে একটা মোহ,

অনুরাগ যাহা দিতে পারে না। বিবেকানন্দ মা কি তাঁহার জীবনের শেষাশেষি একদিন বলিয়াছিলেন, "বিবেকানন্দের চেয়ে নরেন্দ্রনাথই বড় ছিল।" তৃপ্তির খোঁজে চলিলেও মানুষের কেমন ঝোঁক আছে অতৃপ্তির উপর—শেষের সিদ্ধির দিকে চলিতে চলিতেও সে চায় আরও কিছু পথ আরও সাধনা। সীমার মধ্যে সান্তের মধ্যে অসীমকে 'অনন্তকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মানুষ যে সীমার দ্বারা সান্তের দ্বারা অতিমাত্র পীড়িত, তাই তাহার প্রাণ চায় অসীমের অনন্তেরই মধ্যে অসীমকে অনন্তকে ধরিতে অথবা ধরি-ধরি করিয়াও না ধরিতে। মানুষ সর্ব্বাবস্থায় চায় তাই একটা মুক্ত যাযাবর ভাব।

বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও মুক্ত হওয়া যায় তবুও জীবন্মুক্তি অপেক্ষা কৈবল্যমুক্তিই মানুষের প্রাণকে বেশী আকৃষ্ট করে, মাতাইয়া তোলে। গৃহী হইয়াও ত্যাগী হওয়া যায়, তবুও সন্ন্যাসকেই লোকে বুঝে ভাল। পূর্ব্বরাগে আর অনুরাগে একই আনন্দ খেলিতেছে বোধ হয়; তবুও মানুষের মধ্যে একটা কি পূর্ব্বরাগের উপরই ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়! আমাদের ভারতে পূর্ব্বরাগের রোমান্স খেলিয়া উঠিবার তেমন সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, মানুষের প্রকৃতি সেখানেও আপন পথ তৈয়ার করিয়া লইয়াছে—পূর্ব্বরাগের পরিবর্ত্তে তাই 'পরকীয়া'।

পরিশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের ভাল-মন্দ আমরা বিচার করি নাই, সমাজের কল্যাণ-কল্পে অথবা ব্যষ্টির শ্রেয়ের পক্ষে কোন্‌টির মূল্য কি, তাহা আমরা মোটেই নির্দ্ধারণ করিতে চাহি নাই, আমরা বিষয়টি দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি ব্যক্তিগত প্রেয়ের দিক দিয়া। আমাদের এই দেখিবার ভঙ্গী যদি কাহার মনঃপুত না হয়, তবে আমরা নাচার।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

কলিকাতা।

চক্র

৪

দিন এমনি করিয়াই কাটিতে লাগিল। মানুষের শরীরের কোথাও যদি একটা মস্ত ক্ষত থাকে ত, বাহিরে হাজার চাপা দিলেও একটু নড়া-চড়াতেই তাহাতে চাড় লাগে! কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাস সেটাকেও কালে সহনীয় করিয়া তোলে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকটে অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতারিত হইয়া বিপিনবিহারী ও জগদ্ধাত্রী মর্ম্মে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, প্রচণ্ড একখানা ক্ষতের মতই সে আঘাতের বেদনা তাঁহাদের চিত্তে চিরসঞ্চিত হইয়াই রহিল; কিন্তু কালের প্রলেপ যে উহার দাহজ্বালা অনেকখানি প্রশমিত করিয়া দিয়াছে তাহা তাঁহাদের মুখের সুস্থভাবেই ব্যক্ত হইতেছিল। বিশেষ জগতের সর্ব্বপ্রধান শোক চিরাগত প্রিয়

তমের অভাবও মানুষ যখন সহনীয় করিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে, তখন এ'তো তবু তাঁহাদের অপ্রতিবিধেয় দুঃখ নয়। ছেলে বাঁচিয়া আছে, হয় ত সে সুখেই আছে! চাই কি—এমনও আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে একদিন সে নিজের ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া মা-বাপের কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিবে।

কয় বৎসরে বিনয় ও ঊর্ম্মিলার মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। বিপিনবাবুকে বুড়ি করিয়া যদিও এখনও তাহাদের চোর-চোর বা জলডেঙ্গা-ডেঙ্গি খেলা হইয়া থাকে, তবু সদরের বাগানে এখন আর সে খেলা চলে না; তাহার পরিবর্ত্তে অন্দরের সুবৃহৎ আঙ্গিনা বা ছাদ রঙ্গভূমির স্থান অধিকার করিয়াছে। কলহ-বিবাদ উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র কমে নাই বটে, তথাপি মারামারি এখন তাহাদের নিত্য-কর্ম্ম নয়, কদাচিৎ তাহা ঘটে। এদিকে ঊর্ম্মিলার খাটো চুল লম্বা হইয়া প্রায় পিঠ ছাড়াইয়া পড়ে, সেই চুলে আজ-কাল সে চিরুণী গুঁজিয়া মাথাজোড়া খোঁপা বাঁধে। তাহার সর্ব্ব-শরীরের অপূর্ণতা এখন দেখিতে দেখিতে বর্ষায় জল-নামা পাহাড়ে-নদীর মত ভরিয়া উঠিতেছিল।

ঊর্ম্মিলার মামার বাড়ী নিকটেই,—ঘণ্টা কয়েকে ঘোড়ার গাড়ী বা নৌকায় করিয়া যাওয়া যায়। মাঘ মাস। মামাতো ভাইএর বিবাহে দিন-কয়েকের জন্য সে মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ীর ভিতরের কয়েকটা ভাল ঘরের মধ্যে একটার সাজসজ্জায় আগাগোড়া পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে ঘরখানা অব্যবহার্য্য রূপে কতকগুলা সিন্দুক-বাক্সের ও ছেঁড়া গদি-বালিসের গুদাম হইয়া অনেক দিন হইতেই পড়িয়াছিল। হঠাৎ আজ সেখানে বেশ এক লোভনীয় শোভনতা বিরাজ করিতেছে! ঊর্ম্মিলা কৌতূহলী হইয়া ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল, এবং ইহার চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

তা ঘরখানায় দেখিবার জিনিসও নেহাৎ কম ছিল না। প্রশস্ত কক্ষের এক পাশে এক-খানা ঝক্‌ঝকে পালঙ্ক, তাহাতে একটী ধবধবে বিছানা—দেখিলেই ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে;—মসারিটা—মা এই সেদিন যেটি সেলাই করাইয়াছেন! ঐ মতলবে বুঝি করা হইয়াছিল? ঘরের অপর দিকে খাটখানার ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি ঘরের মেজেয় খুব বড় গোছের একখানা পার্সিয়ান কার্পেট পাতা। তার কোণ চারিটায় ফুটন্ত গোলাপ এবং মধ্যস্থলে একটা সতেজ সবল আরবী ঘোড়া আঁকা। ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকাইয়া সাম্‌নের এক পা তুলিয়া দৌড়িবার জন্য উদ্যত ভঙ্গীতে অঙ্কিত হইয়াছে। এখানা সচরাচর মায়ের বিছানা-তোলা চালুনিতে তোলা থাকে। কার জন্য নামানো হইয়াছে? এ আবার কি! বাহিরের ঘরের একটা ছোট টেবিল মাথায় কালো বনাত আঁটা, এদিকে-সেদিকে সাতটা খাপ-খুবরি টানা দেরাজ, সেটাও যে আসিয়াছে। ঊর্ম্মিলা চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে দেখিল, সেই টেবিলটার উপর বিনয়কুমারের সযত্ন-সঞ্চিত এবং ঊর্ম্মিলার বহুদিনকার বিশেষ লোভনীয় অনেকগুলি পদার্থ, যথা, আগ্রার শ্বেত প্রস্তরের তৈয়ারী প্রবাল কারু-খচিত

কাগজ-চাপা, দোয়াতদান, কাশী হইতে শ্বশুর কর্ত্তৃক আনীত পিতলের দোয়াত-কলম, চুনারের ফুলদানি ইত্যাদি সাজানো রহিয়াছে!

"বাঃ! বাঃ! ও হচ্চে কি? দেখো, যেন আমার জিনিষ সব লোপাট করে ফেলো না।"

"আমি যেন চোর! তোমার জিনিষ চুরি করতেই এসেছি! না?"

ভীষণভাবে ভীষণ অভিযোগের এই প্রত্যুত্তর দিয়া উর্ম্মিলা স্প্রিং-এর মত ছিট্‌কাইয়া ফিরিয়া আততায়ীর সহিত ঠিক মুখামুখী দাঁড়াইল। তাহার মুখে-চোখে যে ভাব ব্যক্ত হইতেছিল, তাহাতে আহতের আঘাতটা যে কোন্‌খানে, সেটুকু বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। সহস্রবার পূর্ব্বারোপিত চৌর্য্যাপবাদ যে উর্ম্মিলাকে এমন অতর্কিত অগ্নিশিখায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিল, তাহার স্বামীটির মনের প্রান্তে এক লহমার জন্যও এমন অন্যায় বিশ্বাস জাগে নাই; কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই সে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "তার পরে উর্ম্মিলাসুন্দরি, কখন আসা হলো? টুক্ টুক্ করে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চো কি? এ ঘর আমার! শুধু আমার একলার। এই টেবিলে বসে এবার থেকে আমি একলাই লেখাপড়া কর্‌বো। ঘুম পেলে ঐ খাটে শুয়ে একা ঘুমিয়ে পড়বো।—"বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া বারেক টেবিলের সাম্‌নের চৌকিখানা টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল, এবং আবার তখনই উঠিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে খাটের সম্মুখে আসিয়া চটিজুতা জোড়াটা খুলিয়া ধপাস করিয়া তদুপরি শুইয়া পড়িল; তারপর পরাজিত এবং একান্ত বিমর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে গৌরব-দীপ্ত সহাস্য চক্ষুদ্বয় ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌লিতো? এ সব আমার!"

উর্ম্মিলার মুখ ঈর্ষায় কালো হইয়া উঠিল। সে সন্দিগ্ধ ভগ্ন কণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমাকে এ সব দিলে?"

"কে আবার! আমার মা দিয়েছে।" শুনিয়া উর্ম্মিলা জ্বলিয়া উচ্চ চীৎকারের স্বরে ডাকিয়া উঠিল, "মা, মা!" এবং ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক দ্বারের বাহির হইতেই যেমনি মায়ের সাড়া আসিয়া পৌঁছিল, এবং সস্নেহে হাসিমাখা সস্নেহ চোখে চাহিয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন, অমনি দুর্জ্জয় ক্রোধ ও অভিমানের সমুদ্র উর্ম্মিলার অপমানাহত ক্ষুব্ধ বক্ষে উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং এইরূপে শাশুড়ীকে জানাইয়া দিল যে সে তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছে।

জগদ্ধাত্রী এ সব মান-অভিমানে বেশ অভ্যস্ত আছেন। দুই-এক বৎসর পূর্ব্বে ইহারা স্পষ্টবাক্যে তাঁহাকে জানাইয়া দিত যে, "আমি তোমার উপর রাগ করিয়াছি।" এখন আর সেরূপ করে না, কিন্তু এই একটা ভাবে এখনও নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে।

কাছে আসিয়া খপ্ করিয়া বধূর মাথা বুকে টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "রাগ হলো কেনরে?"

উর্ম্মিলা জবাব দিবে না মনে করিয়াছিল; তবুও আচম্‌কা ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "যাও; আমি তোমার সঙ্গে কথা কবো না।"

মা আবার হাসিয়া বলিলেন, "কেন রে পাগলী?"

"কেন রে পাগলী, বই কি!—কিছু যেন জানেন না!" উর্ম্মিলা নিজের পুঁটে ঘেরা খোঁপাশুদ্ধ মাথাটা শাশুড়ীর কবল হইতে মোচন-চেষ্টায় একটা ঝট্‌কা মারিল। খোঁপায় আঁটা কানকাঁটার ঘুঙুরগুলা অমনি ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

খাটে শুইয়া বিনয় এতক্ষণ হাসিয়া কুটি-কুটি হইতেছিল। সে মায়ের পরাভব দেখিয়া অধিকতর আনন্দ অনুভব করিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বুঝতে পারচো না? আঃ, আমার এই ঘর দেখে তোমার পাগলি হিংসেয় জ্বলে মরচে!"

"ইঁ্যারে মা?"

"যাও, আমি তোমার মা নই, আমার বাবার মা। তুমি নিজের ছেলেটীকে ঘর-টর সব দিয়েছ। আমায় দিয়েছ কি?"

গৃহিণী হাসিয়া সস্নেহে বধূর ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "নে' পাগল, তোরই তো সব।"

উর্ম্মিলা সবেগে মুখখানা সরাইয়া লইয়া উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "ও সব বাজে কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। আমায় একটা ঘর দেবে কি না, শীগ্‌গির বলো?"

বিনয় তাড়াতাড়ি খাট হইতে উঠিয়া মার দিকে ছুটিয়া আসিয়া দুইহাত জোড় করিয়া উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, "দিও না মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, ওকে দিও না।"

মা বলিলেন, "সে কিরে, ও যে আমার ঘরের লক্ষ্মী! তা এ ঘর তো তোদের দুজনকেই দিয়েছি। এইখানে আজ থেকে তুইও তো রাত্রে শুবি রে পাগলি।"

বিনয় অমনি মহাশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও বাবা রে! সে হচ্ছে না। ওকে আমি আমার ঘরে শুতে দেবো না। ওর মাথার তেলে আমার ঘরের বালিস নোংরা হয়ে যাবে, ওর মল-পরা পা আমার ঘাড়ে এসে চড়বে—সে আমি পারবো নারে বাবা!"

মহা অপমানিত, কোপে আরক্ত হইয়া উঠিয়া উর্ম্মিলা শাশুড়ীর গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সতর্জ্জনে বলিল, "মা, তুমি জানো ত, ঘুমুতে ঘুমুতে কে ঘাড়ে এসে পড়ে! সারা রাত তোমায় পাশ বালিস করে আঁকড়ে ধরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়! তবু কি না তুমি বল্‌চো আমায় তার সঙ্গে শুতে? বেশ ত তুমি মা!"

মা বলিলেন, "ওরে, তোরা যে বড় হচ্চিস্, চিরদিনই কি মার আঁচলের তলায় থাকবি?"

বিনয় বলিল, "তা থাকি আর নাই থাকি, তা বলে তো আর ওই রাক্ষুসীর আঁচল ধরতে পারিনে!"

ইহার শোধ লইবার জন্যই উর্ম্মিলা পাল্টা গাহিল, "বাপ্‌রে! ছেলে যা নাক ডাকান, রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে কতদিন যে আমি ভয় পাই, তা বলতে পারিনে। আমি অমন সাপের গর্ত্তর শুতে চাইনে, আমায় একটা আলাদা ঘর তুমি দেবে কি না, বলো? দেবে? আচ্ছা, তবে এক্ষনি দেবে, এসো।"

৫

"বাবা, তোমার আজ চান করতে

আসতে বেলা হয়েছে। হবেই তো, এখন তো আর আমার বৈঠকখানায় গিয়ে তোমায় ধরে আন্‌বার যো নেই।"

"নারে পাগলি, বেলা কেন হবে! ঠিক সময়েই এসেছি।"

"কক্ষণো নয়, অনেক বেলা হয়ে গেছে। নিজের ঘড়ি দেখ। আন্‌বো ঘড়ি?"

"না, থাক্। আচ্ছা, কাল থেকে—"

"সে তোমার দ্বারা হবে না বাবা, দেখই না একবার কত বেলা হলো।"

"তবে আন্।"

ঊর্ম্মিলা উৎসাহ-সহকারে ঘড়ি আনিয়া সম্মুখে ধরিলে বিপিনবিহারী দেখিলেন, বহুমূল্য সুদৃশ্য ঘড়িটী টুকরা-টুকরা করিয়া ভাঙ্গা! বিস্মিত হইয়া বধূর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! ঘড়ি কেন ভাঙ্গা, মা? তুই ভেঙ্গে ফেল্লি নাকি?"

বধূ নীরবে মাথা নাড়িল, না।

বিপিন বাবু ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে ভাঙ্গলো কেমন করে? একেবারে দফা রফা হয়ে গেছে যে! জানো, কে ভেঙ্গেছে?"

বধূ মস্তক হেলাইয়া জানাইল, জানে। আর কিছু বলিল না।

তখন বিপিনবাবু বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "বিনে? নিশ্চয় এ সেই বিনে হতভাগার কাজ! রাস্কেলটা গেল কোথায়?"

বিনয় অত্যন্ত গম্ভীর মুখে আসিয়া বলিল, ঘড়ি সে ভাঙ্গে নাই। কে তাহাকে ভাঙ্গিতে দেখিয়াছে? এই কথা বলিয়াই ঊর্ম্মিলার চোখের উপর চোখ পড়িতেই হঠাৎ সে থতমত খাইয়া ঢোক গিলিতে লাগিল।

ঘড়ি ভাঙ্গা এবং মিথ্যা বলা,—এ দুইটা অপরাধের জন্যই বিপিনবাবু ভৎর্সনা করিয়া ছেলেকে বিদায় দিলেন। দোষ স্বীকার এবং মিথ্যার জন্য বাপকে তাহার সেই অগ্নি দৃষ্টিরই অনুরূপ কটাক্ষ করিয়া দুমদুম্ শব্দে পা ঠুকিয়া সে চলিয়া গেল। পুত্র ঘরের অন্তরালে গেলে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিপিনবাবু আত্মগতভাবেই বলিলেন, "দুটোই সমান গোঁয়ার! এটারও মানুষ হবার লক্ষণ দেখ্‌চি নে।"

স্বামীর সেই কোপদৃষ্টি এবং নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া সারাদিন ঊর্ম্মিলা লুকাইয়া বেড়াইল; কিন্তু এখন আর যেন সে এমন করিয়া অপরাধের বোঝা বহিয়া বেড়াইতে পারিতেছিল না। এইবার স্বামীর নিকট ধরা দিয়া কৃত কার্য্যের শাস্তি বহন করিতে প্রাণ তাহার উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। রান্না-বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে বাহির হইয়া আসিল; অন্তরালে থাকিয়া আততায়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে চিত্ত তাহার বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিতে লাগিল এই জন্য যে, এই একটু পূর্ব্বেই এরূপ স্থলে যেমন ঘটিয়াছে, এবার তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না! বিনয় তর্কে তর্কে ঊর্ম্মিলার সন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে এবং তাহাকে বাহির হইতে দেখিলেই বাঘের মত গর্জ্জিয়া আসিয়া পড়ে! তারপর দুইজনে হুড়াহুড়ি মারামারি—সে সব অনেক কাণ্ডই ঘটিয়া যায়। কিন্তু আজ তার কিছুই হইল না। গোপন আবরণ ছাড়িয়া অবশেষে

যখন কি সারা বাড়ীটাই ঊর্ম্মিলা ঘুরিয়া খুঁজিয়া আসিল, শত্রুপক্ষের দেখা নাই। ব্যাপার কি? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও ভরসা হয় না,—যদি ঠিক সেই সময়টিতেই সেই ব্যক্তি আসিয়া পড়িয়া তাহার কথা শুনিতে পায়!

সন্ধ্যার পর কি একটা দরকারে উপরে ভিতরকার বারান্দার দিকে যাইতে যাইতে ঊর্ম্মিলা দেখিল, বিনয়ের ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়াই তাহার বিষণ্ণ মুখে কমনীয় আলোই জ্বলিয়া উঠিল এবং হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তিন লাফে দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়াই সে মলের শব্দ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি পুস্তকের পৃষ্ঠায় অখণ্ড মনোযোগ-নিবন্ধন বিনয়-কুমারের দৃষ্টি তাহার পানে ফিরিল না। বোধ করি চারগাছা মলের সে খন্ খন্ রব তাহার কর্ণগোচর না হইয়াই থাকিবে!

ঊর্ম্মিলা নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের কোন সুযোগ খুঁজিয়া না পাইয়া খোলা দরজাটাকে টানিয়া ঝনাৎ করিয়া বন্ধ করিল। তারপর তাহাতেও বিপক্ষ পক্ষকে অটল দেখিয়া অসহিষ্ণু ধৈর্য্য-হারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া যে চৌকিখানায় সে বসিয়াছিল, সেইখানার হাতা ধরিয়া বিপুল বলে একটা ধাক্কা দিল; পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া বিনয় তখন ঘুরিয়া বসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খবরদার! আমার ঘরে ঢুকেছ কি ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছি!"

ঊর্ম্মিলা আসিয়াছিল ক্ষমা চাহিতে, কিন্তু পূর্ব্বের সমস্ত সংকল্প নিজেই যখন মাটি করিয়া ফেলিয়াছে, তখন বাকীটুকুও বিস্মৃত হইয়া তেমনি খর দীপ্ত হইয়া উঠিয়া জবাব দিল, "ইস্—তোমারই না কি একলার ঘর! মা বলেছে, আমারও এতে ভাগ আছে। শুধু তাই নয়; তোমার সব জিনিষেই আমার ভাগ আছে।"

বিনয় নিজের নামের সম্মান সম্পূর্ণ ভুলিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "বেরোও বল্‌ছি, এ ঘর থেকে, ভাল চাও তো এখনি বেরোও! আমি 'স্পাই'কে আমার ঘরে ঢুকতে দিইনে।"

এ কথায় ঊর্ম্মিলার অহঙ্কার-প্রদীপ্ত মুখের ছবি মুহূর্ত্তে রাহুগ্রাস-কবলিত শশাঙ্কের মতই নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

তানপুরা

আমাদের দেশে সঙ্গীতের সহিত সঙ্গতের জন্য তানপুরা যন্ত্রটি সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। ইহার বহুল প্রচলন হইলে সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্যক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। শব্দ-বিজ্ঞানের ও য়ুরোপীয় স্বর-মিল-শাস্ত্রের সহিত তানপুরার সুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রে ও

পুরাণাদিতে কথিত আছে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া পরে ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু ও তুম্বুরু এই পাঁচ শিষ্যকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন।

"ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তুম্বুরুমেবচ।
পঞ্চ শিষ্যাংস্ততোঽধ্যাপ্য সঙ্গীতং
ব্যাদিশদ্বিধিঃ॥"
নারদ-সংহিতা।

কাহারও মতে এই পঞ্চম শিষ্য তুম্বুরুই প্রথম সৃষ্টি করেন বলিয়া যন্ত্রটির নাম হইয়াছে 'তম্বুরা'। আবার অন্য মতে—এই যন্ত্রে পুরা তান—অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে স্বরের খেলা হয় বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে, 'তানপুরা'। কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "Its use is calculated, as the name indicates, to fill up all pauses and vacuities in the song, and likewise to keep the songster from straying from the tone which he originally adopted."

ইহার ভাবার্থ এই যে, গায়ক যে স্বর ষড়জ করিয়া গান ধরিয়াছেন,—তাহা ঠিক রাখিবার জন্য এবং গানের মধ্যে অন্য স্বরের সাহায্য পাওয়াই তানপুরার প্রধান উদ্দেশ্য।

আজকাল হারমোনিয়ম যন্ত্রের বহুল প্রচলন হওয়ায় ঘরে ঘরেই গায়ক পাওয়া যায়। গান গাওয়া বা স্বর-সাধনা হারমোনিয়ম বা অন্য তারের যন্ত্র, যথা, সেতার, এস্রাজ, বা বেহালা ও সারেঙ্গির সাহায্যে খুব সহজ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে গান শিক্ষা দেওয়া প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও কিছুদিন প দেখা যায়, যে যাঁহারা এই সকল য সাহায্যে গান শিক্ষা করেন বা গা থাকেন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে গা প্রায়ই অক্ষম, গাহিলেও কষ্ট বোধ ক তাহার কারণ এই যে,—তাঁহাদের গলা যন্ত্রের স্বরকে অনুধাবন করে। যন্ত্র এক ছাড়িয়া দিলে গলার দোষ বাহির হইয়া ও তখন তাহা একেবারেই মিষ্ট শুনায় এরূপ গায়ক তানপুরায় গাহিতে অপা বা অনিচ্ছুক,—সেটা কেবল অভ্যাসের দো দিনকতক তানপুরার সহিত স্বর-সাধনা গান অভ্যাস করিলে নিজেই নিজের গ স্বরের বেসুরত্ব বুঝিতে পারিবেন ও আ হইতেই তাহার সংশোধনের চেষ্টা আসিবে।

সঙ্গীত-সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর লোক যায়—যথা, অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও অ যাঁহারা অজ্ঞ তাঁহাদের কোন বালাই না যেটা ইচ্ছা ভাল লাগিল ত বসিলেন,—তা হিন্দি গানই হউক আর বাঙ্গলা গানই হ বা কীর্ত্তনই হউক। তাঁহাদের কোন দেওয়া যায় না।

যত গোল এই অনভিজ্ঞদের লই তাঁহারা শিখিয়াছেন অনেক গান,—হার নিয়মের সাহায্যে বেশ ভাল গান গাহিতে পারেন, সে গাওয়া সকলে পছন্দও ক কিন্তু যন্ত্রটি কাড়িয়া হাতে তানপুরা দি অমনি একেবারে গলার স্ব-রূপ প্রকা হারমোনিয়ম বা অন্য যন্ত্র স্বরের মিষ্টতা গানের মিষ্টতা বজায় রাখে। যদি এ কষ্ট করিয়া কিছুদিন তানপুরার সাহায্যে বা স্বর-সাধনা অভ্যাস করেন, তাহা হ

তাঁহাদের গানেরও উন্নতি হয়, আর সঙ্গীতেরও শ্রাদ্ধ না হইয়া সঙ্গীতের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে।

এ বিষয়ে বালাইও কিছু নাই। কারণ তানপুরা যন্ত্রটি শেখা সহজ, এবং দামেও শস্তা।

গানের আসরে 'তানপুরা' দেখিলে অনেকেই ভয় পান যে এইবার বুঝি গানের কুস্তি সুরু হইবে! সেটা যন্ত্রের দোষ নহে,—সে আমাদের দেশের ওস্তাদরা সঙ্গীতের নামে যাহা খাঁই গলা লইয়া রাগ-রাগিণীর সহিত ব্যবহার করেন বলিয়াই অমন হয়। কোন একটি রাগিণী মধুর রসাশ্রিত হইলেও ব্যায়াম ও বিকট কসরতের চোটে, ভয়ানক বীররসাত্মক হইয়া পড়ে।

আধুনিক সঙ্গীতের মজলিসে আরও একটা দোষ হইয়াছে এই যে, তানপুরা থাকিলেও অনেক ওস্তাদের গানের সহিত হারমোনিয়মও বাজিতে থাকে। ইহাতে অবশ্য গান শুনিতে বেশ মিষ্ট হয় কিন্তু গায়কের গলার স্বরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। এবং যে-সকল রাগিণীর কোমল সুর হারমোনিয়মে পাওয়া যায় না—হারমোনিয়মে তাহা বাদিত হইলে কিরূপ শোনায়, বিশিষ্ট অভিজ্ঞগণ সেটুকু বেশ বুঝিতে পারেন। মনে করুন, কানাড়ার গান্ধার কোমল বা পুরিয়ার রেখাব কোমলের সহিত হারমোনিয়মের ঐ সকল সুর বাজানো হইলে বেসুরা শুনাইবেই, এবং গায়কের গলা হইতে যখন ঐ স্বর বাহির হইবে, তখন তাহা হারমোনিয়মের স্বরের দিকেই ঝুঁকিবে। তাহা হইলে রাগিণীর বিশেষত্ব নষ্ট ও আসল সঙ্গীতের প্রলাপ হইবে।

তানপুরা যন্ত্রটির নিম্নে লাউর খোলের ঠ অংশ—ও তাহার উপরে কাঁপা কাঠের দণ্ড। চারিটি থাকে; মধ্যের দুইটি পাকা ইস্পাতের তার ও পাশের দুইটি পিতলের। উপরে সরু সোয়ারী ও নীচে চওড়া সোয়ারী বা bridge. নীচের সোয়ারীতে তারের নীচে সুতা দিয়া জোয়ারী বা রেশ উৎপাদন করা হইয়া থাকে। প্রথমে কানের সাহায্যে সুর বাঁধিয়া, পরে সোয়ারীর নীচে প্রত্যেক তারের ভিতর যে গুলি বা মেন্‌কা থাকে, তাহা সরাইয়া স্বরের অল্প প্রভেদ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। মেন্‌কা অল্প অল্প সরাইলে তারের টান tension বাড়িয়া বা কমিয়া সুরে মিল করিয়া দেয়। তার পর জোয়ারীর সুতা বা সিল্ক ঠিক যেখানে তার সোয়ারীর উপর ঠেকিয়া থাকে, সেইখানে এক হাতে ১ ইঞ্চি লম্বা, ২ বা ৪ ফের সুতা, ক্রমশঃ টানিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সেই তারটিতে অন্য হাতের এক আঙ্গুল দিয়া পিড়িং পিড়িং শব্দ করিতে হয়। এক সঙ্গেই শব্দ করিতে হইবে ও সুতা সরাইত হইবে,—যতক্ষণ না পিড়িং পিড়িং আওয়াজ বেশ রেশ-যুক্ত শব্দে পরিণত হয়। প্রত্যেক তারেরই কেবল একমাত্র স্থান আছে যেখানে সুতা আসিলে বেশ রেশযুক্ত স্বর ধ্বনিত হয়। জোয়ারী আরও নামিয়া গেলে রেশ বন্ধ হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের "পিড়িং পিড়িং" শব্দ হয়। চারিটি তারেই জোয়ারী বসিতে আরম্ভ করিলে, তার পর আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বা এক হাঁটু আসনে লাগাইয়া ও অন্য হাঁটু উঠাইয়া বসিয়া তানপুরার তুম্বী কোলের উপর করিয়া তারগুলি দক্ষিণ দিকে লইয়া ডাণ্ডী

নামক অর্দ্ধগোল যে লম্বা কাঠ, তাহার মধ্যদেশ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা একদিকে, ও অনামিকা ও কনিষ্ঠা আর একদিকে দিয়া এমনভাবে ধরিবে, যেন তারগুলি করতলে না লাগে। এই প্রকারে ধরিয়া দক্ষিণ কাণের নিকট খাড়া করিয়া রাখিয়া, দক্ষিণ মধ্যমা দ্বারা প্রথম তার ও দক্ষিণ তর্জ্জনী দ্বারা ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তার পর-পর ধ্বনিত করিবে।

ইহাই হইল তানপুরা বাঁধিবার রীতি। মধ্যের তার দুইটি ষড়জে, প্রথম তারটি মুদারার পঞ্চমে ও চতুর্থটি মুদারার ষড়জে বাঁধাই প্রচলিত নিয়ম। যার যেরূপ গলার ওজন, সেইরূপ সুরে ষড়জ বাঁধা উচিত। সেজন্য একটি গলার ওজন হিসাবে সুরের সুর-শলাকা বা টিউনিং ফর্ক ও মুদারার পঞ্চমের ও ষড়জের সুর-শলাকা রাখা উচিত।

তাহা হইলে তানপুরার স্বর এইরূপ ধ্বনিত হইবে, যথা,—

(১) পা, সা, সা, সা—

আরও অন্য রকমে তার বাঁধা হইয়া থাকে। যে রাগিণীতে পঞ্চম বর্জ্জিত, তাহা গাহিবার সময় পঞ্চমের তারটিকে মধ্যমে বাঁধা উচিত,—যেমন মালকোষ, পুরিয়া, মারোয়া, জয়ন্ত, বসন্ত, পঞ্চম, হিন্দোল, সোহিনী, ললিত গাহিবার সময়,—এই সকল রাগিণীতে পঞ্চম সুর বর্জ্জিত বলিয়া প্রথম তারটি পঞ্চমের পরিবর্ত্তে, মধ্যমে বা মা সুরে বাঁধা হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রকার বাঁধার রীতি হইল—

(২) মা, সা, সা, সা।

ইহা ভিন্ন ভিন্ন-ভিন্ন রাগিণী গাহিবার সুবিধার জন্য—আরও চারি প্রকার বাঁধার নিয়ম আছে—

(৩) পা, নি, সা, সা।

ইহা বেহাগ, তিলক কামোদ, বৃন্দাবনী সারঙ্গ এই সকল রাগিণী গাহিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

(৪) গা, সা, সা, সা।

যে সকল রাগিণীর গান্ধার সুর বাদী সেই রাগিণী সকলের বিশেষ উপযোগী।

(৫) গা, নি, সা সা।

যে সকল রাগিণীতে নি, সা, পর প্রায়ই লাগে, অথচ গান্ধার সুর বাদী সমবাদী, সেই সকল রাগিণীর পক্ষে বিশে সহযোগী যথা, ইমন, ও তাহার সম-প্রকৃতি রাগিণীগুলি।

(৬) সা, পা, পা, পা।

ইহাতে প্রথম তারটি ষড়জে, দুটি দুইটি পঞ্চমে ও চতুর্থটি মুদারার পঞ্চমে।

যে রাগিণীতে পঞ্চম সুর বাদী তাহা গাহিবার সময় এইরূপ বাঁধিলে বিশে সুবিধা হয়। তবে এইরূপ সংযোগ করিতে হইলে, জুড়ির তার দুইটি সরু হইলেই ভা হয়, তাহা না হইলে পঞ্চমে বাঁধিতে তা ছিঁড়িয়া যাওয়া সম্ভব।

তানপুরার নীচে যেমন চওড়া সোয়ারী বা bridge আছে, উপরের দিকে সেইরূ না দিয়া সরু সোয়ারী দিবার কারণ এই যে উপরেও চওড়া সোয়ারী ও জোয়ারী দিলে সে আরও বেশী হইতে পারিত, কিন্তু উপরে লাগানো সুতা নীচের দিকে ক্রমশঃ ঝুলিয়া পড়া ও তারের কম্পনের সহিত নীচের দিকে ক্রমশঃ নামিয়া ও সরিয়া আসার সম্ভাব

থাকায়, তারের রেশ খারাপ করিয়া দিতে পারে।

জোয়ারী লাগাইবার প্রধান উদ্দেশ্য, তার যেখানে সোয়ারীতে লাগিয়া থাকে, সেখানে খুব সূক্ষ্মভাবে কাঠের সহিত স্পর্শ করানো। অর্থাৎ স্পর্শের জায়গায় খুব fine touch দরকার।

তানপুরা রীতিমত সুরে বাঁধা হইলে ঘরটি যেন সুরে ভরিয়া যায়। ইহার কারণ কি, ও সঙ্গীত বিজ্ঞান ও স্বরমিল (harmony) শাস্ত্রের কি নিয়ম অনুসারে তানপুরায় সুরের খেলা হইয়া থাকে, তাহা দেখা যাক

সঙ্গীত বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, সা, রে, গা মা পা, ধা নি, এই সাতটিই প্রধান সুর। এবং যে-হিসাবে এই সকল স্বরের কম্পন সংখ্যার ক্রমোচ্চ সাধিত হয়, তাহা পর পর $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{7}{8}$, এই সকল ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিলেই পাওয়া যায়। সা সুরের শব্দের কম্পন-সংখ্যা ১ ধরিলে, রে সুরের শব্দের কম্পন সংখ্যা হইবে $\frac{9}{8}$। আবার রে সুরের কম্পন সংখ্যাকে $\frac{10}{9}$ দিয়া গুণ করিলে গা সুরের কম্পন-সংখ্যা বাহির হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—

সা সুরের কম্পন-সংখ্যা ১ হইলে
রে সুরের কম্পন-সংখ্যা $\frac{9}{8}$, এবং
গা " " " $\frac{5}{4}$
মা " " " $\frac{4}{3}$
পা " " " $\frac{3}{2}$
ধা " " " $\frac{5}{3}$
নি " " " $\frac{15}{8}$
সাঁ " " " ২ হইবে

(তারা)

অর্থাৎ মোটামুটি ও সহজ হিসাবে সা সুরের কম্পন-সংখ্যা ২৪ হইলে, রে গা মা, পা ধা নি সাঁ ২৭, ৩০, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪৫, ৪৮ হইবে।

তারের যন্ত্রের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে—সমস্ত তারের দৈর্ঘ্য ১ ধরিলে, উপরের ভগ্নাংশগুলির বিপরীত যে ভগ্নাংশ হইবে, সেই অংশের তারে হাত দিলে বা ভাগ করিলে পর-পর সুরগুলি বাহির হইবে। যথা,—

সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সাঁ,
১ $\frac{8}{9}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{8}{15}$, ২।

তারের

১, $\frac{8}{9}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{8}{15}$, $\frac{1}{2}$, অংশে
সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সাঁ—

এই সকল সুর ধ্বনিত হইবে। দেখা যাইতেছে যে সম্পূর্ণ তারে সা ধ্বনিত হইলে তাহার $\frac{1}{2}$ অংশে অর্থাৎ ঠিক মধ্যে তারার সাঁ ধ্বনিত হইবে; $\frac{2}{3}$ বা অপরদিক হইতে $\frac{1}{3}$ অংশে মা ধ্বনিত হইবে,—$\frac{3}{4}$ বা অপরদিক হইতে $\frac{1}{4}$ অংশে পা ধ্বনিত হইবে; $\frac{4}{5}$ বা অপরদিক হইতে $\frac{1}{5}$ অংশে গা বাহির হইবে। "অপর দিক" হইতে বলিবার অর্থ এই যে,—তারটি দুই দিকে বাঁধা আছে, যে বিন্দুটি একদিক হইতে সম্পূর্ণ তারের $\frac{1}{2}$ অংশ তাহা অপরদিক হইতে $\frac{1}{2}$ অংশ, কারণ ১—$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$

সেইরূপ $\frac{1}{2}$এর অপর অংশ $\frac{1}{2}$
" $\frac{1}{3}$ " " " $\frac{1}{3}$
" $\frac{1}{4}$ " " " $\frac{1}{4}$
" $\frac{1}{5}$ " " " $\frac{1}{5}$
$\frac{1}{2}$এর " " $\frac{1}{3}$

১/৫ „ „ ১/৫

২/৫ „ „ ২/৫

ইহা বলিবার উদ্দেশ্য তারের কত অংশে পর পর সুর কয়টি ধ্বনিত হয়, যখন সেই সেই অংশে তারটি ছোঁয়া হয়।

খোলা তারে ধ্বনিত হয়——সা

তারের ১/২ অংশ ছুঁইলে ধ্বনিত হয়—রে

„ ২/৩ „ „ „ „ গা

„ ১/৩ „ „ „ „ মা

„ ১/৪ „ „ „ „ পা

„ ২/৩ „ „ „ „ ধা

„ ১/৫ „ „ „ „ নি

„ ২/৫ „ „ „ „ র্সা।

তার যখন ছোঁয়া না হয়, কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তারটি বাজাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন শব্দবিজ্ঞানের নিয়ম-অনুসারে প্রথমে পুরা তারটি ধ্বনিত হইলে, সা সুর বাহির হয়, তার অব্যবহিত পরেই তাহার ১/২ অংশ ধ্বনিত হয়, এবং তার পরেই ১/৩ অংশ, তারপর ১/৪ অংশ ইত্যাদি এবং প্রত্যেক অংশ হইতে সেই অংশানুক্রমিক সুর বহির্গত হয়।

অতএব তানপুরার সা সুরের তারটি যখন ধ্বনিত হয়, তৎক্ষণাৎ পর পর এইরূপ ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া, অপূর্ব্ব স্বর-সংযোগ বা harmonyর সৃষ্টি করিয়া থাকে; এবং সেই জন্য তানপুরা বাজিতে আরম্ভ করিলে ঘরটি যেন সুরে ভরিয়া যায়,—

স্া স্ প্ সা গা পা ণি র্সা

১ ১/২ ১/৩ ১/৪ ১/৫ ২/৫ ১/৬

র্সা র্রে র্গা র্পা র্ণি নি র্সা

১/৬ ১/৭ ১/৮ ১/৯ ১/১০ ১/১১ ১/১২

এইরূপ বাড়িয়া গেলে দেখা যাইবে, সব কয়টি সুরই এক সা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আবার পা হইতেও সেইরূপ পাকে সুর ধরিলে, তাহার উপরকার সুর সকল পূর্ব্বের সা সুরের মতই ঐ অনুপাতে বাহির হইবে।

পা তারের সুর, ও সা ও স্া তারের সুর, যেগুলির হার্ম্মনি-শাস্ত্র-অনুসারে মিল সম্ভব, সেই সুরগুলি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। স্বর-মিল শাস্ত্র অনুসারে মিল তিন প্রকার।

(১) উৎকৃষ্ট মিল, best harmony —স্ স্া, সা, র্সা, র্স্া, অর্থাৎ ষড়জে ও তাহার অষ্টমে।

(২) সম্পূর্ণ মিল—perfect concord—

(ক) সা, পা—সুর পঞ্চম

(খ) সা, মা—সুর মধ্যম

(৩) অসম্পূর্ণ মিল—Imperfect concord.

(ক) সা, গা—সুর গান্ধার

(খ) সা,—(ধা কোমল)

(গ) সা, ধা—

(ঘ) সা, জ্ঞা (গা কোমল)

তানপুরার চারটি তারের মধ্যে উপরি-উক্ত সুরের জোড়া দুইটি একসঙ্গে পাইলে harmonyর সৃষ্টি হয়।

এখন বক্তব্য হইতে পারে যে, যখন তানপুরা গ্া, নি, সা, স্া—বাঁধা হয় অথবা প্া, নি, সা, স্া—বাঁধা হয়, তখন নি সা দুইটি তার ধ্বনিত হইলে স্বর-মিল হইতে পারে না, তাহার উত্তর এই যে, নি, সা দুইটি তার ত একসঙ্গে ধ্বনিত হয় না। সুরে বাঁধা তারটি ধ্বনিত হওয়ার পরে

সুরের তার হাতে পড়ে। ততক্ষণ নি সুরের তার, উপরি-উক্ত নিয়ম-অনুসারে, তাহার নিজের স্বরগ্রাম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং সা সুরের তারের সৃজ্য স্বরগ্রামের যে কয়টি সুরের সহিত উপরি-উক্ত হারমনি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে জোড়া মিল হইবে, সেই কয়টি প্রবলত্ব ও মিষ্টত্ব লাভ করিয়া হারমনির সৃষ্টি করিতে থাকে।

চেষ্টার উপর দেখা গেল, সঙ্গীতবিজ্ঞান ও স্বরমিল শাস্ত্র হিসাবে তানপুরা গানের বিশেষ সহযোগী, স্বাধীনভাবে গলার রেওয়াজ করার পক্ষে উপযোগী ও ইহার সহিত অভ্যাস করিলে স্বরের উৎকর্ষ-সাধন হইয়া থাকে। ইহার জোয়ারীর মধ্যে স্বরগ্রামের সব সুরই পাওয়া যায়। অধিক সংখ্যায় ও শিক্ষিত লোকে ইহার নির্ম্মাণ ব্যবসা করিলে ইহার মূল্য খুবই শস্তা হইয়া সকলের পক্ষে সহজ-প্রাপ্য হইবে।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

একটা পুরাণ গীত *

মল্লার—একতালা ও কাওয়ালী

সুধীর ধারা বহিছে এই, ঘোরতর রজনী,
এ সময়ে প্রাণ-নাথরে কোথায় গুণমণি,
ঘন গরজে ঘন শুনি।
ময়ূর-ময়ূরী হরষিত হেরি চাতক-চাতকিনী ॥
কদম্ব কেতকী চম্পক যূতি সেঁউতি শেফালিকে,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জনমায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে ॥
বিদ্যুৎ খদ্যোৎজ্যোতি দিবামত চমকে দিনমণি
এ সময়ে প্রাণনাথরে কোথায় গুণমণি ॥

রচয়িতা—অজ্ঞাত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বর-লিপি

II মা মা মা | পা পা –া | ধা মা মা | পা পা –I
সু ধী র ধা রা ০ ”ব হি ছে এ ই ০

I ধা –া –া | র্সা ধা পা | মা পা মজ্ঞা | –া –া –া I
ঘো ০ ০ র ত র র জ নী০ ০ ০ ০

* “শান্তিনিকেতন” পত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গীতটির বহু প্রশংসা করিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

মা –া রা | রা রা –া | সা সা না | সা সা –া I
এ, ০ স ম য়ে ০ প্রা ণ না থ, রে ০

I রমা মা –া | –া –া –া | মা পা পা | ধধপা– মজ্ঞা –া I
কো থা ০ ০ ০ য় গু ণ ম ণি– ০০ ০

I জ্ঞমা জ্ঞমা রা | রা সা –া | সা রা না | সা –া –া॥ II
ঘ ন, গ র জে ০ ঘ ন, শু নি ০ ০

II মা পা পা | না –া –া | না র্সা –া | –া –া –া I
ম যূ র ম ০ ০ যূ রী ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা র্সা | র্সা –া –া | র্সা –না –র্রনা | র্রা –া –া৭ I
হ র ষি ত ০ ০ হে ০ ০ ০ রি ০

I ণা ণা ণা | ণা –র্সা ণধা | পা পা –া | –া –া –া I
চা ত ক চা ০ ত০ কি নী ০ ০ ০ ০

I রমা –া রা | রা রা –া | সা সা না | সা সা –া I
এ ০ স ম য়ে ০ প্রা ণ না থ রে ০

I রমা মা –া | –া –া –া | মা পা পা | ধধপা– মজ্ঞা –া II
কো থা ০ ০ ০ য় গু ণ, ম ণি০ ০০ ০

I জ্ঞমা জ্ঞমা রা | রা সা –া | সা রা না | সা –া –া II
ঘ ন, গ র জে ০ ঘ ন, শু নি ০ ০

II মা পা –া | না না না | না –া –া | –া –া –া I
ক দ ম্ ব, কে ত কী ০ ০ ০ ০ ০

I নর্সা –া –া | র্সা র্রা –া | না –া –া | র্সা –া –া I
চ ০ ম্ প ক ০ যূ ০ ০ থি ০ ০

I না র্সা র্সা | র্সা না –র্রা | র্সা র্রা –া | –া –া –া৭ I
সেঁ উ তি শে ফা ০ লি কে ০ ০ ০ ০

I ধা ণা ণা | ধা ণা ণা | র্সা ণা ধা | পা পা –া I
ভ্রা ণে তে প্রা ণে তে মো হ, জ ন মা য়

I মা ধা ধা | পা পা পা | মা মা –া | মরা –া –া I
প্রা ণ, না থে, গৃ হে না, দে ০ খে ০ ০

কাওয়ালী I রা –মা মা মা | মা– পা পা পা | পধা –মা –া –া | পা –া –া –া I
বি ০ ত্যু ত খ ০ দ্যো ত জ্যো ০ ০ ০ তি ০ ০ ০

I ধা র্সা ধা পা | মা ধা পা মা | পা মা মজ্ঞা –া | –া –া –া –া I
দি বা ম ত চ ম কে, দি ন, ম ণি০ ০ ০ ০ ০ ০

কাওয়ালী শেষ

I রমা –া রা | রা রা –া | সা সা সা | না সা –া I
এ ০ স ম য়ে ০ প্রা ণ না থ রে ০

I রমা মা –া | –া –া –া | মা পা পা | ধধপা– মজ্ঞা –ম I
কো থা ০ ০ ০ য় গু ণ, ম ণি০ ০০ ০

I জ্ঞমা জ্ঞমা রা | রা সা –া | সা রা না | সা –া –া IIII
ঘ ন, গ র জে ০ ঘ ন, শু নি ০ ০

চোর

বাবুর বাড়ী চুরি হইয়াছে—মহা হুলস্থূল। কোথায়? তাহার মাহিনা পড়িয়া আছে, কাপড় কোথায়? তাহার মাহিনা পড়িয়া আছে, কাপড় বিছানা—না হয় হইলই বা সাত হাত একখানা ধুতি আর ছেঁড়া একখানা মাদুর—আছে ত।

কর্ত্তার ঘর হইতে দশ টাকার কখানা নোট পাওয়া যাইতেছে না। লইবে আর কে, চাকরদেরই কাজ। সন্দেহটা পড়িল কেষ্টার উপর। কেষ্টা কর্ত্তার দেড়বছরের নাতিটার বাহন—বছর চৌদ্দ বয়স। ফ্যাকাসে রং, ছিপ্‌ছিপে পাতলা চেহারা—একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর তার তলায় বড় বড় দুটো জ্বল্‌জ্বলে চোখে চন্‌মনে চাহনি।

ছোঁড়াটা যে কোথায় গিয়াছে তাহার কোনও পাত্তাই পাওয়া যাইতেছে না। হাজার হোক কাঁচা চোর ত—হজম করিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িয়াছে আর কি! পুলিসে খবর দিলে কিনারা নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু কে আর সামান্য এই দশটা-টাকার জন্য আঠারো ঘা করে! আর সে যাইবেই বা কোথায়? তাহার মাহিনা পড়িয়া আছে, কাপড় বিছানা—না হয় হইলই বা সাত হাত একখানা ধুতি আর ছেঁড়া একখানা মাদুর—আছে ত।

কে-রে! দরজার পাশে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে না?

"হাঁ-হাঁ-তাইত—দেখ্ দেখ্—"

"আরে!—এই যে কেষ্টা!"

"ব্যাটা গিয়েছিলি কোথায় সমস্ত দিন—"

"বার কর ব্যাটা নোট—"

কেষ্টা হতভম্বের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল, যেন কিছু জানে না।

"ন্যাকা সেজে পার পেয়ে যাবে মনে করেচ। দাঁড়া হারামজাদা—" চটাস্ করিয়া কেষ্টার গালে একটা চড় পড়িল।

"বল্ ব্যাটা টাকা কোথা—" কথা নাই।

বাড়ীতে ছিল সীতিকণ্ঠ, গ্রাম-সম্পর্কে কর্ত্তার ভাইপো। কলিকাতায় সে চাকরী করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু চাকরী করিত না—তামাক খাইত আর টেরী মেরামত করিত। সে যাই হোক এই সব চোর ছ্যাঁচড় তাহার দুই চক্ষের বিষ। দুই হাতে ইস্ত্রী করা টেরীটা ঠিক করিতে করিতে আসিয়া সে বিরাশী শিক্কা ওজনের একটা চড় কেষ্টার গালে বসাইয়া দিল—"শাল্লাঃ—"

আর সঙ্গে সঙ্গেই ভিড় হইতে তিন হাত পিছাইয়া গিয়া টেরীটা দুই হাতে ঠিক করিতে লাগিল। সম্ভাষণটা হইয়াছিল অত্যন্ত আকস্মিক। কেষ্টা তাহাতে ভয়ানক চমকিয়া উঠিল—যেন বিদ্যুতের একটা ঝলক তাহার শরীর বহিয়া গিয়া মাটীতে প্রবেশ করিল! আর হতভাগাটা বোধ হয় মুখটা একটু ফাঁক করিয়াছিল নহিলে সামান্য একটা চড়ে দাঁত লাগিয়া ঠোঁটটাই বা কাটিয়া যাইবে কেন!

কিন্তু ইহাতেও কেষ্টা কথা কহিল না।

চটাপট্—চটাপট্—গুম গাম, ধুপ-ধাপ্-ধপাস ঢিপ্—

অনেক চেষ্টা হইল কিন্তু সেই যে সে দরজার কোন ঘেঁসিয়া জালে-পড়া হরিণের মত চোখ দুটা লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম হইল না। চোরাই মালের কিনারা করিতে আসিয়া বাড়ীর লোক ত দূরের কথা পাড়া-শুদ্ধ সকলে হাঁপাইয়া পড়িল তবু তাহার মুখ দিয়া একটা শব্দও কেহ বাহির করিতে পারিল না। আশ্চর্য্য!

কিন্তু মারের চোটে ভূত পলায় আর সামান্য একটা ছোঁড়া সিধা হইবে না? এতক্ষণ ভাল মানুষীতে কিছু হয় নাই, এইবার উত্তম-মধ্যম ঔষধ পড়িলেই হইয়া যাইবে।

উত্তম-মধ্যম ঔষধ চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে রোগী ও রোজার দল দরজার কে হইতে উঠানে, উঠান হইতে দালানে, দালা হইতে বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিল কি যথাপূর্ব্বম্ তথাপরম্!

"নাঃ, ব্যাটাকে ভাল ভাবে পারা যা না—" সীতিকণ্ঠ বলিল—"হপ্ লেস্।"

"দাও ব্যাটাকে পুলিসে—"

"না—না—পুলিসে দিয়ে কিছুই হবে না দাঁড়াওনা দিই ব্যাটার নখের ভিত ছুঁচ চালিয়ে—"

"আহা—হা—তোমরা কি সব কস নাকি গা—" পেন্সন-প্রাপ্ত রায়সা বিষ্ণুবাবু এই কথা বলিয়া কেস্‌টা হা লইলেন।

চুরির ফলে ইহকালে যাহাই হউক কেন পরকালে অনন্ত নরক। সেই নরকে কুম্ভীপাকে চড়াইয়া যমদূতেরা অনন্তকা ধরিয়া যে ভীষণ যন্ত্রণা দিবে তাহার খ পাইয়া উপস্থিত সকলেই শিহরিয়া উঠি পাড়ার বখাছেলে রমেন্দ্র কন্সার্ট পার্টীর বা বাজান ফেলিয়া মজা দেখিতে আসিয়াছি মুখফোঁড় ছোঁড়াটা চাপা গলায় বলি ফেলিল—"আই উইট্‌নেস্!"

কথাটা যত আস্তেই হউক না কে আফিম-সাধা কানে তাহা পৌঁছিল ঠিক।

"পাষণ্ডঃ—" বলিয়া বিষ্ণুবাবু ভা হুঁকাটায় খুব জোরে জোরে টান দি লাগিলেন।

ধর্ম্মের কাহিনী শুনিয়া মহাপাতকী

নিস্তার পাইতে পাইতে মধ্য পথেই হিয়া গেল, আর সে যে শুধু তাহারই জন্য—মেন্দ্রও এ কথাটা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল। তাড়াতাড়ি ভুলটা শুধরাইয়া লইবার জন্য গোটাকয়েক অতি প্রাঞ্জল বিশেষণের সহিত তাহার ফুটবল-দুরন্ত পায়ের একটী লাথি সে কেষ্টার পাঁজরায় বসাইয়া দিল।

বিকট একটা চীৎকার করিয়া কেষ্টা পড়িয়া গেল। পড়িয়া এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যেন দম বন্ধ হইয়া যায় আর কি! এটা ঢং না সত্যই—বুঝিবার পূর্ব্বেই দেখা গেল, সেখানে কর্ত্তার পুত্রবধূ উপস্থিত—বজ্রপাতের ফাটলের মধ্য দিয়া দেবীর আবির্ভাবের মত। সমস্ত মুখখানি তাঁর লাল, চোখ দুইটী দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে! ঠোঁট দুইটী চাপা, নাকটী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিঃশ্বাস পড়িতেছে! কেষ্টাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া একরকম কোলে করিয়াই তিনি বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন।

সারা বাঙ্‌লা দেশটা উৎসন্নে গেল এমনই করিয়া, এই সব বাঙালীর মেয়েদের জন্যই—তাহাদের মারাত্মক মায়ার লোকে না করিতে পারিল উন্নতি, না হইল পাপীর সাজা! পাড়ার লোকে হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া ত একটা চোরকে হাতে পাইয়া ছাড়া যায় না। আর মেয়েদেরও এমনভাবে চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়।

তখন অন্দরের উপরে উঠিবার সিঁড়িতে বৌমা বসিয়া আর তাঁহার পায়ের কাছেই আর-একধাপ নীচে কেষ্টা বসিয়া-বসিয়া হাঁপাইতেছে আর মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছে। সামনে দাঁড়াইয়া বাড়ীর গিন্নী—নিস্তব্ধ গম্ভীর।

"আঃ, তোমাদের জ্বালায়—"

"বাস্—চলে যাও এখান থেকে। আমার উপরে কর্ত্তাগিরি করতে হবে না—"

গিন্নীর এই তাড়নায় যে যার চুপ-চাপ সরিয়া পড়িল।

চুরির আর কিনারা হইল না।

২

কাঁসাই নদীর বাঁকের মুখে ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম। তাহারই প্রান্তে তাল-তেঁতুলে ঘেরা কুঁড়েখানির উঠানে বসিয়া চাষার মেয়ে ধান ঝাড়িতেছিল। ছেলে তাহার কলিকাতায় চাকরি করিতেছে। তাহারই সংসারে লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বিধবা গুত্তর খাটাইয়া উপায় করিত। সোনার চাঁদ ছেলে,—তার চৌদ্দ বৎসর বয়স হইলে কি হয়,—প্রতি মাসেই সে দুই টাকা তিন টাকা করিয়া পাঠায়। সে টাকার একটীও সে খরচ করে নাই, সবই ঘরের যে-কোণটীতে সে শোয়, সেই কোণে পিতলের ঘটীতে পুরিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছে। ছেলের বিবাহ দিয়া চাঁদপানা বৌ যখন সে ঘরে আনিবে, তখন সেই টাকায় আসল চাঁদী রূপার পৈঁছা, বিছা, বাউটী, খাড়ু, জসম তাবিজ গড়াইয়া গা ভরিয়া দিবে। তখন কি আর সে এমনই করিয়া পরের বাড়ীর ধান ঝাড়িয়া বেড়াইবে! তখন নাতিটীকে কোলে করিয়া দাওয়ার উপরে পা ছড়াইয়া দিন-রাত সে বসিয়া থাকিবে।

কোন্ সুদূরের স্বপন-দেশের রঙীন আব-

হাওয়ায় গা ভাসাইয়া গরীব বিধবা এমনই করিয়া ধান ঝাড়িতে বিভোর ছিল। মাথার সূর্য্য কখন্ যে পশ্চিমের সেই বাঁধের তাল গাছটার পিছনে সরিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। খেয়াল হইল যখন মাধায়ের ছেলে রাখাল আসিয়া গড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল আছ ত বটে পিসি ?"

রাখাল কলিকাতায় চাকরি করিত।

"ভাল আছি ত রাখাল—কখন এলি বাবা ?"

"এই আলাম কৎখণ—তা বলি কি যাই একবার পিসিমার ছ্যারণটা ছুঁয়ে আসি বটে, আর কেষ্টার খবরটাও—"

"কেষ্টার কি খবর রে, ভাল আছে ত সে ?"

"আছেক ত বটে, তবে বাবুদের বাড়ী নাকি হাঙ্গামা হইছিলক। তা হাঙ্গামা কিছু লয় বটে তবে ট্যাকা চুরি গিয়েছিল বটে। তা জান কি পিসি কলকাতার লোক তেনারা কসাই বটে! আহা, ছেলেটাকে যে মেলে, তা কইতে লারবে।"

"এ্যাঁ—কাকে মারলে! আমার কেষ্টাকে—চুরি করেছিল সে ?"

"তা লয় গো, তা লয়। চুরি করবেক ক্যালে ? তার কাছেক ত পাওয়া যায় নি বটে। তা তেনারা নাকি বড় লোক বটে—"

"বল্ বাবা সব খুলে রাখাল—বাছা আমার আছে ত ?"

"আহা মরবেক ক্যানে গো—তা ভাগ্যে বাবুর বৌ নাকি বার-বাড়ীকে এসে তাকে টেনে লিয়ে গিয়ে ছিলক বটে, তাই লাকি পরাণটা বেঁচে গেলক বটে। রামসদয় দা কইলেক গিন্নীমা তারে খাওয়া করায়ে শোওয়া করায়ে রাখ্লেক, তা ছুঁড়াটা রেতে উঠে কোথাকে যে গেছে—"

"কোথায় গেছে—তোরা কেউ একবার খোঁজ করলি না ?"

"খুঁজবক নি ক্যালে। গটা মুলুকটা খঁজা করেছি বটে তবে না আমি আইচি হ্যাথাকে। তা রামসদয় দা বড় দুখ্ করছিল বটে—আহা, ছুঁড়াটা গেলক জ্বর গায়ে—"

"এ্যাঁ, এর উপর আবার জ্বর! জ্বর গায়ে গেছে ? হে হরি—"

"হাঁ গো জ্বর বলেক জ্বর, একেবারে ব্যাভ্রম বকছিল বটে—"

মায়ের কেষ্টা,—মা না দেখিলে কে তাহাকে দেখিবে! গেলে আর কাহারও ত যাইবে না। হা-হুতাশ বন্ধ করিয়া বিধবা কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহা দেখিয়া রাখাল বলিল, "ক্যানে, ক্যানে, এখন অত তাড়া ক্যানে! দুদিন পর আমিই যাব সেথাকে; আমার সাথেই যাবে বটে। কথাকে যাবে তুমি একাটী সে মুলুক ?"

মার জিদে সে কথা কিন্তু তাহার রহিল না; তখন সে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিল, "তবেক চল। আচ্ছে কথাকে সে। লুকিয়ে যাবেক কথাকে!"

৩

আকাশ-ভেদী বাড়ীর বেড়া কাটাইয়া ভোরের সূর্য্য তখনও গঙ্গার জলে একটু উঁকি মারিতেও পারে নাই। পাড়াগাঁয়ের চাষার মেয়ে সেই সময় পুলে লোকের ভিড়ে হাবু-

ডুবু খাইতে খাইতে চলিয়াছিল। শ্যামবাজারে তাহার যাওয়া চাই, কেষ্টাকে তাহার পাওয়া চাই, এইমাত্র সে জানে। এইটুকু জানিয়াই চলিয়াছে—আগের লোকের পিছনে পিছনে।

ভোঁপ্—ভোঁপ্—ভোঁপ্, ঢং-ঢং-ঢং-হে-এ—এ—মাগী—

হাওয়ার গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী গরুর গাড়ী চারিদিক হইতে আসিয়া পড়িয়াছে! চাপা দিবে বুঝি! সে তাড়াতাড়ি বাঁদিক্কার রাস্তাটায় ঢুকিয়া পড়িল।

ভরা জোয়ারে দুই কূল ছাপিয়া গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে—ঘাটে-ঘাটে মানুষের মেলা।

হে মা গঙ্গা, আমার বাছার দেখা যেন পাই মা—যেন প্রাণে-প্রাণে ফিরাইয়া পাই। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর, আমার বাছাকে রক্ষা কর—

মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকল অন্তর দিয়া শুধু এই কথাই বলিতেছিল। আর চরণ দুইটা তার সেই সঙ্গে রেলের গাড়ীর মতই ছুটিয়াছিল—লোকের চাহনি টিট্‌কারী ধাক্কা গালাগালি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—বিরাম নাই, শান্তি নাই, লক্ষ্য নাই। কোথায় চলিয়াছে, কে জানে!

সূর্য্য তখন বেশ প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দেশের লোক রামসদয়ের বাসায় একটা ছিন্ন মলিন বিছানায় কেষ্টা পড়িয়াছিল—জ্বরের ঘোরে একেবারে অচেতন! মা গিয়া কেষ্টাকে দুই হাতে টানিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

"মা—" বলিয়া কেষ্টা একবার চোখ চাহিল—চোখের কোলে বড় বড় দুই ফোঁটা জল!

"বড় বেদনা—" কেষ্টা আবার চোখ মুদিল। তাহার সকল অঙ্গ কাটিয়া ছড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল। বাছারে—! কেষ্টার সর্ব্বাঙ্গে মা আপনার স্নেহ-হস্তের সোনার পরশ বুলাইয়া দিল!

কেষ্টা আবার চোখ মেলিয়া চাহিল—ডাকিল, "মা—বড় তেষ্টা।"

"এই যে বাবা, জল—" মা জল দিল; জল খাইয়া কেষ্টা চক্ষু মুদিল।

মায়ের কোলে মাথাটী রাখিয়া কেষ্টা নিঝুম হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আর তাহারই গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে মা তাহার ভাবিতেছিল, বারো বছর আগেকার সেই রাতটির কথা—

শ্রাবণের কাজল-পরা আঁধার কাটিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া দেবতা নামিয়াছিল, তখন সে দুই বছরের ছেলেটাকে কোলে লইয়া মরণোন্মুখ স্বামীর পাশে বসিয়া। ছেলের বুকে শিথিল হাতখানি রাখিয়া আর-একখানি হাতে তাহার হাতটী ধরিয়া চাষা যখন বলিল, —ওরে যেমনই থাকিস্, ছেলেটাকে মানুষ করিস্ রে। তখন সে—

"উ-হু-হু—" চমকিয়া জড়-সড় হইয়া কেষ্টা চীৎকার করিয়া উঠিল।

"—কি—কি—কি হয়েছে বাবা ?"

"চুরি করি নি—আমি চুরি করি নি—"

"না—না—কে বল্‌লে তুমি চুরি করেছ—তুমি আমার সোনার ছেলে—"

সোনার ছেলেকে এমনই করিয়া রাক্ষসের পুরীতে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল রে। সে কি

মা? না সে ভাইনী? কেন সে টাকার লোভ সামলাইতে পারিল না? কেন সে পাঁচজনের কথা শুনিয়া—

"ওগোঃ—ওগো বাবা গোঃ—গেছি গো—আমি না—আমি না—"

হঠাৎ চাবুক মারিলে যেমন করিয়া মানুষ চমকিয়া উঠে, তেমনই চমকিয়া কেষ্টা মায়ের বুকে মুখটা গুঁজিয়া দিল। সমস্ত দেহ তাহার শক্ত কাঠ, থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা তখন একমনে ডাকিতেছিল,—ঠাকুর, হে ঠাকুর—

৪

বাড়ীর কাঠের আসবাবগুলা মেরামতের জন্য মিস্ত্রী লাগিয়াছিল। বাবুর বৌমা শ্বশুরের টেবিলটা পালিস করিতে দিবার জন্য দেরাজগুলা একে একে খালি করিতেছিলেন। ওদিক্‌কার দেরাজটা টানিয়া বাহির করিতেই খস্ করিয়া কি একটা কাগজ মাটীতে পড়িয়া গেল। বুঝি-বা কোন চিঠিপত্র! দেরাজটাকে মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া কাগজখানা উঠাইতেই দেখা গেল, সেটা একটা নোট।

তাইত, একখানা দশ টাকার নোটই যে! তখন সকাল বেলার মিঠা রৌদ্র জানলার ফাঁকে আসিয়া নোটখানার ভিতরকার জলের অক্ষরগুলাকে পর্য্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। আর তার সেই উজ্জ্বলতা ছাপাইয়া নোটের সকল বর্ণ-বৈচিত্র্য ভেদ করিয়া আরও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল, একখানি মুখ। ঝাঁকড়া একমাথা চুল আর তার তলায় বড় বড় দুটো জ্বল্‌জ্বলে চোখ।

নোটখানা হাতে লইয়া কাজ বন্ধ করিয়া বৌমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু চোখ দুইটা তাঁহার জানিবার পূর্ব্বেই সেই নোটখানার উপরই গিয়া পড়িল। তখনো তাঁর চোখের সাম্‌নে ভাসিতেছে,সেই একখানা মুখ—কালশিরা-পড়া, ক্ষত-বিক্ষত,—আর জালে-পড়া হরিণের মতই বড় বড় দুইটা চাখের মর্ম্মঘাতী চাহনি। বৌমার চোখে এক ফোঁটা জল আসিয়া জমিল, সেই ফোঁটা বড় হইয়া ছিট্‌কাইয়া নোটের উপর পড়িল। বৌমা নোটের পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। হায়রে—দুঃখিনীর ধন! নিরপরাধ বেচারা!

শ্রীনরেশ দত্ত।

সিমলার কথা

বেলা পাঁচটার সময় Summer Hill—যেখানে Viceroy থাকেন, তথায় আসিয়া আমাদের ট্রেণ পৌঁছিল। তার পর বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা সিমলায় পৌঁছাইলাম। ষ্টেশন হইতে একখানি রিক্‌সা ভাড়া করিয়া তাহাতে মালপত্র তুলিয়া নিজে চাপিলাম। রিকসার সামনের দিকে চারজন কুলি, পিছন দিকে দুইজন। কুলিতে রিক্‌সা ঠেলিয়া পাহাড়ের উপরকার রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। আমার পিছু পিছু

আরো কত রিক্‌সাতে চাপিয়া সাহেব-মেমেরা ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে যাইবার জন্য আসিতেছে। আমি Ambrosia অর্থাৎ হিন্দু হোটেলে আসিয়া পৌঁছিলাম। রিক্‌সার ভাড়া দিলাম, সাড়ে ছয় টাকা।

এখানকার সব বাড়ী কাঠের ও ইটের; শীতপ্রধান দেশ বলিয়া কাঠের বাড়ী। জানালাগুলি সমস্ত কাঁচের,—যেমন বিলাতের বাড়ীতে থাকে সেই রকম প্রত্যক জানালার ভিতর দিকে পর্দ্দা দেওয়া আছে। ঘরের মেজেগুলি কাঠের, তাহা কার্পেট দিয়া ঢাকা। ঘরে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থাও আছে। এই হিন্দু হোটেলে টেলিফোঁ আছে, প্রত্যেক ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ আলোও আছে। যত ইচ্ছা, গরম জল পাওয়া যায়; হোটেলটী সাহেবী ধরণের, কাঁটা-চামচের সাহায্যে খানা খাইতে হয়; হিন্দু হোটেল কেবল নামেই।

এখানকার অধিকাংশ বাড়ীরই নাম আছে। এখানে রাস্তায় প্লান্ টাঙ্গানো থাকাতে পথিকেরা কোথায় কি আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন এবং হাঁটিতে হাঁটিতে সিমলার কোন্ প্রান্তে আসিয়াছেন, তাহাও জানিতে পারেন। কোন্ রাস্তায় কোন্ সময় বৈদ্যুতিক আলো জ্বালা হয়, তাহাও লেখা আছে। সন্ধ্যার পর Carleton Hotelএর নিকট হইতে দাঁড়াইয়া সহরের বাড়ীগুলির পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে দেওয়ালি হইতেছে! একই ধরণের অসংখ্য বাড়ী পাহাড়ের গায়ে রহিয়াছে, প্রত্যেক বাড়ী হইতে আলো আসিতেছে—তখন কি সুন্দর শোভাই যে হয়!

বৃষ্টি এখানে প্রায়ই হয়। পাহাড়ের আশে-পাশে মেঘেরা বাসা করিয়া থাকে। যখন তাহাদের ইচ্ছা হয়—চল, আমরা দল বেঁধে এক হয়ে জল ঢালি—অমনি কোথাও কিছু নাই, দেখিতে দেখিতে মেঘেরা সব এক হইয়া যায়, আর বর্ষা নামে। এ বৃষ্টি বেশীক্ষণের জন্য হয় না। একে ত খুবই শীত, তার উপর আরো ঠাণ্ডা পড়ে। আবার খানিক পরে সূর্য্যোদয় হয়।

একদিন এখানে খুব শিলা বৃষ্টি হইল, শিলাগুলি আট ঘণ্টার মধ্যেও গলিয়া গেল না; সে দিন খুব ঠাণ্ডা ছিল।

এখানে ঘোড়ার গাড়ী সব রাস্তা দিয়া যায় না, কারণ রাস্তা সব উঁচু-নীচু, এবং সে জন্য ঘোড়ার গাড়ী ভাড়াও মিলে না। তবে যাহারা বড় লাটের অতিথি হইয়া থাকেন, তাঁহারাই ঘোড়ার গাড়ী চড়ার সুখটা পান। রাস্তায় দেখি কেবল রিক্‌সা ছুটিতেছে, আর ঘোড়া ও মানুষ চলিয়াছে। কোন রিক্‌সাতে ইংরাজ মহিলা চলিয়াছেন, স্বামী তাঁহার পাশে পাশে পদব্রজে—কখন দেখি স্ত্রীর রিক্‌সা আগে চলিয়াছে, তার পাছু পাছু স্বামীর রিক্‌সাও চলিয়াছে, কারণ পাশ্চত্য সভ্যতায়—"beauty before bright।" কখন দেখি কোন ইংরেজ মহিলা নিজের শিশুকে কোলে লইয়া রিক্‌সা চাপিয়া বায়ু সেবন করিতেছেন, গলা হইতে পা অবধি র‍্যগ্ দিয়া ঢাকা। সন্ধ্যার সময় ছোট সিমলার পথে কেবলই রিক্‌সা ছোটে, কোনটায় সাহেব, কোনটায় বা মেম—রিক্‌সা কুলিগুলি ছোটার দরুণ ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, আর আরোহীরা তাহাদের নিশ্বাস-মিশ্রিত

বায়ু সেবন করিতেছেন। ইহাতে স্বাস্থ্যের যে কি উন্নতি হয়, তাহা বুঝি না। দু'একটী বাঙালী মহিলাকেও রিক্‌সা চাপিয়া যাইতে দেখিয়াছি, কেহ কেহ হাতে একখানি বইও লইয়াছেন! ওদিকে অবার বাঙালী মেয়েদের পদব্রজে হাঁটিয়া বেড়াইতেও দেখিয়াছি —শীতে জড়সড়, বৃষ্টি পড়িতেছে, water-proof over-coat-এ গা ঢাকিয়াছেন—বেশ দেখাইতেছিল!

সাহেব-মেমের ঘোড়ায় চড়া বৃষ্টিতেও বন্ধ হয় না। কোন মেম জিনের দুইদিকে দুই পা ঝুলাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছেন! এখানে দেখি ঠাণ্ডার দিনেও ইংরাজ মহিলারা গলা ও প্রায়-অর্দ্ধ-বুক-খোলা ব্লাউশ পরিয়া বাহির হন। কাহার কাহার গলায় খরগোসের বা বাঘের চামড়ার কম্‌ফর্টর ঝোলে, পায়ে গ্রীষ্মকালের মোজা। শুনিতে পাই যে ইঁহারা মদ্যপান করিয়া ঠাণ্ডার হাত এড়ান্। মদ খাইলে শরীর নাকি গরম হয়, সেজন্য ইঁহারা এত ঠাণ্ডাতেও ঐরূপ পোষাক পরিয়া শীত সহ্য করিতে পারেন!

পার্শি মহিলাদেরও পদব্রজে বেড়াইতে দেখিয়াছি, তাঁহারা ভেলভেটের বর্ডার দেওয়া ওভার-কোট গায় দিয়া বাহির হন। এখানে বিস্তর পাঞ্জাবী মহিলা আছেন। তাঁহারা দিনেও রাস্তায় বেড়ান, তাও আবার ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া। তাঁহাদের পায়ে জুতা, মোজা, দশ-বারো গাছা করিয়া মল। অত্যন্ত শীত অনুভব করেন বলিয়া তিন-চারিটি পেটীকোট পরেন, পিঠের দিকে ওড়না ঝুলানো থাকে। রাত্রি ৯টা-১০টার পর বেড়াইতে বাহির হইলে দেখি, যত পাঞ্জাবী মহিলা দল বাধিয়া বাহির হইয়াছেন, জুতা পায়ে, গায়ে রঙিণ ওড়না—ঘোমটা টানিয়া; কেহ বা ইজের পরেন, তার উপর পেটীকোট, কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ বা ছেলে কোলে লইয়া "Mall"এ যত দোকান সাজান আছে সেই সব দেখিয়া বেড়াইতেছেন। একদিন দেখি, একটি মহিলা ঘোমটা টানিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছেন, সঙ্গে পদব্রজে তাঁহার স্বামী। নিজেদের গন্তব্য স্থলে আসিয়া পৌঁছিলে স্বামী ঘোমটা-দেওয়া স্ত্রীকে কোলে করিয়া ঘোড়া হইতে নামাইয়া লইলেন। পঞ্জাবী মহিলারা যেমন হৃষ্টপুষ্ট, দেখিতেও তেমনি সুশ্রী!

হিমালয়ের আর্য্য পাহাড়ী মেয়েদের নাকে মস্ত বড় একটা তেকোণা গহনা ঝোলে। সকল মেয়েরাই ইজের পরে, কাল পোষাকের ইজেরই বেশীর ভাগ পরে, কারণ শীঘ্র ময়লা হয় না। প্রায় সকল কুলিমেয়েদের পায়ে জুতা। সকল কুলিমেয়েদের এক-এক কাণে ১০।১২টা করিয়া মাকড়ী। আমি এক একটি মেয়ের কাণের মাকড়ী গণিয়া দেখিয়াছি। তাহারা পাহাড়ে পুরুষের কাজ করে। কেহ বা সমস্ত দিনই পাথর ভাঙ্গিতেছে। কাহারো পিঠে ঝুড়ি বাঁধা আছে, ভাঙ্গা পাথরের টুকরাগুলি ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া অন্যস্থানে লইয়া যাইতেছে। কেহ বা আয়া-গিরি করে। ও-রকম আয়ারা বেশ ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা বলে! এক একটী আয়ার বেতন মাসে ৩৫ টাকা, ইহা ছাড়া তাহাদিগকে কাপড়ও দিতে হয়, খাওয়াও দিতে হয় না। ঠাণ্ডায় তাহাদের ও এখানকার সব মেয়েদের গায়ের বর্ণই একেবারে লাল টক্‌টকে হইয়া ওঠে।

এখানকার পুরুষ কুলিরা দড়ির সাহায্যে

সিমলা বাজার ও গির্জ্জা

পিঠে মোট বয়। একদিন দেখি দু'টী কুলির পিঠে একটি পাথরের 'চাপ' চাপানো হইয়াছে। তাহারা উঠিতেছে আর মধ্যে মধ্যে কাহারো বাড়ীর রোয়াকে চাপ নামাইয়া খানিকটা করিয়া জিরাইয়া লইতেছে। একদিন দেখি একটা বড় আলমায়রা একজন কুলি পিঠে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেখানকার রাস্তা এই বাঙ্‌লা দেশের মত সোজা নহে, কাজেই উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে এই রকম করিয়াই মোট লইয়া যাইতে হয়। একদিন দেখি কতকগুলি কুলি পাহাড় হইতে বরফের "চাঙ্গি" পিঠের ঝুড়িতে লইয়া যাইতেছে, তাহাদের গা দিয়া বরফ-জল ঝরিয়া পড়িতেছে। একদিন দেখি আমাদের হোটেলের সামনে একটা ডুলিতে করিয়া এক মুসলমান মেয়েকে কয়জনে কাঁধ বদলা-বদলি করিয়া লইয়া চলিয়াছে—এসব দেখিতে বেশ মজা লাগে! কোন কোন hill-stationএ পারাস্থুলেটার গাড়ী চলে না, সে জন্য ছোট রকমের খাটে শিশুর বিছানা করা আছে, তাহাতে শিশুকে শোয়ান হয়, ও দুইদিকে দুইজনে বাঁশ কাঁধে লইয়া শিশুর খাট তুলিয়া শিশুকে হাওয়া খাওয়ায়। যখন মুখে রোদ লাগে, ছাতাটা মাঝখানে বাঁধিয়া দেয়। কোন কোন পাহাড়ী মেয়ে পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা দিয়া যাইবার সময় নিজের শিশুকে পিঠে কাপড় ফেলিয়া তাহার মধ্যে ঝুলাইয়া লইয়া যায়, শিশুও বেশ আরামে ঘুমাইতে ঘুমাইতে যায়।

এক-এক জায়গায় ২০০ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া রাস্তায় চলা-ফেরা করিতে হয়। একদিন আমাকেও ২০০ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এক পাহাড়ে বাড়ীর নীচু হইতে আর-এক বাড়ীর উপরে উঠিতে হইয়াছিল। কোন মেম সিঁড়িতে উঠিতেছে, আর-এক একবার কোমরে হাত দিতেছে, এমনি হাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

স্যাঞ্জলি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল স্থান।

যক্ষ মন্দির ও বানর

"Burnes court"—এখানে পাঞ্জাবের ছোটলাট বাস করেন।

"Jesus and Mary's Convent" দেখিলাম, অনেকটা জায়গা লইয়া স্কুল ও বোর্ডিং হাউস্ হইয়াছে। অনেক মেয়ে-বোর্ডার এখানে আছে।

"Lady's ride"—অর্থাৎ এক মাইল ধরিয়া বেড়াইবার রাস্তা। সেই রাস্তায় মধ্যে মধ্যে বেঞ্চ আছে, এই সব বেঞ্চে প্রায়ই তরুণ-তরুণীরা ভিড় করিয়া বসিয়া গল্প করে।

"Orphanage" দেখিলাম। এখানে যত অনাথ রহিয়াছে। ইংরাজ ছেলেমেয়েদের সুখের জন্য যত রকমের বন্দোবস্ত সিমলাতে আছে, ভারতীয়দের জন্য তাহার কিছুই নাই।

"Jakko height—" "মলে"র উপর যে গির্জ্জা আছে, তাহার পাশ দিয়া ঘুরিয়া অনেক উচ্চে যক্ষ পর্ব্বত বা জ্যাকো হিল্‌স্। এখানে যক্ষ মন্দির আছে। ছবি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মন্দির খুবই ছোট। সেখানকার একজন লোক বলিল যে মন্দিরের মধ্যে মহাবীরের মূর্ত্তি আছে। যখন পৌঁছিলাম তখন তিনটী সাধুকে ধ্যানমগ্ন দেখিলাম। বাহিরে দুটী পাথরের পাদুকা, একটী বড় ও একটী ছোট বাঁকাইয়া রাখা হইয়াছে। অনেক বাঁদর এখানে আছে, তাহারা বেশ নির্ভয়ে আমাদের কাছে আসিল। (ছবি দেখুন) দেওয়ালে লোকের নাম খোদাই আছে,—তবে বেশী নহে। আমিও নিজের নাম কাঠের দেওয়ালে লিখিয়া রাখিলাম। কলেজের Herbaruimর জন্য কিছু গাছপালা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। এখানে পানীয় জল অনেক দূর হইতে আনিতে হয়। অনেক দূরে ও এত উপরে উঠা কষ্টকর বলিয়া বেশী লোক এ মন্দির দেখিতে আসে না। রিক্‌সা করিয়া

যক্ষ মন্দির যে পাহাড়ে সেইদিককার দৃশ্য

আসা যায়, তবে রিক্‌সা কুলিগুলিকে খুবই কষ্ট দেওয়া হয়, তাছাড়া রিকসায় ভাড়াও বেশী পড়ে।

সিমলায় "মলে"র রাস্তা ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইলে পাশ্চাত্য মেয়েরা কত রকমের পোষাক পরেন, কত রকমের সৌখীন জাপানী ছাতা ব্যবহার করিতেছেন, কত রকমের সিমলার মতির মালা পরিয়া নিজেদের সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়াইতেছেন, সেই সব দৃশ্য চোখে পড়ে। য়ুরোপীয় মহিলার ব্রাহ্ম-ধরণের শাড়ী পরিয়া বেড়ানোর দৃশ্যটা খুবই দেখা যায়। আর ইংরাজ সৈন্য যত আছে, তাহারা বেড়াইতে বাহির হইলে, তাহাদের হাত ধরিয়া একটি না একটী যুবতীকে ঝুলিতে দেখি। তাহাদিগকে "Sweet-heart" করিয়া রাখিবার জন্য ঐ সমস্ত সৈন্যদিগকে মধ্যে মধ্যে ইংরাজদের দোকানে লইয়া যাইয়া 'এটা' 'ওটা' কিনিয়া উপহার দিতেও হয়, ও restaurantয়ে খাওয়াইতেও হয়। এ সব দেখিয়া মনে হয়, সিমলা যেন ছোট রকমের বিলাত!

বড়লাটের Summer Residenceর পাশ দিয়া গিয়া Bonileguny পুলিশ ষ্টেসন ছাড়িয়া বিখ্যাত Prospect Hill। ইহাও কম উঁচু নহে। এখানে কামনা দেবীর মন্দির দেখিলাম। মন্দিরের মধ্যে দেবীমূর্ত্তি। একজন সাধু বলিল, এ মন্দির কাশীর মন্দিরেরও আগে তৈয়ারী হইয়াছে। রাস্তায় একজন লোক বলিল, যে-ব্যক্তি যা-কামনা করিয়া মন্দিরে আসে, তাহার সেই কামনাই পূর্ণ হয়, ও সেজন্য ইহার নাম "কামনা-দেবী"। তিনটী পাহাড়ী মেয়েকে মন্দিরের পাশে বিশ্রাম করিতে দেখিলাম, তাহারা সিগারেট্ ফুঁকিতেছিল। শুনিতে পাই, এই সব পাহাড়ী মেয়েদের চরিত্র অতি জঘন্য।

"Lover's walk" নামে একটী রাস্তা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলি

সেক্রেটারিয়াট বিল্ডিং ; প্রস্‌পেক্‌ট হিল্

দেখিলাম, সেই রাস্তা ধরিয়া বরাবর Race Courseএ পৌছানো যায়।

এখানে হিমালয়ের নব বিধান সমাজের ব্রহ্ম মন্দির দেখিলাম। ইং ১৮৮৬ সালে স্থাপিত।

সিমলায় বাঙ্গালীরা আসিলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার স্থান পায় না। এই হিন্দু হোটেল (Ambrosia) ভিন্ন আর গতি নাই বলিলেই হয়। যে সব বাঙ্গালীরা আছেন, তাঁহাদেরও অপর কাহাকে স্থান দিবার মত অতিরিক্ত ঘর থাকে না। 'এখানে বাড়ী ভাড়াও সব সময় পাওয়া যায় না—পাওয়া গেলেও ভাড়া খুব বেশী। য়ুরোপীয়ান্ হোটেল আছে, তবে তথায় দিন ১০৲ টাকা দর লয়; তাও আবার হোটেলে ভারতীয়দের থাকিতে দেয় না। এখানে সমস্ত জিনিষই আক্রা। একটি রুমাল কাচাইতে আমার ৵০ আনা খরচ হইল। বুট জুতা পালিশ করাইতে ৵০ আনা। মাছের সের ১৷৷০ বা ১৷৷০ টাকা। দুধ টাকায় ⁄২৷৷০ সের। একটি চাকর রাখিতে হইলে তাহাকে মাসে ১৫৲ মাহিনা ও তাহার উপর তাহাকে খাওয়া দিতেও হয়। এখানে কাঁচা আম বিক্রয় হয়, ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া বলে—"আম কাচ্চা, চাট্‌নি আচ্ছা।" সিমলা বাজারে সব রকম জিনিষই বিক্রয় হয়। ডিম চালান হইয়া আসে। এক একটি মুর্গির ডিমের দাম কখন ⁄০ আনা, আবার কখন বা ৵০ আনা।

সিমলা একটী বৃহৎ কারবারের জায়গা হইয়া উঠিয়াছে। যত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ব্যবসায়ের জন্য আসিয়াছে, ব্যবসায়ে টাকা করিতেছে; শুধু বাঙ্গালীরাই কেরাণী-গিরিতে নিযুক্ত। কেরাণীর কাজে বেশী মাহিনাও হয় না, কোন রকমে কষ্টে অফিসারস্ মেসে থাকিয়া দিন গুজরান্ হয়। একজন পাঞ্জাবী

আমাকে বলেন, "দেখুন, বেশীর ভাগ আমার পাঞ্জাবী ভায়ারা এখানে ব্যবসা করছে, আর আপনার দেশের বাঙ্গালীরা এখানে খালি কলম ঠেলছে, ব্যবসা করতে চায় না।" কথাটা সত্য।

সিমলায় কয়েকটী কারবার আমরা বাঙ্গালীরা বেশ ভালরূপে চালাইতে পারি। যদি কেহ কারবার করিতে চান, আমাকে পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানাইতে পারি।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

চাঁদের আলোয়

হাওয়ায়-কাঁপা কনক-চাঁপা আন্ তুলে,
রেশমি-কালো মিশ্‌মিশে ঐ পর্ চুলে ;
সুর্‌মা এঁকে চোখ-দুখানি কর্ কালো,
মেঘের কোলে বিজ্‌লী যে লো ছায় আলো!
ডুরিয়ে নে তোর পাৎলা সাড়ী নীল রংএ,
ভুলিস্‌নে পায় আলতা দিতে ভুলক্রমে,
সোণার হাতে সাজ্‌বে সরু জল-চুড়ি,
ফুলঝুরি লো ওলো রূপের ফুলঝুরি!

এই বেলা চল্ বেলাবেলি যাই ছাতে,
উঠবে যে চাঁদ সকাল সকাল আজ রাতে ;
টিপ্ দিতে যে ভুল করেচিস্, দূর বোকা!
ছোট্ট করে টিপ কেটে নে—কাঁচ-পোকা,
এলাচ দিয়ে পান্ খেয়ে নে একখিলি ;
লাল রং আর লাল ঠোঁটে তোর নাই দিলি!
মাখা বরং গালটি নরম একবারে
টাট্‌কা-তোলা ফুল-পরাগের পাউডারে!

হীরের বালা মোতির মালা ঝক্‌মকে—
নেই বলে কি কাঁদবি সখি সেই শোকে?
দুধের মত উথলে-ওঠা জোচ্ছনা,
সোনার জলে আঁকবে গায়ে আল্পনা!
পরীরা সব দেখবে তোরে চোখ চেয়ে—
উপচে-পড়া রূপখানি তোর দিক ছেয়ে ;
মলয়-অনিল করবে পাখা হর্-ঘড়ি,
অপ্সরী লো ওলো আমার অপ্সরী!

উঠবে লো চাঁদ সকাল সকাল,—চল্ ছাতে,
কইতে আছে অনেক কথা আজ রাতে ;
প্রেমের কথা একটিও সই তুল্‌বো না,
নিবিড় কালো কেশের রাশি খুল্‌বো না,
নেহাৎ যদি ভুল ক'রে সই ভুল করি,
গোস্তাকিটা মাপ করিস্ লো পায় ধরি ;
তোর মুখেতে চাঁদের সুধা পান ক'রে
ইচ্ছেটা হয় চাঁদের আলোয় যাই মরে!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

বারোয়ারি উপন্যাস

২১

অরুণের মুখে শাশুড়ীর ওই দুর্দ্দান্ত অসুখের কথা শুনে কমলার দুচক্ষু ছল্ ছল্ করে এল। এবং, বিশেষ করে, সে যখন জানালে যে জামাই বাবু নিরুদ্দেশ, হয় ত বা তিনি এখন হিমালয়ের কোন্ গুহার মধ্যে তপস্যায় নিযুক্ত, এবং তাঁকে একটা সম্বাদ দেওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবপর নয়, তখন সেই দুটি চোখ দিয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ধারা বয়ে নেমে এল।

হঠাৎ কি কারণে যে সতীশ সংসার ত্যাগ করে চলে গেল, এ কথা মনে মনে সবাই বুঝ্‌লে, কিন্তু, মুখ ফুটে কেউ উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারলে না।

অরুণ বল্‌লে, শুধু কি এই? ডাক্তারের কাছে শুনে এলুম দুর্নামের ভয়ে পাড়ার কেউ শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করতে রাজি নয়। একেই ত পাড়াগাঁয়ে মানুষের চেয়ে জানোয়ারই বেশি, তার ওপর যদি এই উৎপাত হয় ত গ্রামের সারা যাবে।

[illegible] চোখ মুছে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে [illegible] করলে, হাঁ অরুণ, মা কি তবে [illegible] পড়ে আছেন? মুখে একফোঁটা জল দেবারও কি কেউ নেই?

অরুণ বল্‌লে, অবস্থা ত তাই বটে,—আমাকে ত একরকম দোর ভেঙেই বাড়ী ঢুকতে হয়েছিল, তবে, আজ রাতটার মত একটা বন্দোবস্ত করে এসেচি, ডাক্তারবাবু তাঁর হিন্দুস্থানী দাসীটাকে পাঠিয়ে দেবেন ভরসা দিয়েছেন।

যাক্, বাঁচা গেল! বলে হরেন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, রাতটা ত কাটুক,—ভোর পাঁচটায় একটা ট্রেণ আছে, আমরা তাইতে বেরিয়ে পড়লে সকাল লাগাদ কমলাকে পৌঁছে দিতে পারবো।

ক্ষিতীশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ কোরেই ছিল, মুখে তুলে বল্‌লে, কমলাকে নিয়ে যাবে? হঠাৎ ওঁকে নিয়ে গিয়ে কি সুবিধে হবে হরেন?

বাঃ,—সুবিধে হবে না? সতীশ যখন নেই, তখন, শাশুড়ীর সমস্ত দায়িত্ব ত এখন ওরই। তা'ছাড়া দেখ্‌বে কে? শুন্‌লে ত গ্রামের মেয়েরা দুর্নামের ভয়ে বুড়ীর কাছে ঘেঁস্‌তে পর্য্যন্ত রাজি নয়। কে সেবা করে, বল ত?

ক্ষিতীশ লোকটি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিও নয়, আগাগোড়া ভেবে-চিন্তে হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করাও তার স্বভাব নয়, কিন্তু ভিতরের একটা গোপন বেদনা কিছুদিন থেকে ওই দিকের দৃষ্টিকে তার অত্যন্ত প্রখর কোরে তুলে-ছিল, সে ক্ষণকাল চুপ কোরে থেকে বল্‌লে, কথাটা ঠিক সত্যি নয়, হরেন। আমার মনে হয় তাঁর অসুখের খবর পাড়ার মেয়েরা জানেন না। কারণ আমার নিজের বাড়ীও ত পল্লীগ্রামে, সেখানে বাপের বাড়ী থেকে বৌ হারিয়ে গেলে শাশুড়ীর জাত যেতে আমি আজও দেখিনি, এবং এই দোষে পাড়ার মেয়েরা পীড়িতের সেবা করেন না, এত-বড় কলঙ্কও তাঁদের দেওয়া চলেনা হরেন।

অভিযোগটা হরেনের নিজের গায়েও বিঁধল। সে লজ্জিত মুখে জবাব দিলে, বেশ ত ক্ষিতীশ, সেবা না হয় তাঁরা করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে এত-বড় একটা টাইফয়েড রোগের সেবাও তাঁরা নিয়মিত কোরে যাবেন, এত-বড় বোঝাও ত তাঁদের চাপানো যায় না, ভাই।

ক্ষিতীশ বল্‌লে, ওটা যে টাইফয়েড তাও নিশ্চয় বলা যায় না। অন্ততঃ, একটা দিনের জ্বরকে অত-বড় একটা নামের ঘটা দিয়ে না ডাকাই ভাল হরেন।

হরেন চিন্তিত মুখে প্রশ্ন কর্‌লে, তাহলে কি করা যায় বল?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অরুণ বড়দের কথায় কথা কয়নি, চুপ কোরেই শুন্‌ছিল, এবার বলে উঠলো, দিদির শাশুড়ী সকাল থেকে জ্বরে বেহুঁস, এই আমি শুনে এসেচি, কিন্তু জ্বরটা যে কেবল আজই হয়েছে তাও ত জানিনে। হয় ত বা ক'দিন থেকে—

ক্ষিতীশ কথাটা তার শেষ করতেও দিলে না, কানেও নিলে না, বল্‌লে, তা'ছাড়া একটা বড় কথা আছে হরেন। তাঁর সামান্য জ্বর হয় ত দু'চার দিনেই সেরে যাবে, কিন্তু মাঝখানে সহসা কমলাকে নিয়ে গেলে পল্লীগ্রামে কত-বড় একটা সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি হতে পারে, ভেবে দেখ দিকি? সতীশের মা ওরের ঘোরে হয়ত বলেছেন যে তিনি কমলার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না, কিন্তু—

কিন্তুটা ওইখানেই থেমে গেল। অরুণের মত ক্ষিতীশের নিজের বক্তব্যটাও শেষ হতে পেলে না। কমলা এতদূর পর্য্যন্ত নীরবে শুন্‌ছিল, হঠাৎ তার কান্না যেন একেবারে সহস্রধারে ফেটে পড়ল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে বলে উঠলো,—কিন্তু কি ক্ষিতীশদা? আমাকে কি তোমরা এইখানেই বেঁধে রাখতে চাও? আমার শাশুড়ীর ব্যামো, তিনি কাছে নেই, আমি না গেলে কে যাবে, বল ত?

ক্ষিতীশ হতবুদ্ধি হয়ে বল্‌তে গেল, তা বটে, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে—

কমলা তেম্‌নি কাঁদ্‌তে কাঁদতে বল্‌লে, ভেবে কি দেখ্‌তে চাও, শুনি? কেবল ভেবে ভেবেই ত আজ আমার এই দশা করেছ। হরেনের মুখের দিকে চোখ্ তুলে বল্‌লে, আমি দোষ করিনি,—আমার ভালর জন্যে যদি তোমরা অত ফন্দি-ফিকির না কোরে সোজা আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে ত, আজ হয়ত আমার ভালই হতো, তোমাদেরও আমার জন্যে এমন ভেবে সারা হতে হতোনা। আমি আর তোমাদের সাহায্য চাইনে, কেবল অরুণকে সঙ্গে নিয়ে কাল ভোরেই চলে যাবো। আমার ভাগ্যে যা আছে তা হোক্, তোমরা আর আমার ভালর চেষ্টা কোরোনা।

ক্ষিতীশ এবং হরেন দুজনেই চম্‌কে গেল। কমলাকে এমন কোরে কথা বল্‌তে কেউ কখনো শোনেনি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তার নিজের ব্যক্তিগত যে কোন মতামত আছে, আপনার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া, এবং তার সংশোধনের সমস্ত ভার অপরের উপর নির্ভর করা ভিন্ন সেও যে আবার মনে মনে কিছু চিন্তা করে, একথা তারা দুজনেই যেন একপ্রকার ভুলে গিয়েছিল।

হরেনের মুখে সহসা কোন উত্তর যোগাল না, এবং ক্ষিতীশ বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত

কোরে চেয়ে রইল। কিন্তু এ কথা বুঝতে আর তাদের বাকি রইলোনা, যে তাদের উভয়ের সম্মিলিত দুশ্চিন্তাকেও বহুদূরে অতিক্রম কোরে আর একজনের উদ্বেগ কোথায় এগিয়ে গেছে।

কমলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে বল্‌লে, তোমরা মনে কোরোনা ক্ষিতীশদা, তোমাদের দয়া আমি কোন-দিন ভুলতে পারবো, কিন্তু আজ তোমাদের হাত জোড় করে জানাচ্চি ভাই,—বল্‌তে বল্‌তেই তার দুচোখ বেয়ে ঝর ঝর করে আবার জল গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এবার সে জল সে মোছবার চেষ্টাও করলেনা, হাত-দুটি জোড় করে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার জন্যে তোমরা যে কত দুঃখ পেলে, সে আমি জানি, আর ভগবানই জানেন, কিন্তু আর একটা দিনও না। আজ থেকে আমার দুর্ভাগ্যের সমস্ত ভারই আমি নিজের মাথায় তুলে নিলুম। ক্ষিতীশদা, একদিন যেমন আমাকে তুমি পথ থেকে এনে বাঁচিয়ে ছিলে, আজ তেম্‌নি আমাকে কেবল এই আশীর্ব্বাদ তুমি কর, এর থেকেও একটা যেন কোথাও কূল পাই, —আর না তোমাদের দুঃখ দিতে ফিরে আসি!

ক্ষিতীশ চোখ ফিরিয়ে বোধ হয় তার চোখের জলটাই গোপন করলে, কিন্তু হরেন বল্‌লে, আমরা দুজনে সেই আশীর্ব্বাদই তোকে করি কমলা, আমি বল্‌চি এ বিপদ একদিন তোর কেটে যাবেই,—কিন্তু কাল সকালে আমিও কেন তোর সঙ্গে যাইনে?

কমলা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

হরেন উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলো, না কেন কমলা? আমি যদি তোর সত্যিকারের দাদা হতুম তা'হলে ত তুই না বল্‌তে পারতিস্‌নে।

তার শেষ কথাটায় এত দুঃখেও কমলার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলো, সে অধো-মুখে তেম্‌নি নীরবে মাথা নেড়ে বল্‌লে, না।

তার এই লজ্জাটা হরেনের অগোচর রইল না। কিন্তু পরস্পরের নাম নিয়ে এই যে একটা লজ্জাকর অপবাদ, একে সে যে বিন্দুমাত্র স্বীকার করে না, এই কথাটাই সদর্পে জানাবার জন্যে হরেন তীব্রকণ্ঠে বলে ফেললে, তুই কি ভাবিস্ কমলা, আমি মিথ্যে দুর্নামকে ভয় করি? বাবার অন্যায় শাসন গ্রাহ্য করি? আমি যাবো তোর সঙ্গে, দেখি, গ্রামের কে আমার মুখের সাম্‌নে তোকে কিছু বল্‌তে পারে! তার জবাব আমি দিতে পারবো, কিন্তু ছেলেমানুষ অরুণ পারবে না।

কমলা সজল চোখ দুটি তার মুখের পানে তুলে বল্‌লে, অরুণ পারবে না সত্যি, কিন্তু তোমারও পেরে কাজ নেই হরেনদা। আমার বোঝা আমাকে বইতে দাও, আর আমার সমস্যাকে তোমরা জটিল কোরে তুলোনা।

হরেন বল্‌লে, গ্রামের লোকগুলোকে একবার ভেবে দেখ্ কমলা। সেখানে একাকী তোর অদৃষ্টে কি যে না ঘট্‌তে পারে, সে তো আমি ভেবেও পাইনে!

কমলা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। সে আর কথা কাটাকাটি না কোরে শুধু উপরের দিকে মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—তিনিই জানেন। এই বলে সে হাতদুটি মাথায় ঠেকিয়ে উদ্দেশে তাকে

যেন প্রণাম করেই, দ্রুতপদে উঠে অন্য ঘরে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত কারও মুখ দিয়েই কোন কথা বার হোলোনা, সবাই যেন নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। খানিক পরে অরুণ বল্‌লে, আমি কিন্তু একটা সুবিধে করে এসেছি হরেনদা। জামাইবাবুর মাকে বলে এসেছি, দিদি হারিয়ে যাবার পরে অসুখ থেকে সেরে উঠে পর্য্যন্ত বরাবর আমার কাছেই আছেন। ঠিক করিনি ক্ষিতীশদা? অবশ্য তোমাদের নামও করেছি বটে।

হরেন বল্‌লে, দূর পাগ্‌লা! তুই ছেলে-মানুষ,—কল্‌কাতায় কমলা তোর কাছে আছে, এ কথা কি কেউ কখনো বিশ্বাস করে? কি বল হে ক্ষিতীশ?

ক্ষিতীশ হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে, হুঁ। বলেই লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি হেসে বললে, আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে হরেন, আমি চললুম। বলে ঠিক যেন টল্‌তে টল্‌তে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

নিজের বাড়ীতে তাদের কোন খেয়াল না কোরে ক্ষিতীশ শুতে গেল, এটা তার স্বভাবের এম্‌নি বিরুদ্ধ যে হরেন ও অরুণের বিস্ময়ের [illegible] রইল না কিন্তু যথার্থই আজ ক্ষিতীশের এদিকে দৃষ্টি দেবার সাধ্যই ছিলনা। বহুক্ষণ থেকেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এত আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অর্দ্ধেক বোধ-হয় তার কাণেই যায়নি। সেখানে কেবল একটা কথাই বারম্বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল,—সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে, সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে! তার মনের নিভৃত গুহায় যত-কিছু পাপ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কমলার কাছে সমস্ত ধরা পড়ে গেছে,—তার কোথাও কিছু আর লুকোনো নেই! তাই সে আজ ব্যাধ-ভয়ে ভীত হরিণীর মত ছুটে পালাতে চায়! আজ তার সকল যত্ন, সকল সেবা, সকল পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক!

২২

ক্ষিতীশ দা!

কে?

আমি কমলা, একবারটি দোর খোল।

ক্ষিতীশ শশব্যস্তে দোর খুলে বাইরে এসে দেখ্‌লে, সুমুখে দাঁড়িয়ে কমলা। রাত্রির ঘোর তখনো কাটেনি, তখনও কালো আকাশে দু'চারটে বড় বড় তারা জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্‌চে। কেবল পূবের দিকটা একটু স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র। বারান্দার এককোণে যে লণ্ঠনটা মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল, তারই অস্পষ্ট আলোতে ক্ষিতীশ চক্ষের নিমিষে সমস্ত ব্যাপারটা দেখে নিলে।

কমলার গায়ে আগাগোড়া একটা হল্‌দে রঙের র‍্যাপার জড়ানো, এবং তারই অদূরে দাঁড়িয়ে অরুণ। তার ডোরা-কাটা কোটের ওপর কোমরে বাঁধা একটা আধময়লা চাদর। বাঁহাতে তার পৈতের সময়কার লাল রঙের ছাতাটি এবং ডান বগলে চাপা একটি ছোট্ট পুঁটুলি।

কেবল এতটুকুই ক্ষিতীশ দেখ্‌তে পেলে। কিন্তু কমলা যখন গড় হয়ে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, ক্ষিতীশ দা' আমি চল্‌লুম, তখন আলোর অভাবেই হোক্, বা চোখের দোষেই হোক্, তার মুখের কিছুই আর ক্ষিতীশের চোখে পড়ল না। তার মনে

হ'ল, অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে যেন সম্মুখে, পাশে, ওপরে, নীচে সমস্তটাই একেবারে মসীকৃষ্ণ হয়ে গেছে।

—আমাদের সময় হয়েছে আমি যাচ্চি ক্ষিতীশ দা'।

—যাচ্চো? আচ্ছা—

—আমি কোথাকার কে, তবু কত কষ্টই না এতদিন ধরে তোমাকে দিলাম—এই বলে কমলা র‍্যাপারের কোণে চোখ মুছ্‌লে।

প্রত্যুত্তরে ক্ষিতীশ শুধু কেবল জবাব দিলে, কষ্ট? কই, নাঃ—

—কিন্তু তোমার প্রাণ বাঁচানো যেন নিষ্ফল না হয় যাবার সময় আমাকে এইটুকু আশীর্ব্বাদ কেবল তুমি কর ক্ষিতীশ দা'—এই বলে কমলা ঘন ঘন চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌ল।

ক্ষিতীশ কোন উত্তরই খুঁজে পেলে না। কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ বলে উঠ্‌লো, আশীর্ব্বাদ? নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা' করচি বই কি। হাঁ অরুণ, মোটরটা বলে দেওয়া হয়েছে?

অরুণ মাথা নেড়ে জবাব দিলে, হাঁ, হরেন দা' ত নীচে তাতেই বসে আছেন! তিনি ইষ্টিশন পর্য্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আপনি যাবেন না?

আমি? না ভাই, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই—

কমলা দূর থেকে আর একবার নিঃশব্দে নমস্কার কোরে আস্তে আস্তে নীচে চলে গেল। অরুণ কাছে এসে বল্‌লে, আমিও চল্‌লুম ক্ষিতীশ দা'—এই বলে সে দিদির মত প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্ষিতীশ সহসা সজোরে তার হাতদুটো ধরে হিড় হিড় কোরে টেনে তার ঘরের মধ্যে এনে ফেলে বল্‌লে, অরুণ, তোমরা সত্যি সত্যিই চল্‌লে ভাই?

অরুণ অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে রইল, প্রশ্নটা যেন সে বুঝ্‌তেই পারলে না।

ক্ষিতীশ পুনশ্চ বল্‌লে, কে জানে, আর হয়ত আমাদের দেখাই হবে না,—আমিও আজ দুপুরের গাড়ীতে পশ্চিমে চল্‌লুম ভাই।

অরুণ এ কথারও জবাব দিতে পারলে না, কিন্তু বালক হলেও সে এটুকু বুঝ্‌তে পারলে যে ক্ষিতীশদা'র কণ্ঠস্বর কান্নার জলে যেন একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বল্‌লে, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার ওপর যে কত-বড় ভার পড়্‌ল, এ হয়ত তুমি জানোও না, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি কায়মনে প্রার্থনা করি, তোমাদের আজকের যাত্রাটা যেন তিনি সকল প্রকারে নির্বিঘ্ন কোরে দেন।

এই বলে সে তার বালিশের তলা থেকে একখান খাম বার কোরে অরুণের হাতে গুঁজে দিতে গেল। অরুণ হাতটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি ক্ষিতীশ দা?

সামান্য গোটা-কয়েক টাকা অরুণ।

কিন্তু ভাড়ার টাকা ত আমার কাছে আছে ক্ষিতীশ দা।

তা' থাক। তবু ছোট ভাইদের যাবার সময় কিছু হাতে দিতে হয়।

এই বোলে সে অরুণের কোঁচার খুঁটটা টেনে নিয়ে তাতে বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে বল্‌লে, তোমার ত কেউ বড় ভাই নেই অরুণ,

তাই জানো না, নইলে তিনিও এম্‌নি কোরেই বেঁধে দিতেন, দাদার স্নেহের উপহার বলে নিতে কিছু লজ্জা কোরো না, ভাই। তোমার দিদি কখনো যদি জান্‌তে পেরে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকেও এই কথাটাই বোলো। এই বোলে সে সেটা যথাস্থানে পুনরায় গুঁজে দিয়ে হাত ধোরে তাকে বাইরে এনে বল্‌লে, আর সময় নেই অরুণ, তুমি যাও ভাই, সাড়ে চারটে বেজে গেছে। ওঁরা বোধ করি বড্ড ব্যস্ত হচ্চেন—এই বোলে সে একরকম তাকে জোর কোরে বিদায় কোরে দিলে।

অরুণ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কতদিন পশ্চিমে থাক্‌বেন ক্ষিতীশ দা?

সে কথা আজ কি কোরে বোল্‌ব ভাই?

মিনিট-খানেক পরে অরুণ গিয়ে যখন গাড়ীতে উঠে বোস্‌লো, তখন তাকে একাকী দেখে কমলা কোন প্রশ্নই কর্‌লে না, কিন্তু হরেন জিজ্ঞাসা করলে, ক্ষিতীশ এলোনা অরুণ!

তার জবাবটা ক্ষিতীশ নিজেই দিলে। সে উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বল্‌লে, শরীরটা আমার ভাল নেই হরেন, আর ঠাণ্ডা লাগাবোনা।

হরেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌লে, ভাল নেই? তা'হলে হিমে আর দাঁড়িয়ো না ক্ষিতীশ, ঘরে যাও, আমি এদের পৌঁছে দিয়ে এসে তোমাকে জানাবো।

মোটর ছেড়ে দিলে। হরেনের উপদেশ তার কাণে গেল কি না কে জানে, কিন্তু গাড়ী যখন বহুক্ষণ তার চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও সে তেম্‌নি সেই দিকে চেয়ে তেম্‌নি স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

ষ্টেসনে পৌঁছে, টিকিট কিনে দুজনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে হরেন কমলার কাছে গিয়ে একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বল্‌লে, আমার উপস্থিত ঠিকানা যদিচ আমি নিজেই জানিনে, তবুও আমাকে খবর দেবার যদি আবশ্যক হয়ত কেয়ার অফ্‌—

অরুণ পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটুক্‌রো কাগজ আর পেন্‌সিল বার কোরে বল্‌লে, থামো থামো হরেন দা, ঠিকানাটা, তোমার লিখে নিই। তা ছাড়া শুন্‌লুম ক্ষিতীশদা'ও আজ দুপুরের ট্রেণে পশ্চিমে চলে যাচ্চেন, এটা ছাই মনে হোলোনা যে তাঁর ঠিকানাটা জিজ্ঞেসা কোরে রাখি।

সম্বাদ শুনে কমলা মনে মনে আশ্চর্য্য হোলো, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলে না। কিন্তু হরেন উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠ্‌লো, বলিস্‌ কি অরুণ! ত'হলে ত আমাকে এখুনি ফিরে গিয়ে তাকে থামাতে হয়!

কমলা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কেন হরেন দা?

অরুণ বল্‌লে, কেন কি, বাঃ—

হরেন বল্‌লে, সেখানে কত কি ঘট্‌তে পারে কে বল্‌তে পারে? আবশ্যক হলে আমি ত যাবই, এমন কি ক্ষিতীশকে পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে যেতে ছাড়বো না! তুই কি আমাকে ভীরু মনে করিস্‌!

কমলা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, না, তা' করিনে। কিন্তু তোমাদের কারও সেখানে আমার জন্যে যাবার দরকার হবে না।

হরেন ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,

হবেনা? নাই হোক্, কিন্তু আজও কি তুই আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে চিনিস্ নি কমলা?

কমলা এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলে না, বল্‌লে, আমি কিছুতে ভেবে পাইনে হরেন দা', এতদিন কি কোরে আমার সমস্ত বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, আর কেমন কোরেই বা এতদিন নিজের কাজের ভার তোমাদের পরের ওপর নির্ভর কোরে থাক্‌তে পেরেছিলুম! ভুল যা করেচি তার সীমা নেই, কিন্তু তোমাদের সাক্ষী দিতে ডেকে পাঠাবো এতবড় ভুল বোধ হয় আমিও আর কোরব না। এই বোলে সে ছোট ভাইয়ের হাত থেকে কাগজের টুক্‌রোখানি নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে।

হরেন মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, কিন্তু কমলা, নির্দ্দোষীকেও কি সাক্ষী দিয়ে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে হয় না?

কমলা একটুখানি ম্লান হেসে বল্‌লে, সে আদালতে হয়; কিন্তু আমার বিচারের ভার আমি যাঁর হাতে তুলে দিয়েচি হরেন দা', তাঁকে সাক্ষী যোগাতে হয় না, তিনি আপনিই সব জানেন।

এই বোলে সে উদ্গত অশ্রু গোপন করতে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

গার্ড-সাহেব সবুজ নিশান নেড়ে দিলেন, ড্রাইভার বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে, এই সময়টুকুর মধ্যে হরেন যেন একটা ধাক্কা সাম্‌লে নিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে দু'পা এগিয়ে এসেও কমলার মুখ আর দেখ্‌তে পেলে না কিন্তু তাকেই উদ্দেশ কোরে চেঁচিয়ে বল্‌লে, তাই যেন হয় বোন্, আমি কায়-মনে প্রার্থনা করি তিনিই যেন আমাদের বিচারের ভার গ্রহণ করেন!

কমলা এ কথারও কোন উত্তর দিলে না, দেবার ছিলই বা কি! কিন্তু গাড়ী কতকটা পথ চলে গেলে সে কেবলমাত্র একটিবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে পেলে হরেন তখনও সোজা তাদের দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পথের মধ্যে অরুণ অনেক কথাই বকে যেতে লাগ্‌ল। তার নিজের প্রতি ভারি একটা ভরসা ছিল। সেই যে দুর্গামণি তাকে বলেছিলেন, তিনি গুজবটা বিশ্বাস করেন নি, এবং সেও তাঁকে জানিয়ে এসেছে কলকাতায় দিদি তার কাছেই আছেন, এতেই তার সাহস ছিল দুর্ঘটনাকে সে অনেকখানিই সহজ করে দিয়েচে। এই ভাবের সান্ত্বনাই সে থেকে থেকে দিদিকে দিয়ে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু দিদি যেমন নিঃশব্দে ছিল, তেম্‌নি নীরবেই বসে রইল। হরেন্দ্রর সেই কথাটা সে ভোলেনি যে অরুণের এই কথাটা সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না! কিন্তু এজন্য মনের মধ্যে তার বিশেষ কোন চাঞ্চল্যও ছিল না। বস্তুতঃ, যা সত্য নয় সে যদি লোকে অবিশ্বাসই করে ত দোষ দেবার কাকে কি আছে! কিন্তু যথার্থ যে-চিন্তা তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে জাঁতার মত চেপে বস্‌ছিল সে তার শাশুড়ীর কথা। তিনি বলেছিলেন বটে তাঁর বধূর কলঙ্ক তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এই বিশ্বাস কি তাঁর শেষ পর্য্যন্ত অটুট্ থাক্‌বে? কোথাও কি কোন অন্তরায় কোন বিঘ্ন ঘট্‌বে না? সে জান্‌তো, ঘট্‌বে। পল্লীগ্রামে মানুষ হয়েই সে এতবড় হয়েছে, তাদের সে চেনে,—কিন্তু এ সঙ্কল্পও তার মনে মনে একান্ত দৃঢ় ছিল, অনেক ভুল, অনেক ভ্রান্তিই হয়ে গেছে, কিন্তু আর সে তার নিজের এবং স্বামীর মধ্যে তৃতীয় মধ্যস্থ মান্‌বে না। এ সম্বন্ধ যদি ভেঙেও যায় ত যাক্. কিন্তু জগদীশ্বর ভিন্ন দুজনের মাঝখানে অন্য বিচারক সে কখনো স্বীকার করবে না।

বেলতলী ষ্টেসনে যথাসময়েই ট্রেন এসে পৌঁছল, কিন্তু ঘোড়ার-গাড়ী জোগাড় করা সহজ হোলোনা। অনেক চেষ্টায় অনেক দুঃখে অরুণ যখন একটা সংগ্রহ করে নিয়ে এল, তখন বেলা হয়েছে, এবং পল্লীপথের পাকা দুই ক্রোশ উত্তীর্ণ হয়ে অশ্বযান যখন জগদীশপুরের সতীশ বাগ্‌চীর বাটীর সুমুখে উপস্থিত হল তখন বেলা বারোটা।

দুর্গামণি গোটা-তিনেক ময়লা, ওয়াড়হীন তুলো-বার-করা বালিশ জড় কোরে ঠেস্ দিয়ে বসে এক বাটি গরম দুধ পান করছিলেন, এবং অদূরে মেঝেয় বসে পাড়ার একটি বিধবা মেয়ে কুলোয় খৈয়ের ধান বাচ্‌ছিল। দুর্গামণির জ্বর তখনও একটু ছিল বটে, কিন্তু টাইফয়েডের কোন লক্ষণই নয়। তিনি অরুণকে দেখে খুসি হয়ে বল্‌লেন, কে অরুণ এসেছো, বাবা? এসো, বোসো,—দোর-গোড়ায় ও কে গা?

দিদি এসেছেন—

দিদি? কে, বউমা?

পরক্ষণেই কমলা ঘরে ঢুকে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিতলে গড় হয়ে প্রণাম কর্‌তেই দুর্গামণি শশব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। দুধের বাটিটা মুখ থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থাক্ থাক্, বউমা, আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। সারাদিন পরে দুধ ফোঁটা টুকু মুখে তুলেচি, এটুকু আর ছুঁয়ে দিয়ো না।

যে মেয়েটি খৈ বাচ্‌ছিল সে স্পর্শ বাঁচিয়ে কুলো-সমেত দুহাত সাম্‌নে এগিয়ে গেল। কমলা নির্ব্বাক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু অরুণ যেন একেবারে অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলে উঠে বলে ফেল্‌লে,—মিথ্যেবাদী! কেন তবে কাল তুমি বল্‌লে, ও-সব গুজব তুমি বিশ্বাস করোনা! কেন বল্‌লে—

শোন কথা! কবে আবার বল্‌লুম বিশ্বেস করিনে? আর জ্বরের ধমকে যদি কিছু বলেই থাকি ত সে কি আবার ধর্ত্তব্যি, বাছা!

অরুণ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্‌লে, তা'হলে ত আমি কখ্‌খনো দিদিকে আন্‌তুম না! দুর্গামণি দুধের বাটিটি সরিয়ে একটু নিরাপদ স্থানে রেখে বল্‌লেন, তা' বেশ ত বাছা, অমন মার-মুখী হোচ্চো কেন? শাণ্ডেল মশাই আসুন, রায় বট্‌ঠাকুরকে খবর দি,—ততক্ষণ, ঘরে সবই আছে, পটলের-মা বের কোরে দিক্,—দোরের উনুনটায় বোক্‌নোয় কোরে ডাল-চাল দুটো ফুটিয়ে তোমাকেও দুটো দিক্, নিজেও দুটো খাক্।

অরুণ চতুর্গুণ জ্বলে উঠে বল্‌লে, কি! আমরা তোমার বাড়ী ভিক্ষে নিতে এসেচি! এত বড় কথা 'বল তুমি! আচ্ছা, টের পাবে! এই বোলে সে কমলার হাতখানা চেপে ধরে বল্‌লে, চল দিদি, আমরা যাই,—এখনো আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—আর এক মিনিট ও এর মুখ দেখ্‌তে চাইনে!

কমলা ধীরে ধীরে নিজের হাতখানি মুক্ত করে নিয়ে বল্‌লে, চল, যাচ্চি ভাই। তার পরে মাথার অঞ্চলটা সরিয়ে দিয়ে শাশুড়ীর মুখের পানে চেয়ে শান্ত সহজ কণ্ঠে বল্‌লে, মা, আমি চল্‌লুম, কিন্তু, আমিও এ বাড়ীর বউ তোমারি মত এও আমার শ্বশুরের ভিটে। কিন্তু এমন অপরাধ আজও করিনি যাতে এ বাড়ীতে আমাকে দোরের উনুনে রেঁধে খেতে হয়!

শাশুড়ী বল্‌লেন, তা' কি জানি, বাছা!

কমলার মলিন চোখের দৃষ্টি হঠাৎ শিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল,—বোধ হয় কি যেন সে বল্‌তেই চাইলে, কিন্তু সে অবসর আর পেলে না। অরুণ বজ্র-মুষ্টিতে হাত ধরে জোর করে তা'কে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)*

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

বিলাতযাত্রীর পত্র

৬

দক্ষিণ-ফ্রান্স.
Cap Martin,
Alpes Maritimes.

এখানকার যে সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তি লাভ করে। কেননা, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র—সেইখানে স্বার্থলোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়—সেইখানে মানুষ নিজের সুখদুঃখের, নিজের ভোগসম্ভোগের অতীত হয়ে বিচরণ করে—সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধরে রাখ্‌তে পারেনা, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবিকাল-বিহারী তারাই অমৃতলোকের অধিবাসী, কেননা মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্চে বর্ত্তমান। এখানেই পদে পদে ক্ষয়, এই-খানেই যত আঘাত যত নৈরাশ্য—এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মানুষ পীড়িত হয়। মানুষ হচ্চে "অমৃতস্য পুত্রাঃ", মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী। সেই দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, খণ্ডকালে নয়। আমা-দের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা আমাদের মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়,—সেই ব্যথা বর্ত্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে, সেই হচ্চে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্চে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘর মাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই। আধুনিক ভারত-বর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে বর্ত্তমানের সব দাবীও সে পুরাপুরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চল্‌চে না, ঋণের প্রত্যাশায় সে ধনীর দ্বারে ধর্ণা দিয়ে বসে আছে। কিন্তু যার বর্ত্তমানের সম্বল স্বল্প সে আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায়—আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতচি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্চি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবী কাল বাধাগ্রস্ত, এইজন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে

* আগামী সংখ্যার লেখক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।

পারচে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে বা লিখেচ তার কারণ হচ্চে মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসের বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে-সকল পরিবার থেকে এই-সব ছাত্র আসে তারা আত্মার দীনতা দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম্ম করতে নিযুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বদ্ধ হয়, তাহলে বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ" আমাদের পক্ষে সত্য নয়, "বিপুলা চ পৃথ্বী" সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা।

মানুষ যখন তার কীর্ত্তির জন্যে বৃহৎকালের ক্ষেত্র না পায় তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করতেই পারেনা, সে আপন অভাবকে হীনতাকেই ব্যক্ত করে। নিরন্তর যে দেশে কেবল এই অভাব এবং দুঃখদুর্গতিই প্রকাশ পাচ্চে সেখানে আত্মার উপরে মানুষের শ্রদ্ধা চলে যায়—পরস্পরের কুৎসাবাদে ঈর্ষ্যাপরতায় সেই শ্রদ্ধাহীনতা মানুষের আত্মাবমাননাকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে। আমাদের দেশের লোককে বার বার জানাতে হবে যে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—আমরা দিব্যধাম-বাসী। কি করে জানাতে হবে? ত্যাগের দ্বারা। চিরন্তন কালের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে সেই ত আন-ন্দের সঙ্গে বর্ত্তমানকালকে ত্যাগ করতে পারে—এবং সেই চিরন্তন কালই আত্মার অমৃতধাম। পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে অর্থসংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহুলোক এখানে ভাবের জন্যে বস্তুকে, ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ করচে যে তার সংখ্যা নেই। সেইরকম অনেক লোককে দেখ্‌চি। যতই দেখচি ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে মানুষের সেই অন্নদানের দ্বারা—ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা নৈব নৈবচ। কোনো রিফর্ম বিল্ আমাদের দুঃখসমুদ্র পার করাতে পারবে না—আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না—ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর—মণ্টেগু সাহেব তাকে বাঁচাবে কি করে?

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

২৮ আগষ্ট, ১৯২০

৭

Villa Dunare
Cap Martin
Alpes Maritimes
28th Agust, 1920.

We are in a most beautiful part of France. But of what avail is the beauty of nature when you have lost your trunks which contained your dresses and under-wears? I could have been with perfect sympathy with the trees surrounding me, if, like them, I were not dependent upon tailors for maintaining my self-respect. However, the most important event for me in this world at present is not what is happening in Poland or Ireland or Meso-potamia, but that all the trunks belonging to our party have disappeared from the goods van in their transit from Paris to this place. And therefore, though the sea is singing its hymns to the rising and the setting sun and to the starlit silence of the night, and though the forest round me is standing tiptoe on the rock like an ancient druid, raising its arms to the sky, chanting its incantation of primeval life, we have to hasten back to Paris to be restored to the respectability ministered by tailors and washermen. This is what

our first parents have brought upon us. Our clothes are acting like screens dividing us from the rest of the world; and for this we have to pay—pay the bills. Do you not think that it is outrageously undignified for my humanity that standing face to face with the magnificient spirit of this naked nature I can think and speak of nothing but my wretched clothes which in three years time will be tattered into rags while these pine-trees will remain standing ever fresh and clean majestically unaffected by the soiling touch of hours? But enough of this.

I suppose I told you in my last letter that I met Sylvan Levy in Paris. He is a great scholar as you know, but his heart is larger even than his intellect and his bearing, His Philosophy has not been able to wither his soul. His mind has the translucent simplicity of greatness and his heart is overflowing with trustful generosity which will never acknowledge disillusionment. His students come to love the subject he teaches them because they love him. I realise clearly when I meet these great teachers that only through the medium of personality truth can be communicated to men. This fundamental principle of education we must realise In Santiniketan. We must know that only he can teach who can love. The greatest teachers of men have been lovers of men. The real teaching is a gift, it is a sacrifice, it is not a manufactured article of routine work, and because it is a living thing it is the fulfilment of knowledge for the teacher himself. Let us not insult our mission by allowing us to become mere school masters, the dead feeding bottles of lessons for children who need human touch lovingly associated with their mental food.

I have just received your letter and for some time I feel myself held tight in the bosom of our Ashrama. I can not tell you how I feel about prolonged separation from it which is before me, but at the same time I know that unless my relationship with the wide world of humanity grows in truth and love my relationship with the Ashrama will not be perfect. Through my life my Ashrama will send its roots into the heart of this great world to find its sap of immortality. We who belong to Shantiniketan can not afford to be narrow in our outlook and petty in our life's mission and scope. We have seen in Tiretta Bazar thirty or more birds packed in one single cage, where they neither can sing nor soar in the sky, but make noise and peck at each other. Such a cage we build ourselves for our souls with out petty thoughts and selfish ambitions and then spend our life quarreling with each other clamouring and scrambling for small advantages. But let us bring freedom of soul into Shantiniketan.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তি নিকেতন, আশ্বিন ১৩২০।

বাঙ্গালী কি আর্য্য ?

কথাটা অনেক দিন হইল শুনিতেছি। পুরাতন দল "মোক্ষমূলর বলেছে আর্য্য" এই কথাটাই ধরিয়া খাতেরজমা হইয়া বসিয়া আছেন আর যে কেউ আমাদের অনার্য্য বলিতে যান তাঁহাদিগকে গালিগালাজ করিতেছেন। আর নূতনের দল সমান ক্ষেপিয়াছেন আমাদের অনার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় অনেক দিনের পর কথাটা আবার তুলিয়াছেন।

এ প্রশ্ন শুনিয়া আমার প্রথম মনে হয় এ কথা লইয়া এত মাতামাতি বাড়াবাড়ি কেন? আর্য্যই হই, অনার্য্যই হই, আমরা যে বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালীই যখন থাকিব, তখন এ কথা লইয়া এত চেঁচামেচি কেন। অনার্য্যই হইলেই ব্যাবিলনী, কি ইজিপ্টীয়, কি গ্রীক কি হিট্টাইটদিগের মত গৌরব হয় না, আধুনিক জাপানী বা প্রাচীন চীনের সঙ্গেও এক পংক্তিতে বসা যায় না। আর আর্য্য হইলেই এমন কিছু কুলীন হওয়া যায় না। প্রাচীন কালে আর্য্য সভ্যতার যে গৌরব ছিল, এই সব অনার্য্য জাতিদের গৌরব তার চেয়ে কোনও অংশে হীন বলা যায় না। বর্ত্তমান কালেও অনার্য্য জাপান গৌরবে কোনও তথাকথিত আর্য্যজাতি হইতে হীন নহে। পক্ষান্তরে আর্য্যবংশীয় বর্ব্বর প্রাচীন জর্ম্মাণ বা স্কান্দিনেবিয়ান জাতি যে একটা উন্নত জাতি ছিল তাও বলা যায় না। তবে এ কথায় আমাদের বর্ত্তমান বা অতীতের গৌরবের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না! আমরা ছোট না বড় সেটা নির্ণয় হইবে আমরা বাঙ্গালী হিসাবে কতটা কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি তাই দিয়া। আমাদের প্রাচীন গৌরব কি ছিল সেও প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তিকলাপ দিয়া। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ মধ্য-এসিয়া হইতে আসিয়াছিল, না আমেরিকা হইতে আসিয়াছিল, না এই দেশের মাটিতে জন্মিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালীর গৌরবের ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

এই কথাটা মনে রাখিয়া কেবল অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ ভাবে এ কথার ইতিহাস আলোচন করিলেই আমরা সত্যে উপনীত হইতে পারিব।

হেমন্ত বাবু বলিয়াছেন আমরা অন্—আর্য্য। মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় রক্ত আমাদের শরীরে প্রবল। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যরক্তের যে মিশ্রণ আছে তাও অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? আমরা একটা মিশ্র জাতি এটা খাঁটি সত্য। সেজন্য আমাদিগকে অন-আর্য্য বলিতে হয় বল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আর্য্যজাতি কোথায় আছে? গ্রীসের আর্য্যের যে কতটা বেশী পরিমাণে ইজিয় (Aegian) জাতির সঙ্গে ভেজাল ছিল, সেটা আজকাল খুব বেশী পরিমাণে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া রোম, জর্ম্মাণী-স্ক্যাণ্ডিনেবিয়া প্রভৃতি যত আদিমকালের আর্য্য-নিবাস ছিল, সে সব কোনও স্থানেই খাঁটি আর্য্যজাতি ছিল না। আজও কোথাও আর্য্যজাতি নাই। নৃতত্ত্ববিদের শাস্ত্রে 'আর্য্য' কথাটা আর মনুষ্য জাতির শ্রেণী-বিভাগে শুনা যায় না! আর্য্যবাদ এখন "Aryan heresy" বলিয়া পরিচিত।

সুতরাং আমরা আর্য্য নই এ কথা যেমন সত্য, এ জগতে কোথাও আর্য্য-জাতি নাই, সে কথাটাও তেমনি সত্য। এই আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কত প্রাচীন কালে এই আর্য্যজাতির রক্তের ভিতর ভেজাল আরম্ভ হইয়াছে। বেদের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত,। তাহা ছাড়া বেদ যে কোথায় রচিত হইয়াছিল তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না; নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগে সব চেয়ে প্রাচীন দু'টি আর্য্যজাতির কথা আমরা পাই, একটি মিটানী রাজ্যে আর একটি ব্যাবিলনের ক্যাসাইট বংশে। সে প্রায় চার হাজার বছরের কথা। তখন দেখিতে পাই মিটানীর রাজা দশরট্ট (দশরথ?) তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন ইজিপ্ট-রাজের সঙ্গে। ক্যাসাইট রাজা কাদাশমান—এনলিল ইজিপ্টের রাজা তৃতীয় আমেন হেটেপকে

কন্যা দান করিবার জন্য কড়া তলব পাঠাইয়াছিলেন।* রাজায় রাজায় যখন এমনি হইত তখন ছোটখাট লোকের মধ্যে "দুষ্মুলাদপি" স্ত্রীসংগ্রহ হইত না, কে বলিবে? পক্ষান্তরে শূদ্র ও অনার্য্যের ভিতর হইতে যে স্ত্রীসংগ্রহ হইত এবং তাহাদের পুত্রেরা পুত্ররূপে পরিগণিত হইত ইহার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। বিবাহ সম্বন্ধে জাতিভেদের কড়াকড়ি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে হইয়াছিল। সকল দেশেই আর্য্যজাতি এমনি করিয়া আর্য্যেত্বের জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

যদিও নিঃসংশয়ে এ কথা এখনো বলা যায় না, তবু মনে হয় আর্য্যজাতি এক সময়ে ভূতপূর্ব্ব অপসিরিয়াল ও হিটাইট সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে যে স্থানে আর্য্যগণের প্রতিষ্ঠান ছিল সেই সেই স্থানে পূর্ব্বে নানাজাতির বল ছিল, ব্যাবিলনের সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা ও সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয় সভ্যতা সজীব ছিল। আর্য্য-জাতি ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে হউক পরে হউক এই সমুদয় জাতির সহিত অনেকটা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, একথা সত্য হইলে প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্র যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারাও যে খাঁটি আর্য্য ছিলেন এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। অথর্ব্বাঙ্গিরসের ভিতর যে সব আচার-অনুষ্ঠান পাই, ঋগ্‌বেদেও যে সমুদয় আচার-অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত পাই, তার ভিতর অনেকটা যে এই সব অন-আর্য্য জাতি হইতে গৃহীত নয় তাহা কে বলিবে?

আর্য্য-জাতির বিবাহ-বিধান হইতে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এবং আসুর,গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানান্তরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ব্রাহ্ম বিবাহই আদিম আর্য্য বিবাহ-পদ্ধতি †।

আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ বিধি অনার্য্য জাতিগণের বিবাহ-বিধান হইতে ধার করা। আসুর-বিবাহে কন্যা মূল্য দিয়া ক্রয় করা হয়। আসুর জাতির (Assyrian) মধ্যে কেবল এই উপায়েই বিবাহ হইত, তাহা আমরা জানিতে পারি। রাক্ষস-বিধান অদ্যাপি ভারতের বহু স্থানে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত। ইহা ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের নিকট ধার করা এ কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দ্রাবিড় দেশের প্রাচীন সাহিত্যে রাক্ষস নামক মনুষ্যজাতির কথা উল্লেখ আছে, পাণিনীও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহও ঐরূপ গান্ধারবাসী গন্ধর্ব্ব জাতি হইতে গৃহীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি আরও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, এই সমস্ত বিজাতীয় হীন বিবাহগুলিকে আর্য্য-সংস্কার দ্বারা শোধিত করিবার চেষ্টায়ই দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। আসুরাদি বিবাহ দ্বারা কেবলমাত্র লৌকিক উপায়ে নারীর উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আর্য্য-বিবাহের প্রধান ব্যাপার স্বামী স্ত্রীর অদৃষ্ট-সম্বন্ধ। সেই অদৃষ্ট-সম্বন্ধ সূচিত করে শাস্ত্রীয় সংস্কার। সুতরাং নিকৃষ্ট বিবাহগুলিকে সংস্কার-শোধিত করিয়া বিশেষভাবে আর্য্য-অনুষ্ঠান করিয়া লইয়া যে বিবাহ-পদ্ধতির সৃষ্টি হয় তাহারই নাম দৈব আর্য্য ও প্রাজাপত্য। পরবর্ত্তী কালে, ইহাতেও যখন কুলাইল না তখন আসুরাদি বিবাহকেও সংস্কারযুক্ত করিয়া লওয়া হইল। বশিষ্ঠের মতে আসুরাদি বিবাহে সংস্কার না হইলে তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না। এই উপায়ে অনার্য্য অনুষ্ঠান সংস্কৃত করিয়া আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে সমীকৃত করিয়া গ্রহণ করা হইত।

সুতরাং আর্য্যজাতি যে "অন-আর্য্য" জাতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে গোড়া হইতেই মিশিয়া গিয়াছিল এবং "অন-আর্য্য" জাতির নিকট আচার-অনুষ্ঠান অনেক ধার করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিলেই বাঙ্গালীর বা ভারতবাসীর অনার্য্যত্ব প্রমাণ হইল না। শরীর-হিসাবে মানুষ একটা উচ্চ অঙ্গের পশু, কিন্তু অন্তরের হিসাবে সে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। এই অন্তরটাই হইল মানুষের বেশীর ভাগ। পশু-হিসাবে মানুষের বিভাগ এবং তার মনের হিসাবে বিভাগ সব সময় মিলে না। ইংরেজ জাতির মধ্যে অনেকের কুলজী দেখিলে শেষে গিয়া ঠেকিতে হইবে একটা ফরাসীর নামে। জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্টের পূর্ব্বপুরুষ একজন স্কটলণ্ডবাসী। তাই বলিয়া, কাণ্টকে স্কচ এবং মার্টিনোকে ফরাসী বলিয়া বর্ণন করিলে যে ভুল হইবে সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? মানুষের মন দেখিয়া তার Cultureএর হিসাবে যে জাতিবিভাগ, সেটা পশুবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র।

মনুষ্যত্ববিদ্ আর্য্যজাতি বলিয়া বর্ত্তমান মনুষ্য-জাতির কোনও বিভাগ স্বীকার করেন না; কিন্তু আর্য্য-ভাষা ও আর্য্য Cultureএর স্বতন্ত্র অস্তিত্বও অস্বীকার করেন না। আমরা আর্য্য কি অনার্য্য, আমাদের পশুত্ব-হিসাবে এ কথার কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু আমাদের Cultureএর দিক হইতে এ প্রশ্নের একটা সার্থক উত্তর দেওয়া যায়। বাঙ্গালীর মন, তাহাদের Culture আর্য্য কি না এই কথাটাই অনুশীলনের যোগ্য। নাক-চোখের মাপ দিয়া বাঙ্গালীর আর্য্যত্ব ও অনার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না।

বাঙ্গালীর শরীর মঙ্গোল হউক বা দ্রাবিড় হউক বা কোল হউক, তার মন জ্ঞান ও আচার আর্য্য কিনা, এইটাই জিজ্ঞাস্য।

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। কোনও জাতির Culture সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে দেখিতে হইবে প্রধানতঃ সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেণীগুলির আচার, বিজ্ঞান, ভাষা ও ধর্ম্ম। নিম্নস্তরের মন দিয়া সমস্ত সমাজের Culture বিচার করা যায় না। নিম্নস্তরের যে জাতীয় জীবনের উপর কোনও প্রভাব নাই এ কথা বলি না; কিন্তু সে প্রভাব গৌণ। প্রধানতঃ নিম্নস্তরই উচ্চস্তরের নিকট তাহাদের Culture প্রাপ্ত হয়।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে যে কোনও জাতির আর্য্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে আমাদের একথা প্রমাণ করিতে হইবে না যে তাদের মন তাদের আচার অনুষ্ঠান, তাদের ভাষা সমস্তই তিন চার হাজার বছরের পূর্ব্বেকার আর্য্যজাতির সঙ্গে আগাগোড়া মিলিয়া যায়; কালবশে প্রভেদ হইবেই। তা ছাড়া আর্য্য-সভ্যতা তাহার অনার্য্য আবেষ্টন হইতে যে অনেক জিনিষ আপনার ভিতর টানিয়া লইবে তাহাও নিশ্চয়। এই ধার-করা মাল যদি আর্য্য-সভ্যতা ও আর্য্য জীবনের আদর্শের সহিত সমীকৃত হইয়া থাকে, ফল কথা, এই ইতিহাসের মূল প্রাণের প্রবাহটা যদি আর্য্যের প্রাণ হয় তবে আর্য্যত্ব বজায় থাকে। ডিমটি ফুটিয়া যেমন পাখীটি হয়, সমাজের ক্রমবিকাশ কখনই সে রকম হয় না। সমাজ বাড়িতে হইলে পরিণত জীব-শরীরের ন্যায় বৃদ্ধি ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে তাহার সমস্ত বাহ্যিক আবেষ্টন হইতে। সুতরাং আর্য্য জাতির চিন্তা ভাব ও আদর্শের স্রোত পদে পদে চতুর্দ্দিক হইতে আর্য্যেতর জাতির ভাব চিন্তা ও আদর্শ লইয়া পুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ছাগল ঘাস খাইয়া শরীর-পুষ্টি করে বলিয়া যেমন ছাগল ঘাস হইয়া যায় না, আমরা পাঁঠা খাইয়া শরীর পোষণ করিয়া পাঁটা হইয়া যাই না, তেমনি আর্য্য সভ্যতা ও culture অনার্য্য আচার-অনুষ্ঠান লইয়া নিজের পুষ্টি করিয়াছে বলিয়া সে অনার্য্য হইয়া যায় না। আসল প্রশ্ন এই যে প্রাণের ধারার মূল প্রবাহটা আর্য্য না অনার্য্য।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া বাঙ্গালীর চিত্তজগৎ অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই সেই কথাটা বিচার্য্য। চিত্তজগতের নানা প্রকাশের দিক হইতে একথা বিচার করা যাইতে পারে। একটা দিক আমাদের ভাষা। ভাষাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে আমাদের ভাষাটা তামিল তেলেগুর সামিল। সংস্কৃতের সামিল নয়। আমি ভাষাতত্ত্ববিৎ নহি, কিন্তু কথাটা অসংশয়ে মানিয়া লইতে পারিলাম না। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া অনধিকার-চর্চ্চা করিব না। কারণ সুনীতি বাবুও একথা অস্বীকার করেন না, যে বাঙ্গলা ও প্রাকৃত প্রধানতঃ সংস্কৃতের বিকৃতি, সংস্কৃত ভাষা ভিন্নজাতির মুখে যাইয়া যেমন বিকৃত হইতে পারে,

* Hall; History of the Middle East p. 257-61.

† প্রতিভা ১৩২৫—'প্রাচীন ভারতে বিবাহ বিধান'।

তেমনি বিকৃতি। এইটুকুই আমার প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট। একথা যদি সত্য হয় তবে বাঙ্গলা ভাষা আর্য্যবংশীয়।

আমাদের চিত্ত-জগতের আর একটা প্রকাণ্ড অংশ আমাদের সামাজিক জীবনে পাই। আমাদের জাতীয় জীবনের সব-চেয়ে স্থায়ী এবং দৃঢ় বন্ধন আমাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, ধর্ম্ম ও ব্যবহার। এই দিকটা আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। বাঙ্গালী হিন্দুর উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে জীবনের প্রত্যেক বড় ও ছোট ব্যাপার যে স্মৃতির বিধান দ্বারা নিয়মিত, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে স্মৃতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া বেদের আমল হইতে রঘুনন্দন বা শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত একটা না একটা জীবন্ত ধারার সন্ধান পাই। তার প্রাণশক্তি ও কেন্দ্র আর্য্যের প্রাণ! আর্য্য ঋষিগণ যে আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, আমাদের আজিকার নিত্যকৃত্য অবং অষ্টাদশ সংস্কার প্রভৃতি সকলই সেই আচারাদি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন না হইলেও তাহারই পরিণতি মাত্র। দৈনিক জীবনে চিন্তার ভাবে জীবনের ছোট-বড় সকল আদর্শে আমরা সেই আর্য্যের প্রাণে অনুপ্রাণিত। এই সকল চার-অনুষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, স্থানে স্থানে ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কোথাও বা বাহির হইতে কোনও নিয়ম বা অনুষ্ঠান ইহার ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে যাহা আসিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে সমীকৃত হইয়া,আর্য্যসভ্যতার তন্তাবে ভাবিত হইয়া তবে সমাজে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং এদিক হইতে দেখিলেও দেখিতে পাই যে আমরা দ্রাবিড় হই বা মাঙ্গোলীয় হই, আমাদের Culture, আমাদের সভ্যতা, আর্য্যসভ্যতা। বুদ্ধদেবকে যখন শুদ্ধোদন পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, আমি তোমার পুত্র নহি, আমি পূর্ব্ববুদ্ধদিগের বংশধর। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলকে আমাদের এমনি উত্তরই দিতে হইবে।

বাঙ্গালীর চিত্তজগতের, চাইকি সমস্ত ভারতবাসীরই চিত্তজগতের এমন কতকগুলি প্রকাশ আছে যাহার মূল আমরা প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না। তাই বলিয়া এগুলিও যে ভারতীয় আর্য্যসমাজ বলিতে যে প্রাচীন মিশ্র সমাজ বুঝি, তাহার ভিতর ছিল না একথা জোর করিয়া বলা অসম্ভব। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে যে সমসাময়িক সকল সামাজিক তথ্য ধৃত আছে এমন কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে! সে সময়েও সমাজের তলায় এমন সব তথ্য ছিল, যাহা কোন শাস্ত্র খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের মেয়েলী শাস্ত্র ধরা যাইতে পারে। এই যে আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারভূয়িষ্ঠ শাস্ত্র, ইহার বেশীর ভাগের কোনও কথা বেদে পুরাণে নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহা আবহমানকাল হইতে প্রচলিত স্ত্রী-শূদ্রের লৌকিক ধর্ম্মে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। আপস্তম্ব তাঁহার ধর্ম্মসূত্রের শেষে বলিয়াছেন, গ্রন্থে যাহা লেখা হইল তাহা ছাড়া অন্যান্য তথ্য স্ত্রীলোকদিগের নিকট শিখিতে হইবে। ইহা কি মেয়েলী শাস্ত্রের দিকে ইঙ্গিত নয়? হরদত্ত এ ইঙ্গিতে বুঝিয়াছেন অর্থশাস্ত্র, কিন্তু তাহা হইলে বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের প্রতি উদ্দেশ কেন? তা' ছাড়া, আমরা জৈন আবেষ্ট হইতে দেখিতে পাই যে প্রাচীন পারশিকদের মধ্যে আমাদের চলিত মেয়েলীশাস্ত্রের অনেকগুলি অঙ্গ প্রচলিত ছিল। সুতরাং এই মেয়েলীশাস্ত্রেও যে প্রাচীন কালের ধারা-প্রসূত এবং ইহার মধ্যে বাহিরের যে জিনিষ তাহাও যে প্রাচীন ধারার সহিত সমীকৃত একথা বলা যাইতে পারে।

তারপর, আমাদের দেশে অবস্থাগতিকে কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই সব ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায়ের যে আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ধারার সহিত কোনও সংযোগ ছিল না, একথা কেহ বলিতে পারি না। তাহার কতকগুলির মূল হয় তো আমাদের লৌকিক সংস্কারের, চাইকি প্রচলিত মঙ্গোলীয় সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেগুলি যখন আর্য্য ধর্ম্মের সহিত সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়া গৃহীত হইয়াছে তখন তাহার বলে বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্য্যেতর যাহা হইতে প্রাপ্ত একথা অনুমান করা সঙ্গত হইবে না।

সুতরাং আমাদের চিত্ত-জগৎ হিসাবে আমরা আর্য্যবংশীয়। পশুহিসাবে আমরা কোন্ দলে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমরা খাঁটি আর্য্য নই তাহা নিশ্চয়। কেবল তাহাই নয়, খাঁটি আর্য্য বলিয়া কোনও জাতি জগতে নাই এবং আর্য্যত্বের মূলে মানবজাতির কোনও শ্রেণী বিভাগ করা চলে না। কাজেই আমরা আর্য্য কি না, এ কথার উত্তর কেবল Cultureএর দিক হইতেই দেওয়া চলে। সে হিসাবে আমরা আর্য্যবংশীয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নারায়ণ, কার্ত্তিক, ১৩২৭।

কলিকাতা।

সরযূ জোর

নির্ব্বাসনে কাঁদ্‌ছে কে গো?—
যক্ষেরি কোন্ কন্যা এ গো!—
জলের ধারা কোন্ রূপসীর চোখে?
শুকায় না ক' আঁখির পাতা,
তরুণ প্রাণে এমন ব্যথা
কোন্ প্রাণে রে কে দিলে গো ওকে!

বাল্লির পাঁজর ঠুন্‌ক হিয়া
কে ভাঙিল আঘাত দিয়া?
কে দেখা'লি হৃদয় খুলে ওরি!
বেদন-ভরা অশ্রুময়ি,
কা'র বিরহে কাতর অয়ি,
নয়ন-জলের কে তুই ভরাভরী!

বুকের নীচে পাথর ঠেকে,
তবু আশার স্বপন দেখে,
পাথর ঠেলে উধাও চলে মেয়ে;
উপল-ঘায়ে রোদন ভরে
বিরহেরি টনক্ নড়ে,
জাগায় ব্যথা স্মৃতির অলপ্পেয়ে!

মনের কথা যাচ্ছে শোনা,
বুকের উপল যাচ্ছে গোনা—
মুখের ছায়া আঁখির দরপণে;
এমন সরল কমলটিরে
কে ভাসালে নয়ন-নীরে?—
হায়, প্রণয়ীর দরদ নাহি মনে!

শব্দ নাহি, নাইক সাড়া,—
একটি শুধু চোখের ধারা
দিন-যামিনী এম্‌নি করে' ঝরে;
একটি শুধু গানের লীলা—
একটি ব্যথা অন্তঃশীলা
আবেগ-ভরে উছ্‌লে খালি পড়ে!

মৌনতারি নিঝুম সুরে
একটি কথা বেড়ায় ঘুরে',—
উপত্যকায় তাকায় মিছে আশা!
দিন-দুপুরের ঝিলিক-আলো
অন্ধকারে মুখ ফিরালো,
গুম্‌রে মরে অবুঝ ভালবাসা!

টুন্‌টুনিরা ঘুটিঙ্‌ 'পরে
রাখ্‌তে বৃথা চেষ্টা করে,
ক্ষুদ্র নখের ক্ষুদ্র স্নেহ-কণা!
জল্‌কে এসে ফির্‌ল নারী,
চল্‌কে উঠে কাঁখের ঝারি,
মিলায় পায়ে মায়ার আলিপনা!

ছড়ের জলে এলায় আসি'
রবির আলো, চাঁদের হাসি,
সজল করে শুধুই আঁখি-পাতা;
সুখের কথা—কান্না-ভরা,
সান্ত্বনা তা'র—অশ্রু-ছড়া,
পরাণি যা'র ব্যথার রেশে গাঁথা!

একটুকুও' কল্‌কলানি,
একটুখানি ধড়্‌ফড়ানি,
শিলায়-শিলায় একটু লুটোপুটি,
সুখ-পেয়ালার শেষ-তলানি,
তোরেই আমি মিষ্টি মানি,
তোরই তরে এ'মোর ছুটোছুটি!

গড়িয়ে গেছে কোথায় জানি
এই পরাণের আধেক খানি
ওই নয়নের আগ্‌-ফোঁটাতে তোর!
পিছ্‌-ফোঁটাতে পিছিয়ে পড়ে'
কোথায় যেন কাঁদ্‌ছে ওরে
আধেক হিয়া—লো সরযূ-জোর!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চয়ন

রুষ-লেখক সোলোগাব

সোলোগাব রুসিয়ার একজন সুবিখ্যাত লেখক। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তাহার মধ্যে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে মাত্র কয়েকখানি। কিন্তু সোলোগাবের আসল বিশেষত্ব যে-সব রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুঃখের বিষয় অনুবাদকরা সেগুলির দিকে এখনো দৃষ্টিপাত করেন নাই।

সোলোগাব কবি, চিন্তাশীল ও স্বপ্নদর্শক। তাঁহার মানস-ভাব এত সূক্ষ্ম ও গভীর যে, আমাদের রবীন্দ্রনাথের মতন তাঁহারও রচনা পড়িয়া জন-সাধারণ যথার্থ রসবোধ করিতে পারে না। দার্শনিকরাও তাঁহার লেখা পছন্দ করেন না, কারণ তাঁহার শব্দচিত্রে রঙের লীলা অফুরান। সুতরাং এই দুই অতি-নিম্ন এবং অতি-উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে থাকেন যে-দলের পাঠকরা, কেবল তাঁহারাই সোলোগাবের লেখা পড়িয়া খুসি হন।

জান্‌লার ধারে বসিয়া যে-সব লেখক পথের দৃশ্য-প্রবাহ দর্শন করেন এবং তাহার বর্ণনামাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দেন, সোলোগাব তাঁহাদের দলের নন। এইখানেই শেখভের সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ। তিনি খালি পুতুল-খেলার মতন লোকের মেলা দেখিয়াই খুসি হন

না—সেইসঙ্গে আরো দেখিতে চান—কিসে এরা চলা-ফেরা করিতেছে, কোন্ অদৃশ্য হস্ত এদের খেলাইতেছে? তিনি প্রশ্ন করেন এবং অনুমান করেন—কিন্তু দার্শনিকের ভাষায় নয়, কারণ তাঁহার কাছে সে ভাষা একান্ত নীরস। আপনার মানস-ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তিনি রূপক, কথা ও কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। দৈনিক জীবন-যাত্রার মাঝখানে তাঁহার কাহিনীগুলি বিচিত্র কল্পনার কুসুমের মতন বিকসিত হইয়া ওঠে। কিন্তু তিনি কল্পনার আনন্দ-লহরীতে গা-ভাসান দিবার জন্য মনোগৃহের দরজা খোলেন না, ভাবকে ও চিন্তাকে চিত্রিত করিবার জন্যই স্বপ্নাকাশের উধাও কল্পনাকে সংযত করিয়া টানিয়া আনিয়া, তিনি ছোট ছোট শব্দ-চিত্রে রেখায় লেখায় জাগাইয়া তোলেন।

এইজন্যই সোলোগাব জনসাধারণের মন রাখিতে পারেন না। তিনি নিজে এ-কথা জানেন ও মানেন। কিন্তু কেউ তাঁকে ভালো-বাসে কিনা, সে-সব কোন-কিছুর তোয়াক্কা তিনি রাখেন না। তাঁহাকে তাঁহার লেখার মানে বুঝাইয়া দিতে বলিলে তিনি জবাব দেন:—

"মনে ভাবের আবেগ হ'লেই মানুষ লিখ্‌তে বসে; কিন্তু সে সময়েও সে যদি আপনার ভাবকে ব্যক্ত কর্‌তে না পারে, তবে পরে যখন মন থেকে ভাবের আবেগ চলে যায়, তখন সে কি ক'রে সেই অস্পষ্টতার আসল ব্যাখ্যা দিতে পার্‌বে?"

সমস্ত কবি-প্রকৃতিরই এই একই ধারা। তাই কবির কাছে যারা তাঁর রচনার অর্থ জানিতে যায়, তারা কবির উপরে যথার্থ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করেনা।

সোলোগাবের মতন প্রতিভাবান লেখকরা শব্দের ঐন্দ্রজালিক হইয়া থাকেন। তাঁহারা যাহাকে আকার দিয়া প্রকাশ করেন, তাহাকে আমরা সকলেই অনুভব করি, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না।

সোলোগাব তাঁহার সাহিত্য-জীবন সুরু করেন কবিরূপে। তাঁহার কবিতায় দেখা যায়, তিনি সর্ব্বত্রই মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু যে উত্তরে মনের সকল সন্দেহ কাটিয়া যায়, তাহা তিনি বিশ্ব চুঁড়িয়া কোথাও পাইতেছেন না।

"কেন এবং কিসের জন্য এই মানব-জীবন?"

"সমস্ত জীবনটাই খেলা এবং সে খেলার কোন লক্ষ্য নেই।"

"সমস্ত জীবনটাই মিছা জাঁকজমকে ভরা এবং লক্ষ্যহীন দ্বন্দ্বমাত্র। বেঁচে থাকার কোন মানে পাওয়া যায় না।"

"Oppressive Dreams" নামে কাব্য-পুস্তকে তিনি জীবনের এই ব্যর্থতাকেই নানা-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

"একজন চলন্ত মানুষ তিনবার থুথু ফেল্‌লে। মানুষ কোথায় চলে গেল, কিন্তু থুথু পড়ে রইল।

প্রথম থুথু বল্‌লে, "আমরা এখানে আছি, কিন্তু সে মানুষটি আর নেই।"

দ্বিতীয় থুথু বল্‌লে, "সে চলে গেছে।"

তৃতীয় থুথু বল্‌লে, "সে খালি আমাদের এখানে ফেল্‌বার জন্যেই এসেছিল। আমরাই হচ্ছি মানুষের অস্তিত্বের লক্ষ্য। মানুষ চলে গেছে, কিন্তু আমরা আছি।"

জীবন-সম্বন্ধে হতাশ হইলেও সোলো-

গাবের মধ্যে অর্থপূর্ণ হাস্তরসের অভাব নাই। "বুড়ো-বুড়ী"র কাহিনীই তাহার প্রমাণ।

"এক যে ছিল বুড়ো, আর এক ছিল বুড়ী।

বুড়োর বয়স পাঁচশো আর বুড়ীর চারশো।

বুড়ো পেতো মোটা পেন্‌সন। কিন্তু সে টাকাগুলো বুড়ীর হাতেই সঁপে দিত—খরচ চালাবার জন্যে!

বুড়ো সাজগোজ কর্‌ত ঠিক নব-যুবোর মতন, আর বুড়ী তার মাথার চুলে কলপ মাখ্‌ত আতর।

বুড়ো ফুঁক্‌ত সিগারেট আর কাপড়ে মাখ্‌ত আতর।

বুড়ী চুষ্‌ত লজঞ্চুস্ আর যেত থিয়েটার দেখ্‌তে।

বুড়ো একদিন সিগারেটে খুব কষে দম্ ভ'রে মার্‌লে এক টান—আর-এক টান—আর-এক টান! শেষ-টানে সে শিঙে ফুঁকে চলে গেল যমের বাড়ী।

বুড়ী একদিন অপেরার গান শুন্‌তে শুন্‌তে, গলার সপ্তশির বের ক'রে খুব চেঁচিয়ে বল্‌লে—এক্কোর—এক্কোর—এক্কোর! সেই চ্যাঁচানিতেই দম ফেটে সে থিয়েটারের ভিতরে পড়্‌ল আর মর্‌ল।

কিন্তু এতে শোক করবার কিছু নেই। দুনিয়ায় আরো বুড়ো, আরো বুড়ী আস্‌বে।"

এই সুরে সাহিত্য-জীবন সুরু করিয়া, সোলোগাব শেষে জীবনের তরলতার দিক ছাড়িয়া তাহার গভীরতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার "The Little Demon" নামক দীর্ঘ উপন্যাসে তিনি সমাজের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর তুচ্ছ জাঁকজমকের একখানি ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু সোলোগাবের পরিণত চিত্তের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়, তাঁহার "The Lily and the Cabbage" নামক সুন্দর কাহিনীতে। ইহার মধ্যে তিনি সমাজের চিরাচরিত বাঁধা-ধরা রীতিনীতির ভণ্ডামির উপর প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিয়াছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মড়া কি জ্যান্ত হয়?

বিলাতের একখানি প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক কাগজে এ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আমরা তাহার সার-মর্ম্ম তুলিয়া দিলাম।

মাঝে মাঝে শোনা যায়, মরা মানুষ ফের জ্যান্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া তাহাদের অনেকে বলে যে, দেহের অস্থায়ী মরণের সময়ে তাহারা "স্বর্গ" দেখিয়া আসিয়াছে। কেউ-বা কিছুই বলিতে পারে না—মৃত্যুর সময়ে তাহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অন্ধকারে বাস করিয়াছিল। যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান লইয়া আলোচনা করেন, মরণের পরে আত্মা কোথায় যায়, এই বিষয় লইয়া তাঁহারা অনেকদিন ধরিয়া তর্কাতর্কি করিয়া আসিতেছেন।

বৈজ্ঞানিকদের চোখের সাম্‌নে সংপ্রতি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। মিসেস্

এলিজাবেথ ব্লেকের বয়স বাহাত্তর বৎসর। দশ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার দেহে "মিডিয়ামে"র ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। গত মার্চ্চমাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ডাক্তারও তাঁহাকে মৃত সাব্যস্ত করেন। তাঁহার দেহ মড়ার মতন শক্ত হইয়া আসে এবং সে দেহে নাড়ীর গতি, হৃৎপিণ্ডের দুপ্‌দুপুনি বা নিশ্বাসের কোন লক্ষণই ছিল না। এইভাবে তাঁহার দেহ আধঘণ্টা থাকে। তারপর আবার তাঁহার দেহে জীবনের লক্ষণ ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে। প্রথমে তাঁহার চোখের পাতা কাঁপিতে লাগিল, তারপর দেহ নড়িয়া উঠিল, তারপর চোখ খুলিয়া গেল, তারপর তাঁহার ঠোঁট স্পন্দিত হইল।

তিনি বলিলেন, "আমি প্রেত-জগতে গিয়েছিলুম,—আহা, সে কি চমৎকার ঠাঁই! আমি আমার স্বামী আর এগারোটি সন্তানের সঙ্গে কথা কয়ে এসেচি!" আবার পার্থিব জীবন লাভ করার দরুণ তিনি অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ ব্লেক দিনকতক বেশ সুস্থদেহে রহিলেন। তারপর আবার তিনি মরণাহত হইয়া পড়িলেন এবং ডাক্তাররা আবার তাঁহাকে মৃত সাব্যস্ত করিলেন। ঘণ্টাকতক পরে আবার তিনি জীবিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আত্মাকে পুনরায় জরাজীর্ণ দেহে ফিরিয়া আসিতে দিয়াছেন বলিয়া স্বামীকে উদ্দেশে বকিতে লাগিলেন। গত ১০ই এপ্রিল তারিখে তাঁহার তৃতীয়বার মৃত্যু হয় এবং এবারে আর তিনি জীবনলাভ করেন নাই।

এই ঘটনার কথা শুনিয়া একজন নামজাদা ডাক্তার বলিয়াছেন, "লোকে যাঁর যেমন খুসি ভাবিতে পারেন। যাঁর ইচ্ছা, বিশ্বাস করুন যে, মিসেস্ ব্লেকের আত্মা স্বর্গে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মত এই যে, চারিটি কারণের দরুণ মিসেস্ ব্লেকের অমনধারা দশা হইতে পারে। হিষ্টিরিয়া, আত্ম-সম্মোহন, মোহপীড়া (Catalepsy) বা মূর্চ্ছারোগ। মূর্চ্ছারোগের সাদাসিধে মানে হইতেছে, সাধারণ দুর্ব্বলতা; যাহাতে দেহের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া যায়। প্রগাঢ় মূর্চ্ছাকে আমরা Syncopeএর আক্রমণ বলি এবং এই অবস্থা বহুক্ষণস্থায়ী হইতে পারে।"

মোহপীড়া বা পক্ষাঘাতে মানুষের আড়ষ্ট হাত-পা'কে যে-ভাবে রাখিবেন, সেইভাবেই তাহা থাকিবে।

অনেক জন্তু-জানোয়ারকে রক্তস্রাব করাইয়া "মারিয়া" ফেলিয়া, আবার তাহাকে জীবন্ত করা হইয়াছে। অনেক মানুষকে ঔষধের দ্বারা "হত্যা" করিয়া, ঘণ্টাকতক পরিশ্রমের পর আবার তাহাকে বাঁচাইয়া তোলা হইয়াছে। বিষাক্ত বাষ্পের দ্বারা অনেককে যমের দুয়ারে পাঠাইয়া, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। বিদ্যুৎ-সাহায্যে পশুদের "হত্যা" করিয়া আবার বিদ্যুতের দ্বারাই তাহাদের জীয়াইতে পারাও গিয়াছে।

এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, "জীবন কাহাকে বলে?" এর ঠিক জবাব আজ পর্য্যন্ত কেউ দিতে পারে নাই। যদিও কোন কোন লোক বলিয়া থাকেন, জীবনটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়,—তবু

এখানে মুস্কিল হইতেছে এই যে, এঁরা আপনাদের অনুমানকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন নাই।

কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জ্যাকো লোয়েব এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে না পারিলেও, সমস্যার অনেকটা সমাধান করিয়াছেন। নানা পরীক্ষার পর সংপ্রতি তিনি মদ্দা ব্যাঙের কোন সাহায্য না লইয়াই, মাদী ব্যাঙের গর্ভ হইতে কৃত্রিম উপায়ে স্বাস্থ্যসবল বাচ্চা ব্যাঙের জন্ম দিতে পারিয়াছেন।

এর উপায়ও খুব সরল। প্রথমে মাদী ব্যাঙের ডিম বা ovum লইয়া তার মাঝখানে ছোট্ট-একটি ছাঁদা করা হয় (আল্‌পিনের সামান্য খোঁচা দিলেই চলে), তারপর তাহাতে কোন নিস্তেজ অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয়। তারপর কোন বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ভিতরে আনিয়া, শেষে সেই অণ্ডটিকে একরকম পুষ্টিকারক তরল রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে স্থাপন করা হয়। যথাসময়ে সেখানে একটি ব্যাঙাচি জন্মগ্রহণ করে।

এর-মধ্যে সব-চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, ঐ পিতৃহীন কৃত্রিম উপায়ে জাত ব্যাঙের লিঙ্গ-গ্রন্থির ভিতরেও অণ্ডের অভাব হয় না। সুতরাং মদ্দা জীবের অস্তিত্ব না থাকিলেও এইভাবে চিরকালই নূতন জীব-সৃষ্টি চলিতে পারিবে।

জীবনের সমস্যা এইভাবেই কতকটা সমাধান করা হইয়াছে। এখন "মরণ" কি, দেখা যাক্। মিসেস্ ব্লেকের "মরণে"র মতনই আর-একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। এক যুবা ডাক্তার তেরো গ্রেণ আফিমের সার খাইয়া মৃত্যুমুখে পড়েন। আফিমের সারের এক গ্রেণই যখন মারাত্মক বলিয়া মানা হয়, তখন তেরো গ্রেণ আফিমের সার খাইলে যে মৃত্যু একেবারে সন্দেহের অতীত, সে কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষ, কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, সেই যুবকের দেহে জীবনের কোন লক্ষণই বর্ত্তমান নাই।

যাহা হউক, সেই অবস্থাতেই ডাক্তারেরা সকলে মিলিয়া বিষ-প্রতিষেধক সমস্ত উপায় এবং কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা, যুবকটিকে আবার চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। প্রায় বারোঘণ্টা ধরিয়া অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিবার পর যুবকের দেহে আবার জীবনের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল। আরো কিছুকাল পরিশ্রমের পর সেই "মৃত" যুবক আবার "জ্যান্ত" হইল।

রকফেলার ইনষ্টিটিউটের ডাক্তার সামুয়েল জে, মেল্‌ট্‌জার এই ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে সকলকেই নিঃসন্দেহ হইতে বলিয়াছেন। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের আধুনিক নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন তিনিই। তাঁহারও মতে ঐ যুবক ডাক্তার সম্পূর্ণরূপেই মৃত হইয়া পরে আবার জীবনলাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখানে সকলেই যেন মনে রাখেন যে, ঐ ডাক্তার বাঁচিয়া উঠিয়া, পরলোকের কোন কথাই বলিতে পারেন নাই!

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

বাসর

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২৭ [৯ম সংখ্যা

মরণ-বাঁচনের কথা

আমাদের জাতীয়-জীবনের প্রধান সমস্যা 'মরণ-বাঁচনের' কথা। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা "বিশ্বরাজনীতির" (World-Politics) বড় বড় কথা লইয়াই উন্মত্ত, অথচ নিজের অতি-নিকটের কথা,—যাহা চোখের সম্মুখে ক্রমেই ভয়াবহ মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে,—সে দিকে কাহারও বেশী মনোযোগ দেখিতে পাইতেছি না। বৈদ্য যাহার গঙ্গাযাত্রায় আশঙ্কা করিতেছে, সে রোগী যদি বারোয়ারী তলায় যাত্রা দেখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহা যুগপৎ হাস্য ও করুণ রসের কারণ হইয়া পড়ে।

Statistics বা সংখ্যা-সংগ্রহের যদি কোন মূল্য থাকে, তবে ইহাই বলিতে হয় যে সমগ্র বাঙ্গলা দেশটা ক্রমেই ভয়াবহ মরণ-সিন্ধুর মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গলা দেশের মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, আরও ভয়ের কথা জন্ম-সংখ্যা হইতে মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য দেখা যাইতেছে। অবস্থাটা এমনই শোচনীয় যে, একজন স্কুলের ছেলেও অঙ্ক কষিয়া বলিয়া দিতে পারে—কবে আমাদের জাতির সমাধি হইবে। অনেক বিজ্ঞ ঘাড় নাড়িয়া বলেন, যুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীর নানাদেশের ন্যায়, আমাদের দেশেও, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক কারণেই হইতেছে, লোকও একটু বেশী মরিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞেরা এই কথাটা তলাইয়া বুঝেন না যে, সমস্ত জাতিটা কেন এত রোগ-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে! রোগের বীজ ত সর্ব্বদাই অণু-পরমাণুর সঙ্গে চারিদিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রোগ-প্রতিষেধের যে ক্ষমতা প্রাণশক্তির মধ্যে আছে, তাহাই তাহাকে এই-সব ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। এই প্রাণশক্তি যখন ক্ষীণ হইয়া পড়ে তখনই জাতির মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং আমাদের

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

জাতির জীবনীশক্তি যে অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িতেছে তাহা ত বেশ বুঝা যাইতেছে। কথাটা এমন শোচনীয়রূপে স্পষ্ট, যে স্বয়ং মণ্টেগু সাহেবও, পাকে-প্রকারে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই জীবনীশক্তি হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই মনে পড়ে, দেশব্যাপী ঘোরতর দারিদ্র্য। নোয়াখালির একজন কৃষক অনাহারে মরিবার সময় বলিয়াছিল, "একমুঠা ভাতের অভাবে আজ আমি মরিলাম।" কথাটা শুধু সেই দরিদ্র কৃষকের নহে,—উহা যেন সমগ্র দেশের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। বুভুক্ষা-পীড়িত দেশের ক্লিষ্ট আত্মার কাতর মর্ম্ম-বেদনা, যেন ইহার মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে। দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারে এমন লোক এই বিপুল দেশে কয়জন আছে? দৈনিক একমুঠা কাহারও হয়ত জোটে, তাও জোটে না। পরণে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাহারও একখণ্ড আছে, কাহারও নাই! অথচ, মজুর ও কৃষকও ত অলস নহে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া খাটিয়া তাহাদের বুকের রক্ত জল হইয়া যায়। আর ছেঁড়া কামিজ ও ছেঁড়া চটী পরিয়া, মুখে একখণ্ড পান গুঁজিয়া, যে সব ক্ষীণকায় বাবুর দল অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে আদালতে ছুটাছুটি করে—তাহাদের কথা মনে করিতে গেলেই আমাদের রক্ত তুষারের মত হিম হইয়া যায়। যে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; অনাহারে যাহার দেহের শিরা-উপশিরা বিকল, সে কেমন করিয়া রোগ-রাক্ষসের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবে?

ইতিহাসে পড়ি—দাসত্ব নাকি পৃথিবী থেকে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়।

ঘোর-প্যাঁচ করিয়া যাহাই বল, যতই দার্শনিকতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর, আসল কথা এই যে, জীবন-সংগ্রামে আমরা ক্রমেই হটিয়া যাইতেছি। যে প্রাচীন জাতি এতকাল ধরিয়া এত আঘাত সহ্য করিয়াও কোনও প্রকারে বাঁচিয়াছিল, আজ বুঝি তাহাকে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে হয়। বুঝি মাওরী-জাতিদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আমাদেরও তাহাই হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম, তখন কেহ কেহ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"কি, আমাদের সঙ্গে মাওরীদের তুলনা? আমরা কত সভ্য,—তারা ছিল অসভ্য ইত্যাদি।" কিন্তু বোধ হইতেছে যে ভগবান আজ আমাদের এই বৃথা গর্ব্ব ও অন্ধ সংস্কার দূর করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ধ্বংসপ্রবণ জাতির মধ্যে যে-সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমাদের মধ্যে সে সবগুলিই ক্রমে ক্রমে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। (আমরা কতকগুলি প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে এই কথা "নারায়ণ" ও "ভারতী"তে আলোচনা করিয়াছি।) প্রবল জাতির সংস্পর্শে আসিয়া এ পর্য্যন্ত প্রায় কোন দুর্ব্বল জাতিই আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। হয় প্রবল জাতির সঙ্গে মিশিয়া তাহার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, নয় একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত ডারুইনের সুপরিচিত গ্রন্থে কয়েকটী দেখা যাইতে পারে।

ভয়াবহ সন্ধিক্ষণ আজ আমাদেরও সম্মুখে উপস্থিত;—জীবনযুদ্ধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আমরা ক্রমেই হটিয়া যাইতেছি। দেহ আমাদের দুর্ব্বল, মন আমাদের নিস্তেজ; আমাদের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ আজ স্বপ্ন-কথার ন্যায়;—শিল্প-বাণিজ্য অতীতের কাহিনী। মিউজিয়মের ঘরে অতীত জীবের কঙ্কাল যেরূপ ভাবে রাখিয়া দেয়, আমাদের অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের নেতারা হাত-মুখ নাড়িয়া টাউনহলে যখন লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেন, বা মনের সম্মুখে ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের ছবি আঁকেন, তখন আমাদের মন দুঃখে ভরিয়া যায়।

ধ্বংস-প্রবণ জাতির মধ্যে ধ্বংসের প্রাক্কালে জন্ম-সংখ্যার হ্রাস হইতে থাকে; রমণীরা ক্রমশ বন্ধ্যা হইয়া আসে;—অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি তাহাদের লুপ্ত হইয়া যায়। মাওরীদের মধ্যেও এইরূপ হইয়াছিল। অনেক প্রাচীন ধ্বংস-প্রবণ জীব-জাতির মধ্যেও এরূপ দেখা গিয়াছিল। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, অনেক ধ্বংস-প্রবণ জাতির মধ্যে আবার ইহার প্রায় উল্টা আর-একটা লক্ষণ দেখা যায়;—সেটা হইতেছে জন্ম-সংখ্যার অত্যাধিক্য;—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য। কথাটা জীব-তত্ত্বের একটা গভীর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবের মধ্যে আত্মরক্ষার যে প্রবল ইচ্ছা, তাহা সকলেরই জানা আছে। উহারই আর এক মূর্ত্তি বংশরক্ষা বা জাতিরক্ষার ইচ্ছা। ইংরেজী কথায় "Self-preservation" ও (Self) reproduction"—উভয়ই একই Struggle for Existence (জীবন-সংগ্রাম) এর দুই পার্শ্ব। মৃত্যু যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, আত্মলোপের কথা যতই বেশী মনে হইতে থাকে,—জীব ততই বংশরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যক্ষ্মারোগীর মধ্যে কাম বা বংশোৎপাদন প্রবৃত্তির এইজন্য অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। ধ্বংস-প্রবণ জাতিরও ঠিক এই যক্ষ্মারোগীর অবস্থা হয়। আসন্নমৃত্যুর বিভীষিকা অনুভব করিয়া সে আত্মরক্ষা বা জাতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাই ধ্বংস-প্রবণ জাতির মধ্যে একদিকে যেমন মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য, অন্যদিকে তেমনই জন্ম-সংখ্যার আধিক্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ অবস্থা বহুকাল থাকে না। বৃদ্ধি হইতে ক্ষয়ের দিককার শক্তিই বেশী প্রবল হওয়াতে, মৃত্যু-সংখ্যা শীঘ্রই বাড়িয়া যায় ও জন্ম-সংখ্যা শীঘ্রই কমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। শেষে জন্মসংখ্যার হ্রাস (মাওরীদের মত) হইতে থাকে। আমাদের দেশে এখন পূর্ব্বের অবস্থা;—যেমন জন্ম-সংখ্যার আধিক্য —তেম্‌নি মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা জন্মসংখ্যাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই মাওরীদের দশা আমাদের হইবে বলিয়া খুবই আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

কিন্তু এই ধ্বংস হইতে রক্ষার উপায় কি? অনেকেই বলিবেন বিভীষিকার দিকটাই ত দেখাইয়া দিলে, কিন্তু আশার কথা কি কিছু নাই? উত্তরে সহজেই মনে আসে, রোগ প্রতিকার কর, জাতির অন্ন-সংস্থান কর, শিল্প-বাণিজ্যের বৃদ্ধি কর ইত্যাদি। কথাগুলা ঠিকই। কিন্তু এক হিসাবে বলিতে হয়—"এতো বহে, আগে কহ আর।"

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, রোগ-প্রতিকার, অন্ন-সংস্থান করিবে কে? যে করিবে সেই জাতীয় আত্মা যে দীন হইয়া পড়িয়াছে! গাছের মূলেই যদি জীবনীশক্তি না থাকিল, তবে ডাল-পল্লবের শোভা কেমন করিয়া আসিবে? তাই মনে হয়, এই আত্মার দীনতা কিসে ঘুচে, তাহাই হইতেছে, আসল কথা।

পরলোকগত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জীব-তত্ত্বের সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সারসত্যের অমৃত তুলিয়াছিলেন তাহা এই—"জীবনের মূলই হইতেছে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা।" আমি বাঁচিবই, আমাকে বাঁচিতেই হইবে—ইহাই হইতেছে জীবনের ভিত্তি। এই যে ইচ্ছাশক্তি, ইহাই সমগ্র জীবকে ধারণ করিয়া আছে। ব্যষ্টিগত ভাবে যাহা সত্য,—সমষ্টি-গত ভাবেও তাহাই সত্য। জাতির জীবনীশক্তির মূলে এই বাঁচিবার প্রবল ইচ্ছা। যে জাতি মরিতে চায় না—মৃত্যুকে পদে পদে তাহার কাছে পরাস্ত হইতে হয়। ধ্বংসপ্রবণ জাতির মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। জীবনযুদ্ধে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া জরাজীর্ণ স্থবির জাতি বাঁচিবার ইচ্ছাকে হারাইয়া ফেলে;—ঠিক যেন আফিসের কেরাণীর মত। আমাদের আজ সেই দশা। যদি বাঁচিতে হয়, তবে এই ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে; লুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। আমাদের সঙ্কল্প আমরা বাঁচিবই—এই বিরাট বিপুল বিশ্বের প্রাণের লীলাক্ষেত্রে আমাদের নিতান্তই যোগ দিবার প্রয়োজন। তপস্যা দ্বারা জাতীয় আত্মাকে শতদল-পথে এইরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তখন স্বাস্থ্য-সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের লক্ষ্মী আপনিই আসিয়া তাহার উপরে চরণস্থাপন করিবেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

পতিতা

রজনী প্রহর যায়—
সব কাজ করি সায়,
পা দিয়েছি পথের উপর,
সহসা কানের কাছে,
একেবারে প্রাণে বাজে,
এ কাহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বর!
সারা দিন মেঘে মেঘে
শ্রাবণ ঝরিছে জেগে,
বাদল করিছে আনা-গোনা!
আর্দ্র শীত বর্ষা-বায়ু
কাঁপায়ে তুলিছে স্নায়ু,
বিজলীতে ঝলিতেছে সোনা!
পথের নাহিকো সাথী—
জনহীন স্তব্ধ রাতি
ঝিমায়ে বুনিছে তন্দ্রা-জাল!
সারা দিবসের চাপে
অবসন্ন হিয়া কাঁপে,
পায় মেতে উঠেছে মাতাল।

আধ ঘুমে—আধ জাগি'
চলেছি ঘরের লাগি,
কোন মতে ভাঙি অবসাদ,
সহসা কানের কাছে
একেবারে প্রাণে বাজে
এ কাহার চাপা আর্ত্তনাদ!
কে আজ এমন রাতে,
এই বর্ষা-বৃষ্টি-পাতে
খুলে দেছে মনের দুয়ার!
এই বরষারি মত
হোথাও কি মেঘ নত,
ওখানেও জেগেছে জোয়ার?
থমকি তাকায়ে দেখি—
ও হরি! হেথায় এ কি,
পথে কে যে পড়িয়া বিকল!
ফেলিতে প্রদীপালোক
অপলক দুটি চোখ—
রূপেরো কি নেমেছে বাদল?
কোমল বিড়ালের ছানা;
ঘেরি তনু দেহখানা
লাবণ্যের দুলিছে লহরী,
মেঘের ধারায় ভিজে
জমাট যৌবন নিজে
পথের উপরে আছে পড়ি।
অকস্মাৎ একেবারে—
ঝুঁকিয়া পথের ধারে
যেমন টানিব দেহখান,
সে কি কান্না বুক-ভাঙা,
বেদনার রক্তে রাঙা
সে কি আর্ত্ত কাতর আহ্বান!

* * *

ভাবিনু মনের শ্রান্তি—
সারা দিবসের ক্লান্তি
রচিয়াছে এতগুলা ভুল,
ভালো ক'রে আঁখি মুছে
আবার দেখিনু খুঁজে
পথে পড়ে ঝরা বন-ফুল!
শ্রাবণের ধারাগুলি
মুক্তাসম আছে দুলি
ঘিরে ঘিরে কালো কেশপাশ,
তখনো মাথার পরে
বাদল পড়িছে ঝরে,
হা—হা—ক'রে শ্বসিছে বাতাস।
কিছুক্ষণ সব ভুলি
দৃষ্টিহীন আঁখি তুলি
দাঁড়ায়ে রহিনু—তার পর,
মূর্চ্ছিতারে তাড়াতাড়ি
একেবারে নিনু কাড়ি
কাদা হ'তে বুকের ভিতর।

* * *

বাহিরে মেঘের দোলা,
সমুখে দুয়ার খোলা,
কে আছ গো? কহিলাম হাঁকি,
—হেথা এস, দেখো চেয়ে,
বুঝি তোমাদেরি মেয়ে,
মরার বিশেষ নাহি বাকি—
ঘরে ঘরে দ্বার বাঁধা,
আঁধারের আর্ত্ত কাঁদা
দিকে দিকে উঠিতেছে ফিকে,
ভাঙ্গিয়া স্তব্ধতা সব
মোর-কণ্ঠ কলরব
আঘাতিছে জানালার চিকে।

ভাবিতেছি শূন্য গেহ,
পোড়ো বাড়ী, নাই কেহ ;
কি যে করি ধেয়াইছি মনে ;
সহসা দুয়ার ঘেঁসে
কে যেন দাঁড়াল এসে
আগুন ভরিয়া আঁখি-কোণে !
কহিল—পারিনে ছাই,
এমন তো দেখি নাই,
এ যে বাপু বড় বাড়াবাড়ি,
সেই আজ কোন্ ভোরে,
বিড়ালটা গেছে মরে,
মেটেনি এখনো জের তারি !
শোনো তবে কাণ্ডখানা—
ঐতো বেড়াল-ছানা,
মানুষ করেছে ঐ বটে,
সারাদিন তারি লাগি
কাঁদিয়া কেটেছে জাগি,
বসে নাই ভাতেরো নিকটে।
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত যবে
ঘুমায়ে পড়েছে সবে,
ছানাটারে চুরি ক'রে আমি,
জানলা গলায়ে পথে
ফেলেছিনু কোনো মতে—
এত সব তাহারি ফাকামি !
প্রাণ বলে কিছু নাকি
আমাদের আছে বাকী !
দেহ বেচে মিটাই অভাব,
বিড়ালের ছানা ও ত—
মানুষ মেরেছ কত
তারি কিছু রেখেছ হিসাব ?

শয্যায় দেহটি থুয়ে,
বারেক সমুখে শুয়ে
ধীরে এসে দাঁড়ানু বাহিরে,
কোনো কথা নাহি বলি
খোলা দ্বারে এনু চলি,
বিস্ময় বহিয়া আঁখি-নীরে।
আর্দ্র অজগরবৎ
পড়ে আছে দীর্ঘ পথ,
বাদলে বিকল চারিভিত,
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
হা—হা বায়ু ওঠে হেঁকে,
নভতল চিরিছে তড়িৎ।
একই পথে বারে বারে
ঘুরিয়া ঘরের দ্বারে
অবশেষে দাঁড়ানু যখন,
তখনো বুকের ভাঁজে
তেমনি করিয়া বাজে
তারি আর্ত্ত করুণ রোদন !
রূপের পসরা বয়ে
দিন যার গেছে ক্ষয়ে,
দেহের বেসাতি করে যারা,
এই কি তাদেরি নারী !—
সহসা নিশ্বাস ছাড়ি
ক্ষণেক রহিনু মুগ্ধ পারা !
তার পর শয্যা-খানি
কখন্ নিয়েছি টানি,
বালিসে বেঁধেছি আলিঙ্গনে,
কখন্ চোখের কাছে
নিদ্রা নেমে আসিয়াছে
এতটুকু নাহি তায় মনে।

* * * * * * *

সমস্ত শ্রাবণ-রাতি
করিয়াছে মাতামাতি
মেঘ আর মাতাল বাতাস,
কেবল তন্দ্রার মাঝে
কানে এসে বাজিয়াছে
তাদেরি কঠিন অট্টহাস !

কেবল ঘুমের ঘোরে
স্তব্ধ হৃদয়ের দোরে
মাঝে মাঝে হেনেছে অশনি,
একেবারে বুক-ভাঙা
বেদনার রক্তে রাঙা
পতিতার আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনি !

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সম্ভোগ-তত্ত্ব

যদি আমাদের কেহ সমগ্র বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসা করিয়া, এক কথায় মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলে, তাহা হইলে, আমরা বলিব, "মানব ! তোমার কর্ত্তব্য অতি সহজ। এই বিশ্ব তোমারই জন্য সৃষ্ট ! এই বিশ্বের যাহা-কিছু—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—সকলই তোমার সুখের জন্য,—তোমার আনন্দের জন্য—তোমার আত্মবোধ জাগাইয়া দিবার জন্য অবস্থিত। যাও মানব ! তোমার সুখের রাজ্যে—তোমার যাহা-কিছু আছে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সব দিয়া বিশ্বকে উপভোগ কর—তবেই সেই পরম-সুন্দরের উপলব্ধি করিতে পারিবে—কিছুমাত্র দ্বিধা করিও না—সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা কিছুই হৃদয়ে স্থান দিও না। জাগো প্রকৃতির একনিষ্ঠ সাধক, কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে—জানিও এই বিশ্ব তোমার বন্ধনের জন্য নহে—মুক্তির জন্য। যতক্ষণ তুমি সংকীর্ণ, অল্পে তৃপ্ত,—ততক্ষণই তুমি ক্ষুদ্র, ততক্ষণই তুমি বদ্ধ—কোন ক্ষুদ্র জিনিষের উপর তোমার দৃষ্টি রাখিও না,—ভূমাই তোমার আদর্শ হোক। তুমি যতই ছোট জিনিষের দিকে ছুটিবে ততই তুমি নিজেই নিজের চারিদিকে অসংখ্য বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া আপনাকে কোষবদ্ধ গুটিপোকার মত জড় হইয়া ফেলিবে। অনন্তের দিকে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত কর—তোমার প্রাণের ক্ষুধাকে জাগাইয়া সমগ্র বিশ্বের দিকে ছুটাইয়া দাও—দেখিবে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি ! এই নূতন যুগের নূতন সাধনায় কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না—সবই গ্রহণ করিতে হইবে—বিশ্বের যা' কিছু, কোনদিকে বাদ দিলে চলিবে না,—জানিও, এই বিশ্বের যেটুকু ও যতটুকু তোমার সম্ভোগের তালিকা হইতে বাদ পড়িবে, তুমি সেই পরিমাণেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, তোমার আত্মা সেই পরিমাণেই সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণ হইয়া থাকিবে।"

এ বিশ্ব আনন্দময়ের লীলা-নিকেতন—আনন্দেই ইহার জন্ম, আনন্দেই ইহার

স্থিতি এবং আনন্দেই ইহার পরিণতি। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" দুঃখ, বিষাদ, কলহ, রোগ, শোক, মৃত্যু—ইহাদিগের কোনটিই বিশ্বের প্রকৃতি নহে—এ সমস্তই মনুষ্যের নিজের সৃষ্ট—আত্মকৃত অপরাধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া বিশ্ব-নিয়ন্তাকে গালি দেয়।

মানুষ চায় ভোগ, কিন্তু ভোগের আসল প্রকৃতিটুকু সে জানে না, তাহাতেই অল্পের মধ্যে ভূমার, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ও সান্তের মধ্যে অনন্তের সন্ধান করিতে গিয়া, ব্যর্থ-মনোরথ হয় এবং হা-হুতাশ করিতে থাকে। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখম্ অস্তি।" সুতরাং তাহার ভোগ তাহার মুক্তির কারণ না হইয়া অধিকাংশ স্থলেই তাহার বন্ধন ও আসক্তিরই হেতু হইয়া থাকে। তখন কেহ কেহ ত্যাগকেই জীবনের আদর্শরূপে বরণ করিয়া ত্যাগের নামে ধ্বংসের—বৈরাগ্যের নামে দীনতা ও হীনতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক, অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। ফলতঃ ভোগই মানুষের জীবনের চরম আদর্শ।

শ্রুতি ভগবানের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'রসো-বৈ-সঃ'—তিনি যদি রসস্বরূপ হইলেন—তখন, তাঁহার সাধক হইতে গেলে, আমাদিগকেও রসিক হইতে হইবে এবং রসচর্চ্চা ও রসসাধনায় আমাদিগের সম্ভোগ-শক্তিকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া বিশ্বের এই অনন্ত রস-প্রবাহের মধ্যে আপনাদিগকে নিঃশেষে ও নিঃসংশয়িতরূপে ঢালিয়া দিতে হইবে। তবে, ভোগের আসল প্রকৃতিটুকু ভুলিলে চলিবে না। আমরা অনেক সময়ে, ভোগের সেই আসল প্রকৃতি-টুকু ভুলিয়া যাই বলিয়াই কষ্ট পাই। সম্ভোগ করিতে হইবে বলিয়া, আমরা অনেক সময় ক্ষণিক সুখের আশায় মধুলুব্ধ মক্ষিকাবৎ সংসার-ভাণ্ডে নিপতিত হইয়া বিষয়রসে বিজড়িত হইয়া পড়ি এবং পরিশেষে আমাদিগের উত্থান ও উদ্ধার-শক্তি হারাইয়া অশেষ প্রকার দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকি।

কিন্তু, চাহিয়া দেখ ঐ মুক্তপক্ষ, প্রফুল্ল ভ্রমরটি কেমন গুন্-গুন্ করিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমনপূর্ব্বক চারিদিকে আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া মধুসঞ্চয় করিতেছে। অনবরত কার্য্য করিতেছে—এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে—প্রাণে আনন্দ, হৃদয়ে উৎসাহ ও দেহে অদম্য কর্ম্ম-শক্তি লইয়া কর্ম্মের সাধনা করিতেছে আর বিশ্ব-রাজ্যে যত মধু আছে—পৃথিবীর চক্ষে যাহা অতি নীরস, কঠোর ও শুষ্ক—তাহার মধ্য হইতে মধুসঞ্চয় করিতেছে;—অথচ দেখ, সে কত মুক্ত—কত স্বাধীন, ক্ষুদ্রের মধ্যে সংকীর্ণের মধ্যে তাহার আনন্দ নাই—সে একের মধ্যে আবদ্ধ নহে—ছুটিয়াছে বহুর দিকে—অসীমের দিকে—অনন্তের দিকে।

মানুষ, তুমিও ছোটো বহুর দিকে, অনন্তের দিকে। সান্তের মধ্যে তৃপ্তি চাহিও না, ক্ষুদ্রের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিও না—তোমার সম্ভোগের গণ্ডী বাড়াইয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত আপনাকে একান্ত ও সম্পূর্ণ ভাবে মিলাইয়া দাও, তুমি শান্তি পাইবে।

সম্ভোগ-তত্ত্ব ও বৈরাগ্য

পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ভোগই মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য। "জীবনটাকে উপভোগ কর", ইহাই প্রকৃতির নির্দ্দেশ এবং তজ্জন্য যাহা-কিছু ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তির প্রয়োজন, ভগবান তার কোনটি থেকেই মানুষকে বঞ্চিত করেন নাই। কিন্তু এই সকল মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির পরস্পরের মধ্যে সমতা রক্ষা এবং তাহাদিগের সুসঞ্জসীভূত বিকাশের উপরেই মানুষের উপভোগ করিবার শক্তি নির্ভর করিতেছে। এইখানে সম্ভোগ-তত্ত্বের সহিত বৈরাগ্যের সম্বন্ধ। বৈরাগ্য বা ত্যাগ জীবনের উদ্দেশ্য নহে—ভোগই উদ্দেশ্য, ত্যাগ তাহার উপলক্ষ্য বা উপায় মাত্র। ত্যাগ বিনা ভোগ অসম্ভব। ত্যাগের ভিতর দিয়াই ভোগকে ধরিতে হইবে। নচেৎ ত্যাগহীন ভোগ উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। উচ্ছৃঙ্খলতায় মনুষ্যের সুখ কোথায়? যাহাকে উপভোগ করিতে হইবে তাহাকে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় ও সমস্ত মনোবৃত্তি দিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে; যে পরিমাণে ঐ সকল ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তির পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের বিচ্যুতি ঘটিবে, সেই পরিমাণেই আমাদিগের ভোগ জিনিষটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, আর যে পরিমাণে আমরা আমাদিগের সমস্ত মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত করিয়া, বিষয়ান্তর হইতে আহরণ পূর্ব্বক ভোগ্য বিষয়ের উপর নিক্ষিপ্ত ও কেন্দ্রীভূত করিতে পারিব—সেই পরিমাণেই আমরা উক্ত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া সেই লীলাময়ের লীলারস আস্বাদনে সমর্থ হইব। ভগবান এই বিশ্বকে এবং বিশ্বের মধ্যে যাহা-কিছু আছে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—আত্মারূপে, প্রাণরূপে, অন্তর্যামী ও সর্ব্বসাক্ষীরূপে ওতঃপ্রোতভাবে বিশ্বের সহিত মিলিয়া তৎসমূহ সম্ভোগ করিবার জন্যই এই বিশ্বলীলার অবতারণা করিয়াছেন। তুমি আমি যদি বিশ্বকে উপভোগ করিতে চাই, তাহাতেই কি দোষ হয়?

তবে কথা আছে। আমাদের ভোগ—দানবের ভোগ, আমরা যাহা ভোগ করি, তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলি এবং শেষে হাহাকার করি। ঐ যে সুরম্য গোলাপ ফুলটি প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া চারিদিক সুবাসে আমোদিত করিতেছে, উহাকে ছিঁড়িয়া, দলিয়া, মথিত করিয়াই না আমাদিগের সুখ? কিন্তু ভগবান তাহা করেন না। তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন না। দেখ দেখি, তিনি কেমন উহার সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়া, নিজেই একেবারে পুষ্পময় হইয়া রহিয়াছেন এবং নিজের সকল সৌন্দর্য্য ঐ পুষ্পের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া আপনার সত্তাটিকে সেই সৌন্দর্য্যের আবরণে আবৃত ও বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন! বাহিরে দেখি ফুল, কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না, আর রাখিবারও যো নাই। এই যে সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপ—ইহাই ভগবানের সম্ভোগ-নীতি। বড় সহজ কথা নহে—সম্ভোগ করিতে কে পারে? যে ভোজ্য বস্তুর মধ্যে আপনার সমগ্র সত্তাটিকে ডুবাইয়া দিয়া নিজের দেহ মন ও আত্মার সকল সৌন্দর্য্য তাহার মধ্যে নিঃশেষে ঢালিয়া দিতে পারে, সেইই সম্ভোগ-

তত্ত্বের প্রকৃত অধিকারী, সেই নরশ্রেষ্ঠই ভোগের প্রকৃত সাধক।

যাহাকে বৈরাগ্য বলি, তাহা একপ্রকার সাধনা মাত্র, তাহা মানুষকে প্রকৃত সম্ভোগের পথে লইয়া যায়। আমরা বাহিরের ভোগ-টাকেই খুব বড় করিয়া দেখি—স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যটাকেই সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি—কিন্তু বাহিরের ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আমাদের মনেরও যে ইন্দ্রিয় আছে—আত্মারও যে রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ ধারণা করিবার শক্তি ও সাধনযন্ত্র আছে, তাহা ভুলিয়া যাই। যাহাকে সাধারণী ভাষায় ত্যাগ বলিয়া থাকি—বৈরাগ্য বলিয়া কঠোর চক্ষে দেখি, তাহা এই মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভোগের সোপান মাত্র।

মনে কর, আমি একটি সুমিষ্ট আম্রফল পাইয়াছি, আমি নিজে তাহা ভক্ষণ করিলাম—স্থূল রসনেন্দ্রিয়ের কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি হইল বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। ইহা একপ্রকার ভোগ বটে, কিন্তু এরকম ভোগকে প্রকৃত ভোগ বলা যায় না। ইহাতে দেহের পরি-পুষ্টি হইল—কিন্তু, মন আত্মার পরিপুষ্টি হইল না। কিন্তু যদি ঐ ফলটি নিজে ভক্ষণ না করিয়া জনৈক ব্যক্তির মুখে তুলিয়া দিতে পারিতাম এবং তাহার সত্তায় আপনার সমগ্র সত্তাটিকে মিশাইয়া দিয়া মনের মধ্যে, আত্মার মধ্যে—আত্মার যে ইন্দ্রিয় তাহাদ্বারা ঐ ফলটির মিষ্টস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতাম বল দেখি, তবে কি তাহা আমাদিগকে বাহিরের রসনার তৃপ্তি অপেক্ষা স্পষ্টতর ও মহত্তর তৃপ্তি আনিয়া দিত না? দেহের বিনাশ আছে—আত্মার বিনাশ নাই। সুতরাং দৈহিক সম্ভোগ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্ভোগই শ্রেষ্ঠ।

দেহের সম্ভোগ ক্ষণিক—দেহের বিনাশে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু আত্মার সম্ভোগ চিরন্তন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও তাহার বিনাশ নাই। যাহা ভোগ করিবে চাও তাহার প্রতি কোনরূপ মমতাবোধ রাখিও না—কেননা মমত্ববোধ সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া, সম্ভোগের মাত্রা কমাইয়া দেয়। অতএব তাহার সহিত শুধু দৈহিক মিলন না রাখিয়া মনোমধ্যে তাহার ধ্যান কর এবং আত্মার দ্বারা তাহার সহিত একীভূত হইয়া তাহাকে সমগ্র বিশ্বের সহিত মিলাইয়া দাও, লক্ষ লক্ষ দেহে লক্ষ লক্ষ প্রাণে লক্ষ লক্ষ আত্মায় তাহার সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়ুক—বিশ্বের সমগ্র নর-নারীর কণ্ঠে তাহার জয়গীতি বিঘোষিত হউক, দেখিবে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! ভগবান আমাদিগে সকলকে তাঁহার সম্ভোগ-লীলা বুঝাইয়া দি —আমরা যেন প্রকৃত সম্ভোগের অধিকা হইয়া ধন্য হইয়া যাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়

তফাৎ

দপ্তর-খানায় চাকরী করতো, বড্ড গরীব লোকটা। আপন-জন, সহায়-বন্ধু তার সে নিজেই—সম্বলের ভিতর ছিল গতরখানা। দিন-মজুরেরো বাড়া, হাড়-ভাঙ্গা, শক্তি-সা খাটুনীটা বেচারী খাটতো দিনটা ভরে—পি খানা ভেঙে পড়তে চাইতো—গুরু ভারে

বুকের রক্তটুকু জল হয়ে বেরিয়ে আসতো ঘরণা-ঘামের ডাগর ফোঁটায়।

মনিব-সরকার থেকে তন্‌খা যা আসতো তাতে মাস-কাবারে পেটে খেতে দু'মুঠোই জুটতো না—এর উপর আবার অঙ্গ-ঢাকা কুর্ত্তা কেনা আছে—সাদা কাপড়ের ঝোলা চাপকান, নইলে দপ্তরীর চাকরীটুকুও টেঁকে না। চার-চারটে কচিবাচ্ছা—এতটুকু-টুকুন্—অষ্ট প্রহরই ভুঁয়ে পড়ে আছে, আর সকাল-দুপুর, বিকাল-সন্ধ্যা বারো ঘড়ি চাইছে শুধু রুটি।

লক্ষ্মী তার বউটী। মুখে কথা নেই,—কাজল চোখে অশ্রুর কলঙ্ক নেই—অধরে হাসি অবিশ্যি শুকিয়ে গেছে—কিন্তু দীর্ঘ নিশ্বাসে কারো বিরুদ্ধে তপ্ত অভিযোগও সে কখনো জানায় নি। গাঁটের পাশে গাঁট বাঁধা তার কাপড়খানা,—দেহ কঙ্কালসার, তরুণ মুখের কাঁচা রং পিংসে হয়ে গেছে—ভাসা চোখ, নেমে-পড়া পাতা দুখানার নীচে বসে এসেছে! কোলের মেয়েটী, দুধের শিশু—কাঁচা কলার শুক্‌নো গুঁড়ো গরম জলে গুলে তাকে খাওয়াতো—তাও কি পেট ভরে দিতে পেতো?—হায়রে কপাল! মুখের পানে তাকিয়ে মায়ের ফালি-ফালি, ময়লা কালো আঁচলখানা টেনে টেনে অস্পষ্ট, অফোটা তার ভাষায়—এক চুমুক খাবারের মিনতি-ভরা ভিক্ষা যখন সে জানাতো—মায়ের কাছে তখন তা অমৃতের পূর্ণ পাত্র উপুড় করে দিত না—পাঁজর কখানা তার হাজার টুক্‌রোয় ভেঙ্গে যেতে চাইত! সে তাকে বুকের সুধার লহর ঢেলে দিতে যেতো—নিজেকে দিয়েও যদি সন্তানকে বাঁচাতে পারে! কিন্তু দুদিন পরে একবেলা তার আধপেটা সে খাওয়া—কলজের রক্ত-ফোঁটাই কি আর বক্ষের উৎসে এসে জমতে পেতো!—মর্ম্মের মাঝখানে জমাট-বাঁধা সে গুমোট ব্যথাটা ছাতি-ফাটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে টাটিয়ে উঠে হতভাগীর দম্ বন্ধ করে আন্‌তো—কিন্তু কঠিন প্রাণটা তবু বেরুতো নাতো!

মাথা গুঁজে তারা থাকতো একখানা এক-চালার নীচে—দেবতার তাও সইল না। দখিণ থেকে হাওয়া সেবার ফাগুনেও আগুন হয়ে এসে শিল-হানা বৃষ্টির পিচকিরি মেরে হোলি খেলে গেল—বেচারীর চালাখানার বুকের উপর! মাতাল তার পায়ের ছন্দে এর যা কিছু ছিল, আবরণ-আচ্ছাদন, উড়ে গেল। রৌদ্রকে আর ধরে রাখা যায় না—হিম-হানা জ্বর কি আর শাসন মেনে বাইরে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়? সে এসে ছেলে-পুলে শুদ্ধ এই দম্পতীটীকে কাঁপিয়ে তুল্‌লো শিউরে উঠ্‌লো তাদের ফুকের ছিদ্রে ছিদ্রে—আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে গেল তাদের গায়ের উপর।

এমন সময়—অজন্মা—দুরান্তে কোথায় দিগন্ত-রেখার নীলা মেরজাই গায় জড়িয়ে নিজেরই সে তুহিন নিশ্বাসে আচ্ছন্ন একা—অঙ্গার-অঙ্গে হিম শিউরে শিউরে কেঁপে উঠ্‌ছিল—মৃত্যুর পরোয়ানা তাকে উষ্ণ, উত্তেজিত করে তুল্‌লে। এই দেশে সে বিকট হয়ে দেখা দিলে—হাড়ের নূপুর পায়ে দিয়ে—ক্ষেতে-ক্ষেতে সেই আজন্ম-শ্যামল, হাওয়ায় হীরা-ভাঙা লীলায়িত রূপের উপর মরণ নিশ্বাসের বুটী-তোলা গাঢ় পাণ্ডুর পুরু পর্দ্দাখানা টেনে সে বিছিয়ে দিলে—

সেখানকার সে ভরপুর ভাণ্ডারের যত মতি-পান্না চুর-চুর করে মাটীতে মিশিয়ে দিয়ে রাক্ষসী নেশায় উন্মত্ত সে নিষ্ঠুর আপন আনন্দে নেচে উঠ্‌লো—সে কি উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য! ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ নিয়ে এল—বিশ্ব-গ্রাসিনী ক্ষুধা, কঙ্কাল-সার দেহ—রক্ত-লেলিহান জিহ্বা—তারপর সকল-ভোলানো মৃত্যু!

লোকটা আর পারে না! চারদিন শুধু জল খেয়ে কাটিয়েছে—অবসন্ন পায়ের উপর আজ আর তার দাঁড়িয়ে ওঠবার বল নেই! ক্ষুধায় শীর্ণ দেহ নিয়ে মনিবের কাজ-ঘরের কড়া ফরমাস ক'লও খেটে এসেছে—কিন্তু আজ দেহ চল্‌তেই নারাজ।

ঘরে কোলের মেয়েটী জ্বরে পড়ে কোঁকাচ্চে—গা খই-ফোটানো বালির মত তপ্ত আগুন! শীতে সে শিউরে উঠ্‌ছে—খাবার চাইছে না আজ—চাইবে যে, সে যে ঐ অদূরের আগল-হীন অবারিত দ্বারের ফাঁক দেখে মুক্তির অবাধ প্রসারের ভিতর বাঁধন-হারা ছাড়া পাবার জন্য অসীমের ঐ ঘন নীলিমার দিকে একলক্ষ্যে উধাও হয়ে উড়ে চলেছে!

মনিবের বড়-ভালো যাঁরা চান্—তাঁরা চাকর নন্, চাকুরে। তাঁদেরই বাড়ী থেকে পেয়াদা এল ডাক্‌তে—আজ পাহারার কাজে দপ্তরীকে সারা রাত জাগ্‌তে হবে।

রোগ-ক্ষীণ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন—পাহারাদার?"

পেয়াদা উত্তর দিলে—"খেতে না পেয়ে সে মরে গেছে—আর দোস্‌রা পাহারাদারও রাখা হবে না। দানা-রোটি, চাল-ডালের বড় দাম—"চাকুরে" আর চালাতে পারেন না। দপ্তরী যে, আজ থেকে বাড়ীপাহারা কাজও তার।"

"দপ্তরীর জান্ বাঁচে কিসে? কে বাঁচায়?—তার রুটী, এক টুক্‌রো শুক্‌নো রুটী—কে জোগাবে?"

"চাকুরের তা দেখ্‌বার অবসর নেই—হুকুম—তোমায় তামিল কর্ত্তেই হবে।"

"আর এই মেয়ে—তার শেষ নিশ্বাসটা না পড়া অবধি তাকে ছাড়ি কি করে? শীতে কাঁপ্‌ছে—ঢেকে দেবার ছেঁড়া একখানা আঁচলও নেই—বাপ, মা দুজনে আজ দুখানা বুকের মধ্যে ওর দেহখানি জড়িয়ে ধরে বসে আছি—বুকের গরমে যদি হিম কমে! কিন্তু তাই বা কই? বুকে গরম কই?—রক্ত নেই—অসাড়, বরফ!"

"নোকরের লেড়্‌কা তো মর্‌বেই, চাকুরে বলেছেন—তাই বলে সে নিজে মর্‌বে কেন? দশ-বাজে হাজির না হলে—তন্‌খা কাটা যাবে—পাঙ্খাওয়ালাকে পাহারায় আন্‌বেন।"

"তাঁর মেয়ের সাদি দিতে মাহিনা-ভর ছুটী নিলেন—তখন কি তাঁর তন্‌খা কাটা গেছ্‌লো?"

"না—ভারী নক্‌রী তাঁদের—তলব-গুদ্ধ ছুটী! দপ্তরীর ফিন্ ছুটী কি? আর তলবই বা সে পাবে কেন? আট রূপেয়া এক মাহিনায়—বহুৎ, ঢের!"

"হুঁ—"বল্‌তেই একটা মস্ত নিশ্বাস ক্ষুধার্ত্তের শীর্ণ পাঁজর কখানার উপর এক সঙ্গে হাজার শাণিত ছোরার শক্ত আঘাত হেনে বাইরে বেরিয়ে এসে পড়্‌লো, বেচারীর বুকের পাশে একটা কালো কলঙ্কের ছাপ

মেরে। বেচারী সেইখানেই বসে পড়্‌লো, কিন্তু কাঁপছিল—থাক্‌তে পার্‌লে না—ধুলোর উপর সে লুটিয়ে পড়্‌লো। পেয়াদা বল্লে—"ওহো—হায় হায়!" ওদিকে মনিব কুরসীতে বসে চটে টং হচ্ছিলেন—কাজের বে-বন্দোবস্ত—এখনো এলোনা বেটা পাহারায়!

একদল লোক যাচ্ছিল—ক্ষুধায় তারা রাক্ষস—পেট চিম্‌সে লেগে পিঠের সঙ্গে এক হয়ে গেছে! নড়ি-নড়ি হাত-পা—ডাগর মাথাটা তখনো তারা তুল্‌তে পারে—! ছুটে চলেছে তারা, কাতর স্বরে, সরু গলায় ডাক্‌তে ডাক্‌তে—"ওরে! তোরা কে আছিস—ক্ষুধাতুর, অর্থহীন, অন্নহীন,—গৃহ-হারা হতভাগা, ছুটে আয়—যা আছে, লাঠী-সোটা, তাই নিয়ে ছুটে আয়—মরণ তো এসেইছে—ঐখানে গে মরিগে, ওদেরই দোরে—মনিবের ভাণ্ডারের হিসাব রাখ্‌ছে যারা, চাকুরেরা—তাদেরই বুকের উপর। খেতে যদি দেয়, তলব যদি বাড়ায়—ভালো! নইলে—"

দপ্তরীর প্রাণের ভিতর গিয়ে সেই সব কথা গুলো আঘাত করলো—দুর্ব্বল দেহের ভিতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ বুঝি চল্‌কে উঠে তাতে বল সঞ্চার করে দিয়ে গেল। সেও এসে যোগ দিলে, এই আত্মহারা উন্মাদদের কলরবে। মেয়েটী ভুঁয়ে পড়ে তখনো ধুঁক্‌ছিল,—মা তাকে বুকে ঢেকে কোলে জড়িয়ে অন্য শিশুগুলিকে পিঠের উপর আশ্রয় দিয়ে পড়ে রইল, মুখ বুজে—মরিয়া স্বামীকে ফেরাবার জন্যে নারীর নিবেদন, স্ত্রীর দাবী, মায়ের মিনতি নিয়ে সে গিয়ে আজ সাম্‌নে দাঁড়ালো না।

আকাশের দূর পরিসর কাঁপিয়ে নিগস্তে প্রতিধ্বনি তুলে হতভাগাদের "দাও-দাও" ভিক্ষা স্পষ্ট হয়ে, পরিস্ফুট হয়ে সঘন হয়ে উঠ্‌লো। চাকুরে বিপদ গণ্‌লেন—পাহারা-দার কেউ এগোলো না—এদের রোখে কে?

রাজার কাণে এ ধ্বনি বজ্র-নির্ঘোষের মত গিয়ে বাজলো—এ কি রাষ্ট্র-বিপ্লব—বিদ্রোহী-দের বিজয়-দামামা?—প্রাণ তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো—বুকের ভিতরটা বেজে উঠ্‌লো।—তিনি খবর জিজ্ঞাসা কল্লেন—"কি হয়েছে—কিসের এ গোলমাল?"

সংবাদবাহী বল্‌লে—"ক্ষুধায় উন্মাদ লোকগুলো এসেছে রাজকোষ লুট্‌তে—হয় তাদের অন্ন দিতে হবে—তলব বাড়াতে হবে—নয়তো ওরা ভাণ্ডার লুট্‌বে। অক্ষম যদি হয় ওইখানেই পড়ে মর্‌বে না কি আজ!"

মহারাজ বল্লেন—"আহা! বেচারীরা! দাও, ভাণ্ডার খুলে দাও—রাজকোষ মুক্ত কর—তন্‌খা ওদের বাড়িয়ে দাও।"

খবর শুনে উচ্ছৃঙ্খল জন-তরঙ্গ শান্ত হল—আশ্বাস পেয়ে তারা হেসে উঠ্‌লো।

চাকুরে এসে বল্‌লেন—"মহারাজ, করেন কি? অজন্মার দিনে ভাণ্ডার খালি করলে—উপায়?"

মহারাজ বল্‌লেন—"উপায় ভগবান! অবশেষে না হয় মৃত্যু—ভাণ্ডার উজাড় করে ওদের অন্ন দাও।"

"মহারাজ,—আমারও ঘোড়ার দানা-পানি জোটে না, গন্ধ-দীপ জ্বালবার তেল কেন্‌বার কড়ি নেই—মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি—আমার—আমাদের সম্বন্ধে বিবেচনা?"

"হ্যাঁ,—সকলের সম্বন্ধেই বিবেচনা অবশ্য কর্‌তে হবে। ভাগ বেঁটে নাও—বিলি কর। অন্নের অভাবে যেন প্রজার জীবন-নাশ না হয়। ভাণ্ডার উজাড় হলেও আমার উত্তরীয়ের মণি আছে, মহিষীর অঙ্গের আভরণ আছে—প্রাসাদ-চূড়ার স্বর্ণ আছে—তারপরে—তারপরে দেবতা আছেন—ঘন-কৃষ্ণ মেঘের ধারে অমৃতের বৃষ্টি নামবেই নিশ্চয়।"

চাকুরে এলেন। তন্‌খা বাড়ার সুসমাচার জানিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করে দিলেন—আশা নিয়ে আনন্দিত তারা অভাগার দল ঘরে ফিরে এল।—দপ্তরী এসে দেখে, মায়ের অসাড় আড়ষ্ট বুকখানার পাশে, কোলের মেয়েটার শক্ত কাঠ মৃত দেহটী পড়ে আছে—ছেলে-মেয়ে তিনটীই চলে গেছে, সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা এড়িয়ে—সব-পাওয়া, সব-চাওয়া মেটানো—সকল-হরণ, সকল-মোহন সেই অমৃতের দেশে।

অবাক দুই চোখ তুলে লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, এই মরণেও অবিচ্ছিন্ন মায়ের মমতা-গ্রন্থিটীর পানে—মায়ের আশে-পাশে সম্বিৎ-হারা, প্রাণ-হারা তার বুকের ধন-ক'টীর রক্ত-লেশহীন পাণ্ডুর মুখ ক'খানার দিকে। "যেটী আছে, তাকে বাঁচাবো। না খেয়ে বাছারা গেছে—কিন্তু এবার তো রাজা শস্য কেন্‌বার স্বর্ণ দিতে চেয়েছেন—বুকে করে জড়িয়ে রেখে বাঁট-গরম টাট্‌কা দুধে একে বাঁচাবো।"

ভাবতে ভাবতে লোকটা ছেলেটীকে বুকের উপর জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল—শুষ্ক তার চোখ, আর্ত্তনাদ-হীন সে কণ্ঠ, কেবল বুকের ভিতরে রক্তের স্রোত চলেছে—উদ্দাম দ্রুত।

চৈত্র-সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হাওয়া পিতা-পুত্রের মুখের উপর দিয়ে আরাম বুলিয়ে বয়ে গেল—এইবার হতভাগা চেঁচিয়ে উঠে আছাড় খেয়ে মাটীতে প'ড়্‌লো, বুকের উপর ছেলেটি!

সংবাদ-বাহী এসে খবর দিলে—"তন্‌খা বেড়েছে।"

"অাঁ"—বলে সে উঠে বস্‌ল।

খবর নিয়ে এসেছিল যে, সে বল্‌লে—"হ্যাঁ তলব বেড়েছে। তোমারও বেড়েছে, আমারও বেড়েছে,—হুজুরেরও বেড়েছে।"

"বেড়েছে?—এনেছ টাকা? না দাও, টাকা দিয়ে দুধ কিনে এনেছ? দাও দাও, ঢেলে দাও এর মুখে—আহা, বাছার গলাটি শুক্‌নো কাঠ হয়ে গেছে।"

"টাকা ত আনি নি—দুধও আনি নি।—হারে হতভাগা! বাড়া তলব মিল্‌বে আস্‌চে-মাস থেকে—এক টাকা।"

"আর হুজুরের?"

"একশ টাকা! তিনমাস আগের তারিখ থেকে হিসেব হবে, তাঁদের।"

"কে বিলি কর্‌লে?"

"হুজুর।"

"হুঁ—"বলে বেচারী ছেলেটীর মুখের দিকে তাকালে।

সংবাদ-বাহী বল্‌লে—"রাজা আর চাকুরের—চাকুরের আর চাকরে—এই তফাৎ!"

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ক্রমিক নং
শ্রেণী নং
কলিকাতা।

কবিতার কথা

কবিতার জন্ম কবির কল্পনায়। কবিতা-সুন্দরী কবির মানস-কন্যা। মাতৃ-অঙ্কে শিশু যেমন ক্রমোন্নতি লাভ করে, কবির মনে কবিতাও ঠিক তেমনি প্রসার লাভ করে। কবিতা স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ও সুগভীর অন্তরের প্রতিবিম্ব—পবিত্র জীবনে শুভ ও সফল মুহূর্ত্তের আগমনের পরিচয় মাত্র। যে শক্তি থাকিলে মানুষ কবি হয়, সেই শক্তি কল্পনা নামে পরিচিত। সেই কল্পনা কত সুন্দর-সুন্দর চিত্রের সংগ্রহ ও সমাবেশ করিয়া, কত নব নব মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া কবিতাকে সাজাইয়া দেয়, যাহা অতি মলিন ও নিন্দনীয়, তাহাকেও উজ্জ্বল এবং সুন্দর করিয়া তুলে; যাহা সুন্দর, তাহাকে আরও সুন্দর ও মহিমোজ্জ্বল করে। এক কথায়,—"গরলে অমৃত করে কল্পনার ইন্দ্রজাল।" কল্পনা সুদূর অতীতের দৃশ্য বর্ত্তমানের সমক্ষে আনিয়া জীবন্তবৎ তাহা প্রত্যক্ষ করাইতে পারে এবং বর্ত্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের সন্ধান করিয়া দিতে পারে। কল্পনার চক্ষে দেশ ও কালের গণ্ডী চূর্ণ হইয়া যায়। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে।
নাহি স্থল, যথা দেবি, নাহি তব গতি।"

ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজের মূলে আত্মোৎসর্গ বা প্রেম এবং প্রেমের মূলে কল্পনা। এই কল্পনার সাহায্যে আমরা অন্যের সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদ, উৎসব-ব্যসনকে আপনার করিয়া লইতে পারি—নিজেকে অন্যের বলিয়া ভাবিতে পারি। এইরূপ ভাবিতে পারি বলিয়াই অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারি। এই আত্মোৎসর্গ প্রেমের প্রধান উপাদান কিম্বা প্রেমের অপর নাম। প্রেম আমাদের অন্তরের আসল মানুষটাকে আবিষ্কার করে; ইহার তড়িত-পরশে মন্ত্র-দৃষ্টিতে আমাদের 'আমি' বিশ্বে নামিয়া আসে, এবং বিশ্বের সকল বস্তুকেই সুন্দর ও পবিত্র বলিয়া উপলব্ধি করে। কল্পনা-শক্তি না থাকিলে অন্যকে আপনার বলিয়া ভাবা যায় না এবং কোন বস্তুকে সুন্দরের ও পবিত্র বলিয়া অনুভব করা যায় না, অর্থাৎ কল্পনা না থাকিলে, প্রেম জন্মিতে পারে না। কল্পনার অভাবে প্রেম নষ্ট হয়। যে হৃদয় যতই কল্পনা-প্রবণ, সে হৃদয় ততই প্রেমিক, উদার ও মহৎ। প্রেমের জন্ম যেমন কল্পনা-ভরা হৃদয়ে, তাহার লীলা-ক্ষেত্রও তেমনি হৃদয়ে। ইহা একের হৃদয় অন্যের হৃদয়ের সহিত গাঁথিয়া দিতে পারে—এক হৃদয়ের ভাব অন্য হৃদয়ে সংক্রমিত করিতে পারে। যখন দুইটি মানব-হৃদয় সম-ভাবে বিভাবিত, সুদৃঢ় প্রেম-সূত্রে গ্রথিত, তখনই মানব-সমাজের উদ্ভব, এবং সমাজ-জীবনের মূলে অতি শুভ মুহূর্ত্ত, অতএব সমাজ-গঠনের মূলে মিলন; এবং মিলন সহমর্ম্মিতা আত্মোৎসর্গ বা প্রেমের উপর নির্ভর করে। শুধু সমাজ কেন, ধর্ম্ম ও নীতির মূলেও প্রেম। ধর্ম্ম ও নীতি আত্ম-ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রেমের মূল উপাদান কল্পনা। কবির হৃদয় কল্পনা-প্রবণ সুতরাং প্রেমময়, আর কবিতা অমূর্ত্ত বা বাহ্য প্রকাশ,

কবি তাই অতি সহজেই "পরকে আপন করে, আপনাকে পর," অন্যের কাছে আপনাকে ধরা দেয়, এবং ধরা দিয়া শেষে অন্যকে আপনার করিয়া লয়। কবি স্বপ্ন-ভরা সান্ধ্য-সমীরণে আন্দোলিত বিহঙ্গের ন্যায় নিভৃতে একাকী কল্পনার আবেশে গান করেন, আর সব অন্ধকার নীরবতা মুখরিত প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার যে হৃদয়ে বাজে, সে হৃদয়, গায়কের সন্ধান জানুক আর না জানুক, আনন্দে আনন্দিত ও বিকম্পিত হইয়া উঠে, কবির হৃদয় বিশ্ব-হৃদয়; কবি সকলের মধ্যে বিশ্ব-মানবকে দর্শন করে, কবি কল্পনায় পূর্ণপ্রাণ, তাই সে এত প্রেমিক ও ত্যাগী। যে প্রকৃত কবি, সে ত্যাগী ও তপস্বী এবং প্রেম-যজ্ঞে আত্ম-বলিদান করিতে সক্ষম, সুতরাং প্রকৃত কবিই আদর্শ ধর্ম্মের দীক্ষাগুরু, আদর্শ-নীতির বার্ত্তাবহ ও আদর্শ-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

কল্পনার প্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধি। বুদ্ধি যাহা দেখে, তাহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেখে। বাহ্য দৃশ্যপুঞ্জ বা বস্তুনিচয়ের মধ্যে যেখানে অনৈক্য, বিরোধ বা ব্যবধান, সেইখানেই ইহার দৃষ্টি। কিন্তু অনৈক্যের মধ্যে যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে যে মিলন, ব্যবধানের মধ্যে যে নৈকট্য, তাহা কল্পনার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না; বুদ্ধি বস্তুকে বাহির হইতে দেখে, তার বহির্ভাগেই আবদ্ধ থাকে। কল্পনা তার অন্তরে প্রবেশ করে, তার অন্তস্তল বা মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং তার সহিত একাত্ম বা তন্ময় হইয়া যায়, অতএব কল্পনা অন্তর্মুখী, আর বুদ্ধি বহির্মুখী; বুদ্ধি ক্ষুদ্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে কারণ তার দৃষ্টি খণ্ড ও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কল্পনা তার অন্তর্দ্দেশে পৌঁছিতে পারে বলিয়া তার আসল মূল্যের পরিচয় পায়। কল্পনার সমগ্র দৃষ্টিতে—

.....ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়;
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়—"

কেহ বলিতে পারেন যে, কল্পনার সাহায্যে আমরা নানাভাবে সুখের উপভোক্তা হইতে পারি বটে, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে আমরা নানাবিধ মঙ্গলের অধিকারী হইয়াছি, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কল্পনা সুখদাত্রী, আর বুদ্ধি শুভদাত্রী—বুদ্ধি আর কল্পনার দ্বন্দ্ব শ্রেয় ও প্রেয়'র দ্বন্দ্ব, কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত সুখ বা আনন্দ ও প্রকৃত কল্যাণের মধ্যে কোনো বিরোধ বা পার্থক্য নাই। সুখ দ্বিবিধ; এক চিরস্থায়ী ও সর্ব্বজনীন অর্থাৎ সমষ্টির ভোগ্য; অন্য অস্থায়ী ও ব্যক্তিবিশেষের ভোগ্য। এই উভয়বিধ সুখ হিতকার্য্য হইতে স্থায়ী সুখের উদ্ভব। তাহাই প্রকৃত হিতকার্য্য, যে কার্য্যের দ্বারা আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ সজীব ও বিশুদ্ধ হয়, কল্পনা প্রসার লাভ করে, হৃদয়ে প্রেমের উৎস খুলিয়া যায়, এবং মনের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর হয়; তাহাই প্রকৃত হিতকার্য্য এবং তাহাই স্থায়ী পবিত্র সুখের জনক, কিন্তু যে-কার্য্যের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের লাভালাভ কিম্বা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি সম্ভবপর হয় এবং কল্পনা নির্জ্জীব ও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তাহা নিম্নশ্রেণীর হিতকার্য্য, ইহার অন্য নাম স্বার্থপরতা। প্রকৃত হিতকার্য্যে যে সুখ পাই, তাহা পরার্থপরতার সুখ, মনের স্বাস্থ্য ও জীবনের সুখ, আমাদের অন্তর-পুরের 'আসল

মানুষের, সঙ্গতিলাভের সুখ, কবির কল্পনা-রচিত প্রেম-রাজ্যের সুখ, তাই কবি গাহিয়াছেন,—

"পরের কারণে মরণেও সুখ,"

* * *

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন-মন সকলি দাও—
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া যখন আমরা আপনাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি, তখনই আমাদের অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো সম্ভবপর হয়, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা আমরা আপনাদিগকে বাঁচাইয়া চলি। পরহিতৈষণার মূলে কল্পনা, আত্মসুখেচ্ছার মূলে বুদ্ধি। এ জগতে যে যত আপনাকে অন্যের সহিত স্বার্থের সংগ্রামে জয়ী করিতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্। এ সংসারে যদি শুধুই স্বার্থসেবী বুদ্ধিমান্ লোক থাকিত, তাহা হইলে মানব-সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যে কিরূপ হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; আমাদের সমাজ স্বার্থ-সংগ্রামের রঙ্গভূমিতে পরিণত হইত, আমাদের ঘরে ঘরে চার্ব্বাক ও এপিকিউরাসের আধিপত্য দেখা যাইত, কিন্তু যদি ডান্টে, পেট্রার্ক, বোকাসিও, চসার, সেক্ষপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কল্পনাপ্রবণ কবিগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক অবস্থা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিত। শুধু কবিগুরু বাল্মীকি ও হোমারের অভাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিরোধ ও বৈষম্য বিকট মূর্ত্তিতে তাণ্ডব নৃত্য করিত। মহাকবিগণ পরিবারগত সমাজগত, দেশগত, কালগত, ধর্ম্মগত সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের অন্তরালে যে ঐক্য নিহিত আছে, তাহারি অনুভূতিতে বিভোর হইয়া উঠেন, ধর্ম্ম, প্রেম, 'বিশ্ব-ভূলোকের অসীম পুলকের' আস্বাদন, দুঃখ-দীর্ণ হৃদয়ের আশা-ভরসা, অনুতাপক্লিষ্ট হৃদয়ের বেদন-নিবেদন প্রভৃতি কবির জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়, এখানে কল্পনা তাঁর একমাত্র সহায়। প্রকৃত কবি ও আত্ম-সেবী, কবিতা ও আত্ম-সর্ব্বস্বতা পরস্পর-বিরোধী। কবি গাহিয়াছেন,—

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে!
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথায় নাহিরে,

* *

"আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,

* * *

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতর লুকাইয়া কহি তাহারে।"

কবি যেমন প্রকৃত সুখের সন্ধান দেন, তেমনি প্রকৃত দুঃখেরও সন্ধান দেন। প্রকৃত দুঃখ যে কি তাহা কবির কল্পনাই উপলব্ধি করিতে পারে। কবি অতিসহজেই বুঝিতে পারে যে দুঃখের সহিত সুখের এক ঘনিষ্ঠ অপরিহার্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, দুঃখ যতই কঠোর, ততই পরম-মঙ্গলের সহিত সম্বন্ধ, শোক, ভয়, ঔৎসুক্য, নৈরাশ্য-প্রভৃতি কেবল

পরম-মঙ্গলের নিদর্শন মাত্র, তাই কবির শোক-কাব্য; দুঃখের মধ্যে যে সুখ আছে তারই গান গায়, সেই জন্যই শোক-কাব্য আমাদের এত প্রিয় ও প্রাণ-স্পর্শী, দুঃখে যে সুখ, সুখে সে সুখ নাই, এ এক অতি মধুর সুখ; অন্য সুখ তাহার তুলনায় অতি উৎকট, সুখের সন্ধানে সুখের প্রমোদ কাননে বিলাস-ভবনে যাওয়া অপেক্ষা দুঃখের প্রশান্ত ক্ষুদ্র কুটিরে যাওয়াই ভাল, দুঃখ সুখেরই উজ্জ্বল চিত্র মাত্র, শোক-কাব্য সুখ-কাব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাই কবি দীনের জীবন-কাহিনী, ক্ষুদ্র-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস, দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-শোক প্রভৃতি উপাদান-সমূহ স্তরে স্তরে সাজাইয়া সুখের এক সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিতে পারেন, তাই কবি বলিয়াছেন,—

"স্বর্গে তব রহুক অমৃত,
মর্ত্তে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গ-খণ্ডগুলি।"

শেষ কথা,—যাহাকে আসল কবিত্ব বলা যাইতে পারে, তাহা চঞ্চল মনের ক্ষণিক ভাব বা খেয়াল নহে; তাহা শিশুর ক্রীড়নক-রচনার ন্যায় অতি সহজ ও তুচ্ছ নহে। তাহা ধীর ও গম্ভীর হৃদয়ের নীরব ভাষা—ভাবুকের ভাব—তরঙ্গের স্পন্দন,—তপস্বীর পূত মন্ত্র, সুতরাং কবি ভাবুক ও তপস্বী। তাহার কল্পনা মনের খেয়াল নহে; পরন্তু অনন্ত সত্য ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি মাত্র, মানুষ যখনই তাহার অন্তরে এই অনন্ত সত্য ও সৌন্দর্য্য বা মহান্ আদর্শের স্পর্শ-সুখ অনুভব করে, যখনই সেই পরম দৈবতের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই সে মহাকবি, তখনই সে নব জাগরণে জাগরিত হয়, নব ভাবে বিভাবিত হয়, তখন সে শুধু মানুষ নয়, দেবতার লীলাভূমি। তখনই সে ভীতির সহিত প্রীতির, দুঃখের সহিত সুখের, অনিত্যের সহিত নিত্যের, চঞ্চলের সহিত চির-স্থির-শান্তের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে! তখনই তাহার চক্ষে যাহা ঘৃণ্য তাহাও প্রিয় ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় এবং জগৎ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া দাঁড়ায়। কবি হয়ত প্রথম অবস্থায় নিজের উদ্দাম-লালসা, বিফল-বাসনা অতৃপ্ত-আশা বা প্রমোদ-বিভ্রমের কাহিনী গান করে; কিন্তু যতই তার কল্পনা প্রসার লাভ করে, হৃদয় উদার হয় এবং যতই সে সত্য ও সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন হয়, ততই সে আত্মকাহিনী ছাড়িয়া অন্যের সুখ-দুঃখের কথা গাহিতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বিশ্ব-জগৎ তার কাব্যে স্থান পায়, শেষে যাহা চির-সত্য ও নিত্য সুন্দর, তাহারই সমীপে কবি আত্ম-বিসর্জ্জন করে। কবির জীবনে প্রথম স্তর—আত্ম-সর্ব্বস্বতা; দ্বিতীয়—পরার্থতা এবং শেষ আত্ম-বিসর্জ্জন। এই শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়া কবি বিশ্ব-কবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গাহিয়াছেন,—

"তুমি কি মহান্, বিভু, আমি কি মলিন ক্ষুদ্র
আমি পঙ্কিল সলিল বিন্দু, তুমি যে সুধাসমুদ্র,
তবু তুমি ডাকিলে হৃদয়ে এস,
তাই এত অযোগ্যের লাজ।"

* * *

"আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
বসে, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার বিদ্যারত্ন।

পুরূরবা

দিনশেষে রাত্রি এল, শারদ শর্ব্বরী
ফেটে গেল বহুক্ষণ ভুবন-ভবনে;
গৌরী গোধূলির ভালে রৌপ্য-দীপাধার
কখন্ উঠেছে জ্বলি', সন্ধ্যা জ্যোৎস্নামুখী
রচিল কনকবেণী কানন-কুন্তলে।
অতিমুক্ত, কর্ণিকার, পুন্নাগ, পাটল
বিথারিল দেবতার নিভৃত শয়ন
পুষ্পোচ্ছ্বাসে, ফুলবনবীথিকার তলে।
ক্রমে উর্দ্ধে, আরো উর্দ্ধে, স্ফটিক-বিমানে
আরোহি' আকাশবর্ত্মে প্রবেশিল শশী
উন্মাদনী যামিনীর নিশীথ-বাসরে।
তখনো ভ্রমিছে একা অরণ্যগহনে,
নদীতীরে, পর্ব্বতের সঙ্কট-শিখরে,
প্রিয়াহারা পুরূরবা; হৃত-উত্তরীয়,
ছিন্নবাস, নগ্নশির, উন্মাদের মত।
অতিদূর গিরীশের নীহার-বলয়ে
বিচ্ছুরিত চন্দ্রহাস ধাঁধিছে নয়ন—
সে কাহার অট্টহাসি দিগন্ত-প্রসারী
বিজ্ঞাপিছে বিরহীর বৃথা অন্বেষণ।
অরণ্যগভীরে বনশাখা-অন্তরাল
নিত্য-অন্ধকারে জনমিছে দৃষ্টি-ভ্রম,—
তিমিরপটলে যেন তরল সরসী!
দুলিছে তাহারি তলে দীপাবলিসম
অযুত আলোকবিম্ব—নহে খদ্যোতিকা!
অপূর্ব্ব সে মরীচিকা কানন-আঁধারে!
গন্ধলতিকায়, কুসুমিত তৃণস্তরে,
বিথান বসনপ্রান্ত গিয়াছে লুটিয়া
প্রিয়ার, প্রয়াণপথ সুরভিত করি'।
সচকিত কুরঙ্গীর কস্তুরীসুবাস
তাহারি নিশাস যেন, জ্যোৎস্না হেথা-হোথা
লেগে আছে তরুশাখে, ব্রততীবিতানে—
শুভ্র-চীনাংশুক-শোভা! ঝিল্লীর ঝঙ্কার
কাহার মঞ্জীরগুঞ্জ? কার দীর্ঘশ্বাস
নীড়সুপ্ত বিহঙ্গের পক্ষ-বিধুননে!
গুঞ্জরিছে মুখে তার ভাব-গদগদ
অসম্বদ্ধ বাণী, হৃদিসিন্ধুমন্থশেষ
সুধার বুদ্বুদ যেন অধরের ফাঁকে!
চলিতে চরণ বাজে কভু শিলাতটে,
কঠিন কণ্টকে কভু, দৃঢ় বল্লীফাঁসে—
স্বপনে-উন্মীলনেত্র চলে পুরূরবা
সুরযোষা উর্ব্বশীর অলীক সন্ধানে।

সহসা কাননতলে অসম্ভব বিভা!
স্থিরদীপ্ত সৌদামিনী, প্রখর-ভাস্বর,
দীর্ঘায়ত, অতর্কিতে খসি' স্বর্গ হ'তে
ভরিল পাদপস্থলী,—সহস্রশাখার
অনন্ত সে রন্ধ্রময় জালায়ন দিয়া
ঢালিল কৌমুদী-ধারা মেঘমুক্ত শশী,
আরোহিয়া গগনের গম্বুজশিখরে;
নিদ্রাতুরা ধরণীর দু'নেত্র উপরি
ফুটিয়া উঠিল যেন স্বর্ণ-শতদল
উচ্চবৃন্তে, তাহারি সে নাভিপদ্মনালে!
মুহূর্ত্তে সে বরবপু হ'ল রূপান্তর
অটল-নিটোল শুভ্র মর্ম্মর-পুত্তলে।
কুটিল সে কেশদাম অংসবিলম্বিত
মুহূর্ত্তে শোভিল যেন কিরণ-কিরীটি!

নিস্তার নয়ন যেন হারাইল দিশা,
বক্ষ সুবিশাল ধরিল তুহিন-কান্তি,—
চাহি' ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইল পুরূরবা,
জ্যোৎস্নাধারা শিরে ধরি' নব গঙ্গাধর!
অপলক নেত্র তার অলোক সুষমা
গণ্ডুষে সাগর-সম করিল নিঃশেষ;
তীব্র বাসনারণনে মর্ম্মমূল যেন
বীণার তন্ত্রীর মত হারা'ল কম্পন!
প্রিয়ার পীরিতি যেন দিকে দিকে দিকে
উথলিল লাবণ্যের মত! সে মিলন
অহরহ, কোথা নাই বিরহ-কল্পনা!
নাহি মৃত্যু, নাহি জরা,—মহাকাল যেন
সহসা নিশ্চল! আলোক-আঁধারে দ্বন্দ্ব
ঘুচে' গেল মানবেরি পিপাসার সাথে।
অবগাহি' অফুরন্ত জ্যোতির প্রপাতে
দেহ হ'ল ছায়া-হীন, মৃত্যুজয়ী প্রেম
ধরিল সর্ব্বাঙ্গ-শুভ্র মূর্ত্তি আপনার,
কোনোখানে নাই তার বিষের কালিমা!

পরক্ষণে তেমনি চকিতে মুদে' গেল
জ্যোতিঃশতদল; স্বপ্ন-ভঙ্গে পুরূরবা
অলস-অবশ-দেহ বসিল ভূতলে;
আবরিল আঁখি তার আঁধার-অঞ্চলে
বনস্থলী, লেপি' দিল পুনঃ স্নেহভরে
সর্ব্ব অঙ্গে ম্লানচ্ছায়া চন্দ্রিকা-চন্দন।
আলোক-বন্যার সেই গভীর প্লাবনে
স্থির ছিল জলজ কুসুম, ঊর্দ্ধমুখে,
বৃন্ত দৃঢ় করি'; যবে বন্যা গেল সরি',
নমিয়া পড়িল শির—লুটাইবে বুঝি
আপনারি পাদমূলে পঙ্কিল শয়নে!
অনচ্ছ আলোকে তাই নয়নের কোণে
বাহিরিল দুই বিন্দু তরল মুকুতা,
অবরুদ্ধ বাসনার অরুদ্ধ আবেগে।
কি-এক সঙ্গীত, যেন বিয়োগ-রাগিণী,
আত্মারি সে আর্ত্তরব—সারাচিত্ত ভরি'
ধ্বনিয়া উঠিল তার সকল শিরায়;
মর্ম্মকোষে দেহপদ্মমধু'র তাড়না
একসাথে ফুটাইল পঞ্চেন্দ্রিয়-দল,
রূপের কিরণরশ্মি পান করিবারে!
অমনি সে বাণবিদ্ধ কেশরীর মত,
ঊর্দ্ধশ্বাসে, আন্দোলিয়া কেশরকলাপ,
ছুটে গেল বনান্তরে, উত্তান আননে,
রক্তসিক্ত পদে। তার রোদন-আরাব
সমস্ত কান্তার বাহি' পঁহুছিল শেষে
পর্ব্বতকন্দরে, অতিদূর দুরান্তরে
হু'ল প্রতিধ্বনি, শিহরিল তারাস্তোম
অনন্ত সে ব্যোমপথে; প্রৌঢ়া নিশীথিনী
ফিরিয়া বাঁধিল তার বিশীর্ণ কবরী।

পাণ্ডুর বদনে বিধু হেরিল তাহারে।
সে যে তাঁরি বংশধর প্রতিষ্ঠানপতি
ঐল পুরূরবা! সেই পূর্ব্ব-ইতিহাস,
যৌবনের মধুময় মোহের কাহিনী
স্মরিল বিষাদে সোম, সে কলঙ্ক-লেখা
এখনো বাজিছে বুকে—তবু কি মধুর!
তখনো সিঞ্চিত ওষ্ঠে অমৃত নবীন,
তরুণী সে পৌর্ণমাসী রাতি,—ব্রহ্মচারী
পারিল না ফিরাবারে নিষিদ্ধ চুম্বন।
গুরুপত্নী তারা ধরিল সন্তান তাঁর
আপন জঠরে—সেই পুত্র বুধ হ'তে
জনমিল পুরূরবা, ইলার তনয়।
কভু নর, কভু নারী—ইলার কাহিনী
সুবিচিত্রতর! তাই সে অপূর্ব্বজন্মা
লভিল অহীন কান্তি বীর পুরূরবা—

ধরাতলে প্রথম সে পূর্ণ মানবতা।
একদা নেহারি' তায় চৈত্ররথবনে,
প্রগল্‌ভে প্রসাদ তার যাচিল উর্ব্বশী,
উন্মদনা অপ্সরা সে অমরা-আলোক!
স্বর্গের লাবণ্য হরি' আনিল ধরায়
চন্দ্রবংশ-অবতংস বীর পুরূরবা।
নন্দনে যে ফুল ঝরি' ফুটিল না আর—
ফুটিল সে পুঞ্জে পুঞ্জে ধরণীর বনে,
উর্ব্বশীর রাগারুণ নয়ন-আলোকে,
ফুটিল অমরীবাঞ্ছা মানবের প্রেমে।
সেই প্রেম, সেই বধূ ফিরে গেছে আজ
আপন আলয়ে, তারি শোকে পুরূরবা
উন্মাদ ভ্রমিছে ঘুরি' কান্তারে গহনে।

যবে রাত্রি আয়ুঃশেষ, তিমির-অলকে
ফুটিছে ধূসরচ্ছায়া অটবীসীমায়,
ক্লান্তিহর শীতস্পর্শ নিশান্ত-সমীরে
কে যেন বুলায় ধীরে অতি সুকোমল
করাঙ্গুলি, জ্বরতপ্ত ললাটে চিবুকে,
স্বেদলিপ্ত শিরোরুহমূলে। আচম্বিতে
জ্যোৎস্না নিবে' গেল, প্রভাত-গোধূলি
ঢালিল কলসী-জল তরল তিমিরে;
শুধু ঊর্দ্ধে চিত্রসম চন্দ্রের বদনে
তখনো জাগিছে জ্যোৎস্না নিশীথ-লাঞ্ছন।
এতক্ষণে পার হয়ে শীর্ণা শুক্তিমতী
উত্তরিল পুরূরবা অম্ভোজের তীরে।
একটি পুন্নাগতরু সরল সুঠাম,
তারি দেহে দেহ রাখি', বাহু বাঁধি' বুকে,
ডুবা'য়ে চরণযুগ মুঞ্জাতৃণবনে,
দাঁড়া'ল সম্বিৎ-হারা শ্রীহীন উদাস
ত্রয়োদশদ্বীপাধিপ প্রতিষ্ঠান-পতি।
সম্মুখে সরসীজলে সরোজ-শয়নে
ঘুমা'য়ে পড়েছে অলি মধুপানশেষে,
দুলিছে নলিন-দোলা জলের দোলনে।
ধূপধূম্রসমোচ্ছ্বাস বাষ্প-যবনিকা
গোপন নেপথ্য রচি' আবরিছে দিক্
প্রাচীমুখে; যেন কারা অন্তরীক্ষ-পথে
স্বপ্নজাগরের মাঝে করে আনাগোনা,
যেন কারা—স্নানার্থিনী, তেয়াগি' বসন,
নামিয়াছে পদ্মবনে অম্ভোজ-সরসে,
পূর্ব্ব-সোপান-শিখরে রাখি' দীপটিরে
শুকতারকার, সাজাইয়া সযতনে
রতনভূষণরাজি আকাশ-কুট্টিমে।
কাঞ্চন-কঞ্চুক 'পরে মুকুতার সিঁথী
আবরিয়া অভ্রস্বচ্ছ জরীর প্রাবারে,
ঢালিয়াছে পার্শ্বে তার সদ্যঃ-চয়নিত
নব সিন্ধুবার। গাঁথিবে বিনোদ কাঞ্চী
মাধবী-মুকুলে বুঝি? কেশর-কলাপে
গড়িবে গুণ্ঠন? কি যেন আশ্বাস-সুখে
মুদিল মদিরদৃষ্টি, মেলিল যখন—
সুবঙ্কিম দীর্ঘায়ত আঁখির তোরণে
ফুরিছে অমৃত-ভাতি দিব্য চেতনার!
তখন সুদূর দিক্-চক্রবাল-রেখা
হ'য়ে গেছে রূপান্তর জ্যোতির বলয়ে,
ধূম্র-গিরিশ্রেণী গাঢ় নীলাঞ্জনে লেখা—
ক্ষৌমবস্ত্রপটে যেন চিত্রঘনাবলী!
পলে পলে নব শোভা উঘারি' উঘারি'
কে করিছে নেত্রসেবা? মুগ্ধ পুরূরবা
বিস্মৃতি-বিস্মিত,—ভুলিয়াছে এত ত্বরা
কামরূপা অপ্সরার অপার মোহিনী,
অসীম ছলনা!

সহসা সরসী-বুকে
দুলিল সলিল, ভিন্ন কুহেলির ফাঁকে
ফুটিল আভাসে কার স্তনাংশুক যেন,

লীলায়িত বাহুভঙ্গি,—কি মধুর হাসি
মুহূর্ত্তেকে মিলাইল পাটল অধরে!
তখনি চিনিল তারে, বর্ষ সহস্রেও
যার সাথে ছিল নিত্য নবপরিচয়!
তাই সে প্রসারি' বাহু, উন্নমিত মুখে,
উচ্চারিল নব ঋক্ সত্য-সমুজ্জ্বল—
প্রেমের প্রণবমন্ত্র তাহারি উদ্দেশে।

'কোথায় চলেছ অয়ি জীবনরূপিণি,
জায়া মোর, শূন্য করি' এ দেহ-দেউল?
হের ওই পূর্ব্বাশার উদয়-দুয়ারে
এখনি দাঁড়া'বে আসি' হৈমবতী ঊষা
সদ্যঃ-প্রাণহন্ত্রী-বেশে। কোন্ অপরাধে
কি ছলে ত্যজিলে মোরে, কহ তা' উর্ব্বশি!
নিত্যজ্যোৎস্না নিত্যপুষ্প নন্দনের লাগি'
বিরহী হৃদয় তব? তাই উদাসীন
মর্ত্ত্যসুখে—সদ্যঃপাতি ধরার কুসুমে?
তা' ত' নহে! রচিয়াছি হৃদয় প্রসারি'
তোমার মন্দির ঘেরি' নন্দন-অধিক
রূপময় উপবন, আনন্দ-হিন্দোলা।
স্বপ্নাঞ্জন পরা'য়েছি নেত্র-ইন্দীবরে,
মোর মুখে চেয়ে তব অকুণ্ঠিত আঁখি
শিথিল নিমেষপাত, পক্ষ্ম-অগ্রভাগে
দুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিশির যেমতি
শিরীষ-কেশরে; সুনিবিড় আলিঙ্গনে
উপজিল হৃদিতলে মধুর বেদনা,
নীল-ভৃঙ্গ বিলসিল উরস-কমলে—
সফল হইল তব যৌবন-প্রসূন!
ষষ্টিশত শতাব্দের অমৃত রজনী
এই হৃদিপাত্র ভরি' যে-সুধা ঢালিয়া
পিয়াইনু এতকাল—তারি মোহাবেশে
বিলম্বিত চন্দ্রোদয়ে রহিতে জাগিয়া
নিদাঘ-যামিনী কত অলিন্দের 'পরে,
হেরিবারে জ্যোৎস্না মোর সুখসুপ্ত মুখে—
অধর অধীর হ'ত চুম্বন-লালসে।
ছিলে নাকি সুখী? তোমার অম্লানরূপ—
দেবতাকাঙ্ক্ষিত, ধন্য, অনির্ব্বচনীয়!—
রাজ্যসুখ তুচ্ছ করি' চেয়েছিনু আমি
ধরণীর পতি, তুমি তাই পণ দিয়ে
জিনিয়া লইলে মোর কৌমার অতুল—
অ-স্বর্গীয়, দেবতা-দুর্ল্লভ। স্বর্গ হ'তে
রূপ আসে নামি', ধরার অনর্ঘ দান
মানবের প্রেম; এ দোঁহার বড় কে যে
বুঝিবারে নারি। তবু কহ সত্য করি',
আর কেহ ওই ফুল্ল রক্তাধর পানে
নিমেষে-সর্ব্বস্বহারা চেয়েছে এমন?
ও-কটাক্ষে সুধাপাত্র হাত হ'তে খসি'
পড়েছে কভু কি কারো ত্রিদশ-মণ্ডলে?
তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! এত ত্বরা ফিরা'য়ো না মুখ!
অয়ি মানস-নিষ্ঠুরে! কর অন্তরাল
আমার নয়ন হ'তে ঊষার অঞ্চল!
ওই না হেরিনু সেই মরণমোহিনী—
অনির্ব্বাণ কামনার অশেষ ইন্ধন,
উর্ব্বশীর বিবসনা শোভা! কি বলিলে?
দৈবাধীনা তুমি? ফিরিতেছ দেবাদেশে
দ্যুসুস্বর্গে, দেবতার সুখচর্য্যা লাগি'?
তোমারো নয়নে অশ্রু! থাক্ থাক্ তবে,
আমার সকল ব্যথা নিয়েছ হরিয়া
অশ্রুমুখি! কিন্তু ওই মর্ত্ত্য-মনোহর
অনুপম নেত্রভূষা কোথায় লুকা'বে
অমর-সভায়? যেয়ো না, যেয়ো না প্রিয়ে!
মাগি' লও স্বর্গ হ'তে চির-নির্ব্বাসন,
চেয়ো না অমৃত, এসো মরি দু'জনায়!
অজর অমর হ'য়ে নিত্যের নন্দনে

থেকো না অরূপ রূপে, অনিত্য-সদনে
অন্তহীন মৃত্যুস্রোতে এস গো নামিয়া!
নব-নব জন্ম-বিবর্ত্তনে আঁখিযুগ
চিনি' ল'বে আঁখিযুগে, চির পিপাসায়;
বার বার হারা'য়ে হারা'য়ে, ফিরে' পা'ব
দ্বিগুণ-সুন্দর; আবার বিচ্ছেদ-কালে
ফুটিবে চুম্বন যেই মর্ম্মান্ত আবেগে
ওষ্ঠপুটে, তারি গন্ধ-মকরন্দ-লোভে
লুকা'য়ে নামিবে মর্ত্ত্যে সকল দেবতা।
নিত্যেরে কে বাসে ভালো? চিরস্থির ধ্রুব
অনন্ত রজনী কিম্বা অনন্ত দিবস?
নহি তা'র অনুরাগী; আমি চাই আলো
ছায়ারি পশ্চাতে, চাই ছন্দ, চাই গতি,
রূপ চাই ক্ষুব্ধ-সিন্ধু-তরঙ্গ-শিখরে—
ধরিতে না ধরা যায় পলকে লুটায়!'

নীরবিল পুরূরবা,—কোথায় উর্ব্বশী!
রেখে গেছে হাসিখানি প্রভাতের মুখে
করুণ-কোমল; তাই যেন মনে লয়
আবার কোথায় কবে হইবে মিলন।
সেই কথা লিখি' দিয়া সোণার অক্ষরে,
মিলাইল মধুবর্ণ বিবাহ-দুকূল
মেঘস্তরে; শূন্যমনা মুগ্ধ পুরূরবা
হেরিল গরলনীল মৌনী গিরিমালা
বালারুণ-রক্তরাগে অমৃতায়মান্।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

অবতার

৭

অক্টেভের শরীরে এখন ওলাফ-লাবিন্স্কির আত্মা বাস করিতেছে। সঙ্গে আছেন একাকী ডাক্তার বালথাজার-শেরবোনো। এখন এই জড়পিণ্ড দেহটাকে ডাক্তার আবার সচেতন করিতে উদ্যত হইলেন। নিশ্চেষ্ট ও আড়ষ্টভাবে অক্টেভ-দেহধারী ওলাফ পালঙ্কের এককোণে আবদ্ধ ছিলেন, কতকগুলা ঝাড়া দিবার পর ওলাফ-অক্টেভ (পরস্পরের শরীরে পরস্পরের আত্মার বিনিময় হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এইরূপ নামকরণ করিতে হইল) নরকস্থ প্রেত-ছায়ার ন্যায় তাঁহার গভীর নিদ্রা হইতে, অথবা মৃগীরোগের মূর্চ্ছা-মোহ হইতে যন্ত্রের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু এখনো ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল না; এখনো 'মাথা-ঘোরা'টা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া যায় নাই; এখনো পা টলিতেছিল। তাঁর চারিদিকে পদার্থ সকলের মধ্যে একটা যেন চাঞ্চল্য উপলব্ধি করিতেছিলেন, বরাবর দেয়ালের ধারে ধারে বিষ্ণু-অবতারদিগের যেন তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। ডাক্তার শেরবোনো সেই এলিফ্যাণ্টা-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন, দুই হাতে পাখীর ডানা-ঝাড়ার মত হাত-ঝাড়া দিতেছেন। চসমার চক্র-রেখার ন্যায় শ্যামল বলি-রেখা-বিশিষ্ট নেত্র-মণ্ডলের মধ্য-স্থিত নীলবর্ণ দুই তারা ঘুরিতেছে—ডাক্তারের সম্মোহন-প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ চৈতন্য-লোপের

পূর্ব্বে ওলাফ এই যে-সব অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ঐ-সব দৃশ্য আবার তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তির উপর কাজ করিতে লাগিল; ক্রমে আস্তে আস্তে বাস্তব পদার্থ সকল তাঁহার উপলব্ধি হইল। বুক-চাপা দুঃস্বপ্ন হইতে স্বপ্নদর্শী হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে যেরূপ হয়, আসবাব-পত্রের উপর ছড়ানো কাপড়-চোপড়কে প্রেতের উপছায়া এবং দীপালোকে উদ্ভাসিত পর্দ্দার তাঁবার আংটা-কড়াগুলাকে দৈত্যের জলন্ত চোখ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইতেছিল।

ক্রমশঃ এই ছায়াবাজির দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। আবার সমস্তই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। ডাক্তার শেরবোনো এখন আর ভারতবর্ষের তাপস সন্ন্যাসী নহেন, এখন তিনি চিকিৎসক ডাক্তার মাত্র; তিনি সাদামাটা ভদ্রতার হাসি মুখে আনিয়া ওলাফকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"কৌণ্ট-মহাশয়, আমি আপনার সম্মুখে যে-পরীক্ষাগুলি দেখিয়ে ধন্য হয়েছি সেই পরীক্ষাগুলি দেখে আপনি কি পরিতুষ্ট হয়েছেন?"—এই অতি-নম্র কথার মধ্যে যে একটু বিদ্রূপের ভাব ছিল না এ কথা বলা যায় না। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন:—"ভরসা করি আমার সান্ধ্য-বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন ব'লে 'আপনি পরিতাপ করবেন না; আর বোধ হয় এখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, দস্তর-মোতাবেক বিজ্ঞান যাকে গাল-গল্প ও বাজি-করের খেলা বলে' উড়িয়ে দেয়, সেই সম্মোহন-প্রক্রিয়ার কথা সমস্তই গাল-গল্প ও বাজিকরের হাতের চালাকি নয়।" ডাক্তারের কথায় সায় দিবার ভাবে, অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্ট ওলাফ মাথা নাড়িয়া ইসারায় উত্তর করিলেন, এবং ডাক্তার শেরবোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; ডাক্তার প্রত্যেক দরজার কাছে আসিয়া খুব মাথা হেঁট করিয়া কৌণ্টকে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

ব্রুহাম গাড়ী অগ্রসর হইয়া একেবারে সোপান-ধাপ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কোণ্টেস্ লাবিন্স্কার পতি, অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্ট ওলাফ, সহিস-কোচম্যানের উর্দ্দি-পোষাক বা গাড়ীর গঠনের প্রতি বড়-একটা লক্ষ্য না করিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

কোচ্‌ম্যান জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইবেন?" সবুজ-পোষাক-পরা তাঁর কোচম্যান সচরাচর যে স্বরে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিত, সেই স্বর শুনিতে না পাইয়া তাঁর গোলমাল ঠেকিল,—তিনি বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন:—

"আমার বাড়ী—আবার কোথায়?"

এখন এই ব্রুহাম গাড়িতে উঠিয়া দেখিলেন গাড়ীটা ঘোর নীল রঙের ফুল-কাটা পশমি কাপড়ে মণ্ডিত; সাটিন-মোড়া বোদামে বিভূষিত। এই-সব প্রভেদ সত্ত্বেও তিনি উহা নিজের গাড়ী বলিয়া মানিয়া লইলেন। যেরূপ স্বপ্নে, সচরাচর দৃষ্ট পদার্থ অন্য আকারে দেখা দিলেও সেই পদার্থ বলিয়াই মনে হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। ইহাও তাঁহার মনে হইল, তিনি আসলে যাহা, তাহা অপেক্ষাও যেন খাটো; তা ছাড়া তাঁর মনে হইল, তিনি ডাক্তারের বাড়ী কোট পরিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই পরিচ্ছদ তিনি যে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা ত তাঁর স্মরণ হয় না—এখন দেখিলেন, একটা পাতলা কাপড়ের আলখাল্লা পরিয়া আছেন; এ পরিচ্ছদ তাঁর কাপড়ের আলমারি হইতে ত কখনই বাহির হয় নাই! তিনি অননুভূতপূর্ব্ব একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রাতঃকালে তাঁর চিন্তা-প্রবাহ এমন স্বচ্ছ ছিল, এখন যেন সমস্তই কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সান্ধ্য বৈঠকের অপূর্ব্ব অদ্ভুত দৃশ্যগুলার উপর তিনি এই অবস্থাটা আরোপ করিয়া ঐ বিষয়ের চিন্তায় মন দিলেন না; গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া একটা এলোমেলো চিন্তাপ্রবাহে না-নিদ্রা না-জাগরণ এইরূপ একটা তন্দ্রাবস্থার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন।

ঘোড়া এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া পড়ায় এবং কোচম্যান উচ্চৈস্বরে "ফাটক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠায়, তিনি আপনাতে ফিরিয়া আসিলেন; শাশি নামাইয়া দিয়া, গাড়ীর জান্‌লা হইতে মাথা বাহির করিলেন, এবং রাস্তার গ্যাসের আলোয় দেখিতে পাইলেন, এ একটা অপরিচিত রাস্তা, বাড়ীটাও তাঁর বাড়ী নয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—

"আমাকে কোথায় নিয়ে এলি? এই কি তবে ল্যাবিনস্কির হোটেল?"

—"হুজুর, মাপ করবেন, আমি তাহলে বুঝতে পারি নি" কোচমান এই কথা গুন্‌গুন্‌স্বরে বলিয়া, কথিত স্থানের অভিমুখে অশ্বযুগলকে আবার চালাইয়া দিল।

যাত্রা-পথে রূপান্তরিত কৌণ্ট, মনে মনে অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। "আমাকে না লইয়া আমার গাড়ী কেন চলিয়া গেল, আমি ত আমার জন্য অপেক্ষা করিতে হুকুম দিয়াছিলাম!" "আর একজনের গাড়ীতে আমি কেন উঠিলাম?" তিনি অনুমান করিলেন, হয় ত একটু জ্বরভাব হওয়ায়, তাঁর জ্ঞান অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; হয় ত সেই "মনের" ডাক্তার, তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতা আরও বাড়াইবার জন্য, তাঁর নিদ্রিত অবস্থায় "হাশিশ্" কিংবা উহারই মত কোন প্রকার বিভ্রম-উৎপাদক মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি বিশ্রাম করিলেই এই-সব বিভ্রম নিশ্চয় চলিয়া যাইবে।

লাবিন্স্কির হোটেলে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

দরোয়ানকে ফাটক খুলিতে বলায় দরোয়ান ফাটক খুলিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিল, "আজ রাত্রে লোক অভ্যর্থনা হবে না; কেননা হুজুর দুই-এক ঘণ্টার উপর হ'ল বাড়ী এসেছেন—আর রাণী বিশ্রামের জন্যে নিজের মহলে চলে গেছেন।"

ভ্রমণকারী অশ্বারোহী পুরুষদিগকে যাদু-করা রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ করিবার জন্য, আরবদেশের কাহিনীতে প্রকাণ্ড তাম্র-মূর্ত্তিসকল যেরূপ দ্বার আগলাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড ভীমকায় যে দরোয়ান খুব জাঁকজমক ভাবে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত ফাটকের সম্মুখে খাড়া হইয়াছিল, তাহাকে অক্টেভ-দেহ ওলাফ এক ঠেলা দিয়া বলিলেন:—

"আরে বেটা, তুই মাতাল না পাগল?"

এই কথা শুনিয়া দরোয়ানের লাল মুখ রাগে নীল হইয়া উঠিল—সে উত্তর করিল:—

"মশাই, আপনিই মাতাল কিংবা পাগল।"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "হতভাগা, যদি আমার আত্মমর্য্যাদা না থাকত....."

বারোয়ারীর সং ভীমের প্রকাণ্ড এক হাত বাহির করিয়া সেই প্রকাণ্ডকায় দরোয়ান উত্তর করিল:

"চুপ কর! নৈলে আমার এই হাঁটুর তলায় তোর মাথাটা গুড়োগুড়ো ক'রে, রাস্তার উপর ছুড়ে ফেল্‌ব। বাছাধন, আমার সঙ্গে চালাকি না,—দুই-এক বোতল শ্যাম্পেন বেশী মাত্রায় খেয়েছ ব'লে এ-সব চালাকি আমার কাছে চলবে না।"

এই কথা অক্টেভ-দেহ-ওলাফ আর বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তাহাকে এমন এক ঠেলা দিলেন যে, সেই ঠেলায় সে গাড়ী-বারাণ্ডার তলায় গিয়া পড়িল। যে-সব ভৃত্য তখনও শুইতে যায় নাই, তাহারা একটা গোলমাল শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল।

"হতভাগা, পাজি, নচ্ছার! তোকে আমি জবাব দিলাম। আজ এই রাত্তিরটাও তুই এই বাড়ীতে থাকিস্ আমার ইচ্ছা নয়; দূর হ এখান থেকে—নৈলে হর্নে কুকুরের মত তোকে এখনি হত্যা করব। একজন নীচ ভৃত্যের রক্তে আমার হাতকে কলঙ্কিত করতে আমাকে বাধ্য করিস্‌নে বল্‌চি।"

তাহার পর স্বদেহ হইতে বেদখল কৌণ্ট ঐ অতিকায় দরোয়ানের দিকে ছুটিয়া আসিলেন—তাঁহার চোখ দুইটা ক্রোধে বিস্ফারিত, ঠোঁটের উপর ফেনপুঞ্জ, হাতের মুঠা কুঞ্চিত। দরোয়ান কৌণ্টের দুই হাত তাহার এক হাতের ভিতর লইয়া মধ্যযুগের যন্ত্রণা দিবার পাক-সাঁড়াশী যন্ত্রের মতো তাহার হেড়ো গাঁঠওয়ালা খাটো মোটামোটা আঙ্গুলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পিষিয়া ফেলিবার যোত্র করিয়াছিল। এই অতিকায় পুরুষটা আসলে লোক ভাল—উহার কোন বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল না। আগন্তুককে শুধু একটু শিক্ষা দিবার জন্য দুই-চারিটি মর্ম্মান্তিক টিপুনি দিয়াছিল। তারপর আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিল:—

"দেখ, একটু ঠাণ্ডা হও। ভদ্রলোকের মত কাপড় চোপড়—তোমার এইরকম ব্যবহার করা, রাত্রে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে এইরকম গোলমাল করা কি সুবুদ্ধির কাজ? বেশ দেখছি এ কাজ নেশার ঝোঁকে করেছ—কে নাজানি তোমাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ছেড়েছে! এইজন্যই তোমার উপর আমি মারপীঠ করব না, তোমাকে শুধু আস্তে আস্তে রাস্তার উপর রেখে দিয়ে আসব, সেখানেও যদি গোলমাল কর,—রোঁদ্ ফেরবার সময় পাহারাওয়ালা তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে; এস, একটু তোমাকে বেহালা শোনাই—বেহালার একটা গৎ শুনলে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফ সমবেত ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

—"নির্লজ্জ বেহায়া,—এই একটা নীচ অলীক কথা বলে তোদের মনিবকে—লাবিন্স্কির কৌণ্ট-মহোদয়কে অপমান

করচে—আর তোরা স্বচক্ষে দেখেও কিছু বল্‌চিস নে!"

এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভৃত্যবর্গের মধ্যে খুব-একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। একটা অট্টহাস্যে, উহাদের জরির ফিতায় বিভূষিত বুকগুলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল: "দেখ ভাই, এই লোকটা আপনাকে কৌণ্ট লাবিন্স্কি বলে মনে করচে! হা! হা! হি! হি! বেশ যা হোক!"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফের ললাট কণ্ঠ শীতল ঘর্ম্ম-বিন্দুতে আর্দ্র হইল। ছোরার ফলার মত তীক্ষ্ণ একটা কথা যেন তাঁর মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। "সমারা" দরোয়ানটা সত্যই কি আমার বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল? তখনকার সে জীবনটা কি আমার বাস্তব জীবন? আমার বুদ্ধিটা কি চুম্বক-আকর্ষণের প্রক্রিয়ায় একেবারে ঘুলিয়ে গিয়েছিল? অথবা কেউ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে এই রকম নাকাল করেছে? এই-সব ভৃত্য, যারা আমার কাছে থর্ থর্ ক'রে কাঁপত, আমার পদানত হয়ে থাকত, তারা কিনা আমাকে চিন্‌তেই পারলে না! আমায় যেমন কাপড় বদ্‌লে দিয়েছে, গাড়ী বদ্‌লে দিয়েছে সেইরকম কি আমার শরীরও বদ্‌লে দিয়েছে? ঐ ভৃত্যবর্গের মধ্যে যে সব-চেয়ে দুবিনীত সে বলিল:—

"দেখ, তুমি যে কৌণ্ট লাবিনস্কি নও, এইবার ঠিক জানতে পারবে। তুমি যে রকম অপমানের কথা বল্‌ছিলে তাই শুনে স্বয়ং কৌণ্ট ঐ দেখ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।"

দরোয়ানের বন্দী, প্রাঙ্গনের শেষ-প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মাটিতে-পোঁতা তাঁবুর মত একটা বৃহৎ ছত্রের চাঁদোয়ার তলে একটি যুবক দণ্ডায়মান। শোভন ছিপ্‌ছিপে গঠন, মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, কালো কালো চোখ, শুকসদৃশ নাসা, সরু গোঁফ,—এ ত তিনিই, তিনি ভিন্ন আর কেহ নয়। অথবা সাদৃশ্যে বিভ্রম উৎপাদন করিবার উদ্দেশে সয়তান নিজে বোধ হয় তাঁর প্রেতচ্ছায়ামূর্ত্তি গড়িয়াছেন।

দরোয়ান, কয়েদীকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই মুষ্টি শিথিল করিল। দৃষ্টি অবনত, হস্ত পার্শ্বে লম্বিত, নিস্পন্দ নিশ্চল ভৃত্যবর্গ, বাদশার আগমনে গোলাম-দিগের ন্যায় দেয়ালের গায়ে ভক্তিভাবে সারি দিয়া দাঁড়াইল। যে সম্মান তাহারা আসল কৌণ্টকে প্রদর্শন করে নাই, সেই সম্মান তাহারা তাঁহার উপছায়াকে প্রদর্শন করিল।

রাণী প্রাস্কোভির পতি, খুব সাহসী হইলেও স্বকীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তির আগমনে, তাঁহার মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল।

তাঁহাদের বংশগত একটা প্রাচীন কাহিনী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাতে এই ভয় আরো বর্দ্ধিত হইল। প্রতিবার লাবিন্স্কি-বংশের কোন ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয়, ঠিক্ তাঁহার মত দেখিতে এক উপছায়া আসিয়া ঐ সংবাদ তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইয়া দেয়। য়ুরোপের উত্তর খণ্ডের লোকের মধ্যে, স্বপ্নেও নিজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখাটা মৃত্যুর পূর্ব্ব-

সূচনা বলিয়া চিরদিন গৃহীত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ককেসসের এই নির্ভীক যোদ্ধৃপুরুষ, আপনার বাহিরে আপনার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া, একটা অন্ধ-সংস্কারমূলক দুরতিক্রম্য আতঙ্কে আক্রান্ত হইলেন; কামান হইতে গোলা বাহির হইতে যখন উদ্যত এমন সময়ে যিনি নির্ভয়ে কামানের মুখে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, সেই তিনি এখন কিনা নিজেরই সম্মুখ হইতে ভয়ে পিছু হটিলেন!

কৌণ্ট লাবিন্স্কি-ওলাফ-দেহধারী অক্টেভ, স্বকীয় পুরাতন শরীরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ শরীরে মধ্যে, কৌণ্টের আত্মা কখন যুঝাযুঝি করিতেছিল, কখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতেছিল, কখন বা ভয়ে কাঁপিতেছিল। লাবিন্স্কি-দেহ অক্টেভ, অক্টেভ-দেহ লাবিন্স্কিকে উদ্ধত ও প্রাণহীন ভদ্রতার স্বরে বলিলেন:—

"মহাশয়, এই ভূতদের সঙ্গে বিবাদ ক'রে অনর্থক আপনার মান হানি করবেন না। যদি আপনি কৌণ্ট লাবিন্স্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তাহলে জান্‌বেন, তিনি দুফুর দুটোর পূর্ব্বে আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আর কৌণ্টেস্ মহোদয়ার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎকারের অধিকার আছে, কৌণ্টেস্-মহোদয়া বৃহস্পতিবারে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।"

এই কথাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া এবং প্রত্যেক শব্দের গুরুত্ব দেখাইবার জন্য, প্রত্যেক শব্দের উপর সজোরে ঝোঁক্ দিয়া এই অলীক কৌণ্ট ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন, আর তাঁর পশ্চাতে দ্বারও রুদ্ধ হইল।

অক্টেভ-দেহ ওলাফ-লাবিন্স্কি মূর্চ্ছিত হওয়ায় তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া তাঁহার গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি দেখিলেন, এমন একটা শয্যায় তিনি শুইয়া আছেন, যেখানে তিনি পূর্ব্বে কখন শয়ন করেন নাই, এমন একটা ঘরে রহিয়াছেন, যে ঘরে তিনি কখন প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না। তাঁহার নিকটে একজন অপরিচিত চাকর দাঁড়াইয়া ছিল। সে, তাঁহার মাথাটা উঠাইয়া, নাকের কাছে ঈথরের শিশি ধরিল। চাকর অক্টেভ-দেহ কৌণ্টকে আপনার মনিব মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল:

"এখন আপনার একটু ভালো বোধ হচ্চে?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন:—

—"হাঁ; ও একটা ক্ষনিক দুর্ব্বলতা মাত্র।"

—"আমি কি এখন যেতে পারি?—না আপনার কাছে আপনাকে দেখবার-শোন্‌বার জন্য আমাকে এখানে থাকতে হবে?"

—"না, আমাকে একলা থাকতে দেও; কিন্তু চলে যাবার আগে,—বড় আয়নার কাছে যে-সব লোহার মশাল-বাতি আছে সেগুলা জ্বলিয়ে দিয়ে যেও।"

—"কিন্তু এত-বেশী আলোতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে ব'লে আপনার মনে হচ্চে না কি?"

—"কিছুমাত্র না; তা ছাড়া এখনো আমার ঘুম পায় নি।"

—আমি শুতে যাব না, যদি আপনার কিছু দরকার হয়, ঘণ্টা বাজালেই আমি ছুটে আস্‌ব।"

চাকর, কৌণ্টের পাণ্ডুবর্ণ, ও বিশ্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়াছিল।

চাকর বাতিগুল, জ্বালাইয়া প্রস্থান করিলে কৌণ্ট আয়নার কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং আলোক-উদ্ভাসিত এই পুরু ও বিশুদ্ধ আর্সির ভিতর দিয়া দেখিলেন:—একটি তরুণ মুখ, মৃদু ও বিষণ্ণ, মাথায় প্রচুর কালো চুল, নীলবর্ণ চোখের তারা রেশমের মত মোলায়েম শ্যামল শ্মশ্রু—তখন বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! এ মুখটা ত আমার নয়!" তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলেন, হয়তো কোন দুষ্ট তামাসা-বাজ লোক তাম্র ও ঝিনুক-খচিত আয়নার তির্য্যক্ কিনারার পিছনে তাঁর একটা মুখস্ রাখিয়া দিয়াছে। তিনি পিছনে হাত দিয়া দেখিলেন, হাতে কিছুই ঠেকিল না। সেখানে কেহই ছিল না।

আপনার হাত টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন,—তাঁহার হাত অপেক্ষা সরু, লম্বা, ও শিরা-সমন্বিত; অনামিকা অঙ্গুলিতে একটা বড় সোনার আংটি, আংটির মণির উপর কুল-চিহ্ন খোদিত। কৌণ্ট এই আংটির অধিকারী কখনই ছিলেন না। তাঁহার পকেট্ হাতড়াইয়া একটা ছোট পত্র-পেটিকা পাইলেন,—তাহার ভিতর কতকগুলি সাক্ষাৎ করিবার তাস-পত্র (card) ছিল—তাস-পত্রের উপর এই নামটি লেখা ছিল;—"অক্টেভ"।

লাবিন্স্কি-প্রাসাদে ভৃত্যদের অট্টহাস্য, তাঁহার দ্বিতীয়-মূর্ত্তির আবির্ভাব, আয়নার ভিতরে নিজের মূর্ত্তির বদলে ভিন্ন লোকের মূর্ত্তির ছায়া দর্শন—এ-সব বিকৃত মস্তিষ্কের বিভ্রম হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই-সব অন্তের পরিচ্ছদ, এই আংটি যাহা তিনি আঙ্গুল হইতে খুলিয়া ফেলিয়াছেন—এই সব সারালো প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতিবাদ করা, এই-সব সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে কিছু বলা অসম্ভব। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হইয়াছে; নিশ্চয়ই কোন যাদুকর, সম্ভবত কোন দানব তাঁহার আকৃতি, তাঁহার আভিজাত্য, তাঁহার নাম, তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিকট হইতে হরণ করিয়াছে, কেবল তাঁহার আত্মাকে তাহার নিকট রাখিয়া দিয়াছে অথচ সেই আত্মাকে বাহিরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিবার কোন উপায় রাখিয়া দেয় নাই।

তাঁহার অবস্থা অন্য প্রকারেও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তিনি যে শরীরের মধ্যে বন্দী হইয়া আছেন, সে শরীর ধারণ করিয়া তিনি লাবিন্স্কি কৌণ্টের পদবী কখনই আর দাবী করিতে পারিবেন না। সকলেই তাঁহাকে প্রবঞ্চক,—নিদান পক্ষে,—পাগল বলিয়া ঠাওরাইবে। একটা মিথ্যা আকারে আবৃত তিনি—এখন তাঁর স্ত্রীও তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না—তাঁকে কে সনাক্ত করিবে? কি করিয়া তিনি তাঁহার তাদাত্ম্য প্রমাণ করিবেন? অবশ্য অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের ঘটনা আছে, অনেকে রহস্যময় খুঁটিনাটি কথা আছে যা অন্যের অপরিজ্ঞাত হইলেও, কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভীর মনে পড়িতে পারে এবং সেই সব কথা মনে করিয়া তাঁহার ছদ্মবেশী স্বামীর আত্মাকে তিনি খুব সম্ভব চিনিতে পারিবেন কিন্তু একা তাঁহার বিশ্বাসে কি হইবে? সমস্ত

লোকের মতের বিরুদ্ধে কি তাঁহার বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারিবেন? সত্যই তাঁহার "আমি" সম্পূর্ণরূপে তাঁর বেদখল হইয়া গিয়াছে। তাঁর এই রূপান্তীকরণ শুধু কি বাহিরের আকার ও মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন মাত্র অথবা বাস্তবিকই তিনি অন্য কাহারো শরীরে বাস করিতেছেন। তা যদি হয়, তবে তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল? কোনও চুলার মধ্যে পড়িয়া কি ছাই হইয়া গিয়াছে, অথবা কোন সাহসী চোরের অধিকারে আসিয়াছে? লাবিন্স্কি প্রাসাদে তাঁহারা অনুরূপ যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহা প্রেত-মূর্ত্তি হইতে পারে, কোন অলৌকিক দর্শন হইতে পারে; কিংবা কোন শরীরী জীবন্ত জীবও হইতে পারে, সেই আমির আকৃতি ডাক্তার হয়ত আমার গাত্রচর্ম্ম খুলিয়া লইয়া তাহার মধ্যে দারুণ নিপুণতার সহিত ঐ লোকটাকে স্থাপন করিয়াছে।

বিষাক্ত সর্পের ন্যায় এই চিন্তাটা তাঁর হৃদয়কে দংশন করিতে লাগিল।—কিন্তু এই অলীক কৌণ্ট লাবিন্স্কি, কোন দানব যাহাকে আমার আকারে পরিণত করিয়াছে, সেই রক্তপিপাসু হিংস্র পশু, যে এখন আমার বাড়ীতে বাস করিতেছে, ভৃত্যেরা এখন যাহার আজ্ঞাবহ হইয়াছে, হয়ত সে এই সময়ে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, সেই কক্ষ যেখানে প্রথম রাত্রির ন্যায় যখনই আমি প্রবেশ করিতাম আমার হৃদয় একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগে ভরিয়া উঠিত। হয়ত এখন কৌণ্টেশ প্রাস্কোভি সেই হতভাগার ঘৃণিত স্কন্ধের উপর আপনার স্বর্গীয় রক্তিম রাগে রঞ্জিত সুন্দর মুখখানি আনত করিয়া রহিয়াছেন এবং এই মিথ্যুককে, প্রবঞ্চককে, নারকীকে আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন! এখন যদি ছুটিয়া আমার প্রাসাদে যাই আর উচ্চকণ্ঠে কৌণ্টেশকে বলি:- "তোমারে ও প্রতারণা করচে, ও তোমার হৃদয়েশ্বর ওলাফ নয়! তুমি না জেনে নির্দ্দোষ ভাবে এমন একটা জঘন্য কর্ম্ম করতে উদ্যত হয়েছ যা আমার হতাশ আত্মা চিরকাল—অনন্তকাল স্মরণ করবে!"

কৌণ্টের মস্তিষ্ক অগ্নিময় আবেগ তরঙ্গে আলোড়িত হইতে লাগিল। কখন বা অস্পষ্ট রাগের কথা মুখ দিয়া বাহির হইল, কখন বা মুষ্টি-কণ্ডূয়ন অনুভব করিতে লাগিলেন, ঘরের মধ্যে হিংস্র পশুর মতো অস্থির ভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্পষ্ট অহংজ্ঞান, যেন উন্মাদে আচ্ছন্ন হইবার মতো হইল। তিনি ছুটিয়া অষ্টেভের প্রসাধনকক্ষে গেলেন, জলের বাসনে জল ভরিয়া, তাহার মধ্যে মাথা ডুবাইলেন। যখন মাথা উঠাইলেন, তখন সেই কণ্‌কনে তুষার-শীতল জলে সিক্ত মাথা হইতে বাষ্প-ধূম উত্থিত হইতেছিল। তাঁহার রক্ত আবার ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যাদুগিরি ও ডাইনীমন্ত্রতন্ত্রের দিন ত চলিয়া গিয়াছে! মৃত্যুই কেবল আত্মাকে শরীর হইতে বিযুক্ত করিতে পারে। একজন পোলাণ্ডের কৌণ্ট, যে প্যারিসে বাস করে, রথচাইল্ডের কাছে যাহার লক্ষ লক্ষ টাকা ধার আছে, যে বড় বড় বংশের সহিত যে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, একজন সৌখীন রূপসী যাকে পতিত্বে বরণ

করেছে, প্রথম শ্রেণীর রাজ-সম্মানে যে বিভূষিত তাকে কি কোন বাজিকর এই রকম করে চোখে ধূলো দিতে পারে? এ নিশ্চয়ই সেই বালখাজার শোরবোনোর কাজ—আমাকে লইয়া সে একটু মজা করিয়াছে; কিন্তু ইহাতে তার কুরুচিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখন এই সমস্তের ব্যাখ্যা একমাত্র সেই করিতে পারে।

তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তাড়াতাড়ি অষ্টেভের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুইবামাত্র গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চাকর এক সময়ে আসিয়া, তাঁহার চিঠিপত্র ও খরচের কাগজাদি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রস ও নিরস

বহুকাল হ'ল মানুষ আপনার ইতিহাস লেখা সুরু করে দিয়েছে। প্রথম ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে—লেখার অক্ষরেও নয়, ছাপার অক্ষরেও নয়, কিন্তু বাটালির চোপ দিয়ে; নয়তো তুলির আঁচড় দিয়ে মানুষ প্রথম লিখলে সিংহের ঘাড়ে পা রেখে মানুষ দাঁড়িয়েছে—পাড়া হয়ে! এইভাবে এক ঢিলে দুই পাখী মারার নিয়ম এখনো ঐতিহাসিকদের মধ্যে চলে এসেছে। ভারত-বিজয়ের ইতিহাসেও এই প্রথা, সিংহ-বিজয়ের ইতিহাসও তাই, আবার ভারত-শিল্পের ইতিহাস লেখবার সময়েতেও ঐ একই নিয়ম চলে আসছে এ-পর্য্যন্ত। মানুষের দিক দিয়ে সিংহ-বিজয়টা অষ্টপাথরে অক্ষয় কালিতে ছাপা হয়ে রয়ে গেল, আর পশুদের দিক দিয়ে তাদের আপনার ইতিহাস যা লেখা হ'ল ও হচ্ছে, তা রক্তের অক্ষরে পশু-ভাষায় লেখা—কাজেই পণ্ডিতেরা তার অর্থ বুঝলেন না, উল্টো টীকাই ক'রে চল্লেন! কাজেই সিংহ দুঃখ করে বলেছিল—আমি যদি মানুষের ভাষায় ইতিহাসটা লিখতেম—তাহলে সিংহ রইতো উপরে, মানুষ রইতো নীচে! এই তো গেল ঝগড়ার ইতিহাস; —সে ইতিহাসের মূল্য ইতিহাস-হিসাবে নয়, মকদ্দমার নথি-হিসাবে সেটা কাজের হতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে আমাদের শিল্পের ইতিহাস আমরা লিখলে হবে এক-রকম, ওরা লিখলে হবে অন্য! ওরা যতটা পারে যিশুখৃষ্টের জন্মের পরে আমাদের শিল্পটাকে ঠেলে এনে আলেকজাণ্ডারের পায়ের তলায় ফেল্‌বে, আর আমরা ঠেলে তুল্‌বো আমাদের শিল্পটাকে খৃষ্টপূর্ব্ব এবং খৃষ্টেরও পূর্ব্ব তস্য-পূর্ব্ব ভূতপূর্ব্বের দিকে সোজা—এইভাবে ঝগড়া চল্‌তে থাক্‌লে হবে কি? ঝগড়ারই ইতিহাস বাড়বে, আমাদের দেশের artএর ইতিহাস একছত্রও এগোবে না। এই সেদিন—ফরাসী মুল্লুক থেকে একজন এলেন, তিনি প্রমাণ করে গেলেন,

সব বুদ্ধমূর্ত্তিতে গ্রীক শিল্পের ছাপ রয়েছে, অতএব ওটা পশ্চিম এসে পুবকে বথ্‌সিস্ করে গেছে। কিন্তু আমি বল্‌তে চাই—দেখ দেখি একটা দাঁড়ানো সমভঙ্গ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং ইজীপ্তের এক দেবতার চেহারা, দুটোই দেখবে এক ছাঁচে ঢালা,—ইজিপ্তের সঙ্গে ভারতের একটা কুটুম্বিতেও ঘটেছিল এক সময়ে, কাজেই প্রমাণ হচ্ছে—ভারত যেটা দিলে ইজীপ্তকে গ্রীসেরও পূর্ব্বজন্মের—এমন কি ফরাসী জাতেরও সৃষ্টি হবার স্বপ্নেরও স্বপ্নের আগে, সেইটে থেকেই সবাই শিখলে মূর্ত্তি গড়তে। এর উত্তর সবাই দেবে—যে আস্পর্দ্ধা বিদেশীকে মানায় সেটা দেশীতে মানাবে কেন? অথচ তোমরা জানো কেবল ব্রাহ্মণ যেমন জন্মেই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, তেম্‌নি ফ্রেঞ্চম্যান কি ইংরেজ বলেই এরা artist, কিন্তু সত্যিই এরা archæologist ও Historian যারা ভারত-শিল্পী সম্বন্ধে চর্চ্চা ক'রে ইতিহাস লিখতে চলেছে—তারা art জিনিষটার তথ্য artএর দিক দিয়ে আবিষ্কার করতে চলছেনা, সন-তারিখের প্রমাণ আর বাহ্যরূপ দেখেই তারা চলেছে আমাদের artএর তথ্য লিখতে! Indian Artর বড় বড় history, archæology কুটকচাল ধরে! কাজেই artএর হিসেব যা হচ্ছে আমাদের তা archæological বা খুবই logical,—artistic একেবারেই নয়!

Artএর সম্পর্ক রসের সঙ্গে রসিকের সঙ্গে, কাজেই তার ইতিহাস হ'ল রসের ইতিহাস, রসিকেই সেটা লিখবে, ইংলণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গেও মিলবে না গ্রীসের সঙ্গেও নয়, এমন কি তোমাদের আপনার ইতিহাসের রাজা-বলীর তারিখের সঙ্গেও নয়। বাঙ্গা পাঁজিতেও হয়তো লেখা আছে অমুক রা অমুক সনে পুরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে শিলালিপিতেও পাওয়া গেল তাই, কি শিল্পজগতের রসের ভাণ্ডারে কবে কেম করে পুরী-মন্দিরের ছাঁচ প্রস্তুত হয়েছি —বাংলা পাঁজির বহুপূর্ব্বে, ঐতিহাসিকে সাধ্য নেই যে দেখে,—সেটা রসিকের চোখে ধরা যায়। ফুল-ফলের মধ্যে রূপ রস গন্ধ সবই ফুল-ফল দেখা দেবার অনেক আগে এসে জোটে, কোনটা সময় পেয়ে চট্ ক'রে ফোটে, কোনটা সময় অপেক্ষা ক'রে দেরী করে, আর কোনটা বা ফুটতেই পায়না সময়-অভাবে। রসালের জন্ম যেদিন গ্রীষ্মের তাপে সে পাকলো সেদিন, না বসন্তের হাওয়ায় সে গুটি বাঁধলে, সেদিন, না কুয়াশার মধ্যে সে যেদিন বউল ফোটালে বা যেদিন আমগাছটাই ফল নিয়ে বীজ ছেড়ে বেরোলো, সেদিন? কালের মাপকাটি দিয়ে রসের ইতিহাস মাপা চলবেনা। রসের সমতা আর তার অসমতা রসের উৎকর্ষ রসের অপকর্ষ এই নিয়েই একদেশের এক কালের artএ ভেদাভেদ করা যেতে পারে, তা ছাড়া তারিখ-সন্ মিলিয়ে যা হয় তা আর্টের কুষ্টি বা গুষ্টি কথা। আর্টের এ-পর্য্যন্ত যা ইতিহাস হয়েছে তা ঐ কুষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়! কোন বিশেষ দেশের বিশেষ শিল্পের বয়েস নেবার বেলায় কুষ্টির সন-তারিখগুলো তার দাঁতের হিসেবের কাজ করতে পারে, কিন্তু তাতে ক'রে এ প্রমাণ হয় না যে আজকের বলেই কসা গুটি থেকে রসাল পেয়েছে তার রস, কিংবা বয়েসে গুটি বড়, অতএব সদ্য-পাকা

আমের চেয়ে পুরোণো বলেই সেটা ভালো ও বড়! বয়েসের আগে-পিছে হিসাবে artএর ছোট-বড় ভাল-মন্দ হিসেব হয় না, হ'তে পারে না! রসের তারতম্য নিয়েই কথা,—এবং তারি ইতিহাস হয় artএর ইতিহাস! যুগের ইতিহাস জাতির ইতিহাস কোন-একটা বিশেষ সভ্যতার ইতিহাস অনেকটা ক'রে সময় নিয়ে অনেকগুলো কাজ-কর্ম্ম বলা কওয়া কাণ্ড-কারখানা নিয়ে জড়িয়ে চলে, কাজেই অনেক টুক্‌রো টুক্‌রো জিনিষকে একত্র ক'রে নিয়ে তবে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে দেখা ও দেখানো ছাড়া উপায় নেই। তেম্‌নি রসের সৃষ্টি ঠিক যে ভাবে প্রকাশ হয় তাতে শুধু তার প্রকাশের তারিখ তার ইতিহাস জানার পক্ষে যথেষ্ট নয়,—কোথা থেকে সে রস এল, কেমন ক'রে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে সে আস্তে আস্তে আপনার মাধুর্য্য প্রকাশ করলে এটা না ধরতে পারলে কখনই artএর ইতিহাস লেখা সম্ভব হয় না, জিনিষটিকেও সম্পূর্ণ জানা চলে না। এটা একেবারে ঠিক যে, জাতি-বিশেষের ইতিহাস যে রাস্তাটি ধরে উঠে পড়ে চলেছে সে রাস্তাটি ধরে জগতের শিল্পের ইতিহাস চলেনি। দেখছি মানুষ তখন সভ্যতার ধার দিয়েও যাচ্ছে না, গুহার মধ্যে বাস করেছে—কাঁচা মাংস খাচ্ছে অথচ artএর দিক দিয়ে খুব আধুনিক য়ুরোপীয় শিল্পীর মতো ড্রয়িং করছে। ইউরোপের গুহাবাসীরা যে তখনকার মহিষ বরাহ হরিণের পালের নক্সা লিখেছে, এখনকার ফরাসী চিত্রকরের সঙ্গে তার খুব তফাৎ এই যে সেটা অনেক ভালো! আবার কোথায় দেখি জগতে আদিমতম artএর মূর্ত্তি ইজীপ্তের দেবতা আর খৃষ্টজন্মের ঢের পরেরকার ভারতের একযুগের বিষ্ণু-মূর্ত্তি দুই একছাঁদে গড়া, একভঙ্গী একভাব! কাজেই বল্‌তে হয় artএর বিশ্ব-জোড়া একটা স্বতন্ত্র বিচিত্র গতি রয়েছে, এই বিরাট গতির উত্থান-পতনের ইতিহাস হচ্ছে artএর ইতিহাস। একই জলের ঢেউ যেমন নানা জায়গায় মাথা তুল্‌তে তুল্‌তে চলে—বেগের তারতম্যে কোথাও বড় কোথাও ছোট, বিচিত্র ভঙ্গীতে বিচিত্র; তেম্‌নি artও আপনাকে প্রকাশ করছে—স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে এক ও বিচিত্রভাবে গোড়ায় রয়েছে রসের ঝর্ণা বা ইংরিজীতে যাকে বলি artistic feeling; কোথাও সেটা ফুটেছে খুব শীঘ্র একরকম, কোথাও সেটা এসেছে খুব পরে আর এক রকম। ইউরোপ angelকে ডানা দিয়েছে যে রসের তাড়নায়, সেই রসেরই তাড়নায় আমাদের দেব-দেবীর মূর্ত্তি দশ হাত, হাজার হাত ছড়িয়ে বাহাস কেটে চলেছে দেখছি! এতে ক'রে কেন যে একটাকে বলি angel আর একটাকে বলি monster তাতো আমি বুঝিনে! কোন্ authority নিয়ে গায়ের জোরে রাক্ষস বলে বসলো ওরা আর আমর সেটা মেনে নিলুম অবাধে নির্ব্বিচারে, সেটা আর যাতেই সম্ভব হোক artএর ইতিহাস গড়বার বেলায় সেটা চলবে না। সেখানে এককথা art, কি art নয়।

রাস্কীনের কাছে গ্রীক শিল্প ছাড়া সবই Barbarian art, Birdwood সাহেবের মতে বুদ্ধ-মূর্ত্তি Salt Pudding ছাড়া কিছুই নয়, Anderson বলেন, এ সবই monster, আর Vincent Smith যিনি সেদিন Indian

Artএর history লিখে গেছেন তিনি বলেন, এদের দেশে Fine art সম্বন্ধে কোন বই লেখা এ পর্য্যন্ত হয়নি। কাজেই Fine art ব'লে পদার্থ এদেশে নেই ও ছিল না,—চীনের দেশে artএর ষড়ঙ্গমালা আছে. তাদের artও আছে, গ্রীসের পুঁথিগুলো দুর্ভাগ্য ক্রমে লোক পেয়েছে এবং রোমান আমলের কপি ছাড়া আসল গ্রীক মূর্ত্তি খুবই কম পাওয়া যায়, কিন্তু তবু তাদেরও art আছে, কেবল নেই এদের! আর খুব আধুনিক ফুচে সাহেবের মত হ'ল, তোদের যা কিছু ভালো সবই প্রায় গ্রীসের দেওয়া। এ ছাড়া ছোট-খাটো অনেক authority আছে যারা এদেশের Fine artকে সপ্তরথীর মতো ঘিরে বধ করতে চাচ্ছে। একা অভিমন্যু তার সেকালের ধনুর্ব্বাণ এমন কি ভাঙা সূর্য্যের রথের চাকা ঘুরিয়ে যে কিছু করতে পারে এ ক্ষেত্রে তা বোধ হয় না। অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি খানিক চলবে কিন্তু তারপরে যখন বাক্‌যুদ্ধ বাধবে তখন আমাদের পরাজয় স্বীকার করতেই হবে যদি না তেমন যোদ্ধা পাই! আমি তো বলি লড়ায়ে কাজ নেই, সে সময়টা artistএর চোখ দিয়ে দেখে Art History যদি কেউ আমরা লিখে যেতে পারি সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য! এটাকে তোমরা বল্‌বে ভীরুতা। কিন্তু আমি বলি সুবিবেচনা! Archæologyর শরশয্যায় art কে না শুইয়ে তাকে নিজের দরদের সিংহাসনে বসিয়ে যদি দেখ, তো দেখবে ঢের গোলযোগ আপনি মিটে যাবে, এবং artistএর দিব্যচক্ষু নিয়ে তোমরা দেখতে পাবে যদিই বা লড়তে চাও তো ওই-সব authorityকে উড়িয়ে দেবার ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে artএর প্রখর করজাল, Archæology'র ধূমধাম নয়। Artএর ইতিহাস দরদের ইতিহাস আর artর গতিবিধির ইতিহাসটা সুবিস্তৃত সব বড় জিনিষের যেমন তেমনি। সেটার ইতিহাস লেখার সময় দরদ দিয়েই লিখতে হবে, চাক্ষুস প্রমাণ দিয়ে কোন বিশেষ artএর সঙ্গে অন্য artএর তারতম্য এবং তার মোটামুটি আন্দাজ শ্রেণী ও জাতি-বিভাগ করা চলে, কিন্তু artএর ঘরের কথা, যেখানে গ্রীক হিন্দু মুসলমান মীসরী চিনে জাপানী আধুনিক ও পুরাতন একাকার হয়ে artএর বিরাট ধারাটি উঠে পড়ে চলেছে, কোথাও অন্তঃশীলা বইছে আপনার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রেখে, কোথাও মিলছে ত্রিবেণী-সঙ্গমে, কোথাও একটানা স্রোতে কোথাও জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়ে চলেও গেছে এবং চলেও যাবে অবাধ আনন্দময়ী ছন্দরূপা, তার ইতিহাস দরদীরই জ্ঞানের বিষয়। চাক্ষুস প্রমাণের চেয়েও সত্যকার এই দরদ দিয়ে লেখা যে artএর ইতিহাস সেই হচ্ছে নানা শিলা-লিপিতে যা পাই, মাটি খুঁড়ে যা পাই, সাহেবের লেখা ইতিহাস পড়ে যা পাই—সবার চেয়ে artএর সঠিক ইতিহাস, কেননা দরদের প্রকাশ হোলো না art! দরদ জিনিষটি দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, কিন্তু দরদ অনেকখানি দেখাতে পারে শোনাতেও পারে। দপ্তরী টানলে লাইন রুল দিয়ে পরিষ্কার একেবারে সোজা, ছেলেও দেখে সোজা বুড়োও দেখে সোজা, কিন্তু artist দেখলে ওটা লাইন ছাড়া আর কিছু নয়। Artist টানলে লাইন দরদ দিয়ে, সেটা হল এমন জিনিষ যে দরদী ছাড়া সহজে কারো বোঝবার জো নেই! এইখানে দপ্তর-ঘাঁটা ঐতিহাসিকের ইতিহাসের সঙ্গে

artistর লেখা artর ইতিহাসের তফাৎ। বে-দরদী সে factর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে লিখতে চলে, factর বাইরে যা তার ইতিহাস, কাজেই তাতে ভুল থেকে যায়, আর দরদী লিখে চলে দরদের টানে হু-হু ক'রে, তাতে fact হয়ে যায় ওলোট-পালোট। Fact বাদ দিয়ে ইতিহাস যেমন অসত্য, তেম্‌নি দরদ বাদ দিয়ে শুধু fact নিয়ে artর কথা বল্লে তার চেয়ে কম অসত্য হয় না। রসালের সব ইতিহাস লেখা হলো কেবল রসের কথাটাই বাদ পড়লো এটা ভালো, না তার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব অনেকটা বাদ গেল কিন্তু রসতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফুটে উঠলো সেটা ভালো, এ নিয়ে মামলা artist ও archæologist দুই দলেই চলেছে কিন্তু জিতবে দরদী! ইতিহাসের তথ্য আজ বদলাবে কাল বদলাবে কিন্তু দরদীর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে artর সত্য কথাটাই পড়বে অভ্রান্তভাবে এটা ঠিক। এ পর্য্যন্ত যা fact আবিষ্কার হয়েছে তারি উপরে নির্ভর ক'রে archæologist দেখলেন গান্ধার শিল্প অতি চমৎকার আর তারি প্রভা ভারতের এমন কি জাভা চীন জাপান যেখানে যত বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে তার উপরে, কিন্তু দরদীর বা artistর দিক দিয়ে গান্ধার-শিল্পের ঐ মায়াদেবী * কিম্বা বোধিসত্ত্বটির * দিকে চেয়ে দেখ দেখবে হয় মেয়ের ধড়ে পুরুষের মুণ্ড নয় এর বিপরীতটা! Fact বাদীরা একেই বলেন গান্ধার শিল্প বা Greco-Bactrian art আর এরি ফল ভারতের শিল্প, কিন্তু দরদী দেখে গান্ধারের বীজ যা তা থেকে ভারত কেন, কোন শিল্পই জন্মাতে পারে না, কেননা, সেটা গ্রীক শিল্পের কতকটা আবর্জ্জনা, গ্রীক অভিযানের স্রোতে এদিকে এসে পড়েছিল, জোয়ার চলে গেলে ভাঁটার মুখে এইখানেই পড়ে রইলো, এই আবর্জ্জনা কুড়িয়ে ভারত-শিল্পী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও গড়ে নি, মায়াদেবীকেও সাজায় নি, একটি খাঁটি বুদ্ধ মূর্ত্তি আর মায়াদেবীর চেহারা * দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। গ্রীসের বরুণ-দেবতার * পাটখানি যেমন বেঁকিয়ে গান্ধার শিল্পের মূলে রয়েছে গ্রীক শিল্প তেমনি আমাদের 'সুন্দর' মূর্ত্তি প্রমাণ করছে—নানা গ্রীক-দেবতার বীজে ভারত-শিল্পের জন্ম নয়, কিছুতেই নয়! তেঁতুলের বীজে আর আমের বীজে যতখানি তফাৎ তার সঙ্গে সমান তফাৎ গান্ধার-শিল্পে আর ভারত-শিল্পে, এই হ'ল দরদীর প্রমাণ! দরদীর চোখে গ্রীক দেবতা আর 'সুন্দর' মূর্ত্তি এক শ্রেণীর জিনিষ, দুয়ের মধ্যেই গতির আর ভাবের এমন-কি কারিগরিরও পার্থক্য বড়-একটা নেই এ-টা fact, কিন্তু Archæologistরা কিছুতেই মানবে না, দেখিয়ে দিলেও দেখতে পাবে না—কেননা তারা যে দরদী নয়! বরং fact-বাদীরা এই কথাই বলবে যে গ্রীকের নরদেব আর সিংহলের এই অতি-আশ্চর্য্য ভক্ত মূর্ত্তির সঙ্গে যখন অনেকটা মিল দেখা যাচ্ছে তখন

* Fig. 67. 68. P. 116. Vincent smith.
* Fig. 62. P. 112 Vincent smith.
* P. xxxvi. Vincent smith.
* Fig. 77. P. 124 Vincent smith.

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

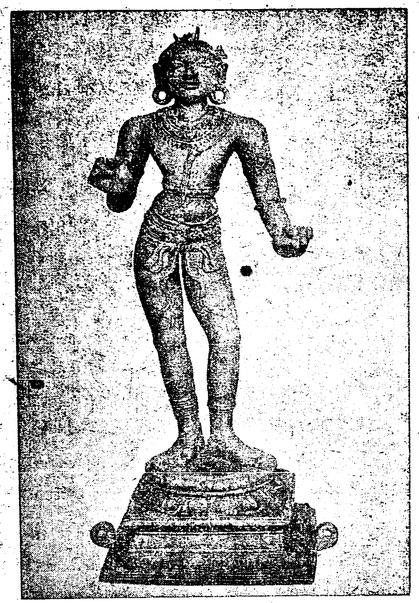

সুন্দর মূর্ত্তি

সুন্দর মূর্ত্তির জনক নিশ্চয়ই গ্রীক-দেবতাটি, কিন্তু দরদীর উত্তর হচ্ছে তা নয় দেখতে এক হলেও এক রসে গড়া একটি, অন্য রসে গড়া অন্যটি, art দুটিরই জনক, এরা দুই ভাই, কিন্তু রস দিচ্ছে দুজনে পৃথক পৃথক যেন হিন্দু-মুসলমান, মানুষ হিসেবে দুই ভাই কিন্তু রসের প্রকৃতি দুয়ের সম্পূর্ণ আলাদা। পিতা পুত্র হ'লে এরূপটি হতো না, কম-বেশী একই রস দুজনে দিত। এই রসের তারতম্য ধরে artর ইতিহাস লেখার কথা কিন্তু নীরস Fact দিয়েই রসের ইতিহাস গড়তে চলেছে প্রায় সবাই, কেন যে, তার কারণ যারা রস সৃষ্টি করতে চায় তাদের ইতিহাস সৃষ্টি করবার চেষ্টাই আসেনা সময়ও হয় না! আমাদের দেশে শিল্পীর মন থেকে অষ্টাদশভুজা দানব-দলনী মূর্ত্তি যখন বায়ুস্তরে একটাঙ্গতর তুলে বেরিয়ে এল, সেটা দেখে দরদীর মন আলোড়িত হল, সে নির্ব্বাক হয়ে রস উপভোগ করলে, আর যে দরদী নয় সে চেঁচিয়ে উঠলো monster বলে, এবং কেতাবে লিখলে এরা রাক্ষসী-প্রতিমা ছাড়া আর কিছুই গড়ে নি গড়তে পারে না। They are a peculiar people and necessarily produce peculiar art—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত!

কিন্তু দরদীর দিক দিয়ে এ-কথা যদি বলা যায়, Sir, you are not at all artistic so you do not understand what *Rasa* is and therefore you are unaffected by *Rasa*—এ হ'লেই ঝগড়া! যারি পৈতে আছে সে যেমন এদেশে আপনাকে ভাবে ব্রহ্মবিদ্যার উত্তরাধিকারী তেমনি সাদা চামড়া মাত্রই আপনাকে ঠাওরায় artist, রস্কিন নিজেকে তাই ঠাউরে গ্রীস ছাড়া সবার শিল্পকে বর্ব্বর বলে নিন্দা করেছিলেন এবং সেই গর্ব্বে Whisler artকেও সমালোচনা করতে গিয়েছিলেন, বিশ্ব-শিল্পের দেবতা তাঁকে আদালতে নিয়ে এক সিলিং জরিমানা ক'রে ছেড়ে দিলেন। Birdwood সাহেবেরও ঐ দশা। জীবনের বেশি ভাগ এদেশে কাটিয়ে দেশের কারু শিল্পের উপরে ভালো বই লিখে শেষ বয়সে তিনি বুদ্ধের-মূর্ত্তিকে গালাগালি দিলেন

Salt pudding ব'লে অমনি তাঁরই দেশের ত্রয়োদশ দরদী মিলে তাঁকে বধ করলে, প্রাণে নয়, মানে। Vincent Smith যেমনি লিখলেন, তাঁর Art Historyতে, "The enormous mass of Indian literature whether in Sanskrit or in any other language does not contain, I believe a single treatise on the æsthetics of plastic or pictorial art, and thus present a marked contrast to the literature of China." যেদিন সাহেব বল্লেন, চীনেদের মতো এদের ষড়ঙ্গমালা নেই, সেই দিনই বাৎসায়ণের ষড়ঙ্গ ছটা সাপের ফণা তুলে গর্জ্জে উঠলো।

রূপভেদ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম
সাদৃশ্যম্ বর্ণিকাভঙ্গম ইতি চিত্রম্ ষড়ঙ্গকম্!

এই ভারত ষড়ঙ্গমালা চীনের চেয়ে পুরাতনও বটে বিচিত্রও বটে, সেটা Fact-বাদীদের চোখে পড়বে কেন, চোখে পড়লো আগেই তাদের, যারা দরদী—artর ক্রীতদাস! মানুষ একদিন না একদিন মরবে, যে দরদী সেও মরবে, যে নয় সেও মরবে, কাজেই artর history অসমাপ্ত রেখে যদি কেউ চলে যায় আগেই, তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু দুঃখ থাকবে যদি আমাদের দেশে যে চমৎকার প্রকাণ্ড একটা art treatise ইংরেজী ভাষার জন্মের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় দরদী লিখে গেছেন সেটার কথা কিছু তোমাদের জানিয়ে না যাই। আমার বড় ইচ্ছে ছিল Vincent Smithকে এই পুঁথির কথাটা একবার শুনিয়ে দিই কিন্তু তা এখন আর হয় না, কাজেই তোমাদের সময় থাকতে শুনিয়ে রাখছি, বিশ্বাস করো না যে, ভারতবর্ষের এত-বড় art থাকতে Æsthetics সম্বন্ধে কেউ ভাবেনি বা লেখেনি! লিখেছে, এমন ক'রে লিখেছে, এমন সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ক'রে লিখেছে, যে আমার মনে হয় যে art সম্বন্ধে তার উপর আর-কিছু বলা চলে কি না! আমি অবাক হয়ে যাই যে art আর æsthetics সম্বন্ধে এত-বড় সাহিত্য এ দেশে থাকতে art সম্বন্ধে জানতে চাই আমরা সাহেবদের লেখা পড়ে, এর এক কারণ বই-খানা সংস্কৃততে লেখা, আর এক কারণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংস্কৃত জানলেও artর জ্ঞান তাঁদের একেবারেই নেই, কাজেই অলঙ্কার-শাস্ত্রটা কাব্যেরই অন্তর্গত করে তাঁরা ধরেছেন, অলঙ্কারের সূত্রগুলো যে ছত্রে ছত্রে artর ব্যাখ্যা ক'রে চলেছে সেটা কোন পণ্ডিতকে তো এ পর্য্যন্ত বলতে শুনলেম না! ছেলেবেলায় যা একটু দেবভাষা পড়েছি আর এ পর্য্যন্ত যেটুকু শিল্প-চর্চ্চা করেছি, তাতে ক'রে আমি স্পষ্ট দেখছি অলঙ্কার শাস্ত্রটা মূলতঃ সব শিল্পেরই ব্যাখ্যা। কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, নাট্য সবারই মূল কথা ওখানে ধরা রয়েছে। সেকালে Photograph ছিল না যে অলঙ্কার শাস্ত্রকার নানা মূর্ত্তি নানা চিত্র দিয়ে সূত্রগুলি বিশদ্ ক'রে বোঝাবেন, কবিতার পুঁথিগুলো হাতের কাছে পাওয়া সহজ ছিল সেইজন্যে তারই নমুনা তুলে আপনার Laws of Æsthetics বুঝিয়ে গেছেন, এখন সময় এসেছে ঐ সব সূত্র মূর্ত্তি-শিল্প চিত্রশিল্প এম্‌নি সবার নমুনা দিয়ে বোঝানো। এটা দেখা যায় যে, একই অলঙ্কার-শাস্ত্র নানা মুনি নানা শিল্পের ব্যাখ্যায় লাগিয়েছেন

সময়ে সময়ে! ভরত অলঙ্কার-শাস্ত্র জুড়ে দিলেন নাট্যকলায়, সাহিত্যিক জুড়লে সেটা সাহিত্য-দর্পণে, কবি নিয়ে সেটাকে গড়লেন কাব্যপ্রকাশ, কেন এখন বাংলায় একটা শিল্পপ্রকাশ না হবে অলঙ্কারে সাজানো? Art æsthetics সম্বন্ধে একটা স্বাধীন চিন্তার স্রোত অনেক কাল ধরে এদেশে চলেছে দেখি। এক কালের art-critic কোন-এক সূত্র লিখলে সেই সূত্রের নানা ব্যাখ্যা কালে কালে পণ্ডিতেরা ক'রে চল্লেন, এইভাবে বিচার চলতে চলতে কোন সূত্র দেখছি গ্রাহ্য হচ্ছে, কোনটা বা খণ্ডিত হচ্ছে বর্জ্জিত হচ্ছে—এম্‌নি ক'রে কালে কালে নানা সভ্যতা নানা সময় নানা মনের ছাপ নিয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্রগুলি গড়ে উঠেছে দেখি। আমাদের দেশে যত দীর্ঘকাল ধরে æsthetics সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক চলেছে এমনটি আর কোনো দেশে হয়েছে কিনা সন্দেহ। শিল্পীর দিক দিয়েও অলঙ্কার-শাস্ত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া যে চলেছে তারও আভাস কতক কতক প্রাচীন ছবিতে দেখেছি। এই সেদিনের কথা-কতকগুলো পুরোণো ছবি উল্‌টে-পাল্‌টে দেখছি, বসন্ত-ঋতুর একটা ছবির উপরে একটা হিন্দিতে লেখা শ্লোক চোখে পড়লো, আমি শ্লোকটা পড়ে চল্লেম, অলঙ্কারের পণ্ডিত ছিলেন সাম্‌নে, হঠাৎ ব'লে উঠলেন, এ যে কাব্যপ্রকাশের একটা জানা কবিতা! কবে কার মাথায় কাব্যপ্রকাশটা ছবি দিয়ে প্রকাশ করবার ইচ্ছে হয়েছিল, কে জানে, তারি প্রমাণটুকু রয়ে গেছে মাত্র, কিন্তু এ থেকে ধরা যায় যে নবরস যা কাব্য-প্রকাশের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সেটা কেবলি কবিদের একার সম্পত্তি নয়, শিল্পীরও সেটা নিয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্র লেখার নজীর রয়েছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রকে ইংরিজিনবিশেরা তর্জ্জমা করেন Treatise on Rhetoric ব'লে, সেটা একেবারে ভুল; সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য, নাট্য, এবং চিত্র ও অন্য শিল্প সবার সাধারণ সম্পত্তি হচ্চে অলঙ্কার-শাস্ত্র—এর তর্জ্জমা হওয়া উচিত Our Laws of Æsthetics কিম্বা Indian Æsthetics. যাই বল ওটা কেবলি কিন্তু Treatise on Rhetoric নয়। সমস্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্রগুলো ছবি মূর্ত্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে পারলে শুধু যে মনোরম হবে তা নয়, জিনিষটাকে বোঝাও আমাদের সহজ হবে। সমস্ত শাস্ত্রটাই বোঝানো চলবে কি না ছবি মূর্ত্তির দিক দিয়ে, সেটা ভাববার বিষয়, তবে এটা বলা যায় যে, চেষ্টাটা একবার ক'রে দেখলে হয় সেটা বাজে কাজ বলে উড়িয়ে না দিয়ে। অলঙ্কার-শাস্ত্র যে শিল্পী এবং শিল্পকে যারা জানতে চায় তাদের পক্ষে কতটা কাজের হ'তে পারে তা বলি।

আমাদের সাধারণ ধারণা, কাব্য হচ্ছে নানা ছন্দে-বাঁধা কবিতায় লেখাগুলো,—কিন্তু আলঙ্কারিক বলছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং'। বাক্য মানে এখানে মুখের কথা নয় ইংরেজিতে যাকে বলে Utterance তাই, কিন্তু যেমন সব জিনিষই art নয় তেমনি Utterance মাত্রই কাব্য নয়, সেটা রসাত্মক হ'লে তবে হলো কাব্য। কথা দিয়ে, শরীরের গতিবিধি ও সুরের ওঠা-পড়া দিয়ে যেমন মনের চিন্তা ও ভাব uttered হচ্ছে কবিতায় নাটকে ও গানে তেমনি arta জিনিষ দিয়ে artista ও মনোগত যা-তা uttered হচ্ছে—কিন্তু যা-ই uttered

তাতো কাব্য কিম্বা art হ'তে পারে না, বীণা-খণ্ডটায় আঙুল দিয়ে ঘা দিলেম, কাঠ বল্লে টক্ টক্ কিম্বা তার বল্লে টিং টিং সেটা কাঠ আর তারের utterance হলো মাত্র, রসাত্মকও হ'লনা কাব্যও হলনা। Artist বীণা তুলে নিলে, তার মনের রস গিয়ে বীণার তারে, তার কাঠের অণু-পরমাণুতে, তার খোলটার মধ্যে ভরা বাতাসে কম্পন তুল্লে, সঙ্গীত-বাণী রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি uttered হলো! তখন হলো সেটা art। এম্‌নি অলঙ্কার-শাস্ত্রে art বিষয়ে কত গভীর চিন্তা যে লুকোনো রয়েছে তার ঠিকানা নেই। মহাকাব্য বলতে আমরা এ-পর্য্যন্ত বুঝে আসছি রামায়ণ মহাভারত আর নয়তো পৃথ্বীরাজ-বধ! কিন্তু অজন্তার আজ বরভুধরের পাথরে কেটে শিল্পী যে মহাকাব্য লিখেছে সেটার খবর আজ আমার কাছে শুন্‌ছো। সত্যি কিনা, মহাকাব্যের লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ—'কোন দেবতার কিম্বা সদ্বংজাত ক্ষত্রিয়ের অথবা এক-বংশসম্ভূত নৃপতি-পরম্পরার বৃত্তান্ত লইয়া যে রচনা তাহার নাম মহাকাব্য। মহাকাব্য নানাসর্গে বিভক্ত, কিন্তু আট সর্গের ন্যূন হইলে মহাকাব্য হয় না।" শুধু কটা গুহায় কতলায় বরভুধরের আর অজন্তার ছবি ভাগ করা হয়ে সেইটে জান্‌তে বাকি রইলো! খণ্ডকাব্য —মহাকাব্যের কোন কোন লক্ষণাক্রান্ত ও এক এক বিষয় লইয়া লিখিত হয় খণ্ডকাব্য! এর দৃষ্টান্তও শিল্পে ভূরি ভূরি রয়েছে। তারপর আছে অলঙ্কারে বৃত্তি বা style সম্বন্ধে বিচার তারপর লক্ষণের অধ্যায়ে চিত্রের কাব্যের স্বরূপ বিভাগ, আকার-চিত্র বন্ধচিত্র, গতিচিত্র স্থানচিত্র! এগুলো কি কাব্যেই খাটে, শিল্পে খাটে না!

আকার-চিত্র কাকে বলা হচ্ছে, না—Those which have only one creator, the Lord, are called আকার-চিত্র। এখানে যে আকৃতি সৃষ্টিকর্ত্তার রচনা তারি প্রতিকৃতি মাত্রটিকে বলা হ'ল আকার-চিত্র, এককথায় Photographic representtion, not artistic expression হল আকার-চিত্র। এমনি কি পরিষ্কার ক'রেই আমাদের আলঙ্কারিক বুঝিয়েছেন শিল্পের খুব ভিতরের ও খুব বাহিরের খুব সহজ বা খুব শক্ত কথাগুলো ভাবলে অবাক হই।

বন্ধচিত্রের বেলায় বলা হচ্ছে, which are created by the Lord and by man and have thus two creators, constitutes বন্ধচিত্র! গাছকে ডালপালার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করলেন বিধাতা গাছ কেটে পুতুল কিম্বা চৌকি কিম্বা নৌকো গড়লে শিল্পী, দুই সৃষ্টিকর্ত্তায় ভাব হয়ে গেল, বিধাতা বুঝলেন তিনি পারেন না নৌকো গড়তে, শিল্পী বুঝলে সে পারেনা গাছ গজাতে, কাজেই দুজনে সন্ধি-বন্ধন হয়ে হ'ল বন্ধচিত্র, ইংরিজী ভাষাটা সৃষ্টি হবার পূর্ব্বে যে-সব ভাবনা আমাদের পণ্ডিতেরা ভেবে বিচার বিতর্ক ক'রে চুকেছেন ইউরোপ তারি কতক কথা নতুন ক'রে বলছে, কতক কথা এখনো বলতেও আরম্ভ করেনি দেখি, কিন্তু এই গর্ব্বে সবই আছে বলে যদি আমরা ঘুমোতে বসি, তবে চোখ আমাদের বোজাই থাকবে আর কোন দিন দেখবো আমাদের ধন পরহস্তগতম্ হয়েছে, তখন আপ্‌সোস সার হবে। অলঙ্কারের ধুয়া নিয়ে এবারে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমরা লড়ায়ে এগোবে,

কিন্তু ব'লে রাখছি সবই বৃথা যদি আমাদের হাতে পড়ে এই শাস্ত্রটা লোককে হাঁচাবার ও হাসাবার জিনিষ হয়ে ওঠে। জিনিষটাকে যদি সত্যি কাজে লাগাতে হয় তবে স্থির হয়ে বসে রসের জিনিষগুলি সংগ্রহ এবং সব-চেয়ে প্রধান কাজ রসিকদের একটা দল বাঁধা, শুধু দেশী রসিকের কর্ম্ম নয়, বিদেশী রসিকদেরও চাই এখানে জাত্যভিমান চলবে না। কেননা জার্ম্মাণ পণ্ডিত জাকোবী, অল্ডেনবার্গ এঁরা অলঙ্কার আর ইতিহাস আমাদের যেমন বিশদ ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন Havell যেমন চোখে আমাদের কলা বিদ্যাকে দেখেছেন—তার সমকক্ষ লোক এদেশে পাওয়া যায় ভালো। এই সব দেশ ও বিদেশের রসিক মিলে যদি কারিকা ধ'রে অলঙ্কার-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, শিল্পের দিক দিয়ে তবেই হবে একটা জিনিষের মতো জিনিষ।

যে দেশ থেকে রসিকের সভা উঠে যায়, রসের চর্চ্চা যেখানে বন্ধ হয়ে যে দেশে কেবল পলিটিক্স আর হরতাল্ শূন্য-হাতে হরিত-কীটির মতো অবশিষ্ট থাকে, সে দেশের ভাণ্ডার শূন্যই বলতে হয়—সেখানে বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে দুর্ভিক্ষের চীৎকার প্রবল হয়, কেননা সেখানে থেকে শিল্প তার সঙ্গে দেশের শ্রীও বিদায় হয়। এইজন্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের গোড়াতেই বলা হয়েছে।

কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর ক্ষয়তে—

সদ্যঃপরনির্বৃতায় কান্তাসম্মীততয়োপদেশ যুজে।

Art is for fame, wealth, knowledge of rights, usages, removal of evils, it is the Smile of a love brightening our home exhorting us to do good, and it is ever-lasting joy.

এরি প্রতিধ্বনি এখনকার ইউরোপ দিচ্ছে—a thing of beauty is a joy for ever.

এই কথারই পরিষ্কার প্রতিধ্বনি পাচ্ছি ফ্রান্সের বিখ্যাত মূর্ত্তি-শিল্পী রোঁদার কথায়। It is the human soul's smile on the house and its belongings...it impregnates everything of use to man with the charm of thought and sentiment.

বিশ্বে এলো মানুষ—এর অর্থ এই যে মানুষ বিশ্বকর্ম্মার রচনার মধ্যে নেমে এল রসের অভিনয় দেখতে এবং দেখাতে—যেমন ক'রে শিল্পী ছবি দেখেও বটে দেখায়ও বটে; সে কথা মানুষ ভুলে গেল, চল্লো অন্য পথে—উল্টোমুখে ঘরের শ্রী বাইরের শ্রী কোনোদিকে তার চোখ রইলো না—রইলো গোলদিঘীর পশ্চিমে মোটা থাম-কটার দিকে, নয় আদালতের চূড়োর দিকে, নয় আফিসের বড় সাহেবের সইটার দিকে! এ হ'লে শ্রীই ওদের চলে গেল সারা-জীবন থেকে; আর শ্রী যদি চলে যায়, রস যদি শুকিয়ে মনটা ঝামা হয়ে যায় শক্ত কর্কশ সে মানুষের হয় কি? রসের উৎস বন্ধ হয়ে যায়, রস-সাগরে গিয়ে জীবনের মেলবার পথে চড়া পড়ে আর মরুভূমি ধূ-ধূ করতে থাকে—সাম্নে পিছনে আশেপাশে! যে দেশে ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র রস ফুটে পড়ছে, সে দেশে fine art ছিল না, হ'তেও পারে না, এটা

যেমন fact নয়, তেম্নি এটাও যে ভয়ঙ্কর fact আমাদের মধ্যে এখন art নেই, artর ভাবনা নেই, আর্টের আনন্দ আর্টের জন্যে চিন্তামাত্র নেই ঘরে ঘরে! ইতিহাসের fact নিয়ে লড়াই ক'রে হবে কি, আসল লড়াই হচ্ছে এই অতি-সত্য অতি-ভীষণ factটার সঙ্গে—art ছিল। যা ছিল সে তো ছিল, কিন্তু সেটা যে এখনো আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে তার প্রমাণ আমরা কোথাও পাচ্ছি কি না দেখি! স্থাপত্য-শিল্প নেই, সঙ্গীত রয়েছে প্রায় না থাকারই মধ্যে, অতীতই তার বেশী, বর্ত্তমান খুব কম। চিত্রবিদ্যা একটু গা-ঝাড়া দিচ্ছে কিন্তু এখনো রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে, কাব্য-সাহিত্য অনেকটা সজাগ ও সবল দেখছি স্বাধীনও বোধ হচ্ছে এই দুটো। কিন্তু এই হ'লে যদি আমরা খুসি থাকি তবে artর পরিপূর্ণতা তো পাওয়া আমাদের সম্ভব নয়। কবি লিখলেন নাটক কিন্তু দেশে সেটা প্রচার করলে না অভিনেতারা। ছবি লিখলে অন্যে, নিয়ে গেল সেগুলো পাঁচজনে এসে বিদেশ থেকে, গান গাইলেন তানসেন তার পর থেকে কেউ আর রাগ পর্য্যন্ত করলে না, সেই একই গান শুনতে শুনতে এ পর্য্যন্ত, বজ্রাঘাতে ভাঙলো মন্দিরের চূড়ো তার জায়গায় উঠলো খোলার ছাদ। artর এ দীনতা তো ঘুচবে না, সমস্ত জীবনের গতি আমাদের যদি artর মুখে না গিয়ে যায় কেবলি আফিস-আদালতের মুখেই অনবরত! সাহেব-গুলো খেতে বসেছে আর শুন্‌ছি পাশেই বেহালা সুর ধরেছে, আর আমরা খেতে বসেছি শুনছি ঘড়িতে দশটার ঘড়ি টিং টিং বলছে—আর না, ওঠো, সময় ফুরিয়ে এলো। এই যে নিরানন্দ জীবন, এ থেকে একটু ছাড়া পেলে যদি কেউ অসম্ভব রকম আমোদের নেশায় সারা রাত থিয়েটারের কিন্নরীকে অপ্সরী ভেবে কাটিয়ে দেয়, আর বসন্তের আগমনে বছরের একটা দিন নিজেরা ফাগ-মেখে রাস্তায় ঘাটে হারমোনিয়াম বাজিয়ে চীৎকার ক'রে কান ঝালা-পালা ক'রে দেয়, তবে তার দায়ী কাকে করা যাবে? যারা আমোদে মেতেছে তারা নয়, যারা নাচ-গান সবই দেশের লোপ ক'রে দিয়ে সুসভ্য হয়ে উঠতে চলেছে তাদেরই দায় এটা। আমাদের থিয়েটার বাইনাচ বারোয়ারী এম্‌নি সব নানা জিনিষ, যে-গুলোর মধ্যে অনেকখানি art থাকা দরকার ছিল, সেগুলো এখন বিকৃত রুচির আড্ডা হয়ে পড়েছে, কেন না তার মধ্যে art নেই, কাজেই ছেলেগুলিকে সেখানে পাঠাতে সহজেই আমরা ভয় পাই। কিন্তু art বর্জ্জিত অতএব সম্পূর্ণ বিকৃত সমস্ত যৌবনকালব্যাপী একটা ভয়ঙ্কর নীরস শিক্ষা-প্রণালীর ভিতর দিয়ে আমাদের ছেলেগুলোকে আমরা মানুষ করতে চলেছি। একবার ভাবিনে পরকালে কি হবে, শুধু এই নয় এই শিক্ষার গুল-পোড়ার শিলমোহরের ছাপ নিয়ে আসবার জন্যে ছেলে না চাইলেও জোর ক'রে তাকে দাগী হ'তে পাঠাই, এমন-কি উৎসাহ দিতেও কসুর করিনে; এখন এই আর্টশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা বুড়ো হবার আগেই যদি থিয়েটারে গিয়ে বাকি যৌবনটা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তবে যাদের রুচি রস এ-সবের কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত করা হয়নি—তাদের অনর্থক আমরা দোষ দিই

কেমন ক'রে? কেবল পেন্সিলের দাগ আর পানের পিক্ এরি মধ্যে বসিয়ে পড়ালেম ছেলেকে, সে কলম পিষ্‌লে সমস্ত দিন, রাতের অর্দ্ধেক কাটাতে লাগলো বিড়ির ধুয়া আর পানের পিকের মধ্যে—এতো হতে বাধ্য! এম্‌নি বিপরীত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা চলবো—আর art চলবে না, চুপটি ক'রে বসে থাক্‌বে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী হয়ে, এ হতে পারে না! ঘরের মধ্যে কেরোসীন safety lampএ ভরে রাখলেও আমাদের আর্ট পুড়ে মরবে—তাতেই সংসারের জিনিষ-গুলোয় আমাদের আগুন ধরিয়ে! আমাদের শাস্ত্রে artকে বলা হয় অনন্ত-পরতন্ত্রা, সুতরাং আমাদের আর্ট আর কারু হ'তে পারে না, কিন্তু তবু সে যে "হ্লাদৈকময়ী" যেখানে art এর আনন্দ লোকের মধ্যে নেই, নিশ্চয় জান্‌বে সেখানে আর্ট থাকে না। Artর মানে অভিধানে পাবে—'নৈপুণ্য' শিল্প মানে পাবে 'অর্থকরী বিদ্যা' কিন্তু ভেবোনা যে এ দুটো artর ঠিক মানে। হাতের চালাকি বুদ্ধির দৌড় এ-সব দিয়ে অর্থকরীবিদ্যাকে বাগে আন্‌তে পারো, কিন্তু তাই ব'লে artকে পাবে এটা মনেও করা ভুল! Art যে সহজ বস্তু নয়, তা art কি, তা জানতে চেষ্টা কর্‌লেই বোঝা যায়, আমি তো না সংস্কৃত না ইংরিজী না ফরাসী অভিধানে artর মানে পেয়েছি। What is Art ব'লে বইটা পড়লুম তাতে কেবল নিজের মাথাই ধরানো—artর মাথা-মুণ্ডু কিছু পেলুম না, কাজেই তোমাদের বলছি History of Art, What is Art এমনি সব বড় বড় বই পড়ে ও তর্ক-বিতর্ক শুনে artকে একটুও বোঝা যায় না, বোঝা যায় একটিবার দরদীর একটি কথা শুনলে। দুঃখের বিষয়, দরদী সকল দেশেই চিরকালই দুর্লভ, তাই এ পর্য্যন্ত art সম্বন্ধে পরিষ্কার বুঝিয়ে একটি মাত্র শ্লোক ছাড়া না দেশে না বিদেশে কোথাও আর কিছু পেয়েছি। আজ হ'ল বিংশ শতাব্দী, আর আমার শ্লোকটি হল দ্বাদশ শতাব্দী কি তারও পূর্ব্বের ঠিক বলা যায় না। এই শ্লোকে art সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে এই শত শত বৎসরে মানুষের চিন্তা যে তার চেয়ে বেশি এগিয়েছে তা বল্‌তে পারিনে। শ্লোকটি হ'ল artর বন্দনা ক'রে লেখা; কাব্য-প্রকাশের প্রথম সূত্রপাত হ'ল এই শ্লোক দিয়ে

নিয়তিকৃত নিয়মরহিতাম্
হ্লাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাম্
নবরসরুচীরাং নির্মিতি আদধতি
ভারতী কবের্জয়তি।

এই শ্লোকটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা কর্‌তে হ'লে art সম্বন্ধে একটা বই লিখতে হয়; কাজেই এর একটু চুম্বুক ইংরিজীতে শোনাই—

Art is ungoverned by nature's law, it is another creation having its own laws. It is pleasurable in its entirety spirit of joyousness নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা হ্লাদৈকময়ী। Possessing great individuality and the independent expression of artistic sentiment. অনন্যপরতন্ত্রা; A tasteful creation of the manifold poetic sentiment (রস) or the embodiment of taste, beauty, রস and রুচীরতা! নবরসরুচীরাং নির্মিতি আদধতি!

এই শ্লোকের প্রথম অংশটা থেকে জাপান

শিল্পের একটা আইন সৃষ্টি হয়েছে যাকে বলা হয় Esoragoto বা artistic unreality নিয়তিকৃতনিয়মরাহিত্য! জাপানের শিল্পী এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন this is Esoragoto, the privileged departure, the false made to seem true!

ইউরোপও এই কথাই বল্‌ছে চিত্রের বেলায়, nothing in a picture is real, art has been pursuing the chimera, attempting to reconcile two opposites, the most slavish fidelity to nature and the most absolute independence, so absolute that the work of art may claim to be a creation অনন্য পরতন্ত্রাম্ নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা নির্মিতি।

আধুনিক ফ্রান্সে, এমন-কি জগতের সব-চেয়ে বড় ভাস্কর রোঁদা, তিনিও বলেন—.....its laws are more powerful than those of the compass, art is again taste. ও-সব কথা নতুন নয়, পুরোনোও হবে না কোনো দিন। দরদী যে, সে তখনও যা বলে নমস্কার দিয়েছে artকে আজও দরদী সেই ব'লে নমস্কার দিচ্ছে, পরেও দেবে artএর জয় ঐ একই শ্লোক ব'লে—

নিয়তিকৃত নিয়মরহিতাম্
হ্লাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাম্
নবরসরুচীরাং নির্মিতি আদধতি
ভারতী কবের্জয়তি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দৃষ্টি

অস্থির চঞ্চল,
একটুতে চোখে জল,
মাধুরীর শতদল
বুক-জুড়ানো!
চুম্বন-উৎসুক
ঠোঁট লাল টুক্‌-টুক্‌,
দুষ্টু মি-মাখা-মুখ
হাসি-ছড়ানো!

কান্ত ও কমনীয়,
চিরদিন স্মরণীয়,
সে অনির্ব্বচনীয়,
স্বপ্নময়ী!

আগুনের ফিন্‌কুটি
ছিট্‌কায় চোখদুটি,
ছোট্ট সে বাহুমুঠি
বিশ্ব-জয়ী!

স্নিগ্ধ কী শীতলতা—
বেষ্টিত তনু-লতা,
লাবণ্য কোমলতা
ঝরে অঙ্গে!
অদ্‌ভুত প'ড়ে গায়
মজ্‌বুত ঝগড়ায়,
বিদ্যুৎ চমকায়
ভুরু-ভঙ্গে!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

রেগে রাঙা গন্ গন্,
ঘর-দোর ঝন্ ঝন্,
চুড়ি বাজে খন্ খন্,
কাঁপিয়ে ভিটে!
পলকেই রাগ ছোটে,
সে মানুষ নয় মোটে,
একগাল্ হাসি ফোটে
এক মিনিটে!

এই ভাব এই আড়ি,
চুমু নিয়ে কাড়াকাড়ি,
তাড়াতাড়ি বাড়াবাড়ি,
সব জিনিষে!
রাতদিন অবিরল
কৌতুক-লীলাছল,
অভিমানে রসাতল
প্রতি নিমিষে!

বেমালুম্ বুক ঠুকে
মিছে কথা কয় রুখে,
জবাবটি মুখে মুখে
গাঁথা তৈরী!

অবুঝ্ সে নিষ্ঠুর,
নেই বোধ কিছুর,
ঘুমের সে দস্তুর-
মত বৈরী!

এ-রকম দস্যিকে
সাম্‌লাবো কোন্ দিকে?
লুটে নিলে মনটিকে
জোর্‌সে এসে!
তবু সেই মন্-চোরে
ভালবাসি অন্তরে,
জানিনে কি মন্তরে
ভোলালো যে সে!

নন্দন-বন থেকে
চুরি করে আন্‌লে কে?
পারিজাত ফুল একে—
রাখবো কোথা?
এ হাওয়ায় বাঁচবে কি?
আলো-জলে নাচবে কি?
বুকে রেখে চেয়ে দেখি—
লেগেছে ব্যথা!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

বারোয়ারি উপন্যাস

২৩

বৈরাগ্য-জিনিষটা কল্পনায় যতখানি সুন্দর ব'লে মনে হয়, আসলে তার সৌন্দর্য্য যে ঠিক ততখানি ভোগ করা যায় না, দিনকতক বৃন্দাবনে থেকে সতীশ তা বিলক্ষণ-রূপেই টের পেয়ে গেল।

সমুদ্রের ঝড়ের দোলায় নৌকা যেমন স্থির থাক্‌তে পারে না, বিক্ষুব্ধ মনের ভিতরেও তেম্‌নি শান্ত ভাবের ঠাঁই হওয়া অসম্ভব। সতীশও তাই বৃন্দাবনে এসে বেশী-দিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না—সংসার আর অতীতের স্মৃতি তাকে যেন চারি-

দিক থেকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে টান্ দিতে লাগ্‌ল।

সতীশ মনে মনে ভাব্‌লে, গুরুদেব বলেন জগৎ মায়াময়—মিথ্যা! আমার কিন্তু গুরু-বাক্যে বড়ই সন্দেহ হচ্চে, কারণ যে সত্যকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে নিশিদিন সত্য ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌চি, এত সহজে কি-ক'রে তাকে মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেব!

গুরুদেবের হুকুম মেনে সে যে পাগলের মতন হিমালয়ে ছুটে গিয়ে সত্যসত্যিই ক্ষেপে যায়-নি, এই ভেবে সতীশ এখন মনে মনে অনেকটা আরাম বোধ কর্‌লে।

সতীশ ভাব্‌তে লাগ্‌ল, এবারে সে কি কর্‌বে? সে কি আবার লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে যাবে? কিন্তু আত্মানন্দ-বাবাজীর বৈরাগ্যের লেক্‌চার, মুক্তির টীকা-টিপ্পনী, আর লোটা-কম্বল-ত্রিশূলের আস্ফালন স্মরণ হবা-মাত্রই লক্ষ্ণৌয়ের কথা তার মন থেকে একেবারে নিঃশেষে মুছে গেল।

তারপরে মনে হোলো, বেলতলীর কথা। সেখানে তার মা আছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে তাঁর ফিরে-ফির্‌তি বিয়ে-করার প্রস্তাবটাও। সুতরাং সে ঠাঁইও যথেষ্ট নিরাপদ নয়।

আচ্ছা, কালীগাঁয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু তখনি তার মনে হোলো, কমলার অন্তর্ধানের কথা! ব্যাপারটা যে-ভাবে তার কাণে উঠেছিল, সতীশ তা বিশ্বাস কর্‌ছিলও বটে—কর্‌ছিল না-ও বটে! তাই আসল কথাটা জান্‌বার জন্যে মন তার ব্যথা-ভরা আগ্রহে উস্‌খুস্ ক'রে উঠ্‌ছিল। কিন্তু কমলা-শূন্য কালী-গাঁ এখন যে কেবল সফল দুঃস্বপ্নের মতন, তা নয়;—সেইসঙ্গে গ্রাম্য ঘোঁটে, চাপা হাসি-ব্যঙ্গ-টিট্‌কিরিতে তা যে কতখানি বিষিয়ে উঠেচে, সেটুকু এক-বার মাত্র কল্পনা ক'রেই সতীশের মনটা যার-পর-নাই নেতিয়ে পড়্‌ল।

সতীশ ভাব্‌লে, এ কি মুস্কিলেই ঠেকা গেল! সন্ন্যাসী হ'তে বা ঘরে ফির্‌তে বা নিষ্কর্ম্মার মত এখানে ব'সে থাক্‌তে—আমি এ তিনটের কোনটাই পার্‌চি না! তবে আমি কর্‌ব কি?

ভেবে-ভেবে সতীশ আর ভাব্‌তে পার্‌লে না—মাথাটা তার ঘুলিয়ে এল! শেষটা সে আপন মনে ব'লে উঠ্‌ল—"দূর হোক্-গে ছাই,—চুলোয় যাক্ এ-সব ভাব্‌না-চিন্তা! পরের কথা পরে ভাবা যাবে-অখন, আপাতত যখন স্থির করেচি যে সন্ন্যাস নিয়ে আর পাগ্‌লামি করা হবে না, তখন যে ক'টা দিন ছুটি আছে, পশ্চিমের দেশগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখে-নি!"

সতীশ ঠিক কর্‌লে, কাল সকালের গাড়ীতেই সে আগ্রায় তাজমহল দেখ্‌তে যাবে।

… … … …

কবি সাজাহানের অমর মর্ম্মর-কাব্য নানান লোকে নানান ভাবে দেখেছে। কিন্তু তাজ-মহল দেখে সতীশের মনে হোলো, এ যেন তারই প্রিয়তমার মূর্ত্তি!

প্রিয়তমা! 'কে সে?… …কমলা?—না, সে এ-কমলা নয়—যে-কমলা তার স্নেহ-প্রেম, যত্ন-আদর ভুলে, লোক-সমাজে তাকে হাস্যাস্পদ ক'রে, তার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ডুবিয়ে এ-জন্মের মত তাকে ছেড়ে

চ'লে গেছে, তার কথা সে আর ভাব্‌তে পারে না—ভাব্‌তে চায়ও না! কিন্তু স্বদেশে-বিদেশে যে প্রেমময়ী নারী-মূর্ত্তিকে নিয়ে সতীশের বহু বিনিদ্র-রজনী পরীর স্বপ্নের মতন অজান্‌তে কেটে গেছে, যার চোখের মাধুরী, ঠোঁটের হাসি, তনুর লীলা, হাতের স্পর্শ—সবার উপরে যার বুক-ভরা অগাধ ভালোবাসার স্মৃতি ফুলের মতন তার জীবন-বৃন্তকে পুষ্পিত ক'রে রয়েছে—সতীশ এত সহজে এখনো তাকে ভুল্‌তে পারে-নি—এই পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তাই তো তার বৈরাগ্যের শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টাটা একেবারে মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল! সতীশের মনে হোতো, যেন কাল্‌কের কমলা আর আজ্‌কের কমলা—এ দুজনে এক লোক নয়। যদিও এ-রকম মনে-হওয়াটাও ছেলেমানুষী এবং এর কোন-একটা সঙ্গত কারণও নেই, তবু এম্‌নি-একটা ভাবই তার মনের আশ-পাশ দিয়ে যখন-তখন উকিঝুঁকি মার্‌ত। যুক্তি-তর্ক এখানে খাট্‌ত না—তার মন জোর ক'রে ব'লে উঠ্‌ত—সে-কমলা এ-কমলা এক লোক নয়, দুজনে স্বর্গ-নরক তফাৎ! সে ছিল আমার,—একান্তই আমার, আর এ হচ্ছে··· ··· ···

—এইখানে ভাব্‌নার সূত্র ছিঁড়ে যেত। আজ্‌কের এই কমলাকে তার মন নিজের ব'লে দাবি কর্‌তেও পার্‌ত না, পরের ব'লে মান্‌তেও রাজি হোতো না—এইখানে মস্ত-বড় একটা অন্ধকার—অজানা অন্ধকার ছিল, সে অন্ধকার যেন লুকানো অশ্রুজলে জমাট্‌!

একদিন, দুদিন, তিনদিন—আরো ক'টা দিন একে একে কেটে গেল, সতীশ কিন্তু তাজমহলকে ছেড়ে চ'লে যেতে পার্‌লে না। কি এক অজানা মোহের টানে রোজ সে তাজমহলের দিকে ছুটে আস্‌ত, মর্ম্মরের শুভ্র স্বপ্নের সেই স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শের মধ্যে আপনার ব্যথিত দেহকে এলিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে সে প'ড়ে থাক্‌ত, আর তার সাম্‌নে দিয়ে যমুনার কালো জল কলবেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কূল কূল ক'রে বয়ে যেত,—কূলে কূলে মাথা কুটে, রবি-শশীর নয়ন-কিরণে আকুল হয়ে।

সাজাহানের প্রেমের স্মৃতি তাজমহল আজ তারও বুকের ভাঙা-ঘরে প্রেমের দীপশিখাটি আবার যেন উস্কে দিলে,—এ মর্ম্মর যেন জীবন্ত, এ পাষাণের মৌন ভাষা যেন কাণ পেতে শোনা যায়, এর এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা যেন বুকের আঁধারকে আলো ক'রে নেয়!

সতীশ স্থির কর্‌লে, কি হবে ছন্নছাড়ার মতন দেশে দেশে ঘুরে ম'রে,—ছুটির ক'টাদিন এইখানে বসে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাক্‌, দেখি, এতে তবু মনটা কিছু শান্ত হয় কিনা!

··· ··· ··· ···

পূর্ণিমার চাঁদের আল্‌পনা সেদিন তাজের মর্ম্মর-শিলায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চাতালের উপরে গায়ের জামাটা খুলে বালিসে পরিণত ক'রে, সতীশও শুয়ে শুয়ে দেখ্‌ছিল—জোছ্‌না আর তাজ যেন আজ মিলে-মিশে ধীরে ধীরে একাকার হয়ে যাচ্ছে—একটু পরেই যেন কে জোছ্‌না, কে তাজ তা আর মোটেই চেনা যাবে না!

হঠাৎ কাছেই কার বাঁশী বেজে উঠ্‌ল —নিশীথিনীর নীরবতায় সুরের লহরী তুলে। এক তানেই বোঝা গেল, এ যার-তার বাঁশী নয়, ওস্তাদের বাঁশী।

বাঁশী বাজ্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু কি উদাস তার সুর! এ যেন মুখের ফুঁয়ে বাজ্‌চে না—বুকের দীর্ঘশ্বাসে বাজ্‌চে! বাঁশী যেন কবে কাকে হারিয়েচে, আকাশে-বাতাসে, যমুনার জলোচ্ছ্বাসে, চাঁদের আলোয়, তাজের ছায়ায় সে যেন কাকে দিশেহারা হয়ে ডেকে-ডেকে কেঁদে ফির্‌চে—সে কান্না শুনে সাজাহানের আত্মার যেন কত-যুগের নিশ্চিন্ত সমাধি-শয়ন থেকে জেগে, এখনি উঠে বসে ব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখ্‌বে, এতকালের পর পাশ থেকে রূপের পুতলি মম্‌তাজ আবার তাকে ফাঁকি দিয়ে হারিয়ে গেছে কিনা!

বাঁশীর কান্না থেমে গেল। তার হতাশ সুরে সতীশের চোখের পাতাও ভিজে এসে-ছিল। একটা নিশ্বাস ফেল্লে আস্তে আস্তে সে উঠে বস্‌ল—তার আগ্রহ হোলো বাঁশীর এই ওস্তাদটিকে একবার দেখবার জন্যে।

দেখ্‌লে, কাছেই, যমুনার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটি লোক চুপ ক'রে বসে আছে। পোষাক দেখে বোঝা গেল, বাঙালী।

সতীশ স'রে তার কাছে গিয়ে বস্‌লে, "দয়া ক'রে আর একবার বাজাবেন কি?"

লোকটি সতীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখ্‌লে। তারপর একটু হেসে, কোন কথা না ক'য়ে বাঁশীতে আবার ফুঁ দিলে।

সেবারেও বাঁশীতে নিরাশার আর এক রাগিণী বেজে উঠল। এ বাঁশী যেন কান্না বৈ আর কিছু জানে না!

কেঁদে কেঁদে বাঁশী আবার থাম্‌ল। সতীশ আর সেই লোকটি, দুজনেই আনমনে নীরবে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে রইল।

তারপর সতীশ ধীরে ধীরে বল্‌লে, "আপনার বাঁশীর ভেতরে আরো কত কান্না পোরা আছে?"

লোকটি তেম্‌নি মৃদু-মৃদু হেসে বল্‌লে, "আপনার মন রাখ্‌বার জন্যে আমার বাঁশী হাস্‌তেও পারে! শুন্‌বেন?" সে ফের বাঁশীটিকে মুখের কাছে তুল্‌লে।

সতীশ বাধা দিয়ে বল্‌লে, "না, তাজের কোলে হাসি তো জম্‌বে না! এ তাজ যে বিরহীর চোখের অশ্রু দিয়ে গড়া!"

লোকটি বল্‌লে, "তাইতো আমারও বাঁশীর মুখে হাসি আসে নি। এই দুঃখের দুনিয়ার সঙ্গে কান্নার সুর ছাড়া আর-কিছু তো খাপও খায় না!"

তার কথাবার্ত্তা শুনে, লোকটিকে সতীশের বড় ভালো লাগল। সে বল্‌লে, "যদি কিছু মনে না করেন, তবে আপনার পরিচয়টি জান্‌তে পারি কি?"

—"ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। কপিলডাঙায় থাকি। মশায়ের পরিচয়?"

—"সতীশচন্দ্র বাগচী। নিবাস চব্বিশ পরগণা, বেলতলীতে।"

ক্ষিতীশের হাত থেকে বাঁশীটি খসে, সশব্দে পড়ে গেল। অত্যন্ত বিস্ময়ে সে সতীশের মুখের দিকে অবাক্‌ হয়ে তাকিয়ে রইল।

—"আ-হা-হা, দেখুন, বাঁশীটা ভেঙে গেল না তো?" এই ব'লে সতীশ বাঁশীটা তুলে নিয়ে ক্ষিতীশের অসাড় হাতে ফের গুঁজে দিলে।

ক্ষিতীশ ততক্ষণে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "বেলতলীতে সতীশচন্দ্র বাগচী ব'লে আর কেউ থাকেন নাকি?"

—"না। তবে আমি যেখানে চাকরী করি, সেই লক্ষ্ণৌয়ে আমার নামে আর একজন আছেন।"

ক্ষিতীশের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সে বল্‌লে, "কালীগাঁয়ে কি আপনার শ্বশুরবাড়ী?"

ভুরু কুঁচ্‌কে সন্দিগ্ধ স্বরে সতীশ বল্‌লে, "হ্যাঁ। কিন্তু এ-কথা আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?"

ক্ষিতীশ অত্যন্ত খুসি হ'য়ে বলে উঠ্‌ল, "সতীশবাবু, আপনার কথার জবাব পরে দেব। আপাতত ভগবানের দয়ায় এমন আশ্চর্য্য ভাবে যখন আপনার দেখা পেয়েছি, তখন আর আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না। খুব কাছেই আমার বাসা। আপনাকে এখনি সেখানে যেতে হবে।"

ক্ষিতীশের দিকে হতভম্বের মতন খানিক-ক্ষণ চেয়ে থেকে সতীশ বল্‌লে, "আমাকে যেতে হবে আপনার বাসায়? কেন মশাই?"

—"আপনার 'কেন'র জবাব আমার বাসায় গেলেই পাবেন।"

—"আপনি কে?"

—"মণিহারা ফণি।"

—"আপনার কথার অর্থ?"

—"ক্রমশ-প্রকাশ্য। এখন উঠুন—উঠুন, আর দেরি কর্‌বেন না!"

—এই ব'লে ক্ষিতীশ অবাক সতীশকে দু'হাত ধ'রে একরকম জোর ক'রেই টেনে-হিঁচ্‌ড়ে তুলে নিয়ে গেল। তার অত সাধের দামী বাঁশীটা যে তাজের আলো-মাখা সাদা চাতালে কালো একটা রেখার টানের মতন পড়ে রইল, আনন্দের আবেগে সেদিকে তার একটুও খেয়াল রইল না।

২৪

গেল-দুদিন হরনাথ মৈত্রকে ভিন্-গাঁয়ের এক যজমানের বাড়ীতে, কি-একটা শান্তীয় অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাক্‌তে হয়েছিল। যজমান-বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম সেরে, আজ দুপুরে তিনি আবার নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। তাঁর পিছনে পিছনে আস্‌ছিল দুটো লোক। তাদের মাথায় বড় বড় দুটো বস্তা এবং একটা বস্তার ফাঁক দিয়ে একটি নতুন চক্‌চকে পিতলের ঘড়া উঁকি মারচে। দেখ্‌লেই বুঝে নিতে দেরি হয় না যে, যজমানের বাড়ী থেকে এবারে ঠাকুরের ভাগ্যে লাভ হয়েচে, তা যৎসামান্য নয়।

রোদ্দুরের ঝাঁজ থেকে রেহাই পাবার জন্যে হরনাথ মাথার উপরে ভিজে গামছাখানি পাট ক'রে রেখে, একটি সাদা কাপড়ে মোড়া ছাতার ছায়ায় ছায়ায় তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ফির্‌ছিলেন। তাঁর বাঁ-হাতে যজমানের দেওয়া খানকয়েক নতুন কাপড়।

এই ক'দিনেই হরনাথের চেহারা কেমন বুড়িয়ে পড়েচে,—দেহটিও রোগা, কোলকুঁজো হয়ে গেছে। তাঁর চোখদুটি বসা-বসা, তার তলায় গভীর কালির রেখা। তাঁর মুখ দেখ্‌লেই বোঝা যায়, বুকের ভিতরে তিনি অহরহ কি অসহ চিতার দাহ সহ্য কর্‌চেন!

যজমানী কর্‌তে তাঁর মনে আর একটুও ইচ্ছা নেই—কাজকর্ম্ম এখন যা করেন তা কতকটা শিষ্যদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দায়ে ঠেকেও বটে, আর কতকটা আপনার ব্যথিত প্রাণকে অন্যমনস্ক রাখ্‌বার জন্যেও বটে!

চারিদিকে কাঠকাটা রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌চে—পায়ের তলায় পথের ধুলোগুলো পুড়ে পুড়ে যেন আগুনের কণা হয়ে উঠেচে। হরনাথ কোনদিকেই না-তাকিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ছিলেন—হঠাৎ ডানদিক থেকে শব্দ উঠ্‌ল—'কিস্তি মাৎ!' হরনাথ থম্‌কে দাঁড়ালেন, শশী মুখুয্যের ঘরের দাওয়ায় তাস-দাবার দৈনিক আসরটা রীতিমত জমে উঠেচে। তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্যে ছাতাটাকে ডানধারে হেলিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা কর্‌লেন। কমলার অন্তর্ধানের পরে এই শশী মুখুয্যেকে তিনি ভালো ক'রেই চিনে নিয়ে ছিলেন। তাই তার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গভরা মুখে বিনয়প্রকাশের মহা-আড়ম্বর দেখ্‌লেই, হরনাথের বুকের ভিতরে কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে লাগ্‌ত।

কিন্তু 'কাণা শশী'র একটিমাত্র যে চোখ, তা সাপের মতন তীক্ষ্ণ। সে চিলের মতন চর্চ্চি-করা গলা তুলে সাড়া দিলে—"হরনাথ-দা', বলি ও হরনাথ-দা'! অধীনদের দিকে একটিবার নেক্-নজরে চেয়ে যান, এমন ক'রে পায়ে ঠেলে গেলে তো চল্‌বে না!"

হরনাথ বেগতিক বুঝে দাঁড়িয়ে পড়্‌লেন। ছাতার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রে প্রভিত স্বরে বল্‌লেন, "না ভাই, রোদ্দুরের তাজে অনেকখানি পথ হেঁটে তেষ্টায় প্রাণটা টা কর্‌চে—এখন কি আর কোনদিকে ইবার যো আছে? তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে ল্‌লেই বাঁচি!"

কাণা শশী বকের মতন এক-পা এক-পা রে এগিয়ে এসে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্‌লে, "সে কি দাদা, তেষ্টা পেয়েচে? আসুন—আসুন, আমার বাড়ীতে আসুন!"

হরনাথ বল্‌লেন, "আর ভায়া, বাড়ীর কাছেই এসে তো পড়েচি, একেবারে সাংহিক ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে জল্-টল্ যা-হয় খাওয়া যাবে!" এই ব'লে তিনি আবার এগিয়ে পড়বার চেষ্টা কর্‌লেন।

শশী আঁকুপাকু ক'রে বল্‌লে, "দাদা, যাবেন না! জল না খান, একটা সুখবর অন্তত শুনে যান।',

হরনাথ নিরাশ ভাবে করুণ স্বরে বল্‌লেন, "সুখবরের কথা আর তুলো না ভায়া, এ-জীবনে সু আর কু, ও দুইই এখন আমার কাছে এক কথা।"

শশী 'হাঁ'য়ের অন্ধকারে অনেকগুলো হল্‌দে দাঁতের ঝিলিক্ মেরে একগাল হেসে বল্‌লে, "হরনাথ-দা', অতটা হাল ছেড়ে দিয়ে বস্‌বেন না! সত্যিই যদি সুখবর দি, আমাকে কি খাওয়াবেন বলুন দেখি?"

শশীর রকম-সকম দেখে হরনাথের মনে সাঁ-ক'রে একটা সন্দেহের বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল। শশী তো অকারণে কিছু করবার পাত্র নয়—অকস্মাৎ তার এতটা আত্মীয়তার কারণ কি? উদ্বিগ্নভাবে তিনি বল্‌লেন, "শশী, তুমি কি বল্‌চ? তোমরা কি কমলার কোন খবর পেয়েচ? এতদিন যা কান্না কর্‌ছিলুম, তাই কি হয়েচে? সত্যিই কি কম্‌লী মরেচে? বল, বল—এর চেয়ে সুখবর এখন আমার কাছে আর কিছুই নেই!"

শশী নকল দরদে মুখখানা যথাসম্ভব কাঁচু-মাচু ক'রে বল্‌লে, "ওকি কথা হরনাথ-দা'?

বাপ হয়ে মেয়ের মৃত্যু-কামনা কর্‌বেন না, ছি!"

হরনাথের সন্দেহ বেড়ে উঠ্‌ল। তিনি উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বল্‌লেন, "শশী, তুমি যা বল্‌তে চাও, শীগ্‌গির বলে ফেল!"

শশী তার হাসিকে আরেকটু মিষ্টি ক'রে বল্‌লে, "অরুণ যে কম্‌লীকে নিয়ে কল্‌কাতা থেকে ফিরে এসেচে!"

হরনাথের বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন দমাস্ ক'রে ফেটে যাবার মতন হ'ল, দু-হাতে বুকখানা জোরে চেপে ধ'রে বজ্রাহতের মতন স্তম্ভিত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন—তাঁর চোখের সাম্‌নে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সমুজ্জ্বল শিখাও যেন এক-মুহূর্ত্তে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আধ-মরা ইঁদুরের ভাবভঙ্গি বিড়াল যেমন নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে দেখে, হরনাথের দিকে শশী ঠিক তেম্‌নি ভাবেই বারবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল পর, বিষম রাগে আর অপমানে হরনাথের সমস্ত মুখখানা রাঙা টক্‌টকে হয়ে, রগের উপরকার শিরগুলো ঠেলে ঠেলে ফুলে উঠ্‌ল। ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আগুন-ভরা চোখে শশীর দিকে তাকিয়ে তিনি প্রাণপণে চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "ওরে মহাপাপী, এই কি তোর সুখবর? তোর মাথায় বজ্রাঘাত হোক্, বজ্রাঘাত হোক্!" বল্‌তে বল্‌তে একরকম ছুটেই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। খানিকদূর গিয়ে শুন্‌লেন, শশীর আড্ডা থেকে অনেকগুলো গলা একসঙ্গে হো-হা ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

বাস্তবিক, এতক্ষণ শশীর দলের লোকগু চরম আগ্রহের সঙ্গে যেন অত্যন্ত উত্তেজ একখানা নাটকের বিচিত্র অভিনয় দ কর্‌ছিল। হরনাথ চলে গেলে পর একচোট হেসে নিয়ে বোসজা বল্‌লেন, "টাকার গরমে মৈত্রের পা যেন এতদি মাটির ওপরে পড়্‌ত না! কিন্তু মাথার ওপ যে দর্পহারী মধুসূদন হাস্‌চেন, সে খোঁজ শর্ম্মা রাখ্‌তেন না! আচ্ছা শশী, মৈত্র এখ কি কর্‌বে বল দেখি? কম্‌লী ছুঁড়ী বাড়ীতে রাখ্‌বে, না ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক' দেবে?"

হরনাথের সেই অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখে আ অভিশাপ শুনে, শশীর পাপী মনটা দস্তর মতন চম্‌কে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল কোনরকমে এখন সে ভাবটা সাম্‌লে নিয়ে সে বল্‌লে, "বোধ হয় তাড়িয়েই দেবে কিন্তু বলাও যায় না, মৈত্র যেমন চট্ ক' রেগে ওঠে, তেম্‌নি শীগ্‌গির তার রাগ জ হয়েও যায়। আর হাজার হোক্ বাপে মন, মেয়ের মুখ দেখে ভুলে যেতেও কতক্ষণ —যা-হোক আপাতত তোমরা এখানে বোসো তো, এর-মধ্যে আমি জমিদার-বাবুকে খবরটা দিয়ে আসি!"

একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "গিয়ে কি বল্‌বে?"

—"বলব যে হরনাথ মৈত্র ফিরে এসেচে কম্‌লীর আসার খবর জমিদার-বাবুর কা আগেই উঠেচে। কেবল মৈত্র এখানে ছি না ব'লেই এ দুদিন তিনি রাগ সাম্‌লে চু ক'রে আছেন!"

সকলকার মুখেই ভারি-একটা আরাম

সন্তোষের লক্ষণ ফুটে উঠ্‌ল। গাঁয়ে দিন-কে-দিন হরনাথের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যে-লোকগুলি মনের ভিতরে বরাবর নিষ্ফল হিংসা আর আক্রোশ পুষে আস্‌ছিলেন, আজ তাঁদের অন্তর্দাহ নিবারণের মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত!

২৫

হরনাথ যখন প্রচণ্ড একটা উল্কার শিখার মতন বাড়ীর ভিতরে এসে হুড়মুড় ক'রে ঢুক্‌লেন, মৈত্র-গিন্নি তখন অরুণ আর কমলার সাম্‌নে ভাতের থালাখানি পাঁচরকম অন্নব্যঞ্জনে সাজিয়ে এনে ধর্‌ছিলেন।

হরনাথকে প্রথমেই দেখ্‌তে পেলে—কমলা সে তখনি পিঁড়ি থেকে উঠে পড়ে, "বাবা গো" ব'লে কেঁদে ছুটে এসে, দু-হাতে হরনাথের পা-দুখানা একসঙ্গে প্রাণপণে জড়িয়ে ধর্‌লে।

মৈত্রগিন্নীও দুঃখের আনন্দে কেঁদে ফেলে, বল্‌লেন, "ওগো তোমার কম্‌লীকে ঠাকুর আবার ফিরিয়ে দিয়েচেন গো!"

হরনাথ একবার কমলা, আর একবার গৃহিণীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তাঁর সে দৃষ্টি পাগলের মতন উদভ্রান্ত। তারপর অরুণের দিকে চেয়ে তিনি গর্জ্জন ক'রে ডাক্‌লেন—"অরুণ!"

তাঁর সেই কড়া ডাকে ভয় পেয়ে অরুণ খুব আস্তে সাড়া দিলে, "বাবা!"

মৈত্রগিন্নী স্বামীর ভাব দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণে দেব-দেবীকে স্মরণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। হরনাথ মৈত্রের রাগ এ গ্রামে ঘরে ঘরে বিখ্যাত। রাগের মাথায় তিনি অনেক সময়ে এমন-সব কাজ ক'রে ফেলেচেন, যে-জন্যে পরে তাঁকে অনুতাপ কর্‌তে হয়েচে।

হরনাথ কর্কশ স্বরে বল্‌লেন, "অরুণ, কম্‌লীকে তুই কোথায় পেলি?"

অরুণ মৃদুস্বরে বল্‌লে, "ক্ষিতীশবাবুর বাসায়।"

হরনাথ চোখ পাকিয়ে বল্‌লেন, "ক্ষিতীশ! কে ক্ষিতীশ?"

বাপের সঙ্গে কথা কইতে অরুণের ভরসায় আর কুলোলো না। অভ্যস্ত দীনভাবে করুণ চোখে সে মায়ের দিকে তাকালো।

মৈত্র-গিন্নী স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "ওগো, সে অনেক কথা। কম্‌লী আর অরুণের মুখে সমস্তই আমি শুনেচি। শোনো—"

হরনাথ ধম্‌কে বল্‌লেন, "গিন্নী, তুমি থামো! ওদের যে-কথা তুমি বিশ্বাস করেচ, গাঁয়ের আর-পাঁচজনেও তোমার মতন অত সহজে তা বিশ্বাস কর্‌বে না!"

—"বিশ্বাস কর্‌বে না! কেন?"

—"কেন, তাও আবার খুলে বল্‌তে হবে? কারণ, তোমার মেয়েকে তারা কুলটা বলে!"

এতক্ষণ কমলা ভূলুণ্ঠিত দেবী-প্রতিমার মতন হরনাথের পায়ের তলায় পড়ে চোখের জলে ধরিত্রীর ধূলাকে সিক্ত ক'রে তুল্‌ছিল। এখন সে আহত বিষধরের মতন আচম্বিতে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "বাবা, বাবা! তুমিও কি আমাকে তাই ব'লে বিশ্বাস কর?"

হরনাথ গম্ভীর স্বরে কেবলমাত্র বল্‌লেন, "হুঁ।"

কমলার দুইচোখে যেন বিদ্যুতের হল্‌কা

ঝল্‌কে উঠ্‌ল। সগর্ব্বে মাথা তুলে তীব্র স্বরে সে বল্‌লে, "তুমিও? তুমি,—আমার বাবা,—তুমিও বিশ্বাস কর?"

হরনাথ কমলার সেই অভাবিত, তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হলেন বটে, কিন্তু সে বিস্ময় তাঁকে একটুও টলাতে পার্‌লে না। সেদিনের সেই নিদারুণ কথা আজও তাঁর বুকের পরতে পরতে গাঁথা আছে—যেদিন কল্‌কাতায় হরেনের মেসে গিয়ে ক্ষুদিরামের মুখে তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন যে, হরেনের সঙ্গে কমলা একলাটি বোম্বাই মেলে বিদেশে চ'লে গিয়েচে। তারপর,—এই ক্ষিতীশ! কোথাকার কে সে? তাঁর বাসায় কমলা কেন ছিল? এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হ'তে পারে? তিনি চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ, আমিও বিশ্বাস করি, যা নিজে গিয়ে জেনে এসেচি, তা বিশ্বাস না-করাই আশ্চর্য্য! এতদিন পরে কেন তুই আবার এখানে ফিরে এলি, কেন তুই মর্‌তে পার্‌লি না, কেন তুই—"

দুইহাতে দুইকাণ ঢেকে, চক্ষু মুদে, গভীর বেদনায় অবরুদ্ধ স্বরে কমলা ব'লে উঠ্‌ল—"আর শুন্‌তে পারিনি গো—বাবা, থামো, থামো,—যথেষ্ট হয়েচে!... ...ভগবান, তোমার জগতে নারী এত অসহায়! উঃ!" কমলা ট'লে পড়ে যাচ্ছিল—মৈত্র-গিন্নী তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে ফেল্‌লেন।

হরনাথ কমলার সে অবস্থা দেখেও দেখ্‌লেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, অবিচল স্বরে তিনি বল্‌লেন, "আমার ঘরে কলঙ্কিনীর ঠাঁই নেই! এখানে আর এক-দণ্ড না! চ'লে যা—চ'লে যা—এখনি চ'লে যা—নইলে—"

মৈত্র-গিন্নী কান্নাভরা গলায় ব'লে উঠ্‌লেন, "ওগো, তুমি কি পাষাণ গো! অমন কথা মুখেও এনো না!"

হরনাথ তেম্‌নি অটল ভাবেই তিক্ত স্বরে বল্‌লেন, "গিন্নী, যে দোষে যোগেন মিত্তির তাঁর ছেলের মায়াও ছেড়েচেন, সেই একই দোষে দোষী এই পাপিষ্ঠাকে কোন্ মুখে আমি ঘরে তুলে নেব?"

—"হ্যাঁ গা, যোগেন মিত্তির ছেড়েচেন ব'লে সমাজও তো হরেনকে ঠেলে রাখ্‌তে পার্‌বে না। সে ব্যাটাছেলে আর কমলা যে মেয়ে! এ বিপদে তুমি না দেখ্‌লে তাকে যে আর কেউ দেখ্‌বে না!"

হরনাথ অত্যন্ত শুক্‌নো একটা হাসি হেসে বল্‌লেন, "একজন দেখ্‌বে—তার নাম যম। আমার রক্তের একবিন্দুও যদি কমলীর দেহে থাকে, তবে ও যেন এখনি গিয়ে তারই আশ্রয় নেয়!" বল্‌তে বল্‌তে হরনাথের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তের সেই একান্ত অস্বাভাবিক হাসিকে ভিজিয়ে দিলে।

কমলা হঠাৎ মায়ের আলিঙ্গন থেকে আপনাকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিয়ে বাপের মুখের দিকে শান্ত চোখ তুলে স্থির ভাবে বল্‌লে, "বেশ বাবা, তাই হবে। তোমরা সকলে মিলে যা-থেকে আমাকে বিনা-দোষে বঞ্চিত কর্‌লে, দেখি যমের কাছে গিয়ে সত্যিই সে আশ্রয় পাই কিনা!" তার পর ফিরে পূর্ণ-দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, গাঢ় স্বরে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "মা, তোমার জামাইয়ের খোঁজ যদি পাও, তবে তাঁকে আমার এই শেষ-নিবেদন জানিও যে, কলঙ্কিনী নাম নিয়ে মর্‌লেও আমার স্বামী-ভক্তি কোনদিন সাবিত্রীর চেয়ে একটুও কম ছিল না!" বল্‌তে বল্‌তে তার গলার আওয়াজ ধরা-ধরা হয়ে উঠ্‌ল, চোখের পাতা আবার কান্নার জলে ভেরে এল—কিন্তু প্রাণপণে প্রাণের সমস্ত উচ্ছ্বাস দমন ক'রে, মায়ের সমস্ত বাধা এড়িয়ে সে দ্রুতপদে সদর-দরজার দিকে এগিয়ে গেল—তার পরেই, আবার কি-যেন দেখে চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে হরেন এসে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে, কমলার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "বোন, এমন যে হবে, আমি তা আগেই জান্‌তুম। তাই তোমাকে বিদায় দিয়ে কল্‌কাতায় আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি নি। তোমার খোঁজে আমি বেলতলী গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সব শুনে একেবারে এখানে ছুটে এসেচি।"

হরনাথ প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন না। হরেন যে ভরসা ক'রে তাঁর বাড়ীতে মাথা গলাতে পারে এটা তাঁর কল্পনাতীত ছিল। দুপুর রোদে তেতে-পুড়ে, পথ হেঁটে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁর ভগ্ন দেহ একে তো অবশ হয়ে ছিল, তার উপরে এই-সব বিষম উত্তেজনা ও নানা ভাবাবেগের ঘাত-প্রতিঘাত! এখন এই শেষ-ধাক্কায় একেবারে ভেঙে প'ড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বল্‌লেন, "না, আর পারি না! মধুসূদন, এ অগ্নি-পরীক্ষা থেকে আমাকে রেহাই দাও প্রভু!" এই ব'লে তিনি ক'রে মাটির উপরে ব'সে পড়ে, দুইহাঁটুর মাঝখানে নিজের মুখ ঢেকে ফেল্‌লেন।

ঠিক সেইসময় বাড়ীর বাহির থেকে গম্ভীর গলায় কে ডাক্‌লে, "মৈত্র-মশাই বাড়ীতে আছেন কি?"

হরনাথ পাথরের নিশ্চল মূর্ত্তির মতন ব'সে রইলেন—সাড়া-শব্দ কিছুই দিলেন না।

হরেন কমলার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আমার বাবা ডাক্‌চেন!" (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সোনার গৌরাঙ্গ

নদীয়ায় আজ বড় ঘটিল জঞ্জাল,
সোনার গৌরাঙ্গে বুঝি ছুঁয়েছে চণ্ডাল!
কেহ বলে, ঢালো শিরে সুরধুনী-নীর,
পঙ্কজাব্যে নিমজ্জন কেহ করে স্থির।
চাহিয়া গৌরাঙ্গ-পানে জুড়ি দুটি কর
চণ্ডাল কহিল ধীরে,—গদ-গদ-স্বর—
হে ঠাকুর, কত লোহা করিলে কাঞ্চন,
কাঞ্চন হইয়া তব এ কি এ লাঞ্ছন?
চণ্ডালেরে কোল দিলে তুমি জগন্নাথ,
আজি তার আলিঙ্গনে হারাইবে জাত?
কৃপাতে করিলে কত পাতকী-উদ্ধার,
পাতকী-পরশে আজি পতন তোমার!
গৌরাঙ্গে আলিঙ্গি হৃদি করেছি সরস,
আমি ত কনক কই, করিনি পরশ!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ক্রমিক সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চয়ন

ছায়ার কায়ালাভ

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক কন্যান ডইল সাহেব আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রেত-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। তিনি এবং আরো জন-কতক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ একটি বিজ্ঞানে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা অত্যন্ত সতর্কভাবে আলোচনা করিতেছেন, এবং বহুকাল ধরিয়া পরলোকের রহস্য লইয়া যে-সব কুসংস্কার ও মিথ্যা প্রমাণ জড়ো হইয়া উঠিতেছে, সে-সমস্তকে তাঁহারা যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া চলিতেছেন।

ছায়ার কায়ালাভ—ectoplasmএর সাহায্যে।

তাঁহাদের মতে, মৃত্যুই অনন্ত নিদ্রা নয়—ইহলোকের পরে পরলোকের অস্তিত্ব আছে। প্রেতেরা মানুষের সাম্‌নে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে—ছায়া-মূর্ত্তি নয়, কায়া-রূপেই!

প্রেতেদের ছায়া-দেহ কিরূপে কায়ায় পরিণত হয়, সে-সম্বন্ধে এক নূতন রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। এ রহস্যের কথা এর-আগেও অস্পষ্টভাবে আরো কেউ কেউ বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সে-সমস্ত কাহিনীকে গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

এখন অতীতের ও বর্ত্তমানের বিচ্ছিন্ন প্রমাণগুলি একত্র করিয়া ডাক্তার ক্রেঙ্ক-নটজিং, ডাঃ গিলে, প্রফেসর ক্রুক্‌স্, ডাক্তার ক্রফোর্ড ও কন্যান ডইল প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরা স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন, ঐ কাহিনীগুলি বাস্তবিকই মিথ্যা নয়। কোথাও কোথাও অতিরঞ্জিত হইলেও সত্যের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

প্রেততত্ত্বে যাঁহারা একেবারেই বিশ্বাস করেন না, এমন অনেক নামজাদা বৈজ্ঞানিক লোকের সাম্‌নে, মিডিয়ামের সাহায্যেও এই ব্যাপারটার সত্যতা (ছায়ার কায়ালাভ) নানাভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে—অবিশ্বাসীরা চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়াও তাহার ভিতরে জাল-জুয়াচুরির লেশমাত্রও দেখিতে পান নাই।

বিজ্ঞান-জগতে প্রফেসর ক্রুক্‌সের ডাক-নাম বড় অল্প নয়। ক্রুক্‌স্ প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে-সব ঘটনার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও ক্রুক্‌সের কথা যে মিথ্যা, এ-কথা তাঁহারা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছেন না। কারণ ক্রুক্‌সের সুদীর্ঘ কর্ম্মবিচিত্র জীবনে অদ্যাবধি কেহ মিথ্যার কলঙ্ক আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সকলেই স্বীকার করেন, তিনি আর যাহাই হউন, মিথ্যাবাদী কখনোই নন।

মিসেস্ কর্ণার নামে এক মিডিয়ামের সাহায্যে প্রফেসর ক্রুক্‌স্, কেটি কিং নামে এক যুবতী প্রেতের সাক্ষাৎলাভ করেন। কেটি কিং সুদূর অতীতে,—দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল!

ক্রুক্‌স্ ও কেটকিংয়ের প্রেতাত্মা

কেটি কিং কেবল যে রক্তমাংসের মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা নয়; পরন্তু সে ক্রুক্‌সের শিশু-সন্তানদের সঙ্গে খেলা করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেকালের অনেক গল্প বলিয়াছিল—এমন-কি ক্রুক্‌সের সঙ্গে ফটো তুলাইতেও আপত্তি প্রকাশ করে নাই। বিদায় লইবার সময়ে সে বলিয়া গিয়াছিল, "মৃত্যুর পরেও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, পৃথিবীতে এই মহা সত্য প্রকাশ করিবার জন্যই, মানুষের সাম্‌নে আমি দেহ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছি।

এখন, প্রেতেদের ছায়া-দেহ কি-করিয়া কায়ায় পরিণত হয়? কন্যান ডইল নানা কালের নানা প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া-

ছেন যে, মিডিয়াম যখন অভিভূত অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহার নাক, চোখ, কাণ, মুখ ও দেহের ত্বকের ভিতর হইতে একরকম অদ্ভুত চট্‌চটে, স্থিতিস্থাপক পদার্থ বাহির হইয়া আসিতে থাকে! হস্ত দিয়া স্পর্শ করিলে বা আচম্‌কা তীব্র আলোক পড়িলে সেই বিচিত্র পদার্থটা চকিতে আবার মিডিয়ামের দেহের ভিতরে ঢুকিয়া যায়! যদি তাহা সজোরে টিপিয়া ধরা হয়, তবে মিডিয়াম অত্যন্ত যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে! এই পদার্থই ক্রমে ক্রমে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করিতে থাকে এবং এই ভাবেই প্রেতের ছায়া-দেহ কায়ায় পরিণত হয়।

এই পদার্থটি যে কি, বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করিয়াও তাহা ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই। ইহা মিডিয়ামের দেহ ও কাপড় ফুঁড়িয়া বাহির হয় বটে, কিন্তু আবার মিলাইয়া গেলে পর দেহে বা কাপড়ে ইহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না! ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে, ectoplasm!

ডাঃ শ্রেঙ্ক নটজিং মিডিয়ামের দেহ হইতে নির্গত ঐ অদ্ভুত পদার্থের একটুকরা কাটিয়া লইয়াছিলেন। তাহাকে তিনি পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুড়াইবার সময়ে অনেকটা শিং-পোড়া গন্ধের মতন একটা গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয়, তাহার ভিতরে অন্যান্য উপাদানের সহিত chloride of soda (সাধারণ লুন) এবং phosphate of calicum এর অস্তিত্বও বিদ্যমান আছে!

প্রেতাত্মার মুখে সংলগ্ন ectoplasm

জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে শত শত লোকের চোখের এবং ক্যামেরার সুমুখে বারংবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকরা স্বচক্ষে এই অদ্ভুত পদার্থ দেখিয়া এবং ছুঁইয়াও ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। কারণ পৃথিবীতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়াও যখন মানুষের দেহে এমন-কোন উপাদান পাওয়া যায় না,—তখন ইহাকে সত্য বলিয়া কিরূপে তাঁহারা মানিয়া লইবেন? আসল কথা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে তাঁহারা মহা ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছেন।

এদিকে যতরকম প্রমাণ দেওয়া সম্ভব, প্রেততত্ত্ববিদরা তাহা দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু অবিশ্বাসীরা তবু ইহাকে জোর করিয়া মানিতে চাহিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন,—"তোমাদের বিজ্ঞানই অসম্পূর্ণ—কারণ যাহা চাক্ষুষ সত্য, তাহাকে সে মিথ্যা বলিতেছে, তাহাকে সে অস্বীকার করিতেছে। তোমাদের জড়-বিজ্ঞানই মিথ্যা, কারণ সত্যকে সে প্রমাণিত করিতে পারিতেছে না, অথচ আপনার অক্ষমতা স্বীকার করিতেও রাজি নয়!"

দিনে-দিনে প্রেততত্ত্ব নানাদিকে যেরূপ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আশা হয় যে, অদূর-ভবিষ্যতে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সেতুবন্ধনও সম্ভব হইতে পারে! মরণের মহা-ভয় মানুষের মনকে আর কাতর করিতে পারিবে না—জানি না, পৃথিবীতে সে শুভদিন আসিতে আর কতদিন দেরি আছে!

নূতন 'গম্ভীরবেদন'

সংপ্রতি বিলাতে একটি যুবকের উদরে সাংঘাতিক অস্ত্রচিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল। তাহার পেটের ভিতরে টিউবারকিউলসিস হওয়াতে, ডাক্তার তাহার পেটের খানিকটা অংশ একেবারে বাদ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই অস্ত্র-চিকিৎসায় সময় লাগিয়াছিল একঘণ্টা দশমিনিট। কিন্তু অস্ত্রাঘাতের সময়ে রোগীকে অজ্ঞান করা হয় নাই,—তাহার জ্ঞান বরাবর সমান টন্‌টনে ছিল,—ছিল না কেবল তাহার ব্যথাবোধের শক্তিটা! তাহার নাড়ীও খারাপ হইয়া পড়ে নাই; অস্ত্রাঘাতের সময়ে সে "নার্স"দের সঙ্গে দিব্য খুসিমনে ঠাট্টা-তামাসা করিয়াছিল,—এমনকি কিছু-কিছু আহার করিতেও তাহার কোন বাধা হয় নাই!

এহেন অসম্ভব সম্ভব হইল কিসে? পাশ্চাত্যদেশের চিকিৎসকরা সংপ্রতি এক রকম "গম্ভীরবেদন" বা anæsthetic আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যুবকটির দেহে সেই জিনিষটি—অর্থাৎ "ইথর" প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু এই "ইথর" সাধারণ "ইথর" নয়। ইহার দ্বারা কিছুক্ষণের জন্য মানুষের অনুভব-শক্তি চলিয়া যায়, অথচ সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে না। মানুষের মস্তিষ্কের একঅংশেই ইহা কাজ করে, অন্য অংশের স্বভাব কিন্তু সমানরূপেই বজায় থাকে।

কানাডার ডাক্তার জেমস্ কটন এই নূতন "ইথর" আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদিন ডাক্তাররা ছোটখাট অস্ত্র-চিকিৎসার সময়ে রোগীর যন্ত্রণা দূর করিতে পারিতেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে ছোট-বড় সমস্ত অস্ত্র-চিকিৎসাই এই নূতন "ইথরে"র সাহায্যে যন্ত্রণাশূন্য হইবে,—অস্ত্রের নামে রোগীকে আর ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতে হইবে না।

দাঁতের ব্যামো

ডাক্তার আলবার্ট ওয়েষ্টলেক্, দন্ত-চিকিৎসার সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যে-সকল যুবকের বয়স উনিশ হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এবং যে-সকল যুবতীর বয়স ষোল হইতে একুশ বৎসরের মধ্যে, তাহাদের দাঁতের মাড়ির প্রান্ত-রেখা যদি লালরঙে রঞ্জিত হইয়া ওঠে, তবে তাহারা দেহের স্বাস্থ্যের দিকে চোখ না রাখিলে পনেরো বৎসরের ভিতরে নিশ্চয়ই pyorrhœa রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইবে। যাহাদের অন্ত্রের মধ্যে কোন গোলমাল নাই, তাহারা কখনো এই রোগে ভোগে না।

ডাক্তার ওয়েষ্টলেকের মতে, মুখ-ধোওয়ার পক্ষে পাতিলেবু বা কমলালেবুর রস সব-চেয়ে উপকারী। লেবুর রস ব্যবহারের পর এক গেলাস জলের দ্বারা মুখ ধুইলেই মুখের ভিতরটা চমৎকার পরিষ্কার হইয়া যায়। পাঁচভাগ জলে দুইভাগ লেবুর রসই যথেষ্ট।

দাঁতের ডাক্তাররা পচা দাঁত ও মাড়ির অসুখ আবার ভালো করিতে পারে বটে, কিন্তু এই আরামের সুখ বেশীদিন টিকে না। কারণ যাহারা দেহের স্বাস্থ্যের দিকে মন দেয় না, দাঁতের অসুখ আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

সকালের ও রাত্রের আহারের পর দন্ত-রোগীদের উচিত, গোটাদুয়েক কমলা বা একটি পাতি লেবুর রস পান করা। কিছু লেবুর খোসা, শাঁসের সঙ্গে খেয়ে করিয়াও খাওয়া দরকার। কারণ ইহার ভিতর vitamine নামে পরম-উপকারী উপাদান বর্ত্তমান থাকে।

অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসক মাত্রই জানেন, মানুষের গ্রন্থি-সম্বন্ধীয় বিকৃতির জন্যই দাঁতে নানারকম অসুখ হয়। সব সময়েই দাঁত সুপরিষ্কৃত দন্ত নীরোগ হয়, এ ধারণা ভুল। এমন অনেক মানুষকে দেখা যায় যাহারা জীবনে কখনো দাঁত মাজে নাই, কিন্তু তাহাদের দাঁত নীরোগ ও নির্খুত।

মনের বসতি কোথায় ?

বিজ্ঞানের কথা দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—আজ যাহা সত্য, কাল তাহা মিথ্যা। সংপ্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা এমন-এক নূতন কথা বলিতেছেন, যাহা সত্য হইলে দেহ-তত্ত্বের প্রধান একটা স্থির সিদ্ধান্তও একেবারে বাতিল হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকরা নানা পরীক্ষার পর শেষটা ঠিক করিয়াছেন যে, মানুষের মনের বাসা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে নয় এবং মস্তিষ্কের ভিতরে কোনরূপ মানসিক কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না। ডাক্তার রবার্টসন বেল অনেকদিন আগে বলিয়াছিলেন যে, নর-দেহের solar plexusএর মধ্যেই মনের বসতি। তখন কিন্তু কথাটা সকলেই হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকরা বলিতেছেন, গত যুদ্ধে তাঁহারা রণক্ষেত্রে অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া সময়ে কোন কোন লোকের মস্তিষ্কের সমস্ত অংশও বাদ দিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে মানুষের মানসিক শক্তি একটুও নষ্ট হয় না। আর-একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক (Prof. Froude) বলিতেছেন, কুকুর ও বানরের উপরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া উড়াইয়া দিলেও তাহাদের মানসিক অবস্থার কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হয় না! আধুনিক অনেক চিকিৎসকের মতে, মানুষের মনের জন্মক্ষেত্র নিশ্চয়ই দেহের অন্য-কোন স্থানে। তবে সে স্থানটা যে কোথায়, সেটা এখনো ঠিকমত ধরিতে পারা যায় নাই।

বেতার টেলিগ্রাফে ফোটো-তোলা

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া চমকিত হইবেন না, কারণ এবারে বেতার টেলিগ্রাফে ও টেলিফোনের সাহায্যেও ফোটো-তোলা সত্যসত্যই সম্ভব হইয়াছে।

এর-মধ্যেই এই ব্যাপারের অনেকগুলি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে—যদিও এক-বিষয়ে সমস্ত পদ্ধতিতেই মিল দেখা যায়। টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের সাহায্যে কোন আলোক-চিত্র অখণ্ডভাবে নয়—কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবেই স্থানান্তরে চালান করা হয়। তারপর সেই খণ্ডাংশগুলি একত্র করিলেই একখানি সম্পূর্ণ আলোকচিত্র গড়িয়া উঠে।

এ বিষয় লইয়া বৎসর-কয়েক পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টা চলিতেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে চেষ্টা আংশিকভাবে সফলও হইয়াছিল বটে, কিন্তু এবার এই ব্যাপারটি একেবারে নিখুঁত হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও চলে। সংপ্রতি ডেনমার্ক হইতে বিলাতের "ডেলি এক্সপ্রেস" নামক সংবাদ-পত্রের কার্য্যালয়ে, প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের একখানি ছবি বেতার টেলিগ্রাফের সাহায্যে প্রেরিত হইয়াছে। টেলিগ্রাম পাঠাইতে যে খরচ হয়, এই উপায়ে ছবি পাঠাইতেও তার চেয়ে বেশী-কিছু খরচ পড়ে না।

মানুষ-খেকো গাছ

আফ্রিকার নিকটস্থ মাডাগাস্কার দ্বীপে একজন বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক একটি অদ্ভুত গাছ দেখিয়া আসিয়াছেন। "ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ" প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট গাছের কথা ইতিপূর্ব্বেই শোনা গিয়াছিল—যাহারা পোকা-মাকড়-মাছি প্রভৃতিকে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া আহার করে। কিন্তু এই নূতন-আবিষ্কৃত গাছটির নজর আরো উঁচু এবং সেইজন্যই স্থানীয় অসভ্য বাসিন্দারা ইহাকে বৃক্ষ-দেবতা বলিয়া পূজা করে। এই বৃক্ষ-দেবতা নরমাংসের অত্যন্ত ভক্ত। অসভ্যরা তাহাদের বৃক্ষদেবতার নিকটে মানুষকে বলিরূপে নিবেদন করে। কিন্তু সাধারণ পাষাণ-দেবতার মতন এই বৃক্ষদেবতা নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া মানুষ-বলি দর্শন করেন না। ইনি স্বয়ং তাহাকে বধ করেন এবং শিষ্যগণের জন্য সামান্য প্রসাদ পর্য্যন্ত না-রাখিয়া সমস্তটাই নিজে নিঃশেষে খাইয়া ফেলেন। বলিরূপে

মানুষ-খেকো গাছ

তিনি নর-কেও পান না—পান যুবতী নারীকে!

এই ভয়ানক গাছের নাম দেওয়া হইয়াছে, "ক্রিনোইডা ডাব্জিনা।" এই গাছের গুড়ি সাধারণত দশফুট উঁচু হয় এবং তাহাদিগকে দেখিতে অনেকটা বড়-জাতের আনারস গাছের মতন। গাছের মাথার বেড় আট-নয় ফুট এবং তাহার উপর-দিকটা প্রকাণ্ড এক-খানা থালার মতন আকার ধারণ করিয়াছে। গাছের গুড়ির উপর হইতে আটখানা করিয়া পাতা ঝুলিতে থাকে,—সেগুলো লম্বায় দশ-বারো ফুট এবং চওড়ায় গোড়ার দিকে এক ফুট, মাঝখানে দুই ফুট, তারপর ডগার দিকে সূচের মতন তীক্ষ্ণ হইয়া আসে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় কাঁটা খাড়া হইয়া থাকে। এই পাতাগুলো মাঝখানে এক ইঞ্চির কম পুরু নয়। ইহাদের উপরে আড়া-আড়ি ভাবে অনেকগুলো শাখা থাকে। মাথার উপরে থালার তলাতেই গুটিছুয়েক নলের মতন কেশর—তাহারা সর্ব্বদাই থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। গাছের থালায় এক-রকম পুরু ও মিঠা রস পাওয়া যায়, তাহার একটুখানিতেই এত নেশা হয় যে, মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। রসের লোভে যে গাছে ওঠে, এই গাছ আপনার কেশর দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। তারপর কাঁটাওয়ালা পাতায় চাপিয়া ধরিয়া তাহার প্রাণবধ করে!

শ্রীপ্রসাদদাস রায়

অভিনেতার সংগ্রহ

Matheson Lang একজন বিখ্যাত অভিনেতা। ইহাঁর অভিনয়-চাতুর্য্য বিশ্ব-বিশ্রুত। সম্প্রতি তিনি Pearson's Magazine-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—তা থেকে কিছু চয়ন করে দিলাম।

তিনি আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং সেই-সব দেশ-ভ্রমণের ফলে এমন অনেক ফটোগ্রাফ ও আসল অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করেছেন, যাতে তাঁর অভিনয় স্বাভাবিক হ'তে অনেকখানি সাহায্য করেছে। তাঁর সংগ্রহ ভবিষ্যতে আরও অনেক নাটকে তাঁকে সাহায্য করবে। তাঁর সংগ্রহসম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেছেন। একবার Zanzibarএ তিনি এক বৃদ্ধ আরব সেখকে দেখ্‌তে পান, তার পোষাক দেখেই তাঁর মনে হল যে সেই রকম পোষাক ওথেলোকে পরিয়ে তাকে স্বাভাবিক করে তুল্‌বেন। তখনই তাঁদের গাইড গিয়ে আরবটিকে ডেকে নিয়ে এল; আর তাকে ফটো-তোলাতে সম্মত করিয়ে। ফটো নেওয়া হয়ে গেলে বৃদ্ধ আরবটির পোষাক Mrs. Lang কিনে নিতে চাইলেন। সে তাঁর একটি পোষাক বিক্রী করে গেল, সেই পোষাক পরে Mr. Lang ওথেলোর ভূমিকা অভিনয় করে থাকেন।

Zanzibar-এই তিনি একটি সুন্দর বাড়ীর ফটো নিয়েছিলেন, সেই ছবি থেকে পরে Merchant of Veniee-এ সাইলকের বাড়ীর দৃশ্য-রচনা করা হয়েছিল। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে তিনটি জিনিষ তাঁর কাছে অমূল্য। একটি হার, একজোড়া জুতো আর একখানা ছোরা। হারটি মরক্কো থেকে আনা। তাঁর স্ত্রী সেটি একটি চামড়ার বেল্টের বদলে লাভ করেছিলেন। এ হার তিনি সাইলক আর ওথেলো সেজে ব্যবহার করেন! জুতো-জোড়া ভারতবর্ষ থেকে কেনা। ছোরাখানি অর্দ্ধচন্দ্রকার, এখানা Zanzibarএর এক দোকান থেকে কেনা; ওথেলো সেজে এখানা তিনি ব্যবহার করেন।

তাঁর এই রকম অসংখ্য সংগ্রহ আছে। তার কতক তিনি ব্যবহার করেছেন, কতক ভবিষ্যতে ব্যবহার করবার জন্য মজুত আছে।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

সঙ্কলন

বিলাত-যাত্রীর পত্র

৮

হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই চম্‌কে উঠেচি। কাছে থেকে তোমাদের যে সান্ত্বনা করতে পারতুম এত দূর থেকে তা আর সম্ভব হয়না। তোমাদের চিঠি আসতে এবং আমার উত্তর পৌঁছিতে যে দীর্ঘ সময় যাবে সেই সময়ই ধীরে ধীরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি তোমাদের শুশ্রূষা করবে। জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি আর যা বলি তার মধ্যে অন্ধকার থেকে যায় কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে, আমরা ভাগ করে দেখি। ঘরের মধ্যে আমরা আলো জ্বালি, কেননা তখনকারমত ঘরের মধ্যেই

আমাদের বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু সেই আলো জ্বালার দ্বারা আমাদের আলোকিত ছোটঘর আর অনালোকিত বিপুল বিশ্ব আমাদের কাছে দুই স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আমরা যাকে বলি জীবন সেও সেই আলোকিত ছোট ঘরের মত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে সংহত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের লীলা-স্থল। তার বাইরে যে অসীম সত্য আছে তাকে আমরা জীবনক্ষেত্রের বিরুদ্ধ বলে ভুল করি। কিন্তু আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবচ্ছিন্ন যোগ, যেমন এই ঘর ও বাহির একই সত্যে বিধৃত, তেমনি, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই—আমরা আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ব বশত অংশমাত্রকে একান্ত করে জানচি বলেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্চি। আজ যেখানে আলো জ্বলচে কাল সেখান থেকে আলো সরে যেতে পারে কিন্তু আমাদের বিশ্ব সরে যাবে না,আমাদের আশ্রয়স্থল সমান ধ্রুব হয়েই থাকবে। অখণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। রাত্রে জেগে উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে সে বুঝি তার মাকে হারিয়েচে —এই সত্যটুকু শিখতে তার দেরি হয় যে আলোতেও তার মা আছে অন্ধকারেও তার মা আছে।. জীবন মৃত্যু সম্বন্ধেও আমরা সেই শিশুর মত—আমরা বৃথা ভয়ে কাঁদি জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃত্যুতে সত্যকে হারাই। কিন্তু বিশ্বে প্রাণের মূর্ত্তিকে দেখ, সে মূর্ত্তি আনন্দ মূর্ত্তি। চারিদিকে তরুলতা পশুপক্ষী রূপে শব্দে গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করচে; বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দ-রূপ কি কখনই টিঁকে থাকতে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো সত্য না থাকত? রাত্রে আমরা ছোট প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু পলতেই বা জ্বালাই। কিন্তু সেইটুকু শিখার মধ্যে লয় নেই কেন? কেননা একথা নিশ্চয় জানা আছে যে, সে নিভলেও সূর্য্য কখনো নিভবে না। বিশ্বের মধ্যে মহা-প্রাণই হচ্চে অনির্ব্বাণ সত্য,সেই জন্যেই ক্ষুদ্রপ্রাণ নিয়েও ভাবনা নেই। যা ওঁ যা হাঁ তাকে প্রাণের দৃষ্টিতে দেখছি, সেই হাঁ-কেই বিশ্বাস কর, না-কে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস কর কুয়াশাকে না। আমাদের চারিদিকে জগৎ জুড়ে প্রাণ এই অভয় বাণী ঘোষণা করচে, মৃত্যু কোনোমতেই সেই বাণীকে নিরুদ্ধ করতে পারচে না. মেঘ বারেবারে এসে সূর্য্যকে যেন ঢেকে ফেলতে চাচ্চে কিন্তু কিছুতেই মুছতে পারছে না। মৃত্যু তেমনিই প্রাণের উপর দিয়ে চলে যাচ্চে কিন্তু প্রাণকে কখনই আচ্ছন্ন করে বিলুপ্ত করতে পারবেনা। অতএব মনকে শান্ত করে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা কর মৃত্যুকে না। যাকে ভাল বেসেচ, যাকে সত্য বলে জেনেচ সে মৃত্যুতেও সত্যই আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন, কার্ত্তিক ১৩২৭।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইয়াছে। প্রায় ষাট বৎসর বা ততোধিক কাল বয়সে তিনি ইহলীলা সংবরণ করিলেন। জীবদ্দশায় তাহার কাব্য-সাধনা ও অন্যান্য কীর্ত্তি সাধারণ্যে প্রচার না হইলেও পণ্ডিত এবং রসিক সমাজে তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভা সকলকেই আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি কি দিয়া গিয়াছেন, আজিকার হট্টগোলে সে সংবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিলেও যাঁহারা গুণগ্রাহী ও ভাবের ব্যাপারী তাঁহারা ভালরূপই জানেন, দেবেন্দ্রনাথের স্থান কোথায়,—বঙ্গীয় কাব্য-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং ৭৫৫
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ

কাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে তিনি চিরদিন আগত ও অনাগত রসপিপাসুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

রবীন্দ্রিয় যুগে যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর যে দুইজন কবি তাঁহার যথার্থ সমসাময়িকরূপে বাংলা কবিতায় বিশিষ্ট কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন,সেই অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ আজ উভয়েই পরলোকে—the greatest and the last of the Victorians রূপে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এখনো নিত্য-নূতন রশ্মি-প্রভায় বাংলা সাহিত্যের তামসী নিশাকে তাহার স্বাধিকার হইতে দূরে রাখিয়াছেন, বঙ্গভারতীর মহাদুর্ভাগ্যের মধ্যেও এই অতিরিক্ত সৌভাগ্য-যোগ হইয়াছে, এখনো তিনি আছেন বলিয়া রুদ্ধ অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া আছে, সিঁথির মণি উজ্জ্বল আছে, অধরের স্মিত-হাস্য ম্লান হয় নাই!

দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদে একটি বিশেষ

দুঃখের কথা এই যে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আজিকালিকার সাহিত্য-সমাজে কেবল তাঁহার নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনেকেই তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাবলীর সহিত পরিচিত নহেন। পুরাতন 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় তিনি যে নূতন রসধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভার সেই মাধ্যন্দিন গৌরবের কথা অনেকেই জানেন না—তাঁহার মৌলিক কল্পনা, আশ্চর্য্য কবিপ্রাণ, ও চমৎকার ছন্দঃস্রোত ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাইতে হইলে গত ১৫ বা ২০ বৎসরের পূর্ব্বেকার রচনা পাঠ করিতে হয়। অধুনাতন রচনাগুলিতে, তিনি যে কত বড় কলাবিদ্ ছিলেন তার প্রমাণ তেমন পাওয়া যাইত না। কাজেই আমি লক্ষ্য করিয়াছি, বর্ত্তমানবংশীয় অতি-অল্প সাহিত্যামোদী যুবকই তাঁহার কাব্য-আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেন। তাঁহার পরিচয় সর্ব্বত্র যেন নূতন করিয়া দিতে হয়। 'অশোক-গুচ্ছ'ও অনেক দিন পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল—পুরাতন সংস্করণ বহুকাল নিঃশেষিত হইয়াছে; কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থগুলির প্রচার আদৌ হয় নাই। তাই তাঁহার সম্যক পরিচয় অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের আদি বংশীয়েরা মজুমদার নামে পরিচিত। হুগলীজেলায় পাণ্ডুয়া মহকুমার বলাগড় গ্রামে ইহাঁদের আদি নিবাস। প্রায় দুই পুরুষ যাবৎ ইহারা ও ঐ বংশের অন্য দুই-এক শাখা পশ্চিম-প্রবাসী। এই প্রবাস-কালেই ইহাঁরা মজুমদার উপাধির পরিবর্ত্তে মূল কুল-সংজ্ঞা সেন (গুপ্ত) উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ সেন ব্যবসায়-উপলক্ষ্যে বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যেও স্বভাব-গত উদারতা ও দানশীলতা, আশ্রিত-পালন প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার ভাই-ভগিনীরা তাঁহাদের অসাধারণ গুণবতী জননীর স্নেহ-শাসন ও শিক্ষা-প্রভাবেই বাল্যে ও যৌবনে যত-কিছু সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনে এই মহীয়সী নারীর প্রভাব যে কতখানি ছিল—হৃদয় ও মন, উভয়ের বিস্তার-লাভে তাঁহার কৃতিত্ব যে কতখানি, তাহার বিবরণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সুখে দুঃখে, নিরতিশয় অভাব ও অর্থ-কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও এই জননী কখনো মহান্ আদর্শ হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত হইতে দেন নাই। সারল্য, উদারতা, মহাপ্রাণতা নিঃস্বার্থপরতা ও পরকে আপন করিয়া লওয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ এই জননীদেবীর শিক্ষা ও অতন্দ্রিত চেষ্টায় এই সংসারে কিরূপ স্ফুরিত হইয়াছে তাহা পরিচিতদিগের মধ্যে অবিদিত নাই। সর্ব্ববিধ কার্পণ্য ও ক্ষুদ্রতা হইতে তিনি সন্তানদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেন; পরচর্চ্চা, পরনিন্দা তাঁহার সংসারে হইতে পারিত না। সৎসাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার এত অনুরাগ ছিল যে শেষ-বয়সে তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে প্রত্যহ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বধূরা পালাক্রমে কোনও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে এবং অপর সকলকে শুনাইবেন। সংসারটিকে তিনি স্নেহ-প্রীতির লীলানিকেতন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই শিক্ষা ও বোধ করি, তাঁহার পিতার মুক্তপ্রাণের অধিকারী হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথের কবি-শক্তি স্ফুরিত হইয়াছিল।

তিনি অতি অল্প বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। উদ্বেল ভাবরাশি অকৃত্রিম গিরিনির্ঝরের মত উৎসারিত হইত। ক্রমে সেই ভাব ও ভাষা গভীরতর হইয়া—যৌবন-প্রবুদ্ধ হৃদয়ের স্বভাব-সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে ভূষিত হইয়া বঙ্গভারতীর চরণদ্বয় ও দীর্ঘ-লুণ্ঠিত অঞ্চল-প্রান্ত প্রাণের রঙ্গে লালে-লাল করিয়া দিয়াছে। তিনি প্রথম যৌবনে মানস-শক্তির প্রথম প্রকাশ-মুখে পশ্চিম হইতে বাংলার রাজধানীতে বিদ্যা-শিক্ষা করিতে আসেন; সবজজ মথুরানাথ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা, ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে অধিক বয়সে এলাহাবাদ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রথম কলিকাতা-বাসকালে তিনি যে সঙ্গ ও সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজ প্রাণহীন। তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের সূচনা মাত্র হইতেছে। অমৃত-পিপাসু তরুণ দেবতাদের অপূর্ব্ব সম্মেলনে বাণীর প্রসাদ-পাত্রে যে নবীন সুধা কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে, সেই রসরঞ্জিত ওষ্ঠাধরের কলগুঞ্জন দেবেন্দ্রনাথের অন্তর-বীণায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সে আনন্দে পরিপুষ্ট হইয়া, সে সৌহার্দ্দ্য ও সমপ্রাণতায় আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া তিনি অল্প লাভবান হন নাই! বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগসন্ধির গৌরব ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা অবশ্য [illegible] জীবন। কত আশা, কত উৎসাহ! কতদিকে কত নব নব প্রতিভার উন্মেষ, তার পরে কত ফোটা, কত ঝরা! দেবেন্দ্র নাথের প্রতিভা এইরূপে সেই নব-জাগ্রত সৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রস্থলে আপনাকে স্থাপন করিয়া সাধনা ও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

তারপর পত্নী-বিয়োগ—দারান্তর-গ্রহণ—ওকালতী ব্যবসায়ে সফলতা। তারপর একমাত্র পুত্রের বিয়োগ-দুঃখে শোকোন্মাদ—ওকালতী-পরিত্যাগ—কত উত্থান-পতন! কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের মধ্যে সেই যে আজন্ম-লব্ধ কবি-প্রেরণা, তাহা হইতে কখনো তিনি বিচ্যুত হন নাই।

প্রায় কুড়িবৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় ফিরিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার কবিতা ও জীবন এক ছিল, তাঁহার বাস্তব জীবনের যাহা কিছু সত্যকার মর্ম্মকথা, যাহা তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধর্ম্ম ছিল, তাহাই আবেগ ও কল্পনার একটু আমেজ পাইলেই ছন্দঃ-স্রোতে উথলিয়া উঠিত। আপনাকে বিলাইয়া আত্ম-পর ভুলিয়া, এমন কি সাংসারিক কর্ত্তব্য-জ্ঞানকেও বিস্মৃত হইয়া, নিতান্ত শিশুর ন্যায় সরল মনে জীবনটাকে চিন্তালেশ-শূন্য দায়িত্ববিহীন আবেগের পথে ছুটাইয়া যখন প্রচণ্ড প্রতিঘাত পাইলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার মানস-নদে একটা ঘূর্ণা জাগিল—আর গতি নাই, আর প্রসার নাই, বিকাশ নাই; তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রীতি ও প্রেম-কল্পনায় একটা বাঁধন পড়িল—প্রেম-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিশ্বমঙ্গল-কল্পনা, ভাগবত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। কর্ত্তব্য-শাসনে আপনাকে

না বাঁধিয়া, যতটা সম্ভব নিজেরই মানস-সম্ভূত অথচ পৃথক্-কল্পিত এই শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে ভক্তির শাসনে আপনার অন্ধ হৃদয়কে লুটাইয়া ধরিয়া তিনি কর্ম্ম-সন্ন্যাসের সাধনা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে এই ঘূর্ণার প্রচণ্ড-বেগে তিনি ঘর-সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণপ্রেম-প্রচারে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত পর্য্যটন করিয়াছিলেন—প্রায় কৌপীনবন্ত ও তরুমূল-বাসী হইয়া এ সময়ে তিনি কি দুর্দ্দম উন্মানদার বলেই একাগ্র-চিত্তে সকল বাধা, সকল বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া Srikrishna Mission, Srikrishna Review ও শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন! কলিকাতার শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় ইতিহাস অনেকেই জানেন, ইহার আশ্চর্য্য অভ্যুদয় ও পরিশেষে আকস্মিক পতন, কোনোটাই আশ্চর্য্যজনক নয়। প্রকাণ্ড কল্পনার সঙ্গে যদি তীক্ষ্ণ কর্ম্মবুদ্ধি না থাকে, আত্মশক্তিতে অত্যধিক আস্থা, মনে মনে "কল্পধেনুর অমৃত দুগ্ধ-দোহন" করা কোনো কর্ম্মে সফলতা আনয়ন করে না। কবি দেবেন্দ্রনাথ চির-দিনই কবি, একেবারে আত্মবিস্মৃত মোহাভি-ভূত,—সুন্দর ও মঙ্গল-এর অন্ধ উপাসক, যাহা মনে করেন তাহাই সত্য, এবং যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই শুভ—এই রূপ বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ তাঁহার জীবনকে ব্যবহারিক দিকে নিষ্ফল করিয়াছে। তিনি শেষ জীবনে আবার সংসারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সংসার ও কল্পনা, এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব কখনো তাঁহার জীবনে মেটে নাই। ইদানীং তিনি অকাল-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, মস্তিষ্কের ও চক্ষুর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র অবলম্বন তাঁহার 'পাঠশালা' যখন আচম্বিত বজ্রপাতে চূর্ণ হইয়া গেল, তখন হতোদ্যম ও হতোৎসাহ হইয়া ভগ্নহৃদয় দেবেন্দ্র-নাথ তাঁহার অধুনা-প্রবাস-ভূমি দেরাদুনে ফিরিয়া গেলেন, এবং সেইখানেই বোধ হয় সারাজীবনের কল্পনা-স্বপ্নের অবসানে সংসারের দাবদাহের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবন বাহিরের দিক দিয়া দেখিবার নয়—সে দেখায় সম্পূর্ণ উল্টা দেখাইবে। সর্ব্ববিধ নিয়মের বাহির যে, তাহাকে লইয়া সমাজে বিশেষতঃ সংসারে, সাংসারিক নীতির আলোচনা করিলে, সত্যকে পাওয়া যাইবে না, মিথ্যারই উদ্ভব হইবে। বাঙলাদেশে যদি কোন কবি জন্মিয়া থাকেন, যাঁহার জীবন বা চরিত্র-ব্যাখ্যান করিতে হইলে সংসারকে, বাস্তব ভাল-মন্দকে একেবারে ভুলিতে হইবে, তিনি দেবেন্দ্রনাথ; তাহা না হইলে দেবেন্দ্রনাথকে কিছুতেই সত্য করিয়া জানা যাইবে না। কবির কথা "যেজন সেবিবে ও পদযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে"—'দরিদ্র' অর্থে জীবনে-পরাজিত—ইহার কারণ বা অর্থ কবি দেন নাই; কিন্তু দেবেন্দ্র-নাথ আপনার জীবনে তাহার অর্থ সুস্পষ্টরূপে করিয়া দিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যেও যাহা, তাঁহার জীবনেও তাহাই প্রবল ছিল, ভ্রূক্ষেপহীন আত্মপ্রসাদ সুন্দরের ধ্যানে নয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার অনুভূতিতে যে উল্লাস, তাহাতেই সমস্ত ভুবন তাঁহার চক্ষে রাগরঞ্জিত হইয়াছিল। সহজ কথায় প্রাণ ও মন [illegible] যে ভেদ নির্দ্দেশ করি—সেই [illegible]

প্রাণের অকুণ্ঠিত বিলাসই তাঁহার কল্পনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে; 'মন' জিনিষটা তেমন ফুটিতে পায় নাই। ইহার যদি বিপরীত হইত, তবে বাংলা কাব্যে আমরা একটি খাঁটি Keats পাইতাম। সুন্দর-পিপাসার সঙ্গে দুঃখ-বোধ তাঁহার ছিল না। তাঁহার প্রাণের আবেগ বিশালতর ছিল, art এর মধ্যে তিনি আনন্দ অন্বেষণ করেন নাই—এই জীবন ও জগৎটাকেই আপনার প্রাণের রঙ্গে ছোপাইয়া তিনি বৃন্দাবন-স্বপ্নে ভোর হইতে চাহিয়া ছিলেন। কীটস্-এর মত তাঁহার sensuousness ত' intellectual, objective নয়; জগৎ ও নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব তিনি মানিতেন না; আর্টিষ্টের মত আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিয়া, জগৎকে একটু দূরে ধরিয়া, চিন্তা ও ধ্যানের সাহায্যে রসাস্বাদন করা তাঁর ধর্ম্ম নয়, সংশয় সন্দেহ নয়, সরল বিস্ময়ের প্রাণময়তা তাঁহাকে এই নূতন ভোগপন্থা ও আনন্দবাদের কবি করিয়াছিল। Sense ও Dutyর যে conflict তাহা তিনি বুঝিতেন না, আপনার আনন্দ-বিশ্বাস তাঁহাকে আর সর্ব্ব-বিষয়ে অন্ধ করিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার কাব্য, অতি অপূর্ব্ব-মধুর হইলেও, জীবনের সারা বৎসরের সঙ্গী নয়, কেবল উৎসব-রাতে, জীবনসংগ্রামের ক্ষণিক অবসরে, অনাবিল প্রীতিহাস্যে আমা-দিগকে মুগ্ধ করে। কিন্তু মুগ্ধ সে করিবেই—সে 'ভাবে' রinfection কাহারও রোধ করিবার শক্তি নাই—সে এমনই সহজ, সবল ও সুন্দর। তাঁহার কাব্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ হইলেও মৌলি[illegible]তা ও প্রকৃত কবিশক্তিতে এ যুগে—[illegible] রবীন্দ্রনাথকে একেবারে বাদ দিয়া —তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই। কেবল মাত্র প্রাণের অতি তীব্র স্পন্দনে ভাষা, ছন্দ, ও সুর কেমন করিয়া আপনা-আপনি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও কারু-কলার নিদর্শন হয়—unconscious art এর কথা যে সত্য, তাহা দেবেন্দ্র-নাথের প্রতিভার মধ্যাহ্নকালের রচনা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যাইবে। ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্যে তাঁহার গভীর প্রবেশ ছিল। বাংলা কাব্যে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার উপর কিছু কিছু পড়িয়াছিল—বোধ হয় হিন্দি কবিতাও কিছু কিছু চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাঁহার ছন্দে যে একটি অপরূপ ঝঙ্কার আছে, তাঁহার আবৃত্তিতেও সেই রূপ এক অতি মধুর স্বর-ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিত; তাহার মধ্যে যেন তাঁহার প্রাণের সুন্দর-সম্ভোগের সমস্ত রস ঢালিয়া দিতেন। তাঁহার সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, অনু-রোধ করিলেই অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাই-তেন। এমন সাদর অভ্যর্থনা, প্রাণ খুলিয়া বুকে করিয়া লওয়া, আর কোথায়ও দেখি নাই।

দেবেন্দ্রনাথেরা পাঁচ সহোদর—তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেন ওকালতি করেন, তিনি দুই বিষয়ে এম, এ। তৃতীয় সহোদর ৺উপেন্দ্রনাথ সেন ঋষিতুল্য লোক ছিলেন—যেমন সাহিত্যানু-রাগ, তেমনি স্বভাব-ধার্ম্মিকতা, সাত্ত্বিকতা, বিনয় ও প্রীতি তাঁহাকে আদর্শ গৃহী করিয়া-ছিল। তিনি এম,এ, বি,ল,—সবজজ ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সংসারে হাসির আলো অনেকখানি নিবিয়া গিয়াছে। চতুর্থ সহোদর যতীন্দ্রনাথ সেন কোনও উপাধিধারী না

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

হইলেও প্রগাঢ় পণ্ডিত, সুলেখক, সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন—তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে যশো-লাভ ক'রিয়াছেন—এক সময়ে এলাহাবাদের চরম-পন্থী ইংরাজী পত্র 'Citizen' এর সম্পাদক ছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ-সেন এম, এ, এল, এল, ডি মহাশয় অধুনা এলাহাবাদ-হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল।

ভ্রাতৃগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষ করিয়া এই কনিষ্ঠ সহোদরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার 'হিন্দোলা' ও 'তুষার' নামে দুইখানি কাব্য ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি বিনয়ী ও মুক্তপ্রাণ।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

পৌষের অবেলায়

পৌষের হাওয়া দেয়, গা করে শির্ শির্!
কোন্ তূণ খালি করে' কোন্ জন ছোড়ে তীর!
দেখা যায় ফাঁকে ওই নারিকেল-পত্রের—
রূপসীর লাজ-ভরা চাউনিটি নেত্রের!
নীলিমার নীল চোখে গাঢ় হয় নীল রঙ্,
অন্তরে বুলে যায় আকাশের রঙ্-চঙ্;
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,—
বাঁধা হলো চুল তোর—কদ্দুর? কদ্দুর?

নলি বেয়ে খেজুরের রস পড়ে টুপ্ টুপ্—
অধরের সীধু-টুক্ ঝরে' যায়—চুপ্ চুপ্!
কাঁঠালের কচি মুচি কাঁচা সোনা চুক্ চুক্—
আধ-রোদ আধ-ছায় দেয়ালার দুখ-সুখ!
চরা সায় চড়ায়ের, ঘর-কোণে উড়ে' যায়,
চোখ-চোখ চায়, আর প্রেম- শ্লোক আওড়ায়,
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,—
বাঁধা হলো চুল তোর—কদ্দুর? কদ্দুর?

খিলি খেয়ে হাসে যেন খিল্ খিল্ বকফুল—
তরুণীর রক্তিম কর্ণের ওই তুল!
বোঝা ভার—কাঁচলো কি পাক্‌লো ও কৎবেল
লাজশীলা বধূটির যেন রীত-আক্কেল!
সজনের ফুল থোক—বুক-ভরা মৌ ও'র,
শেষ করে মৌমাছি মন-পাওয়া মস্তর!
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,—
বাঁধা হলো চুল তোর—কদ্দুর? কদ্দুর?

নট্‌কনা চট্‌কনা ভেঙে [illegible] দু'চোখের—
পিয়ে যায় প্রেয়সীর রূপ-রস ওষ্ঠের!
সাত গুছি রুচি তোর, খুটি নুটি কর্ সায়,
বেঁধেছিস্ মন মোর বিউনির ফাঁস্ টায়!
উড়ে' যায় পাখী ওই একসার—দুইসার,
থাক্-ভাঙা বক যায়,—সাধ নেই গুণবার!
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,—
বাঁধা হলো চুল তোর—কদ্দুর? কদ্দুর?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যো[illegible]

নাস্তিকের গল্প

একটা কথা আমরা বেশ জানি, 'যার খাই বাই, তাকে বলি চোর!' ভগবানের হাতের তৈরী জীব হয়ে, তাঁর খেয়ে দেয়ে, তাঁকে আবার আমরা কিনা অস্বীকার করে ফেলি! এটা একটা উল্টা চাপ্। জগতের ইতিহাসে এ-সহজ রকম নিমকহারামি ত কথা নয়। আমাদের অনেকের জানা আছে তর্ক-শাস্ত্রের অদ্ভুত পণ্ডিত মিলের কথা (John Stuart Mill); তিনি তর্কের ফন্দি বার করে শেষটায় এই হলেন যে তর্ক ছাড়া কোন জিনিস বড় একটা বিশ্বাসের ধার কাছে আস্‌তে দিতেন না—কিন্তু কতকগুলি জিনিস আছে, যেগুলি চোখে দেখা যায় না, সহজে মনের ধাপে নামে না, তবু সত্য! এই যেমন বাতাস, এটীকে দেখ্‌বার যো নেই—কিন্তু স্পর্শ করেই বুঝ্‌তে হ'বে যে এ বড় বেজায় জিনিস। মিলের তর্কে এটার ঠাঁই হইতে পারে, কিন্তু এমন জিনিস ঢের আছে, যে-গুলি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের কোনটীর দ্বারাই অনুভব করা অত সহজ নয়, তবে ধ্যানের দ্বারা সে শক্তি লাভ করতে হয়। ইংরেজীতে এইগুলিকে Transcendental—ইন্দ্রিয়ের অতীত বলে। এই যেমন ভগবান্‌কে পেতে হলে, এই অতীন্দ্রিয়ের দরকার—সাদামাঠা চোখ দিয়ে দেখা যায় না। তাই কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর!' এই বিশ্বাস—Faith তর্কের বিষয়ীভূত নয়, তাই [illegible]র ভগবানে আস্থা ছিল না। তিনি [illegible] মানতেন্ না। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের দিকে চেয়ে মহাকবি শেক্সপীয়র খুব জোর গলায় অতি-পণ্ডিতদের হেঁকে বলে ছিলেন, 'There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক কিছু আছে যা মস্ত পাণ্ডিত্যে ধরা দেয় না। এই সব বুঝতে হলে, মনের বিশ্বাসকে আমল দিতে হয় এবং তাই নিয়ে ধ্যানশক্তি বাড়াতে হয়, তবে না—দেখার জিনিস দেখা যায়। মিল তর্কের ঝড় ছুটিয়ে শেষ জীবনে মৃত্যু শয্যায় যখন দেখেন যে আর জীবন যেতে বাকী নাই, তখন তাঁর বন্ধুদের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ভগবান নামক কোন জিনিষ তোমরা বিশ্বাস কর?'

সকলেই বলে উঠলেন, 'খুব—মিল, জীবন থাকতে তুমিও বলে যাও, ভগবান্ আছেন, ক্ষমা পাবে।' তখন তর্ক-রাজ শেষ নিঃশ্বাস টানতে টানতে বল্লেন, 'If there be any God, let Him forgive me.' ভগবান বলে কোন জীব থাকলে, আমায় ক্ষমা করুন। মৃত্যুর গলা টিপানি খেয়ে তাঁর মুখে এই নাম বাহির হল। কিছুদিন আগে বিলাতে একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল, সে হচ্চে এক নাস্তিকের সভা,—An assembly of atheists. তাঁরা সব দলে দলে ভিড়ে সভাপতি ঠিক করে এক বিরাট সভার আয়োজন করে ফেল্‌লেন, সভা-মঞ্চের দুরে, প্লাকার্ডে বড় বড় অক্ষরে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

লেখা হইল, 'God is no where' অর্থাৎ ভগবান্ কোথাও নাই—এ একটা মস্ত ভুল! তারপর ভোট লওয়া আরম্ভ হল, সকলেই ভোট দিলেন ঈশ্বর নাই—যিনি সভাপতি তিনি দরাজ গলায় সে বিল পাশ করলেন। আর অমনি ঘোষণা হল ঈশ্বর থাকলেও পেন্সন পেলেন। ঠিক এমন সময় এক নাস্তিকের ছোট একটী ছেলে সেই posterএর (লেখার দিকে) দিকে চেয়ে আপনমনে জোর গলায় পড়ে গেল, 'God is now here' শোনবামাত্র সকল নাস্তিকের পিলা চম্‌কাইয়া উঠিল, তারা সব চেয়ে আশ্চর্য্য দেখলে nowhere কথাটা কেমন ভাবে যেন কার যাদু-মন্ত্রে 'now here' হয়ে উঠেছে! ক্ষুদ্র শিশুর কণ্ঠে ভগবান্ জানিয়ে দিলেন 'ওরে তোরা বল্‌ছিস্ আমি নেই—এই দেখ্ কথার ফাঁকেই আমি আছি!' তখন আর যায় কোথা! সোরগোল পড়ে গেল, মুখপোড়া বানরের মত সেই নাস্তিকের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় সরে পড়ল। কেহ খোঁজ পাইল না। Trench পাঞ্চে এক চিত্র বাহির হইয়াছে, এটি অবশ্য ব্যঙ্গ চিত্র। একটা বিলাতী গোরাকে এক মিশনারী বললেন, 'খ্রীষ্টকে কি ভুলিয়াছ?' সেনা হাকিল—'Christ! what is his number!—বটে খ্রীষ্ট কই চিনিনা—সে অবশ্যই আমার মত সৈন্য হবে, তার নম্বর কত?' নাস্তিকতা কিরূপে চারিদিক আপন পাথায় ঢাকছে, এ তারই একটা ইঙ্গিতমাত্র।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

A Short History and Ethnonology of the Cultivating Pods, by Mahendranath Karan. Published by Rai Charan Sardar B. L. Diamond Harbour. Dt. 24 Parganas. Kuntaline Press. Calcutta. Price Superior edition Re 1/-; Popular edition annas ten only.

এই গ্রন্থখানিতে পোদ জাতির উৎপত্তি, তাঁহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী ও তাঁহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। শাস্ত্র ও ইতিহাস-গ্রন্থাদি হইতে গ্রন্থকার নিপুণ ও নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, পোদ জাতি পৌণ্ড্রক জাতিরই নামান্তর,—ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ জাতি হইতে তাহার উৎপত্তি নহে। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, মনু-সংহিতা, মৎস্যপুরাণ, কুলচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থে পোদ বা পৌণ্ড্রক জাতির উল্লেখ আছে। অনার্য্য পোদ জাতির সহিত cultivating পোদ জাতির কোন সম্পর্ক নাই; বাঙলা দেশের ধীবর জাতি এই অনার্য্য পোদ জাতির অন্তর্ভুক্ত। পোদ জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহারের সহিত প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির বিস্তর সোসাদৃশ্য আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেখকের সত্যানুসন্ধিৎসা এবং তথ্য-সংগ্রহে বিপুল উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। বাঙলার জাতীয় ইতিহাসে এ গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। বাঙলা ভাষায় এ গ্রন্থের প্রচার বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থের ভাষাও বেশ সহজ ও চিত্তগ্রাহী হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, হুকিয়া ষ্ট্রীট, কাস্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২৭ [১০ম সংখ্যা

অবতার

৮

কৌণ্ট চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহার চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, শয়ন-কক্ষটি বেশ আরামের কিন্তু খুব সাদাসিধা; চিতা-চর্ম্মের অনুকরণে তৈয়ারি একটা গালিচায় ঘরের মেজে আচ্ছাদিত; বুটিদার পরদায় জান্‌লা-দরজা ঢাকা, কাপড়ের মত দেখিতে সমান-চোস্ত সবুজ কাগজে ঘরের দেয়াল মণ্ডিত। কালো মার্ব্বেলে গঠিত একটা ঘড়ি—তাহার উপরে একটা রূপার পুত্তলিকা—তাহার সহিত দুইটা রূপার প্রাচীন পেয়ালা—এই সমস্ত জিনিসে সাদা মার্ব্বেল-গঠিত চিমনী-স্থান বিভূষিত ছিল। একটা পুরাতন ভিনিশিয়ান আর্শি যাহা কৌণ্ট গতরাত্রে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এক বৃদ্ধার চিত্র—সম্ভবত অক্টেভের জননী—ইহাই এই ঘরের একমাত্র অলঙ্কার; ঘরটি বিষণ্ণ ও কঠোর-দর্শন; আসবাবের মধ্যে একটা পালঙ্ক, চিমনীর নিকটে স্থাপিত একটা আরাম-কেদারা, পুস্তক ও কাগজ-পত্রে আচ্ছাদিত একটা দেরাজ-ওয়ালা টেবিল। এই সকল আস্‌বাব আরামপ্রদ হইলেও লাবিন্‌স্কি-প্রাসাদের জম্‌কালো আস্‌বাবের কাছ দিয়াও যায় না।

চাকর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল:—

"মহাশয়, উঠেছেন কি?" এই কথা বলিয়া, তাহার মনিবের প্রাতঃকালের পরিচ্ছদ,—একটা রঙ্গিন কামিজ, একটা ফ্ল্যানেলের প্যান্‌টালুন, একটা আলখাল্লা—কৌণ্টকে দিল। পরের কাপড় পরিতে তাঁর নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও,—অগত্যা ঐ কাপড় তাঁকে পরিতে হইল; কেননা, না পরিলে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হয়। শয্যা হইতে নামিবার সময় একটা কালো ভাল্লুকের চাম্‌ড়ার পা-পোষের উপর পা রাখিলেন।

তাঁহার সাজসজ্জা শীঘ্রই হইয়া গেল। কৌণ্ট অক্টেভ নহে—এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া চাকর কৌণ্টের বস্ত্র

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

পরিধানে সাহায্য করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ সময় মহাশয় প্রাতর্ভোজন করতে ইচ্ছা করেন?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন!—

"নিত্য-নিয়মিত সময়ে"। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় পাছে কোন বাধা ঘটে, এই মনে করিয়া তাঁহার এই দৈহিক পরিবর্ত্তনটা আপাতত মানিয়া লইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

চাকর প্রস্থান করিলে, অক্টেভ-দেহ-ওলাফ, সংবাদ-পত্রাদির সহিত যে দুইখানা চিঠি তাঁর জন্য আনা হইয়াছিল, সেই দুইখানা চিঠি খুলিলেন; আশা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে, তাঁহার রূপান্তর সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর পাইবেন। প্রথম চিঠিতে কতকগুলি প্রণয়-ভৎর্সনা আছে—লেখিকা আক্ষেপ করিয়াছেন, কেন বিনা কারণে তাঁর বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করা হইল। দ্বিতীয় পত্রে, অক্টেভের উকিল অক্টেভকে পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন, ভাড়ার হিসাবে তিনি যে টাকা পাইবেন, তাহার চতুর্থাংশ যেন কোন লভ্যজনক কাজে খাটান হয়। কৌণ্ট মনে মনে ভাবিলেন:—

"তাই নাকি, তবে ত দেখছি যার শরীরে আমি বাস করছি—সেই অক্টেভ নামে এক-জন লোক বাস্তবিকই আছে; সে তা হলে একটা কাল্পনিক জীব নয়। তার ঘর-বাড়ী আছে, তার বন্ধুবান্ধব আছে, তার উকীল আছে, টাকা খাটাবার মূলধন আছে—একজন ভদ্রলোক গৃহস্থের যা থাকা উচিত সবই আছে, কিন্তু আমার ত বেশ মনে হচ্চে—আমিই কৌণ্ট ওলাফ লাবিন্স্কি।"

কিন্তু আর্শিতে একবার কটাক্ষপাত করিবামাত্র তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাঁহার এই মতের সঙ্গে কাহারও মিল হইবে না—কেহই ইহাতে সায় দিবে না। কি উজ্জ্বল দিবা-লোকে, কি অস্পষ্ট দীপালোকে, ঐ আর্শিতে তো একই মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে!

বাড়ীর কোথায় কি আছে কৌণ্ট দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিলেন। একটা দেরাজের মধ্যে দেখিতে পাইলেন,—ভূসম্পত্তির কতকগুলা দলিল, দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ; আর এক দেরাজের মধ্যে রুষীয় চামড়ার পত্র-পেটিকা—একটা সাঙ্কেতিক তালা দিয়া তাহা বন্ধ রহিয়াছে।

চাকর ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইয়া দিল আলফ্রেড সাহেব আসিয়াছেন। চাকরের উত্তর আনিবার অপেক্ষা না করিয়াই অক্টেভের পুরাতন বন্ধু, ঘনিষ্ঠতার ভাব ঘরের ভিতর হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল। আগন্তুক যুবাপুরুষ, মুখে একটা সরল দিল্-খোলা ভাব। যুবক কৌণ্টকে বলিল:—

"এই যে অক্টেভ, আজকাল কি করচ বলদিকি? তোমার হ'ল কি? তুমি বেঁচে আছ না মরেছ? কোথাও তোমাকে ত আর দেখা যায় না; তোমাকে বিশ্বলেও ত উত্তর পাওয়া যায় না। দেখ আমার অভিমান করাই উচিত। তবে কিনা, বন্ধুত্বে আমি মান-অভিমানের বড়-একটা ধার ধারিনে, তাই তোমাকে দেখতে এলাম। বল কি হে! এক কালেজের সহপাঠী তুমি, তোমাকে কিনা এই অন্ধকেরে ঘরে বিষণ্ণ হয়ে মরতে দেব! তুমি পীড়িত—তোমার কিছুই ভাল লাগে না—এ সমস্তই

তোমার ভাই কল্পনা। তোমার মন ভাল করবার জন্যে, তোমাকে একটু আমোদ দেবার জন্যে তোমাকে জোর ক'রে একটা ভোজের নেমন্তন্নে নিয়ে যাব। সেখানে আজ খুব আমোদ-প্রমোদ হবে। আমাদের বন্ধু "রাম্বো"ও আসবে।"

অর্দ্ধ দুঃখ প্রকাশ ও অর্দ্ধ পরিহাসের স্বরে অক্টেভের বন্ধু অক্টেভ-দেহ কৌণ্টের নিকট এইরূপ বাক্য-বিন্যাস করিয়া ইংরেজের ধরণে কৌণ্টের হাত ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিল। কৌণ্ট তাঁহার জীবন-নাট্যে এখন যে ভূমিকাটি তাঁর অভিনয় করিতে হইবে, তাহার মর্ম্ম-ভাবটী ঠিক ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন:—

"না ভাই, অন্য দিনের চেয়েও আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানে যাবার মত আমার মনের অবস্থা নয়। আমি গিয়ে তোমাদেরও বিষণ্ণ করে তুলব,—তোমাদের আমোদের ব্যাঘাত হবে।"

আলফ্রেড দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাস্তবিক তোমাকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্চে, মুখে ভয়ানক একটা ক্লান্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আচ্ছা, তা হ'লে একটু ভাল হও—আর এক সময়ে দেখা যাবে। আমি তবে পালাই। বড় দেরী হয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়ত তিন ডজন কাঁচা "অয়ষ্টার" ও এক বোতল শোতেরন্ সুরা পার হয়ে গেছে। "রাম্বো" তোমাকে না দেখতে পেয়ে খুবই দুঃখিত হবে।"

এই আগন্তুকের আগমনে কৌণ্টের বিষণ্ণতা আরও বৃদ্ধি পাইল;—চাকরটা তাঁকেই মনিব ঠাওরাইয়াছে। অ্যালফ্রেড তাঁকেই বন্ধু ভাবিয়াছে। এখন কেবল একটা প্রমাণ বাকী। এই চূড়ান্ত প্রমাণ। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। একটি মহিলা—মাথায়-বাঁধা ফিতায় জরির সুতা মিশ্রিত এবং দেয়ালে যে-ছবিখানি ঝুলিতেছে সেই ছবির সঙ্গে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য—ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া কৌণ্টকে বলিলেন:—

"কেমন আছিস্‌রে অক্টেভ! চাকর বল্‌ছিল, কাল তুই খুব দেরীতে বাড়ী এসেছিস্; আর ভয়ানক দুর্ব্বল অবস্থায়। বাছা, তোর শরীরের একটু যত্ন করিস্। কেন তুই এত বিষণ্ণ হয়ে থাকিস্, আমার কাছে ত কিছুই খুলে বলিস্‌নে, তোকে দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।"

অক্টেভ-দেহ ওলাফ্ উত্তর করিলেন:

"ভয় নেই মা, ও কিছুই গুরুতর নয়; আজ আমি অনেকটা ভাল আছি।"

এই কথায় অক্টেভ-জননী আশ্বস্ত হইলেন। তিনি জানিতেন তাঁর পুত্র একাকী থাকিতে ভাল বাসে। বেশীক্ষণ কেহ তাহার নিকট থাকিয়া তার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিলে তাহার ভাল লাগে না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রস্থান করিলে, কৌণ্ট বলিয়া উঠিলেন, "আমি তবে নিশ্চয়ই অক্টেভ; অক্টেভের মা আমাকে চিন্‌তে পারলেন। তাঁর পুত্রের শরীরে এক অপরিচিত আত্মা বাস করচে—এটা ত তিনি মনে করলেন না। সম্ভবত চিরদিনের মতো আমাকে এই আবরণের মধ্যে বদ্ধ থাকতে হবে, অন্যের শরীরে আত্মা আবদ্ধ—আত্মার এ কি অদ্ভুত কারাগার!

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

তথাপি কৌন্ট ওলাফ লাবিন্স্কির অস্তিত্বকে, তাঁর কুলচিহ্নকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ঐশ্বর্য্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া, আর সামান্য এক গৃহস্থের অবস্থায় পরিণত হওয়া—এ বড়ই কঠিন। যে চামড়াটা এখন আমার গায়ে লগ্ন হয়ে আছে, সে চামড়াটা ছিঁড়ে একটি একটি করে, ওর প্রথম-অধিকারীকে আমি প্রত্যর্পণ করব। যদি আমি প্রাসাদে ফিরে যাই? না!—তাহলে অনর্থক একটা কেলেঙ্কারি হবে, দরোয়ান আমাকে দরজায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। আমি ত এখন রুগ্ন লোকের বস্ত্র পরে আছি। আমার দেহে এখন আর সে বল নাই। দেখা যাক্, অনুসন্ধান করা যাক, এই অক্টেভ কি-রকম করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত, আমার একটু জানা দরকার।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি সেই পোর্টফোলিওটা খুলিতে চেষ্টা করিলেন। ছুঁইবামাত্র হঠাৎ স্প্রিংটা খুলিয়া গেল; কৌন্ট উহার চামড়ার পকেট হইতে প্রথমে কতকগুলা কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন, উহা ঘন-নিবদ্ধ ও সূক্ষ্ম লেখায় কালো হইয়া গিয়াছে—তাহার পর একটা চৌকো চর্ম্ম-কাগজের উপর তত নিপুণ হাতের না হইলেও, কৌন্টেস্ প্রাস্কোভি-লাবিন্স্কার একটা পেন্সিলে আঁকা ছবি আঁকা রহিয়াছে—ছবিটা অবিকল তাঁর মত—দেখিলেই চেনা যায়।

এই আবিষ্কারে কৌন্ট একেবারে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বিস্ময়ের পরেই একটা ভীষণ ঈর্ষার আবেগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। কৌন্টেসের ছবি কেমন করিয়া এই অপরিচিত যুবকের গুপ্ত পত্র-পেটিকার মধ্যে আসিল? কোথা হইতে আসিল? কে চিত্র করিল? কে ইহাকে দিল? প্রাস্কোভি—যাঁকে তিনি দেবীর মত পূজা করেন, তিনি কিনা তাঁর স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া এই জঘন্য গুপ্ত-প্রেমে লিপ্ত হবেন? যে রমণীকে এতদিন তিনি নিষ্কলঙ্ক ভাবিয়া আসিয়াছেন সেই রমণীর প্রণয়ীর শরীরের মধ্যে তার স্বামী কি না এখন কয়েদী? না-জানি এ কার নিষ্ঠুর পরিহাস! পতি হইয়া শেষে কি আবার তাঁকে প্রণয়ী হইতে হইবে! এ কি ভীষণ দশা-বিপর্য্যয়! এ কি হাস্যজনক ওলট-পালট! পতি ও প্রণয়ী একাধারে!

এই সকল কথা তাঁর মাথার ভিতর গুন্ গুন্ করিতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁর বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি খুব জোর করিয়া আপনাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চাকর খবর দিল, আহার প্রস্তুত; তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ গুপ্ত পত্র-পেটিকাটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পত্রগুলা একপ্রকার মনস্তত্ত্বঘটিত দৈনিক-লিপি বলিলেও হয়—বিভিন্ন কালের লেখা। কখন বা লেখা হইয়াছে—কখন বা লেখা বন্ধ করা হইয়াছে। ইহার কতকগুলি টুক্‌রা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—কৌন্ট উদ্বেগপূর্ণ কৌতূহলের সহিত এইগুলা যেন গিলিতে লাগিলেন:—

"সে কখনই আমাকে ভালবাসবে না—কখনই না, কখনই না!

তার চোখের দৃষ্টি এমন কোমল, কিন্তু ঐ কোমল দৃষ্টির মধ্যে সেই নিষ্ঠুর কথাটি

আমি পাঠ করেছি—যার চেয়ে কঠোর কথা আর নাই—যে কথাটি কবি দান্তে তাঁর বিষাদপুরের তোরণ-দ্বারের উপর লিখে রেখেছেন,—"সব আশা ত্যাগ কর।" আমি কি করেছি যে ভগবান জীবন্ত অবস্থাতেই আমাকে নরক ভোগ করালেন? কাল, পরশু, চিরদিন এই একই ভাবে চল্‌বে! তারকামণ্ডলের মধ্যে পরস্পর পথ কাটাকাটি হতে পারে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে যোগ হয়ে পুটলি পাকিয়ে যেতে পারে, তবু আমার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

সেই রমণী আমার স্বপ্ন শূন্যে বিলীন করে দিয়েছে; এক ইঙ্গিতে আমার কল্পনার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে! যত মিথ্যা অসম্ভব সব একত্র হয়েও আমাকে একটা সুযোগ করে দিচ্চে না; ভাগ্যপাশায় কত লোকের কত ভাল ভাল দান পড়ছে—হায়! আমার অদৃষ্টে একটিও পড়ল না!"

"আমি হতভাগ্য, আমি বেশ জানি স্বর্গের দ্বারদেশে আমি মূঢ়ের মত বসে আছি, আমি নীরবে অশ্রুপাত করচি—উৎসের সহজ ধারার মত অবিরত চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরচে। আমার সে সাহস নেই যে এখান থেকে উঠে গিয়ে কোন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করি।"

"কখন কখন রাত্রে যখন নিদ্রা হয় না আমি প্রাস্কোভিকে ধ্যান করি; যদি নিদ্রা আসে,—প্রাস্কোভিকেই স্বপ্নে দেখি; আহা ফ্লরেন্স্ নগরে সেই বাগান-বাড়ীতে তাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! সেই শুভ্র পরিচ্ছদ, সেই সব কালো ফিতা—একাধারে চিত্ত-বিমোহন ও মরণ-শোক-সূচক! শুভ্রতা তাঁর জন্য, শোকের বর্ণটা আমার জন্য! কখন কখন ফিতাগুলা বাতাসে নড়ে গিয়ে ও একত্র মিলিত হয়ে সেই সাদা জমির উপর 'ক্রস' আকারে গড়ে উঠছিল; কোন অদৃশ্য আত্মা আমার হৃদয়ের মৃত্যু উপলক্ষে যেন খুব আস্তে আস্তে আমার অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করছিলেন।"

"কি অদৃষ্টের ফের! আমি ইস্তাম্বুলে যাব মনে করেছিলাম, যদি যেতাম তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা হত না। আমি ফ্লরেন্সে থেকে গেলাম,—তাঁকে দেখলাম,—আর সেই দেখাই আমার কাল হল।"

"আমার মরণ হলেই ভাল।—কিন্তু জীবিত থাকতে থাকতেই তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার নিঃশ্বাস যদি একটিবার মেশাতে পারি—ওঃ! সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! না, না, তাহলে আমি যে নরকস্থ হব। পরলোকে গিয়ে তাঁর ভালবাসা পাব—সে সম্ভাবনাও তাহলে আর থাকবে না। তাহলে সেখানে আমাদের পৃথক হয়ে থাকতে হবে। তিনি থাকবেন স্বর্গে—আমি থাকব নরকে। একথা মনে হলে, একেবারে অভি-ভূত হয়ে পড়তে হয়!"

"যে রমণী আমাকে ভালবাসে না, সেই রমণীকেই আমায় ভালবাসতে হবে, এ কেমন কথা? কত কত রূপসী এর আগে তাদের মধুর মুখের মধুরতম হাসি ঢেলে আমার হৃদয় হরণ করবার চেষ্টা করেচে, কিন্তু তবুও আমার হৃদয় হারাই নি। আর এখন? আহা সে কি ভাগ্যবান, যে তার পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ফলে এই নিরুপমা ললনার প্রেম লাভ করে ধন্য হয়েছে।"

আর বেশী পাঠ করা অনাবশ্যক।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

প্রাস্কোভির পেন্‌সিলে আঁকা ছবিখানি প্রথম দেখিয়া কৌণ্টের মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, এই গোপনীয় লেখাগুলার প্রথম দুই ছত্র পড়িবামাত্র সে সন্দেহ দূর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রেমাসক্ত যুবক তাঁর ছবি আঁকিয়া নিরাশ প্রেমের অক্লান্ত ধৈর্য্য সহকারে আসলের অভাবে এই নকলকেই তার প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র গুহ্য দেবালয়টিতে "ম্যাডোনা"কে স্থাপনা করিয়া, নতজানু হইয়া, নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারই পূজা-অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

"কিন্তু যদি এই অক্টেভ, আমার শরীর অপহরণ করিবার জন্য, এবং আমার শরীর ধারণ করিয়া প্রাস্কোভির প্রেম আকর্ষণ করিবার জন্য সয়তানের সঙ্গে চুক্তি করিয়া থাকে?"

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ অনুমান অসম্ভব মনে করিয়া এই অনুমানটিকে কৌণ্ট শীঘ্রই মন হইতে দূর করিয়া দিলেন।

এমন অসম্ভব কথা তিনি বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন মনে করিয়া তিনি একটু হাসিলেন। তাঁর চাকর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছিল, ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও তাহাই আহার করিলেন। আহারান্তে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গাড়ী আনিতে বলিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তার বালথাজার-শেরবোনোর গৃহে উপনীত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই সব কক্ষের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন যেখানে গত রাত্রে কৌণ্ট ওলাফ লাবিন্‌স্কির নামেই প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখান হইতে যখন বাহির হইয়া আসেন তখন সকলেই তাঁকে অক্টেভের নামে অভিবাদন করিয়াছিল। ডাক্তার তাঁর দস্তুরমত, পিছন দিকের শেষ-কামরায় পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। হাতের মধ্যে পা-টা রাখিয়া গভীর চিন্তায় যেন নিমগ্ন।

কৌণ্টের পদশব্দ শুনিয়া ডাক্তার মাথা উঠাইলেন।

"আঃ! অক্টেভ, তুমি? আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম; কিন্তু রোগী আপনা হতেই ডাক্তারকে দেখতে এল—এটা শুভ লক্ষণ বল্‌তে হবে।"

কৌণ্ট বলিলেন—

—"অক্টেভ, অক্টেভ, অক্টেভ—ক্রমাগতই অক্টেভ! আমার এমন রাগ ধরছে—আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব!" তাহার পর বাহুর উপর বাহু রাখিয়া ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং ভীষণভাবে এক দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

"বালথাজার-শেরবোনো, আপনি ত বেশ জানেন আমি অক্টেভ নই, আমি কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্‌স্কি। আপনিই গত রাত্রে এই-খানেই যাদুমন্ত্রে আমার শরীর অপহরণ করেছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে হাঃ! হাঃ! করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; হাসিতে হাসিতে বালিসের উপর উল্টিয়া পড়িলেন এবং হাস্যাবেগ থামাইতে পারিতেছেন না এইভাবে দুইহাতে পার্শ্বদেশ ধরিয়া রহিলেন।

"ডাক্তার তোমার এই আনন্দের উচ্ছ্বাসটা একটু কমিয়ে আনো, নৈলে পরে হয় ত অনুতাপ করতে হবে। আমি সত্য বল্‌চি, পরিহাস করিচে নে।"

—"তাহলে ত আরো খারাপ, আরো খারাপ! ওর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে, আমি তোমার চেতনশক্তি-হীনতা ও অকারণ বিষণ্ণতার চিকিৎসা করছিলাম, সেটা ঠিক নয়। আর কিছু না, এখন কেবল চিকিৎসাটা বদ্‌লাতে হবে, এইমাত্র!"

কৌণ্ট, শেরবোনোর দিকে অগ্রসর হইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—"তোমার গলা টিপে কেন যে তোমাকে এখনো মারি নি, আশ্চর্য্য!"

কৌণ্টের এই ভয়-প্রদর্শনে ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিলেন; তারপর, একটা ছোট ছুরিপাতের ছড়ির প্রান্তভাগ কৌণ্টের হাতে ছোঁয়াইলেন;—কৌণ্টের শরীরে একটা ভয়ানক ঝাঁকানি লাগিল, মনে হইলে যেন তাঁর হাতটা ভাঙ্গিয়া গেছে। ডাক্তার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিবার মত একটা ঠাণ্ডা রকমের স্থির দৃষ্টি কৌণ্টের উপর নিক্ষেপ করিলেন,—সে দৃষ্টিতে পাগলরা বশীভূত হয়, সে দৃষ্টিতে সিংহ একেবারেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। এইরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার তাঁকে বলিলেন:—

"দেখ, রোগী অবাধ্য হয়ে বেঁকে দাঁড়ালে, তাকে সিধা করবার উপায়ও আমাদের হাতে আছে। বাড়ী ফিরে যাও, বাড়ী গিয়ে স্নান কর,—অতি-উত্তেজনায় মাথা গরম হয়েছে,—ঠাণ্ডা হবে।"

কৌণ্ট বৈদ্যুতিক আঘাতে বিহ্বল হইয়া ডাক্তারের গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁর সংশয় ও ভাবনা আরো বাড়িল।

এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য, ডাক্তার B.....এর বাড়ী গিয়া উপনীত হইলেন। এবং ঐ প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে বলিলেন:—

"আমি এক অদ্ভুত বিভ্রম-বিকারে আক্রান্ত হয়েছি, আমি যখন আয়নায় মুখ দেখি, তখন আমার মুখের স্বাভাবিক অবয়ব-গুলো তাতে দেখতে পাই না। আমি যে সব পদার্থে বেষ্টিত থাকতাম সে সব পদার্থ বদ্‌লে গেছে। এখন আমার ঘরের দেয়াল-গুলোও আমি চিন্‌তে পারি না, আস্‌বাব-গুলোও চিন্‌তে পারি না! আমার মনে হয় আমি যেন সে আমি নই—আমি যেন অন্য লোক।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"তুমি আপনাকে কি-রকম দেখ বল দেখি? ভ্রমটা চোখ থেকেও উৎপন্ন হতে পারে, মস্তিষ্ক থেকেও উৎপন্ন হতে পারে।"

—"আমি দেখতে পাই, আমার চুল কালো, চোখ নীল, মুখ ফ্যাকাশে,—আর দাড়িতে ঘেরা।"

—"ছাড়-পত্রে যে রকম কোন লোকের মুখের বর্ণনা থাকে, তোমার বর্ণনাটা তার চেয়ে সঠিক দেখ্‌চি।

তোমার বুদ্ধি-বিভ্রমও হয় নি, দৃষ্টি-বিভ্রমও হয় নি। তুমি আসলে যা,—ঠিক্ তাই আছ।"

"কিন্তু না,—তা নয়! আমার আসলে কটা চুল, চোখ কালো, রং রৌদ্র-দগ্ধ আর আমার গোঁফ হঙ্গারী দেশের লোকের মত সরু করে' ছাঁটা।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন:—"এইখানেই বুদ্ধি-বৃত্তির একটু বদল দেখছি।"

—"যাই হোক ডাক্তার, আমি পাগল নই, বেশ জেনো। একটুও না।"

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—"নিশ্চয়ই। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে তারাই কেবল আমার এখানে আসে। একটু দৈহিক শ্রান্তি, একটু অতিরিক্ত পড়াশুনা, কিংবা অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ থেকে এই অসুখটা ঘটেছে। তুমি ভুল করচ আসলে,—তুমি যা চোখে দেখছ তাই বাস্তব আর যা মনে ভাবচ—সেইটেই কাল্পনিক। ফর্সা রঙের দেশে তুমি আপনাকে শামলা দেখছ; কিন্তু তুমি আসলে শামলা, কল্পনা করচ তুমি ফর্সা।"

"—সে যাই হোক্, আমি যে লাবিন্স্কির কৌণ্ট ওলাফ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—কিন্তু কাল-থেকে সবাই আমাকে সাবিলের অক্টেভ বল্‌চে।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—

"—আমি ত ঠিক্ তাই বলেছিলাম। তুমি আসলে সাবিলের অক্টেভ, কিন্তু মনে করচ তুমি লাবিনস্কির কৌণ্ট। আমার স্মরণ হচ্ছে, আমি কৌণ্টকে দেখেছি :—তাঁর রং ত ফর্সা। আয়নায় যে তুমি অন্য মুখ দেখ্‌তে পাও, তার কারণ ত বেশ বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই আসল মুখের সঙ্গে, তোমার মনোগত কাল্পনিক মুখের মিল হচ্ছে না বলেই তুমি বিস্মিত হয়েছ।—এই কথাটা বিবেচনা করে' দেখ না, সবাই তোমাকে অক্টেভ বল্‌চে; সুতরাং তোমার নিজের বিশ্বাসের কথায় ভুলো না। দিন কতক আমার এইখানে থাক :—স্নান, বিশ্রাম, বড় বড় গাছের তলায় পায়চারি করলেই তোমার এই মনের বিকারটা কেটে যাবে।"

কৌণ্ট মস্তক অবনত করিয়া, অস্বীকার করিলেন, আবার তিনি আসিবেন।

ডাক্তারের কথায় অগত্যা বিশ্বাস করিলেন।

কৌণ্ট তাঁর আবাস-গৃহে ফিরিয়া গিয়া হঠাৎ দেখিলেন, টেবিলের উপর, কৌণ্টেস্ লেবিন্স্কার নিমন্ত্রণ-পত্র রহিয়াছে—ঐ পত্রখানাই পূর্ব্বে অক্টেভ ডাক্তার শেরবোনোকে দেখাইয়াছিল। কৌণ্ট বলিয়া উঠিলেন :—

"এই যাদু-কবচটা সঙ্গে নিলেই, তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারবে!" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতীত

তবলা বোল্‌হীন, সেতার হারা তার,
ভাঙ্গিয়া পড়ে আছে হয়নি সারা আর।
বাদক বুড়া আহা, শকতি অবসান,
বাহিরে বসে আছে সুমুখে উপাধান।
দূরেতে শানায়েতে আলাপে ছায়ানট,
মানসে খুলে তার মোহিনী মায়াপট।
ভাসিয়া গেছে যাহা গিয়াছে অতি দূর,
নিকটে আনে আজি সে যা চেনা সুর।

ভুলে সে যায় ধরা ভুলে সে যায় কাল,
আপন উপাধানে ধীরে সে দেয় তাল
রাগিণী উঠেনাক, বুকেতে পায় লয়,
প্রাণের বেলাভূমে ভাবের ঢেউ বয়।
কেহবা হাসে দেখে, কেহবা চলে যায়,
কেহ সে সুর স্মরি 'আহা' 'হা' বলে যায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

জানিবিঘা শিলালিপি

পূর্ব্ব ইতিহাস—১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে, পাটনা কলেজের "প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির" এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমান্ মহেন্দ্র প্রসাদ সিংহ নামক জনৈক ছাত্র গয়া-জিলার জানিবিঘা গ্রামে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপির উল্লেখ করেন। "সরস্বতী" নামক হিন্দী মাসিক পত্রের ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত হরিরামচন্দ্র দিবেকর নামক লেখক শিলালিপির প্রতিলিপি সহ এক প্রবন্ধে উহার পরিচয় প্রদান করেন। শিলালিপির এই প্রতিলিপি দেখিয়া ও বিবরণ পাঠ করিয়া যাহাতে উহা পাটনা যাদুঘরে আনীত হয় তজ্জন্য যাদুঘরের অধ্যক্ষের নিকট আমি আবেদন করি। তিনি গয়ার কালেক্টরের নিকট এ জন্য পত্র দিলে শিলালিপির স্বত্বাধিকারী, জানিবিঘার মোহন্ত মহাশয় উহা দিতে অস্বীকার করেন। কিছু দিন পরে আমি যাদুঘরের কিউরেটর বা অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত ছাত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁহার পিতৃদেব উক্ত মোহন্ত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু মুকুটধারী সিংহ উহা প্রদানের জন্য মোহন্ত মহাশয়কে অনুরোধ করেন। মুকুটধারী বাবুর অনুরোধে মোহন্ত মহাশয় উহা দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু কিউরেটর স্বয়ং উপস্থিত না হইলে উহা দিবেন না বলায়, আমি জানিবিঘায় যাইয়া উহা গয়ায় আনয়ন করিয়া গয়ার কালেক্টরের হস্তে উহা পাটনায় প্রেরণের জন্য রাখিয়া আসি। দুঃখের বিষয় রেলযোগে প্রেরণকালে কালেক্টরের নাজীরের অসাবধানতায় উহা দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। তবে সুখের বিষয় এই যে, উহা দ্বিধা বিভক্ত হইলেও লিপিপাঠের কোন অসুবিধা হয় নাই।

স্থান-পরিচয়—জানিবিঘা গ্রাম গয়া জিলায় অবস্থিত এবং উহা বোধ-গয়ার ছয়-মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম জানিবিঘার মোহন্তগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিপুষ্ট। প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে বংশী ভারতী নামক মুলতান-বাসী এক ব্যক্তি অযোধ্যায় আসিয়া নাগেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বুধরাম ভারতী নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন—এই বুধরাম ভারতীই জানিবিঘা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা।

বুধরাম তীর্থ-পর্য্যটনকালে বোধগয়ায় আগমন করেন। তথা হইতে তিনি বোধগয়ার পাঁচমাইল পূর্ব্বে অবস্থিত গাফা নামক গ্রামে গমন করেন। গাফা তখন গভীর জঙ্গলাবৃত ছিল। বুধরাম তপশ্চারণ-মানসে এই জঙ্গলে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের উর্দ্ধ-তলে বাস করিতেন—তাঁহার শিষ্যবৃন্দ গৃহ-তলে থাকিতেন। প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, বুধরাম ভারতীর তপশ্চারণ-কালে জানুমিয়া নামে এক জিন (মুসলমান ভূত) তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্য্যাতন করিতেন। বুধরাম এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিজেই একদিন গৃহের তলদেশে জিনের জন্য অপেক্ষা করিতে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

লাগিলেন এবং জিনের আবির্ভাব হইলে মন্ত্রবলে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। ফলে জিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তত্রস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বুধরামের জন্য মঠ নির্ম্মাণ করিল; বুধরামও জানুমিয়ার নামানুসারে গ্রামের নাম রাখিলেন জানিবিঘা।

বুধরাম ভারতী বোধগয়ার তৎকালীন মোহন্ত রামনীল মোহান্তের মন্ত্রগুরু ছিলেন। টিকারীর তৎকালীন মহারাজ মিত্রজিৎ সিংহও ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া বুধরামকে কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করেন। মিত্রজিৎ সিংহ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে টিকারী-অধিপতি ছিলেন—জানিবিঘা গ্রাম এ হিসাবে আধুনিক।

শিলালিপি-আবিষ্কার—আলোচ্য শিলালিপিখানির এক প্রান্ত মৃত্তিকার বাহিরে অনেকদিন হইতেই দেখা যাইত; কিন্তু, গ্রামবাসিগণের কুসংস্কার-হেতু উহা আর খনন করা হয় নাই। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে মোহন্ত মহাশয় স্বয়ং উহা খুঁড়িয়া বাহির করেন। সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বোল্লিখিত "সরস্বতী" পত্রিকায় উহার বিবরণ প্রকাশিত হয়; তৎপরে শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল ও ৺ হরনন্দন পাণ্ডে শিলালিপি সম্বন্ধে বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির ১৯১৮ সালের পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তাঁহারা শিলালিপি প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এম-এ, মহাশয় "ইণ্ডিয়ান য়্যান্টিকোয়ারী"তে ১৯১৯ সালের এপ্রিলমাসে শিলালিপির পুনরালোচনা করেন।

দুঃখের বিষয়, বঙ্গবিজয় সম্বন্ধীয় ভ্রমাপনোদন সম্বন্ধে এই শিলালিপিখানি অত্যাবশ্যক হইলেও, বঙ্গভাষায় কেহ ইহার আলোচনা করেন নাই। আমরা অব্যবসায়ী,—এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদগণের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তবে অষ্টাদশ অশ্বারোহী যে বঙ্গবিজয় করেন নাই, এ দুরপনেয় কলঙ্ক-অপনোদনে যে এই শিলালিপি যথেষ্ট সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিলালিপির মূল্য—'সরস্বতীর' লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক হিসাবে ইহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু তাঁহার এই মন্তব্য পরবর্ত্তী লেখকগণ স্বীকার করেন নাই। মিনহাজ লিখিত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনীর সহিত এই শিলালিপির যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। এই শিলালিপি হইতে প্রমাণ হয় যে, বিহারের অনেকাংশেও সেন-রাজগণের আধিপত্য ছিল এবং বক্তিয়ার-পুত্র মুহম্মদের তথা-কথিত বঙ্গ-বিজয়ের পরেও সেনবংশীয় বুদ্ধসেন-পুত্র জয়সেন গয়ার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে রাজত্ব করিতেন।

শিলালিপি—যে প্রস্তরখানিতে শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, উহা ৩ফিট ১৯ ইঞ্চি উচ্চ, ৯৯ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৬ইঞ্চি পুরু। শিলালিপি ৯৯ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ইহার প্রস্থ ৭½। লিপির ঊর্দ্ধে বোধিবৃক্ষের তলদেশে বজ্রাসনাসীন ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বুদ্ধ-মূর্ত্তি। লিপির তলদেশে, ঐ বংশীয় কেহ শিলালিপির শাসনস্থ আদেশ অমান্য করিলে গর্দ্ধভের ঔরসে ও শূকরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, এইরূপ অভিশাপের কথা চিত্রিত রহিয়াছে। সাক্ষীস্বরূপ বুদ্ধমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে সূর্য্য ও চন্দ্র অঙ্কিত রহিয়াছেন।

বজ্রাসন ও তৎসংলগ্ন মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য সপ্তঘাটার অন্তর্গত কৌট্‌খল গ্রাম সিংহলদেশীয় ভিক্ষু মঙ্গলস্বামীকে বুদ্ধসেন পুত্র, পিথিপতি রাজা জয়সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল শিলালিপির ইহাই উক্তি।

প্রথম পংক্তি। ওং স্বস্তি॥ শ্রীমন্মহাবোধিপুরং পুরাণং পরম্পং

দ্বিতীয় পংক্তি। রীণং নিয়তং জিনানাং। হ্যধ্বস্থিতানাং স্থিতি—

তৃতীয় পংক্তি। রস্তি যত্র সংবোধয়ে— বোধিরোস্তলং চ॥

চতুর্থ পংক্তি। শ্রীমদ্বজ্রাসনায় স্থলজল সহিতঃ কোট্‌খ।

পঞ্চম পংক্তি। লা গ্রাম এষ আচন্দ্রার্কং প্রদত্তস্তদধিবসত—

ষষ্ঠ পংক্তি। যে মঙ্গল স্বামিভিক্ষোঃ। হস্তে শ্রীসিংঘলস্ত

সপ্তম পংক্তি। ত্রিপিটক-কৃতিনঃ শাসনীকৃত্য রাজ্ঞা নির্ব্বা—

অষ্টম পংক্তি। জঃ সপ্তঘট্টে হলকরকলিতো বুদ্ধসেনাত্মজে—

নবম পংক্তি। (ন)। দত্তো দানমিমং গ্রামং জয়সেন স ভূপতিঃ।

দশম পংক্তি। (পী) থী পতিরূবাচেদমাচার্য্যঃ সত্যবাগ্বচঃ। বংশে

একাদশ পংক্তি। মদীয়ে যদি কোপিভূপঃ শিষ্টোঽথবা দুষ্টত—

দ্বাদশ পংক্তি। রো বিনষ্টঃ। ব্যতিক্রমং চাত্র করোতি তস্য তা—

ত্রয়োদশ পংক্তি। তঃ খরঃ সূকরিকা চ মাতা॥ লক্ষ্মণ—

চতুর্দ্দশ পংক্তি। সেনস্যাতীতরাজ্য সং ৮৩ কার্ত্তিক শুদি।*

শিলালিপির অর্থ—ওং স্বস্তি। আমি

---

* শিলালিপি-পাঠে মত-ভেদ।

প্রথম পংক্তি। মহাবোধিপুরং—হরনন্দন পাণ্ডে মহাবোধিপ্রদং পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। পুরং পাঠই সঙ্গত। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ও দিবেকর মহাশয়দ্বয় পুরংই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রদং করিলে অর্থের বিভিন্নতা হয়। পরম্পং—পরম্পা হইবে।

দ্বিতীয় পংক্তি। দিবেকর মহাশয় হ্যধ্বস্থিতানাম্—স্থলে তুষ্টস্থিতানাং করিয়াছেন। তুষ্টি পাঠ আদৌ গ্রহণীয় নহে। দিবেকর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি এই শব্দের পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই।

পঞ্চম পংক্তি—'লা' কে দিবেকর মহাশয় শা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অষ্টম পংক্তি—তো স্থলে উক্ত লেখক তাদ করিয়াছেন।

নবম পংক্তি—দত্তো মূল শিলালিপিতে দত্তো থাকিলেও ইহা দত্তা হওয়া উচিত ছিল। দিবেকর মহাশয় তা পাঠ করিয়াছেন।

দশম পংক্তি—দিবেকর মহাশয় আচার্য্যং করিয়াছেন।

একাদশ পংক্তি—পাণ্ডে মহাশয় ভপঃ লিখিয়াছেন—ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়া মনে হয়।

ত্রয়োদশ পংক্তি—শিলালিপিতে সূকরিকা রহিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পংক্তি—পাণ্ডে মহাশয় রাজ্য করিয়াছেন। শিলালিপিতে রাজ্যে রহিয়াছে। শিলালিপিতে শুদি রহিয়াছে, শুদি হইবে।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সম্মানীয়, প্রাচীন, পূজনীয়, যে মহাবোধিপুরে, সম্বোধিকামী জিনগণ সর্ব্বদা বোধিবৃক্ষমূলে বাস করেন, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করি। সপ্তঘাটার অন্তর্গত স্থলজল ও হলকর সহিত এই কোটখলা গ্রাম, বিনা সঙ্কোচে যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবেন, ততদিন সম্মানীয় বজ্রাসনে, ত্রিপিটকাভিজ্ঞ সিংহল দেশীয় ভিক্ষু মঙ্গলস্বামীর বাসের জন্য, বুদ্ধসেন পুত্র, রাজা কর্ত্তৃক শাসনদ্বারা প্রদত্ত হইল। সত্যবাদী ও পিথিপতি, আচার্য্য রাজা জয়সেন এই গ্রাম প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "আমার বংশের শিষ্ট, দুষ্ট অথবা দুশ্চরিত্র কোন রাজা ইহার ব্যতিক্রম করিলে তাহার পিতা অশ্বতর ও মাতা শূকরী হইবে।*

লক্ষ্মণ সেনাব্দের ৮৩ বৎসরের কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চদশ দিবসে (ইহা প্রদত্ত হইল)।

শিলালিপি-পাঠে মত-ভেদ—আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইতি-পূর্ব্বে তিনজনে এই লিপি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনজনেরই মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আমরা পাদটীকায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

শিলালিপি-উল্লিখিত কয়েকটী শব্দ—

সপ্তঘট্ট—জানিবিঘার মোহন্ত মহাশয়কে আমি এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে যে সকল ঘাটোয়াল আছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তীর্থযাত্রিগণের নিরুপদ্রবতার জন্য দায়ী থাকিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন। "ঘাটী আগলাইবার" কথা এখনও বঙ্গদেশে শোনা যায়। মোহান্ত মহাশয়ের মতে, বোধগয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থানে আসিবার সাতটী পথ ছিল এবং তাহা হইতেই এই স্থান এই নামে অভিহিত হইয়াছে।

ওয়ারেন্ নামক আমেরিকাবাসী লেখক লিখিয়াছেন যে, সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণের সময়ে, বুদ্ধ নিরঞ্জনে অবগাহন করেন। এই স্থান 'সপ্ততীর্থ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ("Buddhism in Translation") এই সপ্ত-তীর্থের সহিত সপ্তঘটের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে কি?

পীথী-পতি—পীথী যে কোন্ জনপদ ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার ষ্টেনকোনো মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পিঠপুরকে পীথী বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে বর্ত্তমান ত্রিহুত বলিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "A place named Pithaghatta is mentioned in an ancient geographical work called *Desavali*...The addition of the word ghatta probably means that this place was situated on the Ganges." (*The Palas of Bengal*: Page 87) অর্থাৎ দেশাবলী নামক একখানি প্রাচীন ভৌগোলিক গ্রন্থে পিথঘাট্টা নামক একটী স্থানের উল্লেখ আছে। ঘাট্টা শব্দ-সংযোগে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থান গঙ্গাকূলে অবস্থিত ছিল। এ সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বিক্রম-শিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুরের অন্তর্গত

সহলগী নামক স্থানে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সেই স্থানটী "পাথরঘাটা" বলিয়া পরিচিত। এই "পাথরঘাটার" সহিত দেশাবলী-উল্লিখিত "পিথঘাট্টা"র কোন সম্পর্ক আছে কি না? পাথরঘাটা গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। পিথঘাটার অপভ্রংশ কি পাথরঘাটা হইতে পারে না? বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পালরাজ-গণের যথেষ্ট সংস্রব ছিল। ৺হরনন্দন পাণ্ডে মহাশয় পিথিকে মগধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই মনে হয়।

বুদ্ধসেন পুত্র রাজা জয়সেন—বুদ্ধসেনের পূর্ব্বে রাজা শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত জয়শোয়াল মনে করিয়াছিলেন যে বুদ্ধসেন রাজত্ব করেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, বুদ্ধ-সেনও সেনবংশীয় নরপতি ছিলেন।

উপসংহার—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিলালিপির পাঠোদ্ধারে আমরা অব্যবসায়ী, কিন্তু বঙ্গ-ইতিহাস-সম্বন্ধীয় এই শিলালিপি-খানি অত্যাবশ্যক এবং ইহা তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকগণের গোচরীভূত হইলেও, গভীর দুঃখের বিষয় যে বঙ্গভাষায় এ-সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই। আমাদের ভরসা আছে যে শিলালিপি-পাঠে কৃতী রাখাল দাস বাবু ইহার বিস্তৃত ও সঠিক পাঠোদ্ধার করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ছোট মা

সুব্রত বৌদির পা ছুঁইয়া বলিল,—না বৌদি, আমি ও কথা শুন্‌বনা। আমার সনৎকে মেরেছে, আর আমি চুপ করে থাক্‌ব! এই জন্যেই বৌদি, আমি বলেছিলাম—আমার ও-সব ছাইয়ে আর কাজ নেই! দুধ দিয়ে সাপ পুষে সে সাপের কামড় নিজেকেই খেতে হবে, এ আমি আগেই জান্‌তাম—। বৌদি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—ছি ঠাকুরপো, ও কথা বলো না। ছোট বউ শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে! সে যে কি ভাল,—তুমি তাহলে এখনো তাকে চিন্‌তে পারোনি!

সুব্রত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, ঢের হয়েছে বৌদি! নিজে থেকে ঘরে সাপ ঢুকিয়েছ কি না, তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা তুমি শুনতে চাও না—তা হলে তুমিই যে তার দায়ী হবে!

বৌদি সুব্রতর হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—না ঠাকুরপো, ও কথা তুমি কিছুতেই বল্‌তে পাবে না। এমন লক্ষ্মীর প্রতিমাকে—কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সনৎকুমার আসিয়া বলিল,—বাবা, এই দেখ, ছোট মা আজকে আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছে—আমার দু' গাল থেঁতো করে দিয়েছে।

সুব্রত হুঙ্কার দিয়া বলিল,—বেরো আমার সুমুখ থেকে। লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, সব সময়ে দুষ্টুমি করবি—কে তোকে আদর কর্‌বে!...

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

কি পাজী! এখনো সুমুখে দাঁড়িয়ে রইলি! যাবিনে? দাঁড়া—বলিয়া সুব্রত এমন সজোরে সনৎকুমারের গাল টিপিয়া ধরিল যে বালকের করুণ ক্রন্দনে ঘর যেন ফাটিয়া গেল!

বৌদি সুব্রতকে কোলে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া বলিলেন,—তুমি ক্ষেপেছ ঠাকুরপো!

সুব্রত তীব্র কণ্ঠে বলিল,—দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষেছি, তাই তার প্রতিফল পাচ্ছি!

ছোট বৌ নিকটেই আসিয়াছিল; ঘোম্‌টাটা ঈষৎ টানিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল,—বাস্তু সাপকে শুধু পুষতে হয় না'ত—একে পূজো দিতেও হয় যে!

সুব্রত আরো রাগিয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া,—হ্যাঁ, ঠিকই ত, ঠিকই ত করেছি! গাল থেঁতো করে দিয়েছে বলে আমার সাম্‌নে ও কাঁদ্‌তে এল কেন! বেশ করেছি, তার গাল আরও থেঁতো করে দিয়েছি! সে জানে না, তার মা যেমন তার বিমাতা, তার বাপও তার তেমনি শত্রু!

ছোট বৌ আসিয়া অতি সহজ স্বাভাবিক স্বরে বলিল,—এখন আবার শুলে কেন? জল খাবার খাও'সে, ওঠ।

সুব্রত গম্ভীরভাবে উঠিয়া বসিল। ছোট বৌ জল খাবারের রেকাবিখানা টেবিলে রাখিয়া বলিল,—যাই আমি। নীচেয় আমার মেলা কাজ আছে। ছোট বৌ চলিয়া গেল।

সুব্রত বলিয়া উঠিল,—যাবে বৈ কি, ছোট বৌ! এখন কি সনতের মা আছে যে বসে বসে খাওয়াবে! ততক্ষণ তোমার সংসারের দাস-দাসীর উপর খানিক প্রভুত্ব করা চল্‌বে! তারপর চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল,—ছোট লোকের মেয়ে! আমার সনৎ থাকতে তুমি কর্‌বে তাদের উপর প্রভুত্ব!

ছোট বৌ আসিয়া দিদির পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—ঐ কথাটা,দিদি, আর একবার বল, একবারটি—তোমার পায়ে পড়ি! বলিয়া হাসিয়া সে বড়বৌয়ের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। বড় বৌ তার গালটা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—আমি তোর হয়ে অত লাগি কেন, জানিস্, ছোট বৌ? পান্তা ভাত আর চচ্চড়ি দিয়ে একটা সাপ পুষে তোর ভাগের সমস্ত খাটা আমরা নিজেই আত্মসাৎ করচি।

এমন সময় দুখে আসিয়া বলিল,—ছোট মা, আমি সনৎকে এবার তোমার ছেলে বলে কিছু বল্‌লাম না কিন্তু! সে আমার লাঠিটা নিয়ে রাঙী কুকুরটাকে মার্‌তে গিয়ে কেন সেটা ভেঙ্গে দিলে! ছোট বৌ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল,—কে বলেছে রে দুখে, সনৎ আমার ছেলে? আমি ত এই সেদিন তোদের বাড়ী এলাম, তোদের চোখের সাম্‌নেই সনতের আপন মা মরে গেল! তুই তাকে যত পারিস্,মারিস্—কথাটা বলিয়াই ছোট বৌ দেখিল, সনৎ চোরের মত নিঃশব্দে পলাইতেছে—দেখিয়া ছোট বৌ একরকম লাফাইয়াই তার হাত দু'খানি ধরিয়া সিংহনাদে বলিল,—দুষ্টু ছেলে, যাবি—যাবি, দুখের সঙ্গে ঝিয়ের ছেলের সঙ্গে আর খেলা কর্‌তে? এত করে বলেও তোর হায়া হল না! এই সেদিন এত করে মার্‌লুম! আবার আজ সেই কাজ! এই বলিয়াই সনতের পিঠে গুম্ করিয়া এমন একটা কিল মারিল যে সনৎ—মা গো বলিয়া বসিয়া পড়িল। ছোট

বৌ গর্জ্জন করিয়া বলিল—মা থাকলে কি তোর এত খোয়ার হয় রে ছুঁচো! মাকে তোর ডাক্‌বার হয়েছে কি! তাকে বরং আমিই ডাক্‌ব—কি তার এত শত্রুতা করেছিলুম যে চলে গিয়ে আমার এই মাথার উপর এক মহা কর্ত্তব্যের বোঝা চাপায় সে! এত কি তার বাদ সেধেছিলুম যে—তুই যাবি বয়ে, যা—আমি তা' নিয়ে খুন-সুটি করে মর্‌তে যাই কেন! বড় বৌ আগাইয়া আসিয়া ছল ছল চোখে ছোট বৌয়ের চিবুকখানি ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ছোট বৌ, তোর হাতে সনৎ পড়্‌বে, সনতের মা—সতী সাবিত্রী বুঝি তা জান্‌তে পেরেছিল—তাই সে নিশ্চিন্তে অত শীঘ্র মায়ার সংসার থেকে সরে যেতে পেরেছে!

হঠাৎ এমন সময় সুব্রত সেখানে আসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল,—দুখে, তোর ছোট মা ত ঠিক কথাই বলেছে। কেন, এত দিনও কি জান্‌তিস্ নে তুই নচ্ছার, যে তোর ছোটমা সনতের নিজের মা নয়! তাই তার কাছে তুই ছেলের আবদারের নালিশ কর্‌তে গেছিস্? যা—আমি তোকে একটা আমার লাঠি দেব এখন।

দুখে বাবুর একটা ভাল লাঠি পাইবে শুনিয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল। সুব্রত তখন তপ্ত কণ্ঠে বলিল,—এই ত চাই! পাপ যখন করেছি—তার প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে বৈকি! বিধাতার তা হলে আমার দিকে মোটেই দৃষ্টি নেই বলব যে! ভাল কাজ করে তার সুফল লাভ করে যখন শান্তি পাই, তখন বুঝি, ঈশ্বর আছেন। আর মন্দ কাজ করে যদি তার কুফল ভোগ না করি, তাহলে মনে সন্দেহ হবে, হয়ত মিথ্যাই আমি ত্যাজ্য পুত্র—তাই মন্দের দিকে বয়ে গেলেও ভগবান তা' ভ্রূক্ষেপ করেন না। বড় বৌ আসিয়া বলিলেন,—ভাই, সেই জন্যেই ত ছোট বৌ আমাদের বড় আদরের বউ! ছোট বৌ চায় সনৎকে একটি হীরের টুক্‌রো কর্‌তে! দুখের সঙ্গে খেলা করা নিয়ে ত এই দু'দিন হল, সে সনৎকে মেরে তুলো-ধোনা করে দিলে। আবার তাই! চোখের সাম্‌নে সনৎকে মন্দের দিকে একচুল এগুতে দেখলেই ছোট বৌ খড়্গ-হস্ত হয়! এটা কি সে মন্দ করে সনতের!

সুব্রত বলিল,—হয়েছে বৌদি! তুমি ছোট বৌকে নিয়ে এসেছ, তুমিই তাকে নিয়ে থাক! আয় রে, আয়—সনৎ তখন সেই দিকেই আসিতেছিল—সুব্রত সনৎকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল—কেন,বড়বৌ, তুমি ত সে সময় উপস্থিতই ছিলে। আর আজ তার এত বড় আস্পর্দ্ধা হল!—কেন, এটা মনে মনে পুষে রেখেও কি তার মনস্কামনা সিদ্ধ হত না,—তাই সে স্পষ্ট করে আজ সনৎকে শুনিয়ে দিলে যে সে সনতের আপন-মা নয়! তাই ভাল, বড়বৌ—সনৎকে নিয়ে আমি তার আপন মার কাছে চলে যাই!

ছোট বৌ চীৎকার করিয়া বলিল,—কেন, তাকে আমি বকেছি, মেরেছি, তাই তাকে নিয়ে চলে যাওয়া হল। দিদি, তুমি অমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে! কেন—আমার কি তাকে বক্‌বার-মার্‌বার কোন অধিকার নেই! দুখের গায়ে ত আমি এক-দিনও হাত তুলিনি! তুমিই বল, দিদি, যদি কোনদিন তোমার উপর কোন অপরাধ করে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

থাকি, ক্ষমা কর! জোর করে যদি কোনদিন কোন কথা বলে থাকি, মার্জ্জনা কর।

বড় বৌ বলিলেন,—ছোট বউ, ও যাবে কোথায়? সনৎকে তোমার এখনি আবার নিয়ে এল বলে! সনৎ তোমার ছাড়া আর কাকেও জানে না যে বোন্!

ছোট বৌ কয়দিনে নরম হইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল,—দিদি, তুমি তাকে এনে দাও, একবারটি এনে দাও, আমি তাকে আর কিছু বল্‌ব না! সত্যি বলচি। বড় বৌ মৃদু হাসিলেন। ছোট বৌ হঠাৎ পরক্ষণেই চেঁচাইয়া বলিল,—না, কেন! যে চলে গিয়েছে, তাকে জন্মের মত যেতে দাও! চোখের সাম্‌নে সে বয়ে যাবে, আর আমি শক্রর মত দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ব! কেন, আমি কি তার পর!—তাকে কিছু বল্‌তে দেবে না! এবার আসুক দেখি সে—এমন করে পা ভেঙ্গে দেব যে সে কেমন 'তু' করে ডাকলেই ওঁর সঙ্গে—ছোট বৌ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—সনৎ আমার ছেলে,—সাধ্য কার তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়! দিদি, তুমি তাকে বলে এসো—শীগ্‌গির আস্‌বে ত আসুক, নইলে মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দেব!

বড় বৌ আঁচল দিয়া চক্ষুপ্রান্ত মুছিলেন, মনে মনে বলিলেন,—সনৎ, আজ তুই চেয়ে দেখ্—তুই কেমন মা পেয়েছিস্! তারপর ছোট বৌয়ের হাত দু'খানি ধরিয়া তিনি বলিলেন,—ছোট বৌ, এই তিন দিন না যেতে যেতেই এমন অধীর হয়ে পড়েছ!

ছোট বৌ সগর্জ্জনে বলিল,—বয়ে গেছে! শত্তুর গিয়েছে, ভালই হয়েছে—আমি ত তাই-ই চেয়েছিলুম। তিন দিন! তি যুগের মত যাক্ সে—আমি ত তাই চাচ্ছি বড় বৌ অধীর হইয়া উঠিলেন, দেখলে —ছোট বৌয়ের সেই মুখ, সেই হাসি,— যা' এই কয় বৎসর হইতেই তি দেখিয়া আসিতেছেন—সে মুখ, সে হা যেন কেমন হইয়া আসিতেছে! বড় বলিলেন,—কেন, কি হয়েছে ছোট বৌ সনৎকে সে নিয়ে যেতে পার্‌লে—আর তু তা সহ্য কর্‌তে পর্‌বে না! বিমাতা হয়ে এ দরদ কেন! কিসের জন্যে!

বাঘ যেমন তার শিকারের উপ লাফাইয়া পড়ে, ছোট বৌও তেমনি বড় বৌয়ে পায়ের উপর পড়িয়া বলিল,—দিদি, এ কথ তোমরা যদি এতদিন মনে মনে ঘনিয়ে রেখে ত আমাকে ঘুণাক্ষরে একদিনও তা জান্‌ দাওনি কেন! ওঃ, এতক্ষণে বুঝেচি তাই ত, আমি বিমাতা বই নই! কি জানি যদি আমি সনৎকে মেরে ফেলি,—তাই তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল!

বড় বৌ অপ্রতিভ হইলেন! ছোট বৌ বলিল,—হ্যাঁ, আমি যা' শুন্‌তে চেয়েছিলুম— তাই—এতদিনে তাই তুমি শুনিয়ে দিলে!— বলিয়া সবেগে পাশের ঘরে গিয়া খাটের উপরে বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িল!

* * *

সুব্রত ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—ছোট বৌ, অমন অভিমানী হয়ো না! এই দেখ, সনৎ—তাকে তুমি মেরেছিলে—তাকে তুমি বকেছিলে—তবু সে তোমারই কাছে ছুটে এসেছে। ওঠো, তাকে তুমি একবারটি কোলে নাও! সনৎ বলিল,—নাও, ছোট মা,

মাকে নাও! বাবা আমাকে মাসীর বাড়ী য়ে গিয়েছিল, সেখানে আমাকে বিকেলে তে দিত না! দাও ছোট মা, আমার বেনচুস বার করে দাও! ছোট বৌয়ের খন বিকার! চীৎকার করিয়া সে বলিয়া ঠিল,—আমি বিমাতা বই নই। ভালই য়েছে তাকে নিয়ে গিয়েছে! দেখি, ক তার আপন-মার কাছে আগে যায়।

সুব্রত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—ছোট বৌ, দেখ, সনৎ ক্ষিদে পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নৎ বলিল,—মা ওঠো, বাক্স থেকে খাবার াও! মাথার শিওরে বাক্স ছিল, ডালা খুলিয়া নৎ বলিল,—বাবা দেখ, ছোট মা আমার ন্যে কেমন সাজিয়ে রেখেছে! মাসিমা কত রাখে না। সুব্রত একটু ঝুঁকিয়া াক্সর মধ্যে দেখিল, থরে থরে খাবার ল সাজান, ভাঁজে ভাঁজে সনতের পোষাক-পরিচ্ছদ, থাকে থাকে সনতের বির বই! সে এ বাক্স কোন দিন লিয়া দেখে নাই; চীৎকার করিয়া লিয়া উঠিল,—ছোট বৌ, একদিনও কোন কথা শোন নি—কল্‌কাতার মামীর বাড়ীতে প্রতি রবিবারে তোমার যাওয়া কেউ রোধ করতে পারে নি! তুমি সখানে যেজন্যে যেতে, এখন বুঝচি। লিকাতা হইতে আনীত সেই লেবেনচুস্ সেই বাদাম, বিস্কুট—সেই ছবির বই— াজেশ্বর বাবু প্রতি সপ্তাহে যাত্রা বাড়ী াসিয়া সনতের জন্য সনতের ছোটমার বরাতী ছোট বৌয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেগুলির দিকে তাকাইয়া টস্ টস্ করিয়া সুব্রতর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সনৎ বলিল,—ছোট মা, বাবা আমার খাবারে চোখ দিচ্ছে! বাবা, তুমি অমন করে চোখ দিও না! ছোট মা আমায় রোজ ঘরের মধ্যে আমাকে কত কি খাইয়ে মুখ মুছিয়ে মাথায় ফুঁ দিয়ে তবে বাইরে যেতে দিত। কাউকে বল্‌তে বারণ কর্‌ত; খাবারের দিকে চাইলে লোকে চোখ দেবে, বল্‌ত। বাবা, কেন মার অসুখ হয়েছে বলে তুমি চোখ দিচ্ছ! দাঁড়াও, মা আগে ভাল হোক্, মাকে আমি বলে দেব।

শেষ রাত্রে পাগলের মত চীৎকার করিয়া সুব্রত বলিল,—ডাক্তার বাবু, কেন তবে এতদিন পড়েছিলে, যদি একটি প্রাণই না ফিরিয়ে দিতে পার!—আমার সব দেব ডাক্তার বাবু—বড়বৌকে সুব্রতর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

শ্মশান হইতে কেঁধোরা যখন "বল হরি—হরিবোল" বলিয়া বাড়ী ফিরিল, সনৎ তখন ছুটিয়া আসিয়া বড়বৌয়ের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুব্রত সেখানে আসিয়া বলিল,—বড়বৌ, মাথা নীচু করে কেঁদে কেঁদে ও কি প্রার্থনা কর্‌ছে, বড় বৌ? চোখ মুছিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বড় বৌ বলিলেন,—"কি করছে! বোধ হয়, ও প্রাণ-পণে হরিকে ডেকে বল্‌ছে,—হরি, জন্ম-জন্মান্তরে যেন ছোট মার মতই মা পাই।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

লেখার ইতিহাস

আমাদের দেশে লেখার প্রচার কবে হইল, ইহা এক মহা সমস্যারূপে ইতিহাস-মহালকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, আজও সে সমস্যা পূরণ হয় নাই। না হইবার কারণও বিস্তর রহিয়াছে। পৃথিবীর মানদণ্ড-স্বরূপ এই ভারতীয় সভ্যতা কখন্ প্রথম অত্যুন্নত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার খবর এ যুগে পৌঁছিবে কি করিয়া? কবি কালিদাস হিমালয়কে বলিয়াছেন,'পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ.' এই মান-দণ্ডের সৃষ্টি, রচনা, ক্রম-বর্দ্ধন ও ক্রমোন্নতি একমাত্র বিশ্ব-রচয়িতার নেত্রে উদ্ভাসিত, এই আদিম সৃষ্টিরহস্য মানুষের চক্ষে অনবগুণ্ঠিত হইয়া ধরা দিতে আসিবে, ইহা কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে কি? হিমাদ্রি-অঙ্গের জঙ্ঘা কখন কাঞ্চন-জঙ্ঘার স্বর্ণ-উত্তরীয়ে আবৃত হইল, কখন নভোমণ্ডল-স্পর্শী শির এভারেষ্টে পরিণত হইল, এই সব জল্পনা বড় সুন্দর কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইবার অপেক্ষা রাখে না। আমার ইচ্ছা হয়, সমস্ত ভারতীয় সভ্যতাকে একটী পূর্ণ অবয়ব দিই—ইচ্ছা হয় ভারতের সাধনাকে একটী যুগযুগান্তের স্থায়ী মূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলি। তাহা হইলে দেখিতে পাইব যেমন আকাশের মেঘ-রাজ্য গলিয়া বিশ্ব-বর্ষণে ঢলিয়া পড়ে, সেইরূপ আমাদের ভারতীয় সভ্যতা গলিয়া গলিয়া হিমাদ্রির হিমধারায় ক্ষীর হইয়া, কাল-পুরুষ হিমালয়ের জটাজুটের মধ্যে অলকানন্দা-রূপে ঠাঁই পাইয়াছে—এ অলকানন্দার ধারা জাহ্নবী-মুখে আজও আর্য্যাবর্ত্তের বুক ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর বয়স মাথায় করিয়া হিমালয়ের জটায় পাক ধরিয়াছে। আমাদের শিয়রে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর আদিম পুরুষ আজ মৌন নির্ব্বাক। ভারতীয় সভ্যতা মন্থনদণ্ডে মথিত করিয়া হিমালয় আপনার মাঝে সব সংযোগ করিয়াছেন, তার পর সমাধিস্থ হইয়াছেন। সমাধি-মগ্ন ভোলানাথ সংসার ভুলিয়াছেন, তাই আমরা ভুলের অন্ধ-গুহায় অলি-গলি ঘুরিয়া বৃথাই গণ্ড খুঁজিয়া মরিতেছি!

বাস্তবিক ভারতীয় সভ্যতার জন্মকাহিনী পৃথিবীর প্রথম বয়সের সঙ্গে বিজড়িত, সেই সভ্যতার স্তর পর্ব্বতের স্তরের মত এই বিংশ শতাব্দীর বুক পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। ইতিহাস-রাজ্যে সে স্তর-পরম্পরার খোঁজ যে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে মিলে নাই, তাহা না বলিলেও চলে; যতটুকু মিলিয়াছে, ততটুকুও বিচ্ছিন্ন। ছিন্ন মালিকাদাম হইতে কয়েকটী ফুলের সন্ধান মিলিয়াছে, বাকীগুলি কোথায় রহিয়াছে তাহার কিনারা হয় নাই; যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহারও শ্রেণী-সজ্জা জানা যায় নাই। কোন্ ফুলের পর কোন্ ফুল আসিবে, বেলীর সঙ্গে চম্পক বসিবে, না চম্পকের সঙ্গে অপরাজিতা বর্ণ-বৈচিত্র্যে বাহার ফুটাইবে, এত খুঁটিনাটি পরিপাটিরূপে জানিবার সুযোগ কোথায়? কালের মহা তরঙ্গ হইতে যে ফুলদল পাওয়া গিয়াছে তাহাই যথেষ্ট, এই সভ্যতার ফুলসাজ লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে বিধি-ব্যবস্থা অনেকদিন

চলিয়াছে। ভারতীয় সাধনার যদিও পুঁথি মিলিয়াছে, কলম মিলে নাই, কালির ত আভাসও পাওয়া যায় না, কাগজের তথ্য ত একেবারেই অজ্ঞাত! তাই বলিতেছিলাম, অনেক স্তর আঁখির অগোচরে রহিয়া গিয়াছে, অনেক ফুল সুতা ছিঁড়িয়া দৃষ্টি এড়াইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সুদূর অতীতের স্বপ্ন-লোকে এই সব ভাসিতে দিতে একান্ত নারাজ, কারণ ঐতিহাসিকের লক্ষ্য হইয়াছে প্রাচীনকে নবীনের ঘরে আনিয়া দেওয়া। ইতিহাস-লেখক চাহেন, অতীতের জীবনকে বর্ত্তমানের জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে, আদি স্রোতকে বর্ত্তমানের বুকে বহাইতে। ভগীরথ শিবের জটা হইতে গঙ্গা আনিয়া দেশ-দেশান্তরে নগরে কান্তারে সে সুরধুনী-স্রোত চিরতরে বহাইয়া লইয়া গিয়াছেন, ইতিহাস লেখক চাহেন অতীতের জীবন-ধারাকে তেমনি ভাবে মানব-হৃদয়ে ভাগীরথীর মত চির-স্রোতস্বিনী, চির-কল্লোলিনী করিতে। ঐতিহাসিকের এ স্বপ্ন বড় মধুর, কবিত্বময়! বেদের সভ্যতার খোঁজ পাওয়া গেল, বৈদিক যুগ-রচনার সাড়া পড়িয়া গেল, বেদের সমাজ অল্পে অল্পে ফুটিতে লাগিল। ভারতীয় সভ্যতার চিত্র-অঙ্কণে জর্ম্মণ গুরু পথ দেখাইলেন, ফরাসী ও ইংরাজের দেশেও এই আলোচনার ধুম পড়িয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত সে সভ্যতার এক অঙ্ক বই দুই অঙ্ক উদ্ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বাকি অঙ্কগুলি যবনিকার নিটোল বেষ্টনে অবলুপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সভ্যতার বিকাশ রচনার আতুর-ঘর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, রচনার ভিত্তি লেখার পদ্ধতি। মসী ও লেখনী এই লেখাপদ্ধতির যুগল সারথি আর রচনা-পত্র হইয়াছে রথ। সারথি-পরিচালিত রথ বেদের যুগে কেমন করিয়া চলিয়াছিল, তারপর কেমন করিয়া সেই লেখার রথ ব্রাহ্মণ ও দর্শনের যুগ বহিয়া বৌদ্ধ ভারতে আসিয়া উপনীত হয়, তাহার ইতিহাস কি উপকথার চেয়ে চিত্তাকর্ষক নয়? বৌদ্ধ-যুগ হইতে লেখনী সারথি হইয়া রথকে কোন্ পথে চালাইয়াছিল, ভারতের অঙ্গনে অঙ্গনে কোথায় সে রথ থামিয়াছিল, মৌর্য্য, অন্ধ্র, গুপ্ত সাম্রাজের উপর সে রথ কোন্ ছন্দে নৃত্য জুড়িয়াছিল, তাহা জানিবার ঔৎসুক্য কি আমাদের হয় না? সেই লেখার ইতিহাস-আলোচনার অবকাশ করিয়া লইব। লেখার সঙ্গে জ্ঞানবিকাশের পূর্ণ সম্বন্ধ, ইহা কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে?

লেখার ইতিহাস-আলোচনায় ঐতিহাসিকেরা সভ্যতার স্তর-পরম্পরা ধরিয়া বিচার-তর্ক করিবার সুযোগ পান নাই—কারণ বহু স্তর অদৃশ্য হইয়াছে, ভারতের ইতিহাস বৌদ্ধ যুগ হইতেই ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস নাই, কেবল beacon light এর মত সভ্যতার মুকুটমণি পুস্তকরাজি পাওয়া গিয়াছে। কাজেই বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ইতিহাস সম্বন্ধে কোন কথা বলা কঠিন এবং যতটুকু পারা যায় সেটুকুও অনুমান-সাধ্য। বেদের রচনা-কাল খৃঃ পূঃ ২০০০-১৫০০; এই সময়ে বেদ রচিত হয়। কিন্তু রচনা প্রণালী সম্বন্ধে এক মহা সমস্যা য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গকে পাইয়া বসিয়াছে। তাহার কারণ এই যে বেদের রচনা Revelation হইত, বাল্মীকির রামায়ণ রচনা-চিত্রের মত যে বৈদিক ঋষিরা আসনস্থ হইয়া দোয়াত কলম

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ও কালি এই ত্রয়ী সাহায্যে বেদ-ত্রয়ী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা মানিতে বাধ্য নহেন। শ্রুতি স্মৃতি, যাহা শ্রুতি যাহা শুনা গিয়াছে তাহাই স্মৃতিতে রাখিতে হইবে। ইহাই বেদমন্ত্রের মূল ও মন্ত্রের ব্যবহার ধারণা। এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না যে আধুনিক শিক্ষার মূল মন্ত্র 'লেখা পড়ার' মত অর্থাৎ লেখা ও পাঠ উভয়-সংযোগে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইবে, তখনও বিদ্যার্থীর জন্য হাতে খড়ি দিয়া কলমের সাহায্যে পড়িতে হইবে। পরন্তু গুরুর নিকট শিষ্য শুধু আবৃত্তি করিতে শিখিত। য়ুরোপীয় ধারণায় ইহাই বেদের যুগের 'লেখা পড়া', অর্থাৎ পড়া লেখা নহে। বেদ রচনা-অবধি স্মৃতি-গত থাকিয়া এক যুগ হইতে অপর যুগে চলিয়া যাইত, সে সময় লেখার রথ ছিল না, শুধু স্মৃতির বাহনে বেদের জ্ঞান-সমুদ্র মানব-শিশুর হৃদয়কন্দরে জাগিতে থাকিত। বৌদ্ধ-ইতি-হাসের নায়ক Rhys Davids এই লেখার অভ্যুদয়-কাল বৌদ্ধযুগে স্বভাবতঃই আনিয়া ফেলিতে চাহেন। তাঁহার Buddhist Indiaতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের যাহা কিছু গৌরবের, যাহা কিছু প্রশংসনীয় সকলই প্রায় বৌদ্ধ উত্থান-কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত। এই লেখার মূল বৌদ্ধ-যুগের সঙ্গে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এতটা pan-Buddhism সভ্যতার অপর স্তর-গুলিকে যে তিমিরে সে তিমিরেই রাখিয়া দেয় তাই আজিকালিকার দিনে বোধ হয় pan-Brahmanism-এর প্রয়োজন। কারণ বৌদ্ধ ঐতিহাসিকদের কৃপায় বৌদ্ধ ইতিহাস মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। Pan-Buddhism-এর ফলে আমরা অপূর্ব্ব সামগ্রী পাইয়াছি, এ মহারত্নের তুলনা হয় না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আলোর রথ যে দিন হইতে যে পর্য্যন্ত যে-যে দেশের উপর ছুটিয়া চলিয়া-ছিল, সে সময়ের ইতিহাস আলোক-দীপ্ত হইয়া আজ আমাদের নয়নের মণি হইয়াছে। ধন্য ঐতিহাসিকের বৌদ্ধ-ভক্তি! তাই বলিতেছিলাম, এবার pan-Brahmanism এর প্রয়োজন, তবেই আমরা হারামণি খুঁজিয়া পাইব। হারামণির অন্বেষণ জীবনের ব্রত করিয়া লইলে তবে ব্রতীর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, এবং সেই সফলতার দীপ্তিতে ভারত ইতিহাসের যে যে কোণে আলোক-পাত হইবে, সেই সেই অন্ধ জ্যোতি-রুদ্ভাসিত হইয়া পৃথিবীর বুকে একটা মহা আলোর বন্যা বহাইয়া তুলিবে।

বেদের যুগে কিরূপ লেখা-পদ্ধতি ছিল তাহা অনুমান করা সহজ-সাধ্য নয়। আজি কালিকার দিনে ইহা একরূপ ঠিক হইয়াছে যে বৈদিক যুগে Brahmi-script প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মী অক্ষরের সংখ্যা ও নমুনা বহু বিবেচনাধীন। প্রফেসার Buhler বলিয়াছেন, এই ব্রাহ্মীলিপিই ভারতীয় সভ্যতার মূল-বাহন, এই ব্রাহ্মী রথই সারথি-পরিচালিত হইয়া বেদের যুগ হইতে বরাবর বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল, তৎকালে সে রথ কতক সময় গতিহীন হইয়া আবার পূর্ণ বেগে ভার-তের নগরে প্রান্তরে ছুটিয়া চলিতে পারিয়া-ছিল। খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে এই ব্রাহ্মী লিপি রীতির এক মহা পরিবর্ত্তন আসিল, তাহার কথা বলিবার পূর্ব্বে লেখা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। Buhler এর মতে Brahmi script-এ 500 B. C. পর্য্যন্ত ২২টী অক্ষর

ছিল, সে অক্ষরের নমুনা এবং লিখন-প্রণালী কিরূপ তাহার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু স্থির যে ব্রাহ্মী রচনা বাম দিক হইতে ডাহিনে (left to right) চলিত, এই লিপি-পদ্ধতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। এখন কথা হইতেছে যে ২০০০ B.C. হইতে ৩০০ B.C. পর্য্যন্ত এই Brahmi script কোন্ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত? যদি এই script এর ব্যবহার হইত তবে লেখার ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল, বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ যে ধুয়া উঠিয়াছে স্মৃতি ভিন্ন শ্রুতির ঠাঁই ছিল না, লেখা-পত্রে সে শ্রুতির শব্দরাজি লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই, কারণ যাহা Revelation, তাহার Remem-brance ছাড়া গত্যন্তর আছে কি? শ্রুতির বাহন যদি স্মৃতিই হইল, তবে আর লেখ-পদ্ধতির কি প্রয়োজন? বাস্তবিক অক্ষরের রূপ না জানিয়া ভাষার কড়িকাঠের পরিচয় না জানিয়া বেদের মত গ্রন্থ স্থিতিশীল হইল কাহার উপর, বেদের গুরুগম্ভীর উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ছন্দ কণ্ঠ-বিহীন হইয়া কাহার উপর বাজিয়াছিল? কণ্ঠহীনের কি গান ফোটে? একটা কথা মনে পড়িতেছে, সহস্র সহস্র ঊর্ম্মির ন্যায় সহস্র সহস্র শব্দ লইয়া ভাষা-সমুদ্র উত্তাল নৃত্য করিবার অবকাশ পায়, সহস্র শব্দ যোজনা-দ্বারা ভাষার পিণাক বাণ সন্ধান করিয়া থাকে, কিন্তু অক্ষর বিহীন সে ভাষা হইলে ধনুর ছিলা কোথায় পাইব, সমুদ্রের বারি কোথা হইতে আসিবে? নিরক্ষর লোকে কি চিন্তা করিতে পারে না? পারে। কিন্তু সে কত crude form এ, নিরক্ষরের মুখে কি কথা নাই? আছে। কিন্তু সে কতক দায় সারা গোছের! বিশ্ব-রাগিণী লহরের পর লহর তুলিয়া অক্ষর-অনভিজ্ঞের কণ্ঠে খেলিবার অবকাশ পায় কি? আমাদের দেশের নিরক্ষর সমাজ যে শব্দ-সমূহের কারবার করিয়া থাকে ভাষায় যে লেনা-দেনা চালাইয়া থাকে, তাহার মূল ধন কি তাহারা আপনা হইতেই পাইয়াছে? বিশ্বাস হয় না! তাহারা অক্ষর-সমাজের সহিত মিশিয়া প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধে বদ্ধ থাকায় যে পরিমাণ শব্দ সরবরাহ করে, তাহা তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে বিত্ত রূপে বর্ত্তিয়া যায়। Cultured circle-এর ভাষায় আমদানি করিয়া নিরক্ষর পরিবার অক্ষরের অভাব বোধ করে না। তাই অক্ষর-অনভিজ্ঞ সমাজেও সুন্দর শব্দসমষ্টি পাওয়া যায়। যে দেশে নিরক্ষরের রাজত্ব, অক্ষরের লেশ মাত্রও নাই, এমন কুকি-নাগা রাজ্যে চিন্তা-স্রোত নাই; আছে কেবল বস্তু পরিচয়-জ্ঞান, তাহাও কত crude! এই বস্তু-জ্ঞান মাফিক অক্ষরবিহীন শব্দ দ্বারা বেদ-রচনা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য নয় কি? আর একটা কথা মনে জাগিতেছে যে, ভাষা-পন্থী, অক্ষর-পন্থী আমরা শৈশবে ভাষার অক্ষর পরিচয় না পাইয়া চিন্তা করিবার অধিকার কি পাই নাই? অবশ্যই পাইয়া-ছিলাম। কিন্তু যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা বস্তু-পরিচয় ছাড়া আর বড় বেশী কিছু বলিয়া ত মনে হয় না! বস্তু-তন্ত্র ছাড়া-ইয়া মহা-ভাবতন্ত্রের কথা মনে করিতে পারিতাম না, ইহা সত্য, কিন্তু এখন অক্ষর পরিচয় হইয়া অবধি অজ্ঞাতসারে কখন হইতে আমরা সেই বস্তুচিন্তা পর্য্যন্তও

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

অক্ষর সংযোগে করিতেছি, তাহা আমরা বলিতে পারিব না। ঠিক্ আমাদের শৈশব-নিরক্ষর চিন্তা যাহা বস্তুতে উপগত হয়, ভাবের রাজ্যের সীমানা মাড়াইতে একান্ত নারাজ. সেই অক্ষর-বিহীন চিন্তা চিরজীবন নিরক্ষরের উপর ভর করিয়া থাকে, মহা-ভাবতন্ত্রের তিল আস্বাদও তাহার নিজ হইতে করিবার অধিকার থাকে কি না সন্দেহ। কিন্তু বেদ কি? ইহা ত বস্তু-তন্ত্রের পুঁথি নয়, ইহা মহাভাবতন্ত্রের শব্দকল্পদ্রুম। এরূপ বেদ কি লেখা ব্যতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে? এই বেদের যুগ কি সাঁগরের ঢেউএর মত হঠাৎ বাণ ডাকিয়া আসিয়া পঞ্চনদের তীরে উদয় হইয়াছিল, না, এই যুগ গড়িয়া উঠিতে বহু দিনের সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল? প্রফেসার Buhler-প্রমুখ সুধীবর্গ এরূপ ধারণা করিতে যান নাই, কারণ তাঁহারা প্রমাণ লইয়া তবে কথা কহিবেন, প্রমাণ তাঁহাদের গুরু। Buhler ব্রাহ্মী লিপিকে national writing of India বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই script ২২টী অক্ষর লইয়া 500 B. C. পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এই সময়ে ব্রাহ্মী লিপির অক্ষর সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬টীতে পরিণত হয়। বাদ-বাকী অক্ষরগুলি কোথা হইতে আসিল ইহার তথ্য Prof. Buhler সর্ব্বপ্রথম বাহির করিয়া ভারতীয় লিপির ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় সংযোজনা করেন।

Northern Semitic বা Phœnician type-এ বিরচিত Mesa inscription হইতে এই অত্যাশ্চর্য্য লিপির প্রাথমিক ইতিহাস-সূত্র পাওয়া গিয়াছে। এই inscription Assyrian weight এর উপর লিখিত হয়। ইহার রচনার তারিখ 890 B. C.। Prof. Buhler দেখাইতেছেন যে সেই সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষীয় বণিক সম্প্রদায় বেবিলন ও এ্যাসিরিয়াতে বাণিজ্য-অভিলাষে যাতায়াত করিত, এবং সেই বাণিজ্য-যাত্রার অবকাশে তাহারা মেসোপটেমিয়ার পথে ফিরিত। এই প্রত্যাবর্ত্তন-পথে তাহারা যে লিপি-প্রথা Assyrian weightএ দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহার নমুনা এবং অন্যূন ২০টী অক্ষর লইয়া আসিয়া থাকিবে। ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় ৮০০ B. C. তে এই লিপি প্রথার সঙ্কেত ভারত-বর্ষে প্রচার করিয়া থাকিবে, এবং উহা হইতেই ভারত-ইতিহাসের লিপির অধ্যায় প্রথম সংযোজিত হইয়াছে। Prof. Buhler দেখাইতে গিয়াছেন যে Brahmi scriptএর সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬টী অক্ষরের মধ্যে ২৪টী অক্ষর Mesa inscriptionএর অক্ষরের মত, এবং ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে এই কয়টী Assyria হইতে ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে! ভারতবর্ষ এইরূপে ২৪টী অক্ষর আত্মসাৎ করিয়া লইল! খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দে বণিককুল-দ্বারা লিপি-প্রথা আনীত হইলেও, ইহা প্রায় 500 B. C. পর্য্যন্ত Brahmi Script এর অঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই; কিন্তু এই মিল ঘটিয়াছে, প্রায় 500 B. C. তে। Buhler আরও দেখাইতে গিয়াছেন যে-দুইটী script ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্তও চলিয়া আসিয়াছে, ইহার মধ্যে একটী Brahmi অপরটী Kharosthi, প্রথমটীর কথা এযাবৎ আলোচিত হইল, ইহার গতিবিধি ছিল উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্র, অবশ্য পত্র-চলনই মূল কেন্দ্র। দ্বিতীয়টি গান্ধার রাজ্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। Buhler বলিতে কসুর করেন নাই যে প্রথমোক্ত লিপি এদেশে দেনাপাওনা যুগের বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিত ছিল, তবে ইহার চলনে বড় বেশী জীবনী-শক্তির সঞ্চার তিনি দেখিতে পান নাই, কিন্তু শেষোক্ত লিপির সম্বন্ধে স্পষ্ট বলিয়াছেন, ইহা বেমালুম Assyria হইতে ধার করা। এ দুইটী script এর লিখন-পদ্ধতি বিভিন্ন—Brahmi লিপি বাম হইতে ডানে, আর Kharosthi ডান হইতে বামে। প্রথমটী অবিকল সংস্কৃত পদ্ধতি। দ্বিতীয়টি আরবী পদ্ধতি। Buhler বলিয়াছেন, শেষোক্ত লিপি শুধু গান্ধারেই প্রচলিত ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মী লিপি ভারতের শিরতাজ হইয়াছিল। তাঁহার মতে ইহা national script; কারণ এই ব্রাহ্মী হইতেই ভারতের ভাষা সমূহের প্রচলন ও সংগঠন হইয়াছিল। Kharosthi লিপির চেলা ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী, সিন্ধী, বাঙ্গলা, পালি এই সব ভাষার কৌস্তুভহার এক ব্রাহ্মীর অর্ণব-বক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। Prof. Buhlerএর পথে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক আসিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহারা Buhlerএর মত লইয়া টানাহিঁচড়া করিতে ছাড়েন নাই,—Isaac Taylor বলিতে চাহেন, ভারতীয় লিপিপ্রথা পুরাপরি আরব দেশের southern Semites হইতে ধার করা। Buhlerএর Northern Semites তাঁহার মনঃপূত হইল না। রয়েল এসিয়াটিক জর্ণালে (১৮৯৮)

Mr. Kennedy এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহার মূল মর্ম্ম এই যে, সৌরাষ্ট্রের এক বণিক-সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকালে বেবিলনের সহিত অবাধ বাণিজ্য চালাইত, টাইগ্রীস্ হইতে পশ্চিম-ভারতের সমুদ্র-উপকূল পর্য্যন্ত বাণিজ্য-পথ সুগঠিত ছিল, এই পথেই ভারতের সহিত কেল্‌ডিয়া প্রদেশের দেনাপাওনার কারবার চলিত। এই ব্যবসায়ের আমদানী-রপ্তানি সহযোগে বেবিলন রাজ্যের অক্ষর-লিপি পণ্যশালার মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছিল। যখন এ মাল আসিয়া ভারতের দ্বারে পৌঁছিল, তখনই লিপি-প্রথার সূচনা হইল। সম্ভবতঃ এই সব বণিক দ্রাবিড় জাতীয় হইবে, কারণ তাহারা যে-যে জিনিসের কারবার করিত, তাহাদের নাম সংস্কৃত বা পালি নহে, কিন্তু তামিল অভিধান খোঁজ করিলে ইহাদের সন্ধান মিলিতে পারে। কেনেডীর মত আবার Rhys Davids বদ্‌লাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতীয় লিপির মৌলিকতা বিষয়ে তিনিও সম্পূর্ণ সন্দিহান; পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের ন্যায় তিনিও দেখাইতে চাহেন যে ভারতবর্ষে এ প্রথার উদ্ভব হয় নাই, ভারতবর্ষ এতটা মৌলিক হইবে ইহা তাঁহার ধারণার বাহির্ভূত। Buhler হইতে Rhys-Davids পর্য্যন্ত সকলেই জানেন তিনহাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস এমনি ভাবে Semitic অক্ষর ও লিপি প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই লিপি-প্রথার সহিত তাল রাখিয়া লাটিন ভাষা গড়িয়া উঠিয়া অবশেষে মধ্যযুগে য়ুরোপীয় আধুনিক ভাষা-সমূহের জন্মদান করে; Semitic অক্ষর-জাতি হইতে-এতটা হইল, ভারতবর্ষ কি অমনি লিপি

সৃষ্টি করিয়া বসিল? Rhys Davids কিন্তু Southern Semites বা Northern Semites, ইহাদের কাহাকেও ভারতীয় লিপির সহিত গ্রথিত করিতে চাহেন না, তাঁহার মতে ভারতীয় লিপির সূত্রপাত হইয়াছে বেবিলনের আদিম অধিবাসী Akkadian জাতি হইতে। তাঁহার মতে এই Akkadian হইতেই বেবিলন লিপি-প্রথার আভাস পাইয়াছিল। কাযেই দেখা যাইতেছে যে অত-বড় বেবিলন জাতিরও উহা গড়া সম্পত্তি নহে। তিনি বলেন যে ভারতীয় বণিক-কুল এই লিপির আমদানি করিয়া ব্রাহ্মী scriptএর উদ্ভব ঘটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকিবে। Rhys Davids এই Brahmi scriptকে sublime writing নামে অভিহিত করিয়াছেন। অপর কতিপয় য়ুরোপীয় পণ্ডিতের ন্যায় ঐতি-হাসিক Rhys Davidsও দুই দাঁড় বাহিতে ছাড়েন নাই—হাল একমুখ করিয়া চলার ইচ্ছা হইলেও ঘটনার স্বভাবগত শক্তিদ্বারা ভিন্ন মুখেও যে না হেলিয়া পড়িয়াছেন, এমন নহে। হিন্দুদের লেখা ছিল না জোর করিয়া প্রমাণ করিতে নামিয়াছেন, 'নেতি নেতি' রব তুলিয়া উহাকে খণ্ডিত করিলেন, কিন্তু হিন্দু সাহিত্যের গঠন ও রূপ চিন্তা করিয়া অস্তিত্ব-বাদের দিকেও যে অজ্ঞাতসারে না ঝোঁক দিয়াছেন, তাহাও নহে। নমুনা স্বরূপ এই কয় ছত্রই যথেষ্ট :—'It is of course, not impossible a priori. that the priests in India had developed an alphabet of their own out of picture writing; and that it was on to such an alphabet that the borrowed letters are grafted. ওয়েবারও এই মতবাদ লইয়া অনেক কালি খরচ করিয়াছেন, একবার এদিকেও যে না ঢলিয়াছেন এমন নয়—For their study as well as for the different methods of preserving them, whether by writing or by memory, for either is possible.." এই যুক্তি-তর্কের দোদুল দোলা অনেক মহারথীকে নাচাইতে ছাড়ে নাই। কারণ প্রচণ্ড 'না-না'র মধ্যে—God is no-where বলিতে atheistবর্গ যেমন প্রত্যুত God is now—here লিখিয়াছিল, সেইরূপ হা হা ধ্বনিরও অস্ফুট আভাস জাগিয়া উঠিয়াছে বৈ কি! এই প্রতিকূল শিবিরে General Cunningham অনুকূল মত লইয়া একঘরে হইতে বসিয়াছেন। তিনি অত মাথা ঘামাইয়া 'না'র ইতিহাস রচনায় নিতান্ত নারাজ। তিনি বলিতে চাহেন, ভারতের বেদ-বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গেই লিপি-রচনার স্বভাব-সুন্দর রথ যুগল সারথি-বাহিত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। Ryhs Davids এই মত যুক্তি-তর্ক-বিহীন জ্ঞান করিতে চাহেন। তাঁহার মতে ভারতীয় ভাষার অঙ্গে যেমন বহু শব্দের সমন্বয় দেখা যায় তেমনি ভারতীয় লিপির চেহারায় অপর লিপি-প্রথার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বাহির হইতে এ লিপির অবয়ব ধার করা। যখন ইহা সত্য তখন দ্রাবিড় বণিককুল হইতে ভাষার সংগঠন না হইয়া যায় কোথায়? তাঁহার মতে ব্রাহ্মণেরা আত্মস্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের ভাষার ব্যবস্থা লেখার উপর দাঁড় করান অসম্ভব। এইরূপে বহির্জগৎ

হইতে ভারতের লিপি সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে ইহাই প্রমাণ হয় এবং ইহারই জন্য পশ্চিমের চিন্তাশীলেরা আধুনিক যুগের আবিষ্কারের সাহায্যে ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠা নব গঠিত করিতে প্রতিভা-প্রকাশে তিলমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু একটা কথা উঠিতে পারে কি? এই যে Mesa inscription হইতে ভারতীয় লিপি প্রথার উদ্বোধন হইল, তাহা ত সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, ভারতের বণিক যাইয়া এক কুড়ি অক্ষর কাণা কড়ির মত থলি ভরিয়া লইয়া আসিল, তারপর ভারতবর্ষের বিপণিশালায় ঐ ধার-করা বিত্তের প্রথম ক্রয়-বিক্রয় চলিল, ইহা ত সকলেই বাইবেলের মত মানিয়া লইতেছেন; কিন্তু মানার প্রমাণ? যেহেতু Mesa inscription বহু ব্যয়সাধ্য excavation হইতে বাহির হইয়াছে, যেহেতু ইহা লেখার অতি প্রাচীন নিদর্শন এবং যেহেতু ভারতবর্ষে তৎকালীন বা তৎপর-বর্ত্তী কালের কোন লিখিত দলিল পাওয়া যায় নাই, সেই হেতু কি বলিতে হইবে যে ঐ inscription হইতে লিপি-প্রথা আনীত হইয়া ভারতের সাহিত্য-রচনায় নিয়োজিত হইয়াছে! আশ্চর্য্য কথা! আরও আশ্চর্য্য এই যে ভারতের এক বণিক সম্প্রদায় সে অক্ষর লইয়া আসিল, আবার তাহারা দ্রবিড়-দেশীয়! তাহারা ঐ লেখার মর্ম্ম এত বুঝিল যে অক্ষর-গুলি সাড়ে পনের আনা বেশ মুখস্থ করিয়া, বা য়ুরোপীয় ফ্যাসানে হাত পাকাইয়া এ দেশের হাটে মাঠে ছড়াইয়া দিল। মজার কথা বটে! মধ্যযুগের ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম, চীন দেশ হইতে Silk industry এক অভিনব উপায়ে য়ুরোপে চলিয়া যায়—দু'জন 'পথ-ভোলা পথিক এসেছি-ভাবে' সে দেশে বেড়াইতে যায়, এবং silk-worm আনিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলে বাঁশের বাশীতে কয়েকটী পোকা রাখিয়া তাহারা গ্রীসে চলিয়া আসে, তখন Heracliusএর রাজত্ব। Eastern Capitalএ দেখিতে দেখিতে রেশমের চাষ ছাইয়া গেল। এইরূপে মধ্য-যুগের বাণিজ্যে য়ুরোপ এক নূতন জিনিসের পত্তন করিতে পারিল। আমাদের আলোচ্য বিষয়টীও প্রায় সেইরূপ। এখানেও সেই এক দৃশ্য। কিন্তু গলদ হইতেছে ঠিক সেইখানে যে অক্ষরের চাষ ও রেশমের চাষ মোটেই একরূপ নয়, ইতিহাসের তৌলে এ দুইটী জিনিস মোটে দাড়াইতে পারে না। পশ্চিমের ইতিহাস-নায়কেরা কিন্তু ভারতীয় লিপির ইতিহাসে সেই রেশমের চাষ আনিয়া ফেলিয়া-ছেন। এখন কথা হইতেছে, Mesa inscrip-tion ত আর রেশম পোকার আধার নয়, যে বণিকেরা সাতডিঙ্গায় সে মণি লইয়া আঁধার ভারতের অঙ্গনে বাতি জ্বালিতে থাকিবে? ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় যে-ভারতীয় ব্রাহ্মণ বেদ বেদান্ত উপনিষদ রচনা করিয়া ও 'সোঽহম' চিন্তা লইয়া মগ্ন হইয়া রহিল, তাহারা অক্ষর আবিষ্কারের এক বিন্দু উপায় খুঁজিয়া পাইল না, আর কোথাকার দ্রবিড় বণিককুল পণ্য সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিস বাহির করিয়া ফেলিল! যাহারা ব্যবসায়ী তাহারা লিপির মর্য্যাদা বুঝিল বেশী, আর যাঁহারা মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বেদের অতুল জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া আসিলেন, তাঁহারা লিপিকুশল

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

হইতে জানিলেন না, বা পারিলেন না! বেবিলনে দ্রাবিড় বণিকেরা Mesa inscription দেখিবামাত্র বুঝিয়া ফেলিল, ইহাই লেখা, তারপর জানিল, ইহাতে অক্ষর আছে এবং তৎক্ষণাৎ এগুলি পোকার মত দেশে আনিয়া হাজির হইল! ভাল, এ অক্ষরগুলি আনিল কিরূপে? পুঁটলি বাঁধিয়া? তাহা অবশ্যই নয়। তাহারা নিশ্চয় লিখিয়া অভ্যাস করিয়া থাকিবে, সে দেশে ত আর বর্ণপরিচয় ছিল না যে গুরুদাসের দোকান হইতে এক কাপি লইয়া আসিবে, বা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ছিল না যাহার কাছে সেই Mesa inscription এর প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিয়া, উহার প্রকাশ ও ভারত-ব্যাপী প্রচারে লাগিতে পারিত! তবেই দেখা গেল যে তাহারা নিশ্চয় সেখানে হাত পাকাইতে শিখিয়া থাকিবে। তাহাদের ত আর কাজ ছিল না যে অক্ষর গলাধঃকরণ করিতে লাগিয়া যাইবে! তাহারা Modern school of Archaeology র student ছিল না যে Buhler এর মত, Kennedy র মত, Rhys Davids এর মত Paleography র বিদ্যা লইয়া ব্যবসা করিতে যাইবে! তারপর বণিক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের হাতে এই অক্ষরের অক্ষমালা সম্প্রদান করিতে গেল কখন? তাহারা দক্ষিণ-ভারতের লোক, উত্তর ভারতের উত্তরাংশ বেদাধ্যুষিত। ইতিহাসে আজকাল দেখা যায় দক্ষিণ-ভারতে আর্য্য উপনিবেশ বহু সময়-সাপেক্ষ হইয়াছিল, যদি এইরূপ হয় তবে দ্রবিড় জাতির সহিত বৈদিক হিন্দুর দেখা-সাক্ষাতে কত বিলম্ব ঘটিয়াছিল? আরণ্যক উপনিষদ, অনুক্রমানী রচনায় যে ব্রাহ্মণ সাহিত্যিকের হাত পাকিয়া উঠিয়াছি তাহারা কিনা লিপি-প্রথার হাতে খ লইবে অর্দ্ধ আর্য্য রাষ্ট্র হইতে! যাঁহা ভাবের ও ভাষার উপনয়ন দিয়া মহা-সাহিত্য সৌধ হেলায় আকাশের বুকে জাগাইয়া তুলি তাহারা পুনরায় আতুরঘরে যাইয়া বাণি মুখে লিপির কল-কৌশল জানিতে ব হইবে—তাহারা মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণ হই অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর গূঢ় রহস্য অবগ হইবে! এ কল্পনা ইতিহাসের অঙ্কে প্রলয়ঙ্করী পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তকারীদের মনে কি হয় না, যে সত্যের সাক্ষ্য ভিন্ন রূপ ধা করিতে পারে, বেবিলন বণিককুল ভার আসিয়া লেখার আদর্শ, তাহাদের যুক্তত অনুসারে Brahmi script হইতে লই যাইতে পারে? Mesa inscription এ অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হ কিন্তু বেবিলনের কোন্ অমূল্য পুস্তক পাওয়া গিয়াছে যাহাতে ভারতীয় সাহিত্যের মত ভাষা ও ভাবের মহামিলন দৃষ্ট হয়? তবে কে ভারত হইতেই বেবিলন অক্ষর ধার করিতে আসিবে না? The table is thus upset. না, তা হইবার নয়, তাহা হইবে সেমিটিক জাতি, ভারতের হাতে লেখা-পড়া শিখিয়া ফেলে, এবং সেই জাতি হইতে বর্ণমালার অভিযান গ্রীস ও রোমে যায়! তবেই ত মুস্কিল! য়ুরোপ মৌলিকতার সুর আর ভৈঁরো রাগিণীতে ভাঁজিতে পারে না! Rhys Davids বলিয়াছেন, Akkadian হইতে ভারতবর্ষ অক্ষর লাভ করিয়াছে। এই Akkadian বংশের নাম উল্লেখ করায় নূতন করিয়া একটা ক

নে জাগিল। এ কাহিনী আগুনের ইতিহাস সম্পর্কে।* বেদে দেখা যায় অগ্নিদেব প্রথম ভৃগুবংশের দ্বারা আনীত হন। আগুনের উদ্ভাবন ভৃগু ঋষির কার্য্য, তাঁহার পুত্র শুক্রাচার্য্য ভার্গব নামে খ্যাতি লাভ করেন; এই শুক্রাচার্য্য দৈত্যকুলের গুরু-পদে বৃত ছিলেন! দৈত্যকুল আর কিছুই নহে, Oxus valley হইতে Euphrates valley পর্য্যন্ত যে জনবস্তি আর্য্য সভ্যতার বাহিরে ছিল, তাহাই পৌরাণিক দৈত্যধাম। শুক্র বেদের সভ্যতা-বিস্তারে ইহাদের মধ্যে আবির্ভূত হন, এবং প্রবল চেষ্টায় বৈদিক রীতি-নীতির অনুবর্ত্তন করিতে সযত্ন হন। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ Hewitt তাঁহার 'Ruling Races of pre historic times' পুস্তকে লিখিয়াছেন—The-e western Asiatics formed the Akkadian race of remote past and it is a thing of supreme importance that the chief deity of this race was Sukas, a corruption of the name 'Sukrau. দি ঘটনার স্রোত এ পন্থা অবলম্বন করে, তবে সুর ফিরাইতে আর কতকাল লাগে? Rhys Davids-এর Akkadian race শুক্রাচার্য্য হইতে যে অগ্নির সঙ্কেত লাভ করিল, ঐ অগ্নি প্রজ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার বহু অগ্নি-শিখা যে সেই বেবিলন ও এসিয়ার অংশে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় Hewitt শুক্রাচার্য্যকে Sukrao রূপে Akkadian দিগের কুল-গুরু-পদে বৃত হইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু দানব রাষ্ট্রে বা আধুনিক Semitic নামধারী Assyria বা বেবিলনে, ভারত-ঋষিকে গুরু নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছে এরূপ আলেখ্য ইতিহাসের চিত্রশালায় মেলে কি? তারপর যে ভাষার ও লিপির বাহন বর্ণমালা দ্রাবিড় বণিক ভারতের হাটে Assyria হইতে আনিয়া বিকাইল, সেই ভাষার অগ্নি-শলাকা আগুনের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেবায়তনে যে ধূপ ও দীপ জ্বালিয়া দিয়াছিল, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-সংযোগে ভারত যে একদিন সমগ্র য়ুরোপের তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ হইয়াছিল তাহার খবর কয়জন রাখিতে জানেন, বা রাখিতে চাহেন? Ragozin তাঁহার Vedic India তে এই কয়টি বহুমূল্য ছত্র আমাদের চক্ষে ধরিয়াছেন—Bhrigu comes from a root Bhriji—To burn...it survives in Greek Phlego, Latin flagrare fulgue with all their derivatives chief of which is the Latin fulgar lightning bolt not to speak of their numerous posterity in our modern tongues —p. 360. হিউএট তাঁহার পুস্তকে দেখাইয়াছেন, যে শুক্রাচার্য্য সেই Akkadianদের গুরু হইয়াও পিতার নাম ত্যাগ করেন নাই, তাই তাঁহার পিতার নামানুসারে ফ্রিজিয়া প্রদেশের নামকরণ হয়,—they called themselves Briges, Bhrigu or Phreygoi in Phrygia...Also we

* পুরাতত্ত্বে ভৃগুবংশীয়ের স্থান—শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ভারতী

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

find the northern 'r' altered into 'l' in the Akkadian Bil-gi, we find a similar change in the name Phlegyas, the Greek form of Phreguas and we see the German pflugg and our plough are names taken from that of the Phrygian fire-father God, by a race, which besides changing the r into an 'l' changed 'ph' into a 'ph' "—Vol I. p 39.

স্বভাবের নিয়মচক্রে সূর্য্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইয়া থাকে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসে না, 'কত নদী ধাইলা উছলিয়া পুলকে' 'গলে পড়ে ঝরণা রজ-গিরি পারণা'; এই স্রোতময়ী নৃত্য-চপলা পাহাড় হইতে নামিয়া দেশ-বিদেশ ভাসাইয়া চলে, কিন্তু সেই পিতৃলোক হিমাচলে 'বাপের ঘর' করিতে আর ফিরে কি? এই ভারতীয় সভ্যতার দীপ্তি, জ্বল-জ্বল ময়ূখমালী সূর্য্যবৎ এই সভ্যতার গতি নৃত্য-বিহ্বলা নদীর মত ভারত মহাসাগর হইতে উত্থিত হইয়া, পশ্চিম আসিয়ার দেশ-বিদেশ ভাসাইয়া, বস্‌ফরাস্ পাড়ি দিয়া য়ুরোপের তৃষ্ণাতুর মুখে ছাপাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে স্থল হইতে আর ভারতের দিকে 'ফিরা যাত্রা' করিয়াছিল কি? 'এ ফিরা রথের' ব্যবস্থা ইতিহাসের পাঁজিতে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। হইতে পারে যে Kharosthi script গান্ধারে প্রচলিত ছিল, উহা সেই Semitic type এর বা Rhys Davidsএর Akkadian type এর, কিন্তু দেখিতে হইবে সেই script ভারতবর্ষে কতটুকু ক্ষমতা বাজাইতে পারিয়াছিল। Buhler বলিয়াছেন উহা সে প্রদেশ-বিশেষে নিবদ্ধ ছিল এবং উহার প্রচারের কিছুমাত্র আয়োজন বা প্রয়োজন ছিল না, কারণ ব্রাহ্মী script national হইয়া জাতীয়তার আকার-সম্পাদনে ভারতীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে বসে। ব্রাহ্মী নাম কি ব্রহ্ম-বোধক নহে? হিন্দুর সর্ব্ব-কার্য্যান্তরালে সর্ব্ব সাধনার মূলে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র দেখিতে জানিলে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ধরিবার প্রকৃষ্ট চক্ষু ফোটে বলিতে হইবে। Kharosthi নাম কোন বেদে কোন্ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়? ইহা যে 'পর-দেশী' তাহা নাম-পাঠেই মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ জন্মে। Khorasan নাম পারস্য দেশের এক প্রান্তের উপর ন্যস্ত ছিল, এই Khorasan রাজ্য হইতে Kharoshthi লিপির উদ্ভাবনা সম্ভব। যখন গান্ধারে এ লিপির প্রচলন ঐতিহাসিকেরা দেখিয়াছেন তখন উহা সেই যে 'পর-দেশী' সামগ্রী, তাহাতে ভুল নাই! এ লিপি আরবী প্রভৃতির মত ডান হইতে বামে লিখিত হইয়া থাকে। Buhler বলিতেছেন 4th century B.C. হইতে এই Kharosthi script গান্ধারে প্রচলিত হইয়া 200 A. D. পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্যের অধীনে এই স্থানসমূহ কিছুদিনের জন্য অধীনতা-পাশে কাটাইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে Kharosthi এ প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং পারস্যাধিকার বিমুক্ত হইলেও এ script যাই-যাই করিয়াও কিছুকাল টিঁকিয়া গেল। আজকাল Eastern Turkisthan excavation-এর ফলে যে

লিপির আদর্শ বাহির হইয়াছে, তাহার বিবরণ পরে চলিবে, কিন্তু এইখানে Khotan হইতে তের মাইল দূরে Gosinga Vihar-এ যে লিপি-রচনার কয়েক ছত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কথা একটু বলা প্রয়োজন। এই লেখা ভূর্জ্জ পত্রে মসী-অঙ্কিত, কলমের আঁচড়ে কালির ছাপে আধুনিক প্রথায় রচিত। এ লিপি Paris ও Petrograd-এ তথ্যাবিষ্কারের জন্য চলিয়া গিয়াছে। ইহা Kharosthi script-এর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ইহার রচনা-কাল প্রথম শতাব্দী খৃষ্টাব্দে এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে। যদিও এই Kharosthi script লইয়া Sylvian Levi ও Pischel এর মধ্যে বহু তর্কযুদ্ধ হইয়াছে, তবু ইহার সঠিক নির্ণয় সম্ভবপর হয় নাই। Buhler কিন্তু বলিয়া গিয়াছেন যে ইহা সেই inscription এর Semitic type, কারণ উহাও ডান হইতে বামে লিখিত হয়, এবং Kharosthiও ঠিক্ তদ্রূপ। কিন্তু Brahmi লিপি ইহাদের উল্টা; সেইজন্যই national script বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। Buhler প্রায় বলিতে চাহিয়াছেন যে ভারতের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে এই লেখার আবিষ্কার অন্যতম, ইহাতে যতটা দেশের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, যতটা দেশের হাতে এ লেখার সাজ বানানো হইয়াছে, ততটা কেন, তাহার রত্তি প্রমাণ, বাহিরের ছাপ আসিয়া লাগিয়াছে কিনা সন্দেহ; তবু প্রত্নতত্ত্বের যাদু-ঘরে ঢুকিলে প্রাচীন যুগের Mesa inscription প্রভৃতির দর্শন মাত্রেই মনটাকে এমন যাদু করিয়া তোলে, যে ইহার দ্বারা দূর-দূরান্তের অবগুণ্ঠিত ইতিহাসকে অনবগুণ্ঠন করিবার ইচ্ছা জন্মাইয়া থাকে। এই যাদু-ঘরের যাদু যে ইতিহাস-মহলকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহারই একটা প্রমাণ-স্বরূপ এই লেখার ইতিহাস ইতিহাস-সাহিত্যের আদালতে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সরযূ

বিস্মরণের ভস্ম মাঝে কি গান তুমি গাইছ উদাস-মনে,
রঘুকুলের হে রাজলক্ষ্মী! হে সরযূ! স্বর্ণ-স্রোতস্বতী!
দুঃখ-দিনেও ললাট তোমার অঙ্কিত যে ইন্দ্রাণী-লক্ষণে,
হে সুন্দরী! অনিন্দিতা! অঙ্গে তোমার চন্দ্র-মালার জ্যোতি!
সন্ন্যাসিনীর বেশে রাণী! কি কথা হায় জপ্‌ছ নিরঞ্জনে,
কোন্ অতীতের সঙ্গীতে মন তরঙ্গিয়া চল্‌ছ শ্লথগতি!

স্তম্ভে তোমার পুষ্ট হ'ল দিগ্বিজয়ী রঘুর বিপুল সেনা,
সুহ্ম-মগধ-পাণ্ড্য-কেরল-হূণ-পারসীক-যবন-দর্পহারী;

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ধাত্রী তুমি সম্রাটেদের ; সরিৎ-স্রোতে সাগর-ঢেউএর ফেনা
উথ্‌লাতে বল ধরে যারা, তেমন ছেলে পুষ্‌লে বারম্বারই
পীযূষ দানে। কবির গানে অমর যারা, যারা সবার চেনা,
মানুষ হ'ল তোমার স্নেহে তারা সবাই জৈত্র-ধনুর্ধারী।

মান্ধাতারও ধাত্রী তুমি! গঙ্গারে যে আন্‌লে স্বর্গ হ'তে
সে পঙ্গুরে বল দিয়েছ মুক্তি দিতে ষাট হাজারে, মরি!
ইক্ষ্বাকুরও তুই প্রসূতি, ফির্‌ত যে জন নিত্য ইন্দ্ররথে ;
যে যোদ্ধাদের পরাক্রমে নাম এ পুরীর অযোধ্যা-নগরী,
—অ-যোধ্য যা' সর্ব্ব যোধের—তারা সবাই অয়ি শুচিব্রতে!
তোর মমতায় স্নান ক'রেছে, পান ক'রেছে স্নেহের সুধা তোরি।

তোমার স্নেহের রাখী হাতে রাক্ষসেদের বশ ক'রেছে নরে,
সগর-খাত সাগর-জলে বাঁধ্‌লে সেতু তোমার সন্তানেরা!
ডঙ্কা দিয়ে দিগ্বিদিকে, ঝাণ্ডা নিয়ে দেশে দেশান্তরে
গ'ড়্‌লে কতই উপভারত, উপনিবেশ বাঁধ্‌লে কতই ডেরা ;
তাদের কীর্ত্তি লব-পুরী সে, মগের দেশে আজো বিরাজ করে,
আর দ্বিতীয় অযোধ্যাপুর মেকং-তীরে স্মৃতির ডোরে ঘেরা।

বিভীষণের ভীষণ মুখে ভক্তি-রেখা ফুটিয়েছে যে রাজা,
যার অভিযান হৃদয়-জয়ী, গেড়েছে যে জয়ের ধ্বজা মনে,—
বাল্মীকি আর কালিদাসের কাব্যে যাহার কীর্ত্তি চির-তাজা,—
পায় যে পূজা কৃত্তিবাসের তুল্‌সীদাসের ছন্দ-সুচন্দনে,—
হরের ধনুক ভাঙ্‌লে যে জন,—দর্পীজনে দিলে উচিত সাজা,
তোমার বুকের সেই শতদল ঘুমায় আজি তোমার আলিঙ্গনে।

যাত্রী এসে দেশ-বিদেশের তোর তীরে তার চরণ-চিহ্ন খোঁজে,
চোখের জলে ঝাপ্‌সা দু'চোখ,—খোঁজে সীতার রাঙা পায়ের রেখা,
নিমেষ-মাঝে নিমেষ-হারা, তিনটা যুগের স্বপ্ন স্তাখে ওযে,—
সৈকতে তোর সোণার রেণু,—জলে নব-দূর্ব্বাদলের লেখা!—
পাণ্ডা হেঁকে চমক ভাঙায়, একাল সেকাল সমঝাতে মন যোঝে,
কোথায় সীতা? কোথায় বা রাম? লোকের ভিড়ে একা নেহাৎ একা!

রাবণ-জয়ীর জনম-ঠাঁইএ দাঁড়িয়ে আজি ধ্বজা বাবরশাহী,
যে বাবরের ধর্ম্মী-গরব ডুবে গেছে রাঙা মদের হ্রদে ;

"মুণ্ড-পাহাড়" ভিন্ন যাহার ভূমণ্ডলে অন্য কীর্ত্তি নাহি,
সেই গ'ড়েছে ভজন-শালা, ভিতের পাথর ভিজিয়ে দেমাক-মদে ;
বাহু বলের মদের মাতাল কোথায় গেছে সুরা-সরিৎ বাহি'?
মৌলবীরা হয় তো জানেন,—পরলোকের পরম কোন্ গারদে।

রক্ত-কাদায় তক্ত-তাউস্!...মস্ত কীর্ত্তি প্রাচীন কীর্ত্তি-নাশে!...
কোন্ "যবনে রুধ্‌লে সাকেত"...সে কথা আজ কেউ রাখে না মনে?
বিরূঢ়কের রূঢ়তা লীন বাবরশাহী বর্ব্বরতার পাশে ;
নিষ্ঠুরতার কাহিনী, হায়, যায় তলিয়ে অগাধ নিষ্ঠীবনে!
ভয় জাগিয়ে যে সব পশু বানায় পশু মানুষকে ভয়-ত্রাসে
দুঃস্বপনের মতোই তারা, দিন দু'দিনে ডোবেই বিস্মরণে।

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় নাগর-দোলায় চল্‌ছে ঘোরাঘুরি,
ওঠা-নামার চল্‌ছে তুফান, আগমনী ডাক্‌ছে বিসর্জ্জনে,
ছায়াবাজীর পুতুল চলে সারি সারি উঁচিয়ে ছায়া-তুরী,
নেবে জ্বলে হিন্দু-মোগল, প্রসেনজিতের প্রাচীন এ পত্তনে!
রয় না দেমাক, রয় নাক' জাঁক, অটুট কারো না রয় জারিজুরি
থাকে কেবল পুণ্যশ্লোকের পুণ্যস্মৃতি প্রাণের রামায়ণে।

আজ সরযূ! তোর ছেলেরা কুলির বেশে যাচ্ছে ফিজিদ্বীপে,
যাচ্ছে সুদূর মরীচ-সহর, পেটের দায়ে বিকিয়ে দিয়ে মাথা,
কূলে কূলে কান্না ওঠে, চির-বিদায় বার্ত্তাতে যায় নিবে
কত ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ, কেঁদে মরে কন্যা-জায়া মাতা।
অধীনতার অন্ধকারে হায় সকল আশায় মারছে গলা টিপে,
ধোঁয়ায় ভ'রে যাচ্ছে দু'চোখ, ধোঁকায় ভ'রে উঠছে মনের খাতা।

ঘুর্‌ছে ধাঁধায় হিন্দু-তুরক লাঞ্ছনা আর সইছে গ্লানির বাণী,
আত্মা-লাভের নাই যেন বল আঁধির আঁধার রয়েছে দিক ভরি,
রঘুকুলের ক্ষত্রিয়েরা এক্কা-গাড়ীর কর্‌ছে গাড়োয়ানী,
বাবর-শাহের খান্দানীরা আজ্‌কে শুনি রেঙ্গুনে দপ্তরী!
বিজিত আর জেতার ধূলায় চোখের জলে আজ্‌কে সাঁতার-পানি,
আজ সরযূ অশ্রু-নদী, সরিৎ-রূপা এ রাজ-রাজেশ্বরী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

মাতৃহীনা

ছোট বেলা থেকে আমার মা নেই। লোকে আমায় বল্‌ত "মা-খেকো",—মানুষের এত বড় দুর্ভাগ্যের উপর এতখানি নির্ম্মম উপহাস মানুষে যে কেমন করে' করে, আমি ত তা ভেবে পাই না! এই মায়ের অভাবে যে কি বোধ হয় আমার মত ত আর কেউ তা কখনো অনুভব কর্‌ত না, অথচ আমিই ছিলেম আমার ভাগ্যের জন্যে দায়ী! বাবা আমার মা-বাপ দুইএর অভাবই পূর্ণ করেছিলেন। আমার আদর-আব্দারের অন্ত ছিলনা। লোকে বিরক্ত হত,—'মাওড়া' মেয়ের অত কেন? বাবা হাস্‌তেন, বল্‌তেন, "আহা, করুক! সে থাক্‌লে ত সইত—না হয় আমিও সইলেম।" তবু যত বড় হচ্ছিলেম, আমার মনের অভাব ততই বেড়ে উঠ্‌ছিল। কিছুতে যেন সুখ পেতেম না। খেলার সাথীরা যখন "মা" বলে ডাক্‌ত, আমার মন তখন তৃষিত হয়ে উঠত, ঐ ডাক্‌টির জন্যে! মা! মা! মা! কি মিষ্টি এই নামটি! আমার কেবল কান্না পেত। রাগ হত; কেন আমার মা নেই! মা-ডাকের কিছু অভাব পূর্ণ কর্‌বার জন্যে আমার জেঠিমা কি খুড়িমা কেউ ছিলেন না। আমার শুক্‌নো বুকের ভিতরটা যেন তাই থেকে-থেকে হাঁপিয়ে উঠত। যশোদা আমায় মানুষ করেছিল—তাকে আমি মা বলে ডাক্‌তে সুরু করায় সে বাধা দিলে, "ছি দিদিমণি, যাকে তাকে কি মা বল্‌তে আছে! বিয়ে হোক্, রাঙ্গা শাশুড়ী হোক, তাকে মা বলে ডাক্‌বে।" সেই দিনটি থেকে বিয়ের জন্যে মনে-মনে বড়ই সাধ জন্মাল। বিয়ে জিনিষটা যে কি, তা তখন ভাল করে জানতুম না। তার সুখ-দুঃখ লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখার সে বয়সও নয়। বিয়ের প্রধান যা স্বামী—তাঁর কথা তখন জানতেমও না, ভাবতেমও না—কেবল জানতেম, বিয়ের সঙ্গে মস্ত-বড় একটা যৌতুক আমার পাওনা আছে—সে মা!

ক্রমে বয়স বাড়তে লাগল। সংসারের সঙ্গে ছোট-খাট পরিচয়ও আরম্ভ হ'ল—তবু আমার মানসের মানসী প্রতিমাকে, আমার ভবিষ্যৎ শাশুড়ীকে আমি এতটুকু মলিন হতে দিলেম না। খুব উজ্জ্বল রঙে-রাঙ্‌তায় মুড়ে মাকে আমার দুর্গাপূজার প্রতিমার মতই আমার বুকের ভিতর আমি পূজা কর্ত্তেম। শাশুড়ী সম্বন্ধে কেউ আমায় ঠাট্টা ক'রে কোন অন্যায় কথা বল্লে আমি তা সইতে পারতেম না। মুখরার মত তখনি ঝগড়া বাধিয়ে দিতেম। লোকে বলত, "দেখ, দেখ! রানুর এখন থেকেই শাশুড়ীর উপর কত দরদ—ওরে, অত ভক্তি করিস নে রে—শেষে রাখ্‌তে পার্‌বি নে।"

বারো উত্তীর্ণ হয়ে তেরয় পা দিতেই আমার জন্য পাত্র খোঁজা সুরু হ'ল। আমি বাবার বড় আদরের ছোট মেয়ে, তাই আমার জন্যে একটু বিশেষ ক'রেই যাচাই-বাছাই চল্‌ছিল। বাবার মনের মত আর হয় না! শেষে তাঁর পছন্দ-মত একটি পাত্র মিলে গেল। কলকাতায় বাড়ী, বেশ সচ্চরিত্র। একশো টাকা মাহিনার চাকরি করেন। ঘরে ভাত-কাপড়ের অভাব নাই, অবস্থা ভালো! চাকরিতে ভবিষ্যৎ উন্নতিরও আশা আছে। বিধবার একমাত্র সন্তান! এই-খানটায় বাবার মন একটু খুঁত-খুঁত করছিল। আমরাও যে না হয়েছিল এমন নয়,—আমার এতদিনের এত সাধের দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জ্জন হয়ে গেল। তাহোক মনের ভিতর-কার যে মনোময়ী মা—তাঁর সাজের বদলে কিছু এসে যায় না। তবে অনেক দিনের ঘসা-মাজা নাড়া-চাড়ায় যে উজ্জ্বল মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁকে নিজের হাতে নিরাভরণা কর্‌তে মনে একটা ব্যথাও লাগল। মনকে প্রবোধ দিলেম, নসুর মা ত বিধবা, কাঞ্চনের মাও ত তাই! কি আর হবে তায়, তবু মা ত! বাবা একদিন কাছে ডেকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "রানু, এবার বাবা ছেড়ে মার কাছে যাচ্ছিস। মা পেয়ে বাবাকে ভুলে যাবি নে ত রে?" আমি বাবার কোলে মাথা রেখে বল্লেম, "না বাবা, তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে থাক্‌তে পারব না—কিছুতেই না!" বাবার আমার মনের ভাব তখন অম্‌নি ধারাই ছিল বটে, তবু তার মধ্যে ঐ যে বাবা মিষ্টি করে বল্লেন, "মা পাচ্চিস্"—এই কথাটি আমার কানে এমন মধুর সুরে বেজে উঠল যে তেমন মধুর কোন শব্দ বুঝি আমার কান দুটো কখনো শোনেনি। ওগো, সত্যই তবে এবার আমি মা পাবো। মা ডাকের সাধ আমার এ-জন্মে পূর্ণ হবে তাহলে!

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কথায় বর্ণনার কিছু নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালী গৃহস্থঘরে মেয়ের বিয়ে যেমনভাবে হয়, আমার বেলাতেও কোনদিকে তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সেই আত্মীয়-কুটুম্বের সমাগম, গহনা কাপড় আলো বাজনা, ফুলের মালা, ছাপানো কবিতা—আপ্যায়নের সহিত একখানি অপরিচিত সুন্দর মুখ—শুভদৃষ্টির মধুর মিলন,—সবই তাই। তাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। হ্যাঁ, কিছু তফাৎ ছিল। সেই সুন্দর মুখের যিনি অধিকারী, তিনি আজ মন্ত্র পড়ে আমায় নিজের বলে গ্রহণ করে তাঁর মাকে "মা" বলবার পূর্ণ অধিকার আমায় দিয়ে ছিলেন। আর তাঁর সেই মহৎ দানের বিনিময়ে আমি আমার তের বছর বয়সের কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি ভক্তিভরে তাঁর পায়ে ঢেলে দিলেম। মাতৃহীনাকে যিনি মা দিলেন, তাঁকে অদেয় কিছু থাকে কি! ভাল করে এসব মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা তখন মনে-মনেও করতে পারিনি, তবে মনের নদীতে যেন এমনি ভাবেরই একটা আলোড়ন উঠেছিল! বিয়ের পরে শ্বশুর-বাড়ী এলেম; বাবাকে ছেড়ে ভাইদের ছেড়ে এই আমার প্রথম বাইরের সংসারে পা ফেলা। তাই ভয়ে-ভাবনায় চোখে জল ঝর্‌ছিল। তবু একটা নূতন আশায় মনের ভিতরটা থেকে থেকে, যেন আনন্দে দুলে-দুলেও উঠছিল,—মাকে দেখতে পাব!

আমাদের গাড়ী এসে দোরে দাঁড়াতেই, শাঁখ বেজে উঠল। একজন গহনা-পরা মোটা-সোটা আধাবয়সী স্ত্রীলোক আমায় নামিয়ে নিতে এলেন। বয়স আমার তের হলে কি হয়, দেখ্‌লে লোকে ষোলর কম বল্‌তনা। যিনি নামিয়ে নিতে এসেছিলেন, তিনি খুড়-শাশুড়ী। হাত ধরে নামাতে হোল। আমি তৃষিত চোখে চেয়ে রইলেম, লোকে আমায়

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

বহারা বল্‌বে কিনা, সে উপদেশ মনেও ছিল না। শুনে ছিলেম শাশুড়ী বিধবা, তাই তাঁকে চিনে নিতে দেরী হলনা। স্বামীর মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের অনেকখানি মিল। ছোট-খাট গৌরবর্ণ আধা-বয়সী। চেহারাখানি দেখ্‌লেই ভক্তি হয়, মা বলে ডাক্‌তে মনে কুণ্ঠা আসে না। খুড়-শাশুড়ী বল্লেন, "দিদি, বৌমার মুখে মধু সন্দেশ দাও। সোনার জলে মা-লক্ষ্মীর মুখ দেখো ভাই! সোনার চাঁদের বৌকে যেন সোনার চোখে দেখ্‌তে পার।" শাশুড়ী গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমরা দেখ, ছোট বৌ,—মিথ্যের মুখোস্ পরা আমার কর্ম্ম নয়।" চারদিকের লোকজনদের বিস্মিত লজ্জিত মুখের পানে চেয়ে না দেখেই তিনি তখনকার কোন দরকারী কাজে চলে গেলেন। স্বামী আস্তে আস্তে মুখ নীচু করে গাড়ী থেকে নেমে এলেন। আমি ছেলেমানুষ, তাঁর হেঁয়ালি কথার অর্থ না বুঝে খুসী হয়ে দুধে-আল্‌তায় এসে দাঁড়ালেম। এম্‌নি করে আমার নব জীবনের অভ্যর্থনা হয়ে গেল।

বিয়ের পর যে কয়দিন সেখানে রইলেম গোলমালেই দিন কেটে গেল। মা বলে ডাক্‌বার মত এতটুকু অবসরও শাশুড়ী আমায় পেতে দিলেন না। দিন-রাতই তাঁর কাজ,আর কাজ! খাওয়ানো দেখা-শোনা ঘর-গুছোন পরিচ্ছন্নতা-সাধন এই সবেতেই এমন ব্যস্ত হয়ে থাক্‌তেন তিনি, যে আমার কাছে আস্‌বার কি বস্‌বার তাঁর সময় হতো না। শুনতে পেলেম একদিন মাস্-শাশুড়ী শাশুড়ীকে বলছেন, "পদ্ম, তোর বৌ-ভাগ্যি ভালোই হবে, মেয়ে বড় সুবোধ! মা কি কচ্চেন, মার খাওয়া হয়েছে কিনা, পিসিদের কাছে খবর নেয়।

আহা, ছোট-বেলায় মা মরা। ও তোকে বলে নিতে পারবে।" শাশুড়ী দালানে বসে লুচির ময়দা মাখছিলেন, আমি যে ঘরের এক কোণে বসেছিলেম, তা বোধ হয় ওঁরা জান্‌তেন না।

শাশুড়ী বললেন, "তা যদি হতো দিদি, তা হলে মানুষের পেটে ভগবান সন্তান দিতেন না, গাছপালাতেই ফলাতেন। তুমিও যেমন পাগল!" বাকী কথা শোনা গেল না। যেটুকু গেল তার অর্থও যে ভাল করে বুঝলুম না, তা নয়। তবু তাঁর বিরক্ত বিরস কণ্ঠস্বর আমার বালিকা-চিত্তেও একটা আঘাতের দোলা দিয়ে গেল। মনে হলো, আমি ওঁকে খুসী করতে পারিনি! কি উনি আমার কাছে চেয়েছিলেন? কি কর্ল্লে ওঁকে আমি খুসী করতে পারি? আমায় যদি বুঝিয়ে দেন, বলে দেন, প্রাণপণেই যে আমি তা করতে রাজী আছি!

বছর-খানেক পরে শ্বশুর-বাড়ী ঘর করতে এলেম। বাবা সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র দিয়েছিলেন। শাশুড়ী সবাইকে ডেকে দেখালেন। কুটুম্বের সুখ্যাতি কল্লেন—আমার সম্বন্ধে তাঁর একই ভাব। আমায় তিনি মা বলে ডাকতে দিলেন না! প্রথম প্রথম আমি তাঁর মানা না মেনে মা বলেই ডাক্‌তেম। তিনি যেন শুন্‌তে বা বুঝতে পারেননি, এম্‌নিভাবেই থাক্‌তেন, উত্তর দিতেন না। কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলে না, একদিন স্পষ্ট করেই তা বুঝিয়ে দিলেন। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "গুরুজনের কথা মানো না, বাপেও ভাল শিক্ষা দেয়নি। আমার বাছা, স্পষ্ট কথা,

মধ্যে আমি বল্‌তেও পারিনা, সইতেও পারিনা—। মুখে যতই মা-মা কর, মনে-মনে তুমিও জানো আমিও জানি, সত্যি ত তা নয়! সেজন্যে কেউ তোমায় দুষ্‌বেওনা। তখন-কার লোকে ঠাকুর-ঠাকরুণ বল্‌ত—মিথ্যের উপর ঘেন্না ছিল কি না!—এখন যত ফাঁকি তত ঢং। মা-মা আমায় করো না।" তর্ক করি-বার মত জ্ঞান-বুদ্ধি আমার ছিল না। সাহস বা শক্তির অভাব আরও বেশী। অগত্যা চুপ করে আদেশ পালন করাই সহজ পথ। তা ছাড়া সত্য কথাই আমি বলব। এর পর মা-ডাকের লোভও আমার কমে গিয়েছিল। তৃষ্ণা শুধু শীতল জলেই মেটে এমন নয়, অভাবেও মিটে থাকে!

শাশুড়ী লোক মন্দ ছিলেন না। পাড়া-প্রতিবাসী তাঁর সুখ্যাতি কর্‌ত। এমন পরোপকারী মানুষ হয় না! দাসী-চাকররাও খুসী ছিল তাঁর মিষ্ট কথা আর খাওয়ানোর যত্নে। ছেলেদের প্রতি ভালবাসার তাঁর অন্ত ছিল না। তাঁর স্নানের জল গরম থেকে রান্না-ঘরের পর্য্যন্ত তিনি তদারক কর্‌তেন, কেবল যত অপরাধ কি এই অধম আমার! মিথ্যা বল্‌ব না, তিনি আমার খাওয়া-পরার কোন দুঃখ রাখ্‌তেন না। তাঁতিনী এলে "কিরোনেশান" "ইয়ারোপ্লেন" প্রভৃতি নাম-জাদা পাড়ের শাড়ী কিনে দিতেন। সেমিজ ব্লাউজ-ওলা এসেও এম্‌নি ফিরে যেত না। কিন্তু মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরারই কাঙ্গাল! পাখীকে খাঁচায় পুরে ক্রমাগত যদি ছোলা বুটর আর ভাল ভাল ফল খেতে দেওয়া যায়, তাতে তার মনের অভাব কি মেটে? আমার কতদিনের কত যত্নে নিজের হাতে গড়া সাধের অট্টালিকা যে ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়ো হয়ে গেল, সে খবর ত কেউ নিলেন না! ছেলে বেলার আশা-ভরা প্রাণ নিয়ে মা বলে যাঁর কাঁছে এলেম, তিনি আমায় মাতৃস্নেহে কাছে ত টেনে নিলেনই না বরং অপরাধিনী করে পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিলেন! মা আমায় আদর করে একদিনও কাছে ডাকেননি। "বৌমা" বলেও ডাক্‌তেন না। আমার উপর ভালবাসার এতটুকু বুদ্‌বুদও সে স্থির জলে কখনো ভাস্‌তে দেখিনি। যা তিনি দিতেন না তা আমার কাছেও চাইতেন না; বরং সেধে দিতে গেলে বিরক্তই হতেন, রাগ কর্‌তেন। বাড়ীর পাঁচজনের মত আমিও একজন থাকি। খাই পরি, ইচ্ছা হলে চুল বাঁধি, কাজ করি, ইচ্ছা না হয় করি-ও না। এ সবে নিষেধও নাই; অনুরোধও নাই। ছিল কেবল এক জায়গায়। সে তাঁর ছেলের বিষয়ে। ছেলের খাবার করা,ছেলেকে খেতে দেওয়া—এসব তিনি নিজের হাতে কর্‌তেন। কাকেও তাতে ভাগ নিতে দিতেন না। মা আমায় যে চোখেই দেখুন, আমি যে তাঁকে সেই প্রথম যে-দিন সবুজ বেনারসী সাড়ীর আঁচলে গ্রন্থিবাঁধা তাঁর ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করে মনে মনে বলে-ছিলেম, "তুমি আমার মা, আমার চিরদিনের মা, আমার ক্ষুধিত তাপিত চিত্তের বেদনা-হরা অমৃত-ভরা সুখের উৎস মা,—" সে কথা ত আর ফিরিয়ে নিতে পারি না। তাঁর হাতে পাওয়া অবিচারের আঘাত খেয়ে-খেয়ে মন আমার এখন আর তেমন ক'রে সাড়া দেয় না, তবু কর্ত্তব্যের কাছে তিনি এখন যে আমার মা, আর চিরদিনই সেই মা-ই থাক্‌বেন।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

স্বামী আমায় ভাল বাস্‌তেন, আদর-যত্ন করতেন। তবু তিনিও ত মায়ের ছেলে, বাইরের উচ্ছ্বাসটা তাঁর একেবারেই ছিল না। কতখানি গভীর জলে তরঙ্গ ওঠে, আর কোন্‌খানে ওঠে না,এ-সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের খবর ত রাখ্‌তেম না, তাই নিজেকে বড় একা বড় অসহায় ব'লে মনে হতো! মাকে তিনি ভাল বাস্‌তেন ভগবানের প্রতিভূরূপে, তাই মার মনে পাছে ব্যথা লাগে সর্ব্বদাই ছিল তাঁর এই ভয়। আমার সম্বন্ধেও তাই এত সঙ্কোচ সাবধানতা! বুঝ্‌তুম সব, আবার এও বুঝতুম না মা যে শুধু তাঁর একলারই মা—আমার যে তিনি সব হয়েও কেউ নন্।

এম্‌নি করেই তিন-চার বছর কেটে গেল। অসিত আমার কোলে এলো। শাশুড়ী এবার ডাকার দায়ে অব্যাহতি পেলেন। "অসির মা" বলেই আমার পরিচয় হলো। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম! এত-বড় সংসারে একান্ত অসহায় আমার সহায় হোল, সঙ্গী হোল, আনন্দ আশা সবই হোল—আমার এতটুকু ছেলে অসিত! তোমরা শুনে হাস্‌চ, ভাবচ, এ-সব কবিত্বের কথা! আসলে সত্যিই তাই,—তবু মানুষ যে মানুষ! শুধু সংসারে সংগ্রাম করেই সে বেঁচে থাক্‌তে পারেনা, মাঝে মাঝে শান্তিরও তার দরকার হয়। বাইরের অভাব যাই থাক্, মনের অভাব মন নিয়েই মেটাতে সাধ যায়—হয়ত কারও মেটে, কারও মেটে না!

এম্‌নি ক'রে বছরের পর বছর কেটে এখন আমার মনের নদীতে ভাঁটা পড়ে এসেচে। আমি যে মাতৃহীন, এ অভাব আর আমার মনের কোণেও উঁকি মারে না! মনে হয়, জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে এম্‌নি ক'রে ঝরা ফুলের মত প্রকৃতির কোলেই আমি পড়েছিলেম। সংসারের লেন-দেন নিয়েই আমার কারবার। তিন ছেলের পর দুই মেয়ে হওয়ায় মা তাদের নাম রেখেছিলেন—সাধনা আর আরাধনা। নাতি-নাতনীরা ছিল তাঁর গলার হার। তারা এক মুহূর্ত্ত চোখের আড় হোলে তিনি সংসার অন্ধকার দেখ্‌তেন। তাদের নাওয়ান তেল-মাখান চুল-আঁচড়ান সব তিনি নিজের হাতে ক'রে দিতেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের দেখে নূতন ক'রে হেজলীন পাউডার ব্লুম রিবনের ব্যবহার শিখ্‌লেন। নৈলে তাঁর নাতি-নাতনীদের লোকে যদি তারিফ না করে! তারা যা-কিছু করে মার চোখে তাই ভাল, তাই অদ্ভুত! তাদের বাহাদুরি আর গুণপণার ইতিহাস শুনে-শুনে বাড়ীর লোকের ত কান ঝালাফালা হয়ে উঠ্‌ত। মার কিন্তু বলে আশ মিট্‌তনা—সন্ধ্যার পর জপের মালা হাতে নাতুর পেতে মা তাঁর নাতি-নাতনীদের নিয়ে গল্প শোনাতে বস্‌তেন। সে এক রূপ-কথার রাজ্য। কোথায় কোন্ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের ঘোড়ায়-চড়া রাজপুত্র—নদীর ভিতর সাত-মহলা বাড়ীর ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা, সাত ভাই চম্পার আদরিণী বোন্ পারুলবালা, আরও যে কত দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনী—না শুনিয়ে যেতেন, সে সব শুন্‌তে শুন্‌তে এই এত বয়সেও পাশের ঘরে অন্ধকার বিছানার মধ্যে ছোট খুকীকে বুকে চেপে ধরে আমার ব্যাকুল মন কে জানে কি অতৃপ্ত বেদনার ভারে লুটিয়ে পড়্‌তে থাক্‌ত! মনে হোত সুধা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে জন্ম-ভ'রে কেবল তৃষ্ণা সয়েই কাটিয়ে দিলেম!

একদিন পাড়ার এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে এসে মাকে বল্লেম, "অসির বিয়ে খুব ছোট বেলায় দিতে হবে। ওদের মত অম্‌নি একটি টুক্‌টুকে ছোট্ট বৌ আমায় এনে দিয়ে কিন্তু।" মা বল্লেন, "দুর্গা! না বাছা, আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমরা অসির বিয়ে দিয়োনা। যে দুঃখ আমি পেলুম তা আমি তোমায় দেব না।" শুন্‌লে একবার কথার শ্রী! মুখে একটা তীব্র উত্তর এসে ছিল, কষ্টে জিহ্বাকে সংযত করে নিলেম, তবু ব্যথার উপর অস্ত্রচ্ছেদের মত—বেদনার মধ্যে আনন্দের আভাসও বুঝি একটুখানি পেয়েছিলেম। যে দুঃখ উনি পেলেন আমায় তা দিতে চান্‌না! তবু এতটুকু অন্তরের টান আমার উপরও ওঁর আছে! এক এক সময় মনে হয়—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে, এখন ছুটি পেলেই হয়—উনি খুসি হন্। ঠিক বুঝ্‌তে পারি না। একদিনের কথা বলি। পুরোনো ঠাকুর বাড়ী গেছে,—মা ঠাকুর-ঘরে; স্বামী খেতে বসেচেন। আমি সাম্‌নের দালানে বসে পান সাজচি। অসিত স্কুলে যাবে, ভাতের জন্যে ঠাকুরকে তাড়া দিচ্চে। স্বামী খেতে খেতে নুন্ চাইলেন। ঠাকুর খোকার ভাত বাড়্‌ছিল, আমায় বল্লে "বহুমা, বাবুকো জারা নুন দেন্‌ত।" এ নূতন লোক, এ-বাড়ীর অলি-গলির সব সন্ধান ত জান্‌ত না! উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখলেম, নুনের জন্যে উনি হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন,—দেবে অথন ভেবে নিশ্চিন্ত হ'তে পাল্লেম না, পান ফেলে উঠে এসে একটু নুন এনে পাতে দিলেম। লিখ্‌তে যতখানি সময় গেল, কাজে হয় ত এতটা সময় যায়নি। আমরা যে সেবিকার জাত। সেবা করাই যে আমাদের পরম ধর্ম্ম বলে চিরদিন শিখে এসেচি। ওঁর খাওয়া হচ্চে না, সেইটেই আগে মনে হোল, পাতে নুন দিয়ে সরে এলেম! স্বামী মুখ নীচু ক'রে খাচ্ছিলেন। মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির আমেজ ফুটেচে কি না ফুটেচে হঠাৎ শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর কানে এলো, "এই যে খাবার কাছে সবাই আছে। আমার যেমন পাপের মন,নুন চাইলি শুনে তাড়াতাড়ি জপ ছেড়ে উঠে এলেম।" স্বামী বল্লেন, "কেন তুমি উঠে এলে মা—ওরা ত সব রয়েচে, যে হয় দিত।" মা বললেন, "আর আস্‌ব না বাছা, এবার থেকে ওরাই খাওয়াবে। বুঝতে পারিনি, অন্যায় করেচি।" শাশুড়ী সেখানে আর একটুও দাঁড়ালেন না, অপেক্ষাকৃত জোরে জোরে পা ফেলে আবার পূজার ঘরে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর অসমাপ্ত জপের সূত্র ফের খুঁজে পেয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁর ছেলের পাতের নুন যে নিজের স্বাদ হারিয়ে তিত হয়ে গেছল, সে আমি তাঁর মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পেরে ছিলেম। তার পর থেকে শাশুড়ী আর একদিনও তাঁকে হাতে তুলে কিছু খেতে দেননি! প্রথম কিছুদিন খাবার সময় কাছেও আস্‌তেন না, ছেলের অনুনয়-বিনয় কান্নাকাটি রাগারাগিতে শেষ মা এসে বসতেন,কিন্তু নিজের হাতে পাতে কিছু তুলে দিতেন না। স্বামীর শিক্ষামত আমি সে সময় সেদিকেই থাক্‌তেম না। ঠাকুরকে সব জিনিষ ছুঁতে দেওয়া হোত না, তবু হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও শাশুড়ী তাঁর জেদ বজায় রেখেছিলেন। তিনি জপের মালা

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

য়ে এসে বস্‌তেন; কাজেই নিজে কিছু পার্‌তেন না, নন্দ আমার মেজ ছেলে, একদিন পাতে দই দিতে গিয়ে সবটুকু দই মেঝেতে উল্টে ফেলে দিলে। স্বামী রাগ ক'রে বললেন, "দই আমি আর খাব না। আমার জন্য দই আর পেতোনা মা—দই আমি আর খাব না।" মা শান্ত মুখে জবাব দিলেন—"না খাস্‌ ত পাতব কেন!" এই দই খাওয়াটি যে মা ও ছেলের চিরদিনের অভ্যাস! ছেলের যদিই চলে যায় যে চলে না, তা স্বামীও জানতেন। অর্দ্ধেকগুলি ভাত তিনি এই দই দিয়েই খেয়ে থাকেন। স্বামী দই ছেড়ে দেওয়ায় শাশুড়ীও আর দই স্পর্শ কর্‌তেন না। আমার মুখে মার খাওয়া হচ্চে না খবর পেয়ে উনি সেদেই বল্লেন, "দই দেওয়া ছেড়ে দিলে মা—জানো, শেষ-পাতে দই না হলে আমার খাওয়াই হয় না।" মা যে তা ভালই জান্‌তেন, সে তাঁর ক'দিনের ব্যথা-কাতর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সেদিনের রাগ তাঁর অনেক আগেই পড়ে গেছ্‌ল। ছেলের খাবার কষ্ট তিনি সইতে পার্‌ছিলেন না, এখন কেবল জেদের মাম্‌লা চল্‌ছিল। ছেলের উপর ভালবাসার ত তাঁর অভাব ছিল না! কেবল সে ভালবাসার উপর শনিগ্রহ-রূপিণী এই আমার আবির্ভাবই তাঁর স্নেহ-রাজ্যে বিপ্লব বাধিয়ে ছিল বই ত নয়!

সেদিন মেয়ে আবদার ধল্লে—সন্ধ্যেবেলা গা ধোবে। অনেক করে "মা আমার,—মা-মণি আমার, লক্ষ্মী আমার" বলে ভুলিয়ে আমসত্তর লোভ দেখিয়ে তবে ছাড়ান্ পেলেম। মেয়ে চলে গেলে মা দালান থেকে বল্লেন, "দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে!—সোনা যে পেলে না, তার গিল্টী পরা কেন? মা ত দেখনি, অসির মা,তাই যাকে-তাকে মা ডাকতে তোমার লজ্জা করে না!" মনে হোল বলি, ভগবান্ দেন্‌নি, মানুষেও দিলেনা—কাজেই ঘোলে স্বাদ মেটাচ্চি, তবু চিত্রগুপ্তের দরবারে গিয়ে বল্‌ব যে গব্যরসের স্বাদ পেয়েচি কখনো,—থাক্—কাজ কি আর তর্ক ক'রে!

এইবার আমার সকল অপরাধের চরম শাস্তি হয়ে গেছে। মা আজ কাশী-বাসিনী—এটা তাঁর ধর্ম্মোন্নতির জন্যে, তাঁর স্বেচ্ছার ফল নয়। এ আমার অপরাধের দণ্ড! কি আমি করেছিলেম—সেই কথাই বল্‌ব।

সেদিন, যেদিনকার ঘটনা আমার জীবন-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে, সেদিন সকালবেলা মেজ পিশ্‌শাশুড়ীর ছেলে অপূর্ব্ব আমাদের নিমন্ত্রণ কর্‌তে এলো। —লুবঙ্গর "সাধ", এখনি যেতে হবে। সে আমাদের নিয়ে যাবে। ছেলেরা ত সব নাচ্‌তে সুরু ক'রে দিলে। শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাতে হবে। স্বামী বল্লেন, "বেশ ত, কাল থেকে সেখানে বাগান দেখে সন্ধ্যার সময় সব ফিরলেই হবে।" মা তাঁর নাতি-নাত্‌নীদের সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী হলেন। আমাকেও যাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ছোট খুকীর রাত থেকে জ্বর হয়েচে বলে আমি যেতে চাইলেম না। মাও বল্লেন,"থাক্—কর্ম্মবাড়ীতে অনিয়ম হবে, কাজ নেই। বরং বিপিন বাবুকে ডেকে একবার ভাল ক'রে দেখাও, সর্দ্দিও রয়েচে, ভাল নয়।" মা চলে গেলেন। আমার

মনটা ভার হয়ে রইল। গেলাম না খুকীর অসুখের দোহাই দিয়ে—মাও তাই বুঝে গেলেন,—কিন্তু ওগো আমার অন্তরবাসী অন্তর্য্যামী, তুমি ত জান আমার মনের কথা—যে পাপের সলুই আমার মনের ভিতর জন্মেছিল, সে যে সাপ হয়েই শেষে আমায় দংশাবে—তাকি আমি জান্‌তে পেরে ছিলেম! মাতৃ-গর্ব্বকে আমি মিথ্যা দিয়ে বাড়াব না। খুকীর জন্য সত্যই আমার মনে ভাবনা হয়নি—হয়েছিল দুর্জ্জয় অভিমান। নইলে বাঙ্গলা গৃহের অন্তঃপুরবদ্ধা কুল-নারী আমি, উৎসব গৃহের স্বজন-মিলন আনন্দ-উৎসবের লোভ কি আমার মনেও জাগে নি? জেগেছিল বই কি! তবু যে গেলেম না—সে কেবল জব্দ করতে। তাঁর আদুরে নাতি-নাত্‌নীদের জন্যেও আমার অভাব লাগে কি না,মা দেখুন। তাছাড়া সেখানে সবাই জিজ্ঞাসা করবে, কিগো শাশুড়ী এখন বৌ বলে ডাকে? মা বল্‌তে দেয় ত? কাজ নেই আমার এত কৈফিয়ৎ কাটার। স্বামী ভাত খেতে বসে বল্লেন, "আজ কোরিন্থিয়ানে "মধুর মুরলী" প্লে হচ্ছে,—যাবে? সকালবেলা পানু এসে একখানা রিজার্ভবক্সের টিকিট দিয়ে গেল। ছেলেদের হাঙ্গাম নেই—চল না—ঘুরে আসা যাক্।" মনে মনে লোভ খুবই হচ্ছিল। তবু বল্লেম, "খুকীর অসুখ, তাছাড়া মা যদি শোনেন?" স্বামী হেসে বল্লেন,"নাই বা বল্লে মাকে। বিপিন বাবু ত বলে গেলেন, খুকীর এমন কিছু নয়। যশোদা রাখ্‌বে এখন ওকে, কতক্ষণেরই বা মাম্‌লা!" কথা ঠিক! কতক্ষণই বা! ও ত যশোদারই কাছে বেশী সময় থাকে। নেহাৎ কাঁদে,কুড়ু খাইয়ে দেবে'খন। তবু মন বলছিল কাজ নেই, মা যদি জানতে পারেন—মেয়ে-ছেলে থিয়েটার দেখ্‌তে যাওয়া। লোভ বলছিল, এ আর এমনই কি অপরাধ! চিরদিনই কি ভয়ে চোর হয়ে থাক্‌তে হবে! তুই ত এখন পাঁচ ছেলের মা—কোণের বৌটি ত নোস্। লোভ আর সংযম-শক্তি যে কার বেশী সে খবর অনেকেই জানেন, আমিও জান্‌তেম, তবু স্রোতে ভেসে যাবার মত মনের কাছে না জানারই ভাণ করেছিলেম। কিন্তু হে আমার পাষাণ ঠাকুর, তুমি যে তা ভাল ক'রে জেনেছিলে, তাই না এ দারুণ পরীক্ষায় ফেললে। নাহ'লে এ মুগ্ধা কুরঙ্গিনীকে স্বামীর কণ্ঠ দিয়ে এমন আশ্বাসের মোহন বাঁশী শোনাবে কেন? তোমার যে মোহনবাঁশীর মধুর সুরে অবলা ব্রজের বালা লজ্জা-ভয় কুল-মান সব ভুলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে অকূলে ভেসেছিল—সে বাঁশীর সুরে না ভুলবে কে! স্বামী বললেন, "চল!" তাঁর উপর সব ভাবনার ভার সঁপে দিয়ে আমিও উঠলাম। কিন্তু এ ডাক যে অকূলের ডাক সে খবর কি তখন জান্‌তেম!

থিয়েটারে অভিনব উপাখ্যানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য উপভোগ দূরে থাক্, ঘরের কথাই ভাবছিলেম বেশী। খুকীটা কেমন আছে? কি কর্‌চে? কাঁদবে কি না, কে জানে? মন তাই থেকে থেকে চম্‌কে উঠছিল। "মধুর মুরলীর" নায়িকা সেজেছিল বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস্ গওহর। তার হাব-ভাব লীলা-চাতুর্য্য অভিনব দৃশ্যাবলী লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল।—আমার কিন্তু বেশী ভাল লাগছিল, ঐ সঙ্গে জড়ানো অন্য উপাখ্যানের নায়ক এক মাতৃভক্তকে। গল্পটির সব কথা

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

এবার এ সময় নয়—ভাল মনেও নেই তবু সব-কিছুর মধ্যেও তার ভীষণ পরীক্ষা আমার মনের উপর আজও ছাপ্ মেরে রেখেচে। বিধি রুষ্ট হওয়ায় যখন তার দুর্গতির চরম অবস্থা, এম্‌নি সময় মার কুঁড়ে ঘরে গেল আগুন ধরে,—একমাত্র ছেলেটি গেল জলে ডুবে, সে কি তার ভীষণ পরীক্ষা! কাকে রাখবে—কাকে ছাড়বে! মাতৃ-ভক্তিরই জয় হোল—জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশি বছরের বুড়ীকে সে কোন-রকমে বার ক'রে আন্‌লে। আর তার তরুণ-কান্তি বারো বছরের ছেলে অতল জলে তলিয়ে গেল। কিন্তু না, তা গেল না—যাঁর পরীক্ষা, তিনিই যে বিচারক! তাই ছেলে-কোলে ভিজে জলের ভিতর থেকে সেই শ্যামকান্তি নবজলধর ভুবনমোহন মূর্ত্তি তাঁর ভক্তকে নিয়ে উঠলেন। আনন্দে দুচোখ দিয়ে হু-হু ক'রে জল্ ঝর্‌ছিল। স্বামীকে বল্লেম, "থাক্, আর দেখ্‌ব না, বাড়ী চল।" স্বামী বল্লেন—"জগন্নাথ-দর্শনের বদলে পুঁইশাক দেখা! বৃথা তোমায় টেনে আন্‌লেম, চল।"

কড়া নাড়্‌তেই ঠাকুর এসে দরজা খুলে দিলে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত দিলেম। গা যে পুড়ে যাচ্চে! ওরে বাপ্‌রে, কত জ্বর! তার উপর যশোদা যা খবর দিলে, শুনে ত আমি বসে পড়্‌লেম। যশোদা বল্‌লে—আম্‌রা চলে যাবার খানিক পরেই মা ফিরে এসে ছিলেন, খুকীর জ্বর দেখে গেছলেন, তাই থাক্‌তে পারেননি। আমরা থিয়েটারে গেছি শুনে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আধ ঘণ্টা পরেই চলে গেছেন। অপূর্ব্বই তাঁকে নিয়ে গেছে। মেল-গাড়ী না কি—তাইতে না কি কাশী গেছেন! ঠাকুর সে কথার সাক্ষী হোল। মা তবে আমাদের ছেড়ে গেছেন! এত-বড় অন্যায় কেমন ক'রেই বা সইবেন! কাশীতে মার পিশিমা ছিলেন—নিশ্চয় মা সেইখানেই গেছেন। খুকী একটু সাম্‌লালে আমরা সবাই তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে গেছলেম। মা এলেন না,—বলেছেন, সাধনার বিয়ের সময় আস্‌বেন। স্বামী আস্‌বার সময় চোখের জলে ভেসে বল্‌লেন—"একটা অপরাধ ক্ষমা করতে পার্‌লে না, মা?" মা বল্‌লেন, "একটা নয় আশু, তোর একশোটা অন্যায় আমি ক্ষমা করচি, কর্‌বও, কিন্তু তাদের সংসারের ভেতর আমায় আর টানিস্ নে—আমি আর পাচ্ছিলুম না। বিশ্বনাথ আমায় জুড়্‌তে দিন একটু।"

মা তাঁর ছেলেকে ক্ষমা কর্‌তে পেরেছেন —তিনি যে ওঁর ছেলে! কিন্তু আমায়—! লোকে আমায় হয়ত নিন্দা করে। শাশুড়ী আমার জন্যে তাঁর সাজানো সংসার, সাধের সন্তান সব ছেড়ে আজ কাশী-বাসিনী। ছেলেরা রাগ করে, আমার জন্যেই তাদের ঠাকুমা চলে গিয়েচেন। স্বামী মুখে স্পষ্ট না বলুন কিন্তু মনটা তাঁর ভার হয়েই থাকে—কেন আমি এত কালেও তাঁর মন নিতে পারলেম না—তাঁর মা ত যেমন-তেমন মা নন্! সব সত্যি! কিন্তু ওগো, তোমরা সবাই আমায় ব'লে দিতে পার, আমি রাগ কর্‌ব কার উপর? আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হবার শুভদৃষ্টির শুভ মুহূর্ত্তটিকে—না, চির-মাতৃহীনা ক'রে যিনি আমায় এ সংসারে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর উপর?

শ্রীইন্দিরা দেবী।

যদি সে

যদি সে ফিরে এসে, আবার ভালবেসে,
আমার মুখ পানে চায়!
পুরোনো দুটো কথা, গোপন মন-ব্যথা,
আমার কানে কয়ে যায়!
যদি সে জেগে উঠে সহসা আসে ছুটে
চমকি দেয় দুনয়ন!
দু-খানি বাহুডোরে বাঁধিয়া রাখে মোরে,
আদরে ভরে ত্রিভুবন!
যদি সে অনুপম মু'খানি প্রিয়তম,
মূরতি মনোরম তার,
মাধুরী উছলিয়া জীবন উজলিয়া,
জীবনে আসে একবার!
দলিম-ফেটে-পড়া, গোলাপী-হাসি-ঝরা,
অমিয়-দিয়ে-গড়া মুখ!
ডাগর কালো আঁখি চপল দুটি পাখী,
শীতল স্নেহ-ভরা বুক!—
যদি সে অনুরাগে, রঙীন ফুলে ফাগে,
নবীন করে ফিরে প্রাণ!
সুরভি-কুসুমিত, জোছনা-পুলকিত,—
গাহে সে পরিচিত গান!
দারুণ অভিমানে সজল দুনয়ানে
যদি সে আসে পুনরায়!
বচন বাধো-বাধো মু'খানি কাঁদো-কাঁদো
যাতনাহত বেদনায়!
যদি সে লীলাভরে মুখে না হাসি ধরে
আমোদে ভরে' চারিদিক!
তেমনি পাশে এসে তেমনি কাছে ঘেঁসে
দাঁড়ায় তেমনিটি ঠিক!
বসন-অঞ্চলে মুছায় আঁখিজলে,
ভুলায় কত ছলে আর!
ছ'গাছি চুড়ি বাজে রহিয়া মাঝে মাঝে
নরম দুটি হাতে তার!
"কেমন! আছ ভাল? হয়ে যে গেছ কালো,
না দেখে এই কটা মাস;
এই যে আমি এই! তোমারি প্রিয় সেই!
বঁধু গো নহে পরিহাস!
ছাখ না ছাখ চেয়ে!" বলে সে চুমা খেয়ে
—অমৃত মিঠে নহে তত—
যদি সে বাহু-ডোরে বাঁধিয়া ফেলে মোরে
আদর করে শত শত!
যদি সে এলোচুলে কাঁকন বাহুমূলে
ছেলেকে কোলে তুলে কয়—
"চাহিয়া ছাখো দিকি, বাছারা হয়েছে কি!
স্নেহের এই পরিচয়?"
মুখরা সে আমার যদি সে একবার
আমার কাছে ফিরে আসে!
কঠিন বলে কথা জুড়াতে মন ব্যথা
আবার ফিরে ভালবাসে!

বৃথা এ মনো আশা সে জন ফিরে আসা
পিপাসা পড়ে রবে খালি!
মলিন চিতা-ধূমে কঠিন মরুভূমে
কেবলি বালি আর বালি!
পাখী না গাহে গান চাঁদের আলো ম্লান
কুসুমে পরিমল নাই!
দখিনে বাতাসেতে আর না উঠি মেতে
উড়িছে ছাই আর ছাই!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

বারোয়ারি উপন্যাস

২৬

ক্ষিতীশের বাসা থেকে সতীশ বেরিয়ে এসে যখন পথের মধ্যে দাঁড়াল, তখন রাত অনেক হয়েছে। জন-মানবহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে তার জোট-খাওয়া চিন্তা-সূত্রের যেই খোঁজবার অবসরটুকু যেন তাকে নিমেষে সঞ্জীবিত করে তুল্‌লে।

তাজের গম্বুজের উপর চাঁদের আলোর শুভ্র হাসিটি যেন একশ' বার করে তাকে বল্‌তে লাগল, পৃথিবীর কোন জিনিষই অবহেলার নয়! মানুষ নিজের হীনতার ছাপ দিয়ে তাকে কালো করে দেখে—অযথা স'রে দাঁড়াতে চায়!

কমলার কথা মনে করে তার মনের একদিক যেমন আনন্দে স্বস্তিতে ফুলে উঠতে লাগল—অপর দিকটা তেম্‌নি কুণ্ঠায় গ্লানিতে ক্ষুব্ধ আহত হয়ে পড়ল। তার মার অনুজ্ঞা মনে পড়ল,—ঠিক কথাই শাস্ত্র বলে—হাজার অশিক্ষিত নিরক্ষর হন, তবুও মা মা-ই!—তিনি ত আগা-গোড়াই বলে এসেচেন, বেনাম্নি উড়ো চিঠি বিশ্বাস করা তার কত বড় আহাম্মকি হয়েছে!

বাসায় যেতে মন চাইলে না। সে আস্তে-আস্তে ফিরে ক্ষিতীশের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেইখানটীতে গিয়ে আবার বস্‌ল।

কি চমৎকার রাত, কি সুন্দর জায়গা!—দূরে যমুনার কালো জল—সাদা বালির উপর মৌন জ্যোৎস্না—যেন তারই মত জেগে বসে আছে! মাথার উপর দিয়ে একটা পেঁচা চীৎকার করে উড়ে গেল। তার শব্দের রেশটা আকাশে মিলিয়ে গেল—কিন্তু গম্বুজের ভিতরটা অনেকক্ষণ যেন গুম্‌রতে লাগল।

সতীশ ভাব্‌লে,—তাইত, এই পেঁচাটার ত কিছুই ভাল লাগে না। এত আলো, এত শোভা থেকে কেন সে এমন ভাবে বঞ্চিত! আচ্ছা, সে নিজে বঞ্চিত, না আর কারুর ইচ্ছায় বঞ্চিত? কি জানি,—হয়ত, কেউই জানে না;—যে যা বলে, সব নিজের মন-গড়া কথাই বলে, বোধ হয়!

আবার সে ফিরে-ফিরতি নিজের কথাই ভাব্‌তে বসল।

অসুখ শুনে কমলা অধীর হয়ে সব ভয়-ভাবনা নিন্দা-গঞ্জনাকে তুচ্ছ করে ছুটে গেছে তার মার সেবা করতে। আর সে? কাপুরুষ, কুপুত্র।

সতীশের চোখের সাম্‌নে কমলার ছবি-খানি পরিস্ফুট সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠল। রোগি-নীর শয্যা-পার্শ্বে পতিগত-প্রাণ তার সতী সাধ্বী স্ত্রী কমলা; অনাহারে অনিদ্রায় ক্ষীণ তনু—এই ত' সংসার; এই ত' স্বর্গ; তাই মানুষের মন কিছুতেই তাকে ছেড়ে যেতে চায় না; যেতে পারেও না।

গভীর প্রেম-প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে' চোখ দুটিও অশ্রু-ভারা-ক্রান্ত হলো। তার মনে হলো—তার এখন একান্ত কর্ত্তব্য হচ্চে অচিরে গিয়ে কমলাকে সাহায্য করা। নিমেষে আবার মনে মনে

কমলার কাছে নিজেকে সে নিয়ে গেল। কমলার কোমল দুখানি হাত নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেন বল্‌চে—কমলা, তোমাকে কি আমি সন্দেহ করতে পারি!

এমন সময় পিছন থেকে পাহারায়ালা উচ্চ স্বরে হাঁক্‌লে—কোন্ হ্যায়?

সতীশ তাকে তার অক্ষম দুর্ব্বল হিন্দিতে বুঝিয়ে দিলে যে সে একজন—মুসাফির।

প্রহরী বল্লে,—বাবুজি, বোঁন্‌শি ভি বজাতে হেঁ? সতীশ চেয়ে দেখ্‌লে, ক্ষিতীশের বাঁশিটি পড়ে রয়েচে। সেটাকে হাতে তুলে নিলেই—চৌকিদার একটু বক্র হাসি হেসে অন্যদিকে চলে গেল। তার হাসির অর্থ আর কিছুই নয়—দুনিয়াতে কত পাগলই আছে!

বাঁশিটা আগা-গোড়া নিরীক্ষণ করে সতীশ মনে মনে ভাব্‌লে—এই একই জিনিষ, কিন্তু আমার ফুঁতে এটা কি কুৎসিত শব্দই না করবে! বাস্তবিক কি শুভক্ষণেই বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! আমার কমলাকে উনি বাঁচিয়েছেন—আমাকে আমার জিনিষ পৌঁছে দেবার জন্যে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ছুটে ছিলেন। কপাল আমার!

কমলার জন্য হঠাৎ তার মনটা কেমন অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল। মনে হলো কাজ নেই আর দেরী করে—কি জানি, কি হতে কি হয়—আজকের শেষ-রাত্রের গাড়ীতেই রওনা হয়ে যাই। কিন্তু এই বাঁশীটা কি করে ফিরিয়ে দেব? আচ্ছা, থাক্ না দিন-কতক আমার কাছে। আমিও একদিন তাঁর জিনিষ তাঁকে ফেরাতে যাব, সে বেশ হবে এখন।

পথে বেরিয়ে পড়ে সতীশ হন্‌-হন্ করে বাসার দিকে ছুটল। পথের কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করতে লাগ্‌ল। যেটা বড় কাছা-কাছি এসে পড়লো—তাকে বাঁশিটা উচোঁ-তেই সে পালিয়ে গেল। সে মনে মনে হেসে বল্‌লে, মন্দ কাজে লাগ্‌চেনা এটা। হয়ত আরো কাজে আস্‌বে একদিন!

বাসার দোর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—ডাকা-ডাকি করতেই খুলে দিয়ে চাকরটা বল্‌লে, বাবুজি, ভারি রাত হুয়া। তার হাতে একটা কেরাসিনের ডিপে—চোখদুটো সদ্য ঘুম ভাঙ্গাতে তখনো ছোট্ট হয়ে রয়েছে।

সতীশ বল্লে—রঘ্‌বু, আভি গাড়ি পাওয়া যায়েগা? অগার আন্নে শকেগা ত বকশিশ দেঁগা।

যো হুকুম—বলে রঘুবীর গাড়ীর উদ্দেশে বার হয়ে গেল।

জিনিষ-পত্র বড় কিছু ছিল না—তবে নেহাৎ লোটা-কম্বলও নয়। কারণ সতীশ কোনদিনই হিমালয়ের গহ্বরে বসে যে ধ্যান-মগ্ন হতে পারবে—এমন আশাও করেনি এবং ততখানি মনের জোরও তার কোন কালে ছিল না।

বাসার ম্যানেজার-বাবুকে আর ডেকে তুলতে হলো না; তিনি একটু সতর্ক ধরণের লোক। পাছে কে কোন্‌দিন চার্জ্জ না দিয়ে সরে পড়ে, এ ভাবনা তাঁর সর্ব্বদাই লেগে থাক্‌ত। আর সতীশকে তাঁর কেমন-কেমন বোধ হ'ত—যেন খামখেয়ালি—মতলবের ঠিক-ঠিকানা নেই। রাত্রে শুতে যাবার আগে তিনি খবর নিতেন, কে এল-গেল। বাসন-চুরির ভয়ে সন্ধ্যা না হতেই বাসার দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

দোর খুল্‌তেই সতীশ তাঁর সুমুখে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন,—কি মশাই, এত রাত হল যে! তার পরেই সতীশের হাতে বাঁশি দেখে বলে উঠ্‌লেন—আখ্‌ড়ায় গিয়েছিলেন বুঝি?

সতীশ খৈতে-শুদ্ধ চাবিটা তালার মধ্যে পুরে দিতে দিতে বল্লে—না! এই একটু—আমায় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম।

ম্যানেজার বাবু অবাক্ হয়ে সতীশের দিকে চেয়ে রইলেন।—সতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকে বাতিটা জেলে ফেলেই তার সংক্ষিপ্ত বিছানা-পত্র টেনে মাটিতে নামিয়ে ফেলে সব বেঁধে ফেল্‌বার উদ্যোগ করতে লাগ্‌ল।

এদিকে রঘুবীর ফিরে এসে ভারি গলায় বল্লে—বাবুজি, গাড়ি নেহি পায়া—একঠো টম্‌টম্ লায়া!

সতীশ অন্যমনস্কভাবে বল্লে—আচ্ছা হো যাগা—উস্‌কো ঠারণে বোলো।

ম্যানেজার বাবুর চক্ষু ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌তে লাগল। ব্যাপার কি? লোকটা পালাচ্চে না কি? গতিক ত' ভাল নয়, দেখ্‌চি!

রঘুবীর ঘরের মধ্যে ঢুকে বাবুজির বিলকুল চিজ বিছানার মধ্যে পুরে দিয়ে একটা মস্ত মোট বেঁধে মাথায় করে গাড়ীতে তুলে দিতে গেল।

সতীশ বার হয়ে এসে বল্লে,—তবে এখন আসি ম্যানেজার বাবু, এই গাড়ীতেই মনে করচি—আমি বাড়ী যাব।

ম্যানেজার বাবুর আর সহ্য হল না—তিনি তখন অতি স্পষ্ট করেই বল্লেন—আপনার চার্জ্জ?

সতীশ একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—ইস্ তাইতো—একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম মশাই—একটা ভারি—এই অবধি বলেই একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর একটা ঢোক গিলে বল্‌লে,—বাড়ী থেকে মন্দ খপর পেয়েচি কিনা, তাই বাড়ী যাচ্চি—তা আপনি কিছু মনে করবেন না।

ম্যানেজার বাবু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন—তা হবে না মশাই—টাকা-কড়ি দিয়ে তবে যেতে পাবেন, নইলে—

সতীশের কেমন ধাঁ করে রাগ হয়ে গেল, সে বল্লে—নইলে কি?—আপনি ত' বেজায় ছোটলোক দেখচি, মশাই!

ম্যানেজার বাবুর একটা মুদ্রা-দোষ ছিল—তিনি রাগলেই এক-একটা কথার এক-একটা অক্ষর অনেকবার উচ্চারণ করে ফেল্‌তেন। তিনি বল্লেন,—ছো-ছো-ছো-ছো-ছো-টো লোক তু-তু-তু-মি না আ-ই-ন-মি? টাকা না দিয়ে চ-চ-চ-চ-লে যাচ্চ?

সতীশ বল্লে—কে—চলে কে যাচ্চে, মশাই? টাকা দিতে ভুল হয়ে গেছে—তাই বলচি।

ম্যানেজার তখনি শান্ত হয়ে বল্লেন—তাই বলুন।

—কত দিতে হবে?

—পাঁচ টাকা সাড়ে বারো আনা।

সতীশ তার হাতে ছটা টাকা দিয়ে বল্লে—খুচরো বাকিটা রঘুবীরকে দিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার বাবু মহা খুসী হয়ে টাকাটা হাতে নিলেন। মনে মনে সতীশের প্রশংসা

ন—লোকটা দেখ্‌চি খাসা,—বিনা বে টাকা দেয়!

তীশ সটান গিয়ে টম্‌টমে চড়ে বল্‌লে, কে যাও। টম্-টম্ গাড়ীর মৃতকল্প র পিঠে কোচমান চাবুক কশিয়ে দিয়ে টা গলের মধ্যে পুরে একটা অদ্ভুত শব্দ করলে—যাতে নাকি অশ্বজাতি ন বিষয় একান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে—মের ঘোড়াও অম্‌নি সে শব্দে প্রাণপণ ছুটতে সুরু করে দিলে।

২৭

হরেন গলার আওয়াজ পেয়ে যোগেন আর বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লেন না। তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল —এবং রাগটা এমন অপরিসীম হলো যে রের হাত দুটো পর্য্যন্ত ঠক্-ঠক্ করে পতে লাগল।

তিনি তখন বাড়ীর উঠানের মধ্যে এসে ড়ালেন, তখন তাঁকে ঠিক মনে হলো যেন র মূর্ত্তিমান প্রলয়। চোখদুটো রাগে বড় ং লাল হয়ে উঠেচে—কপালের উপর একটা রগ ফুলে ধক্ ধক্ করচে;—কাঁচা-পাকা ফি-জোড়াও ফুলে দেড়া হয়েচে।

যোগেন মিত্র চীৎকার করে বল্লেন,—াজি, ছুঁচো, শূয়ার, হতভাগা, নচ্ছার—তুই খানে কি করচিস্?

তার বাপের রাগ যে কি তুমুল, হরেন া জান্‌ত, আর এও সে মনে মনে ঠিক য়েছিল যে একদিন তার ভীষণ ধাক্কা াকে পোয়াতেই হবে। তাই সে কোন কথার উত্তর না দিয়ে একটু আড়ভাবে াড়িয়ে হেঁট হয়ে মাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে যে কতখানি নিজেকে সাম্‌লাচ্চে—তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার পকেটের মধ্যে পুরে দেওয়া হাত দুখানার ধরণ দেখে—মনে হচ্ছিল, বগলের নীচে থেকে তার কোট-টা বুঝি বা নেমেই আসে!

পুত্রকে নির্ব্বাক দেখে মিত্রজা কিছুমাত্র শান্ত হলেন না—বরং রাগের মাত্রা তাঁর আরো চড়ে গেল। তিনি হরনাথের দিকে ফিরে বল্লেন,—এই রাস্‌কেলকে তোমার অন্দর মহলের মধ্যে ঢুকতে দিয়েছ কেন?—ওকে জুতো মেরে রাস্তায় বার করে দাও—এক তিলও দেরী করো না,—দাও।

হরেন বাপের দিকে মুখ ফিরিয়ে অকম্পিত স্বরে বল্লে—পরের বাড়ীতে ঢোকা যদি দোষ হয় ত' আমি একা দোষী নই!

ঠিক এমনভাবে কথার উত্তর শোনা জমিদার বাবুর মোটেই অভ্যাস ছিল না, তাই তিনি পুত্রের ঔদ্ধত্যে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। আর একটা কথা তাঁর মনে এলো যে পুত্রের কাছে এমনভাবে অপমানিত না হবার উপায় তাঁর হাতেই ছিল।

এমন সময় কমলা ডাক্‌লে,—জেঠামশায়! যোগেন একবার তার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে তাড়াতাড়ি এমন করে মুখ সরিয়ে নিলেন যাতে প্রকাশ হলো যে এই কুলত্যাগিনীর সঙ্গে কথা কওয়াও উচিত নয়—এইটেই তাঁর দৃঢ় এবং স্থির মত।

কিন্তু কমলা উত্তরের প্রতীক্ষা করে নি, সে খুব সহজভাবে কয়েকটি কথা অনর্গল বলে গেল:—

আপনাদের মস্ত ভুল হচ্চে—আপনারা সবটা না জেনেই হরেন-দাকে অপরাধী মনে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

করে নিচ্চেন। অপরাধ আমরা এক বিন্দুও করিনি—তাই ভয়ও আমরা কারুকে করিনে। যদি ধর্ম্মের জন্যে সত্যের জন্যে আপনারা খোঁজ নেন ত' দেখবেন, কি ভুলই মানুষ মিছি-মিছি করে। মানুষ মানুষের বিচার করতে পারে না—তাই বিচারের প্রার্থনা করে এ সব কথা বলচিনে। বলচি এই কথাই মনে করে যে, আমাদের প্রতি অবিচার করে বিশেষ করে এই নির্দ্দোষ হরেনদাদার উপর অবিচার করে আপনি নিজেই না অপরাধী হয়ে পড়েন! এমন একদিন আস্‌বে যেদিন এই মিথ্যের কেল্লা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে—সেদিন কিন্তু এ জগতে আপনাদের দুঃখ রাখবার আর স্থান থাক্‌বে না।

হরনাথের আর সহ্য হলো না! তিনি উঠে পড়ে বাঘের মত আক্রোশে কমলাকে আক্রমণ করে তার টুঁটি টিপে ধরে হিড় হিড় করে টেনে খিড়কির দোর দিয়ে বার করে দিয়ে বল্লেন—হারামজাদি, এই ক'দিনের মধ্যে থিয়েটার করতে শিখে এসেচিস্! চুলোয় যা—আমার বাড়ীতে তোর স্থান হবে না।

তারপর খিড়কির দরজা সশব্দে বন্ধ করে তাতে তিনি চাবি লাগিয়ে দিলেন।

হরনাথের কাণ্ড দেখ্‌তে সবাই ব্যস্ত ছিল, হরেন যে এর মধ্যে কখন কেমন করে বার হয়ে গেছে, তা' কেউ দেখতে পায়নি।

যোগেন্দ্র যেমন স্তব্ধ গম্ভীরভাবে এসেছিলেন, তেমনি ভাবেই বাড়ী ফিরে গেলেন। অল্পক্ষণের অভিজ্ঞতাটুকু যে জীবনের দুর্লভতম বস্তু হয়ে একদিন দাঁড়াবে—তা' তখন তিনি বুঝতেও পারলেন না!

* * * *

কিছুক্ষণের জন্য কমলা নিজেকে এক অসহায় মনে করে অবিশ্রাম কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। কিন্তু কেঁদে মানুষের দি যায় না। আকস্মিক নির্ম্মম আঘাতে চড়ি পড়া মনটিকে হ'বার সে গুটিয়ে তুল লাগল।

তার সব-চেয়ে বড় ভয়ের জিনিষ হলো— মানুষের সান্ত্বনা কি সহানুভূতির কথা তা সে ধীরে ধীরে উঠে বাগানের এ কো যে নিবিড় বাঁশের জঙ্গল ছিল, তার ম্যে ঢুকে গেল। সেখানে যারা প্রাণের আ রাখে তারা যে কিছুতেই আস্‌বে না—তা ভালো করেই জান্‌ত।

সেখানে বসে সে বেশ ভাল করে বুঝে নিতে চাইলে যে কি করবে। তারপর হাত দু-খানি জোড় করে একান্ত মনে ডাক্‌লে —হে ভগবান্, শুনেছি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি! এখন দেখিয়ে দাও, কোন্ পথে আমার পথ। আমি যে কিছু জানিনে!

ঠিক এই সময়ে তার হরনাথের কথা-গুলো মনে পড়ল। সত্যি—যমই কি এখন তার শেষ আশ্রয়?

একটা ভীষণ আতঙ্কে তার সমস্ত দেহে-মনে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। আত্মহত্যা? না, তা কিছুতেই হতে পারে না। শুনেছি, তাতে আত্মার অনন্ত নরক।—কেন আত্মহত্যা করব? কি হয়েছে আমার? কি করেছি আমি? কিন্তু এই বাঁশ-বনের মধ্যেও ত' জীবন যাপন করা সম্ভব নয়! কিছু একটা উপায় করতেই হবে—একটা ত আশ্রয় চাই—চাই।

কমলা গালে হাত দিয়ে আবার ভাব্‌তে ল। হায়! আজ যদি সতীশ কাছে ত! সে নিশ্চয়ই এমন করে অবিচার ত না।

করত না? ঠিক কি তাই? আচ্ছা, ন করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে লয়ে চলে গেলেন কেন তিনি? শোকে? দুঃখে কমলা আস্তে আস্তে মাথাটি ড় বল্লে—কি শক্ত মানুষকে বোঝা! ইত অনুমান!—অনুমান যে সত্য হবেই —তা কে বলতে পারে!

সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে,— া, আর যে ভাবতে পারিনে—কতক্ষণে হবে—কতক্ষণে গ্রামের লোক ঘুমিয়ে বে।—তখন আমি যে দিকে দু-চোখ সেইদিকে চলে যাব।

মাথাটা হাঁটুদুটোর মাঝখানে রেখে লা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল—মন ভাবতে চায় না—যা হবার হবে। মানুষ দের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে যখন তিক্ত ওঠে—তখন অপরের কথা আপনিই জোটে

তাই কমলা হরেনের কথা ভাবতে বসল। ামশাই ত' তাকে ত্যাগ করেছেন; সে পুরুষ মানুষ,—কি ভাবনা তার! ই কিছু পাপের বিষয় পায় না। কত ন এই ঘটি—আর কি বাঁধনেই বাঁধা ই আমরা! হায় রে!

কমলা যখন এম্‌নি করে পুরুষের সুখ-গুলো তাদের জীবনের দুঃখ-কষ্টের তোল করচে—তখন দেখ্‌লে, পুকুরের র উপর শশী এসে দাঁড়িয়েছে—তার কাণা চোখটী তার দিকে, আর ভাল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পুকুরের একদিক থেকে আর-একদিক পর্য্যন্ত সে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্চে। সে যে কিসের খোঁজে এসেচে, তা বুঝতে কমলার একটুও দেরি হলো না—এই সয়তানের দোসর দেখ্‌তে এসেচে যে কতক্ষণে তার শবটা জলের উপর ভেসে ওঠে!

কমলা ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে চুপ্‌টী করে বসে রইল। শশী কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে বল্লে,—এত শীগ্‌গির ভাসবে না;—কাল সকালে ফুলে ঢোল হয়ে ভেসে উঠ্‌তেই হবে, বাবা।

তার মুখে একটা কুৎসিত হাসি ফুটে উঠ্‌লো—যা দেখে যমও আঁৎকে ওঠে। কমলা ভয়ে শিউরে উঠে চোখদুটো তাড়াতাড়ি বুজে ফেল্‌লে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। বাঁশবনের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকারা সন্ধ্যার আগমনী কিছু আগে-ভাগেই সুরু করে দিলে।

কমলা স্তব্ধ হয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় বসে রইল। শশী বাড়ী চলে গেল। মাঠ থেকে ফিরে আস্‌বার পথে গরুর গলার ঘণ্টাগুলো ক্রমেই বেশী শোনা যেতে লাগল।

চারিদিকের শব্দ—ক্ষীণালোকের সঙ্গে যেন এক শান্ত-মধুর মায়া রচনা করে কমলার চোখের উপর তন্দ্রার একটা পাৎলা পর্দ্দা টেনে দিলে।

কমলা হঠাৎ চমকে জেগে উঠে চারিদিকে চেয়ে বল্লে,—কৈ, তিনি ত আসেন নি! ওমা—আমি কি স্বপন দেখ্‌লুম না কি?

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

এ ত সেই বাঁশ-বন—তেম্‌নি করেই ত বসে আছি!

দুর্নিবার আবেগ তার সমস্ত হৃদয়-মনকে নির্দ্দয় পীড়নে মথিত করে যেন তার দম করে দেয় আর কি! তার দুই চোখ ফেটে অজস্র অশ্রুর ধারা বয়ে গেল।

২৮

সতীশ যে ট্রেণে উঠেছিল সেটা একটা গাধা প্যাসেঞ্জার। অর্থাৎ তার গতির চেয়ে স্থিতি বেশী, আর চলার মুখে সে কাউকে, বম্বে মেলের মত, অনাদর অবহেলা দেখিয়ে চলে যায় না। এই মন্থর-গতি গাড়ীখানার মধ্যে তার বেগবান মনটা খাঁচায়-পোরা পাখীর মতই সমস্ত দিন ছট্‌-ফট্‌ করতে লাগ্‌ল।

দুপুরের কড়া রোদে গাড়ীখানা থাম্‌লে তার ভিতরে আর থাকা যায় না। প্ল্যাট-ফরমেও ভীষণ রোদ—এম্‌নি করতে করতে শেষে শেষ-বেলায় মোগলসরাইএ এসে গাড়ীখানা একেবারেই দাঁড়িয়ে গেল। সতীশ সেখানে জলযোগ করে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করে বেড়াতে লাগ্‌ল।

ওদিককার প্লাটফর্ম্মে গাড়ীখানা এসে লাগল—তা থেকে কত লোক পিল্‌পিল্‌ করে নেমে পড়ে এই গাড়ীখানার দিকে ছুটচে! মেয়েরা এই গরমেও লাল নীল সবুজ রঙের র‍্যাপার গায়ে দিয়ে তাঁদের লজ্জা রক্ষা করচেন—কিন্তু গরমে প্রাণ তাঁদের গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেচে, যেন ওষ্ঠাগত প্রায়!

একজন বিধবা ছুটে এসে সতীশকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—বাবা, এই গাড়ীখানা কি বর্দ্ধমান যাবে?

সতীশ হাঁ বলাতে তিনি ছুটে একখানা সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ীতে চড়ে বস শেষাশেষি একজন কালো উর্দ্দি-পরা কালেক্‌টার এসে সেই গাড়ী থেকে বেচা নেমে যেতে বল্লে। বিধবা ভয়ে আ এক কোণে গুড়িসুড়ি হয়ে বসে চলে থা থাক্‌তে দাও—নাম্‌লেই গাড়ী ছে দেবে

কেউ কারুর কথা বোঝে না; টি কালেক্‌টরটি হিন্দুস্থানী।

সতীশ গিয়ে বল্লে—মা, আপনি গাড়ীতে যান—এটা দুনো ভাড়ার গাড়ী।

বিধবাটি নেমে পড়ে বল্লেন,— তোমার গাড়ীতে আমাকে বসিয়ে নেও। জানি পথ-ঘাট, বড় বিপদে পড়েই বেরিয়েছি।

—আচ্ছা তবে আসুন—বলে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগল—আর দেরী গাড়ী ছেড়ে দিলে বুঝি!

গাড়ীটা নড়ে উঠ্‌তেই সাম্‌নের এক গাড়ীর দোর খুলে বিধবাটিকে তুলে সতীশ সেই গাড়ীতেই উঠে পড়ল

এই বিধবাটির বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। এক সময়ে উজ্জ্বল ছিল; কিন্তু দুঃখে আর সে জেল্লা নেই। চুল একটও পাকে কিন্তু ছোট করে ছাঁটা। কপালে নাকের উপর নীল উল্কির দাগ।

ছুটোছুটির উত্তেজনার কম উ কমে গেলেই তিনি বল্লেন,— যাবে, বাবা?

সতীশ বল্লে,—আমিও বর্দ্ধমানেই তারপর আমাকে জগদীশপুর যেতে হ সে বেশী দুর নয়।

বিধবা বল্লেন,—জগদীশপুর? আহা! মনে করতেও দুঃখু হয়। আমার দুর-সম্পর্কের এক মাসী থাকেন সেখেনে। উপযুক্ত পুত্তুর—কি ক্ষেতিই হয়ে গেল বাবা—আবাগী বৌ মাগীর জন্যে। বৌ মাগী, শুন্‌চি, তার বাপের বাড়ীর দেশের জমিদারের ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে—এই কথা শুনে মাসির ছেলে একেবারে নোটা-কম্বল নিয়ে কোথায় যে নি-উদ্দেশ—হায়, হায়, মাসীর কপাল ধরেচে। এমন বেটা—শুনি না কি পশ্চিমে কোথায় পাঁচশ' টাকার চাকরি করত,—সব জলাঞ্জলি দিয়ে চলে গেছে। ধন্যি মন পুরুষের! কি ভালই যে বাস্‌ত ছোঁড়া ঐ বৌ ছুঁড়িকে। তাই বলি বাবা, রাখ্‌লে কি সে তোর ভালবাসার মান? তাই বলে ভেবে-ভেবে তুই কেন বয়ে গেলি? বৌ ছুঁড়ির নাকি অসামান্যি রূপ; হোক্‌ না কেন রূপ—বাংলা দেশে অমন ঢের-ঢের মেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—কে পোঁছে! সোজা কথা বাবা, পাঁচশ' টাকা মাইনে?

পরচুল-পরা নিজের ছবি যেমন আর্শিতে দেখে কিছুতেই হাসি সামলানো যায় না, সতীশের অবস্থা ঠিক তেমনি হলো—তার নিজের এই অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনে। এই দুর-সম্পর্কের আত্মীয়ার সব-চেয়ে ব্যথা বেশী ঐ পাঁচশ' টাকার চাকরিটির জন্যে। সতীশ মনে মনে হেসে বল্লে,—গাঁধিজীর নন্‌-কো-অপারেশন্‌ বাংলায় চলা শক্ত। কি চাকরি-প্রিয়তা আবাল বৃদ্ধ-বনিতার!

সতীশ বল্লে,—আপনি থাকেন কাশীতে, —এত খপর আপনাদের কাছে পৌছল কি করে?

বিধবা একটু হেসে বল্লেন,—বাবা, বিদেশে থেকে আপনার জনের জন্যে কত যে মন হাঁক-পাঁক করে—তা তোমরা বোঝ না পুরুষ-মানুষরা। তা ছাড়া—আরো একটু কারণও আছে। আমার মাসীটি ঐ বৌ-ছুঁড়িকে বরাবরই দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারতেন না। তাঁর ছেলের আর একটি বে দেবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল—আমার পিস্‌তুতো ননদের এক মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও অনেকটা এগিয়েছিল; কিন্তু যাক্‌ সে সব কথা—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সে মেয়েটির বে হয়ত' আস্‌চে মাঘ মাসে হয়ে যাবে।—সতীশ এই কথাগুলো বেশ সয়ে নিতে পারছিল, তার মানে সে মনে মনে স্থির জান্‌ত যে, কমলা এখন তাদের বাড়ীতে তার মাকেই শুশ্রূষা করচে।

বিধবা আর বেশীক্ষণ জেগে থাক্‌তে পারলেন না—একটি কোণে কুকুর-কুণ্ডলি হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হওয়াতে সমস্ত দিনের হায়রানির পর ঘুমটা ভালই হলো—তার উপর আবার আগের রাতটা একেবারেই অনিদ্রায় কেটেছে।

সকালে মধুপুরে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই সে নেমে পড়ে উপরি-উপরি দু-কাপ চা খেয়ে শরীরটাকে ধাতে নিয়ে এলো। বিধবা বৈদ্যনাথের পাণ্ডার কাছে কিছু নির্ম্মাল্য আর প্রসাদি পেঁড়া সংগ্রহ করে নিলেন। গাড়ীতে প্রসাদ-ভক্ষণটা বৈধব্যধর্ম্মে বাধে না—এ কথা পাণ্ডা অনেকবার করে শুনিয়ে দিলে।

গাড়ীটার বর্দ্ধমানে এসে ঠিক বেলা চারটের সময় পৌছবার কথা; কিন্তু কি একটা কারণে আসান্‌সোলে ঘণ্টা-দুই দেরী

হয়ে গেল—তাই একেবারে অপরাহ্নে এসে গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌঁছল।

সতীশ সহযাত্রিণীর কোন খোঁজ-খবর না নিয়ে সটান একটা কুলির সঙ্গে বাড়ী রওনা হয়ে পড়ল।

পথ অতিক্রম করে যতই বাড়ীর দিকে আসে, ততই যেন তার মনটা উদ্বেগে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মার অসুখ—তিনি কেমন আছেন? যাক্‌গে, সে নিশ্চয় ম্যালেরিয়া—দু-চার দিন নেটিয়ে ভাল হয়ে উঠ্‌বেন। তার পর তার কমলার কথা মনে হলো।

বৌকে্ যদি মা বাড়ীতে জায়গা না দিয়ে দূর করে দেন! না—তা' কি হয়? আমাকে না জানিয়ে—তাইত, আমি ছিলুম কোথায়? ইস্, তাই ত কি ভুলই করেচি! হে হরি—হে মা দুর্গা—এমন যেন না হয়।

গ্রামের মধ্যে যখন সে ঢুকল, তখন বেশ রাত হয়েছে। কারুর সঙ্গে দেখা হবার মত সময় আর নেই। সতীশ দুর্গা-নাম জপ করতে করতে এসে ভূপেন-ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারির কাছে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে—ডাক্তার নেই, কম্পাউণ্ডার একটা ভাঙা বেঞ্চে বসে একখানা বাংলা কাগজ খুলে পড়চে।

সতীশ চেঁচিয়ে বল্লে,—ওহে নিতাই, ডাক্তার কোথায়?

—আজ্ঞে তিনি এইমাত্র একটা কলে বেরিয়ে গেলেন্।...আপনি কবে এলেন? দরকার আছে নাকি? ফিরে এলে পাঠিয়ে দেব?

ভূপেন ডাক্তার কলে যান্‌নি—তিনি বাড়ী গিয়েছিলেন—কিন্তু সেটা বলা নিষেধ ছিল—সব সময়েই তিনি কলে যান্ এই রকম বলার কড়া হুকুম এই বেচারার উপর ছিল।

সতীশ বল্লে,—না, মা আছেন কেমন, জানো কিছু?

—আজ্ঞে তাঁর ত কুইনাইন চলচে।

সতীশ একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে এগিয়ে গেল।

বাড়ীর সাম্‌নে এসে তার বুকের মধ্যটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগ্‌ল।

কুলিটা হাঁকাহাঁকি করতে স্বয়ং দুর্গামণি এসে দোর খুলে দিয়ে মানুষ ভূত দেখলে যেমন করে চেয়ে থাকে, তেম্‌নি করেই চেয়ে রইলেন—তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন।

সতীশ তাঁকে নিরস্ত করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে কুলি বিদায় করার পর তাঁর বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুনে উপলব্ধি করলে—যে কালনাগিনী এসেছিল আর ঠেকার করে বাপের বাড়ী চলে গেছে; তিনি তাকে বিধিমতে ঠাকুরসেবা করেছিলেন—কিন্তু—

সতীশ কোন কথা না কয়ে বাড়ী থেকে ধীরে ধীরে বার হয়ে কালিগাঁর পথ ধরে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সমস্ত দিন স্নান নেই, আহার নেই—তার পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবীটা যেন টল্‌তে লাগ্‌ল—তবুও সে চল্‌চে—চল্‌চে—চল্‌চে।

স্তব্ধ মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার আর পা চলে না। একটা উঁচু আলের উপর বসে পড়ে সে কালিগাঁর দীর্ঘ পথের দিকে চেয়ে রইল—এই পথ তাকে অতিক্রম করতেই হবে—যেমন করে হয়!

খানিক বিশ্রাম করার পর আবার সে

চললো—কিন্তু আর ত চলা যায় না ভগবান্! পা যে ভারী পাথর হয়ে উঠেচে!

একটা ছোট নিমগাছের তলায় সে বসে পড়ল। চারিদিকে চাঁদের আলো ফুট্-ফুট্ করচে—আর সাম্‌নে ধূ ধূ অফুরাণ পথ। সতীশ চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করে আবার উঠ্‌তে গিয়ে দেখে—কে ঐ পথের উপর দিয়ে ত্রস্ত পদে ছুটে চলেচে? মেয়েমানুষ, না?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই কতকগুলো শুক্‌নো পাতা খড়মড় খড়মড় করে উঠতেই মেয়েটি পথের ধারে নিসিন্দের ঝাড়ের পিছনে লুকিয়ে পড়ল।

সতীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরে মেয়েটি আবার বেরিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল।

হঠাৎ তার মুখ থেকে বার হয়ে পড়ল—কে যায় ও? কমলা!

সে স্বর শুনে সেই পথের ধূলার উপর চক্ষের পলকে কমলা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

তার নিস্পন্দ দেহখানি নিজের কোলের উপর টেনে নিতে নিতে সতীশের দুই চোখে অশ্রুর সাগর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

(ক্রমশঃ)*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘুম্‌তী নদী

ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে, ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে!
বেল্-চামেলির চুম্‌কি চুলে, ফুলের হাওয়ায় চোখ্ ঢোলে!
কুড়ুক্-পাখীর উলুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,
ক্ষীর্‌রি-দোয়েল্-শালিক-শামা-বুল্‌বুলিদের কন্‌সাটে!
শনের ফুলে ছিটিয়ে সোনা শরৎ তারে সাজিয়ে যায়,
ভিণ্ডি-ফুলের কনক-জবা তার নিকষে যাচিয়ে যায়।
হেমন্ত ভেট ত্যায় তাহারে আনন্দে দুই হাত ভরি,
মুক্তো-ফাটা গাজর ফুলের চিকণ চারু ফুল্‌করী!
শিশির আসে নীল আকাশে বকাঞ্চ ফুলের বক-ধ্বজা,—
উড়িয়ে ঘোষে ফুল্-মুলুকের নিত্যদিনের নওরোজা!
সমারোহ সর্ষে-ক্ষেতে, জর্দ্দা-ফুলের একজাইএ—
খেলাঘরের খাস্-গেলাসের জলুস্ বাঁধা-রোশ্‌নাইএ!
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে রিম্‌ঝিমিয়ে মন্থরে,
দিনের আলোর ফুল্‌কিগুলি বুক জুড়ে তার সন্তরে!

* * * *

* আগামী সংখ্যার লেখক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঘুম্‌পাড়ানি ঘুম্‌তী নদী ঘুমিয়ে কি তুই পথ চলিস্,
ঘুমের ঘোরে ঘুরিস্ শুধুই স্বপন-পুরীর বোল্ বলিস্!
দুই কিনারায় ফুলের ফসল, পরণে শাড়ী ফুল-পেড়ে,
আমের ছায়া নিমের ছায়া এড়িয়ে আগে যাস্ বেড়ে ;
বসন্তে তোর ডাইনে বাঁয়ে ফুলের ধূলোট, ফুলের বান,
মগজ ভরে মন হরে তোর সাত-আতরের ঐকতান!
জুলুম সুরু কর্‌লে নিদাঘ আঙরা-ঝুরো ছুটিয়ে লু
শিরীষ-চাঁপার অঞ্জলিতে দিস্ ঢেকে তুই তার চিলু।
কাজ্‌রী যখন গায় মেয়েরা, বাদল-মেঘে থির কাজল,
অঢেল্ কেয়ার পরাগ মেখে তুই হ'য়ে যাস্ কেওড়া জল।
খোসবায়ে তোর খুসীর হাওয়া সোঁতের পিছন সঞ্চরে,
ফুলগুলো ধায় ফড়িং হ'য়ে উড়ণ্-ফুলের রূপ ধ'রে!
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলিস্ ঝুম্‌কো ফুলের বন দিয়ে,
ঢেউ ঝিলিকে মাণিক জ্বেলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে।

* * * *

সঙ্গীতে তোর তৈরী শরীর রঙ্গ-বীণার রঙ্গিণী!
অল্-গজলির গজল-গানের তুই যে চির-সঙ্গিনী।
কৃষাণকে তুই করিস্ কবি, করতবে মন চমৎকার,
নূপুর পায়ে চলিস্ মৃদু দুলিয়ে কনক-চন্দ্রহার!
সুল্‌তানেদের সুলতানা তুই, নবাব-বেগম, রাজ-রাণী,
অপ্সরা তুই উর্ব্বশী তুই চার যুগই তোর প্রেমবাণী!
দুই হাতে তোর ডালিম-আনার, ভুট্টা-জনার ছড়িয়ে যাস্,
অড়র-চানার মাঝখানে তোর যোজন-জোড়া ফুলের চাষ।
মস্‌জিদে তোর টিয়ের মেলা, মন্দিরে তোর চন্দনা,
পিক্ আহেরী-ময়না মিলে গায় তোমারি বন্দনা।
আনন্দে নীলকণ্ঠ পাখী বেড়ায় উড়ে তোর তীরে,
মাছরাঙাকে চম্‌কে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে তিত্তিরে!
ফুল-ক্ষেতে আর ফুল-খামারে শঙ্খচিলের আস্তানা
মুখ-চোখে ঠিক ফুল-বিলাসী সুলতানেরি ভাবখানা।
ঘুরে ঘুরে আস্‌ছে তারা, ভাস্‌ছে ফুলের মুখ চেয়ে,
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে ঘুম-নিঝুমের গান গেয়ে॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সঙ্কলন

বিলাতের পত্র

ব্লুম্‌জ্‌ব্যরিতে আমাদের ছাত্রাবাস। এই পাড়াটী আজকাল লণ্ডনের ছাত্রদের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের মাঝখানে এই পাড়া; এর এক বাজুতে ইউনিভার্সিটী কলেজ, আর এক বাজুতে কিংস্ কলেজ; এ ছাড়া আরো অনেক শিক্ষার আয়তন এই অঞ্চলে আছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তর ছাত্র এই পাড়ায় বাস করে থাকে। পারিসে যেমন শিক্ষার্থিদের পাড়াটির নাম লাটিন কোয়ার্টরের নাম, অনেকে মনে করে লণ্ডনে ব্লুম্‌জ্‌ব্যরি তেমনি হয়ে উঠ্‌বে। কলকাতার পটলডাঙ্গা গোলদীঘি অঞ্চল যেমনি। ব্রিটিশ মিউজিয়ম আমার ঘর থেকে দেখা যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পিছনে অনেকটা খালি জমি পড়ে আছে, অনেক জায়গায় অস্থায়ী ঘর রয়েছে, সেগুলো ভেঙ্গে জমি তৈরী সহজ; দূর সাউথ কেনসিংটন্ থেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়ে এনে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পিছনে বাড়ী ক'রে বসাবার কথাও নাকি হচ্ছে; তা হলে এ পাড়াটা পুরোপুরি ইউনিভার্সিটীর ছেলেদের বস্তি হয়ে যায়। কিন্তু সে বোধ হয় দূরের কথা।

আমাদের ছাত্রাবাসে আমরা আছি প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন ছেলে। আমি একা ভারতবাসী। বাকী সব নানা দেশের। ইংরেজ অবশ্য বেশী। এক জন মিসরী —কপ্‌ট খ্রীষ্টান;—একজন গ্রীক, জন সাতেক রুমানীয়ান; জন তিন সার্বিয়ান; তা ছাড়া আছে ফরাসী, ইটালিয়ান, সুইস, রুষ। প্রায় সবাই ছাত্র।

লণ্ডনের বোর্ডিং হাউস-এ তিনমাস কাটালুম। দেখলুম যে বোর্ডিং হাউস-এর চেয়ে এখানে দেখবার শোনবার সুযোগ বেশী। এক ওয়াই, এম, সী, এ, রিক্রিয়েশন্ ক্লাব কাছে আছে, সেখানে মেয়েরা আসে। কলেজের ছাত্রী বেশীর ভাগ, হপ্তায় দু'দিন ক'রে নাচ হয়—আমাদের হোস্‌টেলের ছাত্রেরা অনেকেই যায়। এরা আমায় একদিন নিয়ে যায়, তার পর এদের দলে থেকে মাঝে মাঝে যাই। এই ক্লাবে আর নাচের মজ্‌লিসে ইংরেজ-সমাজের একটা মস্ত দিকের সঙ্গে পরিচয়ের সুবিধা পেয়েছি।

বোর্ডিং হাউস-এর জীবনের পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছে আপাতত নেই—যদি খুব ভদ্রঘর পাই তো আলাদা কথা। লণ্ডনে পৌঁছুলুম রেল্‌ওয়ে ষ্ট্রাইকের মুখে, গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। আমাদের লণ্ডনে আগমনটা হয়ে ছিল একটু নতুন রকম ক'রে। মার্সেল্‌সে আমাদের জাহাজ লাগতে বিস্তর সহযাত্রী সতীর্থ নেমে গেল; আমরা বরাবর জাহাজে করেই এলুম, কিন্তু জিব্রাল্টার দেখার লাভ ছাড়া আর কিছু প্রলোভনীয় ছিল না, যাতে জাহাজে আর এক হপ্তা কারাযন্ত্রণা সহ্য করা যেত। যাক, জনকতক আমরা র'য়ে গেলুম। প্লিমাথে নামতে দিলে না; কাগজ পাওয়া গেল, তাতে পড়লুম যে রেলওয়ে ষ্ট্রাইক আপাতত স্থগিত রইল। পরের দিন লণ্ডনে পৌঁছুল আমাদের জাহাজ, মহা উৎসাহ ক'রে মালপত্র বেঁধে ষ্টুয়ার্ডদের বক্‌শিশ চুকিয়ে দিয়ে উপরে উঠলুম—জাহাজ গ্রেভ্‌সেণ্ডে এসে থেমে গেল। একটা খবর এসে আশঙ্কার ঝড় বইয়ে দিলে—ভীষণ ব্যাপার! রেল-ষ্ট্রাইক, ভয়ানক গোলমাল বাধবে। সহকারী লোক এসে আমাদের পাসপোর্ট দেখে গেল, মনে হ'ল এবার সুরাহা হবে। সাত হাজার মাইল এসে লণ্ডনের দোয়ার গোড়ায় এরকম ভাবে আটকে গিয়ে ভারী বিরক্তি ধ'রে গেল। অনেকের আত্মীয়-স্বজন নৌকা আর লঞ্চ নিয়ে এল, সব মহা ফুর্ত্তিতে চলে গেল। এতে আমরা যারা প'ড়ে রইলুম তাদের মেজাজটা আরও দমে যেতে লাগল। আমরা কতকগুলি ভারতবাসী ছাত্র, আর কতকগুলি ইংরেজ। বাঙালি যে ক'জন ছিলুম, কি করা যায় পরামর্শ আঁটতে লাগলুম। ডাঙায় নামলে লণ্ডন অবধি যেতে পারবো কি না সন্দেহ ছিল; রেল চ'লছে না, ট্রাম আর বাস্‌ও নাকি বন্ধ হ'য়েছে বা হ'ল ব'লে শোনা যেতে লাগল। তার উপর দাঙ্গা ফেসাদের ভয়। ক'দিনে ব্যাপার

মিটবে তা জানা যাচ্ছে না; দু'রাত্তির ডাঙ্গার ধারে জাহাজে কারাবাসের পর আর থাকবো না ঠিক করলুম। জাহাজের এক ইংরেজ মেট্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম—"কিহে, ব্যাপার কি রকম? বলি চুরি ডাকাতি মারামারি হবে না তো?" মেট্ বল্‌লে, "মারামারি তো সামান্য কথা, রেভলিউশন হবে।" বড় আশাপ্রদ কথা মনে হ'ল না। বন্ধু ব—ছেলে মানুষ। মেট্‌-কে একটু কাতর ভাবে বল্‌লেন—"কিন্তু বোধ হয় ইংরেজ-কুলী লুটপাট শুরু ক'রলেও নিরীহ বিদেশীর গায়ে হাত তুল্‌বে না"—ইংরেজ কুলীর নৈতিক উৎকর্ষে বন্ধুর অসীম বিশ্বাস! মেট্‌টী হ'চ্ছে একটী আন্‌কোরা সোশালিষ্ট; সে একটু উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললে, "লুট্‌-পাট্, চুরি-ডাকাতি—এ তো আক্‌ছার ভদ্রলোকে বড়মানুষে ক'রছে! আমায়, আর আমার মত গরীব লোককে খাটিয়ে মারছে, আর আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজকার করা কড়ি—আমাদের হক—মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বাবুয়ানী করছে। ইংলণ্ডের জন-মজুর আমরা, আমরা দেখিয়ে দেবো যে আমরা ম'রে নেই।" তা তো হ'ল; আমরা এখন করি কি? ব—বল্‌লেন—"ভায়া হে, সমুদ্র পেরিয়ে কি শেষটা কূলে এসে প্রাণ দেবে? রয়ে যাও, দুচার দিন বইত নয়—বোঝার উপর শাকের আঁটি।" কিন্তু জি—ঠিক করলেন তিনি আর থাকবেন না—তিনি বেরিয়ে পড়বেন, প্রাণ যাক্ বা থাক্। কারণ দেরী হ'লে তাঁর কলেজে ভর্ত্তি হওয়া হবে না, দিন উৎরে যাবে। তাঁর এই ভীষণ পণ শুনে ব—আর আমি মহা উৎসাহ করতে লাগলুম। জি—for ever! কূলে অবতরণ করে, গ্রেভসেণ্ড থেকে যদি ট্রাম কি বাস্ মেলে তো তাতে ক'রে, নয় মোটর ভাড়া ক'রে লণ্ডনে যাবো ঠিক হ'ল। গ্রিণ্ডলে কোম্পানীর লোক ছিল জাহাজে—সব ভারী মাল ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তার কাছে সঁপে দিলুম—আর সপ্তাহখানেকের মত কাপড়চোপড় আর দরকারী জিনিস একটা মস্ত কিট্-ব্যাগ ছিল তাতে পুরে নিলুম। তার পর আমাদের তিন মূর্ত্তিকে ডাঙায় নামিয়ে দেবে, 'এমন নেয়ে আছে কোন্ নায়' দেখতে লাগলুম। এক নৌকাওলাও জুটে গেল; জন পিছু সাত শিলিঙ ছ' পেন্স নিয়ে আমাদের গ্রেভসেণ্ডের জেটিতে তুলে দিলে। নৌকায় ওঠবার সময় আমাদের এই 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' দেখতে ডেকের রেলিঙে সব যত সহযাত্রী সার করে দাঁড়াল। বন্ধু দ—চেঁচিয়ে বল্‌লেন 'ভায়া, লণ্ডনে পৌঁছে আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করো।' গ্রেভসেণ্ডে উঠে শুন্‌লুম, ট্রাম আর বাস্ চ'ল্‌ছে। আমার কিট্-ব্যাগটা ছিল বিষম ভারী; জেটী থেকে বাসের কাছ অবধি সেটা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া এক বিপদ হ'ল; এমন সময়ে এক জোয়ান ছোকরা এসে ব'ল্‌লে, 'Say gurnor, shall I carry it for you?' জিজ্ঞাসা ক'রলুম, বাস অবধি পৌঁছে দেবে কত নেবে। সে বল্‌লে —one bob অর্থাৎ—এক শিলিঙ। তার হাতে ব্যাগটা দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। এক-জন বৃদ্ধ লোকের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিলুম, বাসে ক'রে যেতে হবে ডার্টফোর্ড অবধি, তারপর ডার্টফোর্ডে ট্রাম ধ'রে উলিজ, উলিজ থেকে গ্রীনিজ, তারপর ডেপ্টফোর্ড, তারপর লণ্ডনের সাদার্ক মহল্লা। আমরা তিনজন বাসের ছাদে চড়লুম। মারামারি রাজা ফেসাদের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু সকলের মুখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব—সবাই আশঙ্কার সঙ্গে কি দাঁড়ায় তারই অপেক্ষা করছে। বাসে চড়ে যেন একটু ভরসা হ'ল। বাঙলায় কথা ক'চ্ছি, সামনে এক ইংরেজ ব'সেছিল, সে দেখি কান খাড়া ক'রে শোনবার চেষ্টা ক'রছে। লোকটা একটী যেন আস্ত জন-বুল্; খুব মোটা চেহারা টক্‌টকে রাঙা, ঘাড়ে মুখে লাল শিরা দেখা যাচ্ছে, গা থেকে যেন রক্ত ফেটে পড়বার মত—গায়ের রঙ কসাইয়ের দোকানে টাঙিয়ে রাখা মাংসের মত। খানিক প'রে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—'কি ভাষায় কথা ক'চ্ছ? আমি ইণ্ডিয়া গিয়েছিলুম, কিন্তু এতো হিণ্ডুস্ট্যানি নয়।' আমি ব'ললুম, 'এ হ'চ্ছে বাঙলা; তুমি হিন্দুস্থানী জানো?' লোকটা ব'ললে—'টৌর‍্যা ম্যালোম—অর্থাৎ "থোড়া মালুম।" হাইদরাবাদে নাকি সে পাঁচ বছর ছিল এক ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে কুলীর সর্দ্দারী কাজে। লোকটা বেশ ভাল মানুষ বোধ হ'ল—লণ্ডনে যাবার পথ আমা-দের সব বুঝিয়ে দিতে লাগল। বাস্ ছেড়ে দিলে;

প্রথম বিলেতের মাটীর উপর দিয়ে আমাদের এই প্রয়াণ। ব—একটু ভাবুক গোছের; বিলেত—শেষটা সত্যিই আমরা বিলেতে পৌঁছেচি! বিলেতের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি! যেন এই চিন্তা তাকে একটু অভিভূত করে ফেল্লে। জি—ভাবুকতার ধার ধারে না, যাকে stolid common sense-ওয়ালা লোক বলে, ও তাই; বাস চলছে—পনেরো কুড়ি বা তিরিশ শিলিঙ খরচ করে লণ্ডন অবধি, মোটর ট্যাক্সি ভাড়া করতে হ'ল না—শিলিঙ খানেকের মধ্যেই সব হ'য়ে যাবে—এই চিন্তায় সে একটু বেশ প্রীতি অনুভব ক'রছে মনে হ'ল। রাস্তার দুধারে ঘর-বাড়ী, বাগান, পথ-চলতি লোক, গাড়ী, মোটর;—মনে হ'য়েছিল এ সব আমার কাছে কতই না জানি আশ্চর্য্য লাগবে—কিন্তু ও হরি! এ যে দেখি সবাই আমার চেনা! বিলেতে আসবার আগে ইংরেজি প'ড়ে, নভেল পড়ে, ছবি দেখে এখানকার লোকজন ঘর-বাড়ী রীতি-নীতির সঙ্গে আমা-দের আগেই একটা পরিচয় হ'য়ে যায়—আমরা অনেক জিনিস যেন দেখবার জন্যে তৈরী হ'য়েই আসি—সুতরাং নতুনত্ব তেমন থাকে না। আমার মনে হয়, যখন প্রথম কলকাতার বাইরে পুরী কি কাশী যাই, বা হরিদ্বারে আর মুসুরীতে হিমালয় দেখি তখন যেন নবীন-দর্শনের পুলক আরও বেশী হয়েছিল। পুরীর সমুদ্রের ধার, মন্দির, নানা জাতের লোকের সমাগম, স্থানীয় লোকদের সব সেকেলে বাড়ী; কাশীর পাথরের সব ঘাট, সরু সরু গলি, ওড়না গায়ে দেওয়া নথ নাকে পশ্চিমে মেয়ে; হরিদ্বারে গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা—দূরে হিমালয়ের বরফ, লছমন্-ঝোলার পাহাড়, গাছ-পালা আর গঙ্গা মিলে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে —এ সবে যেন একটা অজ্ঞাত জীবন আমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছিল—তাতে মনপ্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় রসে ভরে উঠ্‌ত। কিন্তু লণ্ডনের শহরতলীর সব যেন অতি common-place—ধূলি-ধূসরিত,এমন কি কদর্য্য মনে হতে লাগ্‌ল। শহরতলী দিয়ে লণ্ডনে ঢুক-লুম—রেলের ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই বড় সড়কের চটকে অভিভূত হ'য়ে পড়া বরাতে ঘট্‌ল না। মনে হ'ল, এ তো কলকাতার ভাব দেখ্‌ছি—আর সব ছবিতেও তো ঠিক এমনিটিই দেখিছি। বাস ছুটছে কানের পাশ দিয়ে হাওয়া সো-সো করে যাচ্ছে, সেইটীই বা একটু নতুন লাগ্‌ল।

ডার্টফোর্ডে বাস বদলে ট্রামে যেতে হ'ল। সঙ্গী ইংরেজটীও ট্রামে ঢুকলো। আমরা তিন কালো আদমী যাচ্ছি; ব—এব কৌতুকবিস্ফারিত নেত্র, আমাদের ব্যাগে জাহাজের লেবেল আঁটা, আর খুব সম্ভব আমাদের পোষাক (আমি পরে ছিলুম এক ফ্লানেলের পেন্‌টুলেন, আর এক গলুফ কোট, জি—র সাদা পোষাক, আর ব—এর গলা-আঁটা কোট—এখানে দেখছি কেউই সাদা পোষাক পরে না)—দেখে, ট্রামে এক গাদা মেয়ে-পুরুষ উঠল, তারা আড়চোখে চাইতে লাগ্‌ল—দুটী ছোট মেয়ে তো হাঁ ক'রে তাকিয়েই রইল। ইংরেজপুঙ্গব একটু অনাবশ্যক পাণ্ডাগিরি ক'রে নিজের প্রতিও আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কৃতার্থ হ'ল; একটা জায়গা খালি হ'তে খামকা চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—'য়হান্ ব্যায়টো,' কিনা, 'য়হাঁ বৈঠো'। কাজেই গাড়ীর মধ্যে আর সবাই বুঝ্‌লে যে এই ইংরেজটী মস্ত প্রাচ্যভাষাবিৎ—দু একজন একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে তার প্রতি তাকালে। তাতে সে উৎসাহিত হ'য়ে দু-চার মিনিট অন্তর (বোধ হয় মনে মনে কথাগুলো আউড়ে নিয়ে) একটা একটা করে হিন্দুস্থানী বচন আমাদের উপর ছাড়তে লাগল—ডেইকো (দেখে) আর 'লান্নন শ্যার বৌট্ বর্য্যা শ্যার' (লণ্ডন শহর্ বহুৎ বড়া শহর্) 'বৌট ড্যাক্যান, বৌট্ অ্যাড্‌মি,—এই রকম অমূল্য তথ্য আমাদের দিতে লাগল। আমার ভারী মজা লাগ্‌ছিল; আমি একটু শক্ত হিন্দুস্থানীতে তাকে লম্বা একটা কি কথা ব'লুম; দেখলুম বুঝ্‌তে পারলে না, একটু ঠোকর খাওয়া ভাবে তাকিয়ে হাস্‌তে লাগল মাত্র। তাকে খুসী করবার জন্য আমি শেষটা দু একটি হিন্দুস্থানী শব্দ ওজন ক'রে ক'রে বলতে লাগলুম; সেগুলো বুঝতে পরে সে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করলে। যখন নেমে গেল, তখন খুব ঘাড় নেড়ে 'সালাম' 'সালাম' ক'রে গেল।

ডার্টফোর্ড, উলিজ, গ্রীনিজ, ডেপ্টফোর্ড—বাসে আর ট্রামে চ'ড়ে বায়স্কোপের ছবিতে শহর দেখার মত

চোখের সামনে দিয়ে চ'লে গেল। সব গরীব লোকেদের জন-মজুরদের জন্য লম্বা লম্বা বস্তী খুব দেখলুম—সেগুলি বেশ ভাল লাগ্‌ল। ষ্ট্রাইকের লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। ডেপ্‌ট্‌ফোর্ডে ট্রাম ছেড়ে বাস ধরতে হবে। এক পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সাউথ কেন্‌সিংটান্ যেতে চাই, কোন্ বাসে চড়বো? এখন এখানে সব ট্রাম আর বাসের লাইন এত বেশী যে সংক্ষেপে নম্বরে উল্লিখিত হয়; কলকাতায়ও হয়ত এই রকম দাঁড়াবে, ট্রাম আর একটুখানি প্রসার লাভ ক'রলে; যেমন, শ্যামবাজারের লাইনকে একের লাইন, শিয়ালদার লাইনকে দুইয়ের লাইন, কালীঘাটের লাইনকে বারোর লাইন বলা—এই রকম। পাহারাওয়ালা ব'লে দিলে—অমুক নম্বরে চ'ড়ে ওয়াটার্লু ষ্টেশন অবধি যাও; সেখানে বাস্ বদ্‌লে অমুক নম্বরে চড়ে হাইড্‌পার্ক কর্ণার; তারপর সেখানে আবার বাস বদ্‌লে সাউথ কেন্‌সিংটন। ডেপ্টফোর্ডে বাসে ঠাঁই মিল্‌ল—কিন্তু বড্ড ভিড়, আমার মস্ত কিট্‌ব্যাগ নিয়ে জায়গা করা মুস্কিল হ'ল। ডেপ্‌ট্‌ফোর্ড থেকেই আসল লণ্ডন; ওঃ, কি ভয়ানক রাক্ষুসে শহর! একেবারে নতুন আমদানী আমরা; পথ-ঘাট কিছুই জানি না; গ্রেভ্‌সেণ্ড ছেড়েছি সকাল এগারোটা, এখন বাজে প্রায় তিনটে; কিছু খাওয়া-দাওয়া হয় নি। ক্রমাগত রাস্তার পর রাস্তা দিয়ে বাস্ চ'লেছে। ওয়াটার্লু ষ্টেশনে যখন পৌঁছুলুম, তখন দেখি, বাস বদ্‌লে অন্য বাসে চড়া মুস্কিল। ভয়ানক ভিড়; টিউব্-রেল চল্‌ছে না, বড় রেল চল্‌ছে না, একমাত্র বাস হ'চ্ছে সাধারণ লোকের আশ্রয়, কাজেই এক এক বাস্ এসে দাঁড়াতেই ৫০।৬০।৮০ জন লোক তাতে ওঠবার জন্য ধাক্কা-ধাক্কি করতে লাগ্‌ল। আমরা অতি বিপদে পড়লুম; ভারী ব্যাগ নিয়ে ধাক্কা সামলানো দায় হল। বাসের প্রত্যাশা ছেড়ে ট্যাক্সীর চেষ্টা দেখতে লাগলুম, মিল্‌ল না; শেষে তিনজনে কোনও রকমে একটা বাসে ঢুকে পড়লুম। হাইড্‌পার্ক কর্ণারে গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিভীষিকা লাগ্‌তে লাগ্‌ল! কি ভিড়, আর কি বাস আর মোটরের দৌড়! বিবেচনা ক'রে দেখলুম। আবার বাসে চড়বার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। একটী ইংরেজ মহিলা আমাদের রাস্তা-হারিয়ে-যাবার মত ভাব দেখে বুঝতে পারলেন যে আমরা নতুন আমদানী—কোথায় যাবো জান্‌তে চাইলেন। তাঁর নির্দ্দেশমত একটু দূরে এক ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা থেকে ব—গিয়ে এক ক্যাব নিয়ে এল। আমরা তিন জন তাতে উঠলুম—আর মহিলাটী বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনিও ক্রমওয়েল রোডের দিকে যাচ্ছেন শুনে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিলুম। এইরূপে বেলা প্রায় পাঁচটায় ২১ নম্বর ক্রমওয়েল রোডে আমাদের আগমন। সেখানে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান্ এশোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীমতী বেক্ আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এই রকমে লণ্ডন পৌঁছুলুম। গ্রেভ্‌সেণ্ড থেকে ক্রমওয়েল রোড, এই তিরিশ মাইল আন্দাজ পথ আমরা যে করে এসেছি তার একটা অস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে রয়েছে,—এখন লণ্ডনের অনেক জায়গা ঘুরেছি, এ শহরটার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, এর উপর একটা কেমন টানও হ'য়ে যাচ্ছে—কিন্তু এই পরিচয়-সত্ত্বেও প্রথম দিনের লণ্ডনের ছাপ যা আমাদের মগজে প'ড়েছে সেটা কিন্তু যায় নি—লোক-জন, বাড়ী ঘর, ট্রাম-মোটরের উদ্দাম গতি, গাছপালায় আর মেয়েদের পোষাকে রঙের খেলা, একটা রাক্ষুসে আর অতি ভয়াবহ, সর্ব্বগ্রাসী, জীবনস্রোত, ধাক্কাধাক্কি, মোটরের ভেঁপুর রব, ঘোড়ার তড়বড়ি এ সব মিলে মিশে একাকার হ'য়ে ফিউচারিস্ট বা ফিউবারিষ্ট চিত্রকরদের আজগুবি সৃষ্টির মত আবছা আবছা ভাবে চোখের সামনে ভাস্‌ছে।

আমাদের লণ্ডনে আসা এই রকম একটু নতুন ভাবে হ'ল। প্রথম থেকেই লণ্ডনের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করতে পেরেছি। একটা ভারী অস্বস্তি বোধ হ'ত লণ্ডনের রাস্তায় বার হ'লেই! মনে হ'ত যেন কি একটা ভয়ানক ঘূর্ণিপাকের টান মানুষকে টেনে নিয়ে ফেলতে চায়, যেন লণ্ডনের যাঁতা-কল সবাইকে পিষে ফেলতে চায়। ক্রমাগত রাস্তা, মাইলের পর মাইল, অফুরন্ত রাস্তা, বড় বড় বাড়ী—পা ব্যথা ক'রত হেঁটে, চোখ ব্যথা ক'রত দেখে। রাস্তায় চ'লতে চ'লতে

খালি যে পা খাটত তা নয়, চোখেরও বিরাম ছিল না, কানকেও সজাগ থাক্‌তে হ'ত, মনও ভ্রমণের কাজে নিবিষ্ট হ'তে পারত না—নানা বিষয়ে তাকে টানাটানি ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে ফেল্‌ত। পাড়াগাঁ থেকে কোন ছেলেকে এনে চিৎপুর আর বড়বাজারে ছেড়ে দিলে বোধ হয় তার এমনি অবস্থাই হয়। ক্রমে কিন্তু সব বরদাস্ত হ'য়ে গেছে; শহরের ধাত বুঝ্‌তে পাচ্ছি; এখন একে ভালই লাগ্‌ছে।

ক্রমওয়েল রোডে আমরা পৌঁছুতে আমাদের বাহাদুরিকে দু এক জন তারিফ ক'রলেন। জাহাজের বন্ধুদের নামিয়ে আনবার জন্য এঁরা কত চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। ষ্ট্রাইকের জন্য লণ্ডনে খাবার আমদানি বন্ধ হ'ল; আমাদের তো ক'দিন সেপাইয়ের রসদের মত ওজন করে জিনিস দেবার ভাব ক'রলে। আমাদের adventure-এর দুদিন পরে জাহাজ থেকে বন্ধুরা মুক্তিলাভ করে এসে পড়লেন। কিন্তু ষ্ট্রাইক তখনও থামে নি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সবুজপত্র, কার্ত্তিক ১৩২১।

কোনো নেতার প্রতি

দশে যা' বর্জ্জন করে, লোকে বলে, সেই আবর্জ্জনা;
তাই শিরোধার্য্য হ'ল? তাই হ'ল তব উপার্জ্জন?
বিদেশীর দরজায় পেয়ে উঞ্ছ উচ্ছিষ্টের কণা
থেমে গেল অকস্মাৎ তুণ্ড-পুটে সিংহের গর্জ্জন!

স্বদেশ একদা যারে দিয়েছিল ফুলের মুকুট
এ কি হায় সেই তুমি? মর্য্যাদায় রাজার অধিক—
ছিল যেই? এ কি ভিক্ষাবৃত্তি আজ? এ কি ঝুটমুট—
ঝুটা সম্মানের লাগি' সম্মানীর লাঞ্ছনা, হা ধিক্!

জীয়ন্তে জালিয়াঁ-বাগে পুঁতে ফেলে ভারত-মাতায়,
শ্রাদ্ধে দেবে স্বর্ণ-ধেনু; অগ্রাহ্য সে অমানুষ দান;
ভাটেরা আসুক ছুটে, দলে দলে, ক্ষতি নাই তায়,
তুমি যে ভিড়েছ সঙ্গে, এই দাগা, এই অপমান।

না লুকাতে রক্তচিহ্ন, না শুকাতে নয়নের পানি,
প্রবীণ স্বদেশ-ভক্ত! যেচে গিয়ে হ'লে অগ্রদানী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চয়ন

পরীর ফোটো

পরীর ফোটোগ্রাফ!—অতি-বড় গাঁজা-খোরেও এ-কথা শুন্‌লে হেসে গড়িয়ে পড়্‌বে। কিন্তু বিলাত থেকে স্যার আর্থার কন্যান ডইল পৃথিবীকে জানিয়েচেন যে, সরল শৈশবের সোনার স্বপনেই এবং কুসংস্কারের অন্ধকারেই পরীর দল বাস করে না;—এখনকার এই বিজ্ঞান-প্রধান গদ্যময় সভ্যতায়, বাস্তব-জগতেও সত্য-সত্যই পরীর অস্তিত্ব আছে। খালি পরী নয়—বিলাতী গল্পে বালখিল্য মুনিদের মতন ছোট ছোট যে gnome বা "নোমে"দের কথা শোনা যায়—গুপ্তরত্ন পাহারা দেওয়াই যাদের কাজ, তারা পর্য্যন্ত মানুষের কাছে আসে, নাচে-গায়, বাজনা বাজায়—এমন-কি ফোটো তোলাতেও অপত্তি জানায় না!

বাস্তবিক, এ-সব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্যার কন্যান ডইলও জোর ক'রে কাউকে বিশ্বাস করতে বল্‌চেন না। কিন্তু তিনি এবং অন্যান্য আরো অনেকে বিশেষরূপে পরীক্ষা ক'রেও এ ব্যাপারটার মধ্যে কোন-রকম জাল-জুয়াচুরি আবিষ্কার করতে পারেন নি। স্যার কন্যান ডইল সে-সব কথা বিস্তৃতভাবে পাঠকদের সাম্‌নে এনে ধর্‌চেন। এখানে সে-সমস্তের ঠাঁই হওয়া অসম্ভব।

আইরিস ও বেঁটে বক্

যাঁদের কৌতূহল হবে, তাঁরা গেল-ডিসেম্বরের ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগ্যাজিন প'ড়ে দেখতে পারেন!

আসল ঘটনা সংক্ষেপে এই।—

আইরিস ও অ্যালিস দুটি মেয়ে—সম্পর্কে তারা বোন। আইরিসের বাপ বিলাতের একজন বিশিষ্ট ধার্ম্মিক লোক।

আইরিস প্রায়ই তার বাপকে এসে বল্‌ত যে, অ্যালিসের সঙ্গে বনের ভিতরে গেলে সে পরীদের দেখা পায়—পরীদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয়েচে। বলা বহুল্য আইরিসের বয়স বোলো বৎসর হ'লেও তার বাপ এ-সব কথা তাহা কল্পনা ব'লেই উড়িয়ে দিতেন।

কিন্তু আইরিসের মুখে ক্রমাগত এক কথা শুনে ও তার আবদারের দায়ে প'ড়ে বাপ শেষটা মেয়ের হাতে একদিন একটি ক্যামেরা দিলেন। আইরিস তার বোন অ্যালিসকে একটি পুকুর-পাড়ে বসিয়ে, উপরে মিঃ স্নেলিং নামে ফোটোগ্রাফের একখানা ছবি তুলে বাড়ীতে ফিরে এল। সেই ছবিখানা দেখে বাপ একেবারে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কারণ ছবির ভিতরে অ্যালিসের চারপাশে একদল ছোট ছোট ডানাওয়ালা পরী দেখা গেল—নাচের আমোদে তারা মেতে আছে!

মাস-দুয়েক পরে আর-একখানা ফোটোতে আইরিসের সঙ্গে একটি "নোমে"র মূর্ত্তি উঠ্‌ল, সে খালি নাচ্‌ছে না—সেইসঙ্গে বাঁশীও বাজাচ্ছে!

ফোটোগ্রাফের ভিতরে অনেক সময়ে "ডবল এক্সপোসারে"র দ্বারা জাল-জুয়াচুরি চলে। কিন্তু "নেগেটিভ" দেখলেই সে-রকম জালিয়াতি ধরা পড়ে যায়। এই দুখানি বিচিত্র ফোটোর "নেগেটিভ" স্যার কন্যান ডইল স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে দেখেচেন। তার

অ্যালিস ও পরীর দল

একজন প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞকেও "নেগেটিভ" ছবিগুলো পরীক্ষার জন্যে দেওয়া হয়েছিল। বিলাতের বিখ্যাত "অটোটাইপ কোম্পানী" এবং ইলিংওয়ার্থের ফোটোগ্রাফের প্রকাণ্ড কারখানার সঙ্গে আজ ত্রিশ বৎসরের উপর তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যত-বড় পাকা জুয়াচোরই হোক্ না কেন, তাঁর চোখে ধূলা দেওয়া অসম্ভব,—কেননা ফোটোগ্রাফের সমস্ত গুপ্তকথাই তাঁর নখদর্পনে! মিঃ হেলিং তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষার পর বলেছেন—"এই 'নেগেটিভ' দুখানা একেবারে আসল,এর-মধ্যে নকলের বা জাল-জুয়াচুরির নামগন্ধও নেই।"

আইরিস বলেছে, পরীদের উপরে তার কোন শক্তি নেই। তবে সে যখন বনের মাঝে গিয়ে শান্তভাবে ব'সে একমনে পরীদের কথা চিন্তা করে এবং তারপর দূর থেকে যখন একটা অস্পষ্ট শব্দ বা গতির ধ্বনি শুনতে পায়, তখন পরীরা আসচে বুঝে তাদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে কাছে ডেকে আনে!

এখানে অনেকে ভাবতে পারেন, এত লোক থাকতে এই দুটি মেয়েই কেবল পরী ও 'নোম' দেখতে পেলে কেন?

এর সোজা উত্তর, এই মেয়েদুটির ভিতরে এমন কোন অলৌকিক শক্তি আছে, যা অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই নেই। হয়তো আরো কত অজানা লোক এমন-সব বিচিত্র দৃশ্য দেখেচে, কিন্তু তারা হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে গুপ্তকথা কথা ব্যক্ত করে নি, কিংবা কারুর কাছে প্রকাশ ক'রে থাকলেও সে তা গাঁজাখুরি ব'লে উড়িয়ে দিয়েচে—ফলে সর্ব্বসাধারণের কাণে আজ-পর্য্যন্ত পৌঁছবার সুযোগ পায় নি।

সব-চেয়ে পুরোণো পট

যতদূর জানা গেছে তাতে বলা যায় যে, সব-চেয়ে পুরোণো ছবি যে পটুয়া এঁকেছে, আজ থেকে বিশ হাজার বৎসর আগে সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে!

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্যার রে, ল্যাঙ্কেষ্টার অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচেন।

সে সময়ে মানুষরা পাহাড়ের গুহায় বাস করত। গুহার বাইরে তখন সেকালকার সব ভীষণদর্শন অতি-কায় জীবজন্তু মানুষের ঘাড় মটকাবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকত। সে-সব জীব আর পৃথিবীতে টিকে নেই। বাঁচা গেছে!

সেই আদি শিল্পী একটি মৃগ-শৃঙ্গের উপরে বসে বসে এই প্রথম ছবিখানি খুদে' খুদে' এঁকেছিল। পণ্ডিতদের মতে, ছবি-আঁকাই ছিল তার প্রধান কাজ।

দক্ষিণ-ফ্রান্সের একটি প্রকাণ্ড গুহার ভিতর থেকে, সেকালের ব্যবহার্য্য আরো অনেক জিনিষের সঙ্গে এই ছবিখানি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ছবিখানি ছাপ মারবার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। চর্ব্বির সঙ্গে ভূষো মিশিয়ে ছবিতে মাখিয়ে, গাছের ছালের পোষাক বা পশু-চর্ম্মের উপরে এই চিত্রের ছাপ মারা হোতো ব'লেই পণ্ডিতরা অনুমান করেন। এতদিন পরে একালেও

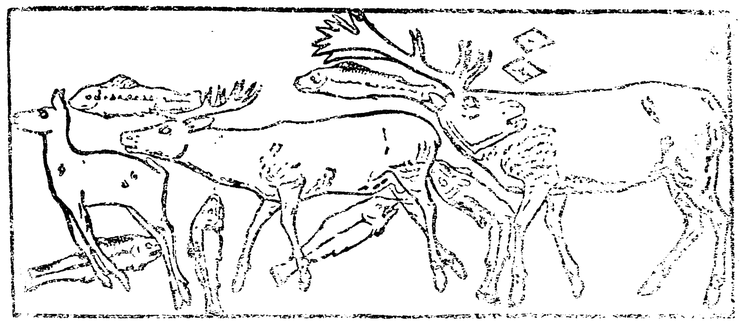

সব-চেয়ে পুরোনো পট

এই নক্সার 'ব্লক' খানি ছাপিয়ে চমৎকার ছবি তোলা গেছে।

ছবিখানি জায়গায় জায়গায় খারাপ হয়ে গেলেও, এখনো এর নিপুণ অঙ্কন-পদ্ধতি দেখলে তারিফ করতে হয়। অত কাল আগেও শিল্পীরা যে কতটা স্বাভাবিক মূর্ত্তি আঁকতে পারত, না-দেখলে তা বিশ্বাস করা সহজ নয়। রেখাগুলিও যথেষ্ট হাতের কায়দার পরিচয় দিচ্ছে।

ছবিতে তিনটি হরিণ আর কতকগুলি মাছের রেখাচিত্র আছে। বড় হরিণের উপরেই যে দুটি সমচতুর্ভুজ রেখা রয়েছে, পণ্ডিতদের মতে সে দুটি শিল্পীর হাতের সই ছাড়া আর কিছুই নয়!

স্পিট্‌স্‌লার

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নোবেলের সাহিত্য-পুরস্কার এ বৎসরে কবি কার্ল স্পিট্‌স্‌লারকে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জাতে সুইস হ'লেও লিখতেন জার্মান ভাষায়। স্পিট্‌স্‌লার সুইজারল্যাণ্ডের প্রবীণ কবি। তিনি "Prometheus", "Epimetheus" ও "Olympischer" নামে গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন। তাঁর বয়স এখন পঁচাত্তর বৎসর।

তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু জানা যায় না। কারণ ক্ষুদ্র এক ভক্ত-মণ্ডলীর বাইরে, তাঁর নাম জানে এমন লোক খুব কম আছে। সেইজন্যে স্পিট্‌স্‌লার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ব'লে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই দস্তুরমত বিস্মিত হয়েছেন।

সৃষ্টিক্ষমতায় স্পিট্‌স্‌লার যে খুব একজন প্রতিভাবান লেখক, তাও নয়; তবে উঁচুদরের কবি ব'লে স্বদেশে, ফ্রান্সে ও জার্মেনীতে কাব্য-রসিকরা তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন ক'রে থাকেন। ফ্রান্সে তিনি "সুইস ফ্লাবেয়ার" (ফ্রান্সের একজন নামজাদা লেখক এবং মোপাসাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের গুরুস্থানীয়) নামে বিখ্যাত। জার্মেনীতেও তাঁর ভক্তের অভাব ছিল না।

কিন্তু গেল যুদ্ধের সময়ে তিনি জার্মানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন ব'লে, জার্মান ভক্তরা নাকি তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেচেন। তাই তাঁর স্বদেশী ভক্তরা জার্মানদের দ্বারা নিন্দিত এই কবির সত্তর জন্মদিনে, গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিপুল এক উৎসবের আয়োজন ক'রে-ছিলেন।

হাম্‌জুন্

১৯২০ খৃষ্টাব্দের নোবেলের সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন নুট্ হাম্‌জুন। হাম্‌জুন নরওয়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং জন-সাধারণের কাছে তিনি ঋষি ও কবি রূপেও পরিচিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট মাসে তাঁর জন্ম। তাঁর বাপ-মা ছিলেন বড়ই

নুট্ হাম্‌জুন

গরিব। ছেলে-বেলায় মুচীর কাজ করতে করতে তিনি কবি লিখতেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস ও কবিতার বই প্রকাশিত হয়।

কিন্তু মুচীগিরির কাজ তাঁর ভালো লাগ্‌ল না। সুদূরের টানে তিনি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি চাকরের কাজ থেকে সুরু ক'রে কেরাণীগিরি পর্য্যন্ত নানান রকম কাজে জীবিকানির্ব্বাহ করেন। এ-সময়টায় তিনি সাহিত্য-সাধনা করেছিলেন খুবই অল্প। মাঝে দিনকতক নাস্তিক ও বিপ্লববাদীর দলে ভিড়ে তিনি আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। তারপর চিকিৎসকরা সন্দেহ করেন, তাঁর যক্ষ্মারোগ হয়েচে। এর পর তিনি ধর্ম্মপ্রচারকের কাজে ও ধর্ম্ম-সাধনায় নিযুক্ত হয়ে কিছুকাল কাটিয়ে দেন।

কিন্তু এই ঘটনা-বহুল জীবনের বিচিত্রতার মধ্য থেকেও স্বদেশের মায়ায় তাঁর মন কেঁদে উঠ্‌ত। ঘরের ডাকে তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন। (১৮৮৫) কিন্তু কোপেনহেগেনে এসে বন্ধু ও অর্থের অভাবে তাঁর জীবন এমন ভয়ানক হয়ে ওঠে যে, তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছিলেন।

তারপর তিনি সাহিত্যকে উপজীবিকা-রূপে গ্রহণ করলেন। প্রথম প্রথম সাহিত্যও তাঁর পেটের ক্ষুধা মেটাতে পারে-নি। কিন্তু তিন বৎসর কাল একখানি জেলে-নৌকায় বাস ক'রে তিনি Hunger নামে যে আত্মজীবনীমূলক চিত্র বা উপন্যাসখানি লিখলেন, তাইতেই তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। Hunger প্রথমে একখানি

দিনেমার সংবাদপত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এখানি পড়েই সকলে তাঁকে প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক ব'লে মাথায় তুলে নেয়। এর পর তিনি ক্রমাগত বই লিখতে সুরু করেন। তাঁর সব-চেয়ে আধুনিক উপন্যাসের নাম "Pan";—এটি একটি প্রেমের কাহিনী। এ ছাড়া হাম্‌জুনের "Mystries," "Editor Lange" ও "The Earth" নামে উপন্যাসগুলিও খুব বিখ্যাত।

তাঁর উপন্যাসের ভিতরে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ভাবের আবেগ এবং স্বপ্নময় অজানা রহস্যের মিলন দেখা যায়। একদিকে তিনি যেমন কল্পনার বল্গা খুলে দিয়ে আমাদিগকে সুমধুর স্বপ্নের রাজ্যে উধাও ক'রে নিয়ে যান, অন্যদিকে তেম্‌নি মানব-আত্মা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করেন এবং আধুনিক জীবনের শত ত্রুটি দেখিয়ে, আপনার তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তির পরিচয় দেন।

নাটক-রচনাতেও তিনি অসাধারণ নাম কিনেচেন। নাট্যকলার প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক বিরাগ থাকলেও, তাঁর চমৎকার নাট্য-রচনাকে তা ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাঁর রচিত "At the Door of the Wealthy", "Queen Tamara" (তাঁর সেরা নাটক) ও "Munken Vendt" প্রভৃতি নামের নাটকগুলি দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেও, হাম্‌জুন তাঁর নির্জ্জন সাধনা-কুঞ্জ ছেড়ে, বাইরের জীবনোল্লাসের মধ্যে আর ঝাঁপ দিতে চান না। খ্যাতি বা সম্মানের তিনি কোনই তোয়াক্কা রাখেন না। তাঁর

পঞ্চাশ জন্মোৎসবের সময়ে দেশবাসীরা যখন "জীবন্ত কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" ব'লে তাঁকে অভিনন্দন দান করেছিল, তখনই তিনি বিজন বন-ভূমির মাঝখানে একখানি কুঁড়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে আপনাকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর ভক্তদের উপদ্রব সুরু হওয়াতে, তিনি আরো দূরে পালিয়ে গিয়ে, আপনার শৈশবের এক ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

এখন তাঁর বয়স একষট্টি বৎসর। কিন্তু তিনি যে নিজেকে বুড়ো ব'লে ভাবেন না, তাঁর "A Wanderer Plays With the Sardine" নামে উপন্যাসেই তার প্রমাণ আছে। লোকে বুড়োকেই সম্মানের ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেয়, তিনি কিন্তু "Honor to the Young" নামে রচনায় যৌবনের কণ্ঠেই শ্রদ্ধার মাল্য অর্পণ করেছেন। পাঠক দেখবেন, আমাদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক বিষয়ে হাম্‌জুনের মিল আছে!

পরলোকে টেলিফোন

আগুনের-শিখায় যখন নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, মানুষের আত্মা কি তখনো পরলোকে জীবন্ত হয়ে থাকে?

আর পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব যদি মেনেও নেওয়া যায়, তাহলে তারা কি বৈতরণীর এপারের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারে? বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা এখন নানান রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর বহু দূর-দূরান্তর থেকে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারি! তেম্‌নি কোন সূক্ষ্মতর যন্ত্রের সাহায্যে নরলোক থেকে পরলোকের খবর পাওয়া সম্ভব কি না?

এ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক মিঃ টমাস, এ, এডিসন বলেন, "এমন ব্যাপার অসম্ভব নয়!" তাঁর মতে বিজ্ঞানের দ্বারা এ সমস্যা সমাধান করা যায়। তিনি একটি নতুন-রকমের যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করেছেন। পরলোকে সত্যি-সত্যিই যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে এই যন্ত্রের মধ্যস্থতায় ইহলোকে সে বার্ত্তা প্রেরণ করতে পারবে।

তবে এখানে একটি মস্ত "কিন্তু" আছে। যে-সে প্রেতাত্মা এই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পারবে না। পৃথিবীতে যারা টেলিগ্রাফ বা বেতার টেলিফোন প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করতে জান্‌ত, এই নতুন যন্ত্রে কেবল তাদেরই মনের কথা ধরা সম্ভব হবে।

এডিসন বলেন, এখন "মিডিয়াম"র সাহায্যে যে-ভাবে প্রেতাত্মাকে আহ্বান করা হয়, সে ব্যাপারটা যেমন আজগুবি, তেম্‌নি বিজ্ঞান-বিরোধী। তথাকথিত অনেক "মিডিয়াম"ই জুয়াচোর;—অবশ্য সাধু "মিডিয়াম"ও আছেন—কিন্তু তাঁরা যা দেখেন ও যা শোনেন, সমস্তই আত্ম-সম্মোহনে অভিভূত হয়ে। এমনধারা ছেলেখেলা ক'রে কখনোই প্রেতলোকের বার্ত্তা পাওয়া যাবে না!

কিন্তু সত্যিই যদি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং মরণের অন্ধকার ভেদ ক'রে জীবনের চাঞ্চল্যের মধ্যে মনের ভাব জানাবার জন্যে যদি তারা বাস্তবিকই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তবে তারা জগতের ইথর-তরঙ্গ বা অন্য কোন শক্তির দ্বারা এডিসনের উদ্ভাবিত এই যন্ত্রের সাহায্যে বার্ত্তা প্রেরণ করতে পারবে।

অনেকে ভাবতে পারেন, এডিসনের এই চেষ্টাও ব্যর্থ চেষ্টায় পরিণত হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান এই ধরণের আরো অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যন্ত্রের সাহায্যে এখন অনেক মাইল দূর থেকে বাতির আলোর তাপের পরিমাণ স্থির করা যায়।—আকাশের সব-চেয়ে দূরবর্ত্তী তারার তাপও পৃথিবীর যন্ত্রে ধরা পড়ছে। এমন-কি কোন্ তারার বয়স অল্প আর কোন্ তারার বেশী, সেটা জানাও অসম্ভব নয়! পৃথিবীর এক-প্রান্তের মাটি একটুমাত্র কাঁপলে অন্য প্রান্তের যন্ত্রে তা টের পাওয়া যায়, এ খবর তো সকলেই রাখেন। রণক্ষেত্রের পরিখার জন্যে আর-একরকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েচে। ঘোর অমবস্যা রাত্রে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও, শত্রুপক্ষের অধিকৃত শত শত ফুট-দূরের পরিখার ভিতর থেকে কোন লোক যদি এক-পলকের জন্যেও মাথা তোলে, তবে তার মুখের তাপ পেয়ে যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ সকলকে ইসারা ক'রে সাবধান হ'তে বল্‌বে!

অবশ্য যারা এ-সব যন্ত্রের ব্যবহার জানে না, এদের কাছ থেকে তারা কোন কাজও পাবে না। কোন ডাক্তার বা উকিল একটি টেলিগ্রাফ-আপিসে গিয়ে নিজে নিজেই তারের খবর পাঠাতে পারেন না। তাই এডিসনের মতে, একজন অজ্ঞ লোক যে ম'রে গেলেই একেবারে সবজান্তা হয়ে উঠে যে-কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞতা দেখাতে পারবে, এও বড় অসম্ভব কথা। এইজন্যেই এডিসন মতপ্রকাশ করেছেন যে, কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ লোকের প্রেতাত্মারাই তাঁর যন্ত্রে সাড়া দিতে পারবে।

যন্ত্রটির সমস্ত গুপ্তকথা এডিসন এখনো প্রকাশ করেননি। তবে তিনি যেটুকু বলেছেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর এই নতুন উদ্ভাবনাটি ভৌতিক বেতার-যন্ত্রের কাজ করবে—জীবন্তের কাণে সে মৃতের কণ্ঠস্বর এনে শোনাবে!

যে হাত বায়স্কোপ আর গ্রামোফোনের সৃষ্টি করেচে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও হয়ত সে হাত ব্যর্থ হবে না। অদূর-ভবিষ্যতে হয়তো পৃথিবীতে মরণের রহস্য আর অজ্ঞাত থাকবে না—কারণ, আমাদের যখনি দরকার হবে, তখনি টেলি-ফোনের হাতল টিপে পরলোকগত আত্মীয়-বান্ধবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পারব!

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বহুমূত্র রোগে গত ১৭ই পৌষ তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একান্ন বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি নিঃসন্তান।

সুরেশচন্দ্র যৌবন-বয়স হইতেই বঙ্গ-বাণীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ সাধক যে বাংলা ভাষায় বেশী আছেন, আমাদের এমন বিশ্বাস নাই। সম্ভবত সাহিত্যের প্রতি এই গভীর নিষ্ঠা

তিনি তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে স্বাভাবিক ভাবেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এমন অনেক লেখক দেখা যায়, যাঁহাদের শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু লিখিয়াছেন অল্প। এঁদের কাছ হইতে লোকে আশা করে ঢের, কিন্তু আশা-পূরণের উপাদান পায় বড় কম। দুর্ভাগ্যক্রমে সুরেশচন্দ্র এই শ্রেণীর লেখক ছিলেন। সাহিত্যের সঙ্গে এতদিন সাক্ষাৎ-সম্পর্ক রাখিয়াও, নিজে এমন শক্তিধর হইয়াও, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তা মুঠা-ভরাও নয় এবং তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার পূর্ণ-পরিচয়ও পাওয়া যায় না।

অথচ তাঁহার হাতের ভিতর দিয়া অনেক অযোগ্য 'মানুষ' হইয়া গিয়াছে। বরাবর তিনি লেখক তৈরির চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন এবং নিজের ভাষার ইন্দ্রজালে অনেক কদর্য্য লেখাকেও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া সাধারণের চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ফলে অনেক সময়েই যে 'বাহবা' তাঁহার প্রাপ্য, তাঁহারই দৌলতে সেটা লাভ করিয়াছে অন্যে। এ কথা যে সত্য, সুরেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন।

লেখায় তাঁহার হাত যে কত মিঠা ছিল, সুরেশচন্দ্রের ছোটগল্পগুলিই তাহার প্রধান প্রমাণ। বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগে অল্প যে কয়েকজন লেখক প্রথম ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, সুরেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার রচিত "বাঘের নখ" ও "প্রাইভেট টিউটার" "কমলা" প্রভৃতি গল্প কতকাল আগে পড়িয়াছি, কিন্তু এখনো সেগুলির কথা ভুলিয়া যাই নাই। মনে হইতেছে, "সাধনা"য় রবীন্দ্রনাথও ছোটগল্প লেখায় সুরেশচন্দ্রের নিজস্ব নিপুণতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সমালোচক-রূপেও সাহিত্য-সমাজে সুরেশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আছে। "মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা" তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের জিনিষ। মাসিক পত্রে তাঁহার আগে এ ব্যাপারটির অনুষ্ঠান আর কেউ করেন নাই। সকলেই দেখিয়াছি, "সাহিত্যে"র পাতা উল্টাইয়া সর্ব্বাগ্রে এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পাঠ করিতে বসিয়াছেন! এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এতটা উপভোগ্য হইবার কারণ, ইহার স্বচ্ছন্দ লিখনভঙ্গী, সমুজ্জ্বল হাস্যরস, অম্লমধুর রঙ্গ-ব্যঙ্গ! এমন-কি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনি পর্য্যন্ত ইহার রস-উপভোগে বিমুখ হইতে পারিতেন না—পেটুকের পাতে রুইমাছের ঝাল-তরকারি পড়িলে যেমন না খাইয়া থাকিতে পারে না, এও তেম্‌নি! দীর্ঘকালের আলোচনায় ভুলচুক থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু দোষে-গুণে জড়াইয়া এই "মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা" যে একটি অপূর্ব্ব ও বিচিত্র অনুষ্ঠান এবং ইহার সার্থকতাও যে অল্প নয়, তাহা কোনরকমেই অস্বীকার করা চলে না। তা ছাড়া এ জিনিষটি বাংলার সম-সাময়িক মাসিক-সাহিত্যের একটী সূচীপত্রের মতনও হইয়া রহিল। সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাংলা মাসিক-সাহিত্যের ধারা কখন্ কোন্ পথে ছুটিয়াছে, কবে কোন্ লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন,

কে কি জিনিষ লইয়া সাহিত্যের হাটে আসিয়া নামিয়াছেন, এ-সব তথ্য ঐ মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার উপরে একবার-মাত্র চোখ বুলাইয়া গেলেই জানিতে পারা যাইবে; সুরেশচন্দ্রের সমালোচনার সঙ্গে সকলের মতের মিল না থাকিতে পারে, কিন্তু এ-সব লাভও বড় যে-সে লাভ নয়!

সম্পাদক রূপে সুরেশচন্দ্রের শক্তি অতি-বড় শত্রুও স্বীকার করিতে বাধ্য। বাংলা দেশের একজন ক্ষমতাবান ও সুযোগ্য সম্পাদক বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম লেখা থাকিবে। দৈনিক "বাঙ্গালী" এবং সাপ্তাহিক "বসুমতী" তাঁহার সম্পাদকতায় কতটা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে কথা তখনকার পাঠকমাত্রেই বলিতে পারিবেন। তাছাড়া তিনি কিছুকাল দৈনিক "নায়কে"রও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন।

কিন্তু সুরেশচন্দ্রের সমগ্র জীবনের প্রধান কীর্ত্তি হইতেছে, মাসিকপত্র "সাহিত্য"। তরুণ বয়সে, দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি সেই যে "সাহিত্যের" সেবার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তারপর মৃত্যুশয্যায় শুইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ধনী ছিলেন না—বরং নিজের দারিদ্র্যের গর্ব্ব করিতেন। সুতরাং কত বাধা-বিঘ্ন, অভাব ও দুশ্চিন্তার মধ্যে, কত ঝড়-ঝাপটা সহিয়াও "সাহিত্যে"র জীবন-প্রদীপটি তিনি দুই হাতের আড়ালে এতদিন সস্নেহে জ্বালাইয়া রাখিয়া ছিলেন, সে কথা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়। যে দেশে ধনীর অজস্র অর্থব্যয়ও অধিকাংশ সাময়িক পত্রের জীবনকে দীর্ঘ করিতে পারে না, সে দেশে এই অভাবিত সাফল্য সুরেশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সাহিত্য-প্রীতি এবং দুর্লভ শক্তির পরিচয় দিতেছে।

"সাহিত্য" বরাবর বাংলা দেশের একখানি প্রধান ও প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র বলিয়া আদর ও সম্মান পাইয়া আসিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকেরই হাতের ছাপ তাহার গায়ে অঙ্কিত আছে। "নব্যভারত" ছাড়া বাংলার আর কোন মাসিক-পত্রই এতকাল ধরিয়া কেবলমাত্র একজনের প্রাণপণ চেষ্টায় ও সেবায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। আজ সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে "সাহিত্যে"র জীবন-শিখাও নিবিয়া গেল। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটা একটা মস্ত দুঃখের বিষয়; কারণ এদেশে ভালো মাসিক কাগজ দুই-তিনখানির বেশী নাই।

অকাল-মৃত সুরেশচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-প্রার্থনা এবং তাঁহার শোকতপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমরা বিদায় হইলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

কলিকাতা।

আলোচনা

গত মাসের ভারতীতে "নাস্তিকের গল্প" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "মিল তর্কের ঝড় ছুটিয়ে শেষ জীবনে মৃত্যু শয্যায় যখন দেখেন যে আর জীবন যেতে বাকী নাই, তখন তাঁর বন্ধুদের দিকে চেয়ে বল্লেন "ভগবান নামক কোন জিনিষ তোমরা বিশ্বাস কর?" সকলেই বলে উঠলেন, "খুব—মিল, জীবন থাকতে তুমিও বলে যাও, ভগবান আছেন, ক্ষমা পাবে।" তখন তর্করাজ শেষ নিশ্বাস টান্‌তে টান্‌তে বল্লেন, "If there be any God, let Him forgive me" মৃত্যুর গলা টিপনী খেয়ে তাঁর মুখে এই নাম বাহির হল।" আমিও পাঠ্যাবস্থায় এক পাদরী সাহেবের বক্তৃতায় শুনিয়াছিলাম যে মিল বলিয়াছিলেন "If there be any God and if there be any soul, let God save my soul." কিন্তু এ পর্য্যন্ত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এবং এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াও এই উক্তির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। কয়েকজন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপককেও এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারাও এ বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। আমার ধারণা এইরূপ অমূলক উক্তি নাস্তিক-বিদ্বেষী পাদরী দ্বারা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। লেখক যদি কোন খ্যাতনামা লেখকের গ্রন্থ হইতে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত এবং বাধিত হইব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র তট্টাচার্য্য।

তারকা ও ফুল

সে ডাকি' কহিল, পথের ধুলায় লুটি,'
—সেফালির মত সকরুণ আঁখি দুটি,
'লহ ওগো মোরে লহ,
নিষ্ঠুর তুমি নহ!'—
সুন্দর ফুল, কেন উঠেছিলে ফুটি'?
কেমনে কুড়া'ব?—জোড়া যে এ হাত দুটি!

সে ডাকি' কহিল সাঁঝের গগনে ফুটি',
—তারকার মত সুগভীর আঁখি দুটি,
'বন্ধু, তোমারে চাই
এই আকাশের ঠাঁই!'—
সুদূর স্বপন, কে দিবে আমারে ছুটি?
মাটির ঢেলায় চাপা যে চরণ দুটি!

সে যবে কহিল নখেতে কাঁকন খুঁটি',
—রমণী আমার, আনত নয়নদুটি,
'ব্যথার নিশীথে প্রিয়,
আমারে জাগায়ে দিও!'
তারা আর ফুল এক সাথে ওঠে ফুটি'—
বিরহে স্বপন, মিলনে সে ভরে মুঠি!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

সমালোচন

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর *

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের পরলোক-গমনের পর তাঁহার সম্বন্ধে যে সন্দর্ভগুলি নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, সেইগুলি এবং "আরও কয়েকজন মনীষীর দ্বারা আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লিখাইয়া লইয়া আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" নামে এই সংগ্রহ-পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এ চেষ্টা বাঙলার বোধ হয় এই প্রথম, এবং এ চেষ্টা যে সার্থক হইয়াছে, সে শুধু সম্পাদক মহাশয়ের অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার গুণে।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে পঞ্চাশৎবর্ষ যেদিন পূর্ণ হয় সেদিন কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। সেই অভিনন্দন-পত্রে আচার্য্যের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্ব দিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশ-মাতার পূজা করিয়াছ।...

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ ...

প্রিয়জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি···নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি···ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবিবরের এই কথাগুলি যে একটুও অতিরঞ্জিত কবিকল্পনা নয়,—নিছক সত্য, তাহা এই গ্রন্থান্তর্গত সন্দর্ভগুলি পাঠ করিলে সঠিক বুঝা যায়—এই গ্রন্থখানিতে রামেন্দ্রসুন্দরের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় পাওয়া যায়—পরিপূর্ণ মানুষটিকে সম্পাদক দেশের লোককে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন। বাঙালী হইয়া বাঙলার মনস্বী আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরকে যিনি না জানিবেন, তাঁহার বাঙালী জন্মই বৃথা হইবে।

জ্ঞানে নিষ্ঠায় মাতৃভূমি ও ভাষার সেবায় রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলার আদর্শ পুরুষ। হাততালির রঙ্গভূমির পিছনে দাঁড়াইয়া নীরবে রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশের যে সেবা করিয়াছেন, তাহার কাছে দীপক-রাগের বক্তৃতা-ভঙ্গীতে দক্ষ বাগ্মীর বাক্যজাল বিস্তার নিতান্তই তুচ্ছ ও অসার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় রামেন্দ্রপ্রসঙ্গে কয়টি চমৎকার কথা বলিয়াছেন—"রামেন্দ্রবাবু বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন।··· পরনিন্দা,পরচর্চ্চা, হিংসা দ্বেষ—এগুলি তাঁহার ছিল না।

"রামেন্দ্রবাবু বড় কোমলপ্রকৃতি ছিলেন।···বিদ্যার উপর রামেন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই পড়িতেন, নিপুণ হইয়া পড়িতেন, হজম করিবার জন্য পড়িতেন, হজম না করিয়া ছাড়িতেন না। তাই অতি কঠিন বিষয়ও সহজেই বুঝাইয়া দিতে পারিতেন।···

"রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—একটি সাহিত্য-পরিষৎ, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য পরিষদের মন্দির।···

"তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যার উপাসনা না করিয়া মা লক্ষ্মীর উপাসনা করিতেন, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতেন,—তাঁহার সময়ের অনেক লোক ত এমন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাবীরের মত সে প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিলেন।···

"লোকে বলে রামেন্দ্রবাবু Nationalist ছিলেন। এ দেশ-হিতৈষিতা তিনি নেতাদের নিকট পান নাই।

---

* আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। বেঙ্গল বুক কোম্পানি, ৩০নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, ১৩২৭। মূল্য দুই টাকা।

কারণ, নেতাদের সহিত তিনি বড় একটা মিশিতেন না। কলেজ, ঘর, আর সাহিত্য-পরিষদ, এই তাঁহার স্থান ছিল।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কয় ছত্র লেখায় রামেন্দ্রসুন্দরে যে পরিচয়টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেই রামেন্দ্রসুন্দরকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; তাঁহার ন্যায় দার্শনিক একালে বিরল। তিনি তাঁহার বিবিধগ্রন্থে বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু জটিল তথ্যের এমন সুন্দর আলোচনা করিয়া তাহার সহজ সমাধান করিয়াছেন, যে অবিশেষজ্ঞ পাঠকও তাহার রস সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন,—দেশ-বিশ্রুতকীর্ত্তি রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের চিন্তা-জগতের প্রায় সর্ব্ববিভাগেই তাঁহার মুদ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে, তাহা বলিবার সময় আসে নাই।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্র-সুন্দরের জীবনের 'মিশন' বা 'সাধনা' তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

"১। প্রথম ভাগ,—ইউরোপের বিজ্ঞান-প্রচারের ভাগ।...আধুনিক সায়েন্সে কি সব পদার্থ-তত্ত্বের কি সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারই সমাচার তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দিতে প্রথম যৌবনে উৎসুক হইয়া ছিলেন।...তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে দেখাইয়া যান যে ইউরোপের সায়েন্সের কথা কেমন বাঙ্গালা গদ্যে লিখিলে তাহা বহুজন-বোধ্য হইবে।...

২। রামেন্দ্রের মনীষার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র ও রসায়নাদি কষিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপ ও ভারতবর্ষকে সমালোচনায় তুলিত করিয়া উভয়ের যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ যাচাই চেষ্টাও রামেন্দ্রের পক্ষে অপূর্ব্ব।

৩। তৃতীয় পর্য্যায়ে রামেন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই সময়ে তিনি যে কয়খানি পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার সাহায্যে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইউরোপের বিদ্যার মাপকাঠিতে ভারতের বিদ্যা মাপিলে ছোট ত হইবেই না, উপরন্তু ভারতে এমন অনেক জিনিস আছে, অনেক ভাব আছে, যাহা ইউরোপের মাপ কাঠির বাহিরে; ইউরোপ এখনও ভাব-জগতে প্রবেশ করিতে পারে নাই :...এই সঙ্গে 'শব্দকথা' 'কর্ম্মকথা' প্রভৃতি পুস্তিকাগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কয়েকবার বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি প্রতিবারই বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষার বক্তৃতা দিতে পারিবেন না বলিয়া সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বাঙলা ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে বলেন—তাহারই ফলে রামেন্দ্রসুন্দর 'যজ্ঞ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। জ্ঞানে-ভাবে-ভাষায় বঙ্গভাষার তাহা অমূল্য।

এ সব গেল তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও স্বদেশ-প্রেমের কথা; কিন্তু তবুও তাঁহার পরিচয়ের যেটুকু বাকী থাকে সুধীন্দ্রনাথ তাহা বলিয়া দিয়াছেন—ত্রিবেদী মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালীর বেশভূষা করিতেন; তিনি বাঙ্গালীর কলেজে পড়াইতেন, তিনি বাঙ্গালীর মত সরল ভাবে সরল প্রাণে সকলের সহিত আলাপ করিতেন, তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর জীবন যাপন করিতেন —তিনি বাঙ্গলা দেশকে ধন্য করিয়াছেন। আজ এই নন্-কো-অপারেশানের-কোলাহলের দিনে ত্রিবেদী মহাশয় একজন অনুকরণীয় স্মরণীয় পুরুষ।

বাস্তবিক এইখানেই রামেন্দ্র-চরিত্রের প্রধান গৌরব আর বিশেষত্ব—রামেন্দ্র 'কায়মনোবাক্যে' বাঙ্গালী ছিলেন। আর এই জন্যই বিশেষ করিয়া এই আদর্শ মনস্বীর এই জীবন-কথা এই চরিত্রালোচনা বাঙালী মাত্রেরই পাঠ্য। এ গ্রন্থ পাঠে স্বদেশ-প্রেমের আসল মন্ত্র শিক্ষা হইবে, মনুষ্যত্ব শিক্ষা হইবে। এ গ্রন্থ বাঙ্গালী মাত্রেরই গৃহ-পঞ্জিকার মত গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।

এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা—৩১, বলিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

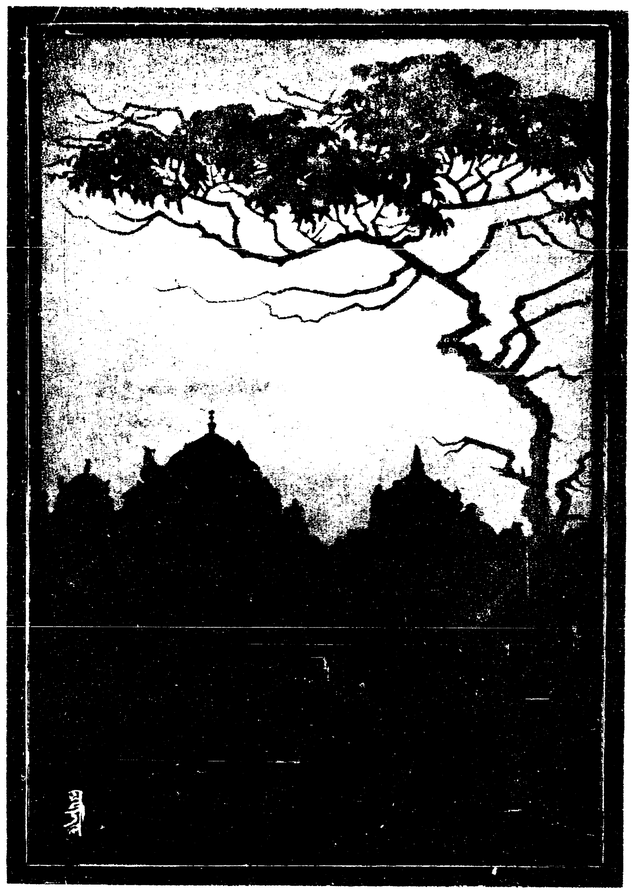

জোছনা রাতে

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৭ [১১শ সংখ্যা

প্রব্রজন ও উপনিবেশ স্থাপন

ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে সময়ে-সময়ে সমগ্র জাতি তাহাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক দেশে গিয়া বসবাস করে। ইহার ফলে নানাজাতির সংমিশ্রণ সাধিত হইয়া নূতন নূতন সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়। জগতের ইতিহাসে যখন প্রথম উষার আলোকপাত হইয়াছে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতিসমূহ যাযাবর প্রকৃতির, দেশ-দেশান্তরে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে এক বিরাট ব্যাপার, সহজে কল্পনায় আসে না। আজকালকার মত একটী ব্যাগ, একটা ট্রাঙ্ক ও একটী বিছানা লইয়া, বড় জোর পাঁচ ছয়টী ট্রাঙ্ক, পাঁচ ছয়টী বিছানা ও কতকগুলি মোট-পুঁটুলি লইয়া ট্রেণে উঠিয়া হাওয়া বদলাইবার খাতিরে কলিকাতা হইতে দেওঘর মধুপুর গিরিডি আর না হয় ডিহরী কি এটাওয়ায় সুখভ্রমণ নয়। এ একেবারে গৃহস্থালী-কে গৃহস্থালী, সারা সংসার গরু বাছুর ভেড়া গাধা উট ও নানা লট-খটী লইয়া এক দেশ হইতে অন্যদেশে পাড়ি দেওয়া। আর রাস্তা-ঘাটেও সুখের সীমা ছিল না। এই যে নিরন্তর ভ্রমণের কণ্ডুয়ণ, ইহা কি একটা জাতির শৈশবাস্থার চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল—না, ইহারও একটা নিয়ম, একটা শৃঙ্খলা ছিল? হ্যাডন তাঁহার Wanderings of Peoplesএ বলেন যে, না, এত-বড় একটা জিনিষ শুধু খেয়ালেরই বশে হয় না। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুই শক্তির খেলায় এই প্রব্রজন সংঘটিত হয়। ইহাতে আকর্ষণ-শক্তি অপেক্ষা বিকর্ষণ-শক্তিরই অধিকতর প্রভাব। আহার্য্য ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন এখানে তিষ্ঠানো যায় কি করিয়া? অতএব এ দেশ হইতে অপসারন অবশ্যম্ভাবী। যে দেশ খাইতে দেয় না, সেখানে কে থাকিবে বল? অতএব চল ভাই, সেই দেশে যেখানে দানাপানি মিলিবে—

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

শ্বাস-জলের অভাব হইবে না। কোথায় আছে সে সোনার দেশ? খুঁজিয়া বাহির কর। শেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই বাঞ্ছিত দেশের সন্ধান মেলে; অমনি সকলে গিয়া সেইখানে উপস্থিত হয়।

ধরুন, এক সীমানির্দ্দিষ্ট প্রদেশে একটী জাতি বাস করিতেছে বহুযুগ ব্যাপিয়া। যদি তাহারা সুস্থ সবল থাকে, তবে প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতেই থাকিবে। আর তাহারা যদি চাষ করিয়া খায়, তবে একদিন ধরিত্রী সাফ জবাব দিয়া বসিবেন,—বাছারা, তোমাদের জন্য আর আমি শস্য প্রসব করিয়া তোমাদের নিয়ত-বর্দ্ধনশীল গ্রাসের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক ভূমির উৎপাদনী শক্তিরও তো সীমা আছে। অর্থ-নীতিবিদ্‌রা নাকি বলেন যে যখন সমগুণ শ্রেঢ়ীতে (geometrical progression) মানুষের বংশবৃদ্ধি হয় ঠিক তখনই সমান্তর শ্রেঢ়ীতে (arithmetical progression) ভূমি হইতে আহার্য্য বস্তুর আমদানি হয়। তবেই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, ভূমির উৎপাদনী শক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাওয়াতে আহার্য্যের অসদ্ভাব হয়। তখন পলাইয়া জীবন রক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর কি থাকিতে পারে? তবে মানুষ ঝট্ করিয়া কোন দেশ ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। অনেকদিন এক জায়গায় থাকিলে দেশ বলিয়া একটা অনুভূতি কেমন আসিয়া পড়ে। শেষ না দেখিয়া আর কেহ যাইতে চাহে না—তাই আবার ভূমির কাছে সাধ্য-সাধনা চলিতে থাকে। ভূমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করিবার যা-কিছু কৌশল জানা আছে তাহার প্রয়োগ নিঃশেষ হইলে সেখান হইতে বিদায় লইতে হয়। আজকালকার উৎকট সভ্যতার যুগে "পুত্রকন্যারূপ প্রবল বন্যার" গতি-নিরোধকারী কৃত্রিম উপায় সে যুগের লোক লইতে শেখে নাই। শিখিলেও যে নির্ব্বাসন হইতে রক্ষা পাইত তাহা বলা যায় না। যাহারা শিকার করিয়া খাইত, তাহাদের অবস্থাও তাদৃশ। খাইয়া খাইয়া মানুষ জানোয়ার-বংশের একরকম উচ্ছেদ করিয়াই বসিয়াছিল; তাহার উপর তাহাদের পীড়া-ব্যাধি তো ছিলই। সুতরাং তাহাদেরও সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। অগত্যা মানুষকে সেই সেই প্রদেশ হইতে সরিয়া পড়িতে হইল। ইহাই বিকর্ষণ শক্তির খেলা।

কোন জাতি যদি অনুর্ব্বর প্রদেশে বাস করে, তাহা হইলে তাহার সান্নিধ্যে যদি উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্র অথবা শস্যশ্যামল উপত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত প্রদেশের জাতি শেষোক্ত জাতির দেশ আক্রমণ করিয়া তথায় বাস করিতে প্রলুব্ধ হয়, ইহাই আকর্ষণ-শক্তি।

ভূতত্ত্ব-বিবরণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হিমানীযুগের অন্ত্য অংশে য়ুরোপের মধ্যভাগে বন্না হরিণ (rein-deer) বড় বড় দল বাঁধিয়া বেড়াইয়া বেড়াইত আর ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে আদি প্রস্তর-যুগের মানুষ তাহাদিগকে শিকার করিত। কিন্তু pleistocene (আধুনিক) যুগে আবহাওয়ার নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এবং এই পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারের ইতস্তত প্রব্রজন ঘটে। বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ও পশু-পক্ষীর সহিত মানুষের

খাদ্য-খাদক সম্বন্ধীয় একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়া-ছিল। তাহাদের অপসারণে মানুষেরও অপসারণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। হ্রদ-যুগে এসিয়ার ভূভাগ ছোট-বড় অসংখ্য হ্রদে আবৃত ছিল। শেষ হিমানীযুগে প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ তাহাদের অধিকাংশই অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই বিশোষণ-প্রক্রিয়ার ফল ঐতিহাসিক যুগেও অনুভূত হইয়াছে। মধ্য এসিয়ার বিশোষণ প্রণালী স্মরণ থাকিলে বোধ হয় উরাল-অলতাই জাতি, মোঙ্গল ও তুর্কদিগের ইতস্ততঃ প্রব্রজনের একটা কারণ পাওয়া যায়। আর ঠিক সেই অবস্থা-পরম্পরার জন্যই য়ুরোপের যে অংশে সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তথায় পরবর্ত্তীকালের জন-মানবের চিহ্ন অবধি লুপ্ত হইয়াছিল।

এখন স্থূলতঃ দুইটী কারণ প্রব্রজন ঘটায়:—প্রথম, মানুষের অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি ও অন্নবন্ধন আহার্য্যের হ্রাস ও দ্বিতীয় আবহাওয়ার ক্রমিক অথবা আকস্মিক পরিবর্ত্তন। ইহা ছাড়াও দুই-চারিটী ছোট ছোট কারণ লক্ষিত হয়। সন্নিহিত জাতি আঢ্য ও দুর্ব্বল হইলে অসভ্য জাতির তাহাকে আক্রমণ করিবার একটা লালসা জাগিয়া উঠে। সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া কৃষি অবলম্বন পূর্ব্বক যে জাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের শান্তিতে ও উন্নতিতে দিন-গুজরান হয়, সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইতে থাকে; কিন্তু সেই পরিমাণে কালে সেই জাতি দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। তখনই তাহাদের ধন ও দৌর্ব্বল্য সন্নিহিত অসভ্য জাতি-সমূহকে প্রলুব্ধ করিয়া তোলে। ইতালীর কথা ধরা যাক্—যে ইতালীর শৌর্য্যে তদানীন্তন জগৎ চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই ইতালী উত্তরকালে নির্বীর্য্য হইয়া পড়ায় গথ, হূন, ভাণ্ডাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা তাহার সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমমাংসলোভী শ্যেনের মত আসিয়া ইতালীর হৃদয়-রক্ত শোষণ করিয়াছিল। কবি বাইরণ আক্ষেপ করিয়াছেন—"কি হতভাগিনী,তুমি ইতালী!" কখন কখন এমন ঘটে যে, বিজেতা জাতি বিজিত জাতির সভ্যতা রীতি-নীতি আপনার করিয়া লইয়া একসঙ্গে মিশিয়া যায়। তাহাতে দুইটী ফল হয়,—এক, অসভ্যেরা সভ্য হয়, আর দুই, বিজিতের ধমণীতে নূতন রক্ত-নিষিক্ত হইয়া তাহাকে সবল করিয়া তোলে।

ভূমির জন্য একটা অশান্ত ক্ষুধা যখন কোন কোন জাতিকে পাইয়া বসে, তখন সে খাই-খাই করিয়া ভূমি-লাভের জন্য নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায় ও সকলকে আক্রমণ করিতে থাকে।

জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে দুইয়ের মধ্যে এক জাতি পরাভূত হয় ও পরাভূত জাতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মধ্য এসিয়ার উচ্চ তৃণ-সঙ্কুল অনুর্ব্বর প্রদেশ হইতে নানা জাতির বিচ্যুতি ও বিকীরণের কথা অবিদিত নাই। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় পাদে হিয়ঙ্গ-নু নামক এক যাযাবর জাতি সেই একই মূল গোষ্ঠীর য়ুএচি নামক আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী-সম্প্রদায়ের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করে। তাহার ফলে য়ুএচিরা পরাভূত হইয়া হিয়ঙ্গ-নু-গণ কর্ত্তৃক চীনদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে বিতাড়িত হয় ও বরাবর পশ্চিমে তাহারা অনুসৃত হইতে থাকে। এই ধাক্কা সাম্‌লাইতে

না পারিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা পাঁচ লক্ষ হইতে দশলক্ষ যুএচির স্রোত টাকলা-মাকান (অর্থাৎ গোবি) মরুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। এই স্রোতোবেগ প্রথমে বু-সুন ও পরে শক জাতির উপর আসিয়া পড়িল। অগত্যা শকগণ নিজ চারণভূমি যু-এচিদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। আরও দক্ষিণে আসিয়া শকগণ ভারতের দ্বারবন্ধে পঙ্গপালের ন্যায় জড় হইল। পাঠক জানেন যে, এই জাতি-বিক্ষেপের ফলে ভারতের রাজনীতিক ভাগ্যাকাশে কিরূপ মেঘের উদয় হইয়াছিল। শক ও যুএচি নৃপতিগণ ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও হিন্দু শিথীয় (Indo-Scythian) রাজবংশ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহাদের ভিতর হইতেই ক্রমে রাজপুতগণের আবির্ভাব হয়।

এই বু-সুন এবং তাহাদের জাতি শক, পশ্চিম শিথীয় ও উত্তর য়ুরোপের নর্ডিকদের সম্বন্ধে হ্যাডন বলিয়াছেন যে, ইহারা যাযাবর জাতির লোক ও কৃষি-জীবিকা অপেক্ষা ইহারা পশুচারণ করিয়া জীবনধারণই অধিকতর পছন্দ করিত। ইহারা সন্নিহিত জাতিদের একটা বিরাট অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মেসোপটেমিয়ায় একসময় যে আশ্চর্য্য সভ্যতা বিদ্যমান ছিল তাহা লেয়ার্ড, বটা (Layaerd, Botta) প্রভৃতি মনীষিগণের কল্যাণে কাহারও অবিদিত নাই। আসিরীয়গণ কানানাইটগণ কর্ত্তৃক বিজিত ও সেমিটীক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, বাবিলোনিয়াগণ হিটাইটগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হয়; ইহারা আবার কাসাইটগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। এই ক্যাসাইটগণ মিডিয়া এলাম ও ব্যাবিলোনিয়ার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। পরে আর্য্য মিতানীগণ আসিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন। ঋগ্বেদে আর্য্যসভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, মিতানীগণ তদ্রূপ সভ্যতায় অলঙ্কৃত ছিলেন।

য়ুরোপে ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে বহু জাতির উদ্ভব হয়। তাহাদের নানা শাখা-প্রশাখা প্রথমে দক্ষিণ য়ুরোপ, পরে পশ্চিম য়ুরোপ ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আসে, যখন তাহাদিগকে নব প্রস্তরযুগের লোক বলিয়া ধরা হইয়াছিল। রাইকা হোল্‌ম্ (Rica Holme) বলেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৮০০ অব্দে আলপাইন জাতির লোকেরা ব্রিটেনে ব্রাঞ্জ ধাতুর আমদানি করে এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮০০ অব্দে কেল্‌টিক জাতিগণ ঐ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে। বহুকাল ধরিয়া কেলটিক জাতি রাইন নদের নিকট দলবদ্ধ হইয়া পরে উহা পার হইয়া ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হয় ও খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে বেশ জাঁকিয়া বসে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারা বোধ হয় স্পেন অধিকার করে এবং ইতালীতেও সেই সময়ে আবির্ভূত হয়। পশ্চিম জর্ম্মাণীতে অবস্থিত কেলটিকগণকে টিউটনগণ বিদেশী অপরিচিত আখ্যা দিয়াছিল। এটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্রিটনেও অ্যাংগ্লো-স্যাক্সনগণ পরাজিত ব্রিটনদিগকে Walas বা অপরিচিত বিদেশী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিল। তাহা হইতেই তাহাদের ও তাহাদের দেশের নাম Welsh ও Wales হয়। তাহার পর টিউটনজাতির ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ সুরু হইল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে তাহারা

কেল্‌টিকগণকে রাইন পার করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে ডানিয়ুব নদের সামান্তে টিউটনরা ভীষণভাবে চাপিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু মার্কাস আরলিয়াসের জন্য তাহা ততটা আশঙ্কার ব্যাপার হইয়া ওঠে নাই। তার পর গথগণ রোমানদিগের সহিত কৃষ্ণসাগরের নিকট যুদ্ধ করে। পূর্ব্বেই হূনদের ইতালী-আক্রমণের কথা বলিয়াছি।

সমাজ যখন বেশ স্থায়ী হয়, তখনও মাঝে মাঝে এক এক দল লোক দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বসবাস করে। ইহারই নাম উপনিবেশ-স্থাপন। আধুনিক যুগে যে বহির্গমন হয় তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক থাকে না। আজকালকার যুগে এখন শুনি নাই যে এক জায়গা হইতে লক্ষ লোক উঠিয়া গিয়া অন্য জায়গায় বসবাস করিতেছে। কতকগুলি দেশের উপনিবেশ-স্থাপনের কথা পর্য্যালোচনা করিলে তাহার কারণ অনায়াসে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। প্রথম গ্রীশদেশীয় উপনিবেশগুলির কথা ধরা যাক্। নাগরিকদিগের মধ্যে অনেক সময় গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়া একটি দলের নির্ব্বাসন হইত। কখনও কখনও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অযথা ঘেঁসাঘেঁসি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত—অথবা কু-শাসন হইতে দূরে থাকিবার জন্য অনেকে বিদেশে গিয়া বাস করিত, তাহাতে ঘরের মত এতটা কড়াকড় বাঁধা-ধরা নিয়মের অত্যাচার থাকিত না। সাধারণতঃ যেখানে ব্যবসায়ের সুবিধা হইত সেইখানেই গিয়া তাহারা উঠিত। কখনও কখনও নগর-বাসিগণ—দুর্দ্দান্ত যুবক-সম্প্রদায়কে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহিত। রাজনীতিক হিসাবে নূতন উপনিবেশ ও পুরাতন দেশমাতৃকার মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকিত না—উভয়েই উভয়ের অনধীন। মাতৃরাষ্ট্র ও দুহিতৃ-রাষ্ট্রের মধ্যে তথাচ একটি বন্ধন থাকিতই—তাহা রাজনীতির বন্ধন নয়;—পরন্তু অপত্যস্নেহ ও মাতৃভক্তির মত কতকটা, আর কতকটা উভয়ের মধ্যে একই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিচার-আচার। দেশ বদলাইলেও পুরাতন দেবদেবীরই পূজা-অর্চ্চনা হইত; পুরাতন যজ্ঞীয় অগ্নিই রক্ষিত হইত। আর যখন মাতৃ-রাজ্যে প্রধান প্রধান ধর্ম্মোৎসব হইত, তখন দুহিতৃ-রাজ্য তথায় প্রতিনিধি পাঠাইয়া মর্য্যাদা রাখিত। অতএব দুই রাজ্যে যুদ্ধ বাধা অনেকে অস্বাভাবিক ও পবিত্র বন্ধনের উল্লঙ্ঘন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তত্রাচ দেখিতে পাই যে (Cornith) করিন্থ ও করকাঁইরার মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়াছিল। নূতন উপনিবেশ স্থানে গিয়া গ্রীকগণ প্রথমেই নগর স্থাপন করিত এবং ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবন নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সমস্ত বাড়ী-ঘরের দরকার হইত তাহা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিত। মাতৃ-রাষ্ট্রে যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান থাকিত, উপনিবেশেও তাহারই অনুকল্প দেখা যাইত। কাজেই উপনিবেশ-সমূহে অনতিবিলম্বে সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মমন্দির, নাগরিকগণের প্রকাশ্য সভাস্থল, ব্যায়ামাগার ও নাট্যশালা স্থাপিত হইত। তবে ইহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপনিবেশ-সমূহে প্রধানতঃ গণতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হইত, কখনো কখনো মাতৃরাষ্ট্রের পূর্ব্বেই তাহা

হইত এবং অভিজাত-তন্ত্র বড়-একটা সে জমিতে ফলিত না। আর ইহা হওয়াই স্বাভাবিক—যেহেতু প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের যে কষ্ট ও গুরুত্ব তাহার সমান অংশ সকলেই লইত; অতএব সাম্যই তাহাদের মন্ত্র হইয়া উঠিত। দক্ষিণ ইতালীতে উপনিবেশ স্থাপিত হইল তাহার নাম হইল বৃহৎ গ্রীস। আরও দেখি যে, নূতন নগর স্থাপিত হইলে পুরাতন নগরের নামানুসারেই তাহার নামকরণ হইত। যথা এসিয়ায় Ædlie Cymeএর নামেই ইতালীর Cumae নাম হইয়াছিল।

রোমানদের উপনিবেশ কিরূপ ছিল? মূলতঃ ইহার অর্থ, চাষীদিগের বসবাস; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ছিল না। রোমীয়গণ শত্রুদিগকে পরাজিত করিলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ করলে রাখিবার নিমিত্ত তাহাদের দেশে দুর্গের মধ্যে সৈন্যস্থাপন করিত। ইহাই তাহাদের উপনিবেশ! সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ইহাই ছিল তাহাদের অন্যতম উপায়। আর একটি—সুদৃঢ় রাস্তা নির্ম্মাণ। আর ব্রিটেন-জয়ের পরে এই দুই উপায়ই তাহারা অবলম্বন করিয়াছিল। রোমের ইতিহাসে পড়া যায় যে, নাগরিকগণ নূতন জমি পাইবার লোভে গৃহত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিত। রোমের নাগরিক হওয়ার জন্য তাহাদের যে অধিকার ও সুবিধা থাকিত, তাহা হইতে কেহ বিচ্যুত হইত না; এবং ঘটনাক্রমে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বের মত তাহারা ভোট দিতে পারিত, যেন তাহারা রোম ত্যাগই করে নাই। সেই সময়েই তাহারা মাতৃরাষ্ট্রের আদর্শ-অনুকরণে নিজেদের নূতন তন্ত্র গড়িয়া লইত। সকল রকমেই যেন তাহারা একটি ছোটখাট রোমে আসিয়া বাস করিতেছে—এমনি ভাবেই রোমের রাজনীতি তাহারা গ্রহণ করিত।

এখন ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করা যাক্। আর্য্যেরা খৃষ্টের জন্মের দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই ভারতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা পঞ্চনদে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশ্য এই ক্রম-বিস্তার রাজপুতানার মরু ও ঘন বনানীতে ঠেকিয়া গিয়া বাধা পাইয়াছিল। যখন তাঁহারা বেশ এক রকম স্থিত হইয়াছিলেন ও পঞ্চনদে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দক্ষিণ ভারতবর্ষ, লঙ্কা ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিতে বেশ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, কুমার ভীম বিন্ধ্য পার হইয়া আসিয়াছিলেন ও বৈদর্ভকুমার আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশ পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া "সীমান্তে" বাস করিয়াছিলেন ও বর্ব্বর আদিম জাতিদিগের সহিত বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহারাই আন্ধ্র, পুলিন্দ ও শবর প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া খ্যাত হন। মহাভারত ও রামায়ণে ইহারা দক্ষিণ-ভারতবর্ষের জাতি বলিয়া পরিচিত। পালি গ্রন্থ সুত্তনিপাতে লিখিত আছে যে, বররিণ নামক একজন ব্রাহ্মণ গুরু উত্তর হইতে আসিয়া অশ্মক রাজ্যে বসবাস করেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, মথুরার নিকট পাণ্ডু বলিয়া এক আর্য্য ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন এবং দক্ষিণে যে পাণ্ড্যদের বিবরণ পাওয়া যায়, তাঁহাদের সহিত এই পাণ্ডুদের

একটা সংযোগ আছে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন (Carmichael lectures) যে, মেগাস্থিনিস যে বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ পাণ্ড্যদিগের সহিত যমুনা ও মথুরার একটা সম্পর্ক আছে, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; যেহেতু প্লিনি ও টলেমি প্রভৃতি গ্রীক লেখকগণ বলেন যে, দক্ষিণে পাণ্ড্যদের রাজধানী মদুরা। মাদ্রাজ বিভাগের একটি জেলার নামও ঐ। দক্ষিণের পাণ্ড্যেরা যে তাহাদের রাজধানীকে মাধুরা বলিয়া অভিহিত করে, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা উত্তরের এমন একটি দেশ হইতে আসিয়াছিল যাহার রাজধানী মথুরা। নূতন স্থাপিত উপনিবেশের নামকরণে যে সনাতন প্রথা অনুসৃত হয় তাহারও ব্যতিক্রম হয় নাই অর্থাৎ ঔপনিবেশিকগণ নূতন নগর অথবা বিভাগের নাম পুরাতন নগর ও বিভাগের নামেই রাখিয়া থাকেন।

সিংহলে তৃতীয় 'মথুরা'(Motura) ও পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে চতুর্থ 'মদুরা' পাওয়া যায়। সিংহলের পুরাতন নাম তাম্রপর্ণী হইতে বুঝা যায় যে, টিনেভেলি জেলায় যে তাম্রপর্ণী নদী আছে তাহার উপকূলস্থিত ব্যক্তিগণ গিয়াই সিংহলে উপনিবেশ-স্থাপন করিয়া ছিল—যেমন সিন্ধুনদ হইতে সিন্ধের নাম হইয়াছে। সেইরূপ বর্ত্তমান নিজামের রাজ্যে পটিট্ঠান বা পৈঠান বলিয়া একটী নগর আছে। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানে বহু-পূর্ব্বে একটী প্রতিষ্ঠান নগর ছিল। উপনিবেশ-স্থাপন কখনো কখনো জয়ের ফলে হইত। যেমন পূর্ব্বের উদাহরণগুলি। শান্তির সময়ে ধর্ম্ম প্রচার ও বিস্তার কল্পে ভ্রমণ ও কোন কারণে নির্ব্বাসন ও অন্যান্য হেতু। ভাষার সাক্ষ্য (পালি) যদি লওয়া যায় তবে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, আর্য্যেরা দক্ষিণ-ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ও দ্রাবিড়ীয় ভাষার উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ না হইলেও দক্ষিণে আর্য্য-ভাষার চলন হইয়াছিল।

প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন দুই যুগেই পুরাতন সহরের নামানুসারে নূতন সহরের নাম-করণ প্রথা একরকম সার্ব্বত্রিক। আপনারা ভাগলপুরের নিকট চম্পা-নগরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। চম্পা নদীর উপর ঐ নগর ছিল (এখন তাহার নাম চম্পা নালা হইয়াছে)। এই নগরটী বর্দ্ধিষ্ণু ছিল এবং আমরা জাতকে পড়ি যে, মগধের সহিত ইহার ঝগড়া ছিল ও পরে ইহা মগধেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মিষ্ট অথচ উগ্রগন্ধ চম্পক ফুলের জন্য এই স্থানটী বিখ্যাত ছিল। যখন ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ কোচিন-চায়নায় যান, তখন তাঁহারা একটী উপনিবেশের নাম এই বিখ্যাত নগরের নামেই রাখিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় চম্পার অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ছিলেন। এখানে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বৌদ্ধেরা চম্পক বৃক্ষকে বড়ই পবিত্র জ্ঞান করিতেন—কেন না, এই চম্পক কাষ্ঠ হইতেই বুদ্ধদেবের বহু মূর্ত্তি গঠিত হইত। সায়ামে হিসয়ু নদীর উপকূলে অযুথিয়া, নামক নগর। কেহ কেহ বলেন যে, অযুথিয়া = অযোধ্যা ও হিসয়ু = সরযূ। কম্বোজ হইতে ভারতীয়গণ যাইয়া কাম্বোডিয়া অথবা কাম্বোজ নামক উপনিবেশ স্থাপন করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬৫ অব্দ ভারতীয়গণ যবদ্বীপে যান ও সেই দেশের

গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৭৮ অথবা ১২৮ খৃষ্টাব্দে একজন ভারতীয় রাজকুমার তথায় যান। জানুয়ারী (১৯২০) সংখ্যার Indian Antiquaryতে Sir Richard Temple লিখিয়াছেন যে, ৭৮ ও ৪১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যবদ্বীপ, বোর্নিও ও সুমাত্রায় শৈব হিন্দুত্বের আবির্ভাব হয় ও সুমাত্রায় একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ২৫০ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে যব ও সুমাত্রায় বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্র নীত হয় ও ৩৮৪ ও ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যবদ্বীপে হিন্দুবংশ রাজত্ব করে। মহাবংশে আমরা সিংহলে উরুবেলা ও জেতবনারামে দেখিতে পাই। উরুবেলা অথবা বুদ্ধগয়ায় শাক্যমুনি সমাধিলাভ করিয়াছিলেন বোধি-দ্রুমের তলায়। জেতবনারামে বুদ্ধদেব বহুবার ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন।

আধুনিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই যে, এই উপনিবেশ স্থাপনে, স্পেন, পর্ত্তুগাল ও হল্যাণ্ড অগ্রণী হইয়া পথ দেখাইয়াছে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পদানুসরণ করিয়াছে। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে পেড্রোডি ভ্যালডিভিয়া চিলিতে স্যানটিয়াগো প্রদেশ স্থাপন করেন। আর-জেনটাইন রিপাবলিকে একটা কর্ডোবা দেশ আছে; নিশ্চয়ই ইহা স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ কর্ডোবার নামানুকরণেই স্থাপিত হইয়া ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিবার একটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। যেদিন ইংলণ্ড স্পেনের বিরাট আর্ম্মাডা ধ্বংস করিয়া তাহার সমুদ্রাধিপত্য হরণ করিয়া লইল, সেইদিন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংলণ্ডের উপনিবেশ-স্থাপন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। শীত-প্রপীড়িত নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনে কৃতকার্য্য না হইলেও এতদুদ্দেশ্যে প্রথম উদ্যমের জন্য স্যার হমফ্রি গিলবার্টের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সার ওয়ালটার র‍্যালে ফ্লোরিডার উত্তর-উপকূল আবিষ্কার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন-মানসে ঐ জায়গাটী পছন্দ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ কুমারী থাকা হেতু ঐ জায়গার নাম দেন তিনি, ভার্জ্জিনিয়া। ইহা ছাড়া তখনকার আর্চবিশপ হুইট-গিফট্ পিউরিটানদিগের উপর বড় নারাজ ছিলেন; তাঁহার শাসন অতি কটু হইয়া পড়ায় অনেক পিউরিটান স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাইবেন বলিয়া দেশত্যাগ করেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর মে ফ্লাউয়ার নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া শতাধিক নরনারী ও শিশু প্লাইমাউথ বন্দর ত্যাগ করিয়া যায়। তাহারা কেপ কড নামক স্থানে অবতরণ করিয়া উক্ত স্থানটীর নাম দেন—নূতন প্লাইমাউথ। এই স্বদেশত্যাগীগণ Pilgrim fathers বলিয়া পরিচিত।

দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ-গমনের আরও হেতু লক্ষিত হয়। স্বদেশে রাজনীতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ও স্বদেশের বিরক্তিকর রাজ্যশাসন পরিহারের নিমিত্তও অনেকে দেশ ত্যাগ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজ কৃষিজীবিগণ এইরূপে দেশ ছাড়িয়া কেপ অফ গুড হোপ অর্থাৎ উত্তমাশা অন্তরীপে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের নাম বুয়র। কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা ইংরাজ-দিগের অধীন হইলে সেই জেলার আদিম অধিবাসীদিগের সহিত ইংরেজগণ প্রীতিপূর্ণ

ব্যবহার না করা হেতু উহারা চটিয়া আরও উত্তরে চলিয়া গিয়া নেটালে ও অরেঞ্জ-ফ্রী ষ্টেটে এবং ট্রান্সভাল অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

প্রথম জেম্‌স্, ক্রমওয়েল ও দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইংরেজগণ উপনিবেশ-স্থাপন ব্যাপারে বেশ-একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস্ তাঁহার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে ফ্লোরিডার কি দংশ দান করাতে, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া রাজার নামেই উপনিবেশের নাম রাখিলেন, কারোলিনা। "নূতন ইংলণ্ড" নামীয় উপনিবেশের কথা আমরা জানি। আমেরিকাতে "নিউ আমষ্ট-র্ডাম" নামে ওলন্দাজদের একটী উপনিবেশ ছিল। কিন্তু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের দ্বারা আবিষ্কৃত হইলে তাহার নাম পাল্টাইয়া নূতন নাম রাখা হইল নিউ-ইয়র্ক। ইংরেজ নৌ-বাহিনীর রণ-পোতাধ্যক্ষ ডিউক অব ইয়র্কের (যিনি পরে দ্বিতীয় জেম্‌স্ হইয়া ছিলেন) নামে উহার নামকরণ হয়। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে কোয়েকার ধর্ম্মাবলম্বী উইলিয়ম পেন "সোসাইটী ফ্রেণ্ডস্" নামক কতকগুলি বন্ধু লইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন—পেনের নামেই তাহার নাম হয় পেনসিলভেনিয়া। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে কতক-গুলি ঋণগ্রস্ত ও উৎপীড়িত জার্ম্মান প্রোটে-ষ্টাণ্টকে আশ্রয় দিয়া জেম্‌স্ অগ্‌লথর্প একটা উপনিবেশ স্থাপন করেন ও তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জর্জ্জের নামে উহাকে জর্জ্জিয়া নামে অভিহিত করেন। বিখ্যাত রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার নামকরণ হয়। ইহার রাজধানী তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর নামে মেলবোর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিগো কেপপুচি নূতন জগতে গিয়া উপস্থিত হন ও নিজের নামানুসারে উহা আমেরিকা বলিয়া আখ্যাত করেন। উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কি পুরাতন কি নূতন সব যুগেই উপনিবেশের নামকরণ এই ভাবেই হইয়া আসিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে কোন কাব্য—কোন 'রোমান্স' নাই। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বোটানি বে-তে জেলের কয়েদী পাঠানো হইয়াছিল,—যেমন ভারত হইতে আন্দামানে কয়েদী পাঠান হয়। অতএব উহা কয়েদীদের আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। এক সময়ে কয়েদীদের দ্বারা নিউ-সাউথ ওয়েল্‌স্-প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বিলাতে যখন স্যর রবার্ট পীল দণ্ডবিধি আইনের সংস্কার করিলেন, তখন কয়েদীর নির্গমন স্রোত কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া পড়িল। অষ্ট্রেলিয়ার উর্ব্বরতা প্রসিদ্ধ, কাজেই সেখানে ঔপনিবেশিকগণের আমদানি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। আর উর্ব্বর ক্ষেত্রে শস্যের অভাব না হওয়াতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়াকে কয়েদীদের আড্ডা করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জুড়িয়া দিলেন। তখন হইতে টাসমেনিয়াতে কয়েদী চালান হইতে লাগিল। অষ্ট্রেলিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিল।

"Deserted Village"এর কবি আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ধনী জমিদারগণ নিজেদের প্রমোদোদ্যান করিবার জন্য নিরীহ প্রজাদিগকে উৎপাত করিয়া দেশত্যাগে বাধ্য করিয়া-ছিলেন। জমিদারের অত্যাচারও উপনিবেশ

স্থাপনের গৌণ কারণ বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সমূহের দেশ-মাতৃকার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান লক্ষিত হয়; তাহার প্রমাণ, য়ুরোপের কুরুক্ষেত্র—যাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। পূর্ব্বে যেমন গ্রীকেরা উপনিবেশ হইতে Olympian অথবা অন্য কোন জাতীয় ক্রীড়োৎসবে যোগ দান করিত, এখনও তেম্‌নি ক্যানেডা বা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ক্রিকেট প্রভৃতি খেলিবার জন্য খেলোয়াড়রা বিলাতে আসিয়া থাকেন।

সংক্ষেপে উপনিবেশ-স্থাপনের কতকগুলি স্থূল কারণ নির্দ্দেশ করিলাম।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

অনন্ত জীবন

তিয়েনার উপকণ্ঠে ছোট একখানি ফিটফাট বাগান। রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণে ছোট একখানি বাড়ী, বাগানের দিকে বারান্দা। বারান্দা থেকে নামবার তিনটি সিঁড়ি। রঙ্গমঞ্চের বামে সামনের দিকে ছোট একখানি টেবিল, চারদিকে চেয়ার, তার মধ্যে একখানি আরাম-চৌকি। পিছনে বাম দিক থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত বাগান আর রাস্তার মাঝে উঁচু রেলিং। দূরে পার্কের গাছপালা আর তুণাচ্ছাদিত ভূমি। শরতের গোড়া, দিন প্রায় শেষ হয়-হয়। বাগানে গভীর স্তব্ধতা। মালি বোরোমাস ফুলগাছের কেয়ারি তৈরি করছে। বুড়োমানুষ, তার বড়-বড় চুল সাদা হয়ে গেছে। হাউসডেরফের আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। তাঁর বয়েস প্রায় ষাট, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো, সাদাচুল ছোট কোরে ছাঁটা, চোখদুটি কিন্তু এখনো তরুণ আছে। পরণে একটি সাদাসিদে কালো পোষাক, ঢিলেঢালা গায়ে বেশ মানিয়েছে। মাথায় একটি মস্ত কালো টুপি।

হাউসডেরফের—এই যে বোরোমাস, ভালো ত?

বোরোমাস—নমস্কার মশাই! আজ সহরের দিকে গিয়েছিলেন বুঝি?

হাউস—না।

বোরো—আজ বিকেলে বাগানে কাফি খেলেন না, তাই ভাবছিলুম হয়তো বা···

হাউস—না, সহরে যাইনি। বাড়িতেই ছিলুম, শোফার ওপর শুয়ে। মাথাটা একটু ধরে ছিল। কি করছ এখন? সমস্ত বাগান তো প্রায় কোপানো হয়ে গেল।

বোরো—না হলে চলে কই? কবে রাত্তিরে তুষার পড়বে, বলা যায় না তো! অক্টোবর মাস পড়ে গেল। এখন আর আলাখেড়া দিলে চলবেনা। ৯৩ সালের শরৎ কাল মনে পড়ে তো? সন্ধ্যাবেলা আমরা বাইরে বসে ছিলুম—২৮ অক্টোবর সেদিন, পরদিন ভোর তিনটেয় সে কী তুষারটাই পড়লো! ৮৭, ৮৮ সালেও সেই একই রকম। না মশাই, পরিষ্কার দিন দেখে আর ভুলি না।

হাউস—ঠিক কথা বোরোমাস। (তাঁর কাজ দেখতে লাগলেন) এখানে কি পোঁতা হবে? (গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন হলেন,

বোরোমাস যে কি উত্তর দিলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না)

বোরো—ঠিক ঐ কথাই আপনাকে বলতে যাচ্ছিলুম। আজ ফ্রাঞ্জের সঙ্গে ছাখা করতে—

হাউস—(অন্যমনস্কভাবে) কে?

বোরো—(অবাক হয়ে) আজ্ঞে ফ্রাঞ্জের কথা বলছি—রাস্তার ওধারে ব্যারন ওআইজ-নেকের মালি। একটু তার গুমর আছে, তা হোক, লোকটি একটু জানে-শোনেও বটে। কেতাবে পড়েছে—তার শেলফের ওপর বিশখানা বা তার চেয়েও বেশী কেতাব আছে। তাই তাকে মাঝে মাঝে দুএকটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তাতে আর এমন দোষ কি—

হাউস—(শুনে) না—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করা উচিত···।

বোরো—আজ্ঞে কি করবো?

হাউস—সে যা বলেছে। আমার তাতে কিছুমাত্র অমত নেই।

বোরো—(আরো অবাক হয়ে) আজ্ঞে মশাই, আমি তো এখনো কিছু বলিনি।

হাউস—(পূর্ব্বের মত) তাই করাই ঠিক, এতে আর সন্দেহ কি?

বোরো—(রীতিমত ভয় পেয়ে) আজ্ঞে, মশাই...

হাউস—(যেন জেগে উঠলেন) কি হয়েছে?

বোরো—আজ্ঞে, বুঝেচি—অপরাধ যদি না নেন তো জিজ্ঞেস করি—কাউনসিলর-গিন্নী কি ভালো নেই? (হাউসডেরফের নিরুত্তর, বোরোমাস অপ্রস্তুত) আজ্ঞে আমি ভাবছিলুম—তিনি যেদিন বাইরে বেরিয়ে-ছিলেন তারপর প্রায় তিন হপ্তা হয়ে গেল—তাই—

হাউস—তিনি মারা গেছেন—তুমি যে তাঁর খোঁজ নিচ্ছ তাতে খুসি হলুম—কাউন-সিলর-গিন্নী মারা গেছেন, বুঝলে? (টেবিলের ধারে তিনি বসলেন)

বোরো—(চমকে উঠে, তাড়াতাড়ি মাথার টুপি খুলে) আহা-হা—মশাই—তাইতো—(ক্ষণকাল উভয়ে নির্ব্বাক)

হাউস—হ্যাঁ। আর তিনি কখনো বাইরে আসবেন না বোরোমাস, আমাদের সঙ্গে ছাখা করতে।

বোরো—আজ্ঞে এও কি সম্ভব! উনি যে এতটা অসুস্থ তা তো ভাবিনি! (মাথা নেড়ে) আর বয়েসই বা এমন কি হয়েছিল!

হাউস—কি বল্লে বোরোমাস? বয়েস হয়নি? অবশ্য আমার চেয়েও সাত বছরের ছোট ছিলেন। তবে আমার বয়েসও প্রায় ষাট হোল।

বোরো—আজ্ঞে, তা বটে।

হাউস—তবুও, লোকে ওর চেয়েও বেশী দিন বাঁচে।

বোরো—আজ্ঞে তাঁকে সদাসর্ব্বদা দেখতুম—গত পনেরো বিশ বছর একরকম প্রায় রোজই দেখতুম—তাই—

হাউস—হ্যাঁ বিশ বছর আগে আমরা সবাই অল্পবয়সি ছিলুম বটে!

বোরো—কিন্তু এই গেল বছরেও কৈ তাঁকে তো বুড়ো বলে' মনে হত না। এবারে গরমের সময় তিনি যখন ভারি রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছলেন—তখন লোকের

ভাবা আশ্চর্য্যি ছিল না—আজ্ঞে আমিই একদিন, সন্ধ্যে তখন অনেকক্ষণ উতরে গেছে, ফটক পার হয়ে যেতে যেতে তাঁকে দেখলুম এখানে বসে' রয়েছেন, মনে হল—অপরাধ নেবেন না—তখন মনে হল নিশ্চয়ই কাউনসিলর-গিন্নীর ছোট বোন বসে' আছেন।

হাউস—(ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে) হ্যাঁ বোরোমাস, তারপর আমাদের দেমাকে বন্ধু ফ্রাঞ্জ কি বল্লে বল ?

বোরো—আজ্ঞে না না, সে-সব কথা বলে' আর এখন বিরক্ত করবো না। (তাঁর হাত নিয়ে চুমো খেয়ে) এ যে কত কষ্ট তা আমি বুঝি, আমারও একদিন স্ত্রী ছিল, তাকেও মাটির তলায়—(হঠাৎ যা বলেছে তা ভেবে সে শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল) আজ্ঞে তার মানে—আমি বলছিলুম কি—

হাউস—বুঝেছি বোরোমাস। (আবার ক্ষণকাল সব চুপচাপ)

বোরো—আর ছেলেটি মশাই ?

হাউস—কে ?

বোরো—আজ্ঞে মিষ্টার হেনরির কথা বলছি। ওঃ কী ভয়ানক! যখন ভাবি সারা গেল বছর তিনি তাঁর মাকে কেমন করে' বাইরে আনতেন, তারপর আবার সন্ধ্যে বেলায় আসতেন তাঁকে নিয়ে যেতে—

হাউস—তা বটে! বেচারা!

বোরো—কৈ তিনও তো আর বাইরে আসেন না ? তাঁরও কি অসুখ না কি ?

হাউস—না না অসুখ কেন হবে ? আমি তো রোজই আশা করছি তিনি আসবেন। তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন, এখানে তো ছিলেন না। এইবার ফেরবার সময় হয়েছে—এলেই হল একদিন। তাঁর বিশ্রাম দরকার হয়েছিল—নিজেকে একটু চাঙ্গা করে' নেওয়া দরকার—আবার তাঁকে কাজে লাগতে হবে তো!

বোরো—আজ্ঞে হ্যাঁ তা বৈকি। বিশেষ তাঁর মত কাজ যে-সব লোকের—

হাউস—কাজ বলে' কাজ—কবি! (দাঁড়িয়ে উঠলেন) কবি! তার মানে কি জানো ?

বোরো—আজ্ঞে হ্যাঁ জানি বৈ কি মশায়—

হাউস—না না তুমি জান না—কিছুই জান না। আমরা ও সম্বন্ধে কেউই কিচ্ছু জানি না—সাধারণ মানুষ আমরা—আমরা কেবল পারি নিজেদের বাগানে বসে' বকবক করতে—

বোরো—আজ্ঞে সে কি বলেন, আপনি তো এক সময়ে—

হাউস—বলছ এক সময়ে আমিও আর কিছু করতুম ? তা-ও এখন যা করছি তার চেয়ে আর কি ভালো ? সহরে আপিসের ডেস্কে বেলা আটটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত, কখনো কখনো তিনটে-চারটে পর্য্যন্ত বসে' থাকতুম, এই তো ?

বোরো—ওঃ রোজ রোজ একই জায়গায় দু'ঘণ্টা ধরে' বসে' থাকা কম কষ্ট নয়! তখন আপনার জন্যে আমার ভারি দুঃখ হোত, বাগানে এসে বসতে আপনার কত দেরী হয়ে যেত! আর তারপর শীতের সময়—

হাউস—কিছু তো করা চাই বোরোমাস। আমার ডেস্কে এখন আর একজন বসছে। আর আমি যতদিন কাজে লেগেছিলুম সে-ও যদি ততদিন থাকে তো পেন্‌সন্ পাবে, তখন আর একজন তার জায়গায় এসে ভর্ত্তি হবে। ও জায়গাটাতে কে বসবে তাতে কিছুই আসে যায় না, যে-কেউ একজন হলেই হল। কিন্তু কবি—সে তোমার-আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের লোক, বোরোমাস! সে যখন কাজ থেকে অবসর নেয় তখন আর অমন চট্ করে' তার জায়গায় বসাবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না—সে-জায়গা ভর্ত্তি হতে হয়তো বহুকাল কেটে যায়। কবি যে, তার বিশেষ সাবধানে থাকা দরকার, জগতের সবাই তা-ই আশা করে—বুঝলে বোরোমাস ?

বোরো—আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেচি।

হাউস—বুঝেচ ? কিচ্ছু বোঝনি। হেনরির মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখেছ ?—অসাধারণ কিছু ? তার মাথার চারিদিকে একটা জ্যোতির মণ্ডল ছাখোনি ? না বলছ ? তবেই তো, ছাখো, তুমি কিচ্ছু বোঝ না এ সব। (বোরোমাস হাসলে, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল) আমার সম্বন্ধে অত ভেবো না, বোরোমাস। আমার মাথা ঠিক আছে। ঐ যে জ্যোতির কথা বল্লুম সেটা সত্যিকারের নয়, কাল্পনিক। তুমি আমি দেখতে পাবো না—কিন্তু ওর মা দেখতে পেতেন।

বোরো—আজ্ঞে, আপনি কি বলতে চাইচেন তা বুঝেচি। মিষ্টার হেনরি সম্বন্ধে কাগজে এত কথা লেখে, যদও তাঁর বয়েস এত অল্প—আর লোকেও তাঁর সম্বন্ধে কত আলোচনা করে—এইতো ? (সে মাথার চারিদিকে হাতখানা ঘুরিয়ে আন্‌লে যেন জ্যোতি-মণ্ডল বর্ণনা করছে। গভীর শোকের পরিচ্ছদে হেনরি বেড়ার ওপাশ দিয়ে চলে গেল। মাথা নত করে' অভিবাদন করে' সে বাড়ীতে গিয়ে প্রবেশ করলে। হাউসডেরফের তার পিছু-পিছু দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, বোরোমাসও চোখ দিয়ে তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করতে লাগলো।)

বোরো—আজ্ঞে আপনি যদি অনুমতি করেন—আমি এখনো ওঁকে জানাবার অবসর পাইনি, আমি কত দুঃখিত···(হেনরি বাড়ীর মধ্যে থেকে বারান্দায় বার হয়ে এল)

হাউস—যাও না, এখন গিয়ে বলো—বলো ওঁর জন্যে তুমি দুঃখিত। (বোরোমাস হেনরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে অগ্রসর হল, হেনরি সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নেমে এসে বুড়োর হাতখানা ধরলে)

হেনরি—ধন্যবাদ, বোরোমাস—বুঝেচি। ধন্যবাদ। (বোরোমাস ডানদিক দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। হেনরি টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। হাউসডেরফের দাঁড়িয়ে উঠলেন, তারপর দু'একপা এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলেন)

হাউস—আবার ফিরেছ তা হলে ?

হেনরি—হ্যাঁ। এত শীগ্‌গির ফিরবো ভাবিনি। বাড়ীতে থাকা বরং ভালো···

হাউস—(ঘাড় নেড়ে) তুমি সেদিন সন্ধ্যেবেলাই চলে' গিয়েছিলে ?

হেনরি—হ্যাঁ। সমাধিভূমি থেকে বাড়ী ফিরে কাপড়-চোপড় ব্যাগে পুরেই বেরিয়ে পড়লুম। সে রাত্তির বাড়ীতে কিছুতেই কাটাতে পারতুম না।

হাউস—তা তো বটেই। তা কোথায় গেলে ?

হেনরি—প্রথমে গেলুম শ্যাল্‌স্‌বার্গ।

হাউস—সত্যি ?

হেনরি—ওখানে গেলে বড় সুখ পাই। ভারি একটি সান্ত্বনা পাই ওখানে।

হাউস—এরকম সহর আছে না কি ? তাহলে তো ভালো !

হেনরি—আজ্ঞে হ্যাঁ আছে, তবে অবশ্য অবস্থাবিশেষে। হঠাৎ শ্যাল্‌স্‌বার্গে গিয়ে পড়িনি। আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে—সাত আট বছর আগেকার, ভারি দুঃখের—আপনি তো জানেন ঘটনাটা—ভেবেছিলুম আর কাটিয়ে উঠতে পারবো না। আমি চলে গেলুম শ্যাল্‌স্‌বার্গে। আর সেই দিনই বিকেলে হেলব্রানের চমৎকার বাগানে একলা বেড়াতে বেড়াতে আমার দুঃখটা যেন হালকা হয়ে এল। পরের দিন সকালে যখন জেগে উঠলুম তখন বেশ সুস্থ সবল মনে হল—আবার আমি কাজে লেগে গেলুম।

হাউস—এও কি সম্ভব ?

হেনরি—নিশ্চয়ই। আমার বয়েস তখন কুড়িও হয় নি, আর কালটা ছিল বসন্ত—সে কথা ভুল্লে চলবে না।

হাউস—ও তা বটে !

হেনরি—কিন্তু এবারে কোনো সুখ পেলুম না—কিছুই না—বরং তার উল্টো।

হাউস—তাহলে এমন সময়ও আছে যখন হেলব্রানও কিছু করতে পারে না ? শ্যাল্‌স্‌বার্গে কতদিন ছিলে ?

হেনরি—আমি পরের দিন চলে গেলুম মিউনিচে। ভেবেছিলুম পুরোনো সব ছবি দেখে সান্ত্বনা পাবো। প্রাচীন পিনাকো-থেকে গেলুম—সেখানে আমার প্রিয় ডুরের আর হোলবেনের ছবি আছে—সেখানে গিয়ে বহুদিনের পর যেন কতকটা সান্ত্বনা পেলুম। (কিছুক্ষণ থেমে) এই সব কথা বলছি বলে' কিছু মনে করবেন না। আপনাকে সমস্ত খুলে বলা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে…

হাউস—(তার হাতখানি ধরে', আগেকার চেয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে) বেশ তো। বলো, বলো।

হেনরি—ধন্যবাদ। (উপবেশন করলে) দেখুন মিষ্টার হাউসডেরফের—আমার ভারি দুঃখ হয়—এই আপনি আর আমি—ইদানী যেন আমরা ভারি তফাৎ হয়ে পড়েছি।

হাউস—তার মানে ?

হেনরি—আমি বেশ বুঝতে পারি যে আপনি—অনেকদিন আগে আমি যখন ছোট ছিলুম, আর ঐ মাঠে খেলা করতুম—তখন আমায় যেমন ভালোবাসতেন এখন আর তেমন বাসেন না।

হাউস—হ্যাঁ—সে তো অনেকদিনের কথা হেনরি। আর তুমি অবশ্য স্বীকার করবে যে তুমিই প্রথমে—অবশ্য তুমি যে তোমার ইচ্ছামত করবে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এ জায়গাটা তোমার মত অল্পবয়েসি লোকের ভালো লাগা শক্ত—তা ছাড়া তোমার নিজের বন্ধুবান্ধব আছে। কিন্তু আমি তো কখনো তা নিয়ে অনুযোগ করিনি—করেছি কি ?

হেনরি—আজ্ঞে না, তা বলছি না। কিন্তু

আমি আপনাকে বলতে চাই—এবারকার এই নিষ্ফল ঘোরাঘুরির পর—অন্য সবার চেয়ে আপনি আমার কত অন্তরঙ্গ। আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন। আপনি জানেন আপনার কাছে আমি কি পর্য্যন্ত ঋণী। আমার মা'র যে আপনি কতখানি ছিলেন তা আমি জানি—তাঁর জীবনের শেষ সময়টা আপনি কি সুন্দর সার্থক করে' তুলেছিলেন।

হাউস—(প্রতিবাদের ভঙ্গীতে) আচ্ছা আচ্ছা—সে কথা থাক—তোমার কথা বলো এখন ! তুমি মিউনিচে গিয়ে ছবি দেখলে ? আর ছবি দেখে সান্ত্বনা পেলে ?

হেনরি—হ্যাঁ, যতক্ষণ সেই শান্ত স্নিগ্ধ হলের মধ্যে ছিলুম। পথে যেই বার হলুম, আবার যে-কে-সেই। আর তারপর সন্ধ্যে-গুলো—কী নির্জ্জন, কী দীর্ঘ—যেন তার অন্ত নেই ! ভাবতে চেষ্টা করলুম—অসম্ভব ! মনে হল আমার মধ্যে সব-কিছু যেন মরে' গেছে। (ক্ষণকাল থেমে দাঁড়িয়ে উঠে) কতকাল এ-ভাব থাকবে কে জানে !

হাউস—ভারি কষ্টকর—বিশেষত কাজ করা যাদের অভ্যাস—

হেনরি—অভ্যাস ? বহুকাল অভ্যাস নেই। সেইটেই ত হয়েছে মুস্কিল। দু'তিন বছরের মধ্যে কিছুই করিনি। আপনি তো জানেন—

হাউস—হ্যাঁ জানি।

হেনরি—একেবারে অসম্ভব। যাঁকে ভালোবাসি, দেখছি সেই মা, কষ্ট পাচ্ছেন—আর তাও কি যেমন-তেমন কষ্ট—আর তারপর বুঝছি কোনো আশা নেই—আর তিনিও তা বুঝছেন—সেইটেই তো ভয়ানক। সন্ধ্যের সময় তাঁর বিছানার পাশে বসে' পড়ে' শোনাচ্ছি আর তাঁর জলজ্বলে চোখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তিনিও নিজের অবস্থা ভালোরকমই বুঝতে পারছেন। (অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে) সে ঘরটা ছেড়ে দিয়েছি।

হাউস—ছেড়ে দিয়েছ ? তোমার একলার পক্ষে মস্ত বড় ঘর !

হেনরি—তা ছাড়া ও ঘরের মধ্যে আমি এক ছত্রও লিখতে পারতুম না। রাতের পর রাত আমার মনে হোত পাশের ঘর থেকে যেন গোঙানির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সেই শব্দ আমার বুকের মধ্যে যেন কেটে বসে' যেত—কাজ করবার ইচ্ছে বা শক্তি আর কিছুই থাকত না—বেঁচে থাকাও কষ্টকর মনে হোত। হা ভগবান—(স্তব্ধতা) তাঁর মৃত্যুর আগের রবিবারে ডাক্তার হসার আমায় কি বল্লেন জানেন ?

হাউস—কি ?

হেনরি—তিনি বল্লেন—আরো দু'তিন বছর হয়তো এই ভাবে চলতে পারে।

হাউস—(চমকে উঠে—প্রায় যেন রাগত-ভাবে) আরো দু'তিন বছর ? (সামলে নিয়ে) তিনি বল্লেন আরো দু'তিন বছর ধরে' এরকম চলতে পারে ?—

হেনরি—হ্যাঁ। তাহলে কিন্তু অবস্থা আরো খারাপ হোত। তিনি ঘরের বার হতে পারতেন না—বাইরে এসে যে ঘণ্টা কয়েক বসে' থাকতেন তা-ও সম্ভব হোত না—এই বাগানের মধ্যে বসতে তিনি কত ভালো-বাসতেন ! (শূন্য আরাম চৌকির পানে দৃষ্টি নত করে' দাঁড়িয়ে রইলো)

হাউস—আমি অবশ্য কখনো কখনো সহরে যেতে পারতুম—কি বল?

হেনরি—(লজ্জিতভাবে) ঠিক বলেছেন মিষ্টার হাউসডেরফের। আমি কেবল নিজের কথাই বলছি—আমার বয়েস অল্প—আমার একটা ভবিষ্যৎ থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু আপনি—আপনি কতটা হারিয়েছেন!

হাউস—হ্যাঁ আমি অনেক হারিয়েছি।

হেনরি—মা যে আপনার কত অন্তরঙ্গ ছিলেন তা জানি। বরাবরই জানতুম—সেই কত বছর আগেও।

হাউস—তখনও—

হেনরি—আমি তো তখন বিশেষ ছোট নয় যখন তিনি—যিনি আমার বাবা ছিলেন—আমাদের ত্যাগ করে' যান।

হাউস—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

হেনরি—সেদিনের কথা এখনো আমার মনে পড়ে, মা যেদিন বল্লেন বাবা চলে' গেছেন। যখন তিনি ফিরলেন না তখন ভাবলুম তিনি মারা গেছেন। তাই ভেবে রাত্তিরে এক একদিন ভারি কাঁদতুম। তার পর একদিন তাঁকে রাস্তায় দেখলুম সেই অন্য মেয়েটির সঙ্গে—যার জন্যে তিনি মাকে ত্যাগ করে' যান। খুব ছেলেবেলাতেই বুঝেছিলুম আমার মা স্বাধীন—বিধবা হলে যেমন স্বাধীন হয় তেমনি।

হাউস—তাহলে—বোধহয়—তুমি আমাদের ক্ষমা করেছ?

হেনরি—(একটু বিরক্তভাবে) মাপ করবেন, আমি হয়তো ঠিকমত মনের ভাব প্রকাশ করতে পারিনি। (আবার উৎসাহিত হয়ে) স্বাভাবিক সোজা কথা আমরা খোলা-সময়ে! ছেলে যেমন করে' বাপের হাত ধরে তেমনি করে' আপনার হাতখানা চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে—আমি তো জানি মা আপনাকে কত ভালবাসতেন! (অন্ধকার ঘনিয়ে এল। একে একে রাস্তার আলো-গুলো জ্বলে উঠলো)

হাউস—ভালোবাসা? সেটা এমন কিছু নয়। বয়েস যখন তরুণ থাকে তখন সহজেই ভালোবাসা আসে। আমরা বন্ধু ছিলুম হেনরি—দুই বুড়োমানুষের বন্ধুত্ব। তার মানে বোঝ? না তোমাদের মত তরুণের কাছে ও-কথার কোন মানেই নেই? ঠিক ঠিক, তুমি কি করে' বুঝবে? তরুণ তোমরা—সামনে সমস্ত জগৎটা পড়ে' রয়েছে—ভবিষ্যৎ তোমাদের পায়ের তলে—আর তুমি, তোমার শক্তি তোমার মনীষা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা নিয়ে কি করেই বা—

হেনরি—আপনি ভুল করছেন মিষ্টার হাউসডেরফের, আমি বুঝি। আমি যদি তাঁকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারতুম—আমাদের কাছে—আহা! মাকে যদি ফিরিয়ে এনে আবার ঐখানে বসাতে পারতুম—অন্তত কেবল একটা সন্ধ্যের জন্যেও—ওঃ তার জন্যে কী-না দিতে পারি!

হাউস—(তিক্তভাবে) কী দেবে শুনি?

হেনরি—(ইতস্তত করে') আমার এখন মনে হয় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, যা-কিছু আমি করতে পারি, যা কিছু করবার আশা রাখি সমস্তই ঐজন্যে দিতে পারি।

হাউস—হেনরি, রাগ কোরো না—কিন্তু তুমি নিজে ওকথা বিশ্বাস করোনা।

হেনরি—করতে যদি পারতুম—করবার যদি উপায় থাকতো—

হাউস—না, হেনরি, ও-কথা সত্যি নয়—তোমার শক্তি থাকলেও—আমি তোমায় জানি—তোমাদের মত সবাইকে বুঝি—তোমরা সব আর্টিষ্ট, তোমাদের ধরণ-ধারণ বেশ জানি।

হেনরি—আমাদের সবাইকে? আমি আর কারো জবাবদিহি করতে চাইনা।

হাউস—না, আর কারো জবাবদিহি তোমায় করতে হবে না। কিন্তু যখন বলি তোমাদের সবাই, তখন কি বলতে চাইচি তা বুঝতে পারো বোধ হয়। শোন। বছর দশেক আগে আমার আপিসে একজন লোক ছিল—অবসর সময়ে সে বাজনা নিয়ে থাকতো। একবার তার তৈরি একটা গৎ কনসার্টে বাজানো হয়েছিল। লোকটির নাম টমাস। তার একটিমাত্র ছেলে মারা যায়—বুদ্ধিমান ফুটফুটে একটি সাত বছরের ছেলে। আমি তাকে জানতুম, সে তার মার সঙ্গে মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসতো। একদিন রাতে ডিপথিরিয়ায় সে মারা গেল। আমি তাদের এই বিষম বিপদে সহানুভূতি জানা-বার জন্যে গেলুম। গিয়ে দেখি বাপ পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর সেই ঘরেই একধারে মরা ছেলে বাক্সের মধ্যে পড়ে রয়েছে। আমি ঘরে ঢুকতেও সে থামল না, বাজাতেই লাগলো—মাথাটা আমার দিকে একটুখানি হেলিয়ে অভি-বাদন করে' ফিসফিস করে' সে বল্লে—আমি তখন তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েচি—"শুনুন মিষ্টার হাউসডেরফের—আমার বেচারী ছেলেরই উদ্দেশে রচনা—সুরটা এখুনি মাথায় এল।" মরা ছেলেটা কফিনের মধ্যে—ভাবো একবার—আমি তো দেখে শুনে থ মেরে গেলুম—

হেনরি—(খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলে। তারপর তৃপ্তভাবে) হ্যাঁ—আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারি—অনেক ভালো লোক যদিও এ-সব ব্যাপারে আঁতকে ওঠেন।

হাউস—আঁতকে ওঠেন? হ্যাঁ তা ঠিক বলেছ।

হেনরি—আচ্ছা মিষ্টার হাউসডেরফের, বলুন দেখি আমাকে, এই সব লোকের ওপর কি হিংসা হয় না?—যারা এমন করে' দুঃখশোক পরিহার করতে পারে—দুর্দ্দিনে তাদের কাজের মধ্যে, তাদের আর্টের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে?—এমন কি যাদের এমন কোনো ইন্দ্রজাল জানা আছে যার প্রভাবে, তারা তাদের দুঃখকে একটা সুন্দর মূর্ত্তি দান করতে পারে—কেবল অনেকটা ব্যর্থ অশ্রু-পাত না করে?

হাউস—কি বল্লে? দুঃখকে সুন্দর মূর্ত্তি দান করবে? তাইতে কি মরা মানুষকে ফিরিয়ে আনা যায়?

হেনরি—চোখের জল ফেলেও ত যায় না। একথা বলছিনা যে প্রিয়জনের মৃত্যুর শোককে কর্ম্মের আনন্দ ছাপিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই কি আমাদের সম্বল নয়—এই আমাদের কাজ? আপনি কি আগেকার মতই যত্নে আপনার বাগানের পরিচর্য্যা করবেন না? আমি তো সেই দিনের প্রতীক্ষা করছি যখন আবার কাজে লাগতে পারবো, তেমন-কিছু একটা রচনা করতে পারবো। ভবিতব্যের পায়ে মাথা নোয়ানো ছাড়া উপায় কি!

হাউস—ভবিতব্যের পায়ে—হ্যাঁ সেকথা সত্য হতে পারে।

হেনরি—এও তো ভবিতব্য।

হাউস—না-না—

হেনরি—(একটু বিস্মিতভাবে) না তো কি? ঐ-সব চিন্তা করে' কষ্ট পান কেন? আপনি তো নিজেই ডাক্তারের সঙ্গে—এই মাসদেড়েক আগে কথা কয়েছেন—তিনি তো আপনাকে সত্য কথাই বলেছিলেন—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

হাউস—কিন্তু এত শীগ্‌গির নয়। আরো পরে।

হেনরি—কি করে' আপনি ও-কথা বলতে পারেন মিষ্টার হাউসডেরফের? আপনি বলতে চান না নিশ্চয়—যে কোনোরকম যত্নের ত্রুটি ঘটেছিল—

হাউস—না না, তা নয়, আমায় মাপ করো। যা করবার তা সমস্তই করা হয়েছিল।

হেনরি—তবে?

হাউস—তুমি কি নিজেই আমায় এইমাত্র বল্লেনা যে তিনি আরো দু'তিন বছর হয়তো বাঁচতে পারতেন?

হেনরি—হ্যাঁ, তা তো বলেছি। কিন্তু ডাক্তার তো বলেই রেখেছিলেন যে মৃত্যু হঠাৎ যে-কোনো দিন ঘটতে পারে। সে-কথা তো আপনিও জানেন।

হাউস—হঠাৎ? হ্যাঁ-তা হঠাৎ এসেছিল বটে। (ইতস্তত করে'—তারপর মন স্থির করে') তবে স্বাভাবিকভাবে এসেছিল কি না সেটা আলাদা কথা।

হেনরি—(চমকে উঠে) কি? কেন?—আপনি এরকম কথা কেমন করে' বলতে পারেন বুঝতে পারিনা—কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলে ডাক্তার তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো—

হাউস—কেন সে বুঝবে? কেমন করে'? একটু বেশী মাত্রায় মরফিন—সকালের আগেই মৃত্যু—পরিবারের সকলে তো প্রস্তুতই ছিল—

হেনরি—কথাটা আপনি এমন জোরের সঙ্গে বলছেন—আমার মা কি কখনো ও সম্বন্ধে—?

হাউস—আমার ভুল হয়নি—এই বল্লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে।

হেনরি—আপনি যখন এতটা বলছেন মিষ্টার হাউসডেরফের, আপনার বোঝা উচিত যে আমি—

হাউস—আমি কি বলছি তা আমি বেশ জানি—বেশী কিছু আর জিজ্ঞেস কোরোনা।

হেনরি—আপনি বলতে চান তাঁর ডেস্কের ওপরের চিঠিখানায়—

হাউস—(ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ। (ক্ষণকাল চুপচাপ)

হেনরি—(ভীত সন্দেহান্বিত) সেই চিঠি? হুঁ—তাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? সেই সব ভয়ানক রাত্রে আমি যে কতবার নিজেকে প্রশ্ন করেছি—আপনি হয়তো শুনে আঁতকে উঠবেন তবুও আমি এখন স্বীকার করবো—আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি হতভাগ্য মানুষ আমরা এত দুঃখ কেন ভোগ করি—যখন এ সমস্তই এক মুহূর্ত্তে শেষ করে' দেবার উপায় আমাদের হাতে রয়েছে।

হাউস—হেনরি!

হেনরি—আপনি যা বলছেন আমার মা যদি তাই করে' থাকেন তাহলে তিনি ঠিকই করেছেন।

হাউস—হেনরি!

হেনরি—আমার সত্যিকার মত তাই।

হাউস—কিন্তু হেনরি তুমি জান না যথার্থ ব্যাপারটা তুমি জান না। তিনি বেঁচেই থাকতেন—এত কষ্ট সহ্য করেও—ভগবান যতদিন তাঁকে রাখতেন—তিনি আমার জন্যে আর তাঁর নিজের জন্যে বেঁচেই থাকতেন—এই বাগানের মধ্যে প্রত্যহ ঘণ্টাকয়েক আমার সঙ্গে কাটাবার জন্যে—এই বাগান, যা আমাদের যৌবনের শত সুখস্মৃতিবিজড়িত! তিনি মরেছেন তোমার জন্যে, হেনরি! এখন বুঝলে? তিনি তোমার জন্যে মরেছেন!

হেনরি—(ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে) আমার জন্যে—আমার জন্যে? আপনার কথা আমি মোটেই বুঝতে পারছিনা। আমার জন্যে? তার মানে?

হাউস—সত্যি বুঝতে পারছ না? কল্পনা করতে পার না? এইমাত্র তুমি নিজে বল্লে না?

হেনরি—কি বল্লুম?

হাউস—এইমাত্র তুমি আমায় বল্লেনা বছরখানেক ধরে' তোমার মনে কি ভাব জাগছিল? তুমি কি ভাবো তোমার মা তা টের পাননি?

হেনরি—কি টের পাবেন?

হাউস—যে তিনি পীড়িত হয়ে পড়াতে তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে?—তুমি আর লিখতে পারনা—তোমার ভাবনা হচ্ছে তোমার প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেল—যে তুমি—তুমিই মারা পড়লে—তিনি সে সমস্তই বুঝতে পেরেছিলেন—আর বুঝতে পেরেছিলেন বলে'—

হেনরি—সেই জন্যে? না-না-না, এ কখনো সম্ভব নয়।

হাউস—খুব সম্ভব—তিনি যে তোমার মা ছিলেন!

হেনরি—না-না তা হতে পারে না! মিষ্টার হাউসডেরফের, আপনি শোকের তাড়নায় অন্যায় কথা ভাবছেন। অবশ্য আমি স্বীকার করি আমার মানসিক অবস্থা মার অজ্ঞাত ছিলনা—যদিও সেটা তাঁর কাছ থেকে গোপন করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু তার জন্যেই যে তিনি—না-না তা অসম্ভব।

হাউস—(সক্রোধে বাধা দিয়ে) তুমি আমায় বিশ্বাস করছনা কেন? আমি কি তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলছি? কি দরকার আমার! (পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে') এই নাও পড়ো—পড়ে' ছাখো। সজ্ঞানে লেখা চিঠি—এই চিঠি তাঁর ডেস্কের ওপর পাওয়া যায়। সেই শেষ দিন সন্ধ্যা-বেলায় এই চিঠি লেখেন—আর আধ ঘণ্টা পরে—পড়ো, পড়ো, সব কথা ওতে আছে—তুমি কষ্ট পাচ্ছ দেখে—বুঝ্‌চ? তিনি তোমার কষ্ট দেখে—আমাদের ছেড়ে গেলেন—তাঁর সময় ফুরোবার আগেই। এখন বুঝলে কেন তিনি মারা গেছেন?

হেনরি—(তাড়াতাড়ি চিঠি পড়তে লাগলো) মা! মা! (সে বসে পড়লো, যেন ভেঙে পড়লো) আমার জন্যে—আমার জন্যে—আমি তাহলে তাঁর—ভগবান! মা! ও মা! (আরাম চৌকির সামনে হাঁটু গেড়ে

বসে পড়লো। মাথাটা চৌকির ওপর লুটিয়ে গেল। হাউসডেরফের নত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়তে লাগলেন। বহুক্ষণ উভয়েই নীরব। অবশেষে হেনরি দাঁড়িয়ে উঠে আস্তে-আস্তে বলতে লাগলো)

হেনরি—আমি যাচ্ছি। বুঝতে পারছি আমাকে এখানে দেখা আপনার পক্ষে কত কষ্টকর। এই চিঠি (চিঠিখানা তখনো তার হাতে)—সজ্ঞানে লেখা আর এতে সত্য কথাই আছে। এতে আর সন্দেহ নেই। (একমুহূর্ত্ত ইতস্তত করে') কিন্তু এই একটা ছত্র আপনাকে দ্যাখাতে পারি কি ?

হাউস—কৈ, কোন্‌টি ?

হেনরি—এই যে, যেখানে মা আপনাকে মিনতি করছেন এ চিঠির বিষয় কখনো আমায় না জানাতে। (পড়তে লাগলো) "আমি মিনতি করি—" তিনি মিনতি করছেন আপনার কাছে, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে, আমার এই বিশ্বাস যেন অটুট থাকে। এ চিঠি কেবল আপনার জন্যেই লেখা, আমার জন্যে অবশ্য নয়।

হাউস—কিন্তু আমার ইচ্ছে যে তুমি এ-কথা জানো। এর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি! কিছু ভেবনা, তুমি এ ধাক্কা বেশ সামলাতে পারবে!

হেনরি—আপনার এই কাজ তাঁর ইচ্ছা-মৃত্যুর, তাঁর মহৎ আত্মত্যাগের সকল গৌরব নষ্ট করে' দিলে। তিনি ইচ্ছা করেননি যে আমি তাঁকে হত্যা করলুম এ-ভাব যেন আমার মনে থাকে—অভিশপ্তের মত আমি জীবন কাটাই। একদিন হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন, কতবড় অন্যায় আপনি করলেন। কেবল আমার প্রতি নয়, তাঁর প্রতিও—সে অন্যায় আমার অনুষ্ঠিত অন্যায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

হাউস—অন্যায় যদি করে' থাকি তো তা মাথা পেতে নিচ্ছি, হেনরি—তোমার মত লোককে সেকথা অসঙ্কোচে বলতে পারি। ভয় নেই, বেশীদিন তুমি নিজেকে দোষী মনে করবেনা—বেশ বেঁচেবর্ত্তে থাকবে—কাজ-কর্ম্ম করবে—এ-ব্যাপারটাকে নিয়ে হয়তো সুন্দর কিছু একটা রচনা করে' ফেলবে!

হেনরি—সেটা আমার অধিকার—এখন সেটা আমার কর্ত্তব্য! এখন আমার পক্ষে আর কিছু করণীয় নেই—হয় আত্মঘাতী হওয়া, কিম্বা প্রমাণ করা যে আমার মার মৃত্যু বিফল হয়নি।

হাউস—হেনরি! এই একমাস আগে তোমার মা বেঁচে ছিলেন, অমন কথা তুমি বলতে পার? তিনি তোমার জন্যে আত্মঘাতিনী হলেন তুমি তা গায়ে মাখবেনা? দিন কয়েক পরে কে জানে, হয়তো তুমি ভাববে যে তিনি তাঁর কর্ত্তব্যই করেছেন। কেমন ঠিক নয়? তোমরা আর্টিষ্ট—তোমরা সব সমান—ছোট বড় মাঝারি সব এক রকম—দাম্ভিক—গর্ব্বে ভরা! তোমার মা যখন এখানে এই আরাম-চৌকিতে বসে' আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন কিম্বা মৌনমুখে বসে' থাকতেন—কিন্তু তিনি এখানে ছিলেন—বেঁচে ছিলেন—তখনকার তাঁর জীবনের সেই রকম একটি ঘণ্টার তুলনায় তুচ্ছ তোমার সব রচনা! তা তুমি যত বড় মনীষিই হও!

হেনরি—জীবন? লোকান্তরিতকে যারা মনে রাখে তারা যতদিন বাঁচে ততদিনই সেও বাঁচে যে পরলোকে! মৃত্যুর পরেও মানুষের স্মৃতিকে যা অম্লান ও উজ্জ্বল রাখে সে কাজ তুচ্ছ নয় ব্যর্থ নয়! তবে আসি মিষ্টার হাউসডেরফের। আজ শোকের তাড়নায় আপনি আমার ওপর অবিচার করবার অধিকার পেয়েছেন। বসন্তে আপনার বাগানে আবার যখন গাছে-গাছে ফুল ফুটবে, রিক্ত শাখায় সবুজ পাতার বাহার খুলবে, তখন আপনার সঙ্গে দ্যাখা করবো। ভয় নেই, আপনিও বেঁচেই থাকবেন—কিছু মারা যাবেন না! (বারান্দার মাঝ দিয়ে সে চলে' গেল। বাড়ীর দরজা যেই খুল্লে অমনি ঘরের ল্যাম্প থেকে একটি প্রশস্ত আলোর ধারা অন্ধকার বাগানের মধ্যে এসে পড়লো)*

[যবনিকা]

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কন্দর্পের প্রসার

প্রথম বসন্ত দিনে বন পথে
চলে মনমথ!
মলয়ে মদির—নেশা,—ফুলকুল
চরণে প্রণত!
কুহক কাজল টানা—আকর্ণ সে
দু'টি আঁখি-পাতে;
ফুলের ধনুকখানি, খর প্রেম-
পুষ্প-শর হাতে!
পিক-কণ্ঠে বণ্টে নিতি সুললিত
প্রেমের প্রলাপ,
রক্তাধরে চুম্বিয়া সে প্রীতি-রাগে
রঞ্জিছে গোলাপ!
যৌবনেরি মধুরিমা ফুলে ফুলে—
বনে বনে ঢালা,
মনমথ চলে পথ,—কামনার
উভ তীর আলা!

অনুরাগে ধোওয়া ফুল—পথপাশে
ফুটে কত যূথি,
নিরজন বন-পথ—সুনীরব
একান্ত নিশুতি!
সেদিন গাছের ডালে সেই সবে
পিক ডাকে 'কুহু'—
বিরহীর ব্যথা যেন গুমরিয়া
উঠে 'উহু-উহু'!
যূথিকার কথাখানি গুন্ গুনি'
বসোরার কাণে
সেদিন শুনা'ল অলি,—কামদেব
শরের সন্ধানে
তুলিল ধনুকখানি,—বায়ু গেল
মর্ম্মর করি,'
বাখানিল কত কথা, মুকুলের
চাপা মন হরি'!

* অষ্ট্রীয়ার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার Arthur Schnitzler হইতে।

মুকুল তুলিল মুখ,—খুলে গেল
গুণ্ঠনখানি,—
বনস্থলে কত ভাষা—কত কথা
হয় কাণাকানি !
মধু চেয়ে মিষ্টি আছে, প্রজাপতি
সেইদিন বুঝে,
সেইদিন পোড়া মন অপরের
মন মরে খুঁজে !
আপনার ছায়া দেখি' সেই দিন
ভেবে মরে মন,
দোসর করিব এরে ইথে মোর
করেছি মনন !
কারো সুখে হাসিবারে, কারো দুখে
লুটাইতে হায়,
কি জানি কি কথা মন বারে বারে
জানাইতে চায় !

গোলাপ-বনের কাছে মনমথ
দাঁড়া'ল কৌতুকে,
তুলে নিল ধনুখানি, খোঁজে ফুল-
শর হাসিমুখে !
সেই পথে চলে বামা—মধুময়ী,
মদালস আঁখি,
গোলাপী অধরে তা'র সোহাগের
ঢেউ মাখামাখি ;
গোধূলি আঁচলে বাঁধা, রূপসীর
আলো-করা রূপ—
মদনের আঁখি-পাতে যেন সেই
করিছে বিদ্রূপ !
চকিতে বকুল মালা খোঁপা হ'তে
খসে' গেল পড়ি,'
স্তনের উশীর-লেপ কোথা দিয়ে
কোথা গেল ঝরি' !

নোয়ায়ে গোলাপ-শাখা চারু হাতে
হৃদয়ের 'পর
দেখে বামা সবেনা সে—তরুণীর
প্রণয়ের ভর !
মদনের শর চেয়ে খর শর
রমণীর চোখে,
শাণিত সে আঁখি-বাণ গেল ছুটি'
বিজলী ঝলকে,
মনমথ-হিয়া ক্ষত করিল সে—
আঁখি পালটিতে,
বিস্ময়ে মদন-দেব চেয়ে র'ল
কুণ্ঠা-ভরা চিতে !
লয়ে ফুল-ধনু, শর অর্ঘ্য দিয়া
পদে তরুণীর,
চোরা ধন ফিরে চায় কামদেব
পায়ে কামিনীর !

"কন্দর্প ! আমার নাম রতিদেবী"
হেসে কয় বামা ;—
মনমথ কহে, "প্রিয়া, চমকিত
করিয়াছ আমা !—
ভ্রূ-ধনু কি মনোরম ! পুষ্প-ধনু
ছার মনে হয় !
খর আঁখি-শর কাছে ফুল-শর
কিছু নয়—নয় !
ত্যক্ত-ফুল ধনু-শর লুকাইছে
লাজে মরি মরি,
সু-ভ্রু ! তোর টানা ভুরু, মোহনীয়
দিঠিতে সুন্দরি !
মদনের এই জ্বালা, এ বিরহ,
এই ব্যথা সখি,
যেন আমি ত্রিভুবনে—জনে জনে
নিখিলে নিরখি !"

বসন্তের কোন্ পাখী অবিশ্রান্ত
ওই মরে কেঁদে !
রতি কহে, "আপনারি তীর সখা'
আপনারে বেঁধে !"
শিশিরে স্খলিত পাতা গোলাপের—
ছড়ান চৌদ্দিকে,
বিরহের ব্যথাখানি দিকে দিকে
কে রেখেছে লিখে !

স্নিগ্ধগন্ধি শৈবালের মখমলে
বসিলা সুন্দরী ;—
ফাগুনে আগুন জ্বালা কে ছড়া'ল
মুঠা মুঠা ভরি' !
মনমথ অনুরাগে চুমিল সে
রতির অধরে,
শত চুমা হাহাকার করে' উঠে
নিখিল অন্তরে !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদর্শের বিড়ম্বনা

বাইরের চাপে মানুষের মন যখন দুর্ব্বল হয়ে ওঠে, তখন তার অক্ষমতার আর সীমা থাকে না—তার শারীরিক শক্তি, তার মানসিক বীর্য্য, তার সৃষ্টি করবার ও কল্পনা করবার ক্ষমতা সবই ক্ষীণ হয়ে যায়। মন ও দেহ যখন কোন কল্পনা-বস্তুতে রূপ দেবার চেষ্টা করে তখন একটা আদর্শ তার অন্তরের মধ্যে কল্পনায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে—তাই দেখিয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা পারিবারিক জীবনের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপেও আমরা একটা আদর্শ বস্তুকে মনশ্চক্ষে পরতে পরতে খাড়া করে রেখেছি—কাজেই মন যে অক্ষম হচ্ছে আমরা তার প্রমাণ পাই আমাদের কল্পনা-শক্তির হীনতায়, আমাদের আদর্শ সৃষ্টির দৈন্যে।

একদিন যখন ভারতবর্ষে মানুষের মত মানুষ ছিল তারা কল্পনা দিয়ে গড়েছিল সত্যিকার দেবতা, আর পূজা করেছিল প্রাণের প্রবল বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায়। তারা গড়েছিল শিবকে—সেই সর্ব্বত্যাগী মহাদেবকে—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—স্বর্গরাজ্যের সমস্ত বিলাস-ঐশ্বর্য্য এবং দেবোচিত ভদ্রতার সকল তকমা-তাবিজের গৌরব যার কাছে তুচ্ছ, নগণ্য। এই আদর্শ দেবতা গড়বার শক্তির জন্ম জীবনের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায়, মোহহীনতায় ও অন্তর-জাত সত্য দৃষ্টিতে। কোন দেশ বা সাহিত্য এমনধারা দেবতা কি মানুষ এ পর্য্যন্ত সৃজন করতে পারে নি। প্রলয়ের এই মনমোহন রুদ্রকে তারা কল্পনাও করতে পারে নি—অথচ সেই ভারতবর্ষের শৈব সেই অপূর্ব্ব নিষ্ঠা কোন্ অতলে' বিসর্জ্জন দিয়ে ছদ্মবেশী ভণ্ড, মিথ্যা দেবতার পশ্চাতে ছুটে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে !

একদিন এ দেশের লোক কি করেছিল তা নিয়ে অহঙ্কারে আমাদের মাটীতে আর পা পড়ে না, অথচ সেই মহতীশক্তি ও উচ্চ আদর্শ থেকে বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা স্মরণ

করিয়ে দিলে অনেক অনার্য্যের শিরায় শিরায় আর্য্য রক্তের প্রবাহ এত দ্রুত ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে লেখকের উর্দ্ধতন কয়েক পুরুষকে উদ্দেশ্য করে গালি না দিলে ক্রোধ-উপশমের কোন সম্ভাবনা থাকে না। মস্ত বড় আশার কথা এই যে এত গালাগালিতেও অনেকে কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি!

আমাদের দেহ ও মন যে দুর্ব্বল হয়েছিল তার একটা নিদর্শন আমাদের দেবতা-সৃজনের কল্পনা-শক্তির হীনতায়—অসভ্য ইটকাট পুজো করে—প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা বলে ভুল করে—ভয়ে, আত্মরক্ষার চেষ্টায়; আর মানুষ পূজা করে রক্ত-মাংসের আদর্শ পুরুষকে ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে; এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে বলিষ্ঠ নিষ্ঠায় সে আদর্শকে অনুসরণ করতে।

কিন্তু আমরা সে কথা ভুলে ছিলুম তাই কবিকল্পিত চরিত্রকে দেবতা করে তুলে-ছিলুম—আদর্শপুরুষকে নয়—রামের মত, যুধিষ্ঠিরের মত সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁরা বচনে, কর্ম্মে, চারিত্র্যে, সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় এমন কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন নি—যাকে আমরা সকলেই জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে আঁকড়ে ধরতে পারি।

যুধিষ্ঠিরের মত আদর্শ পুরুষের জীবন আলোচনা করলেই এ-সব কথার সার্থকতা প্রমাণিত হবে, অন্ততঃ আলোচনার ফলে সত্যবস্তুর সাক্ষাৎও মিলতে পারে। হাজার বছরের পুরানো বলেই যে কোন জিনিষ বা কোন লোককে বড় বলে মানতে হবে—জ্ঞান-যুগের শিক্ষিত মানুষ সে কথা বলবে কোন্ লজ্জায়? সব জিনিষকে যাচাই করা যে তার কাজ—সব জিনিষ বাজিয়ে নেয় বলেই ত তার হাতে সবই সচল হয়ে উঠচে—মেকি আর চলছে না, ঝুটোর কারবার বন্ধ।

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। কাব্যের চরিত্র নিয়ে বিচার করুন কাব্যরসিক সমালোচক। আমি সেই যুধিষ্ঠিরকে আসরে নামাতে চাই—যাঁর নাম আমার দেশের আপামরসাধারণ শৈশবেই শোনে এবং আদর্শ পুরুষ-জ্ঞানে যাঁকে নির্ব্বিচারে নিয়ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

অনেকে বলবেন, dead lionদের নিয়ে দেশের হাটে খেলাবার আর কি দরকার। অথচ তাঁরা মনে মনে বেশ জানেন তাঁদের শিক্ষিত মন এ জিনিষকে dead বলে মনে করলেও তাঁদের পারিবারিক বা সামাজিক মন সে কথায় আদৌ সাড়া দেয় না—কবির কথা, "কালী জিভ মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন" অবশ্য খুব খাঁটি; তবে আমার বক্তব্য এই, যদি এঁরা dead lions হন তবে এঁদের সম্বন্ধে শেষ কথা বলতে দোষ কি? আর যদি না হন, তবে আমার কথায় কিছু dead হয়ে যাবেন না; চাই কি ঘষে-মেজে তাঁদের প্রাচীনতার চারদিকে যে কলঙ্কের দাগ জমে উঠেছে তা ধুয়ে-মুছেও যেতে পারে।

জন্মমাত্রই মা-বাপ মুখ ফেরালেন, ভাব-লেন, এ ত নয়! ধর্ম্মপুত্র জেনেও তাকে বরণ করে নিতে পারলেন না কেন? আমাদের ধর্ম্ম-ভীরু হিন্দুসমাজে মুখরা সংবাদ-পত্রিকার নিন্দা ও গলাবাজির ভয় তাঁদের ছিল না বোধ করি।

শিশুর অন্য ভাইদের কথাই আমরা কেবল শুনেছি, এই বললেন, তাই করলেন; কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্ম্মপুত্র, বোধ করি সেই হেতুই তিনি আমাদের একালের সুবোধ বালকটির মত সবার পিছনে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বলতা নিয়ে সারা শৈশব ও যৌবন চুপ করেই কাটালেন!

তারপর আমাদের আদর্শ পুরুষ বড় বয়সে কি করেছেন, তার বিচার করা যাক্। যদিও শৈশবের নমুনা দেখেই পরে কেমন হবেন সেটা অনেকটা বোঝা যায়।

যুধিষ্ঠিরের অন্য দুটি ভাই তাঁদের শৌর্য্য-বীর্য্য ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্যে যত না কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন, যুধিষ্ঠির তার-বেশী প্রশংসা লাভ করেছেন নৈতিক চরিত্রের দাবীতে! বুদ্ধিমান লোক কোন-কিছুর সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামান না, এবং আমিও তা করবার চেষ্টা করব না। নৈতিক চরিত্র বল্লে কি বোঝায় তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বিশেষ গুণের মধ্যে তাঁর সত্যবাদিতার উল্লেখ নিয়ত হয়ে থাকে। কথায় বলে, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! জীবনে সত্যের প্রতি যে মহতী শ্রদ্ধা তিনি দেখিয়েছেন, তার পরিচয় তাঁর আচরণে আমরা পাইনি কি?

মিথ্যাবাদীর অখ্যাতি অর্জ্জন করে তারাই, কাজে-অকাজে মিথ্যা বলাই যাদের স্বভাব; কিন্তু বিপদের দিনে আত্মরক্ষার জন্যে মিথ্যা এমন কি অর্দ্ধ-সত্য বা সত্যের ভাণও যে প্রশংসার বস্তু হয়ে ওঠে, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা-হীন লোকের কাছে সেটা একটু রহস্যময় নয় কি? এটা কেমন করে সম্ভব হল? সত্যের আদর্শ যদি সেকালে কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হোত তবে যুধিষ্ঠিরের এ পতনকে অগ্রাহ্য করা চলতো; কিন্তু অর্জ্জুন-সম্বন্ধে ভীম ব'লে ছিলেন, তিনি পরিহাস-ছলেও মিথ্যা বলেননি, অথচ মহাপ্রস্থানের সময় সকলেরই কোন না কোন কারণে পতন হলো—পতন হলো না শুধু বাক্যবাগীশ এই অক্ষম মহাপুরুষের! সাধারণ মানুষের পক্ষে আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া যত সহজে ক্ষমা করে চলে, আদর্শ পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ সম্পদে বিপদে নিজের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ ও পবিত্র রাখাই তাঁর জীবনের ব্রত। ভীষ্মকে আমরা যে কারণে পূজা করি, প্রতাপকে আমরা যে কারণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, ঠিক সেই কারণেই কি যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করা চলে, না সত্যবাদী ব'লে প্রশংসা করা যায়?

তখনকার কালে ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ ছিল—সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ—মন্ত্রণা-সভায় তাঁর কতখানি বুদ্ধি খরচ হ'ত, তা আমরা কেন, অনেকেই জানেন না; কিন্তু যুদ্ধে তাঁর বিক্রমের উল্লেখ না করাই ভালো! যদি অনেক অক্ষৌহিণী সেনা, অর্জ্জুন, ভীম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির বিনা সহায়তায় যুদ্ধ-জয় ঘটতো, তবে নৈতিক বলে যুদ্ধ-জয়ের কথা স্বীকার করা যেত। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, নৈতিক বলের বক্তৃতায় রাজা-উজীর মারা চলে, সত্য-কার যুদ্ধে অন্য বলের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যুদ্ধে বিরাগ বা বিষাদ হওয়া সম্ভব অর্জ্জুনের মত বীরের, যুধিষ্ঠিরের নয়—যিনি আজীবন পরের বীরত্বকে আশ্রয় করে ছিলেন—এমন কি বিবাহে পর্য্যন্তও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেননি।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের আরও দু'একটা দিক

আছে যেটাকে আমরা কোন নীতিবান্ লোকের আদর্শ ব'লে মানতে পারি না। আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের কথা বলছি—ভ্রাতৃবৎসল স্বামী যুধিষ্ঠিরের কথা বলছি। ইতিহাসে আমরা এমনধারা ঘটনার কথা খুব কমই পড়েছি, যেখানে রাজা পাশা খেলার পণ রেখেছেন তাঁর রাজ্য এবং এমন দেশও খুব কম দেখেছি যেখানে প্রজারা সে-রাজাকে আদর্শ বলে' পূজা করেছে। আমাদের দেশে রাজ্য ছিল রাজার হাতে ন্যস্ত ধন, সে ধনে রাজার অধিকার ছিল অনেক, কিন্তু পণে বসিয়ে দেবার নয়। তা ছাড়া সুশাসনের জন্যে তিনি রক্ষণ-বেতন পেতেন, কাজেই তিনি ছিলেন রাজ্যের কর্ণধার কর্ম্মচারী—তার পুরো মালিক নন্। হয় যুধিষ্ঠির এ কথা ভুলেছিলেন; কিম্বা তখন হয়ত এ নিয়ম ছিল না! কিন্তু তা হলেও যুধিষ্ঠির রেহাই পান না। কারণ সে রাজ্য তাঁর একার সম্পত্তি নয়, পাঁচ ভাইয়ের। তাদের অনুমতি নেবার অপেক্ষা তিনি রাখেন নি—শুধু তাই নয়—অনুমতি নেবার আগেই সস্ত্রীক ভায়েদের পণে বসিয়ে দিয়েছিলেন! এবং তাঁর ভায়েরা আমাদের দেশের পাঠশালায় পড়া সুবোধ সুশান্তের মত পিঞ্জরের মধ্যে দিব্য আসন নিয়ে ভ্রাতৃস্নেহের অক্ষয় ও অনিন্দ্য মহিমায় যথেষ্ট আত্ম-প্রসাদ অনুভব করলেন! স্ত্রীর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বোধ করছি—বলা বাহুল্য, এ স্ত্রীও তিনি স্বয়ম্বর সভার পরীক্ষায় জয়লাভ ক'রে অর্জ্জন করেন নি! নীতি-বিশারদ কিন্তু স্বপক্ষে দু-একটা কথা বলতেও পারেন—তিনি বলতে পারেন যে তাঁর ভাববার সময় নিতান্ত অল্প, অথবা আত্মসম্মান কুলগৌরব যখন অপমানের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন ঐ কম সময়ের মধ্যেই ভেবে দেখলুম যে, রাজ্য-ভাই সব গিয়েছে,বাকি আছে পাঁচভায়ের একমাত্র স্ত্রী, তাকে পণে বসিয়ে দিলুম—আদর্শ স্বামী নয় কি!

পদে পদে ভ্রান্তমতিত্বের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না—যুধিষ্ঠির হয়ত তাঁর সমাজ ও কালানুযায়ী কাজ করে ছিলেন, দুষ্য কিছুই করেননি; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এমনধারা ভ্রান্তমতি দুর্ব্বল-চিত্ত ঝুটো মানুষকে নিয়ে আমাদের এ কি বিড়ম্বনা! নেই-মামার চেয়ে কাণা মামাই যাদের একমাত্র সম্বল, মানুষের মত মানুষকে পূজা করবার যাদের শক্তির অভাব, এই সব আদর্শকে নিয়ে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করুক; কিন্তু মানুষ যারা,—তেজের উপর সত্যের উপর পবিত্র জীবনের 'পরে যাদের অগাধ ও বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা, অন্তরে যাদের সার্থক জীবনের অসীম উৎসাহ, তারা কেমন ক'রে এ মিথ্যাকে এ ব্যর্থতাকে সত্য ব'লে আদর্শ ব'লে মেনে নেবে? যদি প্রাচীন কালে মনের মত আদর্শ না মেলে ক্ষতি কি! নতুন দেবতার প্রতিষ্ঠা কর! ঝুটা নিয়ে আর ভুলে থেকোনা।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

গান ও প্রাণ

সবারে শুধাই ডেকে, কি দিবি রে দান ?
বলে তারা, দেব গান।...
ভ্রমর গুঞ্জরি' যায়, শিরোপরে পাখী যায় গেয়ে
বেশী কি দিবি রে এর চেয়ে ?
শুনে তারা বাহিরায় পথে!
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ওঠে, চক্রের ঘর্ঘর জয়রথে,
গগনের চন্দ্রাতপ-তলে
গ্রহ রবি শশী পলে পলে
পায় পায় চলে তাল দিয়া,
গমকে গমকে কাঁপে মুগ্ধ ত্রাসে ধরিত্রীর হিয়া।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

দ্বারে দ্বারে হাত পাতি, বলি, তোরা কে কি দিবি দান ?
বলে তারা, দেব প্রাণ।...
মরণ আসিয়া বলে পরিহাসে চোখ ঠেরে হেসে,
—সে ত ঢের দেওয়া হলো যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে;
কিছু দাও নিজে থেকে, কিছু নিই কেড়ে,
এমনি করিয়া মোর দিনে দিনে পুঁজি যায় বেড়ে!
শুনে তারা—
তেড়ে গিয়ে মরণেরে করে দেশ-ছাড়া।
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বলে, প্রাণ এল ধড়ে,
কি কাজে লাগিতে হবে, বল ত্বরা ক'রে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

অবতার

৯

যে-সময়ে লাবিন্স্কি-প্রাসাদের ভৃত্যেরা প্রকৃত কৌণ্ট লাবিন্স্কিকে, গাড়িতে উঠাইয়া দেয় এবং কৌণ্ট নিজের ভূস্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়া অক্টেভের বাসা-বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হন—সেই সময় রূপান্তরিত অক্টেভ ধ্বধবে-সাদা একটী ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ঘরে গিয়া—কখন্ কৌন্টেসের ফুরসৎ হয়, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চিম্নীর আগ্নস্থানটা ফুলে ভরা; সেই

চিমনীর সাদা মার্ব্বেল পাথরে ঠেস্ দিয়া, কৌণ্টদেহধারী অক্টেভ আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। আয়নাটা সোনালি পায়া-ওয়ালা দেয়ালে-মারা একটা ব্র্যাকেটের উপর মানানসই রকমে বসানো। যদিও অক্টেভ দেহ-পরিবর্ত্তনের ভিতরকার গুপ্ত কথাটা জানিত, তথাপি, তাহার নিজের আকৃতি হইতে এই প্রতিবিম্ব এত তফাৎ যে, সে সহসা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, আয়নার এই প্রতিবিম্ব তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব কি না। অক্টেভ এই অপরিচিত ছায়ামূর্ত্তিটা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, উহা হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না।

সে দেখিল উহা আর একজনের ছায়া-মূর্ত্তি। ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সে একবার খোঁজ করিয়া দেখিল, কৌণ্ট ওলাফ চিম্‌নির কাছে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন কি না, এবং তাঁহারই ছায়া পড়িয়াছে কি না। কিন্তু কাহাকেই দেখিতে পাইল না। দেখিল—সে একলাই আছে। নিশ্চয়ই এই সমস্ত ডাক্তার শেরবোনোর কাণ্ড।

কয়েক মিনিট পরে, অক্টেভ-দেহ লাবিন্‌স্কি,—প্রাস্কোভোর স্বামীর শরীরের মধ্যে তার আত্মা যে প্রবেশ করিয়াছে এই চিন্তা হইতে বিরত হইয়া তাহার চিন্তার গতিকে বর্ত্তমান অবস্থার কতকটা অনুযায়ী করিয়া তুলিল। সমস্ত সম্ভাবনার বহির্ভূত এই অবিশ্বাস্য ঘটনা, যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবা যায় না, তাই কি না ঘটিল! এখনই সেই বহুদিনের আরাধ্য দেবীর সম্মুখে আমি উপস্থিত হইব, তিনি আর আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না! সেই অকলঙ্ক অনিন্দিতা রূপসীর সংসর্গে আমার ঐ অভিলাষ পূর্ণ হইবে!

সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত্ত যতই কাছাকাছি হইতে লাগিল, ততই তাহার মনের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। প্রকৃত প্রেমের যে সঙ্কোচ ও ভীরুতা, তাই আসিয়া অলক্ষ্যে দেখা দিল—যেন ঐ প্রেম এখনো অক্টেভের অনাদৃত, হীন দেহের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে।

রাণীর পরিচারিকার আগমনে, এই সমস্ত চিন্তা ও উদ্বেগ অপসারিত হইল। যখন পরিচারিকা নিকটে আসিল, তখন কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন হৃৎপিণ্ডে আসিয়া জমা হইল। পরিচারিকা বলিলঃ—

"রাণীঠাকুরাণী, আপনার অভ্যর্থনায় প্রস্তুত আছেন"।

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ পরিচারিকার পিছনে পিছনে চলিল, কেননা সে এই প্রাসাদের অন্ধিসন্ধি কিছুই জানিত না। পদচালনায় ইতস্তত-ভাব দেখিয়া পাছে তার অজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এইজন্য সে পরিচারিকার অনুসরণ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। পরিচারিকা তাহাকে একটা ঘরে লইয়া গেল। ঘরটা বেশ একটু বড় রকমের। এটি রাণীর প্রসাধন-কক্ষ। প্রসাধন-টেবিল সমস্ত সুকুমার বিলাস-সামগ্রীতে বিভূষিত। উৎকৃষ্ট খোদাই কাজ-করা কতকগুলা আলমারী; আলমারীগুলা সাটিন, মখমল, মলমল, জরি প্রভৃতি নানাপ্রকার সৌখীন পরিচ্ছদে ঠাসা। ঘরের দেয়াল সবুজ সাটিন

দিয়া মোড়া। মেজের তক্তা বিচিত্র মোলায়েম রঙে রঞ্জিত এক পুরু কোমল গালিচায় আচ্ছাদিত। প্রসাধন-টেবিলে সুগন্ধ-নির্য্যাসের স্ফটিক সিসিগুলা বাতির আলোয় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

ঘরের মধ্যস্থলে একটা সবুজ মখমল-পা-দানের উপর অদ্ভুত গঠনের ইস্পাতের কাজ করা একটা বৃহৎ ভূষণ-পেটিকা—তাহাতে বিবিধ রত্নালঙ্কার সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু এই সব অলঙ্কার পেটিকাতেই প্রায়ই বদ্ধ থাকিত;—কৌনটেস্ কচিৎ কখন তাহা ব্যবহার করিতেন। নারী-সুলভ অশিক্ষিত সুরুচি তাঁকে বলিয়া দিত—রত্ন-অলঙ্কারে রূপসীর প্রয়োজন হয় না। রূপের ছটার কাছে ঐশ্বর্য্যের ঘটা অতীব তুচ্ছ।

জানলা হইতে পর্দ্দা ভাঁজে ভাঁজে নিচে লুটাইয়া পড়িয়াছে—সেই জানলার কাছে, একটা বড় আয়না ও প্রসাধন-টেবিলের দুই-ডেলে বৈঠকী ঝাড়ের ছয় বাতির আলোয় উদ্ভাসিত। তাহারই সম্মুখে কৌনটেস্ প্রাস্কোভি-লাবিন্‌স্কা রূপলাবণ্যের ছটা বিকীর্ণ করিয়া উপবিষ্টা এক লঘুস্বচ্ছ বহিরাচ্ছাদনের নীচে কার্পাসের একটা শিথিল বন্ধনহীন নৈশ পরিচ্ছদ। তুষার-শুভ্র সুশোভন সুভঙ্গিম মরাল-কণ্ঠ বহিরাচ্ছাদনের ভিতর হইতে দেখা যাইতেছে। দুই দাসীতে মিলিয়া তাঁহার প্রচুর কেশগুচ্ছ ভাগ করিতেছিল, মসৃণ করিতেছিল, কুঞ্চিত করিতেছিল, কাণের ঘর্ষণ না লাগে,—এই ভাবে সাবধানে কেশ-রাশি কুঞ্চিত-আকারে গুছাইয়া রাখিতেছিল।

যখন এই কেশ-বিন্যাসের কাজ চলিতেছিল, রাণী জরির কাজ করা সাদা-মখমলের একটা ছোট চটিজুতার অগ্রভাগ মৃদু মৃদু নাচাইতেছিলেন। কখন কখন বহিরাবরণ-বস্ত্রের ভাঁজ একটু সরিয়া গিয়া, তুষার-শুভ্র নিটোল বাহু বাহির হইতেছিল, এবং কোন কেশগুচ্ছ স্থানচ্যুত হইলে অতি শোভন ভঙ্গীতে হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দিতেছিলেন।

তাঁহার সমস্ত শরীরে যেরূপ একটা শোভন এলানো ভাবভঙ্গী ছিল তাহা কেবল প্রাচীন গ্রীক্ পাষাণ-মূর্ত্তিতেই লক্ষিত হয়। এরূপ লঘু ধরণের তরুণ সৌন্দর্য্য, সুন্দর গঠন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ফ্লরেন্সের বাগান-বাড়ীতে অক্টেভ কৌন্‌টেসকে যখন দেখিয়াছিল তাহা অপেক্ষা এখন কৌন্‌টেস্ আরও চিত্ত-মোহিনী হইয়াছেন। যদি অক্টেভ পূর্ব্বেই ইহার রূপে মুগ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখন দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আরও কিছু যোগ করিয়া অসীমের বৃদ্ধি করা যায় না।

কোন-একটা ভীষণ দৃশ্য দেখিলে যেরূপ হয়, কৌন্‌টেসকে এইরূপ মূর্ত্তিতে দেখিয়া, কৌণ্টদেহধারী অক্টেভের হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল,—সে একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল; মুখ শুকাইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কে যেন হাত দিয়া তার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। লোহিতবর্ণ অগ্নিশিখা যেন তাহার চক্ষের চারিধারে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। এই রূপসী তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

এই আত্মহারা ভাব, এই মূঢ়তার ভাব কোন প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর পক্ষেই সাজে, কিন্তু কোন স্বামীর পক্ষে নিতান্তই হাস্যজনক—এই মনে করিয়া কৌণ্টদেহ অক্টেভ সাহস

করিয়া দৃঢ়পদক্ষেপে কৌন্‌টেশের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দাসীরা তখন তাঁহার বেণী রচনা করিতেছিল; তাই কৌন্‌টেশ মুখ না ফিরিয়াই বলিলেন, "আ! তুমি ওলাফ! কি দেরী করেই এসেছ আজ!" তার পর, বহিরাবরণ-বস্ত্রের ভাঁজ হইতে তাঁর সুন্দর একটি হাত বাহির করিয়া, অক্টেভের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

কৌণ্টদেহ অক্টেভ কুসুম-কোমল এই হাতখানি লইয়া জলন্ত আগ্রহের সহিত দীর্ঘ টানে চুম্বন করিল—যেন তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার ওষ্ঠাধরে আসিয়া তখন কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

আমরা জানিনা, কি-এক সূক্ষ্ম বোধশক্তি হইতে, কি এক স্বর্গীয় লজ্জাশীলতা হইতে হৃদয়ের কি এক যুক্তিহীন যুক্তি হইতে, কৌন্‌টেস যেন পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন; লোহিতবর্ণ উচ্চ গিরিশিখরস্থ তুষাররাশি উষার প্রথম চুম্বনে যেরূপ হয়, সেইরূপ তাঁহার মুখ, তাঁহার কণ্ঠ, তাঁহার বাহু সহসা রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইল। অর্দ্ধ অভিমানের ভাবে, অর্দ্ধলজ্জার ভাবে, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার হাতখানি ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেন। অক্টেভের ওষ্ঠাধর স্পর্শে তাঁহার মনে হইল, তাঁহার হাতের উপর কে যেন অগ্নি-তপ্ত লোহার ছাঁকা দিল। তথাপি তিনি চিত্তকে সংযত করিয়া, তাঁর সেই শিশুবৎ মধুর হাসিটি মুখে আনিলেন।

"ওলাফ, তুমি কোন উত্তর দিচ্চ না কেন? আমি যে ছয় ঘণ্টায় উপরেও তোমাকে আজ দেখ্‌তে পাইনি।" পরে ভৎর্সনা স্বরে বলিলেন—"তুমি আমাকে এখন বড়ই অবহেলা কর, পূর্ব্বে ত তুমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে এই রকম করে একলা ফেলে থাক্‌তে পারতে না। তুমি কি আমাকেই শুধু ভাব্‌ছিলে?"

কৌণ্টদেহ অক্টেভ উত্তর করিল:—

—"তোমাকেই। তোমা ভিন্ন আর কাউকে না।"

—"না, না, সব সময় আমাকে ভাবনি; যে সময়ে তুমি আমার কথা ভাব, আমি দূরে থাক্‌লেও তা জান্‌তে পারি। এই মনে কর, আজ রাত্রে আমি একলা ছিলাম, সময় কাটাবার জন্য পিয়ানোয় বসে একটা সুর বাজাচ্ছিলাম। যখন সুরগুলো খুব জমে উঠেছিল, তোমার আত্মা কয়েক মিনিট ধরে' আমার চারিদিকে একবার ঘুর-পাক দিয়েছিল; তারপর কোথায় যে উড়ে গেল, কিছুই জানতে পারলাম না—তার পর সে আর ফিরে আসে নি। মিথ্যে কথা বোলো না। আমি যা তোমাকে বল্‌চি—সে-বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত।"

বস্তুত প্রাস্কোভির ভুল হয় নাই; এই সেই মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে ডাক্তার শেরবোনোর বাড়ীতে, কৌণ্ট ওলাফ মন্ত্রপূত জলপাত্রের উপর নত হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁহার আরাধ্য দেবীর মূর্ত্তিকে আহ্বান করেছিলেন—তার পরেই তিনি সম্মোহন-নিদ্রার অতল সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তখন তাঁর জ্ঞান, তাঁর ভাব, তাঁর ইচ্ছা—সব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দাসীরা কৌন্‌টেশের নৈশ প্রসাধন সমাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কৌণ্টদেহ অক্টেভ সেইখানে বরাবর সমান দাঁড়াইয়া থাকিয়া কৌন্‌টেশ প্রাস্কোভির উপর জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। এই লালসা-দীপ্ত দৃষ্টি

সহ্য করিতে না পারিয়া কৌণ্টেস তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আলখাল্লায় বেশ করিয়া আচ্ছাদন করিলেন, কেবল মাথাটা খোলা রহিল। ব্রহ্মলোগম নামে সেই সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বলে ডাক্তার শেরবোনো দুই আত্মাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন—একথা শুধু প্রাস্কোভি কেন—কোনও মানুষের অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু প্রাস্কোভি, কৌণ্টদেহ অক্টেভের চোখে, ওলাফের সচরাচর চোখের ভাব, সেই দেবোপম বিশুদ্ধ প্রশান্ত ধ্রুব নিত্য প্রেমের ভাব দেখিতে পাইলেন না। কৌণ্টদেহ অক্টেভের ঐ দৃষ্টিতে একটা পার্থিব লালসার আগুন জ্বলিতেছিল। তাই ঐ দৃষ্টিতে কৌন্টেস্ ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক্ কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিলেও তাঁর মনে হইল একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। নানাপ্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন; তবে আমি কি এখন ওলাফের চোখে শুধু একটা ইতর রমণী, এক-জন নীচ বারাঙ্গণা মাত্র—যার রূপের লালসায় তিনি উন্মত্ত হয়েছেন। আমাদের আত্মায় আত্মায় কেমন একটি সুন্দর মিল ছিল—দুই হৃদয়-বীণা কেমন মধুর ভাবে এক সুরে বাজ্‌ত, না জানি কিসে এই মিলটি, এই ঐক্যতানটি ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ওলাফ কি আর কাউকে ভাল বাসত? প্যারিসের পঙ্কিল মলিনতা ঐ অকলঙ্ক হৃদয়কে কি কখন কলঙ্কিত করেছিল?" এই প্রশ্নগুলি তাঁর মনের মধ্য দিয়া দ্রুতভাবে চলিয়া গেল, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিতে পারিলেন না। ভাবিলেন হয়ত আমি উন্মাদগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে যেন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁর বুদ্ধি লোপ পায় নাই। কি-একটা অজ্ঞাত বিপদ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত—এইরূপ ভাবিয়া তাঁর অত্যন্ত ভয় হইল। মনে করিলেন আত্মার এই "দ্বিতীয় দৃষ্টির" প্রভাবে যাহা অনুমান হইতেছে তাহা অগ্রাহ্য করা ঠিক্ নহে।

তিনি বিচলিত ও আকুল-ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং উঠিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। অলীক কৌণ্টও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কৌন্টেস্ দরজার কাছে আসিয়া আবার ফিরিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন। তার পর প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সাদা ও শীতলকায় কৌন্টেস্, ঐ যুবকের প্রতি ভীতি-বিস্ফারিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ঝপ্ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া, খিল লাগাইয়া দিলেন।

"ও যে অক্টেভের দৃষ্টি!" এই কথা বলিয়া অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত হইয়া একটা কৌচের উপর শুইয়া পড়িলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে মনে-মনে বলিলেন:—আচ্ছা এ কেমন করে' হ'ল, সেই দৃষ্টি—যে দৃষ্টির ভাবটা আমি কখনই ভুলবনা—সেই দৃষ্টি ওলাফের চোখে কেন আজ রাত্রে দেখতে পেলাম?" সেই বিষণ্ণ হতাশ হৃদয়ের অগ্নিশিখা আমার স্বামীর চোখের উপর জ্বলে উঠ্‌ল কি করে'? অক্টেভের কি মৃত্যু হয়েছে? আমার কাছে চিরবিদায় নেবার জন্য তার আত্মা কি মুহূর্ত্তের জন্য আমার সম্মুখে দপ্ করে একবার জ্বলে উঠ্‌ল! ওলাফ ওলাফ! যদি আমি ভুল করে থাকি, যদি পাগলের মত মিথ্যা ভয়ে আকুল হয়ে থাকি, তবে আমাকে তুমি ক্ষমা কর। কিন্তু দেখ, যদি

আমি আজ রাত্রে তোমাকে আলিঙ্গন করতাম, তাহলে আমার মনে হ'ত আমি আর একজনকে আলিঙ্গন করচি।"

খিল্‌টা ভাল করিয়া লাগানো হইয়াছে কিনা,—দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া, মাথার উপর যে লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, সেই লণ্ঠনটা জ্বালাইয়া, কৌন্‌টেশ ভীত শিশুর মত গুঁড়ি-সুঁড়ি মারিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কি এক অনির্দ্দেশ্য বেদনা তাঁর বুকে চাপিয়া রহিল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কত অসংলগ্ন অদ্ভুত স্বপ্ন আসিয়া তাঁর গভীর নিদ্রায় ব্যাঘাত করিল। আগুনের মত জ্বলন্ত সেই অক্টেভের চোখ—কুয়াসার ভিতর হইতে—তাঁহার উপর একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং তাঁহার উপর আগুনের হল্‌কা নিক্ষেপ করিতেছে। আর সেই সময় তাঁহার খাটের নীচে একটা কালোমূর্ত্তি—মুখ বলি-রেখায় আচ্ছন্ন,—উবু হইয়া বসিয়া আছে, অপরিচিত ভাষায় বিড়বিড় করিয়া কি বলিতেছে; এই অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে ওলাফও আছেন—কিন্তু তাঁর নিজের আকৃতিতে নয়—অন্য আকৃতি ধরিয়া।

অক্টেভ যখন দেখিল, তার সম্মুখেই দরজা বন্ধ হইল, ভিতরকার অর্গলের ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ শুনা গেল, তখন সে কিরূপ হতাশ হইয়া পড়িল, তাহা আমরা আর বর্ণনা করিব না। তাহার সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত্তের চরম আশা অন্তর্হিত হইল। মনে মনে বলিল:—"আমি কি করিলাম! এক নারীর হৃদয় জয় করবার জন্য এক যাদুকরের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে আমার ইহকাল পরকাল সমস্তই নষ্ট করলাম—ভারতবর্ষের ডাইনী মন্ত্রে সেই নারী অসহায় ভাবে আমার কাছে ধরা দিয়েছিল—কিন্তু আবার পালিয়ে গেল। আমি পূর্ব্বে প্রেমিক হয়ে প্রত্যাখাত হয়েছিলাম, এখন আবার স্বামী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হলাম। প্রাস্কোভির অজেয় সতীত্ব, যাদুকরের সমস্ত নারকী কুমন্ত্রণা-জাল ছিন্ন করে দিয়েছে। শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়ে যেন কলুষিত-চিত্ত কোন দুরাত্মাকে দূর করে দিলেন!

অক্টেভ সমস্ত রাত্রি এই অদ্ভুত অবস্থায় আর থাকিতে পারিল না। সে কৌন্টের মহলটা খুঁজিতে লাগিল। সারি সারি অনেক ঘর পার হইয়া অবশেষে দেখিতে পাইল,—কাঠের খুঁটি-বিশিষ্ট একটা উচ্চ পালঙ্ক—তাহাতে সংলগ্ন বুটিদার চিত্রবিচিত্র পর্দ্দা। কায়িক শ্রমে ও মনের আবেগে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া কৌন্ট-দেহ অক্টেভ সেই পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িল,—শেরবোনোর উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের অবস্থা একটু ভাল হইয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল,—"এখন হইতে আমি একটু সংযত হয়ে চল্‌ব; ওরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে থাক্‌ব না; স্বামীর ধরন-ধারণ অবলম্বন করব। কৌন্টের পরিচারকের সাহায্যে অক্টেভ একটু গম্ভীর ধরণের সাজসজ্জা করিয়া, ধীর-পাদবিক্ষেপে খাবার ঘরে প্রবেশ করিল। সেইখানে কৌন্টেশ প্রাতর্ভোজনে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চয়ন

ষ্টিভেনসনের প্রিয়তমা

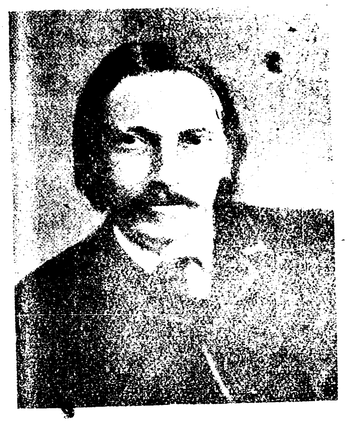

ষ্টিভেনসন

When my wife is far from me,
The undersigned falls all at
sea. R. L. S.

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রবার্ট লুইস ষ্টিভেনসন নিজের স্ত্রী-সম্বন্ধে এইভাবে নিজের মনের প্রেমকে ব্যক্ত ক'রে গেছেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আজ যে আমি এতটা উন্নতিলাভ করতে পেরেছি, তার একমাত্র কারণ আমার সহধর্ম্মিনী। যখন আমার ভিতরে ঠক্‌ঠকে হাড় আর খক্‌খকে কাশি ছাড়া আর-কিছু দেখবার-শোনবার বিষয় ছিল না, যখন আমাকে দেখলে বাসরের বরের বদলে ঘাটের মড়া ব'লেই মনে হোতো, এই করুণাময়ী মহিলা সেই দুর্দ্দিনেই আমার কণ্ঠে বর-মাল্য অর্পণ করেছিলেন।"

বাস্তবিক, ফ্যানি অস্‌বোর্ণের সঙ্গে বিবাহের সময়ে ষ্টিভেনসনের অর্থভাগ্য ও স্বাস্থ্যভাগ্য দুইই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। বিবাহের নামে ফ্যানি অস্‌বোর্ণেরও সুখী হবার কোন কারণ ছিল না। সতেরো বৎসর বয়সে প্রথমে যে পুরুষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল—সে লোকটি ছিল একটি একের নম্বরের দুরাচার। অস্‌বোর্ণ স্বামী ত্যাগ ক'রে নিজের তিনটি সন্তান নিয়ে য়ুরোপে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ষ্টিভেনসনের আলাপ হয় ফ্রান্সে এবং তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই অল্‌বোর্ণের প্রেমে পড়ে যান।

ষ্টিভেনসনের বয়স তখন ছাব্বিশ আর অস্‌বোর্ণের ছত্রিশ। ষ্টিভেনসনের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও যত্ন করবার লোকের অভাব দেখে, অস্‌বোর্ণের মাতৃহৃদয়ে মমতার ক্ষুধা জেগে উঠল। সেই মমতা ক্রমে গভীর প্রেমের আকারে দেখা দিলে। ষ্টিভেনসন তখন ভীষণ যক্ষ্মাকাশে আক্রান্ত এবং বড়-জোর মাসকতকের বেশী তাঁর বাঁচবার আশা ছিল না। কিন্তু অস্‌বোর্ণ তবু তাঁকে বিবাহ করতে ইতস্তত করলেন না এবং বিবাহের পরেও একমাত্র তাঁরই সেবা-যত্নে ষ্টিভেনসনের নির্ব্বাণপ্রায় জীবন-দীপটির শিখা চোদ্দবৎসর কাল উজ্জ্বল হয়ে ছিল।

ফ্যানি অস্‌বোর্ণের বাপ-মা ছিলেন ওলন্দাজ। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানোপোলিস নগরে তাঁর জন্ম হয়।

বিবাহের পর যে চোদ্দবৎসর ষ্টিভেনসন বেঁচে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁর ভালো ভালো বইগুলি এই সময়েই লেখা।

স্বাস্থ্যলাভের জন্যে ষ্টিভেনসন তাঁর সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে প্রায় সারা পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে বেড়ান। তারপর তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের স্যামোয়া দ্বীপে গিয়ে স্থায়ী হন। এবং এইখানেই, আজ থেকে ছাব্বিশ বৎসর আগে তাঁর মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ-সাগরের দ্বীপে দ্বীপে তিন বৎসরকাল ভ্রমণের সময়ে, তাঁর প্রেমময়ী স্ত্রী যে কত কষ্ট সহিয়াও স্বামীর প্রত্যেক অভাবটি পূরণ করেছিলেন, সে কাহিনী শুন্‌লে সকলকেই অভিভূত হ'তে হবে। ধারাবাহিক ভ্রমণের সমস্ত জিনিষ গুছানো, নির্জ্জন দ্বীপের মধ্যে খাবার যোগাড় করা, জাহাজের খোঁজ নেওয়া, অনেক দূর থেকে রুগ্ন স্বামীর দেহ বহনের জন্যে নিজেই গাড়ী-ঘোড়া ডেকে আনা, জাহাজের আগুন থেকে স্বামীর পাণ্ডুলিপির প্যাট্‌রা বাঁচানো,—এম্‌নি কত ব্যাপারে অস্‌বোর্ণ ছাড়া অসহায় ষ্টিভেনসনের আর দ্বিতীয় গতি ছিল না।

এই নিঃস্বার্থ প্রেমের উপরে শেষটা হঠাৎ একদিন যবনিকা পড়ে গেল। তখনো সন্ধ্যার আহার সুরু হয়নি। বাংলোর বারান্দায় বসে ষ্টিভেনসন খুব খুসি মনে স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করছিলেন। আচম্বিতে আপনার মাথায় তিনি দুই হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "এ কি হোলো?" তারপর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার চেহারা কি অদ্ভুত দ্যাখাচ্ছে?"—ব'লেই তিনি স্ত্রীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। আজ কত বৎসর ধ'রে শান্তি-সুখ-আরামের জন্যে এম্‌নি ভাবেই তিনি স্ত্রীর স্নেহ-ভরা কোলের ভিতরে আশ্রয় চেয়ে এসেছেন।—দেখতে দেখতে তাঁর মুখের উপরে মরণের অন্ধকার ঘনিয়ে এল, এবং স্ত্রীর আলিঙ্গনের ভিতরেই তাঁর বক্ষ ভেদ ক'রে অন্তিম নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

নরওয়ের ভাস্কর

চার পাঁচ বছর আগে "ভারতীর" চয়নে নরওয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ষ্টিফ্যান সিণ্ডিংএর সামান্য পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। গেল কয় বছরের মধ্যে তাঁর হাতের কাজ নিয়ে আরো অনেক আলোচনা হয়েছে। পাথরের উপরে এমন ক'রে কবিতা লিখতে,—খালি নরওয়ে কেন,—একমাত্র রোদাঁ ছাড়া এ-যুগের আর কোন ভাস্কর পারেন নি।

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এই। চুয়াত্তর বৎসর আগে, পশ্চিম নরওয়েতে তাঁর জন্ম। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া সাঙ্গ ক'রে তিনি প্রথমে আইন শিখতে যান। কিন্তু চব্বিশ বৎসর

সিণ্ডিং

বয়সের সময়ে আইন ছেড়ে তিনি ললিত কলার আশ্রয়ে আত্মসমর্পন করেন, জার্ম্মানীর বার্লিন সহরে গিয়ে ভাস্কর ভোল্‌ফের কাছে সিণ্ডিং শিল্পশিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ছয় সাত বছর সেখানে থেকে, ভাস্কর্য্যে হাত অনেকটা দুরস্ত ক'রে নিয়ে, তিনি আধুনিক ললিত কলার কেন্দ্র প্যারী সহরে আগমন করেন।

প্যারীতে থাক্‌তে থাক্‌তে ছাত্র-অবস্থাতেই সিণ্ডিং তাঁর অদ্বিতীয় মূর্ত্তি Valkyrie গঠন করেন।

একবার একটি পাহাড়ে উঠবার সময়ে আচম্বিতে সিণ্ডিংয়ের চারপাশে গভীর গর্জ্জনে ঝটিকা জেগে উঠেছিল। তাঁকে বার বার ধাক্কা মেরে তীরের মতন ঝোড়ো হাওয়া বয়ে

বন্দিনী মা

রণরঙ্গিণী

যেতে লাগ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নেমে এল! সেই ঘন ঘন বিদ্যুতের চম্‌কানি ও পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত বাজের ঝন্‌ঝনানির মাঝে সিণ্ডিংয়ের ভাবুক প্রাণের ভিতরে ঝড়ের যে রুদ্র মূর্ত্তি ফুটে উঠেছিল, এই "রণরঙ্গিণী" বা Valkyrie-তে তারই স্থায়ী প্রকাশ আছে।

য়ুরোপের কলা-রাজ্যে সিণ্ডিংএর স্থান কোথায়, তাই নিয়ে এখন আলোচনা চল্‌ছে। কলাজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের সঙ্গেই সকলে সিণ্ডিংএর নাম উচ্চারণ করছেন। বিখ্যাত জার্মান বিশেষজ্ঞ কুহ্‌নের মতে "রোদাঁর সঙ্গে তুলনায় সিণ্ডিং কিছু-মাত্র খাটো হবেন না। রোদাঁর সঙ্গে সত্য সত্যই তাঁর গঠন-পদ্ধতিরও অনেকটা মিল আছে। অধিকন্তু সময়ে সময়ে রোদাঁর খেয়ালের খেলায় যে-সব অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে, সিণ্ডিংএর হাতের কাজে তেমন খাপছাড়া কোন-কিছুও নজরে পড়ে না।"

নর ও নারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি

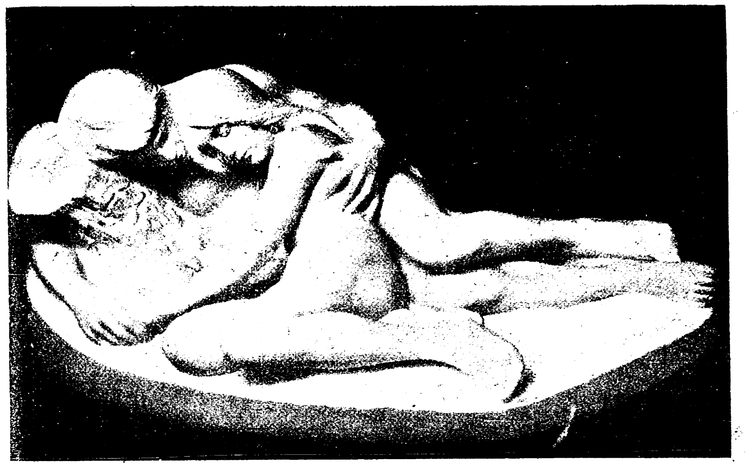

রাত্রি

যে গভীর আকর্ষণ আছে, রোদাঁর মতন সিণ্ডিংও তা শিলাপটে চমৎকার ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর রচিত 'রাত্রি'তে আমরা এই ভাবেরই ছবি দেখি। 'রাত্রি'র মধ্যে নিদ্রিত পুরুষের মুখের ও হাতের ভাব-ভঙ্গিতে কতটা প্রেমের ও স্নেহের, এবং ঘুমন্ত মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে কতখানি আত্ম-সমর্পনের রূপ বিকসিত হয়েছে!

রোদাঁর শিল্প-জীবনের অধিকাংশ সংগ্রামে পরিপূর্ণ। লোকে তাঁকে সহজে চিন্‌তে পারে নি। চারিদিক থেকে নানা বাধা-বিঘ্ন, হিংসা-নিন্দা, অনাদর ও প্রতিবাদের ভিতর থেকে রোদাঁ বহুকষ্টে নিজের পথ কেটে নিয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌছোতে পেরে ছিলেন। আধুনিক জগতের তিনি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বটে,—কিন্তু এ সম্মান পেয়েছিলেন তিনি প্রায় জীবনের সায়াহ্নে।

যদিও প্রতিভা-মাত্রেরই স্বরূপ চিন্‌তে দেরি লাগে, তবু এ-কথা সত্য যে, স্বদেশে নিজের নামকে প্রতিষ্ঠিত করতে, সিণ্ডিং তেমন বেশি কষ্ট পান নি। নরওয়ের আধুনিক শিল্প-সমাজে সিণ্ডিং গুরুর মতন আদর ও সম্মান লাভ করেছেন। এবং সমগ্র স্কাণ্ডিনেভিয়ার নবীন কোন শিল্পীই সিণ্ডিংয়ের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন-নি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভাবুকতার ক্ষমতা

আফ্রিকার রুয়েনজোরি আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের উপরে চির-তুষারের সাম্রাজ্য। তার তলায় মিকিনো আগ্নেয়-গিরির পাথর-গলানো উত্তাপ; এই আগ্নেয়গিরির পাদমূলে যে নিবিড় অরণ্য, তার মধ্যে থাকে গরিলার দল।

এইখানে যে পুরুষ-গরিলাকে বন্দী করা হয়েছিল, নীচে তার ছবি দেওয়া গেল। এই জীবটি মাথায় আটফুট উঁচু, ওজনে পাঁচমণ পঁচিশসের; তার বুকের বেড় একষট্টি ইঞ্চি। চল্লিশজন পালোয়ান মানুষ একসঙ্গে আক্রমণ করলেও সকলকেই সে একলাই মেরে-ধরে তুলো ধুনে দিতে পারে,—গায়ে তার এত জোর!

ছবির গরিলার ডানধারে, ওপরের হাত-দুখানা গরিলার; আর নীচের হাত-দুখানা মানুষের। এই দু-জোড়া হাতের ভিতরে আসল তফাৎ হচ্ছে বুড়ো-আঙুলে। চিন্তাশক্তির দ্বারা মানুষের কপালের মতন, হাতের বুড়ো-আঙুলও ক্রমেই বিকাশলাভ করেছে।

গরিলার ডানধারে একটি মানুষের মূর্ত্তি।

বৈজ্ঞানিকদের মতে, এই দুটিই দুই ভাইয়ের মূর্ত্তি; এবং দশলক্ষ বৎসর আগে থেকে এই দুই ভাই পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আছে।

গরিলার ভিতরে কতক পরিমাণে মনুষ্যত্ব এবং মানুষের ভিতরে কতক পরিমাণে "গরিলাত্ব" আছে। কথাটা শুনতে অনেকের ভালো লাগ্‌বে না—কিন্তু মূলে এটি সত্য কথা।

হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধের সময়ে মানুষের মুখ প্রায়ই এই গরিলার মুখের মতন দেখতে হয়। ভাগ্যে গরিলা-সুলভ সংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে অবিরাম সংগ্রাম চল্‌ছে—তাই তার মুখের উপরে আজ একটি প্রশান্ত শান্তির কান্তি ফুটবার অবকাশ পায়!

গরিলার দেহের ভিতরে হাড় ও অন্যান্য শারীর-যন্ত্রের সংস্থান অবিকল মানুষের মতন। এমন-কি উভয়ের মস্তিষ্কের গঠন পর্য্যন্ত প্রায় একরকমই দেখ্‌তে।

দশলক্ষ বৎসর বা আরো আগে এই মানুষ

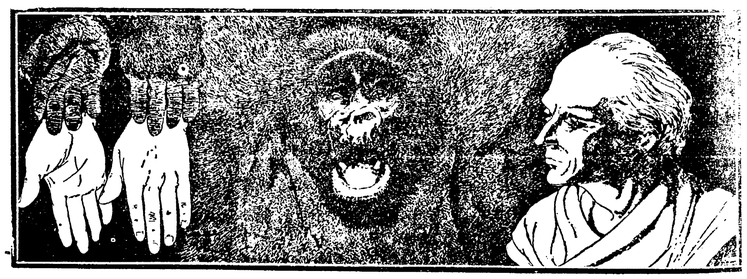

গরিলা ও মানুষ

আর গরিলার ভিতরে মনের পার্থক্য ছিল অত্যন্ত অল্প।

গরিলার গায়ের জোর ভয়ানক,—সে অনায়াসে সিংহের সঙ্গে লড়্‌তে পারে। দাঁতের আর হাতের জোরে সে কারুকেই কেয়ার করে না! অতএব সে সুধু দাঁত আর হাত এবং পাশব শক্তিকেই সম্বল ক'রে রইল। সে কখনো চিন্তাশক্তির ছায়া মাড়ায় নি, কারণ চিন্তার সার্থকতা কখনো সে অনুভব করে-নি।

কিন্তু সেই আদিম যুগে,—গরিলার ভাই, অর্থাৎ যে মানুষের আকার লাভ করে, সে, গায়ের জোরে আর লম্বায়-চওড়ায় গরিলার চেয়ে ঢের ছোট ছিল। হিংস্র জন্তুরা অনায়াসে তাকে বধ কর্‌তে পার্‌ত। সে-সব জন্তু দেখে মানুষ ভয়ে সারা হয়ে উঠ্‌ত—এখনো ওঠে। কাজেই এই দুর্ব্বল মানুষ-জন্তু গিরি-গুহায় ঢুকে, গাছের টঙে চড়ে নানান-রকম বুদ্ধি খাটিয়ে আত্মরক্ষা কর্‌ত। তাই চিন্তাশক্তির দ্বারা তাকে দেহ-শক্তির অভাব পূরণ ক'রে নিতে হয়েছিল। এইখানেই তার ক্রমোন্নতির সূত্রপাত।

এই ছবিতে আঁকা গরিলা আর মানুষ একই সমস্যা পূরণের চেষ্টা করছে। গরিলা ভাবছে—"আমি যাকে দেখতে পারিনা, তাকে কি ক'রে তাড়িয়ে দেব?.....হত্যা কর্‌ব?" দেখুন, দুইহাত তুলে গরিলা শত্রুকে ধ্বংস কর্‌তে উদ্যত। কেননা এ-ছাড়া আর-কোন পদ্ধতি তার অজ্ঞাত।

মানুষ ভাবছে:—"ন্যায় ও মানস-শক্তির দ্বারা কেমন ক'রে আমি পাশব-শক্তিকে দমন কর্‌ব?"—এ সমস্যা মানুষ সমাধান করেছে তার মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিকে কাজে খাটিয়ে। ফলে আজ সে নায়গ্রা প্রপাতকে—দশলক্ষ গরিলার জোর যার কাছে তুচ্ছ—অনায়াসে বেঁধে ফেল্‌তে পেরেছে। যে বিদ্যুৎ দেখ্‌লে গরিলা পর্য্যন্ত ভয়ে কুঁকড়ে পড়ে, মানুষ সেই বিদ্যুৎকেও অনায়াসে নিজের গোলাম ক'রে রেখেছে। দুর্ব্বল মানুষের এই চিন্তাশক্তির কাছে মহাবল গরিলা আজ তৃণের মত তুচ্ছ।

শত শত যুগ আগে মানুষের আর গরিলার মুখে বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। চিন্তাশক্তির অভাবে গরিলার মুখ আজও যে-কে-সেই আছে; কিন্তু চিন্তাশীলতার গুণে মানুষের মুখের চেহারা আজ কত উন্নত!

চিন্তাশক্তি যে কি অসাধ্য সাধন কর্‌তে পারে, ছবির এই মূর্ত্তিদুটি তারই জলন্ত প্রমাণ।

একশো-বচ্ছরের বর

ডাক্তার মরিসন আমেরিকার একজন বিখ্যাত লোক। তাঁর বয়স পাকা একশো বছর।

মিস্ বার্ণির বয়স অন্তত বাহাত্তর বৎসর। "অন্তত" বল্লুম এইজন্যে যে, মিস বার্ণি নিজের বয়সের কোনই হিসাব রাখেন না! তিনি নানাদেশী চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

সংপ্রতি এই একশো বছরের বরের সঙ্গে এই বাহাত্তর বৎসরের কুমারী কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে!

বর আর বউ!

মিস্ বার্ণি বলেন, "আমি অল্পবয়সের বিয়েতে বিশ্বাস করি না। যৌবন-বিবাহের 'রোম্যান্স' সম্বন্ধে যে গল্প-গুজোব শোনা যায়, তাতেও আমার কোন আস্থা নেই। আমার মতে, বিবাহের দ্বারা মানুষ তার দোসর—সুখ-দুঃখের অংশীদার সংগ্রহ করে—এই মাত্র! ডাক্তারের সঙ্গে আমি যে বিবাহের চুক্তিপত্রে সই করেছি, তার কারণ আমাদের দুজনের রুচি ও প্রকৃতি একরকম;—কাজেই আমরা পরস্পরকে সাহায্য কর্‌তে পারব।"

ডাক্তার মরিসন দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে বলেন, "মানুষ তার মনের ধারাকে বন্ধ ক'রে দেয় এবং ফলে তার দেহের কল-কব্জায় মর্চ্চে ধরে যায়। নানান ভাষার আলোচনার দ্বারা আমি আমার মনকে সর্ব্বদাই সতর্ক রাখি ও কাজে খাটাই। গ্রীক, লাটিন, হিব্রু ও সংস্কৃতের শব্দকোষ স্মরণ রাখ্‌তে এবং ফরাসী, ইতালীয় ও স্পেনীয় ভাষার অনেকটা-একরকম বিভিন্ন বাগ্‌ধারাকে মনের ভিতরে পরস্পর থেকে আলাদা ক'রে রাখ্‌তে পার্‌লে, মানুষের মন ষোদ্ধার তরোয়ালের মতন মার্জ্জিত হয়ে থাকে। অলস সাধারণ লোকেরা নিজেদের মন ও দেহকে অকেজো রেখে রেখে শেষটা মর্চ্চে ধরিয়ে ফেলে; আবার ব্যবসায়ী ও পেশাদার লোকেরা আপনাদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এমন বিশেষ ভাবে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন যে, সে সংকীর্ণতা 'অ্যাসিডে'র মতন তাদের মনের 'স্প্রিং'কে ক্ষইয়ে দেয়। আমার পেশা ডাক্তারী। কিন্তু সেজন্যে সঙ্গীতালাপ কর্‌তে আমি বিমুখ হইনি বা আমার ডাক্তারীকে আমি আমার প্রেত-তত্ত্ব, জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান আলোচনাতেও বাধার মতন হ'তে দিইনি। এম্‌নি নানান বিষয়ে আকৃষ্ট থাকার দরুণ আমার মনের ভারও সর্ব্বদিকেই সমান হয়ে আছে। দীর্ঘজীবন লাভের আর-একটি মস্ত উপায় হচ্ছে, প্রতিদিন হাসি-খুসির

ব্যবস্থা ক'রে রাখা। আমি সহজে রেগে উঠি না। আমি সাদাসিধে পোষ্টাই খাবার খাই এবং আমার খাদ্যসামগ্রীতে খুব-বেশী starch বা protein থাকে না। আমার মতে, অধিকাংশ লোকই যেমন বেশী খায়, তেম্‌নি বেশী ঘুমায়।"

ডাক্তার মরিসন তাঁর স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে এখন এমন একখানি পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, যা প্রকাশিত হ'লে চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হবে। মিস বার্ণি তাঁর চতুর্থ-পক্ষের স্ত্রী।

হাড়ের 'কলম'

গেল কয়-বছরের মধ্যে অস্ত্র-চিকিৎসার বিভাগটা অত্যন্ত উন্নত হয়ে উঠেচে। সুতরাং প্রায়ই নতুন নতুন উদ্ভাবনার কথা শোনবার জন্যে জনসাধারণ যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে, এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

পাশ্চাত্য অস্ত্র-চিকিৎসায় আজ-কাল হাড়ের কলম বসাতে ডাক্তাররা অশ্চর্য্যরকম কেরামতি দেখাচ্ছেন। সংপ্রতি উইলিয়ম কস্‌গ্রোভ নামে একজন গাড়োয়ানের দেহ নিয়ে অস্ত্র-চিকিৎসকরা যে কার্য্য সাধন করেছেন, আপনারা তা শুন্‌লেও অবাক হবেন। অনেকদিন আগে পিঠের ওপর ঘোড়ার লাথি খেয়ে তার শিরদাঁড়াটা আহত হয়ে যায়। ফলে তার দেহে আংশিক পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

হাসপাতালের ডাক্তাররা তার আহত শিরদাঁড়ার খানিকটা বাদ দিয়ে, সেখানে গরুর পাঁজ্‌রার একখানা হাড় বসিয়ে দিতে চাইলেন। কস্‌গ্রোভ তাতে রাজি হয়ে গেল।

তখন একটি অল্পবয়সী গরু বেছে নিয়ে আগে পরখ ক'রে দেখা হ'ল, সে নীরোগ কিনা? গরুটির বয়স অল্প না হ'লে তার হাড় তেমন নরম ও নমনীয় হ'ত না, আর মানুষের দেহে তেমন খাপ্ খাইয়ে বসানোও চল্‌ত না।

গরুর দেহ থেকে চোদ্দইঞ্চি লম্বা একখানা হাড় কেটে নিয়ে, প্রথমে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে সেখানা সিদ্ধ করা হ'ল। তারপর উকো দিয়ে ঘসে ঘসে ডাক্তাররা হাড়খানার গড়নটা মানুষের দেহের উপযোগী ক'রে তুল্‌লেন।

এদিকে যথাসময়ে কস্‌গ্রোভের দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করা হ'ল। ডাক্তাররা ছুরি চালিয়ে তার পিঠ চিরে মেরুদণ্ডের সমস্তটাই বার ক'রে ফেল্‌লেন। তারপর নানান-রকম অস্ত্রের দ্বারা চিকিৎসকরা কস্‌গ্রোভের আহত মেরুদণ্ডের চোদ্দইঞ্চি কেটে নিয়ে, সেই চোদ্দইঞ্চি গো-হাড়খানা তার দেহে বসিয়ে দিলেন।

গেল যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সের বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক আলেক্সিস কারেল সাহেব এর-চেয়েও অদ্ভুত কাজে সিদ্ধ হয়েছেন। জেনারেল ফেবারের ডানহাতখানা বেলজিয়মের রণক্ষেত্রে কামানের গোলার চোটে উড়ে গিয়েছিল। কারেল সাহেব তখনি সাংঘাতিক-রূপে আহত

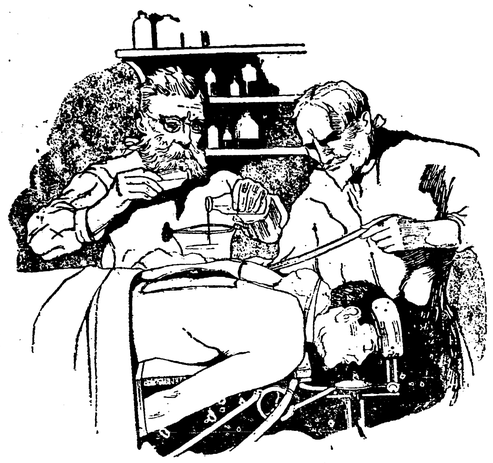

মানুষের পিঠে গরুর হাড়

একটি সৈনিকের ডানহাত কেটে নিয়ে, সেই হাতখানা সেনাপতির দেহে বসিয়ে জুড়ে দিয়েছেন। হয়ত খুব-শীঘ্রই আমরা এও শুনতে পাব যে, রামের মাথা শ্যামের ধড়ে বসে পরমানন্দে হাস্‌ছে, দুল্‌ছে, হেল্‌ছে!

অস্ত্রচিকিৎসায় আজকাল অনেক নতুন উন্নতি হচ্ছে বটে, কিন্তু এ ব্যাপারটা মান্ধাতার আগের আমোল থেকে পৃথিবীতে চলে আস্‌ছে। বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ দিয়েছেন যে, সেই শিলা-যুগের (stone age) আদি মানুষরাও এ-বিষয় নিয়ে কিছু কিছু চেষ্টা করতে ছাড়ে নি।

শ্রীপ্রসাদ রায়

মঙ্গল মঠ

আমাদের আড্ডার দেশজোড়া নামডাক ছিল। সেখানে যে এসে আধঘণ্টার জন্য বসেছে, তাকেই বল্‌তে হয়েছে—হাঁ একটা আড্ডার মতন আড্ডা বটে! এক-একটি লোকের হালচাল এক এক-রকমের, কোন দুটি লোকের স্বভাবে মিল পাবার যো ছিল না। তবে এক জায়গায় আমাদের সবারই মিল ছিল, আমরা সবাই ছিলুম লক্ষ্মীছাড়া। হাড়-লক্ষ্মীছাড়া না হলে সেখানে কেউ পাত্তা পেত না। লোকে এই আড্ডার নাম দিয়েছিল "লক্ষ্মীছাড়ার দল।"

ভৈরবচন্দ্র ছিলেন আমাদের মধ্যে সব থেকে বাবু। শান্তিপুরে ধুতি, রেশমের ফতুয়া, ঢাকাই আদ্ধির পাঞ্জাবী, ভাল বার্নিশের লপেটা এ সব ছাড়া সে এক-পা-ও নড়ত না। তার এই সব বিলাসিতার বিরুদ্ধে আমাদের বল্‌বার কিছু ছিল না, তবে তার মাথার সেই শাঁস বার করা থাক্-কাটা চুল ছাঁটা দেখলেই আমাদের মেজাজ যেতো চটে। ভৈরবকে এই চুল ছাঁটা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই সে বল্‌ত—লোকের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ান তোমাদের কেমন একটা বদ অভ্যেস—

বিলাস কুমার ছিল ভৈরবের ঠিক উল্টো। সে পরত গেরুয়া বসন, মুক্ত কচ্ছ, নেড়া মাথা, খালি পা—বিলাস দিন কতক সন্ন্যাসীও হয়েছিল, সম্প্রতি জঙ্গল ছেড়ে আবার সে সহরবাসী হয়েছে। হঠাৎ তার এই মত পরিবর্ত্তনের কারণটা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেনি।

বাইরে এদের যেমন পার্থক্য ছিল তেমনি অন্তরেও তারা দুই বিভিন্ন ভাবের রাজ্যে বিচরণ করত। ভৈরবের মুখে ছিল দিনরাত বেদান্তের ছড়াছড়ি। শান্তিপুরে ধুতির কোঁচান কোঁচাটী বাঁ হাতে আলগোছে ধরে যখন সে বেদান্তের ব্যাখ্যা করত তখন সেটা শোনবার না হোক্ একটা দেখবার জিনিষ হত বটে। আবার ওদিকে গেরুয়া বসন পরা বিলাস যখন নেড়া মাথা দুলিয়ে চার্ব্বাক দর্শনের সরল অর্থ ও ভাষ্য জুড়ত তখন আমাদের আড্ডাধারী অতুল চার্ব্বাকের একজন উঁচুদরের শিষ্য হলেও চঞ্চল হয়ে বলে উঠত—বিলাস দা একটু সাম্‌লে—

মহেন্দ্রর বয়স ছিল প্রায় সত্তর। আমরা সবাই তাকে দাদা বলে ডাকতুম। ভৈরব ও বিলাসের অন্তর বাইরের এই তারতম্য নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হত, মহেন্দ্র দা তখন বল্‌ত—কি জানিস্! ওরা মাঝে মাঝে পাষাণ ভেঙ্গে দাঁড়িপাল্লাটাকে ঠিক করে নেয়—

এত রকমের লোক থাকা সত্ত্বেও রোজই একসঙ্গে মেলামেশার জন্য আড্ডা মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ত, সেই সময় আমরা যে-যার এক একদিকে চলে যেতুম, দিনকয়েক আড্ডাঘরের দরজায় চাবি পড়ত।

ঠিক এম্‌নি একটা সময়ে যখন সবারই মনে পালাই পালাই ডাক দিতে আরম্ভ করেছে সেই সময় একদিন ভৈরবচন্দ্র নতুন বেশে আড্ডায় এসে হাজির হলেন। আমরা ত তার চেহারা দেখে একেবারে অবাক! তার মাথায় সেই একআনা পনেরো আনা চুল কি করে চৌরস হয়ে কদম-ছাঁটে পরিণত হয়েছে। গায়ে ফিনফিনে আদ্ধির পাঞ্জাবীর বদলে একটা মোটা কুর্ত্তা, আর তার উপরে একখানা বোম্বাই বিছানার চাদর, পরনে একখানা মোটা থান ধুতি, পায়ে সাদা বেলো-য়ারী চামড়ার একজোড়া চটি আর হাতে শঙ্কর দর্শনের এক খণ্ড।

ভৈরব বল্লে—ব্যস, সংসারের সঙ্গে তার ইতি হয়ে গেল। সে শীগ্‌গীরই হিমালয়ের মঙ্গল মঠের সেবক হয়ে সেখানে চলে যাচ্ছে। মঙ্গল মঠের প্রতিষ্ঠাতা একজন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তার মনের মধ্যে এখন এই দ্বৈতাদ্বৈতের ভয়ানক লড়াই চলেছে, সেই সন্দেহটা কেটে গেলেই একদিন সে বেরিয়ে পড়বে।

ভৈরবের মুখে এইসব লম্বা-চওড়া কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক শুনেছি কিন্তু তেমন মনোযোগ কখনো দিইনি। আমরা জানতুম দুনিয়াশুদ্ধ লোক মিথ্যেবাদী আর আমরা সত্যবাদী। ও-সব দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীর ধার কখনো ধারতুম না। মহেন্দ্র দাদা বল্‌ত ও-গুলো মিথ্যেবাদীদেরই নামান্তর মাত্র।

আমাদের এই অবহেলায় ভৈরবচন্দ্র কিছু-মাত্র বিচলিত না হয়ে দিনে দিনে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠছে দেখে আমরা তাকে ভণ্ড বলে ডাকতে আরম্ভ করে দিলুম। প্রথমে দিনকয়েক সে এই ডাকে কিছুমাত্র আপত্তি জানায় নি, তারপর হঠাৎ একদিন ঘোরতর

আপত্তি জানিয়ে বল্লে—আড্ডায় আসা তা'হলে ত্যাগ কর্‌তে হল—

ভৈরবের আপত্তির মূলে একটু ইতিহাস ছিল। একদিন আমরা তাকে ভণ্ড বলা মাত্র নফর তার প্রতিবাদ করে বল্লে—কেন তোমরা ওকে ভণ্ড বল?

নফরটা ছিল কিন্তু ভণ্ড চূড়ামণি। তার মন ভাবত এক কথা, আর মুখ বল্‌ত আর এক কথা। তার এই অসাধারণ গুণের জন্য আড্ডা থেকে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল—অন্তঃসলিলা। সে এইরকম করে একজনের পক্ষ নিয়ে তাকে গরম করে দিত, তারপর তর্ক অর্থাৎ ঝগড়াটি যখন বেশ পাকিয়ে উঠ্‌ত তখন নিশ্চিন্ত মনে অন্য লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ত।

নফরের কথা শুনে আমাদের সত্যিই মনে হয়েছিল—তাইত, ভৈরবকে ভণ্ড বলাটা বোধ হয় উচিত হচ্ছে না। তাই তাকে একটু আপ্যায়িত কর্‌বার জন্যে আমরা বল্লুম—ভয় নেই ভৈরব, ও ভণ্ড সাজতে সাজতে সাধু হয়ে যায়—

নফর বল্লে—কখনই না—

নফরের কথা শুনে ভৈরব আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বল্লে—অসত্য যার ভিত্তি তার উপরে কখনো কোন ভাল কাজ হতে পারে না—

তর্কটি জমিয়ে দিয়ে নফর চন্দ্র সরে পড়্‌লেন। ভৈরব তখন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী বয়েৎ ছেড়ে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা কর্‌তে লাগল। বিলাস একমনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আফিংয়ের নেশায় ঢুলছিল। থেকে থেকে তার মাথাটা কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ছে—এই রকম অবস্থা। হঠাৎ ভৈরবের একটা হুঙ্কারে সে চম্‌কে উঠে বল্লে—ব্যাপার কি! ভৈরব এত চেঁচাচ্ছ কেন হে?

ভৈরবের মুখে তর্কের কারণ শুনে বিলাস বল্লে—আচ্ছা আমাদের পক্ষে যদি আমরা প্রমাণ খাড়া করতে পারি?

ভৈরব বল্লে—তা হলে অন্ততঃ তাকে হেরে গেলুম এটা স্বীকার করব।

বিলাস বল্লে—তবে শোন—

আমরা বিলাসকে ঘিরে গোল হয়ে বসলুম। অতুল মনে করলে বিলাস হয়ত চার্ব্বাক দর্শনের কোন একটা অপ্রকাশিত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা সুরু করবে, তাই সে একটু ভয়ে ভয়ে বল্লে—বিলাস দা একটু আস্তে ভাই, বাড়ির ভেতরে যেন শুনতে না পায়—

বিলাস বল্‌তে লাগল—তোমরা সবাই জান যে জপেন আমার সহোদর, কিন্তু তা নয়। আমি বাপের একছেলে, জাপনও বাপের একছেলে, আমরা দুজনে মাসতুত ভাই। আমার মাতামহ গোষ্ঠি খুব ধনী ছিলেন। আমি যে আজ চার্ব্বাক দর্শনে এত বড় একজন পণ্ডিত হয়ে উঠেছি—এই পাণ্ডিত্য বংশ পরম্পরায় আমি আমার মাতামহের কাছ থেকে পেয়েছি। তবে তাঁরা চারু বাক্যগুলির সঙ্গে চারু কার্য্যগুলিকেও বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন কর্‌তেন। বাক্য ও কার্য্য বিজ্ঞানের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে, ঐ-দুটো জিনিষের মিলন যেখানে সেইখানেই অনর্থ পাত। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। মাতামহের পূর্ব্বপুরুষেরা এই বাক্য গুলিকে কার্য্যে পরিণত করে করে তাঁদের

বিশাল বিষয়ের বোঝাটি যখন আমার মাতামহের পিঠের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়্‌লেন তখন দেখা গেল যে, বিষয়ের খোলসটি ঠিক আছে বটে কিন্তু তার ভেতরটায় ঘুণ ধরে গেছে।

মাতামহের পুত্র সন্তান ছিল না। গরিবের ঘরে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইদের তিনি নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন। জামাইরা গরীবের ছেলে, বড়লোক শ্বশুর বাড়ীতে এসে দু-দিনেই তাঁদের বনিয়াদি চাল চলন আয়ত্ত করে ফেল্লেন। আয়ত্ত করলেন বটে কিন্তু গরীবের হাড়ে তাঁদের সেটা আর সহ্য হল না। কাজেই আমাকে আর জপেনদাকে জ্ঞান হবার আগেই পিতৃহীন হতে হয়েছিল। আমাদের মাতামহ মারা যাবার আগেই মার আর মাসীমার মৃত্যু হয়েছিল তাই দাদামশায়ের মৃত্যুদিনেই পাওনাদারদের হাতে বাড়ীখানা ছেড়ে আস্‌বার সময় নিজের ভাবনা ছাড়া আর কারো ভাবনা ভাবতে হয় নি!

আগেই বলেছি,পিত্রালয় কখনো দেখিনি, দাদামশায়ের বাড়ীকেই নিজের বাড়ী বলে জানতুম। তার প্রত্যেক থাম, এমন-কি প্রত্যেক ইটখানার সঙ্গে আমাদের দুই ভাইয়ের এমন পরিচয় ছিল যে, কেউ যদি আমাদের চোখ বেঁধে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেত ত আমরা দেওয়াল স্পর্শ করে বলে দিতে পারতুম—এটা ঠাকুর দালান, এটা দাদামশায়ের বস্‌বার ঘর—

ছেলেবেলার এই খেলাঘর যেদিন ছাড়তে হল সেদিন আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। আমার চোখে জল দেখে জপেন দা সেদিন বলেছিল—চলে আয় বিলে কাঁদিস নি, আমি বেঁচে থাক্‌লে তোকে পঞ্চাশখানা বাড়ি বানিয়ে দেব।

সেই দিন থেকে কিন্তু জপেনদার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমার বাবার দুই সহোদর ছিলেন, তাঁরা আমায় নিয়ে গেলেন। জপেনদার পিতৃপুরুষের কেউ ছিল না, তাকে নিতেও কেউ এল না। সেই বয়সে সে যে কোথায় গেল, কার কাছে আশ্রয় নিলে তা জানি না!

এই ব্যাপারের দশ বারো বছর পরের কথা বলছি—আমি তখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোন একটা সওদাগরি আপিসে পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি করি। একদিন গড়ের মাঠে কিসের একটা মেলা দেখতে গিয়ে জপেন দাদার সঙ্গে দেখা—তাকে দেখে ত আমি চিনতেই পারিনি! তার দুইহাতে গোটা-দশেক হীরের আংটি, ঘড়ির চেন, সোনা বাঁধান ছড়ি—

দাদা জিজ্ঞেস কল্লে—বিলে কি কচ্ছিস? পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী করি শুনে সে বল্লে—দূর্‌-দূর্‌ চাকরী ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে বেরুতে আরম্ভ কর। বিশ্বাস করতে পারি এমন একটা লোক পাইনে, বড় মুস্কিলেই পড়েছি—

মেলায় একটুখানি ঘুরে তার গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড কালো জুড়ি। গাড়ীর পা-দানিতে পা দেওয়া মাত্র ভেতরে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। আমার ত দেখে শুনে তাক্ লেগে যাবার উপক্রম হল!

একটুখানি পরে গাড়ীখানা একটা প্রকাণ্ড ফটক পার হয়ে এক বাড়ীর মধ্যে

ঢুকল। প্রাসাদের মত বাড়ী, যেমন বাড়ী তেমনি তার আসবাব-পত্র। জপেনদা বল্লে কোন এক ইংরেজের সাজান বাড়ী সে কিনেছে, দাম কত—পঁচিশ না পঞ্চাশ লাখ কত বল্লে ঠিক মনে নেই। দাদার সঙ্গে অনেক কথা হল। সে দালালীতে বিস্তর পয়সা রোজগার করে, তবে তার একজন সহকারী না হলে আর চলচে না। বিশ্বাস করে কার হাতেই বা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, মাসতুত ভাই হলেও অমি তার সহোদরেরই মতন ইত্যাদি—

নানা কথাবার্ত্তার পর সে বল্লে—কি খুড়োদের ওখানে পড়ে আছিস,আমার এখানে চলে আয়, দুই ভাইয়ে মিলে আবার আগেকার মতন থাকা যাবে।

পরদিন খুড়োদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে দাদার বাড়ীতে চলে এলুম। দুই-এক দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে মোটর গাড়ী করে কাজে বেরুতে আরম্ভ করা গেল। দাদা দুহাতে পয়সা রোজগার করত, আমাকে পেয়ে তার রোজগার আরও বেড়ে গেল। দুই ভাইয়ে মিলে আফিস খোলা হল। দালালীটা ছিল আমাদের প্রধান ব্যবসা, তবে তার সঙ্গে জাল জুচ্চুরি, বাটপাড়ি, জুয়া, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি অনেক রকমে পয়সা উপায় হতে লাগল। দাদা বলত—দুনিয়াময় পয়সা ছড়ান রয়েছে শুধু কুড়িয়ে নিতে জানতে হয়।

বছর দুয়েকের মধ্যে ধনী বলে আমাদের নাম জাহির হয়ে গেল। ব্যবসা অর্থাৎ জুচ্চুরিতে আমরা যে অদ্বিতীয় সে কথা সহরের আপামর সবাই জেনে গেল।

পয়সা যে কি রকম আমদানী হতে লাগল তা বল্লে তোমরা বিশ্বাসই করবে না। এক একদিন আমরা লাখ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করেছি। যেমন আমদানী প্রত্যহ তেমনি অজস্র পয়সা খরচও করতুম। রোজ রাত্রে আমাদের বাড়ীখানা যেন ইন্দ্রপুরী হয়ে থাকত। শ্যাম্পেনের ফোয়ারা, বাইজীর নাচগান আর বন্ধু-বান্ধবদের হাল্লায় সেই প্রাসাদের মতন বাড়ী খানা একেবারে জমজম করত। কোথায় কোন দেশে এক বাইজী ভাল নাচতে পারে, কোন রাজার কাছে একজন ভাল গাইয়ে আছে এই সব খবর জুটিয়ে আনবার জন্যে আমাদের মাইনে করা মোসাহেব ছিল, তারা সব খবর আনত আর যত টাকা লাগে তাই দিয়ে তাদের নিয়ে আসা হত। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা লক্ষ টাকা মুজরা দিয়ে দিল্লী থেকে ফৈজী বিবিকে আনিয়ে ছিল শুনে তোমাদের তাক্ লেগে যায়, আর আমাদের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন দেখো লক্ষ টাকা মুজরা দিয়ে ও-রকম দশটা বাইজী আমরা আনিয়েছি। আজকে আমার এই সিরীষ-কাগজের মতন মোলায়েম গায়ের চামড়া দেখে তোমরা সব ঠাট্টা কর, একদিন দুধ আর গোলাপ জল দিয়ে এই চামড়া পরিষ্কার করা হত, আর এর পালিশ ঠিক রাখবার জন্য কত রকমের যে মলম লাগানো হত তার নাম করতে গেলে এখন একটা বড় অভিধান হয়ে যাবে।

ব্যবসা যত জোর চলতে লাগল জাল জুচ্চুরিতেও ততই পাকা হতে লাগলুম। মাসতুত ভাইয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যে একটা বচন প্রচলিত আছে লোকে আমাদের দুই ভাইকে দেখিয়ে সেই বচনের সত্যতা প্রমাণ করত।

একবার দাদার একটা চালের ভুলে আমাদের ভয়ানক লোকসান হয়ে গেল। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কে যা-কিছু নগদ ছিল তা, আর বাড়ীখানা চলে গেল। টাকা যেমন জলের মতন আসত তেমনি জলের মতন বেরিয়ে গেল। লোকসান সামলে একটু দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আবার লোকসান খেলুম। লোকসানের সময় লোকের মাথার ঠিক থাকে না, বুড়ো-ঘাগী ব্যবসাদারেরাই ডিগবাজী খায় ত আমরা—আমাদের দুজনের কারোই তখন ত্রিশ পার হয়নি।

জাল, জুচ্চুরি, বাটপাড়ি ইত্যাদিতে কোন দিক দিয়ে সামলাতে না পেরে একদিন আমরা দুজনে পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়লুম। দাদার এক মাড়োয়ারী বন্ধু বড়বাজারে থাকত তার বাড়ীতে মাস কয়েক গা-ঢাকা দিয়ে বসে থেকে একদিন সন্ধ্যে বেলা দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল। পালিয়ে কোথায় যাওয়া হবে সেটা দাদা আগেই ঠিক করে রেখেছিল, আমি জিজ্ঞেস করাতে সে একটা ধমক দিয়ে বল্লে—কিছু জানতে চাস্‌নে এখন, সোজা চলে আয়—

দুজনে সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে গোরক্ষপুরের দুখানা টিকিট কিনে রেলে উঠে বসলুম। দিন দুই পরে এক সন্ধ্যেবেলা গোরক্ষপুরে নেমে এক ধর্ম্মশালায় রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকাল থেকে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলুম। দাদার হালচাল দেখে মনে হল তার এ-সব রাস্তা যেন বেশ চেনা আছে। খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমি আবার তাকে প্রশ্ন করায় সে বল্লে—আমাদের প্রায় সাতদিন হাঁটতে হবে। হিমালয় পাহাড়ে স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী আছেন আমরা গিয়ে তাঁর শিষ্য হব, সেইখানেই থাকব। ভাবলুম—এ মন্দ হলনা, অনেক পাপ করা গেছে, এবার সন্ন্যাসীই হওয়া যাক্—

কয়েকদিন অনবরত হেঁটে আমরা সচ্চিদানন্দ স্বামীর মঠে গিয়ে পৌছলুম। চারিদিকে ছোট বড় পাহাড় সব আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে, তারই মাঝখানের উপত্যকায় ছোট্ট খানকয়েক বাড়ী—সন্ন্যাসীদের থাকবার মতন জায়গা বটে।

দাদা ত গিয়েই আর কোন কথাবার্ত্তা না বলে সচ্চিদানন্দের পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে—প্রভু আমরা মহাপাপী আমাদের কি উদ্ধার হবে না—

স্বামীজি তখন কি একটা বই পড়ছিলেন, দাদা ও-রকম হাঁউমাউ করে গিয়ে পায়ের ওপর পড়াতে তিনি চমকে দশহাত পেছিয়ে গেলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটু হেসে বল্লেন—বৎস, তোমাদের কিছু ভয় নেই, অনুতাপে পাপের ময়লা কেটে যায়, তোমাদের অনুতাপ এসেছে, কিছু ভয় নেই—

সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ অদ্ভুত লোক ছিলেন। যেমন তাঁর গৌরবর্ণ সুবেশাল দেহ, তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে একবার শুনলেই মোহিত হয়ে যেতে হত। কি তাঁর গভীর জ্ঞান, অথচ শিশুর মতন সরল। বক্তৃতা করবার তাঁর যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি আজ পর্য্যন্ত তা কারো দেখিনি।

মঠে আমরা পাঁচ সাত জন সেবক ছিলুম। সকাল বেলা ঘণ্টাকয়েক শাস্ত্রপাঠ হত

তারপর আর কোন কাজ ছিল না, আমরা যে-যার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতুম।

আমাদের মঠ থেকে দূরে একটা পাহাড় দেখা যেত তার মাথায় সব সময়েই বরফ জমে থাকত। পাহাড়ীরা এই পাহাড়টার নাম দিয়েছিল সতী। এই সতী নানা ছলে আমাকে এই পাহাড়ের বুকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করত। তার দিকে যখনই তাকিয়েছি তখনই দেখেছি,সে নতুন সাজে সেজে রয়েছে। সকালে সূর্য্য ওঠবার আগেই তার চূড়োটা সলজ্জ নববধূর মুখের মতন গোলাপী রংয়ে রঙিন হয়ে উঠত। আমার মনে হত মহেশ্বরের প্রথম প্রণয় সম্ভাষণে নববধূ সতী যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। কোন কোন দিন দুপুর বেলা সূর্য্যের লাল রশ্মি পড়ে পাহাড়টা এত লাল হয়ে উঠত যে, তার দিকে চাওয়া যেত না। সে সময়ে তার চেহারা দেখে মনে হত যেন দক্ষের দরবারে সতী দেবী পতি নিন্দা শুনে ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে এখুনি তার ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, আর তার বুকের তরল আগুন চারদিকে ছিটিয়ে পড়ে পৃথিবীতে প্রলয় কাণ্ড সুরু হবে। অমাবস্যার অন্ধকারে যখন পৃথিবীর আর কিছুই দেখা যেত না তখনও তার দিকে চেয়ে দেখেছি, মনে হয়েছে, সতী যেন একটা গাঢ় নীল রংয়ের ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে কার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছ, ওড়না ভেদ করে ধবধবে সাদ রং ফুটে বেরিয়েছে। ক্রমে এই মঠ আর দূরের ওই সতী আমার সমস্ত মন প্রাণ গ্রাস করে ফেলতে লাগল। আমার অতীত যেন আমার মন থেকে মুছে যেতে আরম্ভ করল।

কয়েকদিন আগেই আমি যে একটা মস্ত শয়তান, মস্ত জোচ্চোর ছিলুম সে কথা আমি নিজেই ভুলে যেতে লাগলুম। সময়ে সময়ে আমার মনে হত যে, আমি যেন চিরকাল এই পাহাড়ের কোলেই বেড়ে উঠেছি, আমার চারদিকে এই যে ছোট বড় সব পাহাড় ওরা আমারই আত্মীয়। আমারই মতন একদিন তারাও এই বুকে খেলে বেড়াত হঠাৎ কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তারা এই রকম নিশ্চল অসাড় হয়ে পড়েছে, আবার কবে কে এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাদের জাগিয়ে দেবে সেই আশায় তারা দিন গুণছে।

দাদার কিন্তু সেখানে গিয়েও কোন পরিবর্ত্তন হল না। সে রোজ সন্ধ্যে বেলা আমাকে দিয়ে আফিং আনিয়ে খেত। পাহাড়ীদের ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে রকম বে-রকমের নেশা করত। তা ছাড়া আমি তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দুই একটা পাহাড়ী মেয়েকেও দেখেছি। অবশ্য, সচ্চিদানন্দ কিংবা তাঁর কোন শিষ্য ঘুণাক্ষরে এ-বিষয়ে জানতে পারত না। বরং সে দিন-কয়েকের মধ্যেই স্বামীজির প্রধান শিষ্য হয়ে দাঁড়াল।

সচ্চিদানন্দের নিয়ম ছিল যে পাঁচ বছর অন্তর তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে তাঁর কাছে জীবনের পাপ স্বীকার করতে হবে। আমরা সেখানে থাকবার কিছুদিন পরে সেই পাপ স্বীকারের দিন এগিয়ে এল। সেদিন মঠে নিজেদের মধ্যেই একটা উৎসব করা হত। পাপ স্বীকারের ব্যবস্থা শুনে আমি ত চঞ্চল হয়ে উঠলুম, দাদা কিন্তু নির্ব্বিকার। দেখলুম সে আফিংয়ের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিলে মাত্র।

স্বীকার-উৎসবের দিন দুই আগে দাদা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে—আমায় একটু ধুনো জোগাড় করে দিতে পারিস্?

আমার কাছে মঠের ভাঁড়ার থাকত, হঠাৎ এত জিনিষ থাকতে তার ধুনোর কি দরকার পড়ল তাই ভেবে তাকে জিজ্ঞেস করলুম—ধুনো দিয়ে কি হবে?

—দে তো খানিকটা ধুনো, একটা ওষুধ তৈরি করতে হবে।

ভাঁড়ার থেকে খানিকটা ধুনো তাকে দিয়ে আমি তক্কে-তক্কে ফিরতে লাগলুম। দেখলুম যে,দাদা নিজের ঘরে গিয়ে ধুনোটাকে গুঁড়িয়ে তিন চারটে গুলি পাকিয়ে টপ্ টপ্ করে গিলে ফেল্লে।

পরদিনই দাদা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার দুদিন পরে মঠের উৎসব। উৎসবের দিন দাদার অবস্থা রীতিমত খারাপ হয়ে দাঁড়াল। তার অসুখের জন্য আমায় তার কাছে থাকতে হল বলে পাপ স্বীকারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলুম। সন্ধ্যের একটু পরে দাদার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে তার চোখ দুটো লাল হয়ে কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করলে। অবস্থা দেখে আমার মনে হতে লাগল যে, এখুনি তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

দাদা আমায় বল্লে—স্বামীজিকে একবার ডাক। তাঁর কাছে পাপ স্বীকার না করলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। দাদা পাপ স্বীকার করলে আমার অবস্থাটাও বিশেষ সুবিধের হবে না ভেবে তাকে বল্লুম—দাদা এ সময় আর কেন—

সে বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে বল্লে—তোর কিছু ভয় নেই, তুই স্বামীজিকে ডেকে নিয়ে আয়।

স্বামীজিকে ডেকে আনলুম। তিনি কাছে এসে দাদার অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন। দেখলুম তার কষ্ট দেখে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। কাতরস্বরে দাদাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—জপেন বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা?

দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল—প্রভু, দেবতা, আমার বোধ হয় সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু যাবার আগে আমি যে পাপ করেছি তা আপনার কাছে স্বীকার করে না গেলে আমি মরেও সুখ পাব না—

সচ্চিদানন্দ বল্লেন, তাঁর সেইগুলো মনে পড়লে আজও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি বল্লেন—তীর্থযাত্রার আগে আর উপদেবতাকে প্রণাম কেন বাবা—পাপ স্বীকার করার উদ্দেশ্য, চোখের সাম্নে নিজের কীর্ত্তির একখানা জলন্ত ছবি রেখে দেওয়া—ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার পথে ঠিক হয়ে চলবার একটা উপায় মাত্র। তোমার আত্মা এখন অনন্তের পথে পাখা বিস্তার করেছে, দেহীর নিক্তির ওজনের পাপ পুণ্যের বিচারে সেখানকার কোন লাভ নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

সচ্চিদানন্দের এই সব কথা শুনেও দাদা পাপ স্বীকার করবার জন্য জেদাজেদি করতে লাগল। তার সেই কাণ্ড দেখে আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল—দিই গলাটা টিপে, পাপ স্বীকারের মজাটা একবার বার করে দিই।

দাদার জেদ দেখে স্বামীজি তাকে প্রশ্ন

করলেন—নিজের পত্নী ছাড়া কখন অন্য কোন স্ত্রীলোকের—

সচ্চিদানন্দের কথা থামিয়ে দিয়ে দাদা বল্লে—প্রভু আমি অবিবাহিত, তা ছাড়া মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু সে বিষয়ে যেমন নির্দ্দোষ থাকে ঐ বিষয়ে আমিও সেই রকম নিষ্কলঙ্ক।

দাদার কথা শুনে ত আমার মাথাটা লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল। ওঃ কী ভয়ানক! জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যে এইরকম মিথ্যে কথা বলতে পারে তার গুণ নির্দ্দেশ করবার মতন বিশেষণ বোধহয় পৃথিবীর কোন ভাষার অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কথাটা শুনে বোধহয় স্বামীজিরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিনি একটু চুপ করে থেকে তাকে বল্লেন—বৎস, এ বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে ঢের উন্নত। তুমি ধন্য।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—আমি শুনেছি তুমি ব্যবসাদার ছিলে। ব্যবসায় অনেক সময় অনেক অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হয়, তা ছাড়া অর্থের ওপরেও লোভ অত্যন্ত বাড়ে। তুমি কি কখনও সেই লালসায় অভিভূত হয়েছিলে?

প্রশ্ন শুনে দাদা বিকট একটা হাসির আওয়াজ করলে, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই বুঝতে পারলুম যে সেটা হাসি নয়, কান্না! হাউ হাউ করে কেঁদে সে বলতে লাগল—প্রভু আমি অতি লোভী, বিবাহ না করলেও আমার সংসার ছিল খুব বড়, কিসে কেমন করে আমি আমার বাপ মা, ভাই, বোনদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারবো রাত-দিন কেবল সেই চিন্তাই করেছি, আর সেই লোভে তন্ময় হোয়ে অর্থ উপার্জ্জন করেছি। আমার কি মুক্তি হবেনা? এই বলে সে সচ্চিদানন্দের পা জড়িয়ে ধরলে।

স্বামীজি তাকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, কিন্তু সে সব কথা কি তার কানে যায়—সে থেকে থেকে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে আর বলে—প্রভু আমার কি হবে?

সচ্চিদানন্দ আর কোন প্রশ্ন না করে তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। উত্তেজনায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেলে সে একটুখানি শান্ত হল।

কিছুক্ষণ এই রকম স্থির হয়ে পড়ে থেকে আবার সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। আমি ভাবলুম—আবার কি হল!

দাদা আবার সুরু করলে—প্রভু আমি অতি পাপী, আমি অতি চোর, জোচ্চোর—যখন ব্যবসা করতুম তখন একদিন হিসেব মিলিয়ে বাড়ী যাবার সময় দেখি যে, কয়েকটা টাকা তবিলে বেশী পড়ে রয়েছে। বোধহয় কেউ ভুলে বেশী দিয়ে গিয়েছে মনে করে আমি আমার কর্ম্মচারীদের টাকাটা আলাদা করে রেখে দিতে বলেছিলুম। আজ মনে হচ্চে টাকাটা ত কাউকে দেওয়া হয় নি! আমার কি হবে?—বলে সে কপাল চাপড়াতে লাগল আর থেকে থেকে উঠে বসতে আরম্ভ করলে।

সামনে একটা নরহত্যা হয় দেখে স্বামীজি সেখান থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন।

দাদার আগ্রহে আবার তাঁকে ডেকে আনতে হল। এবার সে তাঁকে কি বল্লে

জান? বিলাস একবার গলাটা সাফ করে ভৈরবের দিকে চেয়ে একটু নীচু গলায় বল্লে—এবার সে কি বল্লে জান? এবার দাদা বল্লে—প্রভু আপনি বলুন আমার দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার হতে পারবে কি? আমার ইচ্ছা যে আমি এইখানেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাই। আপনি যদি আশ্বাস দেন ত এবারের মতন আমি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সে শক্তি আছে।

দাদার এই কথা শুনে আমার মাথার ভেতরে কি রকম একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হতে লাগল। সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলল না। কোন ক্রমে দেয়াল ধরে ধরে বাইরে চলে এলুম।

সমস্ত রাত্রি ধরে স্বামীজিতে আর দাদাতে কি কথাবার্ত্তা হল জানিনে। সকালবেলা উঠে দেখি সে দিব্যি হেঁটে ফিরে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই সে আমায় ডেকে বলে দিলে—ধুনোর কথাটা কাউকে বলিস নি—

আমি মনে মনে ভাবলুম—ও বাবা! ধুনোর এত গুন!

এই ব্যাপ্যারের মাসখানেক পরে আমি আর আমাদের মঠের আর একজন সেবক ত্রিকুট মঠের একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে আমরা প্রায় ছ-মাস ছিলুম। এই ত্রিকুট মঠ আমাদের মঙ্গল মঠ থেকে মাসখানেকের রাস্তা। এই ত্রিকুট মঠে বসেই আমরা শুনতে পেলুম যে আমাদের মঠে আনন্দ স্বামী নামে একজন মস্ত অদ্বৈত-বাদী পুরুষ এসেছেন। সচ্চিদানন্দ এই সন্ন্যাসীকে গুরু করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে লোকে এই মহাত্মাকে দেখতে আসছে। তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও সারিয়ে দিচ্ছেন।

নিজেদের মঠে এমন একজন মহাত্মার সমাগম হয়েছে শুনে আমরা সেইদিনই ত্রিকুট ত্যাগ করে মঙ্গল মঠের দিকে যাত্রা করলুম।

মঠে এসে দেখি সেখানে চারিদিকে ধুম ধাড়াক্কা লেগে গিয়েছে। সেবকদের থাকবার জন্য বড় বড় বাড়ী হচ্চে। একদিকে একটা বড় আতুর-আশ্রম খোলা হয়েছে, লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে বড় লোকই বেশী। স্বামী সচ্চিদানন্দ সম্প্রতি গুরুর আদেশে প্রচারে গিয়ে অনেক অর্থ ও অনেক শিষ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। আনন্দ স্বামীর থাকবার জন্য সুন্দর একখানা শ্বেত পাথরের মন্দির হয়েছে, স্বামীজি তার মধ্যে ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন।

মন্দিরে ঢুকে স্বামীজিকে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—হরি! হরি! আনন্দ স্বামী আর কেউ নন, আমার দাদা—শ্রীযুক্ত জগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

মঠের একজন সেবককে ব্যাপার কি তা জিজ্ঞেস করে জানলুম—স্বামীজি একজন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ, সচ্চিদানন্দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ছলনা করতে এসেছিলেন। সচ্চিদানন্দ একদিন স্বপ্নে এই কথা জানতে পেরে সকালে উঠে তাঁর পায়ের ওপর পড়াতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিয়েছেন। ক্রমে শুনলুম যে আমার অবর্ত্তমানে সেখানে অনেক কাণ্ড হয়ে

গিয়েছে। আনন্দকে একদিন সাপে ছোবল মেরেছিল, আসল জাত সাপ। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে সে বিষ নামিয়ে দিয়েছেন। এই রকম অনেক অলৌকিক কাণ্ড তিনি এই কয়েক-মাসের মধ্যে করে ফেলেছেন।

দেখে শুনে আমার মনে অহঙ্কার হল যে, এমন দাদার ভাই আমি। কিন্তু সচ্চিদা-নন্দের মতন অমন মহাপুরুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারলুম না। একদিন দাদাকে আড়ালে পেয়ে আমি খুব গালাগালি দিলুম। গাল খেয়ে সে আমায় গোটাকয়েক হীরের আংটি দিয়ে বল্লে—এ-গুলো নিয়ে তুই সংসারে ফিরে যা, বিক্রী করে যা হবে তাতে তোর সারাজীবন সুখে কেটে যাবে।

বুঝলুম তার চক্ষুলজ্জা এখনও কাটেনি।

মঙ্গল মঠ আর আনন্দ স্বামীর নাম দিনে দিনে চারিদিকে প্রচার হয়ে পড়তে লাগল। মঠ থেকে অনেক সৎকাজ হতে লাগল, চারিদিক থেকে নতুন নতুন সেবক এসে জুটতে আরম্ভ করল। এত গোলমালের মধ্যেও দাদার অহিফেন সেবন ও মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চলতে লাগল। একবার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে তিন দিনের জ্বরে আনন্দ পঞ্চত্ব পেলেন।

সেবকেরা বল্লে—স্বামীজি দেহত্যাগ কল্লেন—বাংলা খবরের কাগজওয়ালারা লিখলে—একে একে নিভেছে দেউটী—সমস্ত ভারতবর্ষ বল্লে—দেশের একজন মহাত্মা অকালে চলে গেলেন।

আমি সেইদিনই মঠ ছেড়ে কলকাতায় চলে এলুম। কলকাতার বীডন-কুঞ্জে মহতী সভা হল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পড়ে আমায় সেই সভায় দাঁড়িয়ে একঘণ্টা ধরে আনন্দের গুণাবলী ব্যখ্যা করতে হয়েছে। আনন্দ স্মৃতি-সমিতি হল, আনন্দ ধনভাণ্ডার খোলা হল। ভাণ্ডার-রক্ষকটী মাসকয়েক হল টাকা-কড়ি মেরে দিয়ে ফেরার হয়েছেন।

এখনও এই আনন্দ স্বামীর নামে মঠ চলেছে, দেশ-বিদেশে এই মঠের শাখা পর্য্যন্ত স্থাপিত হয়েছে। দলে দলে রোগী তার সমাধির পাশে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে, তারা ওষুধও পায়, শুনেছি তাতে রোগও সারে।

বিলাসের গল্পের পর আমাদের সেদিনকার মতন আড্ডা ভাঙল। পরদিন ভৈরব এসে বল্লে—সে ত্রিকুট মঠে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছে।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

হিন্দুস্থান

(মহম্মদ ইক্‌বল)

দুনিয়ার মাঝে যত ঠাঁই আছে
সব-সেরা কোন্ ঠাঁই ?
হিন্দুস্থান ! হিন্দুস্থান !
হিন্দুস্থান ! ভাই !

হাজার ফুলের ফুল-বাড়ী সে যে
নন্দন-সমতুল,
সে যে শতদল গোলাপের দেশ
মোরা তারি বুল্‌বুল্ !
যে দেশেতে যাই থাকিনা যেথাই
যত ধন-মানই পাই,
মন পড়ে থাকে হিন্দুস্থানে,
হৃদয় ভারতে ভাই !
হৃদয় আমার যেখানে গিয়েছে
সেথা যেতে আমি চাই,
হিন্দুস্থান ! হিন্দুস্থান !
হিন্দুস্থান ! ভাই !

হিন্দুস্থানে বিরাজে সে গিরি
জগতে যে অতুলন।
হিম-চূড়া যার স্বর্গদুয়ার
ছুঁয়ে আছে অনুখন !
সান্ত্রী মোদের সেই হিমালয়,
জুড়ি কেহ নাই যার;
জগৎ হ'য়েছে অবাক শোভায়
ভারত-গোলেস্তাঁর !
কল-কল্লোলে ভারতের কোলে
খেলে শত নদী নদ,
ঈর্ষায় দহে স্বর্গও যার
হেরি রূপ-সম্পদ !

সাগর পারায়ে যত দিই পাড়ি
যত দূরে দূরে যাই
টানে মন প্রাণ হিন্দুস্থান,
হিন্দুস্থান, ভাই !

গঙ্গা ! তোমায় সুধাই আজিকে
ওই তব কিনারায়,—
কত যুগ ধরি বাস মোরা করি
মনে কি আছে গো তায় ?
পুরাণ-পন্থী কেরাণ-পন্থী
হিন্দে মোদের ঘর,
ধরমের বাণী না শেখায়, জানি,
কলহ পরস্পর।
দুষ্‌মনি মোরা হারাম জেনেছি,
চিনেছি ভ্রাতৃ-প্রেম,
হিন্দের মোরা চির-বাসিন্দা
হিন্দু ও মোস্‌লেম।
সময়-সাগরে বুদ্‌বুদ্ হেন
কত জাতি কত দেশ
দর্পে ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাটিয়া
হইল স্বপ্ন-শেষ !
মিশর বাবিল মূতের সামিল
গ্রীস আর নাই গ্রীস,
হারায়ে আপন সাধনার ধারা
ধুঁকিছে অহর্নিশ।
মানী রোম আর হিস্পানীয়া,
দেহ আছে প্রাণ নাই,
চির-প্রাণবান প্রাচীন মহান্
হিন্দুস্থান ! ভাই !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বারোয়ারি উপন্যাস

২৯

বাল্মীকির বাঙালী দোহার কৃত্তিবাস ওঝা সতীশের মনের কাণে বল্‌তে যাচ্ছিলেন "অগ্নি-পরীক্ষা!" কিন্তু কমলার "না হ'তে দহন তনু পতন হইল আগে!" সতীশের মনের চোর-কুঠুরীর অন্ধকারে একটা অনাহুত দ্বিধা যেমন নিমেষের মধ্যে উদয় হ'য়েছিল তেম্‌নি নিমেষের মধ্যেই তলিয়ে গেল। অন্তর্য্যামী বল্লেন, "অগ্নি-পরীক্ষা নয়, অজ-বিলাপ।"

উচ্ছ্বসিত চোখের জলের প্রথম বেগটা সাম্‌লে নিয়ে মূর্চ্ছাহত কমলার মূর্চ্ছা ভাঙাবার জন্যে, তার ঘোম্‌টা-মুক্ত মাথাটি আস্তে আস্তে তাল-পাকানো উড়্‌নীর বালিশের উপর নামিয়ে রেখে, সতীশ, একটু জলের চেষ্টায় ওঠ্‌বার উদ্যোগ করছিল। ঠিক এই সময়ে একটা শাদা মেঘ স'রে গিয়ে, একরাশ চাঁদের আলো, কমলার নির্ম্মল মুখের উপর এসে পড়্‌ল। সতীশ উঠ্‌তে গিয়ে মুগ্ধের মতন বসে পড়্‌ল।...

সেই কমলা! বিয়ের আগে, ঘাটের পথে যার পদ্মফুলের মতন শুচি-সুন্দর মুখখানি দেখে সতীশের সন্ন্যাসী মন সংসারী হ'য়েছিল! সেই কমলা!...তেম্‌নি সুন্দর,তেম্‌নি নির্ম্মল! বিয়ের রাতে শুভদৃষ্টির সময়, তার উপবাসক্লিষ্ট কচি মুখখানি যেমন দেখে ছিল, সতীশের মনে হ'ল, আজও সে মুখ তেম্‌নিই আছে, তেম্‌নি নির্ম্মল, তেম্‌নি নিষ্কলঙ্ক। বিয়ের ফিরে-বছর, ঘর-বসতের সময়, বাপের বাড়ী থেকে এসে এম্‌নি একদিন কমলা, সতীশের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিছানার উপরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেদিন সতীশ বন্ধুদের মজলিস্ থেকে, তাদের কাছে নিজের মনের জোর জাহাবার জন্যে, বেশ-একটু বেশী রাতেই বাড়ী ফেরে। ছেলেমানুষ কমলা, দরজা খোলা রেখে, ঢুলে ঢুলে, শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নিদ্-মহলে, জ্যোৎস্না-সায়রে এই কমলকে দেখে সেদিন যেমন সতীশের স্বপ্নাবিষ্ট হৃদয় তার কুণ্ঠিত ঠোঁট-দুটিকে ঘুমন্ত কমলার পুষ্পাধরের দিকে অতর্কিতে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সতীশ বুঝতে পারলে, আজও ঠিক তাই ঘট্‌তে বসেছে। আর এ-কথাও বেশ বুঝতে পার্‌লে, যে, যা ঘট্‌তে ব'সেছে, তা' রোধ করবার শক্তি আত্মানন্দ বাবাজীর প্রিয় শিষ্য বৈরাগী-বাগীশ সতীশচন্দ্রের এক-কড়াও নেই। ঘুমন্ত-ছবি কমলার পূরন্ত ঠোঁটদুটির দুরন্ত আকর্ষণে বৈরাগী সতীশের ঘাড় তিলে তিলে ঝুঁকে পড়তে লাগল। গেরুয়ায় গোলাপীর আমেজ মাখা দিলে। মমত্বের সুপ্ত বীণার সমস্ত তার একসঙ্গে হঠাৎ স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল। এই একটা মুহূর্ত্তের একফোঁটা আতরে হাজার জ্যোৎস্না-রাতের হাজার হাজার জুঁই-চামেলি, যেন, কাতার দিয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

ঠিক এই সময়ে মূর্চ্ছিত কমলার নিস্পন্দ দেহ একটু ন'ড়ে উঠ্‌ল। স্বপ্নাবিষ্ট সতীশের হুঁস হ'ল, সে দেখ্‌লে কমলা চোখ মেলেছে; মূর্চ্ছা-নাগিনীর নাগপাশ খুলে গেছে। তার অসমাপ্ত চুম্বনের চুম্বক আকর্ষণে

কমলা চেতনার রাজ্যে ফিরে এসেছে। সতীশ ফিশ্‌ ফিশ্‌ স্বরে ডাক্‌লে, "কমলা!" কমলা কিছু বল্‌তে পার্‌লে না, বোধ হয় বলবার শক্তিও তার ছিল না। তার খোলা চোখ-দুটো কেবল কূলে কূলে ভ'রে উঠ্‌ল। আর তারপর টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়্‌ল।

বক্তব্যকে চাপা দিয়ে কান্নার বেগ এবং কান্নাকে চাপা দিয়ে বক্তব্য কথা, ক্রমাগত ঠেলাঠেলি ক'রে, আগে বেরিয়ে পড়্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে, সতীশের কণ্ঠের সমস্ত শিরা-উপশিরা-গুলোকে ব্যথায় টন্‌টনিয়ে তুল্‌লে। সে কিছু না বল্‌তে পেরে কেবল উচ্ছ্বসিত চোখের জলে কমলাকে অভিষিক্ত কর্‌তে লাগ্‌ল। এইরকম ক'রে ভাবের প্রথম আবেগ কতক পরিমাণে শান্ত হ'লে সতীশ ভাঙা গলায় বল্‌লে, "কেঁদ না। কমল, আমি ক্ষিতীশবাবুর কাছে সমস্ত শুনেছি।"

কমলা তার হরিণের মতন আয়ত চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্লে, "শুনেছ?...এমন বিপদ যেন শত্রুরও না হয়।" ব'লে সে ধীরে ধীরে উঠে বস্‌ল এবং তার কল্‌কেতা প্রবাসের ইতিহাস বল্‌তে সুরু কর্‌লে। সতীশের মন তার অজ্ঞাতসারে কমলার রিপোর্টের সঙ্গে ক্ষিতীশবাবুর রিপোর্ট প্রতিপদে মিলিয়ে চল্‌ছিল এবং মিল দেখে খুসী হচ্ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই ব্যাপারটা সতীশের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, সে যেন নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, "থাক্, থাক্, তোমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি এখন ক্লান্ত আছ, আর ও-সব আমি শুনেছি...সমস্তই শুনেছি।"

চাণক্য, সতীশকে তর্জ্জনী তুলে বল্‌ছিলেন

"বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু"

কিন্তু তার ফিরে-পাওয়া সুন্দরী স্ত্রীর সুন্দর মুখের সাম্‌নে সে চাণক্যের ঐ কথাটা কিছুতেই মান্‌তে পার্‌লে না। সুন্দরকেই সতীশ সত্য ব'লে গ্রহণ করলে।

কমলা কিন্তু তার এই কথায় যেন ঈষৎ সঙ্কুচিত হ'য়ে বল্‌লে, "তা হ'লে তুমি আমায় ...ঘেন্না কর না?...আমায় অবিশ্বাস কর না?" শেষ-কথাটা উচ্চারণ কর্‌তে তার গলা কেঁপে গেল, চোখ্ আবার ছল্‌ছলিয়ে এল। সতীশ স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, "মোটেই না, অবিশ্বাস কর্‌লে, আগ্রা থেকে, ধুলো পায়ে তোমার সন্ধানে কালি-গাঁয়ে আস্‌তুম না।"

কমলা সোজা হ'য়ে সহজ হ'য়ে বস্‌ল। অপমানে, লাঞ্ছনায়, ধিক্কারে, অনাহারে, যার দেহ-মন ভেঙে পড়বার জো হ'য়েছিল,সতীশের এই ক'টি কথায় সে যেন মৃত-সঞ্জীবনী লাভ কর্‌লে। তার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত কষ্ট যেন চোখের নিমেষে অন্তর্ধান হ'য়ে গেল। কমলার মনে হ'ল, সে তার পুরোনো অধিকার ফিরে পেয়েছে। তাই তার প্রথম প্রশ্ন হ'ল, "আগ্রা থেকে আস্‌ছ,...তা হ'লে খাওয়া হয়নি?"

সতীশ বল্লে, "সে হবে এখন, তোমার? তোমারও বোধ হয় হয়নি।"

কমলা চুপ ক'রে রইল। দুজনে খানিকক্ষণ নীরব হ'য়ে রইল। তারপর হঠাৎ, বিনা জিজ্ঞাসায়, সতীশ তার দীর্ঘ বিচ্ছেদের সুদীর্ঘ ইতিহাস বল্‌তে সুরু কর্‌লে, উড়ো চিঠির কথা, তীর্থ-পর্য্যটনের কথা, আগ্রার কথা, ক্ষিতীশের কথা। সতীশ কিছুই গোপন কর্‌লে না, সে স্পষ্টই বল্‌লে, "সত্যি কথা

বল্‌তে কি উড়ো-চিঠিতে তোমার সম্বন্ধে যে সব কুৎসিত কথা লেখা ছিল, সে সব ঠিক বিশ্বাস না হ'লেও, মনে কেমন যেন একটা ধোঁকা জমেছিল। কিন্তু ক্ষিতীশ যখন বল্‌লে যে তার মায়ের চরিত্র সে যেমন নির্ম্মল, যেমন নিষ্কলঙ্ক ব'লে মনে করে, তোমার চরিত্রও ঠিক তেম্‌নি ব'লেই মনে করে, তখন, তার সেই কথা, তার চোখের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি, তার স্বরের দৃঢ়তা সমস্ত মিলে, দক্ষিণে হাওয়া যেমন ঘোলাটে কুয়াসা কাটিয়ে দ্যায়, তেম্‌নি ক'রে আমার মনের ধোঁকা কাটিয়ে দিলে। যার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তার চরিত্রের সঙ্গে কেউ নিজের মায়ের চরিত্রের তুলনা দিতে পারে না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তা হ'লে তুমি আমায় বিশ্বাস করো?"

সতীশ বল্‌লে, "নিশ্চয়।"

"আগেকার মতন?"

"নিশ্চয়।"

কমলা প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে চোখের জলে সতীশের পা ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। খানিক পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে চোখ মুছে সে বল্‌লে, "তুমি অবিশ্বাস কর না, এই আমার যথেষ্ট, এখন ম'লেও আর দুঃখ নেই।"

সতীশ বল্‌লে, "যাক্ ও-সব ছাই কথা, চল বাড়ী যাই।"

কমলার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠল। সে বল্‌লে, "বাড়ী?...বাড়ীতে কি মা আমায় জায়গা দেবেন?"

"আমায় যদি স্থান অবিশ্যি তোমাকেও দিতে হবে।...ভালো কথা, মার অসুখ শুনে, তুমি শুন্‌লুম, বাড়ী গিয়েছিলে... ত'রপর?"

কমলা খুব দ্রুত অথচ খুব ছোট্ট ক'রে ঘাড় নাড়্‌লে, জ্যোৎস্নায়, তার চোখ ছল্‌ছলু ক'রে উঠ্‌ল।

সতীশ বল্‌লে, "ও! বুঝেছি, মা তোমার সেবা গ্রহণ করেন নি। আচ্ছা সে সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখন।...তুমি যখন বাড়ীতে যাও, তখন মা একলা ছিলেন, না আর কেউ ছিল? ...ছিল,...হুঁ...বুঝেছি,...পাড়ার গুল্‌মুখী গোবর-সোহাগীর দল কাছে থাক্‌লে মা যেন আর এক মানুষ হ'য়ে যান্...এই স্থাখনা, মা তো তোমায় অত ভালোবাস্‌তেন, কিন্তু, ওদের মন্ত্রণায় আমার আবার বিয়ে দেবার ধুয়ো তুলেছিলেন। কি সমাচার, না বউএর ষোলো বছর উৎরে গেল অথচ ছেলে হ'ল না।... যাক্,...আমি সে সব ঠিক ক'রে নেব। শুচিবাই ছোঁয়াচে রোগ; গোবর-সোহাগীদের আব্-হাওয়া থেকে সরিয়ে আন্‌তে পার্‌লেই মা যেমন স্নেহময়ী ছিলেন, আবার তেম্‌নিই হবেন; তুমি দেখে নিও। মায়ের মত করবার ভার আমার—এখন চল—চল্‌তে পার্‌বে ত?"

কমলা মুখে বল্‌লে "পার্‌ব", কিন্তু গ্রামের রাস্তা ধ'রে চল্‌তে চল্‌তে প্রতিপদেই সতীশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল যে, কমলা আর পারছে না। তাই সে প্রস্তাব করলে, "আজ হাট-বার; হাটের ফির্‌তি গোরুর গাড়ীর জন্যে মোড়ে এগিয়ে অপেক্ষা করা যাক্।"

মৈত্র-মশায়ের বাড়ী দূর নয়, কিন্তু সতীশ সে কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত কর্‌লে না এত রাত্রে কমলাকে জগদীশপুরের পথে দেখে, সে

স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছিল, বাপের বাড়ী কমলা আশ্রয় পায় নি। একবার ভাবলে সোজা দুজনে পশ্চিমেই যাবে, কিন্তু এত রাত্রে পশ্চিমের কোনো গাড়ীই বেলতলাতে থামে না, কাজেই জগদীশপুরের রাস্তা ধ'রে দুজনে পা টেনে টেনে চল্‌তে লাগ্‌ল।

ধুৎরো ফুলের ঝোপে গোটা-কয়েক জোনাকী লুকোচুরি খেল্‌ছে। ঝিঁঝি ডাকছে। ফুর্‌ফুরে বাতাসে বকুল গাছের পাতাগুলো গা-টেপাটেপি কর্‌ছে। আর সেই স্থির জ্যোৎস্নার অকূল পাথারে পাড়ি দিয়ে চলেছে দুটি প্রাণী; অশ্রুস্নাত, নিষ্কলঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ। কমলার মনে জাগ্‌ছিল তাদের বিয়ের রাতের কথা, মিলন-রাতের কথা, সেদিনও এম্‌নি জ্যোৎস্না। তার মনে হচ্ছিল এ যেন ঠিক সেইদিন! সারাদিন উপবাসের পর সেদিনও শরীরটাকে এম্‌নি হাল্কা বোধ হচ্ছিল, মন জুড়ে ছিল আশঙ্কার সঙ্গে আশার আনন্দ, আজও ঠিক তাই!

সতীশের মনেও যে ঐ কথাই উঠ্‌ছিল তা' তার কথাতেই প্রমাণ হ'য়ে গেল; সে বল্‌লে, "কমলা, আজ তোমারও উপোষ আমারও উপোষ; মনে পড়ে বিয়ের দিন?—সেদিনও এম্‌নি দুজনেরই উপোষ ছিল, আজ আমাদের নতুন বিয়ে—ফিরে-ফির্‌তি।'

কমলা মৃদু হেসে বল্‌লে, "হ্যাঁ ফিরে-ফির্‌তি।"

হঠাৎ দূরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, কে প্রাণপণ চেঁচিয়ে গাইছে

"ওহে দীনবন্ধু হরি!
একবার স্থাথা দাও, রাঙাচরণ দু'খানি॥

গোরুর গাড়ীর খবরাখবর পাবার আশায় সতীশ ও কমলা থম্‌কে দাঁড়াল। লোকটা নিকটে এলে, সতীশ বল্‌লে, "ওহে মোড়লের পো, এদিকে গোরুর গাড়ী-টাড়ী আস্‌তে দেখেছ?"

লোকটা গানের রসভঙ্গ হবার ভয়ে শুধু একটা "না" ব'লেই পূর্ব্ববৎ চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল।

সতীশ কমলাকে বল্‌লে, "লোকটাকে গানে পেয়েছে।"

কমলা বল্‌লে, "চাঁদের আলো দেখে ফুর্ত্তি লেগেছে।"

সতীশ বল্‌লে, "হুঁ-উঁ-উঁ, ফুর্ত্তি ব'লে ফুর্ত্তি, একেবারে স্বভাব-কবি দাঁড়িয়ে গেছে, 'দীনবন্ধু হরি'র সঙ্গে "রাঙা চরণ-দুখানি" মিল্ দিচ্ছে, দেখ্‌ছ না।"

কমলা ছন্দ-মিলের ধার ধার্‌ত না, কিন্তু এই স্পষ্ট গরমিলটা সতীশ যখন দেখিয়ে দিলে, তখন সেও হেসে উঠ্‌ল।

চল্‌বে কি ঐখানেই দাঁড়িয়ে গাড়ীর অপেক্ষা কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে দুজনেই ইতস্তত কর্‌ছে এমন সময়ে কমলা বল্‌লে, "ওই শোনো,—আবার গান—এবার কিন্তু গোরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চাকার শব্দও শুন্‌তে পাচ্ছি।"

সতীশ কান পেতে শুন্‌লে সত্যিই গাড়ী আস্‌ছে। গাড়োয়ান গাইছে,

"যাও হে, যাও হে, ও কালাচাঁদ!
তুমি আর এস না আমার বাড়ী।
এবার এলে আমার বাড়ী
দেব তোমায় খ্যাংরার বাড়ী।"

বিংশ শতাব্দীর কালাচাঁদের এই রকম

বীভৎস অভ্যর্থনায় সতীশ হাসবে কি কাঁদবে ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না। এমন সময়ে গাড়ী মোড় ফিরে প্রায় কাছে এসে পড়্‌ল, তখন গাড়োয়ান গাইছে—

"বাইরে তোমার লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়েনা হাঁড়ি।
(তোমার) খেতে মাখতে তেল জোটেনা
ক্যা—রা—সিনে
বাগাও তেড়ি—ই—ই !"

এই গাড়োয়ান-কুলের তানসেন নিকটে এলে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে, শেষে এক টাকায় রফা ক'রে, সতীশ কমলাকে নিয়ে ছইয়ের ভিতরে গিয়ে বস্‌ল এবং "পথে একবার নক্‌ড়ো ময়রার দোকানে গাড়ীটা যেন দাঁড় করানো হয়," এই ব'লে গাড়ী ছেড়ে দিতে বল্‌লে।

গাড়োয়ান "এজ্ঞে" ব'লে, বৈয়াকরণদের উপর টেক্কা দিয়ে মূর্দ্ধার গম্বুজে জিহ্বা টঙ্কৃত ক'রে বলদ দু'টোকে শাকটায়ণ-কৃত মূর্দ্ধণ্য ক-এর উচ্চারণ শেখাতে শেখাতে, কানের বদলে বেচারাদের ল্যাজ মল্‌তে মল্‌তে জগদীশ-পুরের রাস্তায় রওনা হ'ল।

৩।

বিনাদোষে বারম্বার লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে হরেনের মনটা অনেকদিন থেকেই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ্‌কের এই পিতৃ-কৃত অপমানে তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বিষ হয়ে উঠ্‌ল। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো যেন বিদ্যুৎ-ভরা তারের মতন তাকে প্রকাশ-হীন বিহ্বলতার যন্ত্রণায় অস্থির ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌ল। চিরকালের সংস্কারের বশে সে বাপের কথার কোনজবাবই দিতে পার্‌লে না। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বেরিয়ে চ'লে গেল। এতক্ষণ ধ'রে সে সমস্ত অবিচার সমস্ত অপমান সহ্য করেছে, কিন্তু আর পার্‌লে না। তার সমস্ত আবেগ, বজ্রের মতন কারো উপরে প'ড়ে, কিছু একটা ভেঙে-চুরে, তছ্‌নছ্‌ ক'রে ফেলবার জন্যে তাকে পাগল করে তুল্‌ছিল। তাই যখন সকলের আক্রোশ কমলার উপর গিয়ে প'ড়েছে তখন সে নিজেকে একটা কুৎসিত অকাণ্ড থেকে বাঁচা-বার জন্যে, কিছু না ভেবে-চিন্তে ত্যারছা হাউইয়ের মতন অন্ধ বেগে বেরিয়ে পড়্‌ল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল শশী মুখুয্যেকে ; সেই মিথ্যাবাদী—সেই শয়তানই তো যত নষ্টের মূল। হরেন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে,তার রাগের খাপ্‌রা মাথার মধ্যে জ্বালিয়ে নিজেদের কাছারী-বাড়ীর দিকে একরকম ছুটে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে শুন্‌লে শশী অসুখের অজুহাতে ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে গেছে ; একজন আম্‌লা এইসঙ্গে এটাও হরেনকে জানিয়ে দিলে, যে, অসুখ আছিলা-মাত্র। রাতের ট্রেণে ম্যাজিষ্ট্রেট কালীগাঁয়ে আস্‌ছেন, কাজেই সকলকে একটু বেশীমাত্রায় আজ দৌড়-ঝাঁপ কর্‌তে হবে ; শশী কিন্তু দৌড়ঝাঁপ মোটেই পছন্দ করেনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়্‌তে খুব পারে, পরের উপর মোড়লী করতে ওস্তাদ কিন্তু কাজের বেলায় ঢু-ঢু। তাই আগে-ভাগে অসুখের অছিলায় সরে পড়েছে। হরেন শেষ-পর্য্যন্ত না শুনেই শশীর বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। সেখানে হাজির হয়েই হরেন হাঁক দিলে "মুখুয্যে !" ত্যালা-কুচোর লতায় ঢাকা একটা ছোট্টো জান্‌লা ঈষৎ ফাঁক হ'য়েই বন্ধ হয়ে গেল। কেউ

জবাব দিলে না। কিন্তু হরেন খড়মের শব্দ স্পষ্ট পেয়েছিল। সে বেশ বুঝতে পারলে শশী বাড়ীতেই আছে, তাই ফের ডাক্‌লে, "ওহে মুখুয্যে বাড়ী আছ, না জেগে ঘুমুচ্ছ !" অনেক চেঁচামেচির পর, কাণে-হাঁটা কইমাছের মতন একটা ঘুন্সি-পরা ন্যাংটাছেলে, শুক্‌তলার মতন একটা আমসত্ত্বের ফালি লালায় ভিজাতে ভিজাতে তড়াং তড়াং ক'রে বেরিয়ে এল।

হরেন বল্লে, "এই পট্‌লা, তোর বাবা কোথায় ?"

ছেলেটা আমসত্ত্বের দিকে জিভ্‌ বাড়াতে বাড়াতে ধীরে-সুস্থে বল্‌লে, "বাবা ?—অ্যাঁ ? —বাবা ?—বাবা ঘড়ে—না, না, বেড়িয়ে গেছে।"

"তবে রে শূয়োর, মিছে কথা ?" ব'লেই হরেন যেমন তার কান ধর্‌তে যাবে অম্‌নি ছেলেটা চট্‌ ক'রে মাথাটা নাবিয়ে নিয়ে সমস্ত আমসত্ত্বটা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে দুড়্‌দুড়্‌ ক'রে বাড়ীর ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

হরেন দরজায় একটা লাথি মেরে "লুকিয়ে ক'দিন থাক্‌বে ?" এই কথাটা চীৎকার-স্বরে জানিয়ে দিয়ে একটু তফাতে গোঁ-ভরে একটা আমগাছের ছায়ায় গিয়ে বস্‌ল।

এম্‌নি অনেকক্ষণ বসে রইল। গাছের ছায়াগুলো মাথার উপর থেকে, পুবে হেলে, আস্তে আস্তে লতিয়ে চড়্‌কে সন্ন্যাসীদের মতন দণ্ডী কাট্‌তে কাট্‌তে এগিয়ে ক্রমশঃ লম্বা হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। সূর্য্য ডুব্‌ল। হরেন বিরক্ত হয়ে উঠে পড়্‌ল। যাবার সময় আরেকবার শশীর দরজায় লাথি মেরে, হন্‌ হন্‌ ক'রে বড় রাস্তার দিকে মোড় নিলে। তেমাথায় এসে হরেনের হুঁস হ'ল, যে, রাগটা কমার সঙ্গে ক্ষিদেটা আবার যেন বেশ-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই থম্‌কে দাঁড়িয়ে ষ্টেশনে গিয়ে সোজা রেলে উঠে বস্‌বে কি তার আগে হাট থেকে কিছু খাবার সংগ্রহের চেষ্টা দেখ্‌বে, এ বিষয়ে একটা মীমাংসার জন্যে মনিব্যাগটার ভিতরের খবর তলিয়ে দেখ্‌ছে, এমন সময় পিছন থেকে কে ডাক্‌লে, "হরেন দা !"

হরেন চম্‌কে উঠ্‌ল, ফিরে দেখ্‌লে অরুণ।

"অরুণ !"

"হ্যাঁ হরেন দা', দিদিকে খুঁজছি,—তাকে তুমি এদিকে ন্যাখনি ?"

"কেন ? সে বাড়ীতে নেই ?"

অরুণ মুখ ফ্যাকাশে ক'রে বল্‌লে, "না, বাবা তাকে বার ক'রে দিয়েছেন ; আমাদের কাউকে, তাকে খুঁজ্‌তে পর্য্যন্ত যেতে ন্যানি, তিনি বাড়ী থেকে বেরুলে তবে বেরুতে পারলুম।—কিন্তু তাকে খুঁজে তো কোথাও পাচ্ছি নি। যাবার সময় বাবা দিদিকে বলেছিলেন "চুলোয় যা"—দিদি বড় অভিমানী —সে কি সত্যি সত্যিই—" অরুণ আর বল্‌তে পার্‌লে না, তার চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠ্‌ল, সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

হরেন রাস্তার মাঝখানে ধুলোর উপর বসে পড়্‌ল, সে যেন সমস্ত ভাবনার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, কিছু বুঝ্‌তে পারছে না, কেবল তার ফ্যাল্‌ফেলে তাকানি অরুণের মুখের উপর সমবেদনার প্রলেপ বুলিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে অরুণ নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "পাড়ার কারো-বাড়ী যাবেনা, তাই কারো বাড়ী খোঁজ করিনি, তবে খিড়কীর বাগান, পঞ্চানন তলা, ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল সমস্ত উট্‌কে পাট্‌কে দেখেছি, কোথাও নেই।"

হরেন বল্লে, "বিনা দোষে কি শাস্তি, দ্যাখো।" ব'লেই আবার ভাবনার অতলে যেন তলিয়ে গেল। মিনিট-খানেক পরে ব'লে উঠল, "ষ্টেশনের দিকে যায় নি তো?—চল, ষ্টেশনের দিকটা একবার খুঁজে ছাখা দরকার।"

"ষ্টেশনের দিকে বাবা এইমাত্র গেলেন, আমি যাব না, আমায় দেখ্‌লে রেগে উঠবেন।"

হরেন বল্লে, "কেন? ষ্টেশনে কেন?"

"ষ্টেশনে ঠিক নয়, রেল-লাইনের ওপারে, কে একজন যজমান নাকি মরণাপন্ন। তার অন্ত-প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে, তাই ডেকে নিয়ে গেল।—আমি ওদিকে যাব না,—তোমারও ওদিকে যাওয়া—"এই পর্য্যন্ত ব'লেই অরুণ থেমে গেল।

হরেন ভুরু কুঁচ্‌কে কি-যেন ভেবে নিয়ে বল্লে, "আমার জন্যে ভাব্‌তে হবে না, তুই চল্। আর তিনি তো সেখানে দাঁড়িয়ে নেই, তোরই বা ভয় কি?"

অরুণের পা-দু'টো যেন ইতস্তত করতে করতে হরেনের পিছন পিছন চল্‌তে লাগ্‌ল। খানিক দূরে গিয়ে হরেনকে সম্বোধন ক'রে সে বল্‌লে, "হরেন দা', তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধ হয়?"

"না—তুই?—তোরা খেইছিস্?"

"উঁহু, আমরা ফেউই খাইনি, দিদি মুখের গ্রাস্ ফেলে চলে গেল,—তাই মা সমস্ত ভাত-তরকারী গোরুকে ধ'রে দিয়েছেন!"

"তাইতো অরুণ,—আমার জন্যে ভাবি নি,—তুই ছেলেমানুষ সমস্ত দিন খাস্‌নি—চল্, হাট থেকে কিছু খেয়ে নিবি চল্। আজ হাট-বার, ফল-টল, খাবার-টাবার সব টাট্‌কা।"

"আর তুমি?"

"সে হবে এখন—ষ্টেশন থেকে এসে" এই ব'লে দু'জনে আবার নীরবে চল্‌তে লাগ্‌ল।

হরেন আর অরুণ ষ্টেশনের পথে যেতে হাটের কাছে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। এক জায়গায় জনকয়েক লোক তাড়ি খেয়ে খুব মাদল পিট্‌ছে, তার মধ্যে একজন পেশাকরদের মতন ফেরতা দিয়ে কাপড় প'রে গোঁফ-দাড়ির উপর আড়-ঘোম্‌টা টেনে অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান ধরেছে:—

"খুব হ'ল লাচন্ দাদি!
বাবুরা হুকুম দিলে, লেগে গেল
লাচ্-পাগলের গাঁদি!
(আমায়) লাচ্‌তে ব'লে সবাই মিলে
করলে সাধাসাধি!
(তাই) লেচে লেচে ধর্‌ল মাজা
(এখন) লাচ্‌তে বল্‌লে কাঁদি!"

মাতালের ভিড় দেখে হরেন অরুণকে দাঁড়াতে মানা করলে। তাড়ির গন্ধ নাকে যাওয়ায়, দুজনেই ক্রমাগত থুথু ফেল্‌তে ফেল্‌তে এগিয়ে চল্‌ল। মাঝে মাঝে ম্যাজিষ্ট্রেটের শুভাগমনের জন্যে নারকোল পাতার তোরণ তৈরী হ'চ্ছে, কলাগাছের কবন্ধের উপর আলোর ব্যবস্থা হচ্ছে। হরেনের সেদিকে

খেয়াল নেই, সে অরুণকে কিছু খাইয়ে নেবার জন্যে টাট্‌কা ফলের সন্ধানে চোখ্‌দুটো বিস্ফারিত ক'রে চলেছে।

খানিকদূর এগিয়ে দেখ্‌লে, আবার ভিড়। এবার একেবারে লোকারণ্য; ভাঙা হাটে হঠাৎ এমনধারা লোক-সমাগম কেন, তা জান্‌বার জন্যে, ছেলেমানুষ অরুণ আবার ভিড়ের ভিতর সেঁধিয়ে পড়ল, পিছনে পিছনে হরেনও ঢুক্‌ল। ভিড় ঠেলে একটুখানি এগিয়েই দেখ্‌লে, কপালে ফেট্টি-বাঁধা একজন স্ত্রীলোক কাঁদ্‌ছে আর গালাগালি দিচ্ছে।

"চ'লে আয় অরুণ, কি দেখ্‌বি" ব'লে হরেন অরুণকে নিয়ে বেরিয়ে আস্‌বে, এমন সময় শুন্‌তে পেলে মাতালের গলায় কে বল্‌ছে, "খবর্দ্দার চৌকীদার! বাগ্‌দী হ'য়ে বামুনের গায়ে হাত। ছুঁস্ নে বল্‌ছি, খবর্দ্দার! যমের বাড়ী যেতে হবে না ভেবেছিস্! বামুনের গায়ে হাত! শাপ-মন্যির ভয় নেই? খবর্দ্দার!"

হরেনের মনে হ'ল চেনা গলা! পর-মুহূর্ত্তেই, দেখ্‌তে পেলে লোকটা আর কেউ নয়, শশী মুখুয্যে! শশীর গলা পেয়েই যে স্ত্রীলোকটী ব'সে ছিল সে দাঁড়োস্ সাপের মতন খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ল, এবং কোমরে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ওঃ, উনি বামুন, ওঁর শাঁপের ভয়ে লোকে তো ডরিয়ে গেল!

শাঁপে বামুন শাঁপে
আমার নখের কুণি কাঁপে,
আমার চোখের ভোঁয়া কাঁপে!
আমার ভুরুর রোঁয়া কাঁপে!

বাঁধ চৌকীদার বাঁধ। ছুঁড়ীকে একেবারে খুন ক'রে ফেলেছে গা!"

'খুন' শুনে হরেন ভিড় ঠেলে বাঘের মতন লাফিয়ে গিয়ে শশীর গলা টিপে ধর্‌লে!

ঝাঁকানি দিতে গিয়ে, হরেন চম্‌কে গেল, লোকটা যেন শোলার মতন হাল্কা, তার রাগের বেগ অর্দ্ধেক কমে গেল। ভিড়ের ভিতর একটা অস্ফুট কলরব উঠ্‌ল—"ছোট বাবু!" "ছোট বাবু!"

চৌকীদারকে ধমক দিয়ে এবং শশীকে আর একবার ঝাঁকানি দিয়ে হরেন চেঁচিয়ে বল্‌লে, "তোরা এই অপদার্থটাকে এতগুলো লোকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পারছিস্ নে? নে, বাঁধ্।"

কলরব শুনে যারা পাতার গেট বাঁধতে বাঁধ্‌তে কাতাদড়ি আর কাটারি হাতে মজা দেখ্‌তে এসেছিল, তাদেরি একজন দড়ি জুগিয়ে দিলে। চৌকীদার ছোটবাবুকে দেখে সাহস পেয়ে শশীকে বেশ শক্ত ক'রেই বেঁধে ফেল্‌লে।

হরেন শশীকে চৌকীদারের হাতে সঁপে দিয়ে অরুণকে কি বলবার জন্যে পিছন ফিরতেই শশী অস্ফুট স্বরে ঠোঁট উল্‌টে ব'লে উঠ্‌ল, "ইস্!—এই যে! বাপের তেজ্যি-পুত্তুর!—তেজ্যিপুত্তুর—না তেজচন্দর্!" —কথাগুলো হরেনের কানে পৌঁছবার আগেই সেই আধাবয়সী স্ত্রীলোকটি হাত জোড় ক'রে হরেনের পায়ের কাছে বসে প'ড়ে কাকুতির স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "রক্ষা কর ছোটবাবু, রক্ষা কর! এই সব্বনেশে বিট্‌লে বামুন আমার বোনকে খুন ক'রেছে! আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই ছাখো। তোমরা মনিব, তোমরা ছাখো, তোমাদের জানাচ্ছি, তোমরা বিচার কর।"

হরেন বল্‌লে,"খুন ক'রেছে তো শুন্‌ছি—তোমার বোন্‌কে ?—লাশ কোথায় ?"

"এই যে দাদা, এইদিকের এই ঘরে দেখে যাও একবার, কি কাণ্ড করেছে !"

হরেন স্ত্রীলোকটির পিছন পিছন যেতে যেতে অরুণকে বল্‌লে, "অরুণ, লাশ পুলিশে চালান দেবার আগে তুমি, ভাই, একবার দৌড়ে ডাক্তারবাবুকে খবর দাও।"

অরুণও তাই চাইছিল, সে মৃতদেহ দেখ্‌তে নিতান্ত নারাজ। কারণ তার ভূতের ভয় বেশ একটু প্রবল। হরেনের কথায় তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, সে উর্দ্ধশ্বাসে ভিন্ন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৩১

যে আধাবয়সী স্ত্রীলোকটি লাশ ছাখাবার জন্যে হরেনকে ডেকে নিয়ে গেল, সে হচ্ছে মাতির বোন কাতি, অর্থাৎ মাতঙ্গিনীর বোন কাত্যায়নী। এই মাতঙ্গিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যেই হরনাথ মৈত্র একদিন শশী মুখুয্যেকে একঘ'রে করতে চেয়েছিলেন। হরনাথের আন্দোলনের ফলে শশী মুখুয্যের রজকিনী রামী অর্থাৎ কৈবর্ত্তদের মাতঙ্গিনী, জমীদারের কড়া-হুকুমে গ্রাম ছেড়ে হাটতলায় ঘর নিতে বাধ্য হ'য়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনীর দিদি কাত্যায়নীর মুদিখানার দোকানটিও, স্থান-পরিবর্ত্তনের নোটিশ্‌ না দিয়েই হাটতলায় এসে হাজির হ'য়েছিল। কাত্যায়নীর তাতে শাপে বর হ'ল। তিনখানা গাঁয়ের লোক তার খরিদ্দার হ'ল, তা ছাড়া ষ্টেশনের রাস্তার উপর ব'লে ছোট-বড় সবারই পায়ের ধূলো তার দোকানে পড়্‌তে লাগল। আয় অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু বাহাদুরীটা নিলে শশী মুখুয্যে। সে বল্‌ত তার জন্যেই তো এখানে দোকান হ'ল। নিরীহ কৈবর্ত্তর মেয়েরা শশীর এ-কথায় প্রতিবাদ কর্‌ত না। কথাটা শুন্‌তে শুন্‌তে তাদের একরকম বিশ্বাসই জন্মে গিয়েছিল। ঠিক কথাই তো, শশীর জন্যেই তো সব, নইলে এমন রোকের জায়গায় দোকান হবে, এ স্বপ্নের অগোচর।

জায়গাটা শশী মুখুয্যের পক্ষে একটু দূর-পাল্লা হ'লেও আনাগোনা বন্ধ হ'ল না।

মাতঙ্গিনী ছিল কর্ত্তাভজা, শশী ছিল তার ভজনের কর্ত্তা। কর্ত্তার সমস্ত আবদার, সমস্ত উপদ্রব সহ্য ক'রে তার সেবা ক'রে যেতে হয়, এই হ'ল কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের মর্ম্ম-কথা। কিন্তু ধর্ম্মের এই সুস্পষ্ট আদেশসত্ত্বেও ইদানীং কিছুদিন থেকে মাতঙ্গিনীর একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল। সে আর আগেকার মতন তেমন মনের সঙ্গে মুখুয্যের সেবা কর্‌তে পার্‌ত না। এতে মাতঙ্গিনীকে বিশেষ অপরাধ দেওয়া যায় না। মাস-কতক আগে মাতঙ্গিনী তার কল্‌কেতা-প্রবাসী মরণাপন্ন মাসীর টেলিগ্রাম পেয়ে তার সেবার জন্যে কল্‌কেতায় যায়। কাত্যায়নী দোকানের লোকসান হবে ব'লে, যেতে পার্‌লে না। তাই ছোটো হ'লেও, দিদি থাক্‌তে মাতঙ্গিনীকেই সেই মাসীর সেবা ছেড়ে মাসীর করুনা কর্‌তে যেতে হ'ল।

সেখানে চূড়ামণি-যোগে স্নান ক'রে এবং মাসীর স্বর্গারোহণ-প্রাপ্তির পর, উত্তরাধিকার-সূত্রে, তার সোনার দানা, সোনার তাগা, রূপোর চাবি-শিকলি, থান-ছয়-সাত

গিনি, ও শ'-দেড়েক নগদ টাকা অঞ্চলস্থ ক'রে মাতঙ্গিনী গাঁয়ে ফেরে।

ফিরে এসে মাতঙ্গিনী শশীকে যেদিন প্রথম তার ধন-দৌলৎ ছাখালে, সেইদিন থেকেই শশী জিনিসগুলি, হস্তগত কর্‌বার জন্যে টোপ ফেল্‌তে সুরু কর্‌লে। শেষে অনেক জপিয়ে, সুদে খাটিয়ে টাকা বাড়িয়ে দেবার নাম ক'রে জিনিসগুলি বিক্রী ক'রে, সেই টাকায় শশী নিজের নামে বিঘে-কতক জমী, যোগেন মিত্তিরের একজন দেন্‌দার প্রজার কাছ থেকে দাঁও-মাফিক বাগিয়ে নিলে। কিন্তু মাতঙ্গিনীকে এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দিলে না। সে বেচারা সুদের জন্যে শশীকে তাগিদ দিলে, শশী তাকে সুদের সুদ আদায় ক'রে দেবে ব'লে স্তোক দিত। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

এ বিষয়টার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল্‌বার জন্যে মাতি আর কাতিতে অনেক যুক্তি-পরামর্শ হ'য়েছে, কিন্তু সে শেয়ালের যুক্তি। শশীর কাছ থেকে একটা খোলসা জবাব নেবার জন্যে অনেকবার মৎলব আঁটা হয়েছে ; কিন্তু ম্যাও ধরে কে ? শশীর মুখের কাছে এগোয় কে ? জমীদারী-সেরেস্তার লোক, কলমের আঁচড়ে হয়-কে নয় কর্‌তে পারে, ওকে ঘাঁটিয়ে লাভের চেয়ে লোক্‌সানের সম্ভাবনাই বেশী। এই-সব সাত-পাঁচ ভেবে কথাটা ধামা-চাপাই থেকে যেত। তা' ছাড়া কাতি বলত, "মাসী ভালোবেসে তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কপালে না থাক্‌লে ভোগে হয় না। সবই কপাল। আমায় কেউ কিছুই ছায়নি, তবু যা হোক্‌, দোকানের দৌলতে, ভাতের পাতে নিত্যি মাছের মুড়ো, দুধের বাটি না জুটুক্‌, দু'বেলা দু'মুটো জুট্‌ছে তো।"

এতে মাতি আরো চ'টে যেত, সে ঠেস্‌-দেওয়া কথা মোটেই সইতে পার্‌ত না। হয় দু'জনে ঝগ্‌ড়া বেধে যেত, নয় তো মুখ অন্ধকার ক'রে মাতি দুম্‌দুম্‌ শব্দে নিজের ঘরে গিয়ে খিল্‌ এঁটে দিত। আজও অম্‌নি বোনের সঙ্গে শশীকে টাকা তাগিদ দেওয়ার কথা নিয়ে খিটিমিটি ক'রে মাতঙ্গিনী নিজের ঘরে ঢুকে যেমন কপাট দিয়েছে, অম্‌নি শশী এসে দরজায় ধাক্কা দিলে।

মাতঙ্গিনী ধড়াস্‌ ক'রে খিলটা খুলে দিয়েই মুখ ফিরিয়ে, হারিকেনের সাম্‌নে সুপুরি কাট্‌তে বস্‌ল।

মাতঙ্গিনীর রংটি মেটে, চেহারাটি একটি বিপুল কচ্ছপের মতন। তার ধড়খানা একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ, মুখখানি মাঝারি কচ্ছপ ; ফুলো-ফুলো হাত-পাগুলি বাচ্ছা কচ্ছপ ! নামে আর রূপে মিলিয়ে একেবারে গজ-কচ্ছপী ব্যাপার ! তার কানে গোটা-আষ্টেক রিং-মাক্‌ড়ী, নাকে লঙ্গফুলী নাক-ছাবি। গলায় তুলসীর কণ্ঠী, মাঝে মাঝে মুড়্‌কীর সাইজের সোনার মাদুলি। নীচে-হাতে সবুজ কাঁচের রেশ্‌মী চুড়ি, তার সঙ্গে মরা রূপোর আটগাছা ক'রে ষোলোগাছা গোথ্‌রি। উপর-হাতে তারকনাথের তাগা, তাতে গুটি-দুই পলা, গুটিচারেক মাদুলি, একটা নিমুখোর ফল, আর-একটা পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ। তাগার ময়লা সুতোটা আধহাত লম্বা হ'য়ে ঝুল্‌ছে।

ঘরে আস্‌বাবের মধ্যে কেওড়া কাঠের তক্তপোষ। একখানা জল-চৌকি, একটি

কড়ি-বাঁধা কলি হুঁকো, লাট্টুর মতন বিচিত্র রঙের একটি আল্‌না, তাতে পাঁচপেড়ে, তিনপেড়ে, হাতীপেড়ে, মাছপেড়ে, ফুলপেড়ে শাড়ীর সঙ্গে বেগ্‌নী রঙের একখানা খেজুর-ছড়ি কাপড়, আট-পাটি দাঁত মেলিয়ে যেন হাস্‌ছে। দেয়ালে খানকয়েক ফ্রেমে-বাঁধানো কালীঘাটের পট। একটাতে কালীয়-দমন, একটাতে গোপীদের বস্ত্রহরণ। একখানাতে ছুঁচোর কীর্ত্তন, তাতে একটা লোক লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে গোটা-পাঁচেক ছুঁচো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে গম্ভীর ভাবে খোল-কর্ত্তাল বাজিয়ে কীর্ত্তন সুরু করেছে! আর একখানায়, মালিনী ফুল শুঁকিয়ে একটি বাবু-কছমের মানুষকে ভেড়া বানাচ্ছে। যে বাবুটিকে ভেড়া করা হচ্ছে তার মুণ্ডুটি এখনো মানুষের মতোই আছে, বাঁকা সিঁথের দুইপাশে চোম্‌রানো গোঁফ-জোড়াকে টেক্কা দিয়ে দিব্বি একজোড়া শিং গজিয়েছে। বাবুর দেহটি কিন্তু এক-জোড়া শাল হবার উপযুক্ত ঘন পশমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

শশী যখন মাতঙ্গিনীর ঘরে ঢুক্‌ল, তখন সন্ধ্যা। হরনাথ মৈত্রের খিড়্‌কীর বাগান থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত তার মনটা কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আন্‌চান্ করছিল। সে মনে করেছিল কমলা ডুবেছে। এতে তার খুসী হবার কথা, কারণ, কমলা হরনাথের মেয়ে, হরনাথ শশীকে একঘরে কর্‌তে চেয়েছিল। কমলার মৃত্যুতে শশীর সেই অপমানের প্রতিশোধ। শশী মনে কর্‌ছিল, শশী খুসীই হয়েছে; যা' একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল তা' বোধ হয় খুসী জানাবার দোসর পাচ্ছিল না বলেই। সে অনেক আগেই মাতঙ্গিনীর কাছে আনন্দ জ্ঞাপন কর্‌তে আস্‌ত, কিন্তু যোগেন মিস্তিরের হুঁকো ছেলেটা দরজায় ধর্‌না দিয়ে তাকে হুক্-নাহুক্ দেরী করিয়ে দিলে। হরেন চ'লে যেতেই শশী গলি-রাস্তায় লোকের আনাচ-কানাচ দিয়ে মাতঙ্গিনীর বাড়ী এসে হাজির হ'ল এবং ঘরে ঢুকেই উড়ুনি-জড়ানো সাজান-পুরী বেগম ওর্‌ফে ধান্যেশ্বরীর বোতলটি বার ক'রে ঢুকুঢুকু সুরু ক'রে দিলে।

তিন চার পাত্র পেটে পড়েও যখন নেশা জম্‌ল না, তখন শশী মাতঙ্গিনীকে একপাত্র প্রসাদ দিয়ে তরিবৎ ক'রে গাঁজা সাজ্‌তে বস্‌ল। মাতঙ্গিনীর মন ভালো ছিল না, সে শশীর দিকে পিছন ক'রে পাত্র উপুড় ক'রে সমস্ত প্রসাদটুকু ডাবরে ঢেলে দিলে।

শশী ততক্ষণে কল্‌কেয় সাপি জড়িয়ে, ক'সে গুটি-তিনেক দম লাগিয়ে, কল্‌কে উপুড় ক'রে দিয়ে আপনার খেয়ালে হাস্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছে।

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে শশীর আপাদ-মস্তক একবার তীব্র দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বল্‌লে, "মরণ আর কি, শুধু শুধু হেসে মরা হচ্ছে কেন?"

শশী চোখদুটো শিবনেত্র ক'রে সমস্ত শরীরটা ঈষৎ দুলিয়ে বল্‌লে, "খুসী হ'লেই হাসি, হাসি হ'লেই খুসী, হাসি-খুসী, হাসিখুসী!"

মাতঙ্গিনী বল্‌লে, "হাসিখুসী যে খুব দেখ্‌ছি,—এখন টাকাটার কি হ'ল বল দেখি?"

শশী বল্‌লে, "আরে টাকা কি বল্‌ছিস্—এমন খবর তোকে দিতে পারি—যার দাম লাখ টাকা,—টাকার কথা কি বল্‌ছিস্?—আজ কি হ'য়েছে তা জানিস্?... জানিস্ নি; তবে শোন্—সেই খোলা-কাটা বারেন্দ্র ব্যাটার মেয়ে...কম্‌লি রে কম্‌লি... ডুবে মরেছে;...তিনকুলে কেউ জায়গা দিলে না...শাশুড়ী না—মা-বাপ না,—যাবে কোথায় —পুকুর-জলে ডুবে মরেছে—আমি স্বচক্ষে এই দেখে আস্‌ছি।"

যদিচ শশী কমলাকে ডুবতে ছাখেনি, তবু সে জোর-গলায় বল্‌লে, "স্বচক্ষে দেখেছি"। শশীর মতন যারা পাকা খেলোয়াড় লোক, তারা নিজের চালের ও নিজের বুদ্ধির উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে এবং নিজেদের এরকম দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব'লেই মনে করে। আত্ম-অবিশ্বাস এদের কুষ্ঠিতে লেখেনি। এ বিষয়ে শশী শয়তান, শকুনি, কাইজার, কালনেমি, ক্লাইব্, কৌটিল্য, হেষ্টিংস্, হিণ্ডেনবার্গের ভায়রা-ভাই বা মাতুতো ভাই। মনের মতন কল্পনাকে সে কলে-কৌশলে অনেকবার ফলিয়ে তুল্‌তে পেরেছে ব'লেই, সে ঠিক ক'রে রেখেছে, তার যা মনের মতন তা ফল্‌বেই। সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিল, কমলা মরেছে, নির্ঘাৎ মরেছে, ডুবে ম'রে ভেসে উঠেছে। তাই সে বল্‌লে "আমি স্বচক্ষে দেখেছি!"

মাতঙ্গিনী চোখ কপালে তুলে খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে থেকে ব'লে উঠল, "বল কি মুখুয্যে! ছুঁড়ি ডুবে মরেছে?"

"হুঁ, ডুবে মরেছে—আত্মহত্যা করেছে—পেত্নী হবে—ফের টাকার তাগাদা করিচিস্ কি তোর ঘাড় ভাঙ্‌বে!—হুঁ হুঁ, বামুনের কথা মিথ্যে হয় না!"

মাতঙ্গিনী চ'টে উঠে বল্‌লে, "ঘাড় আমার ভাঙ্‌বে না তোমার ভাঙ্‌বে?—তুমিই তো বামুনের মেয়ের নামে—হয়-না-হয় বদনাম দিয়ে এই কাণ্ড ঘটালে!—আহাহা!—ছুড়ি বেঘোরে মারা গেল গা—ইস্ত্রি হত্যে— বেম্ম হত্যে—ছিঃ!"

শশী ত্যারছা ভাবে একটা কটাক্ষ হেনে বল্‌লে, "মাতি! তুই মাতাল হইচিস্!"

মাতঙ্গিনী ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লে, "মুখে আগুন মাতালের,—তোমার মদ ঐ ডাবরে—ইচ্ছে হয় শুঁকে ছাখো;—ছিছি!—এত অনাচার ধম্মে সইবে না—ছিঃ!—মানুষকে খানে-খারাপ করা—ছিঃ—ছিঃ, বামুনের মস্তির ভয় নেই—"

শশী ক্রমশঃ তেতে উঠছিল, সে তার ঘোলা চোখ্‌টাকে বিকট রকম ঘুলিয়ে এবং ঘুরিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বল্‌লে—"বামুন—হুঃ! বামুন খোলা-কাটা বামুন—ভারি বামুন—আমার কাছে আবার বামুন কোন্ ব্যাটা? ফুলের মুখুটি নসী মুখুয্যের নাতি শশী মুখুয্যে, আমায় কিনা ব্যাটা বলে একঘরে কর্‌বে? ব্যাটা পিণ্ডিখোর পুরুৎ—এত-বড় আস্পর্দ্ধা পুরুৎ বামুনের?—বাম্‌নাই ফলায় আমার কাছে? এখন সাম্‌লাও ঠেলা!"

মাতি মনে মনে তার মা-গোঁসাইকে নমস্কার ক'রে স্বগত বল্‌লে, "অপরাধ মাপ কোরো মা-গোঁসাই, আমি এ নচ্ছারের ওপর আর ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখ্‌তে পারলুম না। এতে আমার যা পাপ হয় তা' হবে।" প্রকাশ্যে বল্‌লে, "যাও, যাও, আর বড়াই কর্‌তে হবে না।

উচিত কথা বল্‌ব; তাতে বন্ধু বেগ্‌ড়ান, বেগ্‌ড়াবেন। বলে—

'অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী
তাহার অধিক পাপী বিশ্বাসঘাতকী'

তুমি আবার বামুন,তুমি মহাপাপী! যে মানুষ ইহকাল-পরকাল খুইয়ে অ্যাদ্দিন ধ'রে তোমায় ঠাকুর-সেবা কর্‌লে, তার সব্বস্ব সুদের লোভ দেখিয়ে ফুস্‌লে বার ক'রে নিয়ে ফাঁকি দিলে, মেয়েমানুষের টাকা হজম কর্‌লে; তারপর আর এক ভালো-মান্‌সের মেয়ের নামে মিছি-মিছি বদ্‌নাম দিয়ে তার একাল-আখের খেয়ে দিলে, তার আবার বাম্‌নাই?—মুখে আগুন তার;—গলায় দড়ি, সে আবার মানুষ?"

শশী বল্‌লে, "ছাখ্‌, মাতি, রাগাস্‌ নি বল্‌ছি,—আমি মিছিমিছি বদনাম দিইছি? স্বচক্ষে দেখিছি!"

মাতি বল্‌লে, "মরণ আর কি, বলে

'জেনে শুনে মিথ্যে বলে,
তার দোলা নরকে দোলে!'—

মিছে ক'রে বদনাম দাওনি কম্‌লির নামে? মাসীর অসুখের সময় কল্‌কেতায় সোহাগ ক'রে চিঠি লেখা হয়েছিল যে—তাতে কি লিখেছিলে মনে নেই?—দাওনি মিছি-মিছি বদ্‌নাম?—নও মিথ্যেবাদী?"

শশী মুখুয্যে রাগে গির্‌গিটির মতন মাথা উঁচু ক'রে গর্‌গর্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

মাতি বল্‌লে, "কি, গির্‌গিটির মতন খাড়া হ'য়ে উঠছ কেন? চোখদুটো খুব্‌লে নেবে নাকি?"

চোখ খোব্‌লানোর কথায় কাণা-শশীর ভোঁ ক'রে মাথা ঘুরে গেল। ধাঁ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে সে কর্কশ কণ্ঠে ব'লে উঠল, "তরে রে পাজী, ছোটলোক, ক্যাওট, যত-বড় মুখ, তত-বড় কথা!—আমি গির্‌গিটি?"

"খবর্দ্দার বামুন, বেরিয়ে যা' ঘর থেকে, গায়ে হাত তোল্‌বার তুই কে?—সর্ব্বস্ব হজম ক'রে—এখন ক্যাওট—ক্যাওটের ভাত মেরে এখন ক্যাওট—বলে 'ভাত-কাপড়ের খোঁজ নেইক, নাক কাট্‌বার ঠাকুর!' দূর হ'য়ে যা ঘর থেকে!"

"ছাখ্‌ মাতি তুই বড় বাড়িয়েছিস্‌; জমীদার চাল কেটে দেশ-ছাড়া ক'রে দিচ্ছিল, আমি যার ব'লে ক'য়ে হাটতলায় জায়গা দেওয়ালুম, তাই মাথা গুঁজে থাক্‌তে পেইচিস্‌।—আমার উপর ট্যাক্‌ ট্যাক্‌?—সবুর কর্‌—মাথায় ঘোল ঢেলে দেশ-ছাড়া কর্‌ছি—সবুর কর্‌।—বল্‌ছি জমীদারকে—বড় বাড় বেড়েছিস্‌।"

ঘোল-ঢালার কথায় মাতি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে, "জমীদার?—যা'না জমীদারের কাছে,—আমিও সেখানে যেতে জানি,—যাব—বল্‌ব—সব ফাঁস ক'রে দেব—তার ব্যাটার নামে মিথ্যে বদ্‌নাম দিয়ে তাকে তেজ্যিপুত্তুর করিয়েচিস্‌—সব বল্‌ব—অন্দরের ভিতর গিয়ে গিন্নিঠাকুরুণকে বল্‌ব।—আমায় তুই চিনিস্‌ নি!"

"যা, যা; যা'না, কস্‌বীর কথায় কে বিশ্বাস করবে? হেঃ, যা'না, গিয়ে একবার মজাটা ছাখ্‌ না।"

মাতঙ্গিনীর রোখ চেপে গিয়েছিল, সে বল্‌লে, "বিশ্বাস করে কি না করে, সে আমি বুঝব,—কল্‌কেতার দরুণ সেই চিঠি নিয়ে যাব, গিয়ে গিন্নি-ঠাকুরুণকে দেব,—বাবুদের ছাখাব,—সে চিঠি আমি ফেলিনি—কোনো

কাগজ আমি ফেলি নি—সব আছে—তা জানিস্‌!"

হঠাৎ নরম হ'য়ে শশী বল্‌লে, "মাতি, রাগ কর্‌লি?"

মাতি বল্‌লে, "রেখে দে তোর সোহাগ, কাতির বোন্‌ মাতি তোর শুক্‌নো আদরে আর ভুল্‌ছে না।"

শশী বল্‌লে, "সে চিঠিটা কোথায় রেখেছিস্‌ ছাখা না।"

"ইস্‌!—কেন?···না ছাখাব না; কি করবি তুই বামুন,—তোর বিষ-দাঁত আমি ভাঙ্‌ব,—আমার বুক-ভরা সোনা হজম করেছিস্‌—আমার সর্ব্বস্ব খেইচিস্‌—সব বল্‌ব—জোচ্চোর—বাট্‌পাড়—বেইমান বামুন!"

শশী রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে বল্লে, "দিবি নি?"

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "না দেব না।"

"দি বি নি?"

"না!"

"দিবি নি?"

মাতঙ্গিনীর জিদ্‌ বেড়ে গেল, সে বারবার তিনবার বল্‌লে "না।" মদে গাঁজায় শশীর মগজ একেই ভয়ঙ্কর তেতেছিল, তার উপর মাতঙ্গিনীর এই-সব কাটা কাটা কথায় ও চাকরী যাবার ভাবী সম্ভাবনায় সে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠ্‌ল। চালাকি ক'রে, সময় মতন চিঠিটা বার ক'রে নেবার তার আর তর্‌ সইল না! ফিচেল্‌ শশী হঠাৎ গোঁয়ারের মতন মাতঙ্গিনীকে একেবারে চিৎ ক'রে ফেলে, তার বুকের উপর দুই হাঁটু দিয়ে জেঁকে ব'সে গলাটা সজোরে টিপে দমক দিতে লাগ্‌ল। মাতঙ্গিনীর আর্ত্তনাদে ও গোঁ গোঁ শব্দে কাত্যায়নী দোকান ছেড়ে যখন মাতঙ্গিনীর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুক্‌ল, তখন মাতঙ্গিনীর দম বন্ধ হ'য়ে গেছে।

"ছাড়্‌, ছাড়্‌, খুন করলে হতভাগা, খুন কর্‌লে" ব'লে কাত্যায়নী চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছে দেখে শশী মাতঙ্গিনীকে ছেড়ে বোতল ছুঁড়ে কাত্যায়নীকে ঘায়েল করে। কাত্যায়নী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চেঁচিয়ে, গাল দিয়ে কেঁদে সরগরম ক'রে তুল্‌লে। শশী এই সুযোগে স'রে পড়্‌ছিল, কিন্তু একে হাট-বার তায় ম্যাজিষ্ট্রেটের অভ্যর্থনার জন্যে হাটবাট দোকান-পাট সাজানো হচ্ছে দেখে, অনেক হাটুরে ও নিষ্কর্ম্মা লোক সন্ধ্যা হ'য়ে গেলেও জটলা ক'রে হাকিম দর্শনের অপেক্ষায় ছিল। জন-দুই চৌকীদারও পুলিশের তরফ থেকে সাজানোর কাজ তদারক করছিল। কাজেই শশীর মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। সে জমীদার-সরকারের লোক ব'লেও রেয়াৎ পেলে না। ধর্ম্মের কল নেহাৎ বাতাসেই নড়ে গেল।

৩৩

যে গাড়ীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কালীগ্রামে আসবার কথা ছিল, সে গাড়ীতে তিনি আসেন্‌ নি। যোগেন মিত্তির ষ্টেশনে গিয়ে দেখ্‌লেন, তার বদলে তাঁর নামে এক তার এসে হাজির। তাতে যা' লেখা আছে তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সাহেবের গ্রাম পরিদর্শনে আসা হ'ল না, সেজন্যে তিনি দুঃখিত। তবে আশা করেন, যে, দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি সেরে উঠ্‌বেন এবং কালীগ্রামে পায়ের ধুলো দেবেন।

সমস্ত আয়োজন পণ্ড হওয়ায় এবং খরচ দোকর হবার সম্ভাবনায় যোগেন মিত্তির মনে মনে দস্তুরমতন বিরক্ত হ'য়ে, হাতীটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে স্বয়ং টম্ টম্ হাঁকিয়ে আগেই গাঁয়ের দিকে রওনা হ'লেন। খানিকদূর গিয়ে চাঁদের আলোয় হঠাৎ মৈত্র-মশাইকে দেখে গাড়ী থামালেন।

"প্রাতঃপ্রণাম মৈত্র-মশাই, এত রাত্রে ?"

"রেলের ওপারে ডোমাই-চণ্ডীতলায় একটু দরকার ছিল,—একজন যজমানের অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তের জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, লোকটি অনেকদিন থেকে ভুগ্‌ছিল।—তা গিয়ে শুন্‌লুম, মারা গিয়েছে—তাই ফিরছি।"

যোগেন মিত্তির বল্‌লেন, "আসুন আমার গাড়ীতে।" মৈত্র-মশাই একটু ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে গাড়ীতে উঠে পড়্‌লেন। গাড়ী রশি-খানেক গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের কাঁচা রাস্তা নিলে। তখনো হাটের ফির্‌তি দু'একখানি গোরুর গাড়ী, নিদ্রোত্থিত বেতো রুগীর মতন, আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে, প্রচুর ধুলো উড়িয়ে হোঁচট খেতে খেতে গ্রামান্তরে চলেছে।

যোগেন মিত্তির স্বয়ং গাড়ী হাঁকাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর সিগারের তৃষ্ণা প্রবল হওয়ায়, রাশ, চাবুক, সিগার,দেশালাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, এবং জমীদার ক'রেও বিধাতা যে কেন তাঁকে চতুর্ভুজ করেন নি, তা বুঝ্‌তে না পেরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গাড়ী থামালেন। তারপর অনেক রকম কায়দা ক'রে মেঠো হাওয়ার ফুস্-মন্তর থেকে দেশালাইয়ের শিখাটিকে বাঁচিয়ে সিগারটি প্রায় ধরিয়েছেন এমন সময়ে "রাখো! রাখো!" শব্দে তাঁর চমক ভাঙ্‌ল। সাম্‌নে দেখ্‌লেন ডাক্তারের পাল্‌কী। ডাক্তার বাবু পাল্‌কী থেকে নেবে প'ড়েই একেবারে টম্‌টমের কাছে হাজির হ'লেন। সিগারটা দাঁতে চেপে রাশ-চাবুক একসঙ্গে নাক বরাবর উঁচিয়ে যোগেন মিত্তির বল্‌লেন, "প্রাতঃপ্রণাম, ডাক্‌টার বাবু যে!" (দন্ত-পাটির জাঁতি-কলের মধ্যে সিগার থাকলে তবর্গ স্থানে টবর্গ হয়,ইতি তাম্রকুট-কৌমুদী।)

ডাক্তার বাবুটি কালীগ্রামে নূতন এসেছেন, জাতে ব্রাহ্মণ, তাই বয়সে যোগেন মিত্তিরের চেয়ে ঢের ছোট হ'লেও কায়স্থ জমাদারের প্রাতঃপ্রণামের জবাবে তিনি ঠিক আশীর্ব্বাদ করলেন কি 'বক' দেখালেন, তা' স্পষ্ট রকম বোঝা গেল না। যজ্ঞ-বাড়ীতে খাওয়ার পর লোকের ঠেলাঠেলিতে এঁটো হাতের উপর গায়ের শাল খসে পড়বার সম্ভাবনা হ'লে হাতের যে অপরূপ ভঙ্গী হয়, ডাক্তার বাবুর হাতের ভঙ্গীও দেখ্‌তে অনেকটা সেই রকমই দাঁড়াল। চক্রাকার মুখখানিতে অহেতুকী-প্রফুল্লতার খাজার ভাঁজ যেন কায়েম হ'য়ে থাকবার জো হ'ল। তিনি বল্লেন, "একবার ডোমাই-চণ্ডীতলায় যেতে হবে, একটি রুগী আছে।"

যোগেন মিত্তির বল্লেন, "সে আর কষ্ট ক'রে কেন যাবেন, তাঁর হ'য়ে গেছে। এই যে মৈত্র-মশায় সেখান থেকে আস্‌ছেন।"

মৈত্র-মশায় বল্লেন, "ডোমাই-চণ্ডীতলার চৌধুরীদের ন'কর্ত্তা তো—তাঁর হ'য়ে গেছে।"

ডাক্তারের চাঁদসই খাজার মতন মুখখানি হঠাৎ বেগুণ-পোড়ার মতন লম্বা হ'য়ে ঝুলে

পড়্‌ল। তিনি কিন্তু বে-পরোয়া ভাবে বল্লেন, "যাক্!"

বাড়ীর দিকে ফির্‌বেন কি চৌধুরীদের দেউড়ি পর্য্যন্ত গিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে আস্‌বেন, ঠিক কর্‌তে না পেরে, মিনিট-খানেক ডাক্তার বাবু 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় টম্‌টমের ঘোড়ার পুচ্ছ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌লেন। হঠাৎ ডাক্তারের মগজের ভিতর তৃতীয় পন্থা খুলে গেল। তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "ভালো কথা, বল্‌তে ভুলেছি, খাজাঞ্চি-খানার শশী মুখুয্যের বড় বিপদ, লোকটা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়েছে।"

যোগেন মিত্তির বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "কি রকম? সে তো অসুখের নাম ক'রে ছুটি নিয়ে গেছে; আমার আম্‌লা পুলিশের হাতে কি-রকম?"

তখন ডাক্তার ভিজিটের শোক ভুলে পরম প্রগল্‌ভতার সঙ্গে আদ্যোপান্ত সমস্ত বল্‌তে সুরু কর্‌লেন।

তিনি যা বল্লেন তার মর্ম্মটা এই রকম;—

চৌধুরীদের ন-কর্ত্তাকে দেখ্‌তে যাবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রায় হাট-তলার কাছ-বরাবর এসেছেন, এমন সময়, মৈত্র-মশায়ের ছেলে অরুণ হাঁপাতে হাঁপাতে মাঝপথে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে হাটে একটা জরুরি কেসের নাম ক'রে ডেকে নিয়ে যায়। তিনিও জরুরি কেস্ শুনে, তাঁর ভিজিটের টাকা কে দেবে, সে কথা না ভেবেচিন্তেই, ডাক্তারের যা' কর্ত্তব্য তাই করেন। সেখানে যাকে দ্যাখ্‌বার জন্যে তিনি গিয়েছিলেন, সে একজন স্ত্রীলোক। প্রথমে তাকে মৃত ব'লেই মনে হয়েছিল, কিন্তু, পরে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে তার চৈতন্য-সম্পাদন করা হয়।

আরেকটি স্ত্রীলোক, বোধ হচ্ছে তার বোন হবে,—সে বল্‌লে যে শশী মুখুয্যে, মাতাল অবস্থায় বোতল মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এর আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটিকে ঐ-রকম মাতাল অবস্থাতেই গলা টিপে মেরে ফেল্‌ছে দেখে সে ধর্‌তে গিয়েছিল, এই তার অপরাধ। ডাক্তার বাবু দারোগাকে খবর পাঠান, তিনি এসে দু'জন স্ত্রীলোকেরই এজেহার লিখে নিয়েছেন। ডাক্তার বাবু এ সব ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তেন না; কারণ ঘটনার সময়ে তিনি কালিগ্রামে কর্ম্মগ্রহণই করেন নি। এজেহারে যা' শুনেছেন তাই বল্‌ছেন। সুতরাং মৈত্র-মশাই যেন কিছু মনে না করেন। এজেহারে প্রকাশ,শশী মুখুয্যের সঙ্গে প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটির প্রসক্তি ছিল এই কথাটা ক্রমশঃ রাষ্ট্র হ'য়ে যাওয়ায় মৈত্র-মশাই নাকি শশীকে একঘ'রে কর্‌বার চেষ্টা করেন। শশীর রাগ ছিল। তাই মৈত্র-মশায়ের মেয়ে যখন কল্‌কেতায় হারিয়ে যায়, তখন মৈত্রকে জব্দ কর্‌বার জন্যে শশী একটা মিথ্যা-কলঙ্ক রটিয়ে দ্যায়। আজ নাকি সেই সব কথা নিয়ে দুজনে কি বচসা হয়। স্ত্রীলোকটি শশীর এই সমস্ত কীর্ত্তির কথা ফাঁস ক'রে দেবে বলে। তাই নেশার ঝোঁকে রাগের মাথায় শশী তার গলা টিপে ধরে। স্ত্রীলোকটি বলে, চূড়ামণি-যোগের সময় যখন সে তার মাসীর কাছে কলকেতায় যায়, তখন নাকি শশী তাকে তার এই কীর্ত্তির কথা জানিয়ে এক চিঠি লেখে। মৈত্র-

মশাইকে জব্দ করবার সে যে অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন ক'রেছে তা' সবিস্তারে লেখে। সে চিঠি সে ফেলেই দিত, কিন্তু মাসীর দরুণ টিনের তৈরী গহনার বাক্সটার তলায়,যে কাগজ-খানা পাতা ছিল,তা মর্‌চে লেগে জ'রে যাওয়ায় ও হাতের কাছে অন্য কোনো কাগজ না থাকায় সে গহনার বাক্সর তলায় শশীর ঐ চিঠিখানা বিছিয়ে তার উপর গহনাগুলি রেখে ছিল। সে চিঠিও পাওয়া গেছে।

ডাক্তার বাবুর রিপোর্ট শেষ হ'লে যোগেন মিত্তিরের ভুরু-দুটোর মাঝখানে যে ভ্রূকুটিটা এতক্ষণ কাম্‌ড়ে বসেছিল, সেটাকে উপরের দিকে ঠেলে কপালময় ছড়িয়ে দিয়ে,তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "হারামজাদার এত বড় আস্পর্দ্ধা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! জেলে পচাব! ব্যাটাকে চাল কেটে দূর ক'রে দেব। তবে আমার নাম যোগেন মিত্তির!—ওঃ এত বড় শয়তান!"

মৈত্র-মশাইএর মুখ লাল, চোখে জল, কপালের শিরাগুলো সমস্ত ফুলে উঠেছে; দুঃখ-সুখের দোটানায় তাঁর ঠোঁটের চেহারা অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। তিনি ভাঙা গলায় শুধু বল্লেন "পাষণ্ড", আর কোনো কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না।

যোগেন মিত্তির ডাক্তারকে পিছনে আস্‌তে ব'লে, বেগে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

সহজ স্বাস্থ্যরক্ষা—প্রথম ভাগ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হারাধন বসু, এম-বি প্রণীত। প্রকাশক, এস, কে, দত্ত, ২৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ভারত মিহির প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বালক-বালিকাগণের জন্য রচিত। ইহাতে খুব সহজ ভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কথাই মোটামুটি বিবৃত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার যে সাধারণ নিয়মগুলি লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে অর্থব্যয় হইবে না, অথচ সেগুলি বেশ সহজ ও একেবারে বাঙালী গৃহস্থ জনসাধারণের পক্ষে নিতান্তই ঘরোয়া ধরণের। মেলেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কৃমি, প্রভৃতি রোগ ও তাহার প্রতিকারের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু বিশেষ উপকারে লাগিবে; আলোচ্য বিষয় বুঝিবার সুবিধা-কল্পে কয়েকখানি চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

প্রধীকর্ম্মকার।—বা কর্ম্মার ক্ষত্রিয় Researcher প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায় বর্ম্মণ, ৫।৪ জরিফ লেন কলিকাতা। মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না। এই গ্রন্থে লেখক শাস্ত্র ও ইতিহাস হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, "যাঁহারা লৌহস্থবর্ণাদি ধাতু-রত্নঘটিত শিল্প-বিজ্ঞান-কর্ম্মে অলৌকিক গুণকর্ম্ম-শালী হইতেন, তাঁহাদের 'কর্ম্মার' (অর্থাৎ ধীকর্ম্মা বা প্রধীকর্ম্মকার) এই গৌরবাত্মক উপাধি হইত। পরিশেষে চতুর্ব র্ণ সৃষ্টি হইলে সামরিক ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র-যন্ত্র-তৈজস-আভরণাদির রচনা-কর্ম্মকুশল এই কর্ম্মার আখ্যা ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়বর্ণে স্থান পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যেমন অধিকাংশ অসিচালক, যোধন বা রাজন্য ছিলেন, সেরূপ কতকাংশ অসিকারক সুকারু কুলিক ছিলেন।" কর্ম্মকার জাতি বর্ণসঙ্কর নহে, ক্ষত্রিয়েরই একটি শাখা বিশেষ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই জাতীয় জাগরণের দিনে বাঙলার সকল জাতিই যে

ভেদান্তরালের মধ্য দিয়া আপনাদিগের লুপ্ত পরিচয় উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চাহিতেছেন, যে বিশ্বসভায় তাঁহাদের দাবী কতটা, ইহা সুলক্ষণ, ভবিষ্যৎ উন্নতির শুভ সূচনা! এ গ্রন্থ শুধু কর্ম্মকার সম্প্রদায় কেন, সমস্ত বাঙালীই পাঠ করুন,—পাঠ করিলে এ কথা সকলকে বলিতেই হইবে, আমাদের কেহ তুচ্ছ নয়!

পাশ্চাত্যধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা।—শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার প্রণীত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সনৎকুমার হালদার, রাঁচি। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক ইহাই বুঝাইয়াছেন, "ইউরোপের সভ্যতা কোনো কালেই খ্রীষ্টানধর্ম্মের বিশেষ মুখাপেক্ষী ছিল না, বরং খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের কাছে অনেক সময়ে গুরুতর বাধা পেয়ে এসেছে। আপাততঃ যে ভাবে ইউরোপে ও আমেরিকায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা এগিয়ে চলেছে সেরূপ যদি বেশী দিন চলে, তাহলে প্রচলিত খ্রীষ্টানধর্ম্ম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বলা কঠিন।" এই গ্রন্থপাঠে লেখকের প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় পাই। লেখক এই প্রসঙ্গে বার্ণার্ড শ'র যে-উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই আলোচনার যোগ্য। সে উক্তিটি এই—To offer a Hindoo so crude a theology as ours in exchange for his own, or our Jewish canonical literature as an improvement on Hindoo scripture is to offer old lamps for older ones in a market where the oldest lamps like old furniture in England are the most highly valued.

হিন্দুনারী।—শ্রীযুক্ত এবনে নুর প্রণীত। প্রকাশক, শেখ মোহম্মদ ইদরিস আলী, কোহিনুর লাই-ব্রেরী, কলিকাতা। বঙ্গনুর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি উপন্যাস, ইহার লেখক মুসলমান—অথচ গ্রন্থের নাম 'হিন্দুনারী'—কাজেই অনেকখানি কৌতূহল লইয়াই গ্রন্থখানি পাঠের উদ্যোগ করিয়াছিলাম; তাহার উপর গ্রন্থের মুখপত্রে লেখক সাড়ম্বরে যখন বলিয়াছেন, এ গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন শুধু হিন্দু-মুসলমানে সৌহৃদ্য স্থাপনের জন্য, অপর কোন উদ্দেশ্যে নয়! এ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও এই মুখপত্রেই শেষের দিকে দেখিলাম, বঙ্কিম-চন্দ্রকে লেখক অনর্থক বেশ একহাত লইয়াছেন! তার-পর গ্রন্থখানির প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখি, শিষ্টাচারের যে একটা স্বাভাবিক নিয়ম সকল সমাজে প্রচলিত আছে, লেখক তাহার মুাথায় লগুড়াঘাত করিয়াছেন। তার পর এক মহর্ষির শিষ্যদ্বয়কে আসরে নামাইয়া তাহাদের মুখ দিয়া যে ভাষায় যে সকল কথা বলাইয়াছেন, তাহাতে লেখকের রুচি ও সাহিত্যজ্ঞানের যে পরিচয় পাই, তাহা আজিকালিকার দিনে খুলিয়া না বলাই ভালো। লেখক উপন্যাসের ঘটনা স্থাপন করিয়াছেন, হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে আর সেই সময়কার কথায় বলিতেছেন —'সে সময় ভারতের কোন স্থানেই রমণীগণ সতীত্ব-রক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া যে মনে করিত এরূপ মনে হয় না। এমন কি সম্ভ্রান্ত, পরিবারেও ব্যভিচারের স্রোত যেন প্রকাশ্যে প্রবল বেগেই প্রবাহিত হইত। সেকালে নর-নারীগণ পশুবৎ ব্যবহার করিত।' ইত্যাদি। ইহার পর আর এ গ্রন্থ পড়িবার প্রবৃত্তি থাকে না। লেখকের ভাষা ও সাহিত্য-জ্ঞানের পরিচয় গোড়ার কয় পৃষ্ঠাতেই যাহা পাই, তাহা একেবারে অপূর্ব্ব! ইতিহাসেও এমনি জ্ঞান যে সাদা চোখে ইতিহাসের পাতা কয়খানা শুধু উল্‌টাইয়া গেলেও ফল এখন বীভৎস দাঁড় করানো কঠিন হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস! এই জঘন্য রুচির গ্রন্থ বাহিরে প্রকাশ করিলে সাহিত্যের আদালতে সাজার কোন ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু রাজ-দ্বারে এই গ্রন্থ দেখাইয়া এই শ্রেণীর গ্রন্থ-প্রকাশের একটা সীমা এখনই মাপিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তবে এই আইন-আদালতের দিনে যে যা-খুসি লিখিয়া চালানো যায় না—এ বোধ যাহার নাই, তাহাকে সুবুদ্ধি বা পরামর্শ দিতে যাওয়া শুধু বাতাসে অসি-প্রহার মাত্র!

ঘর ও পর।—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রণীত। বিপ্র-ভাণ্ডার, বসন্ত কুটীর, গোন্দলপাড়া চন্দননগর, কলিকাতা সাথী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি সন্দর্ভ-পুস্তক। লেখক এই গ্রন্থে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী কাটাইয়া মানুষকে এক বিরাট মহামানবতায় পরিণত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা

ইতিহাসের ধারাকে অবলম্বন করিয়া দার্শনিকতা ও সামাজিকতার লক্ষ্য হারায় নাই। সর্ব্বপ্রকার লৌকিক সুবিধার দিক দিয়াও তিনি এই বিশাল সহমর্ম্মিতার যৌক্তিকতা দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। চিত্তের ও দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; সেই মনুষ্যত্ব-লাভের দিকেই সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতেই মানুষের উন্নতি ও সুখ—মোটামুটি ইহাই এই সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য। এ সন্দর্ভে লেখকের ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পাই; সঙ্গে সঙ্গে যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা হইয়াছে তাহাও যেমনি নিপুণ তেমনি অকাট্য।

শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যম্।—পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভু গৌরসুন্দর ভাগবত দর্শনাচার্য্যেণ সংশোধিতম্। ভাগবত-সেবক শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দাস ঘোষেণ সম্পাদিতং। শ্রীযুক্ত প্রমথচরণ দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক দেওঘর অশ্বত্থছায়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। ইহাতে ভাগবত-গ্রন্থের উত্তর খণ্ড মূল ও পয়ার ছন্দে রচিত তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা খুব সহজ—যাঁহারা সামান্য লেখা-পড়া জানেন, তাঁহারাও অনায়াসে এই অনুবাদ-পাঠে মূলের ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন—ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। ছাপা কাগজ ভালো। ভূমিকায় প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন উৎসাহ পাইলে বহু-ব্যয়সাধ্য এই 'শ্রীগ্রন্থ' তিনি সমগ্র প্রকাশ করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞানের গল্প।—শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র। এই গ্রন্থখানিতে বিজ্ঞানের কতকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা, এমন চমৎকার সহজ ভাষায় সুললিত ভঙ্গীতে ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে ছেলেরা ইহাকে গল্পের বইয়ের মতই সমাদরে পাঠ করিবে। সূর্য্য, সূর্য্যের তাপ ও আলো, আলোর উৎপত্তি, শব্দের উৎপত্তি, রঙিন আলো, রঙের খেলা, মেঘ ও বৃষ্টি, মেঘের আকৃতি ও প্রকৃতি, গাছের ঘুম, রক্ত, ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, মাছ, আমাদের খাদ্য ও শরীরের বিষ—এই কয়টি বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞানের মত নীরস বিষয়ও দিব্য মনোরম ভঙ্গীতে বলিবার ক্ষমতা জগদানন্দ বাবুর অসাধারণ. এ গ্রন্থে সে পরিচয় সর্ব্বত্র পাই। এ গ্রন্থখানি শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, তাহাদের অভিভাবকেরা অবধি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন, উপকৃত হইবেন। যে যে গৃহে ছেলে-মেয়ে আছে, সেই-সেই গৃহমাত্রেই এ গ্রন্থ বিরাজ করুক। পাঠের বিভীষিকা ত ছেলেরা বুঝিবেই না—আনন্দের সহিত শিক্ষাও তাহারা প্রচুর পাইবে। বহিখানির ছাপা কাগজ চমৎকার—অনেকগুলি ছবিও বহিখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ছবিগুলি বর্ণনীয় বিষয়গুলিকে আরো সুপরিস্ফুট করিয়া ইহার পাঠক-পাঠিকার তরুণ চিত্তে জ্ঞানের সুদৃঢ় রেখা পাত করিবে।

ত্রিরাত্রি।—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্ কলিকাতা। চোরবাগান, কলিকাতা, কণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিক্কা। এখানিকে ঠিক উপন্যাস বলিতে পারা যায় কিনা বলিতে পারি না, তবে উপন্যাসেরই মত। কয়েকখানি পত্রচ্ছলে গ্রন্থকার ইহাতে "আমাদের সমাজের বর্ত্তমান সৎ এবং অসৎ ভাবের ধারাগুলি দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।" পত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া একটি প্লটও মন্দ ফোটে নাই! লেখকের লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা আছে—বর্ত্তমান যুগে যে সব তত্ত্ব অনেকেরই চিত্তে আন্দোলন তুলিয়াছে, তাহার তরঙ্গ পত্রগুলির মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। লেখক ভাবুক—তাঁহার প্রাণে কবিত্ব আছে—পত্রগুলি পড়িবার সময় পাঠকের চিত্তে বহু চিন্তার উদ্রেক হয়, বহু ভাবে তারা চিত্ত দুলিয়া ওঠে। পত্রগুলিতে এত বিভিন্ন ভাবের ধারা ছুটিয়াছে যে উপন্যাসের দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে এ কথা বলিতেই হইবে যে তাহাতে উপন্যাসের গতি স্থানে স্থানে মন্দ হইয়া রসভঙ্গ করিয়াছে; তবে বিভিন্নভাবে ধরিলে পত্রগুলি চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষক হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে লেখকের শক্তির পরিচয় পাইয়াছি,—মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁহার বেশ পারদর্শিতা আছে। মোটের উপর বলিতে পারি, গ্রন্থখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ও বিজ্ঞান।—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনাথ-নাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ নং ক্লাইভ রো কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁহার অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের বলে পুরাণ ও বিজ্ঞানের ছায়ায় সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

কর্ম্মফল। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় প্রণীত। প্রকাশক, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই বৌদ্ধ মতবাদের সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকার কর্ম্মফল নামে একটি বৌদ্ধ আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন। সেটি উপন্যাস নয়, আখ্যায়িকা মাত্র; তবে আখ্যায়িকাটি ঠিক অনুবাদও নয়। উপাখ্যানটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং লেখক তাহাতে কোনরূপ উচ্ছ্বাস বা বাক্যের আড়ম্বর বিন্যাস করেন নাই। এই 'উপখ্যানটির' ঐ হিসাবে মূল্যও আছে যথেষ্ট; উপখ্যানটি হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতির প্রচুর পরিচয় পাই—, বৌদ্ধযুগের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন একটি লৌকিক আদর্শেরও সন্ধান মিলে। এ আদর্শটি বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ—স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির উপর জন-সাধারণের মতের প্রাধান্য ও প্রভাব এই উপাখ্যানে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে, অথচ এ আদর্শের ভিত্তি ইতিহাস; কল্পনা নয়।

নূতন উপনিবেশ। শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ছয় আনা। এখানি ছেলে-মেয়েদের জন্য রচিত গল্পের বই। গল্পটি মামুলি রূপকথা নয়; জন্তু-জানোয়ার লইয়া লেখিকা ইহাতে নূতন রকমের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। রচনার ভঙ্গী সহজ, সরল, ছেলেমেয়েরা পড়িয়া বিশেষ কৌতুক ও আনন্দ বোধ করিবে। কয়েকখানি ছবিও বইয়ে আছে—ছবিগুলি চমৎকার হইয়াছে। বহিখানির ছাপা-কাগজ ভালো।

ষড় অবতার। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্ কলিকাতা। ষ্টাণ্ডার্ড ড্রগ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে ছয়টি ছোট গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। ছোট গল্প বলিলে যাহা বুঝি এগুলি সে শ্রেণীর নয়। ছোট গল্পের মাপ-কাঠিতে মাপিলে এগুলির যাচাই ঠিক হইবে না; খোস গল্পের হিসাবে বঙ্গিব, নতুন জামাই ও গোড়ায় গলদ গল্প দুইটি বেশ কৌতুক-কর, মজার। তবে গোড়ায় গলদে আইনের প্রকটু গলদ আছে,—পুলিশের কাছে চুরির নালিশ করিয়া মামলা চালাইব না বলিলেই কাজ চোকে না, মিথ্যা নালিশ করার চার্জ্জে পড়িতে হয়; গল্পের শেষে নায়ক যত সহজে আপনাকে রেহাই দিয়াছেন, তত সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। 'বিষম স্বদেশী' গল্পে মজা আছে বটে, তবে সমরেন্দ্রর আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কোন কারণ পাওয়া যায় না, কারণ দেওয়া উচিত ছিল। "কলির কানাই","খুড়োর বরাত" ও "নকলে আসল" গল্প তিনটি বিশেষত্ব-হীন। বহিখানির ছাপা-কাগজ ভালো।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

চক্র

৬

কিসে যে কি ঘটিয়া যায় কেহ জানে না। সেই যে সেদিনকার ঐ ঘটনাটা ঘটিল, ইহার পূর্ব্বে এমন কাণ্ড ত কতই হইয়া গিয়াছে। ঝগড়া-ঝাঁটি নালিস ফরিয়াদ এ বালক-দম্পতীর মধ্যে সেই বিবাহের রাত্রি হইতে কবেই বা না হইয়াছিল? তবে এবারই বা কি এমন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে যে তার জন্য সবটাই ওলোটপালোট হইয়া যায়?

সেই যে সেদিন ঊর্ম্মিলা শ্বশুরকে ঘড়ি ভাঙ্গার কথা জানাইয়া স্বামীকে লাঞ্ছিত করাইয়াছিল তাহার পক্ষে এ কিছু নতুন নয়;

এমন কতবারই হইয়াছে, কিন্তু এবারে এ কাজটা সে যে কি অশুভক্ষণেই করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা তাহার ভাগ্য-নিয়ন্তা যিনি তাহার বুদ্ধিকে ওই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনিই জানেন; তবে ইহার ফলটা যে অকস্মাৎ এতখানি কটু হইয়া দেখা দিবে সে যদি সে বিষয়ে একটু সন্দেহ রাখিত তো নিশ্চয়ই এমন কর্ম্ম সে করিতে যাইত না। সেই যে সেদিন সুগভীর ঘৃণাভরে গুপ্তচর বলিয়া বিনয় তাহাকে নিজের ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ঊর্ম্মিলার দুই পায়ে কে যেন জোর করিয়া একগাছা মোটা লোহার বেড়ি আঁটিয়া দিয়াছে। বিনয় সেই একটিবার মাত্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া বিদ্যুতের ঝিলিক হানিয়াই সেই যে আবার পিছন ফিরিয়া বই লইয়া বসিয়াছিল, সেই যে বিদ্যুৎ সে হানিয়াছিল তার কাছে জগতের আর কোন রকমের মৃত্যুবাণই বেশী নির্ঘাত নয়। শুনা যায় তাড়িতের প্রবাহের মতন অত শীঘ্র মানুষ মারিবার শক্তি নাকি আর কাহারও নাই! বিদ্যুৎস্পর্শে এক মুহূর্ত্তের চেয়েও অল্প সময়ে দেহের প্রত্যেক লোমকূপটিকে পর্য্যন্ত স্থির রাখিয়াই জীবন চলিয়া যায়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবার মত কেহ সেখানে ছিল না তাই, থাকিলে দেখিতে পাইত যে এই মেয়েটীরও অবস্থা ঠিক সেই রকমই হইয়াছে। ওই একটী মুহূর্ত্তের প্রচণ্ড তিরস্কারের অযথা লজ্জায় তাহার বুকটা যেন কালো হইয়া পুড়িয়া গেল তাহাকে মরিয়া যাইবার জন্য যেন প্রলয়-ঝড়ের গর্জ্জনেই অনুজ্ঞা প্রদান করিল! এর চেয়ে সে যদি ছুটিয়া আসিয়া তাহার কর্ণভূষা-সমেত কানদুইটা বেশ কঠিন হস্তে মুচড়াইয়া ধরিত,—যেমন কতবারই করিয়াছে—চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া পিঠে অজস্র ধারায় কিল-ঘুষি লাগাইত—বুঝি, ঠিক এইটী ছাড়া আর যা-কিছু করিত, তাহাতে ঊর্ম্মিলাকে এমন করিয়া মরার বাড়া হইতে হইত না। কতক্ষণ সে সেই দরজাটা ধরিয়া আড়ষ্ট আকাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—সে যে কতটা সময়, সে অনুভব-শক্তিও বোধ করি ঠিক তাহার ছিল না। তারপর সেইরূপ থাকিয়া অনেকক্ষণ পরে কতকটা আত্মস্থ হইয়া যখন সে মুখ তুলিল, তখনও তাহার আততায়ীকে তাহার সেই নিজস্থানেই ঠিক সেই একই অবস্থায় নিবিড় মনোযোগের সহিত পাঠমগ্ন দেখিয়া সহসা তাহার সেই মৃত্যুবাণাহত অন্তরের উপর যেন আবার একবার নূতন করিয়া তপ্ত শেলের আঘাত লাগিল। এই অকথ্য লজ্জার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এবার সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া একেবারে অন্ধকারে বিছানার মধ্যে শুইয়া পড়িল।

বিপিনবাবুকে আজ আর কেহ আহার করিতে ডাকে নাই। জগদ্ধাত্রী কাজকর্ম্মের তদারক সারিয়া মালা লইয়া যেমন বসেন, তেমনি বসিয়াছিলেন, উঠিবার কোন তাগিদ নাই। মালার পর মালা ফিরিয়াই চলিল। বামুন-মেয়ে রান্নাঘরে রান্না সারিয়া ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে বিরক্তিতে অস্থির হইতেছে, শেষকালে আর থাকিতে না পারিয়া রান্নাঘরে ঝীকে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া গৃহিণীর উদ্দেশ্যে উঠিয়া আসিয়া

হাঁক পাড়িল, "বলি, হ্যাঁগা মা, আজ আমাদের বৌরাণী কি বাড়ী নেই? সব খাওয়া-দাওয়া হবে কখন?"

গৃহিণীরও মনটা যেন এই রকম একটা কিসের সন্দেহের আমেজে জপের সংখ্যা ভুল করিতেছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ 'নামের' মালা যোড়-কর-শুদ্ধ মাথায় ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং আহ্নিকের সজ্জা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে প্রশ্নের উত্তরে ঈষৎ চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন, "কি জানি মেয়ে, আমিও তো তাই ভাবচি। বলি, পাগলীর বেটী আজ গেল কোথায়?"

তল্লাসে যখন জানা গেল যে ঊর্ম্মিলা তার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিত, তখন গৃহিণীর আর ভয়-ভাবনার পরিসীমা রহিল না। ওই দস্তি মেয়েটীর চক্ষে ঘুম যে কত দুঃখেই আনিয়া দিতে হয়, সে ত তাঁহার বিলক্ষণই জানা আছে, নিশ্চয়ই বড়-বেশী অসুস্থ হইয়াই সে এমন অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে! স্থূল শরীর ও ব্যস্ত মন লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরতলায় উঠিয়া "ঊর্ম্মিলা" "ঊর্ম্মিলা" হাঁক পাড়িতে পাড়িতে তিনি তাহার ঘরে আসিলেন। ঊর্ম্মিলা বোধ করি ঘুমাইয়া ছিল, ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; এমনভাবে গা ভাঙ্গিয়া নিদ্রালস-জড়িত কণ্ঠে "উঁ" বলিয়া একটা উত্তর দিয়াই সে আবার ভালো করিয়া শুইল এবং শাশুড়ীর অজস্র প্রশ্নের অনুরোধের শাসনের উত্তরে শুদ্ধমাত্র জবাব দিল যে, তার বড় অসুখ করিতেছে; সে আজ খাইবে না, উঠিবে না।

মা গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নে বাপু, ভঙ্গি রাখ্, গা'তো তোর কন্‌কন্ করছে। অসুখ হয়েছে না ছাই হয়েছে। সারাদিন দস্যিবৃত্তি করিস, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিস্। ওই জন্যেই তো বলি বাছা যে, বড় হচ্চিস্, দুপুর বেলা আমার কাছে এসে দুদণ্ড শো' বোস্, তা ত তোর কুষ্টিতে লেখেনি!"

ঊর্ম্মিলা শাশুড়ীর হাতখানা অঙ্গ হইতে ঝটকা দিয়া সরাইয়া দিল এবং একটু চুপ হইয়া থাকিয়া পরে বলিল, "জ্বর তো আর আমার হয়নি যে গা হাতড়াচ্চো! আমার পেট ব্যথা করচে।"

গৃহিণীর বিলম্ব দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বামুন-মেয়ে উঁহাদের সন্ধানে আসিয়া এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়াছিল, সে অমনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কামড়াবে না পেট! বলি, পেট তো আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ নয়, যে যা খুসী তাতে ভরে দিলেই হলো! বলবো কি মা, তোমায় বল্লে না পেত্যয় যাবে, দাদাবাবু আর এই আমাদের বৌ-রাণীটী মা আর জন্মে যে কে ছিলেন তা দেবতারাই জানে, এমন-সব অখাদ্যি দেখিনে যা ওঁদের পেটে যায় না। কাল দেখি না আমড়া পাতাগুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে নুন দিয়ে খেতে লেগেছেন। আমি বারণ করলুম বলে বৌরাণী তো আমায় ভেংচে ঠেংরে এক করলে, দাদাবাবু আবার বলে কি, জানো? বলে কি না, খেয়ে দেখতো বামুন-মেয়ে, এ খেলে আর কখনো ভুলতে পারবে না। তা ও-সব খেলে আর পেট-ব্যথা—"

ঊর্ম্মিলা হাত-পা ছুঁড়িয়া অধৈর্য্য সহকারে চেঁচাইয়া উঠিল, "মাগো, বাবাগো, সব্বাই মিলে এই ঘরের মধ্যে চেঁচাতে ঢুকলো! যাও

শীগ্‌গির, না হলে আমি ছাদে গিয়ে দোর বন্ধ করে শুয়ে থাকবো, তা বলে দিচ্ছি। অসুখ করেচে বল্‌চি, তা একটু ঘুমতে দেবে না।"

জগদ্ধাত্রী একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাহলে একটু জোন্‌-সুনে খা দেখি, না হয় তো—"

বধূ এবার উঠিয়া বসিয়া সরোদনে "না হয় তো খানিকটা উনুনের ছাই এনে দাও, খাচ্চি—"বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া পুনশ্চ বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিল; এবং কান্না-ভাঙ্গা স্বরে বলিতে লাগিল, "বলচি আমার কিছু ভালো লাগচে না, আমায় ছেড়ে দাও, সে হবে না। আমার অত আদরে দরকার নেই, যাও দেখি তুমি আমার ঘর থেকে।"—বলিতে বলিতেই পুনশ্চ দ্বিগুণ বেগে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন অপ্রতিভের এক-শেষ হইয়া স-পার্ষদ গৃহকর্ত্রী বধূর ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু সে রাত্রের অবশিষ্ট কাজ-কর্ম্মের মধ্যে আর যেন তিনি নিজের মনটাকে কোনমতেই লাগাইতে পারিলেন না। কর্ত্তা সন্ধ্যাবেলায় আপিস খাইতে পান নাই, তাঁহার শরীর বিষম বে-এক্তার হইয়া রহিয়াছে—পদসেবা হয় নাই, বাতের শরীর, ব্যথায় আড়ষ্ট, তার উপর বধূর অসুস্থতার সংবাদ, মনটা যেন তাঁহার কি রকম হইয়া গেল। খাওয়ার মধ্যে কোন রসই পাইলেন না,—সাতবার করিয়া গৃহিণীকে বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁগা, পাগলী বেটির যদি সত্যি সত্যি বেশী অসুখ হয়? হ্যাঁগা হরিদাস ডাক্তারকে না হয় একবার ডাকাওই না।"

গৃহিণীর মনটা এ-রাত্রে শুধু একটু পেট ব্যথার জন্যে ডাক্তার ডাকার হাঙ্গামা আর পোহাইতে দিল না। তিনি বলিলেন, "দেখা যাক, চুপ করে থেকে ঘুমিয়ে যদি সেরে যায় তো আর অত নেঠা কেন?"

কেবল বিনয়ই শুধু এ বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিন্তভাবে আহার-কার্য্য সমাধা করিয়া নিজের স্বতন্ত্র শয়নাগারে নিদ্রা দিতে চলিয়া গেল।

৭

ইহার পর হইতে চক্রের গতি যে কেমনই সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে যেন এক ইন্দ্রজাল! ঊর্ম্মিলা সে দিনের সেই অপ্রত্যাশিত দুঃসহ লজ্জার বেদনায় এমনই মুষড়িয়া পড়িল এবং নিজের মনের সঙ্কোচে বিনয়ের সান্নিধ্যকে এমন করিয়াই পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, এক এক সময়ে তাহার নিজের কাছেই এটা আশ্চর্য্য প্রহেলিকার মত ঠেকিল। বিস্ময়ে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যা কেহ কখন পারে নাই, কেমন করিয়া সে এই এত বড় দুরূহ কার্য্য আপনা হইতে সে করিতে পারিতেছে; ইহা ভাবিতে গিয়া তাহার বুকের মধ্যটা যেন এক প্রচণ্ড ব্যথায় টনটন করিতে থাকে; কতবারই বিষয়টাকে অবজ্ঞায় ঠেলিয়া ফেলিয়া চিত্তকে লঘু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে, মনে মনে হাসিয়া নিজেকে ভীরু বলিয়া গালি দিয়াছে, নিতান্ত সহজভাবেই ঝড়ের মত ছুটিয়া বিনয়ের পাঠাগারে ঢুকিয়া পড়িয়া ভালোয়-মন্দে কলহে-কাতরতায় এই বিষম অভিশপ্ত মৌন-বিদ্রোহের একটা চরম নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার জন্য যে সে নিজের সমস্ত শরীর-মন-প্রাণকে কিরূপ উদ্‌গ্র

আগ্রহে উন্মুখ করিয়া ধরিয়াছে, তাহা তাহার অন্তর্যামী ব্যতীত বুঝি সে নিজেও তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারে নাই। কিন্তু সেই যে সেদিনের বজ্রপাত করিবার পর হইতেই বিনয়ের মুখখানা নিরেট মেঘের মতই কঠিন হইয়া আছে, অতি গোপন সন্তর্পণে সেই মুখখানার দিকে চোখ তুলিলেই ঊর্ম্মিলার অটল হৃদয় কেনই যে পদ্মপত্রের সঞ্চিত জল-বিন্দুর মত টলমল করিতে থাকে সে কথাও ঠিক বুঝা যায় না। আসল কথা যে কখনো সত্যকার পাপ করে নাই, সে যদি একটা যথার্থ অন্যায় আচরণ করিয়া বসে তো তার শাস্তি যতটা বাহির হইতে সে পায়, তদপেক্ষা শতগুণ ভোগ করিয়া থাকে সে নিজের মনে! এই যে অজ্ঞাত তাড়না সে অহরহ ভোগ করিয়া চলিল, এটা বিবেকের তাড়না।

আবার ও দিকে ইংলণ্ড প্রভৃতির ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডের বহর দেখিয়া সে সম্বন্ধে বিনয়ের মতটাও বেজায় কড়া হইয়া উঠিয়াছিল। সে একেবারে বজ্রের মত কঠিন হইয়াই স্থির করিল যে, এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য ইতিহাস-সম্মত ভাবে যখন প্রাণদণ্ড দিবার উপায় নাই, তখন অন্ততঃ উহারই কাছাকাছি পৌঁছানো প্রয়োজন। গুপ্তচরকে ছেলেরা একেই একটু বিশেষরূপে ঘৃণা করিয়া থাকে, তার উপর বিনয়ের আবার সেই ঘৃণার মাত্রা একটু অতিরিক্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তার উপর আবার যখন সে দেখিল দিনের পর দিন কাটিলেও সেই অপরাধিনী ঘৃণিত জীব তাহার দুই পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে আসিল না, বরং তেজ দেখাইয়া সরিয়া রহিল, তখন সে সেই অন্তরস্থ তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের বশে একরকম পাগল হইয়াই নিজের মনের কাছে শপথ করিয়া বসিল যে এ-জন্মে আর কখনো ঊর্ম্মিলাকে তাহার ক্ষমা করা হইবে না এবং এই প্রতিজ্ঞার পর হইতেই অসম্ভব মনোযোগ-সহকারে সে বিদ্যালাভে যত্নবান হইয়া বহি ঘাঁটিয়া বহি পড়িয়া গৃহবাসী সকলের ও স্কুল-মাষ্টারদের চমক লাগাইয়া দিল।

ইহার পূর্ব্বে আর কখনো তো এমন ঘটে নাই, তাই এত-বড় কাণ্ডটা ঘটিতে থাকিলেও এই বালক-দম্পতীর প্রবীণ অভিভাবকদ্বয়ের চিত্তে কোন সন্দেহের রেখাপাত করিতে পারে নাই। ঊর্ম্মিলা মুখ ফুলাইয়া থাকে, বেশীর ভাগ সে বিছানাতেই পড়িয়া থাকে, এই বলে পেট ব্যথা, এই বলে মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ গেল; ভালো কথাটি বলিতে গেলেও কাঁদিয়া ফেলিয়া দশটা মন্দ কথা শুনাইয়া দেয়; শ্বশুর-শাশুড়ী তো বউ লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ছেলের যে আজকাল পাঠা-পুস্তকে অখণ্ড মনোযোগ সঞ্চার হইয়াছে, কোনোরকম বদমায়েসীর মধ্যেই আজকাল আর তাহার সাড়া পাওয়া যায় না; হঠাৎ একদিন এই তত্ত্বটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যখন ইহার মূল তথ্যটা যে তাহার ঘাড়ের অবিদ্যাটার স্কন্ধ ত্যাগ করাইয়াছে এ টুকুও জানিতে বাকি রহিল না,—তখন এই একমাত্র কারণেই শুধু প্রিয়তমা বধূটীর 'রুগিয়া' পড়াটাকে তাঁহারা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইতে পারিলেও মনে মনে তাহার জন্য তাঁহাদের আর উদ্বেগের অন্ত রহিল না। রোগের কষ্টেই যে সে তাহার স্বামী-রত্নটীকে ভূতের মত অনুসরণ করা হইতে মুক্তি দিয়াছে,

এ বিষয়ে সন্দেহের ছিলই বা কি? ইহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ যে কবি-বাক্যকে সার্থক প্রমাণ করিয়া তাহাদের "যখন হতো ঝগড়া-ঝাঁটি, হতো প্রায়ই লাঠালাঠি,—গতিক দেখে ছুটোছুটি পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকতো"—গোছের হইয়াছে। আজ সহসা তাহারা এত কি বড় হইল যে—

বিনয় আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি শিবপুরে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারীং পড়তে চাই, আমাদের স্কুল থেকে চারজন ছেলেকে পাঠাচ্চে, আমারও খুব জানা আছে, যেতে দিন।"

বিপিন-শীল ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরামর্শ করিয়া স্কুলের হেড-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া অনুমতি দিয়া ফেলিলেন।

জগদ্ধাত্রী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলিলেন, "হ্যাঁগা, ছেলেটাকে আবার তুমি কাছ-ছাড়া করতে চাইচো! তোমার কি ভয় নেই প্রাণে একটুও!"

বিপিনবাবু মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সন্দিগ্ধভাবে বলিতে লাগিলেন, "সে ত বটেই, সে ত বটেই; কিন্তু কি জানো, ছেলেটা পড়াশোনায় তো তেমন নয়, অথচ এদিকে বেশ একটু শক্তি আছে, দেখলে না, সেদিন চট্ করে সেই ভাঙ্গা ঘড়িটাকেই কেমন কাজ-চলা-গোছ মেরামত করে ফেল্লে! আর ওর মাষ্টাররাও সব্বাই বলচেন যে ওদিকে ওর যখন একটা স্বাভাবিক শক্তিই রয়েছে, আর ও বিষয়ে আবার এমন একটা সুযোগও উপস্থিত, তখন আর বাধা দেওয়াটা উচিত হয় না। দেখ, গোবিন্দ কি আর গোরে-বারেই আমাদের কাঁদাবেন! তাঁর নাম নিয়ে যাতে ওর মঙ্গল হয় তাই হতে দাও।"

তথাপি মায়ের মন প্রবোধ মানিল না। মা ছেলের কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "আমি কাকে নিয়ে থাকবো রে? তোর মুখ দেখেই যে শুধু পাষাণে প্রাণ বেঁধে রয়েছি।"

ছেলে হাসিমুখে জবাব দিল, "কেন, তোমার তো আর একজন রয়েছে। আমায় যেতেই হবে।"

শুনিয়া ঊর্ম্মিলা চিলের ছাদের পাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া খানিক কাঁদিল, তারপর দিনে রাত্রে এদিক-সেদিকে উস্‌খুস্ করিয়া ফিরিতে লাগিল যে, যদি এই বিদেশ-যাত্রা উপলক্ষেও তাহাদের মধ্যকার এই সহসাগত অথচ ইহারই মধ্যে যেন প্রায়দুর্লভ বিরাট মৌনতার নির্ম্মম প্রাচীরটা কোন মতে ভাঙ্গিয়া পড়ে! যদি তেমন ঘটিতে পারে, তবে বুঝি ঊর্ম্মিলার কাছে এই দীর্ঘদিনের ছাড়াছাড়ির নিদারুণ ভীতিও আনন্দ-সংবাদের মতই মধুর হইয়া ওঠে!

কিন্তু তাহা ঘটিল না। ঊর্ম্মিলার বিষম লজ্জার বেদনাকে প্রচণ্ড গর্ব্ব বলিয়া ভুল করিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিক গুপ্তচরের কার্য্যের সহিত তুল্য করিয়া তুলিয়া বিনয়কুমার স্ত্রীর নিকটে নিষ্ঠুর নিঃশব্দ বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবপুর যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ লালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

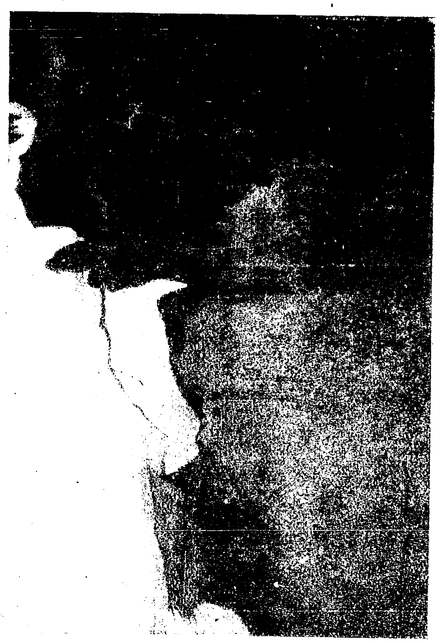

সন্ধ্যার পাখী

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র দে অঙ্কিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৭ [১২শ সংখ্যা

অবতার

১০

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ খানসামার পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল। অক্টেভ আপনাকে বাড়ীর মালিক মনে করিলেও, বাড়ীর মধ্যে খাবার ঘরটা কোথায়, সে জানিত না। খাবার-ঘরটা খুব বড়—একতালায় অবস্থিত। সেখান হইতে প্রাঙ্গণ দেখা যাইতেছে। দেয়ালে সুন্দর ঘর-কাটা-কাটা কাঠের কাজ। দেয়ালের গায়ে ঋতুর পর্য্যায়-অনুসারে প্রত্যেক ঋতু-সুলভ শিকার-লব্ধ হত জীব-জন্তুর দেহাবশেষের নিদর্শনসকল রক্ষিত হইয়াছে। ভোজন-শালার দুই প্রান্তে বড় বড় কাষ্ঠমঞ্চ, তাহার উপর লাবিন্স্কি-বংশের পুরাতন রূপার বাসন-কোসন সাজান রহিয়াছে। দেয়ালের দুই ধারে সারি সারি সবুজ মরক্কো চর্ম্মে মণ্ডিত কেদারা। ঘরের মাঝখানে খোদাই-কাজ-করা পায়া-বিশিষ্ট খাবার-টেবিল। মাথার উপরে একটা বৃহৎ বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলিতেছে।

টেবিলের উপর, রুশীয় পরিবেশনের ধরণ-অনুসারে একটা নীল রজ্জু-ঘেরের মধ্যে নানাবিধ ফল পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিত এবং মাংসাদি সমস্ত রান্না ঢাকনি-ঢাকা বাসনের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। পালিস-করা ধাতব ঢাকাগুলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। টেবিলের মুখামুখী দুই আরাম-কেদারা;—তাহার পিছনে দুইজন খানসামা নিশ্চল ও নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান—ঠিক্ যেন সাক্ষাৎ গার্হস্থ্যের দুই পাষাণ-মূর্ত্তি।

অক্টেভ ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি এক নজরে দেখিয়া লইল; পাছে এই-সব অপরিচিত নূতন সামগ্রী দেখিয়া তাহার মুখে কখন অনিচ্ছা-ক্রমেও বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পায়। এমন-সময় পাথরের মেঝের উপর হইতে একটা সর্ সর্ শব্দ,—রেশমি-কাপড়ের একটা খস্‌খস্ শব্দ উঠিল। অক্টেভ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন,—কৌণ্টেস্ আসিতেছেন। অক্টেভ বসিলে পর, বন্ধুভাবে অভিবাদনস্বরূপ

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ছোট-খাটো ইঙ্গিত করিয়া, তিনিও বসিলেন। কৌণ্টেশ্ একটা রেশমী পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন। কপালের দুই পাশে রাশীকৃত কেশ-গুচ্ছ একটা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জরি-জড়ান বেণীর আকারে গ্রীবাদেশে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখের স্বাভাবিক গোলাপী রং, গত-রাত্রির মনের আবেগে ও নিদ্রার ব্যাঘাতে একটু ফ্যাঁকাশে হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে চোখ্ সচরাচর কেমন শান্ত ও নির্ম্মল—সেই চোখের চারিদিকে ঈষৎ কালিম রেখা পড়িয়াছে। তাঁহার মুখে একটা শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্ন ঢুলু ঢুলু ভাব লক্ষিত হইতেছে। এইরূপ ম্লান আকার ধারণ করায় তাঁর সৌন্দর্য্যচ্ছটা যেন আরও মর্ম্মভেদী হইয়াছিল; তাহাতে যেন একটু মানবী ভাব আসিয়াছিল। এখন যেন সামান্য রমণী হইয়া পড়িয়াছেন; স্বর্গের পরী পাখা গুটাইয়া উড্ডয়নে বিরত হইয়াছেন।

অক্টেভ এইবার একটু সাবধান হইয়াছে, সে তাহার চোখের আগুনকে ঢাকিয়া ও মনের উচ্ছ্বাসকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া একটা ঔদাসীন্যের ভাব ধারণ করিল। জ্বরের ঈষৎ কম্পনের ন্যায় স্কন্ধদেশ একটু নাড়াইয়া কৌন্‌টেশ তাঁহার স্বামীর উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এখন তিনি অক্টেভ্‌কে আপন স্বামী বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। কেন না রাত্রে যে-সব ভয়-ভাবনা, পূর্ব্বসূচনা, বিভীষিকা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, দিবালোকে সে-সব অন্তর্হিত হইয়াছে। কৌণ্টেশ কোমল মধুর স্বরে সতী স্ত্রীর সমুচিত একটু 'আদুরে-পনা' করিয়া পোলাণ্ড দেশের ভাষায় অক্টেভকে কি-একটা কথা বলিলেন!!!

মন-খোলাখুলি মধুর ঘনিষ্ঠতার সময়, বিশেষতঃ ফরাসী ভৃত্যদের সন্নিধানে কৌণ্টেশ অনেক সময় কৌণ্টের মাতৃভাষায় কৌণ্টের সহিত কথা কহিতেন। ফরাসী ভৃত্যেরা পোলোনী ভাষা জানিত না।

প্যারিস নগরবাসী অক্টেভ, লাটিন ভাষা স্পেনীয় ভাষা ও ইংরেজীভাষার কতকগুলি শব্দ জানিত; কিন্তু 'শ্লাভ্'-জাতির ভাষা মোটেই জানিত না। পোলোনী ভাষায় স্বরবর্ণের বিরলতা ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রাচুর্য্য থাকায় ইচ্ছা করিলেও তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারিত না। ফ্লোরেন্স নগরে কৌণ্টেশ অক্টেভের সহিত বরাবর ফরাসী কিংবা ইটালীয় ভাষাতেই কথা কহিতেন।

ঐ পোলীয় ভাষায় কথিত বাক্য, কৌণ্টদেহ অক্টেভের মস্তিষ্কের ভিতরে গিয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল:—প্যারিস্-বাসী ফরাসীর অপরিচিত ও অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনিসমূহ "শ্লাভ"-জাতীয় কাণের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের এমন জায়গায় পৌঁছিল, যেখানে ওলাফের আত্মা উহা গ্রহণ করিয়া চিন্তার আকারে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং একপ্রকার ভৌতিক ধরণের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল, ঐ সকল ধ্বনির অর্থ গোলমেলে-ভাবে অক্টেভের মাথায় আসিল; শব্দগুলা মস্তিষ্কের পাকচক্রের ভিতর দিয়া স্মৃতির গুপ্ত দেরাজের মধ্যে আসিয়া গুণ গুণ করিতে লাগিল—যেন উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু সাক্ষাৎ 'আত্মার সহিত ঐ সকল অস্পষ্ট পূর্ব্বস্মৃতির যোগাযোগ না হওয়ায় উহা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল।

আবার সমস্ত অস্বচ্ছ হইয়া পড়িল।

প্রেমিক বেচারা ভয়ানক মুস্কিলে পড়িল। কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্‌স্কির শরীর গ্রহণ করিবার সময় অক্টেভ এই-সব গোলযোগের কথা ভাবে নাই। এখন বুঝিতে পারিল, অন্যের শরীর ধারণ করায় অনেক বিপদ আছে।

কৌণ্টেশ অক্টেভের নীরবতায় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, আর কোন চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত হওয়ায় হয় ত অক্টেভ তাঁর কথা শুনিতে পায় নাই; এই মনে করিয়া কৌণ্টেশ সেই বাক্যটা আবার খুব ধীরে ধীরে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন।

ঐ শব্দগুলার ধ্বনি শুনিতে পাইলেও, অক্টেভ এখনো উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। উহার অর্থটা ধরিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। কোন ফরাসী, ইটালীর ভাষার কথা আন্দাজে কিছু কিছু বুঝিতেও পারে, কিন্তু নীরেট ধরণের পোলীয় ভাষার সম্বন্ধে সে একেবারেই বধির।—অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাহার গাল লাল হইয়া উঠিল, নিজের ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল, এবং মুখরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়া প্রচণ্ডভাবে প্লেটের মাংসখণ্ড কাটিতে আরম্ভ করিল।

কৌণ্টেশ বলিলেন—(এইবার ফরাসী ভাষায়):—

"ওগো! তুমি দেখ্‌ছি আমার কথা শুন্‌চ না, কিংবা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চ না, হ'ল কি তোমার?..."

কৌণ্টদেহ অক্টেভ কি বলিবে ঠিক্ করিতে না পারিয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল:—এই লক্ষ্মীছাড়া ভাষাটা এমন শক্ত!

—শক্ত! হাঁ, বিদেশীর কা[illegible] শক্ত ঠেকতে পারে, কিন্তু ঐ ভাষা যাকে মায়ের কোলে আনন্দ দিয়েছে, প্রাণ-বায়ুর মত প্রবাহের মত যার মুখ দিয়ে আজন্ম নিঃসৃত হয়েছে, তার পক্ষে এই ভাষা শক্ত নয়।

—হাঁ, সে কথা সত্যি, কিন্তু এমন এক এক মুহূর্ত্ত আসে যখন আমার মনে হয় ঐ ভাষা আমি কিছুই জানি না।

—তুমি কি-বল্‌চ ওলাফ? কি! তোমার পিতৃ-পিতামহের ভাষা, তোমার পবিত্র জন্ম-ভূমির ভাষা, যে ভাষায় তোমরা স্বজাতীয় ভাইদের চিন্‌তে পার, যে ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে আমাকে বলেছিলে—"আমি তোমায় ভাল বাসি," সেই ভাষা তুমি ভুলে যাবে, এ কি সম্ভব?

কৌণ্টদেহ অক্টেভ আর কোন সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—"আর এক ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায়"...

এবার ভর্ৎসনার স্বরে কৌণ্টেশ বলিলেন—

"ওলাফ, আমি দেখ্‌ছি প্যারিস্ তোমাকে বিগড়ে দিয়েছে; সেই জন্যেই তখন প্যারিসে আস্‌তে আমার ইচ্ছে ছিল না। তখন কে জান্‌ত যে মহামহিম কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি যখন তাঁহারা স্বরাজ্যে ফিরে যাবেন, তখন তাঁর প্রজাদের অভিনন্দনে তিনি নিজ ভাষায় উত্তর দিতে পারবেন না?"

কৌণ্টেশের সুন্দর মুখখানি একটু বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। দেবীপ্রতিম নির্ম্মল ললাটে এই সর্ব্বপ্রথম একটা দুঃখের ছায়া পড়িল। এই অদ্ভুত বিস্মৃতি, তাঁহার আত্মার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল; ইহাকে তিনি এক-প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করিলেন।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আহারের অবশিষ্ট সময়টা নিস্তব্ধভাবে অতিবাহিত হইল। কৌণ্টেশ, যাকে কৌণ্ট মনে করিয়াছিলেন সেই অক্টেভের উপর অভিমান করিলেন। অক্টেভের মনে এখন একটা বিষম যন্ত্রণা হইতেছিল; তার ভয় হইতেছিল, পাছে তার উত্তর দিতে না পারে।

কৌণ্টেশ গাত্রোত্থান করিয়া আপন মহলে চলিয়া গেলেন।

অক্টেভ এখন একলা,—একটা ছুরির বাঁট লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতেছিল; এক-একবার ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ ছুরি নিজের বুকে বসাইয়া দেয়;—তার অবস্থাটা এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, হঠাৎ এক নূতন জীবন-ক্ষেত্রে সে প্রবেশ করিবে; কিন্তু এখন দেখিল, এই অজ্ঞাত জীবনের অন্ধিসন্ধি তার জানা নাই; কৌণ্ট ওলাফের শরীর ধারণ করিতে গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধারণা ও সংস্কার, নিজের ভাষা, শৈশবের সমস্ত স্মৃতি, মানুষের 'আমি' জিনিসটা যেসকল অসংখ্য খুটিনাটি দিয়া গঠিত, নিজের অস্তিত্ব যাহা অন্যান্য অস্তিত্বের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ—এই সমস্ত বিসর্জ্জন করা আবশ্যক; এবং এই সমস্তের জন্য ডাক্তার বাল্‌থাজার-শেরবোনোর বুজ্‌রুগি যথেষ্ট নহে। এ কি বিড়ম্বনা! এই স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম, অথচ উহার দ্বারদেশ দূর হইতেও দেখা আমার পক্ষে একপ্রকার ধৃষ্টতা! কৌন্‌টেসের সহিত এক গৃহে বাস করিব, তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার সহিত কথা কহিব, অথচ তাঁর সতীত্বের লজ্জা ভাঙ্গিতে পারিব না, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে এক-একটা মূঢ়তার কাজ করিয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ফেলিব! কৌণ্টেশ আমাকে কখনই ভালবাসিবে না—ইহা আমার অখণ্ডনীয় অদৃষ্টের লিপি! তথাপি মানব-গর্ব্বকে ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া আমি যার-পর-নাই ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছি। আমি নিজের 'আমি'কে বিসর্জ্জন দিয়া, অপরের শরীর ধারণ করিয়া অন্যের প্রাপ্য আদর-যত্ন দাবী করিতে সম্মত হইয়াছি!"

অক্টেভের মনে-মনে এইরূপ স্বগতোক্তি চলিতেছিল। এমন সময় একজন সহিস্ আসিয়া মাথা নোয়াইয়া গভীর ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিল:—

"আজ কোন্ ঘোড়াটা হুজুরকে এনে দেখাব?" প্রভু উত্তর করিতেছেন না দেখিয়া,—পাছে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, ভয়ে-ভয়ে—অতি মৃদুস্বরে গুজ্‌গুজ্ করিয়া সহিস্ আবার বলিল—"ভুল্‌টুর"কে আন্‌ব না "রোস্তমকে" আন্‌ব? আট দিন ওদের সোয়ারি হয় নি।"

এইবার অক্টেভ উত্তর করিলেন—"রোস্তমকে"।

অক্টেভ, স্নায়ুর উত্তেজনা মুক্ত-বায়ু সেবনে প্রশমিত করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া বোয়া-দে-বুলং-এ বেড়াইতে গেলেন।

রোস্তম উচ্চকুলোদ্ভব প্রকাণ্ড ঝাঁকালো ঘোড়া; তাকে কাঁটার আঘাতে উত্তেজিত করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। সে সোয়ারের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াবামাত্র তীরের মত ছুটিল। দুই ঘণ্টা প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি করিয়া, অশ্ব ও অশ্বারোহী প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল।

বেড়াইয়া আসিয়া অক্টেভের মস্তিষ্ক একটু ঠাণ্ডা হইল। ঘোড়ার নাসাদেশ রক্তিম হইয়াছে ও গাত্র হইতে বাষ্পধূম উত্থিত হইতেছে।

তথা-কথিত কৌণ্ট, কৌণ্টেশের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কৌণ্টেশ তাঁর বৈঠক-খানায় আছেন। একটা সাদা রেশমের পারচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। আজ কিনা বৃহস্পতি-বার; তাই আজ অভ্যাগত লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৃহেই আছেন।

একটু মধুর হাসি হাসিয়া—(অমন সুন্দর ওষ্ঠাধরে অভিমানের ভাব বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না) কৌণ্টদেহ অক্টেভ বলিলেন;—

"বোয়ার উপবন-পথে, ছুটাছুটি ক'রে তোমার স্মৃতি কি আবার ফিরে পেলে?"

অক্টেভ উত্তর করিল—

—"না, লাবেন্‌স্কি; একটা গোপনীয় কথা তোমার কাছে প্রকাশ করা আবশ্যক।"

—"আমি তোমায় গোপনীয় মনের কথা পূর্ব্ব হতেই কি সব জানিনে? আমাদের মধ্যে এখনো কি কিছু ঢাকাঢাকি আছে?"

—"যে ডাক্তারের কথা লোকের মুখে এত শোনা যায়, কাল আমি সেই ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

—"হাঁ, সেই ডাক্তার বাল্‌থাজার শেরবোনো যে অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিল। সে নাকি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে খুব আশ্চর্য্য গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছে। তুমি তাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আস্‌তেও চেয়েছিলে। কিন্তু ও-বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই; কেন না আমি বেশ জানি, তুমি আমাকে ভালবাস। এই বিজ্ঞানই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

—"তিনি আমার সাম্‌নে যে সব ব্যাপার পরীক্ষা প্রয়োগ করে' দেখিয়েছিলেন, আশ্চর্য্য কাণ্ড করেছিলেন, তাতে আমার মন এখনো বিচলিত হয়ে আছে। এই অদ্ভুত ডাক্তার কি-একটা অনিবার্য্য শক্তি প্রয়োগ করে' এমন-এক গভীর চৌম্বক-নিদ্রায় আমাকে নিমজ্জিত করলেন যে, যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন দেখি আমার সমস্ত মনো-বৃত্তি লোপ পেয়েছে। অনেক জিনিসের স্মৃতি আমার নষ্ট হয়েছে। আমার অতীতটা যেন একটা গোলমেলে কোয়াসার ভিতর ভাস্‌চে। কেবল, তোমার উপর আমার যে ভালবাসা—সেইটিই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।"

—"ওলাফ! তোমার ভারী ভুল হয়েছিল,—ঐ ডাক্তারের হাতের মধ্যে কি যেতে আছে? ঈশ্বর যিনি আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন, আত্মাকে স্পর্শ করবার অধিকার একমাত্র তাঁরি আছে। মানুষের এইরকম চেষ্টা করা মহাপাপ; আশা করি, তুমি আর কখনও সেখানে যাবে না। আর, যখন আমি পৌলীয় ভাষায় কোন ভালবাসার কথা বল্‌ব; তখন আশা করি তুমি আবার পূর্ব্বে-কার মত তা বুঝতে পারবে।"

অক্টেভ যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেছিল তখনই সে এই মৎলব আঁটিয়াছিল যে, ডাক্তারের চৌম্বক শক্তির দোহাই দিয়া তাহার এই-সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ-জনিত বিপদ হইতে সে আপনাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু এই

খানেই বিপদের শেষ হইল না।—একজন ভৃত্য, দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া খবর দিল।

"সাভিলের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ অক্টেভ।"

কোন-না-কোন দিন এইরূপ সাক্ষাৎকার ঘটিবে মনে মনে জানিলেও, ঐ সাদাসিধা শব্দগুলি শুনিবামাত্র প্রকৃত অক্টেভের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল; মনে হইল তাহার কাণের কাছে, হঠাৎ যেন "অন্তিম-বিচারের" তূরী-নিনাদ হইল। সাহসের উপর খুব ভর করিয়া, মনে মনে ভাবিল, এখনো এমন অবস্থা দাঁড়ায় নাই যাহাতে আপনাকে একেবারে নিরুপায় বলিয়া মনে হইতে পারে। অতর্কিতভাবে অক্টেভ একটা কৌচের পৃষ্ঠ-দেশ ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহ্যতঃ মুখে একটা শান্ত ও দৃঢ়তার ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

অক্টেভ-দেহধারী প্রকৃত কৌণ্ট ওলাফ কৌণ্টেশের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে খুব নত হইয়া অভিবাদন করিল।

অক্টেভদেহ কৌণ্ট, ও কৌণ্টদেহ অক্টেভ ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করিয়া দিয়া, কৌণ্টেশ বলিলেন;—

"ইনি লাবিন্‌স্কির কৌণ্ট—ইনি সাভিলের অক্টেভ—।"

এই দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠাণ্ডা ভাবে অভিবাদন করিয়া লৌকিক ভদ্রতার মুখসের ভিতর হইতে পরস্পরের প্রতি একটা চোরা কটাক্ষ হানিল।

চির-পরিচিত বন্ধুর ভাবে কৌণ্টেশ বলিলেন:—

"দেখ অক্টেভ, আমি যখন ফ্লরেন্সে ছিলাম তখন হতেই আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব। তোমার সেই বন্ধুত্বের বন্ধন এখনো পর্য্যন্ত একটুও শিথিল হয় নি। তুমি আমার সেই বাগান-বাড়ীতে তখন নিত্য যাতায়াত করতে। আমায় তুমি আপনাকে আমার বন্ধুবর্গের একজন ব'লে মনে করতে।"

অলীক অক্টেভ ও প্রকৃত কৌণ্ট একটু বাধো-বাধো স্বরে উত্তর করিলেন:—

—"দেখুন, কৌণ্টেশ, আমি অনেক ভ্রমণ করেছি, অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, এমন কি পীড়িতও হয়েছিলাম—আপনার সদয় নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে মনে করলাম, এই সুযোগ ছাড়ব কি না। কিন্তু আমার একটু আশঙ্কাও হ'ল, পাছে স্বার্থপর বলে আমার মত উদাস-চিত্ত ব্যক্তি আপনার নিকট গিয়ে আপনার অনুগ্রহের অপব্যবহার করে।"

কৌণ্টেশ উত্তর করিলেন:—

—"উদাস-চিত্ত? হ'তে পারে। না, না, উদাস-চিত্ত নয়। তুমি তখন বিষাদ রোগগ্রস্ত ছিলে। কিন্তু তোমাদের একজন কবি এই কথা বলেন নি কি?:—

"আলস্যের পরে ইহাই সব-চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি।"

অক্টেভ দেহধারী কৌণ্ট বলিলেন:—

"অন্যের দুঃখকষ্টে পাছে মমতা করতে হয় এই-জন্যই সুখী লোকেরা এই গুজব রটিয়েছে।"

কৌণ্টেশ অনিচ্ছাক্রমে তার মনে যে প্রেমের উদ্রেক করিয়াছিলেন তজ্জন্য যেন ক্ষমা চাহিতেছেন—এইভাবে কৌণ্টেশ অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্টের উপর একটি অতীব মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন:—

"তুমি যে-রকম মনে কর আমি ততটা মমতা-শূন্য লঘুচিত্ত নই। প্রকৃত দুঃখ দেখলে আমার হৃদয় হয়, আর সে দুঃখকষ্টের লাঘব না করতে পারলেও অন্তত তার জন্য সমবেদনা দেখাতে পারি। দেখ অক্টেভ, তুমি সুখী হও—এই ইচ্ছা আমি করতে পারতাম; কিন্তু কেন বল দেখি, তুমি নিজের বিষণ্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে একগুঁয়ের মত জীবনের সমস্ত সুখ, জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য, জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিলে ও আমার বন্ধুত্বই বা কেন তুমি প্রত্যাখ্যান করলে?"

এই সাদাসিধা সরল-ভাবের কথাগুলি দুই শ্রোতা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিল।

—অক্টেভ বুঝিল,—বাগান-বাড়ীতে কৌণ্টেশ তার উপর যে দণ্ডাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই দৃঢ় সমর্থন মাত্র। কেন না, ঐ সুন্দর ওষ্ঠাধর মিথ্যাবাদে কখনও কলুষিত হয় নাই।

এ দিকে কৌণ্ট ওলাফ,ঐ কথাগুলির মধ্যে কৌণ্টেশের অপরিবর্ত্তনীয় সতীত্বের আর-একটা প্রমাণ পাইলেন। ভাবিলেন, কোন সয়তানি চক্রান্ত ব্যতীত, সে সতীত্বের কখনই পতন হইতে পারে না। এই কথা মনে হইবামাত্র তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। আর এক আত্মার দ্বারা অধিকৃত নিজের মূর্ত্তিকে দেখিয়া এবং সেই অলীক ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি ছুটিয়া গিয়া ঐ অলীক কৌণ্টের টুটি চাপিয়া ধরিলেন।

"চোর,ডাকাত, পাজি,—ফিরে দে আমার শরীর!"

এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া কৌণ্টেশ ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন; কতকগুল ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া কৌণ্টকে ধরিয়া লইয়া গেল।

কৌণ্টেশ বলিলেন:—

"অক্টেভ-বেচারা পাগল হয়ে গেছে!"

প্রকৃত অক্টেভ উত্তর করিল:—

"হাঁ প্রেমে পাগল! কৌণ্টেশ, তোমার রূপলাবণ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

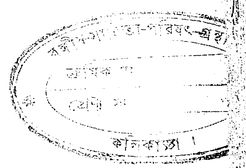

ভাষার উৎপত্তিতত্ত্ব

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত)

আচার্য্য মোক্ষমূলর ভাষাতেই অপর জীব হইতে মনুষ্যের বিশেষত্ব দেখিতে পাইয়া ইহাকে মনুষ্য ও অপর জীবের মধ্যে অনুল্লঙ্ঘনীয় ব্যবধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের মধ্যেই যে মনুষ্যত্বের প্রকৃত রহস্য নিহিত রহিয়াছে—তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি এবং ভাষাতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে মনুষ্যত্বের আদিরহস্যও উদ্‌ঘাটিত হইবে তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। মনুষ্যত্বের মূলীভূত এই ভাষা কিরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য মনুষ্য

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

মাত্রেরই মনে বিশেষ কৌতূহল হওয়া সম্পূর্ণ ই স্বাভাবিক। আমরা এই স্বাভাবিক কৌতূহলেরই বশবর্ত্তী হইয়া তৎপরিতৃপ্তির জন্য এখানে এতৎ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভাষা-নিরপেক্ষ চিন্তা সম্ভবপর নয়, ইহা যুক্তি-শাস্ত্রের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। ভাষা ও চিন্তার এই সাপেক্ষ-ভাবটীকে আচার্য্য মোক্ষমূলর এইরূপে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন "উচ্চৈঃস্বরের চিন্তার নামই ভাষা এবং অনুচ্চস্বরের ভাষার নামই চিন্তা।" ("Speaking is thinking high and thinking is speaking low.")

ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এই সম্বন্ধ হইতে আমরা ভাষা সম্বন্ধে এই মূল সত্যটী লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি যে, চিন্তার বিকাশই ভাষার প্রকৃত উদ্বোধক। এইজন্যই চিন্তার বিকাশের অনুপাতেই ভাষার বিকাশ দেখিতে পাই। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে চিন্তার বিকাশ যেমন কম তাহাদিগের মধ্যে শব্দ-সংখ্যাও তেমনই কম; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে চিন্তার বিকাশ অধিক বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে শব্দসংখ্যারও আধিক্য। চিন্তা যে মনুষ্যের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ, সংস্কৃত মনু, মনুষ্য, এবং ইংরেজী man প্রভৃতি নামেই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চিন্তা দ্বারা যেমন মনুষ্য, মনু বা man হইয়াছে চিন্তা দ্বারাই তেমন মনুষ্যের ভাষা "বাচ্" বা voice হইয়াছে।

চিন্তা প্রথম ভাষাতেই আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই চিন্ময় ব্রহ্ম "শব্দব্রহ্ম" হইয়াই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য Logosও শব্দব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র। খ্রীষ্টধর্ম্মের বাইবেলের সৃষ্টি-প্রকরণে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট বস্তুসকলের নামকরণের যে বর্ণনা আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে ভাষা যে সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ইহা যে ঐশ্বরিক নিয়মে গঠিত তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। মনু-সংহিতাতেও আমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদ হইতে বস্তুসকলের নামকরণ হয় বলিয়া উল্লেখ পাই যথা;—

"সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥২১॥"
মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়।

'পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে বেদশব্দ সকল হইতেই বস্তুসকলের নাম, কার্য্য ও পৃথক্ শ্রেণী বিভাগ করিলেন। বেদদ্বারা স্বাভাবিক শব্দরাশি বা ভাষাই আমরা বুঝি। 'বেদ অপৌরুষেয়' ও 'শব্দনিত্য' প্রভৃতি তত্ত্ব ভাষার স্বাভাবিক ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট গঠন-তত্ত্বই বুঝাইয়া থাকে বলিয়া আমরা মনে করি। যুক্তিশাস্ত্রে বস্তুসকলের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ তাহাদের গুণ ও কর্ম্মবোধক ভাষা দ্বারা হওয়ার যে নিয়ম আছে এখানে আমরা তাহারই আভাস পাইতেছি।

চিন্তাকে মূল করিয়াই ভাষার বিকাশ হইয়া থাকে; চিন্তার পরিণত অবস্থা হইলে ভাষারও পরিণত অবস্থা হয় এবং চিন্তার অপরিণত অবস্থা হইলে ভাষারও অপরিণত অবস্থা হয়। এই প্রকারেই পৃথিবীতে মানসিক অবস্থার তারতম্যানুসারে ভাষার পূর্ণতা ও অপূর্ণতা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ যে ভাষার এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, বেদের ভাষা উৎপত্তির

বিবরণেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে আমরা সেই বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বৃহস্পতে প্রথমং বাচো যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরি প্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং
গুহাবি॥ ১॥
সকুমিব তিতউনা পুনংতো যত্রধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখোয়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি
বাচি॥ ২॥
যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয় মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাংসপ্তরেভা অভিসংনবংতে॥৩॥
উতত্ব পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃন্বন্ন শৃণোত্যেনাম।
উতো ত্বস্মৈ তন্বংবি সস্রে জায়েব পত্য উশতীসুবাসাঃ॥৪॥
ঋগ্বেদ ১০।৭১।

"হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষা-শিক্ষার প্রথম সোপান। তাহাদিগের যাহা-কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তাহা বাগ্দেবীর করুণা-ক্রমে প্রকাশ হয়।

"যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব, অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে।

"বুদ্ধিমান্‌গণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিদিগের অন্তঃকরণমধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাষা আহরণ পূর্ব্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন। সপ্তছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে।" রমেশবাবুর অনুবাদ।

এখানে ভাষা যে হৃদয় বা মনের মধ্য হইতে বাহিরে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। পাশ্চাত্য ভাষা-বিজ্ঞানে ভাষার প্রাকৃতিক জীবন স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইহা যে স্বাভাবিক বিকাশ, কৃত্রিম গঠন নহে তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার প্রবল আবেগের দ্বারাই প্রথম ভাষার অভিব্যক্তি হয়। যেমন তন্ত্রীবাদ্যযন্ত্রের উপর বায়ুর কার্য্যদ্বারা স্বতঃই ধ্বনি উৎপাদিত হয়, তেমনই আমাদের প্রবল হৃদয়াবেগের দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রাণবায়ু যখন বাগ্‌যন্ত্রের উপর আঘাত করিতে থাকে তখনই তাহা হইতে শব্দ নির্গত হইয়া থাকে। এই শব্দ ব্যক্ত বা অর্থযুক্ত হইলেই তাহা ভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পশুপক্ষীদিগের মধ্যে হর্ষ-বিষাদ ভয় প্রভৃতির আবেগ দ্বারাই শব্দ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহাদের শব্দ ব্যক্ত না হইলেও স্বর-বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ব্যক্ত শব্দেরই ন্যায় তাহার ভাব স্বভাবতঃই বোধগম্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে আমরা একপ্রকার "সহজভাষা" (Natural language) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। মনুষ্যের প্রাণীসাধারণ প্রকৃতি হইতে প্রাণী সাধারণ সহজাত ভাষারই প্রথম বিকাশ আমরা তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই। এই সহজাত ভাষার শব্দসকলই আমাদের ব্যাকরণে 'অব্যয়' Interjection প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারের সহজাত ভাষা যে মনুষ্য-সাধারণেরই ভাষা হইবে তাহা সাধারণ যুক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মনুষ্যদিগের "ব্যক্ত ভাষা" পরস্পর

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ভিন্ন হইলেও এই সহজাত ভাষার দ্বারা পরস্পরের মনের ভাব বোধগম্য হইতে পারে।

যেমন পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক শব্দদ্বারা আমাদের মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে, তেমনই আবার বাহ্য আকারের পরিবর্ত্তন বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ও অপর স্বাভাবিক উপায়ে আমাদের মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। প্রথমটীকে আমরা স্বাভাবিক স্বরমূলক ভাষা (Sound-Language) ও দ্বিতীয়টীকে স্বাভাবিক সঙ্কেত-মূলক ভাষা (Gesture Language) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি এবং উভয়কে এক নামে সহজাত ভাষা (Natural language) নামে অভিহিত করিতে পারি। ইহা সকলেই জানেন যে অনেক সময়ে শব্দ দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় না, হাব ভাব বা আকার ইঙ্গিতে তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই উভয় ভাষাই ব্যক্ত ভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাদের অপূর্ণতা দূর করিবার আবশ্যকতা হইতেই ব্যক্ত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরমূলক ভাষা দ্বারা আমরা সীমাবদ্ধ কয়েকটী ভাবকেই মাত্র প্রকাশ করিতে পারি। সঙ্কেতমূলক ভাষার ব্যবহার আলোকের মধ্যে ও সন্নিকটবর্ত্তী স্থলেই মাত্র সম্ভবপর হয়। ব্যক্ত ভাষা ইহাদের উভয়েরই স্থলবর্ত্তী হইয়াছে। এইজন্যই ব্যক্ত ভাষার অব্যয়শব্দে, স্বরমূলক ভাষার এবং অনুকার ও রূপক শব্দে সঙ্কেতমূলক ভাষার যথেষ্ট নিদর্শনই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা ভাষাতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুইটের (Swect) এ সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"It is evident therefore, that ideas must from the beginning have been expressed by a Combination of gesture and sound. As gesture is duly available in the light of day or of the campfire and when the speakers are face to face, there would also be a tendency from the first to develop the more convenient sound signs and to extend their use as much as possible, till at last they constituted the majority of the words and what was at first an easily learnt natural language, became a complex traditional one of infinitely greater convenience and range of expression : p. 4—

We have already seen that language proper or "traditional language" was preceded by what we may call "natural language" which consisted partly of gestures, partly of sounds and sound-groups directly associated with the ideas they represented. There are three principal ways in which such associations can be formed, yielding three classes of imitative, interjectional and symbolic words, all of which have left numerous traces on traditional lauguage. p 33.

History of Language, by Henry Sweet M. A. (Temple Primer)

কিন্তু কেবল শব্দের দ্বারা ভাষা হয় না। শব্দ সকল পরস্পর-সম্বদ্ধ হইয়া যদি কোন পূর্ণার্থের প্রকাশক হয় তবেই তাহাদের দ্বারা ভাষা গঠিত হইতে পারে। পূর্ণার্থ প্রকাশক এইরূপ শব্দ-সমষ্টির নামই বাক্য, সুতরাং ভাষায় আমরা শব্দ ও বাক্য এই দুইটী মূল উপাদান পাইতেছি। যুক্তি-শক্তির বিকাশ ব্যতীত এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বাক্যরচনা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। যুক্তি-শক্তির দ্বারা বাক্য হইতে শব্দকে মনুষ্য যেমন ভেদ করিতে পারে তেমনই শব্দকে বাক্যে যোজনাও করিতে পারে। এইজন্যই মনুষ্যে ভাষার বিকাশ হইাছে; কিন্তু ইতর প্রাণীতে এই যুক্তি-শক্তির সমুচিত বিকাশ হয় নাই বলিয়া তাহারা যেমন বাক্য হইতে শব্দের ভেদ বুঝিতে অসমর্থ, তেমনই শব্দ-যোজনা দ্বারা বাক্যরচনা করিতেও অসমর্থ। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে ভাষার বিকাশ হইতে পারে নাই। ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সুইট এই সম্বন্ধে যে সারবান্ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য বোধ করি :—

"Language, then, implies differentiation of words and sentence. It is evident that until it has reached this stage, it cannot claim to be an efficient expression or instrument of thought: This differentiation has not been attained by animals. They can express ideas by sounds but they cannot combine these sounds together to express corresponding combination of ideas. Thus they can make a sound which serves whether intentionally or not to warn their companions of danger, but they can not as far as we know combine other sounds with it to indicate the nature of danger and if they indicate the source or locality of the danger, it is only by instinctive movements or glances." The History of Language, by Henry Sweet M. A. P. 2. (Temple Primer)

মনুষ্যের মধ্যেই মাত্র যে ভাষার অভিব্যক্ত সম্ভবপর তাহা আমরা প্রতিপাদন করিলাম। এক্ষণে মনুষ্যের মধ্যে এই ভাষার প্রথম বিকাশ কিরূপে হয় তাহাই আমরা আলোচনা করিব। ভাষার শব্দ ও বাক্য এই দুইটি উপাদানের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে শব্দেই ভাষার প্রথম বিকাশ কি বাক্যেই ভাষার প্রথম বিকাশ এই সম্বন্ধে ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ-দিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় শব্দেই ভাষার প্রথম বিকাশ দেখিতে পান—অপর সম্প্রদায় বাক্যে ভাষার প্রথম বিকাশ দেখিতে পান। আচার্য্য মোক্ষমূলর প্রথম সম্প্রদায়ের অগ্রণী এবং অধ্যাপক সেইস (Sayce) দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

অগ্রণী। পূর্ব্বোক্ত উভয় মতেই সত্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভাষা যখন 'সহজাত' অবস্থায় ছিল তখন মূলভাব একটী মাত্র অপরিস্ফুট শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া অবান্তর বা আনুষঙ্গিক ভাবগুলি অঙ্গ-সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হইত। কিন্তু ভাষা যখন প্রকৃত 'ব্যক্ত' অবস্থা প্রাপ্ত হইল তখন সমস্ত ভাবই বাক্যাকারে প্রকাশিত হইল। সুতরাং বাক্য বা বাক্‌ই ব্যক্ত ভাষার আদি হইতেছে।

প্রাচ্যগণ এই তত্ত্বটী সম্যক্‌রূপেই অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় তাহাতেই সংস্কৃতে ভাষার এক নাম বাক্ পাওয়া যায়, যথা অমরকোষ অভিধানে

"ব্রাহ্মীতু ভারতী ভাষা গীর্ব্বাগ্‌বাণী সরস্বতী॥"

আমরা ঋগ্বেদের ভাষা-উৎপত্তির যে বর্ণনা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেও ভাষার পরিবর্ত্তে বাক্ শব্দটীরই ব্যবহার দেখা যায়। ইংরেজীতে মনুষ্য শব্দের বাচক যে Voice শব্দ প্রচলিত আছে এবং ইহার মূল Latin ভাষায় যে Vox, Vocis শব্দ পাওয়া যায় তৎসমস্তই মূলে বাচ্ শব্দের সহিত একই প্রাকৃতিক শব্দ। এই voice শব্দে মনুষ্য ভাষা-উৎপত্তির ইতিহাস যেন অতি স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই Voice শব্দ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে মনুষ্য প্রথম যে শব্দদ্বারা ব্যক্ত ভাষার সূত্রপাত করে তাহা বাক্যরূপ শব্দ, কারণ Voice ও বাক্-এ মূলতঃ কোনও ভেদ নাই।

প্রথম ভাষা গঠন যে অখণ্ড বাক্যাকারে ছিল কিন্তু খণ্ড খণ্ড শব্দাকারে ছিল না সংস্কৃত 'ব্যাকরণ' শব্দেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া আমরা মনে করি। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ। অখণ্ড বাক্যকে বিশ্লেষণ করিয়া তদঙ্গীভূত শব্দ সকলকে পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শন ও তাহাদের পৃথক্‌ভাবে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ইহাই ব্যাকরণের প্রধান কার্য্য।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় ব্যাকরণ রচনার আদি ইতিহাস ও তৎ-প্রসঙ্গে ভাষার প্রথম প্রকাশের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ সমর্থনই পাওয়া যায়। আমরা বিশ্বকোষ হইতে এতদ্বিষয়ক আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সেই অতি পূর্ব্বকালে ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল এবং ইন্দ্রই সর্ব্বাদি শাব্দিক। যথা—

"বাক্‌বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোঽব্রবীৎবরং বৃণৈ মহ্যং চৈষ বায়াব চসহ গৃহতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রঃ বায়বঃ সহতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে তদেতদ্ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম্॥" "অস্য পরাচী পুরাতনী বাক্ দেবরূপিণী অব্যাকৃতা মেঘস্তনিতবদখণ্ডাকারা অবিদিত-পদ-বাক্য-প্রভেদেতি যাবৎ। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বিচ্ছিন্ন এতাবদিদং বাক্যং বাক্যে চৈতানি পদানি পদেষু চৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ এতেচ প্রত্যয়াইত্যেব মবক্রমণং অখণ্ডা বাচোবিভেদনং কৃত্বেত্যাদি॥" (ভাষ্য)

ভাবার্থঃ এইরূপ "পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় অখণ্ডাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত

না। তখন দেবগণ প্রার্থনা করেন যে বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ, প্রত্যেক পদের প্রকৃতি, স্পষ্ট করিয়াছিলেন।" বাক্য, পদ পদের অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য।"

তৈত্তিরীয় সংহিতার উপরের বর্ণনায় আমরা বাক্যেই যে ভাষার প্রথম উৎপত্তি তাহার স্পষ্ট উল্লেখই পাইতেছি।

শব্দ সকলই ভাষার মূল উপাদান। সুতরাং শব্দ সকলের মূল গঠন সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শব্দের গঠনে আমরা ব্যাকরণে প্রকৃতি, প্রত্যয় ও বিভক্তি এই কয়েকটী প্রধান উপকরণের উল্লেখ পাই। শব্দের মূল ধাতু বা প্রকৃতির সহিত প্রত্যয় যোগ করিয়াই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শব্দের সহিত বিভক্তিযুক্ত হইলেই তাহা সুবন্তপদ রূপে পরিণত হইয়া বাক্যের কারকাংশ গঠন করিয়া থাকে, ধাতুর সহিত অন্যপ্রকার বিভক্তিযুক্ত হইলে তাহা তিঙন্তপদরূপে পরিণত হইয়া ক্রিয়াংশ গঠিত করিয়া থাকে। এইরূপেই বাক্যের গঠন সম্পাদিত হয়, যথা "সুপতিঙন্তচয়ো বাক্যং ক্রিয়া বা কারকান্বিতঃ॥" পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি, প্রত্যয় ও বিভক্তি সকল প্রথমে ভাষায় কি আকারে বর্ত্তমান ছিল তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। বর্ত্তমান আকারে ইহারা কখনও ভাষায় পৃথক্‌ভাবে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। ভাষা-বিজ্ঞান-বিৎদিগের মতে ইহাদের সকল গুলিই এক সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ ছিল এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহৃত হইত কিন্তু কালে বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ সংযোগ হইতে ইহারা বিকৃতি ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে। ক্রিয়া-বিভক্তি-সকলকে ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পুরুষীয় সর্ব্ব-নামেরই রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বোক্ত রূপান্তরিত সর্ব্বনাম যোগে ক্রিয়া একটী সঙ্ক্ষিপ্ত বাক্যে পরিণত হইয়াছে। ক্রিয়ার বর্ত্তমান ধাতু অংশটী পূর্ব্বে একটী স্বতন্ত্র ক্রিয়া-শব্দই ছিল, সর্ব্বনাম ইহার সহিত যুক্ত হইয়া যেমন বিকৃত হইয়া বিভক্তিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে তেমনই ইহাও বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ধাতুরূপে পরিণত হইয়াছে। সমাসবদ্ধ পদসকল পূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাক্য ছিল, সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়া সমাসের আকার ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সুইটের "ভাষার ইতিহাস" (History of Language) নামক পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব-সকল পরিষ্কাররূপ বিবৃত হইয়াছে, এখানে আমরা তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"An impartial study of the morphological development of languages makes it tolerably certain that all inflectional languages must once have been isolating and have passed through the agglutinative stage." p. 67.

"This period, again, must have been preceeded by one of more or less agglutination, in which the

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

cases were mere post—positions, and this period was preceeded in its turn by an isolating period, in which grammatical relations were indicated by word order and the use of particles p. p. 110—111.

Composition and derivation, though the result of the fixed order of words in sentences, are thus word forming and not sentence forming processes p, 42

If we define inflection as "agglutination run mad" we may regard incorporation as inflection run madder still! It is the result of attempting to develop the verb into a complete sentence. p. p. 65—6.

Composition—This "pre-adjunct—" order putting the adjunctor modifying word—before its head word that is, the word whose meaning it modifies is evidently very old in Aryaus, for it is the basis of the Aryan method of forming compound words. Such compounds as the Sanskrit rajaputra, "king's son", Greek hippodamos "horse taming" theo-dotos, "god-given, given by god" are simply fragments of sentences—they were originally groups of words preserved from the pre-inflectional period of Aryan, in which grammatical relations were shown by merely putting the adjunct word before its head-word; in the above compounds the first elements are equivelent respetively to genitives, accusatives and instrnmentals or a batives. As the connection between the members of such groups began to be more-more intimate, the whole group came at last to have only one accent, as if it were a single word; hence, when it became the rule that every noun and adjective must have its relations to the other words in the sentence shown by inflection, the first elements of these groups were passed over and allowed to remain uninflected, and being regarded now as only parts of words, they lost their freedom of position in the sentence, and so, such a form as hippo could only form part of a word, and was no longer an independent word." p. 41.

উদ্ধৃত মন্তব্য সকল হইতে বাক্যই যে ভাষার আরম্ভ তাহার যথেষ্ট প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হইলাম। আমরা উপরে শব্দ-সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে শব্দ সকল যে অর্থযুক্ত হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হয় তাহার

উল্লেখ আমরা করি নাই। অর্থ প্রকাশের জন্যই শব্দ প্রয়োগ হয়—সুতরাং বাক্যের কোন শব্দই নিরর্থক হইতে পারে না, সকল শব্দই সার্থক। অতএব—শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। তাহাতেই কালিদাস এই উপমা দিয়াছেন "বাগর্থা বিবসম্পৃক্তৌ"। শব্দার্থের এই নিত্য-সম্বন্ধ ঐশ্বরিক নিয়মেই হইয়াছে; তাহাতেই দুর্গাকে শব্দের আধার ও শিবকে অর্থের আধার রূপে শাস্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়; যথা শব্দজাত মশেষস্তদ্বত্তে সর্ব্বস্য বল্লভা। অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ॥"

পূর্ব্বোক্ত কল্পনায় আমরা শব্দ ও ভাষা উৎপত্তির বিশেষ কৌতুকাবহ ইতিহাস সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাই। শব্দের উপাদান বর্ণ বা অক্ষর। অক্ষর সকল বা সমগ্র বর্ণমালা আমরা "মাতৃকা" নামে শাস্ত্রে অভিহিত দেখি। মাতৃকা-দেবী দুর্গার এক নাম। মাতৃকা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণের নাম মাতৃকা। ইহাতে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যেমন হয়, এই ব্যাখ্যাতে দুর্গা যে শব্দের আধার বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিতও সামঞ্জস্য হয়। কিন্তু আমরা এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অপেক্ষাও ইহার মধ্যে যে একটী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে তাহা হইতেই অধিক সত্যলাভের আশা করি। বর্ণ বা বর্ণাত্মক শব্দ সকল প্রথম মাতার দ্বারাই উচ্চারিত হয় বলিয়াই ইহাদের নাম 'মাতৃকা' হইয়াছে ইহাই আমাদের নিকট ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ সন্তানের নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত আলাপের প্রয়োজনীয়তা হইতেই মাতাকর্ত্তৃক শব্দ ও ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই ভাষার প্রথম ইতিহাস বলিয়া আমাদের মনে হয়। মাতা ও সন্তানের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা এরূপ আর কাহারও নহে। সুতরাং সন্তানের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ হেতু এবং সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা মাতারই কর্ত্তব্য বলিয়া এই সমস্ত প্রয়োজন সুসাধন জন্য যে মাতাতেই প্রথম ভাষার বিকাশ হইবে ভাহা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আমরা প্রথম মাতার নিকট হইতে ভাষা শিক্ষা করি বলিয়া আমাদের শৈশবের ভাষা "মাতৃভাষা" বলিয়া কথিত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। বর্ণমালার মাতৃকা নামের অনুকরণে "মাতৃভাষা" নাম কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ইংরেজী mother tongue কথাটিও এই ভাবে কল্পিত হইয়াছে।

মাতার দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দ ও শব্দাত্মক ভাষা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পিতার দ্বারা শব্দের বা ভাষার প্রকৃত অর্থ প্রথম আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই শিব অর্থের আধার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মাতা ভাষার প্রথম গঠন প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু পিতা ইহার প্রথম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যারই নাম ব্যাকরণ বা শব্দ-শাস্ত্র, সুতরাং পিতা হইতেই ব্যাকরণ বা শব্দ-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, শিবকে আমরা অর্থের অধিষ্ঠাতা দেবতা দেখিতে পাই, তাঁহাকেই আমরা ব্যাকরণেরও প্রণেতা দেখিতে পাই। তাঁহাতেই তদীয় মহেশ নামে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

"মহেশ ব্যাকরণের" উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনি স্বকীয় ব্যাকরণে মহেশ ব্যাকরণের প্রত্যাহার-সূত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রত্যাহার-সূত্র সকলে বর্ণসকলের যেরূপ শৃঙ্খলা দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ ব্যাকরণ রচনার পূর্ব্বেই বর্ণসকল বিদ্যমান ছিল। ইহা মাতা হইতে বর্ণোৎপত্তির অন্যতর প্রমাণ বলা যাইতে পারে। মহেশ ব্যাকরণ যে পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা কেবল প্রাচীন নহে, উৎকৃষ্টও ছিল, নিম্নোক্ত সুপ্রচলিত বাক্যদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়, যথাঃ—

"ঘান্ন্যজ্জহার ব্যাসোমাহেশাদ্ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিন্তানি পদরত্নানি সন্তিপাণিনি গোষ্পদে॥"

"ব্যাসদেব মাহেশ ব্যাকরণরূপ সমুদ্র হইতে যে সমস্ত রত্ন উত্তোলন করিয়াছেন সেই সমস্ত পদরত্ন কি পাণিনি রূপ গোষ্পদে আছে?"

কেবল যে পতি-কর্ত্তৃকই ব্যাকরণ বিরচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নহে, পুত্র কর্ত্তৃক ব্যাকরণ বিরচিত হওয়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কাতন্ত্র ব্যাকরণ কুমার বা কার্ত্তিকেয় হইতে প্রাপ্ত বলিয়াই ইহার নাম কলাপ বা কৌমার ব্যাকরণ হইয়াছে। ইহাতেও বর্ণসকলকে "সিদ্ধ" (বর্ত্তমান) বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাতেই ইহার প্রথম সূত্র হইয়াছে "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ॥" ইহাতেও বর্ণসকলের সহিত যেন মাতার যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রকারে জগতের আদি পিতামাতার সহিত ভাষা ও অর্থের যোগ হইতে তাহাদেরই বর্ত্তমান প্রতিরূপ আমাদের পিতামার সহিতও তাহাদের যোগ হইয়াছে। এখানে জগতের আদি পিতামাতার সহিত কবিগুরু কালিদাসের ভাষায় আমাদের পিতামাতাকে, আমাদের ভাবা ও অর্থের জন্য বন্দনা করিয়া আমরা আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি ঃ—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাদেকা

অতুল রূপসী কৃষক-বালিকা
কথা কয় ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
নাকেতে বেসর, নয়নে সুর্ম্মা,
হস্ত মেহেদী-রাঙ্গা।
বিবাহ না হ'তে, জানিতে পেরেছে,
ইসুক তাহার বর,
দেখিলে লাজেতে কুরে মাথা হেঁট,
এক-পাড়াতেই ঘর।

বিবাহের সব হইয়াছে ঠিক,—
সে সকল কথা থাকু,
প্রণয়ী ইসুকে সহসা পড়িল
সমরে যাইতে ডাক্।
নিটোল গঠন, জোয়ান যুবক,
বিশাল দরাজ বুক্,
সমরে যাইতে তবুও কি জানি
মলিন হলো যে মুখ।

সোহাগে সাথীর করদুটি ধরি
পরশি অধর তার,
গোপনে বলিল "হয়ত সখিরে
হবে না কো দেখা আর।"
কহিল কিশোরী "কবরে গেলেও
পেলে এ পরশ তব,
নবীন জীবন লভিয়া আমি যে
অঙ্গে জড়ায়ে রব।"

* * * *

পাঁচটি দীর্ঘ বরষ কেটেছে
ফিরিছে যুবক গ্রামে,
হৃদয় তাহার ব্যাকুলি উঠিছে
শুধু সাদেকার নামে।
প্রবেশিছে গ্রামে, রাঙ্গা বাসে ঢাকা
কার মৃতদেহ যায়,
সারা বুক তার কেঁপে উঠে কেন?
মুখে উঠে হায় হায়!
গৃহে গিয়া যুবা শুনিল তখনি
সাদেকা গিয়াছে মারা,
এখন তাহার সমাধির ধণ
কাঁদিছে সকল পাড়া।
তাহারি অমতে পিতা দিল তার
বিবাহ অপর সনে,
তাহাতেই বুঝি উপজিল রোষ
দারুণ বিধির মনে।
দুদিনের এক তনয় রাখিয়া
চলে গেল ধরা ছাড়ি,
লাজ হ'ল বুঝি, দেখাইতে মুখ
ইসুক ফিরেছে বাড়ী!
রটায়েছে লোকে ইসুক মরেছে,
"কুতএল্-আমার' রণে,
দুদিন ধরিয়া সাদেকা কেঁদেছে
কি প্রীতি তাহার সনে।

গভীর নিশীথে গোপনে ইসুক
একাকী সমাধি খুঁড়ে,
কাফেরের মত, একি এ কাণ্ড!
মৃতের নীরব পুরে।
কতবার তার কাঁপি উঠে হাত
ভাবে দেখিতেছে কেহ,
মাটী হতে ধীরে বাহির করিল
তরুণীর মৃতদেহ।
কাঁদিয়া অধরে চুম্বন দিল
আছে কি সংজ্ঞা লেশ?
বুকেতে জড়ায়ে রমণীর দেহ
ইসুক ত্যজিল দেশ।
প্রাতে 'মাতোয়ালি' হেরি সমাধিটী
পুন লেপি দিল মাটী,
বুঝিল এ-সব প্রকাশিতে নাই
'জিনের' কাণ্ড খাঁটী।

সাত-বরষের পরে যে আবার
ইসুক এসেছে ঘুরি,
সঙ্গে তাহার রূপসী পত্নী
সজীব কনক হুরী।
গ্রামে কাণাকাণি করিছে সবাই
এই ত সাদেকা বটে,
মরা মানুষের ঘরে ফিরে আসা
কেমন করিয়া ঘটে!
সাদেকার স্বামী প্রিয়ারে তাহার
পুনরায় ফিরে পেতে,
ইসুকের নামে নালিশ করিল
অচিরেই আদালতে।
জানালো সাদেকা, জনম তাহার
সুদূর জোয়ান-পুরে,

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ও স্বামীরে কই, চেনেনা জানেনা,
দেখেনি জীবন ধরে।
স্বামী বলে তার "চিনি ওই রূপ,
কপালেতে সেই তিল,
সেই বটে মোর আর কেহ নয়
হুবহু যে সব মিল।
সমাধি তাহার তুলিয়া দেখেছি
অস্থিও নাই তাতে,
বুঝিতে পারিনে কেমনে জুটিল
হেতা ইসুকের সাথে।"
বিচারক ক'ন "মৃত বটে সে ত
নাহি সন্দেহ-রেখা,
সমাধি হইতে উঠিল কি মৃত
করিতে আবার 'নেকা'?
হেকিম দেখেছে বলিয়াছে মৃত
প্রোথিত করেছে সবে,
একরূপ হয়ে দুইটী প্রতিমা
থাকিতে নাহি কি ভবে?"
চতুর সে স্বামী কিছু নাহি বলি
তাদিকে সেথানে রাখি,
জননীর ছবি শিশু বালকেরে
নিকটে আনিল ডাকি।
দেখি রমণীরে একমুখ হাসি'
শিশু কাছে গেল সরি',
নাহি চেনা তবু দাঁড়ালো তাহার
সাড়ীর আঁচল ধরি।
হেরি মুখ তার সহসা রমণী
ঢলিয়া পড়িল ঘুমে,
এবার ইসুক জাগাতে নারিল
শতবার মুখ চুমে!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

জহর খাওয়া

(গল্প)

বোগ্‌দাদ সহরের সীমান্তে সে বন—যেমন ঘন তেমনি শ্যামল। বনের পাশ দিয়ে অজগরের মত দেহটী বেঁকিয়ে বয়ে গেছে ক্ষীণা ঝালানদী,—তর্‌তরে তার ধার, টলটলে তার জল। বনের বুকে বুকে হাওয়া যখন ক্ষেপে ওঠে, নদীরও বুকে ঢেউগুলো তখন মাতালেরই মত মত্ত-উচ্ছ্বাসে ফুলে উঠে পাহাড়ের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে।

নদী-পাহাড়ির উপর ছোট্ট কুঁড়েখানি—ছাউনির উপরটা তার আগাগোড়াই [illegible] ললিত, পাতায় সবুজ; বেড়াখানি [illegible] বয়ে বন-ধুঁদুলের গাছ ঘরের ভিতর [illegible] গিয়ে পৌছেচে। মটকার উপর বসে [illegible] ঘুঘুটা যখন-তখনই তার প্রিয়ার কাণে কাণে প্রাণের গোপন কাহিনী শোনায়—কোথায় বাসা বেঁধেছে একজোড়া পায়রা, তারা মুখে মুখি বসে ডাকে,—"বগ্‌বগুম-বগ্‌"—আর তো না হতেই এসে চুমো খেয়ে যায় ওই [illegible] মুখে এক রাশ সোনার আলো! কুটীরে

সাম্‌নে উঠানখানি ঘন সতেজ ঘাসে ঘাসে একটানা সবুজ! দেখ্‌লে মনে হয় স্বভাব-লক্ষ্মী বুঝি কোন্ সুনীল গাঙে স্নান ক'রে এসে সিক্ত শাড়ীখানি তার এইখানে মেলে দিয়ে গেছে—ঝালা নদীর লীলা-রেখায় সে কাপড়ের ঝলমলে ময়ূর-কণ্ঠী পাড়টী মানানো।

এই কুঁড়েখানি জুড়ে একটী শিকারীর সাধের ঘরকন্না পাতা। শিকারী আর তার বৌ—বুকে বুকে গাঢ়-ঢল ঢল ভালোবাসায় যুগল বাহুর নিবিড় বেষ্টনে প্রাণে প্রাণে এক সুখে-দুঃখে সমানই শান্তিতে সেইখানে বাস করে—আজ আট বচ্ছর।

শিকারীর নাম বান্নু—বউকে সে ডাকে "দুরারী" বলে। দুরারী সত্যই সুন্দরী। গোলাপ ফুলের মত টক্‌টকে তার রঙ, বিদ্যুৎ ভেঙে চুনিয়ে বাঁধা বুঝি তার অঙ্গ। কোটা পদ্ম সদ্য তুলে যত্নে গড়া তোড়াটীর মত ঢল ঢল তার মুখখানি। নিটোল দুখানি গাল ঈষৎ একটু তোলা তোলা, মাঝখানটীতে যে বুঝি-ফাগ-পোরা কুঙ্কুম ছুঁড়ে মেরেছে। ডাগর দুটী টানা চোখ কালো কালো; তরুণের বুকে ভালোবাসার প্রথম শিহরণের মত চঞ্চল তার দৃষ্টি। একরাশ চুল মিশ্‌মিশে কালো, উঁচু নাক, সুডোল হাত-পা,—আরো আরো সব এম্‌নি যা,—সে আর বলা যায় না। মরালীর মত বাঁকা গ্রীবাটীতে একগাছা মুক্তা রঙের পুঁতির মালা। কোমল বাহুর মূলে পিতলের বাজু, মণিবন্ধে তারি দুগাছি সরু সরু কাঁকণ আঁটা। পাকা জামের রঙের নীলাম্বরীখানি পরে দুরারী যখন দাওয়ায় এসে বসে, তখন দেখে মনে হয়, সেই স্বপ্ন-সুকুমার তনুখানিও বুঝি তার বনান্তের বাতাসে ফুলের মতই দুলে উঠ্‌ছে! তার সমস্ত রূপখানি ছেয়ে একটা স্বাধীনতার আলো সারাদিন খেলা করে—সে সৌন্দর্য্য সেই টাইগ্রীস আর ইউফ্রেটীস নদীর ধারা-ধোয়া গোলাপ-ফুলের স্বপ্ন-রাজ্যেই শুধু গড়ে ওঠবার!

বনের উপর দুপুর বেলাটী তপ্ত হয়ে ঐলে বান্নু চারটী খেয়ে শিকারে বেরোয়। বনের হরিণীটীর মতন স্বাধীন দুরারী সেই কুটীর খানির ছায়ায় ঝালা-তীরে এসে বসে; সুগৌর পিঠের উপর দিয়ে ভিজে ভিজে চুলের গোছা ছড়িয়ে শুকোতে দেয়। ঝালার স্রোতের উপর তপ্ত কিরণ ভরা যৌবন নিয়ে খেলা করে; নদীর ও-পারে সবুজ ক্ষেতের ধার দিয়ে হরিণটা ছুটে পালায়; ঝোপের ঘন আড়ালে কোনোখানে বা একটুক্‌রো মেঘের মতন সাদা খরগোষটা ঘুমিয়ে থাকে, ঝোপের নীচে স্বচ্ছ ছায়াখানা গাছের পাতার সবুজ বুকে করে চক্ চক্ করে—তার উপরে আঙুর-লতার বুকের সোনা ঝলক-মারা রোদের ফাঁকে টুক্‌রো হয়ে এলিয়ে পড়ে; লতার মুখে রস লীলায়িত ললিত; গাছের মাথায় কি সুঘন শ্যামলতা, ফুলের রঙে সেই কোন্ অজানা কারিকরের নিপুণ তুলির টান—সেই কোন্ অগোচরের সংগোপন খবর বলে যায় যে বর্ণ-রেখা, দুরারী তাকিয়ে তাকিয়ে সেই সব দেখে; কখনো বা পাতার উপর ছবি আঁকে, আলতার লাল আর পেস্তা পাতার সবুজ দিয়ে সে লেখায় রঙ ফলায়! আবার হয়তো কখনো দেওয়ানা বুলবুলটার অফুরান কাঁদা-কাটি শুনে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

শুনে আর পারে না, চোখ দুটী তার জলে ভরে আসে—পাখীটার প্রাণের সুরে আপন অনুভব মিলিয়ে কি এক অব্যক্ত ব্যথায় বুকখানা তার ভরিয়ে তোলে।

এমনি করে বান্নুর ঘরের প্রেমের দুলাল দুরারী আপন মনের নির্ভীক সুখে সারাটী দীর্ঘ বেলা কাটিয়ে দেয়; আস্তে আস্তে গোধূলি-লগ্ন ফুরিয়ে গেলে দুরারীর চোখের সাম্‌নে বনের সন্ধ্যা কালো হয়ে আসে;—স্বামীর আশায় পথের দিকে চেয়ে চেয়ে—"সে এখুনি আস্‌বে"—পাখীটা উড়ে গেল "ঐ বুঝি সে এলো"! হরিণটা ছুটে পালায়—"তারই তো পায়ের শব্দ"!—এম্‌নি ভেবে ভেবে মুগ্ধ বেদেনী তার একান্ত হৃদয়খানা প্রাণেশের ভাবনায় ভরে তোলে। বনের আলো নিবে গেলে সারাদিনের পর বান্নু ঘরে ফিরে তার পটের মতন উঠোনখানির ছায়ায় দাঁড়িয়ে ডাকে—"দুরার"—দুরারীর বুকের ভিতর আবেগ কেঁপে কেঁপে নেচে ওঠে! সে অম্‌নি ছুটে এসে বান্নুর শ্রান্ত চক্ষু দুটির সাম্‌নে দাঁড়াতেই দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। দুরারীর মুখের সে হাসি অগাধ হৃদয়ের কন্দর ভেঙে উৎসের বেগে বেরিয়ে এসে বান্নুর গায়ে শ্রান্তি-হরা, আবেশ-ভরা তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দেয়—তার সারাদিনের ভ্রমণ-পরিশ্রম সার্থক হয়ে যায়—আর দুরারীর সারা-দুপুরের চিন্তা-ম্লান কপোলদুটীতে তখনি দুটী চুম্বন গোলাপ ফুলের মত ফুটে উঠে সেখানকার সমস্ত কালো দাগটুকুকে লাল ক'রে দেয়—সে স্বামীর শিকারে-ধরা পাখীগুলোকে কুটীরে নিয়ে যায়।

এমনি করে দিন-ভরা বিরহে, আর রাত-ভরা মিলনে শিকারি-দম্পতীর আনন্দের ঘর-সংসার অনেক দিন চল্‌লো—তারপর একদিন দুরারীর রূপ তার সুখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বস্‌লো! অদৃষ্টের ক্রুর আকাশে তার সাদা হাসি রক্ত-মেঘ সেজে বান্নুর সাজানো বাগানে তুফান তুলে দিলে—হতভাগা বান্নু নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌বার জন্য তৈরি হবার অবসরও পেলে না!

বসন্ত-প্রাতের রক্ত বরণ বনলক্ষ্মীর পল্লব লালে মিশে তরু-শিরে যেন কোনো তরুণীর চরণ-লিপ্ত অলক্তক-লেখা লিখে দিয়েছে। ফুটন্ত মঞ্জরীর ঘুমন্ত মুখে চুমো খেতে চরণ ধরে তার ভ্রমর-বঁধুর স্তব্ধ গুঞ্জরণ বীণার তারের মতই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।

বাদশাজাদা আজ সকালে শিকারে এসেছেন—তাঁরই পড়েছে হাজার দু'হাজার আমোদ ক'রে পশু-বধ, তাও আবার শাজাদার খেয়াল-ভরা চিত্ত-তলের বছর-পুরে সখ! হুকুম করবামাত্রই সব তামিল হয়েছে—হাজার হাজার হাতী-ঘোড়া লোকজনে সহর-তলীর উচ্চ কোলাহল এসে লেগেছে এই নিবিড় বনের নীরব সীমানায়।

বাদশাজাদা হরিণ, বাঘ, পাখী অনেক শিকার করলেন। শিকারের পিছনে ছুটে ছুটতে শিবির ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়লেন—এদিকে বনের স্নিগ্ধ সকাল-বেলা দিক্-চক্রবালের আড়ালে গড়িয়ে যেতে দুপুরের আগুন জ্বলে উঠ্‌লো। ধূসর এক খরগোষ তখন প্রাণের ভয়ে তার কোমল দুটী চোখের তারা বড় বড় করে বাদশাজাদার লুব্ধ চোখের সামনে দিয়ে ছুটে গেল।

বাদশাজাদার নিষ্ঠুর বুকে সে করুণতা-ভরা দৃষ্টি এতটুকুও ব্যথা জাগিয়ে দিতে পার্‌লে না—তিনি তীর-ধনুক নিয়ে সেই ছোট খয়গোষটীর অন্তরতম অন্তরালের সন্ত্রস্ত প্রাণটুকুর জন্য ছুটলেন। বেচারী নিরীহ প্রাণী, প্রাণপণে দৌড়নো—বুঝি তার শঙ্কার মৌন নিবেদন সেই মৌন দেবতার চরণ-তলে গিয়ে পৌঁছেছিল—অনেক দূরে গিয়ে একটা পাহাড়ে ঝোপের পাণ্ডুর আড়ালে কোথায় সে মিলিয়ে গেল, বাদশাজাদা আর তাকে দেখ্‌তে পেলেন না। তাঁর ব্যর্থ হৃদয় নুয়ে এল—ক্লান্ত দেহে তিনি সেইখানে বসে পড়্‌লেন। কাছেই ক'টা বড় বড় বাদাম গাছ বান্নুর উঠানখানিতে ছায়া বিছিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কুঞ্চিত ঘন কিশলয়গুলো পাখার মত দুলে উঠে বাদশাজাদার শ্রান্ত দেহে হাওয়া করে গেল—বনলতার সবুজ বোঁটা ভেঙে গোটাকতক মালতী ফুল তাঁর পায়ের নীচে ঝরে পড়ে তাদের সম্রাট-নন্দনের আতিথ্য অভিনন্দন করলে।

বাদশাজাদা কৌতুকে কুতূহলে বড় অনেকক্ষণ ছুটেছিলেন—ঢের দূর এসে পড়েছেন—অবসন্ন দেহখানা আয়াসে বয়ে কতদূরের সেই মৃগয়া-শিবিরে ফিরে যাবার আর তাঁর ইচ্ছা হল না—বলও পেলেন না,—ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় সমস্ত দেহ-মন অবসন্ন কাতর হয়ে উঠ্‌লো।

বান্নু তখন—রোজই যেমন যায়—বনে বা'র হয়ে গেছলো। সে দিন যেন কেমন দুরারীর জিউ ভাল লাগ্‌ছিল না—সে খাওয়া-দাওয়া কোনোমতে মিটিয়ে কুটীরের মেঝেয় বিছানাখানি পুরু করে পেতে শুয়ে পড়েছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে সে রূপের জেল্লা বাদাম গাছের নীচেকার ছায়া অবধি বেরিয়ে এসে রৌদ্র-রেণুর স্বর্ণ-বর্ণকে মলিন করেও দিচ্ছিল বুঝি—বাদশাজাদার উৎসুক নয়নের দৃষ্টিটাকে কিন্তু সে এড়াতে পার্‌লে না। তিনি শ্রান্ত পায়ে ধীরে ধীরে চলে বান্নুর ছোট কুঁড়েখানির কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন, পৌঁছে ডাক্‌লেন, "এখানে কে আছো?" কেউ উত্তর দিলে না। বাদশাজাদা আবার বল্‌লেন—"ওগো একজন শ্রান্ত মুসাফেরকে তোমরা কেউ একটু আশ্রয় দেবে?"

ত্রস্ত চকিত কুরঙ্গিনীটীর মত দুরারীর প্রাণখানা হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। কুঠরীটী ঘেরা লতার বেড়ার শীর্ণ ফাঁকে সেই কাজল-কালো টানা টানা দুটী চোখের ব্যাকুল দিঠি বার করে দিয়ে অতিথিকে একবার সে দেখে নিলে—স্বেদ-সঞ্চিত কপোলের উপর তাঁর ক্লান্তির চিহ্ন কালো হয়ে উঠেছে দেখে রূপসীর বুকখানা করুণায় টল্‌টলিয়ে উঠ্‌লো—কিন্তু পরিপূর্ণ আশার মত সে ভরা যৌবনের পুলক-ভরা দৃষ্টির নেশা নয়নে নিয়ে অমন সুরূপ তরুণ মুসাফেরের তৃষ্ণার্ত্ত চক্ষুর সাম্‌নে দাঁড়াতে সরমে ভয়ে সে শিউরে উঠ্‌লো—ভাব্‌লে, একলা সাকীর সেবার পেয়ালা পূর্ণ পেয়ে মুসাফেরের প্রাণের ঢেউ যদি কূল ছাপিয়েই ফেনিয়ে ওঠে—সে যদি পাগল হয়ে গিয়ে একটা ভয়ানক কিছুই করে বসে!

বাদশাজাদা ক্লান্ত কণ্ঠে আবার ডাক্‌লেন, "ওগো—" কেউ উত্তর দিলে না দেখে পরিচয় দিয়ে বল্‌লেন, "তোমরা কি তোমাদের বাদশাজাদাকে এক পেয়ালা পানীয় দিতে-

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

নারাজ, গো? সে বড় শ্রান্ত, তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

এবার দুরারীর নারী-হৃদয়ে আঘাত পড়লো—আর ধৈর্য্য মানলে না। সে বিছানার উপর উঠে বসে তন্দ্রা-শিথিল কালো শাড়ীখানা টেনে টেনে পরলে—তারপর নিদ্রা-অলস চোখের উপর দিয়ে সুরমার মোটা টানটা বাঁচিয়ে পালকের চাইতেও কোমল তার হাতের মোলায়েম স্পর্শখানি বুলিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

বাদশাজাদা দেখ্‌লেন, দূর বনান্ত-রেখার চেয়েও কালো চুলের এলো রাশ গোছায়-গোছায় ঘন বেঁধে উঠে তরঙ্গেরই মত লহর খেলে গেছে। বনের ভিতর বাস করে এক বেদেনী—তার মুখের উপর কে এ অপরূপ রূপের রহস্যময় দীপটী জেলে দিয়ে গেছে, কার জীবনের আঁধার-রাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গো? বাদশাজাদার প্রাণের উপর দিয়ে স্পন্দন ছুটে গেল বিদ্যুতের মত—রক্তের প্রবাহ ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো তরঙ্গের মত। তার চরণ-ক্ষেপের লঘু তালে তিনি শুন্‌লেন, এক প্রেমের গানের সলয় ছন্দ—তার আঁচল খানার মৌন মর্ম্মরে তিনি শুন্‌লেন, কোন্ স্বপ্নলোকের নটী-কণ্ঠে-গাওয়া গানের সাবলীল মূর্চ্ছনা—এক মুহূর্ত্তে মুগ্ধ হয়ে তিনি একটা কি ভেবে ফেল্‌লেন—সেই সময় দুরারী মাটীর দিকে আঁখির তারা নীচু করে বল্লে, "আমি যে বেদেদের মেয়ে—শিকারীর ঘরের বউ। আমার হাতের—"

"তাতে বয়ে গেছে—শাজাদার। আমার আভিজাত্যের গৌরব নষ্ট কর্‌বে কে সে কমবখ্‌ত! সুন্দরি, একটু পানীয়—আমি বড় পিপাসিত।"

দুরারী বল্‌লে—"এ আমার বড় মান,—শাজাদা! স্বামী আমার শিকারে বেরিয়েছে—মুসাফেরকে আজ আমারই হাতের সেবা নিতে হবে।"

"মোসাফের ধন্য হয়ে যাবে—"

আর দেরী নয়,—দুরারী তার যা-কিছু শোভন, সরস, খাঁটী, মিঠা,—তাই দিয়ে অতিথিকে তুষ্ট কর্‌লে—বাদশাজাদা আছেন শুধু ঐ মুখখানির দিকে তাকিয়ে তার বুক খানার উপর কটাক্ষ হান্‌তে—কফোনীর কাছে হাতের বাঁকটা অমন করে গ'ড়ে—সে শিল্পী কেন এ রূপ তৈরি কর্‌লে!—ভাব্‌তে লাগলেন।

এমনি ক'রে কুটীরখানার ছায়ায় বসন্তের বিকেলটা স্নিগ্ধ হয়ে এলে ঐ পরীর মতন মুখখানার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে বাদশাজাদা বিদায় নিলেন—দুরারীর চোখে কিন্তু সেই লালসা-নীচ দৃষ্টিটা ভাল ঠেক্‌লো না।

তার পর একদিন ফাল্গুনের সূর্য্য যখন আগুনের হল্কা তুলে দিনের মাঝ-বুকে ছুঁড়ে মারছিলেন, সেই সময় শাজাদার আরাম-বাগের অন্দর-মহল থেকে খোজা এসে তার হাতীর দাঁতের কাজ-করা তাঞ্জামের ভিতর তুলে—দুরারীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। দুরারী কত মিনতি করলে, সেধে সেধে পায়ে ধ'র্‌লে, তার সবুজ উঠান খানির উপর কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল—কিন্তু হতভাগিনীর কাঁদা-কাটী শোন্‌বার প্রাণ তাদের কই?

বাদশার রংমহালের পাশে বাদশাজাদার যে মহলটীর চূড়া আকাশ-পানে উঁচু হয়ে উঠেছিল, তারা তাকে সেইখানে নিয়ে চল্‌লো—তার সারা দুপুরের সাথী পোষা পায়রাটীও তাঞ্জামের উপরে উপরে উড়ে দুরারীর সঙ্গে গেল।

সন্ধ্যাবেলা হতভাগা বান্নু এক প্রাণ আশা আর এক খাঁচা পাখী নিয়ে ঘরে ফিরলো। বাড়ীর নীচে দাঁড়িয়ে রোজই যেমন ডাকে, আজও তেমনি করেই ডাক্‌লে—"দুরারি—" কিন্তু দুরারী তো আজ উত্তর দিলে না! ঘন-বনের সুদূর শেষে শুধু একটা প্রতিধ্বনি কি যেন এক ভয়ানক খবর বলে উঠ্‌লো। বান্নুর বুকখানা কেঁপে উঠ্‌লো—সে আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার ডাক্‌লে, "দুরারি!" কৈ, না! কাজল-টানা চোখের পাতায় আনন্দের বিদ্যুৎ চমকিয়ে তার প্রণয়ের রাণী তো সেই তার অবসন্ন চোখের সামনে দেখা দিলে না! বান্নু ভাবলে, আজ দুয়ারীর কি হলো, তা'হলে?

বান্নু কুটীরের সাম্‌নে গেল—কুটীরের দরজা খোলা! বান্নুর আধখানা বুক শুকিয়ে উঠল—চোখের পাতায় জল এসে তার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিটাকে ভিজিয়ে তুল্‌লে।

বান্নু আস্তে আস্তে কম্পিত পায়ে কুটীরে ঢুক্‌লো—দেখে মেজের উপর পাতা বিছানাখানা খালি পড়ে আছে—কুটীরের কোনোখানেই দুরারী নেই! তার বুকের মধ্যে একটা তীব্র হাহাকার ভয়ঙ্কর বেদনায় আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো।

সে একটা বড় মশালে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে কুটীরের চার ধারে,—নদীর তীরে তীরে তার আদরের দুরারীর খোঁজ করলে, সমস্ত বনটা তন্ন তন্ন করে হাত-ড়ালে—আতিপাতি করে দেখ্‌লে—তৃষ্ণা-শুষ্ক-কণ্ঠে "দুরারি, দুরারি," বলে কত ডাকা-ডাকি করলে—কিন্তু হায়রে, বেচারা! তার সে ডাকে সেদিন কেউ সাড়া দিলে না! —ক্লান্ত চোখের সম্মুখে এসে দুরারী ত হেসে উঠ্‌লো না!

তখন আশ্বাস-হারা তার ভাঙা বুকখানার উপর কেবলই একটা হায়-হায় নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দুলালের পাতা সেই বিছানার উপর সে শুয়ে পড়্‌লো—বিনিদ্র চোখ বুঁজে কত কি ভাব্‌তে লাগলো—ভাব্‌তে ভাব্‌তে সারাটা রাতই সে পুইয়ে ফেললে।

পরদিন সকালে বান্নু যখন বিছানা ছেড়ে বাইরে এল, তখন পূব আকাশের সোনালি আঁচলায় রক্তরঙের ধূপছায়া কাজ করে সূর্য্য উঠেছে—কেলুগাছের পাতায় পাতায় তার লালিমার রঙ্গ-নৃত্য চঞ্চল হয়ে উঠে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে সিঁদুরের ঝরণা ঝরাচ্ছিল। আর বান্নুর বুকে তখন রক্তের ঢেউ জমাট বেঁধে উঠে নিশ্বাসটা তার চেপে ধর্‌তে চাইছিল; এমন সময় সে দেখলে,—কেঁলুর লাল পল্লবের উপর ছোট্ট ছোট্ট পা দুটী পেতে দুরারীর পোষা পায়রাটী বসে আছে। তাকে দেখে বান্নু পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"দুরারী কই? আমার দুরারী—বুকের দুরারী—আমার কলিজার দুরারী—কই?" পায়রাটী আস্তে আস্তে উড়ে এসে বান্নুর হাতে বস্‌লো। কেলুর মতই তার

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

াল ছোট ছোট চোখ দুটীতে ছোট দু'ফোঁটা জল—আর ডানার সঙ্গে বাঁধা একখানা কাগজ—ঐ রকমই রাঙা।

বান্নুর বুকে আশার চমক তড়াক্ করে উঠ্‌লো—সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে দেখে—একটী ছবি আঁকা—আগাগোড়াই তার দুরারীর হাতের সেই পরিচিত তুলির টান্—তার রেখায় রেখায় হতভাগা শিকারীর দুঃখ-দুর্দ্দিনের সুখ-সৌভাগ্যের জীবন-মরণের চিরসাথী দুরারীর চাঁপার গুচ্ছ আঙুল কটীর স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠে প্রাণের গোপন কোণের লুকোনো ব্যথার কাহিনী লিখে পাঠিয়েছে—প্রথমটা একটা পিঞ্জরে—তাতে সোনার শিক, মণির দাঁড়—ইরাণী আখ-রোট কাবুলী পেস্তা, কাশ্মীরী আঙুর অঢেল—পিঞ্জরের মাঝে একটা মনিয়া—বুঝি ব্যথায় মুষ্‌ড়ে পড়েছে—এ সব সম্পদ সে তুচ্ছ করে পিঁজ্‌রে ভেঙে ফেলে বেরিয়ে আস্‌তে চায় ঐ উদার অবাধ একটানা আকাশের ঘন নীলিমার নীচে—কিন্তু প্রহরী বড় সতর্ক—বড় কড়া তার দৃষ্টি—সে দিন-রাত অষ্টপ্রহর নজর রাখ্‌ছে—মনিয়াটী নিরুপায় হয়ে শুধু চোখের জলে বুক ভিজুচ্ছে! প্রাচীন এসিরীয় প্রহরীর চেহারার নীচে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—"শাজাদা।"

ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘৃণায় বান্নুর মন ছি-ছি করে উঠ্‌লো—রাগে জ্বলে উঠে তার আসল-ইস্পাতের চক্‌চকে ভোজালিখানা বার করে আপন মনে সেই মাটীর উপর কোপাতে লাগলো—শেষকালে লজ্জায় ভয়ে কেমন যেন অবসন্ন হয়ে তার সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে এল—ভোজালির চোট্ আর হান্‌লো না—চোখের সে ধক্‌ধকানি শুধু তখনো মলো না—সে কেলু ফুলের কালী দিয়েই ছবির উপর ছবি আঁক্‌লে—একটা তর-তরে-ধার বাণ পিঞ্জরের গোড়া থেকে শাজাদার বুকে গিয়ে পৌঁচেছে।

ছবি আঁক্‌তে আঁক্‌তে মনটায় তার কি জানি কি আকুলি-বিকুলি উদ্দাম হয়ে উঠ্‌লো—বাঘছালের আচকান এঁটে পাখীর পালকের বাহার-দেওয়া পাগড়ী উড়িয়ে সে সহরের দিকে বার হয়ে গেল—কিন্তু পায়রাটা যে সেই ছবিখানা মুখে করে আবার আরাম-বাগের পানে দ্রুত উড়ে গেল—সে খবর বান্নু রাখলে না।

বাদশার পুরী—শ্বেত পাথরের চৌ-মহলা চক্‌চকে তেল-তেলা—গম্বুজ তার আকাশের নীল ছুঁতে সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে—দ্বারে শান্ত্রী তরোয়াল ঝল্‌মলিয়ে, জেল্‌লাদার পোষাক ঝক্‌মকিয়ে, আঠারো হাত লম্বা উষ্ণীষ মাথায় জড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে—পাথরের উপর ঠক্-ঠকাৎ তার নাগরার শব্দ নিষেধের চেয়েও কড়া—আঘাতের চেয়েও মর্ম্মান্তিক হয়ে—পথিক বা অচেনা প্রবেশার্থীর পথ-রোধের বিজ্ঞাপন জারি কর্‌ছে। বান্নু শিকারী সেই মহলের সাম্‌নে দাঁড়াতেই প্রহরীর রক্ত চক্ষু আজ আরও রক্তিম হয়ে উঠ্‌লো—কঠোর কণ্ঠ অত্যন্ত গম্ভীর করে সে বল্‌লে—"এইয়ো দাঁড়াও, তোমার কোতল হবে।"

রাজপুরীতে সব চুপচাপ,—দূর থেকে দেখে মনে হয়—এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে

আছে! গম্বুজের নহবত্-রাগিণী বন্ধ, গাড়ী-ঘোড়া চল্‌ছে না, দোকানপাট্ খোলে নি—সমস্ত রাজধানীটার উপর দিয়ে যেন এক কালো ছায়া আসন্ন হয়ে এসেছে—বান্নু আস্‌তে আস্‌তেই তা অনুভব করেছিল,—কিন্তু সে যে আজ মরিয়া—স্পষ্ট করেই নির্ভয়ে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আজ সব নীরব কেন, শান্ত্রী?" লোকটা বান্নুর মুখের দিকে ক্রুর কটাক্ষে একবার তাকিয়ে রুদ্ধ গলায় জবাব দিলে—"নির্ব্বোধ, কোতল হবে তোমার। কোনো প্রশ্ন করো না।"

বান্নুর প্রাণের ভয় নেই,—সে বল্লে, "কোতল কর্‌বে। সব নীরব কেন, বল?"

এবার যেন প্রহরী কি ভেবে একটু নরম হল—বান্নুর কানের কাছে মুখ নীচু করে বল্লে, "শাহাজাদা খুন হয়েছেন।"

বান্নুর বুকের রক্ত হঠাৎ বাধা পেয়ে বুঝি থম্‌কে গেল! সে চম্‌কে উঠে শুধু, বল্লে, "অ্যাঁ—" বড় বড় চোখ দুটো তার তখন ধকধক করে জ্বলে উঠেছে! শান্ত্রী কিছু না বুঝে বল্‌লে, "হ্যাঁ—কিন্তু বাদশার কড়া হুকুম, আজ কেউ পথে বেরোতে পার্ব্বেনা—তুমি কি ক'রে এলে, হতভাগ্য এই পুরীর দরজায়?—তোমার কোতল হবে।"

"কোতল হবে" ছাড়া সে কথার আর এক হরফও বান্নুর কাণে পৌঁছুলো না—সে শুধু বল্‌লে—"কোতল হবে আমার! খোদা! কোতল কর্‌বে! বাদশাজাদা খুন হয়েছেন?—কে খুন করলে তাঁকে, শান্ত্রী?"

"খবর পাওয়া যায় নি এখনো—কিন্তু আমি এই খুনের রক্তের উপর আবার নিরপরাধের হত্যার রক্ত ফেল্‌তে চাইনে—তুমি পালাও।"

লোকটা ভাল। এর মধ্যে পুরীর ভিতর একটা অস্ফুট কোলাহল শোনা গেল—তার পর একটু স্পষ্ট—তার পর বেশ পরিস্ফুট—একজন অন্তঃপুর-চারী খোজা যাচ্ছিল—দ্বারের প্রহরী তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কি হয়েছে?" সে গম্ভীর স্বরে বল্‌লে—"বাদশা-জাদাকে খুন করেছিল যে কসবী দুরারী বেগম, সে কারার ভিতর জহর খেয়েছে। বাদশা যাচ্ছেন তাকে দেখতে।"

বান্নু গুপ্ত আঘাতে আহত হতভাগ্যের মত একটা বিকট চীৎকার করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো—প্রহরী দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে শেষ একটা টানা নিশ্বাসের সঙ্গে দুজনেই বল্‌লে—"এ কি!"

কুটীরের দাওয়ায় দুরারী যেখানে আঁচল খানি বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে সন্ধ্যার আকাশে লাখো হাজার মাণিকের টুক্‌রো একে একে ফুটে উঠ্‌তে দেখ্‌তো—তমাল-লতার কচি বুক বেঁকিয়ে গড়া জাফরীর পাঁজর ভেঙে জোৎস্না যেখানে বেরিয়ে এসে খুনের রক্তের মতই লাল দুরারীর ঠোঁট দুখানির উপর তরল আর রূপালি আঙুলের পল্‌কা-রেখায় হাল্‌কা ছায়ার আল্‌পনা টান্‌তো, ঠিক সেইখানটায় এসে বান্নু আছাড় খেয়ে পড়লো, হাউ হাউ করে কাঁদলে—বুকের উপর চাপড় মেরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—লুটোপুটী খেয়ে পড়তে লাগ্‌লো। আবার দু' হাতে বুকখানা চেপে ধ'রে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

অনুভব করলে—হতাশার ব্যথায় তপ্ত রক্তের স্রোত সমুদ্রের জোয়ারের মতই বুঝি ফেনিয়ে ফুঁপিয়ে চলেছি—তার পর চিৎ হয়ে শুয়ে চুপ করে কি খানিকটা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"জহর খেয়েছে, জহর খেয়েছে—অসাড়, হিম, নীল হয়ে গেছে সে—নীল তার আঁখির তারা পিংসে হয়েছে,—ঠোঁটের লাল ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—চোখের তো আর পলক পড়ে না—প্রাণের যে সাড়া নেই—একেবারে নেই—চিরদিনের জন্য নেই—হায়, হায়! হায় হায়। উঃ ফেটে গেল—বুকখানা ফেটে গেল—"

পাগল হয়ে গেল বুঝি বেচারা—দুই হাত শক্ত করে ঘিরে নিজের বাহুমূল জড়িয়ে ধরলে সে—দূরে আখরোট গাছটা নিস্পন্দ দাঁড়িয়েছিল—সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগ্‌লো—"ঐ তো—বেগুনে ডুরে পরে বসে আছে দুরারী—ঐ যে তার গলায় বনতুলসীর জরদা মঞ্জরীর মালা দুল্‌ছে—ঐ যে 'গোরা রঙ ফুটে বেরিয়ে আস্‌ছে—এলানো চুলের কালো ফাঁকের ভিতর দিয়ে"—ছুটে গিয়ে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"দুরারী", "দুরারী"—আলিঙ্গনের মধ্যে খালি মিছে কথা—ছায়া। ঝালার নীরে হরিণটা এসেছিল জল খেতে—ঐ তো ঝালার জল ছল ছল কর্‌ছে—পাথরের উপর শিং লেগে ঠন্ ঠন্ কর্‌ছে—ঐ না তারি কাঁকণের কন্ কন্—হ্যাঁ দুরারী—আছে, আছে—ঐ যে—দুরারী, দুরারী, পেয়ারী, মেরে জান, আমার কলিজা"—অমনি ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো! হায়রে, শোক-ব্যাকুল, আপনাহারা প্রেমিক—দুরারী কি আর আছে—পার্ব্বত্য নদীর ফটিক-ভাঙা জল—শীতল বরফ—তোমার শুধু হাহাকার।

তার পর থেকে রোজই এম্‌নি বান্ন, যেখানে-সেখানে শুধু দেখে দুরারী—প্রাণের ভিতর তার দুরারী, বাহুর বাঁধনের ভিতর অনুভব করে—দুরারী—আকাশে, বাতাসে, রৌদ্রে, শিশিরে—ভিতরে-বাহিরে—দুরারী শুধু দুরারী!

বান্ন আর শিকার করে না—খাঁচা ভেঙে পাখী সব উড়িয়ে দিয়েছে, বিছানা খানা ঝালার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, বন-কপোতের জন্যে চেঙারী বেঁধে বাসা গড়ে দিয়েছে—তারা জোড়ায়-জোড়ায় সেখানে রাত কাটায় আর নিজে সে বেচারী রাতে কোথায় থাকে তা কেউ জানে না।

দুপুর রাত্রে যখন হীরে-মহলের চূড়ায় বারটার গজল ঢন্-ঢনিয়ে ওঠে, তখন হঠাৎ বাদশার ঘুম ভেঙে যায়। পশমের চেয়েও মোলায়েম তাঁর বিছানার উপর কিসের যেন তড়িৎ স্পর্শে স্বস্তিটাকে সব উবিয়ে নেয়—একটা বিষম যন্ত্রণা কাঁটায়-বোনা তার ধারালো আঁচলে বেঁধে বাদশার সমস্ত ঘুমটুকু চুরি করে পালায়! মখমলের বালিস ছেড়ে তিনি খাটের বাজুর উপর মাথা রেখে এক মনে শোনেন—দূরে বাদশা-মহলের গোলাপ বাগিচার প্রান্ত রেখায় সীমাবদ্ধ সুদূর মাঠেরও ওধার থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে সে সুর—করুণার বন্যায় স্নান করানো তার আবেশ বুঝি মীড়ের রিশে মিশে, মূর্চ্ছনার উচ্ছ্বাসে বুক-ভাঙা কান্নার ঝরণা ঝরিয়ে দেয়—রোজই ঠিক ঐ একই সময়ে কে গায়,—

"বনের পাশে ফুটেছিল সেই একটী গোলাপ—নিষ্ঠুর তুমি ওগো পথিক, ঝড়ের মত নিমেষে এসে পাপড়ি কটী তার ছিঁড়ে ছুঁড়ে ঝরিয়ে দিয়ে গেলে? হা নির্ম্মম!

"অনন্ত আকাশের সুনীলিম বিস্তার বেয়ে অনন্তেরই যাত্রী সে বুল্‌বুল্ গান গেয়ে পাখা মেলে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় উড়ে চলেছিল—ক্রুর ব্যাধ, তোমার বুকে এতটুকু ব্যথা বাজ্‌লো না—অমন বিষাক্ত বাণ মার্‌লে তাকে তুমি, মর্ম্মহীন!

"শুধু আমারি শিষে শিষ্ দিত আর এই ব্যাধের মোটা আঙুলের কড়া তাড়িতেই নাচতো সে দোয়েল—পিঁজ্‌রে ভেঙে তাকে নিয়ে বন্দী কর্‌লে, খাস-মহলের সোনার ফাটকে,—ব্যাধকে ফাঁকি দিয়ে রে বেইমান,—সে কি টেঁকে?—সে যে আমারি পিঁজ্‌রের পোষা দোয়েল—জীবনে-মরণে সে আমারি!

"তার জহর-খাওয়া মরণের তীব্র নীল তোমার খুনের রক্তে মিশে বেগুনে বিষের সৃষ্টি কর্‌বে—জর্জ্জরিত কর্‌বে তোমার আত্মাকে, উচ্ছন্ন দেবে তোমাদের সাম্রাজ্যকে,—শ্মশান কর্‌বে তোমাদের মহলকে,—হতভাগা, দরিদ্রের বুকখানা খালি করে মোতির মালা-গাছি নিয়ে গেছ! দুনিয়ার মালিক তার একান্ত আত্মার আধার পাঁজ্‌রা কখানা গুঁড়ো করে—তারি একমুঠো ধ্বংসের তেজে গলিয়ে অভিশাপ গড়্‌চেন,—সে জন্ম-জন্মান্তর ফিরবে তোমারি পিছনে, ফুল দিয়ে গড়া ধনুর গন্ধ-মাখা তূণের ভিতর তোমারি মৃত্যুবাণ লুকিয়ে নিয়ে।"

সারারাত ধরে কে যে এই গান গায়, কেউ তা বুঝ্‌তে পারে না।—বাদশার হুকুমে হাজার গোয়েন্দা অনুসন্ধানে লাগলো কিন্তু তাকে ধর্‌তে পারলে না।—রক্তে বাদশার শঙ্কা হয়েছে—মৃত্যুর খবর তাঁর বুকের নীচে পর্য্যন্ত একটা তরোয়ালের আঘাত পৌঁছে দেয়—এ গান তাঁকে উন্মাদ করে তুল্‌লে—কিন্তু কি এ, কে সে গায়ক—ছায়ার মত অলক্ষ্যে এসে বেহেস্তের মদিরা-মাখানো সুরে নুয়ে-পড়া দেহের, টুটে-পড়া প্রাণের কাহিনী এমন করুণ সুরে বলে যায়! আচ্ছা, দেখ্‌তে হবে,—কেউ পেলে না সে গায়কের খোঁজ? না। সবাই খুব লক্ষ্য করে গোপনে গোপনে এগিয়ে যায়—গানও দূর হতে দূরান্তরে অবারিত মাঠের সুদূর শেষে—আকাশ যেখানে বাঁকা হয়ে মিশেছে—সেই দিক পানে সরে-সরে যায়।

সে দিন বাদশা নিজেই বেরোলেন—ছদ্মবেশে—সঙ্গে কেউ নেই! নিস্তব্ধ রাতের নির্জ্জন প্রহর কাঁপিয়ে মিঠা কণ্ঠের লহর-তোলা সুর-কল্লোলে সে গান হাওয়ায় হাওয়ায় ঊর্দ্ধে উঠে বুঝি ঐ আকাশের ওপারকার কোন্ অগোচর দেশের শাহান-সার কাছে—কার কাতর প্রাণের নিবেদন নিয়ে ছুটেছে!

বাদশা প্রথমটা একমনে লক্ষ্য করে জায়গাটার নিশানা নিলেন—তার পরে একটানা চলে গিয়ে পৌঁছুলেন—প্রায় আধ ক্রোশ দূরের একটা বট গাছের আবছায়া অন্ধকার-তলায়। গান তখন সেখান থেকে অনেক দূরে গিয়ে উঠেছে। বাদশা টের পেলেন—এ গায়কের ওস্তাদি! সে হরবোলা—এই কাছে, এই দূরে, এমনি করেই সুর তোল্‌বার সে সাধনা করেছে।

বাদশা গাছের ঝুরি ধরে খানিকটা

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

উপরে উঠতেই দেখেন—একখানা বাঁকানো ডালের উপর ঝাপসা পাতার আড়ালে বসে কে একজন। বাদশা শাসকের দৃঢ়কণ্ঠে অধীশ্বরের গাম্ভীর্য্যে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তুমি—রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে রোজ গান গাও?"

আর লুকোচুরি চল্‌বে না—আর গোপন করা মিছে বুঝে বান্নু আস্তে আস্তে বল্লে, —"আমি ব্যথা-হত, প্রিয়া-হারা উন্মাদ—আমাকে কেন?"

"উন্মাদ তুমি নও,—উন্মাদ তোমার প্রেম! কিন্তু যে গিয়েছে, তাকে কি আর পাওয়া যায় —হতভাগ্য! যাও, কুটীরে ফিরে যাও—"

"পাওয়া যায় না? কে বল্‌লে পাওয়া যায় না? এই যে সে আমার বুকের ভিতরে— এই গানের সুর তার অশরীরী আত্মা বয়ে এসে আমার বাহু-বন্ধনের ভিতর মুক্ত করে দিয়ে গেছে।"

"তুমি তা অনুভব করছ?"

"অনুভব নয়, প্রত্যক্ষ করছি—এই যে তার প্রস্ফুট অধরের প্রান্তে আমার একান্ত চুম্বন-ঘুমন্ত তার চোখের পাতা আস্তে আস্তে মেলে দিচ্ছে—আধ-ফুটন্ত গোলাপের রক্ত-বরণ পাপড়ি দুটীরই মত।"

"এত প্রেম!—অগাধ—অতলস্পর্শ—এ যে মহান্। প্রেমিক, গৃহে ফিরে যাও—আর নিত্য নিশি জেগে এমন আকুল কান্না কেঁদো না। খোদা তোমার এ ভালোবাসার বখসিশ করবেন, নইলে তিনি খোদাই নন্! এস, নেমে এস, মুসাফের—তোমার প্রণয়ের রাণীর সোহাগ-ভরা বুকের মধ্যে নিশ্চিন্তে নিশি যাপন কর্‌বার জন্য—সেই বিশ্ব-শিল্পী নিজের হাতে ইমারত গড়ে দেবেন।"

বাদশার সঙ্গে সঙ্গে খানিকদূর এসে বান্নু তাঁর আরজি-ভরা অনুরোধ এড়াতে না পেরে বনের দিকে চলে গেল। বাদশা অন্দরে ঢুক্‌লেন।

তার পর দিন থেকে হাজার হাজার মজুর দিন-রাত খেটে জঙ্গল কেটে কালো পাথরের ইমারত গড়ে তুল্‌তে লাগ্‌লো, বান্নুরই কুঁড়েখানার পাশে—কেউ বুঝলে না—কেন? সবাই বল্‌লে—বাদশার দৌলতের বিকার।

বাড়ী শেষ হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাত্রির সন্ধ্যা সেদিন পূর্ণিমার আলো নিয়ে বনের সবুজ রাজ্যের বুকে নেমে এল। বেচারী প্রেমিক কুঁড়ের দাওয়ায় এলিয়ে পড়ে চোখ বুজে স্বপ্ন দেখ্‌ছিল—পরীর রাজ্য থেকে প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে দুরারী তার বুকের উপর ফিরে এল! সে ব্যাকুলতা-ভরা চিত্ত-হারা আবেগে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে দুরারীর স্থলপদ্মের মত গোলাপী ঠোঁটে—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে—"অ্যাঁ! দুরারী! দুরারী? না, না, মিছে কথা।"

পিছন থেকে বাদশা বল্লেন—"হ্যাঁ, এ দুরারী—মিছে নয় প্রেমিক, এই তোমার প্রেমের রাণী দুরারী—এই তার রাজ্য— ঐ রাজ-পুরী—আমি গড়ে দিয়েছি—আর দশলক্ষ আসরফি—আমি বাদশা—তোমার প্রেমের জহর খেয়েছি আমি।"

বান্নু বল্‌লে, "চাইনে, চাইনে—ফিরিয়ে নিয়ে যাও শাহান্‌সা—শুধু কুঁড়েখানা দিয়ে যাও—কোটী কোটী কত কোটী-লক্ষ যে তার লেখা-যোখা হয় না—এমনো আসরফি রয়েছে এই আমার বুকের ভিতর!"

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আখেরী

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ-দিনেতে,
মজ্জাগত গোলাম-সমঝ শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বল্‌ব জোরে,
মিথ্যা দলীল তাদের, যারা জীবকে ছ্যাখে তুচ্ছ ক'রে।
দলীল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় ক'রতে খাটো,
হাম্‌বড়াইএর সংহিতা-কোড্ বেবাক কাটো, বেবাক কাটো।
সবাই সমান এই জগতে কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে,
কার কাছে তুই নোয়াস্ মাথা, ত্রস্তচোখে কম্প্রদেহে?
সবাই সমান আঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা,
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-ধুয়া মিছাই ধরা।
মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের মিথ্যা গরব রঙ্ বা ঢঙের,
ভেদের তিলক তক্‌মাতে লোক সংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
মরদ ব'লেই গরব যাদের,—চায় নারীদের দল্‌তে পায়ে,
তৈমুরও যার স্তন্যে মানুষ মরদ সে কি? আয় সুধায়ে।
চেঙ্গিজও যার পীযূষ-কাঙাল পুরুষ সে কি? জিজ্ঞাসা কর্;
মাংসপেশীর পেষণ-বলে হয়না মহৎ হয়না ডাগর।

* * * *

কংস-জরাসন্ধ-রাবণ-সেকেন্দার ও মিহিরকুলে
দেখে নে তুই কল্পনাতে প্রসব-ঘরে শ্মশান-ধূলে।
মিছের ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জম্‌ছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লুহাজাল দুইহাতে দুই মশাল জ্বালি।
পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ-নরক পুণ্য-পাতক ছাই ক'রে দে,
লোভের চিঠা ভয়ের রোকা জ্বালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে;
মেকীর উকীল মেকলে আর ভারত-মনু মনুর পুঁথি
স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য বহ্নিকুণ্ডে দে আহুতি।
আর্য্যামি আর জিঙ্গোপনায় ছাই দিয়ে দে, কিসের দেরী?
ছাই হ'য়ে যাক্ মর্দ্দ-গরব, আজ আখেরী, আজ আখেরী।

* * * *

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

প্রণাম দাবী করছে কারা মুনি-ঋষির দোহাই পেড়ে ?
স্পষ্ট বলি পৈতা-ওলায় ও লোভ দিতে হচ্ছে ছেড়ে।
থাউকো-দরে আদর ক'রে অমানুষের দল বেড়েছে,
থাক-বাঁধা জাত মিছার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে।
হাজার হাজার বছর পরে দেশ-ছাড়া ফের ফিরছে দেশে,
ভয় ভেগেছে উষার আগেই দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে !
দেশ জেগেছে অবিচারের বন্যাতে বাঁধ দেবার আশে,
পাইকারী প্রেম থাউকো ভক্তি উড়িয়ে দেব অট্টহাসে।
প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
দধীচ মুনি মহৎ ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে ?
ঘুষ খেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙ্‌লা অন্ধকারে,
বামুন ব'লেই পূজ্‌ব কি সেই ঘরের কুমীর মজুন্দারে ?
বামুন ব'লেই করব ভক্তি চাঁদ-কেদারের পুরোহিতে
অন্নদাতার কন্যাকে যে মুসলমানে পারলে দিতে ?
বামুন ব'লেই করব খাতির শুনঃশেপের ঘৃণ্য পিতায়
হাড়কাটে যে নিজের ছেলে বাঁধ্‌তে রাজী, ধন যদি পায় !
ঘুষের রাস্তা বন্ধ দেখে রাজায় ডেকে যজ্ঞশালে
পুত্র-বলির যুক্তি যে ছায় পূজ্‌ব কি সেই খণ্ডহালে ?
বামুন ব'লেই পূজ্‌বে হিন্দু ভৃগুকুলের মত্তহাতী ?—
কৃষ্ণ-প্রেমিক পূজ্‌বে তাদের ঝুঁঝে যারা ছাখায় লাথি ?
ভিক্ষু-শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিল্‌ল ব'লে
হর্ষেরে খুন করতে যে যায়, অলোভ তাদের কই কি ছলে ?
গুজ্‌রাটেতে আব্‌রু নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরে
স্বদেশ যেজন পরকে দিলে পূজ্‌ব কি সেই বিপ্রবরে ?
রাজপুতানার গড় ঘিরে যে, মুসল্‌মানের অভিযানে,
বাঁধ্‌তে গরু যুক্তি দিলে, পূজ্‌ব কি সেই বুদ্ধিমানে ?
"দুর্গপথে তুল্‌সী ছড়াও, মাড়াতে তায় নারবে মোগল"
এমন যুক্তি যাদের তারাও ভক্তিভাজন ? হায়রে পাগল।
হিন্দুচূড়া নন্দ-কুমার,—যে পরালে তাঁরেও ফাঁসী
গলায়-দ'ড়ে রাম-ফাঁসুড়ে তারেও দেব অর্ঘ্যরাশি ?
তুড়ুঙে যার শান্‌লোনাকো আন্‌তে হ'ল গিলোটিনে
মদ্র হ'তে বঙ্গভূমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-ঋণে ?

পুলিশ-টাউট্ নেশায় আউট্ গঙ্গাজলী-সাক্ষ্যে দড়
বিট-বিদূষক ভেড়ুয়া-পাচক বামুন ব'লেই মান্‌ব বড় ?
কালিদাসের কাব্য অমর তাঁর গুণে দেশ আছেই কেনা
তাই ব'লে পাঁউরুটি-ওলার পায়ের ধুলো কেউ নেবেনা।

* * * *

জাতের খাতায় সাফ সুকৃতি দেখিয়ে শুধুই মস্ত হবে ?
দুষ্কৃতি যে দেউলে' ক'রে ছায় তলিয়ে অগৌরবে ;—
তারো হিসাব চাইছে জগৎ, দাখিল করো নাইক দেরী,
প্রণাম দাবী ছাড়্‌তে হবে নাইক দেরী, আজ আখেরী।
শ্রদ্ধা-ভাজন সত্যি যেজন তারেই মানুষ শ্রদ্ধা দেবে,
রাহাজানি করলে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে।
পাইকারীতে তরবে না আর জাতের টিকিট মাথায় এঁটে
সে যুগ গেছে সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে।
সেক্সপীয়ারের স্বজাত ব'লে পুছ্‌বে না কেউ কিপ্‌লিঙেরে
চৌচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আস্‌ছে সেরে।
বার্ক্-শেরিডান মহৎ বলে ইস্পে-ক্লাইব পূজ্‌বে কেবা ?
হেয়ার-বেথুন স্মরণ ক'রে হোঁৎকা গোরার চরণ সেবা ?
কর্জ্জনেরে কেউ দেবে না গার্ড ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু,
লর্ড্ সাহেবের মর্য্যাদা কি টুটবে জিঙ্গো পাদ্‌রী প্রভু ?
হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়্‌বে ওলাই-চণ্ডী কি হায় ?
বেসাণ্ট্ সে নৈবেদ্য নেবে অর্পিত যা' নিবেদিতায় ?
রং দেখিয়েই ভড়্‌কে দেবে ?' তেমন শিশু নাই দুনিয়া,
ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ডায়ার-প্রেমী হিষ্টিরিয়া ?
মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এম্‌নি কি মাহাত্ম্য ত্বকে ?
ফর্সা বলেই করব খাতির চর্ম্ম-গূঢ় মহত্ত্বকে ?
দোকানী যে রেজ্‌কী কুড়ায়,—নাক তুলে রাজ-কায়দা করে
তারেও কি রাজভক্তি দেব ? রাখ্‌ব কী ধন রাজার তরে ?
অভদ্র যে রেলগাড়ীতে, অভব্য যে খেলার মাঠে,
তারেও নাকি করব খাতির অকথ্য যে রাস্তাঘাটে ?
নিশীথে যার হরিণ-শীকার, ফকির-শীকার দিন দুপুরে,
যার পরশে কুলির প্লীহা বিস্ফুরকের মতন স্ফুরে,

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

রাস্তাতে যে বুকে হাঁটায়, নিরস্ত্রে যে খাওয়ায় খাবি,
ঘোম্‌টা খুলে ছাড়ায় যে থুতু রাজপূজা সেও করবে দাবী ?
সাহেব ব'লেই করব সেলাম ? মন্দ ভালো বাছ্‌ব নাকো ?
অন্যায়ে যে করবে কায়েম বল্‌ব তারে সুখে থাকো ?
খুনীরে যে দেয় খোলসা আইন গ'ড়ে রাতারাতি
প্রশস্তি তার পড়ব কি হায়, প্রকাশ ক'রে দন্তপাঁতি ?
গোরা ব'লেই গৌরবে কি দিতে হবে শ্রীবুট মুড়ে ?
বামুন ব'লেই নাহক প্রণাম করতে হবে হস্ত জুড়ে ?
মরদ ব'লেই মর্দ্দানি কি সইবে নীরব মাতৃজাতি ?
আত্মালাভের প্রসাদ-পবন জাগ্‌ছে রে, তাথ্‌ নাইক রাতি।
সঙ্কুচিত চিত্ত জাগে দেখিস্‌ কি আর চিঠার ঢেরি,
হিসাব নিকাশ করতে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী।

* * * *

বুঝ্‌-সমঝের বইছে হাওয়া গোলাম-সমঝ্‌ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর কর্‌ছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে !
মুরুব্বিদের কর্‌ছে তলব চাইছে হিসাব চাইছে চাবী,
মানুষ ব'লেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি কর্‌ছে দাবী ;
তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে
নিখিল নরে রন্‌ নারায়ণ পুণ্য-পাঞ্চজন্য হাতে।
তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি-নির্ব্বিশেষে
বিশ্বে নিকাশ-আখেরী আজ নূতন যুগে, যুগের শেষে।
চিনি ব'লে চুণ যে খাওয়ায় চল্‌বে না তার সওদাগরী
নিখুঁত হিসাব তেরী করো রেখোনা ভুল খাতায় ভরি।
খাদ কষে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে
মদের গেলাস আছ্‌ড়ে ভাঙো মুরুব্বিদের ওড়াও হেসে।
মন খুলে বল্‌ মনের কথা জম্‌তে বুকে দিস্‌নে ঘুণা,
মন্দকে বল্‌ মন্দ সোজা, পালিস বিনা রসান্‌ বিনা।
দাম-নিরূপণ পাল্‌টিয়ে কর রদ্দি যে তায় ফেল্‌রে ছুঁড়ে ;
মধুফলে মিল্‌লে পোকা ঠাঁই হবে তার আঁস্তাকুড়ে।
সত্য কথা বল্‌ খোলসা, করিস্‌নে ভয় নিন্দা-গালি,
মিথ্যাবাদী নাম যারা ছায় তাদের মুখে দে চুণকালি।

পাওনা-দেনা ঠিক দিয়ে নে দিল্‌-গোলামীর নিকাশ ক'রে,
মানুষ আবার মানুষ হবে বিশ্বে বিশ্বনাথের বরে।
রুজু দিয়ে পাতায় পাতায় খরচ জমা তৈরী রাখো
জাব্দা-জুজুর ভয় কোরো না, টিক্‌ দিয়ে ঠিক্‌ তৈরী থাকো।
নতুন খাতার বেদাগ পাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে,—
তৈরী থাকো ; অরুণ-উষায় নতুন জীবন আস্‌বে নেবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাঁচটা টাকা

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। নবদ্বীপে গঙ্গা-স্নানে পুণ্যলাভের জন্যে দলে দলে লোক এসে জমা হয়েছে। দিনকতক আগে এসে যারা ঘাটের উপর ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বেঁধে কতকটা গুছিয়ে নিয়েছে, তাদের ঘরেও নূতন অতিথির আবির্ভাব হয়ে শান্ত নির্জ্জন গঙ্গাতীরকে কোলাহল-চঞ্চল করে তুলেছে! ঘরে ঘরে সকলকার মুখেই এই যাত্রীদের কথা ছাড়া আর কোনো আলোচনা নাই!

ষ্টেশনের মাল-বাবু ফণিভূষণ রায়ের স্ত্রী মণিমালা রান্নাঘরের দালানে বসে তরকারী কুটছিল। এমন সময় বাড়ীর ঝি মঙ্গলা সেই সকাল বেলাতেই একমুখ পাণ চিবুতে চিবুতে বাজার করে ফিরে আসতেই ঘর থেকে বাবুর মা বলে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁরে মঙ্গলা, তোর এত দেরী হল কেনরে? কোন্ চুলোয় বসে গল্প করছিলি বুঝি? রান্নাবান্না আজ হবে কখন, বল্‌ দেখি!"

মঙ্গলা হাতের মাছটা নামিয়ে রেখে বল্‌লে, "হ্যাঁ মা আজ একটু দেরী হয়ে গেছে, বাজার থেকে ঘুরে আবার ঘাটে গেনু কিনা, তাই—"

"আবার ফিরে ঘাটে গেলি কেন?"

মঙ্গলা হাসিমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে বল্‌লে, "সে যে এক মস্ত কাণ্ড হয়ে গেছে গো মা!"

গিন্নি রাগ ভুলে গেলেন, খুব আগ্রহ করে বল্‌লেন, "কি হয়েছে রে?"

কথাটা ভালো করে শোনবার জন্যে মণি-মালাও বঁটির উপর থেকে হাত তুলে সরে বস্‌ল। মণিমালার এই অল্প কিছু দিন আগেই বিয়ে হয়েছে, একে নিতান্ত গরিবের ঘরের মেয়ে, তাতে একটু বেশী বয়সে বিয়ে হয়েছে বলে সে একেবারেই ঘর করতে আরম্ভ করেছে, তবু বাপের বাড়ীর বিচ্ছেদ-ব্যথাটা তীক্ষ্ণ খোঁচার মত বুকে বিঁধে আছে, সেটা সে কিছুতেই ভুলতে পারেনি!

মঙ্গলা বল্‌লে, "হয়েছে কি ছোন মা, ঘাটে কোন্ যাত্রীদের মধ্যে নাকি কলেরা হয়েছে বলে কাল রাত্তিরে তো হুড়মুড় করে অর্দ্ধেকের ঢের বেশী লোকই পালিয়েছে, তা গঙ্গার বালির চরে একটা কচি মেয়ে পড়েছিল, বলবো কি মা, মেয়েটা যেন পদ্মফুলের মত সুন্দর—"

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

মণিমালা বলে উঠ্‌লো, "কতটুকু মেয়ে ? খুব ছোট্ট ?"

"ছোট্ট নয় আবার ! সবে জন্মেছে, নাও-য়ানোও হয়নি,—চৌকিদার সব কুঁড়ে খুঁজে যার মেয়ে তাকে ধরবে বলে ঘুরছিল, ডাক্তার বসে ছিলেন, রাজ্যির লোক জমা হয়েছে !"

গিন্নি বললেন, "ওমা,—তারপর ? পেলে মাগীকে ?"

"তা আর পাবেনা ! ছেড়া কাঁথায় মুখ লুকিয়ে পড়ে পড়ে কান্না হচ্ছিল, চৌকিদার গিয়ে ধর্‌লে, ডাক্তার বাবু গিয়ে দু'চারটে ধমক দিতেই মেয়ে কোলে তুলে নিলে !"

গিন্নি আশ্চর্য্য হয়ে গালে হাত দিয়ে বল্‌লেন, "অবাক কাণ্ড ! মা, না, রাক্ষসী গো !"

শাশুড়ী একটু সরে গেলে মণিমালা বল্‌লে, "সে মাগীটা কি রকম মঙ্গলা ? এই সব বোষ্টম মাগীদের মতন ?"

মঙ্গলার দেরী করে আসার অপরাধটা এই সরস কৌতূহলে চাপা পড়েই গিয়েছিল, এইবারেই কিছু মুস্কিল হল। কেননা সে ওই মাগী'টাকে নিজের চোখে দেখবার সুবিধে মোটেই করতে পায়নি, দেখ্‌তে গিয়ে কেবল লোকের মুখে শোনা তার কাহিনী টুকুই সংগ্রহ করে এনেছিল মাত্র, কাজেই মণি-মালার কথার উত্তরে কি যে বলে তা সে ভেবে পায় না, তবু বুদ্ধি জুটিয়ে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বল্‌লে, "তা ওমনিই হবে বই কি ! মুয়ে আগুন ! পোড়াকপালী মরতে আর ঠাঁই পায়না—"

মঙ্গলা মাছ কুটতে বস্‌লো, বামুন ঠাকরুণ ওদিকে ভাতের হাঁড়ি উনুনে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "ওগো বৌঠাকরুণ, তুমি বলো মাকে —আমিও যাই ঘাটে একটু দেখে আসিগে !"

মণিমালার উত্তর শোন্‌বার অপেক্ষা না করেই তিনি ত চলে গেলেন ; মণিমালার শাশুড়ী শুনে ছুটে এসে বল্‌লেন, "বামুন ঠাকরুণ আবার গেলেন কোন্ আক্কেলে ? ভাল এক তামাসা হয়েছে বাপু !"

কিন্তু হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ পরেই বামুন ঠাকরুণও ফিরলেন ; দেখ্‌তে পাননি, তাই বল্‌লেন, "না, সে আবাগী মেয়ে নিয়ে ঘরে দুয়োর দিয়ে বসে আছে, কিছুতেই দুয়োর খোলেনা !"

মঙ্গলা ঘাড় ফিরিয়ে বল্‌লে, "ও অমন করে আর কদিন থাক্‌বে ? পেট জ্বললে পরে আপনিই বেরুবে তখনই দেখো !"

বামুন ঠাকরুণ বল্‌লেন, "কত লোকেই যে কত কথা বলছে, ঠিক কথা কি তা বোঝবার যো নেই !"

এমনি করে বেলা দুপুর হতে না হতে পতিতপাবনী গঙ্গার সৈকতে সেই বন্ধ কুঁড়ের ভিতরকার সদ্যপ্রসূতি হতভাগিনীর নামে কুৎসিত আন্দোলনে সারা দেশটা তোলপাড় হয়ে উঠ্‌লো, কিন্তু সেই মজা দেখার জীবটি আর তিন দিনের মধ্যেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে কাউকে দেখা দিলে না !

যারা তামাসা দেখ্‌তে এসেছিল, তারা সেই বন্ধ ঘরখানার আশে-পাশে ঘুরে ফিরে গেল, মধ্যে মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত শিশুর কান্নার শব্দও কেউ কেউ শুনে গেল, কিন্তু সে মায়ের গলা কেউ শুনতে পেলে না।

যখন দর্শনার্থীর দল যাওয়া-আসা কমাল, তখনি কেবল গঙ্গার তরঙ্গ-ধ্বনির সঙ্গে একটা

বুক-ফাটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। তবে সে খুব চাপা গলার সুর, সহজে ধরা যায় না।

২

আরো ক'দিন কেটে গেল। সেদিন ঠিক দুপুর বেলা. চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ। আমের গুটি-ভরা আম গাছের ডালে লুকিয়ে শেষ বসন্তের কোকিলের কুজন-শব্দ ছাড়া আর কোনো সাড়া-শব্দ কোথাও নেই ! প্রখর রোদ যেন আগুন বর্ষণ কর্‌ছিল, সজনে গাছের জটার মত পাকা ডাঁটাগুলো পট্ পট্ করে ফেটে পড়ছিল।

সেদিনটাও রবিবার। তবে ষ্টেশনে রবিবার-সোমবারের বিচার না থাকলেও সেদিন ফণি-ভূষণ বাবুর শরীরটা ভাল ছিল না বলে তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ীতে মশারির ভিতর দিবা-নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন।

মণিমালার দিনে ঘুমানো অনভ্যাস, তাই সে ঘুমায়নি। অন্য ঘরে জন-তিনেক সমবয়সী মেয়েদের নিয়ে সে 'ছক' কেটে কড়ি খেলতে বসেছিল। বাড়ীর পাশেই ডাক্তার বাবুর বাড়ী ; তাঁর মেয়েও মণিমালার সমবয়সী, সে সম্প্রতি শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে, তারাও সেই ঘাটের হতভাগিনীর কথা নিয়ে খুব হাসাহাসি কর্‌ছিল, মাগীটার কাল্পনিক রূপ-বর্ণনাও বাদ যায় নি,—তার যে সারা গায়ে মাটী দিয়ে না-হয় সাদা চন্দনের রাধাকৃষ্ণ নামের ছাপ আছে আর কপালের উপর লম্বাধরণের বৈষ্ণব তিলক আছে, এ-বিষয়ে আর কারো সঙ্গে কারো মতের অমিল হল না।

নানা কথায় তাদের গল্পের গতি অন্যদিকে ফিরল। একটি মেয়ে মণিমালাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি এখন বাপের বাড়ী যাবে নাকি ভাই ?" মণিমালা একটা নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "কি করে বলি,—জানিনে তো, এঁরা পাঠাবেন কি না পাঠাবেন !"

ডাক্তার বাবুর মেয়েটি বল্‌লে, "কতদিন এসেছ তুমি ভাই, বেশী দিন ত নয় !"

মণিমালা একটু হেসে বল্‌লে, "কেন, যত-দিন বিয়ে হয়েছে ততদিনই ত আছি !"

হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে বলে উঠ্‌লো, "ওমা, ও কে ভাই ?"

মণিমালা মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে যে, একটী পনেরো-ষোলো-বছরের ফুট্‌ফুটে সুন্দরী মেয়ে এসে তাদের উঠানের ও-পাশে গোয়াল ঘরের দাওয়ার উপর বসে পড়েছে। তার ছোট মুখখানি ঘিরে রেশমের মত নরম কালো চুলের গোছা ঝুলছিল। বড় বড় চোখ দুটি তার গভীর যাতনায় ভারি। বিষাক্ত শরে মরণাহত চোখে যে আর্ত্ত করুণ কাতরতা ফুটে ওঠে, তার মুখে সে দাগ রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছিল।

অসহ্য রোদে পথ হেঁটে এসে সে ক্লান্ত-ভাবে শ্বাস ফেলছিল। মেয়েরা সব তার কাছে আস্‌তেই সে বল্‌লে, "এইটেই কি এখানকার ডাক্তার বাবুর বাড়ী ?"

মণিমালা বল্‌লে, "না,—কেন ?"

মেয়েটী ব্যথিত কণ্ঠে বল্‌লে, "কেন ? তাঁর সঙ্গে আমার ঢের কথা আছে যে ! এই বোঝাটাকে যে আমায় বইতেই হবে।"

এতক্ষণে সকলে দেখলে যে তার কোলে রোদে-আঁচা মল্লিকার মত একটী শুভ্র সুন্দর ঘুমন্ত শিশু। মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা বুঝে নিলে যে, তিনদিনকার উপোসের পর সমস্ত লজ্জা-

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

সঙ্কোচের মাথা খেয়ে আজ এই অভাগিনী মেয়েটা পথে বেরিয়ে পড়েছে!

কিন্তু কল্পনাতে রং ফলিয়ে তারা এর আর যে ছবি এঁকেছিল, আসলটার সঙ্গে তার এতটুকুও তো মিললো না! এর গায়ের কোন-খানেই কোনো নামের ছাপ নেই, তিলক-ফোঁটা কাটাও নেই, বরং মাথার এলো-মেলো চুলের মাঝে দিন দশ-বারো আগেকার পরা সিন্দূরের চিহ্নও দেখা যায়। হাতে সধবার চিহ্ন লোহাও আছে, কিন্তু এ-সব ব্যব-স্থার সঙ্গে তার অবস্থাটা এমনি বেমানান যে ও চিহ্নগুলোর দিকে যেন মানুষে চোখে পড়ে না! এ যে নিতান্ত কচি, সংসার-জ্ঞানহীনা বালিকা মাত্র!

ডাক্তার বাবুর মেয়ে বল্লেন, "ডাক্তার বাবু তার কি করবেন, বল?—মেয়ে কি তোমার নয় নাকি? তবে তুমি তখন নিলে কেন? বল্লেই ত পারতে—"

মেয়েটী হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, "না, না, এ আমারই, সে জন্যে আমি কিছু বলতে আর চাইনে, তবে মানুষ করতে হলে যে এর অনেক কিছুই দরকার!"

একটী মেয়ে ফস্ করে বলে বস্লো, "কেন, মেয়ের বাপ গেলেন কোথায়?"

সকলে মনে করেছিল যে এই মর্ম্মান্তিক খোঁচা খেয়ে মেয়েটি বুঝি লজ্জায় মুখ ঢাকবার ঠাঁই খুঁজে পাবে না, কিন্তু সে তা কিছুই করলে না, মাথাটা নীচু করে চুপ করে বসে রইল।

চারিদিক থেকে অজস্র অপমান-বিদ্রূপের ধারালো বাণ তার উপর বর্ষণ সুরু হলো!

মঙ্গলা মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরে এসে বাড়ীতে পা দিয়েই এই অপরূপ শ্বেত-শতদলের মত রূপসীটিকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়াল। একটু পরে মেয়েদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় বুঝতে পেরে বল্লে, "তুমি এসেছিলে কার সঙ্গে গা? এই মেলার দিনে গঙ্গার ঘাটে একা তো আসোনি!"

ছল্ ছল্ চোখে মেয়েটি বল্লে, "মার সঙ্গে এসেছিলুম, মা কলেরায় মারা গেছে, আমি একা বাড়ী যেতে পারছিনে।"

"তোমার বাড়ী কোথায় গা?"

"কাল্নায়—"

"কাল্নায়! কা কপাল! কালনায় আর তুমি নিজে যেতে পারো না? যাবে? আমি লোক দিতে পারি।"

"না—" বলে সে একবার সকলের মুখ পানে চেয়ে দেখলে, তারপর নিজের মুখখানা কাঁচুমাচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগলো। বোধ হয় এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের এসব কথা বার্ত্তায় নিছক দয়া ছাড়া ঠাট্টায় ঢাকা মজা দেখাও ঢের রয়েছে! একে তো ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার সর্ব্বশরীর যেন এলিয়ে পড়ছিল তার উপর মনেও তো কম দুঃখ ছিল না। কাজেই মুখে আর সে এদের কি বলবে।

মেয়েটার দশা দেখে মণিমালার কিন্তু তখন ভারী দয়া হল। এ দয়াটা হওয়া তার উচিত কিনা সেটা আর তার ভাববার অবসর হল না। মেয়েটীর শুক্নো ম্লান মুখের পানে চেয়ে সে বল্লে, "তুমি কিছু খাবে? তোমরা তো বোষ্টম?"

মেয়েটীর করুণ দৃষ্টি সজল হয়ে উঠ্লো, সে বল্লে, "না, আমরা বোষ্টম নই, আমরা ব্রাহ্মণ—"

"তা—আমরাও তো বামুন, খাবে আমাদের রান্না?"

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে হাঁটুর উপর শিথিল মাথা রেখে সে ক্লান্তি-ভরা সুরে বল্লে, "আঃ মাগো!"

নাড়া পেয়ে কোলের কচি মেয়েটী ককিয়ে কেঁদে উঠ্লো, তখন সে আবার সোজা হয়ে বসে সেটাকে বুকে চেপে নিলে! এলিয়ে পড়লে আর তার চলে না!

ঘর থেকে বাড়ীর গিন্নির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে কানে কচি ছেলের কান্নার শব্দ গিয়েছে, তিনি বললেন, "মঙ্গলা, ও কার ছেলে কাঁদে, ছাখ্তো রে,—এ যে আমাদের বাড়ীতেই মনে হচ্চে, ছাখ্তো কে কাঁদে!"

মণিমালা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চাইলে, পাছে তার স্বামীরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে থাকে! শীগ্গির শীগ্গির ওকে বিদায় করবার জন্য সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো, পাড়ার অন্য যে মেয়েরা ছিল, তারাও সেই সময় নিজেদের বাড়ার দিকে চলে গেল। মণিমালার শাশুড়ীর অখণ্ড প্রতাপ ছিল, সবাই তাঁকে ভয় করতো!

৩

একখানা কাপড় আর খুচরো কিছু পয়সা দিয়ে ভিখারীকে বিদায় করবার জন্যে মণিমালা ঘরে ঢুকেছিল; কিন্তু ঘরে গিয়ে সে দেখলে, তার স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে, তিনি বালিশে হেলান দিয়ে চোখ চেয়ে বসে আছেন;

মুখখানি এমনি অন্ধকার যেন এই মাত্র তাঁর ফাঁসির হুকুম এসেছে!

স্বামীর সামনে কাপড় বা পয়সা বের করতে গেলে পাছে তিনিও আবার কারণ জিজ্ঞাসা করে বসেন, এই ভয়ে সে বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে কি যে করবে তাই ভাবছিল। আঁকা-বাঁকা বিদ্যুতের ঝলকের মত অনেক কথাই তার মনে হল।

মেয়েটীর উপর তার দয়া হয়েছিল, তাকে নিয়ে যদি স্বামীও কিছু বলেন, এই ভয়ে সে স্বামীর কাছে কিছু বল্তে পারছিল না। মেয়েটী আবার তার বাড়ী বলেছে, কাল্নায়। এই কাল্নার সঙ্গে যে ফণিভূষণের কতখানি যোগ আছে তা মণিমালা জানতো!

মণিমালাকে বিয়ে করবার আগে ফণি-ভূষণের চরিত্রের সুনাম বড় ছিল না। চরিত্র-দোষেই বাপের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে মামার বাড়ী কাল্নায় গিয়ে সে অনেকদিন ছিল। সেখানে একটী নিতান্ত গরীব অনাথা বিধবার মেয়েকে বিয়ে করতে সে বাধ্য হয়, মামা মামী তার তখন এ বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন বলে আজও একরকম একঘরে-গোছ হয়ে আছেন।

মণিমালার শাশুড়ী এ কথা স্বীকার করবার পাত্র নন, স্বামীকে বলতেই ভরসা হয় না তবু দেশশুদ্ধ সবাই এ কথা বল্তো, কাজেই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস না করলেও মণিমালার মনে একটী গোপন জ্বালা ছিল।

স্বামীর দিকে পিঠ দিয়ে তোরঙ্গর চাবি খুলতে খুলতে সে বল্লে "কি গো, অমন চুপ করে বসে আছ যে!"

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

ফণিভূষণ ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "এমনিই—কি বের করবে?"

মণিমালা একটু থতমত খেয়ে বল্‌লে, "এই একখানা পুরোনো কাপড়!"

কথাটা বলেই মণিমালার ভয় হল, স্বামী যদি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করে বসেন! কিন্তু ফণিভূষণ আর কিছু না বলে চুপ করেই রইল।

সহসা শাশুড়ীর তীব্র কণ্ঠের ঝঙ্কার শুনে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মণিমালা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখ্‌লে যে শাশুড়ী রোদ লাগবার ভয়ে দালানের দুয়োরের কাছে ছায়ায় দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন, "হ্যাঁ মঙ্গলা, কি তোদের আক্কেল বাছা,—ছি ছি, গেরস্তোর বাড়ী-ঘর, দে ওকে উঠিয়ে দে,—বলিহারি মেয়ে, মাগো, লজ্জাও করেনা একটু!"

মেয়েটি পা দিয়ে মাটি চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখখানা মড়ার মত সাদা; হরিণের মত নিরীহ সুন্দর চোখে ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি যেন লক্ষ্য-হারা! অনাহার-অনিদ্রা-ক্লিষ্টা সদ্য-প্রসূতি বালিকার শরীরে আর এমন বিন্দু-মাত্র শক্তিও সঞ্চিত ছিল না যে তার পা দুখানিকে সে ইচ্ছার বেগে চালিয়ে দেয়! সে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল দেখে মণিমালা বল্‌লে, "বসো, বসো, তুমি পড়ে যাবে যে!"

গিন্নি বল্‌লেন, "তা বসো গে বাছা, ঐ গাছ-তলাতে, এ গেরস্তো-বাড়ী আর বস্‌তে হবে না—"

মঙ্গলা বল্‌লে, "কি দেবে ওকে, দিয়ে দাওনা মা, অত বকা-ঝকার দরকার কি বাপু। ভিক্ষে চাইতে এসেচে, ভিক্ষে দিয়ে দাও, চুকে গেল কথা।"

গিন্নি বল্‌লেন, "সেই ভাল, যা মঙ্গলা, ঘর থেকে চারটি চাল এনে দে ওকে!"

মঙ্গলা চাল আন্‌তে ভাঁড়ার ঘরে ঢুক্‌তে যাবে, এমন সময়ে এ ঘর থেকে ফণিভূষণ তাকে ডাক্‌লে, "মঙ্গলা, শুনে যা!"

এই ডাক শুনেই ত সে ভিখিরী মেয়ে চম্‌কে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো; এ যে তার সেই "হারা বাঁশীর সাড়া"র মত অতি-পরিচিত প্রিয় কণ্ঠ!

সব অপমান, লজ্জা ও গ্লানির কথা এই একটু সাড়ায় যেন নিমেষে একেবারে তাকে ভুলিয়ে দিলে; মঙ্গলা ফিরে এসে তার হাতে পাঁচটা টাকা গুণে দিলে; বদ্ধ ঠোঁটে তার বিশ্রী শ্লেষের হাসি!

গিন্নি চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন, "ওমা, ও কি! পাঁচ-পাঁচটা টাকা হল ভিক্ষে! বার-ব্রতো কর্‌তে ত আমি চাইলে অত পাইনে কক্ষনো! ছেলেদের এ আমীরি মেজাজ বোঝা দায়, দেখ্‌চি!"

মঙ্গলা বললেন, "তা ওঁদের দয়া মা, যখন যার ওপর দয়া করেন"—

"হুঁ, তাইতো। দয়ার আর পাত্তর খুঁজে পেলেননা! মরুকগে, ওঁদের যা খুসী করুন, ভুগবেন এর পর নিজেরাই!"

ভিখিরী তখনো টাকা হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন ঐ তার চেনা গলার স্বরে তাকে যাদুমন্ত্রে পাষাণ না কাঠের পুতুল করে দিয়েছে,—বন্ধ ঘরের দিকে চেয়ে সে আর যেতে পার্‌ছিল না!

কড়া রোদের আঁচ সইতে না পেরে গিন্নি আবার ঘরে ঢুকে পড়্‌লেন। দিনের ঘুমটুকু তাঁর তখনো শেষ হয়নি, তাই

বাকীটুকু শেষ করতে তিনি আবার শুয়ে পড়লেন।

মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে মণিমালাও গিয়ে তখন ঘরে ঢুক্‌লো, পাছে ওর কাছে থাক্‌তে দেখলে শাশুড়ী কি স্বামী রাগ করেন!

মঙ্গলা ত আর কোন কথা না বলে একরাশ এঁটো বাসন নিয়ে মাজ্‌তে বসে গেল। সে অনেক দিনের ঝী, বাবুর দয়ার এই বাড়ন্ত বহর দেখে গিন্নির চেয়ে সেও বড় কম জ্বলে যায়নি, তবে কিনা তখনো বাবু ঘরেই শুয়েছিলেন, কাজেই মুখ বন্ধ করেই আপনার রোখ্‌টা সে চেপে ছিল।

বাসনে হাত দিয়ে একবার আড়চোখে সে চেয়ে দেখ্‌লে যে ভিখিরীটা তখনো হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—সে আর কিছু বললেনা, কেবল মনে মনে ভাবলে, আরো কিছু চায় নাকি!

৪

ঘরের ভিতর খাটের উপরে হাত দুখানা উপর-পানে তুলে তাকিয়া বালিশ ঠেসান দিয়ে ফণিভূষণ যেমন বসে ছিল, তেমনিই রইল, স্ত্রীকে আস্‌তে দেখেও সে তাকে কিছুই বল্‌লে না!

একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা টাকা দান করে ফেলে তার মত পঁচিশ-ত্রিশ টাকা মাইনের লোকের যে স্নিগ্ধ তৃপ্তির আভাস জাগে তার মুখে তার একটু রেখাও ছিল না! মণিমালা হাসি মুখে বল্‌লে, "তুমি তো দেখচি মস্ত একজন দাতা হয়ে পড়্‌লে, মা কিন্তু এতে মোটেই খুসি হন নি!"

ফণিভূষণও কোনো উত্তর দিলে না যেমন চুপ করে ছিল তেমনিই রইল, দেখে মণিমালা চটে গেল, সে বল্‌লে, "আচ্ছা এমন চুপ করে আছ কেন, বল দেখি?"

"তা কি করবো?"

"কেন, করবার বুঝি আর কোনো কাজ নেই! এই তো এখুনি দান কর্‌লে, সে তো একটা কাজ হল।"

"তা হল্‌।"

"না, না, সত্যি করে বল না গো, শুধু শুধু অত দাতা হলে কেন?"

"কেন আবার! টাকা হাতে থাকলেই লোকে দাতা হয়, এর আর সত্যি মিথ্যে কি! তোমার হাতে কাপড় ছিল দিতে চাইছিলে, আর আমার হাতে টাকা ছিল, দিলাম, মন্দ কি করেছি!"

"মন্দ করেছ এমন কথা ত আমি বলিনি, —কিন্তু যদি তুমি তোমার দানের পাত্রটিকে দেখতে—"

"আচ্ছা, থাক্"—ফণিভূষণের মুখ একেবারে লাল হয়ে ঘেমে উঠ্‌লো।

"তা তবে না হয় থাক্! কিন্তু তুমি এখনো শুয়ে থাক্‌বে নাকি?"

"না, এই উঠি--কটা বাজলো দেখতো!"

মণিমালা ঘড়ি দেখে বল্‌লে, "পাঁচটা,—একেবারে কাঁটায় কাঁটায়!"

"উঠি তা হলে,—ও গান করছে কারা?"

"ডাক্তার বাবুর বাড়ীর ছেলেরা, জান্‌লাটা খুলে দেব?"

"দাও" বলে ফণিভূষণ উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর ছেলেরা তখন গাইছিল,

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর-মত বাসিও!"

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

পাঁচ-পাঁচটা টাকা! অপ্রত্যাশিত আশার অতিরিক্ত ভিক্ষে পেয়েও যে সেই ভিখারিণীটা এখনো দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, এমন সন্দেহ তখন আর কারো মনেই ছিল না।

বাইরে রোদের ঝাঁঝ তখন কমে এসেছে, উত্তর আকাশে ঘন কালো মেঘের সজল আভায় একটি চোখ-জুড়ানো স্নিগ্ধতা মাখা। ডাক্তার বাবুর ফুলবাগানে সমস্ত ফুলগাছগুলির মাথায় রোদ লেগে সেগুলিকে যেন বৃষ্টির আশায় উন্মুখ দেখাচ্ছিল।

ফণিভূষণের চোখ পড়লো উঠানের মাঝখানে, যেখানে বিকশিত পদ্মফুলটীর মত মুখে, ভিজে ভ্রমরের মত দুটি বিপন্ন সজল চোখ তার পানেই অতৃপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে,—সে চোখ যেন পলক-হারা!

হত্যা-কাণ্ড শেষ করে খুনে যেমন নিজের ফাঁসির ভয়ে পালায়, তেমনি উদ্ভ্রান্ত ব্যাকুল হয়ে ফণিভূষণ জান্‌লার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখের সমস্ত দীপ্তি তখন একটা কদর্য্য দুর্ব্বলতায় ঢেকে গেল। সে—এখানে—এ বেশে—!

তার সরে যাবার রকম দেখে মণিমালা দেখ্‌তে গেল, ব্যাপারটা কি? তার ফলে তার সন্দেহটাই যেন চোখের উপর রূপ ধরে ফুটে উঠ্‌লো! অপ্রিয় সত্যের আবিষ্কার করে তার মুখও বেশ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো।

একটু বিমূঢ়-ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে যখন ছুটে উঠানে এসে নামলো, তখন মেয়েটি চলে গিয়েছে। চিনতে পেরে চোখে দেখেও সে তার প্রিয়তমের অনিচ্ছা অনাগ্রহ বুঝে তাঁর সুখের বাধা হ'য়ে থাক্‌লো না! মণিমালার চোখ ফেটে জল এসে পড়লো। —হায়রে, এই তার স্বামী!

মণিমালা অনেকক্ষণ কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল,—তারপর যখন হঠাৎ হুঁস হল, তখন সে দেখ্‌লে, তার সাম্‌নেই একটু-দূরে দিনান্তের পড়ন্ত রোদের লাল আভায় রক্তমাখা ফুলের মত টাকা পাঁচটা পড়ে আছে!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

চুড়ির আওয়াজ

চুড়ির আওয়াজ, আর কিছু নয়, একটু ঝুনিঝুনি—
কতবার যে কতই সুরে বাজে তাহাই শুনি!
সোনার হাতে সোনার চুড়ি, কে কার অলঙ্কার?
নয় সে শোভা, বধূই জানে চুড়ি কি ধন তার!
ঘুরিয়ে দিয়ে ছোট্ট দুটি কোমল কর-মূল,
আড়াল থেকে চম্‌কে দিয়ে করায় কত ভুল!
শব্দ-তাড়িত প্রাণের তারে জানায় কত কথা,
কেউ জানেনা লাজুক বধূর চুড়ির মুখরতা!

নিশীথ-রাতের গোপন-গভীর মিলন-মধু'র আশে
তরুণ যুবার নিদ্রাকাতর নয়ন মুদে' আসে;
চম্‌কে ওঠে, কোথায় যেন বাজ্‌ল কাঁকণ কার!
কই—কোথা নয়! ওই যে বাজে, শুন্‌ছি পরিষ্কার!
সকল নীরবতার মাঝে কি-ওই বাজে কানে?
দুয়ার-পাশে ওই যে বাজে, বাজ্‌ছে সে কোন্‌খানে?
কাণ সে বাজায় আপন মনে, শাসন নাহি মানে,
সত্যি-বাজায় মিথ্যা-বাজায় প্রভেদ নাহি জানে।

এমন সময় ঝুন্‌ঝুনিয়ে বাজ্‌ল বারান্দায়
চুড়ির আসল সাততারাটি, তন্দ্রা ছুটে যায়।
কি সুর বাজে সকল শিরায় শির্‌শিরিয়ে রে!
একটু শুধু রুন্‌ঝুন্ আর রিন্‌ঝিনিয়ে রে!
গুমট-ভাঙা দম্‌কা-হাওয়ার পরশ লাগে গা'য়,
সকল ফুলের সকল সুবাস জাগ্‌ল লহমায়!
আঁধার ঘরে আচম্বিতে জ্যোৎস্না ফিনিক্ ফোটে,
শীতের শেষে প্রথম যেন কোকিল ডেকে ওঠে।

মানভরে আজ আছেন তিনি কথা নাইক' মুখে,
তিনটি দিনের পরে বোধ হয় প্রাণ গলেছে দুখে।
দোষটি আমার ছিল যাহা, দেখেন তাহা নিজের,
বুকের ব্যথা বাড়ছে, তবু যায় কি মানের সে জের!
ঘন ঘন বাজিয়ে চুড়ি সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া,
আমার ঘরেই খুঁজ্‌তে আসেন যায় না কি যে পাওয়া!
চুড়ি বলে, 'একবারটি কওনা কথা ডেকে,
জুড়াই ব্যথা বুকের 'পরে মাথা বারেক রেখে।'
কইব কেন? হ'বই আমি হ'বই বেরসিক,
শুন্‌ব চুড়ির মধুর আওয়াজ, থাক্‌ব এখন ঠিক!
বাজুক এখন ঝুন্‌ঝুনিয়ে, বাজুক রেগে কেঁদে,
বাজুক আবার নরম সুরে—'মার্‌ছ কেন বেঁধে?'
মিথ্যে করে' ঘুমিয়ে যখন পড়ব ধীরে ধীরে,
এটা-সেটা রাখার ছলে বাজুক ঘুরে ফিরে।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

হাতের চুড়ি এমন যখন বল্‌ছে মুখের বোল,
কাজ কি কথায়? শুনছি বেশ ওই মধুর গণ্ডগোল!

মনে পড়ে, শেষবার সেই এক্‌জামিনের পড়া—
দুই ঘরেতে দু'জন আছি, শাসন বড়ই কড়া।
বল্‌লে ডেকে, 'কাল সকালে ঘুমটি ভাঙার পর
মুখটি তোমার দেখার যেন পাই গো অবসর।
থাক্‌ব আমি দুয়ার ধরে' তোমার দুয়ার চেয়ে,
দেখ্‌ব শুধু একটি পলক লাজের মাথা খেয়ে।'
রাত্রি জেগে' ভোরের সে-ঘুম ভেঙেও ভাঙে না,
কাণে আসে কিসের আওয়াজ? থেমেও থামে না!
বুকের ভিতর কেমন বাজে চুড়ির রিনিঝিনি,
ভোরের ভজন এ কোন্ সুরে গাইছে ভিখারিণী!
আকুল হ'য়ে কাঁদন যেন ফিরছে নিরাশায়—
"ওগো জাগো, ডাকছি আমি, সময় বয়ে যায়!"
দুয়ার খুলে' তাকিয়ে দেখি, বিউনি খোলার ছলে
ভোমরা-কালো চুলের মূলে আঙুল দ্রুত চলে।
একে একে সাপ-কাঁটা আর চিরুণ, প্রজাপতি,
সব নেমেছে, খোঁপার সে কি অপূর্ব্ব দুর্গতি!
খুল্‌ছে না ক' ফিতার গিরা, ফাঁসটি ধরে' টানে,
অম্‌নি চুড়ি বালার 'পরে কি ঝঙ্কারই হানে!
অবাক হ'য়ে দেখ্‌নু চেয়ে চোরের চতুরালি,
দুষ্ট চুড়ির দুষ্টামী সে, নূতন দুতিয়ালী!
চুড়ির আওয়াজ, আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি—
কতই সুরে কতবার সে বাজে তাহাই শুনি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ

(Electrolysis)

উনবিংশ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে বৈজ্ঞানিক দিগের মন এক অভিনব ঘটনাদ্বারা আকৃষ্ট হয়। ঘটনাটি "তড়িত বা বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ।" কোন কঠিন বা তরল পদার্থের মধ্যে যদি তড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তবে সেই পদার্থের মধ্যে এক রকম রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical action) দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন বা তরল পদার্থ ধাতু (metal) হইলে রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical action) হয় না। রাসায়নিক ক্রিয়াসম্ভূত পদার্থ, যে সঞ্চালক-দ্বয়দ্বারা তড়িত-প্রবাহ কঠিন বা তরল পদার্থে যথাক্রমে প্রবেশ ও বাহির হইয়া যাইতেছে, সেই সঞ্চালকদ্বয়ে আসিয়া দেখা দেয়। অর্থাৎ যে সঞ্চালক (conductor)* দ্বারা তড়িত প্রবাহ তরল পদার্থে প্রবেশ করে, সেই সঞ্চালকে কতকগুলি তড়িত বিশ্লিষ্ট পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যে সঞ্চালকদ্বারা তড়িত প্রবাহ (current of electricity) কঠিন বা তরল পদার্থ হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই সঞ্চালকে অপর কতকগুলি তড়িতবিশ্লিষ্ট পদার্থ (যথা ধাতু ও আর্দ্রজন বা হাইড্রোজেন গ্যাস) আসিয়া দেখা দেয়। যে সকল দ্রব্য ধাতু (metal) নয়, সেগুলি তড়িত-বহনে অসমর্থ অর্থাৎ তড়িত-প্রবাহ তাহাদের উপর দিয়া যাইতে পারে না। যদি তাহাদের মধ্য দিয়া তড়িত প্রবাহ (electric current) প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ভাবের কোন এক রকমের রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে।

যে পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িত প্রবাহ প্রবাহিত হইলে তাহার বিশ্লেষণ ঘটে, তাহার নাম "তড়িত বিশ্লেষ্য" (electrolyte) পদার্থ। যে সঞ্চালক (conductor) দ্বারা তড়িত প্রবাহ বিশ্লেষ্য পদার্থের (electrolyte) মধ্যে প্রবেশ বা বাহির হইয়া যায়, তাহার নাম "তড়িদ্বার" (electrode)। যে সঞ্চালক দ্বারা "বিশ্লেষ্য পদার্থ" মধ্যে তড়িত প্রবাহ প্রবেশ করে, তাহার নাম "সুদ্বার" (anode); আর যে সঞ্চালক দ্বারা তড়িত প্রবাহ বাহির হইয়া যায়, তাহার নাম "কুদ্বার" (cathode)। যে প্রণালী দ্বারা তড়িত প্রবাহ-বলে কোন দ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়, সেই প্রণালীর নাম "তড়িত বা বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ।" সকল ধাতুই (metals) বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের পর "কুদ্বারে" (cathode) আসিয়া দেখা দেয়। আর এ্যাসিড্ র‍্যাডিকল্ "সুদ্বার" (anode) হইতে উৎপন্ন হয়; সঙ্গে সঙ্গে

* যাহা দ্বারা তড়িত প্রবাহ কঠিন বা তরল পদার্থে প্রবেশ লাভ করে, সেই সঞ্চালকে (Conductor) কহে।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

তড়িতদ্বারে (electrodes) আর একটি প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়া-বলে, বিশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থ, (products of Electrolysis) হয় বিশ্লেষ্য পদার্থের সহিত গুলিয়া যায়, (dissolved) নচেৎ তড়িদ্বারের (electrode) সহিত রাসায়নিক যোগে মিশিয়া যায়। তড়িদ্বারের সহিত রাসায়নিক যোগে (chemically) মিশিয়া গেলে আর তাহাকে মুক্ত (free) অবস্থায় পাওয়া যায় না; তড়িদ্বারের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এখন একটি উদাহরণ লইয়া বিচার করা যাক্। গুন্ধারিকাম্লের (সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিডের) ডাইলিউট্ দ্রবণ * মধ্যে (solution of sulphuric acid) খানিকটা জলে ফোঁটা কয়েক খাঁটি (strong) সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড্ মিশাইলেই সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিডের ডাইলিউট্ "দ্রবণ" প্রস্তুত হয়—তড়িত-প্রবাহ চালাইলে গুন্ধারিকাম্ল (সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিড) বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

$$H_2SO_4 = H_2 + SO_4$$

যদি প্লাটিনাম প্লেটদ্বয় (electrodes) রূপে ব্যবহার হয়, তবে "কুদ্বারে" (kathode) আর্দ্রজন (হাইড্রোজন) গ্যাসের বুদ্বুদ (bubbles) দেখিতে পাওয়া যায় ও "সুদ্বারে" (anode) এ্যাসিড্ র‍্যাডিকল্ (radical) আসিয়া উপস্থিত হয়। "কুদ্বারে" আর্দ্রজন (হাইড্রোজেন) যেমন মুক্ত অবস্থায় (free) দেখিতে পাওয়া যায়, "সুদ্বারে" তেমনি এই এ্যাসিড্ র‍্যাডিকল্‌টী (SO_4) দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্রবণে (solution) যে জল থাকে তাহার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া-বশতঃ এই এ্যাসিড্ র‍্যাডিকল্‌টী আবার এ্যাসিডে পরিণত হয়। যথা

$$2SO_4 + 2H_2O =$$

(এ্যাসিড্ র‍্যাডিকল্) (জল)

$$2H_2SO_4 + O_4$$

(সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড) (অক্সিজেন গ্যাস বা অক্ষজন)

এ্যাসিড্ র‍্যাডিকেলের বদলে অক্সিজেন গ্যাস "সুদ্বারের" প্লাটিনাম প্লেটে বুজগুড়ি রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "সুদ্বার" (anode) প্লাটিনাম প্লেট না হইয়া যদি তামার প্লেট হইত, তাহা হইলে এ্যাসিড র‍্যাডিকেল্ (SO_4) তামার সহিত রাসায়নিক যোগে (chemically) মিশিয়া তুঁতেরূপ (তাম্র গুল্‌বেত Copper sulphate Cu SO_4) ধারণ করিত। অক্ষজন অক্সিজেন বাহির হইত না।

মহামতি ফ্যারাডে সাহেব বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ (electrolysis) সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমানুষিক সহিষ্ণুতা সংবলিত পরীক্ষা ও ধীর পর্য্যবেক্ষণ-ফলে তিনি বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ সম্বন্ধে দুটী সূত্রবিধি (law) জগতে প্রচার করেন। বিজ্ঞান

* কোন তরল পদার্থের সহিত অন্য কোন কঠিন বা তরল পদার্থ মিশ্রণে যে মিশ্র তরল পদার্থ হয় তাহাকে "দ্রবণ" (solution) বলে। বলা বাহুল্য উভয় পদার্থ বেশ গুলিয়া যাওয়া চাই। আমি যাহাকে দ্রবণ বলিতেছি, আচার্য্য রামেন্দ্র বাবু তাহাকে "দ্রবীভবণ" বলিয়াছেন।

জগতে এই দুটী বিধি "ফ্যারাডে বিধি" নামে প্রসিদ্ধ।

ফ্যারাডে বিধি—প্রথম বিধি। বিশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ (১) প্রবাহ-বেগের (strength of current) ও (২) যে সময় ধরিয়া প্রবাহ বহিতে থাকে সেই সময়ের সহিত আনুপাতিক (proportional)।

দ্বিতীয় বিধি। এক সময় ধরিয়া প্রবাহিত, একই তড়িত প্রবাহদ্বারা উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরিমাণ সেই বস্তুর "রাসায়নিক সমতা"র (chemical equivalents) সহিত আনুপাতিক (proportional)।

এ দুটী বিধি বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ব্যাপী নির্দ্দিষ্ট তড়িত-প্রবাহ প্রসূত কোন একটা পদার্থের বিশ্লেষণ-পরিমাণ জানা থাকে এবং যদি অন্য কোন পদার্থের রাসায়ণ সমতা (Chemical equivalent) জানা থাকে, তবে সেই দ্বিতীয় পদার্থের বিশ্লেষণ-পরিমাণ বাহির করিতে পারা যায়। আর একটু বিশদরূপে বলিতেছি। প্রথমে রসায়ণ সমতা (Chemical equivalent) কাহাকে বলে দেখা যাক্: কোন এক মূল পদার্থের (element) পরমাণু ওজনকে (atomic weight) তাহার মিলনাঙ্ক দ্বারা (valency) ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে রাসায়ণ সমতা বলে। মনে কর, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তড়িত-প্রবাহ

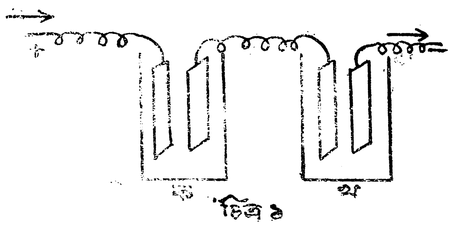

চিত্র ১

(যে তড়িত-প্রবাহের পরিমাণ আমরা জানি) কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থিত, (ক, খ, চিত্র ১) ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে প্রবাহিত হয়, 'ক'-পাত্রের কুদ্বারে উৎপন্ন বিশ্লিষ্ট পদার্থ-পরিমাণ যদি আমরা জানিতে পারি, এবং 'খ'-পাত্রস্থিত কুদ্বারে উৎপন্ন পদার্থের রাসায়ণ-সমতা যদি আমাদের জানা থাকে, তবে 'খ' পাত্রস্থ 'কু'দ্বারে উৎপন্ন পদার্থ পরিমাণ আমরা গণনা দ্বারা স্থির করিতে পারি। এক সেকেণ্ড-ব্যাপী, এক এম্পিয়ার পরিমিত তড়িত-প্রবাহ প্রসূত কোন পদার্থের পরিমাণকে তাড়িত রাসায়ণ সমতা (electro-chemical equivalent) বলে। তাহা হইলে, একটি পদার্থের তাড়িত-রাসায়ণ-সমতা জানিতে পারিলে অন্যান্য পদার্থের তাড়িত-রাসায়ণ-সমতা স্থির করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ঐ এক বস্তুর তাড়িত-রাসায়ণিক-সমতা অতি সূক্ষ্মরূপে জানা চাই; নচেৎ অপর পদার্থের তাড়িত-রাসায়ণ-সমতা সূক্ষ্মরূপে বাহির হইবে না। বড় বড় বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা রৌপ্যের তাড়িত-রাসায়ণ সমতা অতি সতর্কতার সহিত অতি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত করিয়াছেন। তাঁহাদের

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

পরীক্ষালব্ধ রৌপ্যের তড়িত-রাসায়ণ-সমতা =·০০১১১৮৩। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা অন্যান্য পদার্থের তাড়িত-রাসায়ণ-সমতা অতি সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিতে পারি। যথা,- দস্তার মিলনাঙ্ক (valency)=২। দস্তার অণু-ওজন (atomic weight)= ৬৫.৩৭। রৌপ্যের অনু-ওজন.= ১০৭·৯। রৌপ্যের মিলনাঙ্ক = ১

দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী

$$\frac{\text{দস্তার তাড়িত-রসায়ণ সমতা}}{\text{রৌপ্যের তাড়িত রসায়ন সমতা}} = \frac{\text{দস্তার রসায়ণ-সমতা}}{\text{রৌপ্যের রসায়ণ সমতা}}$$

$$= \frac{\frac{৬৫.৩৭}{২}}{\frac{১০৭.৯}{১}} = \frac{৬৫.৩৭}{২ \times ১০৭.৯}$$

∴ দস্তার তড়িত-রাসায়ন-সমতা =

$$\frac{·০০১১১৮৩ \times ৬৫·৩৭}{২ \times ১০৭·৯} = ·০০০৩৩৮৭$$

এইরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণে **ফ্যারাডে বিধির নিত্যতা** প্রমাণ হইয়াছে। ফ্যারাডে বিধির নিত্যতা (constancy of Faraday's laws) সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ নাই। ধাতুজ পদার্থ হইতে ধাতু-অংশটী তড়িত প্রবাহ দ্বারা অনায়াসে অতি সহজে বিশ্লিষ্ট হয়। ফ্যারাডে বিধির নিত্যতা হেতু ও তড়িত প্রবাহ দ্বারা ধাতুজ পদার্থ হইতে ধাতু বিশ্লেষণে প্রয়াস-হীনতা-হেতু পদার্থ বিদ্‌গণ তড়িত প্রবাহ মাপিবার জন্য **"তড়িত বিশ্লেষণ প্রণালী"** প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে যন্ত্র সাহায্যে তাড়িত বিশ্লেষ্য পদার্থকে তড়িত প্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় মাপযোগ করা হয় সেই যন্ত্রকে **ভল্‌টা মাপক** (voltameter) বলে। নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া তাড়িত বিশ্লেষ্য পদার্থ মধ্য দিয়া তড়িত প্রবাহ প্রবাহিত করা হয়; এবং বিশ্লিষ্ট পদার্থের ওজন স্থির করা হয়। এবং সেই বিশ্লিষ্ট পদার্থের তাড়িত-রাসায়ন-সমতা যদি জানা থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত অঙ্কপাত হইতে তড়িত প্রবাহ পরিমাণ স্থির করা যাইতে পারে। যদি তড়িত প্রবাহ পরিমাণকে 'ত' বলা হয়, তাড়িত-রাসায়ন সমতাকে যদি 'র' বলা হয়, বিশ্লিষ্ট পদার্থের ওজন যদি 'ও' হয়, সময়ের পরিমাণ যদি 'স' সেকেণ্ড হয় তবে

$$ও = ত \times র \times স$$

এই চারিটি রাশির মধ্যে তিনটি জানা থাকিলেই চতুর্থটী বাহির করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানাগারে সাধারণতঃ 'ত' ও 'র' এই দুটি রাশি স্থির করিবার জন্য শিক্ষার্থী-দিগকে বলা হয়। 'ত' স্থির করিবার জন্য

$$ত = \frac{ও}{র \times স}$$

সমীকরণ (equation) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর 'র' স্থির করিবার জন্য

$$র = \frac{ও}{ত \times স}$$

সমীকরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর পরমাণু-ওজন (atomic weight), মিলনাঙ্ক (valency) রাসায়ন-সমতা ও তাড়িত-রাসায়ণ সমতা নিম্নলিখিত চক্রে (table) প্রদত্ত হইল।

তড়িত-রসায়ন-সমতা

মূল পদার্থ	মূল পদার্থের ইং সঙ্কেত	অণু ওজন Atomic weight	মিলনাঙ্ক Valency	রসায়ন-সমতা Chemical Equivalents	তড়িৎ-রসায়ন-সমতা in Practical units
অ্যান্টিমণি	Sb	১২০·২	৩		
অক্ষজন বা অক্সিজেন	O	১৬·০০	২	৭·৯৩৫	·০০০০৮২৮৫
এ্যলুমিনিয়াম	Al	২৭·১	৩	৮·৯৬	·০০০০৯৩৫৫
কুলহরিণ (ক্লোরিণ) গ্যাস্	Cl	৩৫·৪৬	১	৩৫·১৭	·০০০৩৬৭২
তাম্র	Cu	৬৩·৩	১	৬৩·০৯	·০০০৬৫৮৭
তাম্র	"	"	২	৩১·৫৪	·০০০৩২৯৩
দস্তা	Zn	৬৫·৩৭	২	৩২·৪৪	·০০০৩৩৮৭
পোট্যাসিয়াম্	K	৩৯·১৫	১	৩৮·৮৪	·০০০৪০৫৫
নিকেল	Ni	৫৮·৭	২	২৯·১২	·০০০৩০৪০
রৌপ্য	Ag	১০৭·৯৩	১	১০৭·০৭৩	·০০১১১৮৩
লৌহ	Fe	৫৫·৯	২	২৭·৭৩	·০০০২৮৯৫
লৌহ	"	"	৩	১৮·৪৮৫	·০০০১৯৩০
স্বর্ণ	Au	১৯৭·২	৩	৬৫·২১	·০০০৬৮০৮
সোডিয়াম্	Na	২৩·০৫	১	২২·৮৭	·০০০২৩৮৭
অর্দ্রজন (হাইড্রোজেন)গ্যাস	H	১·০০৪	১	১	·০০০০১০৪৪

ভল্‌টা মাপক

(VOLTA METER)

সাধারণতঃ বিজ্ঞানাগারে তিন রকম ভল্‌টা মাপক (Volta meter) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা তাম্র-ভল্‌টামাপক রৌপ্য-ভল্‌টামাপক ও জল-ভল্‌টামাপক। এই তিনটি ভল্‌টা মাপকের বিশদ বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তাম্র ভল্‌টামাপক ॥

একটি কাচ পাত্রে (চিত্র ১,ক) তুঁতে গোলা জল রাখা হয়। পরিষ্কার পবিত্র তুঁতে দানা (crystals of Copper Sulphate) তাহার চারগুণ ওজন জলে গোলা হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত তুঁতে দ্রবণে (Solution) কয়েক ফোঁটা খাঁটি সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিড্ মিশাইয়া কাচ পাত্রে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

চিত্র ১

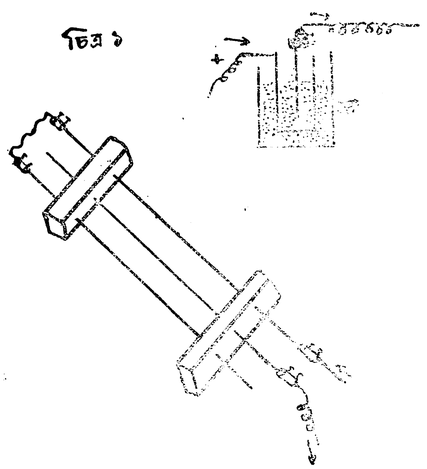

পাত একত্র-যোগে সুদ্বাররূপে বর্ত্তমান। যে তিনটি তার হইতে তাম্র পাত তিনটি ঝুলানো হইয়াছে, সেই তিনটী তার দুটী সরু সরু কাঠের মধ্য দিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। এই দুটী কাঠ কাচ পাত্রের উপর স্থাপিত। এখন তাড়িত প্রবাহ যদি আস্তে আস্তে সুদ্বার (anode) হইতে কুদ্বারে (kathode) প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ তড়িত প্রবাহের বেগ (strength) যদি খুব বেশী না হয়, তাহা হইলে কুদ্বারে তামার কণাগুলি বেশ সমভাবে ও দৃঢ়রূপে বসিতে পারে। কিন্তু যদি তড়িত প্রবাহে বেগ খুব বেশী হয়, তবে অনেক তামার কণা তাড়াতাড়ি গাদাগাদি করিয়া কুদ্বারে বসিতে যায়, কাজেই পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার সুবিধা পায় না। কুদ্বারটি ধুইবার সময় আলগা তামার কণাগুলি পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য তড়িত-বিশ্লেষণে মন্দ-বেশী তড়িত প্রবাহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুদ্বারের প্রত্যেক ৫০ বর্গ সেন্টিমিটার পক্ষে এক এম্পিয়ারের অধিক প্রবাহ ব্যবহার করা উচিত নহে। বিশ্লেষ্য পদার্থ মধ্যে দিবার পূর্ব্বে কুদ্বারকে বেশ পরিষ্কার করা আবশ্যক। খুব মিহি বালির কাগজ দিয়া প্রথমে কুদ্বারের দুই পিঠ ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। তারপর তাহাকে শুদ্ধারিকায় সালফিউরিক্ এ্যাসিড্ মিশানো জলে কয়েক মিনিট ডুবাইয়া রাখিবার পর পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। যদি কুদ্বারে তামার অক্সাইড ঘষার পরেও লাগিয়া থাকে তবে সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিডের তাহার উপর রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়ায়, অক্সাইড সলফেট্ হইয়া যায়, তখন জলে ধুইলে সলফেট্ জলে গুলিয়া যায় ও তামার পাতাটী বেশ পরিষ্কার হয়। অকসাইড্ তাড়াইবার জন্যই সাল্‌ফিরিক এ্যাসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তার পর একখানি সাদা ব্লটিং কাগজের উপর কুদ্বারটীকে খাড়া করিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া থাকিলে জলটি ব্লটিং কাগজে শুষিয়া যাইবে তখন তাহাকে স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় প্রায় একফুট উপরে কিছুক্ষণ ধরিলে কুদ্বারটি বেশ শুকাইয়া যাইবে। শিখার নিকটে থাকা উচিত নয়। কেননা, তাহা হইলে তামার অক্সাইড হইবার সম্ভাবনা। কুদ্বারের সহিত সমকালি-বিশিষ্ট অপর একখানি তাম্র-পাত কুদ্বার রূপে বিশ্লেষণ কোষের (electrolytic cell) মধ্যে রাখিয়া তড়িত প্রবাহ পরিমাণ উপযুক্ত রূপে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তার পর তাম্র পাতটি তুলিয়া রাখা হয়। এদিকে পূর্ব্বোক্ত পরিষ্কার কুদ্বারটির ওজন স্থির করা হয়। মনে কর, এখনকার ইহার ওজন 'ও' গ্রাম। ওজন স্থির করিবার পর কুদ্বারটিকে বিশ্লেষণ-কোষে বসাইয়া দেওয়া হয় ও সেই মুহূর্ত্তে ঘড়িটি দেখিয়া রাখা হয়। তার পর কিছুক্ষণ পরে (যথা আধ ঘণ্টা) ঘড়ি পুনরায় দেখিয়া কুদ্বারটী তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত জল-ধারায় তাহাকে ধুইয়া ফেলা হয়। এখন ইহাতে ইটের ন্যায় লাল তাম্র কণা সমস্ত প্লেটটিতে—যতখানি তরল পদার্থের মধ্যে ছিল—জমা হইয়াছে। তাহার পর ব্লটিং কাগজের উপর খাড়া করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর তাহাকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে শুকাইয়া লওয়া হয়। শুকাইবার পর তাহাকে আবার ওজন করা হয়। এখনকার ওজন, মনে কর, 'ও´' গ্রাম। যদি ঘড়ি-দৃষ্ট সময়-দ্বয়ের অন্তর 'স' সেকেণ্ড হয়, ও তামার তড়িত রাসায়ন—সমতা যদি 'র' হয়, তবে তড়িত প্রবাহ পরিমাণ, ত, নিম্নলিখিত অঙ্কপাত হইতে বাহির করিতে পারা যায়।

$$ত = \frac{ও - ও'}{স \times র}$$

ত = তড়িন্মাপক (Galvanometer)
ক = বর্ত্তক (Commutator)
ব = ব্যাটারি
বি = বিশ্লেষণ-কোষ
কু = কুদ্বার
সু = সুদ্বার
র = রোধভাণ্ডার (resistance-box)

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কপার সাল্‌ফেট তড়িত প্রবাহ দ্বারা দুইভাগে বিশ্লিষ্ট হয়। কপার (তামা, cu) ও সাল্‌ফেট্ (SO_4) দুই বিশ্লিষ্ট অংশ। তামাটি কুদ্বারে (cathode) জমা হয়, আর সাল্‌ফেট্ (SO_4) সুদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুদ্বারটি তামার প্লেট বলিয়া সাল্‌ফেটে (SO_4) তামার সহিত রাসায়নিক্ যোগে যুক্ত হইয়া কপার সালফেটে পরিণত হয়। কপার সাল্‌ফেট জলে দ্রবণীয় বলিয়া জলে গুলিয়া যায়। তাহা হইলে দেখ, সাল্‌ফেটের একটি অণু (molecule) তড়িত প্রবাহ

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

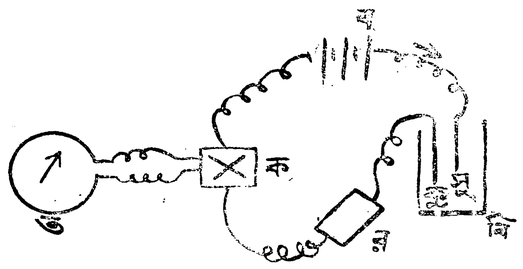

দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া তাম্র পরমাণুকে কুদ্বারে ছাড়িয়া দিয়া সুদ্বার হইতে অপর একটি তাম্র পরমাণু লইয়া আবার কপার সালফেটের একটি অনুতে পরিণত হয়। সুতরাং তুঁতে জলের বা তুঁতে দ্রবণের তুঁতের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

সুদ্বারের ক্ষয় কুদ্বারের বৃদ্ধির সহিত ঠিক সমান নহে। কারণ সুদ্বার যখন ক্ষয়িতে থাকে, তৎসংলগ্ন ময়লা (impurities) আলগা হইয়া যাওয়ায় তাহাও পড়িয়া যায়। কুদ্বারের বৃদ্ধি কেবলমাত্র তামা জমা হইবার দরুণই হইয়া থাকে কিন্তু সুদ্বারের ক্ষয়= তামার ক্ষয়+ময়লা। কাজেই সুদ্বার-ক্ষয় কুদ্বার-বৃদ্ধির সহিত সমান হইতে পারে না। সুদ্বার-ক্ষয় কুদ্বার-বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিক হইবে। সুতরাং তড়িত প্রবাহ মাপিবার সময় কুদ্বারে বৃদ্ধি না ধরিয়া সুদ্বার-ক্ষয় ধরিয়া গণনা করিলে ভুল হইবে।

পূর্ব্ব-বর্ণিত ভল্‌টা-মাপক বিজ্ঞানাগারে এম্‌-মাপক (am-meter) ও ট্যানজেণ্ট গ্যাল্‌ভান্‌ মাপক যাচাই করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার কারণ, ইহা অতি সহজেই প্রস্তুত করা যায়, এবং ইহা দ্বারা বেশ সূক্ষ্মরূপে তড়িত প্রবাহ মাপিতে পারা যায়।

রৌপ্য ভল্‌টা মাপকের কুদ্বার (anode) প্লাটিনাম নির্ম্মিত একটি বাটি (চিত্র ১,কু)।

রূপার গোল প্লেট, সু, সুদ্বার (anode রূপে ব্যবহৃত হয়।

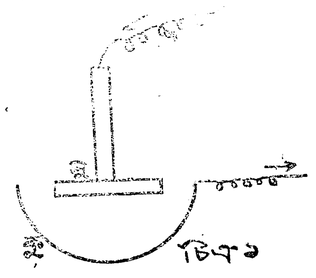

চিত্র ১

১৫ হইতে ২০ গ্রাম বিশুদ্ধ সিলভার নাইট্রেট্‌ ($AgNO_3$)

১০০ গ্রাম পরিষ্কার (pure) জলে গোলা হয়।

এই সিলভার নাইট্রেট্‌ গোলা জল বা সিল্‌ভার নাইট্রেট্‌ দ্রবণ (solution) রৌপ্য

ভল্‌টা মাপকে বিশ্লেষ্য পদার্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিল্‌ভার নাইট্রেট দ্রবণ প্লাটিনাম বাটিতে রাখা হয়। এই দ্রবণের মধ্যে সুদ্বারকে, সু, ঝুলাইয়া রাখা হয়। তড়িত প্রবাহ দ্বারা সিলভার নাইট্রেট্‌ বিশ্লিষ্ট হইয়া সিলভার (রৌপ্য) কুদ্বারে প্লাটিনম বাটির ভিতর দিকে জমা হইয়া থাকে। আর নাইট্রেট (NO_3) সুদ্বারে আসিয়া সুদ্বার হইতে রৌপ্য পরমাণু লইয়া আবার সিল্‌ভার নাইট্রেটে পরিণত হয়। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণীয় বলিয়া নবজাত সিলভার নাইট্রেট্‌ জলে গুলিয়া যায়। কাজেই দ্রবণের দ্রবণ-বল (Strength of the solution) ঠিক থাকে। তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। যখন রৌপ্য প্লেট হইতে রৌপ্য পরমাণু একএক করিয়া যেমন রাসায়নিক ক্রিয়া-যোগে সিল্‌ভার নাইট্রেটে পরিণত হইতে থাকে, তৎপার্শ্বস্থিত ময়লাগুলিও(impurities) আলগা রৌপ্যকণা খসিয়া প্লাটিনাম বাটিতে পড়া সম্ভব। যে রৌপ্য তড়িত প্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া প্লাটিনাম বাটিতে জমা হইয়াছে, তাহার ওজন আমার চাই। কিন্তু ময়লা বা আলগা রৌপ্যকণা রৌপ্যপ্লেট হইতে খসিয়া প্লাটিনাম বাটিতে পড়িলে, তড়িত বিশ্লিষ্ট রৌপ্যের ওজন সূক্ষ্মরূপে পাওয়া যাইবে না। কাজেই যাহাতে ময়লা বা রৌপ্য-কণা সুদ্বার হইতে খসিয়া প্লাটিনাম বাটিতে পড়িতে না পারে তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সুদ্বারটি ফিল্‌টার কাগজে জড়াইয়া রাখিলে ময়লা বা রৌপ্য-কণার খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। অথচ দ্রবণ (solution) ফিলটার কাগজের মধ্য দিয়া যাতায়ত করিতে পারায় তড়িত প্রবাহের গমনের পথে কোন বাধা পড়ে না। তড়িত প্রবাহের পরিমাণ কুদ্বারের প্রতি বর্গ-সেণ্টিমিটারের পক্ষে ·০৩ এ্যাম্পিয়ারের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে।

প্রথমে পরিষ্কৃত প্লাটিনাম বাটির ওজন দেখিয়া রাখ—মনে কর, ইহার ওজন 'ও' গ্রাম; তাহার পর সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ ইহাতে ঢালিয়া দাও। সুদ্বার যেন দ্রবণে ডুবিয়া থাকে ও কুদ্বারে না ঠেকিয়া যায় এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। পরে ঘড়ি দেখিয়া তড়িত প্রবাহ চালাইয়া দাও। ইচ্ছামত সময়-বাদে আবার ঘড়ি দেখিয়া তড়িত প্রবাহ থামাইয়া দাও। তাহা হইলে যতক্ষণ তড়িতপ্রবাহ বিশ্লেষ্য পদার্থ মধ্যে প্রবাহিত হইল, ঘড়ি সাহায্যে এই সময়টি পাওয়া যাইবে। মনে কর, এই সময় 'স' সেকেণ্ড তাহার পর কুদ্বারটি অর্থাৎ প্লাটিনম বাটিটি পরিষ্কৃত জলে ধুইয়া, সামান্য তাপে শুকাইয়া, আবার ওজন কর। এখনকার ওজন ও' গ্রাম। রৌপ্যের তড়িত রসায়ন সমতা (electro-chemical equivalent) চক্র (table) হইতে দেখিয়া লও। তার পর নিম্নলিখিত অনুপাত সাহায্যে তড়িতপ্রবাহ পরিমাণ স্থির কর। যদি ত=তড়িত প্রবাহ পরিমাণ, 'র' তড়িত রসায়ন সমতা হয়, তবে

$$ত = \frac{ও - ও'}{র \times স}$$ ।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

লাজ

হে দেবতা,
কি কহিতে চাহি আমি, কি আজি কব তা
জানো তুমি আগে;
তাই ত কহিতে কিছু ভালো নাহি লাগে।
আমার এ গান,
কুড়ানো মূর্চ্ছনা শুধু একটি তন্ত্রীতে কম্পমান
অসীমের শত তন্ত্রী হতে!
হৃদয়ের পরতে পরতে
যা-কিছু সমৃদ্ধি আছে, কিছু লয়ে চলে না গরব,
কার এ খুসির দান, খেয়ালে খোয়াতে পারি সব;
এ জীবন এত বড় ফাঁকি!

তুমি মোরে নিয়ে এলে ডাকি'
তোমার সভার মাঝে, গুণীজন সনে
পরিচয় ক'রে দিলে, তারপর বসায়ে আসনে
কোলে মোর সম্ভ্রমে সাদরে
বীণাটি তুলিয়া দিলে আপনার করে,
ধন্য হ'নু আমি।

তবুও কি বেদনায় আজি মোর গান গেছে থামি'
জানো না তুমি তা।
তুমি যে গো অসীমের পিতা,
—তুমি সব;
কি আছে আমার, আমি কি ল'য়ে জুড়িব কলরব
এত আড়ম্বরে?

তোমার ভাঁড়ার ঘরে
যত ধন যত বস্তু আছে,
সকল মেলিয়া দিলে অধমের কাছে,
এত দয়া তব!
হাতটি বাড়ায়ে কিছু ল'ব
নাহি সে শকতি;
হে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের পতি,
চিরকাল তুমি রাজা, চিরকাল আমি যে ভিখারী
এ লাজ সহিতে নাহি পারি।

চাহি না সে ধন,
হোক সে উজাড়-করা ধরণীর মাণিক রতন,
প্রতিভার বরমাল্য, প্রেয়সীর বাহুমাল্য আর,
চিরজনমের মোর যার 'পরে নাহি অধিকার,
লভি শুধু তব অনুগ্রহে।

—মোর এ ত এক জন্ম নহে!
কে বলেছে চিরকাল যাবে শুধু তব দয়া পেয়ে?
হয় ত জনম ল'ব হয়ে কোথা পতিতার মেয়ে,
অস্পৃশ্য অধম জাতি, জন্মান্ধ ভিখারী,
পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, কিবা পূর্ণাঙ্গী ভারতের নারী।

বুকে অনন্তের তৃষা ...আগুনের মাঝখান দিয়া
যদি নাহি যেতে পারি, পাশ ঘেঁষে গিয়া
নিজ ক্ষুদ্র সুখ ল'য়ে পাব না তৃপতি।
অনন্ত জীবন ধ'রে যত দুঃখ ক্ষতি
সহিয়াছে কোটি জীব, সব আমি স'ব,
কীট হয়ে পিষ্ট হব,
কুকুর হইয়া খাব তাড়া,
হিন্দুর বিধবা হয়ে আঁখিজলে নিশা হবে সারা,
দিন যাবে অনাদরে, অবজ্ঞায়, শ্লেষে।

আমার সে কোটি জন্ম তোমার দুয়ারতলে এসে,
ভিড় করে ওগো মহারাজ!
ক্ষমা কোরো মোরে তুমি আজ,
এ বোবা-কালার হাটে বাঁশী যদি বেসুরেই বাজে
স্বর যদি বেধে যায় লাজে
কণ্ঠের নিকটে এসে, খঞ্জের মেলায়
স্বচ্ছন্দ নৃত্যের ছন্দে তাল কেটে যায়,
অন্ধের আলয়ে
যদি লাজ বাসি আমি পশিবারে হাতে
আলো ল'য়ে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বারোয়ারি উপন্যাস

৫৩

আজ বৎসরাধিক কাল ধরে আমরা মাসের পর মাস পালায়-পালায় আপনাদের যে গল্প শুনিয়ে আসছি এতদিনে তার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে, অর্থাৎ গল্পটি এগার হাতে মানুষ হয়ে অতঃপর আমার হাতে এসে পড়েছে তার সমাপ্তি লাভ করবার জন্য।

এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনের গল্প শেষ হয় এক মৃত্যুতে; কিন্তু আমাদের মনগড়া গল্প শেষ হয় নানা রকমে। কোনটি শেষ হয় হত্যায়, কোনটি আত্মহত্যায়, কোনটি বিবাহে, কোনটি সন্ন্যাসে, কোনটি কান্নায়, কোনটি হাসিতে। কিন্তু আমাদের মনগড়া গল্পও আমরা যেমন খুশী তেমনি করে শেষ করতে পারি নে। কেন না গল্পের পরিণতিও গল্পের নিয়তির অধীন।

আপনারা মনে ভাবতে পারেন যে, কমলার উপাখ্যান গত মাসেই শেষ হয়ে গেছে। কিছুদিন ধরে অদৃষ্টই কমলা ও সতীশকে যে-লুকোচুরি খেলাচ্ছিল সে-খেলা একদিন অদৃষ্টই বন্ধ করে দিলে, পথের মাঝে দুজনকে পরস্পরের কাছে ধরিয়ে দিয়ে। এ ধারণা এক হিসেবে ঠিক হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। পৃথিবীর যে-কোন ব্যাপার হোক না কেন, তার জের না মিটলে তা খতম হয় না। আমার পালা হচ্ছে এ গল্পের জের মেটানো।

আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, আপনাদের সঙ্গে কমলা ও সতীশের যখন শেষ দেখা হয় তখন তাঁরা একখানি গরুর গাড়ীতে শোয়ার হয়ে কালীগ্রামাভিমুখে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। গো-শকটের এই মন্থরগতি আরোহী-যুগলের কাছে মোটেই বিরক্তিকর বোধ হয় নি। এ গাড়ী সগড় না হয়ে মোটর হলে—কমলার কথা, কমলা বলবার ও সতীশ শোনবার সুযোগ পেত না। আর বলা বাহুল্য, কমলার বলবার কথা অনেক ছিল আর সে তার স্বামীর কাছে তার জীবনের নূতন ইতিহাস তন্ন তন্ন করে বলতে ত্রুটি করে নি। সে-বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করার একমাত্র ফল হবে পুঁথির পাতা বাড়ানো। আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনে সতীশ মনে-মনে বল্লেন—"গল্প ত আগেই শুনেছি; এ ত ক্ষিতীশের রিপোর্টের অক্ষরে অক্ষরে কপি।"

কিন্তু কপি হলেও ক্ষিতীশ-দত্ত বিবরণের সঙ্গে এ বিবরণের পার্থক্য অবশ্য ছিল। একই জিনিষ পুরুষের হাতের লেখায় এক চেহারা আর মেয়ের হাতের লেখায় আর-এক চেহারা ধরে। কমলার বর্ণনার লাইন-গুলো আঁকা-বাঁকা ও অক্ষর গুলো ছোট-বড় ছিল। এই কাঁচা হাতের বর্ণনায় কৌশলের লেশমাত্র ছিল না বলে ক্ষিতীশের কথার চাইতে কমলার কথা সতীশের মনে বেশি করে বসে গেল। সে কথা যে সত্য সে বিষয়ে সতীশের মনের কোন কোণে তিলমাত্র সন্দেহও আর রইল না। সতীশ মনে-মনে প্রতীজ্ঞা করলে যে, যে যাই ভাবুক, যে যাই বলুক, সতীশ সীতার

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

বনবাসের পুনরভিনয় প্রাণ থাকতেও করবে না। সতীশের ব্যবহারে, তার কথায় বার্ত্তায়, তার কণ্ঠস্বরে, তার ভাব-ভঙ্গীতে কমলা বুঝলে যে তার স্বামীর পুরো বিশ্বাস সে আবার ফিরে পেয়েছে! তখন তার মনে হল যে, সে সেই গঙ্গাস্নানের দিন পথশ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, এইমাত্র সে জেগে উঠেছে। ইতিমধ্যে যে সব ঘটনা সে মনে ভাব্‌ছে ঘটেছে, সে-সব দুঃস্বপ্ন মাত্র।

৩৫

এই ত গেল তাদের মনের খবর। কিন্তু মানুষের দেহ বলেও একটা জিনিস আছে—যার দাবী সুখে-দুঃখে কোন অবস্থাতেই মানুষ উপেক্ষা কর্‌তে পারে না। এই একটা দিনের ঘটনা মনে করলেই পাঠক সহজেই অনুমান কর্‌তে পারবেন, শ্রান্তি সতীশ ও কমলার দেহকে কতদূর অভিভূত করে ফেলেছিল, ও ক্ষুধা তাদের কতদূর পীড়া দিচ্ছিল। গাড়ী বাড়ীর যত কাছে আস্‌তে লাগল তারা দুজনে ততই আহার ও নিদ্রার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু কি আহার কি নিদ্রা ভগবান সেদিন তাদের কপালে লেখেন নি। বলা বাহুল্য সে রাত্তিরে বাড়ী তারা অবশ্য পৌঁচেছিল, কেন না গরুর গাড়ীর আর যাই দোষ থাক্—একটা মহাগুণ আছে। গরুর গাড়ীতে আর গরুর গাড়ীতে কখন কলিসন হয় না—আর যদিও হয় তা হলে ব্যাপার তেমন মারাত্মক হয় না।

সতীশ কমলা সে রাত্তিরে তাদের নিজের বাড়ীতে আশ্রয় পায় নি।

অনেক বকাবকির পর দুর্গাসুন্দরী ছেলেকে শেষ-কথা বল্‌লেন এই যে কমলার হাতে জল তিনি কিছুতেই খাবেন না, তার সঙ্গে একত্রে বাস কিছুতেই করবেন না। সুতরাং সতীশকে হয় তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বার করে দিতে হবে—নয় তার মাকে।

কমলার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে নি এ কথা দুর্গাসুন্দরী কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না, কেন না সতীশের কথা শুনে তাঁর মনে এই বিশ্বাস অতি বদ্ধমূল হল যে, বউ তাঁর ছেলেকে যাদু করেছে। সতীশ কাকুতি-মিনতি করে রাগ দেখিয়ে ধমক দিয়েও যখন দেখলে যে তার মা কমলার নির্দ্দোষিতায় কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, তখন তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ এই কথা বেরিয়ে গেল যে কমলা সতীই হোক আর অসতীই হোক আমি ওকে কিছুতেই ত্যাগ করব না।

এ কথা শুনে দুর্গাসুন্দরী কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থেকে পরে অতি ধীরে বল্‌লেন,

"ভগবান যদি আমার কপালে তাই লিখে থাকেন ত তাই হোক। আমি ছেলে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব—কিন্তু ধর্ম্ম-ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না।"

কমলা এতক্ষণ পটে-আঁকা-ছবির মত এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। একটি কথাও কয় নি। যখন তার বাবা তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন তখন তার শাশুড়ী যে তাকে ঘরে তুলে নেবেন না, এতে আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি, দুঃখের বিষয়ই বা কি? সতীশচন্দ্র যখন মাকে প্রণাম করে উঠে

বললেন—"চল কমলা, আমরা যাই" তখন কমলা জিজ্ঞেস করলে "কোথায়?" উত্তর এল, "দেশ ছেড়ে।" কমলা বললে "দেশ ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, মা ছেড়ে বেরবার আগে নিজের মনে বুঝে দেখো যে কাজ করতে যাচ্ছ তার শেষ রক্ষে কর্‌তে পারবে কি না।"

"আমি মনস্থির করেছি, এ গ্রাম থেকে এই মুহূর্ত্তেই বেরিয়ে পড়ব, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। শেষে যা হয় তা হবে; তার ভাবনা ভাববার এখন সময় নেই।" এর পর সতীশ তার পৈতৃক ভিটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কমলার হাত ধরে সেই অন্ধকারের ভিতর নিরুদ্দেশভাবে বেরিয়ে পড়্‌লো।

৩৬

অজানা পথের পথিক হওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু মেয়ের পক্ষে তা নয়। স্ত্রীলোক যদি এক ঘর থেকে বেরয় ত সে আরেক ঘরে ঢোকবার জন্য। তাই কমলা সতীশের নিরুদ্দেশ-যাত্রার একটা লক্ষ্য নির্দ্দেশ করে দিলে। স্থির হলো তারা দুজনে সতীশের কর্ম্মস্থল লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে যাবে, কলকাতা হয়ে। লক্ষ্ণৌ দুদিন পরে পৌঁছনতে কোনোও ক্ষতি নেই—কেননা সতীশের ছুটি আজোও ফুরোয় নি। তা ছাড়া কমলা যে ইহলোকে আছে এবং তার স্বামীর আশ্রয়ে—এ সংবাদটা সে তার মা বাবাকে না জানিয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়াটা সঙ্গত মনে করলে না। পথিমধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে স্থির করলে যে, 'তারা কলকাতায় হরেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে দিয়েই খবরটা দেশে পাঠিয়ে দেবে। হরেনকে খুঁজে বার করতে তাদের কোনও কষ্ট পেতে হবে না। কমলা হরেনের বাসার ঠিকানা জানত।

তারা বেলতলীতে শেষ-রাত্তিরে ট্রেন ধরে সকাল বেলা কলকাতায় গিয়ে পৌঁছল। তার পর, এক ঠিকে-গাড়ীতে আগোহী হয়ে বরাবর বৌবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। সতীশ গাড়ী থেকে নেমে হরেনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলেন, আবার পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে খবর দিলেন যে হরেন সে-বাসায় আর নেই। কিছুদিন আগে তার বাবা এসে সেখান থেকে তার মালপত্র যা কিছু ছিল সব নিয়ে চলে গেছেন।

কমলা জিজ্ঞেস করলে—"হরেন এখন কোথায় থাকে মেসের কেউ কি তা বল্‌তে পারে না?"

সতীশ আবার ফিরে গিয়ে হরেনের হাল-সাকিমের সন্ধান নিয়ে এল। কমলা রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বর শুনে বললে—"ও ত ক্ষিতীশ বাবুর বাসা।" সতীশ প্রস্তাব করলে, "চল সেখানেই যাওয়া যাক্।" কমলা তাতে কোনোও আপত্তি করলে না। সত্য কথা বলতে গেলে অস্বীকার করা চলে না যে, কমলা যখন কলকাতা ঘুরে লক্ষ্ণৌ যাবার প্রস্তাব করে তখন মনের কোণে এ আশা ছিল যে কলকাতায় গেলে চাইকি ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে তার আর-একবার সাক্ষাৎ হলেও হতে পারে।

৩৭

ক্ষিতীশের বাসায় পৌঁছবা মাত্র সতীশের সঙ্গে প্রথম যার সাক্ষাৎ হল সে হচ্ছে কমলার ভাই অরুণ। কমলা গাড়ীতে বসে আছে, সতীশের মুখে এই কথা শুনে অরুণ আনন্দে

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

এতই অধীর হয়ে পড়্‌ল যে সে ছুটে গিয়ে তার দিদির কাছে যা বক্‌তে লাগল, তাকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না ; কেননা সে-সব কথার ভিতর কোনরূপ গাঁথুনি, কোনরূপ বাঁধুনি ছিল না। কিন্তু তার এই সব এলোমেলো বকুনির ভিতর থেকে সতীশ ও কমলা এই মোট কথাটা উদ্ধার করলে যে সমস্ত গোল চুকে গিয়েছে, শশি মুখুয্যের জাল ধরা পড়েছে—আর গাঁয়ে কমলার কোনো ভল্লাস না পেয়ে মৈত্রমহাশয়, যোগেন মিত্তির, হরেন ও অরুণ কাল রাত্তিরে এখানে এসে পৌঁচেছে। নির্দ্দোষী কমলা তাদের দোষেই পথে দাঁড়িয়েছে এই জ্ঞান হওয়া মাত্র মৈত্রমহাশয় ও মিত্তির মহাশয় উভয়েরি একসঙ্গে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেলে। উপস্থিত ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করতে না পেরে তাঁরা অরুণ ও হরেনের পরামর্শ মত চল্‌তে স্বীকৃত হলেন। এরা দুজনে তাঁদের এখানে নিয়ে এসে উপস্থিত করেছে। এরা ধরে নিয়েছিল যে কমলা যদি আত্মহত্যা না করে থাকে তাহলে সে ক্ষিতীশের দ্বারস্থ হবে, কেননা, ক্ষিতীশ ছাড়া আর কারও কাছে আশ্রয় পাবার তার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। মানুষ যখন জলে পড়ে ডুবে মরবার ভয় পায় তখন সে হাতের গোড়ায় যাকে পায় তাকে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে। তার পর অরুণ "দিদি এসেছে, দিদি এসেছে" বলে চীৎকার করতে-করতে কমলার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে কমলাকে ক্ষিতীশের সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে—যেখানে অপর সকলে গালে হাত দিয়ে বসে ছিলেন।

হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে কমলার সঙ্গে তার গুরুজনদের মিলন হয়ে গেল। দৈব-দুর্ব্বিপাকে একটা ভেস্তে-যাওয়া পরিবার দৈবের কৃপায় আবার যেমন ছিল তেমনি গুছিয়ে উঠল। প্রত্যেকে—যার যেখানে জায়গা সে সেইখানে বেমালুম বসে গেল। খালি তার বাইরে রয়ে গেল একমাত্র ক্ষিতীশ। এই মিলনোৎসবের ক্ষেত্র থেকে ক্ষিতীশ যে সরে পড়েছিল অনেকক্ষণ কেউ তা লক্ষ্যই করে নি। শেষটা মিত্তিরমহাশয় হরেনকে দিয়ে ক্ষিতীশকে ডেকে পাঠালেন। ক্ষিতীশ এলে তাঁকে সম্বোধন করে যোগেন মিত্তির ভদ্রতা করে বললেন—"দেখুন ক্ষিতীশবাবু, এই বিভ্রাটের জন্য আমরা "ওল্ড ফুল্‌রাই সম্পূর্ণ দায়ী।"

ক্ষিতীশ হেসে উত্তর করলে—"আপনাদের চাইতে বোধ হয় বেশি দায়ী আমরা—"ইয়ং ফুলরা"। আমি যদি কমলাকে নিজের বাসায় না এনে হাঁসপাতালে পৌঁছে দিতুম তাহলে এই ছোটখাটো ট্রাজেডিটি মোটেই ঘটত না।"

এ কথাটা এতই সত্য যে কেউ আর তার প্রতিবাদ করলেনা। ক্ষিতীশ অপ্রতিভ ভাবে নীরব হয়ে রইল দেখে হরেন বললে—"যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী তুমিও নয়, আমিও নই ; দায়ী আমাদের হতভাগা সমাজ।" সতীশ বললে—"দোষ সমাজেরও নয়! দোষ আমাদের স্বভাবের। আমরা যৌবনকে ভয় করি আর স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিনে।"

সতীশের এ কথা শুনে বুড়োরা কে কি মনে করলেন তার কোনো আভাস দিলেন না বরং এ আলোচনা চাপা দেবার জন্য যোগেন মিত্তির সতীশকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবাজী, এখন কি করবে স্থির করলে?" সতীশ

একটি অভিনেত্রীকে মাসের পর মাস ধ'রে নিয়মিত আহার-বিহারের দ্বারা নিজের দেহকে-দেহই বদ্‌লে ফেল্‌তে হয়েছিল!

আর-একখানি নাটকের একটি 'চরিত্রে'র দাঁত ছিল না। সেই ভূমিকাটি যে অভিনেত্রী গ্রহণ করলে, দান্নুনসিও তাকে বল্‌লেন, "তোমাকে সাম্‌নের একটা দাঁত তুলে ফেল্‌তে হবে।"

বলাবাহুল্য, অভিনেত্রী তাতে রাজি হলো না।

দান্নুনসিও রেগে টং হয়ে বল্‌লেন, "কা! দাঁত তুল্‌বে না, বটে! দাঁত-তোলা তো তুচ্ছ কথা, আমার নাটকে ভূমিকার উপযোগী হবার জন্যে, এক অভিনেত্রী তার একটি চোখ পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে রাজি হয়েছিল, সে খবর তুমি রাখো কি?"

এত-বড় দৃষ্টান্তেও ঐ অভিনেত্রী কাঁচা দাঁত তুল্‌তে আগ্রহ দেখিয়েছিল কিনা, তা প্রকাশ পায়নি।

সভ্য অসভ্যতা

বিলাতী সমাজে মানুষের দেহে এতদিন সাজপোষাকের ভার ছিল এদেশের তুলনায় ঢের বেশী। য়ুরোপ শীতপ্রধান দেশ, কাজেই সেখানে বস্ত্রবাহুল্য দেখে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু ফ্যাসনের গোলামি এখন সেখানে

"বল দেখি আমার গায়ে কি?"

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

এতদূর বেড়ে উঠেছে যে, বিলাতী মহিলা-সমাজে লজ্জাসরম ও সুরুচির ঠাঁই আর নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। কৃষ্ণাঙ্গের নগ্ন পদ দেখে যে জাতের সুন্দরীরা লজ্জায় মূর্চ্ছা যান, তাঁরাই আজকাল উচ্চসমাজের মধ্যে এমন-সব সাজপোষাক আম্‌দানি করেছেন, যার কাছে এদেশের প্রবাদ-বিখ্যাত "হাওয়ার কাপড়ও" হার মান্‌তে বাধ্য!

আঁকা গয়না

তাঁদের পা এখন স্বচ্ছ মোজায় আবৃত (?) হয়ে "আবরণের" নামরক্ষা মাত্র করছে, ঘাঘ্‌রা ক্রমেই খাটো হয়ে উপরদিকে উঠছে, আর গায়ের জামা বুক-পিঠকে একেবারে নগ্ন রেখে নীচের দিকে নাম্‌ছে!

নীতিবাগীশের কথা আমরা ধরি না। কিন্তু স্বাধীনতারও একটা সীমা তো নির্দ্দিষ্ট আছে! কাজেই য়ুরোপেও শিষ্ট লোকেরা এই নির্লজ্জ যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলেছেন এবং ডাক্তাররাও বল্‌ছেন যে, এই শীত-প্রধান দেশে এমন পোষাক স্বাস্থ্যের পক্ষেও মারাত্মক। কিন্তু উৎকট ফ্যাসনের বন্যায় তাঁদের আপত্তি, যুক্তি ও বিরক্তি খড়কুটোর মতন ভেসে যাচ্ছে!

বিলাতের লর্ডের ঘরের যুবতী মেয়েও এখন রঙ্গালয়ে ল্যাংটো হয়ে নাচলে কোন দোষ হয় না এবং নগ্ন ও কামোদ্দীপক দুষ্ট-ইঙ্গিত-বহুল নৃত্যও (যার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কোনই সম্পর্ক নেই) যে আজকাল অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে, বিলাতী কাগজ-পত্রের আন্দোলন ও প্রতিবাদ দেখে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত

ইতিহাস থেকে অনেক উদাহরণ তুলে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীতে যখনি কোন ভীষণ সমর উপস্থিত হয়েছে, যুদ্ধের অব্যহিত পরে তখনি সমাজের মধ্যে এম্‌নি অশ্লীলতা, কুরুচি ও লাম্পট্য আত্ম-প্রকাশ করেছে। তাঁর মতে, য়ুরোপীয় সমাজের বর্ত্তমান অধোগতির প্রধান কারণও তাই।

আর-একজন পণ্ডিতও ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, যখনি কোন অতি-উন্নত ও সভ্য জাতির মধ্যে এম্‌নি সব দুর্নীতি ও ব্যভিচারের লক্ষণ ফুটেছে, তখনি তার পতন হয়েছে।

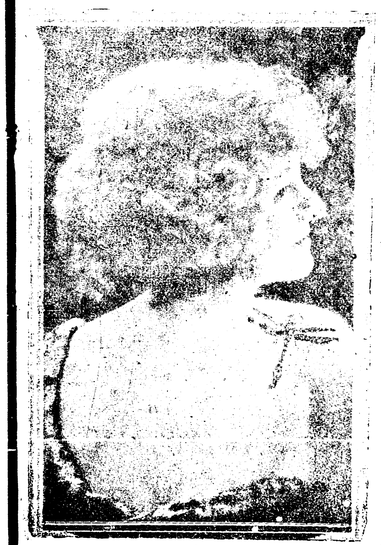

পৃষ্ঠ-পটে চিত্র-পতঙ্গ

কিন্তু এ-সব ঐতিহাসিক প্রমাণের কথা থাক্—আসলে ব্যাপারটা যে বড়ই কদর্য্য, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

রোম থেকে খবর এসেছে, সেখানে খালি যুবতীরা নয়—সত্তর-আশী বছরের বুড়ীরা পর্য্যন্ত বুক নগ্ন রেখে পোষাক পর্‌তে সুরু ক'রে দিয়েছেন! দৃশ্যটা একবার মনের চোখে ভেবে দেখুন। এটা খালি অশ্লীল নয়, বীভৎসও বটে!

আমরা এখানে একেলে পোষাকের অপেক্ষা-কৃত সভ্য নমুনা দিলাম। লক্ষ্য কর্‌লে দেখ্‌বেন, একখানি ছবিতে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, আছড় পিঠের ওপরে একটি পতঙ্গও আঁকা রয়েছে।

আর-একখানি ছবিতে নূতন ফ্যাসনের মধ্যেও অতিরিক্ত বৈচিত্র্য আছে। চিত্র-লিখিত যুবতীর কণ্ঠের, বাহুর ও পায়ের সমস্ত গহনাই আসল নয়, নকল সোনারও নয়—একেবারে হাতের তুলিতে আঁকা!

কিন্তু সবাইকে টেক্কা মেরেছেন ঐ মেয়েটি—পিঠে যাঁর জিজ্ঞাসার চিহ্ন। উনি ঐ চিহ্ন দ্বারা প্রশ্ন করেছেন—"বল দেখি আমার গায়ে কি?"—দেখেও যাঁরা জবাব দিতে পারবেন না, তাঁরা জেনে রাখুন,—ঐ যুবতীর গায়ে জামাকাপড় যা দেখা যাচ্ছে, তা বাস্তবিক নয়, কাল্পনিক—অর্থাৎ, চিত্রকরের তুলিতে রং দিয়ে আঁকা! এঁরাই বিলাতের ভদ্রমহিলা এবং এঁরাই এদেশে এসে ভারতবাসীর নগ্নপদ দেখে লজ্জায় আঁৎকে ওঠেন!

চিরযৌবনের প্রথম ধাপ

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকরা অনেক দিন থেকেই মানুষের যৌবনকে স্থায়ী রাখবার জন্যে চেষ্টা করছেন। সংপ্রতি কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, তাঁদের চেষ্টায় যৌবনকে বাঁধবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এ-সব উপায়ের দ্বারা যৌবন যথার্থই স্থায়ী হয় কিনা, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেতে দেরি লাগে।

কিন্তু এবারে একদল অস্ত্র-চিকিৎসক কেবলমাত্র অস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা বুড়ীকে যথার্থই ছুঁড়ী ক'রে তুলতে পেরেছেন। মানুষের নাক, কপোল, চিবুক ও চোয়াল প্রভৃতির উপরে বা আশেপাশে যে-সব বলি-রেখা পড়ে, তার জন্যেই মানুষকে বুড়ো দেখায়। অস্ত্রচিকিৎসকরা যন্ত্রের দ্বারা মুখের এই-সব ঝোলা মাংস টেনে ধ'রে, ছুরি দিয়ে কেটে তা বাদ দিচ্ছেন। তারপর ক্ষতের জোড় এমন সুন্দর কায়দায় সেলাই ক'রে দেওয়া হচ্ছে যে, অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন মোটেই বোঝা যায় না। অস্ত্রপ্রয়োগের সময় যন্ত্রণাও হয় না—কারণ ঔষধের গুণে মুখ

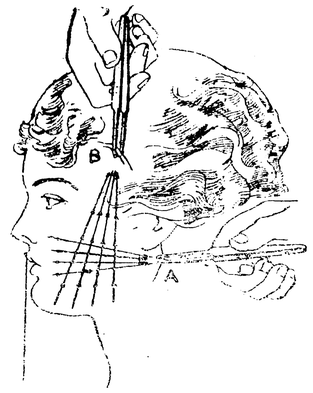

অস্ত্র দিয়ে কোঁচ্‌কানো ত্বক টেনে ধরা হচ্ছে

তখন অসাড় হয়ে থাকে। এই নূতন উপায়ে ভাটা-পড়া যৌবনে আবার জোয়ার বওয়াবার জন্যে বিলাতী মেয়েরা ভারি ক্ষেপে উঠেছেন। ফলে সপ্তাহখানেক আগে যারা ছিল প্রৌঢ়ের মতন দেখতে, আজ তাদের চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক নবযুবতীর মতন!

সেকালের দানব

রূপকথায় অনেক দানবের কথা পড়া যায়,—তবে বৈজ্ঞানিকরা এতদিন তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন নি। কিন্তু বেলজিয়ামের একটি কয়লার খনিতে, ১০৬৮ ফুট নীচে সেকালের এমন ভীষণ দানবের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গেছে, যারা বেঁচে থাকলে পৃথিবী আজ মানুষের দখলে আসত না।

এই দানবের নাম ডাইনোসর ইগুয়ানোডন। এরা উঁচুতে ছিল কুড়ি ফুট। এদের বাহু, হাত, আঙুল ও বুড়ো-আঙুল কিছুরই অভাব ছিল না। এ হাতগুলো প্রায় মানুষের মতনই

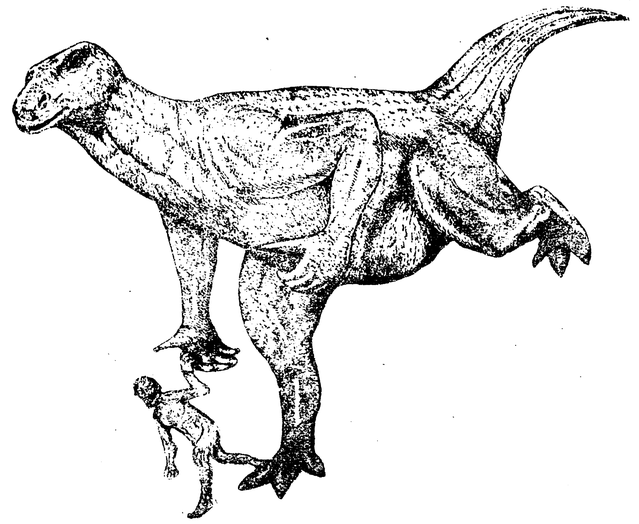

ইগুয়ানোডন ও আদি মানব

দেখতে। এরা মানুষের মতন দুইপায়ে ভর দিয়ে হাঁটত। এদের পায়ে তিনটে ক'রে আঙুল ছিল। তারা মিনিটে অন্তত এক-মাইল বেগে ছুটতে পারত।

এই নব-আবিকৃত ইগুয়ানোডনের আসল বিশেষত্ব তার হাতের বুড়ো-আঙুলে। হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন, হাতের বুড়ো-আঙুলের পরিণতি দেখেই মানুষের ক্রমোন্নতির পরিমাণ বুঝা যায়। কারণ, মানুষ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়েছে তার হাতের ব্যবহারের দ্বারা এবং বুড়ো-আঙুল না থাকলে তার হাত অকেজো হয়ে থাকত।

ইগুয়ানোডন যদি হাতের বুড়ো-আঙুলের সদ্ব্যবহার করত, তবে কালে সে নিশ্চয়ই গাছে চড়তে, ইট ছুঁড়তে, লাঠি ও ধনুক-বাণ ধরতে পারত। ফলে অভিব্যক্তির নিয়ম অনুসারে, তার এই প্রায়-মানুষের-মত হাতের জোরে আজ সে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে দাঁড়াত। ক্রমাভিব্যক্তির ধারায় মানুষের মত তারও ল্যাজ একদিন অদৃশ্য হয়ে যেত। তখন তার কাছে কিছুতেই মানুষ টিকতে পারত না। টিকলেও, আমাদের সকলকে হয়ত ইগুয়ানোডনের আলয়ে বাঁধা থাকতে হোতো—বুদ্ধিমান ও কেজো জীব ব'লে ঘোড়া ও কুকুর আজ যেমন মানুষের দ্বারে বাঁধা আছে।

কিন্তু ভাগ্যে ইগুয়ানোডন তার হাতের বুড়ো-আঙুল ব্যবহার করতে শেখে নি!

তাই তার বুড়ো-আঙুল ক্রমে অকেজো ও আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল। ফলে জীবন-যুদ্ধে বেশীদিন বেঁচে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের আগেই ইগুয়ানোডনের পতন হয়। মানুষ বড় মানে মানে বেঁচে গেছে।

ছবিতে ইগুয়ানোডনের ও আদিম মানুষের চোহারা দেওয়া হোলো। ইগুয়ানোডনের অস্তিত্বলোপের প্রায় দেড় কোটি বৎসর পরে পৃথিবীতে এই-জাতীয় মানুষ বিচরণ করত!

প্রসাদ রায়।

ত্রয়ী

(বিশ্ব)

অবাক চোখে তোমার মুখে চাহিয়া আছি থির,
হে লীলাময় বিশ্ব মহা, প্রবলতম বীর!
সুনীল ভীম শূন্য হতে গরজি' তুলি' তান
ধরার কীট, তৃণেরে লয়ে আকুলি অফুরান
ছুটেছে মহা-জীবন স্রোতে আলোড়ি' যুগ-যুগ
লক্ষ প্রাণ বক্ষে তুলি' মথিয়া সুখ দুখ।

(জীবন)

সে লীলা-পাশে ভুবন জাগে, জাগিছে কত প্রাণ,
সে প্রাণমাঝে বিশ্ব নিতি করিছে গতি দান।
হরষে সুখে দ্বন্দ্বে দুখে বিপুল আলোড়ন,
ধরার জীবে জীবন একি চপল, বিভীষণ!
আর্ত্ত, ভাঙা, অন্ধ মাঝে বিকাশি' শত রূপ
জীবন জাগে প্রণয়ে স্নেহে গরিমাময় ভূপ!

(মানুষ)

বিশ্বমাঝে ভুবন-বুকে জীবন-পারাবার,
তাহারি' পরে মানব দোলে ঢেউর সম তার।
ভাঙিয়া পড়ে, উঠিয়া চলে পাগল আগুয়ান,
কিরণে ক্ষণে বিভাসি' উঠি' মরণে অবসান।
বিশ্ব-নিতি ভুবনে জুড়ি' জীবনে ছুটে যায়,
জীবন নিতি মানুষে লয়ে খেলিছে মহিমায়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

সঙ্কলন

বর্ত্তমানের সমস্যা

এ যুগটা ওলট-পালটের যুগ। ওলটপালট যে কোন বাহিরের জগতে স্থূল বিষয়ে চলিয়াছে তা নয়। বন্দুক কামান লইয়া গায়ের জোরে যে ঠেলাঠেলি মারামারি দাঙ্গা করা চলিয়াছে তাহা সকলে স্পষ্টই চোখের সামনে দেখিতেছেন। কিন্তু মানুষের অন্তরে তার স্বভাবে তার সংস্কারে যে ভাঙ্গন উঠিয়াছে সেইটাই আসল জিনিষ, আর সেইটার দিকেই সর্ব্বসাধারণের নজর আমরা ভাল করিয়া ফিরাইতে চাই। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া যে সব জিনিষে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, যাদের সম্বন্ধে মনে করিয়াছি তাহারা সনাতন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ, ঠিক সেই সব জিনিষে কেমন টলমল করিয়া উঠিয়াছে সে খবরটাই আকালকার দিনের প্রধান খবর। সমাজের মানুষের একেবারে গোড়া ধরিয়াই টানাটানি পড়িয়াছে, বাহিরের দুই চারিটা ভাসা ভাসা জিনিষ যে ধ্বসিয়া ছিটাইয়া পড়িবে তাতে কোন আশ্চর্য্যই নাই। এখনকার দিনে যেনে জিনিষকে, তা মানুষ যতই আপনার বলিয়া বাধ করুক না কেন, তাহা ছাড়িতে মানুষের প্রাণে যেই কষ্ট হউক না কেন, কোন জিনিষকেই তেমন অটল নিত্য সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। অতি প্রিয়তম জিনিষের উপরেও বিচারের তীক্ষ্ণ মশালটা ফেলিতে হইবে, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে হইবে, তাহার শক্তি কতখানি, সত্য কতখানি। নতুবা প্রাণে সাড়া দেয় না এইজন্য চোখ বুজিয়া পুরাতন পরিচিতকে আঁকড়িয়া যে ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে বিপদের হাত সে এড়াইতে পারিবে না। ঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় সীতা-দেবীকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এ ছাড়া আর উপায় নাই।

সভ্য-সমাজের অতি প্রাচীন ও অতি গ্রাম্য একটা সংস্কার হইতেছে বিবাহ। ইউরোপে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠিয়াছে বিবাহ কি এতপ্রয়োজনীয় বরণীয় জিনিষ? এটি ছাড়া মানুষের সত্তা, তার শিক্ষা-দীক্ষা-কি একেবারেই পচিয়া যায়? এ প্রশ্নে শুধু শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, অবিচলিত চিত্তে আলোচনা করিয়া নির্ভয়ে মীমাংসা করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এ সমস্যার তরঙ্গ এখনও আসে নাই। এখানে তরুণদলে দেখা দিয়াছে এই তরঙ্গরেই অব্যবহিতপূর্ব্ব তরঙ্গটি। বিবাহকে বাদ দিলেও চলে কি না, তাহা নয়, প্রশ্ন হইয়াছে স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ; ভালবাসার পরে বিবাহ আত্মীয়স্বজনের দেওয়া বিবাহ অপেক্ষা ভাল কি না। পুরাতনের দিক হইতে বলা হইয়া থাকে যুবক-যুবতীর প্রেমের বিবাহ বাস্তবিক পক্ষে হইতেছে কামের বিবাহ, স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ হইতেছে স্বেচ্ছাচারের বিবাহ। অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান গুরুজনেরা চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া স্বভাব চরিত্র রূপগুণ সব যথাযথ ওজন করিয়া, যে পাত্র ও পাত্রীর মিল করাইয়া দেন তাহাই হইতে পারে,—অন্ততঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহারই হইবার সম্ভাবনা আছে—আদর্শ মিল রাজযোটক। ভালবাসার নামে স্বাধীনভাবে যে মিল সেটা ক্ষণিকের মোহ, দুই দিনেই কাটিয়া যায়, পরে আরম্ভ হয় ঘোরতর অমিল। ইউরোপে যেমন দাম্পত্য কলহ, বিবাহলম্বন (divorce) দেখা যায় ভারতে কি তেমন আছে? নূতনের দল বলিলেন, স্বাধীনভাবে যাহা করা যায় তাহারই একটা মূল্য আছে; হউক না কাম, হউক না ক্ষণিকের মোহ কিন্তু সেটা আমার স্বাধীনতার সৃষ্টি। পরাধীনভাবে অন্ধভাবে ঠিক পথে চলা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে ভুল পথে চলাও অনেক ভাল; কারণ এখানে আছে অন্তরাত্মার জাগরণ আর ওখানে অন্তরাত্মার মৃত্যু, এখানে জীবনের চাঞ্চল্য আর ওখানে মরণের শান্তি। তারপর নিজের পাওয়া ও দেওয়া ভালবাসাটা কাম আর পরের হাতে পাওয়া ও লওয়া জিনিষটায় কাম নাই তাই বা কে বলিতে পারে? দুইটি অজানা অচেনা জীবকে যে একসঙ্গে করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে ত

প্রথমে দুইটি শরীরকে, শরীরের স্থূলতম পর্দ্দাকে এক-সাথে করিয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রাণের মনের মিল ত সেখানে আদর্শ মাত্র ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; পরস্পরে জানা-শুনার ফলে যে দুইটি জীব এক সাথে হইতে চায় সেখানে অন্ততঃ জ্ঞানতরঙ্গের মিল, মনেরও একটা মিল। নতুবা এক সাথে হইতে তাহারা চাহিবে কেন? তারপর দাম্পত্য কলহ—সেটা আমাদের পরিবারে এতই কি দুর্লভ জিনিষ? ইউ-রোপে সেটা না ফুটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু আমাদের সমাজে সেটা বাহির হইবার পথ না পাইয়া ভিতরে ভিতরে খাইয়া চলিয়াছে, তাহা কি কাহারো চক্ষে পড়ে নাই?

আমাদের দেশে বিবাহটা ব্যক্তিগত জিনিষ নয়, ওটি সমাজ-গত জিনিষ। অর্থাৎ আমি বিবাহ করি আমার জন্য নয়, কিন্তু আমার পরিবারের জন্য, আমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য, সমাজের জন্য। এইজন্যই হইয়াছে বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা। বয়সের সাথে সাথে মানুষের স্বাতন্ত্র্যটা বাড়িয়া যায়; তাই আমাদের মধ্যে স্বাধীন মত স্বাধীন ইচ্ছা ফুটিবার আগেই পুরুষ ও মেয়েকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, পরিবারের সমাজের ঢালা স্রোতের মধ্যে পড়িয়া যাহাতে তাদের ধার সব মরিয়া যায়, পৃথক অস্তিত্ব আর না থাকে, পরিবারের সমাজের তাহারা একেবারে অঙ্গীভূত হইয়া যায়। পুরুষের পক্ষে স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ যাহাও বা সম্ভব মেয়ের পক্ষে তাহাও সম্ভব নয়। জ্ঞান হইবার আগেই মেয়েকে পাত্রস্থ করিতে হয়, শ্বশুরের ঘরে তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ারি করিয়া লইবার জন্য। বড় হইলে স্বাতন্ত্র্য জন্মে, স্বাতন্ত্র্য জন্মিলে ইচ্ছামত আর গড়া-পেটা চলে না। নিজের নিজের ইচ্ছায় যদি প্রত্যেকে চলে তবে যে যা খুসী তাই করিতে পারে, ইহাতে আসে, সমাজে বিশৃঙ্খলতা। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা রাখিবার জন্য সমাজই আমার জীবনের সাথীটিকে পছন্দ করিয়া দেয়। কন্যাপক্ষ বরের দেখেন বিদ্যাধন, বরপক্ষ কন্যার দেখেন রূপ গুণ—কিন্তু কুলশীল স্বভাব-চরিত্র এ সকলের সাথে হৃদয়ের অন্তরাত্মার মিলের সম্বন্ধ কি? ব্যক্তির নিজের প্রেরণা সমাজের সুবিধার কাছে, না সমাজের মঙ্গলের কাছেই হইল, তাই বা বলি দিবে এ কোন্ কথা? সমাজ বড় না ব্যক্তি বড়? ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিয়াই কি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি? উভয়ের সামঞ্জস্য নাই? ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ, ব্যষ্টির দাবী কি, দায়িত্ব কি, আর সমষ্টিরই বা দাবি কি? দায়িত্ব কি—এই গোড়ার তত্ত্ব লইয়া গোলমাল, ইহাও আজকালকার যুগের একটা মস্ত সমস্যা। আমরা তত্ত্বের মধ্যে যাইব না, তবে প্রকারান্তরে একরকম ইহারই একটা উদাহরণের কথা বলিব। কথাটা সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ।

আজ-কালকার সমাজ পুরুষের সমাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজে নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান নাই, তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই পুরুষের সেবায়, পুরুষের সুখ-সুবিধা-উপকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়োজিত। সমাজে স্বাধীন সজীব জীব যদি কেউ থাকে তবে সে পুরুষ। নারী যেন পুরুষের জড় ধনসম্পত্তির অন্তর্গত। ব্যবস্থাই আছে, বাল্যকালে মেয়েরা পিতার জিনিষ, যৌবনকালে পতির জিনিষ, পর বৃদ্ধকালে পুত্রের জিনিষ। অস্ব-তন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈদিবাদিজম। পাশ্চাত্যের দার্শনিক-প্রবর দেকার্ত্ত (Descartes) ইতর জীবদের অন্তরাত্মা (Soul) আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না; আমাদের মনে হয় স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেও আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাপকদেরও যেন সেই মতই ছিল। মেয়েদের শিক্ষার যে কোনই বন্দোবস্ত ছিল না বা তাহাদিগকে কেবলই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হইত, এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। কিন্তু সে-সব যাহা করা হইয়াছে বা কি হয় তা যেন অনেকটা দয়ার দান; মেয়েদের নিজের দাবির জোরে নয়। উত্তরে বলা যাইতে পারে, মেয়েরা যে স্বতন্ত্র্যের যোগ্য নয় তার কারণ তাদের ভাব। নারীর স্বভাবই হইতেছে পুরুষের আশ্রয়ে পুরুষকে ধরিয়া চলা, তাহারা হইতেছে অবলা জাত (weaer sex), কাহাকেও না ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারেনা, আর তাদের স্বভাবের মধ্যে অনেক খারাপ জিনিষআছে, পুরুষ যদি তার রাশ টানিয়া না ধরে তবে সহজেই বিগড়াইয়া যায়।

দ্বিতীয় কথা, স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য হইলেও নারীকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নয়, সমাজের কল্যাণ-কল্পে। কারণ মেয়েরা হইতেছে ঘরের লক্ষ্মী। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিবারের সমাজের দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। মূলে, ঘরে কেন্দ্রে যদি স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়, মেয়েরা যদি স্বৈরচারিণী হয় তবে পরিবার বলিয়া কিছু থাকে না, সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। পুরুষের পক্ষে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছাচার, এমন কি উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক সহ্য করা যায়—তাতে সমাজের বিশেষ কিছু আসে যায় না—পুরুষের কারবার যে বাহিরের জগৎ লইয়া; কিন্তু মেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিলে যে সমাজের ভিতরে প্রাণের মধ্যে মিলন-গ্রন্থীতে একেবারে ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করে। এখন প্রশ্ন, মেয়েরা যে স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়, বা হইতে পারে নাই সেটা বাস্তবিক পক্ষে তার জন্মগত স্বভাবের দোষের ফল না শুধু সংস্কারের অভ্যাসের ফল? একটা বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া, একটা বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষার ফলে নারীর স্বভাব স্বধর্ম্ম এইরকম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এইটিই তার সনাতন ধর্ম্ম—এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ— তাই কে বলিতে পারে? অন্যরকম ব্যবস্থা, অন্যরকম শিক্ষা-দীক্ষার ফলে নারীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম অন্যরকমও হইতে পারে না? আর তা যদি সম্ভব হয় তবে, নারীর স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়াই সমাজ বা পরিবার আর একরকম ব্যবস্থায় সুব্যবস্থা-তেই গড়িয়া উঠিতে পারে না? কিন্তু বাস্তবিক যদি ফলে কোন সুব্যবস্থা নাই হয়, তবুও জিজ্ঞাসা করা যায় সমাজের কি অধিকার আছে যে একটা বিশেষ অঙ্গের উপর সে অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে? পাছে উচ্ছৃঙ্খলতা হয় বলিয়া স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যটুকু হইতে নারী বর্জ্জিত হইবে কেন? সমাজের মধ্যে আছি বলিয়া, নারী হইয়াছি বলিয়া কি নিজের ইচ্ছা জিনিষটিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে? সমাজের একটি অঙ্গকে এই রকম নির্বীর্য্য মরণাহত করিয়া রাখিলে সমাজে সুশৃঙ্খলা পাইতে পার, শান্তি পাইতে পার, কিন্তু জীবন পাইবে, পুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে?

এখানে কথা উঠিবে, তবে দাও সেই রকম শিক্ষা সেই রকম দীক্ষা—শুধু স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বলিয়া চীৎকার করিলে হইবে না, আর সেইজন্যই প্রাচীন ব্যবস্থাকারও বলিয়া গিয়াছেন পুত্রের মত কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। নূতন আর আমরা কি বলিলাম? নূতন জিনিষ এই প্রাচীন শিক্ষা মেয়েদের দাসত্ব জিনিষটাকেই ভাল করিয়া সুচারুরূপে করিতে শিখাইত, কেবল এই দাসত্বকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করা হইত বড় বড় কথা দিয়া—যথা সেবা, আত্মোৎসর্গ, বিনয়, লজ্জা। কিন্তু নূতন শিক্ষার লক্ষ্যই হইবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা, নিজেকে জানা, স্বাধীনভাবে নিজের ভিতরের ভগবানকে ফুটিয়া উঠিতে দেওয়া। শিক্ষা আগে পরে স্বাধীনতা, একথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য হইতেছে, আগে স্বাধীনতা পরে শিক্ষা। স্বাধীনতার ভিতর দিয়া জীবন্ত শিক্ষা ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু অপর পক্ষ বলিতে পারে, নারীর অবস্থা যে সমাজে এ-রকম হইয়াছে, সে যে স্থান পাইয়াছে, যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুসরণ করিতেছে, এটা কি শুধুই বাহির হইতে আরোপ, শুধুই পুরুষের কারসাজি? সমাজ যুক্তি করিয়া কোন্ দিন এরকম অত্যাচার আরম্ভ করিল? বলা যায় না কি, নারীর এ রকম ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনুমতি ছিল, কেবল অনুমতি নয়, এইটীর মধ্যেই ছিল তার স্বভাবের আনন্দ, নতুবা এ রকম ব্যবস্থা আদৌ উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া, দেশে দেশে যুগে যুগে ঠিক এই একই ব্যবস্থা এ যাবৎ চলিয়া আসিল কেমন করিয়া? একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে শুধু মায়া শুধু মিথ্যা শুধু জুয়াচুরির উপরই এত বড় জিনিষটা গড়িয়া উঠিয়াছে? পুরুষ যেমন স্বাধীন স্বতন্ত্র হইতে চায়, আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যগ্র, নারীও কি ঠিক তেমনি চায়? এ চাওয়াটা যদি নারীর সত্য হইত তবে তাহা কি সমাজে, সমাজের ব্যবস্থার মধ্যে ফুটিয়া উঠিত না? সমাজটা পুরুষের সমাজ হইল কেন? নারী পুরুষের ছায়া হইয়া থাকিতেই চায়, অধীন হওয়াটাই নারীর স্বাধীন ইচ্ছা, এইজন্যই কি নয়?

আমাদের মনে হয় আসল সত্যটা এই রকমের

প্রাচীন কালে এক সময়ে সমাজের গতি অনুসারে একটা আদর্শ ফুটিয়াছিল—যুগ-ধর্ম্মের বশে পুরুষ ও নারীর উভয়েই এক একটা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন সার্থকতা পাইয়াছিল, সমাজকে একটা বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। সীতা-সাবিত্রীর যুগে নারী আপন ব্যক্তিত্বকে স্বেচ্ছায় পুরুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিল, তাহার অন্তরাত্মা আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, পুরুষের অন্তরাত্মাকেই উপচিত করিয়া চলিত। নারী ছিল দাতা পুরুষ ছিল গ্রহীতা। পুরুষ ছাড়া আপনার ভিন্ন-অস্তিত্ব নারী উপলব্ধি করে নাই, করিতে চায় নাই, তার কোন প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। সেইটাই সেই যুগের ছিল ধর্ম্ম। কেন এই রকম ধর্ম্ম হইল, সমাজের বিবর্ত্তনের কি রকম স্তরে অথবা মানবাত্মার কোন্ প্রেরণাকে কোন্ সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য, সে কূট-সমস্যা আমরা আলোচনা করিব না। শুধু বলিব, তখনকার দিনে পুরুষের ও নারীর সম্বন্ধ ছিল তাহাদেরই ভিতরের একটা জীবন্ত আদর্শ, একটা সত্য ধর্ম্মের ফল; সমাজের ব্যবস্থাও দিল সেইটিকেই ফলাইয়া ধরিবার জন্য সজীব কাঠাম। পরে কিন্তু সে আদর্শ সে ধর্ম্ম লোপ পাইতে লাগিল, সমাজের ব্যবস্থাটা কিন্তু তেমনি অটুট রহিল; শুধু তাই নয়, অগুমান আদর্শটিকে ধর্ম্মটিকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সে ব্যবস্থাকে আরও বিশদ করিয়া খুঁটীনাটিতে ভরিয়া কঠোর করিয়া তোলা হইতে লাগিল। প্রথমে যে সম্বন্ধটা ছিল সহজ ও আনন্দপূর্ণ, পরে তাহা হইল শুধু অভ্যাসের, কর্ত্তব্যের। প্রথমে নারী যে জিনিষটা দিত স্বেচ্ছায় সানন্দে, পুরুষও লইত পূজার দান রূপে, পরে পুরুষ লইতে আরম্ভ করিল দাবিরূপে, নারীও দিতে আরম্ভ করিল অজ্ঞানের সংস্কারের বশে। কেন এ-রকম হইল সে প্রশ্ন তুলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এজিনিষটি যে স্বাস্থ্যকর নয়, পুরুষ ও নারীর জন্য, সমাজের জন্য যে ইহার পরিবর্ত্তন চাই, শুধু তাই নয় আর একটা সত্য আর একটা ধর্ম্ম আর একটা আদর্শ যে পুরাতন জীর্ণ কাঠাম ভাঙ্গিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাই আমাদের বুঝিবার দেখিবার জিনিষ।

সেটা হইতেছে পুরুষের ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন, সেই সঙ্গে নারীরও ব্যক্তিত্বেরউদ্বোধন। পুরুষের ছায়া মাত্র হইয়া নারী যে সত্যকে পরিপূর্ণ করিয়াছে, তাহা অতীতের কথা। ভবিষ্যতের কথা, নারী পাইবে আপনার কায়া, ফেলিবে আপনার ছায়া। পুরুষের সম্পর্ক ছাড়াও নারীর যে আছে একটা নিজস্ব সত্য—নাই কি? তার পরিস্ফুরণ বর্ত্তমান যুগের একটা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাজকে পূরণ করিতে হইবে, পুরুষকেও সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। প্রাচীন ব্যবস্থা উল্টাইতে গেলে সমাজে একটা বিষম গোলমাল হইবে, ওলট-পালট ভাঙ্গাচুরা হইয়া যাইবে, পুরুষ তার সনাতন অনেক সুখের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে—এ সব কারণ দেখাইয়া শান্তি স্বস্তিকে চরম আদর্শ করিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না, মঙ্গলপরও হইবে না।

নারায়ণ ফাল্গুন, ১৩২৭। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

সমালোচনা

সদাচার শিক্ষা।—শ্রীযুক্ত স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ-দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত আদর্শানুযায়ী আচার-ব্যবহারের নিয়মাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, কোন্ সময়ে শয্যাত্যাগ করিতে হয়, শয্যাত্যাগের পর শারীরিক ও মানসিক কৃত্যাদি, গুরু জন ও ভাই ভগিনীর প্রতি কেমন আচরণ করিতে হয়, আহারের নিয়ম ও খাদ্যাখাদ্য বিচার ব্যায়ামচর্চ্চা প্রভৃতির যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা অনুশীলন-যোগ্য। এখনকারদিনে এই নিয়মগুলি কতটা পালন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও যাঁহারা গোঁড়ামি রক্ষা করিতে চান, তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে অনেক উপকার পাইবেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, হরিষা ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।